দেশ

সম্পাদক ঃ শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র সেন — সহকারী সম্পাদক ঃ শ্রীসাগরময় ঘোষ

১২ বর্ষ] শনিবার, ২রা আষাঢ়, ১৩৫২ সাল। Saturday, 16th June 1945. [৩২শ সংখ্যা

সাময়িক প্রসঙ্গ

বাঙলার শাসনতান্ত্রিক সমস্যা

ভারতের সর্বত্র রাজনীতিক জীবন-স্রোতের গতি যেন নূতন আকারে তরঙ্গায়িত হইয়া উঠিতেছে। এ-প্রবাহ রুদ্ধ করিবে, এমন শক্তি কাহারও নাই; কারণ জগতের প্রতিবেশ-প্রভাব ইহাতে শক্তি সঞ্চার করিতেছে। এমন সময়ে বাঙলার অবস্থার কি কোন পরিবর্তন ঘটিবে না? বাঙলার গবর্নর মিঃ কেসি সম্প্রতি দিল্লীতে গমন করিয়াছেন। শুনিতেছি, বাঙলায় নূতন মন্ত্রিমণ্ডল গঠন সম্পর্কে স্থির সিদ্ধান্তে পৌঁছানই তাঁহার দিল্লী গমনের উদ্দেশ্য; এই সম্বন্ধে লর্ড ওয়াভেলের সঙ্গে তাঁহার আলোচনা হইবে। আমরা স্পষ্টই বুঝিতেছি, ভারতের অন্যান্য প্রদেশেও শাসন-ব্যবস্থা সম্বন্ধে নূতন রকমের একটা পরিবর্তন ঘটিবে; সুতরাং বাঙলা দেশেও শাসন-বিভাগীয় কর্তাদের সুবিধামত মন্ত্রিমণ্ডল গঠন করিবার আশায় বসিয়া থাকিবার উপায় নাই। নহিলে এ সম্বন্ধে বিবেচনা হয়ত আরও বিলম্বিত হইত। অন্য কারণে না হউক, পারিপার্শ্বিক কারণের চাপে পড়িয়া বাঙলা দেশ হইতে ৯৩ ধারা প্রত্যাহার করিতে হইবে। আমরা আশা করি, নূতন মন্ত্রিমণ্ডল গঠনের এই ব্যাপারে মিঃ কেসি তাঁহার পূর্ববর্তীর ন্যায় অদূরদর্শিতার প্রভাবে পরিচালিত হইবেন না। ইতিমধ্যেই বাঙলার শাসন-বিভাগে অশেষবিধ আবর্জনা পুঞ্জীভূত হইয়া উঠিয়াছে। শুধু জনমতানুমোদিত মন্ত্রিমণ্ডলের দ্বারাই এই সব সমস্যার সমাধান হইতে পারে। তিনি ইহা বিবেচনা করিয়া স্বদেশের সেবাব্রতী স্বাধীনচিত্ততাসম্পন্ন ব্যক্তিদের দ্বারা গঠিত মন্ত্রিমণ্ডল প্রতিষ্ঠায় উদ্যোগী হইবেন। দেশের স্বার্থ সর্বতোভাবে রক্ষা করাই যাঁহাদের একমাত্র উদ্দেশ্য এবং যাঁহারা বিদেশীর পৃষ্ঠপোষকতার দায়ে সেই আদর্শ হইতে বিচ্যুত হইবেন না, বাঙলার শাসন-কর্তৃত্ব পরিচালনের ভার তাঁহাদের হাতেই দিতে হইবে; নতুবা বাঙলার শাসনতান্ত্রিক সমস্যার সমাধান করা সম্ভব হইবে না, ইহা সুনিশ্চিত।

ভারতীয় সমস্যায় বড়লাট

আমাদের এই মন্তব্য লেখার সময় পর্যন্ত লর্ড ওয়াভেলের প্রস্তাব প্রকাশিত হয় নাই। এ সম্বন্ধে সংবাদপত্রে যাহা প্রকাশিত হইয়াছে, তাহার উপর নির্ভর করিয়া সুনিশ্চিতভাবে কোন কথা বলা চলে না। তবে এইটুকু মাত্র বলা বোধ হয় অসঙ্গত হইবে না যে বড়লাটের প্রস্তাবে দেশবাসীর হাতে প্রকৃত ক্ষমতা হস্তান্তরের কোন পরিকল্পনাই নাই এবং বড়লাট যেভাবে এই সমস্যা সমাধানের জন্য অগ্রসর হইয়াছেন, তাহাতে আমাদের মনে কিছুমাত্র আশার উদ্রেক হয় নাই। সম্প্রতি মিঃ চার্চিল বিলাতের নির্বাচন সম্পর্কিত বক্তৃতায় তাঁহাদের ভারত সংশ্লিষ্ট নীতির কথা বলিয়াছেন; তাহাতেও আমাদের এই বিশ্বাস দৃঢ় হইয়াছে। যুদ্ধে ভারতীয় সেনাদের বীরত্বের প্রসঙ্গ উত্থাপন করিয়া তিনি বলেন,—ভারতবর্ষ যাহাতে ঔপনিবেশিক স্বায়ত্ত-শাসনের অধিকার লাভ করিবার পক্ষে সমধিক সুবিধালাভ করে, তৎসম্পর্কিত পরিকল্পনা নির্ধারণকালে ভারতীয় সেনাদের এই বীরত্বের কথা আমরা কিছুতেই বিস্মৃত হইব না। এক্ষেত্রে দেখা যাইতেছে, মিঃ চার্চিল ভারতবর্ষকে স্বাধীনতা—এমনকি, ঔপনিবেশিক স্বায়ত্তশাসনের অধিকার দান করিবার প্রতিশ্রুতি দানেও সঙ্কুচিত হইয়াছেন; তিনি ঔপনিবেশিক স্বায়ত্ত-শাসনের ক্ষমতালাভে আমাদিগকে অধিক সুবিধা দেওয়া হইবে, আপাতত এ পর্যন্তই শুধু বলিতে প্রস্তুত। এক্ষেত্রে তাঁহার এই সঙ্কোচের জন্য পাছে তাঁহার উদারতা সম্বন্ধে কেহ প্রশ্ন উত্থাপন করেন, সেজন্য নিজেদের পক্ষ হইতে মামুলী কৈফিয়ৎটাও তিনি এই সঙ্গে দিয়া রাখিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, আমাদের বিপদের সময় আমাদের যেসব বন্ধু আমাদিগকে সাহায্যের জন্য দাঁড়াইয়াছেন, তাঁহাদের কথা আমাদের স্মরণ রাখিতে হইবে; ভারতের সংখ্যালঘিষ্ঠ সম্প্রদায়সমূহ এবং সামন্তরাজ্যগুলির প্রতি আমাদের দায়িত্ব রহিয়াছে, তৎসম্বন্ধে আমরা সর্বদা সচেতন থাকিব। সুতরাং স্পষ্টই দেখা যাইতেছে, সাম্রাজ্যবাদী চার্চিল ভারতের উপর ব্রিটিশ প্রভুত্ব কায়েম রাখিবার মনোবৃত্তি লইয়াই পুরাদস্তুর চলিতেছেন। তিনি নিজেদের ঘাঁটি একটুও ছাড়েন নাই; শুধু তাহাই নহে, বিলাতের রপ্তানি বাণিজ্যকে উৎসাহিত করিবার জন্য তিনি এই বক্তৃতায় তথাকার ব্যবসায়ীদিগকে আশ্বাস প্রদান করিয়াছেন, দেখা যাইতেছে; বুঝা যায়, এক্ষেত্রে ভারতের উপরই তাঁহার প্রধানত দৃষ্টি রহিয়াছে। ইংলণ্ডের ভূতপূর্ব স্বরাষ্ট্রসচিব লর্ড ব্রেণ্টফোর্ড একদিন গর্ব করিয়া বলিয়াছিলেন, আমরা নিঃস্বার্থ প্রেমের দায়ে ভারতবর্ষে যাই নাই। ল্যাঙ্কশায়ারের জন্য বাজার সৃষ্টি করাই আমাদের উদ্দেশ্য। মিঃ চার্চিল অবশ্য ততটা স্পষ্ট করিয়া এখনও কথাটা বলেন নাই; কিন্তু তাঁহার নীতি সেই দিকেই যে সম্প্রসারিত হইবে, এমন লক্ষণ ইহার মধ্যেই অনেকটা দেখা যাইতেছে। সুতরাং লর্ড ওয়াভেলের প্রস্তাব লইয়া মাতামাতি করিবার আগে ভারত সম্পর্কে ব্রিটিশ নীতির সূক্ষ্ম গতির উপর লক্ষ্য রাখিতে হইবে। সে নীতির কোন ফিকিরে কংগ্রেসের নির্দেশিত পূর্ণ স্বাধীনতার আদর্শকে পরিম্লান করিতে আমরা যেন প্রলুব্ধ না হই; কংগ্রেসের মর্যাদাকে প্রাথমিকভাবে এবং

প্রধানভাবে স্বীকার করিয়া না লইলে কোন প্রস্তাবই আমরা স্বীকার করিয়া লইব না। সোজা কথায়, কংগ্রেসনেতৃবৃন্দ এবং ভারতের অপরাপর সকল রাজনীতিক বন্দীকে মুক্তিদান করিয়া ভারতের নবজাগ্রত জাতীয় জীবনের পরিপূর্ণ মর্যাদা সর্বতোভাবে মানিয়া লইতে ব্রিটিশ গভর্নমেণ্ট যদি প্রস্তুত না থাকেন, তবে এইসব প্রস্তাব-পরিকল্পনার প্রসঙ্গ উত্থাপন করিয়া লাভ নাই; তাহাতে দেশবাসীর অন্তরের বিক্ষোভ কিছুমাত্র প্রশমিত হইবে না।

বস্ত্রের দুর্ভিক্ষ

অন্নের দুর্ভিক্ষের অপেক্ষাও বস্ত্রের দুর্ভিক্ষ বাঙলা দেশে বর্তমানে প্রবল আকার ধারণ করিয়াছে। বাঙলার শহরে শহরে সহস্র সহস্র বস্ত্রহীন নরনারীর মিছিলের খবর সংবাদপত্রে প্রকাশিত হইতেছে। বস্ত্রাভাবে আত্মহত্যা করিবার সংবাদ পাওয়া যাইতেছে। অন্নের দুর্ভিক্ষে প্রাণের দায়, কিন্তু বস্ত্রের দুর্ভিক্ষে মানের দায়। মানুষের পক্ষে এ দায় সামান্য নহে, প্রাণের চেয়ে মানের দায় বড়। কিন্তু কর্তৃপক্ষ এই সমস্যা সমাধানে এ পর্যন্ত কার্যকর কোন ব্যবস্থাই অবলম্বন করিতে পারেন নাই। কলিকাতায় কবে পূর্ণাঙ্গ বস্ত্র রেশনিং প্রবর্তন করা সম্ভব হইবে, তাঁহারা এখনও সে বিষয়ে নিশ্চিতভাবে কোন কথা দিতে পারিতেছেন না। সরকার পক্ষ হইতে এই কথা শুনিতেছি যে, 'বস্ত্র-সরবরাহ ব্যবস্থার বর্তমান উন্নত অবস্থা যদি বজায় থাকে, তবে দুই মাসের মধ্যে কলিকাতা শহরে বস্ত্র রেশনিং প্রবর্তিত হইবার সম্ভাবনা আছে। আমাদের বস্ত্রাভাবের এই দুরবস্থার মধ্যে বস্ত্র-সরবরাহের উন্নত অবস্থা বলিতে সরকার কি বুঝিতে চাহেন আমরা ধারণা করিতে পারি না। তাঁহাদের হাতে কিছু বস্ত্র আসিয়া জমিতেছে, সম্ভবত এতদ্দ্বারা তাহার অবস্থার কথাই তাঁহারা বুঝাইতে চাহিয়াছেন। আমরা জানি, সরকারের হাতে কাপড় জমা আছে। ঢাকেশ্বরী কটন মিলের ডিরেক্টর শ্রীযুক্ত সূর্যকুমার বসু মহাশয় সেদিন ঢাকার রোটারী ক্লাবের বক্তৃতাপ্রসঙ্গে বলিয়াছেন,—গত চার-পাঁচ মাস হইতে ঢাকেশ্বরী কটন মিলের গুদামে সরকারী অর্ডারী কাপড় ধীরে ধীরে স্তূপীকৃত হইতে থাকে। এপ্রিল মাসের শেষভাগে মজুত কাপড়ের পরিমাণ প্রায় হাজার গাঁইট হয়। তাঁহারা এই মাল ডেলিভারী না লইয়া আমাদিগকে অসুবিধায় ফেলিয়াছেন। মাল মজুত রাখিবার ফলে গুদামগুলি এমনভাবে আবদ্ধ হইয়া গিয়াছে যে, তুলা ও অন্যান্য দ্রব্য রৌদ্র ও বৃষ্টিতে নষ্ট হইয়া যাইতেছে। কিন্তু এভাবে কাপড় জমা থাকায় আমাদের সান্ত্বনার কোন কারণ নাই। কলিকাতার বিভিন্ন ওয়ার্ডগুলির বস্ত্র-বণ্টন ব্যবস্থা পরিচালনার সুবিধা করিবার জন্য সম্প্রতি সরকার কেরানী নিযুক্ত করিয়াছেন, কিন্তু কেরাণী নিয়োগের দ্বারা বস্ত্রের অভাব পূরণ হইবে না। বিভিন্ন ওয়ার্ড কমিটিগুলিকে যে হিসাবে কাপড় দেওয়া হইতেছে তাহা প্রয়োজনের তুলনায় অত্যন্তই অকিঞ্চিৎকর। প্রথমত, নিতান্ত প্রয়োজন মিটাইবার জন্যও তাঁহারা যে পরিমাণ কাপড় চাহিতেছেন, তাহার দশ ভাগের এক ভাগ তাঁহারা পাইতেছেন কি না সন্দেহ। তারপর যে সামান্য পরিমাণ বস্ত্র তাঁহাদিগকে দিবার প্রতিশ্রুতি দেওয়া হইতেছে, তাহাও যথাসময়ে সরবরাহ করা হইতেছে না। দোকান নির্বাচনে অ-ব্যবস্থা ইহার পরে রহিয়াছে; এ বিষয়ে ওয়ার্ড কমিটিসমূহের পরামর্শ অগ্রাহ্য করিয়া ব্যবসায়ে অনভিজ্ঞ নূতন লোককে দোকান-দারীতে বসাইয়া দেওয়া হইতেছে, এমন অভিযোগ আমরা অনেক স্থান হইতেই পাইতেছি। তাঁতের কাপড়ের দ্বারা বাঙলা দেশের কাপড়ের অভাব কতকটা মিটিত; কিন্তু সূতার অভাবে তাঁত চলিতেছে না। দুই তিন মাস আগে যে তাঁতের কাপড়ের জোড়া ২০৲ টাকা ছিল, এখন তাহার মূল্য দ্বিগুণের অধিক হইয়াছে। খদ্দর উৎপাদন নিয়ন্ত্রিত হইয়াছে; শুধু তাহাই নহে, নিখিল ভারত কাটুনী সঙ্ঘের বাঙলা শাখার সম্পাদক শ্রীযুত জিতেন্দ্রকুমার চক্রবর্তী সম্প্রতি সংবাদপত্রে যে বিবৃতি প্রকাশ করিয়াছেন তাহাতে দেখা যাইতেছে, বাঙলা সরকারের আদেশে বাঙলার ৩৫টি খাদি কেন্দ্রের মধ্যে ২৮টি বন্ধ হয়; ইহাদের অধিকাংশ এখনও শীল করা অবস্থায় রহিয়াছে। কতকগুলি প্রতিষ্ঠানের আটক মাল প্রত্যর্পিত হইলেও এগুলি বে-আইনী বলিয়া ঘোষণা করিবার আদেশ এখনও প্রত্যাহৃত হয় নাই। সুতরাং খদ্দর উৎপাদনের সুবিধা থাকিলেও সরকারী নীতির ফলে তাহা নষ্ট হইয়াছে। সত্যই, আমাদের স্বার্থ সম্বন্ধে সদাশয় সরকারের এইরূপ সজাগ দৃষ্টি থাকাসত্ত্বেও যদি আমাদের দুঃখ দূর না হয়, দোষ কাহার?

যুদ্ধজয়ের পর

গত ১০ই জুন পাঁচগণিতে রাষ্ট্র সেবা-দলের সদস্যদের নিকট বক্তৃতা প্রসঙ্গে গান্ধীজী ইউরোপের যুদ্ধের কথা উল্লেখ করিয়া বলেন, ইউরোপের পরিসমাপ্তি আমরা দেখিলাম। এতদ্দ্বারা পৃথিবীতে সত্যেরই জয় ঘটিল কি না, এ বিষয়ে লোকের মনে প্রশ্ন জাগিবে; মিত্রশক্তি জয়-লাভ করিয়াছেন; কিন্তু তাঁহাদের জয় উৎকৃষ্টতর অস্ত্র এবং লোকবলের প্রাধান্যেরই ফল। মিথ্যার উপর সত্যের জয় ঘটিয়াছে; ইহার ফলে আমি ইহা উপলব্ধি করিয়া আনন্দ প্রকাশ করিতে পারি না। সম্প্রতি মিস্ মার্গারেট পোপ এ সম্পর্কে বিশেষ-ভাবে আমাদের কথাটা আরও ভাঙ্গিয়া বলিয়াছেন। বিলাতের কেয়ারহার্ডি হলে বক্তৃতা প্রসঙ্গে তিনি বলেন,—ইউরোপ হইতে নাৎসীবাদ বিতাড়িত হইয়াছে। কিন্তু ভারতের কারাগারসমূহ রাজনীতিক বন্দীদের দ্বারা এখনও পূর্ণ আছে; বিদেশীয় প্রভুত্বের উৎপীড়ন এখনও সেখানে জনমতকে পিষ্ট করিয়া চলিয়াছে। আমরা সংবাদপত্র খুলিলেই দেখিতে পাই, ব্রিটিশ গভর্নমেণ্ট নাৎসীদের কারাগারে উৎপীড়িত বন্দীদের দুর্দশার কাহিনী শতমুখে প্রচার করিতেছেন, কিন্তু ভারতের কারাগারে স্বদেশপ্রেমিক সন্তানদের প্রতি যে নির্মম লাঞ্ছনা এবং নিপীড়ন চলিতেছে, তাঁহারা চোখ বুজিয়া তাহা অস্বীকার করিতেছেন। এই সম্পর্কে আমরা শ্রীযুক্তা লীলা রায়ের কথা উল্লেখ করিতে পারি। শ্রীযুক্তা রায় কিছুদিন হইতেই অসুস্থ আছেন। কিছু-দিন পূর্বে চিকিৎসার জন্য তাঁহাকে কলিকাতায় লইয়া আসা হয়। কিন্তু সম্পূর্ণ আরোগ্যলাভের অবসর না দিয়াই তাঁহাকে পুনরায় দিনাজপুরে লইয়া যাওয়া হইয়াছে এবং বর্তমানে অসুস্থ অবস্থায় তাঁহাকে দিনাজপুরে জেলে এখনও নির্জন কারা কক্ষেই দিনযাপন করিতে হইতেছে। সঙ্গী-স্বরূপে কেহ তাঁহার কাছে নাই। শ্রীযুক্তা রায় নিরাপত্তা বিধি অনুসারে আটক আছেন। প্রকাশ্য আদালতে তাঁহার কোন অপরাধ প্রমাণিত হয় নাই; সুতরাং স্বদেশপ্রেমই এই প্রতিভাশালিনী মহিলার একমাত্র অপরাধ, ইহাই বলিতে হয়। দীর্ঘ-দিন পীড়িতা থাকাতে তিনি ভগ্নস্বাস্থ্য হইয়া পড়িয়াছেন; এরূপ অবস্থায় তাঁহাকে মুক্তি দিলে ব্রিটিশ সাম্রাজ্য বিপন্ন হইবে, এমন কোন আশঙ্কা আছে কি? যাঁহাদের শাসনাধীনে বিনা বিচারে ভারতের স্বদেশ-প্রেমিক সন্তানদের উপর এমন নির্যাতন চলিতেছে, তাঁহারা নাৎসী শাসনে বন্দী-জীবনের করুণ কাহিনী উচ্চকণ্ঠে প্রচার করিয়া নিজেদের উদারতা জাহির করিতে লজ্জাবোধ করেন না, ইহাই আশ্চর্য!



দেশের কথা

বিশ্বশান্তি সম্মেলনের বিজ্ঞগণ ঘাড় নাড়িয়া বলিতেছেন—শুধু কথার জন্য কি আসে যায়? স্বায়ত্তশাসন আর স্বাধীনতা—দুইটি একই বিষয়; কিন্তু ফিলিপাইনের প্রতিনিধি দলের নেতা ব্রিগেডিয়ার জেনারেল কার্লস রোমুলু বলিতেছেন, বিশ্বসনদে 'স্বায়ত্তশাসনে'র পরিবর্তে 'স্বাধীনতা' শব্দটি যাহাতে ব্যবহৃত হয়, সেজন্য তিনি সান্‌ফ্রান্সিস্কো বৈঠকে শেষ পর্যন্ত আন্দোলন চালাইবেন। শ্রীযুক্তা বিজয়লক্ষ্মী পণ্ডিত চিকাগো শহরের একটি বক্তৃতায় এই বিষয়টি উত্থাপন করেন। তিনি বলেন—

"স্বাধীনতা" শব্দটি বাদ দেওয়া মারাত্মক ভুল হইয়াছে। পঞ্চশক্তির মধ্যে যাঁহারা এই শব্দ ব্যবহারে ভীত হইতেছেন, তাঁহারা বড় রকমের ভুল করিতেছেন। ইহার মূলে যে শব্দ তাঁহারা ব্যবহার করিতে চাহিতেছেন, তাহার ব্যাখ্যা তাঁহারা নিজেদের খুশীমত চালাইতে সুযোগ পাইবেন। আমি জানি, পঞ্চশক্তির মধ্যে চীন ও রাশিয়া 'স্বাধীনতা' কথাটি ব্যবহারের পক্ষপাতী ছিল।"

এইখানে প্রশ্ন উঠে এই যে, 'স্বাধীনতা' এবং স্বায়ত্তশাসন যদি একই বস্তু হয়, তবে ব্রিটেন এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের এই শব্দটি বিশ্ব-স্বাধীনতা সনদে ব্যবহার করিতে আপত্তির কারণ কি? নিউজীল্যাণ্ডের প্রতিনিধি স্পষ্ট করিয়া বুঝাইয়া দিয়াছেন যে, সাম্রাজ্য হইতে বিচ্ছিন্ন হইবার অধিকারই 'স্বাধীনতা' এই শব্দটির দ্বারা সূচিত হয়; ব্রিটিশের পক্ষে এ শব্দটি ব্যবহারে আপত্তি থাকিবে, ইহা স্বাভাবিক; কারণ ভারতবর্ষ স্বায়ত্তশাসনের অধিকার ইতিমধ্যেই লাভ করিয়া বসিয়াছে, এই ধরণের ধাপ্পাবাজী ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদীদের পক্ষে তাহা হইলে আর চালানো সম্ভব হয় না।

পূর্ণ স্বাধীনতাই আদর্শ

বিদেশীর সর্বপ্রকার প্রভাব হইতে মুক্ত রাষ্ট্র শাসনে কর্তৃত্বকেই আমরা স্বাধীনতা বলিয়া বুঝিয়া থাকি। জাতির সংস্কৃতির বৈশিষ্ট্য এবং তৎপ্রতি সম্ভ্রম বুদ্ধি এক্ষেত্রে অক্ষুণ্ণ থাকা চাই। এই বৈশিষ্ট্য যদি লুপ্ত হয়, তবে কোন জাতি বাঁচিতে পারে না; কিংবা বড় হইতে পারে না। দৃষ্টান্তস্বরূপে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে কানাডা ও অস্ট্রেলিয়ার তুলনা করা যাইতে পারে। সান্‌ফ্রান্সিস্কোতে কার্লস্ রোমুলু এই কথাটি উত্থাপন করিয়াছিলেন। তিনি বলেন, মার্কিন জাতি যদি পূর্ণ স্বাধীনতা লাভ না করিত, তবে জগতে আজ এত বড় মর্যাদাপূর্ণ স্থান অধিকার করা তাহার পক্ষে সম্ভব হইত কি? মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অবদানের সঙ্গে জগতের সংস্কৃতির ক্ষেত্রে স্বায়ত্তশাসনের অধিকারপ্রাপ্ত কানাডা, অস্ট্রেলিয়া, দক্ষিণ আফ্রিকা, নিউজিল্যাণ্ড প্রভৃতি কোন দেশের তুলনা চলে কি? পরাধীনতার বিষ এমনই যে, কোনভাবে যদি তাহার একটু ছোঁয়াচ লাগে, তবে আর মানুষ বড় হইতে পারে না। তথাকথিত ব্রিটিশের ঔপনিবেশিক স্বায়ত্তশাসনের অধিকারপ্রাপ্ত দেশে মনীষার যে তেমন জাগরণ দেখিতে পাওয়া যায় না, ইহার মূল কারণ রহিয়াছে এইখানে। ক্ষমতাশালী সোভিয়েট সাংবাদিক অধ্যাপক করোভিন সম্প্রতি এ সম্বন্ধে 'রেড স্টার' পত্রে লিখিয়াছেন—

"যতদিন কোন না কোন আকারে ঔপনিবেশিক প্রভাবের চাপ অপর জাতির উপর পড়িবে এবং যতদিন কতকগুলি জাতি ও রাষ্ট্র অন্য জাতিসমূহের ভাগ্যের উপর প্রভুত্ব কোন-ভাবে চালাইবে, ততদিন মানুষের স্বাধীনতার মৌলিক অধিকারের সম্বন্ধে প্রকৃত শ্রদ্ধা সৃষ্টি হইতে পারে না। যুক্তিতর্ক দ্বারা কি ইহা বুঝাইয়া দিবার প্রয়োজন আছে? ঠিক সেই কারণেই আজ পৃথিবীর সব দেশের স্বাধীনতা লাভ করিবার এবং জাতীয় বৈশিষ্ট ধারা ধরিয়া স্বকীয় রাজনীতিক জীবন সংগঠনের অধিকার মানিয়া লইতে হইবে। যাঁহারা বিশ্বের নিরাপত্তার জন্য আজ জল্পনা-কল্পনায় রত হইয়াছেন, তাঁহারা যতদিন পর্যন্ত তাঁহাদের অধীন জাতিগুলিকে তাহাদের আশা-আকাঙ্ক্ষা দ্রুত কার্যে পরিণত করিবার সুযোগ না দিবেন, ততদিন পর্যন্ত তাঁহাদের এই সব চেষ্টার কোন মূল্য নাই।"

মর্যাদাবুদ্ধির অভাব

অথচ অপর জাতির রাষ্ট্রীয় মর্যাদাবুদ্ধির অভাব সর্বত্রই পরিলক্ষিত হইতেছে; এশিয়াবাসীদের সম্পর্কে তো বিশেষভাবে। এশিয়ার লোকদের স্বাধীনতার মৌলিক অধিকারকে শ্রদ্ধা-বুদ্ধিতে দেখিবার দৃষ্টি ব্রিটেনের কোনদিনই ছিল না। শ্বেতাঙ্গ জাতির উপর ভগবান্ কৃষ্ণাঙ্গ জাতি-গুলিকে মানুষ করিবার ভার দিয়াছেন, ব্রিটিশ রাজনীতিকগণ নিজেদের উদার-বুদ্ধিকে বাড়াইয়া এমন ক্ষুদ্র বিচারের গণ্ডির উপরে উঠিতে পারেন নাই। এক্ষেত্রে তাঁহারা হিটলারেরই সমধর্মী। সুতরাং সিরিয়া ও লেবাননের স্বাধীনতার দাবী সম্বন্ধে ব্রিটিশের সহানুভূতি যে ফরাসী এবং মার্কিন রাজনীতিক মহলে সন্দেহের উদ্রেক করিবে, ইহাতে বিস্মিত হইবার কিছুই নাই। আমাদের নিজস্ব সংবাদদাতা সর্দার জে জে সিং এ সম্বন্ধে সানফ্রান্সিস্কো হইতে যে সংবাদ দিয়াছেন, তাহা এক্ষেত্রে বিশেষ-ভাবে উল্লেখযোগ্য। তিনি বলেন,

"আজ আমি ইরাক, ইরান, লেবানন, সিরিয়া ও সৌদী-আরব হইতে আগত প্রতিনিধিদের সঙ্গে আলাপ করি। ফরাসী প্রতিনিধিমণ্ডলের মুখপাত্রদের সঙ্গেও আমার আলাপ হয়। তাঁহারা সকলেই বিষম ক্রুদ্ধ। তাঁহারা মনে করেন, ভারতবাসীদের প্রতি বৃটিশের ব্যবহার স্মরণ করিয়া ব্রিটিশের বিরুদ্ধাচরণ করিয়া ফরাসীদের পক্ষই আমাদের অবলম্বন করা উচিত। আমি তাঁহাদিগকে বলি, ব্রিটিশ জাতির বিরুদ্ধে আমরা যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইতেছি না; তাঁহাদের সাম্রাজ্যবাদী মতবাদ ও পদ্ধতির বিরুদ্ধেই আমাদের সংগ্রাম। ফরাসীরা একথাটা কেন ভুলিয়া যাইতেছেন? তাহা ছাড়া লুঠের মাল লইয়া দুই সাম্রাজ্যবাদী শক্তির মধ্যে ঝগড়া বাধিয়াছে বলিয়াই ভারতবাসীদের দৃষ্টিতে বিবদমান দুই জাতির মধ্যে এক জাতি অন্য জাতি অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ হইয়া উঠে না।"

এই তো গেল ফরাসী পক্ষের কথা; এখন ব্রিটেনের নীতির মধ্যে মার্কিন মহলের অভিমতও কিছু আলোচ্য হইয়া পড়ে। সিরিয়া ও লেবাননের প্রসঙ্গ অবতারণা করিয়া 'চিকাগো ট্রিবিউন' পত্র লিখিতেছেন—

"সিরিয়া ও লেবাননের স্বাধীনতা লাভের প্রশ্ন সম্পূর্ণ সমর্থনযোগ্য হইলেও এই ব্যাপারে ব্রিটেন যে নির্লজ্জ ভণ্ডামি শুরু করিয়াছে, তাহা কোনক্রমেই উপেক্ষা করা যায় না। ব্রিটেন সিরিয়াবাসীদের পক্ষাবলম্বন করিয়া এই ভাবটা দেখাইতে চাহিতেছে যে, সিরিয়া ও লেবাননের স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা দমনের জন্য ফ্রান্স যাহা করিতেছে কিংবা যাহা করিবার সঙ্কল্প করিয়াছে, শতাব্দীব্যাপী ব্রিটিশ অত্যাচারের আমলে ভারতে তাহা কখনও সংঘটিত হয় নাই। ব্রিটেন সম্প্রতি কয়েক বৎসর যাবৎ মধ্যপ্রাচ্যে একটি সেনাবাহিনী মোতায়েন করিয়াছে। ব্রিটেনের এই কাজ বহু মার্কিনের হতবুদ্ধি হইবার কারণ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। এই অঞ্চলে জার্মান আক্রমণের আশঙ্কা ছিল না। জার্মানেরা ছিল ইউরোপে। সেখানে জার্মানদের সায়েস্তা করার ভার ব্রিটিশেরা বেশ হৃষ্টচিত্তে মার্কিনদের উপর ছাড়িয়া দিল। এদিকে মার্কিনেরা যখন লড়াই করিয়া মরিতে থাকিল, তখন শক্তিমান ব্রিটিশ বাহিনী মধ্যপ্রাচ্যে বেশ জাঁকাইয়া বসিয়া রহিল। আমাদের মধ্যে যাঁহারা ইহার কারণ জানিতে চাহিলেন, তাঁহাদিগকে মিত্রপক্ষের মধ্যে অনৈক্যের বীজ উপ্ত করিতে বারণ করা হইল। কিন্তু জবাব আমরা এখন পাইয়াছি—সেখানে ব্রিটিশ বাহিনী রাখার উদ্দেশ্য হইতেছে, ব্রিটেনের অভিপ্রায়ই যেন মধ্যপ্রাচ্যের সর্বত্র আইন হইয়া দাঁড়ায়। ব্রিটিশের স্বার্থমূলক নির্দেশ অনুসারে সেখানে রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক অধিকার ও সুবিধা নিয়ন্ত্রিত হইবে। স্পষ্টই দেখা যাইতেছে যে, ব্রিটেন ন্যায়-নীতি অনুসারে কাজ করিতেছে না। ন্যায়-নীতির তোয়াক্কাই যদি তাহারা রাখিবে, তবে দাসত্ব হইতে তাহারা ভারতবাসীদিগকে মুক্তি দিত।"

'নিউইয়র্ক পোস্ট' পত্রে প্রসিদ্ধ মার্কিন সাংবাদিক মিঃ এডগার আনসেল মাউরার

মুদ্রা। মুদ্রা পরে সকল কেনা-বেচার মাধ্যম হইয়াছিল। তারপর রাজা যখন উৎপন্ন দ্রব্যের অংশের স্থলে, রেণ্ট বা ট্যাক্স হিসাবে, মুদ্রা দাবী করিলেন, সেইদিন হইতে উৎপাদনকারীরা মুদ্রা-সঞ্চয়ীর কাছে মাথা বিকাইল, স্বাতন্ত্র্য হারাইল। মুদ্রাসঞ্চয়ী তাহাদের যে অবস্থায় রাখিতে চাহিবেন তাহাদের সেই অবস্থায় থাকিতে হইবে।

Slave-money বা rent-money হিসাবে ব্যবহৃত মুদ্রা ও দাস ইহারা, একই বস্তুর দুই রূপ। দুইই অনার্জিত ধনের জনক, অতি প্রয়োজনীয় খাদ্যশস্যের মূল্য কমাইয়া অনাবশ্যক হীরা জহরতাদির মূল্য অসম্ভব রকম বাড়াইতে দুয়েরই সমান শক্তি। দুইই বেয়নেটের বলে বলীয়ান।

মনে করা যাক, দেশে দুর্ভিক্ষ হইয়াছে। আমি একজনকে এক মণ চাল ধার দিয়াছিলাম। নালিশ করিয়া তাহাকে চাল ফেরত দিতে বাধ্য করিয়াছি। সে কিন্তু চাল না দিয়া, একটা দাস বা দশটা টাকা পাঠাইয়া দিল। দাস বা টাকা আমার কাছে এখন মূল্যহীন। স্বাধীনতা থাকিলে আমি ইহার একটিও স্পর্শ করিতাম না। কিন্তু রাজার বেয়নেট পশ্চাতে থাকাতে দাস বা টাকা আমাকে লইতেই হইবে, এবং দেনা শোধ হইল বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে। চাল আর চাহিতে পারিব না। rent-money ও Slave এই দুয়ের কল্যাণে টাকা সুচারটি নিষ্কর্মার ঘরে জমা হইল। ইঁহারা বাজারের খাদ্যশস্য Corner করিয়া জমা করিয়া, লাভে বিক্রয়ের আশায় বসিয়া রহিলেন। স্লেভ-লেবারের সহিত পাল্লা দিতে না পারিয়া বা Rent-moneyর চাপে চাষী ও কারু নিজের নিজের কাজ ছাড়িয়া দাস হইবার জন্য লালায়িত হইল; দেশব্যাপী অন্নাভাব হইল, নিষ্কর্মারা সকল আরাম পুরাদমে ভোগ করিয়া চলিল, কেবল যাহারা গলদঘর্ম পরিশ্রম করে তাহারাই খাইতে পায় না, ইহাতে ঘোর অশান্তি ও অন্তর্দাহ হইল, ফলে অভুক্তেরা বিপ্লব করিয়া রক্ত নদী বহাইল, বা বিপ্লবের আশঙ্কা করিয়া রাজা forcible redistribution of wealth করিলেন,—কমিউনিজম্ হইল। পরে যথাক্রমে আসিতে লাগিল মিলিটারী ডিক্টেটরশিপ, প্লুটোক্র্যাসী, ডেমোক্র্যাসী এবং অফুরন্ত দরিদ্রশোষণ, বেকার ও অনশন, বিপ্লব ও ধনপুনর্বণ্টন এবং পুনরায় মিলিটারী ডিক্টেটরশিপ।

অতীত ইতিহাসের দূর কুহেলিকাচ্ছন্ন যুগ হইতে আজ পর্যন্ত ইউরোপের রাষ্ট্র ব্যবস্থায় এই পারম্পর্য চলিয়া আসিতেছে।

ইউরোপ ও আমেরিকার সভ্যতাকে স্লেভ-লেবারমূলক বলা হইয়াছে। কথাটার একটু টীকা আবশ্যক। প্রথমত যুদ্ধবন্দীরাই দাস হইত। পরে দাসের উপযোগিতা দেখিয়া ধনিকেরা দেশের দুর্গতদের ধরিয়া দাস করিতে লাগিলেন। ঋণের দায়ে নিঃস্ব, যুদ্ধে বন্দী, পণ্যেক্রীত মানুষকে গ্রীস ও রোমে দাস করা হইত। ইহাদের মধ্যে দেশী-বিদেশী বা সাদা-কালো ভেদ ছিল না। আজিকার দাস-মালিকের পক্ষে কাল অবস্থা বিপর্যয়ে দাস হওয়া অসম্ভব ছিল না। কাজেই এই সব দাস অনেকটা মানুষের মত ব্যবহার পাইত। তাহাদের মধ্যে অনেকে সম্মানের পদও পাইয়াছেন। যাহারা মাঠে চাষ করিত তাহাদের ক্ষেত ছাড়িয়া পলাইবার অধিকার ছিল না। অন্য অনেক বিষয়ে স্বাধীনতা ছিল। খৃশ্চিয়ান ইউরোপ ও আমেরিকা কিন্তু কোন মানুষকে স্লেভরূপে ধরিয়া রাখিতে ব্যথা বোধ করিলেন। তাঁহারা আফ্রিকার জঙ্গল হইতে নররূপী জন্তু ধরিয়া আনিয়া দাস করিতে লাগিলেন। পাদ্রীরা বুঝাইয়া দিলেন যে এ জন্তুগুলি ঈশ্বরের অভিশাপে সাদা লোকের দাস হইবার জনাই বিশেষ করিয়া সৃষ্ট হইয়াছে। ইহাদের আত্মা নাই, হৃদয় নাই। ইহাদের প্রতি নির্দয় হইলে পাপ হয় না। সাদা কৃশ্চানের পক্ষে এ ব্যাখ্যা জলের মত সহজ বোধ হইল। তাঁহারা দাসদের এমন নির্মমভাবে পিষিয়া কাজ আদায় করিবার চেষ্টা করিলেন যে, অনেকেই অকর্মণ্য হইয়া পড়িল। টিপিয়া সোনার ডিম বাহির করিবার চেষ্টায় হাঁসটাই মারিয়া গেল।

তখন ধনকুবেরেরা মনে মনে ভাবিলেন "আমরা এই জীবগুলাকে পুষিয়া মরিতেছি কেন? পুষিতে গেলে ইহাদের রোগের চিকিৎসা করিতে হইবে, রুগ্ন অবস্থায় কাজ হইতে রেহাই দিয়া ক্ষতি স্বীকার করিতে হইবে, পট করিয়া মরিয়া না যায়, সেজন্য সাবধানে হাত পা নাড়িতে হইবে। এত হাঙ্গামা করি কেন? ছাড়িয়া দিলে ইহারা যাইবে কোথায়? আমাদের কাছেই ত ঠিকা কাজ করিতে আসিবে। কাজ এখন যতটা আদায় হয় তখনও ততটা আদায় করিব। যেদিন কাজ করিবে সেদিনের তংখা দিব। ব্যস্! যেদিন কাজ করিবে না, সেদিন যেখানে হোক পড়িয়া থাকুক, হাওয়া খাক, খাবি খাক, আমাদের ব্যস্ত হইবার কারণ থাকিবে না।।" ধনকুবেরগণ উঠিয়া পড়িয়া লাগিলেন, দাসরা মুক্ত হইয়া গেল। চালচুলাহীন এই সব দাস চাকরী খুঁজিয়া খুঁজিয়া ঘুরিতে লাগিল। ইহাদের কল্যাণে wage-level হুহু করিয়া কমিয়া গেল। তখন অল্প খরচে বেশী লোক খাটাইয়া ধনপতি দ্বিগুণ লাভ করিলেন। এই লাভের টাকায় নূতন নূতন ফ্যাক্টরী হইল; খাদ্যদ্রব্য Corner করিয়া জমাইয়া বা ধ্বংস করিয়া দুর্ভিক্ষের সৃষ্টি করা হইল; চাষী-মুদি-কামারকুমার পেটের দায়ে ফ্যাক্টরীর দ্বারে ধর্ণা পাড়িতে আসিল; Wage-level আরও কমিল, কারখানা মালিক আরও লাভবান হইলেন; এই লাভের

টাকায় ব্যাঙ্কের দব্‌দবা বাড়িল; ট্রেজারী ফাটিয়া পড়িতে লাগিল,—ইনকম ট্যাক্স ও সুপার ট্যাক্স-এর টাকায়; বড় বড় ইমারত হইল কাগজপত্র রাখার জন্য; বড় বড় রাস্তা ও পার্ক হইল নগ্ন-নিরন্ন নরনারীর পড়িয়া থাকিবার জন্য, বড় বড় গবেষণাগারে ভাড়া করা রিসার্চ ওয়ার্কার খাটিতে লাগিলেন ধনিকের ধনবৃদ্ধির উপায় আবিষ্কার করিতে স্কুল হইল, কলেজ হইল, স্কুল-কলেজ ফের্তা। ছাত্রদের লইয়া গঠিত হইল মারণাস্ত্রপটু সৈন্যের দল; আর এই সৈন্যদের মারণাস্ত্র জোগাইবার জন্য ফ্যাক্টরী খুলিয়া বসিলেন দেশহিতৈষী মহাজনগণ, শতকরা ৫০০ বা ৬০০ টাকা মাত্র লাভের দিকে লক্ষ্য রাখিয়া,—সভ্যতার Sky Scraper চড় চড় করিয়া আকাশ ফুঁড়িয়া উঠিল। আশ্চর্যের বিষয় ইহাতেও broadline-এর দৈর্ঘ্য কমিল না। আরও কয়েকটা ফ্যাক্টরী খুলিয়া unemployedদের absorb করিবার চেষ্টা হইল। দেখা গেল এতদিন নিজের কাজ করিয়া যাহারা আধ-পেটা খাইতেছিল, তাহারাও আসিয়াছে ফ্যাক্টরীতে কাজ খুঁজিতে। বহুদিন unemployed derelictদের চেয়ে এই লোকগুলো কর্মী হিসাবে অনেক ভাল। তাই তাহাদের মধ্যে অনেককেই লইতে হইল। Derelictদের দু-পাঁচজনকেও লওয়া হইয়াছে নিশ্চয়। কিন্তু বেকার সমস্যা ঘুচিল না, তখন ধনিকেরা এক কাজ করিলেন। তাঁহারা নিজেদের আয়ের সমষ্টিকে দেশের মোটজনসংখ্যা দিয়া ভাগ করিয়া ফেলিলেন। ইহাতে মাথা পিছু যা আয় দাঁড়াইল, তাহাতে প্রত্যেক লোকেরই রাজার হালে থাকা চলে। ইহার পর আর দুঃখ করিবার কিছু রহিল না। যদিও বেকারত্ব রহিয়াই গেল।

খৃঃ পূঃ ৬০০ অব্দ হইতে ইউরোপ বেকার সমস্যা দূর করিতেছে। এখনো বেকার সমস্যা দূর হয় নাই। তাহার কারণ ইউরোপীয় সভ্যতার মূলভিত্তি হইল unemployment. বেকার না থাকিলে ফ্যাক্টরীতে কাজ করিবার লোক পাওয়া যাইত না। ফ্যাক্টরী না থাকিলে ইউরোপ ভারত ও চীনের মতই বর্বর থাকিত। বেকার আছে বলিয়াই ধনিকগণ কর্মীদের যথেচ্ছ নাচাইতে পারিয়াছেন,—প্রাণহীন পুতুলের মত। এইরূপ নাচা ও না খাইয়া মরা এই দুটির মধ্যে একটিকে বাছিয়া লইবার স্বাধীনতাটুকু কর্মীর আছে। নাকের কাছে Employmentএর Carrot ঝুলাইয়া যাহাদিগকে কামারশালা হইতে সুতার কলে এবং আলেস্কা হইতে মেলবোর্ণে ছুটান যায়, তাহারা দাসই, নাম যাহাই হোক। ইউরোপ-আমেরিকার সকল কর্মীই এইরূপ দাস। অর্কেস্ট্রার বাজিয়েরা পর্যন্ত হুকুমের দাস—সবাই কোন ধনিক বিশেষের মিউজিক ফ্যাক্টরীতে nut ঘুরনে-ওয়ালা।

দাসরা সবাই সমান। সবাইকে দিয়া সব কাজ করান যায়, কাহারও কোন জাতি ব্যবসায় নাই, কর্ম সম্বন্ধে কাহারও ইচ্ছার কোন স্বাধীনতা নাই। স্লেভ-লেবারমূলক পাশ্চাত্য সভ্যতা সুতরাং সাম্যবাদী।

এ সমাজে বেকার সমস্যা দূর করিবার একটি মাত্র উপায় ভাবিয়া পাওয়া যায়,—ফ্রি লেবার না রাখা, emancipation না করিয়া কর্মী মাত্রকেই পোষ্য দাস করিয়া রাখা।

শুনিতেছি জার্মাণী ও রাশিয়াতে নাকি বেকার সমস্যা দূর করিয়া জগৎবাসীকে স্তম্ভিত করিয়া দিয়াছে। মানুষ যথাসাধ্য খাটিয়া দুই বেলা দুই মুঠা খাইতে পাইবে এরূপ ব্যবস্থা করায় যে গৌরবের কিছু আছে তাহা ফ্রি লেবার-এর দেশ ভারত ও চীন হয়ত বুঝিতে পারিবে না। তথাপি ইউরোপের মত চির-বেকার সমস্যার দেশে সকলকে চাকুরী দিতে পারার বাহাদুরী আছে, স্বীকার করিতে হইবে।

জার্মানী সকলকে বাঁধা দাস করিয়া ফেলিয়াছে নিশ্চয়। রাশিয়া সম্বন্ধে কিন্তু একথা বলা চলে না। কারণ সেখানে সব কাজ হইতেছে পপুলার উইল-এ। বেফাঁস কিছু বলিও না, পার্টির মতে মত দিয়া চল,—নির্ভয়ে থাকিবে। পার্টি বলিতেছে 'যুদ্ধ কর।' বাস! যুদ্ধ করিয়া যাও। 'প্যাসিফিষ্ট' হইতে যাইও না, desert করিও না। করিলে কার্ড পাইবে না যাহার সাহায্যে এক টুকরা রুটি বা এক স্কোয়ার ফুট দাঁড়াইবার স্থান সংগ্রহ করিতে পারিবে। পার্টির মতে চল সব পাইবে,—অন্ন, বস্ত্র ঔষধপথ্য, সিনেমা টিকেট এয়ার স্পেস সব কিছু। ডাইনে পুলিশ, বাঁয়ে গোয়েন্দা, সামনে রেশন টিকেট এবং পিছনে Ba—খুড়ি! পপুলার উইল আছে, আগাইয়া চল। পণ্ডিতেরা বলেন, রাশিয়া মানবীয় মুক্তির এ এক গ্র্যান্ড এক্সপেরিমেন্ট সুরু করিয়াছে। সুরুতেই ৩৮০ ফুট লেনিন ষ্টাচু! পরে না জানি আরও কত কি হইবে!

পণ্ডিতদের কথা মাথা পাতিয়া লইলাম। সঙ্গে সঙ্গে সঙ্গোপনে একটি নমস্কার করিয়া লই, বেত ও বেয়নেটকে।

পেখু-ঙেক

অ · কৃ · র

বিদ্যাপতি সহসা বড় চমক লাগাইয়া দিল। কহিল "প্রেমে পড়েছি।"

বিদ্যাপতিকে আমি জন্মাবধি জানি এবং সে যে পাড়ায় থাকে সে পাড়াটিও জানি। কবি বিদ্যাপতি যাহার প্রেমে পড়িতে পারে, অথবা কবি বিদ্যাপতির প্রেমে যে পড়িতে পারে, এমন কোনো মেয়ে সে পাড়ায় নাই। তবে কি বিদ্যাপতি পাড়া ছাড়িয়া গিয়া প্রেমে পড়িল ?

যাহা হউক, চমক লাগিলেও খুশী হইলাম। ইদানীং বিদ্যাপতি বড় বেশী কবিতা লিখিতেছিল; তাহার হাল্কা শরীরের পক্ষে কবিতার অত চাপ স্বাস্থ্যকর নহে। মনে হইল যাক, এবারে প্রেমে পড়িয়া যদি বিদ্যাপতির কবিতা লেখা বন্ধ হয়। কারণ, যাহারা প্রেমে পড়িবার পূর্বে কবিতা লেখে না তাহারা যেমন প্রেমে পড়িলে কবিতা লেখা সুরু করে, তেমনি যাহারা প্রেমে পড়িবার পূর্বে কবিতা লেখে (যেমন দিব্যাপতি বন্দ্যোপাধ্যায়) তাহারা প্রেমে পড়িলে কবিতা লেখা বন্ধ করে। প্রেম মানুষের জীবনে এমনই পরিবর্তন আনে।

প্রশ্ন করিলাম—"সৌভাগ্যবতীটি কে, জানতে পারি কি ?"

বিদ্যাপতি কহিল—"তুমি কি করে জানবে বন্ধু ? তাকে তো জানবার উপায় নেই। আমিই তার স্বরূপ বুঝতে পারিনি।"

কবিতায় হেঁয়ালি বিদ্যাপতি অনেক করিয়া থাকে, কিন্তু গদ্যে এরূপ হেঁয়ালি এই প্রথম। মনে হইল বিদ্যাপতির মনে ধনপতি পাগলার ছোঁয়াচ লাগিয়াছে।

বিদ্যাপতি কহিল—"এবারে আমার কবিতার স্রোত নতুন দিকে ঘুরিয়ে দিয়েছি। এখন লিখছি প্রেমের কবিতা—নতুন ধরণের প্রেমের কবিতা। শুনবে ?"

কহিলাম—"বেশ তো।"

বিদ্যাপতি পকেট হইতে কবিতার খাতা বাহির করিয়া পড়িতে লাগিল :

"তোমারেই আমি চেয়েছিনু বারে বারে
ঝিল্লী মুখর খোলা জানালার ধারে।
চারিদিকে ফেলে জোছনার ফাঁদ
আকাশের বুকে হেসেছিলো চাঁদ,
আমি বলেছিনু তারে :
'শোনো শোনো চাঁদ, শোনো গো
সোনার মেয়ে !
গরবিনী অত গরব কোরো না
আকাশের প্রেম পেয়ে।
আমার চাঁদেরে দেখ যদি, তবে
গভীর সরমে তুমি সারা হবে,
তুমি অপরূপ, মোর চাঁদ তবু
রূপসী তোমার চেয়ে।'......"

প্রশ্ন করিল—"কেমন হয়েছে ?"

আমি কহিলাম—"পড়ে যাও।"

বিদ্যাপতি পড়িতে লাগিল :

"ভেবেছিনু মনে তুমি এলে মোর কাছে
আকাশ হেরিবে আমারো যে চাঁদ আছে।
বৃথা হলো চাওয়া আসা পথ পানে
তুমি যে এলে না কেন কে তা জানে ?
ভয় হলো বুঝি তোমারে হেরিয়া
চাঁদ ডুবে যায় পাছে ?"

বিদ্যাপতি কহিল—'এই পর্যন্ত গেল চাঁদের ব্যাপার।' "তারপর গোলাপের ব্যাপার শোনো।" বলিয়া বিদ্যাপতি পড়িতে লাগিল :

"ফুলের বাগানে দাঁড়াইয়াছিনু একা
হেনকালে হলো গোলাপের সাথে দেখা
কহিল গোলাপ 'শোনো শোনো কবি
মনে মনে তুমি আঁক যার ছবি
জান না কি তুমি তাহার হাসিটি
আমারি কাছে যে শেখা ?'
আমি কহিলাম—'দেখ নাই তুমি তারে।
সে যদি বারেক দাঁড়ায় তোমার ধারে
রবে না তোমার গরবী প্রলাপ,
ভুলে যাবে তুমি, তুমি যে গোপাল,
সাধ হবে তার চরণ পদ্মে
হতে অলক্ত লেখা।'......"

বিদ্যাপতি কহিল—"শেষের লাইন দুটো হয়তো একটু বেখাপ্পা হয়ে গেল, কিন্তু উপায় নেই। একা আর দেখার সঙ্গে মিল দিতে হবে তো !"

আমি কহিলাম—"ওটুকু বেখাপ্পায় কিছু আসবে যাবে না। যাকে লক্ষ্য করে লেখা তিনি এত খুশী হয়ে থাকবেন যে, খাপ ছাড়া বলে তাঁর মনেই হবে না।"

বিদ্যাপতি খুশী হইয়া কহিল—"ঠিক ধরেছো। প্রেমের কবিতার মূল তত্ত্বটুকু তুমি বুঝে ফেলেছো দেখছি। প্রশংসা আর স্তুতি শুনলে পুরুষ পর্যন্ত খুশী হয়, মেয়েরা তো ছেলেমানুষ। তবে, বেশী রকম ব্যাজস্তুতি না হয়ে পড়ে, সে বিষয়ে সাবধান হতে হবে। Undeserved praise is slander in disguise কি না !"

আমি কহিলাম—"সেটা লোকে সহজে মনে করে না। খোশখবরের যেমন ঝুটাও ভাল, প্রশংসাও তেমনি ঝুটো হলেও ভালো লাগে।"

বিদ্যাপতি তখন কহিতে লাগিল :

"শোনো তাহলে বলি প্রেমের কবিতার তত্ত্ব কথা। প্রেমের কবিতায় বাড়াবাড়ি থাকবেই, কেননা বাড়াবাড়ি থেকেই প্রেমের কবিতার, এমন কি প্রেমেরও জন্ম। মানব যখন মানবীর প্রেমে পড়ে তখন নিছক মানবীর জন্যই পড়ে না, তার সঙ্গে যোগ করে দেয় কল্পনার অতিরঞ্জন। সেই জন্যেই কবি প্রিয়াকে সম্বোধন করে

বলেছেন : 'অর্ধেক মানবী তুমি, অর্ধেক কল্পনা।' অবশ্য যে পারসেণ্টেজ (percentage) কবি বেঁধে দিয়েছেন সেটা সব সময় ঠিক থাকে না; কখনো মানবীর অংশ বেশী থাকে, কখনো বা কল্পনার অংশ বেশী থাকে। তা যাই হোক, ঐ কল্পনার অংশটুকু হচ্ছে প্রেমের কবিতার প্রধান উপকরণ।

প্রেমিক কবি যাকে উদ্দেশ্য করে প্রেমের কবিতা লেখে তার সে কবিতা ভালো লাগলে তাতে ...বাড়াবাড়ি লক্ষ্য করেও সে খুশী হবে। ভাববে 'হ্যাঁ, অতিরঞ্জন আছে বটে; কিন্তু থাকলোই বা। আমাকে সে অতিরঞ্জনের সম্মান দিয়েছে, অন্য কোনো মেয়েকে যা দেয়নি।'.....

বুঝলে কিছু ?"

মাথা নাড়িলাম এমনভাবে যাহার দুই প্রকার অর্থ হইতে পারে।

বিদ্যাপতি কহিল, "আশা করি আমি প্রেমের যে ডেফিনিশান তৈরী করেছি তা তোমার জানা আছে। সেটা হচ্ছে :

তুমি ও আমির মধ্যে যেটুকু ফাঁকা সেই ফাঁকাটুকু ফাঁকি দিয়ে ভরে'

সেই ফাঁকি ভুলে থাকা—

এরি নাম হলো প্রেম।

প্রেমে ধাপ্পা আছে, প্রেমের কবিতায়ও কাজে কাজেই ধাপ্পা না থেকে পারে না।"

আমি কহিলাম "তাহলে কি প্রেমে এবং প্রেমের কবিতায় সত্য নেই ?"

বিদ্যাপতি কহিল, "আছে বই কি ? সে সত্য আলাদা ধরণের সত্য। কল্পনার সত্য। বাস্তবের সত্যের চাইতে সে সত্যের দাম কিছু কম নয়। ...দুনিয়ায় কল্পনার সত্য না থেকে শুধু বাস্তবের সত্যই যদি থাকতো, দুনিয়া তা হলে স্রেফ মরুভূমি হয়ে যেতো। আরেকটা কবিতা শোনো।" বলিয়া বিদ্যাপতি আরেকটি কবিতা পড়িতে লাগিল :

"দোলে যেথা চঞ্চল
বনানীর অঞ্চল
সেই পথে এলে মৃদু পায়
না এসে যে ছিল না উপায়।
আমি যে পথের ধারে
গান গেয়ে বারে বারে
ডেকেছিনু সুরের মায়ায়।

*

তারপর............
তোমার পায়ের তলায় অনেক নীচে
পৃথিবীর হৃদয়-স্পন্দন
তুমি কি করো নি অনুভব ?
আমি কিন্তু কল্পনায়
এক হয়ে গেলাম পৃথিবীর সঙ্গে
পৃথিবীর হৃদয়ের সঙ্গে আমার হৃদয়
মিশে গেল একই স্পন্দনে।
সেই যুগ্ম স্পন্দন
তুমি কি করোনি অনুভব ?"

কহিলাম "এটা বড় বেশি বাড়াবাড়ি হয়ে গেল নাকি, বিদ্যাপতি ?"

বিদ্যাপতি কহিল "আহা, বাড়াবাড়িই যে প্রেমের কবিতার প্রাণ সে কথা তো আগেই হয়ে গেল। যাহোক, কবিতাটা কেমন লাগ্‌লো বলো ? আশা করি এ ধরণের প্রেমের কবিতা পৃথিবীর সাহিত্যে না হোক বাঙলা সাহিত্যে অন্ততঃ নতুন। খানিকটা পদ্য-কবিতা, খানিকটা গদ্য-কবিতা। আমি ইচ্ছা কর্‌ছি এ ধরণের প্রেমের কবিতা আমি বাঙলা সাহিত্যে চালু করে যাবো।"

কহিলাম "তাহলে অনেক প্রেমিক তোমার প্রতি কৃতজ্ঞ থাক্‌বে। আগাগোড়া পদ্য-কবিতা লেখা অনেকটা মেহনতের ব্যাপার। পদ্য-কবিতায় খানিকটা এগিয়ে তারপর হালে আর পানি না পেলে যদি গদ্য চালানো চলে, প্রেমিক বেচারারা তাহলে হাঁফ ছেড়ে বাঁচ্‌বে।"

* * *

ইহার পরে বিদ্যাপতি করুণ প্রেম, ব্যাকুল প্রেম, উদাস প্রেম, বিগলিত প্রেম, হতাশ প্রেম, উচ্ছ্বসিত প্রেম, চপল প্রেম, মৌন প্রেম, মুখর প্রেম, পরিমিত প্রেম, সীমাহীন প্রেম প্রভৃতি নানা বিভিন্ন রকম প্রেমের বিভিন্ন রকম কবিতা পড়িয়া শুনাইল।

এতগুলি কবিতা শুনিয়া আমার মনে এই ধারণা জন্মিয়াছে যে, বিদ্যাপতি যে প্রেমে পড়িয়াছে বলিতেছে তাহা ঠিক বলিতেছে না। কাহারো প্রেমেই সে পড়ে নাই।

আমার ধারণা, সে এই কথাটাই চিন্তা করিতেছে যে কবির ভাষায়—

"প্রেমের ফাঁদ পাতা ভুবনে
কে কোথায় ধরা পড়ে কে জানে ?"

ভুবন জুড়িয়া পাতা এই যে প্রেমের ফাঁদ, ইহাতে সে কখন পড়িয়া যাইবে তাহার কিছু ঠিক নাই। ফাঁদে পড়িয়াই চট্‌পট্ বেশি প্রেমের কবিতা লেখা সম্ভব নাও হইতে পারে। এই জন্যই ফাঁদে পড়ার পূর্বে হইতেই সে নানা ধরণের প্রেমের কবিতা লিখিয়া ভবিষ্যৎ প্রয়োজনের জন্য সঞ্চয় করিয়া রাখিতেছে।

ট্রামে-বাসে

প্রসংগত এখানে একটি সাম্প্রতিক সংবাদের কথা মনে পড়িয়া গেল। সংবাদে বলা হইয়াছে যে, আমেরি সাহেব নাকি MacLean Stomach Powder কোম্পানীর চেয়ারম্যান। "Beecham Pill"-এর কারবারও এই কোম্পানীর সংগেই মিলিয়া যায়। চারিদিক হইতে এত নিন্দা, এত বিরুদ্ধ সমালোচনা আমেরি সাহেব



কি করিয়া নীরবে হজম করেন আমাদের মনে এই একটি মস্ত বড় প্রশ্ন ছিল। তাঁর হজমিগুলির কারবারের চেয়ারম্যান পদ-গৌরবের কথা শুনিয়া সমস্ত সন্দেহ ঘুচিয়া গেল!

* * * *

বিগত ৪ঠা জুন সন্ধ্যার দিকে লর্ড ওয়াভেল ভারতে প্রত্যাবর্তন করিয়াছেন। ঠিক্ ঐ দিনই সন্ধ্যার দিকে নাকি দিল্লীতে ভূমিকম্প হইয়াছে। বড়লাট বাহাদুর আমাদের জন্য "একটা কিছু" আনিয়াছেন এই মনে করিয়াই কি বসুন্ধরা আনন্দে শিহরিয়া উঠিলেন,—না নৈরাশ্যের আতঙ্কেই তিনি কাঁপিয়া উঠিলেন—সেই কথা এখন বলা শক্ত। ভূমিকম্পের গতি দেখিয়া আমাদের কিন্তু শেষেরটার সম্বন্ধেই আশংকা হইতেছে। সংবাদে প্রকাশ, ভূমিকম্পে কোন ঘরবাড়ী পড়ে নাই, শুধু ঘঘর শব্দ হইয়াছে। সাম্রাজ্যবাদের ভিত্তিতে যে-সব ঘরবাড়ী তৈরি হইয়াছে সে সবও ধ্বসিয়া পড়ার কোন সম্ভাবনাই নাই, শুধু কয়েকটা দিন একটু ঢক্কা নিনাদ হইবে মাত্র!

* * * *

আমাদের ট্রাম যাত্রীদের পক্ষে জোর খবর এই যে মিঃ পার্সেলের অবসর গ্রহণ করার পর মিঃ গুড়লে ট্রাম কোম্পানীর এজেন্ট নিযুক্ত হইয়াছেন। এর আগে তিনি এই কোম্পানীতেই চীফ্ ইঞ্জিনিয়ারের পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। সংবাদে বলা হইয়াছে যে, সম্প্রতি তিনি নাকি Entertainment Committee of the Red Cross Fund-এর চেয়ারম্যান ছিলেন। অদূর ভবিষ্যতে নিরুদ্বেগে ট্রামে চড়িতে পারিব সেই ভরসা আমাদের নাই। তবে যে-কোন একটা Entertainment-এর ব্যবস্থা তিনি করিবেন এই আশাতেই নবনিযুক্ত এজেন্টের দিকে তাকাইয়া রহিলাম। ট্রামটি "রেডক্রস" নয় জানি, তবে "ফাণ্ডটা" এখানে নেহাৎ ফেল্‌না নয় বলিয়াই এই আব্দারটি করিয়া রাখিলাম। পাখা-কাটা পরীদের নাচ নয়, সেকেণ্ড ক্লাসে ৩টি মাত্র পাখা হইলেই আমাদের Entertainment হয়!

* * * *

বিলাতের রাজনৈতিক ক্ষেত্রে একটি নূতন দল গঠিত হইয়াছে। তার নাম দেওয়া হইয়াছে "League of angry men"! বিদেশে যুদ্ধরত সৈন্যদের সর্বপ্রকার স্বার্থ সংরক্ষণই হইবে



এই দলের একমাত্র নীতি। টোরি পার্টি এই সমস্ত সৈন্যদের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে কোন কিছুই করিতেছেন না এই কথা ভাবিয়াই তাঁহারা রাগিয়া গিয়াছেন এবং সেই জন্যই তাঁদের দলের উক্ত নামকরণ হইয়াছে। তাঁদের দলগত নীতিটি নামের ভিতর দিয়া সুন্দর প্রকট হইয়াছে। কোন রকম বাক্ চাতুর্যের সাহায্য না নিয়া আমাদের দেশের কোন লীগ্ যদি "League of non-compromising men" নাম রাখিতেন তাহা হইলে তাঁহাদের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে সর্বসাধারণ নিঃসন্দেহ হইতে পারিতেন।

* * * *

একটি সংবাদে প্রকাশ, ম্যালেরিয়া প্রতিষেধক হিসাবে চুল হইতে নাকি সম্প্রতি একটি কুইনাইনের অনুকল্প আবিষ্কৃত হইয়াছে। ম্যালেরিয়া-প্রপীড়িত জাতি হিসাবে আমাদের খুবে আনন্দিত



হইবারই কথা ছিল, কিন্তু বিশু খুড়ো বলেন—"এর পর থেকে চুলের ওপর কনট্রোল বসবে, হয়ত মিলিটারির প্রয়োজনে দেশ শুদ্ধ লোককে নেড়া হতে হবে। আমাদের যা-হয় নয় হলো কিন্তু পায় হাই হিল্, পরনে ছাপা শাড়ী, হাতে প্যারাসোল, বগলে ভ্যানিটি আর মাথাটিতে একটি সুস্পষ্ট বেল নিয়ে যখন উঁরা রাস্তায় ঘুরে বেড়াবেন তখন পরিস্থিতিটা কি হবে একবার ভেবে দেখ্"। ভাবিয়া দেখিলাম এবং স্থির করিলাম ইহার চাইতে ম্যালেরিয়ায় মৃত্যু অনেক সুখের!

* * * *

লেখক এবং গ্রন্থকার গোষ্ঠীর সুবিধা-সুযোগের জন্য সোভিয়েট সরকার অনেক কিছু করিয়া থাকেন বলিয়া একটি সংবাদ প্রকাশিত হইয়াছে। নিজেদের অন্ন এবং বস্ত্র চিন্তায় ব্যিব্রত না থাকিয়া তাঁহারা যাহাতে নিরুদ্বেগে সাহিত্য সাধনা করিতে পারেন সরকার নাকি তার সুপ্রচুর ব্যবস্থা করিয়া থাকেন। বিশু খুড়ো বলেন—"এটা নেহাৎ একটা প্রচারের কায়দা। সোভিয়েটের নামেই যাঁরা গদগদ হয়ে উঠেন—এ সংবাদ প্রচার করেছেন শুধু তাঁরাই। তাঁদের অন্ধ-ভক্তির প্রাবল্যে অন্য দেশের সরকারদের প্রচেষ্টার কথাটি চাপাই পড়ে গেল। নজীর খতিয়ে দেখলে দেখা যাবে মিস্ মেয়ো, বিভারলি নিকলস্ প্রভৃতি গ্রন্থকারও সরকারী অনুগ্রহ কিছু কম লাভ করেন নি!"


সেলাই ক'রে চালিয়ে নিন...
—এতে খরচ বাঁচবে!
কম ক'রে খরচ করা মানে—আপনার টাকা বাঁচানো। এই অল্প সঞ্চয়গুলোই একসঙ্গে জমে সপ্তাহে এবং মাসে কত বড় হয়। জিনিসপত্রের সরবরাহ কম থাকায় এবং দরিদ্রদের অভাব মেটাবার জন্য মিতব্যয়ী হওয়া আপনার কর্তব্য। প্রয়োজনের তাগিদে এইভাবে আপনি দেশকেও সাহায্য করতে পারেন, এবং নিজেও টাকা পয়সা জমাতে পারেন।
মিতব্যয়িতার দ্বারা অনটন দূর করুন
ছেঁড়া তোয়ালে, বিছানার চাদর এবং টেবিলের ঢাকনি সেলাই ক'রে আরও কিছুকাল চালিয়ে নিন।
পুরানো শার্ট, ট্রাউজার, পাজামা এবং ধুতি সেলাই ক'রে নিন।
নূতন কেনা ছেড়ে দিন।
বাপ-মায়ের পুরানো কাপড় থেকে ছেলে-মেয়েদের জামা তৈরি ক'রে দিন।
এগুলো খারাপ দেখায় না।
পুরানো জুতা সেলাই ক'রে এবং তালি দিয়ে নিন।
এগুলো ফেলে দেবেন না।
নূতন ছাতা কিন্‌বেন না।
পুরানোটি সারিয়ে নিন।
পুরানো ট্রাঙ্ক, সুটকেস্ ও হোল্ড অল মেরামত করিয়ে নিন
নূতন কিন্‌তে গেলে অনেক খরচ।
যা না হ'লেও চলে এমন কিছুই কিন্‌বেন না
AAA 8.
"গভর্নমেণ্ট অব ইণ্ডিয়া : ইন্‌ফরমেশান অ্যাণ্ড ব্রডকাস্‌টিং ডিপার্টমেণ্ট" কর্তৃক প্রচারিত

অনুবাদসাহিত্য

সৈনিক, ১৯৪০

আরনল্ড হিল

[আরনল্ড হিল্ ছোট গল্প-লেখক হিসেবে কিছ্ কিছ্ নাম করছেন। ইনি ব্যবসায়ী। অবসর সময়ে সাহিত্য রচনা ক'রে থাকেন। বেশীর ভাগ লেখাই তিনি আমেরিকায় পাঠান—এই তাঁর একমাত্র গল্প, যা সর্বপ্রথম ইংল্যান্ড থেকে প্রকাশিত হোল। —অনুবাদক]

অবশেষে প্রায় সাত মাস অপেক্ষা করবার পর জনিদের রেজিমেন্টের ডাক পড়লো। এখন তারা প্রধাবিত হবে ইংলন্ডের দিকে—তারপরে ফ্রান্স, তারপরে হয়তো নরওয়ে কোথায় যে কর্তৃপক্ষ তাদের পাঠাবেন তার কিছুই ঠিক নেই!

কয়েক মিনিটের মধ্যেই ব্যাক স্ট্রীটের এই বাড়ি ছেড়ে তাকে চ'লে যেতে হবে। এই সেই বাড়ি, যেখানে জনি শিশুকাল থেকে একটু একটু করে বেড়ে উঠেছে। এই তার সেই বাসভবন, যেখানে তার শৈশব-জীবন কৈশোরের উপর দিয়ে ভেসে এসে আজকে পরিপূর্ণ যৌবনের দরোজায় আঘাত করেছে—এই সেই বাড়ি যার প্রতিটি ধূলি কণার সঙ্গে জনির জীবনের ২৫টি বছরের সমস্ত দিনগুলি জড়িয়ে আছে।

সামনের ছোট বারান্দাটার দিকে চেয়ে জনি বসে আছে। চারদিক চকচক করছে। জানালাটা খোলা। রান্না ঘর থেকে একটি তীব্র নারীকণ্ঠ ভেসে আসছে। জনি চেনে এই ভদ্রমহিলাকে। তাদেরই প্রতিবেশিনী। যখনই কোন কিছু প্রয়োজন হয়, তখনই তিনি নিজে এসে নানাবিধ উপদেশ বর্ষণ করে তাদের এই পরিবারকে উপকৃত করেন। ডাকতে হয় না তাঁকে অযাচিত, সম্পূর্ণ স্বেচ্ছাপ্রণোদিত তাঁর এই বদান্যতা। জনি যাবে সুতরাং তিনি সকাল থেকেই এসে তার মাকে অনেক রকম নির্দেশ দিচ্ছেন। জনির সঙ্গে আরো কি কি জিনিষ দেওয়া দরকার তার একটা সম্পূর্ণ বিবরণও তিনি তৈরী করে ফেলেছেন ইতিমধ্যে।

বাইরের থেকে দৃষ্টি ফিরিয়ে জনি দেওয়ালের ওপরে ম্যানটল পীসের দিকে চাইলে। একটি ফটো। তারই বাবা আর মায়ের ছবি। আজ থেকে তিরিশ বছর আগে তাঁদের বিবাহের দিনে তোলা হোয়েছিলো। তার মা সোজা হয়ে একটা মস্তো বড়ো কালো চেয়ারের ওপরে বসে আছেন, কোলের ওপরে তাঁর দুটি হাত একত্র সমর্পিত, ছোট্ট দুটি পা, মাটি পর্যন্তও পৌঁছয়নি। একটা শাদা চমৎকার পোষাক পরে আছেন তিনি, আর মাথায় একটা মস্ত বড়ো টুপী, তার চারদিকে অজস্র গুচ্ছ গুচ্ছ চেরী ফুল। মুখে সামান্য একটু হাসির আভাস। কি সুন্দর যে দেখাচ্ছে! আর তাঁর পাশেই স্বামী দাঁড়িয়ে। চমৎকার দৃঢ় এবং গম্ভীর চেহারা, সযত্ন-বিন্যস্ত দীর্ঘ ঘনকৃষ্ণ গোঁফ, সম্পূর্ণ ব্যক্তিত্ব ব্যঞ্জক, চেয়ে থাকতে ইচ্ছে করে।

দেয়াল থেকে চোখ ফিরিয়ে নিলে জনি। তারপরে উঠে জানালার কাছে এসে দাঁড়ালো। দেখলে ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা রাস্তায় খেলা করছে।

তারপরে আয়নাটার দিকে চাইলে একবার। দীর্ঘ, চমৎকার সুদৃঢ় দেহভঙ্গী। নিজের প্রতিবিম্বিত শরীরের দিকে চেয়ে রইলো জনি—না, ইউনিফর্ম পরলে সত্যিই তাকে চমৎকার দেখায়।

মা এসে ঘরে ঢুকলেন। ছোট্ট—আর শান্ত চেহারা। মাথার চুলগুলি অযত্ন-বিন্যস্ত, চোখ দুটি লাল, হয়তো পাশের ঘরে দাঁড়িয়ে একটু আগেই তিনি কাঁদছিলেন।

—যাবার আগে আর একটু চা খাবি বাবা, এনে দেবো? মা বললেন।

না মা, দরকার নেই!

ছোট্ট এক কাপ খা না! সোনা আমার আবার যে কখন তোর খাবার জুটবে! আর হাছাড়া নৌকায় যখন উঠবি তখন ঠাণ্ডাও তো লাগতে পারে?

—না মা, তুমিও যেমন! কিছু হবে না দেখো! হ্যাঁ, মেরী কোথায়? ও আসেনি?

—হ্যাঁ বাবা, সে আসবে এইবার।

জনি আবার জানালার দিকে চাইলো। মা ঘর থেকে চলে গেলেন। বলে গেলেন, একটু বোস, আমি এখুনি চা পাঠিয়ে দিচ্ছি।

পিছনে পিছনে জনিও এগিয়ে এলো। তারপরে সিঁড়ি দিয়ে আস্তে আস্তে নিজের শোবার ঘরের দিকে এগিয়ে চললো।

ঘরটি ছোট্ট। একটি খাট একদিকে পাতা। অন্য দিকে একটা টেবিল। পুরোণো দুখানা 'ওয়াইল্ড ওয়েস্ট' ম্যাগাজিন পড়ে রয়েছে তার ওপরে। একটা চেয়ার একটা বড়ো ড্রেসিং টেবিল তার পাশে—আয়নাটা ভাঙ্গা।

স্কাই লাইটের সামনে দাঁড়িয়ে সেটা টেনে খুলে ফেললে জনি। চারদিকে একবার চেয়ে দেখলে ভালো করে। এখান থেকে প্রতিবেশীদের বাড়ির ছাদগুলিকে বিড়ো সুন্দর দেখায়। ঘন-সন্নিবিষ্ট সারি সারি অট্টালিকার অরণ্য যেন। দিগন্ত প্রসারিত চিমনির শোভাযাত্রা রেডিওর জন্যে খাটানো এরিয়াল পায়রাদের থাকবার ছোট ছোট ঘর—সব যেন সান্ধ্য সূর্যের আলোয় ঝক ঝক করছে!

আস্তে আস্তে মাথাটা সরিয়ে নিয়ে জনি স্কাই লাইটটা বন্ধ করে দিলে। তারপরে এসে বিছানার ওপরে বসলো। বিছানাটা শব্দ করে উঠলো একবার। এই তার শোবার ঘর। কতো দিনের কতো স্মৃতি ধূসর এই দেয়াল, এই তার বসবার টেবিল।

বিছানার কাছেই দেয়ালে একটা ফুটবল টীমের খেলোয়াড়দের ছবি। ঠিক তার বিপরীত দিকে ক্রাইষ্টের, কি চমৎকার শান্ত কি অদ্ভুত সুন্দর!

বিছানা থেকে উঠে বসলো জনি—খালি ড্রয়ারগুলির দিকে শেষবারের মতো আর একবার চেয়ে দেখলে। হঠাৎ নীচ থেকে মায়ের গলা শোনা গেলো। মা তাকে ডাকছেন :

—জনি, জনি কে এসেছে দ্যাখ—

—কে মা? যাচ্ছি আমি নীচে, জনি চীৎকার করে উত্তর দিলে।

তাড়াতাড়ি আর একবার সে সেই ভাঙা আয়নাটার সামনে এসে দাঁড়ালো। হাত দিয়ে ঠিক করে নিলে চুলটা, তারপরে এক মুহূর্তের জন্যে সামলে চৌকাঠের কাছে, সব জিনিসগুলির উপরে শেষ বারের মতো ভালো করে আরো একবার চোখ বুলিয়ে নিলে জনি, তারপরে দরোজাটা দৃঢ় হাতে বন্ধ করে ধীর আর গম্ভীর পায়ে নীচে নেমে এলো।

নীচের সেই ছোট ঘরটার পাশেই মেরী দাঁড়িয়েছিলো। চার দিকের বাতাস ঘন সুগন্ধে উচ্ছ্বসিত হোয়ে উঠেছে যেন। সে তার নূতন কোটটা পরে এসেছে। আর মাথায় জড়িয়েছে চমৎকার একটা শাদা রিবণ। গালের ওপরে পরেছে রুজের প্রলেপ, ঠোঁটের ওপর লিপস্টিক—লাল টুক টুক করছে ঠোঁট দুটি।

—আরে জনি! বেশ যা হোক! তুমি ভেবেছিলে, আমি বোধহয় আর আসবোই না?

—পাগল, তাকি আমি কখনো ভাবতে পারি? জনি বললে।

মেরী আরো কাছে এগিয়ে এলো তারপরে হাত দিয়ে গলাটা জড়িয়ে ধরলো জনির। জনি তাড়াতাড়ি একটু দূরে সরে দাঁড়ালো, মা ততক্ষণে দু কাপ চা নিয়ে ভেতরে এসেছেন।

—দ্যাখোতো মা, ওকে বলছি যে, এক কাপ চা খেয়ে নে, কখন যে আবার খাবার জুটবে তার কি কিছু ঠিক আছে? —তা ছেলের সেকথা গ্রাহ্যই হোচ্ছে না। মা বললেন।

—বাঃ, তা তো নিশ্চয়ই! তুমি কি বলো দেখি? জনির দিকে চেয়ে মেরী হাসলো একটু।

চুপচাপ তারা দাঁড়িয়ে রইলো। মেরী আর জনি মায়ের হাত থেকে চায়ের কাপ নিয়ে চুমুক দিতে আরম্ভ করলে। মা তাদের দু'জনের দিকে চেয়ে রইলেন।

—বাবা, তোর যা যা দরকার সব তো দেখে শুনে নিয়েছিস? মা আবার জিজ্ঞেস করলেন।

—নিয়েছি গো নিয়েছি! কতোবার তুমি এই কথাটা জিজ্ঞেস করবে বলোতো মা?

—না রে না, তা নয়, মা একটু অপ্রস্তুত হোলেন, আমার কেবলি মনে হয় তুই কিছু ভুলে ফেলে না যাস। এখানে ফেলে গিয়ে সেখানে সেই জিনিসের জন্যে অসুবিধে ভোগ করবার দরকার কি? তার থেকে সময় থাকতে গুছিয়ে নেওয়াই কি ভালো নয় সব? কি বলো মা? মেরীর দিকে মা চাইলেন।

—নিশ্চয়ই! মেরী আবার একটু হেসে উত্তর দিলে।

—অবশ্য ওর সব জিনিসই আমি নৌকায় পাঠিয়ে দিয়েছি, তবু—

—বেশ করেছেন, মেরী বললে।

জনির বাবা এসে ঘরে ঢুকলেন। দীর্ঘ, সুদৃঢ় চেহারা। মাথায় বাদামী রংএর চুল, মুখেও বয়সের খানিকটা ম্লান ছায়া এসে পড়েছে। অতি ধীরে থেমে থেমে কথা বলেন।

এই যে জনি, সব ঠিক আছে তো?

—হ্যাঁ বাবা, এখনো অনেক সময় আছে—তাড়াতাড়ির কিছু নেই। জনি বললে।

—একই কথা, মা বললেন, তার থেকে একটু সময় থাকতে রওনা হোয়ে যাওয়াই ভালো, কি বলো? ব'লে স্বামীর দিকে চাইলেন তিনি।

হ্যাঁ, সময় থাকতে পৌঁছনই ভালো। বাবা একটু কেশে গলাটা পরিষ্কার ক'রে নিয়ে আস্তে উচ্চারণ করলেন। তারপরে তাঁর ওয়েস্ট কোটের পকেট থেকে বড়ো রূপোর ঘড়িটা বের ক'রে একবার দেখলেন।

—কটা বেজেছে? জনি জিগেস করলে!

—সাতটা বাজে। বাবা বললেন।

—আরে, অনেক সময় আছে আমাদের, এতো তাড়াতাড়ি কিসের?

মা আর বাবা আস্তে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন। চারিদিক নির্জন। ভারি একটা শান্ত প্রশান্তি চতুর্দিকে। মেরী, জনির পাশেই সোফাটার ওপরে এসে ব'সে পড়লো। তারপরে কয়েক মুহূর্ত সে মুগ্ধ দৃষ্টিতে চেয়ে রইলো জনির দিকে।

—বলো, তুমি গিয়ে আমাকে চিঠি লিখবে? বলো, তুমি ভুলে যাবে না? মেরী চোখ তুলে পরিপূর্ণভাবে তার দিকে তাকালো।

—লিখবো গো লিখবো, হাসতে হাসতে জনি খুব আস্তে উচ্চারণ করলো, জানোই তো আমার চিঠি লেখার অভ্যেস মোটে নেই—তবু আমি অন্তত একটা ক'রে পোস্ট কার্ড তোমাকে পাঠাবো!

সময় হোয়ে এলো। ছোট্ট দালানটা দেখতে দেখতে আত্মীয়স্বজন আর প্রতিবেশীতে ভরে উঠতে লাগলো। ন্যাপস্যাক—রেসপিরেটর, ফ্লাস্ক আর তার বেয়নেট হেলমেটে অপূর্ব দেখাচ্ছিলো তাকে। সে যেন একাই সমস্ত হলটাকে ভ'রে রেখেছে!

অস্তে দরোজার দিকে চেয়ে সে এগিয়ে গেলো। রাস্তায় এসে বাবা তার হাতে রাইফেলটা এগিয়ে দিলেন। কাঁধের উপরে সেটাকে ঝুলিয়ে নিলে জনি।

আরো খানিকটা গেলেই তারা নৌকোটা পাবে। রাস্তার উপরে কতোগুলি ছোট ছেলেমেয়ে ছুটোছুটি ক'রে খেলা করছিলো, জনিকে দেখে হঠাৎ থমকে দাঁড়ালো তারা। একটি ছোট্ট মেয়ে একটা ল্যাম্প পোস্টের নীচে দড়ি নিয়ে খেলছিলো। তাকে দেখে চীৎকার ক'রে উঠলো : আরে, জনি—জনি, ওহো! জনি! তারপরে ল্যাম্প পোস্টটা ধ'রে একপাক ঘুরে তার দিকে এক মুহূর্তের জন্যে চাইলো একবার, তারপরে নিজের 'নিকার'টা উ'চু ক'রে টেনে নিয়ে আবার খেলতে আরম্ভ করলে।

জনি এগিয়ে চললো। এবারে বেশ কঠিন আর দৃঢ় দেখাচ্ছিলো তাকে। সামনে মাটীর দিকে তার দৃষ্টি নিবদ্ধ। গম্ভীর ভাবে সে এগিয়ে চললো, আর একটা কথাও বললে না কাউকে!

তার পাশে হেঁটে চলতে লাগলো মেরী, একটা হাত দিয়ে জনির হাত সে জড়িয়ে ধ'রেছে। মাঝে মাঝে আচ্ছন্ন দৃষ্টিতে সে চাইতে লাগলো জনির মুখের দিকে। কেবলি তার মনে হোতে লাগলো, জনি বুঝি এখনি কথা বলবে। এখনো তো সময় র'য়েছে, বলবে যে মেরীকে সে ভালোবাসে, বারবার বলবে; যতোদিন সে বাঁচবে ততোদিন সে ভালোবাসবে মেরীকে, যেখানেই তাকে পাঠানো হোক না কেন, যা-ই ঘটুক না তার জীবনে, সে তাকে এমনি ভাবেই ভালো বাসবে। জীবনে এতো ভালোবাসতে সে কোনো মেয়েকেই পারেনি, পারবেও না কোনোদিন!

কিন্তু জনি একটা কথাও বললে না। আর মেরী সেই রকম নিস্তব্ধ ভাবেই তার পাশে পাশে হেঁটে চললো।

তার বাবা আর মা শান্তভাবে তাদের পিছনে পিছনে তখনো আসছেন। কাঁধের উপরে তার বাবা তার ভারি আর মোটা 'আর্মি' কোটটা নিয়ে চ'লেছেন। তিনি

ভাবছেন ১৯১৪ সালের থেকে আজকের এই যুদ্ধযাত্রা কতো তফাৎ! কোনো আনন্দ নেই—কোনো উত্তেজনা নেই—দেশের জন্যে আজকে তাদেরই যে একজন জীবন পণ করে এগিয়ে চ'লেছে তার জন্যে নেই কোনো অভিনন্দন। কতো তফাৎ তাঁদের সেই ১৯১৪ সালের যুদ্ধযাত্রা থেকে আজকের এই ১৯৪০ সালের অভিযান। লোকেরা যে যার নিজের কাজে চ'লে যাচ্ছে, কখনো কেউ কেউ তাঁর ছেলের দিকে হঠাৎ চেয়ে দেখছে—আবার এগিয়ে যাচ্ছে!

তারা ওয়েলিংটন প্লেস ছাড়িয়ে গেলো। তারপরে ক্যাসল্ জংশন পার হোয়ে এবারে হাই ষ্ট্রীটের উপরে এসে পৌঁছলো।

মা এখনো পিছনে পিছনে আস্ছেন। তাড়াতাড়ি আস্ছেন—প্রতিমুহূর্তেই জনি তাঁর থেকে দূরে এগিয়ে যাচ্ছে, তাঁর সমস্ত শরীর কেমন যেন অবসন্ন হোয়ে আস্ছে, গভীর একটা উত্তেজনায় তাঁর চেতনা যেন আচ্ছন্ন, সমস্ত পরিপার্শ্বকে তিনি আজ ভুলে গেছেন। প্রশান্ত, ধীর ছবির মতো তিনি হেঁটে চ'লেছেন—নীরব আর করুণ প্রার্থনায় তাঁর সমস্ত অন্তর ভরপুর।

ব্রীজ স্ট্রীটের মোড়ে দাঁড়িয়ে একটি ছেলে খবরের কাগজ বিক্রী করছিলো। টাট্কা নোতুন খবর। তার প্লাকার্ডে বড়ো বড়ো ক'রে লেখা ঃ আরও তিনটি নাৎসী বোমারু বিমান ধ্বংস!

জনির বাবা তাড়াতাড়ি তার মাকে ডাকলেন, বললেন, দ্যাখো, দ্যাখো, আমরা কিভাবে ওদের মারছি, এ তুমি দেখো, শেষ পর্যন্ত ওদের আমরা শেষ করবোই—শেষ করবোই!

কর্মচঞ্চল জনতাজটিল রাজপথের ওপর দিয়ে তারা চল্তে লাগলো—একজনের মুখেও আর কথা নেই। জনি শুধু কাঁধটা একবার ঝাঁকিয়ে নিলে, তারপরে সোজা মার্চ ক'রে চল্লো। রাজপথের ওপরে তার সেই ভারি বুটের শব্দটা বাজ্তে লাগ্লো, কী গভীর আর গম্ভীর তার আওয়াজ! মার্চ ক'রে চললো জনি—শান্ত তবু নীরব, দৃঢ় এবং গর্বিত—ঠিক যেন সেই মানুষের মতো, যে মৃত্যুকে তুচ্ছ করতে পেরেছে জীবনে, যে অন্তরের অন্তস্তল থেকে তাকে করতে পেরেছে ঘৃণা!

একবার মাথা ফিরিয়ে মায়ের দিকে তাকালো জনি,—দূরে মা দাঁড়িয়ে আছেন, তাঁর পাশেই বাবা, তাঁর পাশেই মেরী! মাথা নীচু ক'রেই মা তার উত্তর দিলেন। তাঁরা এখন চুপচাপ—তাঁরা এখন বিচ্ছিন্ন—তাঁদের সেই চারজনের ছোট্ট দলটি ভেঙে গেছে! শান্ত আর অপলক দৃষ্টিতে তাঁরা চেয়ে আছেন!

বসন্ত-সন্ধ্যার সেই সোনালী সূর্যের আলোয় হাই স্ট্রীটের ওপর দিয়ে জনি এগিয়ে চল্লো।

অনুবাদক ঃ নারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায়

রঙ্গ জগৎ

শহরের চিত্রগৃহগুলোর দেখছি মেজাজ খুব চড়ে গেছে। আগেকার দিনে সবায়েরই নজর থাকতো যার যার গৃহকে ঝক্‌ঝকে আকর্ষণীয় ক'রে রাখার দিকে—তাদের অনেক কিছু সাধও দেখা যেতো, কিন্তু লড়াই আরম্ভ হওয়া থেকে সব গেছে চুকেবুকে। প্রথম দু'এক বছর টুকটাক্ কিছু কিছু হ'তো, কিন্তু বোমার হিড়িকে সব একেবারেই শেষ হ'য়ে গিয়েছে। তারও পরে পয়সার নির্ঘাত আমদানী বিষয়ে যখন কোন চিন্তার কারণ আজকাল থাকছে না, তখন চিত্রগৃহকে সাজাবার জন্যে খরচ করাটা তো মহামূর্খতার পরিচায়ক হবে ব'লেই তাঁরা ধ'রে নিয়েছেন। তাছাড়া জিনিসের দুষ্প্রাপ্যতা, গভর্নমেণ্টের 'কণ্ট্রোল' এসব বাহানা তো আছেই। লোকের পয়সা হ'য়েছে, সিনেমায় মজেছে—হাউসের অবস্থা যাই হোক্ লোককে আসতেই হবে



কানন-রায় প্রডাক্সন্সের হিন্দী 'বনফুল' চিত্রে শ্রীমতী কানন

—নোংরা হোক, মশা-মাছি-ছারপোকার রাজত্ব চলুক, মারপিট দাঙ্গা চলুক, কোন দিকে ভ্রূক্ষেপ করার দরকারই বা কি আছে! লোকের আয়াসের দিকে নজর রাখা চুলোয় যাক্, লোককে কত রকমে কষ্ট দেওয়া যেতে পারে প্রদর্শকদের মধ্যে যেন তাই নিয়েই প্রতিযোগিতা লেগে গেছে। কেউ যেন মনে না করেন যে, একথাগুলো আমরা শুধু দেশী চিত্রগৃহগুলিকে লক্ষ্য ক'রেই বলছি—বিলিতি ছবিঘরগুলো, যা এককালে শুধু ভারতবর্ষ কেন, সমগ্র প্রাচ্যের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ব'লে নাম ক'রেছিল, সেগুলোও আজ সব জৌলুস খুইয়ে তো বসেছেই, এমনকি কোন কোন বিষয়ে দিশী ছবিঘরগুলোরও অধম হ'য়ে দাঁড়িয়েছে। গোরা সেনাদের ভিড়ে টিকিট তো সহজে পাওয়াই যায় না, পাওয়া গেলেও দিশী লোকের ভাগ্যে সব সময়েই দেখেছি সব চেয়ে খারাপ সিটগুলোই পড়ে যায়—এর আগে তো থাকে ঘণ্টার পর ঘণ্টা রোদে জলে দাঁড়ানো, কোন কোন দিন সার্জেণ্টের গুঁতোও। এ বিষয়ে লাইট হাউসই বোধ হয় সব চেয়ে খ্যাতি কিনেছে প্রায়ই ওখানকার নিম্নতম টিকিট-ঘরে মারপিটের অনুযোগ শোনা যায়; এবারে শোনা গেল গত শনিবার নাকি চিত্রগৃহের ভিতরে খাস পরিচালকদের সঙ্গেই একপ্রস্থ হাতাহাতি হ'য়ে গেছে, ধরপাকড়ও হ'য়েছে নাকি তার পরে।

প্রমোদ আহরণটা এখন এক মহা ঝঞ্ঝাটে দাঁড়িয়েছে—ইচ্ছে হ'লো আর অমনি মনকে সরস ক'রে তোলার জন্যে দু'ঘণ্টা কাটিয়ে এলুম, সেদিন চলে গিয়েছে। ছবি দেখবার ইচ্ছে হ'লে বেশ ক'দিন আগে থেকে তৈরি হ'তে হয়—ছবি দেখতে যতখানি সময় না যাক্, টিকিট কিনতে তার অন্তত দ্বিগুণ সময় ব্যয় ক'রে এবং টিকিটের দামটা উপার্জন ক'রতে যত না মেহনৎ ক'রতে হয়েছে তার চেয়ে দশগুণ পরিশ্রমের জন্য নিজেকে তৈরি ক'রে রাখতে হয়। এর পরও কি ক'রে লোকের মেজাজ ছবি দেখে প্রমোদে আপ্লুত হ'তে পারে, আমরা ভেবে পাই না।

নূতন ছবির পরিচয়

রতন—(বিনোদ পিকচার্স)—কাহিনী ও পরিচালনা: এম সাদিক, গান ও সংলাপ: ডি এন মোদক, আলোকচিত্র: দিভেচা, শব্দ যোজনা: মিনু কাটরক, সুর যোজনা: নৌশদ আলি, ভূমিকায়: স্বর্ণলতা, করণ দীবান, ওয়াস্তি, মঞ্জুলা, রাজকুমারী শুক্লা, বদরীপ্রসাদ প্রভৃতি। ছবিখানি কপূরচাঁদের পরিবেশনায় ২৬শে মে থেকে প্যারাডাইসে দেখানো হ'চ্ছে।

একেবারে একঘেয়ে চিত্র-কাহিনীর মধ্যে 'রতন' একটু অভিনবত্ব এনেছে শুধু এই হিসেবেই যে, এর কাহিনীটি বিয়োগান্ত। মৌলিকত্ব কিছু নেই এর মধ্যে—সেই 'দেবদাস'-এরই অনুসরণ পদে পদে। তাহ'লেও শেষ দৃশ্যের আগে পর্যন্ত ইমোশানকে বেশ বজায় রেখে গিয়েছে।

বেনিয়ার ছেলে গোবিন্দ রাজপুত মেয়ে গৌরিকে ভালবাসে; সমাজবিধি তাদের মিলনের অন্তরায় হয়। গৌরির বিবাহ হয় শহরে; গোবিন্দ গ্রামে গৌরির কল্পিত মূর্তির পূজা ক'রতে থাকে। গৌরি যখন জানলে, তখন গোবিন্দ শেষ অবস্থায় এসে পৌঁচেছে। গৌরি গেল গোবিন্দের সঙ্গে দেখা ক'রতে ছেলেবেলার সেই নিভৃত কুঞ্জে—শেষ দেখা হ'লো দুজনের; গোবিন্দ হাসতে হাসতে বিষ খেয়ে তারই সামনে আত্মহত্যা ক'রলে আর তারপর গৌরিরও জীবনদীপ নিভে গেল।

সাদাসিদে প্রমোদ হিসেবে 'রতন' মন্দ লাগে না, শুধু শেষ দিকটা যা একটু খাপছাড়া। সঙ্গীতাংশ ছবির প্রধান আকর্ষণ—গান এবং আবহ দুই-ই। অভিনয়ে স্বর্ণলতা ও করণদীবান প্রধান ভূমিকা দুটিতে মানিয়ে গিয়েছেন বেশ। ওয়াস্তির অভিনয় বিরক্তিকর একঘেয়ে। আলোকচিত্র কয়েকটি স্থানে বেশ ভালো। মোটামুটি হিসেবে 'রতন' চলতি ছবিগুলির মধ্যে সব চেয়ে উপভোগ্য বলা যায়।

* * * *

গত সপ্তাহে নতুন ছবি মুক্তিলাভ ক'রেছে প্রভাত, ম্যাজেষ্টিক ও পার্ক শো হাউসে আচার্য আর্ট প্রডাকসন্সের 'পরীস্তান'—যার প্রধান ভূমিকায় অভিনয় ক'রেছেন অঞ্জলি দেবী আর পাহাড়ী সান্যাল। আর অপর ছবিখানি হ'চ্ছে দীপকে জয়ন্ত ফিল্মসের 'ইনসান'; অভিনয়শিল্পী হচ্ছেন শোভনা সমরথ, কিশোর সাহু ও পাহাড়ী সান্যাল।



বড়ুয়ার পরিচালনায় নিউ টকীজের 'পহচান' চিত্রে অশোককুমার অভিনয় করিবেন

গত সপ্তাহে নতুন নাটক মঞ্চস্থ হ'য়েছে ষ্টারে 'মদনমোহন'; পরিচালক হলেন নাট্যকার মহেন্দ্র গুপ্ত আর বিভিন্ন ভূমিকায় আছেন ভূপেন, জয়নারায়ণ, সিধু গাঙ্গুলী, পঞ্চানন, শিবকালি, অপর্ণা, হরিমতী প্রভৃতি।

বিবিধ

ফিল্মিস্তানের পরবর্তী ছবির জন্য প্রযোজক মুখার্জি অশোককুমার-মমতাজ শান্তি জুড়ি নির্বাচন ক'রে রেখেছেন।

* * * *

জয়ন্ত ফিল্মসের 'উর্বশী'র চিত্রগ্রহণ সমাপ্ত না হ'তেই কলকাতায় চলে আসায় সাধনা বসুর নামে কর্তৃপক্ষ ৩ লক্ষ টাকা ক্ষতিপূরণের মামলা আনবে ব'লে শোনা গেল।

* * * *

'স্বামী বিবেকানন্দ'-র জীবনী তোলার জন্যে কবি হারীন্দ্র চট্টোপাধ্যায়কে একখানি ছবির লাইসেন্স দেওয়া হ'য়েছে। নৃত্য-শিল্পী রামগোপাল ও চিত্রশিল্পী চঘতাইও একখানি ক'রে ছবির লাইসেন্স পেয়েছেন।

* * * *

সায়গল বম্বেতে পৌঁচেছেন এবং ক্যারাভান পিকচার্সের 'মজলিশ' ছবিতে কাজ করার জন্য চুক্তি ক'রেছেন।

* * * *

কে এস হিরলেকরের অনুপ্রেরণায় ভারতীয় চলচ্চিত্র বিষয়ে তত্ত্বসন্ধিৎসু সমিতি ও কেন্দ্রীয় শিক্ষায়তন খোলা বিষয়ে একটি কমিটি গঠিত হ'য়েছে যাতে আছেন মিঃ হুসেনভাই এ লালজী এম এল এ, মিঃ গোবিন্দ দেশমুখ, ডাঃ মেঘনাদ সাহা, ডাঃ কে এস কৃষ্ণন, ডাঃ কে হামিদ, ডাঃ কে ভেঙ্কটরমন, ডাঃ নজির আহমেদ ও প্রোঃ বি বি দেশপাণ্ডে।

* * * *

লণ্ডনে থ্রী স্টারস্ ফিল্ম কোম্পানী নামে একটি ইঙ্গ-ভারত চিত্রনির্মাণ প্রতিষ্ঠান গ'ড়ে উঠেছে। এই প্রতিষ্ঠানের কর্ণধার হলেন গোলাম মহম্মদ কলকাত্তাওয়ালা, হুসেন করিমভাই ও বিলেতের সিড্নী বাক্স। ভারতবর্ষে বিশেষ গ্রামে গ্রামে চলচ্চিত্র প্রসার এই প্রতিষ্ঠানের উদ্দেশ্য।

* * * *

চিত্রজগতে দুটো উল্লেখযোগ্য বিবাহের সংবাদ পাওয়া যাচ্ছে। একটি হচ্ছে চন্দ্রপ্রভার সঙ্গে চিত্রনাট্যকার-পরিচালক জিয়া সারহাদীর—জিয়া সারহাদীর এক রূপসী বিবি বর্তমান, যিনি হলেন সংগীত পরিচালক রফিক গজনভীর কন্যা। আর অপর বিবাহ গুজব হচ্ছে মধু বসুর সঙ্গে মীরা ওয়ালেংকর নামক এক মারাঠীর—মধু বসু এবং মীরা দুজনেই শোনা গেল স্ব স্ব পূর্ববিবাহ থেকে বিচ্ছেদের জন্য আবেদন করেছেন।

* * * *

পরেশ ব্যানার্জী কলকাতায় আসছেন দেবকী বসু পরিচালিত 'কৃষ্ণলীলা'য় অভিনয় করার জন্য, আর অশোককুমারও আসছেন নিউ টকীজের বড়ুয়া পরিচালিত 'পহেচান' ছবিতে অভিনয় করার জন্য—অশোককুমারকে কাননের সঙ্গে 'কৃষ্ণলীলা'তেও নামাবার চেষ্টা হচ্ছে।

* * * *

প্রতিমা দাশগুপ্ত পরিচালিত 'চোর'-এর পরিবর্তিত নাম 'ছমিয়া'র ছাড়পত্র সরকারী মহল থেকে সম্প্রতি পাওয়া গেছে—লাইসেন্স সংক্রান্ত গোলমালের জন্য 'ছমিয়া' বহুদিন পূর্বে তৈরী হয়ে গেলেও প্রদর্শন অনুমতি লাভে বঞ্চিত ছিল। এ ছাড়া প্রতিমা আরও একখানি ছবি তোলার লাইসেন্স পেয়েছেন।

* * * *

ফিল্মিস্তানে গৃহীত তাজমহল পিকচার্সের 'বেগম'এর পরিচালক সুশীল মজুমদার ও সুরযোজক শচীন দেববর্মণকে কলকাতায় দেখা গেল। সুশীল মজুমদারের আক্ষেপ বম্বেতে বাঙালী বিদ্বেষ নিয়ে কেউ কোন কথা বলচে না।

* * * *

সাধনা বসুকে লাইসেন্স দেওয়া নিয়ে কেন্দ্রীয় আইন সভায় মনু সুবেদারের সঙ্গে সিভিল সাপ্লাই সদস্য আজিজুল হকের খুব একচোট বাকযুদ্ধ হয়ে গিয়েছে। অন্যান্য নাচিয়ে বা শিল্পীকে বাদ দিয়ে সাধনা বসুকে কেন লাইসেন্স দেওয়া হলো, একে দেওয়ায় অন্যেরাই পাবে না কেন, এই নিয়েই বিতর্কের শুরু।

* * * *

চিত্রজগতের একটি দুঃখদ সংবাদ হচ্ছে বম্বের এক্সেলসিয়ার সিনেমার ম্যানেজার এ আর বিলিমোরিয়ার দেহাবসান। ভারতের চিত্রপ্রদর্শকদের মধ্যে তিনিই ছিলেন সবচেয়ে প্রবীণ।

* * * *

চিত্র-কাহিনী রচনার জন্যে সবচেয়ে বেশী টাকা পেয়েছেন কিশোর সাহু—১৫০০০৲ টাকা 'বীর কুণাল'-এর জন্যে।

* * * *

ইউনিটি পিকচার্সের 'কুরুক্ষেত্র' চিত্রের নায়িকা রাজকুমারী শ্যামলীর আসল নাম—কালিন্দী ভাটে।

রবীন্দ্র-চর্চা

রবীন্দ্র-রচনা-সূচী

শান্তিনিকেতন পত্র ১৩২৬—১৩৩৩

[গত ২৯ বৈশাখ "রবীন্দ্র-চর্চা" বিভাগে প্রকাশিত 'ভাণ্ডার' পত্রের রবীন্দ্র-রচনার সূচীর অনুবৃত্তিরূপে বর্তমান সংখ্যায় শান্তিনিকেতন পত্রে প্রকাশিত রবীন্দ্র-রচনা-সূচী মুদ্রিত হইল। গানগুলি সবই গীতবিতানের প্রথম বা দ্বিতীয় সংস্করণে মুদ্রিত আছে, বা যন্ত্রস্থ তৃতীয় সংস্করণে মুদ্রিত হইবে বলিয়া সেগুলির গ্রন্থাকারে প্রকাশ বিষয়ে কোন উল্লেখ করা হয় নাই। শ্রীঅমল হোম, শ্রীনরেন্দ্রনাথ নন্দী ও শ্রীপ্রদ্যোৎলাল সেনগুপ্ত শান্তিনিকেতন পত্রের কতকগুলি দুষ্প্রাপ্য সংখ্যা দেখিতে দিয়াছেন। পূর্বে প্রকাশিত ভাণ্ডারের সূচী প্রস্তুত করিবার জন্য শ্রীযোগানন্দ দাস 'ভাণ্ডার'এর কয়েকটি দুষ্প্রাপ্য সংখ্যা দেখিতে দিয়াছিলেন। শ্রীপুলিনবিহারী সেন।]

প্রথম বর্ষ ১৩২৬ বৈশাখ—চৈত্র

বৈশাখ

সূচনা (১)
অপ্রকাশিত।

গান
"পাখী আমার নীড়ের পাখী।"

নববর্ষ। মন্দিরে উপদেশ, ১ বৈশাখ ১৩২৬
অপ্রকাশিত।

মৈসুরের কথা
অপ্রকাশিত।

বিশ্বভারতী
অপ্রকাশিত।

ইংরেজি শেখা (১)
শিক্ষা, ১৩৫২, দ্বিতীয় খণ্ড (যন্ত্রস্থ)।

জ্যৈষ্ঠ

অসন্তোষের কারণ
শিক্ষা ১৩৫২ সং, প্রথম খণ্ড।

ইংরেজি শিক্ষার আরম্ভ (১)
শিক্ষা, ১৩৫২, দ্বিতীয় খণ্ড।

গান
"মোর বীণা ওঠে কোন্ সুরে।"

আষাঢ়

মন্দিরে উপদেশ, ১০ বৈশাখ, ১৩২৬
শান্তিনিকেতন ২, বিশ্বভারতী সং, ১৩৪২।

খাদ্য চাই
পাঠপ্রচয় ৪।

প্রতিশব্দ (১)
অপ্রকাশিত।

বিদ্যার যাচাই
শিক্ষা, ১৩৫২, প্রথম খণ্ড।

গান
"আমার বেলা যে যায়।"

শ্রাবণ

মন্দিরে উপদেশ, ১১ আষাঢ়, ১৩২৬
অপ্রকাশিত।

বিশ্বভারতী
অপ্রকাশিত। ১৮ আষাঢ় ১৩২৬ বিশ্বভারতীর কার্যারম্ভের দিনে বক্তৃতা।

পত্রোত্তর
অপ্রকাশিত।

ভাদ্র

কল্যাণ
শান্তিনিকেতন ২, বিশ্বভারতী, ১৩৪২, পৃ ৫৮৮

অনুবাদচর্চা
শিক্ষা ১৩৫২, দ্বিতীয় খণ্ড।

প্রতিশব্দ
অপ্রকাশিত।

গান
"আমি জ্বালব না মোর বাতায়নে।"

আশ্বিন ও কার্তিক

মন্দিরে উপদেশ ১০ ভাদ্র, ১৩২৬
অপ্রকাশিত।

বিদ্যাসমবায়
শিক্ষা ১৩৫২, প্রথম খণ্ড।

গান
"তীরে কি আর আসবে না তোর তরী।"

বাংলা কথ্যভাষা
অপ্রকাশিত।

---

(১) বিনা স্বাক্ষরে প্রকাশিত। শান্তিনিকেতন পত্রে স্বাক্ষরহীন অন্যান্য যে সকল রচনা রবীন্দ্রনাথের কোনো গ্রন্থে পরে সংকলিত হইয়াছে, বা অন্য বিশেষ কারণে তাঁহার রচনা বলিয়া অনুমিত, সেগুলি এই তালিকাভুক্ত করা হইয়াছে। জ্যৈষ্ঠ সংখ্যার "কৈফিয়ৎ" ও বৈশাখ সংখ্যার "তথ্যসংগ্রহ" নিবন্ধও রবীন্দ্রনাথ কর্তৃক লিখিত বা পুনর্লিখিত বলিয়া অনুমান হয়, যদিও এই প্রবন্ধের শেষে উল্লিখিত ও আষাঢ়ে প্রকাশিত "তথ্যসংগ্রহ" প্রবন্ধ শ্রীপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের লেখা। কোনো কোনো গানও বিনা স্বাক্ষরে প্রকাশিত হইয়াছে, সেগুলি রবীন্দ্রনাথের গানরূপে সুপরিচিত বলিয়া আর চিহ্নিত করা হয় নাই।

উদ্যোগশিক্ষা।
পাঠপ্রচয় ৩, ও শিক্ষা ১৩৫২, দ্বিতীয় খণ্ড।

আহারের অভ্যাস
পাঠপ্রচয় ৩।

গান
"দুঃখ যে তোর নয়রে চিরন্তন।"

মিলনের সৃষ্টি
শান্তিনিকেতন ২, বিশ্বভারতী ১৩৪২, পৃ ৫৯১।

শারদোৎসব
রবীন্দ্র-রচনাবলী ৭, শারদোৎসব, গ্রন্থ-পরিচয়।

প্রতিশব্দ
অপ্রকাশিত।

গান
"আমার বোঝা এতই করি ভারী।"

মনোবিকাশের ছন্দ
শিক্ষা, ১৩৪২। শিক্ষা ২, ১৩৫২।

অনুবাদচর্চা
বাংলা শব্দতত্ত্ব, ১৩৪২।

গান
"আজ সবার রঙে রঙ মিশাতে হবে।"

তেল আর আলো
অপ্রকাশিত।

শীলগ্রহণ, মন্দিরে উপদেশ, ১৯ বৈশাখ ১৩২৬।
শান্তিনিকেতন ২, বিশ্বভারতী ১৩৪২, পৃ ৫৯৫।

অগ্রহায়ণ

শ্রীমান প্রসাদ চট্টোপাধ্যায়
প্রসাদ। অংশতঃ শান্তিনিকেতন ২, বিশ্বভারতী সং ১৩৪২, পৃ ৫৯৮।

বাদানুবাদ
আশ্বিন-কার্তিক সংখ্যার 'বাংলা ও অনুবাদ-চর্চা' সম্পর্কে শ্রীযতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের মন্তব্যের আলোচনা। অংশত, বাংলা শব্দতত্ত্ব, ১৩৪২, 'অনুবাদ-চর্চা।'

অনুবাদ-চর্চা
অপ্রকাশিত।

কলাবিদ্যা
শিক্ষা, ১৩৫২, দ্বিতীয় খণ্ড।

প্রতিশব্দ।
অপ্রকাশিত।

পৌষ

নমঃ শিবায়। মন্দিরে উপদেশ ৩ অগ্রহায়ণ।
অপ্রকাশিত।

সওগাত
লিপিকা।

ধর্মশিক্ষা
শিক্ষা ১৩৫২, দ্বিতীয় খণ্ড।

শোকাতুরার প্রতি
অপ্রকাশিত। পত্র. ১৭ অগ্রহায়ণ

১৩২৬. "সংসার থেকে আমরা নানা সূত্রে।"
অনুবাদ চর্চা (১)
অপ্রকাশিত।
প্রতিশব্দ (১)
অপ্রকাশিত।
আকাঙ্ক্ষা
অপ্রকাশিত। শ্রীহট্ট কলেজ হস্টেলে বক্তৃতা।
বাদানুবাদ
"বাংলা কথ্যভাষা" ও "অনুবাদচর্চা" সম্বন্ধে বিজয়চন্দ্র মজুমদার প্রভৃতির মন্তব্য সম্বন্ধে বক্তব্য। অপ্রকাশিত।
মুক্তি
লিপিকা।
ফাল্গুন
৭ই পৌষ : প্রাতঃকালীন উৎসবের উদ্বোধন।
অপ্রকাশিত।
৭ই পৌষ : উপদেশ
অপ্রকাশিত।
১১ মাঘ : উৎসবের উদ্বোধন ও উপদেশ
অপ্রকাশিত।
৭ পৌষ : সন্ধ্যার উদ্বোধন ও উপদেশ।
উপদেশ অংশ, শান্তিনিকেতন ২, বিশ্বভারতী ১৩৪২।
মনের চালনা
অপ্রকাশিত।
গান
"এখনো গেল না আঁধার।"
চৈত্র
স্বস্থ, মন্দিরে উপদেশ, ৩ অগ্রহায়ণ ১৩২৬
শান্তিনিকেতন ২, বিশ্বভারতী ১৩৪২।
ভারত-ইতিহাস-চর্চা
অপ্রকাশিত।
অতিথি
অপ্রকাশিত।

দ্বিতীয় বর্ষ ১৩২৭ বৈশাখ—চৈত্র

বৈশাখ
অন্তর-বাহির, মন্দিরে উপদেশ ১৭ **অগ্রহায়ণ** [১৩২৬]
শান্তিনিকেতন ২, **বিশ্বভারতী**, ১৩৪২, পৃ.৬১২
জ্যৈষ্ঠ
বিলাত-যাত্রীর পত্র
১৪ জ্যৈষ্ঠ **১৩২৭**। অপ্রকাশিত
আষাঢ়
বিলাত-যাত্রীর পত্র
১৯ মে ১৯২০; ২৪ মে ১৯২০; ২৪ মে **১৯২০**। পথের সঞ্চয়, প্রথম সংস্করণ ১৩৪৬, "বিচিত্র"।
শ্রাবণ
বক্তৃতা ও আলোচনা
অনুবাদ। "আশ্রম সংবাদ" দ্রষ্টব্য। অপ্রকাশিত।

আশ্বিন
বিলাত-যাত্রীর পত্র
২৮ আগস্ট ১৯২০। অপ্রকাশিত। একই তারিখে সি এফ অ্যান্ড্রুজকে লিখিত একখানি ইংরেজি চিঠিও (২) আছে।
কার্তিক
বিলাত-যাত্রীর পত্র
২৭ আশ্বিন ১৩২৭। শান্তিনিকেতন ২, বিশ্বভারতী সং ১৩৪২। [সর্বেশচন্দ্র মজুমদারের মৃত্যুতে সন্তোষচন্দ্র মজুমদারকে লিখিত।]
পৌষ
বিলাত-যাত্রীর পত্র
সি এফ অ্যান্ড্রুজকে লিখিত চারিখানি ইংরেজি চিঠি (২): নবেম্বর ৭, ১৯২০, নবেম্বর ৩০, ১৯২০, ডিসেম্বর ১৩, ১৯২০.?. "আশ্রম সংবাদ" বিভাগে একখানি ইংরেজি চিঠি (২) [নবেম্বর ২৫, ১৯২০] উদ্ধৃত আছে।
ফাল্গুন
চিঠি
ইংরেজি (২)। আশ্রম সংবাদ বিভাগ 'গুরুদেবের খবর' দ্রষ্টব্য।

তৃতীয় বর্ষ, মাঘ ১৩২৮—পৌষ ১৩২৯

মাঘ
বিশ্বভারতী পরিষদ সভার প্রতিষ্ঠা।
বক্তৃতা, ৮ পৌষ, ১৩২৮
অপ্রকাশিত।
ফাল্গুন
দীক্ষা। ৭ **পৌষ**, ১৩২৮
অপ্রকাশিত
নবযুগ। বক্তৃতা, ৭ **পৌষ**, ১৩২৮
শান্তিনিকেতন ২, বিশ্বভারতী ১৩৪২
মন্দিরে উপদেশ, ৪ **মাঘ** ১৩২৮
অপ্রকাশিত
চৈত্র
মন্দিরে উপদেশ, ২৫ **শ্রাবণ** ১৩২৮
অপ্রকাশিত
মোলিয়্যার
অপ্রকাশিত। মোলিয়্যারের ত্রৈশতাব্দিক উৎসবে আলোচনা।
মাটির ডাক, ২৩ **ফাল্গুন** ১৩২৮
পূরবী
বৈশাখ
মন্দিরে উপদেশ, মহর্ষির মৃত্যুদিন,
৬ মাঘ ১৩২৮
অপ্রকাশিত
প্রথম চিঠি
লিপিকা

গান
"ও মঞ্জরী ও মঞ্জরী", ২৮ ফাল্গুন ১৩২৮; "তোমার সুরের ধারা ঝরে", ফাল্গুন পূর্ণিমা ১৩২৮
মাটির গান
"ফিরে চল্ মাটির টানে," ২৩ ফাল্গুন ১৩২৮
জ্যৈষ্ঠ
নববর্ষ, মন্দিরে উপদেশ ১ বৈশাখ ১৩২৯
অপ্রকাশিত
বলাকা'র ব্যাখ্যা (৩)
গ্রহণ (১)
অপ্রকাশিত।
আষাঢ়
মন্দিরে উপদেশ, ২০ **ফাল্গুন** ১৩২৮
অপ্রকাশিত
বলাকার ব্যাখ্যা
গান
"কখন বাদল-ছোঁওয়া লেগে", ২৮ জ্যৈষ্ঠ ১৩২৯; "আজি বর্ষারাতের শেষে", ২৩ জ্যৈষ্ঠ ১৩২৯; "এই সকালবেলার বাদল-আঁধারে", ২০ জ্যৈষ্ঠ ১৩২৯।
গান
"এস এস হে তৃষ্ণার জল," ৪ বৈশাখ ১৩২৯। "আশ্রম সংবাদ" দ্রষ্টব্য।
শ্রাবণ
বর্ষশেষ, মন্দিরে উপদেশ, ৩০ **চৈত্র** ১৩২৮
অপ্রকাশিত
গান
"ভোর হল যেই শ্রাবণশর্বরী", ১৬ আষাঢ় ১৩২৯; "একলা বসে একে একে অনামনে", ২০ আষাঢ় ১৩২৯; "শ্রাবণ মেঘের আধেক দুয়ার ঐ খোলা", ২৯ আষাঢ় ১৩২৯।
ভারতবর্ষে হিন্দু-মুসলমান সমস্যার সমাধান কি?
কালান্তর "হিন্দু-মুসলমান"। পত্র।
ভাদ্র ও আশ্বিন
মন্দিরে উপদেশ, ৬ **ফাল্গুন** [১৩২৮]
অপ্রকাশিত
শারদোৎসবের ভূমিকা
রবীন্দ্র-রচনাবলী ৭, শারদোৎসব, গ্রন্থ-পরিচয়
গান
"আমার কণ্ঠ হতে গান কে নিল ভুলায়ে।"
মন্দিরে উপদেশ, ১৩ **ভাদ্র** ১৩২৯
অপ্রকাশিত
বিদায়-অভিনন্দন
সিলভাঁ লেভির বিদায় উপলক্ষ্যে ভাষণ। অপ্রকাশিত।

---

(২) ইংরেজি চিঠি সম্পর্কে সি এফ অ্যান্ড্রুজকে লিখিত পত্রসংগ্রহ 'Letters from Abroad' এবং 'Letters to a Friend' দ্রষ্টব্য।

(৩) বিশ্বভারতীতে বলাকা অধ্যাপনাকালে কথিত কবির মন্তব্য ও আলোচনার শ্রীপ্রদ্যোত-কুমার সেনগুপ্ত কৃত অনুলিপি শান্তিনিকেতন পত্রে ধারাবাহিকরূপে প্রকাশিত হয়। দ্বাদশ খণ্ড রবীন্দ্র-রচনাবলীতে বলাকার গ্রন্থ-পরিচয়ে ইহার অনেকাংশ উদ্ধৃত হইয়াছে।

বিশ্বভারতীর কথা
অপ্রকাশিত। বিশ্বভারতীর নবাগত ছাত্রদের প্রতি।

কার্তিক
মন্দিরে উপদেশ, ২০ ভাদ্র ১৩২৯
শান্তিনিকেতন ২, বিশ্বভারতী সং, ১৩৪২

সামাজিক স্বাস্থ্য ও প্রাণরক্ষার পথ কোন্ দিকে ?
অপ্রকাশিত। এল কে এল্‌ম্‌হার্স্ট কর্তৃক Robbery of the Soil প্রবন্ধ পাঠের পর সভাপতির মন্তব্য।

আলোচনা ঃ বিসর্জন
বিশ্বভারতীতে অধ্যাপনাকালে বিবৃত। বিসর্জন, চৈত্র ১৩৪৬ সং ও তৎপরবর্তী।

অগ্রহায়ণ
মন্দিরে উপদেশ, ২৯ পৌষ
অপ্রকাশিত

বলাকার ব্যাখ্যা

চিঠি
অপ্রকাশিত। "পৃথিবীতে একদল লোক আছে যারা কাজ করে," ১৬ বৈশাখ ১৩২৯।

পুরাতন চিঠি
অপ্রকাশিত। "আমি এই খোলা নদীতে নির্জন চরের মধ্যে", ১৮ কার্তিক ১৩২৮।

পৌষ
৭ পৌষ ১৩২৯। **উৎসবের উদ্বোধন ও উপদেশ**
অপ্রকাশিত

প্রাক্তন ছাত্রদের প্রতি। ৮ পৌষ, ১৩২৯
প্রাক্তনী

বিশ্বভারতী (১)
অপ্রকাশিত।

বলাকার ব্যাখ্যা

সিলভাঁ লেভির বিদায়-সভায় বক্তৃতা
অপ্রকাশিত। ইংরেজি।

চতুর্থ বর্ষ মাঘ ১৩২৯—পৌষ ১৩৩০

মাঘ
মন্দিরে উপদেশ
অপ্রকাশিত

'বলাকা'র ব্যাখ্যা

গান
"তুমি ভাবো গোপন রবে।" ২২ মাঘ ১৩২৯।

ফাল্গুন
মন্দিরে উপদেশ, ১৭ মাঘ ১৩২৯
শান্তিনিকেতন ২, বিশ্বভারতী সং, ১৩৪২।

'বলাকা'র ব্যাখ্যা

পত্র ১-২
অপ্রকাশিত। "জীবনের লক্ষ্য কি হওয়া উচিত"; "নিজের প্রবৃত্তির সঙ্গে সংগ্রাম করা কঠিন।"

গান
"খেলার সাথী বিদায়দ্বার খোল"; "যাওয়া আসারই এই কি খেলা।"

চৈত্র
'বলাকা'র ব্যাখ্যা

বৈশাখ
মন্দিরে উপদেশ, ২ ফাল্গুন ১৩২৯
অপ্রকাশিত

'বলাকা'র ব্যাখ্যা

বক্তৃতা। করাচী নারীসভা
অপ্রকাশিত

গান
"হাটের ধুলা সয় না।" ২ চৈত্র ১৩২৯। দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুর কৃত স্বরলিপি সহ।

গান
"কালের মন্দিরা যে সদাই বাজে।" ৩০ চৈত্র ১৩২৯। দিনেন্দ্রনাথ-কৃত স্বরলিপি সহ।

জ্যৈষ্ঠ
সভাপতির অভিভাষণ। উত্তর ভারতীয় বংগসাহিত্য সম্মিলন, ৩ মার্চ, ১৯২৩।
অপ্রকাশিত

সভাপতির শেষ বক্তব্য, ৪ মার্চ ১৯২৩।
অপ্রকাশিত।

গান
"তোমার শেষের গানের রেশ নিয়ে কানে।" ২৬ ফাল্গুন, ১৩২৯।

স্বরলিপি সহ।

গান

"নাই বা এলে সময় যদি নাই।" ১৯ ফাল্গুন ১৩২৯। দিনেন্দ্রনাথ কৃত স্বরলিপি সহ।

আষাঢ়

'বলাকা'র ব্যাখ্যা

ছন্দ

ছন্দ, দ্বিতীয় সংস্করণ ১৩৫২ (যন্ত্রস্থ)

সুদামাপুরীবাসীদের প্রতি

অপ্রকাশিত

গান

"পাখী বলে, চাঁপা আমারে কও।" ১৫ চৈত্র ১৩২৯। দিনেন্দ্রনাথ কৃত স্বরলিপি সহ।

গান

"তোমার বীণায় গান ছিল, আর।" ২৩ চৈত্র ১৩২৯। দিনেন্দ্রনাথ-কৃত স্বরলিপি সহ।

বৈদিক মন্ত্র

'আশ্রম সংবাদ' বিভাগে মুদ্রিত অনুবাদ। অপ্রকাশিত

শ্রাবণ

গান

"দূরে দূরে বুঝি আমায়।" দিনেন্দ্রনাথ-কৃত স্বরলিপি সহ।

গান

"তোমায় গান শোনাব।" ২৯ ফাল্গুন ১৩২৯। দিনেন্দ্র-কৃত স্বরলিপি সহ।

ভাদ্র

নববর্ষে মন্দিরে উপদেশ, ১ বৈশাখ ১৩৩০

শান্তিনিকেতন ২, বিশ্বভারতী সং ১৩৫২

'বলাকা'র ব্যাখ্যা

সুকুমার রায়ের মৃত্যু উপলক্ষ্যে মন্দিরে উপদেশ, ২৬ ভাদ্র ১৩৩০

শান্তিনিকেতন ২, বিশ্বভারতী, সং ১৩৪২।

গান

"অগ্নিশিখা এস এস।" ৪ বৈশাখ ১৩৩০। শ্রীঅনাদিকুমার দস্তিদারকৃত স্বরলিপি সহ।

গান

"কদম্বেরি কানন ঘেরি।" দস্তিদার-কৃত স্বরলিপি সহ।

আশ্বিন

মন্দিরে উপদেশ, ১৯ ভাদ্র ১৩৩০

অপ্রকাশিত

'বলাকা'র ব্যাখ্যা

গান

"আকাশতলে দলে দলে।" ২৪ আষাঢ় ১৩৩০। দস্তিদার-কৃত স্বরলিপি সহ।

গান

"আষাঢ় কোথা হতে আজ।" দস্তিদার-কৃত স্বরলিপি সহ।

আলোচনা

'আশ্রম সংবাদ' বিভাগ দ্রষ্টব্য। অপ্রকাশিত।

কার্তিক

বঙ্কিমচন্দ্র

অপ্রকাশিত। নব্যভারত ভাদ্র ১৩৩০ হইতে উদ্ধৃত।

'বলাকা'র ব্যাখ্যা

গান

"ছায়া ঘনাইছে বনে বনে।" দিনেন্দ্রনাথ-কৃত স্বরলিপি সহ।

গান

"পুব হাওয়াতে দেয় দোলা।" দস্তিদার-কৃত স্বরলিপি সহ।

অগ্রহায়ণ

মন্দিরে উপদেশ, ৫ বৈশাখ ১৩৩০

অপ্রকাশিত

বলাকার ব্যাখ্যা

গান

"নিশীথ রাতের প্রাণ।" দিনেন্দ্রনাথ-কৃত স্বরলিপি সহ।

গান

"এই শ্রাবণ বেলা বাদলঝরা।" দস্তিদার-কৃত স্বরলিপি।

পৌষ

যোগ

শান্তিনিকেতন ২, বিশ্বভারতী সং, ১৩৫২, পৃ ৬৩৮

বলাকার ব্যাখ্যা

বিশ্বভারতী (১)

অপ্রকাশিত।

গান

"মন চেয়ে রয়, মনে মনে।"

বক্তৃতা (১)

অপ্রকাশিত।

গান

"পৌষ তোদের ডাক দিয়েছে।" দস্তিদার-কৃত স্বরলিপি সহ।

পঞ্চম বর্ষ মাঘ ১৩৩০—পৌষ ১৩৩১

মাঘ

৭ই পৌষ। উৎসবের উদ্বোধন ও উপদেশ

অপ্রকাশিত।

বলাকা, ব্যাখ্যা

পত্র

উইলিয়াম পিয়ার্সনকে লিখিত তিনখানি চিঠি। অপ্রকাশিত।

গান

"আমি সন্ধ্যাদীপের শিখা।" ১৭ পৌষ ১৩৩০। দস্তিদার-কৃত স্বরলিপি সহ।

গান

"আয়রে মোরা ফসল কাটি," ৫ বৈশাখ ১৩৩০। দস্তিদার-কৃত স্বরলিপি সহ।

ফাল্গুন

পরলোকগত পিয়ার্সন (১)

৯ পৌষে ভাষণ। অপ্রকাশিত।

মন্দিরে উপদেশ, ২৪ পৌষ ১৩৩০ (১)
অপ্রকাশিত।

গান
"যে কেবল পালিয়ে বেড়ায়।" দিনেন্দ্রনাথ-কৃত স্বরলিপি সহ।

গান
"এবার অবগুণ্ঠন খোলো।" দিনেন্দ্রনাথ-কৃত স্বরলিপি সহ।

চৈত্র

খৃষ্টোৎসব, ৯ পৌষ ১৩৩০। মন্দিরে উপদেশ অপ্রকাশিত

গান
"আমার শেষ পারানীর কড়ি।" দিনেন্দ্রনাথ-কৃত স্বরলিপি সহ

বৈশাখ

মন্দিরে উপদেশ, ১ ফাল্গুন ১৩৩০
অপ্রকাশিত।

গান
"যখন ভাঙল মিলন মেলা।" দিনেন্দ্রনাথ-কৃত স্বরলিপি সহ।

জ্যৈষ্ঠ

মন্দিরে উপদেশ
অপ্রকাশিত।

আষাঢ়

মন্দিরে উপদেশ, ৮ ফাল্গুন ১৩৩০
অপ্রকাশিত।

একখানি পত্র
ইংরেজি চিঠি, সি এফ অ্যান্ড্রুজকে লিখিত।

গান
"আজ কিছুতেই যায় না মনের ভার।" দিনেন্দ্রনাথ-কৃত স্বরলিপি সহ।

শ্রাবণ

গান
"শ্রাবণ বরিষণ পার হয়ে।" দিনেন্দ্রনাথ-কৃত স্বরলিপি সহ।

সুষীম চা-চক্রপ্রবর্তনা
গান, "হায় হায় হায়, দিন চলি যায়।"

ভাদ্র

মন্দিরে উপদেশ। ৫ চৈত্র ১৩৩০, চীন-যাত্রার পূর্বদিন
অপ্রকাশিত

গান
"ধরণীর গগনের মিলনের ছন্দে।" দিনেন্দ্রনাথ-কৃত স্বরলিপি সহ।

আশ্বিন

গান
"মাটির বুকের মাঝে বন্দী যে জল।"

গান
"পথিক পরাণ চল্।" স্বরলিপি সহ।

কার্তিক

গান
"আমার এ পথ।" দিনেন্দ্রনাথ-কৃত স্বরলিপি সহ।

অগ্রহায়ণ

গান
"একি মায়া লুকাও কায়া।"

গান
"যায় নিয়ে যায় আমায়।" দিনেন্দ্রনাথ-কৃত স্বরলিপি সহ।

ডায়ারির এক পাতা
যাত্রী, পশ্চিমযাত্রীর ডায়ারি।

ছবি
পূরবী

পৌষ

সিন্ধু-শকুন
শ্রীনন্দলাল বসুকে লিখিত পাঁচটি পত্রাংশ। অপ্রকাশিত।

হিন্দী বক্তৃতা
ভাবনগরে কথিত। ৬ এপ্রিল ১৯২০। অপ্রকাশিত।

গান
"নাই যদি বা এলে তুমি।" দিনেন্দ্রনাথ-কৃত স্বরলিপি সহ।

ষষ্ঠ বর্ষ মাঘ ১৩৩১—পৌষ ১৩৩২

মাঘ

গান
"সাধন কি মোর আসন নেবে।"

গান
"একি মায়া লুকাও কায়া।" দিনেন্দ্রনাথ-কৃত স্বরলিপি সহ।

ফাল্গুন

চিঠি
অপ্রকাশিত। "তোমাদের জীবনে একটি শুষ্কতা," ২২ ভাদ্র ১৩১৭।

আকন্দ
পূরবী

গান
"মোরা ভাঙব তাপস।" দিনেন্দ্রনাথ-কৃত স্বরলিপি সহ।

চৈত্র

গান
"আজ কি তাহা বারতা পেল রে।" দিনেন্দ্রনাথ-কৃত স্বরলিপি সহ।

বৈশাখ

গান
"কুসুমে কুসুমে চরণ চিহ্ন।" দিনেন্দ্রনাথ-কৃত স্বরলিপি সহ।

নববর্ষ
শান্তিনিকেতন মন্দিরে উপদেশ, ১ বৈশাখ ১৩৩২। অপ্রকাশিত

বর্ষশেষ
শান্তিনিকেতন মন্দিরে উপদেশ, চৈত্র-সংক্রান্তি ১৩৩১। অপ্রকাশিত।

আষাঢ়

বিদায়কালে ইতালীয়ার প্রতি
পূরবী, "ইটালিয়া।"

ভারতবর্ষীয় বিবাহ
সমাজ, চৈত্র ১৩৪৪ সং।

পত্র
অপ্রকাশিত। "আজকাল আমি নানা অনাবশ্যক কাজের ভিড়ে," ২০ মাঘ ১৩২৬।

শ্রাবণ

বর্ষা-মঙ্গল
গান ১-৬, "ধরণী দূরে চেয়ে;" "গহন রাতে শ্রাবণ ধারা"; "আজি ঐ আকাশ পরে;" "যেতে দাও গেল যারা;" "জানি হল যাবার আয়োজন;" "বজ্রমাণিক দিয়ে গাঁথা।"

গান
"আজিকে এই সকাল বেলাতে।" দিনেন্দ্রনাথ-কৃত স্বরলিপি সহ।

আলোচনা
শিক্ষা, দ্বিতীয় খণ্ড ১৩৫২।

ভাদ্র

গান
"বাজো রে বাঁশরী বাজো"; "ওগো আষাঢ়ের পূর্ণিমা।"

কার্তিক

মন্দিরে উপদেশ, ৩১ আষাঢ় ১৩৩২
অপ্রকাশিত

অনুবাদ
অপ্রকাশিত। "উদ্যোগিনং পুরুষসিংহমুপৈতি লক্ষ্মী" শ্লোকের অনুবাদ।

শেষ বর্ষণ
গান ১-১৩, "এস নীপবনে;" "ঝরে ঝর ঝর;" "আজ শ্রাবণের পূর্ণিমাতে"; "অশ্রুভরা বেদনা;" "বন্ধু রহো রহো

সাথে"; "শ্যামল ছায়া নাই বা গেলে;" "দেখ দেখ শুকতারা;" "এস শরতের কিরণ প্রতিমা"; "তোমার নাম-জানি নে সুর জানি"; "কার বাঁশি নিশি ভোরে"; "হে ক্ষণিকের অতিথি"; "আমার রাত পোহালো"; "গান আমার যায় ভেসে যায়।"

অগ্রহায়ণ

গান

"আমার ঢালা গানের ধারা।"

কেতকী

গান, "একলা বসে বাদল শেষে।"

শেফালি

গান, "ওলো শেফালি।"

গান

"শান্তি মন্দির পুণ্য অঙ্গন" (৪)

সপ্তম বর্ষ—মাঘ ১৩৩২—৩৩

মাঘ

মন্দিরে ৭ পৌষ ১৩৩২ উৎসবের উদ্বোধন ও উপদেশ

অপ্রকাশিত

ফাল্গুন

গান

"লহ লহ তুলে লহ নীরব বীণাখানি।"

দিনুবাবুর কৃত স্বরলিপি সহ।

আচার্যের অভিভাষণ, বিশ্বভারতী বার্ষিক পরিষৎ, ৯ পৌষ ১৩৩২

ফাল্গুন সংখ্যার ক্রোড়পত্র, স্বতন্ত্র পুস্তিকাকারে প্রাপ্তব্য। অপ্রকাশিত।

চৈত্র

কুমিল্লার অভয়াশ্রমের বার্ষিক সভায় সভাপতির অভিভাষণ

অপ্রকাশিত

অভয়াশ্রম

অপ্রকাশিত

মন্দিরে উপদেশ, ময়মনসিংহ

অপ্রকাশিত

বৈশাখ

নববর্ষ

গান ১-৪, "হে চির নূতন আজি এ দিনের"; "আপনারে দিয়ে রচিলি রে কি এ"; "তুমি কি এসেছ মোর দ্বারে"; "বাঁধন ছেঁড়ার সাধন হবে।"

আষাঢ় ও শ্রাবণ

পত্র

'সাধক দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর' প্রবন্ধে উদ্ধৃত। দ্বিজেন্দ্রনাথকে লিখিত। চিঠিপত্র ৫ (যন্ত্রস্থ)।

---

(৪) "ডাক্তার কার্লো ফার্মিকী শান্তিনিকেতনে আগমন করিয়াছেন।......এতদুপলক্ষে পূজনীয় আচার্যদেব একটি পুরাতন গানকে ["মাতৃমন্দির পুণ্য অঙ্গন"] কিঞ্চিৎ পরিবর্তন করিয়া সময়োপযোগী করিয়া তুলিয়াছিলেন তাহা গীত হয়।"

গঙ্গোত্রী

সুবোধ ঘোষ

(৩২)

অজয়ের বাড়ির কাছাকাছি এগিয়ে এসেছে সবাই। ঘন বাগানের লতাপাতায় বন্দী কালো অন্ধকারের রহস্য ভেদ করে প্রদীপের আলোর আভা ফাঁকে ফাঁকে ছড়িয়ে পড়ছিল। মাধুরী আর বাসন্তীর গন্তব্যের সীমা এই পর্যন্ত। ওরা আর এগিয়ে যাবে না। ওদের ব্রত শুধু প্রতীক্ষার ধৈর্যে শান্ত হয়ে থাকবে। শুধু অজয় আর পরিতোষ থামবে না। এরা সোজা হেঁটে রওনা হয়ে যাবে মীরগঞ্জের দিকে।

সবাই একবার থামলো। অজয়ের স্তব্ধতাই একটু অদ্ভুত রকমের মনে হচ্ছিল। অজয় যেন জিরিয়ে নেবার জন্য দাঁড়ালো।

পরিতোষ বললো—আর থেমে কাজ নেই অজয়বাবু। চলুন, একটানা চলে যাই।

অজয় কোন উত্তর দিল না। নিজের মনের আড়ালে একটা বেদনার বোঝাকে যেন সে সরিয়ে দিয়ে হাল্কা হবার চেষ্টা করছিল।

ক্ষণিকের জন্য অজয় আর কিছু ভাবতে পারছিল না। শুধু মনে হয় পরিতোষের কথা। কি দোষ করেছে পরিতোষ? কি ভুল করেছে পরিতোষ? তার শোনা কাহিনীর সকল ইতিবৃত্তকে তন্ন তন্ন করে খুঁজেও আজ আর পরিতোষকে দোষী করার মত কোন প্রমাণ খুঁজে পায় না অজয়। পরিতোষকে আহ্বান করেছিলেন সঞ্জীববাবু। পরিতোষকে বিলেত যাবার খরচ, জীবনে বড় হবার সকল সুযোগ দেবার আশ্বাস দিয়ে সঞ্জীববাবু তাকে কাছে টেনে এনেছিলেন। কিন্তু তার চেয়ে বড় আহ্বান এসেছিল মাধুরীর কাছ থেকে। অজয় কোন দাবী নিয়ে কারও কাছে দাঁড়ায় নি। অজয় তার সুখের ভবিষ্যৎ প্রতিশ্রুতিকে আদায় করার জন্য মাধুরীর কাছে হাত পাতে নি। মাধুরী নিজে থেকেই পরিতোষের মুখের দিকে তার বিহ্বল দৃষ্টির একাগ্রতা নিয়ে তাকিয়েছিল। সাথী হয়ে পাশে দাঁড়াবার মত একটি স্নিগ্ধ ছায়ার স্পর্শ যেন পরিতোষের কাছে কাছে রয়েছে। ইচ্ছে করে নয়, চেষ্টা করে নয়, নিজেরই হৃদয়ের ধর্মে মাধুরী সাড়া দিয়েছিল। কেশবকে ভুলতে পারেনি মাধুরী, যে-আসনে কেশব বসে আছে, সে-আসন এক তিলও স্থানচ্যুত হয়নি। মাধুরী নিজের মনকেই পরীক্ষা করে বুঝতে পেরেছিল। কিন্তু মানুষের হৃদয়ে যেন অনেকগুলি জানালা আছে। সূর্যোদয়ের কালে একদিক দিয়ে আলোর বার্তা ছুটে আসে। আবার গোধূলি বেলায় অন্যদিকে রক্তিম রশ্মির শান্ত পুলক। এ-জীবনে বাতাসের সাড়া লাগে, কিন্তু একই রূপে নয়। ঝড়ের রূপে আসে, কখনো বা মৃদু সঞ্চারে তার আগমন হয়। উভয়কেই ভাল লাগে। উভয়কে ভাল লাগার অবকাশ একই দেহে, একই জীবনে, একই চিত্তের গোপনে নিহিত আছে।

অজয়ের চিন্তার মধ্যে মাধুরীর মনস্তত্ত্বের প্রতিচ্ছবি সকল রূপ রঙ ও বৈচিত্র্য নিয়ে যেন প্রত্যক্ষ হয়ে ওঠে। বিব্রত হয়ে ওঠে অজয়। নিজেকে অপরাধীর মত মনে হয়। মাধুরীর সম্বন্ধে তার মনের একান্তে এই নিঃশব্দ গবেষণার মধ্যে একটা ইঙ্গিত স্পষ্ট হয়ে ওঠে, অজয় ভয় পায়। লজ্জিত হয়।

পরিতোষের জন্যও অজয় তার মনের ভেতর এমনি একটা করুণাভরা সমবেদনার ভাব দেখতে পায়। কেশব হয়তো আবার ফিরে আসবে, মান্দার গাঁ তাকে আর ছেড়ে দেবে না। মাধুরীও প্রস্তুত, কেশবকে অভ্যর্থনা করে নিতে সে আর কুণ্ঠিত নয়। যে যেখানে অধিকার ছিল, সে সেইখানে তার অধিকার আবার চিনে নেবে। কিন্তু পরিতোষের অধিকারের কোন রেখাচিহ্ন আজ আর নেই। ঘটনার আক্রোশে মাঠের শিশিরের মত রোদের জ্বালায় একেবারে নিশ্চিহ্ন হয়ে মুছে গেছে। তার জীবনের একটা অধ্যায় এত বাস্তব হয়ে ফুটে উঠেও স্বপ্নের মত অলীক হয়ে মিলিয়ে গেল। মাধুরীর দিকে ফিরে তাকাবার মত সাহসও বেচারার মুছে গেছে। কেশবের নামে পরিতোষের মনে আন্তরিক শ্রদ্ধার বিস্ময় জেগে উঠেছে। শ্রদ্ধার অর্ঘ্য স্তূপীকৃত হয়ে উঠেছে। পরিতোষ স্বেচ্ছায় ছোট হয়ে থাকতে চায়।

অজয়ের ইচ্ছে হয়, কিছুক্ষণের জন্য এই মাধুরী আর পরিতোষ এখানে দাঁড়িয়ে থাকুক। আর যেন কেউ না থাকে। আজ চরম বিদায়ের এই অদ্ভুত সন্ধিক্ষণে মাধুরীর কাছে ক্ষণিকের জন্য পরিতোষ শ্রদ্ধেয় হয়ে উঠুক। ক্ষমা চেয়ে নিক মাধুরী। নইলে ওর জীবনে আর শান্তি নেই। নির্বিরোধ প্রতিবাদহীন পরিতোষের শান্ত মুখচ্ছবির স্মৃতি মাধুরীর জীবনের সকল হাসি চাপল্য যত্ন নিষ্ঠা ও প্রেমের বুকে কাঁটা হয়ে বিঁধে থাকবে।

অজয় ডাকলো—বাসন্তী; একবার এই দিকে শুনে যা।

বাসন্তী সরে গিয়ে অজয়ের কাছে দাঁড়ালো। একটু ব্যস্ততার সঙ্গে দুজনে কথা বলতে বলতে বাগানের বেড়ার ঝাঁপ সরিয়ে ভেতরের দিকে এগিয়ে গেল।

মাধুরী বললো—বাসু আর অজয়দা কেন সরে গেলেন বুঝতে পারছো?

পরিতোষ চমকে উঠে বলে—না ঠিক বুঝতে পারছি না। অজয়বাবু কি মীরগঞ্জে যাবেন না?

মাধুরী—নিশ্চয় যাবেন। যাকে আজ সবাই মিলে ফিরিয়ে আনতে যাচ্ছে, সে যে সবারই শ্রদ্ধেয়।

পরিতোষ—নিশ্চয়। ভজুর মত মানুষও কেশববাবুকে শ্রদ্ধা করে।

মাধুরী—তুমিও তো কর।

পরিতোষ—হ্যাঁ, এই রকমের একজন মানুষকে দেখতে আমার বড় ইচ্ছে করছে। বিলেতে থাকতেও দেশের খবর শুনে চুপ করে বসে বসে অনেক কথা ভাবতাম। মনে হ'তো, আমরা সবাই কি রকম যেন হয়ে গেছি। একেবারে ছোট হয়ে যাবার একটা পথকে আমরা সবাই বড় হবার পথ বলে মেনে নিয়েছি। এই সব বড় বড় সার্ভিস, ডিগ্রি, ইংরাজিয়ানা, বাড়ি, গাড়ি, বিজিনেস—আমার কাছে সবই কেমন যেন মেকী ও কুৎসিত মনে হয়। আমি পরীক্ষা দিলাম না কেন, জান?

মাধুরী—কেন?

পরিতোষ—অধ্যাপক বললেন, তোমার মত উজ্জ্বল ছাত্র ভারতবর্ষের মত অপদার্থ দেশে গিয়ে কি করবে? তুমি এখানেই থেকে যাও।

মাধুরী হাসছিল—এরই জন্যে তোমার দুঃখ হয়েছে?

পরিতোষ—দুঃখ নয়, সেই মুহূর্তে সব উৎসাহ একেবারে ফাঁকা হয়ে গেল।

মাধুরী—ভালই করেছ।

পরিতোষ—হ্যাঁ, নতুন করে কিছু শেখবার প্রয়োজন বোধ করছি। তাই ভাবছি......।

বিজ্ঞপ্তি

শ্রীযুক্তা সরলা দেবী চৌধুরাণীর আত্ম-জীবনী "জীবনের ঝরাপাতা"র যে অংশ গত সপ্তাহের 'দেশ'এ বাহির হইয়াছে, তাহাতে লেখিকার বিবাহের পর স্বামিগৃহে যাত্রা পর্যন্ত ঘটনা বিবৃত হইয়াছে। ইহার পর তাঁহার জীবনের নূতন অধ্যায় অর্থাৎ বিবাহিত জীবনের অধ্যায় আরম্ভ। আমরা এ অধ্যায়ের পূর্ব পর্যন্ত জীবন-কাহিনী প্রকাশ করিয়াই 'দেশ'এ 'জীবনের ঝরাপাতা' ধারাবাহিকভাবে প্রকাশ করা বন্ধ করিলাম।

—সম্পাদক : 'দেশ'

মাধুরী—কি?

পরিতোষ—কেশববাবুর সঙ্গে দেখা করেই চলে যাব।

মাধুরীর মন বেদনায় মোচড় দিয়ে উঠলো—চলে যাবে কেন? কোথায় যাবে?

পরিতোষ—এখনও স্পষ্ট করে কিছু ভেবে উঠতে পারিনি। কিন্তু কিছু একটা করতেই হবে। অবশ্য আসবো মাঝে মাঝে।

মাধুরী—চলে যাবে কেন?

পরিতোষ—যেতেই যে হবে।

মাধুরী—মাঝে মাঝে আসবে কেন?

পরিতোষ মনে মনে অপ্রস্তুত হয়ে রইল। সহসা উত্তর দেবার মত ভাষা খুঁজে পেল না। মাধুরীর প্রশ্নটাও অদ্ভুত। অত্যন্ত কঠিন প্রশ্ন। পরিতোষের অসতর্ক আবেগের একটা প্রমাণ হাতের কাছে পেয়ে যেন খোঁচা দেবার লোভ সাম্‌লাতে পারলো না মাধুরী। পরিতোষ অন্য প্রসঙ্গে পালিয়ে যাবার জন্য বললো—অজয়বাবুকে এইবার ডাক দেওয়া যাক্।

মাধুরী—আমার কথার উত্তর তো দিলে না?

পরিতোষ—না, উত্তর দেবার এমন কিছু নেই। এমনিই মাঝে মাঝে আসবো। সময় সুযোগ না পেলে আসবো না।

মাধুরী—সে প্রশ্ন করছি না। কেন মাঝে মাঝে আসবে এখানে?

পরিতোষ—তোমাদের সঙ্গে সম্পর্কটা চিরদিনের মত বাতিল করে দিতে চাইছ?

মাধুরী—না, তা নয়। কিন্তু কাদের সঙ্গে তোমার সম্পর্ক?

পরিতোষ—তোমার ও কেশববাবুর সঙ্গে যদি মাঝে মাঝে দু'দিনের জন্য দেখা করে যাই, তাতে আমার উপকারই হবে।

মাধুরী—হাঁ, এস মাঝে মাঝে। কিন্তু কেশববাবুর সঙ্গে দেখা হলেই তোমার উপকার হবে। আমার সঙ্গে দেখা করে উপকার পাবার তো কোন আশা নেই।

পরিতোষ—না, আশা নেই।

মাধুরী এগিয়ে এসে পরিতোষের হাত ধরলো।—তুমি আমায় মাপ করো পরিতোষ।

পরিতোষ বিচলিত হয়ে উঠলো—মাপ করবো কেন মাধুরী?

মাধুরী—নিজেকে সর্বভাবে অশুচি মনে করছি আমি। আমি অবসর চাই, অবকাশ চাই। তোমরা আমাকে মুক্তি দাও।

পরিতোষ—তোমরা?

মাধুরী—হ্যাঁ, তুমি আর কেশবদা।

পরিতোষ—শুধু আমরা দু'জনেই তোমাকে মুক্তি দিতে পারি না মাধুরী। আমার আর একটা কথা মনে হয়েছে। তোমাকে মুক্ত করে দেবার প্রশ্ন বোধ হয় আর একজনের কাছেও......।

—আর একজন? কি বলছো পরিতোষ। তুমিই বা এসব খবর......।

দূরে অজয়ের হাতের লণ্ঠন দুলে উঠলো। বাসন্তী ঘরের ভেতর থেকে কতগুলি কাগজপত্র নিয়ে আসছে, অজয় লণ্ঠন তুলে পথ দেখাচ্ছিল বাসন্তীকে।

পরিতোষ—তুমি এর বেশি কিছু বলতে পারবো না।

মাধুরী—বলতেই হবে তোমাকে।

পরিতোষ—তুমি জান, অজয়বাবুর সঙ্গে আমার অনেক আলাপ হয়েছে।

মাধুরী—হাঁ।

পরিতোষ—অজয়বাবুর সঙ্গে নানা কথার প্রসঙ্গে, তাঁর সব আন্তরিকতা ও আগ্রহের মধ্যে একটা জিনিসের পরিচয় অস্পষ্ট হলেও আমার কাছে ধরা পড়েছে। আমার মনে হয়, বুঝতে আমার ভুল হয়নি।

মাধুরী—তুমি কিন্তু সবই অস্পষ্ট করে বলছো। আমি কিছুই বুঝতে পারছি না।

পরিতোষ—তুমি জান, কেশববাবু এমন একজন লোক, যাঁকে অনেকেই শ্রদ্ধা করে।

মাধুরী—তা জানি।

পরিতোষ—তেমনি তুমি জাননা, তুমি এমন একজন মানুষ, যাকে অনেকেই ভালবাসে।

মাধুরী—অনেকেই? এর অর্থ?

পরিতোষ—আর আমাকে বেশি জেরা করো না মাধুরী। আমি হয়তো তোমার ক্ষতি করে দেব, কারণ আমি কিছুই গুছিয়ে বলতে পারছি না।

মাধুরী জোরে একটা নিশ্বাস ছাড়লো—সব গুছিয়ে বলা হয়ে গেছে তোমার। বলে তুমি ভালই করলে পরিতোষ। না জানলেই আমার ক্ষতি হতো।

অজয় লণ্ঠন হাতে নিয়ে এগিয়ে আসছিল। বাসন্তীও কিছুদূর এগিয়ে ডাক দিল—মাধুরী এস। (ক্রমশ)

"দেশ"-এর নিয়মাবলী

বার্ষিক মূল্য—১৩৲ ষাণ্মাসিক—৬৷৷৹

বিজ্ঞাপনের নিয়ম

"দেশ" পত্রিকায় বিজ্ঞাপনের হার সাধারণত নিম্নলিখিতরূপ:—

সাধারণ পৃষ্ঠা—এক বৎসরের চুক্তিতে
১০০" ও তদূর্ধ্ব ... ৩৲ প্রতি ইঞ্চি প্রতি বার
৫০"—৯৯" ... ৩৷৷৹ " " " "

সাময়িক বিজ্ঞাপন

৪৲ টাকা প্রতি ইঞ্চি প্রতি বার

বিজ্ঞাপন সম্বন্ধে অন্যান্য বিবরণ বিজ্ঞাপন বিভাগ হইতে জানা যাইবে।

প্রবন্ধাদি সম্বন্ধে নিয়ম

পাঠক, গ্রাহক ও অনুগ্রাহকবর্গের নিকট হইতে প্রাপ্ত উপযুক্ত প্রবন্ধ, গল্প, কবিতা ইত্যাদি সাদরে গৃহীত হয়।

প্রবন্ধাদি কাগজের এক পৃষ্ঠায় কালিতে লিখিবেন। কোন প্রবন্ধের সহিত ছবি দিতে হইলে অনুগ্রহপূর্বক ছবি সঙ্গে পাঠাইবেন অথবা ছবি কোথায় পাওয়া যাইবে জানাইবেন।

অমনোনীত লেখা ফেরৎ লইতে হইলে সঙ্গে উপযুক্ত ডাক টিকিট দিবেন। লেখা পাঠাইবার তারিখ হইতে তিন মাসের মধ্যে যদি তাহা 'দেশ' পত্রিকায় প্রকাশিত না হয়, তাহা হইলে লেখাটি অমনোনীত হইয়াছে বুঝিতে হইবে। অমনোনীত লেখা ছয় মাসের পর নষ্ট করিয়া ফেলা হয়। অমনোনীত কবিতা টিকিট দেওয়া না থাকিলে এক মাসের মধ্যেই নষ্ট করা হয়।

সমালোচনার জন্য দুইখানি করিয়া পুস্তক দিতে হয়।

সম্পাদক—"দেশ"
১নং বর্মণ স্ট্রীট, কলিকাতা।

ফুটবল

কলিকাতা ফুটবল লীগ প্রতিযোগিতার প্রথম ডিভিসনের প্রথমার্ধের খেলা শেষ হইয়াছে। লীগ তালিকার শীর্ষস্থান অধিকার করিয়াছে ভবানীপুর ক্লাব। ইহার পরবর্তী স্থানগুলি দখল করিয়াছে যথাক্রমে মোহনবাগান, ইস্টবেঙ্গল ও মহমেডান স্পোর্টিং ক্লাব। এই চারিটি দলের মধ্যে পয়েন্টের ব্যবধান অতি সামান্য। যে কোন মুহূর্তেই যে কোন দল শীর্ষস্থান অধিকার করিতে পারে। সুতরাং দ্বিতীয়ার্ধের সকল খেলা শেষ না হওয়া পর্যন্ত কোন দল চ্যাম্পিয়ান হইবে এখনও কেহ বলিতে পারে না। তবে ভবানীপুর দলের কৃতিত্ব এই যে সে এই বিভাগে অপরাজিত থাকিয়া পয়েণ্ট সংগ্রহ করিয়াছে। প্রথম ডিভিসনে খেলিবার সৌভাগ্য লাভ করিয়া ভবানীপুর দলের পক্ষে এইরূপ কৃতিত্ব প্রদর্শন করা সম্ভব হয় নাই। প্রথমার্ধের খেলার ফলাফলের জন্য কোন বিশেষ পুরস্কারের ব্যবস্থা নাই, নহিলে ভবানীপুর দল অনায়াসে তাহা লাভ করিত। এইরূপ পুরস্কার দানের ব্যবস্থা হওয়া উচিত। ইহাতে প্রথমার্ধের সকল খেলায় শীর্ষস্থান অধিকারী দলকে অর্জিত গৌরব অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করিতে দেখা যাইবে। বিভিন্ন খেলায় তীব্র উত্তেজনা ও প্রতিযোগিতারও অভাব পরিলক্ষিত হইবে না।

ভবানীপুর দলের এই সাফল্য প্রশংসনীয়। অধিকাংশ তরুণ খেলোয়াড় দ্বারা গঠিত এই দল কেবল অপূর্ব দৃঢ়তা ও আন্তরিক প্রচেষ্টার বলেই এইরূপ কৃতিত্ব প্রদর্শন করিতে পারিয়াছে। লীগ প্রতিযোগিতার শেষ পর্যন্ত যদি এই দল এইরূপ দৃঢ়তা ও আন্তরিক প্রচেষ্টায় লিপ্ত থাকে—চ্যাম্পিয়ান হওয়া বিশেষ কঠিন হইবে না। ভবানীপুর দল সাফল্যমণ্ডিত হউক, ইহাই আমাদের আন্তরিক কামনা।

মোহনবাগান গত দুই বৎসরের লীগ চ্যাম্পিয়ান অথচ এই বৎসরে সেই গৌরব প্রতিষ্ঠার জন্য খেলোয়াড়গণের মধ্যে কোনরূপ আন্তরিক ইচ্ছা আছে বলিয়া কোন দিনের খেলায় তাহার পরিচয় এই পর্যন্ত পাওয়া যায় নাই, উপরন্তু দ্বিতীয়ার্ধের খেলা আরম্ভ হইবার সঙ্গে সঙ্গে এই দলের খেলোয়াড়গণ এত নিম্নস্তরের ক্রীড়াকৌশল প্রদর্শন করিতেছেন যে, দলের অতিবড় সমর্থক পর্যন্ত মোহনবাগান তৃতীয় বৎসর চ্যাম্পিয়ান হইবে বলিয়া ভরসা করিতে পারিতেছেন না। যে রক্ষণভাগের খেলার উপর নির্ভর করিয়া এই দল গত দুই বৎসর চ্যাম্পিয়ানসিপ লাভ করিয়াছে, সেই রক্ষণভাগের খেলাই নৈরাশ্যজনক হইয়া পড়িয়াছে। ইহার পরিবর্তন প্রয়োজন—ইহা পরিচালকগণ কেন উপলব্ধি করিতে পারিতেছেন না বুঝি না। ইহারা সমর্থনে হয়তো বলিবেন, "খেলোয়াড় নাই কি করিব।" এই উক্তি সাধারণের মনস্তুষ্টি করিতে পারে; কিন্তু পারিবে না আমাদের। প্রত্যেক দলেরই উচিত প্রত্যেক খেলোয়াড়ের পরিবর্তে একজন করিয়া খেলোয়াড় রিজার্ভ রাখা। প্রয়োজন হইলেই সে স্থান পূরণ করিবে। এই ব্যবস্থা যে দলের নাই সে দল উপযুক্ত পরিচালকমণ্ডলীর দ্বারা পরিচালিত বলা কোনরূপেই চলে না। ইস্টবেঙ্গল দলের চ্যাম্পিয়ান হইবার সম্ভাবনা এখনও বিলুপ্ত হয় নাই। তবে পরিচালকগণ যে রীতি অনুসরণ



করিতেছেন তাহার পরিবর্তন বিশেষ প্রয়োজন। বিশেষ করিয়া আক্রমণভাগের যে সকল খেলোয়াড়কে সম্প্রতি ইঁহারা দলভুক্ত করিয়াছেন তাঁহাদের অনেকেই অচল। পূর্ব খ্যাতি অনুযায়ী ইঁহারা খেলিতে পারিতেছেন না। ইঁহাদের পরিবর্তে লীগ প্রতিযোগিতার সূচনায় যে সকল খেলোয়াড়কে লইয়া দল গঠন করিয়াছিলেন তাঁহাদের খেলাইলে ভালই হইবে।

মহমেডান স্পোর্টিং ক্লাব সম্পর্কে এইটুকু বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে, ঘন ঘন খেলোয়াড় পরিবর্তন রীতি যদি ইঁহারা ত্যাগ না করেন, দল কখনই শেষ পর্যন্ত লীগ চ্যাম্পিয়ান হইতে পারিবে না। লীগ প্রতিযোগিতার সূচনায়

আর দাসের কৃতিত্ব

ভবানীপুর ক্লাবের তরুণ খেলোয়াড় আর দাস প্রথম ডিভিসন লীগ প্রতিযোগিতার প্রথমার্ধের গোলদাতাদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা অধিক গোল করিতে সক্ষম হইয়াছেন। নিম্নে বিশিষ্ট গোলদাতাদের কয়েকজনের নাম প্রদত্ত হইল :—আর দাস (ভবানীপুর) ১১টি গোল, সিকেন্দার (মহমেডান স্পোর্টিং) ৮টি, পাগসলে (ইস্টবেঙ্গল) ৮টি, তাহের (মহমেডান) ৭টি, বি কর (বি এণ্ড এ) ৭টি, সুনীল ঘোষ (ইস্টবেঙ্গল) ৬টি, নিমু বসু (মোহনবাগান) ৬টি, বিজন বসু (মোহনবাগান) ৬টি, মেওয়ালাল (এরিয়ান) ৬টি, জি সাহা (এরিয়ান) ৬টি।



আর দাস

হয়তো এইরূপ নীতি অনুসরণে বিশেষ ক্ষতি হইত না; কিন্তু বর্তমানে ইহা অচল।

আন্তঃপ্রাদেশিক ফুটবল প্রতিযোগিতায় বাঙলা দল যোগদান করিবে, এই প্রস্তাব ফুটবল পরিচালকগণ করিয়াছেন। কিন্তু বাঙলার দল শক্তিশালী করিয়া গঠন করিবার কি ব্যবস্থা করিতেছেন তাহার কোন নিদর্শনই দেখিতে পাওয়া যাইতেছে না। এই প্রতিযোগিতায় সম্পূর্ণ বাঙালী খেলোয়াড়গণ দ্বারা গঠিত একটি দল প্রেরণ করিতে দেখিলে আমরা অন্ততঃপক্ষে বিশেষ আনন্দিত হইব। এইরূপ দল গঠন করা বর্তমানে হয়তো সম্ভব নাও হইতে পারে, ভবিষ্যতে যে হইতে পারে ইহা আমরা জোর করিয়াই বলিতে পারি। এইজন্য প্রয়োজন প্রত্যেক দলের উৎসাহী তরুণ খেলোয়াড়দের একত্র করিয়া খ্যাতনামা খেলোয়াড় দ্বারা গঠিত দলের বিরুদ্ধে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় অবতীর্ণ করা। ইহাতে কেবল যে উৎসাহী খেলোয়াড়দের কৃতিত্ব প্রদর্শনের সুযোগ দেওয়া হইবে তাহা নহে, ভবিষ্যতের দলে কোন কোন খেলোয়াড়ের সাহায্য পাওয়া যাইবে জানিবার সুবিধা হইবে। এই প্রসঙ্গে একটি দলের খেলোয়াড়গণের নাম নিম্নে প্রদত্ত হইল—যাহাদের এখন হইতে মাঝে মাঝে একত্র করিয়া যদি বিভিন্ন দলের বিরুদ্ধে খেলিবার সুযোগ দেওয়া হয়, আমরা দৃঢ়তার সহিতই বলিতে পারি একটি বিশেষ শক্তিশালী বাঙালী দল গঠন করিতে কোনরূপ অসুবিধা হইবে না। এমন কি এই দলটি বিশিষ্ট খেলোয়াড়গণ দ্বারা গঠিত দলের বিরুদ্ধে খেলিয়া নৈরাশ্যজনক ফল প্রদর্শন করিবে না। পরীক্ষামূলক হিসাবে যদি একটি খেলার ব্যবস্থা করা হয় দেখা যাইবে আমাদের উক্তির মধ্যে কতখানি সত্যতা আছে। নিম্নে খেলোয়াড়গণের নাম প্রদত্ত হইল :—গোলরক্ষক—পি মুস্তফি (কালীঘাট ক্লাব), ব্যাকদ্বয়—এ নাথ (এরিয়ান্স) ও ডি পাল (ভবানীপুর), হাফ ব্যাকত্রয়—সত্য মুখার্জি (মোহনবাগান), এ ঘোষ (স্পোর্টিং ইউনিয়ন) ও ডি চন্দ্র (ইস্টবেঙ্গল ক্লাব), আলাউদ্দিন (বি এণ্ড এ রেল), এস ভট্টাচার্য (ইস্টবেঙ্গল), আর সিং (মোহনবাগান), এ ব্যানার্জি (কালীঘাট) ও আর দাস (ভবানীপুর)।

লীগ প্রতিযোগিতার সূচনায় খেলা পরিচালনায় রেফারী সমস্যা তীব্রভাবে অনুভূত হইয়াছিল; কিন্তু প্রতিযোগিতার মধ্যভাগে ইহা বিদূরিত হইলে আমরা আশা করিয়াছিলাম ভবিষ্যতে খেলা পরিচালনার ত্রুটি-বিচ্যুতি বিশেষ পরিলক্ষিত হইবে না। কিন্তু বর্তমানে অতি দুঃখের সহিত বলিতে হইতেছে আমাদের আশা নিরাশায় পরিণত হইয়াছে। যে সকল রেফারী দৌড়াইতে অক্ষম, খেলা পরিচালনা করিতে অক্ষম, তাহাদের পুনরায় খেলাইবার অধিকার দেওয়া কেন হইতেছে বোধগম্য হয় না। যে এসোসিয়েশনের সভ্য সংখ্যা প্রায় দেড়শত সেই এসোসিয়েশনে ভাল ১০ জন রেফারী পাওয়া যায় না কেন? প্রতি বৎসরই নূতন নূতন রেফারী পরীক্ষা করিয়া সঙ্ঘভুক্ত করা হইতেছে—সেই সকল রেফারী কোথায়?

বাঙলার মাঠে খেলা পরিচালনা করিবার জন্য বোম্বাই হইতে রেফারী যখন আনাইবার ব্যবস্থা হইতেছে শুনিতে পাই, তখন মনে হয় "কলিকাতা রেফারী এসোসিয়েশনের মধ্যে কি একটিও মানুষ নাই যে ইহার তীব্র প্রতিবাদ করে?"

ব্যাডমিণ্টন

বেঙ্গল ব্যাডমিণ্টন এসোসিয়েশনের পরিচালকগণ বহু পরিশ্রম বহু অর্থ ব্যয় করিয়া রাজা নবকিষণ স্ট্রীটে যে আচ্ছাদিত কোর্ট নির্মাণ করিয়াছিলেন, তাহা সম্প্রতি হস্তচ্যুত হইয়াছে। যে জমির উপর উহা নির্মিত হইয়াছিল সেই জমি বিক্রিত হওয়ায় এই অবস্থার সৃষ্টি হইয়াছে। তবে উৎসাহী ব্যাডমিণ্টন খেলোয়াড়দের ইহাতে হতাশ হইবার কোনই কারণ নাই। এসোসিয়েশনের পরিচালকগণ পুনরায় কলিকাতায় বিশিষ্ট স্থানে আর একটি কোর্ট নির্মাণের ব্যবস্থা করিয়াছেন। এই কোর্ট দুই মাসের মধ্যেই তৈয়ারী হইবে, তখন আর আচ্ছাদিত কোর্টের অভাব থাকিবে না।

দেশী সংবাদ

৫ই জুন—খুলনা জেলা ৭নং শোভনা ইউনিয়নের পাতিবুনির গ্রামের নিতাই মিস্ত্রির ২০।২১ বৎসর বয়স্কা বিধবা পুত্রবধূ বস্ত্রাভাবে লজ্জা নিবারণে অনন্যোপায় হইয়া উদ্বন্ধনে প্রাণত্যাগ করিয়াছে।

৬ই জুন—সোভিয়েট রাশিয়ায় বিজ্ঞান পরিষদের জুবিলী উৎসবে যোগদানার্থ ডাঃ মেঘনাথ সাহার কলিকাতা হইতে মস্কো যাত্রার প্রাক্কালে 'আনন্দবাজার পত্রিকা ও হিন্দুস্থান স্ট্যাণ্ডার্ডের' কর্তৃপক্ষ অফিস-ভবনে ডাঃ সাহাকে এক প্রীতি অনুষ্ঠানে সম্বর্ধিত করেন। ডাঃ সাহা বৃহস্পতিবার বিমানযোগে মস্কো যাত্রা করেন।

সিরিয়া ও লেবাননের সাম্প্রতিক ঘটনাবলীর বিষয়ে মহাত্মা গান্ধীর দৃষ্টি আকর্ষণ করা হইলে গান্ধীজী বলেন, স্বাধীনতা অর্জনের জন্য ফরাসী সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে সিরিয়া ও লেবাননবাসীদের সংগ্রাম সমগ্র ভারতের সহানুভূতির উদ্রেক করিবে এবং উহাকে জাতীয় সমস্যায় পরিণত করিতে হইবে।

ময়মনসিংহ জেলার জামালপুরে দুই হাজার অর্ধনগ্ন নরনারীর এক মিছিল বাহির হয়। পাবনায় বস্ত্রাভাবে ছেঁড়াচট ইত্যাদি ব্যবহার করা হইতেছে। পূর্ণিয়ার জনৈক পুলিশ কনস্টেবল, তাহার নিকট অপর এক কনেস্টবলের হারানো একখানা কাপড় পাওয়া যাইবার দরুণ বন্দুকের গুলীতে আত্মহত্যা করিয়াছে।

একটি সরকারী ইস্তাহারে উড়িষ্যা সরকার জানাইয়াছেন যে, ১৯৪৪ সালের ১৪ই মার্চ রাত্রিতে একটি জাপানী সাবমেরিন পুরীর উপকূলে শত্রুচর বলিয়া বর্ণিত চারি ব্যক্তিকে অবতরণ করাইয়াছিল।

৭ই জুন—বিশ্বাসযোগ্য বে-সরকারী মহলের সংবাদে প্রকাশ, ১৪ই জুন প্রাতঃকালে কংগ্রেস নেতৃবৃন্দকে মুক্তি দেওয়া হইবে।

৮ই জুন—আসাম কংগ্রেসকে আইনানুমোদিত প্রতিষ্ঠান বলিয়া ঘোষণা করা হইয়াছে। আসাম প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটি, জেলা কংগ্রেস কমিটি এবং বিভিন্ন শাখা প্রতিষ্ঠান বে-আইনী ঘোষণা করিয়া যে-সকল আদেশ জারি করা হইয়াছে, আসাম গেজেটের এক ঘোষণা বলে তাহা প্রত্যাহৃত হইয়াছে।

৯ই জুন—বিহার সরকার বহুসংখ্যক উচ্চপদস্থ অফিসারের বিরুদ্ধে আনীত দুর্নীতির অভিযোগ সপ্রমাণের জন্য দুর্নীতি তদন্ত কমিশন গঠন করিয়াছেন। জেলা অফিসারগণ বহু কর্মচারীর বিরুদ্ধে রিপোর্ট দাখিল করিয়াছেন। প্রকাশ, বিভিন্ন সরকারী কর্মচারীর বিরুদ্ধে এইরূপ শতাধিক অভিযোগ আনীত হইয়াছে।

সারণ জেলায় ১লা জানুয়ারী হইতে ২৬শে জুন পর্যন্ত প্লেগে ৭২২ জন মারা গিয়াছে।

১০ই জুন—মহাত্মা গান্ধী পাচগণিতে রাষ্ট্র সেবাদলের প্রায় তিনশত সদস্যের নিকট এক বক্তৃতায় বলেন, ভারত যদি সত্য ও অহিংসার সাহায্যে স্বরাজ লাভ করিতে পারে তাহা হইলে অপর সমস্ত নিপীড়িত জাতির মুক্তি সংগঠন করিতে সমর্থ হইবে।

পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু ও আচার্য নরেন্দ্র দেব ইজ্জৎনগর (বেরিলী) সেন্ট্রাল জেলে আটক ছিলেন। অদ্য তাঁহাদিগকে আলমোড়া ডিস্ট্রিক্ট জেলে স্থানান্তরিত করা হইয়াছে।

১১ই জুন—মিঃ আসফ আলীর স্বাস্থ্যের অবস্থা ভাল যাইতেছে না; তাঁহার রোগ এখনও নির্ণীত হয় নাই। তাঁহার পাকস্থলীতে ফোড়া হইতে পারে বলিয়া সন্দেহ করা হইতেছে।

সাপ্তাহিক সংবাদ

বিদেশী সংবাদ

৫ই জুন—গার্লস গাইড আন্দোলনের প্রতিষ্ঠাত্রী মিস এগ্‌নিস ব্যাডেন পাওয়েল ৮৬ বৎসর বয়সে পরলোকগমন করিয়াছেন।

কোয়াংসি প্রদেশের শাসন কর্তৃপক্ষ চীনা কমিউনিস্ট গেরিলাদের চারজন নেতার প্রাণ-হরণ করিয়াছেন, তন্মধ্যে একজন হইলেন বিখ্যাত জেনারেল চাং ইয়েন।

৬ই জুন— জার্মান রাইখের অস্তিত্ব বিলুপ্ত করিয়া উহাকে চারিটি অঞ্চলে বিভক্ত করা হইয়াছে।

৭ই জুন—ব্রহ্ম রণাঙ্গনের সর্বত্র তুমুল সংগ্রাম চলিতেছে। তিনটি রণাঙ্গনেই জাপানীদের তৎপরতা বৃদ্ধি পাইতেছে।

মস্কোতে জনরব শোনা যাইতেছে যে, সোভিয়েট গভর্নমেণ্টকে জাপানের পক্ষ হইতে সন্ধির প্রস্তাব প্রেরণের অনুরোধ করা হইয়াছে।

৮ই জুন—জাপ নিউজ এজেন্সী সংকটজনক যুদ্ধাবস্থার সম্মুখীন হওয়ার উদ্দেশ্যে জাপ গভর্নমেণ্টের হাতে জরুরী ক্ষমতা অর্পণের দাবী জানাইয়াছে।

জাপানের বোমাবাহী বেলুনগুলি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা ও মেক্সিকোতে হানা দিয়াছে বলিয়া সংবাদ পাওয়া গিয়াছে।

মার্কিন সাংবাদিক লুই ফিশার রুশিয়া সম্পর্কে মতদ্বৈধ হওয়ায় নিউইয়র্কের "নেশন" পত্রিকার সহিত সম্পর্ক ছিন্ন করিয়াছেন।

৮ই জুন—সোভিয়েট সংবাদপত্র 'প্রাভদা' এক প্রবন্ধে বলেন যে, ১৯১৩ সালে মস্কো সম্মেলনে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র পৃথিবীর সমস্ত উপনিবেশকে অল্পকালের মধ্যে মুক্তি দিবার একটি প্ল্যান উপস্থিত করিয়াছিল, কিন্তু ব্রিটেন ঐ প্ল্যানের আলোচনা রুদ্ধ করে। স্পষ্টত ভারতবর্ষের প্রশ্নই সর্বাপেক্ষা উদ্বেগের সৃষ্টি করিয়াছিল।

৯ই জুন—জার্মানীকে বিভক্ত করার সকল পরিকল্পনা মার্শাল স্ট্যালিন অগ্রাহ্য করিয়াছেন।

যুগোশ্লাভিয়া, গ্রেট ব্রিটেন ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে ইস্ট্রিয়, ট্রিয়েস্ত ও আদ্রিয়াটিক উপকূলভাগের অধিকার সম্পর্কে বেলগ্রেডে এক চুক্তি স্বাক্ষরিত হইয়াছে।

মিত্রপক্ষীয় সৈন্যেরা থাজির ৩৬ মাইল পূর্বে অবস্থিত কালাও বন্দর বিনাবাধায় অধিকার করিয়াছে।

টোকিও বেতারের এক বার্তায় প্রকাশ, মিত্র সৈন্যেরা বোর্নিও দ্বীপের নিকটস্থ লাবুয়ান দ্বীপে অবতরণ করিয়াছে।

সম্মিলিত জাতি সম্মেলনে বে-সরকারী ভারতীয় প্রতিনিধি দলের নেত্রী শ্রীযুক্তা বিজয়লক্ষ্মী পণ্ডিত চিকাগো পরিদর্শনের পর অদ্য সানফ্রান্সিস্কোতে প্রত্যাবর্তন করিয়াছেন। শ্রীযুক্তা পণ্ডিত বলেন, চিকাগোর সভা শেষে মহিলারা ভারতের স্বাধীনতার সহায়তাকল্পে নিজেদের অলঙ্কারপত্র বেদীর উপর নিক্ষেপ করেন।

১০ই জুন—লণ্ডনে প্রকাশ, আগামী বুধ অথবা বৃহস্পতিবারের মধ্যে ভারত সম্পর্কে ব্রিটিশ নীতি ঘোষণা করা হইবে।

১১ই জুন—রয়টারের রাজনৈতিক সংবাদদাতা ফ্রেজার উইটন জানাইতেছেন: ব্রিটিশ গভর্নমেণ্টের দীর্ঘ প্রত্যাশিত ভারত-নীতি সম্পর্কিত ঘোষণা শ্বেতপত্রের আকারে পার্লামেণ্টের নিকটে পেশ করা হইবে। ভারতসচিব মিঃ আমেরী অবিলম্বে কমন্স সভায় একটি বিবৃতি দিবেন এবং ভারতে লর্ড ওয়াভেল উহা বেতারযোগে প্রচার করিবেন।

"চিকাগো ডিফেণ্ডারের" প্রতিনিধি মহাত্মা গান্ধীর সহিত সাক্ষাৎ করিলে গান্ধীজী আমেরিকার নিগ্রো সমস্যার প্রতি গভীর সহানুভূতি প্রকাশ করিয়া যে বাণী দিয়াছিলেন, প্রতিনিধি উহা প্রকাশ করিয়াছেন। উক্ত বাণীতে গান্ধীজী বলিয়াছিলেন যে, অধিকারহারা জাতিসমূহের পক্ষে অহিংসাই প্রধান অস্ত্র।

অস্ট্রেলিয়ান সেনেরা ব্রিটিশ উত্তর বোর্নিওতে অবতরণ করিয়াছে।

প্যারিস বেতারে বলা হইয়াছে যে, শনিবার রাত্রে স্পেনীয় সীমান্তে ফরাসী কর্তৃপক্ষের নিকট মঃ লাভাল আত্মসমর্পণ করিয়াছেন।

অস্ট্রিয়ায় মার্কিন ৭ম আর্মির সহিত অবস্থিত সংবাদদাতা জানাইতেছেন যে, সালসবুর্গ অস্ত্রাগারে পচা কাষ্ঠকে মাংসের মত একপ্রকার খাদ্যদ্রব্যে পরিণত করা হইতেছে। খাদ্যপ্রাণ ও ভিটামিনের দিক দিয়া উহা নাকি কোন কোন শ্রেণীর মাংস হইতেও সারবান। বিখ্যাত জার্মান বৈজ্ঞানিক ডাঃ ফ্রাইডরিক এই আবিষ্কারটি করিয়াছেন।

দেশ

সম্পাদক ঃ শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র সেন | সহকারী সম্পাদক ঃ শ্রীসাগরময় ঘোষ

১২ বর্ষ। শনিবার ৯ই আষাঢ়, ১৩৫২ সাল। Saturday, 23rd June 1945. [৩৩শ সংখ্যা

সাময়িক প্রসঙ্গ

সিমলার বৈঠক

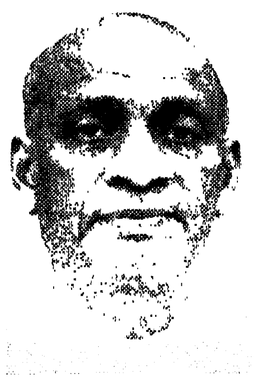
লর্ড ওয়াভেলের প্রস্তাবের ফলে কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির সদস্যগণ মুক্তিলাভ করিয়াছেন। ভারতের স্বাধীনতা-সংগ্রামের যোদ্ধপুরুষগণের দীর্ঘ কারাবাসের পর এই মুক্তিলাভ আমাদের পক্ষে আনন্দের বিষয় সন্দেহ নাই। আমরা তাঁহাদিগকে আমাদের সশ্রদ্ধ অভিবাদন জ্ঞাপন করিতেছি। বহুদিন পর রাষ্ট্রপতি মৌলানা আজাদকে আমরা এই বাঙলাদেশে আবার নিজেদের ভিতরে পাইয়াছি, ইহা আমাদের পক্ষে একান্তই আনন্দের বিষয়; কিন্তু বন্দী নেতাদের এই কারামুক্তি যে আমাদের প্রকৃত সমস্যা সমাধানের পক্ষে যথেষ্ট নয়, এই প্রসঙ্গে আমরা সে সত্যও বিস্মৃত হইতে পারিতেছি না। কারণ ভারতবর্ষ যতদিন পর্যন্ত স্বাধীনতা লাভ না করিবে, ততদিন পর্যন্ত স্বাধীনতার জন্য সংগ্রাম চলিবেই এবং স্বেচ্ছাচারী শাসক শক্তির রোষ-বজ্র জনমতকে পিষ্ট করিবার উদ্দেশ্যে নির্মমরূপেই সমুদ্যত থাকিবে; সুতরাং পরাধীনতা বিদ্যমান থাকিতে এই ধরণের ধরা-ছাড়ার মূল্য বিশেষ কিছু নাই এবং নেতাদিগকে বিনা-বিচারে কারারুদ্ধ করিবার পর এই ভাবে তাঁহাদিগকে মুক্তি দেওয়াতে কর্তৃপক্ষের উদারতারও কিছু পরিচয় পাওয়া যায় না। ভারতের বুক হইতে স্বৈরাচারী বৈদেশিক প্রভুত্বকে আমরা চিরদিনের জন্য উৎখাত করিতে চাই এবং তদ্ব্যতীত অন্য কিছুতেই আমরা নিশ্চিন্ত হইতে পারি না। আমাদের সেই লক্ষ্যই মুখ্য এবং সেই মুখ্য লক্ষ্য সাধনে লর্ড ওয়াভেলের প্রস্তাব কতটা সাহায্য করিবে ইহাই প্রশ্ন। এই প্রশ্নের বিচারের ভার কংগ্রেসের উপর রহিয়াছে। কারণ ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে কংগ্রেসই ভারতের সকল সম্প্রদায়ের প্রতিনিধি-স্থানীয় একমাত্র প্রতিষ্ঠান। দেখা যাইতেছে, যে কারণেই হউক, কর্তৃপক্ষ সোজাসুজি সর্বজনস্বীকৃত এই সত্যকে এতদিন উপেক্ষা করিয়াও আজ বাস্তব অবস্থার চাপে তাহা করিয়া উঠিতে পারেন নাই। কংগ্রেসের সঙ্গে বোঝাপড়া ব্যতীত ভারতীয় সমস্যার যে সমাধান হইবে না, তাঁহারা ইহা উপলব্ধি



করিয়াছেন। অনুমান করিতে কষ্ট হয় না যে, প্রধানত এই কারণেই ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষ মীমাংসার প্রস্তাব ঘোষণার সঙ্গে সঙ্গে কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির সদস্যগণকে মুক্তি দিয়াছেন এবং কংগ্রেস প্রতিষ্ঠানের উপর হইতে নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করিয়াছেন। কিন্তু ইহাই যথেষ্ট নয়, কংগ্রেসের রাষ্ট্র-নীতিক মর্যাদা তাঁহাদিগকে সর্বতোভাবে স্বীকার করিয়া লইতে হইবে। আমরা দেখিয়া সুখী হইলাম, লর্ড ওয়াভেলের প্রস্তাবে এই দিক হইতে প্রথমত যে ভুল করা হইয়াছিল, জনমতের চাপে পড়িয়া পরে তাহার সংশোধন করিতে হইয়াছে এবং কংগ্রেস-প্রেসিডেণ্ট মৌলানা আজাদকে সিমলার বৈঠকে আমন্ত্রণ করা হইয়াছে। আশা করি, কংগ্রেসকে বর্ণ-হিন্দুদের প্রতিষ্ঠানরূপে ব্যাখ্যা করিবার কূট-কৌশল যেসব সাম্রাজ্যবাদীদের মাথায় খেলিতেছিল, অতঃপর তাঁহারা নিরস্ত হইবেন এবং বর্ণহিন্দু ও মুসলমানদের মধ্যে সমতা বজায় রাখিবার নামে নিজেদের দুরভিসন্ধি পূর্ণ করিবার মূঢ়তা তাঁহারা সম্যকরূপে পরিত্যাগ করিবেন। আমাদের মনে হয়, এই ব্যাপারে মিঃ জিন্নাকে লইয়া সংকট সৃষ্টি হইতে পারে। কংগ্রেস মুসলমান সম্প্রদায়েরও প্রতিনিধিত্ব করিবার যোগ্যতা রাখে, এমন কথা শুনিলেই তিনি হয়ত অভিমানভরে বাঁকিয়া বসিবেন। কিন্তু মিঃ জিন্নার তেমন আবদারকে আমল দিতে গেলে ভারতের রাষ্ট্রীয় সমস্যার সমাধান করা কঠিন হইয়া পড়িবে; ব্রিটিশ গভর্নমেণ্ট ভারতের সমস্যার সমাধান করিতে যদি সত্যই ইচ্ছুক হইয়া থাকেন, তবে কংগ্রেসই যে ভারতের হিন্দু, মুসলমান, খৃষ্টান ও অন্যান্য সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিস্থানীয় প্রতিষ্ঠান মুখ্যত ইহা তাঁহাদিগকে স্বীকার করিয়া লইতে হইবে এবং ধর্ম বা সাম্প্রদায়িকতার সমস্যাকে এ ক্ষেত্রে টানিয়া আনিবার সংস্কারবদ্ধ দুর্বুদ্ধি তাঁহাদিগকে পরিত্যাগ করিতে হইবে। ২১শে জুন বোম্বাইতে আহূত কংগ্রেসের ওয়ার্কিং কমিটির এতৎসম্পর্কিত সিদ্ধান্তকে কর্তৃপক্ষ কতটা স্বীকার করিয়া লন, ইহাই দ্রষ্টব্য।

জাতীয়তা বনাম সাম্প্রদায়িকতা

সাম্রাজ্যবাদীর দল পাকে-প্রকারে সাম্প্রদায়িকতাকে জিয়াইয়া রাখিতে এখনও চেষ্টা করিবেন আমরা ইহা বুঝি; কিন্তু সে পথে ভারতের রাষ্ট্রীয় সমস্যার সমাধান হইবে না একমাত্র রাজনীতিক ভাবেই তাহার সমাধান করিতে হইবে। সর্দার বল্লভভাই প্যাটেল এই সম্বন্ধে ব্রিটিশ গভর্নমেণ্টকে সতর্ক করিয়া দিয়াছেন দেখিয়া আমরা সুখী হইলাম। কংগ্রেস বর্ণ-হিন্দুদের প্রতিষ্ঠান—এই ধারণা জাকাইয়া তুলিবার চেষ্টা এখনও হইতেছে, পাকিস্থানী দলের সুরে সুর মিলাইয়া যাঁহারা উহাতে সায় দিতেছেন, আমরা বলি এখনও তাঁহাদের জ্ঞানচক্ষু উন্মীলিত হউক; কারণ পাকিস্থানী দল ব্রিটিশের কায়েমী স্বার্থকে পেলা দিয়া রাখিয়া



উঠিতে পারিবে না। মুষ্টিমেয় সেই সংকীর্ণচেতা স্বার্থসেবীদের এমন শক্তি নাই যে, স্বাধীনতার উদগ্র আগ্রহে জাগ্রত ভারতের জনমতকে তাহারা দমন করিয়া রাখিতে পারে। সাম্রাজ্যবাদীদের পশুবল-সহায়েও তেমন চেষ্টা ব্যর্থ হইবে। মধ্য-যুগীয় ধর্মান্ধ সংকীর্ণতা বর্তমান যুগের প্রগতি প্রবাহে টিকিতে পারে না। কংগ্রেস স্বাধীনতাকামী প্রগতিশীল জনমতেরই প্রতিনিধিত্ব করিয়া আসিতেছে। এ পর্যন্ত বহু মুসলমান কংগ্রেসের সভাপতির পদ অলংকৃত করিয়াছেন, পাশী, খৃষ্টান—ইঁহারাও সে সম্মানে বঞ্চিত হন নাই। কংগ্রেসের বর্তমান প্রেসিডেণ্ট আন্তর্জাতিক জগতে খ্যাতিসম্পন্ন বিদ্বজ্জন সমাজে বরেণ্য একজন মুসলমান; ইহা ছাড়া, উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ, আসাম, পাঞ্জাব, বেলুচিস্থান প্রভৃতি প্রদেশের কংগ্রেস কমিটিসমূহের সভাপতিরাও মুসলমান। কংগ্রেসের ওয়ার্কিং কমিটিতে বরাবরই ভারতের জনমান্য বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ প্রতিনিধিত্ব করিয়াছেন এবং বর্তমান কমিটিতে রাষ্ট্রপতি আজাদ ছাড়া অপর তিনজন মুসলমান সদস্য রহিয়াছেন। ভারতীয় মুসলিম সংস্কৃতিতে উঁহাদের কাহারও অবদান সামান্য নহে। সুতরাং ভারতের রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতাই কংগ্রেসের মুখ্য নীতি, সে ক্ষেত্রে ধর্ম বা সাম্প্রদায়িকতার কোন প্রশ্নই উঠে না। সাম্প্রদায়িক সমস্যার ধোঁকা দিয়া সাম্রাজ্যবাদীরা বহুদিন নিজেদের স্বার্থ বাগাইয়া লইয়াছেন। বর্তমানে বাস্তব রাজনীতিক স্বার্থ-সংঘাতের কথা বিবেচনা করিয়া তাঁহাদের সে দুরভিসন্ধি পরিত্যাগ করা উচিত, নতুবা সমগ্র ভারতের জনমত তাঁহাদিগকে বিপন্ন করিয়া তুলিবে। মিথ্যার কারবার দীর্ঘদিন চলে না, একদিন কঠোর সত্যের আঘাত নির্মম ভাবে মিথ্যাকে বিচূর্ণ করে। ভারতবর্ষ দীর্ঘদিন হইল পরাধীন। হীন স্বার্থের ক্লেদপঙ্ক ভারতের জাতীয় জীবনকে বহুদিন অবসন্ন করিয়া রাখিয়াছে, এবং স্বাধীনতার বলিষ্ঠ বেদনার জাগরণে বাধা দিয়াছে; কিন্তু ভারতের আত্মদাতা সন্তানগণ, বিশেষভাবে বাঙলার সাধক দলের রুদ্র এবং ভৈরব সাধনা আজ স্বাধীনতার যে প্রেরণা জাগাইয়া তুলিয়াছে, ক্ষুদ্রচেতা অমানুষ দলের অনুদার আস্ফালন তাহাকে কিছুতেই নির্বাপিত করিতে সমর্থ হইবে না। আগুন জ্বলিয়াছে এবং সদ্য কারামুক্ত বহ্নিপুরোগামী সাগ্নিক দলকেই সিমলার দরবারে সসম্মানে গ্রহণ করিতে হইবে; সে ক্ষেত্রে বর্ণ বা সম্প্রদায়ের কোন বিচার স্বাধীনতাকামী ভারত স্বীকার করিয়া লইবে না।

কাপড় কোথায়?

বাঙলার সর্বত্র বস্ত্রের সমস্যা। কাপড়ের জন্য কোন কোন স্থান হইতে লুঠ-তরাজেরও সংবাদ আসিতেছে। অথচ বর্তমান মাসের ১০ই তারিখ হইতে কর্তারা মফঃস্বলে বস্ত্র প্রেরণ বন্ধ করিয়া দিয়াছেন। মফঃস্বলে কাপড়ের দুঃখ ঘুচিয়াছে, ইহাই বোধ হয় তাঁহাদের বিশ্বাস। আশ্চর্যের বিষয় কিছু নয়। এদিকে কলিকাতা শহরে বস্ত্রের পুরাদস্তুর রেশনিং কবে আরম্ভ হইবে, এপর্যন্ত কর্তারা সে সম্বন্ধে কোন কথা দিতে পারিতেছেন না। সম্প্রতি একটি সরকারী বিজ্ঞপ্তিতে বলা হইয়াছে যে, অস্থায়ী রেশনিংয়ের ত্রুটি দূর করা হইবে এবং এই ব্যবস্থায় বস্ত্র-বণ্টন যথাসম্ভব ত্বরান্বিত করা হইবে। কিন্তু সেই সঙ্গে একথাও জানানো হইয়াছে যে, প্রতি সপ্তাহে ৫ শত গাঁইটের বেশি কাপড় এতদুদ্দেশ্যে দেওয়া যাইবে না; যদি তাহা না হয়, তবে বণ্টন কার্য ত্বরান্বিত হইবে কেমন করিয়া বোঝা যায় না। কর্তারা কাপড় দিবেন না, অথচ কাপড়ের বণ্টন ব্যবস্থার উন্নতি ঘটিবে, যুক্তি খুবই চমৎকার। হিন্দু বিধবাদের জন্য থানের ধুতি চাওয়া হইয়াছে; কর্তৃপক্ষ জবাব দিয়াছেন যে, থান ধুতির একান্তই অভাব; মাত্র ৬৫ গাঁইট থান ধুতির সংস্থান আছে। তাঁহারা মার্কিন কাপড়ের দ্বারা থান ধুতির অভাব পূরণের উপদেশ দিয়াছেন। কিন্তু সেই মার্কিন কাপড়ই বা কোথায়, সে সম্বন্ধেও কোন ভরসা আমরা পাই নাই। আমরা দেখিতেছি জনসাধারণের বস্ত্রের অভাব যতই প্রবল হইতেছে, সরকারী কর্মচারীরা বিজ্ঞপ্তির উপর বিজ্ঞপ্তি প্রকাশে তাঁহাদের অবলম্বিত ব্যবস্থার মাহাত্ম্য প্রচারে ততই উৎসাহিত হইয়া উঠিতেছেন; কিন্তু জনসাধারণ এতদ্দ্বারা কতটা কৃতার্থ হইতে পারে? যদি এ বিষয়ে তাঁহারা বিবেচনা করিতেন, তবে নিজেদের এমন ফাঁকা মাহাত্ম্য কীর্তনে তাঁহারা লজ্জাবোধ করিতেন।

বড়লাটের 'ভিটোর' মাহাত্ম্য

প্রস্তাবিত ওয়াভেল পরিকল্পনায় শাসন-পরিষদের সদস্যদের সিদ্ধান্তের উপর বড়লাটের 'ভিটোর' ক্ষমতা সমান ভাবেই থাকিবে। সম্প্রতি ভারত সচিব মিঃ আমেরী বিলাতে সাংবাদিকদের এক সভায় বড়লাটের হাতে এই ক্ষমতা রাখিবার তাৎপর্যের ব্যাখ্যা করিয়াছেন। তিনি বলেন, যদি কখনও তেমন প্রয়োজন উপস্থিত হয়, তবে শুধু সেই ক্ষেত্রেই বড়লাট ঐ ক্ষমতা প্রয়োগ করিবেন এবং ভারতের স্বার্থের জন্যই সেই ক্ষমতা প্রয়োগ করিতে হইবে, ব্রিটেনের স্বার্থের জন্য নয়। ভারত সচিবের এই উক্তি হইতে তবে কি ইহাই বুঝিতে হইবে যে, বড়লাট এতদিন পর্যন্ত যেসব ক্ষেত্রে 'ভিটোর' ক্ষমতা প্রয়োগ করিয়াছেন, ব্রিটেনের স্বার্থের জন্যই তাহা প্রয়োগ করা হইয়াছে এবং এখন হইতেই বড়লাটের এই রীতি বা নীতির পরিবর্তন ঘটিবে? মিঃ আমেরী এমন কথা নিশ্চয় বলিতে চাহিবেন না। সুতরাং তাঁহার যুক্তির অর্থ এই যে, নিজেদের দেশের স্বার্থ সম্বন্ধে বিবেচনা-বুদ্ধি ভারতবাসীদের এখনও হয় নাই; এবং সাত সমুদ্র তের নদীর পার হইতে আসিয়া একজন বিদেশীই সে বিবেচনা করিবার অধিকার রাখে। এই শ্রেণীর ধাপ্পাবাজীর দ্বারা একটা জাগ্রত জাতিকে কতদিন প্রবঞ্চনা করিবেন বলিয়া চার্চিল-আমেরীর দল আশা রাখেন, আমরা তাঁহাদিগকে এই প্রশ্নই করিতে চাই।



বাকুড়ায় কারমাইকেল অব্যবহিত পর সাংবাদিকদের সহিত আলোচনারত রাষ্ট্রপতি আজাদ



হাওড়া স্টেশনে কংগ্রেস সভাপতি মৌলানা আবুল কালাম আজাদকে দেশবাসীর বিপুল সম্বর্ধনা জ্ঞাপন : গোল চিহ্নিত স্থানে মৌলানা আজাদকে দেখা যাইতেছে।

দেশের কথা

বড়লাটের প্রস্তাব জানা গিয়াছে। আগামী ২৫শে জুন সিমলায় নেতাদের সম্মেলন বসিবে। এই সম্মেলনে আহূত ব্যক্তিদের নামের তালিকা দেখিয়া একটা কথা আমাদের মনে হইতেছে। সে কথাটা এই যে, বাঙলা কোথায়? অথচ ভারতের রাষ্ট্রীয় আন্দোলনে বাঙলার আত্মদান সব চেয়ে বেশী। 'হিন্দুস্থান স্ট্যাণ্ডার্ড' সত্যই লিখিয়াছেন,—

ভারতের প্রধান প্রধান প্রদেশগুলির মধ্যে ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়া সর্বপ্রথমে বাঙলাদেশেই দেখা দেয়। রাষ্ট্রীয় জাগরণে বাঙলা আগাগোড়াই নেতৃত্বের আসন অধিকার করিয়াছে; প্রকৃতপক্ষে ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলন এই প্রদেশেরই সৃষ্টি। ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের ইতিহাস যেদিন লিখিত হইবে, সেদিন স্বদেশপ্রেমের সাধনায় দুঃখ-কষ্ট বরণে বাঙলার সন্তানদের স্মৃতি সমুজ্জ্বল হইয়া উঠিবে। গভর্নমেণ্ট এক্ষেত্রে উদাসীন থাকেন নাই। রাষ্ট্রীয় জাগরণের পর হইতে বাঙলার উপর পীড়ন অবিরত চলিয়াছে।

এইসব পীড়নের আঘাতে বাঙলার রাজনীতিক জীবন আজ অবসন্ন হইয়া পড়িয়াছে এবং চারিদিকে দুর্নীতি মাথা তুলিয়া দাঁড়াইয়াছে। কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির নেতৃবৃন্দ মুক্তিলাভ করিয়াছেন; কিন্তু শুধু ইহাতেই কংগ্রেস সম্পর্কে বাঙলার অবস্থার বিশেষ কোন পরিবর্তন ঘটিবে না। এ সম্বন্ধে 'হিন্দুস্থান স্ট্যাণ্ডার্ড' সম্প্রতি যে মন্তব্য করিয়াছেন, আমরা তাহা সম্পূর্ণ সমর্থন করি। সহযোগী বলেন,—

কংগ্রেস সম্ভবত সত্বরই বিধিবিহিত প্রতিষ্ঠান বলিয়া গণ্য হইবে এবং ভারতের রাজনীতিক জীবন গঠনের সম্বন্ধে সিদ্ধান্ত নির্দেশে আমন্ত্রিত হইবে। বাঙলা কি পিছনে পড়িয়া থাকিবে? বাঙলার রাজনীতিক জীবনে বর্তমানে যে অরাজকতা চলিতেছে, তাহাতে হিন্দু কিংবা মুসলমান কেহই লাভবান নহেন, এই অবস্থার প্রতিকার সাধনের জন্য আমরা কি বর্তমানের সুযোগ গ্রহণ করিব না? অন্নাভাব, বস্ত্রের দুর্ভিক্ষ, দেশব্যাপী দুর্নীতি—কংগ্রেসের শক্তি বাঙলা দেশে প্রতিষ্ঠিত না হইলে এসব কোন সমস্যারই স্থায়ী সমাধান সম্ভব হইবে না। শ্রীযুত শরৎচন্দ্র বসুর ন্যায় নেতাদের মুক্তিই এক্ষেত্রে কার্যকর প্রভাব বিস্তার করিতে পারে; সুতরাং অবিলম্বে তাহা একান্তই প্রয়োজন।

বড়লাট রাজনীতিক বন্দীদের মুক্তির ভার কেন্দ্রে এবং প্রদেশে নূতন যে গভর্নমেণ্ট গঠন করা হইবে, তাঁহাদের উপর ছাড়িয়া দিয়াছেন; এই ব্যবস্থায় ব্রিটিশ গভর্নমেণ্টের নীতির দিক হইতে যুক্তি যাহাই থাকুক, বাঙলার আত্মদাতা সন্তানদের ত্যাগের মর্যাদা এতদ্দ্বারা স্বীকৃত হয় নাই এবং বাঙলা যে বলিষ্ঠ জাতীয় আন্দোলনের উদ্বোধন করিয়াছে, তাহার সে অবদানের গুরুত্ব উদারতার সঙ্গে গৃহীত হয় নাই। বাঙলার বহু সংখ্যক বীর সন্তান সুদীর্ঘকাল কারাগারে অবরুদ্ধ আছেন। তাঁহাদের যাবজ্জীবন কারাদণ্ডের মেয়াদ শেষ হইয়া গেলেও অনেককে এখনও মুক্তিদান করা হয় নাই। ইঁহাদিগকে নির্বিচারে মুক্তিদান করিয়া সোজাসুজি ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের মর্যাদা স্বীকার করিয়া লইলে ভারতীয় সমস্যা সমাধানের পথ সমধিক উন্মুক্ত হইত এবং ব্রিটিশের আন্তরিকতারও পরিচয় পাওয়া যাইত। শরৎচন্দ্র বসুর ন্যায় জননায়ক অবরুদ্ধ থাকিতে বাঙলার জাতীয়বাদী সন্তানদলের অকুণ্ঠ অভিমত অভিব্যক্তির পথ রুদ্ধ



রহিল। ইহার ফলে বাঙলার সর্বসাধারণ লর্ড ওয়াভেলের ঘোষণায় অনুপ্রেরণা লাভ করিবে না। কারণ, নেতৃসম্মেলনে শাসনতান্ত্রিক আইনঘটিত তর্ক একটা জাতির অন্তরকে বৃহত্তর আদর্শে সাধনার শক্তি জাগাইয়া তুলিতে পারে না। অথচ দেশের রাষ্ট্রীয় জাগরণে ব্যক্তির চেষ্টার চেয়ে জনমতের এই শক্তিকে জাগাইয়া তোলাই প্রথমে প্রয়োজন। ব্রিটিশ জাতির ইতিহাস আলোচনা করিলেও দেখা যাইবে, অস্ট্রেলিয়া এবং আয়র্লণ্ডের ক্ষেত্রে তাঁহারা এই আদর্শকে মুখ্যভাবে মানিয়া লইতে বাধ্য হইয়াছিলেন; কিন্তু ভারতের ক্ষেত্রে তাহার অন্যথাচরণ দেখা যাইতেছে। যাঁহারা স্বাধীনতার সেবায় আত্মোৎসর্গ করিয়াছেন, জাতিকে আগাইয়া দিয়াছেন, তাঁহাদিগকে এক্ষেত্রে উপেক্ষা করা হইয়াছে। কিন্তু সমস্যা সত্যকারভাবে সমাধান করিতে হইলে ইহা প্রকৃত পথ নহে। ভারত সচিব মিঃ আমেরী প্রত্যক্ষভাবে না হইলেও পরোক্ষভাবে সে সত্য স্বীকার করিয়া লইয়াছেন। পার্লামেণ্টে ভারত সম্বন্ধীয় শেষ বিতর্কে আর্ল উইণ্টারটনের প্রশ্নের উত্তরে তিনি বলেন,—

বড়লাটের শাসন পরিষদে বর্তমানে যেসব ভারতীয় সদস্য আছেন, ভারতের রাজনীতিক জীবনে তাঁহাদের সকলেরই বিশেষ উল্লেখযোগ্য অবদান রহিয়াছে। বড়লাট তাঁহাদিগকে সহকর্মী-স্বরূপে গ্রহণ করিতে আমন্ত্রণ করিলে তাঁহারা স্বদেশপ্রেমিক এবং বাস্তববাদীস্বরূপে এই বিবেচনা করিয়া সে আমন্ত্রণ স্বীকার করেন যে, শাসন ব্যাপারে দায়িত্ব বর্জন না করিয়া দায়িত্ব গ্রহণের দ্বারাই তাঁহারা দেশের সমধিক সেবা করিতে পারিবেন। তাঁহারা সুন্দর ভাবে ভারতের সেবা করিয়াছেন এবং তাঁহাদের অবদান একদিন সমধিকভাবে স্বীকৃত হইবে। কিন্তু দুঃখের বিষয়, তাঁহাদের পশ্চাতে ভারতের প্রধান প্রধান সুগঠিত রাজনীতিক প্রতিষ্ঠানের সমর্থন নাই। ইহাতে তাঁহারা জোর পান নাই। সদস্যেরা নিজেরাই তাঁহাদের এই অসুবিধার কথা সর্বপ্রথমে স্বীকার করিবেন। ইহা ছাড়া, আইন সভাসমূহে এবং সংবাদপত্র সমাজেও গঠনমূলক কার্য চালাইতে হইলে যে পরিমাণ সমর্থন এবং সহযোগিতা লাভ করা দরকার তাঁহারা তাহা পান নাই।

রাজনৈতিক বন্দীদের মুক্তি

শ্রীযুক্তা বিজয়লক্ষ্মী পণ্ডিত লর্ড ওয়াভেলের প্রস্তাব সম্বন্ধে বিশেষ কোন অভিমত প্রকাশ করেন নাই; তবে দেখিতেছি, রাজনীতিক বন্দীদের মুক্তির প্রশ্নটি তাঁহার মনে বড় হইয়া দেখা দিয়াছে। তিনি বলেন, রাষ্ট্রীয় নেতাদের মুক্তির কথা শুনিয়া আমি আনন্দিত হইলাম; কিন্তু ভারতে ইংরেজের জেলে এখনও সহস্র সহস্র রাজনীতিক বন্দী অবরুদ্ধ আছেন, অবিলম্বে তাঁহাদিগকে মুক্তি দেওয়া কর্তব্য। শ্রীযুত সন্তোষকুমার বসুও এ বিষয়টি স্মরণ করাইয়া দিয়াছেন। কংগ্রেস নেতৃবৃন্দের মুক্তির সম্বন্ধে মন্তব্য প্রকাশ করিতে গিয়া তিনি বলেন,—

বড়লাটের কথায় ইহাই বোঝা যায় যে, ১৯৪২ সালের আগস্ট হাঙ্গামার পর যাঁহারা বন্দী হইয়াছেন, তাঁহাদের মুক্তি সম্বন্ধে বিবেচনা করিবার ভার নবগঠিত শাসন পরিষদ এবং প্রাদেশিক গভর্নমেণ্টসমূহের উপর থাকিবে। ঐ হাঙ্গামার পূর্বে যাহারা বন্দী হইয়াছেন, সে সব রাজনীতিক বন্দীর সম্বন্ধে বড়লাটের বক্তৃতায় কিছুই পাওয়া যায় না। আমরা শুধু ইহাই আশা করিতে পারি যে, অন্যান্য রাজনীতিক বন্দীকে সম্মেলনের অধিবেশন আরম্ভ হইবার পূর্বেই মুক্তিদান করা হইবে। শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র বসু কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির একজন ভূতপূর্ব সদস্য। যদি তাঁহাকে এবং বাঙলার অন্যান্য বিশিষ্ট স্বদেশ-প্রেমিক রাজনীতিক বন্দীকে মুক্তিদান না করা হয়, তবে ব্যাপার অত্যন্ত মর্মান্তিক হইয়া উঠিবে।

ডাক্তার শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় মহাশয় এ সম্বন্ধে যে মন্তব্য করিয়াছেন, তাহা সর্বাধিক তীব্র এবং ওজস্বিতাপূর্ণ। তিনি বলেন,—

ওয়ার্কিং কমিটির সদস্যগণ মুক্তিলাভ করিয়াছেন। কিন্তু অপর সহস্র সহস্র রাজনীতিক বন্দীকে আটক অবস্থায় হাতে রাখা হইতেছে এবং বর্তমান গভর্নমেণ্ট তাঁহাদের মুক্তি সম্বন্ধে কোন বিবেচনা করিলেন না। আমরা সকলের মুক্তি দাবী করি। ১৯৪২ সালের পূর্বে যাঁহারা কারারুদ্ধ হইয়াছেন, তাঁহাদিগকেও মুক্তি দিতে হইবে। শ্রীযুত শরৎচন্দ্র বসুর ন্যায় বিশিষ্ট নেতাদের মুক্তি দাবী করিতেছি। গভর্নমেণ্ট ইঁহাদিগকে প্রকাশ্য আদালতে বিচারার্থ উপস্থিত করিতে সাহসী হন নাই এবং বিনা বিচারে ইঁহাদিগকে বন্দী করিয়া রাখা হইয়াছে।

মাদ্রাজী রাজনীতির স্বভাবই এই যে, তাহা চরম গরম হইতে একেবারে পরম নরমে নামিয়া পড়ে; ইহার উপর শ্রীযুত শ্রীনিবাস শাস্ত্রী মহাশয় আবার বরাবরই একটু নরম। কিন্তু দেখিতেছি, তিনিও রাজনীতিক বন্দীদের মুক্তির এই প্রশ্নটি বিস্মৃত হইতে পারেন নাই। লর্ড ওয়াভেলের প্রস্তাবের সমালোচনা করিয়া সপ্ততিপর প্রবীণ রাজনীতিক শাস্ত্রী মহাশয় বলেন,

ওয়ার্কিং কমিটির সদস্যদের মুক্তিদানে ঔদার্যের চিহ্ন এতই সামান্য যে, স্বাধীনতা সংগ্রামেরত একটা জাতিকে শান্ত করিবার উদ্দেশ্যে প্রদত্ত কোন বিবৃতিতে গর্বের সঙ্গে তাহা উল্লেখ করা চলে না। ভারতের সব রাজনীতিক বন্দীকে যদি মুক্তি দেওয়া হইত, তবে এক্ষেত্রে ব্রিটিশ গভর্নমেণ্টের কিছু ঔদার্যের পরিচয় পাওয়া যাইত। গভর্নমেণ্ট কৃপণের মত অগ্রসর হইয়াছেন, ইহা দুঃখের বিষয়।

রাজনীতিক বন্দীদের সকলকে মুক্তিদানের এই প্রশ্নের সঙ্গে বাঙলার ঘনিষ্ঠতা ভারতের অন্যান্য প্রদেশের চেয়ে সর্বাধিক জড়িত রহিয়াছে। বাঙলার সমাজ-জীবন সর্বাংশে ভাঙিয়া পড়িয়াছে, তাহাতে প্রাণসঞ্চার করিতে হইলে ত্যাগী কর্মীদের আদর্শের প্রেরণা এবং কর্মসাধনা বাঙলার পক্ষে বর্তমানে সর্বাপেক্ষা প্রয়োজন। ত্যাগের শক্তিই অবসন্ন জাতিকে জাগাইতে পারে এবং সেই পথে বাঙলার বর্তমান নিদারুণ দুর্গতির প্রতিকার হওয়া সম্ভব। কংগ্রেস-নেতৃবৃন্দ কারাগার হইতে মুক্তিলাভ করিয়াই বাঙলার দুর্দশার কথা উল্লেখ করিয়াছেন। রাষ্ট্রপতি মৌলানা আবুল কালাম আজাদ বলেন,—

১৯৪৩ সালের দুর্ভিক্ষে বাঙলার সর্বনাশ হইয়াছে, পূর্বাবস্থা ফিরিতে বহু বৎসরের প্রয়োজন হইবে। গভর্নমেণ্ট এই কথা বারবার বলিয়াছিলেন যে, বাঙলায় দুর্ভিক্ষ ঘটে নাই; কিন্তু লক্ষ লক্ষ নরনারী পথে পড়িয়া মরিয়াছে। গত তিন বৎসর সমগ্র জাতি আরও অনেকভাবে আঘাত পাইয়াছে, এগুলির প্রতিকার সহজ হইবে না। ১৯৪৩ সালের বাঙলার দুর্ভিক্ষের জন্য ব্রিটিশ গভর্নমেণ্ট, ভারত গভর্নমেণ্ট ও বাঙলা গভর্নমেণ্ট ইঁহারা সকলেই দায়ী।

পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু বাঙলার দুর্ভিক্ষের কথা বলিতে গিয়া মনের আবেগে উত্তেজিত হইয়া পড়েন। তিনি বলেন,—

বাঙলার দুর্ভিক্ষে লোকক্ষয়জনিত মর্মান্তিকতা যুদ্ধের অপেক্ষা যদি অধিক না হয়, তবে যুদ্ধের ন্যায় নিশ্চয়ই ভয়াবহ হইয়াছে। ভারতে ব্রিটিশ শাসনের ফলাফল সম্বন্ধে বিচারের ইহা চূড়ান্ত রায়। যে অর্থনীতিক ব্যবস্থার পরিণতিতে এমন দুর্দৈব ঘটা সম্ভব হইয়াছে, উহা সে বৈষয়িক ব্যবস্থার উপর মৃত্যুর পরোয়ানা জারী করিয়াছে। আমরা ভারতবাসীরা অতীতে বিশেষভাবে গত তিন বৎসরে অশেষ দুঃখকষ্ট ভোগ করিয়াছি, এগুলি বিস্মৃত হওয়া আমাদের পক্ষে কিছুতেই সম্ভব হইবে না। কিন্তু তাই বলিয়া আমরা যেন আবেগের বশে অধীর হইয়া না পড়ি এবং ভবিষ্যতে নীতি নির্ধারণ ক্ষেত্রে সেজন্য



আমাদের দৃষ্টি মেঘাচ্ছন্ন হইয়া না পড়ে। গত ৮ই আগস্টের সেই ঐতিহাসিক দিনে মহাত্মা গান্ধী একটি কথা বলিয়াছিলেন, আজ সেই কথাটি আমার মনে পড়িতেছে। তিনি বলিয়াছিলেন—জগতের চক্ষু আরক্ত হইলেও আমরা ধৈর্য হারাইব না এবং আমাদের দৃষ্টি স্বচ্ছ রাখিব।

নিষ্ঠুরতা ও বর্বরতা

নৈনীতালে একটি জনসভায় বক্তৃতাকালে ভারত সরকারের বর্তমান নীতির তীব্র সমালোচনা করিয়া পণ্ডিতজী বলেন,—

বাঙলার বিগত দুর্ভিক্ষ ভারতে ব্রিটিশ শাসনের ইতিহাসে সর্বাপেক্ষা দুরপনেয় কলঙ্ক। কলিকাতার রাজপথসমূহ যে সময় শবরাশিতে সমাচ্ছন্ন ছিল, সেই সময় বিশেষভাবে অনুগৃহীতের দল নাচগান চালাইয়াছে এবং প্রমোদ ও উল্লাসে প্রমত্ত হইয়াছে। বাঙলার জন্য খাদ্য লইবার গাড়ি মিলে নাই; কিন্তু কলিকাতার ঘোড়দৌড়ের জন্য ঘোড়া লইবার গাড়ির অভাব ঘটে নাই। এই সংকটকালে আমাদের দেশবাসীর মধ্যে যাহারা চোরাবাজারী ও লাভখোরের ব্যবসা চালাইয়াছে, তাহাদের আচরণও কম ঘৃণিত নয়। শুধু খাদ্য সরবরাহের দ্বারা এ সমস্যার প্রতীকার হইবে না, যে রাজনীতিক এবং অর্থনীতিক ব্যবস্থার ফলে ইহা সম্ভব হইয়াছে, তাহাকে সমূলে উৎখাত করিতে হইবে।

কারাগার হইতে মুক্তিলাভ করিয়া আচার্য কৃপালনী এক বক্তৃতা প্রসঙ্গে বলেন,—

সমস্ত রাজনীতিক বন্দীকে মুক্তি দেওয়া বড়লাটের উচিত ছিল; তাহাতে তাঁহার ঘোষণার পক্ষে অধিকতর অনুকূল আবহাওয়ার সৃষ্টি হইত। এই তিন বৎসরে ভারতের জনসাধারণ যে দুঃখ দুর্দশা ভোগ করিয়াছে তাহাতে মুক্তিতে আমরা সুখী হইতে পারি নাই। বাঙলার দিকে লক্ষ্য করুন—বহু পরিবার ধ্বংস হইয়াছে।

দীর্ঘকাল ভারতের উপর মুরুব্বিয়ানা ফলাইবার ইহাইতো মহিমা; কিন্তু দেখিতেছি, তবু মুরুব্বিয়ানার মোহ ব্রিটিশের ভাঙ্গে না।

মুরুব্বিয়ানার মোহ

লর্ড ওয়াভেলের প্রস্তাবের দোষ-গুণ ভারতের নেতারা বিবেচনা করিবেন। অন্তত তেমন বুদ্ধি বিবেচনা তাঁহাদের আছে; তথাপি মুরুব্বিয়ানা ফলানো দরকার। অবশ্য এই মুরুব্বিয়ানার মূলে নিজেদের স্বার্থসিদ্ধির চেষ্টাই চলিতেছে। স্যার ষ্ট্যাফোর্ড ক্রীপস আমাদিগকে কি উপদেশ দিতেছেন তাহা শ্রোতব্য এবং প্রণিহিতব্য। তিনি বলেন,—

বর্তমান অবস্থায় বড়লাটের শাসন পরিষদকে কেন্দ্রীয় আইন সভার নিকট দায়িত্বসম্পন্ন করা সম্ভব নহে; কারণ, তেমন পন্থা অবলম্বন করিতে গেলে, আমাদের চেষ্টার সাফল্যের সম্ভাবনা নষ্ট হইবে। যেহেতু কেন্দ্রীয় গভর্নমেণ্টের স্থায়িভাবে জাতিগত এবং ধর্ম সম্প্রদায়গত সংখ্যাগরিষ্ঠের প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠিত হইবার আশঙ্কায় প্রধান প্রধান সংখ্যালঘিষ্ঠ সম্প্রদায়গুলি বিচলিত হইয়া পড়িবে; এবং তাহার ফলে সংখ্যাগরিষ্ঠ ও সংখ্যালঘিষ্ঠ সকলের সহযোগিতার দ্বারা আমাদের পরিকল্পনা সাফল্যলাভ করিতে পারিবে না।

ইংলণ্ডের শ্রমিক দলপতি মিঃ এটলীও ঐ একই সুরে সুর মিলাইয়া আমাদিগকে বলিতেছেন—

এই ব্যবস্থা শুধু সাময়িক। বর্তমান সময়ে ভারতের শাসনতন্ত্রের জন্য সকল দলের মধ্যে সম্পূর্ণ ঐক্য লাভ সম্ভব নহে। আমি আমার ভারতীয় বন্ধুদিগকে এই সুযোগ গ্রহণ করিতে বলি। ভারতবাসীদের দ্বারা যাহাতে ভারতবর্ষ শাসিত হয় এবং সেই শাসনতন্ত্র গঠনতান্ত্রিকতানুযায়ী পরিচালিত হয়, সেজন্য ভারতবাসীরা কিরূপ আগ্রহান্বিত আমি তাহা জানি না; কিন্তু সমস্যা হইতেছে এই যে, গণতান্ত্রিক শাসনের ভিত্তি হইল সহিষ্ণুতা। ভারতের সংখ্যাগরিষ্ঠ এবং সংখ্যালঘিষ্ঠ সম্প্রদায়ের মধ্যে ঐক্য এবং একের হাতে অপরের নির্যাতনের আশঙ্কা বিদূরিত হওয়ার উপর ভারতের গণতান্ত্রিক শাসনের সাফল্য নির্ভর করিতেছে।

এমন সব উপদেশের সুস্পষ্ট তাৎপর্য এই যে, ভারতবাসীরা এখনও মনুষ্যত্ব অর্জন করে নাই এবং ইংরেজের অভিভাবকত্ব ভারত হইতে অপসৃত হইলে তাহারা পরস্পরে মারামারি কাটাকাটি করিয়া মরিবে। কোন জাতির স্বাধীনতার মর্যাদা স্বীকার করিয়া লইবার মত মতিগতি নিশ্চয়ই ইহা

নয়, পক্ষান্তরে এমন মত প্রকাশের দ্বারা একটা জাতিকে পশু বলিয়াই গণ্য করা হয়।

এই প্রসঙ্গে বড়লাটের বেতারের বার্তা আমাদের মনে পড়িতেছে। তিনি বলেন,—আমি নিম্নলিখিত ভদ্রমহোদয়গণকে আমন্ত্রণ করিয়াছি—

বিভিন্ন প্রাদেশিক গভর্নমেণ্টে যাঁহারা প্রধান মন্ত্রিস্বরূপে এখনও কাজ করিতেছেন, অথবা যেসব প্রদেশে বর্তমানে ৯৩ ধারা প্রযুক্ত আছে, সেখানে সর্বশেষে যাঁহারা প্রধান মন্ত্রী ছিলেন। ইহা ছাড়া কেন্দ্রীয় ব্যবস্থা পরিষদের কংগ্রেসী দলের এবং মুসলিম লীগ দলের লীডার এবং ডেপুটি লীডার, রাষ্ট্রীয় পরিষদের কংগ্রেস দল এবং মুসলিম লীগের লীডারগণ, ব্যবস্থা পরিষদের ন্যাশনালিস্ট দল এবং শ্বেতাঙ্গ দলের নেতৃদ্বয়। ভারতের দুইটি বিশিষ্ট রাজনীতিক দলের নেতা হিসাবে মিঃ গান্ধী এবং মিঃ জিন্না, তপশীলী দলের প্রতিনিধিস্বরূপে রাও বাহাদুর শিবরাজ এবং শিখ সম্প্রদায়ের নেতা হিসাবে মাস্টার তারা সিংকে নিমন্ত্রণ করা হইয়াছে। আজ ইঁহাদের নিকট নিমন্ত্রণপত্র প্রেরণ করা হইল। আগামী ২৫শে জুন সিমলায় সম্মেলন হইবে প্রস্তাব করা হইয়াছে। দিল্লীর চেয়ে জায়গাটা ঠাণ্ডা হইবে। দুর্ভাগ্যক্রমে সম্মেলন যদি ব্যর্থ হয়, তবে বর্তমানের ন্যায় আমাদিগকে সকল কার্য চালাইয়া যাইতে হইবে। আমি এই আশ্বাস দান করিতে পারি যে, এই প্রস্তাবের পিছনে ব্রিটিশ জাতির দায়িত্বসম্পন্ন নেতা এবং জনগণের আন্তরিক শুভেচ্ছা রহিয়াছে। ভারতবর্ষ যাহাতে অভীষ্ট লাভ করে, সেজন্য তাঁহারা সাহায্য করিতে চাহেন; আমার বিশ্বাস এই যে, অভীষ্টের পথে উহাকে সোপান বলা চলে এবং তার চেয়ে ইহা অনেক বেশী, দস্তুরমত খুব খানিকটা অগ্রগতি এবং ঠিক পথে অগ্রগতি।

বলা বাহুল্য, এই ধরণের কথা, আমাদের কানে এখনও একঘেয়ে রকমের শুনায়। আমরা অগ্রগতির ভেজাল একেবারেই পোড়াইয়া দিতে চাই; কারণ ব্রিটিশের প্রভুত্বের আড়ালে এই ধরণের অগ্রগতি আমাদিগকে আশ্বস্তি-দান করে না, আমাদের অন্তরে ভীতি থাকিয়াই যায়। বিলাতের শ্রমিকদলের সভাপতিস্বরূপে অধ্যাপক হেরল্ড ল্যাস্কি সে ভয়ের কথা উল্লেখ করিয়াছেন। তিনি বলেন,—

ভারতবাসীদের সঙ্গে এখন আমাদিগকে পুরা-পুরি রকমে আপোষ-নিষ্পত্তি করিয়া ফেলিতেই হইবে; কারণ ভারতের সাফল্যকে এইভাবে অচল অবস্থায় থাকিতে দেওয়া এবং যাহারা আমাদেরই ন্যায় মানুষের স্বাধীনতার জন্য সংগ্রাম করিতেছে, তাহাদিগকে জেলে আবদ্ধ করিয়া রাখা ন্যায়-নীতি এবং রাজনীতি—উভয় দিক দিয়া অসঙ্গত এবং মারাত্মক হইবে। জাপানের সঙ্গে যুদ্ধ শেষ না হওয়া পর্যন্ত ভারতের সমস্যা ফেলিয়া রাখিবার অবসর নাই; এখনই তাহার সমাধান করা দরকার; অন্যথায়, নূতন সমস্যার সৃষ্টি হইবার আশংকা রহিয়াছে; কারণ বহুসংখ্যক জেনারেল ডায়ার ইতস্তত ঘোরাফেরা করিতেছে। অধিকন্তু নিজেদের শাসনে স্বাধীনতার আন্দোলনকে দমিত করিয়া অন্যত্র স্বাধীনতার প্রসার সাধনের প্রচেষ্টার কোন মূল্য থাকে না। আমরা যদি ভারতীয় সমস্যার সমাধান করিতে অসমর্থ হই, তবে আয়ারল্যাণ্ড এবং আমেরিকায় যে শোচনীয় ব্যাপার ঘটিয়াছিল, ভারতে তাহার পুনরভিনয়ের আশংকা রহিয়াছে। যদি আমরা তেমন ভুল করি, তবে আমাদিগকে অবমাননা ভোগ করিতে হইবে।

স্বাধীনতাই প্রকৃত প্রশ্ন

ভারতবর্ষ পূর্ণ স্বাধীনতাই চায়। মহাত্মাজী সেদিন বলিয়াছেন, স্বাধীনতার সাধনাই তাঁহার জীবনের একমাত্র ব্রত এবং মানুষ হইয়া যাহারা পরাধীনতা হইতে মুক্ত হইতে চেষ্টা করে না, তাহারা পশু। লর্ড ওয়াভেলের প্রস্তাবে ভারত



স্বাধীনতা লাভ করিবে কি? আমরা দেখিতেছি, এই প্রস্তাবে স্বাধীনতা এই শব্দটির পর্যন্ত উল্লেখ বিশেষ সাবধানতার সঙ্গে এড়াইয়া যাওয়া হইয়াছে। আমেরিকা এবং ইংলণ্ডে যাঁহারা ভারতের স্বাধীনতার আন্দোলনের প্রতি সহানুভূতিসম্পন্ন তাহাদের ধারণা এই যে, ওয়াভেল প্রস্তাবের মৌলিক পরিবর্তন সাধিত না হইলে তাহা ভারতের দায়িত্বসম্পন্ন নেতৃবৃন্দের দ্বারা গৃহীত হইবে না। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র কংগ্রেসের অন্যতম সদস্য মিঃ এভারেট ডার্কসেন বলেন, স্বাধীনতা ভারতবর্ষের মূল সমস্যা। বৃটিশ সরকার ভারতবর্ষের নিকট যে প্রস্তাব করিয়াছেন, তাহা দ্বারা সেই মূল সমস্যার সমাধান হয় না। যতদূর দেখা যায়, ইহা প্রকৃত সমস্যা সমাধানের ধারে-কাছেও যায় না। ভারতবর্ষের কোটি কোটি লোকের স্বাধীনতাই মূল সমস্যা—এ সমস্যার সমাধান না হইলে কোন কিছুরই মীমাংসা হইবে না।

ইংরেজকে ভারত ছাড়িতে হইবে

বিলাতের 'নিউজ লীডার' পত্রে মিঃ ফ্যারিডলী ব্রিটিশ গভর্নমেণ্টের ভারত সম্পর্কিত নীতির কঠোর সমালোচনা করিয়াছেন। তিনি বলেন,—

ভরত গভর্নমেণ্ট নিছক ও নিখুঁত সামরিক এবং আমলাতান্ত্রিক স্বৈরাচারের উপর প্রতিষ্ঠিত, সম্ভবত ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের ইতিহাসে যাঁহাদের দস্যুতা সর্বাপেক্ষা প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে, সেই লর্ড ক্লাইভ ও ওয়ারেণ হেষ্টিংসের সময় হইতেই এই ব্যবস্থা ভারতে বহাল রহিয়াছে। ফ্যাসিষ্ট-বাদের ও সাম্রাজ্যবাদের মধ্যে কোন তফাৎ নাই। ফ্যাসিষ্টরা ব্রিটিশ ভারতের শাসন ব্যবস্থা হইতেই বন্দীশিবির প্রতিষ্ঠার অনুপ্রেরণা লাভ করে। সম্প্রতি নাৎসী জার্মানীর বন্দীশিবিরে আটক ব্যক্তিদের দুর্দশার মূল আবিষ্কর্তা ব্রিটিশ শাসকশ্রেণী যেন আতঙ্কে শিহরিত হইবার ভাব দেখাইতেছে। অধুনা ভারতের বৃটিশ শাসন ব্যবস্থা উপকথার সূক্ষ্ম সূত্রের উপর দোদুল্যমান। এই দীর্ঘকালের অধিকৃত দেশের অধিবাসীদের স্বাধীনতাদানের প্রতিশ্রুতি দেওয়া হইতেছে। অথচ সকলেই জানেন, এই ধরণের প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করার ব্যাপারটা ইংরেজ-ভদ্রলোকদের পক্ষে তেমন নূতন কিছু ব্যাপার বলিয়া গণ্য হয় না। কিন্তু এসব সত্ত্বেও বলিতে হয় যে, চার্চিল-আমেরী এণ্ড কোম্পানীর পক্ষে অন্তত রাজনীতিক দিক হইতেও বেশী দিন ভারতে টিকিয়া থাকা কি করিয়া সম্ভব হইতে পারে, তাহা বোঝা যায় না। অবশ্য কিছুকালের জন্য বিদ্রোহ এমনকি নিরস্ত্র ভারতীয় জনসাধারণের বিদ্রোহ সত্ত্বেও ব্রিটিশ একমাত্র গায়ের জোরে টিকিয়া থাকিতে পারে; কিন্তু অধুনা ভারতের ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ এক অদ্ভুত অবস্থার সম্মুখীন হইয়াছে। ব্রিটিশের সব মিত্রশক্তি ব্রিটিশের ভারত ত্যাগ কামনা করে। এসিয়া এসিয়াবাসীদের দ্বারা শাসিত হউক, চীন ইহাই চায়। ইউরোপের মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বী ইংলণ্ড এসিয়া ছাড়িয়া যায়, রুশিয়ার ইহাই কামনা। পক্ষান্তরে চীন জাপানের আসন্ন শিল্পসমৃদ্ধি লুণ্ঠনের যে সুযোগ সম্ভাবনা দেখা দিয়াছে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের আর্থিক সাম্রাজ্যবাদ তাহার পুরা সুযোগ গ্রহণের পক্ষপাতী।

কথায় আছে: যতক্ষণ শ্বাস, ততক্ষণ আশ, এ অবস্থা বুঝিয়াও ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ তাহার চিরাচরিত ভেদনীতির কৌশলে ভারতে শেষঘাঁটি আগলাইয়া থাকিবার চেষ্টা করিতেছে। এবং রাজনীতিক্ষেত্রে সাম্প্রদায়িকতার চাপে জাতীয়তাকে পিষ্ট করিবার উদ্দেশ্যে অপূর্ব কৌশল অবলম্বন করিয়াছে। কিন্তু এ চাতুরীর খেলা আর কতদিন চলিবে? সিমলার নেতৃ-সম্মেলনে এই প্রশ্নের উত্তর মিলিবে কি?



অবশেষে ঘুমের আশা ছাড়িয়া দিতে হইল, ভাবিলাম ঘুম যখন হইবে না অন্তত ঘুমের ভান করিয়া চোখ বুজিয়া পড়িয়া থাকি। একটু সুবিধাও ছিল আগেকার মতো আলোর ব্যবস্থা নাই। কিন্তু চোখ বুজিতে গিয়া দেখিলাম অসুবিধা অনেক; প্রথমত এদিক ওদিকে মানুষের ঠেলায় দেহটা তিন চার জায়গায় মোড় ফিরিতে বাধ্য হইয়াছে, তার উপরে আবার শরীরের তলায় গোটা চার পাঁচ ছোট বড় বোঁচকার গুঁতা। এরকম অবস্থা পঞ্চ-মুণ্ডীর শব সাধনার অনুকূলে হইতে পারে —কিন্তু ঘুমের নয়; চোখ খুলিলে ছোট বড় মাঝারি, নূতন পুরাতন, তোরং বাক্স, সুটকেস প্যাঁটরা, পুঁটলি পোঁটলার দুঃস্বপ্ন; চোখ বন্ধ করিলে তামাক বিড়ি চুরুট সিগারেট, গাঁজাও আছে বোধ হয়—প্রভৃতির কুজ্ঝটিকা। এর উপরে আবার গাড়িটা অতর্কিতে থামিয়া গিয়া সর্বাঙ্গে মস্ত একটা করিণা কনুইএর গুঁতা মারে। অর্থাৎ তৃতীয় শ্রেণীর ট্রেনের এক কামরায় বাঙ্কের উপরে আমি ত্রিশঙ্কুর মতো ঝুলিয়া আছি। গাড়ি বেলা আটটায় কলিকাতা পৌঁছিবার কথা—কিন্তু গাড়িখানা যেখানে সেখানে যেমন খুসি থামিতে থামিতে চলিয়াছে, সময়মতো পৌঁছানর আশা সবাই ছাড়িয়া দিয়াছে—সবারই বেশ নির্বিকল্প অবস্থা। দেশলাই-এর স্ফুরিত আলোকে গাড়ির ওই প্রান্তের জনপিণ্ডটাকে চোখে পড়িতেছে—এর মাথা, ওর পা, তার কোমর কারো বা ঘাড়ে মিলিয়া একটা নিহত কীচকের মর্দিত দেহ। ওরা ঘুমাইতেছে। আর ঠিক আমার নীচেই একটা দল ঘুমের আশা ছাড়িয়া বিড়ি সিগারেট টানিতেছে। কাহারো চেহারা দেখিতে পাইতেছি না, তবে মাঝে মাঝে নূতন বিড়ি ধরাইবার সময়ে দেশলাই-এর ক্ষিপ্রালোকে নাকের ডগা, গোঁফ থাকিলে গোঁফ, কাহারো বা চশমার ঝল-মলানি চোখে পড়ে। তবে অন্ধকারে প্রত্যেকের গলার স্বরের বৈশিষ্ট্য এতক্ষণে চিনিয়া গিয়াছি। স্ফুরিত আলোকে কোন কোন ক্ষেত্রে স্বরে ও চেহারাতেও মিলাইয়া লইতে পারিয়াছি—ওই যার বোঁচা নাক গলার আওয়াজ তার বেজায় মোটা; চশমা ও গোঁফওয়ালার স্বর ভাঙা ভাঙা; মোটা লোকটার, ক্ষণিক দীপ্তিতেও তাহার আয়তন না বুঝিয়া উপায় নাই, গলার স্বর সরু, স্বরে আর চেহারায় সামঞ্জস্য করাই কঠিন। তিনজনেই বোধ হয় এক স্টেশনে উঠিয়াছে, একই জায়গার যাত্রী, হয়তো আত্মীয়স্বজনও হইতে পারে। এ-সবই তাহাদের আলাপ হইতে সংগ্রহ করিয়াছি।

সরু আওয়াজ বলিল—ভাগ্যিস নিবারণকে সেকেণ্ড ক্লাশে দিয়েছিলাম। ওর এখন ঘুম দরকার।

মোটা আওয়াজ বলিল—আর ঘুম। জীবনের এক পর্ব শেষ হ'য়ে গেল। আর ঘুম—

সরু আওয়াজ বলিল—ঘুম না হোক্ বিশ্রাম তো চাই।

মোটা আওয়াজ বলিল—ক'বছর হল হে, পাঁচ নয়?

কিছুক্ষণ পরে সরু বলিল—ছয় বছর। বোধ করি সে মনে মনে মানসাঙ্ক কষিয়া লইয়াছে।

কিন্তু সরু মোটা কেহই নিজের কোট ছাড়িবার নয়। ছয় আর পাঁচে যখন রীতিমত কুরুক্ষেত্র বাধিয়া উঠিবার উপক্রম তখন সেই ভাঙাগলার ভাঙা কাঁসা খন্‌খন্‌ করিয়া বাজিয়া উঠিল—নাও বাপু একটু ঘুমোও তো! ছয়ও নয়, পাঁচও নয়, সাড়ে পাঁচ হ'ল তো!

একটু চুপ। বিড়ির আলোটা স্থান পরি-বর্তন করিল। বুঝিলাম ভাঙাগলা মোটা-গলার মুখ হইতে বিড়িটা টানিয়া লইল। ও গোটা-দুই খুব জোর টান মারিয়াছে—অনেকটা ধোঁয়া বিড়ির আলোয় দেখা গেল। তারপরে ভাঙা কাঁসা সুরু করিল—তোমরা যার হ'য়ে দুঃখ করছ, দেখগে সে এতক্ষণ সুখস্বপ্নে ভোর হ'য়ে ঘুমোচ্ছে!

এবারে সরু মোটা যুগপৎ ভাঙাগলার প্রতি সাঁড়াশি আক্রমণ করিল।

—কি যে বল্‌ছ, সবাই তোমার মতো নয়!

—নিবারণ কত ভালোবাসতো আমি তো জানি।

ভাঙা বলিল—ভালবাসা তো আমি অস্বীকার করছি না। স্ত্রীকে সবাই ভালবাসে, তাই ব'লে সে মারা গেলে আর বিয়ে করতে হবে না, এমন কোন্‌ শাস্ত্রে আছে শুনি?

—বিয়ে করবে না কেন? তবে তোমার কথা শুনে মনে হয় আজই বিয়ের কথা ভাবতে সুরু করেছে।

—শাস্ত্রের কথা নয় ভাই মনের কথা। পাঁচ বছরের ঘরকন্না, তার উপরে ..

...তার উপরে দুটি ছেলেমেয়ে? আরে সেই জন্যই তো আরো বেশি বিয়ে করা দরকার।

মোটাগলা এবারে হাসিল—

এ যে ব্যাধির চেয়ে ওষুধ অনেক বেশি উৎকট। ছোট ছেলেমেয়ে মা মারা গেলে অবশ্যই কষ্ট পাবে, কিন্তু কতদিন? একটু বয়স হ'লেই আর কষ্ট পাবে না। কিন্তু দু-বছরের কষ্ট দূর করবার জন্যে এক সৎমা জুটিয়ে দিলে সারাজীবন যে কষ্ট পেতে হবে।

সরুগলা আর একদিক হইতে আক্রমণ করিল—কিন্তু নূতন যাকে বিয়ে করবে সে মেয়ে কেন পরের ছেলের দায়িত্ব নিতে রাজি হবে। অবশ্য দায়ে পড়ে সবাই রাজি হয়—কিন্তু তাকে দিয়ে পরের ছেলে মানুষ করিয়ে নেবার অধিকার কারু নেই! সমাজ তার উপরে অন্যায় করে—সেই অন্যায়ের প্রায়শ্চিত্ত করে আগের পক্ষের ছেলেমেয়ে-গুলো, সারাজীবনের দুঃখকষ্টে!

সরুগলা নিজের বাগ্মিতায় নিজেই বিস্মিত হইয়া স্তব্ধ হইয়া রহিল, খুব সম্ভব ওটা দম লইবার অবসর।

মানুষের সুখদুঃখের কথা নাকি উপর হইতে বিধাতা শোনেন। সত্য কিনা জানি না, তবে আমি তাহাদের এই আলাপ বাঙ্কের উপর হইতে শুনিলাম। না শুনিলেও ক্ষতি ছিল না। বিধাতার শুনিয়াও মানুষের লাভ হয় না। পরের গুহ্য বিষয় পারৎপক্ষে না শোনাই উচিত, কিন্তু সে বিষয়ে পরের সহ-যোগিতা প্রয়োজন। ইহারা যেমন নিরঙ্কুশ —না শুনিয়া উপায় কি? মোটের উপরে বুঝিলাম নিবারণ নামধের এক ব্যক্তির সদ্য স্ত্রী-বিয়োগ হইয়াছে, তাহার দুটি নাবালক ছেলেমেয়ে আছে। তাহারা কোথায় বুঝিতে পারিলাম না। তবে স্বয়ং নিবারণ পাশের এক সেকেণ্ড ক্লাস কামরায় বিরাজ-মান। সে নিদ্রিত কি জাগরিত এ বিষয়ে মতভেদ রহিয়াছে। নিবারণকে একবার দেখিতে পাইলে হইত!

সরুগলা পুছিল—আচ্ছা, তুমি নিবারণের বিয়ের জন্য এত ক্ষেপে উঠলে কেন শুনি?

এই প্রশ্নের উত্তর দিবার অবকাশ না দিয়া মোটাগলা পুছিল—হাতে পাত্রী আছে নাকি হে?

ভাঙাগলা সুরু করিল—নাঃ ঘুমোতে দেবে না দেখছি! পাত্রী থাকাথাকি আবার কি? কুলিনের ছেলে বুড়ো হ'লেও তার পাত্রীর অভাব হয় না—আর নিবারণ তো ছেলেমানুষ। কল্‌কাতায় পৌঁছে দেখো ঘটকের যাতায়াতে বাড়িতে তিষ্ঠোতে পারবে না।

মোটাগলা বলিল—বাইরের ঘটকের চেয়ে ভিতরের ঘটককে করে বেশি ভয়।

—সে ভয় নেই।

—তবে তোমার এত উৎসাহ কেন?

ভাঙাগলা বলিল—আমি নিবারণের জন্যেই বলছি। যদি বিয়ে ক'রে তবে এখনি করে ফেলুক। নতুবা—

—নতুবা কি?

—তবে শোনো—সে এক গল্প, মানে গল্প নয়, এক ট্রাজিক কাণ্ড। সে অনেক দিনের কথা। আজো ভুলিনি—কখনো ভুলবো না। সেই জন্যেই তো আমি বিপত্নীককে সর্বদা বিয়ে করতে উপদেশ দিই। বিপত্নীক বিয়ে করলে অনেকে হাসাহাসি করে—আমি চুপ ক'রে থাকি—আমার মনে অনেক দিন আগের সেই ঘটনা মনে পড়ে যায়।

একটু দম লইয়া আবার সে সুরু করিল।

অনেক দিন আগে পশ্চিমের এক শহরে থাকতাম। তখন আমার বয়স অল্প। কত হবে? বোধ করি দশ-বারোর বেশি নয়। একদিন হঠাৎ নেপালের তরাই অঞ্চল থেকে একদল লোক শহরে এসে উপস্থিত হ'ল। তারা অনেক দূর থেকে আসছে—সারাটা পথ হেঁটেই এসেছে; সঙ্গে কারো পয়সা-কড়ি ছিল না, তীর্থদর্শনে চলেছে দেওঘরে। বেচারাদের অনেক কয়দিন খাওয়া হয়নি। এতগুলো লোককে কে আর খেতে দেবে? ও-দেশটাই যে গরীবের দেশ। কোনো কোনো দিন এক মুঠো ভুট্টা জুটেছে, কোনদিন তা-ও জোটে নি। যখন তারা শহরে এসে উপস্থিত হ'ল যেন একদল কঙ্কাল। বাজারের কাছে এসে সব বসে পড়লো। তখন না আছে তাদের উঠবার শক্তি, না পারে ভালো ক'রে কথা বলতে। বাজারের লোক তাদের গিয়ে ঘিরে ফেললে। কি ব্যাপার? কোত্থেকে আসছ? কোথায় যাবে? সব ব্যাপার শুনে তখনি একজন লোক গেল মুস্তফি ডাক্তারের কাছে। তিনি শহরের সব বিষয়ের নেতা। মুস্তফী বললেন—ওদের ওষুধের চেয়ে পথ্যের দরকার বেশি। তখনি টাকা নিয়ে বাজারে এসে উপস্থিত হ'লেন। বাজার থেকে খাবার কিনে তাদের খেতে দিলেন। ক্ষুধার সে কি লোলুপ মূর্তি! কোনো দিন সে খাওয়ার ছাঁদ ভুলবো না। তারপরে চালডাল যোগাড় ক'রে তাদের রান্নার যোগাড় ক'রে দিলেন। পয়সা দিয়ে চালডাল কিনতে হ'ল না। দোকানদারেরা ক্ষুধিত তীর্থযাত্রীর নাম শুনেই বিনা পয়সায় সব দিল। বিশেষ মুস্তফী বাবু এসেছেন—তাঁর কাছে সবাই জীবন্মৃত্যুর ঋণে বাঁধা!

আমরা ছোট ছেলেরা আশেপাশে ঘুরেচি, ফাই-ফরমাস্ খাটছি, জলটা পাতাটা এগিয়ে দিচ্ছি। তারপরে তারা সবাই যখন খেতে বসলো—শহরের লোক এসে ঘিরে দাঁড়ালো। কাঙালীভোজন দর্শনেও নাকি পুণ্য আছে।

এমন সময়ে এক কাণ্ড ঘটলো—সেই কথাই বলতে যাচ্ছি—এটা শুধু তারই ভূমিকা। বাজারের মধ্যে ছোট্ট একটা গলি ছিল। হঠাৎ তার মধ্যে এক সোরগোল। ব্যাপার কি? খাওয়ার জায়গা থেকে সবাই ছুটলো সেই-দিকে। ছোট্ট গলিটা ভিড়ে নিরেট হ'য়ে গেল। আর ভিড়ের মধ্যে আমাদের মাথা তলিয়ে গেল—কিছুই দেখতে পেলাম না।



কেউ রাগ করলো, বললো, মারো ওঁকে

পরে শুনলাম—সব-জজ্ বাবু নাকি কলমি গোয়ালিনীর হাত চেপে ধরেছিলেন।

শহরে একজন পেন্সনপ্রাপ্ত সাব-জজ্ থাকতেন, বয়স সত্তরের ধারে-কাছে, সম্ভ্রান্ত বিশিষ্ট লোক। ঘরে নাতিনাতনি আছে—তবে স্ত্রী অনেককাল হ'ল গত হয়েছেন। কলমি গোয়ালিনি আধা-বয়সের একটি মেয়ে। সে এই গলির ভিতর দিয়ে যাচ্ছিল—সাব-জজবাবু তাকে অনুসরণ ক'রে গলিতে ঢুকে পড়েন—আর হঠাৎ এসে তার হাত ধরেন। সে ভয়ে চীৎকার ক'রে ওঠে—আর তখনি লোকজন জুটে গেল। এসব তো পরে শুনেছি। তখন সেই জনতার যে অবস্থা! কেউ রাগ করলো—বললো মারো ওঁকে! বেটা বেড়ালতপস্বী। কেউ কেউ বিদ্রূপ করতে লাগলো—সে কি অশ্রদ্ধার হাসি! এতদিন যাকে বড় ব'লে না মেনে উপায় ছিল না—তাকে হঠাৎ নীচের ধাপে দেখে মানুষের সে কি আত্মপ্রসাদের হাসি! সব্বাই ছি ছি করতে করতে চলে গেল। মুস্তফী বাবুর চেষ্টায় ব্যাপারটা ওখানেই মিটে গেল। সাব-জজবাবু লজ্জায় শহর ছেড়ে অন্যত্র চলে গেলেন।

মোটা ও সরু যুগপৎ বলিল—এ কেচ্ছা এখানে ফাঁদবার অর্থ কি?

—অর্থ সেদিনকার জনতাও বুঝতে পারেনি—আর তোমরাও বুঝতে পারলে না দেখছি।

মোটাগলা একটু রাগতভাবেই যেন বলিল—এর মধ্যে বুঝবার আবার কি আছে? একটা বুড়ো লম্পটের কাহিনী। পৃথিবীতে সত্যই ঘৃণার যদি কিছু থাকে তবে তা বৃদ্ধ লম্পট। ছি ছি! এই বলিয়া নিজের নৈতিক তাপে নিজেই হাত-পা সেঁকিতে লাগিল।

সরুগলা আবার সূক্ষ্ম সমালোচক। সে বলিল—বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রোঁয়াতে তোমার ঐ সাব-জজ্ বাবুকেই দেখেছি এবং দেখে হেসেছি।

—তার কারণ ওই প্রহসন তাকে নিয়ে হাসবার জন্যেই লিখিত। নাট্যকার শুধু কার্যটা দেখিয়েছেন তাই সেটা হয়েছে প্রহসন। শিল্পরীতি বদলে ওর কারণটা নিয়ে যদি নাটক লিখতেন, তবে হ'ত সেটা ট্রাজেডি। তখন হাসি না পেয়ে—

—কান্না পেতো?

—ট্রাজেডির উদ্দেশ্য কাঁদানো নয়—ভাবানো—আত্মদর্শনে সাহায্য করা বলতে পারো।

সরুগলা বলিল—আচ্ছা আমরা যেন কিছু বুঝিনি, তুমি কি বুঝেছ তাই শুনি না।

ভাঙাগলা বলিল—আমিও গোড়াতে তোমাদের মতোই ভুল করেছিলাম, হেসে-ছিলাম, ধিক্কার টিট্‌কারিতে যোগ দিয়ে-ছিলাম। বিশেষ তখন তো আমার বুঝবার বয়স নয়। কিন্তু বুঝি আর নাই বুঝি ঘটনাটা মনের মধ্যে রয়ে গিয়েছিল। তারপরে কালক্রমে নিজের দুঃখের সঙ্গে ওই সাব-জজ বাবুর দুঃখ জড়িয়ে নিজের অভিজ্ঞতার পরিপূরক সাব-জজ বাবুর ওই অভিজ্ঞতাকে ক'রে নিয়ে এতদিনে ব্যাপারটার রহস্য যেন বুঝেছি।

দুইগলাই নীরব। সে বলিয়া চলিল—ওই যে ক্ষুধিত লোকগুলিকে খাওয়াবার জন্যে শহরের লোক এত আগ্রহ প্রকাশ করেছিল—সংসারে ক্ষুধার ওই এক মূর্তি। তার আর এক মূর্তি সাবজজ বাবুর কলমির হাত ধরে টান দেওয়াতে। মানুষে শুধু কার্যটাই দেখে, কিন্তু যে দীর্ঘ কারণ পরম্পরার ঠেলায় কার্যটা অনিবার্য হ'য়ে ওঠে তা তাদের চোখে পড়ে না। ক্ষুধার এক মূর্তিকে তৃপ্ত করা ধর্মকার্য বলে মনে করি—অথচ ক্ষুধার আর মূর্তিকে...কি বলবো...এই অন্ধকারেও বলতে সংকোচ বোধ হচ্ছে! কিন্তু যা সত্য তা অন্ধকারেও সত্য! অতি পবিত্র চন্দন কাঠের আগুনেও তো হাত পোড়ে! একে তোমরা দুর্নীতি বলে সমর্থন না করতে পারো—অন্তত সত্য বলে স্বীকার করে নেবার সাহস যেন থাকে। সত্য যদি মুখনিবাসী হ'ত, তবে মুখ চাপা

দিয়ে সত্যকে থামানো যেতো। কিন্তু যার বাস মানুষের স্বভাবের মধ্যে, তাকে থামাবে কি ক'রে? হিতোপদেশ, চাণক্যশ্লোক, বোধোদয় দিয়ে স্বভাবের সেতুবন্ধ সম্ভব নয়।

—তাই তুমি নিবারণকে—

...হ্যাঁ, তাই আমি তাকে অতি শীঘ্র বিয়ে করে ফেল্‌তে বলি। স্ত্রীর মৃত্যুতে অবশ্যই তার দুঃখ হ'য়েছে, কিন্তু সেটা মনের ধর্ম। মন দুঃখিত বলে কি দেহ তার ধর্ম ভুলবে? কেন ভুলবে? আর মানুষ মাত্রেই দেহধর্মের বশীভূত। স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণকেও দেহধর্মের নিয়মে প্রাণত্যাগ করতে হয়েছিল।

..."বেরিলি কি বাজার মে পানি গিরারে
-আউর লাঠি গিরা রে।"

গাড়ির অপর প্রান্তের পিণ্ডীভূত জনতার কণ্ঠ হইতে গান উঠিল—'বেরিলি কি বাজার মে।' বেরিলির বাজারের এই অদ্ভুতপূর্ব পতনের শব্দে এতক্ষণের চট্‌কা ভাঙিয়া পার্শ্ববর্তী বাস্তবে ফিরিয়া আসিলাম।

বেরিলির সংগীতে মনে হইল রাত্রি ভোর হইয়া আসিয়াছে, নিদ্রিত জনপিণ্ড সহজাত শক্তির বলে তাহা যেন বুঝিতে পারিয়াছে। ওঃ, গাড়ির মধ্যে এত ধোঁয়া জমিয়াছে যে কামরাখানা শিকলে বাঁধা না থাকিলে এতক্ষণে বেলুনের মতো আকাশপথে উড়িতে সুরু করিত। কাঁচের শার্সির দিকে তাকাইয়া মনে হইল বাহিরের গাছপালার একটা ঝাপসা রেখা যেন দৃশ্যমান; যেন রবার দিয়া ঘষিয়া মোছা পেন্সিলের অস্পষ্ট দাগ —আর তার উপরে গোটা কয়েক তারা! একবার জানালাটা খুলিয়া দিলে মন্দ হইত না। কিন্তু অনুরোধ করিলে কেহ উঠিবে না, নিজে উঠিয়া খুলিতে গেলে পার্শ্ববর্তী নিদ্রাভাবাতুর দেহটাকে আরও একটু এলাইয়া দিয়া আমাকে স্থানচ্যুত করিবে। রাত্রিশেষের শেষ মুহূর্তে সকলেই সারা রাত্রির বিঘ্নিত নিদ্রার শোধ তুলিয়া লইতে ব্যস্ত। অতএব পূর্ববৎ পড়িয়া থাকিয়া কাঁচের শার্সির ঘষা রেখাটার দিকে তাকাইয়া রহিলাম। তিন-গলাই স্তব্ধ—বহুক্ষণের আলাপে ক্লান্ত কিম্বা হঠাৎ হয়তো ঘুমের দুরাশা তাহাদের পাইয়া বসিয়াছে। ওদিকে বেরিলি বাজার শ্রেণীর সংগীত সত্ত্বেও গাড়িটা অস্বাভাবিক-ভাবে নিস্তব্ধ। হয়তো আমার কান তেমন সজাগ নয় বলিয়াই স্তব্ধ মনে হইতেছিল-মনের মধ্যে সাবজজ বাবু ও নিবারণ সঞ্চরণ করিয়া ফিরিতেছিল। নিবারণবাবু কি কাল-ক্রমে সাবজজবাবুতে পরিণত হইবে না? না, কুলিনের ছেলে ভাসিয়া ওঠামাত্র ঘটক বোয়ালে গ্রাস করিয়া ফেলিবে? দুটাই সমান দুঃখকর। সাবজজবাবুর পরিণাম দুঃখের, কিন্তু তাই বলিয়া সদ্য বিগতপত্নীক শানাই বাজাইয়া পুনরায় বিবাহে চলিয়াছে—এ চিত্রও কম মর্মান্তিক নয়। সংসারের পথ সুখদুঃখের মধ্যগামী হইলে সংসার এমন দুর্বিসহ হইত না; সংসারে পথের একদিকে এক রকম দুঃখ, আর একদিকে আর এক রকম দুঃখ; একদিকে তার অতলস্পর্শী খাদ, অপর দিকে আকাশস্পর্শী চূড়া—যতো বুদ্ধিমানই হও না কেন, এক সঙ্গে দুটো আশঙ্কা হইতে পরিত্রাণ কখনই পাইবে না। সংসারে সেই বুদ্ধিমান, সেই সৌভাগ্যবান্, তাহাকেই আমরা ঈর্ষা করি, যে দুটো মারের মধ্যে একটাকে বাঁচাইয়া যাইতে পারে। অধিকাংশ পথিকেই দুই হাতের মার খায়।

বাহিরে বনরেখার একটানা ঝাপসা ইতি-মধ্যে স্বতন্ত্র হইয়া বৃক্ষত্ব পাইয়াছে। আকাশের তারা দুটো নাই। গরমের দিন হইলে এতক্ষণে বেশ আলো হইত। গাড়িটা গোটা কয়েক বিষম ঝাঁকুনি দিয়া অনেকগুলো লাইন পার হইল। গতিও কমিয়া আসিয়াছে, বোধ হয় কোন স্টেশন আসন্ন।

এতক্ষণে সরুগলা, মোটাগলা, ভাঙাগলার চেহারা দিব্যি পরিস্ফুট হইয়া উঠিয়াছে; তাহাদের স্বরে, মতে, চেহারায় বেশ মিলাইয়া লইয়াছি। গাড়ির শূন্যে আকাশ কালো মাথায় এবং ক্লান্ত চোখে ভরিয়া গিয়াছে, এতক্ষণ যাহারা নানা অপ্রত্যাশিত স্থানে, অসম্ভাবিত আকারে ঘুমাইতেছিল, এবারে তাহারা জাগিয়া উঠিয়া বসিয়া রাত্রের অভদ্রতা, পদাঘাত প্রভৃতির জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া আসন্ন স্টেশনের চায়ের অপেক্ষায় উৎসুক হইয়া আছে।

চায়ের আগ্রহ আমারও ছিল, তাই গুটি গুটি বাঙ্ক হইতে নামিয়া বেঞ্চির এক টেরে বসিলাম। কিন্তু মনে চায়ের আগ্রহের চেয়েও বেশি ছিল নিবারণকে দেখিবার ইচ্ছা। ভাঙা-গলার ওকালতিতে মনঃস্থির হইয়া গিয়াছিল যে নিবারণের বিবাহ করা উচিত—কিন্তু তৎপূর্বে একবার নিবারণকে দেখিতে পাইলে হইত।

রানাঘাট। চা, খাবার, কাগজ, গরম দুধের বহুবিধ চিৎকারে যেন শব্দের মৌচাক ভাঙিয়া পড়িল। সব চেয়ে বেশি জটলা ধূমায়িত চায়ের স্টলের কাছে। প্রাতঃকালের কুয়াশা, উনুনের ধোঁয়া, পেয়ালার বাষ্প মিলিয়া বেশ একটা নীহারিকালোকের সৃষ্টি করিয়াছে।



"নিবারণ, নিবারণ,......কেমন ছিলে?"

তিন গলা একত্র হইয়া গলা ভিজাইবার জন্য জানলা দিয়া ঝুঁকিয়া পড়িয়া চা-করের উদ্দেশে ডাকাডাকি করিতেছে। এমন সময়ে সরুগলা হাঁকিয়া উঠিল—নিবারণ, নিবারণ রাতে ঘুম হ'য়েছিল তো? কেমন ছিলে?

চায়ের উমেদারদের মধ্যেই নিবারণ এক-জন। আমি নিবারণকে চিনিতাম না, কিন্তু চিনিবার প্রয়োজনও ছিল না—সহস্রের জনতার মধ্যেও তাকে বাছিয়া লইতে পারিতাম। মানুষের মুখে চোখে হাবেভাবে সর্বাঙ্গে যে এমন সূচীভেদ্য নৈরাশ্য থাকিতে পারে, তাহা না দেখিলে কখনই বিশ্বাস করিতে পারিতাম না। মেঘলা রাত্রের কুয়াশায় দিক্‌ভ্রান্ত নাবিকের মতো তার ভাব। চুল রুক্ষ্ম, দাড়ি গজাইয়াছে, কাপড়-জামা এলোমেলো—চোখের অনাসক্ত উদাস

দৃষ্টি। চা-পান করিবার আশায় সে দোকানে গিয়াছিল, কিন্তু চাহিতে ভুলিয়া গিয়াছে। তিন গলার তাহার নাম ধরিয়া ডাকাডাকিতে একবার সে ফিরিয়া তাকাইল বটে, কিন্তু উত্তর দিল না। অর্থ বুঝিয়াছে বলিয়া মনে হইল না। সে যেন এক জগতের লোক, এই সব আনাগোনা, ভালমন্দর সঙ্গে যেন তাহার কোন সম্বন্ধ নাই। দুঃখের মূর্তি দেখিয়াছি, কিন্তু পরিপূর্ণ নৈরাশ্যের মূর্তি এই প্রথম দেখিলাম। দুঃখ অন্ধকার, নৈরাশ্য কুয়াশা; দুঃখ বিশ্বকে ঢাকিতে গিয়া অন্তত নিজকে প্রকাশ করে, কুয়াশা বিশ্বকেও ঢাকে নিজকেও প্রকাশ করিতে পারে না; দুঃখ দুর্বিষহ, নৈরাশ্য অসহ্য। নিবারণের পত্নীবিয়োগের নৈরাশ্য। আমি চা-পান করিতে ভুলিয়া গিয়া চুপ করিয়া রহিলাম। ভাবিতেছিলাম কি? হয়তো রাত্রির তর্কের জের টানিয়া সত্যই কিছু ভাবিতেছিলাম; কিন্তু না, না, নিবারণের বিবাহের প্রশ্ন আর উঠিতেই পারে না। গাড়ি ছাড়িয়া দিল। তিনজনে নিবারণকে ডাকিতে লাগিল—সে একবার তাকাইল, কিন্তু গাড়ি ধরিবার জন্য কোনরূপ উদ্যম করিল না। সে একই স্থানে মূঢ়ের মতো দাঁড়াইয়া রহিল। শীতকালীন গাঢ় কুয়াশায় চারিদিক লুপ্ত, আজ সে কুয়াশা নিবারণের নৈরাশ্যের সঙ্গে মিলিত হইয়া যেন গাঢ়তর।

বিজ্ঞানের কথা

এক ফোঁটা জলে বিচিত্র জীব

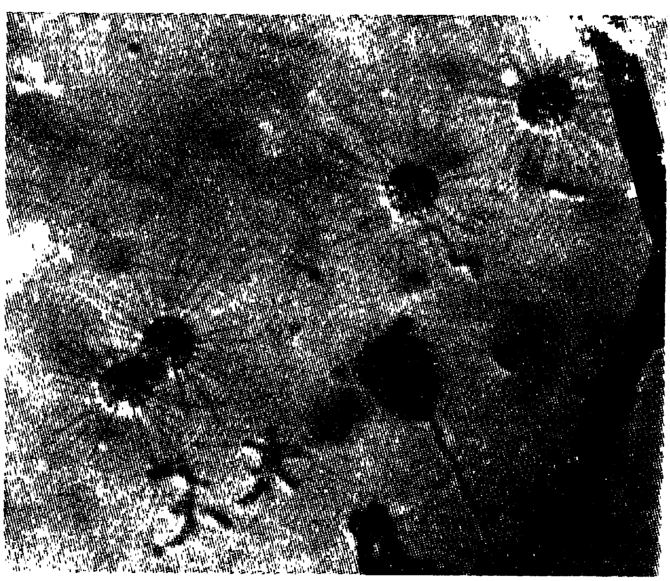
শ্রীগোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য

জলে ডুবাইয়া আঙ্গুলটাকে খাড়াভাবে তুলিয়া লইলে আঙ্গুলের ডগায় এক ফোঁটা জল লাগিয়া থাকে। এরূপে বিভিন্ন স্থান হইতে জল লইয়া বর্ণবিশ্লেষণী যন্ত্রে পরীক্ষা করিতেছিলাম। এক ফোঁটা কলের



স্টেণ্টর। বামদিকের স্টেণ্টরটি ছাতার মত মুখ বিস্তৃত করিয়া আহারান্বেষণে ব্যস্ত; ডান দিকেরটি সবেমাত্র মুখ খুলিতেছে। (প্রায় ২৫০ গুণ বর্ধিতাকারের মাইক্রো-ফটো।

জল এবং এক ফোঁটা পানা-পুকুরের জল আলোর বিপরীত দিকে ধরিলেও খালি চোখে কোনই পার্থক্য বুঝিতে পারা যায় না; কিন্তু যান্ত্রিক পরীক্ষায় উভয় জলের বর্ণালী রেখায় বেশ পার্থক্য দেখিতে পাওয়া গেল। পানা-পুকুরের জলের ফোঁটাকে তীব্র আর্ক-লাইটের বিপরীত দিকে ধরিতে ধূলিকণার মত ভাসমান কিছু পদার্থ দৃষ্টিগোচর হইল। ওগুলি সাধারণ ধূলিকণা ছাড়া আর কিছুই নয়—ভাবিয়াই নিশ্চিন্ত হইলাম, কিছুক্ষণ পরেই আবার মনে হইল—ধূলিকণা হইলে তো মাইক্রস্কোপে পরিষ্কার ধরা পড়িবে। তখন পানাপুকুরের এক ফোঁটা জল কাচের 'স্লাইডে' রাখিয়া 'কভার স্লিপ' চাপিয়া মাইক্রস্কোপের নীচে রাখিলাম। দেড়শত গুণ বড় দেখায়—এরূপ 'লেন্স' 'ফিট' করিয়া সুইচ টিপিয়া দিতেই এক অদ্ভুত দৃশ্য নজরে পড়িল। পূর্বে কখনও এরূপ দৃশ্য প্রত্যক্ষ করি নাই। দেখিলাম সেই এক ফোঁটা জলের মধ্যে উদ্ভিদের বিভিন্ন অংশ এবং অসংখ্য রকমের আবর্জনা ইতস্তত বিক্ষিপ্তভাবে পড়িয়া রহিয়াছে। 'কভার-স্লিপের' তলায় এক পাশে কয়েকটা উদ্ভিজ্জ পদার্থকে আকড়াইয়া ধরিয়া মুগুরের মত আকৃতি বিশিষ্ট কতকগুলি অদ্ভুত পদার্থ ক্রমশঃই যেন বড় হইয়া উঠিতেছিল। ব্যাপারটা কি দেখিবার জন্য মাইক্রস্কোপের 'আই-পিসে' দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া রাখিলাম। আট দশ সেকেণ্ডের মধ্যেই মুগুরের মত সেই অদ্ভুত পদার্থগুলি প্রায় ইঞ্চিখানেক লম্বা হইয়া গেল এবং সঙ্গে সঙ্গেই গোলাকার মাথার দিকটা হঠাৎ খুলিয়া গিয়া একটা ফানেলের আকার ধারণ করিল। সম্পূর্ণ জিনিষটাকে এখন প্রকাণ্ড একটা গ্রামোফোনের চোঙের মত মনে হইতেছিল। প্রায় প্রত্যেকটি চোঙই একবার এপাশে আবার ওপাশে হেলিতেছিল। এগুলি যে কোন জাতীয় অদ্ভুত জীব—এ সম্বন্ধে এখন আর কোন



সূচের মত কাঁটাওয়ালা গোলাকার পদার্থগুলি রেডিওল্যারিয়া নামক একপ্রকার আণুবীক্ষনিক প্রাণী। বামে—একটি হইতে অপর আর একটি রেডিওল্যারিয়া জন্মগ্রহণ করিতেছে। নীচে ভর্টিসেলা দেখা যাইতেছে। ×২৫০

সন্দেহই রহিল না; কিন্তু গ্রামোফোনের চোঙের মত আকৃতি ধারণ করিয়া এপাশ ওপাশ হেলিয়া দুলিয়া কি করিতেছে তাহা কিছুই বুঝিতে পারিলাম না। কিছুক্ষণ পরে দেখিলাম—কোন কোনটা অকস্মাৎ সঙ্কুচিত হইয়া সেই উদ্ভিজ্জ পদার্থের আড়ালে সম্পূর্ণরূপে অদৃশ্য হইয়া গেল; কিন্তু মাত্র অল্প সময়ের জন্য। পরক্ষণেই আবার ধীরে ধীরে মুগুরের আকৃতিতে আত্মপ্রকাশ করিতে লাগিল। তন্ময় হইয়া ইহাদের কাণ্ডকারখানা দেখিতেছি হঠাৎ কোন কারণে আলোর ঔজ্জ্বল্য কমিয়া গেল। পুনরায় আলোর ব্যবস্থা করা পর্যন্ত 'স্লাইডখানা' অন্ধকারেই ছিল। আলো ঠিক হইবার পর দেখি—সেই অদ্ভুত জীব



লম্বা লেজওয়ালা ষ্টেণ্টর। ম.ইক্রো-ফোটো×২৩০

একটিও নাই। সব অদৃশ্য হইয়াছে, অন্ধকারে আত্মগোপন করাই ইহাদের স্বভাব। তখন পয়েণ্টো-লাইটের তীব্র আলোর ব্যবস্থা করিলাম। প্রায় ৫।৭ মিনিটের মধ্যেই একটি একটি করিয়া সেই অপূর্ব জীবগুলি পুনরায় বাহির হইতে লাগিল। তীব্র আলো প্রক্ষেপের ফলে এবার চোঙের প্রান্ত-ভাগের বড় গোলাকার বেড়টায় চতুর্দিকে সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম কি যেন কতকগুলি পদার্থ সমান তালে নাড়িতেছে বলিয়া বোধ হইল। মাইক্রোস্কোপের 'পাওয়ার' দেড়শ' হইতে দুইশ' বাড়াইয়া দিলাম। এবার স্পষ্ট দেখিতে পাওয়া গেল—ছাতার মত গোলাকার মুখটার চতুর্দিকে সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম লেজের মত অসংখ্য পদার্থ সারিবন্ধভাবে সজ্জিত রহিয়াছে। তাহারা অতি দ্রুতগতিতে পর পর জলের মধ্যে দাঁড়ের মত ধাক্কা দিতেছে। ইহার ফলে, অতি সতর্ক দৃষ্টিতে লক্ষ্য করিলেও মনে হইবে চোঙের প্রান্তভাগের গোলাকার একটা অংশ যেন বনবন করিয়া ঘুরিতেছে। কিন্তু চোঙের প্রান্তভাগের এই সূক্ষ্ম পদার্থ-গুলির জলের মধ্যে অনবরত এরূপ আঘাত করিবার কারণ কি? কারণ আর কিছুই নহে—ইহা তাহাদের খাদ্য আহরণের কৌশল মাত্র।

এই অপরূপ প্রাণিগুলি ষ্টেণ্টর নামে পরিচিত, ইহাদের জাতিভেদও কম নহে। ময়লা জলের মধ্যে ৬।৭ রকমের বিভিন্ন জাতীয় ষ্টেণ্টরের সাক্ষাৎ পাইয়াছিলাম। তাহাদের কথা পরে বলিতেছি। হর্ণের মত প্রশস্ত গোলাকার দিকটাই ষ্টেণ্টরের মুখ। এই ছত্রাকার প্রশস্ত মুখের বিপরীত দিকে সূঁচালো প্রান্তের সাহায্যে ষ্টেণ্টর কোন কিছু শক্ত পদার্থ আঁকড়াইয়া ধরিয়া শরীরটাকে প্রসারিত করিয়া দেয় এবং এদিক ওদিক হেলিয়া আশে পাশের বিভিন্ন স্থান হইতে খাদ্য সংগ্রহ করে। ইহাদের খাদ্য সংগ্রহ প্রণালী অত্যন্ত অদ্ভুত। আমাদের পরিচিত অসংখ্য রকমের প্রাণীদের মধ্যে কেহ এই উপায়ে খাদ্য সংগ্রহ করে বলিয়া মনে হয় না। মাইক্রস্কোপের শক্তি বাড়াইয়া দেওয়ার পর ওই এক ফোঁটা জলের মধ্যেই আরও অনেক রকমের অদ্ভুত জীবন্ত প্রাণী নজরে পড়িল। ইহাদের মধ্যে আলপিনের সূক্ষ্ম মুখ অপেক্ষাও ক্ষুদ্রাকার কতকগুলি প্রাণী ছুটাছুটি করিয়া বেড়াইতেছিল। কিছুক্ষণ লক্ষ্য করিবার পর চোখ অভ্যস্ত হইয়া উঠিলে দেখিতে পাইলাম—ষ্টেণ্টরের দেহের ছত্রাকার প্রান্তে অবস্থিত লেজের মত সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম পদার্থগুলির আঘাতে জলের মধ্যে আবর্তের মত একটা প্রবল স্রোতের সৃষ্টি হইতেছে। জলে আঘাত করিবার অদ্ভুত কায়দায় চোঙের প্রসারিত মুখের মধ্য দিয়া স্রোত প্রবলবেগে ভিতরে প্রবেশ করিয়া পুনরায় এক পাশ দিয়া বাহির হইয়া যাইতেছে। স্রোতের টানে কণিকার মত সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম প্রাণিগুলিও ষ্টেণ্টরের মুখের মধ্যে চলিয়া যাইতেছে। কিন্তু একবার ষ্টেণ্টরের পেটে ঢুকিলে জলের সঙ্গে তাহাদের বাহিরে আসিবার আর উপায় থাকে না। কারণ যে পাশ দিয়া জলটা বাহির হইয়া আসে, তাহার মুখেই অদ্ভুত রকমের একটা 'ভাল্‌ভের' বন্দোবস্ত আছে। 'ভাল্‌ভ' জলটাকে ছাড়িয়া দেয়, কিন্তু সূক্ষ্ম প্রাণিগুলিকে আটক করে। এইগুলিই ষ্টেণ্টরের উদর পূরণ করিয়া থাকে। ষ্টেণ্টর কর্তৃক উৎপন্ন এই জলস্রোত এতই প্রবল যে, আণুবিক্ষণিক প্রাণিগুলি আপন মনে ছুটাছুটি করিতে করিতে একবার ইহার কাছাকাছি আসিয়া পড়িলে আর রক্ষা নাই। প্রাণপণে তাহারা ইহার আকর্ষণ এড়াইবার বিরাট চেষ্টা করিলেও জলের টানে নেহাৎ অসহায় অবস্থায় ষ্টেণ্টরের বিরাট মুখগহ্বরে নিক্ষিপ্ত হয়। এক জায়গার শিকার নিঃশেষ হইয়া আসিলে ষ্টেণ্টর শরীরটাকে মুহূর্তের মধ্যে সঙ্কুচিত করিয়া ফেলে এবং অনেকটা লবঙ্গের মত আকৃতি ধারণ করিয়া শোঁ করিয়া অন্যত্র ছুটিয়া যায়। মনে হয় যেন জলের নীচে একটা টর্পেডো ছুটিয়া গেল। নূতন স্থানে উপস্থিত হইয়া শরীরটাকে পূর্বের ন্যায় প্রসারিত করিয়া পুনরায় আহার সংগ্রহে ব্যাপৃত হয়।

এই ষ্টেণ্টরগুলির সঙ্গে বিভিন্ন জাতীয় আরও দুই তিন রকমের ষ্টেণ্টরও আহার সংগ্রহে ব্যাপৃত ছিল। তাহাদের মধ্যে একজাতীয় বৃহদাকৃতির ষ্টেণ্টরের কথা বলিতেছি। পূর্ব বর্ণিত ষ্টেণ্টর অপেক্ষা ইহারা প্রায় ৮।১০ গুণ বেশী লম্বা। মনে



ধূমকেতুর মত বিরাট পুচ্ছবিশিষ্ট একজাতির রটিফার। ×২০০

হয় যেন একটা লম্বা বোঁটার ডগায় একটা রজনীগন্ধা ফুলের কুঁড়ি আধা ফোটা অবস্থায় রহিয়াছে। এই ফুলের কুঁড়ির মত পদার্থটা কখনও সম্পূর্ণভাবে প্রস্ফুটিত হয় না। এত বড় পদার্থটা বিশ্রাম করিবার সময় অথবা কোন কারণে ভয় পাইলে সঙ্কুচিত হইয়া অতি সামান্য একটু জেলীর পিণ্ডের আকার ধারণ করে। আহার সংগ্রহের প্রয়োজন হইলেই ধীরে ধীরে লম্বা হইতে থাকে এবং আধ ফোটা ফুলের কুঁড়ির মত মুখের ভিতর হইতে আঁকাবাঁকা শুঁড়ের মত একটি লম্বা পদার্থ বাহির করিয়া দেয়। এই শুঁড়ের সাহায্যেই ইহারা ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র আণুবীক্ষণিক প্রাণিগুলিকে ঝাঁটাইয়া মুখের মধ্যে লইয়া আসে। মাইক্রস্কোপের নীচে দুইশত হইতে আড়াই শত গুণ বর্ধিতাকারে এই অদ্ভুত প্রাণীগুলিকে দেখিলে আতঙ্কে শরীর শিহরিয়া উঠে।

সেই একফোঁটা ময়লা জলের মধ্যে ইতস্তত বিক্ষিপ্তভাবে আরও কতকগুলি অদ্ভুত প্রাণী দেখিতে পাইলাম। এইগুলিকে দেখিতে অনেকটা বড় এলাচের মত। প্রত্যেকটা এলাচই যেন একটা স্থূলকায়


শীর্ষের
চারিটি
ব্রিজ খেলার "নো ট্রাম্পের" চারটি টেক্কার মতই জুয়েলের সুপ্রসিদ্ধ কেশতৈল চতুষ্টয় — ইহাদের দীর্ঘস্থায়ী সুরভি ও অনুপম গুণের জন্যই তৈলজগতে শীর্ষস্থান অধিকার করিয়া শ্রেষ্ঠ সম্মান লাভ করিয়াছে।
কোকোলা
কল্যানী
জুয়েল আমলা
ত্রিগুণ
কেশ তৈল
জুয়েল অফ্ ইণ্ডিয়া, কলিকাতা

বোঁটার সাহায্যে কোন কিছু আবর্জনার সহিত আটকাইয়া রহিয়াছে। অনেক সময়েই ইহারা আবর্জনার আড়ালে ক্ষুদ্র একবিন্দু জেলীর মত চুপ করিয়া পড়িয়া থাকে। আহার করিবার সময় হইলে অথবা তীব্র আলোকপাত করিলেই ইহারা ধীরে ধীরে বর্ধিত হইয়া এলাচের আকৃতি ধারণ করে। এলাচের মত পদার্থটার সম্মুখের দিকটা ঘটের গলার মত সরু। এলাচের মত আকৃতি ধারণ করিবার পর ভিতর হইতে একটা সরু দণ্ড এবং পাশাপাশি সংস্থাপিত দাঁতওয়ালা একজোড়া চাকা বাহির করিয়া দেয়। দাঁত-ওয়ালা চাকা দুইটিকে বন্‌বন্‌ করিয়া ঘুরিতে দেখা যায়। আসলে কিন্তু চাকা দুইটা মোটেই ঘোরে না। চাকার দাঁতগুলি সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম লেজের মত পদার্থ দ্বারা গঠিত। লেজের মত পদার্থগুলি পরপর অতি দ্রুতগতিতে জলে ধাক্কা দিতে থাকে। ইহার ফলেই চোখের ভুলে চাকা দুইটি ঘুরিতেছে বলিয়া মনে হয়। এইভাবে ইহারা সেই এক ফোঁটা জলের কোন এক ক্ষুদ্রতম অংশে প্রবল স্রোত উৎপন্ন করিয়া ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জীবাণুগুলিকে মুখের মধ্যে লইয়া আসে। এই সময় এলাচের মত পদার্থটার স্ফীত অংশের দিকে তাকাইলে এক অদ্ভুত ব্যাপার দেখিতে পাওয়া যায়। এলাচের মত পদার্থটা সম্পূর্ণ স্বচ্ছ; তাহার ভিতরের জিনিস দেখিতে কোনই অসুবিধা হয় না। ইহা যেন একটি এঞ্জিন ঘর, মোটর এঞ্জিনের মত যেন একটা এঞ্জিন চলিতেছে। একটা ব্যাগের মত পদার্থের মধ্যে একটা 'পিস্টন-রড' অনবরত উঠানামা করিতেছে। ব্যাগটা দ্রুতগতিতে সংকুচিত ও প্রসারিত হইতেছে। এই অদ্ভুত প্রাণীগুলি 'রটিফার' নামে পরিচিত। ইহাদের দেহের পশ্চাদ্‌ভাগ ক্রমশ সূচালো হইয়া



স্টেণ্টর—গ্রামোফোনের চোঙের মত মুখ হাঁ করিয়া আহার সংগ্রহে ব্যাপৃত। অপরটি সবেমাত্র শরীর বাড়াইতেছে। মাইক্রো-ফোটো প্রায় ×২০০

গিয়াছে। এই সূচালো প্রান্তে মুরগীর পায়ের নখের মত তিনটি ধারালো নখ আছে। এই নখ দিয়াই ইহারা কোন কিছুর গায়ে আটকাইয়া থাকে। বিভিন্ন জাতীয় রটিফারের সংখ্যাও কম নহে। এক রকমের রটিফার দেখা যায় যাহাদের মুখের সম্মুখভাগে চাকার মত পদার্থ দুইটি থাকে না। কিন্তু লাঠির মত একটি সরল দণ্ড বাহির হইয়া আসে। ইহারা প্রায় জোঁকের মত ভঙ্গীতে হাঁটিয়া বেড়ায়। এই প্রাণীগুলির দৈহিক গঠন লম্বাটে ধরণের। পচা জলের মধ্যে ইহাদিগকে একসঙ্গে হাজারে হাজারে জন্মিতে দেখা যায়। এই জাতীয় এক ধরণের প্রাণীর আবার মুখের কাছে লাঠির মত দণ্ড অথবা চাকার মত কোন পদার্থেরই অস্তিত্ব নাই। ইহাদের মুখের খাঁজকাটা বেড় হইতে অসম্ভব রকমের লম্বা, ধূমকেতুর পুচ্ছের মত গোছায় গোছায় অসংখ্য সূক্ষ্ম তন্তু বাহির হইয়া থাকে। এই তন্তুর জালে আটকাইয়া অতি ক্ষুদ্রকায় প্রাণীরা ইহাদের উদরস্থ হইতে বাধ্য হয়।

এই এক ফোঁটা জলের মধ্যে রটিফার, স্টেণ্টর প্রভৃতি ছাড়াও আরও অনেক রকমের আণুবীক্ষণিক প্রাণী বিচরণ করিতেছিল; কিন্তু তাহাদের সকলের বিষয় আলোচনা করিতে গেলে প্রবন্ধের কলেবর বর্ধিত হইয়া পড়ে। কাজেই আর দুই একটি প্রাণীর কথা বলিয়াই শেষ করিব। 'স্লাইড'খানাকে এক-দিকে একটু সরাইতেই আর এক প্রকারের অদ্ভুত জীব নজরে পড়িল। সামান্য একটু আবর্জনার মত পদার্থের গায়ে ইহারা আটকাইয়া ছিল, এই প্রাণীগুলিকে দেখিতে অনেকটা ঘণ্টার মত। ঘণ্টাগুলি এক একটা লম্বা দড়ির সাহায্যে যেন আবর্জনার সহিত নোঙর করিয়া রহিয়াছে। এই প্রাণীগুলির



রটিফার আহার সংগ্রহে ব্যস্ত। মুখের সম্মুখস্থ চক্রবৎ পর্দাগুলির পরিষ্কার প্রতিকৃতি তোলা সম্ভব হয় নাই। ×২০০

নাম ভর্টিসেলা। ইহারা একই স্থানে অনেকে মিলিয়া পাশাপাশিভাবে অবস্থান করে। ঘণ্টার প্রশস্ত চক্রাকার মুখের চতুর্দিকে খুব সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম পাতলা পাতের মত পদার্থ পর পর সজ্জিত। এই পাতলা পাতগুলি দ্রুতগতিতে আন্দোলিত করিয়া ইহারা জলের মধ্যে স্রোত উৎপন্ন করে এবং স্টেণ্টরের মতই আহার সংগ্রহ করিয়া থাকে। তবে একটা বিশেষত্ব এই যে, মুখের মধ্যে কোন খাদ্য-বস্তু প্রবেশ করিবামাত্রই ইহারা হঠাৎ একটা ঝাঁকুনি দিয়া আশ্রয়স্থলের আড়ালে চলিয়া যায়। লম্বা দড়ির মত পদার্থটা সঙ্গে সঙ্গে স্প্রিংয়ের মত গুটাইয়া ছোট হইয়া পড়ে। খানিকক্ষণ বাদেই আবার ধীরে ধীরে স্প্রিংয়ের পাক খুলিয়া উপরের দিকে উঠিয়া খাদ্য সংগ্রহে মনোনিবেশ করে।

এই ভর্টিসেলাগুলির আশেপাশে ইতস্তত



ভর্টিসেলা। এক ফোঁটা ময়লা জলে এরূপ অসংখ্য ভর্টিসেলা দেখিতে পাওয়া যায়। মাইক্রো-ফোটো—প্রায় ×২৩০

বিক্ষিপ্তভাবে ঝাউ ফলের মত কয়েকটি গোলাকার পদার্থ নিশ্চলভাবে পড়িয়া রহিয়াছে দেখিতে পাইলাম। ইহাদের সর্বাঙ্গ সূচের মত কতকগুলি লম্বা লম্বা কাঁটায় আবৃত। সাধারণত দেখিয়া ইহাদিগকে কোন জীবন্ত প্রাণী বলিয়াই মনে হয় না। কিন্তু কিছুক্ষণ লক্ষ্য করিয়া দেখা গেল—ইহারা ধীরে ধীরে এক স্থান হইতে অন্য স্থানে সরিয়া যাইতেছে। আরও কিছুক্ষণ অপেক্ষা করিবার পর দেখিলাম—ঐরূপ একটা ঝাউ ফলের মত পদার্থের শরীরের এক পাশে ছোট্ট একটা বুদ্বুদের আবির্ভাব ঘটিল। বুদ্বুদটা ক্রমশ বড় হইতে হইতে ঠিক সমান আকারের আর একটা ঝাউ ফলে পরিণত হইল। কিছুক্ষণ পরে উভয়ে বিচ্ছিন্ন হইয়া গেল। ইহাই তাহাদের বংশ বিস্তারের রীতি। ইহারা রেডিওল্যারিয়া নামক এক জাতীয় প্রোটোজোয়া।

ব্যবসা ও বাণিজ্য

ক্রোমাইট

শ্রীকালীচরণ ঘোষ

ক্রোমাইটের সন্ধান হইতে ক্রোমিয়মের ব্যবহারের মধ্যে বহুকাল ব্যবধান রহিয়া গিয়াছে। ক্রোমাইট প্রস্তরের স্বতন্ত্র পরিচয় হয়, প্রায় দুই শতাব্দীর পূর্বে; আর বিজ্ঞানের প্রসার ও তড়িৎ-শক্তির বহুল ব্যবহার ক্রোমাইটের ব্যাপক ব্যবহার সম্ভব করিয়াছে; সুতরাং ক্রোমাইটকে আত্মপ্রতিষ্ঠ হইতে যে বহুকাল অপেক্ষা করিতে হইয়াছে তাহা সহজেই অনুমান করা যায়।

ক্রোমাইট বা ক্রোমিয়ম

ক্রোমাইট অপরাপর প্রস্তর হইতে ভিন্ন বস্তু বলিয়া ১৭৬২ সালে লেহ্‌মান (Lehman) জগতে প্রথম প্রচার করেন। তাহার পর ছত্রিশ বৎসরকাল বাদে খনিজ সীসক প্রস্তর বা Crocoite (Lead Chromate)এর মধ্যে ১৭৯৮ সালে ক্ল্যাপরথ (M. H. Klaproth) ও ভকোয়েলিন (L. N. Vauquelin) নূতন মৌলিক ধাতু ক্রোমিয়মের সন্ধান পান; এই দুই বৈজ্ঞানিক বিশেষ চেষ্টা সত্ত্বেও ক্রোমিয়মকে স্বতন্ত্র করিতে পারেন নাই। ১৮৫৯ সালে ওহ্‌লার (F. Wohler)-এর জন্য এই যশঃ নির্দিষ্ট ছিল। তিনি ক্রোমিয়মকে স্বতন্ত্র করিয়া জগৎকে উপহার দেন। কিন্তু তাহা সম্পূর্ণভাবে রাসায়নিক পরীক্ষাগারের মধ্যেই নিবদ্ধ ছিল। পরবর্তীকালে প্রয়োজনের অনুপাতে ক্রোমিয়ম উদ্ধার করা হইয়াছে এবং প্রচুর পরিমাণে ব্যবহৃত হইতেছে।

খনির কাজ

ক্রোমাইট দেখিতে সামান্য বাদামী (brown) আভাযুক্ত কৃষ্ণবর্ণ প্রস্তর; উৎকৃষ্ট গুণসম্পন্ন প্রস্তরে উজ্জ্বলতা দৃষ্ট হয়। ক্রোমাইট প্রস্তর অত্যন্ত কঠিন; সংলগ্ন প্রস্তরাদি হইতে সাধারণত গাঁতি প্রভৃতি খননযন্ত্র দ্বারা বিচ্ছিন্ন করা কষ্টসাধ্য; সেই কারণে বিস্ফোরকের সাহায্য গ্রহণ করা হয়। অধিকাংশ ক্ষেত্রে উপর হইতে অপ্রয়োজনীয় মৃত্তিকা প্রস্তরাদির স্তর দূর করিয়া ক্রোমাইট স্তরে পৌঁছিলে ক্রোমাইট প্রস্তর উদ্ধার করা আরম্ভ হয়। ইহা ইংরাজিতে open cast বা quarry method বলিয়া পরিচিত। সাধারণত নয় ইঞ্চি হইতে এক ফুট স্তরে ক্রোমাইট অবস্থান করে। কিন্তু খনির ভাণ্ডারের পরিমাণ কোথাও কোথাও এত বেশী যে এই খাদের বিরাট প্রসারও দেখা যায়। নিউ ক্যালিডোনিয়ার এক খাদ হইতে অন্তত দুই লক্ষ টন ক্রোমাইট পাওয়া গিয়াছে।

খাদ হইতে ক্রোমাইট প্রস্তর উদ্ধার করিবার পর যদি তাহাতে অপ্রয়োজনীয় প্রস্তরাদি সংযুক্ত থাকে তাহা হইলে হাতুড়ি দ্বারা আঘাত করিয়া তাহা দূর করা হইলে বিশুদ্ধ ক্রোমাইট স্বতন্ত্র করিয়া রাখা হয়। কোনও কোনও সময় যন্ত্র দ্বারা অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্রাকারে পরিণত করিয়া লইলে কাজের সুবিধা হয়।

ক্রোমাইটের সন্ধান

১৮৭৯ সালে ভারতবর্ষে ক্রোমাইটের প্রথম সন্ধান পাওয়া গেলেও ১৯০১ সালের পূর্বে ইহা নিশ্চিতরূপে জানা যায় নাই। ঐ বৎসর ভ্রেডেনবার্গ (E. Vredenburg) বালুচিস্থান জোব (Zhob) উপত্যকায় অবস্থিত হিন্দুবাগের সন্নিকটে এবং পিসিন উপত্যকার উপরাংশে অবস্থিত খানোজাই (Khanozai)র নিকটস্থ পর্বতমালায় অপরাপর প্রস্তরের সহিত ঘনসন্নিবিষ্টভাবে যুক্ত ক্রোমাইট দেখিতে পান। খানোজাই-এর প্রায় দুই মাইল পূর্বদিকে দৈর্ঘ্যে ৪০০ এবং প্রস্থে ৫ ফুট প্রায় বিশুদ্ধ ক্রোমাইটের এক খণ্ড লক্ষ্য করেন।*

পরে ভারতবর্ষের অপরাপর অংশে ক্রোমাইটের সন্ধান পাওয়া গিয়াছে; প্রদেশগুলির নামের বাঙলা বর্ণানুক্রমিক ধারায় উহাদের আলোচনা করা যাইতেছে।

ঈস্টার্ন স্টেট্‌স্‌ এজেন্সী

ঈস্টার্ন স্টেটস্‌ এজেন্সীর মধ্যে সেরাই-কেলা রাজ্যে ক্রোমাইটের ভাণ্ডার আছে এবং ভারতবর্ষে প্রতি বৎসর উৎখাত পরিমাণের মধ্যে তাহার যৎসামান্য অংশ বর্তমান। সেরাইকেলার পার্শ্বে অবস্থিত যোযোহাটু হইতে ১২ মাইল দূরে, কারাইকেলার জানোয়া ও রঞ্জাকোচা হইতে ক্রোমাইট প্রস্তর পাওয়া গিয়াছে।† এই প্রস্তর তত গুণশালী না হইলেও আশা করা যায় অনুসন্ধান দ্বারা উৎকৃষ্টতর প্রস্তর অপেক্ষাকৃত অধিক পরিমাণে পাওয়া যাইবে।

১৯০৭ সালে সাউবোলে (R Saubolle) সিংভূমে খনির অনুসন্ধান কার্য চালাইবার সময় তথায় ক্রোমাইটের নমুনা সংগ্রহ করেন; পরে যোযোহাটুর তিনটি ছোট পাহাড়, কিম্‌সি বুরু, কিট্টা বুরু এবং ইহাদের মধ্যে সমৃদ্ধতম চিটাং বুরু-তে তিনটি ভিন্ন ভিন্ন ক্ষুদ্রাকৃতি ভাণ্ডার লক্ষ্য করেন। কুলসন (Coulson A. L.) রাঁচির মধ্যে অবস্থিত সিল্লি স্টেট-এ হোটাগ পাহাড়ে এবং ভাগলপুরে "মন্দার হিল" (পাহাড়) রেলস্টেশনের প্রায় পাঁচ মাইল দূরে অবস্থিত বৈদি বা বাইদি চৌক নামক স্থানে অপরাপর প্রস্তরের সহিত মিশ্রিত অবস্থায় ক্রোমাইট আবিষ্কার করেন। হাজারিবাগ জেলায় গিরিডিতে হল্যাণ্ড (Holland) সুন্দর দানাযুক্ত ক্রোমাইট লক্ষ্য করিয়াছিলেন।

বোম্বাই ও মাদ্রাজ

জনৌলী নদীর তীরে রত্নগিরি জেলায় কানকৌলী নামক স্থানের নিকট এবং গাদ নদীর দক্ষিণে সাবন্তওয়াদী স্টেটের মধ্যে বাগদার সন্নিকটে ক্রোমাইটের অবস্থান সম্বন্ধে জানা গিয়াছে। মাদ্রাজের মধ্যে সালেম জেলা প্রধান। সালেম জেলায় "চকহিলস"

*"In one spot some two miles east of Khanozai a mass of almost pure ore measuring about 400 ft. in length and 5 ft. in breadth was found." *Rec. Geo. Sur. India*, LVII, p. 24 (1925).

† Rec. Geo. Sur. India, Vol. LXXVI, p. 22 (1941).

(Chalk Hills) বা খটিক পর্বতের কারুস্পুরে; শঙ্করীদ্রুগ-এর দক্ষিণ-পশ্চিমে কুমারাপালায়ম-এর নিকট কাবেরী তীরে ত্রিচিনপল্লীর নিকট সৌড়িচিকোলম-এ এবং চেট্টিচাভাডে জায়গীরের মধ্যে অবস্থিত ম্যাগনেসাইট স্তরের অন্তিম উত্তরাংশে ক্রোমাইট পাওয়া যায়। কৃষ্ণা জেলায় কোন্দান পল্লীতে নিম্নগুণে সম্পন্ন ক্রোমাইট আছে বলিয়া জানা গিয়াছে। যদিও অপরাপর অনেকগুলি স্তরের অবস্থান সম্পর্কে উল্লেখ করা গেল, প্রকৃতপক্ষে ইহাদের ভাণ্ডার সম্বন্ধে আরও অনুসন্ধান বাকী আছে। মহীশূরে সে হিসাবে কিছু ভিন্ন স্থান অধিকার করে।

মহীশূর

বালুচিস্থান ভারতে উৎখাত ক্রোমাইটের অর্ধেক একা এবং মহীশূর এক তৃতীয়াংশ সরবরাহ করিয়া থাকে। ১৮৯৮-৯৯ সালে শ্লেটার (H. K. Slater) মহীশূর রাজ্যে ক্রোমাইট আবিষ্কার করেন। তিনি সিমোগা জেলার হারেনহাল্লি-তে অপরাপর প্রস্তরের সহিত মিশ্রিত অবস্থায় ক্রোমাইট দেখিতে পান। বর্তমানে হাসান ও মহীশূর জেলা প্রধান কেন্দ্র বলিয়া পরিগণিত হইয়াছে। মহীশূর জেলায় সমস্ত ভাণ্ডারগুলি মহীশূর হইতে নন্দনগড় পর্যন্ত বিস্তৃত ভূভাগ সিন্ধুভল্লী, তালুর, উরাদবুর গুরুড় এবং ওয়াদ্দারপালায়াম্ স্তরগুলি ধারণ করিয়া আছে। মহীশূর জেলার প্রধান স্তর কাদাকোলা গ্রামের সন্নিকটে অবস্থিত। হাসান জেলার মধ্যে ভক্তারহাল্লি এবং বৈরাপুর হুব্রেনহাল্লির নিকট অবস্থিত স্তরই প্রধান; প্রধানত ইহারাই হাসানের সমস্ত ক্রোমাইট সরবরাহ করিয়া থাকে। কাদুর জেলায় শতকরা ত্রিশভাগ ক্রোমিক অকসাইড (Cr2 3) যুক্ত প্রস্তর উৎখাত হইয়াছে। প্রয়োজন হইলে চিতলদ্রুগ হইতেও ক্রোমাইট উদ্ধার করা যাইবে।

অপরাপর স্থান

ভারতবর্ষের মধ্যে অপরাপর যে সকল স্থানে ক্রোমাইট প্রস্তর পাওয়া যাইতে পারে তাহার মধ্যে কাশ্মীর প্রধান। লাডাক-এ দ্রাস, বেম্বাট এবং তাস্‌গম-এর নিকটে পর্বতমালার—ঊর্ধ্বতর প্রদেশে বিরাট পর্বত খণ্ডরূপে ক্রোমাইট দৃষ্ট হয়। ১৯১৯ সালে ফোর্ট সাণ্ডেমান (Fort Sandeman)-এ জেকব (Col. Jacob) ক্রোমাইট আবিষ্কার করেন। দক্ষিণ আন্দামানের পোর্টব্লেয়ারে চকরগাঁ গ্রামের দক্ষিণে এবং পোর্টব্লেয়ার-এর সন্নিকটে ক্রোমাইট আছে। গদাই-খেল কলাই-এর প্রায় এক মাইল দক্ষিণে সারাগোরাতে পর্বত হইতে বিচ্ছিন্ন (float ore) এবং স্বতন্ত্র অবস্থিত "প্রস্তর" দেখিতে পাওয়া যায়। উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে হাজারা জেলায় কাঘান উপত্যকায় ভূপ্পুর নিকটে ক্ষুদ্রাকৃতি ক্রোমাইট প্রস্তর পাওয়া যাইতেছে। পঞ্চনদের কাঙ্গড়া জেলায় সিপ্টিতে হানলেচু-র সীমা বেষ্টন করিয়া ইতস্তত বিক্ষিপ্ত ভগ্নপাষাণ স্তূপের মধ্যে ক্রোম প্রস্তরের টুকরা পাওয়া গিয়াছে। পশ্চিম ভারতের ইদার ষ্টেটে, উত্তর-পূর্ব প্রদেশে মণিপুরে মিনবু জেলায় এবং তাহারও উত্তরে সারামেটি শৃঙ্গের দিকে ও অন্যান্য স্থানে ক্রোমাইটের পরিচয় মিলিতেছে।

উৎখাত ক্রোমাইট

এতগুলি স্থানের পরিচয় থাকিলেও সকল স্থান হইতে ক্রোমাইট উৎখাত হয় না। হিসাবমত বালুচিস্থান, বিহার, ঈষ্টার্ণ ষ্টেটস্ এজেন্সী আর মহীশূর ভারতের সমস্ত ক্রোমাইট সরবরাহ করে। ১৯০৩ সালে মহীশূরে প্রথম খননকার্য আরম্ভ হয়; পরিমাণ ২৪৮ টন। পরে অপরাপর স্থানে কার্য সুরু হয়। ভারতের ক্রোমাইটের পরিচয়ের সঙ্গে সঙ্গে জগতে ইহার চাহিদা বৃদ্ধি পাইতে থাকে এবং চার বৎসরের মধ্যেই ১৯০৭ সালে উহা ১৮,৩০৩ টনে পৌঁছে। তাহার পর আট বৎসর নিতান্ত মন্দা গিয়াছে, এমন কি ১৯১০ সালে পরিমাণ ১,৭৩৭ টনে নামিলে ক্রোমাইটের বাণিজ্য সম্বন্ধে সকলে সন্দিহান হইয়া উঠে। যুদ্ধের কল্যাণে ১৯১৬ সালে পুনরায় ২০,১৫৯ হইয়া ১৯১৮ সনে ৫৭,৭৬৯ টন হইয়া তখনকার মত চূড়ান্ত হইয়া যায়। তাহার পর ১৯৩৭ সালের ৬২,৩০৭ টনই সর্বোচ্চ পরিমাণ। আজ পর্যন্ত এরূপ পরিমাণ আর কখনও উৎখাত হয় নাই। ইতোমধ্যে ১৯৩২ হইতে ১৯৩৪ পর্যন্ত আবার চাহিদা পড়িয়া যাওয়ায় ১৫,৫২৬ হইতে ২১,৫৭৬ টনের মধ্যে উঠানামা হইয়াছে। নিম্নের অঙ্ক তালিকা হইতে সমস্ত বুঝিতে পারা যাইবে :—

১৯০৩ হইতে ১৯৪০ পর্যন্ত কয়েকটি নির্দিষ্ট বৎসরের উৎখাত ক্রোমাইটের পরিমাণ ও মূল্য :—

সাল	টন	মূল্য পাউণ্ড
১৯০৩	২৪৮	—
১৯০৪	৩,৫৯৬	৪,১৩৭
১৯০৬	৪,৩৭৫	৭,১৮৮
১৯০৭	১৮,৩০৩	২৪,৪০৪
১৯০৮	৪,৭৪৫	৬,৩৩৮
১৯১০	১,৭৩৭	২,৩১৫
১৯১৫	৩,৭৬৭	৩,৫৩১
১৯১৬	২০,১৫৯	১৬,৪০১
১৯১৭	২৭,০৩১	২৬,২১৫
১৯১৮	৫৭,৭৬৯	৫২,০৬৩

ইহার পর হইতে সরকারী হিসাবে ক্রোমাইটের মূল্য (£) পাউণ্ডের স্থলে টাকায় প্রদর্শিত হইয়াছে।

সাল	টন	টাকা
১৯২০	২৬,৮০১	৭,৯৯,৬৯৮
১৯২২	২২,৭৭৭	৩,৬১,২৮৭
১৯২৪	৪৫,৪৬২	৫,৮৭,৪০২
১৯২৫	৩৭,৪৫২	৫,৩৪,২৮০
১৯২৭	৫১,২০৭	৮,৮০,৯৫৭
১৯২৯	৪১,৫৬৫	৮,৪১,৭৬৯
১৯৩০	৫০,৬৮৪	৮,৬৭,৪৫৬
১৯৩১	১৯,৯১৩	৩,১৫,০২৬
১৯৩২	১৭,৮৫৬	২,৭৫,৬৭৫
১৯৩৫	৩৯,১২৭	৪,৭৯,৯৫৭
১৯৩৬	৪৯,৪৮৬	৬,০৪,৪৯২
১৯৩৭	৬২,৩০৭	৮,০৫,৫৮৯
১৯৩৮	৪৪,১৪৯	৬,৮২,৫০২
১৯৩৯	৪৯,১০৬	৩,৩৫,৫১১
১৯৪০	৫৫,৫১১	৭,৪৩,০৩২

খনি সম্বন্ধ প্রদেশ

পূর্বে বলা হইয়াছে, সকল স্থান হইতে ক্রোমাইট উৎখাত হয় না এবং ভারতের মাত্র ছয়টি কেন্দ্র হইতে সমস্ত 'প্রস্তর' সরবরাহ করা হয়। ইহাদের প্রত্যেকের পরিমাণ ও অংশ জানিয়া রাখা প্রয়োজন। ১৯৩৮ সালের পর মোট পরিমাণ জানা গেলেও প্রত্যেক অঞ্চলের অংশ জানিতে পারা যায় নাই। সে কারণে ১৯৩৮ সালের মোট ৪৪,১৪৯ টনের মধ্যে কাহার কত অংশ তাহা স্বতন্ত্রভাবে দেওয়া হইল ঃ—

প্রত্যেক প্রদেশ হইতে উৎখাত ক্রোমাইট তাহার পরিমাণ ও শতকরা অংশ

	টন	শতকরা অংশ
বেলুচিস্থান		
কোয়েটা পিসিন	৩০৩	·৬
জোব (Zhob)	২১,৫৮৯	৪৯·০
বিহার		
সিংভূম	৫,১৯৪	১১.৭
ঈস্টার্ণ স্টেটস এজেন্সী		
সেরাইকেলা	৯৪	·২
মহীশূর করদরাজ্য		
হাসান	৭,২৫০	১৬·৫
মহীশূর	৯,৭১০	২২·০

ভারতবর্ষের ক্রোমাইটের যৎসামান্য পরিচয় দেওয়া হইল; কিন্তু পৃথিবীর বাণিজ্যের সহিত ইহা ঘনিষ্ঠভাবে সংশ্লিষ্ট বলিয়া তাহারও কিছু পরিচয় জানা প্রয়োজন।

পৃথিবীর ক্রোমাইট

উৎকৃষ্ট ইস্পাত প্রস্তুত হইতে আরম্ভ হইয়া আজ বহু কার্যে ক্রোমাইটের বিশেষ প্রয়োজন হইয়া পড়িতেছে এবং ধাতুশিল্পে সমৃদ্ধিশালী জাতিদিগের মধ্যে ক্রোমাইটের চাহিদা ক্রমেই বৃদ্ধি পাইতেছে। সুতরাং মাত্র যে কয়েকটি স্থানের ক্রোমাইট লইয়া জগতের কাজ চলিয়া যাইত এখন তাহাতে আর কুলায় না। সুতরাং নূতন নূতন দেশে সর্বদাই অনুসন্ধান চলিতেছে, যুদ্ধের হাঙ্গামায় ১৯৪০ সালের পর আর কোনও দেশের উৎখাত ক্রোমাইটের পরিমাণ জানা যায় নাই। ১৯৪০ সালের অঙ্কও সম্পূর্ণ নয়; ১৯৩৯ সালের হিসাবে দেখা যায় সোভিয়েট রুশের স্থান প্রথম। তাহার পরই তুরস্ক, পরে সাউথ আফ্রিকা যুক্তরাজ্য দক্ষিণ রোডেসিয়া ফিলিপাইন প্রভৃতির স্থান। বলা বাহুল্য প্রতি বৎসরই উৎখাত পরিমাণের তারতম্য হইয়া থাকে। সুতরাং প্রথম দ্বিতীয় প্রভৃতি স্থান নির্বাচন করা কঠিন ব্যাপার। সাধারণত আন্তর্জাতিক হিসাবে ক্রোমাইট প্রস্তরের মধ্যে ক্রোমিক অক্সাইডের পরিমাণের হিসাব রাখা হয়। অপরাপর হিসাবে ইহার ব্যতিক্রম আছে। নিম্নে যে হিসাব দেওয়া হইতেছে তাহা ক্রোমাইটের মধ্যে অর্ধেক ক্রোমিক অক্সাইড পাওয়া যায়; বলা বাহুল্য ইহার মধ্যে অনেকগুলি আনুমানিক পরিমাণ।

১৯৩৯ ও ১৯৪০ সালে পৃথিবীতে উৎখাত ক্রোমাইটের মধ্যে ক্রোমিক অক্সাইডের পরিমাণ*

	১৯৩৯ মেট্রিক টন	১৯৪০ মেট্রিক টন
সোভিয়েট রুশ		৯৬,০০০
তুরস্ক	৯২,০০০	৬৩,০০০
সাউথ-আফ্রিকা যুক্তরাজ্য	৭২,৬০০	৭৩,৩০০
দক্ষিণ রোডেসিয়া	৬৮,০০০	
ফিলিপাইন	৫৬,০০০	৮০,০০০
যুগোশ্লাভিয়া	২৮,০০০	৪৫,০০০
নিউ ক্যালিডোনিয়া	২৬,০০০	২৮,০০০
ভারতবর্ষ	২৫,০০০	
গ্রীস	২২,০০০	
কিউবা	২১,১০০	১৭,৩০০
সাইপ্রাস	২,৮০০	

*This table refers to the estimated Chromic Oxide (Cr2 O3) of chrome are mined. The principal chrome ore is Chromite. In many cases the figures are only of an approximate nature."
League of Nations Year Book, 1940-41 p. 150.

ইহা ছাড়া ব্রেজিল, বুলগেরিয়া, কানাডা, আমেরিকা, যুক্তরাষ্ট্র প্রভৃতি দেশে কতক পরিমাণ ক্রোমাইট প্রস্তর উৎখাত হইয়া থাকে, তাহাদের আর স্বতন্ত্র অঙ্ক দেওয়া গেল না।

১৯৩৯ সালে উৎখাত ক্রোমাইটের পরিমাণ ধরিয়া প্রতি দেশের ভান্ডার বা খনি সম্বন্ধে আলোচনা করা হইতেছে।

সোভিয়েট-রুশ

ক্রোমাইট উৎপাদনে রুশকে প্রথম স্থান দেওয়া হইয়া থাকে। ইহার সমস্ত ভান্ডার বা খনিগুলি চারিটি অংশের মধ্যে নিবদ্ধ, উরল পর্বত, ওরস্ক খলিলোভো জেলা, মধ্য ভল্গা প্রদেশ এবং পশ্চিম সাইবিরীয় অঞ্চল বলিয়া বিভাগগুলি জানিতে পারা গিয়াছে। উরলের মধ্যে সারানোভ-এর নিকটে স্ভের্ডলোভস্ক (Sverdlovsk) অঞ্চলই প্রধান। ইহারই চতুষ্পার্শ্বে আরও চৌদ্দটি ভান্ডার রহিয়াছে, তাহার মধ্যে স্ভের্ডলভ প্রধান।

রুশের সর্বপ্রধান খনি সারানোভ-এ অবস্থিত। তাহার পরই স্ভের্ডলোভ-এর দ্বাদশ মাইল পশ্চিমে ক্লুচেভস্ক (Kluchevsk) খনি। বাশ্‌কির গণতন্ত্রের দক্ষিণে অবস্থিত ওরেনবার্গ অঞ্চল হইতে রুশের এক পঞ্চমাংশ ক্রোমাইট সরবরাহ হইয়া থাকে। ম্যাগনেটোগরস্ক যাইবার রেল সংযোগ স্থল, কারতালি (Kartaly)-র নিকট চেলিয়াবিনস্ক অঞ্চলে এক প্রকার ক্রোমাইট প্রস্তর আছে। উহা হইতে শতকরা ৪০ ভাগ ক্রোমিক অকসাইড পাওয়া যায়। ম্যাগনেটোগরস্ক-এর পশ্চিমে (বাশির গণতন্ত্র) সমগুণ সম্পন্ন প্রস্তর প্রচুর পরিমাণে দেখিতে পাওয়া যায়। ককেশাস প্রদেশে সেভান হ্রদের নিকটে শতকরা ৪০—৫০ ভাগ ক্রোমিক অকসাইডযুক্ত বহু পরিমাণ প্রস্তর আছে. ট্রান্সবৈকাল প্রদেশে আরস্‌কিনস্কায়া (Arskinskaya) গ্রামের নিম্নাঞ্চলে গাজিমির (Gazimir) নদীর তীরে তীরে বহুতর ভাণ্ডারের অবস্থান সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ হওয়া গিয়াছে।

তুরস্ক

রুশের পরই তুরস্কের স্থান। এক সময় ক্রোমাইট সরবরাহে তুরস্কের একটি প্রধান স্থান ছিল; তাহা ছাড়া বহুকাল হইতে তুরস্কে ক্রোমাইট উৎখাত হইতেছে। ১৮৪৮ সালে ব্রুশা (আসিয়া মাইনর) খনিতে কার্যারম্ভ হয়। ১৮৭৭ সালে মাকুরি উপসাগর অঞ্চলে ক্রোমাইট আবিষ্কৃত হইলে তুরস্কের সম্মান আরও বৃদ্ধি পায়। বর্তমানে উত্তর-পশ্চিমে ব্রুশা, কুটাইয়া এবং এসকিসেহির; দক্ষিণ-পশ্চিমে আইদিন-এর চতুর্দিকে ডেনিজলি, বুরদুর, মুগলা, মারমারিস ফেথিয়ে এবং এ্যানটালায়া; দক্ষিণ তীরবর্তী অঞ্চলে মার্সিন-এর নিকটবর্তী স্থানে এবং পূর্বাঞ্চলে এগানিমাদেন ঘিরিয়া নানা-স্থানে ক্রোমাইটের সন্ধান পাওয়া গিয়াছে।

দক্ষিণ আফ্রিকা

জগতের প্রতি বৎসর মোট উৎপাদিত ক্রোমাইট প্রস্তরের হিসাবে দক্ষিণ আফ্রিকার বেশ সুনাম আছে, কিন্তু তাহার ট্রান্সভাল প্রদেশ ছাড়া আর কোথাও উল্লেখযোগ্য ভাণ্ডার নাই বলিলে অত্যুক্তি হয় না। তাহার মধ্যে আবার দুইটি জেলা লিডেনবার্গ ও রুস্টেন-বার্গ প্রায় সমস্ত ক্রোমাইট সরবরাহ করে।

দক্ষিণ রোডেসিয়া

দক্ষিণ রোডেসিয়ার মধ্যে গোয়েলো জেলার সেলুকোয়ে (Selukwe)-তে অবস্থিত খনি যথেষ্ট প্রসিদ্ধ লাভ করিয়াছে। তাহার পরই সলসবেরী (Salsbury) জেলার খনিগুলি উল্লেখযোগ্য। ভিক্টোরিয়া জেলার নিম্নভাগে বহুতর ভাণ্ডারের সন্ধান পাওয়া গিয়াছে এবং খনির কাজও কতক পরিমাণ চলিতেছে।

প্রয়োজন হইলে এই সকল অঞ্চল হইতে অধিকতর পরিমাণে ক্রোমাইট পাওয়া যাইবে।

ফিলিপাইন

ফিলিপাইনের মধ্যে লুজোন (Luzon) দ্বীপ প্রধান। বর্তমানে লুজোনের পশ্চিম-তীরবর্তী সান্টাক্রুজ (Santa Cruz)এর নিকট হইতে অধিকাংশ ক্রোমাইট পাওয়া যাইতেছে। তাহা ছাড়া লুজোনের জাম্বেলস্ (Zambales) প্রদেশে মানিলা এবং বাগুইয়ো-র মাঝামাঝি স্থানে মাসিনলোক (Masinloc)এর নিকট হইতে প্রচুর ক্রোমাইট উৎখাত হয়। লুজোন দ্বীপের ক্যামারিন্স সুর (Camarines Sur), ক্যামারিন্স নর্টের মাম্বুলাও জেলা এবং লোগোনয়-এর সন্নিকটে অবস্থিত অপরাপর ভাণ্ডার ফিলিপাইনকে সমৃদ্ধ করিয়াছে।

যুগোশ্লাভিয়া

ক্রোমাইট সম্পদে যুগোশ্লাভিয়ার মধ্যে ড্রিনা ও ভারদার প্রদেশ (banovians) বা শাসন বিভাগ প্রধান।

ইহার মধ্যে সার প্লানিলা পর্বতশ্রেণীর দক্ষিণ-পূর্ব ঢালু প্রদেশ হইতে যথেষ্ট পরিমাণ ক্রোমাইট উৎখাত হইয়া থাকে। ভারদার-এর পর মোরাভা ও ভ্রবাস (Vrbas) জেলার নাম উল্লেখযোগ্য। ইহা ছাড়াও যুগোশ্লাভিয়ায় অন্যান্য ভাণ্ডারের পরিচয় আছে। সার পর্বতমালার উত্তর-পশ্চিম ঢালু অঞ্চলে মাগলাজ ও স্প্রেস (Maglaj and Spreee)এর মধ্যবর্তী ওজরেন পর্বতের মধ্যে অস্ট্রোভিকা-য় বহু ভাণ্ডার আবিষ্কৃত হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত মোরাভা ও ড্রিনা শাসন-বিভাগে মোরাভা নদীর পশ্চিম তীর ধরিয়া প্রায় দেড়শত মাইল বিস্তৃত স্থানে কয়েকটি ভাণ্ডারের বিষয় অবগত হওয়া গিয়াছে।

নিউ ক্যালিডোনিয়া

নিউ ক্যালিডোনিয়া সামান্য একটি দ্বীপ হইলেও ক্রোমাইট সরবরাহ করিয়া বিশেষ সুনাম অর্জন করিয়াছে। পৃথিবীর সম্ভবত সর্বাপেক্ষা বৃহৎ ক্রোমাইট খনি ইহার মধ্যে অবস্থিত; ইহার প্রসিদ্ধ তিবাঘি চূড়া (Tiebaghi Dome) নিউ ক্যালিডোনিয়ার উত্তর-পশ্চিম উপকূলে পাগাউমিন (Pagaumene)-এর সন্নিকটে অবস্থিত।

গ্রীস

গ্রীসের প্রধান স্থলভাগ ও দ্বীপপুঞ্জের নানা স্থানে ক্রোমাইটের ভাণ্ডার আছে, বিশেষত থেসালি ও খালকিদিকে উপদ্বীপ এ বিষয়ে অপরাপর অঞ্চল হইতে সমৃদ্ধতর। থেসালির আলচানি-ডোমোকোস জেলার লামিয়ার উত্তর-পশ্চিমে ক্সিনিয়া (Xinia) অবস্থিত সেণ্ট অ্যাথানেসিয়াস (St. Athanisius) খনি সর্বপ্রধান। তাহার পরই থেসালি প্রদেশের এরিট্রিয়া জেলার ভোলোস (Volos)-এর পশ্চিমে এবং লারিসার সন্নিকটে অবস্থিত সাগলির (Tsagli) খনি উল্লেখযোগ্য। তাহা ছাড়া লোকরিস এবং বোইটিও জেলায়, স্কাইরোস্ দ্বীপে এবং অপরাপর নানা স্থানে (*) ক্রোমাইটের পরিচয় আছে।

কিউবা

কিউবার প্রধান খনি কামাগুয়ে জেলায়, ওরিয়েণ্ট প্রদেশের সীমারেখার অতি সন্নিকটে আল্টা গ্রাসিয়ায় (Alta Gracia) অবস্থিত। এখানে দুইটি খনি প্রধান। তাহার উপর মাটানজাস (Matanzas) প্রদেশের কানাসাই (Canasai)তে অবস্থিত কয়েকটা খনি হইতে উৎখাত ক্রোমাইট মিলিয়া বর্তমানের সমস্ত পরিমাণ সরবরাহ করে। ইহার পূর্বে ওরিয়েণ্ট জেলায় পোটোসি, কয়াগুয়োন ও ক্যালিডোনিয়া খনিসমূহ এবং কামাগুয়ে জেলার লিওন-কাডিয়া, নোনা ও ভিক্টোরিয়া খনিসমূহ কিউবার একমাত্র ভরসাস্থল ছিল; কালের গতিতে ইহাদের আর সে সমাদর নাই।

*এই সকলের মধ্যে কয়েকটি স্থানের নাম উল্লেখ করা হইতেছে:—
*Thebes, Tsunoka, Lutzi, Politika, Karditza, Pavlorado, etc.

সাইপ্রাস

সাইপ্রস দ্বীপের নানা স্থানে ক্রোমাইট পাওয়া যায়। সমুদ্রতীরে ক্টিমা-র পূর্বদিকে কেনিয়াতে থেরোসার উত্তর-পূর্বদিকে, ভারভারা ও নাটা-র মধ্যবর্তী অঞ্চলে, প্লুদিতিস্সো এবং ক্রদোস পর্বতে ক্রোমাইট খনির অবস্থান জানা গিয়াছে এবং কয়েক স্থানে কাজও চলিতেছে।

পৃথিবীর প্রধান স্থানগুলি আলোচনা করিবার পর আরও যে কয়টি দেশে কিছু পরিমাণ ক্রোমাইট উৎখাত হয়, তাহারও বিবরণ দেওয়া প্রয়োজন। আজ যে দেশের উৎখাত ক্রোমাইটের পরিমাণ উল্লেখযোগ্য নয় বলিয়া মনে হইতেছে, আগামী কয়েক বৎসরের মধ্যে তাহারাই হয়ত এ বিষয়ে আরও উচ্চস্থান অধিকার করিবে।

আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র

এই সকল দেশের মধ্যে আমেরিকা যুক্ত-রাষ্ট্র প্রধান। ১৯৪০ সালে যে পরিমাণ ক্রোমাইট উৎখাত হইয়াছে, তাহা হইতে প্রাপ্ত ক্রোমিক অক্সাইডের পরিমাণ ১,২০০ টন (অর্থাৎ ক্রোমাইট প্রস্তর আন্দাজ ২,৫০০ হইতে ৩,০০০ টন)। এককালে মেরীল্যাণ্ড ও পেন্‌সিলভানিয়া ক্রোমাইট উৎপাদনে প্রধান ছিল, কিন্তু ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগ হইতে ইহাদের যশ অন্তর্হিত হইতে থাকে। পরে বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় দশক হইতে ক্যালিফোর্নিয়া, ওরেগন, উত্তর ক্যারোলিনা, মণ্টানা, আলাস্কা ও পেন্‌-সিলভানিয়া ঐ স্থান অধিকার করে। বর্তমানে ক্যালিফোর্নিয়া সকলকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিয়াছে। উহার মধ্যে চারিটি প্রাকৃতিক বিভাগ দেখিতে পাওয়া যায়। প্রথম ক্লামাথ পার্বত্য অঞ্চল; দ্বিতীয় সিয়ারা নেভাডা (Sierra Nevada Range) পর্বতমালার সানুদেশ; তৃতীয় সমুদ্র তীরবর্তী পার্বত্য অঞ্চল; এবং চতুর্থ সানলুই অবিস্পো শাসন-বিভাগও জেলা। ক্যালিফোর্নিয়া ছাড়া অপরাপর খনিতে কিছু কিছু কাজ হইতেছে। এতগুলি বিভিন্ন স্থানে খনির কাজ করিয়াও আমেরিকা হইতে প্রাপ্ত ক্রোমাইটের পরিমাণ খুব বেশী নয়। সুতরাং এই সকল ভাণ্ডার যে বিশেষ সমৃদ্ধ নয়, তাহা সহজেই অনুমান করা যাইতে পারে।

ব্রেজিল

ব্রেজিলের স্থান আমেরিকার উপরে; ১৯৪০ সালেও ১,৮০০ টন ক্রোমিক অক্সাইড উৎপাদনের উপযোগী 'প্রস্তর' উৎখাত হইয়াছে। ব্রেজিলের ভাণ্ডারগুলি অপেক্ষাকৃত অনেক সমৃদ্ধ। তবে একটি বিশেষ অসুবিধা, ইহার আয়তনের তুলনায় ইহার ভাণ্ডারগুলি মাত্র কয়েকটি স্থানে নিবদ্ধ। বাহিয়া স্টেটে সাণ্টা লুজিয়া (Santa Luzia) একটি প্রধান কেন্দ্র। কাস্কাবুলহোজ (Cascabulhos) পর্বত-শ্রেণীর ঢালু প্রদেশে ফাজেণ্ডা (**Fazenda**) নামক স্থান সর্বাপেক্ষা অধিক ক্রোমাইট সরবরাহ করিয়া থাকে। তাহা ছাড়া সাউদে (Saude)-র সন্নিকটে বোয়া ভিস্টা (Boa Vista) আর একটি ভাণ্ডার। সাণ্টা লুজিয়া স্টেশনের সওয়া এক মাইল তফাতে কুইমাডাস (Queimadas) মিউনিসিপ্যালিটির মধ্যে পেড্রাস প্রেটাস খনি হইতে বহু পরিমাণ ক্রোমাইট উৎখাত হইয়া থাকে। ইহা ছাড়া ব্রেজিলে আর উল্লেখযোগ্য সমৃদ্ধ ভাণ্ডার নাই বলিলেও চলে।

কানাডা

এক হাজার টন ক্রোমিক অক্সাইড পাওয়া যাইতে পারে কানাডা এরূপ পরিমাণ ক্রোমাইট এ পর্যন্ত উৎপাদন করিতে পারে নাই। কানাডার মধ্যে কুইবেক, অণ্টারিও এবং বৃটিশ কলম্বিয়া প্রধান। তন্মধ্যে আবার কুইবেকের পূর্বে শাসন-বিভাগের কোলেরেন (Coleraine) অঞ্চল বিশেষ উল্লেখযোগ্য। অণ্টারিওর উত্তর-পশ্চিমে থাণ্ডার বে (Thunder Bay) জেলায় ও বোগো হ্রদের উত্তর-পশ্চিমে ক্রোম হ্রদের নিকট আর একটি বৃহদাকার ভাণ্ডার অবস্থিত।

বুলগেরিয়া

১৯৩৯ সালেও বুলগেরিয়ায় ১,৭০০ টন ক্রোমিক অক্সাইড উৎপাদিত হইবার মত ক্রোমাইট উৎখাত হইয়াছে। এখানে প্রধানত দুইটি ভাণ্ডারের কথা উল্লেখ করা যাইতে পারে। গ্রীসের সন্নিকট বুলগেরিয়া সীমার সন্নিকটে মধ্য বুলগেরিয়ার শ্ল্যাটোগ্রাড জেলার পূর্বদিকে প্রধান ভাণ্ডার অবস্থিত। ইহা ছাড়া ড্রেনকফ নামে খ্যাত কতকগুলি খনি মোমসিলগ্রাড হইতে কুড়ি মাইল দূরে ক্রুমোভগ্রাড-এর দক্ষিণ-পূর্বদিকে গোলেমো-কামেনকাতে অবস্থিত ভাণ্ডার-গুলি বুলগেরিয়ার ভবিষ্যৎ আশাস্থল। আশা করা যায়, এই সকল ভাণ্ডার হইতে বহু পরিমাণ উৎকৃষ্ট ক্রোমাইট পাওয়া যাইবে। উপরোক্ত শ্ল্যাটোগ্রাডের ছয় মাইল পূর্বে ডবরোমিরজি (Doboromirzi)-র দক্ষিণ-পূর্বে অবস্থিত কতগুলি সমৃদ্ধ ভাণ্ডার আছে বলিয়া জানা গিয়াছে।

জাপান

জাপানের হিসাব কয়েক বৎসর হইতে পাওয়া যায় নাই, তাহা না হইলেও তাহার স্থান অপর অনেকের উপরে হওয়া উচিত। ১৯৩৬ সালেও সেখানে ১৫,৪০০ টন ক্রোমিক অক্সাইড পাইবার উপযুক্ত ক্রোমাইট প্রস্তর উৎখাত হইয়াছে। ইহার ভাণ্ডার হোক্কাইডো দ্বীপের কাসুগা এবং নিটো আর হনসু দ্বীপের টোট্টারি শাসন-বিভাগে ওয়াকামাটসু এবং হিনো-তে অবস্থিত।

সিয়ারা লিয়োন (পশ্চিম আফ্রিকা) ক্রোমাইট উৎপাদনে ক্রমে অপরাপর দেশের মধ্যে আপনার স্থান করিয়া লইতেছে। ১৯৩৯ সালে ৪,৮০০ টন ক্রোমিক অক্সাইড উৎপাদনের উপযুক্ত ক্রোমাইট উৎখাত করিয়াছে। যে স্থানের আয়তন সামান্য ৪,০০০ বর্গ মাইল মাত্র, তাহার পক্ষে কমবেশ দশ হাজার টন ক্রোমাইট সরবরাহ করা বিশেষ সমৃদ্ধির পরিচয়।

মাদাগাস্কার দ্বীপে দক্ষিণ-পূর্ব

উপকূলে ফারফানগানা (Farfangana)-র ত্রিশ মাইল পূর্বে ভ্যানগেনড্রানো ভাণ্ডার, টামাটাভের পশ্চিমে সানিসোনি নদীর তীরে আম্বোড়িবোনারা গ্রামের সন্নিকটে আম্বোড়িরোফেয়া ভাণ্ডার এবং বোহিভে এবং বোহিট্রাম্বাটো পর্বতের উত্তর দিকের ঢালু প্রদেশে অবস্থিত। টামাটাভে-র পশ্চিমে আম্বোড়িরিয়ানা ভাণ্ডার সম্বন্ধে বিশেষ পরিচয় পাওয়া গিয়াছে। গুয়াটে-মালা, ব্রিটিশ গিয়ানা-তেও ক্রোমাইট ভাণ্ডার অছে।

নিউ সাউথ ওয়েলস (অস্ট্রেলিয়া)-এর ভাণ্ডারগুলি তিনভাগে বিভক্ত করা যায়। উত্তর ভাগে টেণ্টারফিল্ড এবং গ্রাফ্‌টন্‌-এর মাঝামাঝি গর্ডনব্রক, মধ্য-বেল্ট (belt) বা "গ্রেট সারপেণ্টাইন" এবং ইহার অন্তর্গত নাণ্ডল্‌ (Nundle) আটুংগা, মানিল্লা, বারুরাবা এবং বিগরা ভাণ্ডার এবং দক্ষিণ বলয় বা বেল্ট ও উহার অন্তর্গত গুণ্ডাগাই-ওয়ালেণ্ডালিন ভাণ্ডার।

আলবানিয়া, কস্টারিকা, বোর্নিও (উত্তর) প্রভৃতি অপরাপর দেশেও স্বল্প পরিমাণে ক্রোমাইট পাওয়া যায়, কিন্তু তাহার সবিস্তার আলোচনার প্রয়োজন নাই।

বাণিজ্য

ভারতের ক্রোমাইটের বাণিজ্য খুব পুরাতন নহে; হইবার কথাও নয়—কারণ ১৯০৩ সালেই খনির কাজ প্রথম সুরু হইয়াছিল। ১৯০৪-০৫ সালে রপ্তানির প্রথম হিসাব পাওয়া যায়; তখন ৫৫,৮২৬ হন্দর (২,৭৯২ টন) ১,১৫,৮৮৮ টাকা মূল্যে বিদেশী বণিকে লইয়া যায়। ইহা অতি দ্রুত বৃদ্ধি পাইয়া ১৯০৭-০৮ সালে ১,৫৭,০২০ হন্দর (৭,৮৫১ টন) হইয়া যায়, মূল্য ৩,৫৪,১১৫ টাকা। মোটামুটি রপ্তানির পরিমাণের বিশেষ তারতম্য লক্ষিত হয় নাই। অবশ্য ১৯০৭-০৮ সালের ৭,৮৫১ টন রপ্তানি পড়িয়া গিয়া ১৯১৪-১৫ সাল পর্যন্ত দুই হইতে তিন হাজার টনের মধ্যে ছিল। কিন্তু প্রথম মহাযুদ্ধের প্রাক্কালে ১৯১৫-১৬ সালে ১,৮৪৬ টন দাঁড়ায়। ইহার পরে ক্রোমাইট বাণিজ্যের এরূপ দুর্দশা আর ঘটে নাই। যুদ্ধের গুরুত্ব ও প্রসার বৃদ্ধির সংগে সংগে রপ্তানি হঠাৎ চড়িতে থাকে এবং ১৮১৮-১৯ সালে উহা ৩১,৩৮১ টন পর্যন্ত উঠে। এই সময় হইতে সুরু করিয়া জাহাজে স্থান অসংকুলান হেতু বাণিজ্য তার আশানুরূপ বৃদ্ধি পাইতে পারে নাই। তাহা না হইলে ভারতবর্ষ আরও অধিক পরিমাণ ক্রোমাইট সরবরাহ করিতে পারিত; কারণ এই সময় নর্থ-ওয়েস্টার্ন রেলের বোস্তান-বোলান ভাগ খোলাই হইয়া হিন্দুবাগের সহিত যুক্ত হওয়ায় ঐ অঞ্চলের ক্রোমাইট চলাচলের বিশেষ সুবিধা হয়। যাহাই হউক, পূর্বোক্ত অসুবিধার দরুণ বাণিজ্যের সম্প্রসারণ আশানুরূপ ঘটিতে পারে নাই।

ইহার অব্যবহিত পরেই (১৯২২-২৩) সালে হঠাৎ যে রপ্তানি বৃদ্ধি পায়, তাহাই ক্রোমাইট রপ্তানির চূড়ান্ত বলিয়া জানা গিয়াছে, পরিমাণ ৫২,৪৭১ টন ও মূল্য ১৭,১৬,৬৬৪ টাকা। কিন্তু এ অবস্থা বেশীদিন থাকে নাই। রপ্তানি দ্রুত হ্রাস পাইতে থাকে এবং ১৯৩১-৩২ সালে যে অবস্থা দাঁড়ায়, তাহা তাহার পূর্বে অন্তত পনেরো বৎসরের মধ্যে এরূপ হয় নাই; পরিমাণ হ্রাস পাইয়া একেবারে ৮,২৪৪ টন (মূল্য ২,৭২,৮২২ টাকা) হইয়া যায়। তাহার পর আবার রপ্তানি বৃদ্ধি পাইয়াছে সন্দেহ নাই; কিন্তু ১৯২২-২৩ সালের মত ৫২,৪৭১ টন হয় নাই। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের অব্যবহিত পূর্বে (১৯৩৭-৩৮) ৪১,৪৫২ টন পর্যন্ত হইয়াছিল।

ইহার কারণ অনুসন্ধান করিতে বিশেষ কষ্ট নাই। প্রথম মহাযুদ্ধের পর ক্রোমাইটের অভাবের প্রতি সকল দেশেরই লক্ষ্য পড়ে এবং চারিদিকে জোর অনুসন্ধান চলিতে থাকে। এখন নানা দেশে ক্রোমাইট উৎখাত হইতেছে; ভারতের ক্রোমাইটের পূর্বের সে চাহিদা আর নাই। নিম্নের সংখ্যা-তালিকা হইতে সমস্ত অবস্থা পরিস্ফুট হইবেঃ—

রপ্তানি-ক্রোমাইট
১৯০৪-০৫ হইতে ১৯৩৯-৪০ পর্যন্ত
কয়েকটি বিশিষ্ট বৎসরের হিসাব

সাল	হন্দর	টাকা
১৯০৪-০৫	৫৫,৮২৬	১,১৫,৮৮৮
১৯০৬-০৭	৭৩,০৩৪	১,৬৬,০৯০
১৯০৮-০৯	৭৩,৪১৪	১,৪১,৫২৫
	টন	
১৯১০-১১	২,১৪৯	১,০৫,০৬০
১৯১৪-১৫	৩,৬৬৪	১,৮৬,০৬০
১৯১৮-১৯	৩৯,৩৮১	১২,৩০,৬৯০
১৯১৯-২০	১০,৭১২	৩,২৬,১৫০
১৯২২-২৩	৫২,৪৭১	১৭,১৬,৬৬৪
১৯২৪-২৫	৩১,৯৭৯	৯,৯৬,৫৭৫
১৯২৯-৩০	১৭,২৮০	৬,৭৪,৩০০
১৯৩৪-৩৫	২৪,২৭৩	৭,৪৬,৮০৯
১৯৩৫-৩৬	২৬,০৯১	৭,৯৬,২৯৩
১৯৩৬-৩৭	২২,৬৫০	৭,১৯,৮৪৯
১৯৩৭-৩৮	৪১,৪৫২	১২,৬৯,০৭৮
১৯৩৮-৩৯	১৪,৬০৬	৫,৩৬,৮৬৩

ম্যানগানিজের ন্যায় ক্রোমাইটও রপ্তানি করিয়া দিয়া আমরা নিশ্চিন্ত থাকিতে চাই। দেশে লৌহ-ইস্পাত শিল্প বৃদ্ধি না পাইলে রপ্তানি করা ছাড়া আমাদের উপায় নাই। তাপে দুর্দ্ধনীয় বস্তুর প্রয়োজন হিসাবেও দেশের চাহিদা অত্যন্ত কম। এত বড় দেশে চুল্লী নির্মাণে যে পরিমাণ ক্রোমাইট ব্যবহৃত হওয়া উচিত, তাহার কিছুই নাই। রঙ প্রভৃতি প্রস্তুত কার্য সবেমাত্র আরম্ভ হইয়াছে, তাহা ছাড়া তাহাতে ক্রোমাইটের ব্যবহার খুব বেশী নয়।

ব্যবহার

বিজ্ঞানের প্রসারের সহিত ক্রোমাইটের নানাপ্রকার ব্যবহারের বিষয় অবগত হওয়া যাইতেছে এবং পূর্বের ব্যবহারের নানা পরিবর্তন সংসাধিত হইতেছে। প্রথম মহাযুদ্ধের পূর্বে ক্রোমাইটের তাপ সহন-শক্তির উপর নির্ভর করিয়া তাহার ধাতু গলাইবার চুল্লী এবং পাত্রাদির আস্তরণরূপে অধিকমাত্রায় ব্যবহৃত হইত। আর স্বল্প পরিমাণ ক্রোমিয়ম উদ্ধার করিয়া লৌহ-শিল্পে ব্যবহৃত হইত। কিন্তু সে অবস্থার গুরুত্ব পরিবর্তন হইয়া গিয়াছে, এখন সমস্ত বৎসরে প্রাপ্ত ক্রোমিক অক্‌সাইডের শতকরা আশী-ভাগ লৌহশিল্পে লাগিয়া যায়।

লৌহশিল্পে প্রয়োজনের বিভিন্নতা অনুযায়ী ক্রোমিয়মের পরিমাণের তারতম্য করা হয়। সাধারণত ইহার সহিত কোবাল্ট নিকেল, টংস্টেন, মলিবডেনম প্রভৃতি অন্য ধাতুও মিশ্রিত করিয়া লৌহ ইস্পাতের গুণ বৃদ্ধি করা হইয়া থাকে। শতকরা আধ (·৫) ভাগ হইতে আরম্ভ করিয়া ৩৫ ভাগ

পর্যন্ত ক্রোমিয়ম মিশাইবার ব্যবস্থা হইয়াছে। লোহের শক্তি, দৃঢ়তা, ঘর্ষণরোধ ক্ষমতা প্রভৃতি গুণ বৃদ্ধি ছাড়া লোহের কলঙ্ক (মরিচা) রোধ করিবার কার্যে (Stainless steel) ক্রোমিয়ম বিশেষ কার্যকরী। ক্রোমিয়মযুক্ত ইস্পাত দ্বারা যুদ্ধ সরঞ্জামের বর্ম বা আচ্ছাদন, ইস্পাত ভেদ করার উপযোগী শস্ত্র ও যন্ত্রপাতি, সিন্ধুক, ছুরি, কাঁচি প্রভৃতি যন্ত্র, পুলের অংশ প্রভৃতি, ভারী গাড়ি (রেল)র চাকা এবং স্প্রীং প্রভৃতি, উচ্চতাপে কাজ করিতে এবং কঠিন দ্রব্যাদি চূর্ণ বা খণ্ডিত করিবার যন্ত্রের অংশ বিশেষ করিতে হইলে ক্রোমিয়মযুক্ত ইস্পাতের একান্ত প্রয়োজন। এখন বিমানপোতের ইঞ্জিন এবং অপরাপর অংশ * নানা-প্রকার পাম্প অথবা শোষ যন্ত্রে বৃহদাকার হাতুড়ি এবং বিরাটকায় বস্তুতে বাঁধন দিতে (Cotters) ক্রোমিয়ম-ইস্পাত ক্রমেই অধিক পরিমাণে লাগিতেছে।

ক্রোমিয়ম কোবাল্ট ও মলিবডেনম মিশ্রিত ইস্পাত ("stellite") তীক্ষ্ণ ধার অস্ত্রাদিতে কাজে লাগে। ইহাদের তীক্ষ্ণতা সহজে এমন কি অনেক তাপেও নষ্ট হয় না। ক্রোমিয়ম মিশ্রিত ইস্পাত শীতল অবস্থাতেও মোচড়াইতে পারা যায়, শীঘ্র ভাঙ্গিয়া যায় না। ক্রোমিয়ম যোগে ইহা এমন গুরু কঠিনত্ব প্রাপ্ত হয় যে, তাহার মধ্যে অতি সূক্ষ্ম যন্ত্রের সাহায্যেও ছিদ্র করা যায় না। "নি-ক্রোম" (ni-chrome) অর্থাৎ নিকেল প্রাধান্যে মিলিত ক্রোমিয়ম ও লৌহ। ইহাতে সাধারণত শতকরা ৬০ ভাগ নিকেল, ১৪ ভাগ ক্রোমিয়ম এবং মাত্র ১৫ ভাগ লৌহ থাকে। অত্যুচ্চ তাপসহনশীলতা ইহার বিশেষ গুণ এবং সেই কারণে যে সকল ক্ষেত্রে উচ্চ তাপে কাজ করা প্রয়োজন হইয়া পড়ে (annealig boxes, carbonising boxes, retorts, etc) সেখানে "নি-ক্রোম"-এর প্রয়োজন হইয়া পড়ে। ক্রোমিয়মযুক্ত ভ্যানাডিয়ম লৌহে মিশিয়া উহাকে নানা কার্যের উপযোগী করিয়া তোলে। প্রত্যুত, এই দুই ধাতুর সহিত মিলিত হইয়া লৌহ অন্য সকল প্রকার খাদযুক্ত লৌহ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠত্ব প্রাপ্ত হয়।

তাপ সহন ক্ষমতার জন্য ক্রোমাইট লইয়া ইট, সিমেণ্ট প্রস্তুত করা হয় বা ক্রোমাইট প্রস্তর, খনি হইতে উদ্ধার করিবার সময় একেবারে ইষ্টকাকারে বা প্রয়োজনের মত নানা আকৃতিতে কাটিয়া লওয়া হয়। বর্তমানে ফার্ণেস বা চুল্লীর মধ্যে ক্ষার প্রধান কয়লার আধার (অগ্নিকুণ্ড) এবং তাহার অম্ল-প্রধান আবরণী বা ছাদ এই দুইটির ব্যবধান রক্ষা করিবার জন্য ক্রোমাইটের প্রচুর ব্যবহার রহিয়াছে। ক্রোমাইটে ক্ষার বা অম্ল কোন গুণই বর্তমান নাই। (neutral); সুতরাং এই কার্যে ইহা বিশেষ উপযোগী। অপরাপর তাপসহনশীল খনিজ, যথা ম্যাগনেসাইট, সিলিকা—এ্যালুমিনিয়ম মিশ্রিত বস্তু অপেক্ষা ক্রোমাইটের আরও কতগুলি সুবিধা আছে। ইহা যে কেবল দামে সস্তা তাহা নহে, ইহা অপেক্ষাকৃত দীর্ঘকালস্থায়ী এবং ক্ষয়রোধের বিশেষ ক্ষমতাসম্পন্ন। অতি উচ্চ তাপে ও কাঠিন্য রক্ষা করিতে এবং হঠাৎ তাপের পরিবর্তন সহ্য করিবার ক্ষমতা থাকায় এতদুদ্দেশ্যে ইহা অতুলনীয়। সাধারণত তাপের তারতম্যে ফাটিয়া যায় না বা আস্তরণের গাত্র হইতে "ছাল" ঝরিয়া পড়ে না।*

রঞ্জন শিল্পে আজকাল ক্রোমাইটের ব্যবহার বহুল প্রচলন হইয়া পড়িয়াছে, ইহার মূল উপাদান ক্রোমেট ও বাই-ক্রোমেট। ক্রোমাইট হইতে এই বস্তু উদ্ধার করা হয়। ইহা হইতে সুন্দর সুন্দর রঙ বিশেষত হরিদ্রা, সবুজ, লাল ও ছাপা কাপড়ের রঙ এবং চীনা মাটীর কাজে বিশেষ প্রয়োজন।

চামড়ার সংস্কার (chrometanning) কার্যে ইহার ব্যবহার আছে, তাহা যাঁহারা দোকানে গিয়া "ক্রোম লেদারের" জুতা চাহিয়া বসেন, তাঁহারা অজ্ঞাতসারে ক্রোমাইট বা ক্রোমেট-এর গুণ বর্ণনা করেন। আজকাল চামড়া সংস্কারে ক্রোমেটের স্থান খুব উচ্চে।

বাই-ক্রোমেটের সাহায্যে তৈল বা স্নেহ-পদার্থ (চর্বি প্রভৃতি) বর্ণহীন করা যায় এবং পরীক্ষগারের বস্তু "অক্সিডাইজ" করিতেও ইহার ব্যবহার উপেক্ষণীয় নহে।

ক্রোমিক অম্ল বা এ্যাসিড এই সকল কাজেই উপযোগী এবং ফোটোগ্রাফিতে এবং "ইলেক্ট্রোপ্লেটিং" অর্থাৎ চলতি কথায় 'নিকেল' করা (ক্রোমিয়ম প্লেটিং বা পালিশ) কাজে ইহা লাগে। উচ্চাঙ্গের সাদা পালিশ করিতে ক্রোমিয়ম ব্যবহৃত হইতেছে এবং ক্রমেই তাহা বৃদ্ধি পাইতেছে।

ক্রোমিয়ম প্লেটিং বা পালিশের প্রভূত প্রচলন হইলেও ইহাতে ক্রোমিয়মের পরিমাণ সামান্যই লাগে।

ভারতে যে পরিমাণ ক্রোমাইট প্রতি বৎসর উৎখাত হইতেছে সে হিসাবে আমাদের ক্রোমাইট শিল্প বিশেষ নাই বলিলে অত্যুক্তি হয় না। ইহার প্রসার বৃদ্ধি পাওয়া অর্থে সঙ্গে সঙ্গে লৌহ ইস্পাত শিল্প প্রসার লাভ করিবে। দেশে যুদ্ধ সংক্রান্ত সরঞ্জাম (কামান, ট্যাঙ্ক বর্মাচ্ছাদিত যান, সুকঠিন ধাতব চাদর প্রভৃতি) প্রস্তুত সুরু হইলে দেশে স্বতঃই ক্রোমাইটের ক্রমবর্ধমান ব্যবহার প্রচলিত হইবে। ক্রোমেট, বাই-ক্রোমেট, ডাই-ক্রোমেট উদ্ধার এবং তাহার বিরাট ব্যাপক ব্যবহারের কিছুই হয় নাই বলিলেই হয়। ক্রোমিক এ্যাসিড উদ্ধার কার্য যৎসামান্যই হইয়া থাকে; সুতরাং সকল দিকেই অগ্রসর হইবার ক্ষেত্র বর্তমান।

*ক্রোমিয়ামযুক্ত ইস্পাতের বিশেষ ব্যবহার:— Exhaust valves, turbine blades and castings, valves for automotive engines, gears, sheaves, bushings, heavy machinery frames, etc.

*From Chromium Ore by W. G. Rumbold, Mon. Imp. Inst. London, 1921 and Bull. Econ. Min. No. 2, Chromite by A. L. Coulson:

"It has advantages over refractory material such as magnesite and silica-alumina mixtures, not only in possessing longer life and being of less ultimate cost but its superior properties of resisting corrosion, retaining a fair degree of hardness at high temperatures, resisting abraison and withstanding sudden temperature changes. Chromite being of a neutral character, also possesses special value as a refractory in certain cases where basic or acid refractories are undesirable." Ibid.

ট্রামে-বাসে

মহাত্মা গান্ধীর সঙ্গে দেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতি সম্বন্ধে দুই দিবসব্যাপী আলাপ-আলোচনার পর বোম্বাই ফিরিয়া আসিয়া শ্রীযুক্ত ভুলাভাই বলিয়াছেন যে, তিনি আপাতত একটিমাত্র



Hurdle পার হইয়াছেন। আমরা সর্বান্তকরণে ভুলাভাইকে Buck-up করিতেছি এবং আশা করিতেছি তিনি শেষ পর্যন্ত Hurdle Raceএ জয়ী হইবেন।

* * *

একটি সংবাদে প্রকাশ, অতঃপর সিকি, আধুলি প্রভৃতি সেণ্টে পরিণত হইয়া যাইবে এবং ষোল আনায় টাকার হিসাবের আর কানাকড়ি দামও থাকিবে না। ইহার পর আমাদের বস্তিগুলি "স্কাইস্ক্রেপারে" এবং টলিউড হলিউডে পরিণত হইবে কিনা সেই সংবাদ না পাওয়া পর্যন্ত সেণ্টের মহিমায় গদগদ হইয়া উঠিতে পারিতেছি না।

* * *

সিরিয়ার ('আজাদে'র পাঠক "ছিরিয়া" পাঠ সংশোধন করিয়া লইবেন।) প্রেসিডেণ্ট একটি সাম্প্রতিক বিবৃতিতে বলিয়াছেন—"Not one Syrian will want to have any contract with any thing French"। হয়ত এই সিদ্ধান্তে সিরিয়ার ক্ষতি কিছু হইবে না। কিন্তু তবু আমরা বলি অন্তত "শেম্পেনটা" সম্বন্ধে এতটা বাড়াবাড়ি না করিলেই ভাল করিবেন। কেননা এই একটি মাত্র ব্যাপারে ফরাসী পৃথিবীর মধ্যে অজাতশত্রু।

* * * *

জনৈক আমেরিকান প্রোফেসার একটি গুলি আবিষ্কার করিয়াছেন। তাঁহার আবিষ্কৃত চারটি মাত্র গুলি খাইলেই নাকি ষোড়শ-উপচারে পূর্ণ আহারের ফল পাওয়া যায়। ভাবিয়া দেখুন ভোজন ব্যাপারে আর মেরাপ বাঁধাবাঁধির হাঙ্গামা হুজ্জুত নাই। রেশান সংগ্রহের ঝামেলা নাই, পাক পরিবেশনের ঝক্কি নাই। বরযাত্রীদের গলায় একটি করিয়া বেলফুলের মালা আর হাতে চারটি করিয়া এই আশ্চর্য গুলি দিয়া দিলেই পূর্ণ অতিথি বৎসলতা প্রকাশ করা হইবে। তাঁহারা গুলি খাইয়া পরম পরিতৃপ্তির উদ্গার ছাড়িবেন!

* * *

বাংলা সরকারের একটি সাম্প্রতিক আদেশ অনুসারে অতঃপর দুই বৎসরের কম বয়সের পাঁঠা বা ভেড়া হত্যা করা যাইবে না। ভোজন বিলাসীর কাছে—"কচি পাঁঠা বৃদ্ধ মেষ, দধির অগ্র, ঘোলের শেষ"—চিরদিনই চরম কাম্যবস্তু হিসাবে মূল্য পাইয়া আসিতেছে। সুতরাং ভেড়ার সম্বন্ধে আমাদের দুর্ভাবনার কারণ নাই। কিন্তু এই আদেশের



অনুবলে কচি পাঁঠা যদি বাজার হইতে উঠিয়া যায় তাহা হইলে আমরা যে কি জিনিস হারাইব (কাঁচি সিগ্রেট কোম্পানী ক্ষমা করিবেন) তাহা অনুমান করা শক্ত। এই ব্যাপারে পাঁঠার সঠিক বয়স নির্ণয়ের জন্য ঠিকুজি প্রস্তুতের প্রশ্নও উঠেছে। অবশ্য যাঁরা পাঁঠা প্রজননের পরিকল্পনা করিয়াছিলেন, সরকার বাহাদুর ইচ্ছা করিলেই তাঁহাদের মধ্য হইতে বিশেষজ্ঞ আবিষ্কার করিয়া এই আপাত কঠিন কাজটি সুসম্পন্ন করিতে পারেন।

* * *

"Clinical Medicine" নামে একটি আমেরিকান সাময়িক পত্রের প্রবন্ধে বলা হইয়াছে যে, অত্যধিক নুন আহার নাকি বধিরতার অন্যতম কারণ। আবিষ্কারটি অবশ্য আমাদের কাছে নূতন নয়। আমাদের ভারতবর্ষের প্রচুর নুন যাঁহারা খাইয়া থাকেন তাঁহারা প্রায় সকলেই কালা হইয়া গিয়াছেন এবং সেই জন্যই ভারতের আশা-আকাঙ্ক্ষা সম্বন্ধে আবেদন-নিবেদন কোন কিছুই তাঁহাদের কানে পোঁছায় না।

* * * *

আসন্ন আই এফ এ প্রতিযোগিতায় বাহির হইতে অনেক টিমের যোগদানের কথা ঘোষণা করা হইয়াছে। তালিকায় দেখিলাম এক পেশোয়ার হইতেই তিন তিনটি টিম আসিতেছে। যাঁহারা পুই-ডাঁটা খাইয়া ফুটবল খেলিতে নামেন তাঁহারা পেস্তা-বাদামের দেশের লোকের সঙ্গে লড়িবার জন্য এখন হইতেই প্রস্তুত হউন। মোহনবাগান বা ইস্টবেঙ্গলকে পরাজিত করাই যে ফুটবলের চরম আদর্শ নয় একথা গঙ্গা এবং পদ্মাচরবাসীরা মনে রাখিলে ভাল করিবেন।

* * * *

বিশু খুড়োকে আজ ট্রামে দেখিতে পাইলাম না। খুড়োরই জনৈক প্রতিবেশীর নিকট শুনিলাম খুড়ো নাকি গাছ হইতে পড়িয়া গিয়া হাত ভাঙ্গিয়াছেন। জিজ্ঞাসা করিলাম খুড়ো কি বুড়ো বয়সে আম পাড়িতে গিয়াছিলেন—ভীমরতি আর কাকে বলে। উত্তরে প্রতিবেশী বলিলেন—আম পাড়িতে নয়, গাছে চড়িয়া মোহনবাগান ইস্টবেঙ্গলের চ্যারিটি ফুটবল ম্যাচ খেলা দেখিতে গিয়াই এই কাণ্ড হইয়াছে। বুঝিলাম আমের প্রলোভন বৃদ্ধ বয়সে ত্যাগ করিলেও এই দুই দলের লড়াই দেখার প্রলোভন বৃদ্ধ বয়সেও ত্যাগ করা যায় না। আর দেখিতে হইলে অ-সভ্যদের (non-member) পক্ষে গাছে চড়া ছাড়াও উপায় নাই। কিন্তু খুড়োকে যে একখানা টিকিট বহু কষ্টে সংগ্রহ করিয়া দিয়াছিলাম, খুড়ো সেই টিকিট কি করিলেন জিজ্ঞাসা করাতে তার প্রতিবেশী বলিলেন যে—জনৈক বস্ত্র ব্যবসায়ীকে একখানা শাড়ীর বদলে খুড়ো



সেই টিকিট দিয়া দিয়াছেন। এযে কি দেওয়া এবং কতখানি অসহায় হইলে যে মোহনবাগান ইস্টবেঙ্গল খেলার টিকিট বিনিময় করা যায় তাও বুঝিলাম, শুধু বুঝিলেন না বস্ত্র বণ্টনের কর্তারা।

স্বাস্থ্য প্রসঙ্গ

বায়ু ভক্ষণ ও বায়ু সেবন

ডাঃ পশুপতি ভট্টাচার্য ডি-টি-এম্

তাকেই বলা যায় খাদ্য যা প্রাণধারণের জন্য আমাদের ভক্ষণ করতে হয়। সেই হিসাবে বায়ুও আমাদের পক্ষে এক রকম খাদ্য। কেবল তফাৎ এই যে অন্যান্য খাদ্যগুলি দৃশ্যমান স্থূল বস্তু, আর বায়ু সূক্ষ্ম অদৃশ্য বস্তু। আর তফাৎ এই যে, অন্যান্য খাদ্যগুলিকে আমরা মুখ দিয়ে ভক্ষণ করে পেটের ভিতর চালান দিই, আর বায়ুকে আমরা নাক দিয়ে ভক্ষণ করে ফুসফুসের ভিতর চালান দিই। ভেবে দেখতে গেলে এই অদৃশ্য বায়ু আমাদের পেটে খাবার জিনিসের চেয়ে অনেক বেশী দরকারী খাদ্য, কারণ ঐ সমস্ত স্থূল খাদ্য চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে তিনবার কিংবা চারবার খেলেই যথেষ্ট, কিন্তু বায়ু প্রতি মিনিটে আমাদের ১৫।১৬ বার খাওয়া চাই, অর্থাৎ ঘণ্টায় প্রায় হাজার-বার। ঘুমিয়ে ঘুমিয়েও আমাদের বায়ু-ভক্ষণ করতে হয়, নতুবা, দু'তিন মিনিটের জন্যও এটা স্থগিত রাখলে দম বন্ধ হ'য়ে মারা যাবো। অথচ আশ্চর্যের বিষয় এই যে, খাবার জিনিষগুলির সম্বন্ধে আমরা কতই খুঁটিনাটির কথা ভাবি তার পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা নিয়ে কতই বাচবিচার ক'রে থাকি, কিন্তু অবশ্য গ্রহণীয় নিশ্বাস বায়ুর সম্বন্ধে তার তুলনায় কিছুই ভাবি না। দূষিত বায়ু গ্রহণ করতে থাকলে যে কতখানি অনিষ্ট হয় তা আমরা সম্যকরূপে বুঝতেই পারি না, কারণ সে অনিষ্ট আপাততঃ চোখে দেখা যায় না। অবশ্য দূষিত বায়ু থেকে যে সর্দি কাসি ডিফথিরিয়া নিউমোনিয়া থাইসিস প্রভৃতি রোগগুলি জন্মায় একথা আজকাল প্রায় সবাই জানে। কিন্তু বিশুদ্ধ বায়ু যে প্রকৃতই আমাদের খাদ্য, তার অভাবে যে শরীরের দুর্বলতা আসে, রীতিমত রক্তশূন্যতা ঘটে, ক্লান্তি আর অন্যান্য বহু রকমের রোগপ্রবণতা এনে দেয় এমন কি মানুষের নৈতিক অবনতিও ঘটিয়ে দেয়, একথা শুনলে হয়তো অনেকে অবাক হ'য়ে যাবে। কিন্তু এ সম্বন্ধে ধারণা করতে হ'লে বায়ু ভক্ষণের বৈজ্ঞানিক সত্যটুকু আগে ভালো করে বোঝা দরকার।

বায়বীয় পদার্থের আদানপ্রদান করতে থাকা জীবনরক্ষার এক বিশেষ প্রক্রিয়া, কেবল কয়েক প্রকার অবায়বীয় বীজাণু ছাড়া প্রত্যেক জীবন্ত প্রাণীই এ কাজ করে থাকে। শুধু তাই নয় প্রত্যেক জৈবকোষই একাজ স্বতন্ত্রভাবে করে থাকে, কারণ বাঁচবার জন্য প্রত্যেক জৈব কোষেরই অক্সিজেন দরকার। যারা এক-কোষ বিশিষ্ট প্রাণী তারা সরাসরি আপন কোষাবরণের ভিতর দিয়ে বায়ু থেকে অক্সিজেন নিয়ে নেয়। কিন্তু আমাদের শরীরের অসংখ্য কোষগুলির পক্ষে এ কাজ সম্ভব নয়, কারণ শরীরের আভ্যন্তরিক গঠনে নিযুক্ত অধিকাংশ কোষই এমন এমন স্থানে অবস্থিত যেখানে বাইরের বায়ুর সঙ্গে তাদের কোনো সম্পর্কই নেই। সেখানে কোনো জিনিসের মধ্যস্থতায় এই অক্সিজেন প্রত্যেক কোষের কাছে পোঁছে দিতে হবে আর তার বদলে সেখানকার দূষিত গ্যাস বের করে আনতে হবে। এই কাজের জন্যই রয়েছে আমাদের এক জোড়া ফুসফুস আর আমাদের গায়ের সমস্ত রক্ত। ফুসফুসের কাজ কেবল বাইরের বায়ুকে নেওয়া আর ভিতরের বায়ুকে বের করে দেওয়া,—আর রক্তের কাজ শরীরস্থ প্রতিটি কোষে কোষে তারই আদানপ্রদান করা। অতএব ফুসফুস আর রক্ত, এই দুইএ মিলে চালাচ্ছে আমাদের বায়ুভক্ষণের কারবার।

বায়ুতে থাকে শতকরা ২০ ভাগ অক্সিজেন সেইটুকুর জন্যেই আমাদের বায়ুভক্ষণ করা দরকার। যেটুকু আমরা প্রশ্বাসের সঙ্গে গ্রহণ করি তার সবটুকুই যে রক্তের মধ্যে শুষে নেয় তাও নয়, কারণ যে বায়ু আমরা নিশ্বাসের সঙ্গে ত্যাগ করি তাতেও খানিকটা অক্সিজেন থাকে, সুতরাং রক্ত তার অল্পমাত্রাই গ্রহণ করে। ঐটুকু অক্সিজেন দরকার ভিতরকার দাহন কার্যের জন্য কারণ ঐ গ্যাসটি ব্যতীত কোনোরকম দাহনের কাজ চলে না, একটু বাতাস না পেলে আগুন কখনো জ্বলে না। প্রত্যেক কোষে কোষে খাদ্যকে নিয়ে এই দাহনের কাজ চলতে থাকে, সুতরাং প্রত্যেক কোষেরই কিছু অক্সিজেন চাই। রক্তের কণিকাগুলির মধ্যে যে হিমোগ্লোবিন (haemoglobin) নামক পদার্থ থাকে তার কাজই এই, সে নিজের মধ্যে গ্যাসটিকে ধরে নেয় আর কোনো একটি কোষের কাছে গিয়ে সেটুকু ছেড়ে দেয়, কোষটি তখন আবরণের ভিতর দিয়ে সেটুকু নিয়ে তার বদলে কার্বনিক অ্যাসিড বাষ্প দিয়ে দেয়। সুতরাং শ্বাসপ্রশ্বাস নেওয়াই কেবল যথেষ্ট নয়, যার শরীরে রক্ত কম আছে কিংবা যার রক্তে হিমোগ্লোবিন কম আছে সে শ্বাসপ্রশ্বাস নিতে থাকলেও তার দ্বারা কম পরিমাণের অক্সিজেনই গ্রহণ করতে পারে। আবার অক্সিজেন রক্তের ভিতরে গেলেও যে তার সবটুকুই কাজে লেগে যাবে তাও নয়। যার শরীরে কোনোই পরিশ্রম নেই, তার কোষগুলির খাদ্যপ্রয়োজনও কম; কাজেকাজেই দাহনের কাজও কম, সুতরাং বেশি পরিমাণে অক্সিজেন এসে উপস্থিত হলেও তার তখন নেবার দরকার নেই সেটুকু বৃথাই যাবে। অক্সিজেনের জন্যও কোষের একটা ক্ষুধা থাকা চাই, আর পরিশ্রমের দ্বারা সে ক্ষুধা বাড়ানো চাই। যে যত বেশি পরিশ্রম করবে তার তত বেশি অক্সিজেন দরকার হবে, আর সে তত বেশি বেশি শ্বাসপ্রশ্বাস নিতে থাকবে। তাই সচরাচরই দেখতে পাই যে, বিশ্রামের সময় শ্বাসপ্রশ্বাসের ক্রিয়া মন্থর হয়ে যায়, আর পরিশ্রম বা দৌড়াদৌড়ি করবার সময় তা অনেক দ্রুত হয়ে যায়।

সাধারণ বুদ্ধিতে হয়তো অনেকে মনে করতে পারে যে আমাদের ফুসফুস দুটি একবার বাইরের বায়ুকে নাক দিয়ে টেনে নিয়ে ভিতরে বেলুনের মতো অত্যন্ত ফুলে ওঠে, আবার তাকে ফুঁ দিয়ে বের করে দিয়ে নিতান্তই চুপসে যায়। কিন্তু এ রকম ধারণা করা ভুল হবে, কারণ শ্বাসপ্রশ্বাসের প্রক্রিয়াটি একটু স্বতন্ত্র রকমের। বস্তুত আমাদের বক্ষপিঞ্জরের ভিতরের গহ্বরটা এক সম্পূর্ণ বায়ুশূন্য (ভ্যাকুয়াম) আধার মাত্র, আর সেই আধারের মধ্যে রাখা আছে ফাঁপা গঠনের দুটি ফুসফুস, যার বহুবিধ ব্রোমশাখা আর শ্বাসনালীর মারফৎ বাইরের সঙ্গে নিরবচ্ছিন্ন যোগ হয়েছে নাকের দুই রন্ধ্রের ভিতর দিয়ে। আমাদের সেই বক্ষ-পিঞ্জরটি পাঁজরার হাড় প্রভৃতির দ্বারা এমন ভাবেই নির্মিত যে মাংসপেশীর ক্রিয়ার সাহায্যে আমরা তাকে খানিকটা স্ফীতও করতে পারি, আবার সংকুচিতও করতে পারি। বুকের পিঠের ও পেটের মাংস-পেশীগুলির দ্বারা আমরা অনবরত এই কাজই করতে থাকি, আর সেইজন্য বক্ষ-পিঞ্জরের ভিতরকার বায়ুশূন্য গহ্বরের আয়তন একবার বেড়ে যায় ও একবার কমে যায়। বায়ুর নিয়ম এই যে কোথাও ফাঁক পেলেই সে ঢুকে পড়ে আবার চাপ পেলেই বেরিয়ে আসে। সেই নিয়ম অনুসারেই বক্ষপিঞ্জর স্ফীত ও সংকুচিত হলে বায়ু

আপনা থেকে ঢোকে এবং বেরোয় আর ফুস্‌ফুস্‌ দুটি নিষ্ক্রিয়ভাবেই তার আধারের কাজ করে, যদিও আপাতদৃষ্টিতে আমরা মনে করি যে, ফুসফুসের জোরেই আমরা বাতাস টেনে নিচ্ছি ওর ত্যাগ করছি। তা যদি হতো তাহলে অবশ্য বায়ু প্রত্যেকবারে ফুসফুসের মধ্যে পরিপূর্ণ মাত্রাতেই ঢুকতো আর সম্পূর্ণরূপেই বেরিয়ে যেতো, কিন্তু প্রকৃত-পক্ষে তা হয় না। খানিকটা বায়ু ফুসফুসের মধ্যে অনবরত থেকেই যায়, তা ছাড়া শ্বাস-প্রশ্বাসের সঙ্গে প্রত্যেকবারে কতকটা ঢোকে আর কতকটা বেরিয়ে আসে। কার ফুসফুসে কতটা বায়ু ঢুকবে ও বেরুবে সেটা নির্ভর করে তার মাংসপেশীগুলির দ্বারা বুকের গহ্বর ফোলাবার ও সংকুচিত করবার ক্ষমতার উপর। সাধারণ হিসাবে দেখা গেছে যে স্বাভাবিক নিশ্বাস ত্যাগের পরে যতটা বায়ু ফুসফুসের মধ্যে থেকে যায় তার পরিমাণ ২০০ ঘন ইঞ্চি। স্বাভাবিক নিঃশ্বাস ত্যাগের পর আরো জোরে নিঃশ্বাস ত্যাগ (রেচক) করে আমরা ওর থেকে আরো ১০০ ঘন ইঞ্চি পরিমাণ বায়ুকে নিকাশ করে দিতে পারি, কিন্তু তৎসত্ত্বেও খানিকটা বায়ু ফুসফুসের মধ্যে থেকেই যায়—এর নাম দেওয়া যেতে পারে তলানির বায়ু (residual air) এই তলানির বায়ুটিকে মধ্যস্থ রেখেই আমাদের শ্বাস-প্রশ্বাস বায়ুর আদানপ্রদান চলতে থাকে। স্বাভাবিক প্রশ্বাস গ্রহণের সময় আমরা প্রায় ৩০ ঘন ইঞ্চি বায়ু নিয়ে থাকি। কিন্তু খুব জোরে প্রশ্বাস নিলে (পূরক) আমরা আরো ১০০ ঘন ইঞ্চি বায়ু টেনে নিতে পারি। অতএব একবার যথাসম্ভব জোরে নিশ্বাস ফেলে দিয়ে তারপর যথাসম্ভব জোরে প্রশ্বাস টেনে নিলে কিংবা তার বিপরীত প্রক্রিয়া করলে মোট যতটা পরিমাণ বায়ুকে গ্রহণ করা কিংবা ত্যাগ করা যায় তার পরিমাণ হয় সাধারণত ২৩০ ঘন ইঞ্চি। এই জোর করে টেনে নেওয়া বা ত্যাগ করা বায়ুর যে পরিমাণ তার নাম দেওয়া হয় ভাইট্যাল কেপ্যাসিটি (Vital Capacity), কারণ এর দ্বারাই মেপে দেখা যায় যে, কার কতটা জীবনী শক্তি আছে। বস্তুত প্রত্যেকের নিজস্ব শক্তি অনুসারেই এই ভাইট্যাল কেপাসিটি কারো বা কম আর কারো বা বেশি থাকতে পারে। কার কতটা ভাইট্যাল কেপাসিটি আছে তা মেপে দেখবার আরো এক সহজ উপায় আছে, যার দ্বারা লাইফ ইনসিওরেন্সের ডাক্তারেরা প্রায়ই এর পরীক্ষা করে থাকেন। পরীক্ষার্থীকে একবার যথাশক্তি প্রশ্বাস টেনে নিতে বলে তার ছাতির ঘেরটা মেপে দেখা হয়, তারপরে যথাশক্তি নিশ্বাস ছেড়ে দিতে বলে আবার তার ছাতির ঘেরটা মেপে দেখা হয়। অতঃপর দেখা যায় এই দুই মাপের মধ্যে কতখানি ব্যবধান। সাধারণের পক্ষে এই ব্যবধানের পরিমাণ আড়াই ইঞ্চির বেশি হয় না, কিন্তু যারা শক্তিশালী তাদের পক্ষে এই ব্যবধানের মাত্রা আরো বেশি হয়।

ভাইট্যাল কেপাসিটি বাড়লে যে জীবনী-শক্তি বেড়ে যায় তাতে কোনো সন্দেহ নেই, আর অভ্যাস করলে এর মাত্রা আট গুণ পর্যন্ত বাড়ানো যেতে পারে। আমাদের দেশের যোগসাধকেরা যে প্রাণায়ামের অভ্যাস করে থাকেন তা এই কারণেই। তাঁরা পূরকের দ্বারা অনেক পরিমাণ বায়ুকে গ্রহণ করে কুম্ভকের দ্বারা সেটা বহুক্ষণ ধারণ করে থাকেন, যাতে তন্মধ্যস্থ অক্সিজেন বহু পরিমাণেই রক্ত মধ্যে গৃহীত হয়। তারপরে সেই বায়ুকে তাঁরা ধীরে ধীরে ত্যাগ করেন। তেমনভাবে প্রাণায়াম অভ্যাস করা সকলের পক্ষে সম্ভব না হতে পারে, কিন্তু কেবল রেচক-পূরকের দ্বারা সুদীর্ঘ শ্বাসপ্রশ্বাস গ্রহণের অভ্যাস করা ব্যায়াম হিসাবে সকলের পক্ষেই সম্ভব। আর কিছু নয়, রোজ সকালে ঘুম থেকে উঠে যদি খোলা হাওয়ায় দাঁড়িয়ে হাত দুটিকে প্রসারিত করে দিয়ে অর বুক ফুলিয়ে যথাসম্ভব জোরের সঙ্গে মাত্র পাঁচ মিনিট বা দশ মিনিটের জন্য গভীরভাবে শ্বাসপ্রশ্বাস গ্রহণের কসরৎ করা যায়, তবে তিন মাসের মধ্যেই এর হাতে হাতে ফল পাওয়া যায়। তিন মাস পরেই নিশ্চয় দেখা যাবে যে, নিঃশ্বাসে ও প্রশ্বাসে ছাতির ঘেরের যে ব্যবধান মাত্র আড়াই ইঞ্চি ছিল, তার চেয়ে আরো অন্তত দুই ইঞ্চি বেড়ে গেছে, অর্থাৎ ভাইট্যাল কেপাসিটি প্রায় ডবলের কাছাকাছি হয়ে গেছে।

প্রাণায়াম বা গভীরভাবে দীর্ঘ দীর্ঘ শ্বাসপ্রশ্বাস নেবার (deep breathing) কসরৎ করলে যে কেবল বুকের ছাতিটাই ফুলে ওঠে তা নয়। ভাইট্যাল কেপাসিটি বাড়লেই সেই সঙ্গে আমাদের বায়ুভক্ষণের মাত্রাও বেড়ে যায়, আর দূষিত কার্বনিক অ্যাসিড ত্যাগ ও অক্সিজেন গ্রহণের মাত্রাও সুতরাং বেড়ে যায়। এতে অনেক ক্লেদবস্তু নিকাশ হয়ে গিয়ে মানুষ অধিকতর হাল্কা ও স্ফূর্তিযুক্ত বোধ করে তার রক্তধারা চঞ্চল ও সমৃদ্ধ হয়ে ওঠে। আর বিশেষ কথা এই যে তার নিউমোনিয়া থাইসিস প্রভৃতি সাংঘাতিক রোগগুলো সহজে ঘটতে পারে না। যার শরীরে রক্তের ভাগ কম আছে তার পক্ষে এও একটা চিকিৎসা, কারণ এতে শীঘ্র শীঘ্র রক্তের পরিমাণ বেড়ে যাবার পক্ষে সাহায্য করে।

যারা শহরে বাস করে কিংবা যারা বদ্ধ জায়গায় থাকে তাদের পক্ষে এই অভ্যাসটি করা, অর্থাৎ মাঝে মাঝে দীর্ঘ শ্বাস-প্রশ্বাসের দ্বারা বেশী পরিমাণে বায়ুভক্ষণ করে নেওয়া বিশেষ দরকারী। কারণ যে সমস্ত দূষিত বায়ুবাহিত পদার্থ তাদের নাক দিয়ে ফুসফুসের মধ্যে প্রবেশ করে সে-গুলোকে নিকাশ করে দেবার জন্য এর চেয়ে উৎকৃষ্ট অন্য কোন উপায় নেই। বদ্ধ জায়গায় লোকের ভিড়ের মধ্যে থাকলে কার্বনিক অ্যাসিড ছাড়াও অনেক রকমের দূষিত পদার্থকে ফুসফুসের মধ্যে গ্রহণ করতে হয়, তার মধ্যে সবচেয়ে অপকারী সামগ্রী হচ্ছে রোগের বীজাণু, আর বিশেষ করে যক্ষ্মা-রোগের বীজাণু। অবশ্য এই বীজাণু যে

ফুসফুসের মধ্যে প্রবেশ করলেই তা মারাত্মক হয়ে উঠবে এমন নয়। তা যদি হতো তাহলে শহরে যারা বাস করে তাদের মধ্যে শতকরা নিরানব্বুই জনেরই যক্ষ্মা ধরে যেতো, কারণ শহরের ধুলোয় এবং বাতাসে প্রায় সর্বদাই যক্ষ্মা বীজাণু নিক্ষিপ্ত হচ্ছে। কিন্তু যেমন মাটিতে কোন বীজ পড়লেই তৎক্ষণাৎ সেটা উপ্ত হয় না, তার জন্য কিছু সময় লাগে, যক্ষ্মা বীজাণুর সম্বন্ধেও তেমনি একটা নিয়ম আছে। সে নিয়ম এই যে, ঐ বীজাণু যদি ফুসফুসের মধ্যে কোথাও ঢুকে কোন নাড়াচাড়া না খেয়ে অন্ততপক্ষে এগারো দিন পর্যন্ত সেখানে স্থিরভাবে থাকতে পারে, তবেই তার সেখানে স্থায়ীভাবে উপ্ত হবার সম্ভাবনা, নতুবা নয়। এখন ঐ বীজাণু যদি ফুসফুসের কোন প্রান্তদেশে গিয়ে প্রবেশ করে যেখানে স্বাভাবিক শ্বাসপ্রশ্বাসের দ্বারা বায়ুস্রোত সরাসরি গিয়ে পৌঁছতে পারে না, তবে সেখানেই কালক্রমে উপ্ত হয়ে তার রোগ জন্মাবার সম্ভাবনা থাকে। সেইজন্য ফুসফুসের উপরিভাগে কোণের দিকেই প্রায় এই রোগ ধরতে দেখা যায়। আমাদের শ্বাসনালী থেকে যে বহুধা বিভক্ত শ্লেষ্মশাখাগুলি ফুসফুসের নানা অংশে প্রবেশ করেছে সেগুলি সর্বত্রই সমানভাবে ঋজু নয়, তার মধ্যে কোন কোন শ্লেষ্মশাখা (bronchii) বহু বাঁকবিশিষ্ট ও তির্যকগতি। যেখানে এমন অবস্থা সেখানে যা কিছু একবার ঢুকবে তাই স্থায়ী হয়ে থেকে যাবে, কারণ সহজ শ্বাসপ্রশ্বাসের বায়ু সেখানে গিয়ে তাকে নিকাশ করে আনতে পারে না। কিন্তু দীর্ঘ ও গভীর শ্বাসপ্রশ্বাসে এটুকু সম্ভব, যেহেতু জোর করে স্বাভাবিকের প্রায় আট গুণ পরিমাণ বায়ুকে পুনঃ পুনঃ গ্রহণ ও ত্যাগ করতে থাকলে সে বায়ু ফুসফুসের প্রত্যেক অন্ধ্ররন্ধ্রেই প্রবেশ করে ও বীজাণু প্রভৃতি সকল আবর্জনাকেই উৎখাত করে আনে। প্রাণায়াম প্রক্রিয়ার আসল রহস্য এই খানেই। অনেকে যে বলেন প্রাণায়াম করলে সহজে কোন রোগ জন্মায় না, সেকথা সত্য। অন্তত সর্দি কাসি, ব্রংকাইটিস, নিউমোনিয়া ডিফথীরিয়া থাইসিস প্রভৃতি ফুসফুসের রোগগুলি যে ওতে জন্মাতে পারে না একথা খুবই সত্য। কারণ ঐ সকল রোগের বীজাণু ভিতরে প্রবেশ করলেও সেখানে স্থায়ীভাবে কোন ঘাঁটি গাড়তেও পারে না, আর প্রদাহ জন্মাতেও পারে না। এইজন্যই দীর্ঘ শ্বাস-প্রশ্বাস নেবার ব্যায়াম করা এত উপকারী। এর দ্বারা শরীরের সমস্ত কর্মক্লান্তি ও গ্লানি নিমেষে দূর হয়ে গিয়ে একটা স্বাচ্ছন্দ্যবোধ আসে, সর্দিকাসির ধাত বদলে যায়, লিভারের কাজ ভালো হয়, কোষ্ঠবদ্ধতা দূর হয় হার্টের জোর বাড়ে, আর নার্ভাসনেস বা স্নায়ুবিকার প্রভৃতিও দূর হয়ে যায়। একথা সত্য কিনা সকলেই অনায়াসে পরীক্ষা করে দেখতে পারেন। অক্সিজেন আমাদের খাদ্য, সেটা কিছু বেশি পরিমাণে নিতে পারলে উপকার হবেই।

কিন্তু নাক দিয়ে বায়ুভক্ষণ করা ছাড়াও আমরা আর এক অন্য উপায়ে নিত্য বায়ুসেবন করে থাকি, সেটা আমাদের সমস্ত শরীরের বহিরাবরণ দিয়ে। শ্বাসপ্রশ্বাস গ্রহণের প্রয়োজনীয়তার চেয়ে এর প্রয়োজনীয়তা কিছু কম নয়। আমরা যে পৃথিবীতে বাস করছি তার চতুর্দিকেই রয়েছে বায়ুর আবেষ্টন। এই আবেষ্টনের মধ্যে বাস করবার উপযোগী হয়েই আমরা গড়ে উঠেছি, এই বায়ুর আবেষ্টন থেকে বিচ্যুত হয়ে আমরা এক মুহূর্তও বেঁচে থাকতে পারি না। সেটা যে কেবল অক্সিজেনের কারণেই তা নয়, ও ছাড়া অন্য কারণও আছে। গ্যাসের আদানপ্রদান ছাড়াও বায়ুর সঙ্গে আমাদের অনবরতই উত্তাপ ও আর্দ্রতার লেন-দেন চলতে থাকে এবং তার দ্বারাই আমরা শরীরে ভিতরকার উত্তাপ ও আর্দ্রতার সামঞ্জস্য রক্ষা করতে পারি। এই কথাটি এখানে ভালো করে একটু বোঝা দরকার, কারণ বায়ুচলন (ventilation) বলতে আমরা যা ধারণা করি তার মধ্যে এটা খুব দরকারী কথা।

পূর্বে বলা হয়েছে, শরীরের প্রত্যেক কোষে অক্সিজেন কর্তৃক খাদ্যের দাহন

ঘটছে, তার থেকে অনবরতই উত্তাপ উৎপন্ন হচ্ছে। কিন্তু বাইরের বায়ুর আবেষ্টনের মধ্যে রয়েছি বলে তার সঙ্গে এই উত্তাপের আদানপ্রদানও ঘটছে। শীতকালে যখন বাইরের বাতাস খুব ঠাণ্ডা, তখন খাদ্যের উত্তাপও যথেষ্ট হয় না, তখন মাংসপেশী-সমূহের অতিরিক্ত কর্মতৎপরতার দ্বারা আমরা দাহনের কাজ বাড়িয়ে দিয়ে আরো কিছু উত্তাপ বাড়িয়ে নিই, আর এই উত্তাপ বাড়াবার জন্যই আমাদের তখন কাঁপুনি (পেশী কম্পন) ধরে, আমরা ঘরে না বসে ছুটোছুটি করতে চাই। কিন্তু গরমের সময় এর ঠিক বিপরীত অবস্থা ঘটে। তখন শরীরের উত্তাপের চেয়েও বাইরের বাতাসের উত্তাপ বেশি, কিন্তু খাদ্যের উত্তাপ ভিতরে জন্মাতেই থাকে, সুতরাং সেই উত্তাপ দূর করতে আমাদের অন্য উপায় দেখতে হয়। তখন আমরা সমস্ত তপ্ত রক্তস্রোতকে চামড়ার নীচে বাইরের বাতাসের সান্নিধ্যে এনে খানিকটা উত্তাপ বের করে দেবার চেষ্টা করি (radiation), খানিকটা উত্তাপ বের ক'রে দিই ঠাণ্ডা জল বা অন্য কোনো ঠাণ্ডা জিনিষের সংস্পর্শে গিয়ে (conduction) আর খানিকটা বের করে দিই ঘামের দ্বারা ও সেই ঘামকে বায়ু প্রবাহের দ্বারা উদ্বায়িত ক'রে দিয়ে (Evaporation)। এমনি ভাবেই আমরা শরীরের তাপ সামঞ্জস্য রক্ষা করে থাকি। এই তাপ-সামঞ্জস্য রক্ষা করবার জন্য কতকগুলি নার্ভ আর চামড়ার উপরকার রক্তশিরাসমূহ (vasomotor system) ও ঘর্মগ্রন্থিগুলি সর্বদাই নিযুক্ত হ'য়ে আছে।

কিন্তু এর জন্য পারিপার্শ্বিক আবহাওয়া কতকটা স্বাভাবিক মতো থাকাই দরকার। অর্থাৎ আমাদের আবেষ্টনের বায়ুর উত্তাপ আর্দ্রতা ও গতিপ্রবাহ একটা নির্দিষ্ট স্বাভাবিক মাত্রার গণ্ডির মধ্যে থাকা দরকার। সেটা অস্বাভাবিক হ'লেই আমরা কষ্ট পাবো। কোনো বদ্ধ জায়গায় থাকলে আমরা তখনই অস্বস্তিবোধ করতে শুরু করি কেন, জনতার ভিড়ের মধ্যে ঢুকলে আমরা হাঁপিয়ে উঠি কেন, অন্ধকূপের মতো ঘরের মধ্যে ভরে দিলে আমরা অসুস্থ হ'য়ে মারা যাবার মতো অবস্থায় পড়ি কেন? ঐ সকল অবস্থানের মধ্যে নিশ্চয় কিছু বাতাসও আছে এবং অক্সিজেনও আছে, আর সেখানকার বাতাস যতই দূষিত হোক তার জন্য তৎক্ষণাৎ কোনো কুফল ফলতে পারে না। যে কুফল ফলে তা শুধুই বায়ুর স্বাভাবিক বাতায়িত গতির অভাবে। যে বায়ুতে প্রবাহ নেই তা অক্সিজেন সমৃদ্ধ হ'লেও আশু অনিষ্টকারী, কারণ নিশ্চল বায়ুর আবেষ্টনের মধ্যে থেকে আমরা কিছুতেই আমাদের তাপ-সামঞ্জস্য রক্ষা করতে পারি না, তার তাতেই বিপত্তি ঘটে।

এই নিয়ে বৈজ্ঞানিকেরা অনেক রকমের পরীক্ষা করে দেখেছেন। এই পরীক্ষার জন্য একটি স্বতন্ত্র ক্যাবিনেট প্রস্তুত করা হয় যার ভিতরকার উত্তাপ ইচ্ছামত নিয়ন্ত্রিত

করা যায়। ঐ ঘরের মধ্যে পরীক্ষার্থীকে ঢুকিয়ে দিয়ে প্রথমে সেখানকার উত্তাপ ষাট ডিগ্রি ক'রে রাখা হয়। ইচ্ছাপূর্বকই সেখানকার বায়ুতে অক্সিজেনের পরিমাণ নিতান্তই কম ও কার্বনিক অ্যাসিডের পরিমাণ বেশি রাখা হয়, কিন্তু তাতেও পরীক্ষার্থীর কোনো কষ্ট অনুভূত হয় না। সে ষাট ডিগ্রি উত্তাপে ঐ ঘরের মধ্যে চার ঘণ্টা পর্যন্ত অনায়াসেই বাস করতে থাকে। তার কারণ সেখানকার উত্তাপ ষাট ডিগ্রি মাত্র থাকায় সে নিজের শরীরের তাপ-সামঞ্জস্য রক্ষা করতে অনায়াসেই সক্ষম হয়। কিন্তু যেমনি সেই ক্যাবিনেটের উত্তাপ বাহাত্তর ডিগ্রি পর্যন্ত বাড়িয়ে দেওয়া হয় অমনি কয়েক মিনিটের মধ্যেই দেখা যায় সে অসুস্থ বোধ করছে, তার মাথা ধরে গেছে, অবসন্নতার ভাব এসেছে, মানসিক জড়তা বোধ করছে। তারপরে আবার যেমনি সেই ক্যাবিনেটের মধ্যে একটি বৈদ্যুতিক পাখা চালিয়ে দেওয়া হয় অমনি কয়েক মুহূর্তের মধ্যে দেখা যায় যে ঐ সমস্ত লক্ষণ একেবারেই দূর হ'য়ে গেছে। অর্থাৎ ঐ ঘরের মধ্যে বেশি উত্তাপ থাকলেও পাখা চালনার দ্বারা স্থানীয় বায়ু বাতায়িত হওয়াতে কেবল তার দ্বারাই সে তাপ-সামঞ্জস্য রক্ষা করতে সক্ষম হয়েছে।

আরো পরীক্ষা ক'রে দেখা হয়েছে যে, একটি বন্ধ ক্যাবিনেটের বায়ু যদি খুবই অক্সিজেন-বিরল ও কার্বনিক অ্যাসিডে পূর্ণ হ'য়ে থাকে তথাপি সেই বায়ু কেবল শ্বাস-প্রশ্বাসের জন্য গ্রহণ করলে তাতে কোনোই অনিষ্ট হয় না। অর্থাৎ পরীক্ষার্থীকে যদি ক্যাবিনেটের বাইরে মুক্ত বাতাসে দাঁড় করিয়ে রাখা হয়, অথচ ঐ ক্যাবিনেটের ভিতর থেকে একটি পাইপ বের ক'রে এনে তার নাকের সঙ্গে যোগ ক'রে দিয়ে কেবল সেখানকার বন্ধ বায়ু দিয়েই তার শ্বাস-প্রশ্বাস গ্রহণ করানোর ব্যবস্থা করা হয়, তবে তাতে তার কিছুই অনিষ্ট হ'তে দেখা যায় না। অপর পক্ষে পরীক্ষার্থীকে সেই বন্ধ ক্যাবিনেটের মধ্যে ঢুকিয়ে দিয়ে যদি পাইপের সহযোগে বাইরের মুক্ত বাতাস নাকের মধ্যে এনে তার শ্বাসপ্রশ্বাস গ্রহণ করানো হ'তে থাকে, তবে সেই উত্তপ্ত ও নিশ্চল বায়ুর আবেষ্টনের মধ্যে থেকে বিশুদ্ধ বায়ুর শ্বাস নিয়েও তার দারুণ অস্বস্তিবোধ হ'তে থাকে। কিন্তু যেমনি সেখানে পাখা চালিয়ে দেবার ব্যবস্থা করা হয় অমনি সমস্ত অস্বস্তি দূরে হ'য়ে যায়। অর্থাৎ আবেষ্টনের বায়ু যদি নিশ্চল হয় তবে সেই বায়ু আমাদের শরীরের উত্তাপ ও আর্দ্রতা অল্পমাত্র টেনে নিয়েই আর নিতে পারে না, তখন তা বাষ্পময় ঘেরাটোপের মতো আমাদের শরীরকে ঘিরে থেকে অতিষ্ঠ করে তোলে। তখন ঘামটুকুও আর উদ্বায়িত হয় না, উত্তাপও কিছুমাত্র হ্রাস পায়না, শরীরও অত্যন্ত কাবু হ'য়ে পড়ে। কিন্তু পাখার দ্বারা যদি সেই বায়ুকে সচল ও বাতায়িত করা হয় তবে তৎক্ষণাৎ ঐ বাষ্পময় ঘেরাটোপ সরে যায়, গায়ের ঘাম উদ্বায়িত হ'তে থাকে, আর শরীর সুস্থ বোধ করে। অত্যন্ত গুমোট গরমের সময় এই অভিজ্ঞতাটুকু আমরা সকলেই পেয়ে থাকি। বায়ু যখন নিশ্চল ও উত্তপ্ত ও আর্দ্র, তখন পাখা ছাড়া আমাদের কোনোই স্বস্তি নেই। বৈদ্যুতিক পাখা থাকলেই মঙ্গল, নতুবা ক্রমাগতই আমরা হাতপাখা চালাতে থাকি। একেই আমরা বায়ুসেবন আখ্যা দিচ্ছি, শ্বাসপ্রশ্বাসের সঙ্গে এর কোনো সাক্ষাৎ সম্পর্ক নেই। বাতাস বাতায়িত হ'লে (Perflation) তবেই আমরা আমাদের সমস্ত চর্মাবরণ দিয়ে এই প্রকার বায়ু-সেবন করতে পারি।

ঋতুতে ঋতুতে আমাদের আবহাওয়ার পরিবর্তন ঘটে। কখনো ঠাণ্ডা পড়ে, বরফ জমে, বাতাসের আর্দ্রতা কমে যায়। কখনো গরম পড়ে, বাতাসের আর্দ্রতা বাড়ে, গাছের পাতাটিও নড়ে না। মানুষ লক্ষ লক্ষ বছর ধরে এই রকমই পরিবর্তনশীল আবহাওয়ার মধ্যে জীবনধারণ ক'রে এসেছে। মানুষের তাপ-সংরক্ষক যন্ত্রসমূহ এর সঙ্গেই সামঞ্জস্য রেখে চলতে জন্মজন্মাদিক্রমে অভ্যস্ত হয়েছে। তার রক্তবাহী শিরা-পরিচালকতন্ত্র (vasomotor system) এই কাজে এমনি অভ্যস্ত যে শরীরকে ঠাণ্ডা করবার দরকার হ'লেই তার চামড়ার শিরাগুলি ফুলে ওঠে, অধিক পরিমাণ রক্ত সেখানে এসে ঠাণ্ডা হ'য়ে ভিতরে চলে যায়, আর ঘাম বেরিয়েও সমস্ত শরীর ঠাণ্ডা হ'য়ে যায়। আবার যখন শরীরকে গরম করবার দরকার তখন ঐ শিরাগুলি সংকুচিত হ'য়ে পড়ে, ভিতরকার রক্ত উত্তাপ সংরক্ষণ করতে থাকে। ঐ যন্ত্রসমূহকে এই কাজে বরাবর নিযুক্ত ও অভ্যস্ত রাখাই উচিত, তাতেই আমাদের মঙ্গল। যাকে আমরা হাওয়া লাগা বা ঠাণ্ডা লাগা বলি তাতে যদি নিত্য অভ্যস্ত থাকি তবে তাতে আমাদের কোনোই অনিষ্ট হ'তে পারে না, বরং ভালোই হয়। যারা আবহাওয়ার অত্যাচারকে বাঁচিয়ে চলতে যায় তাদেরই গরমের সময় সর্দিগর্মি লাগে, আর শীতের সময় আসে সর্দি লাগার পালা। সকল সময়ে যদি গায়ে হাওয়া লাগানোর অভ্যাস থাকে তাহ'লে কোনো ঋতুতেই তার দ্বারা কিছু অনিষ্ট হয় না। অনেকে হাওয়া লাগার ভয়ে দরজা জানলা বন্ধ ক'রে রাখেন, কিন্তু তাতে ঠাণ্ডা লাগার হাত থেকে কখনই নিষ্কৃতি পান না, কারণ ক্বচিৎ বাইরে বেরোতেই হয় এবং সেই অসতর্ক মুহূর্তেই ঠাণ্ডা লেগে যায়। ঠাণ্ডা লাগা নিবারণের উপায় হচ্ছে আরো ঠাণ্ডা লাগানো, অর্থাৎ স্বাভাবিক বাতায়িত বায়ুকে গ্রহণ করতে অভ্যস্ত হওয়া। এ অভ্যাস কেবল গরমের সময় রাখলেই চলবে না, শীতের সময়েও রাখতে হবে। আজকাল বিজ্ঞানের দৌলতে আমরা শীতের সময় ঘর গরম রাখার ও গরমের সময় ঘর ঠাণ্ডা রাখার উপায় জানি। তাতে সাময়িক আরাম পাই বটে, কিন্তু আখেরে আমাদের জন্মগত অভ্যাসকে নষ্ট করি। তাছাড়া সেই কৃত্রিম অবস্থাপ্রযুক্ত ঘরের মধ্যে সর্বদাই থাকা চলে না, বাইরের অকৃত্রিম আবহাওয়াতে বেরোতেই হয়, তখনই বিপত্তি ঘটে। শীতের সময় গরম ঘর থেকে বেরিয়ে হঠাৎ ঠাণ্ডায় গেলে তাতেও ঠাণ্ডা লাগে, আবার গরমের সময় ঠাণ্ডা ঘর থেকে বেরিয়ে গরমে গেলে তাতেও ঠাণ্ডা লাগে। সুতরাং সকল রকমের প্রাকৃতিক আবহাওয়ার মধ্যে বাস ক'রে সকল রকমের বায়ুসেবনে অভ্যস্ত থাকাই স্বাস্থ্যরক্ষার প্রকৃষ্ট উপায়।

লেখু-গেরু

অ·কৃ·ব

একটি পুরাতন কবিতা সম্প্রতি আবিষ্কার করিয়াছি। সেটি নিম্নে উদ্ধৃত করিলাম:

শুন শুন শুভমতি পরম যতনে অতি
পাঠাইনু বিবাহের তত্ত্ব
যা কহিব এইবার চার আনা ফাকি তার
বাকী বারো আনা ভাগ সত্য
আমার এ পত্রখান আনন্দই দিবে জানি
পাড়লে করিয়া মন দান
কোন্ বারো আনা খাঁটি কোন চারি আনা মাটি
বুঝ সাধু যে জান সন্ধান।

পাঠাইনু যে সন্দেশ খাইতে লাগিবে বেশ,
শুদ্ধভাবে হৈয়াছে তৈয়ারী
যে দুগ্ধে হৈয়াছে ছানা (কহিতে নাহিক মানা)
সে দুগ্ধ পবিত্র ছিল ভারী।
গোয়ালা করিছে দাবী "অমন পবিত্র গাভী
ত্রিভুবনে আরেকটি নাই,
এহেন গাভীর দুগ্ধ পানেতে না হয় মুগ্ধ
হেন মূর্খ কোথাও না পাই।
এহেন গাভীরে মাগো (অবিশ্বাস কোরো নাগো)
দুহিয়াছি আমি যে গোয়ালা
ভগবদ্ ভক্ত ঘোর ঘোষ বংশে জন্ম মোর।
নহিক সামান্য দুধ্‌ওয়ালা;
মেলেচ্ছ সাহেবিয়ানা এবংশে নাহিক জানা।
শুচি আর নিষ্ঠা শুধু জানি;
ভূত, প্রেত, ভগবান, পুরোহিত, যজমান,
হাঁচি, টিক্‌টিকি সবই মানি।
ইষ্টদেবতারে স্মরি' পঞ্জিকা দর্শন করি'
শুভলগ্ন করিয়া বাহির
বাল্‌তি-সহ স্নান ছলে ডুব দিয়া গঙ্গাজলে
পবিত্র হইয়া হৈনু ধীর।
তারপর শুভক্ষণে শুদ্ধদেহে শুদ্ধমনে
গঙ্গাজল-শুদ্ধ বাল্‌তিতে
পবিত্র গাভীর দুগ্ধ দুহিয়া হইনু মুগ্ধ
পরম পুলক হৈল চিতে।
সেই দুগ্ধ হৈতে আহা তৈরী হৈল যাহা যাহা
তাদেরি একের নাম ছানা;
সেই ছানা হৈতে পুনঃ, ওগো মা জননি শুন,
মিঠাই তৈয়ারী হৈল নানা।
হলফ্ করিয়া কহি সেই দুগ্ধ হৈতে দহি,
ইহাতে অশুদ্ধ কিছু নাহি,
ইথে ভেদ বুদ্ধি যার সে যাউক ছারেখার
নরকে ডাকুক ত্রাহি ত্রাহি।
তারপর জননিগো, অধিক কহিব কিগো
হালুইকরের পরিচয়
তারাও আমারি মত পবিত্র বংশের সুত
নিষ্ঠা শুচি কারো কম নয়।"
অতএব হে বেহাই পাঠাইনু যে মিঠাই
অন্যান্য তত্ত্বের পিছু পিছু
তাহা যে সম্ভব হলে বৈকুণ্ঠে পাঠানো চলে
ইহাতে সন্দেহ নাহি কিছু॥

* * *

কবিতাটি বহু পুরাতন কাগজে অস্পষ্ট মেয়েলী হাতে লেখা। নাম, ধাম, তারিখ ইত্যাদি কিছুই লেখা নাই। কবিতাটির ছন্দ ও রচনাভঙ্গী (Style) দেখিয়া মনে হইতেছে কবিতাটি কবি ভারতচন্দ্র রায় গুণাকরের সমসাময়িক। অবশ্য প্রাচীন বাঙলা সাহিত্যে আমি তেমন ব্যুৎপন্ন নহি; এ বিষয়ে যাঁহারা বিশ্ববিদ্যালয়ের আওতায় অথবা তাহার বাহিরে থাকিয়া গবেষণা করেন তাঁহারা হয়তো সঠিক আন্দাজ করিতে পারিবেন।

তা, কবিতাটি কত পুরাতন বা কত নূতন তাহা ঠিক বুঝিতে না পারিলেও বিষয়বস্তু সম্বন্ধে এই ধারণা হইতেছে যে, কোনও সুরসিকা বৈবাহিকা বিবাহের তত্ত্বপ্রেরণ উপলক্ষে বৈবাহিককে (সুরসিক না বেরসিক জানি না) এই কবিতালিপি লিখিতেছেন। বৈবাহিকটি অত্যন্ত শুচিবায়ুগ্রস্ত, তাহা বুঝিতে পারা যাইতেছে। সেজন্যই অতি সুন্দরভাবে বুঝাইয়া দেওয়া হইয়াছে যে যে মিঠাই তত্ত্বরূপে প্রেরিত হইল তাহা অতি বিশুদ্ধ বংশোদ্ভূত সদ্য গঙ্গাস্নান গোয়ালা কর্তৃক গঙ্গাজল ধৌত পবিত্র বাল্‌তিতে শুভলগ্নে দুহিত অতি পবিত্র গাভীর দুগ্ধ হইতে পবিত্রভাবে প্রস্তুত ছানার সাহায্যে অতীব শুচিনিষ্ঠাবান পবিত্র বংশোদ্ভূত হালুইকর দ্বারা প্রস্তুত। সেহেতু এই মিঠাইর পবিত্রতা সম্বন্ধে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই; এমন কি প্রয়োজন ও সম্ভব হইলে এ মিঠাই নিঃসঙ্কোচে বৈকুণ্ঠেও পাঠানো চলে।

প্রথমেই বৈবাহিকা একটু রহস্য রাখিয়া দিয়াছেন এই কথা বলিয়া যে এ চিঠির চারি আনা ফাঁকি এবং বারো আনা খাঁটি, কিন্তু কোন চারি আনা ফাঁকি এবং কোন বারো আনা খাঁটি তাহা "বুঝ সাধু যে জান সন্ধান।" এ রহস্য ভেদ করিবে কে? বৈবাহিকের তো নিশ্চয়ই মাথা চুলকানোই সার হইয়াছিল। নারী জাতি স্বভাবতই রহস্যপ্রিয়া এবং রহস্যপ্রিয়া বলিয়াই হয়তো পুরুষের প্রিয় হইয়া থাকেন।

আমার কিন্তু মনে হয় কবিতার তৃতীয় ও চতুর্থ লাইন ("যা কহিব এইবার" হইতে "বাকী বারো আনা ভাগ সত্য" পর্যন্ত) চারি আনার ভাগে পড়িয়াছে।

এরূপ পত্রাঘাত বৈবাহিক মহাশয় যদি বৈবাহিকের তরফ হইতে পাইতেন তাহা হইলে হয় তো চটিয়া উঠিতেন, অন্তত মনে মনে। পাগলকে পাগল কহিলে সে চটে বলিয়া শুনা যায়; শুচিবায়ুগ্রস্তকেও শুচিবায়ুগ্রস্ত কহিলে তিনি সাধারণত চটিয়া থাকেন। কিন্তু বৈবাহিকার তরফ হইতে এরূপ পত্রাঘাত প্রাপ্ত হইয়া বৈবাহিক সম্ভবত হেঃ হেঃ হেঃ হেঃ করত হাস্য করিয়াছিলেন।

হায় ওগো মানব-হৃদয়! কি অদ্ভুত রহস্যময় তুমি! একই জিনিষ বিভিন্ন ব্যক্তি হইতে পাইলে তুমি বিভিন্ন ভাব ধারণ কর। যে পত্র বৈবাহিকের নিকট হইতে পাইলে বাহিরে না হোক অন্তত মনে মনে চটিয়া উঠিতে, ঠিক তাহাই বৈবাহিকার নিকট হইতে পাইলে তুমি পুলকাকুল হইয়া হাস্য কর! উদাহরণ আরও অনেক দিতে পারিতাম। কিন্তু একটিই যথেষ্ট হইবে আশা করি।

উক্ত পত্রটির সঙ্গে বৈবাহিকও কোন পত্র পাঠাইয়াছিলেন কিনা জানি না। হয় তো পাঠাইয়াছিলেন, সেটি আমাদের হস্তগত হয় নাই। (হায়, অতীতের কত ঐশ্বর্য এভাবে বেহাত হইয়া গিয়াছে কে জানে?)

কবি বিদ্যাপতিকে ধরিলাম। কহিলাম "বৈবাহিকার এ চিঠির সঙ্গে বৈবাহিক মশাই কি চিঠি পাঠিয়েছিলেন আন্দাজ করতে পারো?"

বিদ্যাপতি কহিল, "শুধু আন্দাজ কেন বন্ধু? লিখেও দিতে পারি। দাও, কাগজ কলম দাও।"

বলিয়া বিদ্যাপতি তৎক্ষণাৎ লিখিতে শুরু করিল দ্রুতবেগে:

"নমস্কার বেয়াই।
গিন্নী মিষ্টি মানুষ, পাঠালেন মিষ্টি তত্ত্ব;
তার ওপর খানিকটা টকের আভাস দিতে
পাঠালেন দই।
আমার জীবন-সরসীর পদ্ম তিনি
পাঠালেন সরস পদ্য।
আমি নিতান্তই গদ্য মানুষ,
অথচ সাধ আছে কবি হবার,
সুতরাং গদ্য-কবিতা ছাড়া আর উপায় কি?
গদ্য-কবিতাই পাঠাচ্ছি।

দেখুন, মিষ্টি আমার নয়;
মিষ্টি চট্ করে নিঃশেষ হয়ে যায়
নারীর রূপ আর যৌবনের মতো।
আমি পুরুষ মানুষ,
পাঠাচ্ছি কাপড় টাপড় এবং আরো কিছু
যা পুরুষের মতোই টিক্‌বে
মিষ্টির চেয়ে বেশী।
মেয়েদের মুখ মিষ্টি,
তাই তারা মিষ্টিমুখ করাতে ভালোবাসে;
পুরুষ মিষ্টি খেতে যত ভালবাসে
খাওয়াতে তত নয়—
শুধু খেতে গিয়ে যতটুকু খাওয়াতে হয়
তার বেশী নয়।
তাহলে এখন আসি বেয়াই,
পদ্য-পত্র পড়বেন যত ধৈর্য ধরে
গদ্য-পত্রে তত ধৈর্য থাকবে না
বুঝতে পারছি।
একটা কথা সবিনয়ে বলি—
বিনয়টা নিতান্তই করতে হয় বলে'—
গ্রহণ করেছেন যতো ঋণী তত করেছেন
আমায়,
হে বেয়াই, বিদায়!"

ক য়েকদিন পূর্বে বম্বে থেকে ছুটি নিয়ে এসেছিলেন একজন পরিচালক, যিনি হালে একখানি নামকরা ছবির পরিচালনা কার্যে রত আছেন। এখানে থাকা কালে কোন এক চিত্র সাংবাদিকের কাছে তিনি এই আক্ষেপ করে যান যে, বম্বেতে বাঙালী বিদ্বেষ বড় তীব্র এবং তা নিয়ে এখানকার কাগজপত্তরে কিছু লেখা হয় না। বম্বেতে, বিশেষ করে, চলচ্চিত্র-ক্ষেত্রে বাঙালীকে যে লোকে সুচক্ষে দেখে না একথা নতুন নয়। কিছুকাল আগে তো ওখানকার দায়িত্বসম্পন্ন পত্র-পত্রিকায় একেবারে খোলাখুলি ভাবেই বাঙালীদের লুণ্ঠনকারী শৃগাল-কুক্কুর বলে অভিহিত করা হতো—দুর্ভিক্ষের পর এ পর্যন্ত ঐ ধরণের প্রচারকার্য অবশ্য বন্ধ আছে। বম্বের ঐসব পত্র-পত্রিকা এবং অন্যান্য বিদ্বেষ প্রচারকরা একথা ভুলেই যেতো যে, এখান থেকে যেসব বাঙালী গিয়েছেন তাঁদের মধ্যে দু'চারজন ছাড়া কেউই নিজের গরজে যান নি, দস্তুরমত সাধাসাধি করে এবং প্রভূত অর্থের প্রলোভন দেখিয়ে ওখানকারই প্রযোজকরা নিয়ে গিয়েছেন। বম্বের প্রযোজকরা ঐ ভাবে একদিক থেকে বাঙালীর শ্রেষ্ঠত্বকে যেমনি স্বীকার করে নিয়েছেন, তেমনি বাছাবাছি লোকগুলিকে ওখানে পাচার করে বাঙলার শিল্পকে পঙ্গু করে দিয়েছেন নিঃসন্দেহে। সে কথা যাক।

একটা বিষয় আমাদের মেনে নিতেই হবে যে, নিজের ঘরে পরদেশীর কর্তৃত্ব সহনীয় হতে পারে না কিছুতেই। তবে সেই পরদেশী যদি স্বীয় কৃতিত্বে নিজেকে সেই ঘরের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গী করে তোলে, নিজের কথা ভুলে সেই ঘরের উন্নতির জন্যেই মন প্রাণ সঁপে দেয়, তাহলে সে তখন ঘরের এমন একজন হয়ে দাঁড়ায় যাকে ছাড়বার কথা কল্পনায়ও কারুর আসে না। কিন্তু এখান থেকে যেসব বাঙালী কীর্তিমানরা গিয়েছেন তাঁদের মধ্যে ক'জনকে ঐ রকম হতে দেখা যায়? তার বদলে আমরা দেখছি কি?—দেবকী বসু গেলেন ডঙ্কা বাজিয়ে, একবার নয় বারকয়েক; লক্ষ লক্ষ টাকা ব্যয় করালেন, কিন্তু বিনিময়ে মুখে কালি মাখলেন; প্রফুল্ল রায় গেলেন, প্রেমাঙ্কুর আতর্থী, হাফেসজী, হীরেন বসু, ফণী মজুমদার, নীরেন লাহিড়ী, সুধীর সেন, সুশীল মজুমদার, নীতিন বসু, মধু বসু, আরও কতইজনই তো গেলেন একের পর এক, কিন্তু এঁদের মধ্যে কেউ এতটুকু যোগ্যতা দেখাতে পেরেছেন যার জোরে বম্বেওয়ালাদের সৌহার্দ্য ও প্রীতি দাবী করতে পারেন—গড়পড়তা বম্বে ছবির চেয়ে এঁদের তোলা প্রত্যেকেরই ছবির জন্যে খরচ হয়েছে বেশি, কোন রকম সুযোগ পেতেও বাকি থাকেনি, অথচ একজনও এমন কৃতিত্ব ফোটাতে পারেন নি যা



তাঁর বম্বে গমনকে সার্থক বলে প্রমাণ করতে পেরেছে। বম্বের লোকে দেখছে যে, হাতের গোড়ায় তাঁরা থাকা সত্ত্বেও তাঁদের ফেলে বাঙলা থেকে লোক আনানো হচ্ছে বেশি পয়সা দিয়ে, আগন্তুকদের ইচ্ছামত খরচ করা হচ্ছে, সব সুবিধা দেওয়া হচ্ছে,

পরলোকে রতীন বন্দ্যোপাধ্যায়

এ সপ্তাহের একটি আকস্মিক দুঃসংবাদ হ'চ্ছে গত বৃহস্পতিবার ১৪ই জুন অপরাহ্ণ চারটের সময় হঠাৎ হৃদ্‌যন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হ'য়ে বাঙলা মঞ্চ ও পর্দার প্রতিষ্ঠাবান অভিনেতা রতীন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের পরলোকগমন। মাত্র ৪৫ বৎসর বয়সে স্ত্রী, একমাত্র কন্যা এবং অগণিত স্তাবক ও বন্ধুবান্ধবের মাঝ থেকে তিনি চিরবিদায় গ্রহণ ক'রলেন। কাজ ক'রছিলেন বেঙ্গল কেমিক্যালের খাজাঞ্চীখানায়, কিন্তু সেইখানে থাকতেই তিনি অভিনয় প্রতিভায় পরিচয় দেন, আর শেষ পর্যন্ত অভিনয়শিল্পের প্রতি তাঁর টানই তাঁকে স্থায়িভাবে মঞ্চজগতে টেনে আনে। কলাশিল্পের খাতিরে এটা তাঁর একটা বড় ত্যাগ ছিল, কারণ যে সময় তিনি সব ছেড়ে মঞ্চে যোগদান করেন তখন শিল্পীদের আর্থিক দুর্গতি প্রবচনে দাঁড়িয়েছিল। এদিকে কেউ তখন ঘেঁষতে চাইতো না সহজে। রতীন্দ্রনাথ সেসব ভ্রূক্ষেপ না ক'রে শিল্পের সেবায় আত্মনিয়োগে ব্রতী হলেন। সাধারণভাবে প্রথম আবির্ভূত হ'লেন 'মহানিশা' নাটকে। তারপর থেকে মঞ্চ, পর্দা, বেতার ও রেকর্ডে এই ১৫ বৎসর ধ'রে বিশিষ্ট আসন অধিকার ক'রেছিলেন। রতীন্দ্রনাথ শিল্পী হিসেবে যেমন স্তাবক পরিবেষ্টিত ছিলেন তেমনি মিশুকে স্বভাবের ব'লে বন্ধুও ছিলেন বহু জনের—তাঁর অকালে পরলোকগমন সকলের মনেই ব্যথা দিয়েছে।

খাতির করা হচ্ছে বিশেষভাবে, তার শেষে পর্যন্ত সব ক্ষেত্রেই মূষিক প্রসবই দেখা যাচ্ছে বরাবর। এর পরও বম্বের লোকের কাছে বাঙালীদের সাদর অভ্যর্থনা পাওনা থাকে কি করে? এ ছাড়া আরও একটা বড় কথা আছে। আমাদের যাঁরা যান বিদেশে তাঁরা ওখানকার লোককে কোন রকম আমলই দিতে চান না, তাদের কোন গুণ স্বীকারও করেন না এবং পায়ায় ভর করে এমনি ভাব নিয়ে থাকেন আলাদা হয়ে যে, ওখানকার লোকে ঘেঁষতে পারে না এবং ক্রমে অশ্রদ্ধায় তারা ঘেঁষতে চায়ও না। বাঙালী পরিচালক, শিল্পী, কলা-কুশলীরা শ্রেষ্ঠ—একথা নির্বিবাদে সত্য হলেও আর সবাই একেবারেই জন্তু, আফ্রিকার জঙলীরাও সে ঔদ্ধত্য বরদাস্ত করবে না। দুতিন বছর বম্বেতে কাটিয়ে এসেছে এমন লোককে দেখছি, না কারুর সঙ্গে বন্ধুত্ব পাতাতে পেরেছে, না বুঝতে বা বলাতে শিখেছে ওখানকার ভাষা, এমনকি হিন্দুস্থানীও নয়। নয়তো এমন বাঙালীও তো অনেকে রয়েছেন বিশেষ ক'রে সুর পরিচালকদের মধ্যে যাঁরা নিজেদের কৃতিত্বের জোরে বম্বেরই একজন হ'য়ে গিয়েছেনই, তাঁদের নিয়ে তো গোলমাল বাধে না। বাঙালীর শ্রেষ্ঠত্ব ওরা তো মেনে নিয়েছেই, আর নিচ্ছে ব'লেই অনবরত আমদানী ক'রছে এখানকার গুণীদের, কিন্তু তাদের সেই কদরের মর্যাদা কি রক্ষিত হ'চ্ছে?

প্রাচী-রূপমের নৃত্য-নাট্য

গত রবিবার এলিটে মিসেস আশা মুখার্জির প্রযোজনায় প্রাচী-রূপমের নৃত্য-নাট্য প্রদর্শিত হয়েছে। নৃত্যশিল্পী মণি-বর্ধন ও তাঁর দল অনেকগুলি চিত্তাকর্ষক নৃত্য-নাট্য প্রদর্শন করে দর্শকদের মুগ্ধ করেছেন। বিশেষ করে চিত্রসেন, অশোক, দেবী চান্দ্রিকা ও স্বপন-কল্পনা—এই নৃত্য-কয়টি কি পরিকল্পনা, কি রূপসজ্জা সব দিক দিয়ে দর্শকদের আনন্দ দিয়েছে।

বিবিধ

কাজ না থাকলেও স্টুডিওতে রোজ হাজিরে দিতে হবে, এই আইন করায় শালিমার স্টুডিওর অভিনয়শিল্পীরা সম্প্রতি ধর্মঘট করে এবং প্রতিবাদকল্পে পদত্যাগপত্র দাখিল করে। সন্ত্রস্ত হ'য়ে মালিক ডবল্যু জেড্‌ আহমেদ চট্‌ ক'রে মামলা মিটিয়ে ফেলেন কিন্তু প্রধান অভিনেতা শ্যাম তবুও পদত্যাগপত্র ফিরিয়ে নেয়নি।

* * * *

বিলেতে নাচিয়ে ব'লে খ্যাত রফিক আনোয়ার একখানি ছবি তোলার লাইসেন্স পেয়ে কলকাতায় সেখানি তোলার ব্যবস্থা ক'রছেন—ছবিখানি তিনি হলিউডের কোন পরিচালককে দিয়ে তোলাবেন ব'লে শোনা যাচ্ছে।

* * * *

সাধনা বসু চলে আসায় তাঁর স্থলে সুরৈয়াকে উর্বশীর নাম ভূমিকাটি অর্পণ করা হ'য়েছে।

পুস্তক পরিচয়

ভারতের মুক্তি সাধক—শ্রীগোপাল ভৌমিক প্রণীত। বেঙ্গল পাবলিসার্স, ১৪, বঙ্কিম চাটুজ্যে স্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য ১৸৹।

ভারতের জাতীয় মহাসভা কংগ্রেস আজ ভারতবর্ষের স্বাধীনতা আন্দোলনের সর্ববৃহৎ শক্তিশালী প্রতিষ্ঠান। ১৯১৭ সালে নরমপন্থী পুঁজিবাদীদের হস্ত হইতে চরমপন্থী জাতীয়তাবাদী নেতৃবৃন্দের উপর যখন কংগ্রেসকে পরিচালনার দায়িত্ব অর্পিত হইল, সেই সময় হইতে বর্তমান কাল পর্যন্ত যে সকল দেশনেতা বহু বাধাবিঘ্নের মধ্য দিয়া কংগ্রেসকে ক্রমশ ভারতের জাগ্রত জনগণের প্রতিষ্ঠানে পরিণত করিলেন, সেইসব নেতৃবৃন্দের অন্যতম বারো জন স্বাধীনতা সংগ্রামী নেতার রাজনীতিক জীবনের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস ও ঘটনা আলোচ্য পুস্তকে লিপিবদ্ধ হইয়াছে। সুরেন্দ্রনাথ, তিলক, মতিলাল, মদনমোহন, লালা লাজপত, মহাত্মা গান্ধী, চিত্তরঞ্জন, যতীন্দ্রমোহন, মৌলানা আজাদ, জওহরলাল, আবদুল গফ্ফরখাঁ, সুভাষচন্দ্র এই বারোজন বিশিষ্ট নেতার জীবনের ঘটনাবলী ও স্বাধীনতা আন্দোলনে ইঁহাদের দান অতি সহজ ও সরল ভাষায় চিত্তাকর্ষকরূপে লিখিয়াছেন। লেখক সুসাহিত্যিক ও সাংবাদিক। সাংবাদিক দৃষ্টি লইয়া লেখক এইসব নেতৃবৃন্দের জীবনের ঘটনাবলী ক্রমিক পর্যায়ে এমনভাবে সাজাইয়াছেন যে, জীবনের ইতিহাসের সঙ্গে ১৯১৭ সাল হইতে ১৯৩৮ সাল পর্যন্ত ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের ইতিহাসও মোটামুটি এই গ্রন্থে পাওয়া যাইবে। সুসাহিত্যিকের কলমে পুস্তকটি লিখিত বলিয়া রচনা সরস ও সরল উপন্যাসের মত চিত্তাকর্ষী। সেই সঙ্গে শিল্পী শৈল চক্রবর্তী অঙ্কিত নেতৃবৃন্দের প্রতিকৃতি ও প্রচ্ছদপট পুস্তকের গৌরব বৃদ্ধি করিয়াছে। এক কথায় বাঙলা ভাষায় এই ধরণের পুস্তক ইহাই প্রথম এবং লেখককে আমরা ইহার জন্য অভিনন্দন জানাইতেছি।

New Life and New China—by Mao Tse Tung and others. প্রকাশকঃ পূরবী পাবলিশার্স, ৭২ হ্যারিসন রোড, কলিকাতা—

রুশীয় কমিউনিস্টদের বিস্ময়কর বীরত্বে এবং ভারতীয় কমিউনিস্টদের হুহুঙ্কারে ও বেপরোয়া গালাগালিতে চীনের কমিউনিস্টদের কথা আমাদের কানে সর্বদা পৌঁছিবার সুযোগ পায় না। আলোচ্য গ্রন্থখানি মাও ৎসি টুং প্রভৃতি কয়েকজন বিখ্যাত চীনা কমিউনিস্ট নেতাদের বক্তৃতা ও প্রবন্ধের সমষ্টি। জাপ সেনানীর পিছনে প্রান্তদেশে (Border Region) বিশেষ করিয়া য়েনান জেলায়, কমিউনিস্ট গভর্নমেণ্ট কিভাবে বিধ্বস্ত দেশসমূহের পুনর্গঠন, পর্যাপ্ত ফসল উৎপাদন এবং চাষী ও কারখানার শ্রমিকদের অবস্থার উন্নতি করিয়াছে, তাহার বিস্তারিত বিবরণ এই গ্রন্থটিতে পাওয়া যায়। চীনের কমিউনিস্টরা ভারতীয় কমিউনিস্টদের মত রুশিয়া হইতেই প্রেরণা পাইয়াছেন বটে, কিন্তু তাঁহাদের ভারতীয় ভ্রাতাদের মত রুশিয়ার অন্ধ অনুকরণ ও অনুসরণ করেন নাই, রুশীয় সুরে চীনা গানও গাহেন নাই। কোনও দুর্দশা নিবারণের জন্য তাঁহারা সুদূর মস্কো অথবা নিকটস্থ চুংকিং-মিন-ট্যাং গভর্নমেণ্টএর দ্বারস্থ হন নাই। আর একটি বিষয়ে ভারতীয় ও চীনা কমিউনিস্টদের মধ্যে বিশেষ পার্থক্য দেখা যায়। চীনারা দুই একটি জাপানী বোমার কল্যাণে উৎকট জাতীয় (?) সংগীত রচনা করিয়া উৎকটতর আস্ফালন করেন নাই। তাঁহারা রীতিমত হাতিয়ার লইয়া নিজেদের জীবন তুচ্ছ করিয়া লড়াই করিয়াছেন।

ভারতীয় কমিউনিস্টদের কার্যকলাপ যাঁহাদের মনে গভীর হতাশার সঞ্চার করিয়াছে, তাঁহারা এই পুস্তকটি পড়িলে আনন্দ পাইবেন। প্রেরণার উৎস ও চিন্তাধারা মোটামুটি এক হইলেও সুবিধাবাদ ও আদর্শবাদ—এই দুই ক্ষেত্রে পড়িয়া উৎসের কি আশ্চর্য রকমের বিভিন্ন পরিণতি ঘটে, এই পুস্তকে তাহা পরিষ্কার বুঝা যাইবে।

রঙমশাল (বৈশাখ, ১৩৫২)—শ্রীকামাক্ষীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় ও দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত মাসিকপত্র। গল্প-কবিতা নির্বাচনে পত্রিকাখানার বেশ একটা বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা যায়। কিন্তু একখানা ক্ষুদ্র কলেবর সাময়িক পত্রে চার চারটি ক্রমশঃ প্রকাশ্য রচনা থাকা রীতিমত অসুবিধাজনক। এগুলির সম্বন্ধে মতামত প্রকাশও চলে না। বাকী রচনার মধ্যে কামাক্ষীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়ের 'ছেলেটা' ও বুদ্ধদেব বসুর 'Shoe-শিক্ষা' সুখপাঠ্য। পত্রখানার ছাপা, কাগজ উত্তম এবং বহিরবয়ব সুরুচিসম্মত।

রেনবো—ওয়েণ্ডা ওয়াসিলেস্কা। অনুবাদক—পরিমল মুখোপাধ্যায়। বুক স্ট্যাণ্ড, ১।১।১এ কলেজ স্কোয়ার ইস্ট, কলিকাতা। মূল্য ২৷৹।

১৯৪২ সালে রাশিয়ায় এই উপন্যাসখানি যখন প্রথম প্রকাশিত হয়, তখন দেশবাসীর মধ্যে আলোড়ন সৃষ্টি করে এবং সর্বজনসমাদৃত হয়। ইহার পরই ১৯৪৩ সালে উপন্যাসখানি সর্বশ্রেষ্ঠ বিবেচিত হওয়ায় স্ট্যালিন পুরস্কার প্রাপ্ত হয়। বর্তমান ইউরোপীয় যুদ্ধের প্রথম দিকে য়ুক্রেণ অঞ্চলের একটি পল্লীগ্রামকে কেন্দ্র করিয়া উপন্যাসখানি রচিত। একদিকে নিরীহ গ্রামবাসী শিশু ও রমণীদের উপর জার্মান সৈন্যবাহিনীর অমানুষিক অত্যাচার অপরদিকে নিজেদের দেশরক্ষার জন্য পল্লীবাসী নরনারী ও শিশুদের অকাতরে প্রাণ বলিদান এই উপন্যাসের প্রতিপাদ্য। লোমহর্ষক ঘটনাবলীর মধ্য দিয়া বর্ণিত হইয়াছে। যদিও বইখানি প্রোপাগাণ্ডার উদ্দেশ্য লইয়াই লিখিত, কিন্তু প্রোপাগাণ্ডা যে কী পরিমাণ মনের উপর দাগ কাটিয়া যায় আলোচ্য গ্রন্থটি তাহার উৎকৃষ্ট উদাহরণ। বইখানির বাঙলা অনুবাদ করিয়া শ্রীযুক্ত পরিমল মুখোপাধ্যায় কৃতিত্বের পরিচয় দিয়াছেন। বইখানির বর্ণনার গাম্ভীর্য ও বলিষ্ঠতা অনুবাদে কোথাও খর্ব হয় নাই। অনুবাদে কোথাও জড়তা নাই, ভাষার সচ্ছন্দ গতি বজায় থাকায় বইখানি পড়িতে কোথাও ক্লান্তি বোধ হয় না।

কন্ট্রোলের সাড়ী—শ্রীজলধর চট্টোপাধ্যায় প্রণীত। স্ট্যাণ্ডার্ড বুক কোম্পানী ২১৬, কর্ণওয়ালিশ স্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য ২্।

সুপ্রসিদ্ধ নাট্যকার শ্রীজলধর চট্টোপাধ্যায়ের এই বইখানি পঞ্চাশের মন্বন্তরের পটভূমিকায় লেখা একখানি হাস্যরসাত্মক উপন্যাস। যুদ্ধজনিত নানা দুর্দশায় বাঙালী আজ ভগ্ন হৃদয় ও ভগ্ন মন লইয়া কোন রকমে বাঁচিয়া আছে। এই নিরানন্দ জীবনে আনন্দ পরিবেশনের জন্য লেখক হাস্যরসের মধ্য দিয়া একটি প্রেমের কাহিনীর অবতারণা করিয়াছেন। লেখকের চেষ্টা সেদিক দিয়া সার্থক। কিন্তু হাল্কা হাসির অন্তরালে একটি গভীর বেদনার সুর প্রচ্ছন্নভাবে মনকে আলোড়িত করে। বইখানি পড়া শেষ হইলে হাসিও শেষ হয়; কিন্তু কাহিনীর করুণ সুর বহুক্ষণ মনকে অশ্রুসিক্ত করিয়া রাখে। রচনার সার্থকতা সেইখানে।

হীরের টুকরো—শ্রীপ্রভাতকিরণ বসু প্রণীত। গ্রন্থ-কুটীর, ৮।এ, নন্দরাম সেন স্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য ১৷৹।

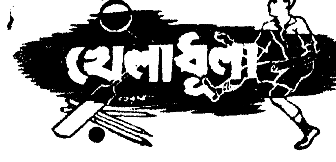
ছোটো ছেলেদের উপন্যাস। বাঙলার পল্লীগ্রামের দুটি ভাই-বোন, বাঙলা দেশকে তাহারা ভালবাসে এবং দেশকে বড় করিবার আদর্শ ও আকাঙ্খা লইয়া জীবনের সংগ্রামে পাড়ি দিয়া অবশেষে একদিন তাহারা সফলকাম হইল—সেই কাহিনীই লেখক সহজ সরল ভাষায় দরদের সহিত এই গ্রন্থে ফুটাইয়া তুলিয়াছেন।

অভিশপ্ত বাঙলা—শ্রীপ্রভাতকিরণ বসু প্রণীত। প্রকাশকঃ ডিক্সনস্, ৩২, সোয়ালো লেন, কলিকাতা। মূল্য ১৷৹।

বিশ্বেশ্বর ডাকাত—অর্থাৎ বিশে ডাকাতের নাম বাঙলার ঘরে ঘরে এককালে প্রচলিত ছিল। বহু প্রাণহরণ এবং বহু ধন অপহরণ করিয়া বিশে ডাকাত একদিন ধনে-জনে পুত্র পরিবারে বিরাট কীর্তি রাখিয়া গিয়াছিল। কিন্তু বহু মৃতের আত্মার অভিশাপে তাহার বংশে একে একে কিভাবে ভাঙন ধরিয়া ছারখার হইয়া গেল সেই রোমাঞ্চকর কাহিনী আলোচ্য গ্রন্থে লেখক অপূর্ব নৈপুণ্যের সহিত ফুটাইয়াছেন। বইখানি নানাচিত্রে শোভিত, রঙীন প্রচ্ছদপট মনোরম।

বাঙলা সাময়িক সাহিত্য (১৮১৮—১৮৬৭)—শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত, ২নং বঙ্কিম চাটুজ্যে স্ট্রীট, কলিকাতা, বিশ্বভারতী গ্রন্থালয় হইতে প্রকাশিত; মূল্য আট আনা; পৃষ্ঠা সংখ্যা—৮৬।

১৮১৮ হইতে ১৮৬৭ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত যে সমস্ত সাময়িকপত্র প্রকাশিত হইয়াছিল, গ্রন্থখানিতে তাহার সংক্ষিপ্ত পরিচয় প্রদত্ত হইয়াছে। মোগল বাদশাহদের আমলেও কিভাবে বাদশাহ সুবেদার, ফৌজদার, থানাদার, এমন কি ধনী বণিকেরা পর্যন্ত 'ওয়াকেয়া-নবিস্' নামে অভিহিত সংবাদ লেখকগণের দ্বারা 'আখ্‌বার,' 'আখ্‌বারাৎ' বা সংবাদ-লিপি লিখাইয়া এবং তাহা পাঠ করিয়া কিভাবে দেশের, রাজ্যের ও নানা দরবারের সংবাদ অবগত হইতেন, এবং সেই সংবাদ কিরূপভাবে দেশের জনগণের মধ্যে প্রচার লাভ করিত, লেখক সংক্ষিপ্ত, অথচ জ্ঞাতব্য তথ্যপূর্ণ নিবন্ধে তাহা বিবৃত করিয়াছেন। কোম্পানীর আমলে সংবাদপত্র শাসন ও ১৮২৩ খৃষ্টাব্দের মুদ্রাযন্ত্রবিষয়ক আইনের ইতিহাসও গ্রন্থখানিতে সন্নিবেশিত হইয়াছে। সংবাদপত্র শাসন ও মুদ্রাযন্ত্র আইন ছাড়াও ২১৯ খানি সাময়িক পত্রের পরিচয় ও সংক্ষিপ্ত ইতিহাস আলোচ্য গ্রন্থখানিতে দেওয়া হইয়াছে। পুস্তকখানির ক্ষুদ্র পরিসরের মধ্যে লেখক যেরূপ দক্ষতা ও ঐতিহাসিক দৃষ্টি লইয়া এতগুলি বিষয়ের অবতারণা করিয়াছেন, তাহাতে তাঁহাকে প্রশংসাই করিতে হয়। আলোচ্য গ্রন্থখানি ব্রজেন্দ্রবাবুর সংবাদপত্রের ইতিহাসের সংক্ষিপ্ত রূপ বলা চলে। তাহা হইলেও এরূপ একখানি গ্রন্থ রচনায় ও তাহাতে নূতন নূতন তথ্য সংযোজনে লেখক যে ধৈর্য ও শ্রমশীলতার পরিচয় প্রদান করিয়াছেন, তাহাতে তিনি দেশবাসীর ধন্যবাদার্হ। এই যুদ্ধের বাজারেও এরূপ একখানি সুলিখিত ও সুমুদ্রিত গ্রন্থের মূল্য মাত্র ৷৹ আনা খুবই সুলভ বলিতে হইবে।



ফুটবল

কলিকাতা ফুটবল লীগ প্রতিযোগিতার প্রথম ডিভিসনের দ্বিতীয়ার্ধের খেলা আরম্ভ হইয়াছে। ভবানীপুর ক্লাব দল এখনও পর্যন্ত লীগ তালিকার শীর্ষস্থানে অবস্থান করিতেছে। তবে এই স্থানে প্রতিযোগিতার শেষ পর্যন্ত এই দলকে দেখা যাইবে কি না সেই বিষয় যথেষ্ট সন্দেহের কারণ হইয়া পড়িয়াছে। এই দলের খেলায় পূর্বের ন্যায় দৃঢ়তা ও নৈপুণ্য প্রকাশিত হইতেছে না। খেলোয়াড়গণ নৈরাশ্যজনক নৈপুণ্যের অবতারণা করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। প্রথম ডিভিসন লীগের যে সমস্ত দলকে প্রথমার্ধের খেলায় শোচনীয়ভাবে পরাজিত করিতে কোনরূপ বেগ পাইতে হয় নাই, সেই সকল দলের বিরুদ্ধে খেলিয়া তাঁহাদিগকে কোনরূপে পয়েণ্ট অর্জন করিতে দেখা যাইতেছে। এইরূপ প্রাণহীন খেলা খেলিবার মত খেলোয়াড়দের কি কারণ থাকিতে পারে তাহা তাঁহারাই জানেন। তবে সাফল্যের কথা স্মরণ করিয়া খেলোয়াড়গণ যদি খেলার নীতি পরিবর্তন না করেন, তবে দলের সৌভাগ্যলাভ সম্ভব হইবে না। মোহনবাগান দল দ্বিতীয়ার্ধের বিভিন্ন খেলায় পূর্বাপেক্ষা উন্নততর নৈপুণ্য প্রকাশ করিবেন বলিয়াই আশা করা গিয়াছিল। কিন্তু বর্তমানে যেরূপ ক্রীড়াকৌশলের নিদর্শন পাওয়া যাইতেছে তাহাতে নিঃসন্দেহ বলা চলে, তৃতীয়বার লীগ চ্যাম্পিয়ান হইবেই এইরূপ ভরসা করা অন্যায় হইবে। প্রথমার্ধের শেষ খেলায় ইস্টবেঙ্গল দলের নিকট পরাজিত হইয়া সমগ্র দলের খেলোয়াড়গণের মনোবলের যে ভাঙ্গন ধরিয়াছিল তাহা আজও কাটাইয়া উঠিতে পারেন নাই। কিন্তু ইহার ফলে পূর্ব অর্জিত গৌরব রক্ষা করা যে অসম্ভব হইবে, ইহা খেলোয়াড়গণ কেন উপলব্ধি করিতে পারিতেছেন না? তাহা ছাড়া বিভিন্ন খেলায় যেরূপভাবে দল গঠন করা হইতেছে তাহাও খুব আশাপ্রদ নহে। পরিচালকগণ বিশেষ বিবেচনা, বিশেষ আলোচনার পর দল গঠন করিয়া থাকেন বলিয়া মনে হয় না। দলের স্বার্থ চিন্তা করিয়া পরিচালকমণ্ডলীর সভ্যগণ নিজ নিজ "পেটোয়া" খেলোয়াড়দের দলভুক্ত করিবার রীতি যদি ত্যাগ করেন, মনে হয় দলের বিভিন্ন খেলার ফলাফল অনেক ভাল হইতে পারে। আমরা আশা করি পরিচালকমণ্ডলীর সভ্যগণ ইহা উপলব্ধি করিয়া দল গঠন করিবেন।

ইস্টবেঙ্গল ক্লাবের খেলা পূর্বাপেক্ষা অনেক ভাল হইতেছে। তবে ইহাদের "স্থান পরিবর্তন" নীতি এখনও পরিত্যক্ত হইল না দেখিয়া আশ্চর্য হইতেছি। দলের চ্যাম্পিয়ান হইবার যথেষ্ট সম্ভাবনা আছে। এইরূপ ক্ষেত্রে পরীক্ষামূলক ব্যবস্থা ত্যাগ করিলেই ভাল করিবেন।

মহমেডান স্পোর্টিং ক্লাবের খেলোয়াড়গণ দ্বিতীয়ার্ধের বিভিন্ন খেলায় অপূর্ব নৈপুণ্য প্রদর্শন করিবেন ইহাই ছিল আমাদের আশা; কিন্তু দ্বিতীয়ার্ধের যে কয়েকটি খেলা এই পর্যন্ত অনুষ্ঠিত হইয়াছে তাহাতে হতাশব্যঞ্জক ক্রীড়াকৌশল প্রদর্শন করিতে দেখিয়া আমাদের সেই আশা ও ভরসা ত্যাগ করিতে হইবে বলিয়া মনে হইতেছে।

ক্যালকাটা ও বি এণ্ড এ রেল দল দ্বিতীয়ার্ধের বিভিন্ন খেলায় উন্নততর নৈপুণ্য প্রদর্শন করিতেছেন। ফলে বিভিন্ন খেলায় সহজেই সাফল্যলাভ করিতেছেন। তবে লীগ চ্যাম্পিয়ান হইবার আশা নাই ইহা বলা খুব অন্যায় হইলেও বলিতে আমাদের কোনরূপ দ্বিধা বোধ হইতেছে না। ভবানীপুর, মোহনবাগান, ইস্টবেঙ্গল প্রভৃতি দলের বর্তমানে নাগাল ধরা খুবই কঠিন। তবে এইজন্য প্রচেষ্টা ত্যাগ করিতে বলি না। যদি অঘটন ঘটে হয়ত বা তাহার ফলেই ইহাদের মধ্যে কেহ না কেহ চ্যাম্পিয়ান হইতেও পারেন।

এইরূপভাবে বিভিন্ন দল সম্পর্কে আলোচনা করিয়া আমরা বলিতে বাধ্য হইতেছি যে, কোন দল চ্যাম্পিয়ান হইবে তাহা এখনও বলা চলে না। তবে শেষ পর্যন্ত চ্যাম্পিয়ানসিপের জন্য বিভিন্ন দলের মধ্যে তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতা বর্তমান থাকিবে, ইহা আমরা জোর করিয়াই বলিতে পারি।

ফুটবল খেলার স্ট্যাণ্ডার্ডের উন্নতিকল্পে কয়েকজন বিশিষ্ট ক্রীড়ামোদী পেশাদার খেলোয়াড় নীতি প্রবর্তনের জন্য বিশেষ চেষ্টা করিতেছেন। ইহারা কতদূর সাফল্যমণ্ডিত



উদীয়মান বালিকা সাইক্লিস্ট
কুমারী তপতী মিত্র

হইবেন জানি না, তবে এই আন্দোলনের প্রতি আমাদের সহানুভূতি আছে। প্রকৃতই লুকোচুরির সাহায্যে অনেক পেশাদার খেলোয়াড় অপেশাদার নামে সকলের নিকট পরিচিত। ইহা খুবই দুঃখের ও পরিতাপের বিষয়। ইহার পরিবর্তে পেশাদারী ব্যবস্থা প্রবর্তন হওয়া খুব সম্মানজনক ব্যবস্থা হইবে। আর আমরাও এই ব্যবস্থা প্রবর্তিত হইতে দেখিলে প্রকৃতই আনন্দিত হইবে। কবে সে সুদিন আসিবে জানি না।

সন্তরণ

বেঙ্গল এমেচার সুইমিং এসোসিয়েশনের পরিচালকগণের কার্যক্ষেত্রে না অবতীর্ণ হইবার দৃঢ়তা দেখিয়া আশ্চর্য হইলাম। কিন্তু এ দিকে উৎসাহী সাঁতারুগণ ধৈর্য হারাইয়া মরিয়া হইয়া উঠিয়াছেন—ইহারা হয়তো শীঘ্রই অপ্রীতিকর অনেক কিছুই করিয়া ফেলিবেন, তখন পরিচালকগণের কি অবস্থা হইবে ভাবিয়া অস্থির হইতেছি। এত বিলম্ব হইবার হেতু কি থাকিতে পারে বুঝি না। তাঁহারা প্রকৃতই কি এত স্বার্থসিদ্ধিতে অন্ধ যে দেশের ভবিষ্যৎ সাঁতারুদের কি সর্বনাশ করিতেছেন, তাহা উপলব্ধি করিতে পারিতেছেন না? যদি তাঁহাদের এই বিষয় দৃষ্টি দিবার মত অফুরন্ত সময় না থাকে, তবে কেন তাঁহারা অবসর গ্রহণ করিতেছেন না? বাঙলাদেশে বহু সন্তরণঅভিজ্ঞ লোক আছেন, যাঁহারা এই পরিচালকমণ্ডলীর সভ্যদের স্থান পূরণ করিতে পারেন। সেই সকল অভিজ্ঞ সাঁতারুদের লইয়া যদি কোন দিন পরিচালকমণ্ডলী গঠিত হয়, আমরা জোর করিয়াই বলিতে পারি এইরূপভাবে বৎসরের পর বৎসর পরিচালনায় শৈথিল্য প্রকাশিত হইতেছে বলিয়া বার বার উক্তি করিতে হইবে না।

সাইকেল চালনা

বেঙ্গল অলিম্পিক এসোসিয়েশন মহিলাদের সাইকেল প্রতিযোগিতা কর্মতালিকাভুক্ত করিবার পর এ্যাংলো ইণ্ডিয়ান বালিকাগণকে বিভিন্ন স্পোর্টস অনুষ্ঠানে সাফল্য অর্জ করিতে দেখা যায়। দুই এক বৎসর পরেই কুমারী শোভা গাঙ্গুলী নামক একটি বাঙালী বালিকা এই বিষয় কয়েকটি অনুষ্ঠানে কৃতিত্ব প্রদর্শন করে। উক্ত কুমারী গাঙ্গুলী হঠাৎ কলিকাতার বাহিরে চলিয়া যাওয়ায় এই বিভাগটিতে পুনরায় এ্যাংলো ইণ্ডিয়ান বালিকাগণ গৌরব অর্জন করিতে সক্ষম হন। ফলে বাঙালী বালিকা এ্যাথলিটদের মধ্যে এই বিষয়ে কুমারী গাঙ্গুলীর অর্জিত গৌরব পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য আগ্রহ জাগে। এই বিষয়ে শিশু মঙ্গল প্রতিষ্ঠানের বালিকা এ্যাথলীটদের বিশেষ উৎসাহ পরিলক্ষিত হয়। সেই উৎসাহের ফলস্বরূপ গত বৎসর হইতে শিশু মঙ্গল প্রতিষ্ঠানের কয়েকজন বালিকা এ্যাথলিটকে বিভিন্ন অনুষ্ঠানে যোগদান করিতে ও কয়েকটিতে সাফল্য অর্জন করিতে দেখা যায়। এই প্রতিষ্ঠানের সভ্য, বেলতলা বালিকা বিদ্যালয়ের ছাত্রী কুমারী তপতী মিত্র এই বৎসর বিভিন্ন অনুষ্ঠানে সাফল্য অর্জন করিয়া পূর্ব অর্জিত গৌরব পুনরুদ্ধারে সক্ষম হইয়াছে। ইহার সাইকেল চালনা কৌশল ও দৃঢ়তা দেখিয়া মনে হয়, আগামী বৎসরে কোন মহিলা বা বালিকা কোন সাইকেল প্রতিযোগিতায় তাহাকে পরাজিত করিতে সক্ষম হইবে না। আমরা এই বালিকার উত্তরোত্তর উন্নতি কামনা করি।

গঙ্গোত্রী

সুবোধ ঘোষ

(৩৩)

অজয় ও পরিতোষ চলে গেল। অজয়ের হাতের লণ্ঠন দুলতে দুলতে মান্দার গাঁয়ের নিস্তব্ধ রাত্রির ঘন অন্ধকারের মধ্যে ক্রমে ক্ষীণতর হয়ে অদৃশ্য হলো। মাধুরী আর বাসন্তী ঘরের ভেতর এসে বসলো।

আজকের সাড়াহীন রাত্রিটার গায়ে যেন একটা শঙ্কার ছাপ লেগে আছে। হঠাৎ একটা হাল্কা ঝড় বাগানের গাছের মাথাগুলি কাঁপিয়ে সির্‌সির্ করে উঠলো। বাতাসটা যেন নিজের দৌরাত্ম্যে মত্ত হয়ে উঠতে লাগলো। নিঃশব্দ রাত্রির স্থৈর্য ক্রমেই একটা প্রবল আক্ষেপে এলোমেলো ও উচ্ছৃঙ্খল হয়ে উঠলো। আকাশের তারাগুলি আকাশের কালো চাঁদোয়াতে চুমকির মত তখনো ছড়িয়ে রয়েছে। মেঘ নেই। ঝড়ের শব্দটা ক্রমেই রুষ্ট হয়ে উঠতে লাগলো। সারা মান্দার গাঁয়ের ওপর দিয়ে কতগুলি প্রতিহিংসার নিশ্বাস যেন এলোপাথাড়ি দৌড়ে বেড়াচ্ছে। হু হু করে এক একবার বাগানের গাছপালার বন্ধন ভেদ করে আকাশের ওপরে উঠতে থাকে। মনে হয়, ঐ কালো চাঁদোয়ার চুমকিগুলি এইবার ছিঁড়ে লুটিয়ে পড়বে চারদিকে।

মাধুরী একটু ভয়ার্তের মত বললো—এ কি আরম্ভ হলো। অজয়দা ওরা মাত্র রওনা হলেন, এরই মধ্যে......।

বাসন্তী—পথ হাঁটতে বেগ পেতে হবে। এই ঝড়গুলির কোন নিয়মকানুন নেই।

মাধুরী—সেরকম বাধা হলে ফিরে আসবেন নিশ্চয়।

বাসন্তী—অজয়দা ফিরবেন না। ওর আবার এইসবই ভাল লাগে।

মাধুরী চুপ করে রইল। বাসন্তী নিজের মনের আবেগে যেন কাব্য করে বলে চললো—আমারও বড় ইচ্ছে করে মাধুরী। চুপচাপ একা একা মেঠো পথের ওপর দিয়ে রাত্রির অন্ধকারে হেঁটে চলেছি। বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে, মেঘ ডাকছে, বৃষ্টি পড়ছে, শন্ শন্ ক'রে ঝড় উড়ে বেড়াচ্ছে চারদিকে, তারই ভেতর একা চলেছি। কোথায় যাচ্ছি, তা'ও জানি না। কিন্তু ফিরবার উপায় নেই। শুধু এগিয়ে চলেছি। এমনি করে যেতে যেতে হঠাৎ পৌঁছে গেলাম নদীর ধারে। নদীর জলের ঢেউ পাগল হয়ে আছড়ে পড়ছে কিনারায়। মাটি ধ্বসে পড়ছে। মাঝে মাঝে দেখতে পাচ্ছি বিদ্যুতের আলোকে—নদীর ওপর বৃষ্টির গুঁড়ো ধোঁয়ার মত ছেয়ে রয়েছে। তারই আড়ালে ঢেউয়ের তোলপাড়ানির শব্দ লক্ষ হাহাকারের মত গড়াচ্ছে ভাঙছে।

মাধুরী—তারপর?

বাসন্তী—তারপর আর কিছু নয়।

মাধুরী—ঝাঁপিয়ে পড়তে ইচ্ছে করবে না?

বাসন্তী—না ভাই এত সাহস আমার নেই।

মাধুরী—তাহলে শুধু দাঁড়িয়ে থেকেই বা কি হবে?

বাসন্তী—বাস্, ঐ পর্যন্ত, তারপর আর কি করা যায়, তা আর ভেবে উঠতে পারি না।

মাধুরী—এরপর কি ভাবতে ইচ্ছে করে জান?

বাসন্তী—কি?

মাধুরী—হঠাৎ দেখতে পাওয়া গেল, একটা নৌকা সেই ঝড়ের সব আক্রমণ সহ্য করে ধীরে ধীরে কিনারার দিকে আসছে।

বাসন্তী—না ভাই, দেখা মাত্র আমি অজ্ঞান হয়ে যাব। ও আমার সহ্য হবে না।

মাধুরী—ধরে নাও, একেবারে খালি নৌকা, কোন মানুষ নেই।

বাসন্তী—তাতেই বা কি লাভ? এ নৌকা ডুবে যাবে, কোন ভরসা হয় না।

মাধুরী—বুঝেছি।

বাসন্তী—কিছু বুঝতে পারনি।

বাসন্তীর প্রতিবাদের সুরের মধ্যে অত্যন্ত প্রচ্ছন্ন একটা বিদ্রূপের আভাস ছিল। কথাটা বলে বাসন্তী নিজেই লজ্জিত ও দুঃখিত হলো। তবু মাধুরীর মুখের দিকে তাকিয়ে বাসন্তীর মনে হয়, এই রূঢ়তার আভাসটুকু সত্যি বুঝতে পারেনি মাধুরী।

মাধুরী কিছুক্ষণের জন্য অন্যমনস্ক হয়েছিল। বাইরের শব্দ স্পর্শ রূপ দিগন্তজোড়া অন্ধকারের প্রশ্রয়ে, আকস্মিক ও অকারণ একটা ঝড়ের প্ররোচনায় ক্রমেই ভয়াবহ হয়ে ওঠছিল। মরা জোনাকীর কুচি ঝরে পড়ছিল হাজারে হাজারে। ঝড়ের অবিশ্রান্ত উচ্ছ্বাসের মধ্যেও, সকল শব্দের রুদ্র হর্ষ ও আক্ষেপের মধ্যে অতি করুণ বিলাপের রেশ মাঝে মাঝে ভেসে আসে। কোন ঘুমকাতুরে নিশ্চিন্ত পাখীর বাসা হাওয়ার দাপটে উপড়ে যাচ্ছে, তারি অসহায় বেদনা মাঝে মাঝে সমস্ত বাতাসের প্রমত্ততাকে করুণ করে তুলছে। মাধুরীর সত্যি ভয় করছিল।

নানা কারণে আজকের রাতটা অদ্ভুত হয়ে ওঠলো। কোন হাসি দিয়ে কোন অকপট আলাপের আনন্দ দিয়ে, কোন কর্তব্যের নিষ্ঠা, সংকল্পের আন্তরিকতা, কোন প্রতিজ্ঞা ও প্রতীক্ষার ধৈর্য দিয়ে এ রাত্রির উচ্ছৃঙ্খলতাকে শান্ত করা সম্ভব নয়। অকারণে সমস্ত সংসারের যত প্রতিশোধগুলি যেন একটা লগ্নের সুযোগে নাটকীয় হয়ে উঠেছে, সব ঘটনাগুলি যেন আজকের রাত্রির জন্য ধৈর্য ধরে বসেছিল। হঠাৎ বাঁধ ভেঙে সব ঘটনার স্রোত ছুটে এল। এই অন্ধকারের মনে প্লাবন সৃষ্টি করলো, তাই তার রূপ এত ভয়াবহ ও এত অস্থির।

—ফিরে আসুক ওরা দুজনে। অন্যমনস্কভাবেই বাইরের পথের দিকে তাকিয়ে মাধুরী যেন মনে মনে প্রার্থনা করে। কিছুক্ষণের মধ্যেই অন্যমনস্কতা কেটে যায়, মাধুরী চমকে ওঠে এই অদ্ভুত প্রার্থনাটিকে যেন শুনতে পায়। বাইরের প্রকৃতির মতই তার মনের রীতিনীতি আকাঙ্ক্ষা ও প্রার্থনাগুলির অকারণত্ব দেখতে পায়। এইমাত্র বাসন্তী বলেছে, শত ঝড় হোক অজয়দা আজ আর ফিরছেন না। বাসন্তীর ধারণা হয়তো পরিতোষ ফিরে আসবে। যদি হঠাৎ পরিতোষ একাই ফিরে আসে তবে এমন কিছু অস্বাভাবিক হবে না। সকল অমর্যাদা ও তুচ্ছতাকে সে সহজে গ্রহণ করবার এক অদ্ভুত শক্তি পেয়েছে। অজয়কে একেই আজ তাকে চলে যেতে হয়েছে। নিশ্চিন্ত হয়ে দাঁড়াবার মত কোন ঠাঁই সে পায়নি। পাওয়ার দাবীও সে করেনি। সবদিক দিয়ে প্রস্তুত হয়েই যেন সে এসেছিল। তার চিরকালের আশ্বাসের ছবি মুছে গেছে, তার ঘুম ভেঙে গেছে, তাই তার স্বপ্নও পর হয়ে গেছে। বড় বড় শ্রদ্ধা, মহত্ব ও প্রতিজ্ঞার দাবীর ভিড়ে তার দাবী ছোট হয়ে গেছে। সে নিজেই বলে গেল, জীবনে দূরে সরে গিয়েও সে মাঝে মাঝে আসবে। পরিতোষকে ভয় করার কিছুই নেই। তার জীবনের বঞ্চনাকে সে মুখ খুলেই বলে ফেলেছে। গোপন রেখে কোন বিরোধ বেদনার জটিলতা সৃষ্টি করেনি। পরিতোষের আসা আর যাওয়া, দুইই সহজ সরল ও স্বাভাবিক। এর মধ্যে কোন দুশ্চিন্তা করবার কুটিল কঠিন প্রশ্ন নেই। মাধুরীর জীবনে কোন ইষ্ট বা অনিষ্ট ঘটাবার মত দায়িত্ব নিয়ে পরিতোষ আর দাঁড়িয়ে নেই।

অথচ কত ভয় হয়েছিল, মাধুরী যখন পরিতোষের গলার স্বর শুনতে পায়। বাসন্তীদের বাড়িতে যে সে আজ এসেছে, তার প্রধান কারণ পরিতোষের সান্নিধ্য

এড়িয়ে যাবার জন্যই। কিন্তু কী মিথ্যা আশংকা। সকল সান্নিধ্যের ইতিহাসের মোহ ও আকর্ষণকে নিজের মনের বিচারের জোরেই বাতিল করে দিয়ে সে মুক্ত হয়ে এসেছিল।

কিন্তু পরিতোষ ফিরে আসতে পারে, মাধুরীর অন্যমনস্কতার মধ্যে এই ইচ্ছাটাই স্পষ্ট হয়ে ওঠেনি। ওরা দুজনেই ফিরে আসুক। এর অর্থ কি? পরিতোষের ফিরে আসা স্বাভাবিক। কিন্তু অজয়দা ফিরতে পারেন না। বাসন্তীই বলেছে, বরং এইরকম ঝড় বাদলে অন্ধকারে চলতে অজয়দা ভালবাসে। কিন্তু শুধু পরিতোষ নয়, অজয়দাকেও ফিরে আসতে হবে। নইলে, মাধুরীর মনের প্রার্থনা অসার্থক হয়ে যায়। পরিতোষের কথাগুলি মনে পড়ে মাধুরীর। কি অদ্ভুত একটা কাহিনী বলে চলে গেল পরিতোষ। অজয়দা তো কোনদিন, কোন মুহূর্তে, কোন অনুরোধ আদেশ ও ইঙ্গিতে, এমন কোন কাহিনীর তিলমাত্র পরিচয়ও ব্যক্ত করেনি। জীবনের কোন মুখর আকাঙ্ক্ষা কি এত মুখচাপা থাকতে পারে? যে মাটির অন্তরে অন্তরে স্রোত বয়ে চলেছে, তার তৃণলতার মধ্যেও কি একটুও সবুজের সাড়া না লেগে থাকতে পারে? এ সম্পূর্ণ অদ্ভুত, অস্বাভাবিক। কিন্তু এই অদ্ভুতের এক মোহকর স্পর্শ যেন অলক্ষ্যে মাধুরীর চিন্তার মধ্যে গিয়ে ঢুকেছে। মাত্র দুটি কথার মধ্যে যে কাহিনীকে শোনা হলো, তাকে যে ভেবে ভেবে কুল পাওয়া যায় না। কোথায় তার সীমা? তার আরম্ভ? কোন্ মন্ত্রে, ঘটনায় বা আবেগে এর উদ্ভব ও স্থিতি? বিনা কারণেই কি এই রহস্য সম্ভব? হয়তো সম্ভব, নইলে রহস্য বলা হয় কেন?

আকাশ পাতাল, এলোমেলো চিন্তা করে মাধুরী। অজয়দাকে আজ সে একবার ফিরিয়ে আনতে চায়। অদৃষ্টটা এভাবে মাঝপথে ফেলে রেখে চলে যাওয়ার কোন অর্থ হয় না। জীবনে যদি প্রশ্ন ঘনিয়ে ওঠে, তবে বোঝাপড়া হয়ে যাওয়াই ভাল। জীবনের এই পরম আশ্চর্যকে একবার বিচার করে বুঝতে চায় মাধুরী। কোথায়, কবে, কোন্ সূত্রে, কোন্ আলোকের দৃষ্টিতে অজয়দার চোখে ভাল লেগে যেন গেল সে?

মাধুরী হঠাৎ লজ্জিত হয়ে নিজের চিন্তাকে সংযত করে। এত আগ্রহ কেন? পৃথিবীতে কত কিছু অকারণ ঘটছে, কিন্তু তার জন্য এত মাথা ঘামাবার প্রয়োজন তার কখনো হয়নি। অজয়দার মনের অলক্ষ্য পরিণাম ও ইতিহাসকে এই অকারণ সাধারণের মতই নিতান্ত নগণ্য বলে উপেক্ষা করতে পারছে না কেন সে?

নিজেকে হঠাৎ কেন অশুচি মনে হয়েছিল, এতক্ষণে তার কারণ বুঝতে পারে মাধুরী। তাঁর নিজেরই মনুষ্যত্ব তাকে ধিক্কার দিয়ে উঠছে। জীবনে কোথা থেকে এই ভ্রান্তির নেশা তার সকল বিচার-বুদ্ধিকে গ্রাস করে বসলো? ভুলের আর শেষ নেই। প্রথম ভুলের আঘাত যেন দ্বিতীয় একটা ভুলের জন্য মাধুরীর অন্তঃকরণ মাতিয়ে তোলে। জীবনের প্রথম প্রতিজ্ঞাকে যে অবহেলা করেছে, অশ্রদ্ধা করেছে, ফাঁকি দেবার চেষ্টা করেছে—তার সমগ্র মনুষ্যত্বটাই আর নির্ভর করার মত নয়। প্রতি ভুলের জন্য সে ক্ষুব্ধ হবে। যেখান থেকে, যার কাছ থেকেই আহ্বান আসুক—এক কপট সমাদরের অভিনয় ক'রে তাকে সে গ্রহণ করে। গ্রহণ করে শুধু আবার অকারণে প্রত্যাখ্যান করার জন্য। মাধুরী উপলব্ধি করে, এইখানে তার জীবনের সকল অভিশাপের রহস্য লুকিয়ে আছে। তার স্থিতিহীন সত্তা শুধু সুখের পিপাসায় অস্থির হয়ে ছুটে চলেছে। প্রতি মেঘের ছায়ার দিকে তাকিয়ে থাকে। যেখান থেকেই ডাক আসুক, সাড়া দিতেই হবে। এ কী ভয়ানক দুর্বলতা। কোথা থেকে এই বিচিত্র শিক্ষা তার সব ভুল করিয়ে দিল?

তবু আশ্চর্য লাগে অজয়দাকে? অজয়দা তো অবুঝ অসহায় ও দুর্বল মানুষ নয়। ভাল মন্দ বেছে চলবার, জীবনের প্রগল্‌ভতাকে শাসনে কঠিন করে রাখবার, উচিত অনুচিত ঠাহর করবার সব রীতিনীতি ও শিক্ষা তার জানা আছে। তবু তার ভুল হয় কেন? অনধিকার ও অপ্রাপ্য হয়ে রয়েছে যে ঠাঁই, তারই আলো-ছায়ার পুলকের মধ্যে নিজেকে বিকিয়ে দিতে তার বাধে না কেন?

তবু, অজয়দা আর একবার প্রকাণ্ড ভুল করে ফিরে আসুক। মাধুরীর কাছে অন্তত একটা প্রশ্ন শুনে যাক্। অজয়দা জানুক, মাধুরী সব জানতে পেরেছে।

বাগানের পথ ধরে একটা কদাকার মূর্তি কাশতে কাশতে উঠোনের ওপর এসে দাঁড়ালো। মাধুরী ও বাসন্তী ভয় পেয়ে কপাট বন্ধ করার আগেই মূর্তিটা ভাঙা-গলায় ডাকলো—অজয় দাদা আছেন?

বাসন্তী প্রত্যুত্তর দিল—তুমি কে?

—আমি ভজু।

না, আর ভয় করবার কিছু নেই। ভজু এ গ্রামের কারও অপরিচিত নয়। ভজু এ গ্রামের শত্রু নয়। ভজু এই গ্রামেরই পোষা বিষধর। গ্রামের লোককে সে কামড়ায় না ভিন্ গাঁয়ের গেরস্থের ঘটিবাটি চুরি করে, ভিন্ গাঁয়ের লোকের মাথা ফাটিয়ে রাহাজানি করে ওর জীবন কেটে যায়। নিজের গাঁয়ে ভজু শুধু দীনতম সেবক। মাটি কাটে, বেড়া বাঁধে, এঁটো খায়, মজুরী পায় না। যেখানে ভয় আছে, মৃত্যু আছে, সেইখানে ভজু সবারই সহায়, সবারই প্রতিনিধি।

বাসন্তী বলে—এত রাত্রে কি মনে করে ভজু? তোমার নাকি খুব অসুখ করেছে?

ভজু—হাঁ দিদিমণি। অসুখ করেছিল বহুদিন আগেই, এইবার অসুখটা সেরে আসবে। বেশ বোধ করছি দিদিমনি, এইবার সেরে আসবে।

বাসন্তী—আজ খেয়েছ?

ভজু—না দিদিমনি।

বাসন্তী—খাবে?

ভজু—না, আমার সময় নাই। এখুনি কাজে বের হতে হবে।

বাসন্তী—এই অসুখ শরীরে, না খেয়ে-দেয়ে, এখন আবার কোন্ কাজে বের হবে?

ভজু—সেই কাজের কথাটাই অজয়দাদাকে জানাতে এসেছিলাম। তিনি ঘরে নাই বোধ হয়।

বাসন্তী—না, মীরগঞ্জ গিয়েছেন।

ভজু—বাস্ ভালই হলো। কেউ আর সাক্ষী রইলন না।

বাসন্তী—কিসের সাক্ষী ভজু।

ভজু—আজ একটা বড় কাজের ভার নিয়ে আগাম টাকা পেয়েছি। সেই খবরটা অজয়দাদাকে জানিয়ে আমি কাজে বের হব ভেবেছিলাম।

ভজুর কথাগুলি দুর্বোধ্য। নেশাখোর মানুষের কথার ধরণ বোধ হয় এই। বাসন্তী তাই শুধু কয়েকটা কথার কথা বলে, গোঁয়ার ভজুকে দুটো মুড়ি খাইয়ে বিদায় করে দিতে চায়। ভজুর কথার মধ্যে যে ঘোরতর অর্থ লুকিয়ে আছে, বাসন্তীর মনে সেরকম কোন সন্দেহ হয়নি।

মাধুরীর দিকে তাকিয়ে ভজু বললে—ইনি কে বটে? ইনিই তো সঞ্জীব চাটুয্যের মেয়ে? স্বদেশী করছেন যিনি?

বাসন্তী হাসছিল। কিন্তু মাধুরী বিরক্ত হয়ে উঠছিল। এই অশোভন গ্রাম্য রূঢ়তা, এই ভাষা আর এই চেহারা, এই ধরণের জীবের জীবন—এসবের পরিচয় সে ভুলে গেছে অনেকদিন। মাধুরীর স্মৃতিতে যদি মান্দারগাঁ আজও বেঁচে থাকে, তবু তার মধ্যে এই কুৎসিতের কোন চিহ্ন নেই। সেখানে শুধু মান্দার গাঁয়ের শিউলীতলা, দীঘির জলের ঢেউ আর ভোরে পাখীর গানের শব্দই শুধু বড় হয়ে আছে। বাসন্তীর মত মান্দার গাঁয়ের পাঁক পোকা-মাকড়গুলিকেও আপনি বলে ভাবতে সে পারে না। ভজুর মত পাপীর কর্কশ কথা-গুলির মধ্যে হাসবার মত এমন কিছু মজার বিষয় নেই।

বসন্তী বললো—ভজু, তুমি কিছু খেয়ে নাও।

ভজু—না, কাজ আছে দিদিমনি। দেরী করলে চলবে না।

বাসন্তী—তাহ'লে যাও।

ভজু—হ্যাঁ যাচ্ছি, কিন্তু যাবার আগে

আপনাকে সাক্ষী মেনে যাচ্ছি আগুন লাগাতে চললাম।

বাসন্তী ভয়ে শিউরে উঠলো—কোথায় আগুন লাগাতে চললে ভজু? ছি ছি, এত অসুখে ভুগছো, মরতে বসেছ, তবু তুমি বদভ্যাস ছাড়লে না।

ভজু—আপনি ত জানেন দিদিমণি, আমি শুধু অর্ডার খাটি, যে টাকা দিবে তারই অর্ডার খাটবো।

বাসন্তী—কে অর্ডার দিয়েছে?

মাধুরীর দিকে একবার সশ্রদ্ধভাবে তাকিয়ে নিয়ে ভজু বললে—অর্ডার দিয়েছেন, এই দিদিমণির পিতাঠাকুর সঞ্জীব চাটুয্যা. আর দিনমণি বিশ্বেস আর বোর্ডের প্রেসিডেণ্ট।

বাসন্তী—কি করতে হবে?

ভজু—পনর টাকা লিয়েছি, আজ রাতের মধ্যে কেশব ঠাকুরের ঘরে আগুন লাগিয়ে দিতে হবে।

মাধুরী স্তব্ধ হয়ে তাকিয়ে রইল। মূর্ছা যাবার লক্ষণ। বাসন্তী কিছুক্ষণ হতভম্ব হয়ে থাকে, তারপর ধীরে ধীরে চোখের দৃষ্টিটা কঠোর হয়ে ওঠে। দুষ্কৃতি ও পাপের গর্বেই ভজুর রোগজীর্ণ কঙ্কালসার মূর্তিটার মধ্যে একটা সজীবতার আনন্দ ছড়িয়ে রয়েছে, নির্বিকার নিষ্ঠুরতা আর অমানুষিকতার প্রেরণাতেই আত্মহারা হয়ে আছে ভজু।

বাসন্তী কঠোরভাবে বলে—তুমি কি ভেবেছ ভজু, অজয়দা থাকলে সে চুপ করে শুধু তোমার কথা শুনতো? তোমার হাত দুটো অজয়দা ভেঙে দিত না?

ভজু কেসে কেসে হাসলো—হাত ভেঙে দিলেনই তো কি করলেন। দাঁতে করে আগুন লাগাতে পারি।

বাসন্তী—বেশী বাজে কথা বলো না ভজু। আজ যদি কারও কথায় কোন কুকাজ করেছ, তবে তোমার রক্ষে নেই জেনে নিও।

ভজু তবুও হাসছিল—যাক্, আপনি দিদিমণি তবু দুটো ধমক দিলেন, কিন্তু উনি কিছু বলতে পারছেন নাই কেন?

ভজুর দিকে চকিতে একবার তাকিয়ে মাধুরীর গা শিউরে উঠলো, কী ভয়ানক নিষ্ঠুর আর বীভৎস মূর্তি।

ভজু আবার বলে—অজয়দাদা তো শুধু আমারই হাত দুখানা ভেঙে দিতে পারেন, কিন্তু আরও যে তিন জোড়া হাতের নাম করলাম, উহাদের ভাঙতে পারেন কি?

মাধুরী অস্বস্তিতে ছট্‌ফট করে ওঠে—ওকে চলে যেতে বলে দাও বাসু।

বাসন্তী—তুমি বোকার মত কথা বলছো কেন মাধুরী? ওকে এখন আটক করে রাখাই আমাদের কাজ। ওকে যেতে দিলে আজ ভয়ানক সর্বনাশ ঘটাবে।

ভজু—আমি আজ কোন মতেই আটক থাকবো না দিদিমণি, আগাম টাকা নিয়েছি, আমাকে কাজ করতেই হবে।

বাসন্তী—তুমি যদি এখান থেকে এক পা নড়েছ, আমিও তোমার সঙ্গে সঙ্গে যাব। সবাইকে ডেকে তোমায় ধরিয়ে দেব।

ভজু—তবে দিন চারটে মুড়ি, খেয়ে নি। কাজটা সারতে আর দিলেন নাই আপনি।

মুড়ি খেয়ে ভজু চলে গেল। যাবার সময় মাধুরীকে উদ্দেশ্য করে বলে গেল—আপনি আজ এইখানে থেকে ভালই করেছেন দিদিমণি, আজকের রাতটা ভাল নয়।

মাধুরী অনেকক্ষণ পরে হাঁপ ছেড়ে কথা বলে—অজয়দাদের আজকে না যেতে দিলেই হতো।

বাসন্তী চুপ করে থাকে। মাধুরী অনেকক্ষণ পরে আবার কথা বলে—আমার শুধু সারদা জেঠিমার কথা মনে পড়ছে বাসু। বড় ভয় করছে, বুড়ো মানুষ, একা একা রয়েছেন।

বাসন্তী—সারদা জেঠিমার কথা তোমার মনে আছে?

মাধুরী—আমায় ঠাট্টা করছো?

বাসন্তী—আমিও এখন তাঁর কথাই ভাবছিলাম।

মাধুরী—যদি কিছু অঘটন ঘটেই যায় কি উপায় হবে বাসু?

বাসন্তী—কিসের অঘটন?

মাধুরী—ঐ ভজু যদি সত্যিই ওঁর বাড়িতে আগুন লাগিয়ে দেয়?

বাসন্তী—ভজু তো বলে গেল, এ কাজ সে করবে না, তবে কেন ভয় করছো?

মাধুরী—চোর গুণ্ডাদের কি বিশ্বাস করা যায় বাসু!

বাসন্তীর চোখ দুটো তীব্রভাবে জ্বলে উঠলো—কে চোর গুণ্ডা মাধুরী?

—ক্রমশ

যুদ্ধের প্রসঙ্গ

জেনারেল সাইমন বাকনার মন্তব্য করেছেন যে, ওকিনাওয়ার যুদ্ধ এই সপ্তাহেই শেষ হয়ে যাবে। যতদূর জানা গেছে তাতে ওকিনাওয়ার ৮ বর্গ মাইল স্থান এখনও জাপানীদের অধিকারে আছে। এ অধিকার করতে যুক্তরাষ্ট্রের যদি মাত্র সপ্তাহকাল সময় লাগে তবে তা তাদের বিশেষ কৃতিত্বের পরিচায়কই বলতে হবে। কারণ ওকিনাওয়াতে জাপানীরা যেমন ক্ষয়ক্ষতি সমস্ত উপেক্ষা করে মরণপণ সংগ্রাম করছে, এমন আর কোথাও করেছে বলে জানা যায়নি। এতে তাদের লোকক্ষয় ও উপকরণ ক্ষয় হয়েছে অপরিমিত, কিন্তু যুক্তরাষ্ট্রের এখানে যে লোকসান হচ্ছে তার পরিমাণও সামান্য নয়। ওকিনাওয়াতে যুক্তরাষ্ট্রের কি অবস্থা হয়েছে সে সম্পর্কে সম্প্রতি এক কৌতূহলজনক বিতর্কের সৃষ্টি হয়েছে। 'নিউ ইয়র্ক সান' পত্রিকার ওয়াশিংটনস্থ লেখক ডেভিড লরেন্স তাঁর লেখায় এই মর্মে মন্তব্য করেন যে, ওকিনাওয়ার যুদ্ধ পরিচালনাতে পার্ল হারবার অপেক্ষাও বেশী সামরিক অযোগ্যতার পরিচয় পাওয়া গিয়াছে। তিনি আরও বলেন যে, ওকিনাওয়ার ক্ষয়ক্ষতির বিবরণ থেকে দেখা যায় যে, প্রশান্ত মহাসাগরের যুদ্ধে আর কোথাও এত লোকসান আমাদের হয়নি। তিনি কয়েকজন নিরপেক্ষ অফিসারের একটি বোর্ডের দ্বারা এই অভিযোগের প্রকৃত তথ্য সংগ্রহ করার প্রস্তাব করেন। এতে প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলের যুদ্ধের নৌবাহিনীর প্রধান সেনাপতি অ্যাডমিরাল চেস্টার নিমিৎস উত্তেজিত হয়ে খুব এক কড়া জবাব দিয়েছেন। তিনি যা বলেছেন তার মর্ম হল—যা আশা করা গিয়েছিল, হতাহতের পরিমাণ তার চেয়ে অনেক বেশী বটে, কিন্তু কারও কাজের কোন ত্রুটির ফলে এ হয়েছে তা তিনি মনে করেন না। তিনি এরূপ মন্তব্যও করেছেন যে, যুক্তরাষ্ট্রের স্বার্থের অনুকূলে নয়, এমন কাজে কারো দ্বারা তিনি ব্যবহৃত হয়েছেন। কারণ তিনি ঘটনাস্থলে ছিলেন না এবং এই প্রবন্ধে যেসব তথ্য আছে তা তাঁর জানবার কথা নয়। কাজেই বুঝা যায় আমার স্টাফ ও কম্যাণ্ডারদের আক্রমণ করানোর উদ্দেশ্যেই তাঁকে ঐসব তথ্য সরবরাহ করা হয়েছে।

এই বিতর্ক থেকে আর যাই হোক এটুকু অন্তত বোঝা যায় যে, যুক্তরাষ্ট্রকে ওকিনাওয়ায় বিজয় অপ্রত্যাশিত মূল্যে ক্রয় করতে হচ্ছে। সংবাদপত্রের মারফত যেসব সংবাদ পাওয়া গেছে তা থেকেও জাপানীদের আক্রমণে যুক্তরাষ্ট্রের জাহাজ, বিমান ও লোকক্ষয় অত্যন্ত বেশী পরিমাণে হয়েছে বলেই জানা গেছে। কিন্তু জাপানীদের মরণপণ যুদ্ধ ও অপরদিকে যুক্তরাষ্ট্রের বিপুল ক্ষতি এই উভয় সত্ত্বেও জাপানীরা ওকিনাওয়া শেষ পর্যন্ত রক্ষা করতে পারবে বলে মনে হয় না। যদি ওকিনাওয়া জাপানীদের হস্তচ্যুতই হয়, তা হলে জাপানের বিরুদ্ধে আমেরিকার যুদ্ধ কিভাবে অগ্রসর হবে সে সম্বন্ধে একটু জল্পনা-কল্পনা করা যাক। সমর তত্ত্বজ্ঞ অনেকে বহুবার একথা বলেছেন যে, জাপানের এক-দশমাংশ সৈন্যের সম্মুখীনও আমরা এখন পর্যন্ত হইনি। জাপানের শ্রেষ্ঠ সেনাবাহিনী এখনও ভবিষ্যৎ যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত রয়েছে ইত্যাদি ইত্যাদি। জাপানের অধিকাংশ সমরোপকরণ নির্মাণের কারখানা ভূনিম্নে স্থাপিত হয়েছে এবং কতক মাঞ্চুরীয়াতে স্থানান্তরিত করা হয়েছে এ সংবাদও পাওয়া গেছে। অপরদিকে এসব সংবাদও পুনঃ পুনঃ প্রচারিত হয়েছে যে, খাস জাপানে অবতরণ করার জন্য মার্কিন সামরিক কর্তৃপক্ষ প্রস্তুত হচ্ছেন এবং এই অবতরণের কাল বেশী বিলম্বিত হওয়ার কোন বিশেষ কারণ নেই। প্রচারিত এই সংবাদ অনুযায়ী মার্কিন সৈন্যদের খাস জাপানে অবতরণের জন্য অগ্রসর হওয়া এখন সম্ভবপর কিনা এবং কি অবস্থায় সম্ভবপর হতে পারে সেই সম্বন্ধেই আলোচনা করা যাক। প্রথমত ওকিনাওয়াতে যুক্তরাষ্ট্রের যে প্রচণ্ড রক্তাক্ত সংগ্রামের সম্মুখীন হতে হয়েছে, তা অপেক্ষা অনেকগুণ বেশী তীব্র ও শক্তি ক্ষয়কর যুদ্ধ যে খাস জাপানে অবতরণ করতে গিয়ে তার করতে হবে তা সহজেই বোঝা যায়। কাজেই এজন্য একদিকে যেমন তার বিপুল লোকবলের প্রয়োজন হবে তেমনি প্রয়োজন হবে শত্রুর চেয়ে বহুগুণ অধিক সমরসম্ভারের। ওকিনাওয়াই খাস জাপানের নিকটতম মার্কিন ঘাঁটি। জাপান থেকে ওর দূরত্ব ৩৫০ মাইল। সমর বিশেষজ্ঞগণ বলেন এই দ্বীপের আয়তন এত বৃহৎ নয়, যাতে এখানে খাস জাপান আক্রমণের উপযোগী জাহাজ, বিমান, সৈন্য, রসদ ও অন্যান্য সমরোপকরণের পূর্ণ সমাবেশ করে খাস জাপানে আক্রমণ চালানো সম্ভব। সমরবিশেষজ্ঞগণের এ অনুমান যদি সত্য হয় তা হলে আমেরিকাকে এই আক্রমণের ঘাঁটি করতে হবে ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জে। ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জের উত্তরতম প্রান্ত থেকে খাস জাপানী দ্বীপপুঞ্জের দক্ষিণতম প্রান্ত পর্যন্ত দূরত্ব প্রায় হাজার মাইল। এই দীর্ঘ দূরত্বে সরবরাহের ব্যবস্থা অক্ষুণ্ণ ও অবিচ্ছিন্ন রেখে খাস জাপানের উপর অভিযান চালান সম্ভবপর কিনা অনেক সমর সমালোচক তাতে সন্দেহ প্রকাশ করেন। সম্প্রতি এক জাপানী সংবাদ সরবরাহ প্রতিষ্ঠানের যে সংবাদ রয়টারের মারফত পাওয়া গিয়েছে তা থেকে জানা যায়—(১) খাস জাপান থেকে ৩৫০ মাইল দূরবর্তী ওকিনাওয়া অঞ্চলে মিত্রপক্ষের সৈন্য, রণতরী ও বিমানের বিপুল সমাবেশ হচ্ছে; এবং আত্মঘাতী জাপ বিমানের ঘাঁটি কিউসু দ্বীপ ও জাপানের প্রধান দ্বীপ হনশুর মধ্যবর্তী সমুদ্রপথে সুপার ফোর্ট্রেস বিমানগুলি মাইন বসিয়েছে।

পূর্বোল্লিখিত সমরসমালোচকদের দৃষ্টিতে দেখলে মিত্রপক্ষের এই তৎপরতাকে সতর্কতামূলক বা অভিযানের সহায়ক ব্যবস্থা বলে মনে করাই সংগত হবে।

একথা সহজেই বোঝা যায় যে, খাস জাপানে যদি মিত্রপক্ষ অবতরণ করতে না পারে তা হলে জাপানকে পরাজিত করা বহু সময়সাপেক্ষ হবে। কারণ জাপানকে বহির্জগতের থেকে সম্পূর্ণ অবরোধ করে এর বাইরের সরবরাহ আমদানী সম্পূর্ণ বন্ধ করা সম্ভবপর হবে কিনা বলা মুস্কিল। আর তা সম্ভবপর হলেও তাতে সময় খুব বেশী ব্যয় হবে বলেই মনে হয়। অবরোধ সম্পূর্ণ হলেও জাপানের আত্মসমর্পণের সময় নির্ভর করবে তার সঞ্চয়ের অল্পতা বা বহুলতার উপর। কাজেই জাপানের পরাজয়কে দ্রুততর করতে হলে মিত্রপক্ষকে খাস জাপানে অবতরণের চেষ্টা করতে হবেই। সমর সমালোচকগণ যা মনে করেন তদনুযায়ী ওকিনাওয়া ও ফিলিপাইন থেকে অভিযান চালনা যদি সম্ভবপর নাই হয় তা হলে মিত্রপক্ষের চীনের সমুদ্রোপকূলে অবতরণের চেষ্টা করা ছাড়া গত্যন্তর থাকে নাই। চীনের সমদ্রোপকূল রক্ষার ব্যবস্থা জাপানের কিরূপ আছে, মিত্রপক্ষের আঘাত তাদের কতদিন প্রতিহত করা সম্ভব এ সম্বন্ধে কোন নির্ভরযোগ্য তথ্য পাওয়া যায়নি। চীনের উপকূলভাগ দীর্ঘকাল জাপানের অধিকারে আছে। তা থেকে বোধ হয় এ অনুমান করা অসংগত হবে না যে, উপকূল রক্ষার ব্যবস্থাও জাপান সাধ্যমত ভালভাবেই করেছে। তবে ঐ দীর্ঘ ভূভাগের সর্বত্র সমদৃঢ় আত্মরক্ষার ব্যবস্থা করা সম্ভবপর বলে মনে হয় না। মিত্রপক্ষ যদি সেইরূপ দুর্বল কোন অংশে আঘাত দিতে পারেন তা হলে তাদের পক্ষে চীনের সমুদ্রোপকূলে অবতরণ অপেক্ষাকৃত সহজ হবে। তবে তাতেও যে তাদের প্রবল বাধার সম্মুখীন হতে হবে তাও সহজেই মনে করা চলে। এভাবে বিচার করে দেখলে মনে হয় যে, খাস জাপানে অভিযান আরম্ভের পূর্বে চীনে মিত্রপক্ষের সঙ্গে জাপানীদের একটা শক্তি পরীক্ষা হবে। তার ফলাফলের উপরই জাপানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ কতকাল স্থায়ী হবে তা অনেকটা নির্ভর করবে বলে মনে হয়।

—বিষ্ণু গুপ্ত

২১।৬।৪৫

দেশী সংবাদ

১৪ই জুন—সন্ধ্যা ৭টা ৪৫ মিনিটে বড়লাট লর্ড ওয়াভেল ভারতবর্ষের বর্তমান রাজনৈতিক অচল অবস্থার অবসানকল্পে নয়াদিল্লী হইতে বেতারযোগে ব্রিটিশ গভর্নমেণ্টের প্রস্তাবাবলী ঘোষণা করেন। কেন্দ্রে একটি নূতন শাসন-পরিষদ গঠন সম্পর্কে এই সকল প্রস্তাব করা হইয়াছে।

কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির যে-সকল সদস্য এখনও আটক রহিয়াছেন, তাঁহাদিগকে মুক্তি প্রদানের আদেশ দেওয়া হইয়াছে।

প্রস্তাবে বলা হইয়াছে, প্রধান প্রধান সম্প্রদায়-গুলির প্রতিনিধি এবং সমসংখ্যক বর্ণহিন্দু ও মুসলমানদিগকে লইয়া প্রস্তাবিত শাসন-পরিষদ গঠিত হইবে। বড়লাট ও প্রধান সেনাপতিকে বাদ দিলে ইহাকে সম্পূর্ণত ভারতীয় পরিষদ-রূপে গণ্য করা যায়। প্রধান সেনাপতি সমর দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত সদস্যরূপে থাকিবেন।

এই পরিষদ গঠনে বড়লাটকে পরামর্শ দিবার জন্য ২৫শে জুন সিমলায় বড়লাটের প্রাসাদে এক সম্মেলন আহূত হয়। মহাত্মা গান্ধী ও মিঃ জিন্না সহ ২১ জন নেতাকে বড়লাট আমন্ত্রিত করেন।

ঐদিন বিলাতে ব্রিটিশ গভর্নমেণ্টের ভারত-নীতি সম্পর্কে এক হোয়াইট পেপার প্রকাশিত হয় এবং উহাতে বড়লাটের শাসন-পরিষদ নূতন করিয়া গঠন করার প্রস্তাব করা হয়।

১৫ই জুন—বড়লাটের আমন্ত্রণ সম্পর্কে গান্ধীজী একখানি তারবার্তায় বড়লাটকে জানান যে, তিনি কংগ্রেসের স্বীকৃত প্রতিনিধি নহেন— ঐ পদের অধিকারী কংগ্রেসের সভাপতি কিংবা কোন বিশেষ স্থলে কংগ্রেসের প্রতিনিধিত্ব করিবার জন্য নিযুক্ত যে-কোন ব্যক্তি।

অদ্য প্রাতঃকালে কংগ্রেস সভাপতি আবুল কালাম আজাদ বাঁকুড়ায় বন্দীদশা হইতে মুক্তি-লাভ করেন। ৩৪ মাস, ৭ দিন আটক রাখার পর তাঁহাকে মুক্তি দেওয়া হইল। ঐদিন সকালে আলমোড়া ডিস্ট্রিক্ট জেল হইতে পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু, যারবেদা জেল হইতে সর্দার বল্লভভাই প্যাটেল ও শঙ্কররাও দেও, বাঁকিপুর জেল হইতে ডাঃ রাজেন্দ্রপ্রসাদ, করাচী জেল হইতে আচার্য কৃপালনী এবং ভেলোর জেল হইতে ডাঃ পট্টভি সীতারামিয়া মুক্তিলাভ করেন।

মুক্তিলাভের পর সাংবাদিকগণের সহিত সাক্ষাৎকার কালে বাঙলার দুর্ভিক্ষের প্রসংগ উঠিলে রাষ্ট্রপতি আজাদ বিশেষ মর্মবেদনা অনুভব করেন এবং বলেন যে, ব্রিটিশ গভর্ন-মেণ্ট, ভারতের কেন্দ্রীয় গভর্নমেণ্ট ও বাঙলা গভর্নমেণ্ট এই মহামন্বন্তরের জন্য দায়ী।

পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু লক্ষ্ণৌ-এ সাংবাদিকগণের নিকট বলেন, এই যুদ্ধে ভয়াবহ যাহা কিছু ঘটিয়াছে, বাঙলার শোচনীয় দুর্ভিক্ষ ভীষণতায় তদপেক্ষা অধিক না হইলেও অন্তত তাহার সমান। এই দুর্ভিক্ষে ভারতে ব্রিটিশ শাসনের উপর কেবল চরম রায় দেয় নাই; যে বৈষয়িক ব্যবস্থায় এই প্রকার মর্মান্তিক ঘটনা ঘটিতে পারে, উহা সেই বৈষয়িক ব্যবস্থার উপর মৃত্যু পরোয়ানাও জারি করিয়াছে।

অদ্য প্রাতে আলমোড়ার এক জনসভায় পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু বক্তৃতায় বলেন, "ভারতের স্বাধীনতার জন্য যাঁহারা ত্যাগ স্বীকার করিয়াছেন, তাঁহাদিগকে আমি সর্বান্তঃকরণে শ্রদ্ধা করি এবং ভারতের প্রত্যেক অকৃত্রিম সেবককে আমি আমার আনন্দভবনে আশ্রয় দিতে প্রস্তুত আছি।"

সাপ্তাহিক সংবাদ

বাঙলা সরকারের এক প্রেস নোটে বলা হইয়াছেঃ ১৯৪২ সালের আগস্ট মাসে কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি বে-আইনী ঘোষণা করিয়া যে নিষেধাজ্ঞা জারি করা হইয়াছিল, বাঙলা সরকার তাহা প্রত্যাহার করিবার সিদ্ধান্ত করিয়াছেন।

১৬ই জুন—সাহানগর শ্মশানঘাটে দেশবন্ধু স্মৃতিসৌধে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশের বিংশতিতম মৃত্যুবার্ষিকী অনুষ্ঠিত হইয়াছে।

আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের প্রথম মৃত্যুবার্ষিকী অনুষ্ঠিত হইয়াছে।

অবিলম্বে শ্রীযুত শরৎচন্দ্র বসুর মুক্তি দাবী করিয়া কলিকাতার বিশিষ্ট নাগরিকগণের এক-খানি বিবৃতি প্রচারিত হইয়াছে।

১৬ই জুন—নারায়ণগঞ্জের নিকটবর্তী পল্লী অঞ্চলের প্রায় এক সহস্র অর্ধ উলংগ নারী শহরের রাজপথে মিছিল করে এবং অতিরিক্ত মহকুমা হাকিমের নিকট গিয়া বস্ত্র দাবী করে। যশোহর জেলার ঝিকরগাছা থানার অন্তর্গত লাউজানী গ্রামের এক ব্যক্তির স্ত্রী বস্ত্রাভাবে ৭ই জুন উদ্বন্ধনে প্রাণত্যাগ করিয়াছে। বাঁকুড়া জেলার ওন্দা থানার ইচাপাড়া গ্রামের একটি তরুণী বস্ত্রাভাবে আত্মহত্যা করিয়াছে। মেদিনীপুরের তমলুক থানার বাশুদা গ্রাম নিবাসী নাটু চক্রবর্তীর অষ্টাদশ বর্ষীয়া পত্নী বস্ত্রাভাবে উদ্বন্ধনে আত্মহত্যা করে। ভোলার জয়নগর ইউনিয়ন বোর্ডের একব্যক্তি বস্ত্রাভাবে আত্মহত্যা করিয়াছে।

১৬ই জুন—রাষ্ট্রপতি আজাদ মুক্তির পর বাঁকুড়া হইতে অদ্য প্রাতে হাওড়া স্টেশনে পৌঁছিলে তাঁহাকে বিপুলভাবে সম্বর্ধনা জ্ঞাপন করা হয়।

১৭ই জুন—কংগ্রেস সভাপতি মৌলানা আবুল কালাম আজাদ আগামী ২১শে জুন বোম্বাইয়ে কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির এক জরুরী বৈঠক আহ্বান করিয়াছেন।

১৮ই জুন—কংগ্রেস সভাপতি মৌলানা আবুল কালাম আজাদ আগামী ২৫শে জুন সিমলায় নেতৃ-সম্মেলনে যোগদানের জন্য বড়লাটের নিকট হইতে আমন্ত্রণ প্রাপ্ত হন।

১৯শে জুন—কংগ্রেস সভাপতি অদ্য তাঁহার সেক্রেটারী আজমল খাঁ সমভিব্যাহারে বোম্বাই যাত্রা করেন।

১৯শে জুন—২৪শে জুন ঘরোয়াভাবে আলোচনার জন্য বড়লাট লর্ড ওয়াভেল মহাত্মা গান্ধীকে যে আমন্ত্রণ জ্ঞাপন করিয়াছিলেন, গান্ধীজী তাহা গ্রহণ করিয়া বড়লাটকে তার প্রেরণ করিয়াছেন বলিয়া জানা গিয়াছে।

পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু আনন্দভবনে বিপুল জনতার সম্মুখে এক বক্তৃতায় ১৯৪২ সালের আগস্ট আন্দোলনের প্রসংগে বলেন যে, "যে-সকল মৃত্যুশংকাহীন শহীদ দেশের স্বাধীনতার জন্য মৃত্যুকে বরণ করিয়াছেন, আমি তাহাদের নিকট আমার মাথা নত করি।"

বিদেশী সংবাদ

১৫ই জুন—ভূতপূর্ব জার্মান পররাষ্ট্রসচিব ফন রিবেনট্রপকে বন্দী করা হইয়াছে।

জাপ প্রধান মন্ত্রী কান্তারো সুজুকী বলেন, 'জার্মান সৈন্য ও জাপানীদের মধ্যে আকাশ পাতাল পার্থক্য। জাপানী সৈন্য ও জনসাধারণ তাহাদের বিশ্বাসের জন্য যুদ্ধক্ষেত্রে প্রাণ বিসর্জন দিতে উন্মুখ।'

১৬ই জুন—১৫ই জুন হইতে ১৮ই জুন পর্যন্ত রুশ বিজ্ঞান পরিষদের ২২০তম বার্ষিকী উদ্যাপন হয়। ভারতবর্ষ হইতে ডাঃ মেঘনাদ সাহা এই অনুষ্ঠানে যোগদান করেন। সম্মেলনে আহূত ৩০ জন ব্রিটিশ প্রতিনিধির মধ্যে ৮ জন বৈজ্ঞানিকের মস্কো যাত্রার প্রাক্কালে তাঁহাদের রাশিয়ায় যাওয়া বন্ধ করিয়া নিষেধাজ্ঞা জারি করায় বৈজ্ঞানিক মহলে চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়।

১৭ই জুন—ইতালীতে দেশভক্ত বলিয়া অনুমিত একদল সশস্ত্র লোক মোডেনা কারাগারে প্রবেশ করিয়া ১৩ জন বিচারার্থী বন্দীকে হত্যা করে। এতদ্ভিন্ন অন্যান্য স্থানেও দেশভক্তগণ কর্তৃক ফ্যাসিস্ট পন্থীদিগকে হত্যা করা হইতেছে।

১৮ই জুন—যুক্তরাজ্য নির্বাচনে কানাডার প্রধানমন্ত্রী ম্যাকেঞ্জি কিং প্রিন্স এলবার্ট নির্বাচনকেন্দ্রে সৈন্যদের ভোটে পরাজিত হইয়াছেন।

ডি'ভ্যালেরা সরকারের সহকারী প্রধানমন্ত্রী ও অর্থসচিব সিন ওকেলী ৫ লক্ষ ৬৫ হাজার ১ শত ৬৫ ভোট পাইয়া আয়ারের প্রেসিডেণ্ট নির্বাচিত হইয়াছেন।

দেশ

সম্পাদক ঃ শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র সেন | **সহকারী সম্পাদক ঃ শ্রীসাগরময় ঘোষ**

১২ বর্ষ] শনিবার, ১৬ই আষাঢ়, ১৩৫২ সাল। Saturday, 30th June, 1945. [৩৪শ সংখ্যা

সাময়িক প্রসঙ্গ

সিমলায় সম্মিলন

সিমলায় নেতৃ-সম্মেলনের উদ্বোধন করিতে গিয়া বড়লাট লর্ড ওয়াভেল বলিয়াছেন যে, কি উপায়ে ভারতবর্ষ সমৃদ্ধি, স্বাধীনতা এবং প্রতিষ্ঠার পথে অগ্রসর হইতে পারে, তিনি তৎসম্বন্ধে নেতৃবৃন্দের পরামর্শ প্রার্থনা করেন। তিনি ইহাও পরিষ্কার করিয়াই বলিয়াছেন যে, শাসনতান্ত্রিক সমস্যার চূড়ান্ত মীমাংসার জন্য এই সম্মেলন আহূত হয় নাই; ভবিষ্যৎ মীমাংসার পথ সুগম করিবার উদ্দেশ্যেই সম্মেলন আহূত হইয়াছে। লর্ড ওয়াভেল যাহা বলিয়াছেন তাহাতে অবশ্য আমাদের পক্ষে আপত্তি করিবার কিছুই নাই। কংগ্রেস ভারতের রাজনীতিক সমস্যা সমাধান করিতে সর্বদাই সহযোগিতার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করিয়াছে; কিন্তু মদোদ্ধত ব্রিটিশ গভর্নমেণ্ট ভারতের সকল সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিত্বমূলক প্রতিষ্ঠানের প্রস্তাব উপেক্ষা করিয়াছেন এবং লর্ড ওয়াভেল আজ যাঁহাদিগকে 'স্বীয় যোগ্যতাবলে এবং চরিত্রশক্তিতে বিভিন্ন প্রদেশের এবং বিভিন্ন রাজনীতিক দলের নেতৃত্বলাভে সমর্থ' বলিয়া অভিনন্দিত করিয়াছেন, ব্রিটিশ গভর্নমেণ্ট কয়েক দিন পূর্ব পর্যন্ত তাঁহাদিগকে বন্দী অবস্থায় লাঞ্ছিত এবং নির্যাতিত করিয়াই নিজেদের স্বৈরাচারিতার পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিয়াছেন। বড়লাট তাঁহার বেতার বক্তৃতায় আমাদিগকে এই কথা শুনাইয়াছেন যে, উভয় পক্ষকে পরস্পরের মনে যে সব অপ্রীতির ভাব রহিয়াছে, তাহা ভুলিয়া যাইতে হইবে। এইভাবে পুরাতন সংস্কার ও বৈরতা এবং দলগত ও সম্প্রদায়গত স্বার্থ ও সুবিধার কথা বিস্মৃত হইয়া ভারতের ৪০ কোটি নরনারীর মঙ্গলসাধনের জন্য সকলকে ব্রতী হইতে হইবে। এ বিষয়েও কংগ্রেসকে নূতন ভাবে বলিবার কিছুই নাই। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদীদের দ্বারা এ দেশের উপর অত্যাচার ও উৎপীড়নের ইতিহাস সুদীর্ঘ। কংগ্রেস জাতির অন্তর হইতে অতীতের সে দুরন্ত জ্বালা অহিংস নীতির প্রভাবে অপসৃত করিয়া সহযোগিতার জন্য বারংবার হস্ত সম্প্রসারিত করিয়াছে, তাহা ছাড়া দলগত এবং সম্প্রদায়গত স্বার্থকে কংগ্রেসের পতাকাতলে সমবেত ভারতের আত্মদাতা সন্তানগণ কোন দিনই প্রশ্রয় দান করেন নাই; কিন্তু ব্রিটিশ গভর্নমেণ্টের পক্ষ হইতেই প্রতিকূলে আঘাত আসিতেছে এবং সাম্প্রদায়িকতার বিষ ভারতের জাতীয় জীবনে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদী দলই নানাভাবে সম্প্রসারিত করিয়াছেন। আজ সত্যই ব্রিটিশ গভর্নমেণ্টের সেই মনোভাবেরই পরিবর্তন ঘটিয়াছে কি? এই প্রশ্নই সমগ্র জাতির অন্তরে দেখা দিয়াছে, এবং সেই প্রশ্ন অন্তরে লইয়া কংগ্রেস-নেতৃবর্গ সিমলার বৈঠকে সমবেত হইয়াছেন। ব্রিটিশ গভর্নমেণ্ট সত্যই যদি ভারতের সকল সম্প্রদায়ের দাবী স্বীকার করিয়া লইতে প্রস্তুত থাকেন, এবং ব্রিটিশের শোষণ স্বার্থকে তুচ্ছ করিয়া ভারতবাসীদের স্বার্থরক্ষার জন্য আজ যে কারণেই হউক আগ্রহপরায়ণ হইয়া থাকেন তবে সে পক্ষে কংগ্রেস নেতৃবৃন্দের সাহায্য তাঁহারা লাভ করিবেন। ওয়াভেল প্রস্তাবের মূলে ব্রিটিশের মন আজ সূক্ষ্মভাবে কিরূপ কার্য করিতেছে, আমরা সে বিচার করিতে চাই না; তাঁহারা কার্যত ভারতবাসীদিগকে স্বাধীনতার অধিকার দানে প্রস্তুত আছেন কিনা এবং সে বাজারে দলবিশেষকে আড়াল করিয়া সাম্প্রদায়িকতার চালবাজী খাটাইবার মোহ তাঁহারা ছাড়িতে রাজী আছেন কিনা, ইহাই বড় কথা। সিমলার সম্মেলনে এ বিষয়ে তাঁহাদের আন্তরিকতার পরীক্ষা হইবে; শুধু ফাঁকা কথায় বা প্রতিশ্রুতিতে ভারতবাসীরা প্রবঞ্চিত হইবে না; এই সত্য ব্রিটিশ গভর্নমেণ্ট যতটা সুনিশ্চিতভাবে উপলব্ধি করেন, ততই মঙ্গল।

ভারতীয় সৈন্যবাহিনী

আমেরিকার এসোসিয়েটেড্ প্রেসের প্রতিনিধির নিকট পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু বলিয়াছেন ঃ—

"ভারতীয় সৈন্যবাহিনী জাতীয় সৈন্যবাহিনী নহে। ইহা সত্ত্বেও আমি মনে করি যে, অন্ততঃপক্ষে অফিসার, এবং নন-কমিশণ্ড্ অফিসারদের মধ্যে জাতীয় মনোভাব বহুলপরিমাণে বিদ্যমান আছে। যুদ্ধবিদ্যা শিক্ষার উদ্দেশ্যে বহু লোক সৈন্যবাহিনীতে প্রবেশ করিয়াছে। সুতরাং সময় যদি কখনও আসে, তাহা হইলে তাঁহাদের এই শিক্ষা কার্যকরী হইবে।"

জাতির প্রয়োজনে ও দেশের স্বাধীনতা ও স্বার্থরক্ষার্থ স্বেচ্ছায় যে বাহিনী গড়িয়া উঠে, তাহাই সার্থকরূপে কোন দেশের জাতীয় বাহিনীরূপে পরিগণিত হইয়া থাকে। কিন্তু এযাবৎকাল যেসব ব্যক্তি সৈন্যবাহিনীতে যোগদান করিয়াছে, তাহারা স্বদেশপ্রেমের জ্বলন্ত প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ হইয়া দেশরক্ষার জন্য গিয়াছে, একথা কখনও মনে করা যায় না। যাহারা সৈন্যবাহিনীতে যোগদান করিয়াছে তাহাদের অধিকাংশ অভাবের তাড়নায়ই যোগদান করিয়াছে। পরাধীন ভারতের সেনাবাহিনী ব্রিটিশ সমর বিভাগের নির্দেশে এবং প্রধানতঃ ব্রিটিশ স্বার্থরক্ষার জন্য নিযুক্ত হইয়াছে। ইহার পূর্বে সানফ্রান্সিস্কোতে এক প্রশ্নের উত্তরে শ্রীযুক্তা বিজয়লক্ষ্মী পণ্ডিত এই কথাই বলিয়াছিলেন ঃ অভাবের তাড়নায়ই লোকে সৈন্যবাহিনীতে যোগদান করিয়াছে। সম্প্রতি আমেরিকার মার্ক হপকিন্স-এ স্থানীয় কোন সংবাদপত্রের এক সংবাদদাতা শ্রীযুক্তা বিজয়লক্ষ্মী পণ্ডিতকে জিজ্ঞাসা করেন—"ভারতবর্ষ স্বাধীন হইলে কি বহিরাক্রমণ হইতে নিজেকে রক্ষা করিতে পারিবে?" এই প্রশ্নের উত্তরে শ্রীযুক্তা পণ্ডিত জিজ্ঞাসা করেন, "যুক্তরাষ্ট্র ও রুশিয়া বাদে অপরের সাহায্য না লইয়া অন্য কোন দেশ কি নিজেকে রক্ষা করিতে পারে? এমন কি যুক্তরাষ্ট্র ও রুশিয়া সম্মিলিত আক্রমণকারীদের হাত হইতে নিজেকে রক্ষা করিতে পারে না।" মার্কিন সংবাদদাতার এই প্রশ্নের উত্তরে আমাদের আর একটি জবাবের কথা মনে হইতেছে। ভারতবর্ষ যদি বহিরাক্রমণ প্রতিরোধ করিতে অর্থাৎ আত্মরক্ষা করিতে

না পারে, তবে সে দোষ কাহার? প্রায় পোনে দুই শত বৎসর যাবৎ ভারত ইংরেজ শাসনাধীনে রহিয়াছে। এই পোনে দুই শত বৎসরের শিক্ষকতায়ও যদি ইংরেজ বিপুল জনবল এবং স্বাভাবিক শৌর্যবলে সমৃদ্ধ ভারতবর্ষকে আত্মরক্ষায় সমর্থ করিতে না পারে, তবে সে দোষ শিক্ষার অথবা শিক্ষকের? ব্রিটিশ গভর্নমেণ্ট এদেশকে নিরস্ত্র ও নির্জীব করিয়া রাখার নীতিই বরাবর অনুসরণ করিয়া আসিয়াছেন। এ অবস্থায় এরূপ প্রশ্ন ভারত সম্পর্কে অজ্ঞতাই সূচিত করে।

চূড়ান্ত অযোগ্যতা

বাঙলার অন্ন ও বস্ত্রের সমস্যা সম্পর্কে বাঙলা সরকার ও ভারত সরকার—এতদুভয়ের কেহই তিলমাত্র যোগ্যতার পরিচয় প্রদান করেন নাই! এই প্রদেশের অন্নের দুর্ভিক্ষের সময় সরকারী অযোগ্যতার যে চূড়ান্ত পরিচয় পাওয়া গিয়াছে, তাহার তুলনা বিরল। পীড়িত এবং নিরন্নের মৃত্যু বন্ধ না হইলেও খাদ্য ব্যবস্থা কতকটা আয়ত্তের মধ্যে আসিয়াছে। কিন্তু অন্নের পরেই বস্ত্রের যে দুর্ভিক্ষ আরম্ভ হইয়াছে, ইহার অবসান কবে হইবে কে জানে! গত ২৫শে মার্চ গভর্নমেণ্ট বস্ত্রাভিযান শুরু করিয়াছেন। তাহার পর তিন মাস অতিবাহিত হইয়া গেল, কিন্তু বস্ত্র রেশনিংয়ের কোনরূপ ব্যবস্থাই আজ পর্যন্ত হইল না। বাঙলার অধিকাংশ অধিবাসীর আর্থিক সঙ্গতি অতিশয় শোচনীয় বলিয়াই, কেহই নিতান্ত প্রয়োজনাতিরিক্ত কাপড় কিনিয়া মজুত রাখিতে পারে নাই। তাহার ফলে এই তিন মাসে বস্ত্রের অভাব যে কতদূর চরম অবস্থায় গিয়া পৌঁছিয়াছে, তাহা হৃদয়ঙ্গম করিবার ক্ষমতা কর্তৃপক্ষের নাই। বস্ত্রের অভাবে আত্মহত্যা, কিংবা আত্মহত্যার চেষ্টা একটা সাধারণ ঘটনা হইয়া দাঁড়াইয়াছে। তীব্র বস্ত্রাভাব ও যে-কোন উপায়েই হোক আবশ্যক বস্ত্র পাওয়ার উৎকট প্রয়াস মানুষকে হিতাহিত জ্ঞানশূন্য অমানুষে করিয়া তুলিতেছে। তাহার ফলে অপরের পরিহিত বস্ত্র ছিনাইয়া লইবার মত প্রবৃত্তি আজ জাগ্রত হইয়াছে। কাপড় নাই, অথচ দোকানের দীর্ঘ তালিকা কর্তৃপক্ষ সংবাদ-পত্রে নির্বিকারচিত্তে প্রকাশ করিয়া যাইতে-ছেন। কেবল এই দীর্ঘ তালিকা দেখিয়া যে কোন সান্ত্বনাই লাভ করা যায় না, কর্তৃপক্ষের তাহা উপলব্ধি করিবার ক্ষমতা নাই। কলিকাতার প্রতি কর্তৃপক্ষ এ পর্যন্ত ভাল করিয়া নজর দেন নাই। তাঁহারা মফঃস্বলের দুঃখমোচনের জন্যই ব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন। কিন্তু টেক্সটাইল ডিরেক্টর মফঃস্বলে বস্ত্র প্রেরণ বন্ধ করিয়া দিয়াছেন। এ পর্যন্ত সরকারকর্তৃক এজেণ্টগণ মফঃস্বলে মাসিক ২০ হাজার বেল হিসাবে বস্ত্র প্রেরণ করিতেছিলেন। কিন্তু শুনিতে পাওয়া যাইতেছে, গভর্নমেণ্ট এই এজেণ্ট-দের হাত হইতে কাপড়ের কারবার গুটাইয়া লইয়া একটি সিণ্ডিকেটের হাতে দিবার ব্যবস্থা করিতেছেন। যতদূর জানিতে পারা গিয়াছে, এই সিণ্ডিকেট একটি জয়েণ্ট স্টক্ কোম্পানী হইবে এবং ইহার মূলধন হইবে ৩ কোটি টাকা। এই সিণ্ডিকেট এই প্রদেশে যেসব বস্ত্র উৎপাদিত হইবে, এবং প্রদেশের বাহির হইতে যে বস্ত্র আসিবে, তৎসমুদয়ই হস্তগত করিয়া মফঃস্বলে প্রেরণের ব্যবস্থা করিবে। বাঙলা দেশের বস্ত্র-সমস্যা সমাধানের জন্য গঠিত এই সিণ্ডিকেটের পরিচালকমণ্ডলীতে বাঙলা দেশের কোন প্রতিনিধির স্থান হয় নাই, ইহাও শুনিতেছি। এই নূতন সাধু ব্যবস্থা কেন? পূর্বের এজেণ্টগণ কি অযোগ্য বলিয়া প্রমাণিত হইয়াছেন, কিংবা তাঁহাদের বিরুদ্ধে কি কোন অভিযোগ উত্থাপিত হইয়াছে? ক্রমে ক্রমে এই সিণ্ডিকেটেও চোরাবাজারী কারবারের আবির্ভাব হইবে না ত? এ সম্বন্ধে সরকারের মৌনবৃত্তিতে দেশের লোকের মনে নানারূপ সন্দেহের সৃষ্টি হইয়াছে।

সিভিলিয়ানী স্পর্ধা

মিঃ এন এম খাঁর নাম অনেকেরই মনে আছে; কারণ, ইনি সিভিলিয়ান সমাজে একজন খ্যাতনামা ব্যক্তি। কি যশোহরে, কি ব্রাহ্মণবাড়িয়ায়, কি মেদিনীপুরে তিনি সরকারী কার্যব্যপদেশে যেখানেই গিয়াছেন, সেখানেই নানা অঘটন ঘটাইয়া খ্যাতি অর্জন করিয়াছেন। প্রাকৃতিক দুর্যোগে বিপন্ন মেদিনীপুরবাসীদের উপর দুর্ব্যবহারের জন্যই ইনি প্রসিদ্ধি লাভ করেন। লেফটন্যাণ্ট কর্ণেল এস এন রায়ের মোটর গাড়ী দখল লইয়া সেখানে যে মামলা উঠে, সেই মামলা হাইকোর্ট পর্যন্ত গড়ায়। বিচারপতি মিঃ সেন খাঁ সাহেবের সম্বন্ধে তাঁহার রায়ে এই মন্তব্য করেন যে, "লেফটন্যাণ্ট রায়কে গ্রেপ্তার করিয়া ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ খাঁ নিতান্ত সংকীর্ণতা এবং স্বৈরাচারী প্রবৃত্তির পরিচয় দিয়াছেন। হাকিমগিরির সম্বন্ধে তাঁহার যে অনুচিত আত্মম্ভরিতা রহিয়াছে, তাহারই তুষ্টি সাধনের জন্য লোককে গ্রেপ্তার করা উচিত হয় নাই। খাঁ সাহেবের বিরুদ্ধে হাইকোর্ট হইতে এই ধরণের সমালোচনা হইবার পর এবং সেই সঙ্গে জনমতের বিরুদ্ধতায় পড়িয়াই বোধ হয়, গভর্নমেণ্ট তাঁহাকে শাসনকার্য হইতে সরাইয়া কৃষি বিভাগের ডিরেক্টারের পদে নিযুক্ত করিয়া-ছেন। কিন্তু সহজে কাহারও স্বভাবের পরিবর্তন ঘটে না। খাঁ সাহেবেরও ঘটিয়াছে বলিয়া মনে হয় না। সম্প্রতি হাইকোর্টে তাঁহার বিরুদ্ধে আনীত একটি ক্ষতি-পূরণের মামলায় খাঁ সাহেবের স্বভাবের আর এক দফা পরিচয় পাওয়া গিয়াছে। ১৯৪১ সালে খাঁ সাহেব যখন যশোহরের জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট ছিলেন, তখন এই মামলায় সংশ্লিষ্ট ব্যাপারটি ঘটে। একদিন যশোহর রেল স্টেশনে উপস্থিত খাঁ সাহেব প্রথম শ্রেণীর ওয়েটিং রুমে বসিতে গিয়া দেখেন, একমাত্র ইজিচেয়ার-খানিতে এক ব্যক্তি ঘুমাইতেছেন। ইহাতে তাঁহার মেজাজ গরম হইয়া উঠে এবং তিনি স্টেশন মাস্টারকে তলব করিয়া ব্যক্তিটিকে উঠাইয়া দিতে হুকুম দেন। স্টেশন মাস্টার তাঁহাকে জাগাইয়া ম্যাজিস্ট্রেটের মহিমা সমঝাইয়া দিলেও তিনি চেয়ার ছাড়িবার কোন আগ্রহ দেখাইলেন না। খাঁ সাহেবের পক্ষে এমন আচরণ অসহ্য হয়। খাঁ সাহেব তাঁহাকে মদ্য পান, অশ্লীল আচরণ ইত্যাদি অভিযোগে গ্রেপ্তার করাইয়া মহকুমা হাকিমের নিকট বিচারার্থ চালান দেন। বিচারে তাঁহার ২০৲ অর্থ দণ্ড হয়। কিন্তু হাইকোর্টে আপীল করিলে উক্ত দণ্ডাদেশ নাকচ হয় এবং সাব্যস্ত হয় যে, খাঁ সাহেব অন্যায়ভাবে তাঁহাকে অভিযুক্ত করিয়া অযথা হয়রাণ করিয়াছেন। এই রায়ের উপর নির্ভর করিয়া বাদী হাইকোর্টে খাঁ সাহেবের বিরুদ্ধে ক্ষতিপূরণের মামলা আনয়ন করেন। এই মামলার বিচারে হাইকোর্ট বাদীর অনুকূলে ৭৫০৲ টাকা ডিক্রী দিয়াছেন। খাঁ সাহেবের পক্ষে এই অর্থ দণ্ড অবশ্য বিশেষ কিছু নয়; কিন্তু বিচারপতি এই প্রসঙ্গে তাঁহার আচরণ সম্বন্ধে যে সব মন্তব্য করিয়াছেন, তাহা এক্ষেত্রে বিশেষ-ভাবে উল্লেখযোগ্য। বিচারপতি মিঃ জেণ্টল বাদীর বিরুদ্ধে মিঃ খাঁ মদ্য পানজনিত উচ্ছৃংখলতা ও অশ্লীল আচরণের যে অভি-যোগ করিয়াছিলেন, তাহা সম্পূর্ণ অবিশ্বাস করিয়াছেন এবং এই মন্তব্য করিয়াছেন যে, খাঁ সাহেব দুরভিসন্ধিক্রমে বাদীকে গ্রেপ্তার করাইয়াছিলেন। সাক্ষী হিসাবে তাঁহার আচরণ অত্যন্ত নিন্দনীয় এবং তাঁহার ভাব-ভঙ্গী অত্যন্ত আপত্তিজনক। এক একটা সামান্য প্রশ্নের উত্তরে তিনি একাধিকবার যে সুদীর্ঘ বিবৃতি দিয়াছেন, তাহার অধি-কাংশই অবান্তর কথায় পূর্ণ; তিনি প্রকৃত প্রশ্নের কোন উত্তর কিছুতেই দেন নাই। গুণগ্রাহী সরকার খাঁ সাহেবের বিরুদ্ধে ইহার পূর্বে মেদিনীপুরের মামলা সম্পর্কে হাইকোর্ট হইতে কঠোর মন্তব্যের পরেও তাঁহাকে কৃষি বিভাগের সর্বাধ্যক্ষের পদে নিযুক্ত করেন। যশোহরের মামলায় বিচারপতি জেণ্টলের মন্তব্যের পর গভর্নমেণ্ট তাঁহার সম্বন্ধে কি ব্যবস্থা অবলম্বন করেন, তাহা দেখিবার জন্য আমরা আগ্রহান্বিত রহিলাম।



বর্ষার কোপাই নদী   শিল্পী : যদুপতি বসু



খেয়াঘাট   শিল্পী : সত্যেন্দ্রনাথ বিশী

দেশের কথা

মার্কিন বার্তা সংবাদ দিতেছেন—

মার্কিন শাসনাধীন জার্মাণ অঞ্চল হইতে লেফটেন্যান্ট কর্ণেল রস ম্যাকডোন্যাল্ড প্রকাশ করিয়াছেন যে, ঐ অঞ্চলের সব জার্মান রাজনীতিক বন্দীকে মুক্তিদান করা হইয়াছে। বন্দী-শিবির এবং কারাগারসমূহ হইতে ৯৬,২০২জন রাজনীতিক বন্দী মুক্তিলাভ করিয়াছে।

কিন্তু ভারতের রাজনীতিক বন্দিগণ এখনও শৃংখলিত অবস্থায় রহিয়াছেন; কংগ্রেসের ওয়ার্কিং কমিটির কয়েকজন সদস্য ব্যতীত ওয়াভেল প্রস্তাবে অপর রাজনীতিক বন্দীদের মুক্তি লাভ ঘটে নাই। বাঙলাদেশের রাজনীতিক বন্দীদের সম্পর্কে কর্তৃপক্ষের অবলম্বিত নীতির কঠোরতা যে কোনক্রমে ক্ষুণ্ণ হইবে, আমরা এমন কোন লক্ষণও এ পর্যন্ত দেখিতে পাইতেছি না। এতৎ-সম্পর্কিত একটি সংবাদে প্রকাশ—

বড়লাট লর্ড ওয়াভেল তাঁহার সাম্প্রতিক ঘোষণায় এইরূপ বলিয়াছেন যে, ১৯৪২ সালের আগস্ট হাঙ্গামা সম্পর্কে যাঁহাদিগকে আটক রাখা হইয়াছে, তাঁহাদের মুক্তির প্রশ্নটি তিনি তাঁহার প্রস্তাবের ফলে নূতন কেন্দ্রীয় গভর্নমেণ্ট গঠিত হইলে সেই গভর্নমেণ্ট এবং প্রাদেশিক গভর্নমেণ্টসমূহের বিচার বিবেচনার উপর ছাড়িয়া দিতে চাহেন। প্রকাশ, বড়লাটের এই ঘোষণা সম্পর্কে কলিকাতার সরকারী মহলে এইরূপ ব্যাখ্যা করা হইয়াছে যে, প্রাদেশিক গভর্নমেণ্ট এই ব্যাপারে এতদিন যে নীতি অনুসরণ করিয়া আসিতেছেন, এক্ষণে অবিলম্বেই যে সেই নীতির পরিবর্তন করিতে হইবে বড়লাটের ঘোষণায় সেইরূপ কোন নির্দেশ নাই; সুতরাং বিভিন্ন বন্দীর বিষয় পৃথক্ পৃথক্ভাবে বিবেচনা করিয়া ক্রমশ বন্দীদের মুক্তি দেওয়ার যে নীতি এক্ষণে অনুসৃত হইতেছে, তাহাই চলিতে থাকিবে। কেন্দ্রে প্রতিষ্ঠিত গভর্নমেণ্ট যদি কখনও এইরূপ বলেন যে, এই ব্যাপারে প্রাদেশিক গভর্নমেণ্ট কর্তৃক অবলম্বিত নীতিতে তাঁহারা সন্তুষ্ট নহেন, তবে শুধু সেই ক্ষেত্রেই বর্তমান নীতির পুনর্বিবেচনা করিবার প্রশ্ন উঠিতে পারে।

রাজনীতিক -বন্দীকে নিজেদের হাতে আটক রাখিয়া ভারতের রাজনীতিক সমস্যা সমাধানের জন্য এই যে প্রচেষ্টা চলিতেছে আন্তরিক উদারতার পরিচয় এতদ্দ্বারা অবশ্যই পাওয়া যায় না। উদার প্রতিবেশ প্রভাবের মধ্যে বৃহত্তর আদর্শকে প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য সত্যই শাসকবর্গ আন্তরিক হইয়াছেন, ক্রমিকভাবে রাজনীতিক বন্দীদিগকে মুক্তি দানের যুক্তির মধ্যে সে আশ্বাস নাই। বিশিষ্ট রাজনীতি-সম্পর্কিত ব্যবহারবিদ-গণের অভিমত এই যে, সমগ্র দেশে শান্তি-পূর্ণ আবহাওয়া সৃষ্টি করিতে হইলে ব্যাপকভাবে রাজনীতিক বন্দীদিগকে মুক্তি প্রদান করাই কর্তব্য; তাহাতে শান্তির কোন ব্যাঘাত তো ঘটেই না; পক্ষান্তরে জন-সাধারণের মনে নূতন প্রেরণার সঞ্চার হয় এবং শাসকদের পক্ষে এমন একটা অনুকূল মনস্তাত্ত্বিক প্রতিবেশ দেশে গড়িয়া উঠে যে, আপোষ আলোচনা সার্থক হইবার পথ প্রশস্ত হয়। সিমলায় সম্মেলন আরম্ভ হইয়াছে; কিন্তু দুঃখের বিষয় দেশের তেমন প্রতিবেশ প্রভাবের মধ্যে তাহা আরম্ভ হয় নাই। ভারতের বর্তমান অবস্থার উল্লেখ করিয়া সেদিন বোম্বাই শহরে জনগণের অভিনন্দনের উত্তরে পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু বলেন—

স্মরণ রাখিতে হইবে যে, ১৯৪২ সালের বিপ্লবের সময় হইতে আজ এ পর্যন্ত ভারত-বাসীরা বর্তমানে সামরিক ও পুলিস গভর্নমেণ্টের অধীনে বাস করিতেছে। দেশের অবস্থাকে ইউরোপের অবস্থার অনুরূপ মনে করিতে হইবে। সেখানে সেদিন পর্যন্তও প্রতিরোধকারী দলকে গুপ্তভাবে থাকিতে হইয়াছে। পণ্ডিতজী আরও বলেন যে, গত তিন বৎসর ভারতকে অত্যন্ত উদ্বেগের মধ্যে দিয়া কালহরণ করিতে হইয়াছে। চারি দিকেই যেন একটা বিরক্তির ভাব বিরাজ করিতেছে।

স্বদেশপ্রেমই অপরাধ

এমন বিরক্তি বা বিক্ষোভের কারণও আছে। শ্রীযুক্তা অরুণা আসফ আলীর সন্ধানে পুলিশ এখনও ঘুরিতেছে। জয়প্রকাশ নারায়ণ, অচ্যুত পটবর্ধনের ন্যায় স্বদেশের স্বাধীনতাকামী সন্তানগণ এখনও কারারুদ্ধ রহিয়াছেন, শ্রীযুত টি প্রকাশমের ন্যায় বয়ীয়ান্ জননায়ক এখনও কারাগারে; সুতরাং ওয়ার্কিং কমিটির সদস্যগণ তাঁহাদের মুক্তিতে যে সুখী হইতে পারেন নাই, ইহা স্বাভাবিক; এই সঙ্গে বাঙলার সর্বজনমান্য নেতা শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র বসুর কথা সকলেরই মনে জাগিবে। গত বুধবার কলিকাতার একটি জনসভায় এ সম্বন্ধে সমগ্র বাঙলার জনমত অভিব্যক্ত হইয়াছে। সেদিন মহাত্মা গান্ধী একটি বিবৃতিতে শ্রীযুত বসুর কথা উল্লেখ করিয়া বলিয়াছেন—

পাঁচগণি পরিত্যাগ করিবার অব্যবহিত পূর্বে আমি একখানা মর্মস্পর্শী পত্র পাই; তাহা হইতে আমি নিম্নের কয়েকটি লাইন উদ্ধৃত করিতেছি—"আমার মাতুল শ্রীযুত শরৎচন্দ্র বসুর স্বাস্থ্যের অত্যন্ত গুরুতর অবস্থার কথা জানাইবার জনাই আমি আপনাকে এই পত্র লিখিতেছি। দীর্ঘকাল তিনি গুরুতর-ভাবে পীড়িত এবং তাঁহার স্বাস্থ্যের অবস্থার জন্য আমাদের সকলেরই মনে বিশেষ উদ্বেগের কারণ ঘটিয়াছে। যদি তাঁহাকে মুক্তি না দেওয়া হয়, তবে অন্ততঃ অবিলম্বে তাঁহাকে বাঙলার কোন স্বাস্থ্যকর স্থানে প্রেরণ করা একান্ত প্রয়োজন, নতুবা তিনি আর বেশী দিন বাঁচিবেন না।" কোন প্রকাশ্য আদালতে শ্রীযুত শরৎবাবুর বিচার হয় নাই; তাঁহার অপরাধও প্রমাণিত হয় নাই। কাজেই স্পষ্টই বোঝা যাইতেছে, কেবল সন্দেহ মাত্র করিয়া তাঁহাকে গত কয়েক বৎসর আটক রাখা হইয়াছে; তাহাও বাঙলা হইতে বহুদূরে। সাধারণ ন্যায় বিচারের খাতিরেই শ্রীযুত শরৎবাবুকে বাঙলার কোন স্বাস্থ্যকর স্থানে স্থানান্তরিত করা উচিত এবং তাঁহাকে আত্মীয়স্বজনের সহিত দেখা সাক্ষাতের অনুমতি দেওয়া উচিত।"

মহাত্মা গান্ধীর এই অনুরোধ রক্ষিত হইবে কিনা আমরা জানি না। বিনা বিচারে বন্দীভূত বঙ্গের এই স্বদেশপ্রাণ জননায়কের সম্পর্কে মানবতার প্রশ্নেও যে গভর্নমেণ্ট সাড়া দেন না, সেখানে স্বাধীনতার পক্ষে দেশের অগ্রগতির জন্য কর্তাদের আন্তরিক আগ্রহ আছে, জনসাধারণ ইহা কেমন করিয়া বিশ্বাস করিয়া উঠিবে? বিলাতে ইণ্ডিয়া লীগের উদ্যোগে আহূত সাংবাদিকদের এক সভায় শ্রীযুত কৃষ্ণমেনন এই প্রসঙ্গ উত্থাপন করিয়াছিলেন। তিনি বলেন—

লর্ড ওয়াভেলের প্রস্তাব স্বাস্থ্যকর আবহাওয়া সৃষ্টি করিতে পারে নাই। দুই হাজার রাজনীতিক বন্দী এখনও কারাগারে অবরুদ্ধ রহিয়াছেন। বর্তমান প্রস্তাবে ইহা-দিগকে প্রতিভূস্বরূপে আটক রাখিয়া যেন প্রস্তাব গ্রহণের জন্য চাপ দেওয়া হইয়াছে। বিনা বিচারে তাহাদিগকে আটক রাখা হইয়াছে, তাহাদিগকে অবিলম্বে মুক্তিদান করা উচিত এবং ভারতের সর্বত্র মুক্তি স্বাধীনতা পুনরুজ্জীবিত হয় ইহাই প্রয়োজন।

বন্দীদের ইতর বিশেষ

বলাবাহুল্য বিনা বিচারে যাহারা আটক আছেন, শুধু তাঁহাদের মুক্তিই আমরা কামনা করি না, রাজনীতিক বন্দীদের সকলের মুক্তিই দাবী করি। রাজনীতিক বন্দিগণ সাধারণ চোর ডাকাত শ্রেণীর অপরাধী নহেন। স্বদেশের স্বাধীনতার বেদনাই তাঁহাদের কার্যের কারণ স্বরূপে বিদ্যমান থাকে। দেশে যদি স্বাধীনতার জন্য অনুকূল আবহাওয়াই কর্তৃপক্ষ প্রতিষ্ঠিত করিতে আগ্রহশীল হইয়া থাকেন, তবে ইঁহাদিগকে বন্দী করিয়া রাখিবার কোন সার্থকতাই থাকে না বরং তজ্জনিত একটা অসন্তোষের ভাবই দেশের আবহাওয়াকে আচ্ছন্ন করিয়া রাখে। 'হিন্দুস্থান স্ট্যাণ্ডার্ড' সম্প্রতি এ সম্বন্ধে লিখিয়াছেন—

রাজনীতিক বন্দীদিগকে মুক্তিদানের জন্য বারংবার দাবী করা হইয়াছে। আমলাতন্ত্র তাহা উপেক্ষা করিয়াছেন। এই দাবী জাতীয় দাবী। দেশের সহস্র সহস্র স্বদেশপ্রেমিক সন্তান কারাগারে ক্লেশ পাইতেছেন, এই অবস্থায় কোন পরিবর্তনকে আশার সঙ্গে গ্রহণ করিতে লোকে কখনই উন্মুখ হইতে পারে না। একদিন

দুইদিন কিম্বা দুই মাস এক মাস নয়, বৎসরের পর বৎসর অতিক্রান্ত হইয়াছে; কিন্তু ইঁহাদের বন্ধন মোচন হয় নাই। পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু তাঁহার নিজের প্রদেশের রাজনীতিক বন্দীদের দুঃখকষ্টের কথা আবেগময়ী ভাষায় ব্যক্ত করিয়াছেন। কিন্তু বাঙলাদেশের বন্দী স্বদেশপ্রেমিক সন্তানগণের সংখ্যা আরও বেশী; ইঁহাদের দুঃখ-দুর্দশা ভাষায় বর্ণনা করা যায় না। আমলাতন্ত্র মহিলা বন্দীদিগকে মুক্তিদান করাও নিরাপদ মনে করিতেছেন না। ইঁহারা বহুদিন অবরুদ্ধ আছেন এবং নানা পীড়ায় ক্লেশ ভোগ করিতেছেন।

এই প্রসঙ্গে শ্রীযুক্তা বিজয়লক্ষ্মী পণ্ডিত নিউইয়র্কের কমোডোর হোটেলে সহস্রাধিক নরনারীর সম্মুখে ভারতের স্বাধীনতা দিবস উদযাপন উপলক্ষে যে বক্তৃতা করেন, সেকথা আমাদের মনে পড়িতেছে। শ্রোতৃবৃন্দকে সম্বোধন করিয়া তিনি বলেন—



গত ১৯৪২ সাল হইতে ভারতবর্ষ একটি বিরাট কারাগারে পরিণত হইয়াছে; বিনা বিচারে ভারতের কারাগার সমূহে ৮৬ হাজার নরনারীকে বন্দী অবস্থায় রাখা হইয়াছে। আমাদের দেশের অবস্থা কি বলিব? সেখানে লোকে মনের ভাব নির্ভয়ে ব্যক্ত করিতে, পারে না। সংবাদ-পত্রে স্বাধীনভাবে অভিমত ব্যক্ত করা চলে না। সভাসমিতি করা সম্ভব হয় না; এসব বেআইনী বলিয়া নির্দিষ্ট হইয়াছে। এক প্রদেশ হইতে অন্য প্রদেশে লোক হাঁটিয়া গিয়া যদি খবর না দেয়, তবে ঠিক খবর জানিবার উপায় নাই; আজ যদি কর্তৃপক্ষের নির্দেশ অমান্য করিয়া বালকবালিকারা এই ধরণের সভা করে, তাহারা অনেকেই তাহা করিতে প্রস্তুত আছে, তবে ভারত জুড়িয়া বালক এবং বালিকাদিগের ধরপাকড় আরম্ভ হইবে এবং আগামীকল্য তাহারা কারাগারে নিক্ষিপ্ত হইবে।

ভীরুতার অপরাধ

এই সেদিন পর্যন্ত বিহারের কানাপড়োতে জাতীয় পতাকা উত্তোলন করিবার অপরাধে স্বদেশপ্রেমিক কংগ্রেস কর্মীদিগকে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে; মাত্র কয়েকদিন হইল সে আদেশ প্রত্যাহৃত হইয়াছে এবং জাতীয় পতাকা উত্তোলনের অপরাধে আর গ্রেপ্তার করা হইতেছে না। কিন্তু ভারতের পূর্ণ স্বাধীনতা যতদিন পর্যন্ত আমরা প্রতিষ্ঠা করিতে সমর্থ না হইতেছি ততদিন এই ব্যাপারের পুনরাবৃত্তির সম্ভাবনা সম্পূর্ণ-রূপেই রহিয়াছে এবং অত্যাচার উৎপীড়নের পথ উন্মুক্ত রহিয়াছে। নেতৃ-সম্মেলনের অধিবেশনে যোগদানের জন্য যাত্রা করিবার পূর্বে পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু বোম্বাইতে যে বক্তৃতা প্রদান করেন, তাহাতে তিনি এই অবস্থার কথা উল্লেখ করিয়া বলেন—

আমি একটি দৃষ্টান্ত মাত্র দিব; বেরেলী জেলার বালিয়াতে ব্রিটিশ গভর্নমেণ্টের শাসন ব্যবস্থা একেবারে এলাইয়া পড়িয়াছিল। নর-নারীর বহু ক্ষতি সাধিত হয়; ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষ এবং তাহাদের নির্দেশক্রমে ভারতীয় কর্তৃপক্ষ গুলী চালায় এবং অত্যাচার করে। উড়ো-জাহাজ সহ সৈন্যদল উপস্থিত হয়, বহুসংখ্যক গ্রাম বিধ্বস্ত করা হয়; কিন্তু এ পর্যন্ত গ্রাম-বাসীদের বিরুদ্ধে যে সব অভিযোগ আনয়ন করা হইয়াছে, আমি যতদূর জানি তন্মধ্যে ব্যক্তিগতভাবে কাহারও উপর বলপ্রয়োগের একটি অভিযোগও নাই। গ্রামবাসীরা ব্যক্তি-গতভাবে কাহারও উপর ক্রোধ প্রদর্শন করে নাই কিংবা কাহারও ক্ষতি করে নাই। আগস্ট মাসের দাঙ্গাহাঙ্গামায় যাহারা জড়িত ছিল, আমি তাহাদের পক্ষ সমর্থন করিতে যাইতেছি না; কিন্তু এই ধরণের অত্যাচারের প্রতিক্রিয়া ভারতবাসীদের উপর স্বভাবত যাহা হইতে পারে, তাহাই বলিতেছি। তাহারা বলিবে, হিংসা হউক, অহিংসা হউক, আমাদিগের উপর যাহারা অকারণ অত্যাচার করিবে, তাহারা যেন সাবধান থাকে। কাহারও পদাঘাত সহ্য করার চেয়ে সাহস প্রদর্শন করা অনেক ভাল। ব্রিটিশ গভর্নমেণ্ট যদি পুনরায় আমাদিগকে আক্রমণ করিতে আসেন, আক্রান্ত প্রত্যেক নরনারী তাহার প্রতিরোধে তাঁহাদের সম্মুখীন হইবে। অনেকে হয়ত অত্যাচার মাথা পাতিয়া লইবে। যে জাতি এই ধরণের অত্যাচার মাথা পাতিয়া লয়, সে জাতি মৃত জাতি। আমাদের দেশের লোক এইরূপ মৃত হইবে, আমি ইহা চাহি না; সুতরাং যদি সেই-রূপ অত্যাচারের পুনরাবৃত্তি ঘটে, তাহার প্রতিরোধ করিতেই হইবে।

পণ্ডিতজী শুধু তাঁহার প্রদেশের কথাই উল্লেখ করিয়াছেন, কিন্তু এই বাঙলার এবং বিশেষভাবে বাঙলার প্রান্ত-দেশে মেদিনীপুরে যে নির্মম এবং নিষ্ঠুর অত্যাচার অনুষ্ঠিত হইয়াছে, তাহার কাছে বেরেলীর ব্যাপার কিছুই নয়। সে অত্যাচার এবং উৎপীড়নের প্রভাব বাঙলা আজও কাটাইয়া উঠিতে পারে নাই। দেশের স্বদেশ-প্রেমিক কর্মিবৃন্দ কারাগারে অবরুদ্ধ রহিয়া-ছেন। দেশের জন্য ভাবিবার কেহ নাই, দেশ-বাসীর জন্য হৃদয়ের দরদ দেখাইবার লোক নাই। আজ বাঙলার শ্মশানভূমিতে প্রেতের নৃত্য শুরু হইয়াছে। সর্বত্র চোরাবাজারী এবং লাভখোরদের তাণ্ডব নৃত্য চলিতেছে। সমাজদেহ প্রাণহীন এবং নির্জীব। স্বদেশপ্রেমিক কর্মী দলের আদর্শ দেশে সম্প্রসারিত থাকিলে এমন নীতিহীন নৃশংসতা এবং দেশের লোকের সর্বনাশ করিবার পাপ ব্যবসায় এমন স্বচ্ছন্দে চলিতে পারিত না। পণ্ডিতজী উত্তেজিত ভাষায় বলিয়াছেন—

সর্বময়, কর্তৃত্বসম্পন্ন বিদেশী গভর্নমেণ্টের যেখানে প্রতিষ্ঠা সেখানে শাসন বিভাগে যোগ-দানের জন্য উৎকৃষ্ট শ্রেণীর লোক আকৃষ্ট হয় না। সরকারী এবং বেসরকারী সব মহলে স্বভাবত ব্যাপক নীতিহীনতা প্রশ্রয় পায়। উডহেড কমিশনের রিপোর্ট অনুসারে বাঙলার দুর্ভিক্ষে মৃত পনর লক্ষ নরনারীর প্রত্যেকের উপর হইতে লাভখোরেরা হাজার টাকা করিয়া লাভ তুলিয়াছে। মানুষ কেমন করিয়া এতটা নিষ্ঠুর এবং নৃশংস হইতে পারে, ধারণায় আসে না। ব্যক্তিগতভাবে বলিতে গেলে আমি একটি পোকাকে মারিতে চাহি না; কিন্তু প্রত্যেক লাভখোরকে ধরিয়া যদি ফাঁসিতে লটকাইয়া দেওয়া হয়, আমি খুবই আনন্দিত হইব।

আমেরীর সাধুগিরি

দেখিতেছি, ভারতসচিব মিঃ আমেরী সেদিন নির্বাচন প্রতিদ্বন্দ্বিতা উপলক্ষে স্পার্কব্রুকে বক্তৃতা করিতে গিয়া বড় সাধু-গিরি ফলাইয়াছেন। ভারতের রাজনীতিক বন্দীদের দায়িত্ব সম্পর্কে তাঁহাকে প্রশ্ন করা হইলে তিনি বলেন,—

ভারতের কারাগারসমূহে সহস্র সহস্র নরনারী বিনা বিচারে বন্দী রহিয়াছে; কিন্তু সেজন্য আমি কেমন করিয়া দায়ী হইতে পারি? ভারতবাসীরা যদি সর্বসম্মতভাবে শাসনতন্ত্র গড়িয়া তুলিতে সমর্থ হয়, তবে এখনই তাহারা প্রকৃত গণতন্ত্র লাভ করিতে পারে। বর্তমানে বড়লাটের শাসন পরিষদের সদস্যগণের দ্বারা ভারতবর্ষ শাসিত হইয়াছে; ইহাদের মধ্যে ১১জনই ভারতবাসী এবং ৪জন মাত্র শ্বেতাঙ্গ। জাপানীদের আক্রমণের আতঙ্কের মুখে ভারতে ধ্বংসাত্মক কার্য শুরু হয়, এজন্য বড়লাটের শাসন-পরিষদের সদস্যগণ কংগ্রেস-নেতৃবৃন্দকে অবিলম্বে বন্দী করা প্রয়োজন বলিয়া স্থির করেন। এই সিদ্ধান্ত করিবার সময় সভায় একজন মাত্র শ্বেতাঙ্গ সদস্য ছিলেন। স্যার অসওয়াল্ড মোসলেকে যেমন এখানে ১৮বি রেগুলেশনে আটক করা হইয়াছিল, সেইরূপ তাঁহাদিগকে আটক করা হয়। প্রাদেশিক গভর্নমেণ্টসমূহ আরও অনেককে বন্দী করেন। এ সম্পর্কে আমি তাঁহাদের উপর কোন নির্দেশ দান করি নাই এবং এখন এই সব বন্দীদিগকে ক্রমিকভাবে মুক্তিদান করা হইতেছে।

মিঃ আমেরীর নির্দোষিতার এই অজুহাতের মূল্য সকলেই বোঝেন। বিলাতের শ্রমিক দলের নেতারা চোখে আঙ্গুল দিয়া দেখাইয়া দিয়াছেন যে, ভারতের কারাগারের চাবি হোয়াইট হলেই আছে এবং মিঃ আমেরীই সেজন্য দায়ী। প্রশ্ন এই যে, বন্দীদিগকে এখনও ক্রমিকভাবে মুক্তিদান করা হইবে কেন? ইউরোপের যুদ্ধ শেষ হইয়াছে, ইংলণ্ডের কারাগারে বিশেষ বিধান অনুসারে কয়জন নরনারী বন্দী অবস্থায় আছে? আজ যদি ভারতের মত সেখানে সহস্র সহস্র নরনারী কারাগারে বন্দী অবস্থায় থাকিত, তবে দেশের লোক চার্চিল-আমেরীর দলকে

রেহাই দিত কি? স্যার অসওয়াল্ড মোস্‌লের মত পাকা ফ্যাসিস্টকেও মুক্তিদান করিতে হইয়াছে, কিন্তু ভারতের ফ্যাসিস্ট-বিরোধী রাজনীতিক সন্তানগণ আজও কারাগারে বন্দী অবস্থায় রহিয়াছেন; ইহার কোন অর্থ হয় কি? শাসন-পরিষদের সদস্যদের দায়িত্বের দোহাই দিয়া লাভ নাই। তাঁহারা পরের হাতে ক্রীড়নকমাত্র। কর্তৃত্ব তাঁহাদের কিছুই নাই। ঐরূপ দায়িত্বহীন শাসন পরিষদ আমরা চাই না। দেশের শাসনতন্ত্র প্রত্যক্ষভাবে দেশের লোকের দ্বারা পরিচালিত হয়, আমরা ইহাই কামনা করি।

বিশ্বসনদ পত্রের মহিমা

ভারতে মানবতার মহিমা এখনও এইভাবে নির্যাতিত হইতেছে। অথচ ওদিকে সানফ্রান্সিস্কোর সম্মেলনের উপসংহার ঘটিল এবং নব গঠিত বিশ্ব রাষ্ট্র সঙ্ঘের সনদপত্র স্বাক্ষরিত হইয়া গেল। জেনারেল স্মাটস এই সনদপত্রের মহিমা কীর্তন করিতে গিয়া সম্প্রতি বলিয়াছেন যে, এই সনদপত্রে ব্রিটিশ গভর্নমেণ্ট যখন স্বাক্ষর করিয়াছেন, তখন চিন্তার আর কোন কারণ নাই। বৃটিশ গভর্নমেণ্টের প্রতিনিধিদের ইহাতে সম্মতি থাকাতেই সুনিশ্চিতভাবে ইহাই প্রতিপন্ন হইতেছে যে, নূতন কিছু একটা ঘটিয়াছে এবং দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সদ্য সম্মেলন হইতে এক নূতন শিশু জন্মগ্রহণ করিয়াছে, এই নবজাতক জগতের ভবিষ্যৎ শান্তি সুনিশ্চিত করিবে। সানফ্রান্সিস্কোতে যে চুক্তিপত্র স্বাক্ষরিত হইল, তাহার মধ্যে সার আছে এবং শক্তিও আছে। এতদ্দ্বারা জগতে যে গণতান্ত্রিকতার ভাব প্রতিষ্ঠিত হইল তাহা বাস্তবে সর্বত্র রূপে পরিগ্রহ করিবে। আমরা ভারতবাসী—জেনারেল স্মাটসের এই মহিয়সী বাণীর মর্ম উপলব্ধি করিবার ক্ষমতা আমাদের নাই; তবে এই অনুষ্ঠান সম্পর্কে মার্কিন বার্তা আর একটি সংবাদ দিতেছেন। সংবাদে প্রকাশ—

"ক্যালিফোর্নিয়ার সিকুইয়া বৃক্ষের খ্যাতি জগতের সর্বত্র। ক্যালিফোর্নিয়ার অধিবাসীরা এই আশা করে যে, আন্তর্জাতিক মৈত্রীর প্রতীক স্বরূপে বিশ্ব সনদ স্বাক্ষরের এই ব্যাপার উপলক্ষে তাহারা জগতের সর্বত্র ঐ বৃক্ষের বংশ বিস্তার করিবে। জেনারেল সেরম্যান সিকুইয়ার বয়স ৫ হাজার বৎসরের উপর; এই বৃক্ষটি উচ্চতায় ২৭৩ ফুট, সানফ্রান্সিস্কোর বৈঠকে সমবেত ৫০টি জাতির প্রতিনিধিগণের মধ্যে এই বৃক্ষের বীজ বিতরণ করা হইতেছে। এই প্রসঙ্গে একথাও বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য যে, ক্যালিফোর্নিয়ার সিকুইয়া বৃক্ষের আদি জন্মভূমি হইল এশিয়া; সম্ভবত সমুদ্র তরঙ্গে বাহিত হইয়া এই বৃক্ষের বীজ একদা আলাস্কার উপকূলভাগে পৌঁছিয়াছিল। 'জেনারেল সেরম্যান বৃক্ষরাজের দেহ হইতে ৫ লক্ষ ঝুরি নামিয়াছে, এতদ্দ্বারা ৫০৫টি বাড়ী প্রস্তুত হইতে পারে।"

স্যার রামস্বামী মুদালিয়ার সিকুইয়া বৃক্ষের বীজ লইয়া আসিতেছেন, আশা করি; কিন্তু জেনারেল স্মাটসের কি এশিয়ায় কৃষ্ণকুলজ এই বৃক্ষের বীজ দক্ষিণ আফ্রিকায় লইয়া যাইতে সম্মত হইবেন? জেনারেল স্মাটস্ আগাগোড়া সাম্রাজ্যবাদী। তিনি ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের চিরন্তন গুণগ্রাহী। সুতরাং তিনি ব্রিটিশের গুণগান করিবেন, আশ্চর্য কিছুই নাই; কিন্তু সংবাদে দেখিতেছি, ব্রিটিশ প্রতিনিধিদলের মুখপাত্র লর্ড ক্রানবোর্ন আগাগোড়া ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের প্রশংসা করিয়াছেন এবং বলিয়াছেন যে, এমন সুখের ব্যবস্থা জগতে অন্য কোথায়ও নাই। তিনি ইহাও বলিয়াছেন যে, স্বাধীনতার আমরা বিরোধী নহি; কিন্তু অধিকাংশ পরাধীন জাতিই তাহা চাহে না। এই সব পরাধীন জাতিগুলিকে আমরা মানুষ করিয়া তুলিতেছি; আমরা যদি সে সাহায্য না করি, তবে তাহারা বর্বর অবস্থার মধ্যে আবার ফিরিয়া যাইবে।

ক্যালিফোর্নিয়ার গাজর

ক্যালিফোর্নিয়ার বনস্পতির মহিমায় বিগলিত হইতেছিলাম, কিন্তু দেখিলাম সন্ত নিহাল সিং নূতন খবর দিতেছেন। তিনি জানাইতেছেন, ভারত সরকারের সম্মান্য প্রতিনিধিস্বরূপে স্যার রামস্বামী মুদালিয়র এবং তাঁহার নিষ্ঠাবান কন্দমূলাহারী ব্রাহ্মণ সতীর্থ স্যার ভি টি কৃষ্ণমাচারী ক্যালিফোর্নিয়া হইতে তথাকার বিখ্যাত গাজর লইয়া ভারতে আসিতেছেন। ক্যালিফোর্নিয়ার সুজলা সুফলা ভূমিতে সযত্নে উৎপন্ন এই গাজরের মহিমা সম্বন্ধে নিহাল সিংজী লিখিয়াছেন,

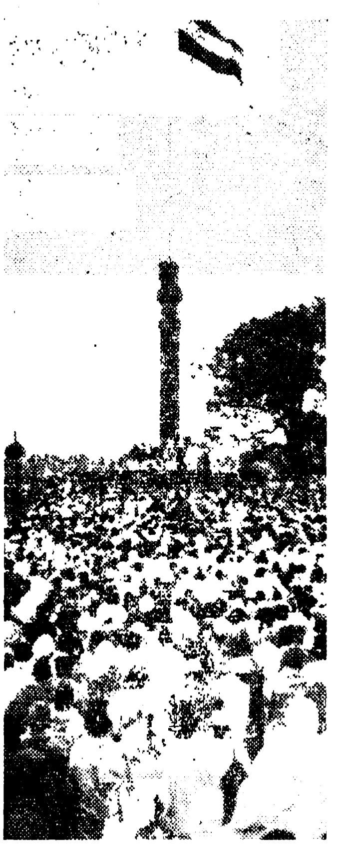
একটি মহৎ উদ্দেশ্য লইয়া ক্যালিফোর্নিয়া হইতে তথাকার গাজর প্রশান্ত মহাসাগর পাড়ি দিয়া এশিয়ায় পাঠান হইতেছে এবং ভারত মহাসাগর অতিক্রম করিয়া তাহা আফ্রিকাতেও লওয়া হইবে। এই উদ্দেশ্য সিদ্ধ করিবার জন্য গাজরগুলি যাহাতে তাজা থাকে, বিশেষত গন্ধ না হারায় তাহা করা দরকার। এই গাজরগুলি গাধার নাকের সামনে নাড়া হইবে। এ গাধা কিন্তু চতুষ্পদ নয়, দ্বিপদ। গাজরগুলি যদি দেখিতে ভাল না হয় এবং তাহার গন্ধ খারাপ হয়, তবে গর্দভগুলি না ডাকিতে পারে এবং তাহারা বিগড়াইয়া যাইতে পারে। এই সঙ্গে একথা স্মরণ রাখা দরকার যে, গাজরগুলি শুধু দেখাইবার জন্য, খাওয়াইবার জন্য নয় এবং শুধু গন্ধ শোঁকাইবার জন্য। চেহারাটা ভাল দেখিলে এবং গন্ধ ভাল পাইলে গর্দভের দল চীৎকার করিতে থাকিবে, তাহারা শুধু চীৎকার করে—ইহাই, তো দরকার, তাহা ছাড়া এ সব জানোয়ারের আর কি যোগ্যতা আছে? যুদ্ধোত্তর জগতের মানুষের জীবন সমধিক জটিল আকার ধারণ করিবে; এই জন্যই এমন ভাবে গাজর উৎপাদন এবং জগতের পরাধীন অঞ্চল, বিশেষভাবে এশিয়া এবং আফ্রিকাতে সেগুলি চালান দেওয়া দরকার হইয়া পড়িয়াছে। আমার স্থির বিশ্বাস এই যে, ভারতবাসীদের মধ্যে যদি কাহারও এমন বিশ্বাস জন্মিয়া থাকে যে, সানফ্রান্সিস্কোর সম্মেলনে এমন কোন সিদ্ধান্ত হইয়াছে, যাহার ফলে পরাধীন জাতিসমূহের শোষণ রুদ্ধ হইবে, তবে তিনি নিতান্তই নিরাশ হইবেন। আমার নিজের কথা বলিতে গেলে আমার এই আশঙ্কা হয় যে, সাম্রাজ্যবাদ উগ্রতর শক্তিতে এবং প্রবলতর পিপাসা লইয়া জাগ্রত হইতেছে। জগতের ইতিহাসে তেমন বুভুক্ষা অন্য কোন দিন দেখা যায় নাই, সুতরাং পরাধীন জাতিসমূহের সম্মুখে দুর্দিন ঘনাইয়া আসিতেছে।

এই সত্যটি পণ্ডিত জওহরলালের সূক্ষ্ম দৃষ্টি অতিক্রম করে নাই। সানফ্রান্সিস্কো সম্মেলনের সিদ্ধান্ত সম্বন্ধে আলোচনা করিতে গিয়া তিনি বলিয়াছেন—

পরাধীন জাতিগুলির স্বাধীনতার প্রশ্ন সম্পর্কে আলোচনা প্রসঙ্গে 'স্বাধীনতা' শব্দটির প্রয়োগ লইয়া যে আপত্তি উঠিয়াছিল, তাহা হইতেই বৃহত্তর রাষ্ট্রগুলির অন্তরের প্রভুত্ব লিপ্সা উন্মুক্ত হইয়া পড়িয়াছে। যদি কোন কিছুর দ্বারা অশান্তি ও অনর্থের সূত্রপাত হয়, তবে অন্যান্য দেশকে পদানত রাখিবার জন্য তাহাদের অন্তরে মূলীভূত এই প্রবৃত্তিই তাহার কারণ স্বরূপে কার্য করিবে; কারণ পরাধীন জাতিগুলি এই অবস্থা স্বেচ্ছায় স্বীকার করিয়া লইবে না।

সুতরাং স্বাধীনতার জন্য আত্মদান এবং সে আত্মদাতাদের শোণিতসিক্ত ইতিহাসের অধ্যায়ের এখনও উপসংহার ঘটে নাই। সেই অধ্যায়ে ভারতের অবদান কোন্ অভিনব আকারে উন্মুক্ত হইবে, ইহা লক্ষ্য করিবার বিষয় এবং সেই পরীক্ষায় ভারত যাহাতে সমুত্তীর্ণ হইতে পারে, তাহাই আমাদের কাম্য।

জাতীয় কংগ্রেসের নূতন অধ্যায়ে



বিগত ১৯৪২ সালের ৯ই আগস্ট, আর বর্তমান ১৯৪৫ সালের ১৫ই জুন! এই দীর্ঘ কারাবাসের পর ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের ওয়ার্কিং কমিটির সর্বজন-শ্রদ্ধেয় সদস্যগণ মুক্তিলাভ করিলেন। ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে চিরস্মরণীয় আগস্ট-প্রস্তাব গ্রহণের ফলে প্রায় তিন বৎসর (১০৩৯ দিন) পূর্বে যে বোম্বাই নগরীতে ভারতের জাতীয় ইতিহাসের এক নূতন অধ্যায়ের সূচনা হইয়াছিল, ভারতের নেতৃবৃন্দ কারাপ্রাচীরের অন্তরালে অবরুদ্ধ হইয়াছিলেন, আমলাতন্ত্রের স্বৈর শাসনচক্রের রোষদৃপ্ত দমননীতি ও অত্যাচারে বিক্ষুব্ধ বিদ্রোহী জনমত রুদ্ধকণ্ঠ হইয়াছিল,—আজ সেই নগরীতে নেতৃবৃন্দের মুক্তিতে ভারতের ইতিহাসের আর এক নূতন অধ্যায়ের সূচনা হইতে চলিয়াছে। নেতৃবর্গের অকস্মাৎ কারাবরোধে ১৯৪২ সালের নৈরাশ্য-নিপীড়িত, বেদনা-বিক্ষুব্ধ বোম্বাই নগরী সদামুক্ত রাষ্ট্রনায়কগণের সমাগমে উৎসাহে ও আনন্দে চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছে। ত্রিবর্ণ-লাঞ্ছিত জাতীয় পতাকা-আন্দোলনে, বন্দে মাতরম্ ও নেতৃবৃন্দের জয়ধ্বনিতে, রাজপথে অগণিত জনসমাবেশে এই নগরীর বুক আনন্দের অধীরতায়, আশা-আকাঙ্ক্ষার উত্তেজনায় স্পন্দিত হইতেছে।

একদা যে নেতৃবৃন্দ ভারতে ব্রিটিশ শাসনের পক্ষে বিপজ্জনক বলিয়া বিবেচিত হইয়াছিলেন এবং আগস্ট প্রস্তাব গ্রহণের ফলে ব্রিটিশ আমলাতন্ত্র বিচলিত হইয়া যে কংগ্রেসের ধারক ও বাহকগণকে কালবিলম্ব না করিয়া কারারুদ্ধ করিয়াছিলেন, আজ সেই কংগ্রেসের মূর্ত প্রতীক মহাত্মা গান্ধী ও রাষ্ট্রপতি মৌলানা আবুল কালাম আজাদ এবং নানা প্রদেশের ভূতপূর্ব কংগ্রেসী মন্ত্রিগণ ওয়াভেল পরিকল্পনা আলোচনার্থ বড়লাট কর্তৃক সিমলায় নিমন্ত্রিত হইয়াছেন। এই পরিকল্পনার বিস্তৃত রূপ কি, দেশবাসী তাহা এখনও জানে না এবং সিমলা সম্মেলনে আলোচনার ফলে এই পরিকল্পনা অনুযায়ী শাসন পরিষদ গঠন সম্ভবপর হইবে কিনা, তাহাও অনিশ্চিত।

আজ ভারতের ইতিহাসের এই নূতন অধ্যায়ের সূচনার সম্ভাবনা ও উৎসাহ-উত্তেজনার মধ্যেও, কারাবাসকালে নেতৃবৃন্দ যে ক্ষয়ক্ষতি সহ্য করিয়াছেন, ভগ্নস্বাস্থ্যের যে দুঃসহ যন্ত্রণা তাঁহাদিগকে ক্ষীণ ও পাণ্ডুর করিয়া তুলিয়াছে, তাঁহাদের কেহ কেহ যে প্রিয়জন-বিয়োগ-ব্যথা সহ্য করিয়াছেন, দেশবাসী স্বতঃস্ফূর্ত বিক্ষোভ ও বিদ্রোহের ফলে যে অপরিসীম লাঞ্ছনা ও নিপীড়নে জর্জরিত হইয়াছে, তাহার বেদনা-ম্লান পটভূমিকা আজ আমরা কিছুতেই ভুলিতে পারিতেছি না।

১৯৪২ সালের আগস্ট মাসে নেতৃবৃন্দের কারাবরোধের এক সপ্তাহের মধ্যেই মহাত্মাজীর একান্ত অনুগত, বিশ্বস্ত পার্শ্বচর, তাঁহার প্রাইভেট সেক্রেটারী মহাদেব দেশাই আগা খাঁ প্রাসাদে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। ইহার এক বৎসর পরে মহাত্মাজীর সুযোগ্যা সহধর্মিণী ও ভারতীয় জনগণের জননী-স্বরূপা কস্তুরবা গান্ধী আগা খাঁ-প্রাসাদে তাঁহার পূজনীয় স্বামীকে একান্ত নিঃসঙ্গ অবস্থায় ফেলিয়া পরলোকগমন করেন। তিনি মহাত্মাজীর কেবল পতিব্রতা, সেবাপরায়ণা পত্নী ছিলেন না, তিনি ছিলেন মহাত্মাজীর উৎসাহ ও প্রেরণার উৎস-স্বরূপিণী, ত্যাগ ও দুঃখবরণের পথের একনিষ্ঠা সঙ্গিনী। আগা খাঁ-প্রাসাদের প্রাঙ্গণে কস্তুরবা ও মহাদেব দেশাইর পাশাপাশি সমাধি দুইটি ভারতীয় জনগণের তীর্থস্বরূপ। বিয়োগ-বেদনার এই দিক দিয়া রাষ্ট্রপতি মৌলানা আজাদ মহাত্মাজীর সহিত উপমিত হইবার যোগ্য। সম্ভবত তাঁহার অবস্থা আরও শোকাবহ। মহাত্মাজী ও মৌলানা আজাদ, উভয়েরই তাঁহাদের বন্দিদশায় পত্নী-বিয়োগ ঘটে। কিন্তু রোগভোগ ও মৃত্যুকালে তদীয় পত্নীর পার্শ্বে মহাত্মাজী বরাবর উপস্থিত থাকিতে পারিয়াছিলেন, কিন্তু মৌলানা আজাদ তাঁহার পত্নীর মৃত্যুকালে একটি বার মাত্র তাঁহার সাক্ষাৎ লাভ পর্যন্ত করিতে পারেন নাই। শেষবারের মত স্বামীকে একবার মাত্র দেখিবার ব্যর্থ, আকুল প্রত্যাশা লইয়া তাঁহার পত্নী প্রাণত্যাগ করিলেন। আসফ আলির ভাগ্যও ইঁহাদের অপেক্ষা কিছুমাত্র প্রসন্নতর নহে। অন্তরোগে অস্থি-চর্মসার হইয়া তিনি মুক্তিলাভ করিলেন। কারামুক্তির পর দিল্লীর বাসভবনে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন, দীর্ঘ কারাবাসের পর সেখানে তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিয়া লইবার জন্য তাঁহার পত্নী উপস্থিত নাই।



রাষ্ট্রপতি আজাদ

আচার্য কৃপালনীকেও দীর্ঘ কারাবাসের পর ভগ্নস্বাস্থ্য লইয়া শূন্য গৃহে ফিরিতে হইয়াছে। তাঁহার পত্নী শ্রীযুক্তা সুচেতা বিহার জেলে এখনও বন্দিনী। পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু অবসন্ন দেহে কারাগার হইতে মুক্তিলাভ করিয়াছেন। যথাসময়ে মুক্তিলাভ না করিলে শ্রীযুক্তা সরোজিনী নাইডুর স্বাস্থ্যের অবস্থাও অত্যন্ত গুরুতর হইত এবং তাহার শেষ পরিণতি যে কি হইত, বলা যায় না। ডাঃ প্রফুল্লচন্দ্র



মৌলানা আজাদ কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির অধিবেশনে যোগদান করিতে যাইতেছেন।



অধিবেশনে যোগদানের জন্য রোগ-শয্যা হইতে আগত মিঃ আসফ আলী।



বোম্বাই বিড়লা ভবনের সম্মুখে বাবু রাজেন্দ্রপ্রসাদ ও আচার্য কৃপালনী।

ঘোষ ও ডাঃ সৈয়দ মামুদকে গভর্নমেণ্ট গুরুতর ভগ্নস্বাস্থ্যের জন্যই কারাগার হইতে মুক্তিদান করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। ডাঃ ঘোষের নিষ্ঠীবনের মধ্যে রক্ত দেখা গিয়াছিল। সর্দার বল্লভভাই প্যাটেল, খান আব্দুল গফুর খান, বাবু রাজেন্দ্রপ্রসাদ, জয়রামদাস দৌলতরাম—ইঁহারা সকলেই গুরুতররূপে ভগ্নস্বাস্থ্য লইয়া কারামুক্ত হইয়াছেন। সর্দার বল্লভভাই প্যাটেলের স্বাস্থ্য লইয়া তদীয় পুত্র দয়াভাই ও বোম্বাই গভর্নমেণ্টের মধ্যে বাদানুবাদ চলিতেছিল। স্বাস্থ্য সম্পর্কে গুরুতর অবস্থা ঘটিবার পূর্বে হরেকৃষ্ণ মহাতাব মুক্তিলাভ করিয়াছেন। শংকররাও দেবও কারাবাসের অশেষ ক্লেশ ও দুর্ভোগ সহ্য করিয়াছেন। ইনিই সেই একনিষ্ঠ দেশ-সেবক, যাঁহাকে প্রায় ২৫ বৎসর পূর্বে যারবেদা জেলে বেত্রাঘাত করা হইয়াছিল।

ওয়াভেল পরিকল্পনার উদ্ভব না হইলে এই সমস্ত নেতৃবৃন্দের যে আরও কত অনির্দিষ্টকাল বন্দী জীবনযাপন করিতে হইত, তাহা ধারণার বহির্ভূত। যে শাসন-ব্যবস্থায় দেশের সর্বজনমান্য নেতৃগণকে **কারারুদ্ধ থাকিতে হয়, তাহার মূলে যে গলদ** রহিয়াছে, সে সম্বন্ধে কোন সন্দেহ নাই। এই সমস্ত কংগ্রেসসেবকগণের বিরুদ্ধে কোনরূপ অভিযোগ উপস্থিত করা হয় নাই, প্রকাশ্য আদালতে বিচারার্থ তাঁহাদিগকে উপস্থাপিত ও দণ্ডিত করা হয় নাই। রাজনৈতিক কারণে বিনা বিচারে যাঁহারা কারারুদ্ধ হইয়াছিলেন, তাঁহাদিগের মধ্যে কয়েকজনকে ইতিপূর্বে ভগ্নস্বাস্থ্যের কারণে এবং বর্তমানে ওয়াভেল প্রস্তাব আলোচনার জন্য কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির সদস্যগণকে মুক্তিদান করা হইয়াছে। এখনও শত শত রাজনৈতিক বন্দী কারা-প্রাচীরের অন্তরালে বন্দী জীবনযাপন করিতেছেন। ইঁহাদের সকলকেই মুক্তিদান করিলে বর্তমানে আরও অনুকূল আব-হাওয়ার সৃষ্টি হইত এবং দেশবাসীরও আনন্দের কারণ হইত। কিন্তু আমলা-তান্ত্রিক দৃষ্টিভঙ্গী সহজে পরিবর্তিত হইতে চাহে না। শ্রীনিবাস শাস্ত্রীর মত নরমপন্থী নেতাও বন্দিমুক্তি সম্পর্কে ব্রিটিশের এই কার্পণ্যদুষ্ট নীতিতে ক্ষুব্ধ হইয়াছেন। এই সপ্ততিপর প্রবীণ রাজ-নীতিক নেতা ওয়াভেল-প্রস্তাবের সমালোচনা প্রসঙ্গে বলিয়াছেন—"ভারতের সমস্ত রাজনীতিক বন্দীকে মুক্তিদান করিলে গভর্নমেণ্টের কিছু ঔদার্যের পরিচয় পাওয়া যাইত। গভর্নমেণ্ট কৃপণের ন্যায় অগ্রসর হইয়াছেন, ইহা দুঃখের বিষয়।"

নেতৃগণের মুক্তিতে বর্তমানে জাতীয় কংগ্রেসের যে নূতন অধ্যায়ের সূচনার সম্ভাবনা দেখা দিয়াছে তাহার পূর্ববর্তী অধ্যায়ের সূচনা হয় নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটি কর্তৃক আগষ্ট প্রস্তাব গ্রহণের ফলে। ৮ই আগস্ট "ভারত ত্যাগ কর" প্রস্তাব গ্রহণের পূর্বে ১৯৪২ সালের ২৬শে এপ্রিল তারিখের 'হরিজন' পত্রে মহাত্মা গান্ধী এক প্রবন্ধে এই প্রস্তাবের পূর্বাভাষ প্রদান করেন। তিনি এই প্রবন্ধে লেখেন যে, বৃটিশকে সিংগাপুর ত্যাগ করিতে হইয়াছিল, সেই-রূপ ভারতের অদৃষ্টে যাহাই ঘটুক না কেন, বৃটিশ যদি ভারত ত্যাগ করিয়া যায়, তবে জাপান হয়ত ভারত আক্রমণ করিবে না। "সুতরাং ভারতের পক্ষে ফলাফল যাহাই হোক না কেন, তাহার (ভারতের) নিরাপত্তা ও বৃটেনের নিরাপত্তা বৃটিশের যথাসময়ে শান্তভাবে ভারতবর্ষ ত্যাগ করিয়া যাওয়ার মধ্যে নিহিত।"

ইহার পাঁচ সপ্তাহ পরে ৩১শে মে (১৯৪২) তারিখের "হরিজন" পত্রে "বন্ধু-জনোচিত উপদেশ" (Friendly Advice)" শীর্ষক প্রবন্ধে এদেশের জনগণ যাহাতে জাপানের সম্পর্কে কোনরূপ অনুকূল মনোভাব পোষণ না করে, তৎসম্বন্ধে সতর্ক-বাণী উচ্চারণ করিয়া মহাত্মা গান্ধী লেখেন :—

"**বৃটিশ শক্তির হাত হইতে নিষ্কৃতি পাওয়ার জন্য জনগণ যেন কোনক্রমেই জাপানের দিকে ঝুঁকিয়া না পড়ে।** ব্যাধি অপেক্ষা তাহার এই প্রতিকার নিকৃষ্টতর। কিন্তু আমি পূর্বেই বলিয়াছি যে, আমাদের সবচেয়ে বড় রকমের যে ব্যাধি, যে ব্যাধি আমাদের মনুষ্যত্বের ভিত্তি নষ্ট করিয়াছে এবং আমাদিগকে একরূপ বিশ্বাস করিতে শিখাইয়াছে যে, আমরা চিরকাল ক্রীতদাসই থাকিব, সেই ব্যাধি হইতে আরোগ্য লাভ করিবার উদ্দেশ্যে এই সংগ্রামে আমাদিগকে সর্বপ্রকার বিপদ বরণ করিতে হইবে। ইহা দুঃসহ ব্যাপার। আমি জানি, আরোগ্যলাভের যে মূল্য, তাহা গুরুতর হইবে। মুক্তির জন্য যে মূল্যই দেওয়া হোক না কেন, তাহা অত্যধিক নহে।"

১৯৪২ সালের ১৪ই জুলাই কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি কর্তৃক যে প্রস্তাব গৃহীত হয়, তাহার মূল ভাব অক্ষুণ্ণ রাখিয়া, তাহার কোন কোন অংশের পরিবর্তন সাধন করিয়া এবং তাহাতে কোন কোন নূতন অংশ জুড়িয়া দিয়া, ৮ই আগষ্ট (১৯৪২) তারিখে নিঃ ভাঃ কংগ্রেস কমিটির সভায় তাহা গৃহীত হয়। এই প্রস্তাবের সংক্ষিপ্ত সার মর্ম হইতেছে এই :—

(১) নিঃ ভাঃ কংগ্রেস কমিটি ১৪ই জুলাই তারিখে ওয়ার্কিং কমিটি কর্তৃক গৃহীত প্রস্তাব বিশেষ-ভাবে বিবেচনা করিয়া দেখিয়াছেন এবং



সীমান্ত গান্ধী
আবদুল গফুর খাঁ



পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু



বাবু রাজেন্দ্রপ্রসাদ

লর্ড ওয়াভেলের বক্তৃতা অনুসারে সন্ধ
করিতে হইবে।"

লর্ড ওয়াভেল কেন্দ্রীয় পরিষদে বক্তৃতা দান করেন, তাহাতেও বৃটিশের চি

তাহা সমর্থন ও অনুমোদন করেন। পরবর্তী ঘটনাসমূহ ইহা পরিষ্কার করিয়া দিয়াছে যে, ভারতের জন্য এবং সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের সফলতার জন্য ভারতে বৃটিশ শাসনের অবিলম্বে অবসান বিশেষ প্রয়োজন।

(২) কমিটি ভীতি-বিহ্বলতার সঙ্গে রুশীয় এবং চীনা জনগণের অবস্থার অধোগতি লক্ষ্য করিয়াছেন এবং তাঁহাদের স্বাধীনতা রক্ষার্থ তাঁহাদের বীরত্বের প্রশংসা করেন। যাঁহারা স্বাধীনতার জন্য যুদ্ধ করেন এবং যাঁহারা পররাজ্যলোভীদের দ্বারা আক্রান্ত জাতির প্রতি সহানুভূতিশীল, এই ক্রমবর্ধমান বিপদে তাঁহাদের কর্তব্য, যে নীতি সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ এতাবৎ কাল অনুসরণ করিয়া আসিতেছেন এবং যে নীতির ফলে তাঁহাদের পুনঃ পুনঃ নিদারুণ ব্যর্থতা হইতেছে, তাহার পরীক্ষা করা। এই লক্ষ্য ও নীতি অনুসরণ করিলে বিফলতাকে সফলতায় রূপান্তরিত করা যাইবে না, কারণ অতীত অভিজ্ঞতা হইতে দেখা গিয়াছে, ব্যর্থতা এই নীতির মধ্যেই নিহিত। এই নীতির ভিত্তি অধীন ও ঔপনিবেশিক দেশসমূহের উপর প্রভুত্বে যতটা, তাহাদের স্বাধীনতায় ততটা নহে। সাম্রাজ্যের অধিকার শাসক শক্তির শক্তিবৃদ্ধি না করিয়া, তাহার ভার ও অভিশাপস্বরূপ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। আধুনিক সাম্রাজ্যবাদের প্রাচীন দেশ ভারতবর্ষ এই প্রশ্নে জটিলতার সৃষ্টি করিয়াছে। কারণ, ভারতের স্বাধীনতার দ্বারাই বৃটেন ও সম্মিলিত জাতিপুঞ্জকে বিচার করা যাইবে এবং এশিয়া ও আফ্রিকার জনগণ আশা ও উৎসাহে পূর্ণ হইবে। সুতরাং ভারতে বৃটিশ শাসনের অবসানই আশু ও অত্যাবশ্যক প্রশ্ন, যাহার উপর যুদ্ধের ভবিষ্যৎ স্বাধীনতা ও গণতন্ত্রের সফলতা নির্ভর করে। মুক্ত ভারত স্বাধীনতার যুদ্ধে ও নাৎসীবাদ, ফ্যাসীবাদ ও সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে তাহার প্রচুর উপকরণসম্ভার বিনিয়োগ করিয়া বিজয় সুনিশ্চিত করিবে। সুতরাং বর্তমান বিপদে ভারতের স্বাধীনতা ও বৃটিশ প্রভুত্বের অবসান আবশ্যক। ভবিষ্যৎ প্রতিশ্রুতি ও আশ্বাসে বর্তমান অবস্থার পরিবর্তন ও বিপদের অবসান হইতে পারে না। কেবল স্বাধীনতার দ্বারা লক্ষ লক্ষ ব্যক্তির উৎসাহের সঞ্চার এবং যুদ্ধের প্রকৃতির পরিবর্তন সাধন হইতে পারে।

(৩) সুতরাং নিঃ ভাঃ কংগ্রেস কমিটি ভারত হইতে বৃটিশ শক্তির অপসরণের দাবীর উপর আবার জোর দিতেছেন। ভারতের স্বাধীনতা ঘোষিত হইলে ভারতের সর্বপ্রকার প্রধান প্রধান দল ও উপদলের প্রতিনিধিস্থানীয় ব্যক্তিগণকে লইয়া একটি অস্থায়ী গভর্নমেণ্ট গঠিত হইবে। ইহার প্রাথমিক কর্তব্য হইবে সশস্ত্রবাহিনী ও ইহার পরিচালনাধীন অহিংসা শক্তির দ্বারা মিত্র শক্তির সহায়তায় ভারত রক্ষা করা এবং বহিরাক্রমণ প্রতিরোধ করা।

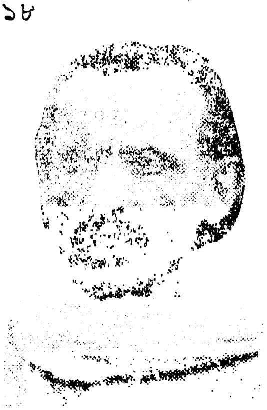
(৪) ভারতের স্বাধীনতা এশিয়ার অন্যান্য সকল জাতির স্বাধীনতার প্রতীক ও ভূমিকাস্বরূপ হইবে।

(৫) প্রাথমিক অবস্থায় ভারতের স্বাধীনতা ও ভারত রক্ষার সহিত নিঃ ভাঃ কংগ্রেস কমিটি সংশ্লিষ্ট হইলেও এই কমিটির মতে বিশ্বের শান্তি, নিরাপত্তা ও বিশ্বের সুশৃঙ্খল উন্নতি বিধানের জন্য একটি বিশ্ব সঙ্ঘ (World Federation) গঠন আবশ্যক। তাহা হইলে নিরস্ত্রীকরণ সম্ভব হইবে এবং কোন জাতির সৈন্যদল, নৌ ও বিমানবাহিনীর প্রয়োজন হইবে না। বিশ্ব সঙ্ঘ বিশ্বের



"স্বাধীনতার জন্য চেষ্টা করা ভগবানেরই সেবা করা। দাসত্ব মানবের মর্যাদার পক্ষে হানিকর।"

—মহাত্মা গান্ধী



আচার্য কৃপালনী

শান্তি রক্ষা করিবে ও পররাজ্য আক্রমণ রোধ করিবে।

(৬) স্বাধীন ভারত এই বিশ্ব সঙ্ঘের সহিত সানন্দে যোগদান করিবে। যে সমস্ত জাতি এই সঙ্ঘের মূল নীতিগুলি মানিয়া লইবেন, তাঁহারাই ইহাতে যোগদান করিতে পারিবেন।

(৭) বৃটিশ গভর্নমেন্টের প্রতিক্রিয়া ও বিদেশীয় সংবাদপত্রসমূহের ভ্রান্ত সমালোচনায় ভারতের স্বাধীনতা বাধাপ্রাপ্ত হইয়াছে। এই সমস্ত সমালোচনা হইতে ভারত সম্পর্কে তাঁহাদের অজ্ঞতাই সূচিত হয়।

(৮) বৃটেন ও সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের নিকট ওয়ার্কিং কমিটির ঐকান্তিক আবেদনে এ পর্যন্ত কোন সাড়া পাওয়া যায় নাই। নিঃ ভাঃ কংগ্রেস কমিটি বিশ্বের স্বাধীনতার দিক হইতে বৃটেন ও সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের নিকট আবার এই আবেদন উপস্থাপিত করিতেছেন। কিন্তু কমিটি মনে করেন, সাম্রাজ্যবাদী ও প্রভুত্বশালী গভর্নমেন্টের বিরুদ্ধে এই জাতির ইচ্ছা দৃঢ়বদ্ধ করার প্রচেষ্টায় বাধা প্রদান আর যুক্তিসহ নহে। সুতরাং ভারতের মুক্তি ও স্বাধীনতার অপরিত্যাজ্য দাবীর যাথার্থ্য প্রতিপাদনের জন্য কমিটি যথাসম্ভব বিস্তৃতভাবে **অহিংস উপায়ে** একটি জন-সংগ্রাম আরম্ভ করার সিদ্ধান্ত করিতেছেন। এই সংগ্রাম অবধারিতভাবে গান্ধীজীর নেতৃত্বে পরিচালিত হইবে এবং কমিটি তাঁহাকে নেতৃত্ব গ্রহণ করিতে এবং যেরূপভাবে জাতিকে পরিচালনা করা আবশ্যক, তাহা করিতে তাঁহাকে অনুরোধ করিতেছেন।

(৯) কমিটি ভারতীয় জনগণকে তাহাদের ভাগ্যে যে বিপদ ও দুঃখই আপতিত হোক না কেন সাহস ও ধৈর্যের সহিত তাহার সম্মুখীন হইতে এবং গান্ধীজীর নেতৃত্বে স্বাধীনতা সংগ্রামের সুশৃঙ্খল সৈনিকের মত তাঁহার উপদেশ পালন করিতে আবেদন জানাইতেছেন। **তাঁহাদের অবশ্যই স্মরণ রাখিতে হইবে যে, অহিংসা এই আন্দোলনের ভিত্তি।** এমন সময় আসিতে পারে, যখন কোনরূপ উপদেশ প্রদান, কিংবা জনগণের নিকট তাহা পৌঁছা সম্ভবপর হইবে না। যদি এইরূপ ঘটে, তবে প্রত্যেক নরনারী, যে এই আন্দোলনে অংশ গ্রহণ করিবে, প্রদত্ত সাধারণ উপদেশ অনুসারে কাজ করিয়া যাইবে।

(১০) নিঃ ভাঃ কংগ্রেস কমিটি ইহা সুস্পষ্টরূপে জানাইতে ইচ্ছা করেন যে, জন-সংগ্রাম আরম্ভ করার উদ্দেশ্য কংগ্রেসের ক্ষমতা লাভের জন্য নহে। ক্ষমতা যখন আসিবে, তখন তাহার মালিক হইবে সমগ্র ভারতীয় জনগণ।"

৮ই আগস্ট (১৯৪২) এই প্রস্তাব ওয়ার্কিং কমিটিতে গৃহীত হয় এবং তাহার পরদিনই কংগ্রেসের নেতৃবৃন্দ কারারুদ্ধ হ'ন। নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটি ও প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটিসমূহ বেআইনী বলিয়া ঘোষিত হয়।

নেতৃবৃন্দের এই অকস্মাৎ কারাবরোধে এক প্রান্ত হইতে অন্য প্রান্ত পর্যন্ত সমগ্র ভারত বিক্ষুব্ধ হইয়া উঠে এবং ইহার প্রতিবাদ করে। এই প্রতিবাদ ও বিক্ষোভের বিরুদ্ধে প্রযুক্ত সরকারী দমননীতির আতিশয্যে ভারতের স্থানে স্থানে জনতা বিক্ষুব্ধ ও বিদ্রোহী হইয়া উঠে এবং রেল লাইন উৎপাটন, স্টেশনসমূহের ক্ষতি সাধন, সংবাদ চলাচল ও যোগাযোগরক্ষা ব্যবস্থার ব্যাঘাত ও নানা হাঙ্গামার সূত্রপাত হয়। এই অশান্ত অবস্থা আয়ত্তের মধ্যে আনয়ন করতে গভর্নমেণ্ট প্রচণ্ডতর দমননীতি প্রয়োগ করেন। স্থানে স্থানে গুলীচালনা করা হয়। যে সমস্ত স্থানে হাঙ্গামা ঘটিয়াছিল, তথাকার অধিবাসীদের নিকট হইতে ব্যাপকভাবে পাইকারী জরিমানা আদায় করা হয়। এই দমননীতির ফলে নানা স্থানে জনগণকে বহু ক্ষয়-

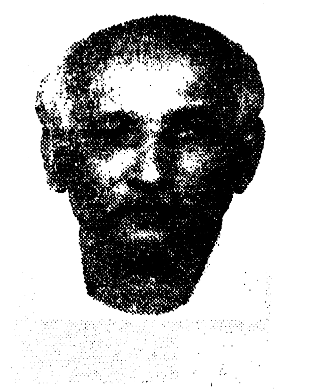


সর্দার বল্লভভাই প্যাটেল

ক্ষতি ও নিপীড়ন সহ্য করিতে হয় এবং জনগণের অনেকে মৃত্যুমুখে পতিত হয়।

মুক্তিলাভের পর এলাহাবাদের এক জনসভায় বক্তৃতা প্রসঙ্গে পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু আগস্ট হাঙ্গামায় জনগণের মধ্যে যাহারা মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছে ও যাহারা অশেষ নির্যাতন ও ক্ষয়ক্ষতি সহ্য করিয়াছে, তাহাদের উদ্দেশ্যে শ্রদ্ধা নিবেদন করিয়া বলেনঃ—

"......আমার দেশবাসী ঠিক পথেই চলিয়া থাক বা ভুল পথেই চলিয়া থাক, যে সকল মৃত্যুশঙ্কাহীন শহীদ দেশের স্বাধীনতার জন্য মৃত্যুকে বরণ করিয়াছেন, আমি তাঁহাদের নিকট আমার মাথা নত করিতেছি।... বালিয়া, আজমগড়, গোরক্ষপুর প্রভৃতি



পট্টভি সীতারামিয়া

জেলার অধিবাসিগণের মহৎ আত্মত্যাগ ও দুঃখকষ্ট বরণের কথা আমি শুনিয়াছি, আমি তাঁহাদের আন্তরিক সম্বর্ধনা জানাইতেছি।"

নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির "ভারত ত্যাগ কর" প্রস্তাবে সম্পূর্ণ অহিংস উপায়ে সংগ্রাম পরিচালনার কথা একাধিকবার উল্লিখিত হইয়াছে। কিন্তু বিলাতের কোন কোন সংবাদপত্র ও ভারত গভর্নমেণ্ট কর্তৃক প্রকাশিত ও মিঃ টটেনহাম লিখিত "১৯৪২-৪৩ সালের হাঙ্গামার জন্য কংগ্রেসের দায়িত্ব" ("Congress responsibility for the disturbonees 1942-43") পুস্তকে উত্তেজিত, বিদ্রোহী জনতা কর্তৃক অনুষ্ঠিত স্বতঃস্ফূর্ত আগস্ট হাঙ্গামার জন্য কংগ্রেসকে দায়ী করা হয়।

গভর্নমেণ্ট কর্তৃক কংগ্রেসের উপর এই দোষারোপ ও অভিযোগের যথাযোগ্য উত্তর মহাত্মা গান্ধী তৎকর্তৃক বড়লাটের নিকট লিখিত পত্রাবলীতে প্রদান করেন। মহাত্মা গান্ধী ও অন্যান্য কংগ্রেস নেতৃবৃন্দ কারারুদ্ধ হওয়ার পর, মহাদেব দেশাই, কস্তুরবা গান্ধী ও বেগম আজাদের মৃত্যু এবং মহাত্মা গান্ধীর ২১ দিনব্যাপী উপবাস ভিন্ন আরও যে সমস্ত ঘটনা ঘটে, তাহার মধ্যে বাঙলা ও উড়িষ্যা প্রদেশের দুর্ভিক্ষ বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। বিশেষভাবে বাঙলার দুর্ভিক্ষ শাসকশক্তির অবিমৃষ্যকারিতা ও অযোগ্যতায় যেরূপ শোচনীয় আকার ধারণ করিয়াছিল, তাহাতে ও চোরাবাজারী দুর্নীতির ফলে বাঙলার সামাজিক জীবন বিপর্যস্ত হইয়া গিয়াছে।

ভারতের অভ্যন্তরভাগে, বিশেষত বাঙলার যখন দুর্ভিক্ষ, অনশন, মহামারী ও মৃত্যুর বীভৎস দৃশ্য ও ভারতের পূর্ব প্রান্তে

(১) নিঃ ভাঃ কংগ্রেস কমিটি ১৪ই জুলাই তারিখে ওয়ার্কিং কমিটি কর্তৃক গৃহীত প্রস্তাব বিশেষভাবে বিবেচনা করিয়া দেখিয়াছেন এবং



ভুলাভাই দেশাই

সমাধানের জন্য যুদ্ধ শেষ হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করিবার প্রয়োজন নাই। ইহাতে কতক সংখ্যক লোকের মধ্যে এইরূপ ধারণার সৃষ্টি হয় যে, তিনি হয়ত শীঘ্রই ভারতের রাজনীতি সমস্যা সমাধানকল্পে উদ্যোগী হইবেন।

কিন্তু ভারত সম্পর্কে তাঁহার আশাব্যঞ্জক কোন নীতির পরিচয় না পাইয়া সকলেই হতাশ হয়।। এমন কি "ইকোনমিস্ট"এর মত বৃটিশ পত্রিকায় লর্ড ওয়াভেলকে, তাঁহার নীতিকে এরূপভাবে রূপদান করিতে বলা হয়, যাহাতে তিনি ভারতের বৃটিশ মনোনীত শেষ বড় লাট হইতে পারেন।

কিন্তু তাঁহার অনুসৃত নীতি হইতে প্রথমত কোন আশার লক্ষণ দেখা যায় নাই। পরন্তু কংগ্রেস সম্পর্কে তাঁহার মনোভাবের যে পরিচয় পাওয়া গিয়াছিল, তাহাতে নৈরাশ্যের ও বিরূপ মনোভাবের সঞ্চারই হয়। মহাত্মা গান্ধী ও অন্যান্য কংগ্রেস নেতৃবৃন্দ তখন কারারুদ্ধ। কস্তুরবা গান্ধী গুরুতররূপে পীড়িত হইয়া পড়িলেন। দেশবাসীর পক্ষ হইতে বহু আবেদন নিবেদন সত্ত্বেও গভর্নমেণ্ট অটল রহিলেন। কারারুদ্ধ অবস্থায় কস্তুরবার মৃত্যু হইল। দেশবাসী এই শোচনীয় ঘটনায় মর্মাহত হইল।

পাঞ্জাব আইনসভার কংগ্রেসী সভ্যগণের উপর আইনসভার কোন অধিবেশনে যাহাতে তাঁহারা যোগদান করিতে না পারেন, তজ্জন্য নিষেধাজ্ঞা জারী করা হইল। এই নিষেধাজ্ঞা সম্পর্কে পাঞ্জাবের প্রধান মন্ত্রী বলিলেন ঃ—

"If they want to come, it is for the organisation to which they belong to make their decision in the light of Lord Wavell's speech."

অর্থাৎ "যদি তাঁহারা আসিতে চান, তবে তাঁহারা যে প্রতিষ্ঠানের অন্তর্ভুক্ত, তাহাকেই লর্ড ওয়াভেলের বক্তৃতা অনুসারে সিদ্ধান্ত করিতে হইবে।"

লর্ড ওয়াভেল কেন্দ্রীয় পরিষদে যে বক্তৃতা দান করেন, তাহাতেও বৃটিশের চিরাচরিত আশ্বাস প্রতিশ্রুতি ও সাম্প্রদায়িক সমস্যার সুরই প্রতিধ্বনিত হইল। তিনি বলিলেন ঃ—

"We are bound in justice to hand over India to Indian Rule, which can maintain the peace and order and progress which we have endeavoured to establish. I believe that we should take some step to further this: but until the two main parties at least can come to terms, I do not see any immediate hope of progress. For the present the government of the country must continue to be a joint British and Indian affair."

অর্থাৎ "যে শান্তি, শৃঙ্খলা ও প্রগতির প্রতিষ্ঠা করিতে আমরা চেষ্টা করিয়াছি, তাহা বজায় রাখিতে সক্ষম এরূপ ভারতীয় শাসনতন্ত্রে আমরা ভারতকে অর্পণ করিতে ন্যায়ানুসারে বাধ্য। আমি বিশ্বাস করি, ইহাকে অগ্রসর করিবার জন্য আমাদের কিছু করা কর্তব্য; কিন্তু যে পর্যন্ত না প্রধান দুই দল কোন মীমাংসায় উপনীত না হয়, সে পর্যন্ত আমি অগ্রগতির কোন আশু আশা দেখি না। বর্তমানের মত এদেশের শাসন ব্যবস্থা যুক্ত বৃটিশ ও ভারতীয় ব্যাপার হিসাবেই চলিতে থাকিবে।"

১৯৪৩ সালের ২০শে ডিসেম্বর তারিখের "এসোসিয়েটেড চেম্বার্স অব্ কমার্স"এর সভায় লর্ড ওয়াভেল তাঁহার বক্তৃতায় সাম্প্রদায়িক সমস্যা যে মীমাংসার অযোগ্য নয়, তাহা স্বীকার করেন। তিনি বলেন ঃ—



সরোজিনী নাইডু

"......অস্ত্রোপচার না করিলেই নয়, ভারতের এমন অবস্থা দাঁড়াইয়াছে, আমি একথা বিশ্বাস করি না। আমি প্রথমে অন্যান্য উপায়ে চেষ্টা করিতাম। কিন্তু 'ভারত ত্যাগ কর' এই ধ্বনি তুলিয়া অথবা সত্যাগ্রহের পথ অবলম্বন করিয়াও যে আপনাদের কোন কল্যাণ হইয়াছে, আমি তাহা মনে করি না। আমি বিশ্বাস করি না যে, ভারত ও বৃটেনের মধ্যে এখন নীতিগত কোন পার্থক্য আছে এবং সাম্প্রদায়িক সমস্যা-সমাধান কঠিন হইলেও, উহা একেবারেই সমাধানের অতীত। সাধারণত বলা হইয়া থাকে যে, বর্তমান ও যুদ্ধোত্তর সমস্যা সমাধান একমাত্র জাতীয় গভর্নমেণ্টই করিতে পারে। যদি ধরিয়া লওয়া যায় যে, যুদ্ধকালেই সর্বদল সম্মত গভর্নমেন্ট গঠন সম্ভব, তাহা হইলেও একথা থাকিয়া যায় যে, এই গভর্নমেন্টকে বর্তমান শাসনতন্ত্রের গণ্ডীতেই কাজ করিতে হইবে। যুদ্ধকালে শাসনতন্ত্রের উল্লেখযোগ্য কোন



রাজাগোপালাচারী

পরিবর্তন সাধনই সম্ভবপর নয়। এই গভর্নমেণ্টের প্রথম কর্তব্য হইবে যুদ্ধ প্রচেষ্টা সমর্থন করা,—শুধু মুখে নয়, বিশ্বস্তরূপে, সর্বান্তঃকরণে কাজের মধ্য দিয়া করিতে হইবে।"

লর্ড ওয়াভেলের এই বক্তৃতার মধ্যে বর্তমান "ওয়াভেল প্রস্তাবে"র কিঞ্চিৎ ইঙ্গিত রহিয়াছে, কিন্তু তখনও তাহা অত্যন্ত অস্পষ্ট এবং হয়ত সম্পূর্ণরূপে দানা বাঁধিয়া উঠে নাই।

১৯৪৪ সালের ৯ই মে মহাত্মা গান্ধী মুক্তি লাভ করেন। জুলাই মাসে, তিনি কোন সাংবাদিকের নিকট সাতটি দফায় বিভক্ত একটি প্রস্তাব বিবৃত করেন এবং তাহা সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়। কিন্তু তাহাতে গভর্নমেণ্টের নিকট হইতে কোন সাড়া পাওয়া যায় না। অতঃপর ভারতের স্বাধীনতার জন্য যুক্ত দাবী উত্থাপনকল্পে, হিন্দু-মুসলমান সমস্যা সম্পর্কে আপোষ-রফায় পৌঁছিবার উদ্দেশ্যে গান্ধী-জিন্না আলোচনার সূত্রপাত হয়। কিন্তু মিঃ জিন্নার পাকিস্থানী ও 'দুই নেশন' নীতির ফলে গান্ধী-জিন্না আলোচনা ব্যর্থ হয়। অচল অবস্থা, দেশব্যাপী অশেষ দুর্গতি ও চোরা-বাজারী দুর্নীতির জন্য দেশে অপরিসীম নৈরাশ্যের ভাব দেখা দেয়। অবশেষে কেন্দ্রীয় ব্যবস্থা পরিষদে কংগ্রেসী দলের নেতা শ্রীযুক্ত ভুলাভাই দেশাই ও মুসলিম লীগের সহকারী নেতা নবাবজাদা লিয়াকৎ আলীর মধ্যে ব্যক্তিগতভাবে আপোষ আলোচনার সূত্রপাত হয়। এই আলোচনার ফলে কেন্দ্রীয় ব্যবস্থা পরিষদে, কংগ্রেস ও মুসলিম লীগ দলের মধ্যে একটা সাময়িক চুক্তির খসড়া হয়।

সংবাদপত্রে এই আলোচনা সম্পর্কে নানারূপ জল্পনাকল্পনা সময়ে সময়ে প্রকাশিত হইলেও, জনসাধারণের কাছে ইহার কথা বহুদিন পর্যন্ত গোপন রাখা হইয়াছিল।

প্রধানত এই দেশাই-লিয়াকৎ প্রস্তাবের উপর ভিত্তি করিয়া "ওয়াভেল প্রস্তাব" রচিত হইয়াছে বলিয়া প্রকাশ। ইণ্ডিয়া অফিস হইতে এতৎসম্পর্কে প্রকাশিত

হোয়াইট পেপারেও হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে সমানসংখ্যক আসন বণ্টনের কথা ঘোষণা করা হইয়াছে।

গত ২১শে মার্চ বৃটিশ গভর্নমেণ্ট কর্তৃক আহ্বানের ফলে লর্ড ওয়াভেল বিলাত যাত্রা করেন। তাঁহার বিলাত গমনের ব্যাপার লইয়া বিলাতে ও এদেশে নানা জল্পনাকল্পনার সূত্রপাত হয়। গত ১৪ই জুন তিনি বিলাত হইতে প্রত্যাগমন করেন এবং কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির সদস্যগণকে মুক্তিদান করিবার আদেশ দান করেন।

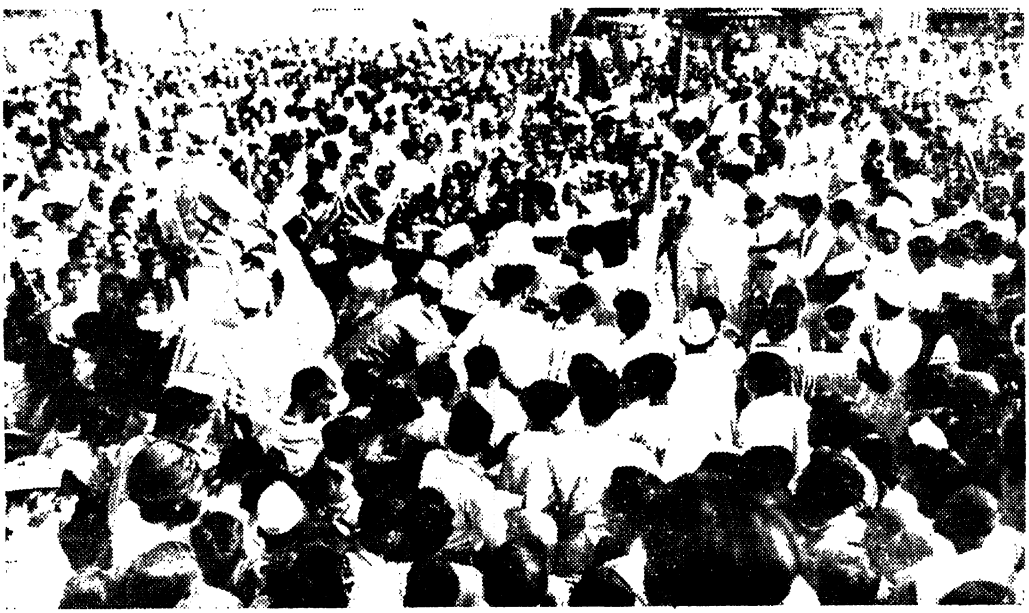
তিনি মহাত্মা গান্ধী, মিঃ জিন্না, ভূতপূর্ব কংগ্রেসী মন্ত্রিগণ, ৯৩ ধারা আমলের পূর্বের মন্ত্রিগণ প্রভৃতিকে ২৫শে জুন সিমলায় তাঁহার প্রস্তাব আলোচনার্থ এক সম্মেলনে নিমন্ত্রণ করেন। প্রথমত কংগ্রেস রাষ্ট্রপতি আবুল কালাম আজাদকে নিমন্ত্রণ না করায় নিয়মতান্ত্রিকতার দিক দিয়া এই সম্মেলনে যোগদানে কংগ্রেসের পক্ষে অন্তরায় উপস্থিত হয়, পরে মহাত্মা গান্ধীর পরামর্শে রাষ্ট্রপতি আজাদকে নিমন্ত্রণ করায় এই অন্তরায় দূরীভূত হয়। লর্ড ওয়াভেল তাঁহার বেতার বক্তৃতায় বর্ণহিন্দু ও মুসলমানগণের আসনের সমসংখ্যার কথা ঘোষণায় মহাত্মাজী আপত্তি জ্ঞাপন করেন। কারণ কংগ্রেস কেবল বর্ণহিন্দুর নহে, তাহা সর্বধর্মের ও সর্বজাতির মিলন-ক্ষেত্র।

সিমলায় বিভিন্ন দল ও উপদলের নেতৃবৃন্দ সমবেত হইয়াছেন। কেবল ভারত নয়, সমগ্র জগৎ এই সম্মেলনের ফলাফলের দিকে উৎসুক নেত্রে তাকাইয়া আছে। মহাত্মা গান্ধী, পণ্ডিত জওহরলাল ও অন্যান্য কংগ্রেস নেতৃবৃন্দ বাস্তবতার দিক হইতেই এই প্রস্তাবকে দেখিয়াছেন এবং এই প্রস্তাব যে আলোচনার যোগ্য তাহা তাঁহাদের সম্মেলনে যোগদানের সম্মতিতেই প্রমাণিত হইয়াছে। শ্রীযুক্ত ভুলাভাই দেশাই ওয়াভেল প্রস্তাব যে দেশাই-লিয়াকৎ প্রস্তাব অপেক্ষা অনেকাংশে শ্রেয়স্কর, এইরূপ অভিমত প্রদান করিয়াছেন।

সিমলা সম্মেলনের ফলাফল কি হইবে, তৎসম্বন্ধে এখনও কোন নিশ্চয়তা নাই। তবে জাতীয় নেতৃবৃন্দ যে সিদ্ধান্ত করিবেন, তাহা তাঁহারা দেশের বৃহত্তর কল্যাণের মুখ চাহিয়াই করিবেন।

এলাহাবাদের জনসভায় পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু বলিয়াছেন :—"ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের এক অধ্যায় সমাপ্ত হইয়াছে এবং আমাদের মুক্তিতে আজ নূতন অধ্যায়ের সূচনা হইয়াছে। কিন্তু আরও অনেক লিখিবার বাকি আছে। আমরা স্বাধীনতা অর্জনে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ। এই উদ্দেশ্য সিদ্ধ না হওয়া পর্যন্ত আমরা সংগ্রাম করিব।"

ভারতের ভবিতব্য স্বাধীনতা সংগ্রামের এই নূতন অধ্যায়ের জন্য মৌন প্রতীক্ষায় রহিয়াছে।



লক্ষ্ণৌতে পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু বিরাট জনসমাবেশে বক্তৃতা করিতেছেন।

আমরা ভারতবাসীরা অতীতে বিশেষভাবে গত তিন বৎসরে অশেষ দুঃখকষ্ট ভোগ করিয়াছি। এগুলি বিস্মৃত হওয়া আমাদের পক্ষে কিছুতেই সম্ভব হইবে না। কিন্তু তাই বলিয়া আমরা যেন আবেগের বশে অধীর হইয়া না পড়ি এবং ভবিষ্যতে নীতি নির্ধারণ ক্ষেত্রে সেজন্য আমাদের দৃষ্টি মেঘাচ্ছন্ন হইয়া না পড়ে। গত ৮ই আগস্টের সেই ঐতিহাসিক দিনে মহাত্মা গান্ধী একটি কথা বলিয়াছিলেন, আজ সেই কথাটি আমার মনে পড়িতেছে। তিনি বলিয়াছিলেন—জগতের চক্ষু আরক্ত হইলেও আমরা ধৈর্য হারাইব না এবং আমাদের দৃষ্টি স্বচ্ছ রাখিব।

—পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু

ভারতের শাসনতান্ত্রিক পরিবর্ত্তনের প্রস্তাব



স্যার স্ট্যাফোর্ট ক্রীপস্

২৯শে মার্চ ১৯৪২, স্যার স্টাফোর্ড ক্রীপস ভারতের শাসন সংস্কার সম্পর্কে বৃটিশ গভর্ণমেণ্টের নিম্নলিখিত প্রস্তাব ঘোষণা করেনঃ—

(ক) যুদ্ধাবসানের অব্যবহিত পরেই ভারতের জন্য একটি নূতন শাসনতন্ত্র রচনার দায়িত্বভার অর্পণ করিয়া ভারতে একটি নির্বাচিত প্রতিষ্ঠান গঠন করা হইবে। কিভাবে ইহা গঠিত হইবে, তাহা পরে বিবৃত করা হইবে।

(খ) শাসনতন্ত্র রচনাকারী প্রতিষ্ঠানে যোগদানের জন্য দেশীয় রাজ্যগুলির অংশ গ্রহণের নিম্নলিখিতরূপ ব্যবস্থা করা হইবে।

(গ) বৃটিশ গভর্ণমেণ্ট এইরূপভাবে রচিত শাসনতন্ত্র নিম্নলিখিত সর্তে অবিলম্বে গ্রহণ করিতে ও কার্যে প্রযুক্ত করিতে প্রস্তুত আছেনঃ

(১) বৃটিশ ভারতের কোনও প্রদেশ নূতন শাসনতন্ত্র গ্রহণ করিতে সম্মত না হইলে তাহাকে বর্তমান শাসনতন্ত্র বজায় রাখিতে দেওয়া হইবে। পরবর্তীকালে ঐ প্রদেশ যদি ইহাতে যোগদানে ইচ্ছুক হয়, তবে তাহারও ব্যবস্থা থাকিবে।

যে-সব প্রদেশ যুক্তরাষ্ট্রে যোগদানে রাজী হইবে না, তাহারা ইচ্ছা করিলে বৃটিশ গভর্ণমেণ্ট উহাদের জন্য "ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের" অনুরূপ পূর্ণ মর্যাদাসম্পন্ন অন্য একটি নূতন শাসনতন্ত্র রচনা করিতে প্রস্তুত থাকিবেন। উহাও নিম্নলিখিতভাবে প্রণীত হইবে।

(২) বৃটিশ গভর্ণমেণ্ট ও শাসনতন্ত্র রচনাকারী প্রতিষ্ঠানগুলির মধ্যে আলোচনামূলে প্রস্তুত একটি সন্ধিপত্র স্বাক্ষরিত হইবে। এই সন্ধিতে দায়িত্ব বৃটিশের নিকট হইতে ভারতীয়দের নিকট সম্পূর্ণ হস্তান্তরিত হওয়ার ফলে উদ্ভূত সমস্ত সমস্যার সমাধান থাকিবে। বৃটিশ গভর্ণমেণ্ট জাতি ও ধর্মবিষয়ে সংখ্যালঘিষ্ঠদের রক্ষার জন্য যে সমস্ত প্রতিশ্রুতি দিয়াছেন, তদনুযায়ী এই সন্ধিতে বিধান থাকিবে. কিন্তু এই সন্ধি বৃটিশ কমনওয়েলথের অন্যান্য সদস্য রাষ্ট্রের সহিত ভারতীয় ইউনিয়নের সম্পর্ক নির্দ্ধারণের ক্ষমতার উপর কোন বিধি-নিষেধ আরোপ করিবে না।

কোনও দেশীয় রাজ্য এই শাসনতন্ত্রে যোগ দিতে ইচ্ছা করুক বা না করুক, নূতন অবস্থায় প্রয়োজন বুঝিয়া ইঁহাদের সন্ধি সর্তগুলির পরিবর্তনের নিমিত্ত আবশ্যক আলোচনা চালানো হইবে।

(ঘ) প্রধান প্রধান ভারতীয় সম্প্রদায়ের নেতৃবৃন্দ যুদ্ধ পরিসমাপ্তির পূর্বে নিজেদের মধ্যে, অন্য কোনরূপ ব্যবস্থায় সম্মত না হইলে শাসনতন্ত্র রচনাকারী প্রতিষ্ঠান নিম্নলিখিতরূপে গঠিত হইবেঃ—

যুদ্ধ সমাপ্তির অব্যবহিত পরে প্রাদেশিক আইন সভাগুলির নির্বাচনের ফল প্রকাশ হইবার সঙ্গে সঙ্গে প্রাদেশিক নিম্ন পরিষদসমূহের যাবতীয় সদস্য একটি নির্বাচকমণ্ডলীরূপে সংখ্যানুপাতে শাসনতন্ত্র রচনাকারী প্রতিষ্ঠানে প্রতিনিধি নির্বাচন করিবেন। নির্বাচকমণ্ডলীর আনুমানিক এক-দশমাংশ সদস্য লইয়া এই নূতন প্রতিষ্ঠান গঠিত হইবে।

বৃটিশ ভারতের জন-সংখ্যায় যে অনুপাত অনুসারে বৃটিশ ভারতের প্রতিনিধি থাকিবেন, সেই অনুপাতে প্রতিনিধি নিযুক্ত করিতে দেশীয় রাজ্যসমূহকেও আহ্বান করা হইবে এবং বৃটিশ ভারতের সদস্যগণের যে অধিকার থাকিবে, দেশীয় রাজ্যের প্রতিনিধিদেরও সেই অধিকার থাকিবে।

(ঙ) বর্তমানে ভারতবর্ষের যে সংকটকাল দেখা যাইতেছে, যতদিন তাহা দূরীভূত না হয় এবং যতদিন নূতন শাসনতন্ত্র রচনা করা সম্ভব না হয়, ততদিন নিশ্চয়ই বৃটিশ গভর্ণমেণ্ট ভারত রক্ষার দায়িত্ব বহন করিবেন এবং জগদ্ব্যাপী মহাসংগ্রাম প্রচেষ্টার অংশ স্বরূপ তাহা নিয়ন্ত্রণ ও পরিচালনা করিবেন। কিন্তু ভারতবর্ষের সামরিক, নৈতিক ও উপকরণগত যে-সকল সুযোগ সুবিধা রহিয়াছে, উহা পুরাপুরি সংগঠন করিবার দায়িত্ব থাকিবে ভারত গভর্ণমেণ্টের এবং ভারত গভর্ণমেণ্ট এতদর্থে ভারতবাসীদের সহযোগিতা গ্রহণ করিবেন। বৃটিশ গভর্ণমেণ্ট ভারতবর্ষের বৃটিশ কমনওয়েলথের ও সম্মিলিত রাজ্যসমূহের



লর্ড ওয়াভেল

পরামর্শে ভারতবর্ষের প্রধান প্রধান দল-সমূহের নেতৃবর্গের ত্বরিত ও সক্রিয় যোগদান কামনা করেন ও তাহা আহবান করিতেছেন। যে কার্যটি ভারতবর্ষের ভবিষ্যৎ স্বাধীনতার মতই গুরুত্বপূর্ণ ও অপরিহার্য, এইভাবে তাঁহারা সেই কার্য সম্পাদনে কার্যত এবং গঠনমূলকভাবে সাহায্য করিতে পারিবেন।"

ওয়াভেল প্রস্তাব

ভারতবর্ষের বর্তমান রাজনৈতিক অচল অবস্থার অবসান ঘটাইবার উদ্দেশ্যে ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্ট যে প্রস্তাব করিয়াছেন তৎ-সম্পর্কে বড়লাট লর্ড ওয়াভেল ১৪ই জুন বেতারে নিম্নলিখিত বক্তৃতা করিয়াছেন—

ভারতবর্ষের রাজনৈতিক অচল অবস্থার অবসানকল্পে এবং ভারতবর্ষকে পূর্ণ স্বায়ত্তশাসনের লক্ষ্যস্থলে পৌঁছাইয়া দিবার উদ্দেশ্যে বৃটিশ গভর্ণমেণ্ট যে প্রস্তাব করিয়াছেন, ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্ট আমাকে ভারতীয় রাজনৈতিক নেতৃবর্গের সমক্ষে সেই প্রস্তাব উপস্থাপিত করিবার ক্ষমতা অর্পণ করিয়াছেন। বর্তমান মুহূর্তে ভারত সচিব পার্লামেণ্টে এই প্রস্তাবের ব্যাখ্যা করিতেছেন। এই প্রস্তাব ইহার অন্তর্নিহিত অর্থ এবং কিভাবে আমি এই প্রস্তাব কার্যে পরিণত করিতে চাই তাহা আপনাদিগকে বুঝাইয়া বলার উদ্দেশ্যেই আমি এই বেতার বক্তৃতা করিতেছি।

ইহা একটি গঠনতান্ত্রিক ব্যবস্থা চাপাইয়া দিবার চেষ্টা নহে। বৃটিশ গভর্ণমেণ্ট আশা করিয়াছিলেন যে, ভারতবর্ষের বিভিন্ন দলের নেতৃবর্গ নিজেদের মধ্যে সাম্প্রদায়িক সমস্যার (এই সাম্প্রদায়িক সমস্যাই প্রধান বাধা) একটি সমাধান করিতে পারিবেন; কিন্তু এই আশা সফল হয় নাই।

ইত্যবসরে ভারতবর্ষকে বড় বড় সুযোগের সদ্ব্যবহার করিতে এবং বড় বড় সমস্যার সমাধান করিতে হইবে। এইজন্য সমস্ত দলের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিবর্গের সম্মিলিত প্রচেষ্টার প্রয়োজন আছে।

নূতন শাসন পরিষদ গঠনের প্রস্তাব

এইজন্য বৃটিশ গভর্নমেণ্টের পূর্ণ সমর্থনক্রমে সঙ্ঘবদ্ধ রাজনৈতিক অভিমতের অধিকতর প্রতিনিধিস্থানীয় একটি নূতন শাসন পরিষদ গঠনের উদ্দেশ্যে আমার সহিত পরামর্শ করিবার জন্য আমি কেন্দ্রীয় এবং প্রাদেশিক রাজনীতি ক্ষেত্রের নেতৃবর্গকে আহ্বান করিবার প্রস্তাব করিতেছি। প্রস্তাবিত নূতন শাসন পরিষদে প্রধান প্রধান সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিগণ থাকিবেন এবং এই পরিষদে বর্ণহিন্দু ও মুসলমান সদস্যদের সংখ্যা সমান সমান হইবে। যদি এই নূতন শাসন পরিষদ গঠিত হয় তাহা বর্তমান গঠনতন্ত্রের গণ্ডির ভিতরে থাকিয়াই ইহা কাজ চালাইবে। বড়লাট এবং প্রধান সেনাপতি বাদে (প্রধান সেনাপতি সমর বিভাগের ভারপ্রাপ্ত সদস্য হিসাবে থাকিবেন) এই নূতন শাসন পরিষদের আর সমস্ত সদস্যই ভারতীয় হইবেন। আরও প্রস্তাব করা হইয়াছে যে, বৈদেশিক বিভাগের ভারও শাসন পরিষদের একজন ভারতীয় সদস্যের হস্তে অর্পিত হইবে। এতদিন বড়লাট এই বিভাগের ভারপ্রাপ্ত ছিলেন।

বৃটিশ গভর্নমেণ্ট আরও প্রস্তাব করিয়াছেন যে, ডোমিনিয়নসমূহের ন্যায় ভারতবর্ষেও একজন বৃটিশ হাই কমিশনার থাকিবেন। তিনি ভারতে গ্রেট বৃটেনের বাণিজ্যিক এবং এইরূপ অন্যান্য স্বার্থের প্রতিনিধিত্ব করিবেন।

আপনারা উপলব্ধি করিবেন যে, এইরূপে একটি নূতন শাসন পরিষদ স্বায়ত্তশাসনের পথে সুনির্দিষ্ট অগ্রগতি সূচনা করিবে। এই নূতন শাসন পরিষদ প্রায় সম্পূর্ণরূপে ভারতীয় হইবে এবং অর্থ ও স্বরাষ্ট্র বিভাগের ভার এই সর্বপ্রথম ভারতীয় সদস্যগণের হস্তে অর্পিত হইবে। এতদ্ব্যতীত ভারতবর্ষের বৈদেশিক বিভাগের ভারও একজন ভারতীয় সদস্যের হাতেই থাকিবে।

অধিকন্তু রাজনৈতিক নেতৃবর্গের সহিত পরামর্শ করিয়া বড়লাট এই সমস্ত সদস্য মনোনয়ন করিবেন। অবশ্য ইহাদের নিয়োগ বৃটিশ গভর্নমেণ্টের অনুমোদন সাপেক্ষ হইবে।

বর্তমান গঠনতন্ত্রের গণ্ডির ভিতরে থাকিয়াই এই শাসন পরিষদ কার্যনির্বাহ করিবেন। বড়লাট তাঁহার গঠনতান্ত্রিক ক্ষমতা প্রয়োগ করিবেন না, এইরূপ কোন প্রশ্নই উঠিতে পারে না; তবে এই ক্ষমতা অসংগতভাবে প্রয়োগ করা হইবে না।

আমার পক্ষে ইহা সুস্পষ্টভাবে ব্যক্ত করা উচিত যে, এই অস্থায়ী গভর্নমেণ্টের গঠন চূড়ান্ত শাসনতান্ত্রিক মীমাংসার কোনপ্রকার ক্ষতি করিবে না।

নূতন শাসন পরিষদের প্রধান কাজ হইবে—

১। জাপান সম্পূর্ণ পরাজিত না হওয়া পর্যন্ত সমস্ত শক্তি নিয়োজিত করিয়া উহার বিরুদ্ধে যুদ্ধ পরিচালনা।

২। সর্বসম্মতিক্রমে এক নূতন স্থায়ী শাসনতন্ত্র রচিত ও প্রবর্তিত না হওয়া পর্যন্ত যুদ্ধোত্তর উন্নয়ন সম্পর্কিত বহু কাজ সহ বৃটিশ ভারতের শাসন কার্য পরিচালনা করা।

৩। কি উপায়ে এইরূপ সর্বসম্মত সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যাইতে পারে তাহা বিবেচনা করা। তৃতীয় কার্য সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ। আমি সুস্পষ্টভাবে জানাইতে চাই যে, বৃটিশ গভর্নমেণ্ট কিম্বা আমি দীর্ঘস্থায়ী সমাধানের আবশ্যকতা বিস্মৃত হই নাই। দীর্ঘস্থায়ী সমাধানের পথ সুগম করা বর্তমান প্রস্তাবসমূহের উদ্দেশ্য।

আমি এইরূপ এক পরিষদ গঠনের সর্বোৎকৃষ্ট উপায় বিবেচনা করিয়া আমাকে পরামর্শ দিবার জন্য নিম্নোক্ত ব্যক্তিগণকে বড়লাট প্রাসাদে আমন্ত্রণ করিবার সিদ্ধান্ত করিয়াছি।

বর্তমান প্রাদেশিক গভর্নমেণ্টসমূহের প্রধান মন্ত্রিগণ অথবা ৯৩ ধারায় শাসিত প্রদেশসমূহের বেলায় শেষ প্রধান মন্ত্রিগণ।

কেন্দ্রীয় পরিষদের কংগ্রেসী দলের নেতা এবং মুসলিম লীগ দলের সহকারী নেতা, রাষ্ট্রীয় পরিষদের কংগ্রেস ও মুসলিম লীগ দলের নেতৃদ্বয়; কেন্দ্রীয় পরিষদের জাতীয় ও ইউরোপীয়ান দলের নেতৃদ্বয়। দুইটি প্রধান রাজনৈতিক দলের নেতা হিসাবে মিঃ গান্ধী ও মিঃ জিন্না।

তপশীলভুক্ত জাতিসমূহের প্রতিনিধিরূপে রাও বাহাদুর এন শিবরাজ এবং শিখদের প্রতিনিধি হিসাবে মাষ্টার তারা সিং।

এই সকল লোককে অদ্যই নিমন্ত্রণ পত্র দেওয়া হইবে এবং ২৫শে জুন সিমলাতে আমরা সমবেত হইব, আশা করি।

আমার বিশ্বাস সকলেই সম্মেলনে যোগদান করিয়া এ বিষয়ে আমাকে সাহায্য করিবেন। ভারত সমস্যা সমাধানের এ নূতন প্রচেষ্টা সফল করিবার গুরুদায়িত্ব আমার ও তাঁহাদের।

সম্মেলন সফল হইলে, আমি আশা করি, কেন্দ্রীয় শাসন পরিষদ গঠনে আমরা একমত হইতে পারিব। আমি আশা করি, যে সকল প্রদেশে ভারত শাসন আইনের ৯৩ ধারা অনুযায়ী শাসন কার্য চলিতেছে সেখানেও ইহার পর মন্ত্রিসভার পক্ষে পুনরায় শাসনভার গ্রহণ করা সম্ভব হইবে এবং এই সকল মন্ত্রিসভা কোয়ালিশন হইবে।

দুর্ভাগ্যক্রমে বৈঠক যদি সফল না হয় বিভিন্ন দল যতক্ষণ না একমত হয়, বর্তমান ব্যবস্থাই থাকিয়া যাইবে। বর্তমান শাসন পরিষদ ভারতের জন্য অনেক কিছুই করিয়াছে, অন্য ব্যবস্থা সম্পর্কে একমত না হওয়া পর্যন্ত ইহারাই বহাল থাকিবেন।

কিন্তু আমার বিশ্বাস, বিভিন্ন নেতা যদি আমার ও নিজেদের পরস্পরের সঙ্গে সহযোগিতা করিবার মনোভাব লইয়া বৈঠকে যোগ দেন, বৈঠক সফল হইবে। বৃটেনের সমস্ত দায়িত্বশীল নেতা ও বৃটিশ জনসাধারণ সমগ্রভাবে ইহার সাফল্য কামনা করেন। আমার বিশ্বাস শেষ লক্ষ্যে পৌঁছিবার পথে ইহা একটি ধাপ মাত্র নয়, এই পথে আমরা অনেকখানি অগ্রসর হইয়া যাইব।

এই প্রস্তাব বৃটিশ ভারতের জন্য; সম্রাটের সঙ্গে রাজন্যবৃন্দের সম্পর্কের কোন পরিবর্তন ইহার দ্বারা হইবে না।

বৃটিশ গভর্নমেণ্টের অনুমোদন লইয়া আমার শাসন পরিষদের পরামর্শসহ কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির বন্দী সদস্যগণের অনতিবিলম্বে মুক্তির আদেশ জারী করা হইয়াছে। ১৯৪২ সালের আন্দোলনের ফলে অন্যান্য যাঁহারা বন্দী আছেন তাঁহাদের ব্যাপার নূতন কেন্দ্রীয় গভর্নমেণ্ট (যদি গঠিত হয়) এবং প্রাদেশিক গভর্নমেণ্ট বিবেচনা করিবেন।

কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক আইনসভার নির্বাচনের উপযুক্ত সময় সম্পর্কে বৈঠকে আলোচিত হইবে।

পরিশেষে আমি আপনাদিগকে শুভেচ্ছাসূচক ও পরস্পর বিশ্বাসমূলক মনোভাব গঠন করিবার জন্য সনির্বন্ধ অনুরোধ জানাইতেছি, কারণ ভবিষ্যৎ সাফল্যের জন্য ইহাই প্রয়োজন। ভারত ইতিহাসের এই সন্ধিক্ষণে এই বিরাট দেশ ও ইহার অগণ্য অধিবাসীর ভবিষ্যৎ বৃটিশ ও ভারতীয় নেতৃবৃন্দের চিন্তা ও কার্যের উপরই নির্ভর করে।

সামরিক দিক দিয়া ভারত বর্তমানের ন্যায় সুনাম কোনদিনই অর্জন করে নাই। আন্তর্জাতিক সম্মেলনে ভারতীয় প্রতিনিধিগণ রাজনৈতিক জ্ঞানের পরিচয় দিয়াছেন। ভারতবাসীর আশা আকাঙ্ক্ষার প্রতি সমস্ত জগতে এতখানি সহানুভূতি কখনই সৃষ্টি হয় নাই। সুতরাং আমাদের সুযোগ গ্রহণ করার মত অনেক কিছু আছে। কিন্তু ইহা সহজও নয়, খুব শীঘ্র সম্ভবও নয়। আমাদের অনেক কিছু করিতে হইবে, অনেক বিপদ, অনেক বাধা আমাদিগকে অতিক্রম করিতে হইবে।

ভারতের ভবিষ্যৎ উন্নতিতে আমি বিশ্বাস করি এবং এজন্য যথাসাধ্য চেষ্টা আমি করিব। আপনাদের সহযোগিতা ও শুভেচ্ছা কামনা করিতেছি।

"কস্তুরী মৃগ সম"

শ্রীসুমথনাথ ঘোষ

নীলিমা. ঘুমচ্ছিল অসাড়ে। সমস্ত দিনের হাড়ভাংগা খাটুনির পর এইটুকু সময় তার ছুটি! রাত্রের এই ক'ঘণ্টা! বাড়ির অন্য সকলে ওঠবার আগে তাকে জাগতে হয় আবার শুতে যেতে হয় সকলের শেষে! এই বাড়ির এই নিয়ম! শ্বশুর, শাশুড়ী, স্বামী, দেওর, ননদ থেকে আরম্ভ করে সংসারের ছোটবড় সকলের সে যেন দাসী! যার যতটুকু সেবা প্রাপ্য, ঘড়ির কাঁটার মত মুখে মুখে যোগান দিয়ে তবে তার ছুটি! শাশুড়ীর সুতীক্ষ্ম রসনা ও সজাগ দৃষ্টি সর্বদা প্রহরীর মত ঘোরে নীলিমার পেছনে পেছনে! কোথায় এতটুকু ত্রুটি বা ব্যতিক্রম ঘটবার উপায় নেই! তাই বিছানায় গা ঠেকবার সংগে সংগে ঘুমে ভেংগে আসে তার সর্বশরীর। একে অল্প-বয়সী মেয়েদের ঘুম গাঢ়, তার ওপর এই হাড়ভাংগা খাটুনি! নীলিমা মুহূর্তে যেন এলিয়ে পড়ে ঘুমে—শিথিল হয়ে আসে তার প্রত্যেক অঙ্গ-প্রত্যংগ নিদ্রার কোমল আবেশে! ফুলের কুঁড়ি যেমন রাত্রের নিস্তব্ধতায় তার একটি একটি করে দল বিকশিত করে, তেমনি ভাবে শয্যার ওপর নিজের দেহকে ছড়িয়ে, বিছিয়ে, খেলিয়ে নীলিমা ঘুমোয়! ক্লান্তির সংগে একটা মোহনীয় কোমলতা ফুটে ওঠে তার মুখে চোখে সর্বাংগে!

খাটের অপর প্রান্তে তখন সতীশের নাক ডাকে! গালবালিশ, কানবালিশ, পাশবালিশ, মাথার বালিশের পাহাড়ের মধ্যে সে ঘুমোয়। তার বিরাট দেহের খাঁজে খাঁজে যেন বালিশের বেড়া দেওয়া! যাতে নিদ্রার আরামে কোনরকম ব্যাঘাত না ঘটে তার এ যেন ষোলআনা আয়োজন! সতীশ খেতে ভালবাসে! জগতের সমস্ত রকমের আহার্যের প্রতি তার সমান আকর্ষণ! সেখানে ভাল-মন্দ, ছোট-বড়র কোন প্রশ্ন ওঠে না—সে যেন সর্বভুক? ফলে অতি ভোজনটাও যেমন তার অভ্যাস, অতি নিদ্রাটাও তেমনি অভ্যাসে দাঁড়িয়েছে! নীলিমা প্রথম প্রথম স্বামীকে একটু কম খাবার উপদেশ দেবার চেষ্টা করেছিল, কিন্তু তাতে বিশেষ ফল হয়নি বরং উল্ট-ই হয়েছে। সতীশ তার উত্তরে স্ত্রীকে বলেছে, আমার বাপ-মা চিরকাল আমায় ভালমন্দ জিনিস খাইয়ে এসেছেন—ওটা আমার অভ্যাস। এই বলে একটু থেকে ক্রুদ্ধস্বরে বলেছে, যাদের সামর্থ্য নেই খাবার তারাই কম খায়!

নীলিমা স্বামীর মুখ থেকে এই রকম উত্তর শুনে ব্যথিত হয়েছে বার বার। এই অতিভোজন সম্বন্ধে উপদেশ দেওয়া ইদানীং বন্ধ করে দিয়েছে। সতীশ ইচ্ছামত ভোজন করে এবং ইচ্ছামত নিদ্রা যায়—তা নিয়ে নীলিমা একেবারে মাথা ঘামায় না! চার বছর নীলিমার বিয়ে হয়েছে—এই চার বছর তাদের এমনি ভাবেই কাটছে! নব-বিবাহিত দম্পতিদের যেসব প্রেমের কাহিনী সে সখিদের মুখে শুনেছিল তার জীবনে কোনদিন তা সফল হয়নি! রাতের পর রাত তার স্বামী তার সে প্রতীক্ষা ব্যর্থ করে দিয়েছে। নীলিমা দেখলো শুধু খাওয়া আর ঘুম ছাড়া তার স্বামী অর্থাৎ সতীশ অন্য কিছু জানে না। সে তাকে বিয়ে করে এনেছে শুধু বিনা মাইনের রাঁধুনী ও ঝিয়ের জন্যে! তাই প্রেমালাপ তাদের রান্নার দোষ-ত্রুটিতে পর্যবসিত হয়। মোটা থলথলে চেহারা—কেবল খেয়ে শরীরটাকে সুস্থ রাখার কথা ছাড়া আর কিছু সতীশ ভাবতে পারে না। ক্ষিদে যেন তার সর্বদা পেয়েই আছে! কারুর মুখে ক্ষিদে নেই শুনলে সে ভারী চটে যায়। নীলিমাকে বার বার শুধু সতীশ বলে, শুধু খেয়ে যাও ক্ষিদের কথা ভেবো না!

নীলিমা এক একদিন রহস্য করবার চেষ্টা করে। বলে, দোহাই তোমার! তুমি একদিন অন্ততঃ খাওয়া ছাড়া অন্য কথা বলো দেখি!

রহস্য বা রসিকতা সতীশের দেহের রক্তে কোথাও একবিন্দু ছিল না। তাই ও-কথা শুনে সে গম্ভীর হয়ে গেল এবং আরো গম্ভীর ভাবে উত্তর দিলে, খাওয়ার জন্যেই তো সব—পেটটা আছে বলেই তো মানুষের এত কষ্ট, এত পরিশ্রম। তা না হলে কে কার 'পরোয়া' করতো! জগতের সমস্ত লোক যে সকাল থেকে উঠে সারাদিন ভূতের মত খেটে মরছে—সে ত এই পেটের জন্যে!

এর আর কোন জবাব না দিয়ে নীলিমা চেপে যায়! প্রতি রাত্রেই তাই ঘরে ঢুকে সে সতীশের এই অতিভোজনজনিত নিদ্রার সশব্দ পরিচয় পেয়ে মনে মনে ক্ষুব্ধ হতো কিন্তু তার জন্যে কোন অনুযোগ করতো না কারো কাছে, এমনি ভাবেই দিন কাটছিল তার।

হঠাৎ একদিন গভীর রাত্রে চোখের ওপর তীব্র আলো অনুভব করে নীলিমার ঘুম ভেঙে গেল। চোখ খুলতেই সে দেখলে সতীশ তার মুখের দিকে একদৃষ্টে চেয়ে আছে আর তার হাতে একটা জ্বলন্ত টর্চ লাইট!

সংগে সংগে নীলিমার মাথায় রাগ চড়ে গেল। সে তার হাত থেকে আলোটা কেড়ে নিতে নিতে বললে, কি হচ্ছে, ন্যাকামো।

সতীশের কণ্ঠ কেমন একপ্রকার রসের আধিক্যে সিক্ত হয়ে উঠলো। একটু ইতস্তত করে বললে, তোমায় দেখছি, নীলি।

তীক্ষ্মস্বরে নীলিমা বলে উঠলো, কেন কোনদিন কি দেখনি এর আগে, যে এমনি করে চুরি করে দেখতে হবে এত রাত্রে?

সতীশ বললে, সত্যি নীলি, এতদিন তোমায় দেখছি, কিন্তু এমন সুন্দর কোন-দিন মনে হয়নি!

চুপ্ মিথ্যে কথারও একটা সীমা আছে মনে রেখো। এই বলে নীলিমা এমন ধমক দিয়ে উঠলো যে সতীশ চুপ করে গেল! তারপর একটু ইতস্তত ক'রে বললে, এই তোমার গা ছুঁয়ে বলছি, মাইরি—

নীলিমা বললে, দেখ গা ছুঁয়ে দিব্যি করে মিথ্যেকে সত্য প্রমাণ করার চেষ্টা আমার কাছে অন্তত করোনা। তারপর মুহূর্ত কয়েক থেমে জ্বালাভরা কণ্ঠে বললে, এতদিন পরে আজ হঠাৎ কেন তোমার প্রেম উথলে উঠলো সত্যি করে বলো বলছি, তা নাহ'লে আমি অনর্থ করবো।

সত্যি জিনিসটা এমন যে সেটা ঠিক সময় ঠিকভাবে উচ্চারিত হলে, অস্বীকার পাওয়া শক্ত! তাই একটু চুপ করে থেকে সতীশ বললে, অমিয় বলছিল তোমায় নাকি অদ্ভুত দেখতে! জগতের শিল্পীরা যেসব রমণীদের কামনা করে যুগ যুগ ধরে তোমার মধ্যে নাকি সেই রকম সুদুর্লভ সৌন্দর্য রয়েছে! তোমার চোখ, মুখ, নাক, হাতের আংগুল, দেহের গঠনভঙ্গী প্রত্যেকটি নাকি আশ্চর্য রকমের সুন্দর!

থামো! বলে নীলিমা এমন একটা ঝঙ্কার দিয়ে উঠলো যে সতীশ আর কথা বলতে পারলে না। চুপ করে গেল। তারপর কিছুক্ষণ নীরব থেকে নীলিমা আবার প্রশ্ন করলে, তোমার বন্ধু আমার যে দৈহিক

গঠনের এত প্রশংসা করলে তা সে দেখলে কি করে?

সতীশ একটু হেসে ফেললে। তারপর বললে, তা আমি বলতে পারবো না, সে বারণ করেছে।

নীলিমা স্বামীকে ভাল করেই চেনে তাই একটু কথাটা বার করে নিতে তার বেশি দেরী হলো না। সতীশ বললে, তুমি যখন আজ বিকেলে পুকুরে সাবান মাখছিলে তখন সে তোমায় দেখেছিল পাশের বাগানটার মধ্যে থেকে।

সঙ্গে সঙ্গে নীলিমার মাথা আগুন হয়ে উঠলো। সে দাঁতে দাঁত চেপে বললে, ছিঃ ছিঃ—তোমার বন্ধু এত ছোটলোক জানলে সেদিন তার সঙ্গে আলাপ করতুম না! এইসব লোকদের তুমি নিয়ে আসো ভদ্দর-লোকের অন্দরমহলে।

ছোটলোক! চুপ চুপ—ওকথা আর মুখে উচ্চারণ করো না! জানো ও কত বড় সম্মানী লোক! ও কবি, ওর কত বই আছে! আমি ওর পায়ের নখের যোগ্য নই!

নীলিমা বলে উঠলো, তাতে আমার কি বয়ে গেল! যে ভদ্দরলোকের বৌঝি'র সম্মান রেখে চলতে জানে না—সে আবার কিসের সম্মানী লোক! তোমার স্ত্রীকে যে এইভাবে অপমান করে সে তোমার কাছে বড় হতে পারে, কিন্তু আমার কাছে ঘৃণ্য মনে রেখো।

সতীশ বললে, কিন্তু তার ত আমি বিশেষ দোষ দেখতে পাচ্ছি না। সে বেচারী সন্ধ্যে বেলায় বাগানে বেড়াচ্ছিল এমন সময় সে তোমাকে দেখতে পায় পুকুরের ঘাটে! তারপর আমার কাছে যদি সে তোমার রূপের প্রশংসা করেই থাকে ত অন্যায় কি করেছে সে ত আমি বুঝতে পারছি না।

সে তুমি বুঝতে পারবে না কোনদিন, এই বলে নীলিমা মাথার বালিশের মধ্যে মুখ গুঁজে যেন হাঁপাতে লাগল। তারপর একটু চুপ করে থেকে বললে, তা নাহ'লে তার কথা শুনে তুমি চুরি করে এইভাবে রাত্রে আমার রূপ যাচাই করবে কেন, তোমার নিজের কি চোখ নেই?

সতীশ বললে, চোখ হয়ত আছে, কিন্তু কবির সে চোখ পাবো কোথায় নীলিমা—এটা কি বোঝোনা? ওরা হলো কবি—রূপের জহুরী—জগতের রূপ নিয়ে ওদের কারবার—ওদের মতামতের মূল্য যে আমার কাছে কতখানি তা কি বলবো তোমায়?

তোমার কাছে তার মতামতের মূল্য যতখানিই থাক, কিন্তু স্ত্রীর কাছে স্বামীর মতের মূল্য তারচেয়ে অনেক বেশি! স্ত্রীর রূপের সমালোচনা যদি পরপুরুষের মুখ থেকে শুনতে হয় তাতে স্ত্রীর রীতিমত অপমান। এটা বোধকরি তোমায় বুঝিয়ে বলতে হবে না?

সতীশ বললে, তুমি এতটা রাগ করবে জানলে আমি ওকথা তোমায় বলতুম না! সত্যি অমিয়কে তুমি ভুল বুঝোনা—ও বড় চরিত্রবান ছেলে—ভারী সুন্দর—দেশের সবাই ওকে মান্য করে!

নীলিমা ক্ষুব্ধস্বরে বললে, চুরি করে যে আমার দৈহিক গঠন দ্যাখে তাকে আর যেই ভাল বলুক কিন্তু আমি কিছুতেই পারবো না! এই বলে সে সতীশের দিকে পিছন ফিরে শুলো। সতীশও আর কোন কথা না বলে চুপ করলে।

গভীর রাত। ঝিঁঝি' পোকার একটানা আওয়াজ বাইরে থেকে এসে তাদের দুজনের মধ্যের নীরবতাকে যেন আরো বাড়িয়ে দিলে।

কিছুক্ষণ উভয়ে নিস্তব্ধ হয়ে থাকবার পর হঠাৎ নীলিমা প্রশ্ন করলে, আর কিছু বলেনি তোমার বন্ধু?

সতীশ গম্ভীরভাবে শুধু বললে, না।

এমনি করে আরো কয়েকদিন কেটে গেল। অমিয়র সম্বন্ধে নীলিমা আর কোন কথাই সতীশকে যেমন জিজ্ঞাসা করে না, তেমনি সতীশও নিজে থেকে কিছু বলে না। ব্যাপারটা নীলিমা ভুলে গেছে মনে করে একদিন সতীশ অমিয়কে রাত্রে খাবার





নিমন্ত্রণ করলে এবং নীলিমাও তাতে কোন প্রকার আপত্তি করলে না বরং উৎসাহ দেখালে দেখে সতীশ মনে মনে খুশি হলো।

সমস্ত দিন ধরে নীলিমা নিজ হাতে নানারকমের রান্নাবান্না করলে অমিয়র জন্যে কিন্তু এক সময় সে ঘরে এসে সতীশকে বললে, দ্যাখো আমি কিন্তু তোমার বন্ধুর সামনে বেরিয়ে পরিবেশন করতে পারবো না।

সতীশ বললে, কেন?

কেন আবার? তোমার যা বন্ধু, হয়ত আবার আমার রূপের খুঁত ধরে কত কি বলবে—আমার ভারী লজ্জা করে।

কিন্তু তুমি তাকে নেমন্তন্য করেছ—অথচ তুমি যদি আড়ালে থাকো সেটা কি ভাল দেখাবে?

নীলিমা বললে, নেমন্তন্য করেছি বলেই যে আমায় বারবার তার সামনে বেরিয়ে পরিবেশন করতে হবে, তার মানে কি?

সতীশ বললে, আচ্ছা তুমি যা ভালো বোঝ তাই কোরো।

নীলিমা বললে, পরিবেশন করতে গিয়ে গায়ের মাথার কাপড়চোপড় কখন কোথায় সরে যাবে—আমার যেন ভারী লজ্জা করে!

খেতে বসে সতীশ অবাক হয়ে গেল। নীলিমা রঙীন সাড়ী পরে চুনির ফুল কানে ঝুলিয়ে—বারবার নিজে এসে তাদের পরিবেশন করতে লাগল। এমন পরিপাটী ক'রে সাজতে সতীশ বহুদিন নীলিমাকে দেখেনি! তার বেশ ভাল লাগল।

খাওয়াদাওয়ার পর অমিয়কে পেঁছে দিয়ে সতীশ যখন বাড়ি ফিরল তখন রাত অনেক হয়েছে। নীলিমা বিছানায় শুয়েছিল কিন্তু ঘুমোয়নি। সতীশ তাকে দেখেই একেবারে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠলো। বললে, ওঃ রান্নাগুলো আজ ভারী সুন্দর হয়েছে!

নীলিমা কণ্ঠে একটা ক্লান্ত সুর টেনে বললে, এটা কি তোমার নিজস্ব মত—না বন্ধু বলে দিয়েছে?

অমিয় সম্বন্ধে কি জানি কেন সতীশের মনে বরাবরই একটু দুর্বলতা ছিল। তার কথা বলতে গিয়ে সে রীতিমত গর্ব অনুভব করতো। তাই সতীশ স্ত্রীর এই প্রশ্নের উত্তরে চট্ করে জবাব দিলে, সত্যি বলেছ নীলিমা, আমি ভালমন্দর কি বুঝি! অমিয় কত বড় বড় লোকের বাড়ি খাওয়াদাওয়া করে—সে বলেছে তোমার হাতটা সোনা দিয়ে বাঁধিয়ে দেবার মত।

নীলিমা এই কথা শুনে বিদ্রূপভরা কণ্ঠে বললে, পরের স্ত্রীর হাত সকলেরই সোনা দিয়ে বাঁধিয়ে দিতে ইচ্ছা করে—নিজের স্ত্রীর হাত তোমার বন্ধু কবার বাঁধিয়ে দিয়েছে জিজ্ঞেস করো ত? তারপর একটু থেমে কি চিন্তা করে বললে, তোমার যদি বলতে লজ্জা করে ত আমার নাম করে বলো—আমি তাতে ভয় পাই না।

সতীশ বললে, আরে এতে তুমি রাগ করো কেন—সে তোমার প্রশংসাই করেছে। আমি তোমার স্বামী—আমার কাছে বলবে না? আমার ত শুনেতে খুব ভাল লাগে! আমি মুখ্যু মানুষ অত ভালমন্দ বুঝি না—কিন্তু অমিয়র মত ছেলের মুখের প্রশংসার দাম অনেক। বাস্তবিক ওর চোখই আলাদা—এই দ্যাখোনা তুমি ত কতদিন কত সেজেগুজে আমায় খেতে দাও কিন্তু আজ তোমার বেশভূষা দেখে অমিয় কি বললে জানো—

কি বললে, বলো না গো? নীলিমার কণ্ঠে যেন কিসের ব্যাকুলতা ফুটে উঠলো।

সতীশ উত্তর দিলে, সে বললে একটা ক্যামেরা থাকলে তোমার ফটো তুলে নিয়ে বাঁধিয়ে রাখতো! ওই কাল সাড়ীটায় তোমায় নাকি এমন মানিয়েছিল যে কোমরে আঁচল জড়িয়ে খাবার থালা হাতে নিয়ে তুমি যখন ঘরে ঢুকলে তখন তোমার দিকে চেয়ে তার—

চুপ্ করো। এই বলে একটা ধমক দিয়ে নীলিমা বললে, কোন সাড়ী পরলে আমায় বেশি ভালো দেখায় সে আমি জানি, তোমার বন্ধুকে বলে দিতে হবে না!

সতীশ বললে, জানো ও হলো কবি, ওর পছন্দর কত দাম! শহরের কত সুন্দরীরা মাথা কোটাকুটি করে ওর পছন্দমত সাড়ী পরবার জন্যে?

যারা করে করুক। আমি সে দলের নই। এ কথাটা তোমার বন্ধুকে ভাল করে স্মরণ করিয়ে দিয়ো। আর তা যদি করতে তোমার লজ্জা করে ত আমায় বলো, আমি বেশ করে তাঁকে বুঝিয়ে দেবো। এই বলতে বলতে হঠাৎ নীলিমার কণ্ঠস্বর উত্তেজিত হয়ে উঠলো, সে বললে, ভদ্রঘরের কুল-বধূদের রূপের প্রশংসা পরপুরুষের মুখ থেকে শোনা যে পাপ, এটা বোঝবার মতও কি শিক্ষা তোমার বন্ধু পাননি? আচ্ছা, আমার সঙ্গে এবার দেখা হলে আমি ভাল করে সেই কথাটা তাঁকে বুঝিয়ে দেবো!

লজ্জা, শালীনতা, ভব্যতা প্রভৃতি গুণগুলি নীলিমার মধ্যে অত্যন্ত প্রবল। তার কোথাও এতটুকু ত্রুটিবিচ্যুতি সে সহ্য করতে পারে না, একথা সতীশ জানে! তবুও অমিয়র মত কবি ও সুশিক্ষিত চরিত্রবান বন্ধুর মুখের প্রশংসায় যে কোন অন্যায় থাকতে পারে, তা সে ভেবেই পায় না। অথচ নীলিমা এসব বিষয়ে অত্যন্ত তেজস্বিনী বলে আবার সতীশের মনে একটু ভয়ও হলো। কি জানি যদি সত্যিসত্যি সে কোনদিন সেইসব কথা বলে অপমান করে! অমিয় যে এখনো সেই বাল্যকালের কথা স্মরণ করে তাকে বন্ধু বলে স্বীকার করে—এতেই সে ধন্য!

সতীশ অত্যন্ত সাধাসিধা সরল মানুষ! অতশত ঘোরপ্যাঁচ বোঝে না—একটু ভালো খাওয়া আর বেশি ঘুমতে পেলেই খুশি! পল্লীগ্রামের একটা সুনিবিড় প্রশান্তি যেন তার মুখেচোখে সর্বদেহে!

পরদিন সকালে উঠে সতীশের সকলের প্রথমে অমিয়র কথা মনে পড়লো। সে তার বাড়িতে গিয়ে নীলিমা যা যা বলেছিল সব কথাই তাকে খুলে বললে—কিছু গোপন করলে না।

অত্যন্ত ভদ্র মন অমিয়র। তাছাড়া সতীশের মধ্যে সে এখনো তার বাল্য-বন্ধুত্বের ছবি দেখতে পায়! তাই নীলিমার কথা শুনে সে মনে মনে একটু ব্যথা পেলে। সতীশের বৌ যে তাকে এমন কথা শোনাবে তা সে আশা করতে পারেনি। সতীশ তার প্রিয়পাত্র বলে তার স্ত্রীর মধ্যে থেকে সেইসব সুদুর্লভ সৌন্দর্য আবিষ্কার করে বন্ধুকে খুশি করতে চেষ্টা করতো।

এদিকে অমিয় যখন সতীশের বাড়িতে আসা সত্যিসত্যি বন্ধ করলে তখন আর এক বিভ্রাট দেখা দিল। বেচারী সতীশ পড়লো উভয় সংকটে! সতীশ বেড়িয়ে রাত্রে বাড়ি ফিরতেই নীলিমা রান্নাঘর থেকে ছুটে এসে তাকে জিজ্ঞেস করলে, হ্যাঁগো তোমার বন্ধুকে বুঝি তুমি বলে দিয়েছো আমার কথা?

সতীশ সরল প্রকৃতির লোক, সত্য কথা বলা তার অভ্যাস, সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দিলে, তুমি ত তাকে বলতে বলে দিয়েছিলে!

নীলিমা মুহূর্তে যেন অন্যমনস্ক হয়ে পড়লো। তারপর নিজেকে সামলে নিয়ে ঝেজে উঠলো, বলবো না? বেশ করবো বলবো—একশোবার বলবো! পরের বৌঝিয়ের রূপ নিয়ে যে ব্যাখ্যা করে তাকে কোন সমাজে বলে ভদ্দরলোক!

সতীশ দু'হাত জোড় করে বললে, দোহাই তোমার সে বেচারীকে নিয়ে আর টানাটানি করো না, ঢের হয়েছে এখন একটু থামো!

থামবো? এর মধ্যে? কেন তোমার বন্ধু বলে পীর নাকি যে পরের বৌ সম্বন্ধে যা মুখে আসবে তাই বলবে? মেয়েমানুষ বলে বুঝি তার কোন মানসম্ভ্রম নেই! এই বন্ধুর তুমি আবার গর্ব করো লেখাপড়া জানা, শিক্ষিত বলে? আমরা হলে এমন বন্ধুর মুখ দেখতুম না।

সতীশ তখন বললে, মুখ দেখা ত তুমি অনেক দিন তার বন্ধ করেছ, তবে আর কেন বেচারীকে শুধু শুধু গালাগালি করছো?

আরো উত্তেজিত হয়ে নীলিমা বললে, আমি ত বন্ধ করেছি এইবার তুমিও যাতে করো তার ব্যবস্থা করছি। একবার সামনা-সামনি পাই তারপর দেখি সে কেমন

ভদ্রলোক। পেড়ে কাপড় পরিয়ে না দিতে পারি ত আমি বাপের বেটী নই। এই বলতে বলতে নীলিমার সর্বাঙ্গ থরথর করে কাঁপতে লাগল, চোখমুখ লাল হয়ে উঠলো।

সতীশ স্ত্রীর এই মূর্তি দেখে ভয় পেয়ে গেল। তাড়াতাড়ি বিছানা থেকে পাখাটা তুলে নিয়ে তার মাথায় বাতাস দিতে দিতে বললে, তা হ্যাঁগো তুমি এমন করছো কেন? বেশ ত, তাকে বারণ করেছি সে এখানে আর আসবে না। আর তোমার সম্বন্ধে কোন কথা বলবেও না।

কেন সে আমার কথা বলবে? না হয় আমার রূপ নেই—না হয় শহরের বড়লোকের মেয়ের মত আমায় সুন্দর দেখতে নয়—তা বলে ঠাট্টা করবার তার কি অধিকার আছে আমার রূপ নিয়ে? এই বলে সে এক রকম ফুঁপিয়ে কেঁদেই ফেলল।

সতীশ পড়লো মহাবিপদে! সে কিছুতেই তাকে বোঝাতে পারে না যে, অমিয় তাকে ঠাট্টা করেনি, সত্যি সত্যি প্রশংসা করেছে। যত সে সেকথা নীলিমাকে বোঝাতে যায়, তত সে বলে ওঠে—ওই বলে আমায় ভোলাতে হবে না, আমি সব বুঝি।

সতীশ বলে উঠলো, আরে ভালো জ্বালায় পড়লুম—তুমি তা কি করে বুঝবে?

নীলিমা বললে, কেন তুমি ত সেকথা কোনদিন আমায় বলোনি—এতদিন হলো আমার বিয়ে হয়েছে। সত্যি যদি আমার রূপ থাকতো, তাহলে তুমি কি তা দেখতে পেতে না?

সতীশ পড়লো আরো বিপদে। সে বললে, আরে আমি হলুম পাড়াগেঁয়ে মুখ্যু মানুষ—আমার চোখের সঙ্গে অমিয়র চোখের তুলনা? সে কত বড় কবি, কত বড় বিদ্বান্ পণ্ডিত। সে যে জিনিসকে যে চোখে দেখবে, আমাদের সাধ্য কি তাকে সেইভাবে দেখি?

নীলিমা সেকথা বিশ্বাস করলে না। বললে, যা ভালো তাকে সবাই ভালো বলে—কিবা পণ্ডিত, কিবা মূর্খ। সতীশ অনেক করে তাকে বোঝাতে চেষ্টা করলে, কিন্তু কিছুতেই সে বুঝলো না। বললে, না, না, না—ও মিথ্যা আমি বুঝি। কিন্তু আশ্চর্য মেয়েমানুষের মন। মুখে যতই সেকথা অস্বীকার করুক মনে মনে কোথায় বুঝি নিজের রূপের প্রতি তার আস্থা ছিল তাই বুঝি মুখে সে অমিয়কে অত গালাগাল দিত শুধু যে তার রূপের প্রশংসা এতদিন পরে করেছে তারই নাম বারবার মুখে উচ্চারণ করবার জন্যে। এ যেন তার বৈরীভাবে ভজনা। রূপের আস্বাদ সুরার মত যে একবার পান করে সে জানে কি ভীষণ তার মোহ। তাই প্রতিদিন সে তার রূপের পূজারীর নাম করতো ওইভাবে। তার অপরাধ কি। আঠারো বছরের স্বাস্থ্যবতী যুবতী সুন্দরী সে—কোনদিন স্বামী বা বাড়ীর অন্য কারুর মুখ থেকে রূপের প্রশংসা শোনেনি—শুধু শুনেছে নিত্যনূতন রান্নার গৃহকর্মের। তাই তার রূপের বহ্নিতে যেই প্রশংসার আহুতি পড়লো, অমনি তার শিখা লক লক করে যেন সহস্র শিখায় জ্বলে উঠে তার সমস্ত অন্তরকে পুড়িয়ে ছারখার করে দিলে। নীলিমা যত তাকে চাপতে চেষ্টা করে গোপন করতে যায়, তত তার মুখ দিয়ে বার হয় গালাগাল—যে তার মনকে এমনি-ভাবে জ্বালিয়ে দিলে তার প্রতি তার হৃদয়ের আক্রোশ। রোজই তাই স্বামীর গলার আওয়াজ পেলে সে তার ঘরে ছুটে আসে

অমিয়র সম্বন্ধে আরো কিছু শুনতে পাবার আশায়। কিন্তু হায়! সবই বৃথা হয়। সে যখন সতীশকে জিজ্ঞাসা করে আর কিছু সে তার সম্বন্ধে বলেছে কিনা, তখন সতীশ তার গায়ে হাত দিয়ে দিব্যি করে বলে, 'মাইরি বলছি কিছু বলেনি।'

আরো কিছুদিন এইভাবে কেটে যাবার পর নীলিমা একদিন সতীশকে জিজ্ঞেস করলে, হ্যাঁগো তোমার বন্ধু ত এত শিক্ষিত, এত বিদ্বান, কিন্তু বন্ধুর বৌ যদি ঠাট্টা করে কিছু বলেই থাকে, তা বলে কি এ বাড়িতে আর আসতে নেই।

সতীশ বিস্মিত হয়ে তার মুখের দিকে তাকিয়ে বললে, তুমি নিজেই ভাঙছ আবার নিজেই গড়ছো। তোমাদের কোন্‌টা ঠাট্টা আর কোন্‌টা ঠাট্টা নয়, এ যে বুঝবে সে এখনো মায়ের গর্ভে।

আহা কথার ছিরি দেখো না—শুনলে গা জ্বালা করে। আমাদের নাকি কিছুই বোঝা যায় না—আর তোমাদের বুঝি সব বোঝা যায়। এই বলতে বলতে সে গৃহান্তরে চলে গেল।

এর কিছুদিন পরে আবার নীলিমা তার স্বামীকে প্রশ্ন করলে, হ্যাঁগো তোমার শিক্ষিত বন্ধু না হয় আমার সংগে নাই দেখা করলে, তা বলে মার সংগে ত যাবার আগে একবার দেখা করা উচিত ছিল।

সতীশ ততোধিক বিস্মিত হয়ে বললে, কে বললে তোমায় যে সে চলে গেছে এখান থেকে। এখনো তার পনেরো দিন ছুটি রয়েছে।

নীলিমা মুখ টিপে একটু হেসে বললে, ওমা আমি বলি বুঝি চলে গেছেন—তা না হলে তোমার মুখে আর বন্ধুর নাম শুনতে পাই না?

সতীশ বললে, তার নাম শুনলেই তোমার গা জ্বলে ওঠে—কাজেই আমি আর ওধার দিয়েই যাই না। একে মা মনসা, তায় ধুনোর গন্ধ। তোমায় যে চেনে সে আবার ও-নাম মুখে আনবে?

এই কথা শুনে নীলিমা রাগে জ্বলে উঠলো। সে বললে, হ্যাঁ খারাপ, আমি বদমাইস, আমি সব—তোমার বন্ধুর সব ভালো—হলো ত? আচ্ছা, এই আমার ঘাট হয়েছে, এই তোমার পায়ে দণ্ডবৎ—আর তোমার বন্ধুর নিন্দে কখনো করবো না। তাকে এ বাড়ীতে আসতে বলো—কোন হারামজাদী আর একটা কথা মুখে উচ্চারণ করে।

সতীশ স্ত্রীর মুখ থেকে এই রকম সব উল্টোপাল্টা কথা শুনে কিছুই বুঝতে পারে না, হকচাকিয়ে যায়। ভাবে নীলিমার মাথা খারাপ হয়ে গেল নাকি। কখনো ত সে এ রকম ছিল না, এইভাবে তার সংগে কখনো ত সে ইতিপূর্বে আলাপ করেনি। তাই নিম্ন স্বরে সে বললে, নীলি তুমি কিসব বলছো? আমি কি কোনদিন তোমায় ওকথা বলেছি?

নীলিমা হিষ্টিরিয়া রোগীর মত বলে উঠলো, এই নাকে কানে খত দিচ্ছি—আর এই জোড়হাত করছি তোমার বন্ধুকে আর কিছু বলবো না।

সতীশ বললে, কেন আমি কি সেজন্য কোন কথা তোমায় বলেছি?

বলতে হবে কেন? আমি কি তোমায় দেখে বুঝতে পারছি না?

সতীশ বিস্মিতকণ্ঠে বলে, তুমি আমায় ভুল বুঝেছ নীলি!

নীলিমা ছোট মেয়ের মত ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠে বলে, না গো আমি ভুল বুঝিনি।

এরপর সতীশ যত নীলিমাকে বোঝাতে যায়, নীলিমা তত কাঁদে। আর বলে, ওগো আমার অপরাধ মার্জনা করো, আমি আর কোনদিন তোমার বন্ধুকে কিছু বলবো না।

অগত্যা সতীশ বললে, আচ্ছা, আচ্ছা, আমি অমিয়কে বলবো যে তুমি তার ওপর আর রাগ করোনি!

নীলিমা তখন চুপ করলে এবং বললে, সেই ভালো, কেন মিছি মিছি আমি তোমাদের কাছে অপরাধী হতে যাই।

সতীশ গলায় একপ্রকার অবিশ্বাসের সুর এনে বললে, কিসের অপরাধ নীলিমা? তুমি বার বার ওই কথার ওপর জোর দিচ্ছ কেন?

হ্যাঁগো, এ আমার গুরুতর অপরাধ, তুমি জানো না?

আচ্ছা আমি জানি না, ত জানি না—তুমি জানো ত, তাহলেই হলো। এই চুপ করো, প্রকৃতিস্থ হও।

নীলিমা প্রকৃতিস্থ হলো বটে, তার মন পড়ে থাকে বাইরে—অমিয়র গলার স্বর শোনবার দিকে। দু'তিন দিন পরে হঠাৎ অমিয় এসে সতীশের নাম ধরে ডাকলে। সতীশ তখন বাড়ি ছিল না। তার মা তাকে ভিতরে আসতে বলে বললেন, তুই ত ঘরের ছেলে বাবা, তুই আবার বাইরে থেকে ডাকছিস কেন?

অমিয় বললে, সে যখন ছোট ছিলুম তখন মাসিমা, এখন সব পরের মেয়ে ঘরে এসেছে তাদের মানইজ্জত বাঁচিয়ে চলতে হবে ত?

তিনি বললেন, ওমা কি বলিস রে, সতীশের বৌ আবার পরের মেয়ে কিরে তোর কাছে?

সে তুমি বললে কি হবে মাসিমা?

তাই নাকি? এই বলে তিনি তখনি নীলিমাকে ডেকে বললেন, ও বৌমা এদিকে এসো ত, দেখে যাও কে এসেছে।

নীলিমা তখন তাড়াতাড়ি ঘরে ঢুকে সাড়ি বদলাচ্ছিল। অন্য একখানা সাড়ী পরতে গিয়ে হঠাৎ তার কি মনে হলো সে দিনের সেই কালো রঙের সাড়ীটা বার করে পরলে তারপর সেদিনের সেই চুণির দুল দুটো কানে ঝুলিয়ে ছুটে বেরিয়ে এলো।

নীলিমাকে আসতে দেখে অমিয় ঘাড় হেঁট করে রইল। তার মুখের দিকে না চেয়েই সে বললে, আজ রাত্রের গাড়িতে চলে যাবো মাসিমা, হঠাৎ অফিস থেকে টেলিগ্রাম এসেছে। সতীশও জানে না যে আজ যাবো—সে বাড়ী ফিরলে একবার আমার সংগে দেখা করতে বলবেন। এই বলে সতীশের মাকে প্রণাম করতেই তিনি বলে উঠলেন, ওমা সেকি হয় খালিমুখে চলে যাবি—যা যা ঘরে বোস—ও বৌমা খানকতক লুচি আর একটু চা করে দাও ত ওকে শিগ্‌গির।

নীলিমা খুব তাড়াতাড়ি চা ও খাবার তৈরী করে নিয়ে ঠিক সেদিনকার মত কাপড়ের আঁচলটা কোমরে জড়িয়ে ঘরে এসে ঢুকলো এবং অমিয়কে খেতে দিলে। অমিয় ঘাড় হেঁট করে বসে বসে খেতে লাগল। খাওয়া শেষ হতে নীলিমা খিল খিল করে হেসে উঠে বললে, রসিকতা বন্ধুর বৌরাই করে থাকে স্বামীর বন্ধুর সংগে।

জানি। বলে তেমনিভাবে তার মুখের দিকে না চেয়ে অমিয় খাওয়া শেষ করে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

নীলিমা তখন ছুটে নিজের ঘরে গিয়ে খাটের ওপর আছড়ে পড়ে কাঁদতে লাগল। তারপর সেই কালো রঙের সাড়ীটাকে পাগলের মত দাঁত দিয়ে ছিঁড়ে ছিঁড়ে টুকরো টুকরো করলে এবং কানের দুল দুটোকে খুলে ঘরের মেঝেয় ছুঁড়ে ফেলে দিলে।

রাত্রে সতীশ বাড়ি ফিরতেই আবার তার বন্ধুকে গালাগাল মন্দ দিতে শুরু করলে নীলিমা। তখন সতীশ তাকে বললে, এই না তুমি সেদিন প্রতিজ্ঞা করলে আর কখনো তাকে কিছু বলবে না?

নীলিমা পাগলের মত চীৎকার করে উঠে বললে, বলবো না—এত বড় ছোটলোক, অভদ্র চাষাকে বলবো না কিছু? একশোবার বলবো—হাজার বার বলবো—সারা জীবন ধরে বলবো—এই বলতে বলতে হাউ হাউ করে কাঁদতে লাগল।

সতীশ কিছু বুঝতে না পেরে হতভম্বের মত স্ত্রীর মুখের দিকে তাকিয়ে রইল।

কাহিনী খবর ভবঘুরে

আসল হিটলার বেঁচে নাকি?

আমেরিকার এক খবরে জানা গেছে যে—স্টকহোলমের 'ফ্রি জার্মান প্রেস সার্ভিস' বলে সংবাদ প্রতিষ্ঠানের এক খবরে রটানো হয়েছে—"জার্মানীর পতনের সময়ে যে 'হিটলার' বার্লিনে ছিলেন—তিনি নাকি মোটেই হিটলার নন—আসলে তিনি হচ্ছেন প্লয়েনের এক মুদী, নাম তার অগাস্ট উইলহেল্‌ম্ বার্থল্ডি—মুখখানাই তার দুর্ভাগ্য—অবিকল দেখতে তিনি 'ফুরেরে'র মত। ঐ সংবাদ প্রতিষ্ঠান বলেছেন যে বার্থল্ডিকে রীতিমত খুঁজে বার করে তাকে এমনভাবে তালিম দেওয়া হয়েছিল—যাতে সে নকল হিটলার হয়ে যুদ্ধসীমান্তে প্রাণ দিয়ে হিটলারের হয়ে শেষ কিস্তি মাৎ করতে পারে—আর সেই ফাঁকে আসল হিটলার গা ঢাকা দিয়ে বেঁচে যাবেন। এই ধাপ্পাবাজিকে রঙ চড়িয়ে পাকা করার ব্যবস্থায় জার্মানীর সরকারী ফটোগ্রাফার হেনরিক হারম্যানকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল যুদ্ধসীমান্তে হিটলারের প্রাণবিসর্জনের শেষ মুহূর্তের ছবি তুলতে।

মুসোলিনীর মৃত্যু কিভাবে ঘটলো?

২২শে এপ্রিল রবিবার মিলানের রেলওয়ে-কর্মচারীরা ধর্মঘট করলে। এই ব্যাপার দেখে মিলানের জার্মান রক্ষিবাহিনী তখনই বুঝতে পারলে যে এটা বিপ্লবের পূর্বাভাস—তারা সঙ্গে সঙ্গে রাস্তাঘাটের জার্মান প্রহরী-দের ব্যারাকে আশ্রয় নেবার নির্দেশ দিলে। বুধবার ২৫শে এপ্রিল সাধারণ ধর্মঘট দেখা গেল—এবং সারা মিলান শহরে জার্মান আর ফ্যাসিস্টদের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ প্রদর্শন শুরু হোল। সেইদিন সন্ধ্যায় রিপাব্লিকান ফ্যাসি গভর্নমেন্টের কর্ণধার মুসোলিনী আর তার যুদ্ধ-সচিব মার্শাল রোদল্‌ফ গ্রাৎসিয়ানি—পার্টিশান দলের প্রতিনিধিদের সঙ্গে মিলিত হলেন। এইদল তাঁর আত্মসমর্পণের দাবী করলে। মুসোলিনী এ দাবী এড়াতে চীৎকার করে বললেন—'জার্মানরা আমাকে ঠকিয়েছে'—আরও অনেক কথা বলে তিনি জার্মান যুদ্ধ-নায়কদের কাছে তাঁর অসন্তোষের কথা জানাবার জন্য এক ঘণ্টা সময় চাইলেন। এই এক ঘণ্টা ফুরোবার আগেই ওদিকে তিনি তাঁর দলবলকে বললেন—"আমি যদি পেছপা হই—আমাকে মেরে ফেলো।" এইসব বলে করেই তিনি চটপট পালাবার ব্যবস্থা করলেন। রাত ৯টার সময় তিনি সুইস সীমান্তের 'কোমো' বলে যায়গাটিতে এসে পৌঁছলেন। বৃহস্পতিবারের ভোর রাত্রি ২টার সময় তিনি সুইস কর্তৃপক্ষের কাছে দূত পাঠিয়ে তাঁর স্ত্রী ডোন্না র‍্যাচেল ও ছেলেমেয়েদের জন্য আশ্রয় ভিক্ষা করলেন, কিন্তু সুইস কর্তৃপক্ষ সে অনুরোধ প্রত্যাখ্যান করলেন। সকাল ৬টার সময় মুসোলিনী উত্তর দিকে যাত্রা শুরু করলেন—জার্মানী পৌঁছাবার উদ্দেশ্যে। এরপরের খবরে জানা গেল যে, জার্মান অফিসারের ওভারকোটে গা ঢাকা দিয়ে ছদ্মবেশে তিনি জার্মানদের এক মোটরবাহিনীর কনভয়ে চেপে বসলেন, কিন্তু 'ডোঙ্গো' বলে যায়গাটিতে তাঁর ছদ্মবেশ ধরা পড়ে যাওয়াতে জার্মানরা তাঁকে গ্রেপ্তার করলে। এই খবর পেয়ে পার্টিশান দলের 'একোয়ার্দো' বলে এক দলপতি—ব্যাপারটির নিষ্পত্তির জন্য তখন তাঁর দলের দশজন লোককে পাঠালেন সেখানে। তাঁরা এসে দেখে কুঁড়েঘরে মুসোলিনী আর তাঁর রক্ষিতা "পেতাচ্চি"কে আটক করা হয়েছে। এদের আসতে দেখে মুসোলিনী ভাবলেন—তাঁকে মুক্ত করতেই এরা এসেছে—তাই আনন্দে দিশেহারা হয়ে 'পেতাচ্চি'কে জড়িয়ে ধরলেন। কিন্তু যখন তারা এসে পৌঁছল তখন শুনলেন যে তারা তাঁকে গ্রেপ্তার করতে এসেছে। তিনি এ খবর শুনে ভয়ে বিস্ময়ে বিহ্বল হয়ে বললেন—"আমায় প্রাণে বাঁচিয়ে রাখো—আমি তোমাদের এক সাম্রাজ্য দোব", পার্টিশান দলের লোকেরা এ কথায় কর্ণপাত না করে সোজাসুজি জানালে যে—তিনি প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত, এবং বিচারে আরও ১৬ জন ফ্যাসি-নেতার প্রাণদণ্ড দেওয়া হয়েছে। তখন সেই হত্যাকারী দলের সামনে মুসোলিনী চীৎকার করে উঠলো—"না! না।"

এরপরে মুসোলিনী, পেতাচ্চি আর ১৬ জন ফ্যাসিনেতাকে এক মোটরভ্যানে ভর্তি করে মিলানে নিয়ে যাওয়া হলো। শুক্রবার ভোরবেলা ৩টার সময়—'পিয়াৎসা কুইন্দিচি মার্তিরে'র প্রাঙ্গণে—(সেখানে ১৫ জন ফ্যাসি-বিরোধী নেতাকে মুসোলিনী হত্যা করিয়েছিলেন) গুলী মেরে ওদের দেহ মাটিতে লুটিয়ে ফেলা হলো। এইভাবে সেইগুলো মাটিতে পড়ে রইলো কয়েক ঘণ্টা। তারপর লোকেরা যখন ভয়ানক ভিড় করলে ব্যাপারটা দেখবার জন্যে তখন পার্টিশান দলের লোকেরা মুসোলিনী আর পেতাচ্চিকে পায়ে দড়ি বেঁধে মাথা নীচু করে ঝুলিয়ে দিলে—পিয়াৎসার দেওয়ালে যে ভারা বাঁধা ছিল তাইতে। তারপর দুপুর বেলায় ওদের দেহ নামিয়ে—টেনে হেঁচড়াতে হেঁচড়াতে উঁচু পাঁচিল দিয়ে ঘেরা মর্গের উঠোনে নিয়ে রাখা হোল। রবিবার সেখান থেকে নিয়ে ফেলা হলো মিলান শহরের মাঝখানের এক পার্কে—যাতে সবাই দেখতে পায় মুসোলিনী আর তার ১৬ জন ফ্যাসিস্ট অনুচরের শেষ পরিণতি!

পেত্যাঁর প্রত্যাবর্তন

আটখানা মোটরগাড়ি পতনোন্মুখ জার্মানী থেকে সুইস সীমান্ত পার হয়ে এসে থামলো। এরই একটি গাড়িতে প্রধান আরোহী অতি বৃদ্ধ ফরাসী—কালো কোট গায়ে দিয়ে গম্ভীর মুখে বসে আছেন—তাঁর পাশেই তাঁর স্ত্রী বসে আছেন তিনি বললেন—"ফিলিপ্ বাড়াবাড়ি করো না" এমন সময় এক সরকারী সুইস কর্মচারী এসে তাঁর অস্থিসার হাতখানি ধরে করমর্দন করলেন—বৃদ্ধের চোখ জলে ভরে উঠলো। সুইস মেয়েরা গাড়ির কাছে এসে তাঁকে ফুল আর রকমারি মিষ্টি উপহার দিলে—তখন আবার তাঁর চোখ থেকে জল গড়িয়ে পড়লো। তাঁর স্ত্রী বললেন—"বাড়াবাড়ি করোনা ফিলিপ।"—আরে ফিলিপ পেতাঁ—ভার্দুনের বীর, ফ্রান্সের মার্শাল—ভিচি রাষ্ট্রের প্রধান তাঁর জন্মভূমিতে ফিরে যাচ্ছেন। সেদিন তাঁর জন্মদিন।

জার্মানদের অনুমতিক্রমে সুইস সরকারের মধ্যস্থতায় মার্শাল জেনারেল দ্য গলের গভর্ন-



মিলানের পার্কে মৃত মুসোলিনীর দেহ



ফিলিপ! বাড়াবাড়ি করোনা!

মেণ্টের কাছে নিজেকে সমর্পণ করতে চলেছেন—চলেছেন ষড়যন্ত্রের বিচার মেনে নিতে। ফরাসী সীমান্তের দিকে গাড়ী চললো।

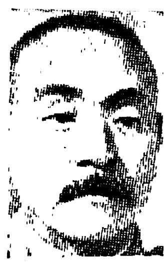
ফরাসী সীমান্তে প্যারির সামরিক শাসনকর্তা লেফটেন্যাণ্ট জোসেফ পিয়েরে কোয়েনিগ্ নিঃশব্দে অপেক্ষা করছেন এ'কে গ্রেপ্তার করার জন্যে। পেত্যাঁর গাড়ি এসে সুইস সীমান্ত আর ফরাসী সীমান্তের মুখে দাঁড়ালো—সুইস সীমান্তরক্ষীরা সামরিক কায়দায় যথারীতি অভিবাদন জানালো, কিন্তু ফরাসীরক্ষীরা বন্দুকের বাঁট ওপরের দিকে করে উল্টো অভিবাদন করে তাঁকে অসম্মান জানালে। বৃদ্ধ পেত্যাঁ তাঁর টুপি খুলে জেনারেল কোয়েনিগের দিকে হাত বাড়ালেন করমর্দন করার জন্য। জেনারেল আড়ষ্ট হয়ে সে আহ্বানকে অস্বীকার করলেন।

সন্ধ্যার আবছা অন্ধকারে আরে পেত্যাঁ—প্যারিস যাত্রার জন্য রক্ষী পরিবেষ্টিত স্পেশ্যাল ট্রেনে চেপে বসলেন। পরের দিন সকালে বৃদ্ধ মার্শাল আর তাঁর স্ত্রীকে ফ্রান্সের রাজধানীর বাইরে মঁত্রুগের দুর্গে এক অতি সাধারণভাবে সজ্জিত ঘরে এনে রাখা হোল। ঘরের গরাদে দেওয়া জানলার ফাঁক দিয়ে দুর্গের বধ্যভূমি দেখা যায়—মার্শাল তাকিয়ে দেখলেন ঘরে দুটি খাটে বিছানা পাতা—দুটি চামড়ার চেয়ার আর টেবিলটি। তারপর তিনি ঘরের পাহারায় নিযুক্ত স্তম্ভিত রক্ষীটিকে জেনারেল দ্য গলের একটি ছবি এনে ঘরের শূন্য দেওয়ালে টাঙিয়ে দিতে বললেন।—

এখানেই তাঁরা দুজনে অপেক্ষা করবেন যতদিন না বিচার হয়।

সুজুকীর মাথা ব্যথা

এক খবরে জানা গেছে—যে প্রেসিডেণ্ট রুজভেল্টের মৃত্যুর খবর পেয়ে জাপানের নতুন প্রধান মন্ত্রী সুজুকী টোকিওতে সাংবাদিকদের এক বৈঠক ডেকে তাতে পরলোকগত প্রেসিডেণ্ট রুজভেল্টের মৃত্যুতে গভীর শোক-প্রকাশ করে বলেন,—"আমেরিকানরা যে তাহাদের নেতাকে হারাইল—এজন্য গভীর সমবেদনা জানাইতেছি"। এইভাবে তিনি নাকি



তাঁর পূর্বপুরুষ প্রাচীন সামুরাই বংশের সৌজন্য প্রকাশের প্রাচীন রীতি অবলম্বন করেছেন—কারণ সম্মানিত শত্রু বা প্রতিপক্ষকেও সৌজন্য ও নম্রতা দেখাতে হবেই—এই ছিল সামুরাই'দের প্রথা। কিন্তু ইংরেজরা সন্দেহ প্রকাশ করে ঐ ব্যা পা র টা কে কটাক্ষ করে মন্তব্য করেছে ন—"প্র ধা ন মন্ত্রী সুজুকীর এতটা মাথা ব্যথার আসল কারণ হচ্ছে—জাপানের মূল ভূখণ্ডে যে আমেরিকানরা ভীষণ কাণ্ড বাধিয়ে তুলেছে।" জানি না সুজুকীর মনে কি ছিল? তবে এইটুকু বলতে পারা যায়—সুজুকী কেন—ঠেকলে পরে ঠেলার চোটে আরও অনেকে অনেক নম্রতা, ভদ্রতা দেখিয়ে থাকেন।

লেখু-ভেক

অ·ক্রূ·র

কাল রাত্রে সাজাহানকে দেখিয়াছিলাম। সেই সম্রাট সাজাহান, যাঁহার প্রেম তাজমহলে অমর হইয়া রহিয়াছে। আমি দূর হইতে তাজমহল দেখিতেছি এমন সময়ে আমার কাঁধে হাত অনুভব করিয়া পিছনে তাকাইয়া দেখিলাম জনৈক বৃদ্ধ ভদ্রলোক। তাঁহার দাড়ি সাদা, কিন্তু তাঁহাকে দেখিয়াই মনে হইল এককালে তিনি তরুণ ছিলেন।

প্রশ্ন করিলাম—"আপনি কে?"

বাদশাহী কণ্ঠে জবাব হইল—"আমি সাজাহান।"

অভিবাদন জানাইলাম। বৃদ্ধ কহিলেন, "এখন আর আমাকে অত কায়দা করিয়া কুর্নিশ করিতে হইবে না। এখন আর আমি বাদশাহ নই। সেজন্য দুঃখ করি না। চিরদিন কেহ বাদশাহ থাকে না। পাঠান গিয়াছে, মোগল গিয়াছে, ইংরাজও যাইবে। কিন্তু আমার প্রেমের কাহিনী আজিও বাঁচিয়া আছে, যতদিন ভূমিকম্পে আগ্রা তচনচ হইয়া না যায়, ততদিন বাঁচিয়া থাকিবেও।"

আমি কহিলাম—"আগ্রা তচনচ হইয়া গেলেও রবীন্দ্রনাথের কবিতাগুলি পুড়িয়া ছাই না হওয়া পর্যন্ত আপনার স্মৃতি অমর হইয়া থাকিবে। রবীন্দ্রনাথ আপনার এবং তাজমহলের সম্বন্ধে একটি চমৎকার কবিতা লিখিয়া গিয়াছেন, সেটি আই এ পরীক্ষায় পাঠ্য থাকে প্রায় প্রতি বছরই। সুতরাং বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের আর সবাই আপনাকে ভুলিয়া গেলেও আই এ পরীক্ষার্থী এবং পরীক্ষার্থিনীরা আপনাকে মনে করিবেই।"

সাজাহান কহিলেন,—"কবিতাটি আমিও পড়িয়াছি। আমারো ভাল লাগিয়াছে। কিন্তু আমার সম্বন্ধে কেহ কেহ গোল বাধাইয়াছে। তাহাদের মধ্যে একজন তোমাদের শরৎবাবুর শেষ প্রশ্নের কমল।"

বিস্মিত হইয়া কহিলাম—"আপনি কি শরৎবাবুর শেষ প্রশ্নও পড়িয়াছেন নাকি?"

সাজাহান কহিলেন—"পড়িয়াছি বই কি! আমার সম্বন্ধে কোন লেখা পাইলেই পড়ি। কমল বড় বাড়াবাড়ি করিয়াছে। ইহাতে অবশ্য আশ্চর্য হইবার কিছু নাই; বাড়াবাড়ি করাটাকেই যাহারা বড় বলিয়া মনে করে কমল সেই দলেরি মেয়ে।"

আমি কহিলাম "আপনি যদি চটিবেন না বলিয়া প্রতিশ্রুতি দেন তো আপনার সহিত কয়েকটা কথা খোলাখুলিভাবে আলোচনা করিয়া নিতে চাই।"

সাজাহান হাসিয়া কহিলেন "চটিব কেন? তুমি যাহা বলিতে চাও বল। নির্ভয়ে বল।"

আমি কহিলাম, "মমতাজ বেগম ছিলেন আপনার বহু বেগমের অন্যতমা মাত্র, একমাত্র বেগম ছিলেন না। ইহা কি আপনি অস্বীকার করেন?"

সাজাহান কহিলেন "ধরিয়া নিলাম আমার আরো বহু বেগম ছিল। তাহাতেই কি প্রমাণ হয় যে মমতাজ আমার প্রিয়তমা ছিল না? তাছাড়া ভালবাসার পাত্রীর সংখ্যা দিয়া ভালবাসাকে গণিতের নিয়মে ভাগ করা চলে না এই সহজ সত্যটা তোমরা সহজে বুঝিতে পার না কেন?"

আমি কহিলাম, "আপনি লায়লি মজনুর গল্প জানেন?"

সাজাহান কহিলেন, "জানি। এবং তুমি কি বলিবে তাহাও বুঝিতেছি। তুমি বলিতে চাও প্রেমিক মজনুর যদি লায়লী ছাড়াও আরও জনাকয়েক প্রেমিকা থাকিত তাহা হইলে প্রেমিক মজনুকে লোকে আজিও মনে রাখিত কি না। কিন্তু আমার সহিত মজনুর তুলনা করিও না; মজনু বাদশাহ ছিল না সে কথা মনে রাখিও দিল-দরিয়ার সঙ্গে দিল-চৌবাচ্চার তুলনা চলে না।" মনে ভাবিলাম, সত্যই তো। আমাদের সাধারণ মাপকাঠি দিয়া বাদশাহকে মাপিতে যাওয়া ঠিক তো নহেই।

সাজাহান কহিলেন, "আমার অন্যান্য বেগমের প্রসংগ একেবারেই অবান্তর। তাজমহলের কথা ভাবিবার সময় ভাবিবে শুধু মমতাজের কথা, মমতাজের প্রেমিক সাজাহানের কথা। সাজাহানের অন্য কোনো বেগম ছিল একথা স্রেফ ভুলিয়া গেলে তোমাদের এমন কি ক্ষতি?"

"কিন্তু ঐতিহাসিক সত্যকে অস্বীকার করিব?"

"একটু না হয় করিলেই। জীবনের বহু ক্ষেত্রেই তো তাহা করিয়া থাক। তাজমহল দেখিবার সময় ইতিহাসের প্রতি অতটা টান না-ই থাকিল। তাজমহলকে ঘিরিয়া একটি চমৎকার প্রেমকাহিনী কল্পনা করিলে যদি তাজমহলের সৌন্দর্য অধিকতর মর্মস্পর্শী হয়, তাহা হইলে সে কল্পনার রঙিন বুদ্বুদটুকু ফাটাইয়া লাভটা কি বলো তো দেখি?"

বুঝিলাম আসল সত্য কথাটিকে ঢাকিয়া ফেলিতে তিনি পরম উৎসুক। আমি কিছু বলিলাম না। তিনিই এক তরফা বলিয়া যাইতে লাগিলেন:

"কল্পনা এবং মিথ্যা এক জিনিষ নহে। কল্পনা ও সত্য, মনোজগতের সত্য। ভগবান আছে কল্পনা করিয়া যাহারা শান্তি পায়, হতাশার অন্ধকারে আশার আলো দেখে,

"তাহাদের সেই মধুর কল্পনা ভাঙিবার দরকারটা কি? বিশ্বাসীরা বিশ্বাস করিয়া যদি সুখী হয় তো হোক না। তাতে কাহার কি ক্ষতি হইতেছে?"

বড় একঘেঁয়ে লাগিয়া উঠিতেছে, ঠিক এমনি সময়ে গোবর্ধন বৈরাগী গান গাহিতে গাহিতে আসিয়া হাজির। আশ্চর্য! আধুনিক বাংলা মুখর চিত্রে যেমন দেখি ঠিক সময়মত (psychological momentএ) কালোপযোগী গান গাহিতে বাউল, মাঝি, পথিক বা গরুর গাড়ীর গাড়োয়ান আসিয়া পর্দার বুকে কিছুক্ষণ সময় ধ্বংস করে, বৈরাগীও দেখি তেমনি করিল। psychological moment-এর খোঁজটা তাহাকে দিল কে?

গোবর্ধন বৈরাগী গাহিতে শুরু করিল:

"ওরে মন প্রেমের স্বপন
দেখ তুমি তাজমহলে
পরের বচন শুইনো না মন
বলুক লোকে যে যা বলে।
(ছিলো) একের মাঝে দুইয়ের বাসা,
বাদশাগিরি, ভালবাসা,
ডুইবে গেছে বাদশাগিরি
ভালবাসার অথই জলে।
আর যা কিছু ডুইলে এবার
ভাব-প্রেমিক সাজাহানে
খুঁতখুঁতি মন খুঁত খোঁজে আর
দরদী মন দরদ জানে
প্রেম-পাথরে খোদাই ছবি
দেইখে ও-মন হওরে কবি
দুপ'র রোদের রুদ্র রবি
ডুবাও রাতের স্বপন তলে।..."

সাজাহান—বৈরাগীকে তাঁহার নিকট অপরিচিত বলিয়া মনে হইল না—খুশি হইয়া কহিলেন, "এই দেখ, এতক্ষণ যে কথাটা এত করিয়াও বুঝাইতে পারিতেছিলাম না, বৈরাগী সে কথাটা গানের মধ্য দিয়া কেমন চমৎকার বুঝাইয়া দিল।"

গোবর্ধন বৈরাগী সাজাহানের উক্তিতে পরম খুশি হইয়া একগাল হাসিয়া কহিল, "শাস্ত্রে কি আর সাধে বইলাছে গানাৎ পরতরং নহি। গানেই শ্যাষ, গানের পরে আর কিছু নাই।" বৈরাগী যেন গান শুনাইবার জন্যই আসিয়াছিল, গান শুনাইয়া চলিয়া গেল।

বৈরাগীর গান শুনিয়া নূতন চোখে তাজমহল দেখিতে লাগিলাম। সহসা তাজমহল ঝাপসা হইয়া গেল। অবাক হইয়া সাজাহানের দিকে তাকাইয়া দেখিলাম, কোথায় সাজাহান? সম্মুখে দেয়ালের গায়ে ফ্রেমে বাঁধানো তাজমহলের ছবি দুলিতেছে। কাল—অপরাহ্ন। বালিশের পাশে "শেষ প্রশ্ন" চিৎ হইয়া পড়িয়া আছে। চোখ রগ্‌ড়াইতে রগ্‌ড়াইতে উঠিয়া বসিলাম।

* * * *

স্বপ্নের সাজাহানের কথা কিন্তু ভুলিতে পারি নাই। স্বপ্নকে যাহারা অসত্য বলিয়া উড়াইয়া দেন, আমি তাহাদের দলে নাই বলিয়াই পারি নাই। তাজমহলের প্রতি যাঁহারা রোমাণ্টিক দৃষ্টিতে তাকান, কিছুদিন যাবৎ তাঁহাদের প্রতি অনুকম্পা বোধ করিতেছিলাম, ভগবানকে ডাকিয়া মনে মনে বলিতেছিলাম "হে প্রভু, এই সব কল্পনা-বিলাসী শিশুদের প্রতি কৃপাদৃষ্টিতে তাকাও। শলাকার সাহায্যে ইহাদের চোখে জ্ঞানাঞ্জনের প্রলেপ লাগাইয়া দাও। ইহারা জানে না ইহারা যে কি..." ইত্যাদি। কিন্তু স্বপ্নের সাজাহান আমার চিন্তাধারা সম্পূর্ণ বদলাইয়া দিয়া গিয়াছেন। এখন ভাবি, যে প্রেমিক সাজাহানের কল্পনা তাজমহলকে এমন অপূর্ব সুষমায় মণ্ডিত করিয়াছে, তিনি বাস্তবে হুবহু সেরূপ ছিলেন কি না তাহা লইয়া মারামারি করার দরকার কি? যদি ধরিয়াই নিই সেরূপ সাজাহানের অস্তিত্ব ছিল না তাহাতেই বা আমাদের কি আসিয়া যায়? যিনি বাস্তবে ছিলেন না, তিনি না হয় কল্পনাতেই থাকিলেন। ক্ষতি কি? তাজমহলের রোমান্সের আবরণ খসাইয়া ফেলিবার উদ্দেশ্যে ইতিহাসের বাস্তব সাজাহানকে টানা-হেঁচড়া করার মধ্যে সস্তা বাহাদুরী থাকিতে পারে, কিন্তু গর্ব করার কোন কারণ দেখি না।

* * * *

বাইবেলে যীশু খৃষ্টকে যেরূপে আমরা পাই, বাস্তব যীশু ঠিক সেইরূপই ছিলেন কি ছিলেন না তাহাতে পৃথিবীর কিছুই যায় আসে না। তাহা লইয়া ঐতিহাসিক গবেষণা করিয়াও কোন লাভ নাই। আমাদের আদর্শ যীশু খৃষ্টকে লইয়া দরকার, যীশু খৃষ্ট ব্যক্তিটি ঠিক ঐরূপ ছিলেন কি না বা আদৌ ছিলেন কি না তাহা অবান্তর। Alter Baxtonএর ভাষায় "It is of no consequence to us what Jesus the actual man was exactly like or even whether or not be actually existed in flesh and blood. We are concernd with Jesus the idea; let us adore the ideal Jesus."

রামায়ণে যে রামচন্দ্রের আদর্শ চরিত্রে মুগ্ধ হইয়া আমরা আজিও তাঁহার স্মৃতির পূজা করি এবং রাম-রাজত্ব বলিতে আদর্শ সুশাসন বুঝিয়া এবং বুঝাইয়া থাকি, তিনি বাস্তব জীবনে মোটেই ঐরূপ আদর্শ-চরিত্রের লোক ছিলেন না বলিয়া কোনও মহাপণ্ডিত ধুরন্ধর গবেষক যদি নিঃসংশয়ে প্রমাণ করিয়াও দেন, তাহা হইলে বলিব "মহাশয়, আপনার অগাধ পাণ্ডিত্য এবং ততোধিক অগাধ গবেষণিক পরিশ্রমের জন্য আপনাকে আন্তরিক অভিনন্দন জানাইতেছি, তিন্তু আপনার রামচন্দ্র আপনারই থাকুক। আমাদের রামায়ণের রামচন্দ্রকে লইয়াই আমরা খুশি থাকিব।"

এবং কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের ভাষায় মহর্ষি নারদ মহাকবি বাল্মীকিকে যে বাণীটি দিয়াছিলেন তাহা সানন্দে এবং সাগ্রহে স্মরণ করিব:

"সেই সত্য যা রচিবে তুমি,
ঘটে যা তা সব সত্য নহে।
কবি, তব মনোভূমি
রামের জনম-ভূমি
অযোধ্যার চেয়ে সত্য জেনো।"

অনুবাদসাহিত্য

মাটি

এইচ ই বেটস্

(ক)

জনসনদের সম্বলের মধ্যে ছিল মাত্র খানিকটা জমি। অনেক সময়ই মনে হতো এ ছাড়া বুঝি আর কিছুই নেই তাদের। অবশ্য আরও কিছু সম্পত্তি ছিল তাদের যেমন—একখানা লাঙ্গল, একটা দু'-চাকার গাড়ি, কিছু যন্ত্রপাতি আর একটা ধূসর রঙের কঙ্কালসার খচ্চর। এই খচ্চরটাই তাদের চার একর পরিমাণ জমিটার উপর দিয়ে লাঙ্গল আর গাড়িখানাকে টেনে নিয়ে যেতো। কিন্তু জমি না থাকলে এই জিনিসগুলো নিতান্তই অপ্রয়োজনীয়। অবশ্য এসব ছাড়াও তাদের একটি ছেলে ছিল। ছেলের নাম বেঞ্জি। ত্রিশ বছরেরও আগে থেকেই তারা ধারণা করে রেখেছিল যে তাদের ছেলেটির মাথা ঠিক নেই। তাই বলে সে যে পাগল কিম্বা জড়বুদ্ধি অথবা লিখতে পড়তে জানত না কিম্বা গুনতে পারত না তা নয়, কিন্তু তবুও কেমন যেন সাদা-সিধা ধরণের ছিল সে—ঠিক যেন অন্য ছেলেদের মতো নয়। একমাত্র ছেলে বলে জনসনরা অত্যন্ত সদয় ছিল তার উপর—তা ছাড়া তার জন্য দুশ্চিন্তারও তাদের অন্ত ছিল না। তার বয়স যতই বাড়তে লাগল, তাদের চোখে সত্যি করে যতটা নয় তার চেয়ে ঢের বেশি অল্পবুদ্ধি বলে প্রতীয়মান হতে লাগল সে।

বেঞ্জির অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ছিল বেশ বড় আর ঢিলে ধরণের, মুখের উপর নরম আর ঘন দাঁড়ি গোঁফ—সাধারণত সাদা-সিধে লোকদের যেমন থাকে; দেখলেই মনে হতো অত্যন্ত সরল সে। চোখ দুটো নীল—মুখে একটা নির্লিপ্ত হাসির রেখা লেগেই আছে সারাক্ষণ। কিন্তু সেই নীল চোখ আর নির্লিপ্ত হাসির পেছনে মনে হতো, কোথায় যেন সারল্য ধীরে ধীরে চতুরতায় রূপান্তরিত হচ্ছে।

ত্রিশ বছরেরও আগের কথা। জনসনদের যখন ধারণা হল যে, বেঞ্জি যেন ঠিক অন্যদের মতো নয়, তখন তারা তাকে এক ডাক্তারের কাছে নিয়ে যায়। সেই ডাক্তার তাদের বুঝিয়ে দেয় যে, কোন রকমে তার মনে ঔৎসুক্য জাগিয়ে তোলা দরকার তা হলেই ধীরে ধীরে তার মনের সবলতা আসবে। তাকে যে কোন একটা কাজে লাগিয়ে দিতে পারলে খুব ভালো হবে, কেননা তা দ্বারা তার মানসিক বিকাশকে সাহায্য করা হবে। তার দায়িত্ববোধকে পরিপুষ্ট করে তোলার জন্য তাকে কোন একটা বিশেষ কাজে উৎসাহিত করে তোলা প্রয়োজন। সেই ডাক্তার আরও বলেছিলেন যে, "তোমরা ত গেরস্থ লোক—ওকে মুরগী রাখার কাজে লাগিয়ে দাও না"

সুতরাং ডাক্তারের উপদেশ মতো বেঞ্জি মুরগী রাখার কাজে নিযুক্ত হল। বেঞ্জির মা আর বাবার কাছে মাটি যা ছিল, বেঞ্জির কাছে মুরগীও হয়ে দাঁড়াল তাই। অর্থাৎ মুরগীই হল তার সবকিছু। স্কুলের ছুটি হয়ে গেলেই অন্য ছেলেদের সঙ্গে না গিয়ে সে সোজা বাড়ি ফিরে আসত এবং এসেই যেতো মুরগীগুলোকে দেখতে। বাড়ির পিছনের দিকে তার বাবা মুরগীগুলোর জন্য একটা ঘর করে দিয়েছিল, সেখানেই সে রাখত তার মুরগীগুলোকে। প্রথম দিকে ঘরটা ছিল ছোট সাদা, কালো, ধূসর সব রঙে এবং সব জাতির মিলিয়ে দশটা কি বারোটা মোটে মুরগী ছিল তখন তার। এখান থেকে ওখান থেকে কুড়িয়ে শস্য কিম্বা রুটির টুকরা যা সে যোগাড় করতে পারত তাই খেতে দিতো মুরগীগুলোকে। নগণ্য প্রাণী বলেই বোধ হয় অতি সামান্য যত্নেই অল্পদিনের মধ্যেই মুরগীগুলো বেশ পরিপুষ্ট হয়ে উঠল। মুরগী সম্বন্ধে প্রথম এবং শেষ কথা বেঞ্জি জেনে রেখেছিল যে, ডিম দেবার জন্যই মুরগীর অস্তিত্ব। যে সময়ের কথা বলছি তখনও মুরগী পোষা ব্যাপারটা বৈজ্ঞানিক উপায়ে অনুষ্ঠিত হতো না। তা ছাড়া খুব লাভজনকও ছিল না ব্যাপারটা। কেননা ডিম তখন অত্যন্ত সস্তা ছিল। তাই মাটির বুক থেকে নিজের চেষ্টায় আহার্য জোগাড় করেই তখন মুরগীকে বেঁচে থাকতে হতো এবং সাধারণ একটা কাঠের বাক্সে খড়ের উপর বসে তাকে ডিম পাড়তে হতো।

মুরগীর ব্যবসা সম্বন্ধে আরও একটা কথা বুঝে নিয়েছিল বেঞ্জি যে, ডিম বিক্রি করে টাকা পাওয়া যায়। প্রথম দিকে গ্রাম্য ফেরিওয়ালাদের কাছেই তার ডিমগুলো বিক্রী হতো এবং ডিম বিক্রি করে যে পয়সা পাওয়া যেতো অত্যন্ত যত্নের সঙ্গে তা জমিয়ে রাখা হতো একটা সাদা রঙের পাত্রের মধ্যে। রান্না ঘরের সব চেয়ে উঁচু তাকটিতে সেই পাত্রটা থাকত বলে বেঞ্জি সেটা নাগাল পেত না। একদিন বেঞ্জির মা বলল তাকে—"এই যে টাকা হয়েছে এ একদিন তোমারই হবে—জানলে। আমি আর তোমার বাবা এই টাকা জমিয়ে রাখছি—যখন অনেক টাকা জমবে তখন ব্যাঙ্কে রেখে দেবো—ব্যাঙ্ক সুদ দেবে। তারপর তোমার বয়স যখন একুশ হবে তখন তুমিই হবে এই টাকার মালিক। তুমি যা খুসী তাই করতে পারবে তখন এই টাকা দিয়ে। বুঝলে ত?" বেঞ্জি একটু সরল হাসি হেসে বলল তার মাকে যে সে বুঝছে।

যতই দিন যেতে লাগল বেঞ্জিও বাড়াতে লাগল তার মুরগীর সংখ্যা। সুতরাং ডিমের সংখ্যাও বাড়তে লাগল ক্রমে। চৌদ্দ বছর বয়সের সময় বেঞ্জি যখন স্কুল ছাড়ল তখন তার মুরগীর সংখ্যা প্রায় পঞ্চাশের কোঠায় গিয়ে ঠেকেছে। সপ্তাহে সে তখন প্রায় তিনশ ডিম পায়। গ্রাম্য ফেরিওয়ালাদের পক্ষে অত ডিম কেনা সম্ভব নয়। তাই প্রতি সপ্তাহে একটা গাড়ীতে ডিমের ঝুড়ি বোঝাই দিয়ে তিনবার সে সবচেয়ে নিকটবর্তী শহরে যেত ডিম বিক্রি করতে। বেঞ্জি যখন থেকে শহরে যেতে শুরু করেছে, তখন থেকেই টাকা আগের সেই পাত্রে গচ্ছিত না হয়ে জমা হচ্ছে ব্যাঙ্কে গিয়ে। বেঞ্জি স্কুলে যাতায়াত করেছে সুতরাং সে পড়তে পারত। একদিন সে একটা কাগজে পড়লো যে, শ্রেণী হিসাবে মুরগীগুলোকে আলাদা আলাদা রাখা ভালো। যেমন সাদা লেগহর্ণ থেকে রোড আইল্যাণ্ডসকে পৃথক করে রাখা উচিত, আবার বুড়ো মুরগীগুলোকে আলাদা করে রাখা উচিত যুবক মুরগীগুলো থেকে। তার অর্থই মুরগীদের জন্য আরও নূতন ঘরের দরকার। বেঞ্জি আরও একটি কাগজে পড়েছিল যে, মুরগীদের খোলা হাওয়া ও ব্যায়াম দরকার, তাছাড়া তাদের ঘুমাবার জন্য চাই স্বাস্থ্যকর ঘর। বেঞ্জি অত্যন্ত সবল ছিল। সুতরাং তারের জালকে কাঠে লাগানর মত সোজা ব্যাপারটা সে অতি সহজেই বুঝে ফেলল এবং মুরগীদের শ্রেণী হিসাবে যাতে আলাদা আলাদা রাখা যায় তার ব্যবস্থা করবার জন্য নিজেই মুরগীর ঘর তৈরী করতে লেগে গেল। এইসব করতে খানিকটা জায়গার প্রয়োজন। সুতরাং তার বাবা আর মা তাদের বাড়ি আর জমির মাঝামাঝি খানিকটা জায়গা ছেড়ে দিল তাকে। এর আগে বোধ হয় এর

চেয়ে বেশি মূল্যবান আর কোন জিনিস তারা দেয়নি তাকে কোনদিন। অর্থাৎ না বুঝে এই প্রথম তারা তাকে একখণ্ড মাটি দিয়ে দিল।

সমস্ত জীবন ভরে প্রায় অযথাই বেঞ্জির বাবা আর মা তাদের জমিটুকু নিয়ে কঠোর সংগ্রাম করে এসেছে। তাদের মনে একটা বিশ্বাস গড়ে উঠেছিল যে, সারল্যের আওতা থেকে তাদের বেঞ্জি একদিন বেরিয়ে আসবেই। আরও একটা বিশ্বাস ছিল তাদের যে জমিই তাদের দারিদ্র্য ঘুচাবে। কিন্তু জমি থেকে আশানুরূপ ফসল তারা পায়নি কোনদিনই। এবং এই ফসল না পাওয়ার জন্য দোষ জমির নয় তাদেরই। কেননা জীবনের বেশীর ভাগ সময়ই তারা পরিশ্রমের চেয়ে বিশ্বাসের উপর নির্ভর করে এসেছে বেশী।

বেঞ্জির বাবা অনেক বছর ধরে প্রচারকের কাজ করছে। এবং সত্যি করেই লোকটার কথা বলার ক্ষমতা ছিল। গ্রামের গির্জার শান্ত পরিবেশের মধ্যে দাঁড়িয়ে রবিবার সমবেত উপাসকদের সামনে বক্তৃতা করতেই যে কেবল সে পছন্দ করত তা নয়। বাড়ির পেছনের দরজার সামনে দাঁড়িয়ে অথবা রাস্তায় দাঁড়িয়ে লোকেদের ডেকে কথা বলতেও সে ভালো বাসত। এত কথা বলে বলেই বোধ হয় তার একটা ধারণা গড়ে উঠেছিল যে, ভগবানের সৃষ্ট মাটিকে উর্বর করে তুলতে কারোও যত্নের প্রয়োজন নেই। তাই সে যখন কথা নিয়ে ব্যস্ত থাকত তখন আগাছা জন্মে তার জমির ফসলগুলোর গলা টিপে ধরত—খরগোস এসে দাঁত বসাত কাঁকিগুলোর গায়ে—ঝড় এসে নষ্ট করে দিয়ে যেতো তার ক্ষেতের খাড়া শস্যগুলোকে। সে সংগ্রাম করত দুরদৃষ্ট কর্তৃক শৃঙ্খলিত মানুষের মত। তার ক্ষেতে যে ভালো ফসল হয় না তা সে জানত, আর জানত বেঞ্জি অত্যন্ত সরল। ভগবানে অতিরিক্ত বিশ্বাস এবং তার আলস্যেমির জন্যই যে তার জীবনের হত দুর্ভোগ সে কথা কেউ তাকে সাহস করে বলেনি কোনদিন, কিম্বা বলার প্রয়োজন মনে করেনি।

বেঞ্জির বাবা যখন কথা নিয়ে ব্যস্ত থাকত, বেঞ্জি তখন মশগুল হয়ে থাকত তার মুরগী আর ডিমের ব্যবসা নিয়ে। বাড়ির পেছনের জমির খানিকটা অংশে সারাদিন ছুটোছুটি করে বেড়াত তার বিবিধ রঙের মুরগীগুলো। অনেকদিন আগে থেকেই তার ডিমের সংখ্যা এত বেড়ে গেছে যে তার দুচাকার গাড়িখানাতে আর কুলায়নি। তাই মাঝে মাঝেই তাকে ধার করতে হচ্ছে তার বাবার ঘোড়া আর গাড়িখানা ডিমগুলোকে শহরের বাজারে নিয়ে যেতে। সরল মানুষের সরল হাসি তার মুখে লেগেই আছে সারাক্ষণ। আর ডিম বিক্রীর টাকা নিয়মিত গচ্ছিত হচ্ছে গিয়ে ব্যাঙ্কে তার নামে।

(খ)

বেঞ্জির যখন একুশ বছর বয়স তখন তার বাবা আর মা একটা ছোটখাটো উৎসবের আয়োজন করল। খাবার সময় ছোট্ট একটা বক্তৃতা দিয়ে বেঞ্জির বাবা যা বলল তার মর্মার্থ এই যে, সমস্ত জীবন নিষ্ঠার সংগে পরিশ্রম করার ফলেই আজ বেঞ্জির জন্য সে কিছু অর্থ সঞ্চয় করে রাখতে পেরেছে। এমন ভাবে কথাগুলো সে বলল যে, মনে হলো সে যেন কোন অবোধ শিশুর কাছে বলছে কথাগুলো। কথা শেষ করে সে ব্যাঙ্কের পাশ বইখানা দিল বেঞ্জির হাতে।

—এটাকা এখন থেকে তোমার হলো—তোমার একুশ বছর বয়স হয়েছে সুতরাং এ টাকার মালিক এখন তুমি, বুঝলে বেঞ্জি?

হ্যাঁ বলেই বেঞ্জি পাশ বইখানা গ্রহণ করল বাবার হাত থেকে। তারপর পাশ বইখানা খুলে দেখল দু'শ ত্রিশ পাউণ্ডেরও কিছু বেশী আছে তাতে। পাশ বইখানা দেখা হয়ে গেলে সে নির্লিপ্তের মত পকেটে পুরে রাখলো সেটা।

বেঞ্জির বাবা কিম্বা মা কোনই কথা বলল না আর। কেমন একটা অদ্ভুত অনুভূতি তাদের অভিভূত করে ফেলল যেন—নিরাশা, ভয়, গর্ব এবং বেদনার একটা মিশ্র অনুভূতি। বেঞ্জির পাশ বইয়ে যে টাকার অঙ্ক ছিল অত টাকা তার বাবা আর মা সমস্ত জীবনেও জমি থেকে সঞ্চয় করতে পারেনি। তারা

আশা করেনি কিম্বা ইচ্ছাও করেনি যে বেঞ্জি পাশ বইখানা আবার তাদের হাতেই ফিরিয়ে দেবে; কিন্তু তবুও বেঞ্জি যখন নির্লিপ্তের মতো পাশ বইখানা নিজের পকেটে পুরে রাখল তখন অত্যন্ত আঘাত পেলো তারা—কেউ তাদের মুখের উপর একটা ঘুষি মারলো যেন। একটু অন্যরকম আশা করেছিল তারা। টাকা সঞ্চয়ের ব্যাপারে তারা সাহায্য করেছে বলে মনে করেছিল যে বেঞ্জি তাদের ধন্যবাদ দেবে কিম্বা বলবে যে, "তোমাদেরও ত' অংশ আছে এই টাকাতে। কিন্তু বেঞ্জি কোন কথাই বলল না। বেঞ্জির এই ঔদাসীন্য তাদের আঘাত করলেও তাদের মনে সে আঘাত বেশীক্ষণ স্থায়ী হতে পারেনি। কেননা বেঞ্জির বয়স বাড়লেও তাদের চোখে বুদ্ধি বাড়ে নি, হাজার হোক সে সরল। এইসব ব্যাপার বুঝবার মত বুদ্ধিই নেই তার। এইসব মনে হতেই তার জন্য অনুকম্পা বোধ না করে পারল না তারা।

—এই টাকা দিয়ে কি করবে—প্রশ্ন করল তারা।

খানিকটা জমি কিনব ইচ্ছা করেছি—উত্তর দিল বেঞ্জি।

জমি! কিসের জমি? কোথায়?

আমাদের জমিটার পাশের চার একর জমিটা মিঃ হুইট মুর বিক্রী করতে চাচ্ছে—সেটাই কিনব বলে মনস্থ করেছি। বেঞ্জি বলল।

কিন্তু তুমি জানলে কি করে যে, জমিটা বিক্রী হচ্ছে! কি করে খোঁজ পেলে তুমি?

বেঞ্জির উত্তর অত্যন্ত সরল। আমি হুইট মুরকে জিজ্ঞাসা করে জেনেছি—সে বলল।

"খুব ভালো কথা," তারা বলল—"চমৎকার প্রস্তাব, এর চেয়ে ভালো কিছু করা হয়ত সম্ভবই হতো না তোমার দ্বারা।"

সময় এগিয়ে চলল। বেঞ্জি দখল করল জমিটা। বেঞ্জির বাবা আর মা পুত্রের কৃতিত্বে রীতিমত গর্ব অনুভব করতে লাগল। শিশু প্রথম কথা বলার সময় কিম্বা প্রথম হাঁটতে শেখার সময় পিতা-মাতা যে রকম গর্ব অনুভব করে, বেঞ্জির বাবা আর মাও ঠিক সেই ধরণের গর্ব অনুভব করতে লাগল। সরল বেঞ্জি এই প্রথম স্বাভাবিক এবং সংসারী লোকদের মত পদক্ষেপ করেছে। কারোর সাহায্য এবং উপদেশ না নিয়েই সে জমিটা কেনার ব্যবস্থা করতে পেরেছে বলে তারা বেশ একটু আশ্চর্যান্বিতই হল। সারা জীবন তারা তাকে শিশুর মতো অবোধ বলেই ভেবে এসেছে এবং ভেবে রেখেছে যে, সে চিরদিন অবোধই থাকবে। কিন্তু হঠাৎ যেন সে বড় হয়ে উঠেছে—সে আর শিশু নয় যেন। তারা যেন ধারণাই করতে পারছিল না ব্যাপারটা। কিন্তু তারা ধারণা করতে না পারুক—তবু বেঞ্জি আজ জমির মালিক।

পরের চার পাঁচ বছরের মধ্যে বেঞ্জি তার মুরগী আর মুরগীর ঘরের সংখ্যা অনেক বাড়িয়ে ফেলল। ফলে সে পেলো আগের চেয়ে অনেক বেশি ডিম এবং তার বিনিময়ে অনেক বেশি টাকা। কিন্তু তখনও সে আগের সেই অবোধ বেঞ্জিই আছে। ফাটকা বাজারের খোঁজ খবরও সে রাখত না কিম্বা জানত না কি করে এক জোড়া জুতা তৈরী করাতে হয়। এসব না জানলেও মুরগী সম্বন্ধে কিন্তু সব কিছুই জানত সে। মুরগীই তার সব। তার বাবা আর মার কাছে মাটি যা তার কাছে মুরগীও ছিল তাই। সুতরাং মুরগী সম্বন্ধে কোন কিছুই অবিদিত ছিল না তার কাছে। কিন্তু বেঞ্জির মুরগী আর তার বাবা-মার মুরগীগুলো ছিল বেঞ্জির নিজস্ব, কিন্তু জমির মধ্যে মাত্র একটা পার্থক্য ছিল। মুরগীগুলো ছিল বেঞ্জির নিজস্ব, কিন্তু জমিটা বেঞ্জির বাবা-মার নিজস্ব সম্পত্তি ছিল না। স্যাণ্ডার্স বলে একটা লোকের কাছ থেকে চল্লিশ বৎসরের জন্য তারা জমিটা বন্দোবস্ত নিয়েছিল। সেজন্য প্রতি বছরই জমিটার জন্য তাকে ভাড়া দিতে হত। অনেকবার তারা জমিটা কিনবে বলে মনস্থ করেছে, কিন্তু যে কোন কারণেই হোক শেষ পর্যন্ত জমিটা আর কেনা হয়ে ওঠেনি। কোন ব্যবসার প্রস্তাব উত্থাপন করার চেয়ে বেঞ্জির বাবার পক্ষে দরজায় দাঁড়িয়ে লোকের সঙ্গে গল্প করা কিম্বা বেদীর উপর দাঁড়িয়ে বক্তৃতা করা অথবা ভগবানের উপর বিশ্বাস করা অনেক সহজ ব্যাপার ছিল। আর এখন এই পঁয়ষট্টি বছর বয়সে—টাকা যোগাড় হলেও, জমি কেনবার কথা উঠিয়েই বা লাভ কি?

হঠাৎ জমিটা বিক্রীর কথা উঠল। তাদের জমি তাদের মাটি, এক কথায় তাদের সর্বস্ব বিক্রী হতে চলেছে। শহর বাড়ছে—স্যাণ্ডার্স বলছিল, "সব জায়গায়ই লোকজন জমি চাচ্ছে ইমারত গড়বে বলে। সুতরাং জমি সে বিক্রী করবেই তা সে তাদের কাছেই হোক আর অন্যের কাছেই হোক।

হঠাৎ তারা দিশেহারা হয়ে পড়ল যেন। এমন একটা সংবাদের জন্য মোটেই প্রস্তুত ছিল না তারা। ভগবানের উপর অনন্ত বিশ্বাস নিয়ে তারা জীবনযাপন করেছে এতদিন। উদ্দেশ্যহীন ভাবে লালন করেছে নিজেদের একমাত্র সহজবুদ্ধি সন্তানকে। বাঁচতে হলে যে নিজের বুদ্ধিবৃত্তিকে সজাগ রাখতে হয়, একথাই তারা ভাবেনি কোনদিন। তাই আজ তারা সবকিছু থেকে বঞ্চিত হতে বসেছে। যে মাটিটুকুকে আঁকড়ে তারা এতদিন বেঁচে ছিল, সে মাটিটুকুও আজ তাদের হাতছাড়া হতে চলেছে।

কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে তারা স্যাণ্ডার্সের কাছে গিয়ে উপস্থিত হল—ব্যাপার কি জানবার জন্য।

আমাদের পক্ষে টাকা সংগ্রহ করা সম্ভব নয়—বলল বেঞ্জির বাবা—"সুতরাং শেষ পর্যন্ত আমাদের হয়ত বাড়িই ছাড়তে হবে।"

"তার আমি কি করব বলুন"—স্যাণ্ডার্স উত্তর দিল—"আপনাদের যা খুসি করবেন। আমি আপনাদের শুধু এই বলতে পারি যে, আপনারা জমিটা না কিনলে কাছেরই কেউ কিনবে এটা।"

"কে কিনবে—"—তারা জিজ্ঞাসা করল।

"বেঞ্জি"—উত্তর দিল স্যাণ্ডার্স।

তাদের জীবনের সব চেয়ে উল্লেখযোগ্য মুহূর্তের সামনে এসে দাঁড়িয়েছে তারা এই অনুভূতি নিয়ে তারা বাড়ি ফিরে গেল। তারা যেন কিছু পুরস্কার পাচ্ছে কিম্বা পাবে। তাদের মনে যে বিশ্বাসের ভিত্তি নড়ে উঠেছিল তা যেন আবার দৃঢ় হয়েছে। তারা দেখল যে, অল্পবুদ্ধি সন্তানকে পালন করেও শান্তি ও আনন্দ পাওয়া যায়—ফল শেষ পর্যন্ত ভালই হয়।

আমরা বেঞ্জিকে চিনিনি এতদিন—ধারণাও করতে পারিনি আমাদের বেঞ্জি শেষ পর্যন্ত জমি কিনবে—বলল তারা।

"হ্যাঁ, বেঞ্জি এই জমি দিয়ে কি করবে তুমি?"

"আমাকে মুরগীর ঘর আরও বাড়াতে হবে—তাই প্রয়োজন জমিটা। বেঞ্জি উত্তর দিল।

আবার তারা যখন বেঞ্জিকে পাশ বই-খানা দিল কোনই কথা বলল না তারা। অন্য রকম কিছু হয়ত প্রত্যাশা করেছিল তারা বেঞ্জির কাছ থেকে, কিন্তু সেটা যে কি তা তারা নিজেরাই জানত না—একটা কথা? একটা অঙ্গীকার মাত্র যে আগের মতই সব চলবে? কিন্তু তাদের প্রত্যাশা সফল হল না। বেঞ্জি নীরবে পাশ বইখানা গ্রহণ করল,—একটা কথা পর্যন্ত বলল না—একটা ধন্যবাদ পর্যন্ত দিল না তাদের।

ক্ষণিকের জন্য অত্যন্ত বেদনা অনুভব করল তারা। তারপর হঠাৎ তাদের মনে পড়ল তাদের পুত্র অল্পবুদ্ধি—সরল। সুতরাং অল্পবুদ্ধি সরল মানুষদের অনেক কিছুই ক্ষমার যোগ্য। কেননা তারা জানে যে, অল্পবুদ্ধি যারা তারা সব সময় সব কিছু বুঝে উঠতে পারে না।

বেঞ্জির বয়স তখন প্রায় চল্লিশের কাছা-কাছি। কিন্তু তার বাবা আর মার কাছে তখনও সে সেই আগের অবোধ শিশুই আছে। তার বাবার জমিটুকু ক্রমে ক্রমে ঢাকা পড়তে শুরু করেছে তার মুরগীর ঘরগুলোর নীচে। যেখানে একদিন ফসল ফলত সেখানে বেঞ্জির বিবিধ রঙের আর জাতির মুরগীগুলো ছোটাছুটি করে বেড়ায়—আহার্য খোঁজে। ক্রমশ শহরের

সেই অঞ্চলে বোঁজ্ঞ সব চেয়ে বড় মুরগী ব্যবসায়ী বলে পরিচিত হয়ে পড়ল। তার চেহারাও বদলে গেল অনেকখানি। তার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গগুলো সব সময়ই একটু বড় ছিল—এখন তাকে রীতিমত মোটা বলা চলে। তার চোখ ঠিক আগের মতই নীল আছে—আর তার মুখের উপর রয়েছে একই ঘন নরম দাড়িগোঁফ, কিন্তু মোটা হওয়ার দরুণ এখন তার চোখ দুটোকে অনেক ছোট বলে মনে হয়। এখন তার চোখ-দুটোকে সরল মানুষের চোখ বলা চলে না—বরং বলা চলে চতুরতা তার চোখ দুটোতে যেন জ্বল জ্বল করছে।

বোঁজ্ঞ নিজে ছাড়া আর কেউ জানত না কতটি মুরগী আর মুরগীর বাচ্চা আছে তার। সমবায় সমিতির লরী এসে তার কাছ থেকে কতটি ডিম নিয়ে যায় প্রতি সপ্তাহে তাও কেউ বলতে পারবে না। আর কেউ বলতে পারবে না তার পাশ বইয়ে টাকার অঙ্ক কত। তার ব্যবসার যে উন্নতি হচ্ছে এ বুঝা সম্ভব কেবল তার ক্রমবর্দ্ধমান মুরগীর ঘর আর মুরগীর সংখ্যা দেখে, আর দেখে যে তাকে সাহায্য করবার জন্য লোক নিয়োগ করতে হচ্ছে তাকে।

যেসব লোকদের নিয়েছিল বোঁজ্ঞ তার মধ্যে একটি মেয়েও ছিল—নাম ফ্লোরেন্স। মেয়েটির স্থূল পা, ঝুলে পড়া ঠোঁট আর ভাবহীন চোখ দেখলেই মনে হতো বোঁজ্ঞরই যোগ্য যেন সে। মুরগীর খাঁচা-গুলো পরিষ্কার করতে ফ্লোরেন্স যখন উবু হতো তখন তার মোজার উপরের খানিকটা নগ্ন মাংস চোখে পড়ত বোঁজ্ঞর, তা ছাড়া ফ্লোরেন্সের জামার নীচে সুপুষ্ট স্তনের ছায়াও দৃষ্টি আকর্ষণ করত তার। অল্প কদিনের মধ্যেই গরম আধো অন্ধকার ডিম ফোটানোর ঘরের মধ্যে বোঁজ্ঞ ফ্লোরেন্সের কোমর ধরতে শুরু করল এবং তার জীবনে এই প্রথম মুরগী ছাড়াও অন্য কিছুর ওপর ঔৎসুক্য দেখা যেতে লাগল।

বোঁজ্ঞ স্পষ্ট বুঝতে পারল যে, তার বাপ কিম্বা মা কেহই এই সাদাসিধা, মুখরা ফ্লোরেন্সকে ভালো চোখে দেখে না। কিন্তু তার ত বুদ্ধিমতী, উল্লেখযোগ্য মেয়ের প্রয়োজন নাই পাওয়া গেলেও না। মুরগীর ব্যবসায় তাকে সাহায্য করবার জন্য একজন স্ত্রীলোক হলেই হলো তার। সুতরাং কদিন পর থেকেই সে বলে বেড়াতে লাগল যে, ফ্লোরেন্সকে বিয়ে করবে সে।

তার বাবা কিম্বা মা এবারেও প্রস্তুত ছিল না এই ধরণের একটা সংবাদ শুনবার জন্য।

"বিয়ে? যেমন ছিলো সেই কি ভালো ছিল না? ভাবতে একটু সময়ও নেবে না? আর যদিবা বিয়েই কর কোথায় থাকবে?"

কেন এইখানেই—বোঁজ্ঞ জবাব দিল।

সেই শরৎকালেই বেঞ্জি ফ্লোরেন্সকে পত্নী হিসারে নিয়ে বাড়িতে এসে ঢুকল।

সামনের শুবার ঘরটা চাই আমাদের—বেঞ্জি বলল।

সমস্ত জীবন বেঞ্জির বাবা আর মা সামনের সেই ঘরটায় শুয়ে এসেছে। এবার তাদের সেই ঘর ছেড়ে দিয়ে পিছনের ঘরে সরে যেতে হলো। তারা সরে গেল বটে, কিন্তু অত্যন্ত আঘাত পেল মনে। বাড়ির মালিক এখন বেঞ্জি এবং বেঞ্জিই চেয়েছে ঘরটা, সুতরাং বিনা প্রতিবাদে ঘরটা ছেড়ে দিতে হলো তাদের। তাদের আগের দীর্ঘ ইতিহাসের পরিধি আরও একটু বাড়ল। তারা মনে মনে ক্ষমা করল বেঞ্জিকে কেননা সে সরল—সে অবুঝ।

কিন্তু মেয়েটি সম্বন্ধে সমস্যা অন্যরকম। তাদের মনে হলো সে যেন তাদের বেঞ্জিকে ছিনিয়ে নিয়ে যাচ্ছে তাদের কাছ থেকে। বাড়ির আবহাওয়া ঈর্ষায় আর শত্রুতায় ক্রমশই বিষাক্ত হয়ে উঠতে লাগল। বাইরে থেকে বুঝা না গেলেও সত্যি করে ভিন্ন হয়ে গেল তারা। এ পর্যন্ত চারজনেই একত্রে খেতো, কিন্তু ফ্লোরেন্সের বাসন মাজা হঠাৎ বেঞ্জির মার অপছন্দ হতে লাগল।

আমরা ও সব সময় সোডা দিয়েই বাসন মেজে এসেছি—বাসন মাজাও তাতে খারাপ হয়নি। এখন শুনছি, সোডায় নাকি বাসন-পত্র ভাল হয় না। কালে কালে আরও কত শুনব।

বেঞ্জি যখন ঝগড়ার কথা শুনল- অত্যন্ত সহজে মীমাংসা করে দিল সে ব্যাপারটা। সে বলল মাকে—"ঝগড়া করে কাজ নেই। তোমরা রান্না ঘরে খেও, আর আমরা অন্য ঘরে খাব, তাহলেই গোলমাল হবে না কিছু।

সারাটা শীতের সময় বেঞ্জি আর তার স্ত্রী বাড়ির এক অংশ নিয়ে রইল আর অন্য অংশে রইল তার বাবা আর মা। বৃদ্ধদের দিন যেন আর কাটতে চায় না। জমিটার দিকে তাকালেই বুঝতে পারে তারা দিনগুলো যেন তাদের কাছে দীর্ঘ মনে হয়। যেখানে একদিন ধূসর মাটি ছিল—ছিল সারি সারি মটরশুটি আর যব, সেখানে এখন বেঞ্জির মুরগীর ঘরগুলি কেবল চোখে পড়ে। সেই এক মাটিই আছে—কিন্তু সে মাটি সম্বন্ধে আজ আর কোন ঔৎসুক্যই নেই তাদের। আজ আর তারা সে মাটির মালিক নয়। তাদের লাঙ্গল, গাড়ি, খচ্চর আর যন্ত্রপাতি অকেজো হয়ে পড়ে আছে প্রাঙ্গণের এক পাশে। জমি না থাকলে এই সব জিনিস যে নিষ্প্রয়োজনীয় তা এর আগে আর তারা এমন করে বুঝতে পারেনি।

শীত এগিয়ে চলল। চারজন লোকই আবদ্ধ হয়ে পড়ল ঘরের ভিতর। ফলে তাদের মধ্যেকার পার্থক্য ক্রমশ স্পষ্টতর হয়ে উঠতে লাগল। বাড়ির দুজন নারী সিঁড়ির উপর দিয়ে চলে যেত পরস্পরের প্রতি কটাক্ষ হেনে, কিন্তু কেউ কারো সঙ্গে কথা বলত না। রবিবার বেঞ্জির বাবা যখন প্রচার করতে বেরিয়ে যেতো তখন তার পদক্ষেপ দেখে মনে হতো আগের চেয়ে অনেক বুড়ো হয়ে গেছে যেন সে। এইসব সাংসারিক গোলযোগে কেবল বেঞ্জিই বিভ্রান্ত হয়নি—সে আগের মতই তার মুরগী নিয়ে ব্যস্ত। স্বাভাবিক মানুষের ভাবাবেগ যেন তার নিরীহ চোখ আর মুখকে বিদ্ধ করতে পারেনি। তার চোখের দৃষ্টি আগের মতই সরল আর নির্লিপ্ত।

শেষ পর্যন্ত বেঞ্জিই সিদ্ধান্ত করল। সে তার বাবা আর মাকে ডেকে বলল—"তোমাদের অন্য কোথাও যেয়ে থাকাই ভাল।"

"বেঞ্জি"—তারা বলল।

—"তোমাদের অন্য কোথাও যেয়ে থাকাই ভালো। এটা এখন আমাদের বাড়ি। এটা আমাদের চাই। আমি কিনেছি এটা সুতরাং এটা এখন আমার প্রয়োজন।

"বেঞ্জি—" তাদের গলার স্বর কেঁপে গেল।

আমি এটা কিনেছি সুতরাং এটা এখন আমার চাই। বেঞ্জি পুনরাবৃত্তি করল—আমার ইচ্ছা তোমরা চলে যাও।

—বেঞ্জি, আমরা যেতে পারি না—তার মা বলল—কোথায় যাব আমরা—যাবার কোন জায়গা নেই আমাদের—স্থান নেই।

কিন্তু তোমাদের যেতে হবেই—চীৎকার করে বলল্ বেঞ্জি। তার চীৎকার শুনে তারা বুঝল বেঞ্জির মাথা ঠিক নেই। এর আগে বোধ হয় এই কথাটা এর চেয়ে বেশি ভালো করে বোঝেনি তারা। তার সরল নীল চোখ দুটো হঠাৎ রাগে হিংস্র হয়ে উঠল যেন। হঠাৎ বুঝতে পারল তাদের অবোধ বেঞ্জি হয়ত বুঝতেই পারছে না কি বলছে এবং কি করছে সে। তার কাজের জন্য সে দায়ী নয় মোটেই। জীবনে এই প্রথম বেঞ্জির চোখের দিকে তাকিয়ে তারা ভয় পেয়ে গেল।

"বেশ তাই হবে" তারা বলল—যেতে যখন হবেই, তখন যেমন করেই হোক যাব আমরা।

(ঘ)

এক সপ্তাহ পরের কথা। বেঞ্জি তার বাবা আর মাকে সঙ্গে করে নিয়ে গেল শহরে রেখে আসতে। বেঞ্জি নিজেই চালাতে লাগল বসে তার ফোর্ড গাড়িখানা। তার বাবা আর মা চালকের সিটে তারই পাশে বসে রইল। কিন্তু বেঞ্জি নির্লিপ্ত। একটুও চাঞ্চল্য নেই তার মনে। স্নেহ, দুঃখ কিম্বা হতাশা এর কোন কিছুই বুঝবার ক্ষমতা নেই যেন তার। তার অনুভূতি, কথা কিম্বা চিন্তা সবই অত্যন্ত সহজ—শিশুর সারল্যের মতই তা নিষ্ঠুর।

"—শহরেই তোমরা বেশ থাকবে—" বেঞ্জি বলল—"নিজেদের খুশী মতো থাকতে পারবে।"

কোনই জবাব দিল না, তারা মুহ্যমানের মতো চুপ করে শুধু শুনল বেঞ্জির কথাগুলো। চল্লিশ বছর ধরে তারা ভেবে এসেছে তাদের পুত্রের মাথা ঠিক নেই, তাই বোধ হয় শেষবারের মত তারা তাকে ক্ষমা করল নীরবে।

শহরের একটা রাস্তায় গাড়িখানা এসে থামল। দুপাশে গিজ গিজ করছে বাড়িঘর। বেঞ্জি গাড়ি থেকে নামল না। তার বাবা আর মার জিনিসপত্র আগেই চলে গেছে, সুতরাং শূন্য হাতে নেমে এসে তারা রাস্তায় দাঁড়াল। তারা গাড়ি থেকে নেমে গেলে বেঞ্জি নির্লিপ্তের মতো তাদের দিকে তাকিয়ে গুটিকয়েক কথা বলল তাদের। তারপর চলে গেল সে গাড়িখানা চালিয়ে।

গাড়িখানা চলে যাওয়ার পর মাটির দিকে তাকিয়ে অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে রইল তারা। তাদের দেখে মনে হচ্ছিল—তারা যেন কোন এক অপরিচিত রাজ্যে এসে পড়েছে। কি করতে হবে—কিভাবে চলতে হবে এখানে কিছুই জানে না তারা।

একদিন তাদের মাটি সম্বল ছিল। কিন্তু আজ তাদের নির্বাক, ম্লান, অবনত মুখ দেখে বলা সম্ভব নয় যে, সত্যি করেই তারা ধারণা করতে পারছে কিনা যে সেই মাটিটুকুও আজ আর তাদের নেই।

অনুবাদক—শ্রীপরেশনাথ সান্যাল

ট্রামে-বাসে

বড়লাট বাহাদুর কর্তৃক আহূত আসন্ন সিমলা সম্মেলনে শেষ পর্যন্ত রাষ্ট্রপতিকে নিমন্ত্রণ করা হইয়াছে। ইহাতে সকলেই সন্তুষ্ট হইবেন সন্দেহ নাই, কেননা ডেনমার্কের রাজকুমারকে বাদ দিয়া হেমলেট অভিনয় হইতে পারে না, একথা সকলেই জানেন। কিন্তু আমরা শুনিলাম দিল্লীর "Dawn" কাগজখানা নাকি সম্মেলনে মৌলানা আজাদের উপস্থিতি বরদাস্ত করিবেন না বলিয়া অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন। ইহাতেও অবশ্য কেহই আশ্চর্য হইবেন না, কেননা "Dawn" কায়েদে আজমের প্রতিষ্ঠিত কাগজ। ওয়াভেল পরিকল্পনা সম্পূর্ণরূপে হজম করিবার আগে সে সম্বন্ধে কোন মতামত প্রকাশ করিতে কায়েদে আজম অক্ষমতা প্রকাশ করিয়াছেন। সুতরাং তাঁরই প্রতিষ্ঠিত কাগজ যদি রাষ্ট্রপতির মর্যাদা ও গুরুত্ব সম্যক উপলব্ধি না করিয়াই উপরিউক্ত মত প্রকাশ করিয়া থাকেন, তবে সেটাকে বদহজম জনিত চোঁয়া ঢেঁকুর বলিয়াই দেশবাসী গ্রহণ করিবেন। সিমলার জলবায়ুতে এঁদের উদরাময় সারিয়া যাক্, এই প্রার্থনাই আমরা করিতেছি।

* * *

রাষ্ট্রপতির কারামুক্তির পর তাঁহাকে বাঁকুড়া হইতে কলিকাতা নিয়া আসার কোন ব্যবস্থাই বাঙলা সরকার করেন নাই। অথচ প্রাক্তন মন্ত্রী পণ্ডিত রবিশঙ্কর শুক্লাকে জব্বলপুরে ফিরিয়া যাইবার জন্য সি পির গভর্ণর নাকি ভাল ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। বাঙলা সরকার বহুদিক দিয়াই দেউলিয়া হইয়া গিয়াছেন, সুতরাং বেচারীদের দোষ নাই। তবে সুখের কথা রাষ্ট্রপতিকে বিনা টিকিটে ভ্রমণ করিতে হয় নাই। স্থানীয় কংগ্রেস কমিটি তাঁহার টিকিট কাটার ব্যবস্থা করিয়া দিয়াছিলেন!

* * *

শিল্পপতি শ্রীযুক্ত বিড়লা বিলাতের ইংরেজদের প্রশংসায় পঞ্চমুখ হইয়া একটি বিবৃতি দিয়াছেন এবং বলিয়াছেন যে,



তাঁহাদের সঙ্গে এদেশে অবস্থিত ইংরেজদের কোন তুলনাই হয় না। অতঃপর তিনি বলিয়াছেন—

I would like to export all Englishmen now in India back to England and import a similar number from among those in England.

বিড়লাজী যে একজন পাকা ব্যবসায়ী তা তাঁর এই ইংরেজ আমদানী রপ্তানীর ব্যাপারে নূতন করিয়া প্রকাশ পাইল। আমরা তাঁকে সবিনয়ে জানাইতেছি যে, এই ব্যবসাতে হাত দেওয়ার আগে কিছুটা বিলাতের মাটি আমদানীর ব্যবস্থাও যেন তিনি করেন; কেননা, আমাদের দেশের মাটিতে পা দিলেই বিলাতী সাহেব স্বদেশী সাহেব হইয়া যাইবে এবং তখন দেখা যাইবে সব শেয়ালেরই এক রা!

* * *

এইবারের ফুটবল লীগ খেলায় কে যে শেষ পর্যন্ত জয়ী হইবেন সেই কথা কেহই বলিতে পারিতেছেন না। প্রায় সবাই যে কথাটা বলিতে পারিতেছেন সেটা এই যে, ভবানীপুরে বৃষ্টি নামিলে তবে খেলিতে



পারিবে না। বৃষ্টি নিশ্চয়ই নামিবে, কিন্তু আমরা যতদূর জানি বৃষ্টির জলে গায়ের জ্বালা কমে না। ডাইনেদের নজর হইতে টিমটাকে বাঁচাইতে হইলে ভবানীপুর কর্তৃপক্ষের উচিত হইবে খেলোয়াড়দের জন্য এক একটা মাদুলি-কবচের ব্যবস্থা করা।

* * *

বিশু খুড়ো ট্রামে চড়িয়াই গড়গড় করিয়া বলিয়া যাইতে লাগিলেন—ধুতি, শাড়ি, লুঙ্গি, শার্টিং, টুইল, লংক্লথ, পপ্লিন, মার্কিন, ভয়েল, নাইনসুক, বেডটিকিন, সুজনী, কোটিং, প্রিণ্টস, মিল খাদি—আমরা সমস্বরে—কোথায়? কোথায় পাওয়া যায়? বলিয়া চেঁচাইয়া উঠিলাম। খুড়ো আধপোড়া বিড়িটায় একটা টান দিয়া গম্ভীর হইয়া বলিলেন—"বিজ্ঞাপনে!"

চ্যারিটি ফুটবল ম্যাচ খেলায় বসিবার বিলিবন্দোবস্ত ব্যাপারে যে পর্যন্ত না পুলিশ সমস্ত দায়িত্ব আই এফ এ'র হাতে ছাড়িতেছেন, সে পর্যন্ত আই এফ এ কোন চ্যারিটির ব্যবস্থা করিবেন না বলিয়া একটি প্রস্তাব পাশ করিয়াছেন। সমাসন্ন রবীন্দ্র



মেমোরিয়েল ফাণ্ডের জন্য চ্যারিটি খেলার আগে এই প্রস্তাবে আমরা শঙ্কিত হইয়া পড়িয়াছি। যাহা হউক, লাট সাহেবকে খেলা এবং বিশেষ করিয়া চ্যারিটি খেলা পরিচালনায় আই এফ এ'র অসুবিধাগুলির সঙ্গে পরিচয় করাইয়া দিবার জন্য একটি ডেপুটেশনের ব্যবস্থা নাকি কর্তৃপক্ষ করিয়াছেন। শুধু মুখের কথার পরিচয়ে লাট সাহেব যে সন্তুষ্ট হইবেন না, সে পরিচয় বাজারের মাছি তাড়াইবার ব্যাপারে আমরা পাইয়াছি। সুতরাং আই এফ এ'র কাছে আমাদের বিনীত পরামর্শ এই যে, অন্তত রবীন্দ্র মেমোরিয়েলের জন্য চ্যারিটি তারা হইতে দিন এবং ঐ দিনের খেলায় লাট সাহেবকে রেম্পার্টে দাঁড়াইয়া খেলা দেখিতে অনুরোধ করুন। পুলিশ কমিশনার সাহেবও রেম্পার্টে জায়গা না পাইলে গাছে চড়িয়া খেলা দেখুন। তাহা হইলে জনসাধারণের অবস্থাটা তাঁরা বুঝিবেন!

* * * *

পলতার জলের কলের কলকব্জা সামান্য একটু বিগড়াইয়াছে বলিয়া পরিস্রুত জল পাইতে নগরবাসীর কয়েক দিন একটু অসুবিধা হইবে বলিয়া একটি বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হইয়াছে। ব্যাপারটা জলের মত পরিষ্কার হইয়া গেল যে—জলও আমাদের পক্ষে দুর্লভ! ইহাতে অবশ্য আমাদের দুর্ভাবনার কারণ নাই। প্রকৃতির বদান্যতায় অচিরেই হয়ত বর্ষা নামিবে, তখন "কর স্নান নবধারার জলে" বলিয়া আমরা স্নানযাত্রা সমাপন করিতে পারিব। আপাততঃ সে কাজটা স্বেদধারাতেই সম্পন্ন হইবে। বাঙলার প্রতি এদিকেও প্রকৃতির কার্পণ্য নাই!



ফুটবল

কলিকাতা ফুটবল লীগ প্রতিযোগিতার প্রথম ডিভিসনের চ্যাম্পিয়ানসিপ লইয়া এতদিন ভবানীপুর, মোহনবাগান, ইস্টবেঙ্গল, মহমেডান স্পোর্টিং, এই চারিটি দলের মধ্যে তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতা চলিয়াছিল। গত সপ্তাহ হইতে ইহাদের মধ্য হইতে মহমেডান স্পোর্টিং দল একটু পিছাইয়া পড়িয়াছে। কয়েকটি খেলায় এই দলের খেলোয়াড়গণ যেরূপ ক্রীড়া-নৈপুণ্যের পরিচয় দিয়াছেন তাহাতে নিঃসন্দেহে বলা চলে যে চ্যাম্পিয়ান হইবার আশা এই দলের খুব কম। একমাত্র অঘটন না ঘটিলে এই দলের সাফল্য কোনরূপেই সম্ভব নহে। যে তিনটি দলের মধ্যে বর্তমানে প্রতিদ্বন্দ্বিতা হইতেছে তাহার মধ্যে ভবানীপুর দলের সৌভাগ্য উল্লেখযোগ্য। এই দল এখনও পর্যন্ত অপরাজিত আছে। সহজে কোন খেলায় পরাজিত হইবে তাহারও বিশেষ সম্ভাবনা দেখা যাইতেছে না। সুতরাং এই দলের চ্যাম্পিয়ান হইবার খুব আশা আছে বলিলে কোনরূপ অন্যায় হইবে না। তবে এই দলের সাফল্য সম্পর্কে নিশ্চিত করিয়া এখনও কিছু বলা চলে না। মাত্র কয়েকদিন হইল বৃষ্টি আরম্ভ হইয়াছে। মাঠ এখনও কর্দমাক্ত হয় নাই। এই সপ্তাহে এই অবস্থায় যে উপনীত হইবে তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। এইরূপ মাঠে প্রত্যেকটি খেলায় যদি ভবানীপুর দল বিজয়ীর সম্মানলাভ করে তখন জোর করিয়া দলের গৌরবময় ফলাফল সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণী করিতে কোনরূপ দ্বিধাবোধ হইবে না। গত দুই বৎসরের চ্যাম্পিয়ান মোহনবাগান দল সহজে যে ভবানীপুর দলকে চ্যাম্পিয়ান হইতে দিবে ইহা ধারণা করাও অন্যায় হইবে। এই দলের খেলোয়াড়গণ পুনরায় নব উৎসাহে খেলা আরম্ভ করিয়াছেন। প্রত্যেক খেলায় জয়ী হইবার জন্য খেলোয়াড়গণ যেন দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। এই মনোভাব যদি শেষ পর্যন্ত বজায় থাকে ফলাফল কি দাঁড়াইবে বলা কঠিন। তাহা ছাড়া ইস্টবেঙ্গল দলও প্রতিদ্বন্দ্বিতা হইতে সহজে পিছাইয়া যাইবার মত খেলিতেছে না। এই দলের খেলোয়াড়গণ পুনরায় উন্নততর নৈপুণ্য প্রদর্শন করিতেছেন। প্রথম ডিভিসনের সকল খেলা শেষ হইতে এখনও একমাস বাকি। এই একমাস বিভিন্ন দলের সমর্থকদের ধৈর্য ধরিয়া থাকিতে হইবে তাহা ছাড়া অন্য কোন উপায় নাই।

লীগ প্রতিযোগিতার সময় প্রতি বৎসরই আই এফ এর কর্তৃপক্ষগণ কয়েকটি খেলা চ্যারিটির উদ্দেশ্যে অনুষ্ঠিত করেন। এই সকল চ্যারিটি ম্যাচে যে অর্থ সংগৃহীত হয় তাহা কয়েকটি বিশেষ প্রয়োজনীয় জনহিতকর প্রতিষ্ঠানের মধ্যে বণ্টন করা হয়। এই বৎসরে এ পর্যন্ত মাত্র একটি চ্যারিটি ম্যাচ খেলা হইয়াছে। এই খেলায় অতিরিক্ত টিকিট বিক্রয় করিবার জন্য আই এফ এ যেরূপ বন্দোবস্ত করিয়াছিলেন কলিকাতার পুলিশ কমিশনার তাহা অনুমোদন না করায় এবং অনুষ্ঠানের দিন আই এফ এর সহ-সভাপতি ও যুগ্ম-সম্পাদক পুনরায় কমিশনারকে অনুরোধ করিতে গেলে তিনি রাজী হন না। এমন কি আই এফ এর উক্ত দুইজন সভ্য কমিশনারের অফিসে উপযুক্ত ব্যবহার লাভ না করার ফলে আই এফ এ'র পরিচালকমণ্ডলী সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছেন সম্মানজনক আপোষ-মীমাংসা না হইলে কোন চ্যারিটি ম্যাচ অনুষ্ঠিত হইবে না। যদি এই ঘটনা সত্য হইয়া থাকে, তবে আই এফ এর সিদ্ধান্ত গ্রহণ খুব উপযুক্ত হইয়াছে। তবে ইহার ফলে পরবর্তী চ্যারিটি ম্যাচসমূহ যদি অনুষ্ঠিত না হয় বহু জনহিতকর প্রতিষ্ঠান বিশেষ ক্ষতিগ্রস্ত হইবে সেইজন্য আমরা একটু চিন্তিত হইয়া পড়িয়াছি। বিশেষ করিয়া ১৪ই জুলাইর মোহনবাগান ও ইস্টবেঙ্গল ক্লাবের লীগের দ্বিতীয়বারের খেলাটি রবীন্দ্র মেমোরিয়াল সাহায্য ভাণ্ডারের উদ্দেশ্যে অনুষ্ঠিত হইবে বলিয়া স্থির ছিল এবং সেই খেলা না হওয়া খুবই দুঃখের কারণ হইবে। আই এফ এর কর্তৃপক্ষগণ কমিশনারের সহিত এই বিষয় কোনরূপ আলাপ আলোচনা না করিয়া সরাসরি বাঙলার গভর্নরের নিকট ডেপুটেশন পাঠাইবার ব্যবস্থা করিয়াছেন। বাঙলার গভর্নর আই এফ এর প্রধান পৃষ্ঠ-পোষক। সুতরাং তাঁহার নিকট মীমাংসার জন্য ডেপুটেশন পাঠাইবার অধিকার আই এফ এর সব সময়েই আছে। তবে এই বিষয়টির দ্রুত মীমাংসা হওয়া খুবই বাঞ্ছনীয়। এইজন্য আই এফ এর কর্তৃপক্ষগণ কি করিতেছেন জানিতে ইচ্ছা হয়

আগামী জুলাই মাসের শেষ সপ্তাহ হইতে ভারতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ আই এফ এ শীল্ড প্রতিযোগিতা আরম্ভ হইবে। পরিচালকমণ্ডলী স্থির করিয়াছেন মোট ৩২টি দলকে এই প্রতিযোগিতায় যোগদান করিতে দেওয়া হইবে। প্রথম ডিভিসনের ১৩টি ও দ্বিতীয় ডিভিসনের ৬টি দল যোগদানের সুযোগলাভ করিবে। তৃতীয় ও চতুর্থ ডিভিসনের কোন দল যোগদান করিতে পারিবে না। বাহিরের যে কোন দলই যোগদান করিতে পারিব না। এক স্থান হইতে একটির বেশি দলকে যোগদান করিতে দেওয়া হইবে না। বাঙলার বাহির হইতে চারিটি বিশিষ্ট দলকে আনাইবার ব্যবস্থা হইতেছে। আই এফ এ শীল্ড প্রতিযোগিতার খ্যাতি ও গুরুত্ব বাড়াইবার জনাই উপরোক্ত নূতন আইনকানুন প্রস্তুত করা হইয়াছে। ব্যবস্থা ভালই হইয়াছে, তবে শেষ পর্যন্ত কার্যকরী হইবে কি না সেই বিষয় আমাদের বিশেষ সন্দেহ আছে। এই সম্পর্কে আর একটি বিষয়ের দিকে আই এফ এ শীল্ড পরিচালকগণের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে চাহি, তাহা হইতেছে উপযুক্ত রেফারী নিয়োগ করা। খেলা ভালভাবে পরিচালিত না হইলে খেলা অনেক সময়েই ভাল হয় না। বিশেষ করিয়া "উপযুক্ত পরিচালনা হয় না" এই দুর্নামের জন্যই বাঙলার বাহিরের দলসমূহ যোগদান করে না। অনেক সময় যোগদান করিয়া শেষ পর্যন্ত ক্রীড়াক্ষেত্রে অবতীর্ণ হয় না। এই দুর্নাম যাহাতে চিরতরে বিদূরিত হয় তাহার জন্য বিশেষ ব্যবস্থা করা কি উচিত নহে?

ব্যাডমিণ্টন্

বোম্বাই ব্যাডমিণ্টন এসোসিয়েশন বোম্বাই শহরের মধ্যস্থলে এক বিশেষ স্থানে একটি আচ্ছাদিত কোর্ট নির্মাণের পরিকল্পনা করিয়াছেন। এই পরিকল্পনা যাহাতে কার্যকরী হয়, তাহার জন্য বিশেষ এক সমিতিও গঠন করিয়াছেন। এই সংবাদ যখন কয়েক দিন পূর্বে প্রকাশিত হয়, তখনই আমাদের মনে হইয়াছিল, বেঙ্গল ব্যাডমিণ্টন এসোসিয়েশনের কর্তৃপক্ষগণ নিশ্চয়ই অনুরূপ ব্যবস্থার জন্য উঠিয়া-পড়িয়া লাগিবেন। আমাদের এই ধারণা যে ভ্রান্তিমূলক নহে তাহার প্রমাণ পাইয়া পরম পরিতোষ লাভ করিলাম। সত্যসত্যই বেঙ্গল ব্যাডমিণ্টন এসোসিয়েশনের কর্তৃপক্ষগণ দুইটি বিশিষ্ট ক্রীড়া পরিচালকমণ্ডলীর সহায়তায় এইরূপ একটি আচ্ছাদিত কোর্ট নির্মাণের জন্য বিশেষ চেষ্টা করিতেছেন। এই নির্মাণকার্য বোম্বাইর পূর্বে হয়তো হইবে না, তবে একদিন যে হইবে সেই বিষয় আমরা নিঃসন্দেহ। বেঙ্গল ব্যাডমিণ্টন এসোসিয়েশনের এই প্রচেষ্টা দ্রুত সাফল্যমণ্ডিত হউক, ইহাই আমাদের আন্তরিক কামনা।

ক্রিকেট

বাঙলার ক্রিকেট মরশুমে আরম্ভ হইতে এখনও কয়েক মাস বাকী আছে; কিন্তু এই বিষয়ে বর্তমানে কিছু না উল্লেখ করিয়া নীরব থাকা খুব উচিত হইবে না। আগামী ডিসেম্বর মাসে ইংলণ্ডের এম সি সি ক্রিকেট দল ভারত ভ্রমণে আসিবে, ইহা একরূপ নিশ্চিত। এই দল কলিকাতায় খেলিবে—ইহাও ভ্রমণ-তালিকায় স্থির হইয়াছে। এইরূপ অবস্থায় বাঙলার ক্রিকেট পরিচালকগণের একেবারেই নীরব থাকা কি খুব যুক্তিযুক্ত হইবে? বিশেষ করিয়া গত বৎসরের অন্তর্দ্বন্দ্ব তো এখনও অবসান হয় নাই। সেই বিষয়ের একটা মীমাংসা করিয়া মিলিতভাবে তাঁহাদের উচিত আলাপ-আলোচনা করা—কিভাবে তাঁহারা এই দলের বিরুদ্ধে অধিক সংখ্যক বাঙালী খেলোয়াড়কে খেলাইতে পারেন। বৃষ্টির অবসানের সঙ্গে সঙ্গে যাহাতে বিশিষ্ট খেলোয়াড়গণ নিয়মিত অনুশীলনে প্রবৃত্ত হন এবং অভিজ্ঞ ক্রিকেট খেলোয়াড় যাহাতে এই অনুশীলন পরিচালনা করেন, তাহার ব্যবস্থা যেন তাঁহারা করেন। আশা করি, পরিচালকগণ এই সকল বিষয় চিন্তা করিয়া কার্যক্ষেত্রে শীঘ্রই অবতীর্ণ হইবেন।

ব্যবসা বাণিজ্য

টংস্টেন বা উলফ্রাম

শ্রীকালীচরণ ঘোষ

একটি জাতির সর্বাঙ্গীন মঙ্গলের জন্য টংস্টেন যে স্থান অধিকার করে, সে হিসাবে ইহার কোনও পরিচয় নাই। সাধারণ শিক্ষিত লোকের মধ্যে অনেকেই ইহার নাম শুনেন নাই, শোনা থাকিলেও ইহার প্রয়োজনীয়তা বা ব্যবহার সম্বন্ধে তাঁহারা মোটামুটি অজ্ঞ। যাঁহারা ইহার প্রকৃত ব্যবহার জানেন তাঁহাদের মতে কোনও দেশকে টংস্টেন হইতে বঞ্চিত করিলে অর্থাৎ প্রকৃত ব্যবহার বা প্রয়োগ করিতে না দিলে ঐ জাতির সামরিক শক্তিকে খর্ব করা এবং শান্তির সময় ইহার শিল্প প্রচেষ্টার সর্বনাশ সাধন করা হয়।

ইংরাজীতে বলে,

"To deprive a nation of tungsten is to cripple its military power and to ruin its industrial life in times of peace."

পরিচয়

টংস্টেনের পরিচয় বহু পুরাতন, কিন্তু ইহাকে রাঙ্গ বা টিনের সহিত একত্র দান করিয়া ভ্রম পোষণ করা হইত। ১৭৮১ সালে প্রসিদ্ধ বৈজ্ঞানিক সিল (Scheele) ইহাকে রাঙ্গ হইতে স্বতন্ত্র ধাতু বলিয়া নিঃসন্দেহে প্রমাণ করিয়া দেন; এবং দ্য এলহিউয়ারস (Elhyuars) ১৭৮৩ সালে ইহাকে ইহার অপরাপর মল হইতে স্বতন্ত্র করিতে সমর্থ হন।

সাধারণতঃ যে সকল "প্রস্তর" হইতে টংস্টেন উদ্ধার করা চলে তাহাই টংস্টেন নামে পরিচিত; তন্মধ্যে উলফ্রাম (১) বা উলফ্রামাইট প্রধান। অপরাপর "প্রস্তর"গুলির মধ্যে সিলাইট, ফারবারাইট, হুবনারাইট(২) প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য। অপেক্ষাকৃত কম প্রয়োজনীয় "প্রস্তর" যথা রিনাইট, পাওয়েলাইট, স্টলজাইট, র‍্যামপাইট(৩) প্রভৃতি প্রস্তরে টংস্টেনের অবস্থান অবগত হওয়া গিয়াছে। সিলাইটে শতকরা ৬৩·৯ এবং উলফ্রামাইটে শতকরা ৬০·৭ ভাগ মূল ধাতু থাকে। টংস্টেন স্বতন্ত্র অবস্থায় কচিৎ পাওয়া যায়।

পৃথিবীর টংস্টেন

পৃথিবীর নানাস্থানে টংস্টেন-যুক্ত প্রস্তর পাওয়া গেলেও সকল স্থানে টংস্টেন উদ্ধার করিবার উপযুক্ত 'ধাতু-প্রস্তর' পাওয়া যায় না। সাধারণতঃ যে সকল 'প্রস্তর'-এ শতকরা ৬০ হইতে ৬৫ ভাগ টংস্টেন আছে, সেইরূপ প্রস্তর ব্যবহৃত হইয়া থাকে। পৃথিবীতে এইরূপ উৎখাত প্রস্তরের বাৎসরিক পরিমাণ ৩৫,০০০ টন।

১৯৩৯ ও ১৯৪০ সালে পৃথিবীতে উৎপাদিত টংস্টেনের পরিমাণ

মোট—৩৫,০০০ মেট্রিক টন

	১৯৩৯	১৯৪০
	মেট্রিক টন	**মেট্রিক টন**
চায়না	৬,৯৪৮	৬,৯৫০
ব্রহ্ম	৫,৩৪০*	......
আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র	২,৬৩৩	২,৮৯৫
পোর্টুগাল	২,৩৭০	২,৬৩৮
বলিভিয়া	২,০০১	২,৫১০
আর্জেণ্টাইনা	৮১০	৮৪৩
অষ্ট্রেলিয়া	৬৭০	......
ইন্দোচীন	৩০৬	২৩৫
থাইল্যাণ্ড	২২৭	২৩১
অসংযুক্ত মালয়	২০৭	......
স্পেন	১৮৪	......
দক্ষিণ রোডেশিয়া	১৬২	......
নাইজিরিয়া	১৪২	৭৭
সুইডেন	১২০	......
পেরু	১০৪	১৮৩

*১৯৩৮ সালের পরিমাণ।

টংস্টেন সরবরাহে এই সকল দেশ প্রধান হইলেও মিশর, মেক্সিকো, রুশ প্রভৃতি কয়েকটি দেশেও প্রতি বৎসর কিছু কিছু টংস্টেন উদ্ধার করা হয়।

চীন

উপরের তালিকা হইতে দেখা যায়, চীন টংস্টেন সম্পদে বিশেষ সমৃদ্ধ। প্রতি বৎসর উৎখাত টংস্টেনের পরিমাণ কমবেশ ৭,০০০ টন। বলা বাহুল্য, ইহার অধিকাংশই বিদেশীদের কাজে লাগে। চীনের মধ্যে হুনান, কোয়াংসি এবং কোয়াংটুঙ প্রায় সমস্ত 'প্রস্তর' সরবরাহ করিয়া থাকে। অপরাপর অঞ্চলের বিশেষ উল্লেখ নাই।

ব্রহ্ম

ব্রহ্ম নানাপ্রকার অত্যন্ত প্রয়োজনীয় খনিজের সহিত টংস্টেন লইয়া বিশেষ গৌরব করিতে পারে। জগতের বাজারে ইহার স্থান দ্বিতীয় এবং প্রতি বৎসর উৎখাত পরিমাণ কমবেশ ৬,০০০ মেট্রিক টন। উত্তরে কিয়াউকসে (Kyaukse) জেলা হইতে আরম্ভ করিয়া ইয়ামেথিন (Yamethin) জেলা, দক্ষিণ শান স্টেট ও কারেন্নি হইয়া দক্ষিণে থাটন, আমহার্স্ট, ট্যাভয় এবং মার্গুই জেলা পর্যন্ত বিস্তৃত এই ৭০০ মাইলব্যাপিয়া ভূভাগে স্থানে স্থানে টংস্টেনের খনি অবস্থিত। ট্যাভয়-স্থিত হারমিঙ্গি (Hermingyi) খনি এবং কারেন্নি স্টেটের দক্ষিণে মচি বা মাউচি (Mawchi) খনি প্রধান।

আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র

আমেরিকার পশ্চিমভাগে অবস্থিত এগারটি স্টেট বা রাষ্ট্রবিভাগে টংস্টেন পাওয়া যায়; তন্মধ্যে আবার তিনটি নেভাডা, কালিফোর্নিয়া ও কলোরাডো আমেরিকার বাৎসরিক উৎপাদিত পরিমাণ ৩,০০০ মেট্রিকটনের মধ্যে শতকরা নব্বইভাগ সরবরাহ করে। নেভাডা হইতে প্রাপ্ত টংস্টেন অপর সকল বিভাগের পরিমাণ অতিক্রম করিয়া থাকে। নেভাডাতে মিল সিটি (Mill City) এবং মিনা-র সন্নিকটে, কলোরাডোর বোল্ডার জেলা (County)র খনি এবং কালিফোর্নিয়াতে সান বার্নার্ডিনো জেলায় আটোলিওর সন্নিকটে অবস্থিত খনিগুলি প্রধান।

পোর্টুগাল

পোর্টুগাল আকৃতিতে অতি ক্ষুদ্র দেশ; সেই অনুপাতে তাহার টংস্টেন উৎপাদন খুবই বেশী মনে করা যাইতে পারে। বাৎসরিক ২,৬০০ মেট্রিক টন অর্থাৎ আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের পরিমাণের প্রায় সমতুল্য। পোর্টুগালের মধ্যে বইস্কা (Beira Baixa) প্রদেশে কাস্টেলো ব্র্যাঙ্কো (Castello Branco) জেলায় পানাসকুইরা (Panasqueira) নামক স্থানই টংস্টেন সরবরাহে প্রধান। অপরাপর অঞ্চল অল্পমাত্রায় 'প্রস্তর' উৎপাদনে সমর্থ।

বলিভিয়া

দক্ষিণ আমেরিকার ক্ষুদ্র বলিভিয়া হইতে কমবেশ ২,৫০০ মেট্রিক টন টংস্টেন প্রতি বৎসর পাওয়া যায়। এখানে প্রধান ভাণ্ডারগুলি ওরুরো জেলায় অবস্থিত। ইহা ছাড়া পোটোসি, লা-পাজ (La Paz) এবং কোচাবাম্বা (Cochabamba) নামক স্থানসমূহে টংস্টেন ভাণ্ডার দেখিতে পাওয়া যায়।

আর্জেণ্টাইনা

আর্জেণ্টাইনায় প্রধানত সান লুই ও কর্ডোবা প্রদেশ হইতে প্রায় সমস্ত 'প্রস্তর' উৎখাত হইয়া থাকে। তাহা ছাড়া সান জুয়ান ও কাটামার্কা হইতেও কতক পরিমাণ প্রস্তর পাওয়া যাইতে পারে। আর্জেণ্টাইনার মোট পরিমাণ ৮৫০ মেট্রিক টন।

1 Wolfram, a mixture of tungtate of iron and manganese.
2 Scheelite, ferberite, hubnerite.
3 Reinite, powellite, stolzite, raspite, tungstite, tungstenite.

অষ্ট্রেলিয়া

অষ্ট্রেলিয়ায় মাত্র নিউ সাউথ ওয়েলস্ প্রদেশে কয়েকটি টংস্টেন খনি দেখিতে পাওয়া যায়। তাহার মধ্যে টরিংটন বিভাগ প্রধান। অপরাপর বিভাগের মধ্যে ফ্রগমোর, বররোয়া, টেণ্টারফিল্ড এবং ডীপ-ওয়াটার বিভাগের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

কুইনসল্যান্ড প্রদেশে ব্যামফোর্ড-এ 'উলফ্রাম ক্যাম্প' অঞ্চলে প্রধান খনি অবস্থিত। তাহা ছাড়া উত্তর কুইন্সল্যান্ডে চিলাগো গোল্ড এন্ড মিনারেল ফিল্ডস অর্থাৎ চিলাগো স্বর্ণ ও খনিজ-ভূমি বা ক্ষেত্রে অপরাপর খনিগুলি অবস্থিত।

অষ্ট্রেলিয়ার উত্তরাঞ্চলে পাইন ক্রীক ও হ্যাচেস ক্রীক জেলা এবং টাসম্যানিয়ায় স্টোরীস ক্রীক, বেন লোমোণ্ড এবং মানিলা জেলা উল্লেখযোগ্য।

অনেক স্থানে খনির সন্ধান থাকিলেও অষ্ট্রেলিয়া হইতে উৎখাত পরিমাণ ৭০০ শত মেট্রিক টনেরও কম। পরে প্রয়োজনে অধিক পাওয়ার সম্ভাবনা আছে।

ইন্দোচীনের কাওবাং প্রদেশের পিয়া-আউয়াক (Pia Ouac) পর্বত হইতে টংস্টেন উদ্ধার করা হয়।

অযুক্ত মালয়-এ টেংগানুতে চন্দরডং এবং কেদাতে সুঙেই, সিণ্টক্ এবং কুবাং পাসু প্রধান।

মালয় যুক্তরাষ্ট্রে পেরাক-এ কুয়ালা কাংসার জেলায় লারুট-এ, ফিন্টা এবং বাটাং-পাডাং নামক স্থানে টংস্টেন পাওয়া যায়। তাহার মধ্যে তাপা-র দক্ষিণে বুকিট-রুম্পিয়ান প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে।

ইপোর সন্নিকটে রুমাট পুলাই খনি সর্বপ্রধান।

স্পেনের মধ্যে বাজাডোজ (Bajados) হইতে প্রায় সমস্ত টংস্টেন পাওয়া যায়।

রোডেসিয়ায় এসেক্সভেল এবং সাবি ভ্যালিতে উলফ্রাম এবং গাটুমায় সীলাইট উৎখাত হয়।

নাইজিরিয়া ও সুইডেনের বিশেষ বিবরণ পাওয়া যায় নাই। পেরুর আনকাক্স (Aneachs)-এ পালাস্কা প্রদেশ এবং লিবার্টাড-এ সান্টিয়াগো ডেল চুকো প্রদেশের সীমারেখা পেলাগাটোজ নদীর দুই কুল ধরিয়া কতকাংশে টংস্টেন ভান্ডার অবস্থিত।

রুশ, কানাডা, নিউজিল্যান্ড, জার্মানী প্রভৃতি দেশে কতক পরিমাণ টংস্টেন প্রতি বৎসরই উৎখাত হইয়া থাকে; পরিমাণ বেশী নয় বলিয়া তাহাদের সবিস্তার আলোচনা করা হইল না।

ভারতবর্ষ

ভারতবর্ষে টংস্টেনের বিশেষ উল্লেখযোগ্য ভান্ডার নাই বলিলে অত্যুক্তি হয় না; সুতরাং ইহার আলোচনা না করিলে ক্ষতি-বৃদ্ধি ছিল না, কিন্তু যেখানে মোটেই টংস্টেন পাওয়া যায় না বলিয়া ধারণা ছিল, অনুসন্ধানের ফলে সেখানেও টংস্টেন পাওয়া যাইতেছে।

ভারতবর্ষের মধ্যে যোধপুর রাজ্যের দেগানার রেওয়াট পর্বত (১) এ বিষয়ে বিশেষ পরিচয় লাভ করিয়াছে। সেখানে ১৯৩৭ সালে ১৩ এবং ১৯৩৮ সালে ১০ টন টংস্টেন উৎখাত হইয়াছে। ১৯৩৯ সালের পরিচয় নাই; ১৯৪০ সালের পরিমাণ জানিতে পারা যায় নাই। উহার মূল্য ৩০,০০০ টাকা বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে। মধ্যপ্রদেশের নাগপুর জেলার আগর গাঁ গ্রাম (২) এবং বাঙলা (৩) প্রদেশের বাঁকুড়া জেলার চেন্দাপাথর হইতে সামান্য পরিমাণ টংস্টেন পাওয়া যাইতেছে। প্রয়োজনের সমস্ত পরিমাণ টংস্টেন ভারতবর্ষেই পাওয়া যাইবে মনে করিলে হয়ত ভুল করা হইবে।

ইহা ছাড়া আরও কয়েকটি স্থান হইতে টংস্টনের অবস্থান সম্বন্ধে পরিচয় পাওয়া গিয়াছে। কিন্তু ভূতত্ত্বিদেরা ইহার উপর বিশেষ আস্থা স্থাপন করেন না।

বাঁকুড়া ছাড়া মেদিনীপুর জেলায় ঝাড়গ্রামের লোকে জঙ্গলের ভিতর হইতে একপ্রকার পাথর আনিয়া দেখাইতেছে। যতদূর জানিতে পারা গিয়াছে, ইহার ক্রেতার অভাব নাই। এ সম্বন্ধে আরও অনুসন্ধান হওয়া প্রয়োজন।

পূর্ববর্তী প্রায় সকল খনিজ সম্বন্ধে আলোচনা প্রসঙ্গে সিংভূমের নাম উল্লেখ করিতে হইয়াছে। এখানেও তাহার ব্যতিক্রম নাই। এই জেলার কালীমাটীতে টংস্টেন পাওয়া যায়। (৪)

ব্যবহার

বৈজ্ঞানিকরা জাতির জীবনে টংস্টেনকে কত উচ্চে স্থান দিয়াছেন, তাহা পূর্বে বলা হইয়াছে। কিন্তু ইহা প্রকৃতপক্ষে কি কাজে লাগে, তাহা সাধারণ পাঠকের জন্য কিছু লেখা প্রয়োজন।

লৌহ-ইস্পাতের গুণ বৃদ্ধির জন্য যে সকল ধাতু সামান্য পরিমাণে মিশাইয়া লইলেই চলে, টংস্টেন তাহাদের অন্যতম। প্রকৃতপক্ষে টংস্টেন অপরাপর এই জাতীয় ধাতু অপেক্ষা অধিক পরিচয় লাভ করিয়াছে।

অত্যধিক বেগে যে সকল যন্ত্রপাতি বা তাহাদের অংশকে ঘুরিতে হয়; অতিমাত্রায় যেখানে ঘর্ষণ লাগে এবং তাপ সৃষ্টি হইয়া ধাতুর গুণের বৈষম্য ঘটায়, সেই সকল অংশ তৈয়ারী করিতে টংস্টেন মিশ্রিত লৌহ-ইস্পাত বিশেষ উপযোগী। টংস্টেন যোগে 'স্টেলাইট' নামে বিশেষ গুণসম্পন্ন মিশ্রিত ধাতু উৎপন্ন হইয়া থাকে।

যতই বৈদ্যুতিক শক্তির ব্যবহার বৃদ্ধি পাইতেছে, বৈদ্যুতিক আলোর বাল্ব বা ডুম এবং রেডিও সংক্রান্ত নলের প্রয়োজন বাড়িতেছে, সঙ্গে সঙ্গে টংস্টেনের আদর ততই বৃদ্ধি পাইতেছে। ইহাদের সংক্রান্ত সূক্ষ্ম তার নির্মাণ করিতে টংস্টেন অদ্বিতীয় বলিয়া পরিচিত হইয়াছে।

রঙ এবং অপরাপর রাসায়নিক পদার্থে এবং চর্মকে শোধন করিয়া তাহার উপর সাদা রঙ বা কষ্ ধরাইতে টংস্টেনের সাহায্য গ্রহণ করা হয়।

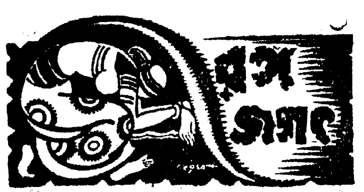
টংস্টেনযোগে একপ্রকার জমানো কারবাইড প্রস্তুত করিয়া (Cemented Tungsten Carbides) নানা কাজে ব্যবহার করা হইতেছে।

শতকরা ৪ ভাগ তামা, ৬ ভাগ নিকেল যোগ করিয়া টংস্টেন সাহায্যে এক মিশ্রিত ধাতু করা হইতেছে। পরীক্ষায় প্রমাণিত হইয়াছে, উহা রেডিওর যন্ত্রাংশ ধারণ করিবার বিশেষ উপযোগী।

কালের অগ্রগতির সঙ্গে টংস্টেনের ব্যবহার নিত্যই বৃদ্ধি পাইবে। যতদূর জ্ঞান জগতে প্রচলিত হইয়া উঠিয়াছে, তাহাই বর্তমানের পক্ষে যথেষ্ট মনে করিলেও ভারতবর্ষে ইহার সর্বাঙ্গীণ ব্যবহার প্রচলিত হইয়া উঠে নাই। আশা করা যায়, এ বিষয়ে ভারত-বর্ষ অপরাপর দেশ হইতে আর পিছাইয়া থাকিবে না। যুদ্ধের চাপে দেখা গিয়াছে, ভারতের নূতন উদ্ভাবনী শক্তি আজও লোপ পায় নাই। আজও ইহার বৈজ্ঞানিক নূতন আবিষ্কারের দ্বারা জগৎকে চমৎকৃত করিতে পারে। বর্তমান যুদ্ধে যেরূপ এই শক্তির স্ফুরণ দেখা গিয়াছে, আশা করা যায়, পরেও ইহা তেমনি সমুজ্জ্বল থাকিবে।

1. Rec. Geo. Sur. of India. Vol. LIV (1923) p. 36.
2. Rec. Geo. Sur. of India Vol. XXXVI (1908) p. 302.
3. Geo. Sur. of India, Vol. LXXXVI (1942) Bull. No. 1.
4. Rec. Geo. Sur. of India. Vol. LIII (1921) p. 304.





বর্তমানে ছবির বাজার হঠাৎ যেন মন্দা হয়ে গিয়েছে বলে মনে হচ্ছে। নতুন ছবি মুক্তিলাভ করলে প্রথম ক' সপ্তাহে যে জনসমাগম দেখা যাচ্ছিল ক'বছর ধরে, ক'সপ্তাহ থেকে তাতে বেশ ঘাটতি দেখা যাচ্ছে—এ অবস্থাটা ঠিক 'ভি-ডে'র' পর থেকেই নজরে পড়ছে। শুধু এখানেই নয়, বোম্বে, দিল্লী, লাহোর, করাচী প্রভৃতি বড় বড় সব শহরেই শুনেছি এই একই অবস্থা। এর কারণটা ঠিক ধরতে পারা যাচ্ছে না। যুদ্ধ এদেশ থেকে যায়নি, যুদ্ধকার্যে নিযুক্ত লোকেরা বেকারও হয়নি কেউ, পয়সার ছড়াছড়িও চলেছে সমান তেজেই, অথচ এই অবস্থা। লোকে কি তবে জোট পাকিয়ে সঞ্চয়ী হতে আরম্ভ করে দিলে ? এই ঢিমে-তাল অবস্থা প্রযোজকদেরও ভাববার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে, বিশেষ করে খরচে রাখার সুযোগ হারিয়েছেন, তারা এমন কিছু দিতে অপারগ হয়েছেন, যাতে স্থায়ী চিত্রপ্রিয়ের সংখ্যা বাড়িয়ে যেতে পেরেছে—দর্শক কমে যাওয়ার এও একটা কারণ হতে পারে। কাঁচা পয়সা হাতে ছবিঘরের দিকে যারা ছুটে আসতে আরম্ভ করেছিলো, বৈচিত্র্যহীন নিরস ছবি দেখে দেখে তারা যে ক্লান্ত হয়ে পড়বে অল্পদিনেই—তাতে সন্দেহ নেই। আর এই যুদ্ধ আরম্ভ হওয়া



'চল চল রে নওজোয়ান' চিত্রে অশোককুমার ও নার্গিস।

প্রযোজকদের। পর পর খানকয়েক ছবির খরচ লাখ পনেরোর কাছে দাঁড়িয়ে গিয়েছে এবং কতকটা জমাটি না হওয়ার জন্যেও বটে, আবার হঠাৎ এই ভীড় কমতি হওয়ার জন্যেও ছবিগুলি প্রযোজকদের মাথায় বজ্র হেনেছে। ফলে এই হয়েছে, ওদের দেখাদেখি যারা ছবির জন্যে বিরাট খরচ করবার মতলব করছিলো, তারা এখন বেশ ভাবনায় পড়ে গিয়েছে।

যুদ্ধ না থামতেই যদি এই অবস্থা হয়, যুদ্ধোত্তর যেসব বড় বড় পরিকল্পনা ফাঁদা হচ্ছে সেগুলি সফল হবার সম্ভাবনা তাহলে কতখানি রয়েছে ? এখন তো মনে হচ্ছে, চিত্র-প্রযোজকরা চিত্রব্যবসাকে ফাঁপিয়ে থেকে খারাপ ছবি তোলারই প্রতিযোগিতা লেগে গিয়েছে যেন। প্রযোজকরা দেখলেন, যা খুসী দেখালেই যখন পয়সা আসছে, তখন ভাল জিনিসের দিকে মুখ ফেরানোই বন্ধ করে দিলেন। পরিচালক, কলাকুশলী ও শিল্পীরাও এ সুযোগ ছাড়তে চাইলেন না; দু-হাত দিয়ে পয়সা লুটতে আরম্ভ করে দিলেন সবাই, গুণাগুণের দিকে আর কারুর নজর রইলো না। বস্তুত, ১৯৪২ সাল থেকে এই সাড়ে তিন বছর নিকৃষ্টতা এতো বেড়ে গিয়েছে, যা তার আগের পঁচিশ বছরেও হয়নি। দর্শক কমতি হয়ে যাওয়ার জন্যে, তা নয়তো দায়ী কে ? অথচ কি বিরাট সম্ভাবনাই এসেছিল হাতে !

নূতন ও আগামী আকর্ষণ

আগামী ১২ই জুলাই—কলকাতায় চিত্রপ্রিয়দের আড়াই বছরের প্রতীক্ষার অবসান ঘটিয়ে একসঙ্গে একেবারে চারটি চিত্রগৃহে—প্যারাডাইস, শ্রী, পূর্ণ ও পূরবীতে 'চল-চল-রে-নওজোয়ান' ছবিখানি মুক্তিলাভ ক'রবে বলে নির্ধারিত হয়েছে। অনেকের অনেক দিনের আশা দেখা যাক কিভাবে মেটে।

* * * *

শৈলজানন্দের পরবর্তী বাঙলা ছবি 'মনে-না-মানা'র প্রারম্ভ দিন উত্তরায় এগিয়ে আসছে। 'অভিনয় নয়'-এর অসাফল্য এ ছবিখানিতে আর পুনরাবৃত্তি হবে না বলেই লোকে বিশ্বাস ক'রছে।

* * * *

এ সপ্তাহের নতুন ছবি হ'চ্ছে প্রভাত ও পার্কশো হাউসে ইউনিটি ফিল্মসের দু'বছর আগেকার হিন্দু-মুসলিম মিলনাত্মক ছবি 'ভাইচারা'। ছবিখানি চলার বাজার বেশ অনুকূল।

* * * *

আগামী সপ্তাহে মুক্তিলাভ ক'রবে সেণ্ট্রাল স্টুডিওর 'এতিম'। ছবিখানি পূর্ববর্তী স্থানসমূহে প্রভূত নাম ক'রেছে।

বিবিধ

খালি রোজগারেই নয়, বম্বের চিত্রজগতের লোকেদের মধ্যে দানের প্রতিযোগিতাও লাগে মাঝে মাঝে। বাঙলার দুর্ভিক্ষের সময় এর পরিচয় তারা দিয়েছে, সেই থেকে আরও বহু মহৎ কাজকে সফল ক'রে তোলায় ওঁরা ঝোঁক দেখিয়ে আসছে। সম্প্রতিকার উদাহরণ হ'চ্ছে 'ফিল্মইণ্ডিয়া'? পত্রিকার উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত 'নেহরু ফাণ্ডে' চাঁদা দেওয়ার; অসিত-চিমুর মামলার ফাণ্ডেও নানাভাবে ওঁরা টাকা তুলে দিচ্ছে। এখানে নামমাত্র ক'জন ছাড়া রবীন্দ্র ফাণ্ডেও চাঁদা দিতে কেউ আর এগিয়ে আসছে না !

* * * *

বম্বেতে গিয়ে সায়গলের যেন ভাগ্য খুলে গেছে আবার। পৌঁছতেই মুরারী পিকচার্সের 'ওমর খৈয়ামে' অভিনয় করার জন্যে এক লাখ টাকার এক চুক্তি ক'রেছেন, কারদারের 'সাজাহান', জয়ন্ত দেশাইয়ের 'তদবীর' আর ক্যারাভান পিকচার্সের 'তহজীব'-এর জন্যে চুক্তি তো এখানে থাকতেই হয়েছিল। এ ছাড়া আরও নতুন চুক্তি হ'চ্ছে সৌকত হোসেনের 'সেণ্ট পারসেণ্ট', বম্বে সিনেটোনের 'জিন্দগী-কী-রাহ' ও সাধনা বসুর 'অজন্তা'।

"দেশ"-এর

নিয়মাবলী

বার্ষিক মূল্য—১৩, ষাণ্মাসিক—৬৷৷৹

বিজ্ঞাপনের নিয়ম

"দেশ" পত্রিকায় বিজ্ঞাপনের হার সাধারণত নিম্নলিখিতরূপ:—

সাধারণ পৃষ্ঠা—এক বৎসরের চুক্তিতে
১০০" ও তদূর্ধ্ব ... ৩, প্রতি ইঞ্চি প্রতি বার
৫০"—৯৯" ... ৩৷৷৹ " " " "

সাময়িক বিজ্ঞাপন
৪, টাকা প্রতি ইঞ্চি প্রতি বার

বিজ্ঞাপন সম্বন্ধে অন্যান্য বিবরণ বিজ্ঞাপন বিভাগ হইতে জানা যাইবে।

সম্পাদক—"দেশ"
১নং বর্মণ স্ট্রীট, কলিকাতা।

বম্বের কাজ সেরে অশোককুমারের কলকাতায় আসতে জানুয়ারী হ'য়ে যাবে।

* * * *

বিলেতে হাইকমিশনার থাকাকালে নানা দাতব্য উদ্যোগে সহায়তা করায় কৃতজ্ঞতা স্বরূপই স্যার আজিজুল, বিলেতে শিক্ষিত ভারতীয় নর্তক রফিক আনোয়ারকে ছবি তোলার লাইসেন্স পাইয়ে দিয়েছেন ব'লে শোনা যায়। ছবিখানি তোলা হবে ক'লকাতায় ইন্দ্রপুরী স্টুডিওতে এবং পরিচালনা ক'রবেন অয়ান সিন্থিয়া নামক হলিউডের জনৈক পরিচালক, যিনি উপস্থিত সামরিক কাজে দিল্লীতে অবস্থান ক'রছেন।

* * * *

বম্বের প্রযোজক রামনিকলাল শাহ সম্প্রতি কলকাতায় এসেছেন একখানি ছবি তোলার উদ্দেশ্য নিয়ে। অন্যদিকের ব্যবস্থা সব পাকা হ'লে এ ছবিখানি এখানকারই এক পরিচালককে দিয়ে তোলানো হবে আর রাই বড়াল, ছবি বিশ্বাস, চন্দ্রাবতী, নারাঙ প্রভৃতির এতে কাজ করার সম্ভাবনা আছে।

* * * *

'পহ্চান' ছাড়া বড়ুয়া যে প্রচার চিত্রখানি তোলায় হাত দিয়েছেন তাতে দেবীকারাণী, মতিলাল প্রভৃতির অবতরণ সম্ভাবনা আছে। এ ছবিখানির কাহিনী ও চিত্র-নাট্য রচনায় বড়ুয়া এখন ব্যস্ত খুবই।

* * * * * *

অভিনেত্রী সিতারা সম্প্রতি প্রযোজক-পরিচালক নাজীরের আস্তানা ছেড়ে দিয়ে তারই ভ্রাতুষ্পুত্র ভারতের কনিষ্ঠতম পরিচালক আসিফকে বিবাহ ক'রেছেন—বিবাহের পর তার নাম হ'য়েছে 'অল্লারখ্যী'; পর্দায় অবশ্য সিতারা নামই থাকবে।

* * *

অভিনেত্রীদের মধ্যে এখন সবচেয়ে দাম চড়েছে রাগিণীর। মেহ্বুব ও কারদারের আগামী ছবিতে ষাট হাজার টাকা ক'রে পাবেন তিনি, আর লাহোরের 'ধমকী' ছবিখানিতে প্রতি মাসে পাবেন পঁচিশ হাজার ক'রে।

* * *

ফিল্মিস্তানের ছবিখানি শেষ ক'রে নীতিন বসু কলকাতায় ফিরে আসতে চান ব'লে শুনছি, সেই নিউ থিয়েটার্সে'ই তো?

* * * *

স্টুডিওহীন একদল চিত্রপ্রযোজক স্বতন্ত্রভাবে একটি সংঘ স্থাপনা ক'রেছে, নাম হ'য়েছে 'বেংগল ইন্ডিপেন্ডেন্ট মোসন পিকচার্স এসোসিয়েশন'। সভ্যদের অধিকাংশ হ'চ্ছেন যারা লাইসেন্স পাননি এবং একেবারে নবগঠিত সংস্থা—বেংগল মোসন পিকচার্স এসোসিয়েশন এদের হ'য়ে কিছু ক'রছেন না বলেই এরা আলাদাভাবে এই সংঘটি স্থাপন ক'রেছেন। গত ১৪ই তারিখে সাংবাদিকদের এক চাপার্টিতে আমন্ত্রণ ক'রে এরা প্রথমে উদ্দেশ্য ব্যক্ত ক'রতে গিয়ে ব'লে ফেলেন যে, লাইসেন্সের জন্য চেষ্টা করাই হ'চ্ছে এই সংঘের উদ্দেশ্য, পরে অবশ্য নিজেদের সংশোধন ক'রে বলেন যে, স্বতন্ত্র প্রযোজকদের সবরকম সুবিধা অসুবিধার দিকে নজর রাখাই হ'চ্ছে প্রধান কথা। এই চিত্রপ্রযোজক সংঘের সভাপতি হ'লেন সাংবাদিক-নেতা সুরেশচন্দ্র মজুমদার, সহঃ সভাপতিঃ মাখনলাল মল্লিক ও ধীরেন্দ্রনাথ গাঙ্গুলী; যুগ্ম সম্পাদক ঃ রধারাণী দেবী ও কল্যাণ গুপ্ত।

* * * *

কলকাতার পরিচ্ছন্নতা নিয়ে অখিল দত্তের ছেলেরা যে ছবিখানি তোলার জন্যে লাইসেন্স পেয়েছে সেখানি হবে পূর্ণ-দৈর্ঘ্য ছবি; নায়িকা হবেন কানন; কাহিনী রচনা ক'রছেন প্রবোধকুমার সান্যাল; পরিচালনা ক'রবেন প্রেমেন মিত্র না হয় বেণু লাহিড়ী, উপদেষ্টা হলিউডের মেলভিন ডগলাস, ব্যবস্থাপক হ'লেন পি এন রায় আর কর্মকর্তা জনৈক এন মজুমদার যিনি লাখদশেক টাকা খরচ ক'রে মাস তিনেকের মধ্যেই ছবিখানি তৈরি ক'রে ফেলবেন ব'লে আশ্বাস দিচ্ছেন।

* * * *

গত ২৭শে মে বম্বেতে চিত্রাভিনেত্রী গহরের পিতা আব্দুল কায়ুম সামাজীওয়ালা পরলোকগমন করেছেন।

* * * *

চিত্রভারতী মানে প্রতিভা শাসমল লাইসেন্স পেয়েই যে ছবিখানি তোলা ঠিক ক'রেছেন তার নাম হবে 'সৌভাগ্যবতী' —নৃপেন চট্টোপাধ্যায়ের লেখা তার পরিচালনা ক'রবেন পশুপতি চট্টোপাধ্যায়।

* * * *

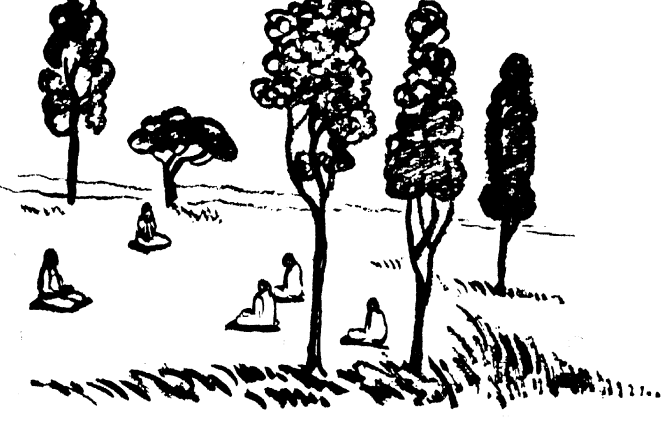
পরিচালক নীতিন বসু ফিল্মিস্থানের ৩য় অবদান (২নং তাহ'লে কোথায় গেল?) যে ছবিখানির কাজে হাত দিয়েছেন তার নায়িকা হবেন মিস ভি আন্কেলসারিয়া নামে এক পার্শী সুন্দরী।

* * * *

পরিচালক গুণময় বন্দ্যোপাধ্যায় শ্রীভারতীলক্ষ্মী স্টুডিওতে 'গাঁয়ের মেয়ে' নামে একখানি বাঙলা ছবি তুলছেন—ঠিক মৃত্যুর দিনে রতীন বন্দ্যোপাধ্যায়ের সংগে চুক্তি হয়েছিল।

* * * *

১৯৪৫-৪৬ সালের জন্যে বঙ্গীয় সেন্সার বোর্ডে থাকবেন পুলিস কমিশনার ও ডেপুটি কমিশনার, যথাক্রমে সভাপতি ও সম্পাদকরূপে আর সভ্য হ'চ্ছেন—কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস-চ্যান্সেলার, বাঙলার ডিরেক্টর অফ পাবলিক ইনফরমেশন, মিলিটারী প্রেস ও ফিল্ম সেন্সর, কলকাতা কর্পোরেশনের এক প্রতিনিধি, মিঃ এফ মংক, মিঃ ডবলু আই এন ম্যাকইউয়ান, মিঃ এস কে ঘোষ, মিঃ এ এফ স্টার্ক, খান বাহাদুর মহম্মদ আলি, মিঃ মোয়াজ্জেম আলি চৌধুরী (ক'বার হলো?), মিসেস কে নুরুদ্দীন ও রায় বাহাদুর রাধিকাভূষণ রায়।



কবিতা

প্রভাতী

শ্রীবিমলচন্দ্র ঘোষ

আজ এই প্রভাতের নতুন আলোয়
মনে মনে বলিঃ
হে প্রভাত, অবসাদ অপরাধ যত
ধুয়ে দাও সোনার আলোয়,
এ জীবনে যেন আর আসে না আমার
রাতের আলেয়া।
পিছু ডাকা রাত জাগা অতি-অসহন
অপমানে মরে থাকা মনের কাঁদন
আর না আর না হে প্রভাত,
সহেছি তো দুঃসহ অনেক আঘাত
সময়ের কালো জলে
লোনাজলে ঢেউ খেয়ে
এতকাল কেটেছি সাঁতার।
মনে মনে লঘু সুরে আজ তাই করি উচ্চারণ
হে আকাশ খোলো খোলো
অসহ রাতের কালো—
মোহ-আবরণ!

তেলের ভাঁড়

শ্রীফণিভূষণ মিত্র

ভালবাসা? ও যে ভাঁওতা! —কোরো না গোসা:
শাঁসটুকু রেখে তাইতো দিয়েছো আঁঠি;
ছাড়িয়ে ফেলেছো দু'হাতে আমের খোসা—
ফে'লে দিয়ে ফের তবু কেন দাও কাঠি?
জলের কলসী কাঁখে যে তোমার ভরা—
পিপাসায় আমি ছট্‌ফট্ করি ভুঁয়ে,
জানিনে যে কা'কে বলে খোসামোদ করা—
মনের কথাটি যাবে নাকি তুমি ছুঁয়ে?
চারিদিকে ওরা ব'সে আছে ভাঁড় পে'তে—
তোমার টনক সেইখানে শুধু নড়ে,
আমি এক কোণে গরমে উঠেছি তে'তে—
ভুলেও যেন না এখানে নজর পড়ে!
ওরা ব'সে আছে নিয়ে ভাঁড় ভরা তেল—
যতই মাথায় শাঁসভরা পায় আম;
কাকের কপালে তাইতো পেকেছে বেল—
অপমান ছাড়া আমার কি আছে দাম?

বাসের ভিড়ে পার্শ্ববর্তী জনৈক সহযাত্রীর প্রতি

শ্রীঅজিতকৃষ্ণ বসু

(আমি) ভুল করে যদি তোমার পকেটে হাত দিই
(মোরে) ভেবো না পকেটমার
ভেবো যে বাসের মহাভিড়ে ভাই
তুমি ও আমিতে কোনো ভেদ নাই
তোমার পকেটে আমার পকেটে
হয়ে গেছে একাকার
(তাই) ভুল করে আমি তোমার পকেটে হাত দিলে
(মোরে) ভেবো না পকেটমার।

* * * *

(আছে) বহু গাঁটকাটা, চোর ও ছ্যাঁচোড়
ঘোরে তারা ট্রামে বাসে,
(তারা) ভদ্রলোকের ভাণ করে' থাকে
ভদ্রলোকের পাশে।
ভিড়ের সুযোগে জানি এরা ভাই
গোপনে চালায়ে হস্ত-সাফাই
পকেটের মাল বে-পকেট করে'
হয় যে পগাড় পার
(তুমি) টের পাবে নাকো পকেটে তাহারা হাত দিলে
(যারা) সাচ্চা পকেটমার।

* * * *

দুঃখের কথা কই তবে শোন,
শেল বিঁধে আছে বুকে
আজ সাথে নাই সাথী ছিল যারা
সমান দুঃখে সুখে,
ঝর্ণা কলম শতদল দুটি'
পকেট-তড়াগে ছিল মোর ফুটি',
জার্মান আর মার্কিন তারা—
পেলিক্যান্, পার্কার।
দুইবারে মোর দুইটি কলম মেরে দিলো
দুইটি পকেটমার।

* * * *

(আহা) পকেটমারেরা সবাই পকেটে হাত দেয়।
তাই বলে কি রে ভাই
পকেটেতে কারো হাতটি পেলেই
চোর বলে' ধরা চাই?
একথাটা ভাই ঠিক জেনে রাখো
পকেটমারেরা ধরা পড়ে নাকো,
ধরা পড়ে যারা ভোলা-মন তারা
নহে তো খবরদার।
টের পাবে তুমি পকেটে যাহার হাত পেলে
সে নহে পকেটমার।

* * * *

(দাদা) আলু-ঠাসা ভিড়ে একটু-আধটু হবেই
ছোটোখাটো ভুলচুক।
এই তো সেদিনে বাসের গরমে ঘরমে
ভিজেছিলো মোর মুখ;
ঘরম মুছোতে লইয়া রুমাল
ভিড়ে গোলমালে হয়ে বে-খেয়াল
আমার রুমালে পাশের শ্রীমুখ
মুছেছিনু একবার
মুখের মালিক তাই বলে ভাই আমাকে
ভেবেছে কি মুখ-মার?
আমার পকেটে ভুল করে' তুমি হাত দিলে
ভেবো নাকো আমি চট্‌বোই
(সেথা) সিকি-ভাগ এক পেন্‌সিল আছে
আর ছোট এক নোট্‌বই;
এ দুটি জিনিস যাবে নাকো চুরি
এ নিয়ে কি কারো পোষায় মজুরী?
তোমায় আমায় এসো রফা করি
এ সর্ত হোক্ তার—
(যেন) কাহারো পকেটে ভুল করে কেউ হাত দিলে
(কেউ) ভাবে না পকেটমার।

পুস্তক পরিচয়

গান্ধীজীর সহিত এক সপ্তাহ—লুই ফিসার; অনুবাদক, বিমলকুমার বসু ও রবীন্দ্রনাথ গাঙ্গুলী। দি গ্লোব লাইব্রেরী, ২নং শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য আড়াই টাকা।

মার্কিন সাংবাদিক লুই ফিসার ১৯৪২ সালের জুন মাসে সেবাগ্রামে গান্ধীজীর সঙ্গে এক সপ্তাহ অতিবাহিত করেন। লুই ফিসারের জীবনের সেই ঐতিহাসিক সাতটি দিনে গুণগ্রাহী, মুগ্ধ শিষ্যের ন্যায় প্রশ্নের পর প্রশ্ন করিয়া তিনি ভারতের সাম্প্রতিক রাষ্ট্রীয় সমস্যা সম্বন্ধে গান্ধীজীর মতামত জানিয়া লন এবং উহা লিপিবদ্ধ করিয়া দেশে গিয়া এই গ্রন্থ প্রকাশ করেন। গান্ধীজীর সরল আন্তরিকতাপূর্ণ মনের সহজ প্রকাশ গ্রন্থখানাকে মহিমান্বিত এবং গ্রন্থকারকে ধন্য করিয়াছে। গীতা বাইবেলের মত সহজ সত্যের স্ফুরণ এই মুগ্ধ দর্শনার্থীর নিকট গান্ধীজীর মুখের বাণী হইয়া রূপলাভ করিয়াছে। এইজন্যই বইটি আন্তর্জাতিক খ্যাতিলাভে সক্ষম হইয়াছে।

এমন একখানা অবশ্যপাঠ্য পুস্তকের অনুবাদ করিয়া অনুবাদকদ্বয় বঙ্গভাষী মাত্রেরই ধন্যবাদ ভাজন হইয়াছেন। অনুবাদ খুব প্রাঞ্জল হইয়াছে, কোথাও অনুবাদের গন্ধটুকুও নাই। গান্ধীজীর অনাড়ম্বর জীবনযাত্রার সুন্দর একখানি আলেখ্য যেন সমগ্র বইখানাতে চিত্রিত হইয়াছে। বইটির ছাপা কাগজ ও বাঁধাই উত্তম এবং বহিরাবরণ সুন্দর।

কাব্য-জিজ্ঞাসা—শ্রীঅতুলচন্দ্র গুপ্ত। প্রকাশক শ্রীপুলিনবিহারী সেন, বিশ্বভারতী। তৃতীয় মুদ্রণ; মূল্য দেড় টাকা মাত্র।

সাহিত্যের ক্ষেত্রে একটা জিনিস মাঝে মাঝে বেশ লক্ষ্য করা যায়,—এক একটা বিষয়ে যেটা প্রথম লেখা সেইটাই শ্রেষ্ঠ লেখা থাকিয়া যায়। শ্রীযুত অতুলচন্দ্র গুপ্তের কাব্য-জিজ্ঞাসা সম্বন্ধেও আমরা এই কথাটা লক্ষ্য করিতে পারি। বাঙলা সমালোচনা-সাহিত্যের দারিদ্র্য আজও পীড়াদায়ক; এখন তবুও কিছু কিছু চলিতেছে,—কিন্তু প্রায় বিশ বৎসর পূর্বে কাব্য-জিজ্ঞাসার লেখাগুলি যখন 'সবুজ-পত্রে' প্রকাশিত হইতেছিল, তখন এ দারিদ্র্যের পরিমাণ আরও অধিক ছিল। সেই যুগে অতুলবাবু তাঁহার জাগ্রত কাব্য-জিজ্ঞাসু মন লইয়া প্রাচীন আলঙ্কারিকগণের আলোচনা অবলম্বনে সাহিত্যে মূল কথা সম্বন্ধে যে সকল আলোচনা করিয়াছেন আজও তাহা অম্লান এবং অপ্রতিদ্বন্দ্বী।

সাধারণভাবে সংস্কৃত আলঙ্কারিকগণের এবং তাহার ভিতরে বিশেষভাবে আনন্দবর্ধন এবং অভিনব গুপ্তের আলঙ্কারিক আলোচনা অবলম্বন করিয়াই গ্রন্থখানি লিখিত। সমস্ত আলোচনা ধ্বনি, রস, কথা ও ফল এই চারি শিরোনামায় বিভক্ত। গ্রন্থের ভূমিকায় লেখক গ্রন্থখানির প্রকৃতি সম্বন্ধে যে দু'একটি কথা বলিয়াছেন, তাহা প্রণিধানযোগ্য। তিনি বলিয়াছেন, গ্রন্থখানি একদিকে যেমন প্রাচীন আলঙ্কারিকগণের মতামতের একখানি সংকলন গ্রন্থমাত্র নহে, অন্য দিকে তাঁহাদের ঘাড়ে জোর করিয়া চাপাইয়া দেওয়া কতগুলি আধুনিক মতামতের সমষ্টিও নহে। আসলে লেখকের নিজের একটি সত্যকারের জিজ্ঞাসু মন রহিয়াছে,—সেই জিজ্ঞাসু মন যেমন নিজের চিন্তার ভিতরে তার জিজ্ঞাসার সমাধান খুঁজিয়াছে তেমনি প্রাচীনদের আলোচনার ভিতরেও তার সমাধান খুঁজিয়াছে। প্রাচীনদের চিন্তা ও নিজের চিন্তার যেখানে বনিবনা ঘটিয়াছে, তাহাকে অবলম্বন করিয়াই লিখিত এই গ্রন্থখানি। ফলে গ্রন্থ মধ্যে শুধু মতামতের ভিড়ের ভিতর দিয়া প্রাচীন আলঙ্কারিকদিগকেই পাই না, বর্তমান লেখকেরও স্পষ্ট সন্ধান মেলে।

আলোচনার ভিতরকার যুক্তিতর্কের পরিচ্ছন্নতা ব্যতীতও গ্রন্থ মধ্যে আর একটি লক্ষণীয় বস্তু হইতেছে লেখকের স্টাইল বা প্রকাশভঙ্গী। এই প্রকাশভঙ্গীর গুণেই গ্রন্থখানি একটা সাহিত্যিক সরসতা লাভ করিয়াছে এবং এতখানি অর্থবহুলতা সত্ত্বেও এতখানি সাহিত্যিক সরসতা বাঙলা-সাহিত্যে ইহাকে আদর্শস্থানীয় করিয়া তুলিয়াছে। গ্রন্থখানির তৃতীয় মুদ্রণ ইহার জনপ্রিয়তারই সূচনা করিতেছে; ইহা সত্যই অতি ভরসার কথা,—লেখকের পক্ষে ততখানি নয় যতখানি বাঙলা সাহিত্যের পক্ষে।

"পদধ্বনি"—শ্রীসুবোধ বসু। প্রকাশক—গ্রন্থাগার, পি-৫৮, ল্যান্সডাউন রোড এক্সটেনশন, কলিকাতা। মূল্য—৩৷৷০।

শ্রীযুক্ত সুবোধ বসু বাঙলা সাহিত্যে বিশেষত কাহিনী সাহিত্যে সুপরিচিত। তাঁহাকে পরিচিত করাইবার প্রয়োজনও নাই আর আমার সে স্পর্ধাও নাই। পূর্বে তাঁহার "পদ্মা-প্রমত্তা নদী" পড়িয়াছিলাম তারপর অনেকদিন পরে তাঁর "পদধ্বনি" উপন্যাসখানি পড়িয়া অত্যন্ত খুশী হইয়াছি। গতানুগতিকের রীতি পরিত্যাগ করিয়া বইখানি সাহিত্যের একটি নূতন ধারার ইঙ্গিত করিয়াছে। আজকালকার দিনে এত নূতন জাতীয় ঘটনা ঘটিতেছে ও কালের এত দ্রুত পরিবর্তন হইতেছে যে তাহা ব্যক্তিকে অতিক্রম করিয়া একটি অশরীরী কালপুরুষের চরিত্র অভিব্যক্ত করিতেছে। এই নূতন যুগ-পুরুষ বা কালপুরুষ (Zeitgeist) আসিতেছে এবং আমাদের মধ্যে পাদচারণ করিতেছে। তাহাকে চোখে দেখা যায় না; কিন্তু তাহার পাদচারণের ধ্বনি শোনা যায় এবং তাহার প্রতিচ্ছবি সর্ব মানুষের মধ্যে সুখে, দুঃখে, বিপদে, অনশনে, পীড়ায়, দুর্ভিক্ষে, নানা মতের পরিবর্তনে, সংযমে, অসংযমে চারিদিকেই আমরা প্রতিবিম্বিত দেখি। এই প্রতিবিম্বের ছবি লইয়া গ্রন্থখানি এমন নিপুণতার সহিত রচিত হইয়াছে যে, বইখানি পড়িতে গেলে আমাদের চারিদিকের ছবি আমাদের মনশ্চক্ষে ভাসিয়া ওঠে। আমাদের চারিদিক সম্বন্ধে আমরা সজাগ হইয়া উঠি। এই রকম একটি অশরীরী কাল-বিবর্তকে রসে ও রঙে ফুটাইবার চেষ্টা করিতে গিয়া গ্রন্থকার আপন সৎসাহসের পরিচয় দিয়াছেন। প্রায় দুই সহস্র বৎসর আগে কালিদাস "রঘুবংশ" লিখিতে গিয়া তাঁহাদের তৎকালের রীতিতে এমনই একটি সাহস দেখাইবার চেষ্টা করিয়াছিলেন; কালিদাসের লেখার মধ্যে তিনি যে কালের চিত্রটি দিয়াছেন, তাহা এখনও অমর হইয়া রহিয়াছে। আমাদের বর্তমান কাল অমর হইবার যোগ্য কি না সে বিষয়ে আমার সন্দেহ আছে; কারণ এ কালটি কেবল গড়বার কাল; একালে কোন কাঠামো এখনও নিষ্পন্ন হোয়ে ওঠেনি, চলেছে ভাঙ্গা-গড়া। তবু আমাদের কাছে এ কালের মূল্য আছে, কারণ এটা আমাদের কাল। এই কালকে মূর্ত করিবার চেষ্টা করিয়া, প্রাণস্পন্দিত করিবার চেষ্টা করিয়া লেখক আমাদের ধন্যবাদ অর্জন করিয়াছেন। সকলেই এই গ্রন্থ পড়িয়া সুখী হইবেন এবং বর্তমান কালের মধ্যে নিজেদের সম্বন্ধে নূতন পরিচয় পাইয়া আনন্দিত হইবেন। হয়ত বা ভাবিবেন "হোল কী", "আমরা যাচ্ছি কোথায়।"

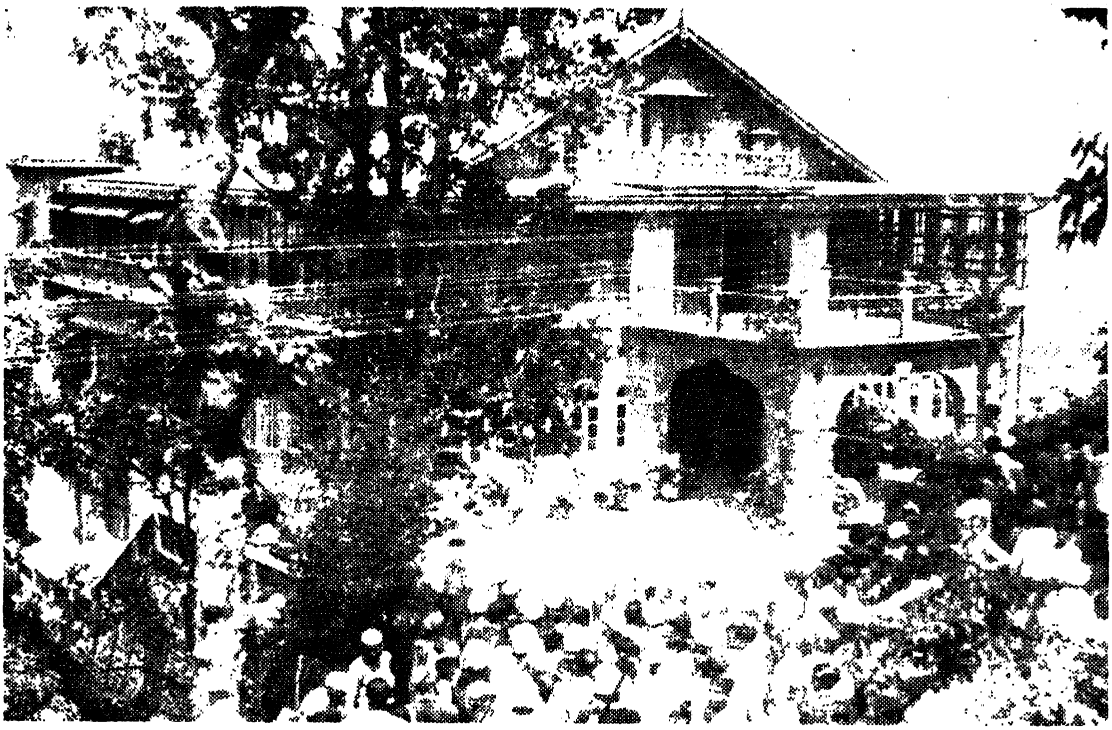
সাধারণতঃ কাব্যে একটি প্রধান চরিত্র এবং একটি প্রধান অঙ্গীরস থাকে; তাহারই চারিদিকে অন্যান্য চরিত্র এবং অন্যান্য রস চারিদিক দিয়া উপচিত হইয়া গাঢ় হইয়া ওঠে এবং দানা বাঁধে। এই উপন্যাসখানিতে একটা প্রধান গল্পের রস থাকিলেও তাহা দুর্বল। তাহাতে লেখক ইহাই সূচিত করিতেছেন যে, বর্তমান কালে ঘটনার প্রবাহ এত দুর্দাম ও এত প্রবল যে, ব্যক্তিগত জীবন সেই প্রবাহের মধ্যে খেলার পুতুলের মত নাচিয়া ফিরিতেছে। কোন ব্যক্তিগত জীবনের প্রতি দৃষ্টি দিবার আমাদের অবসর নাই, প্রয়োজনও নাই। বর্তমান রঙ্গমঞ্চে প্রধান অভিনেতা হচ্ছে বর্তমান কাল। এই কালপুরুষের অভিনয়ের মধ্যে আর সমস্তই অঙ্গস্বরূপ, চারিদিকে চলেছে নানা রকমের ভাঙ্গা-গড়া; তারই প্রতিধ্বনি বা পদধ্বনি আমরা পাই নানা লোকের জীবনের মধ্যে। কালটা যখন থাকে স্থায়ী রকমের, সমাজের বন্ধন যখন থাকে দৃঢ়, রাষ্ট্র যখন থাকে অবিপ্লবী—তখন আমাদের দৃষ্টি পড়ে ব্যক্তিগত জীবনের প্রতি এবং ব্যক্তিগত জীবনের রস ছবিতে যখন ফুটে ওঠে, তখন তা আমাদের দৃষ্টিকে মুগ্ধ করে। অতি প্রাচীনকালে যখন বর্ণাশ্রম ধর্মের বাঁধুনিটা অত্যন্ত কড়া রকমের ছিল, তখন আর এক রকমে ব্যক্তিগত জীবনের মূল্য নিঃসার হোয়ে গিয়েছিল, তাই প্রাচীন ভারতের কাহিনীর মধ্যে ব্যক্তিগত জীবনের মূল্য ছিল না, তৎকালিক কবিদের বিষয়বস্তু খুঁজতে হ'ত রাজাদের জীবনের মধ্যে কিম্বা প্রাচীন পুরাণের মধ্যে। জন্ম থেকে শ্রাদ্ধ পর্যন্ত সমস্ত কাজ ছিল সুনির্দিষ্ট। তার মধ্যে কোন নাটকীয় ঘটনার স্থান ছিল না। এখনকার কাল এত দ্রুত পরিবর্তমান যে, সম্পূর্ণ বিপরীত কারণেও ব্যক্তিগত জীবনের মর্যাদা আমাদের কাছে খাটো হয়ে এসেছে। এ কালে কে কি করবে, তার কোন ঠিকানা নেই, তার জন্য তার নিজের চরিত্রও বিশেষভাবে দায়ী নয়। ঘটনা স্রোতের বেগ এত বেশী যে, তার প্রাবল্যে সকলেই চলেছি আমরা ভেসে। জ্ঞানী, গুণী, মহাত্মা, সাধু, লম্পট, চোর সকলেই বন্যার জলে ভেসে চলেছি। মহাবিপ্লবে সাপে মানুষে জড়াজড়ি করছে। সকলেই ভীত ত্রস্ত, সকলেই মনজমান। এ হেন দুর্দমকালে কালপুরুষের প্রভুত্ব ও তার অলৌকিক চরিত্র আর সমস্ত চরিত্রকে আমাদের দৃষ্টিপট থেকে সরিয়ে দেয়। এই কথাটিই এই কাব্যের প্রধানতম ধ্বনি হয়ে উঠেছে। বাক্যার্থকে অতিক্রম ক'রে এই দুর্লক্ষ্য ব্যঞ্জনা এই কাব্যের মধ্যে একটি নূতন শ্রেণীর রসরূপে ও বস্তুরূপে পরিপুষ্টি লাভ করেছে।

শ্রীসুরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত

হাজার বছর পরে আমাদের কবি (নাটিকা)—সতীকুমার নাগ প্রণীত; চয়নিকা পাবলিশিং হাউস, কলিকাতা হইতে প্রকাশিত মূল্য ।৵০ আনা।

এক হাজার বৎসর পরে এদেশে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের ২৫শে বৈশাখের অনুষ্ঠাতব্য জন্মউৎসব কিভাবে অনুষ্ঠিত হইবে তাহাই কল্পনা করিয়া লইয়া লেখক এই ক্ষুদ্র নাটিকা খানি রচনা করিয়াছেন। নাটকখানি ছোটদের অভিনয়োপযোগী। নাটিকাখানি সুলিখিত এবং ইহা অভিনয় করিয়া ছোটরা আনন্দ লাভ করিবে।

সিমলায় মহাত্মা গান্ধী



মহাত্মাজীকে দেখিবার জন্য ম্যানর ভিলার সম্মুখে দর্শনার্থীদের ভিড়।



রাজকুমারী অমৃত কাউর সমভিব্যাহারে মহাত্মাজী ম্যানর ভিলায় প্রবেশ করিতেছেন।



(৩৪)

বাসন্তীর গলার স্বরের তীব্র শ্লেষ মাধুরীর মনের ভেতর জ্বালা সৃষ্টি করে: বাসন্তীর উদ্ধত দৃষ্টি, মাধুরীর সর্বাঙ্গে কাঁটার মত বিঁধতে থাকে। বাসন্তীর প্রশ্নের ভাষা অর্থ আর ইঙ্গিত মাধুরীর শিক্ষা রুচি ও বিত্ত দিয়ে গড়া শহুরে মর্যাদার মাথায় যেন চরম অপমান বর্ষণ করে।

মাধুরী উঠে দাঁড়ায়। বাসন্তীর উত্তেজিত প্রশ্নের অহঙ্কারকে ঠেলে দিয়ে সে এখুনি চলে যেতে চায়। গর্বিতা বাসন্তীর কোন করুণার প্রশ্রয় সে চায় না। মান্দার গাঁয়ের এত নিরাভরণ জীবনেও যে এত অহঙ্কার লুকিয়েছিল, মাধুরী তা ভাবতে পারে না। কী রূঢ় এই গর্ব!

মাধুরী বলে—ভজুর কথাগুলি বিশ্বাস করতে তোমার বেশ ভাল লাগছে বাসু?

বাসন্তী—তুমি যে আমাকেও ভজুর দলে টেনে আনছো?

মাধুরী—কিন্তু তুমি ভজুর কথা বিশ্বেস করেছ নিশ্চয়।

বাসন্তী—হ্যাঁ, তুমি বিশ্বাস করনি?

মাধুরী—না। আমার বাবা ভজুকে টাকা দিয়ে এসব কুকাজ করাবে, এমন অসম্ভব কথা আমায় বিশ্বাস করতে বলো না।

বাসন্তী—যাক্, এসব কথা আলোচনা না করাই ভাল।

মাধুরী—আমি চল্লাম।

বাসন্তী—এই ঝড়ের মধ্যে, এমন অসময়ে, এত রাগ করে চলে যেতে নেই মাধুরী।

মাধুরী—রাগ করছি না বাসু, নিজের অবস্থাটা বুঝতে পেরেছি। আমি নিজেকে কখনো খুব বড় করে ভাবিনি, খুব বেশি গর্ব আমার ছিল না, কিন্তু তোমাদের মতে আমাকে যতখানি ছোট মনে করা উচিত, নিজেকে ততখানি ছোট বলে ভাবতে পারছি না।

বাসন্তী—বড় ভুল করছো মাধুরী। তোমাকে ছোট করে ভাববার আমার সাধ্যি কি? তুমিই আমাদের অহঙ্কার মাধুরী। তুমিই তো সব দিক দিয়ে জিতে যাচ্ছ। তোমাকে কোথাও হার মানতে হয়নি। আমাকে তুলনা করে লজ্জা দিও না মাধুরী। আমি তোমাদের গাঁয়ের পাতাকুটোর মতন। একটি ফুঁ দিলেই সরে যাব। বিধাতাকে আর অদৃষ্টকে এইভাবেই মানতে শিখেছি আমি। কিন্তু তুমি তো তা নও। মান্দার গাঁ হোক্, মীরগঞ্জ সদর হোক্, বা বিলেত হোক্—পৃথিবীর কোন স্থানের কোন গর্ব তোমাকে ছোট করতে পারেনি।

মাধুরীর মুখের ভাব শান্ত হয়ে এল। বাইরে ঝড়ের দাপাদাপিও অনেকটা শান্ত হয়েছে।

মাধুরী কুণ্ঠিতভাবে বলে—কিন্তু ভজুর কথা আমার বিশ্বেস করতে ইচ্ছে করছে না মাধুরী।

বাসন্তী—বেশ তো, বিশ্বাস করো না। ভজুর কথায় কি আসে যায়?

মাধুরী—কিন্তু যদি সত্যি হয়?

বাসন্তী—তা হলেই বা কি আসে যায়। মানুষ ভুল বুঝেই ভুল কাজ করে। ভুল ভাঙার দিনও আসে, তখন সব ঠিক হয়ে যায়।

মাধুরী—কথাটা ঠিক বললে না বাসু। যেদিন ভুল ভাঙে, সেদিন আর কিছু করার থাকে না। যা ক্ষতি হবার হয়েই যায়, তার পূরণ আর হয় না।

ঝড় থেমে আসছিল, কিন্তু ক্লান্ত ঝড়ের মৃদু বিলাপের শব্দ ছাপিয়ে সারা গাঁ জুড়ে শতকণ্ঠের চীৎকার চারদিকে দৌড়াদৌড়ি করে বেড়াচ্ছিল। পূব-পশ্চিমে উত্তর-দক্ষিণে—সব দিকেই যেন ব্যস্ত ক্ষুব্ধ ও বিব্রত জনতার আর্তরোল শুনতে পাওয়া যাচ্ছে। মাধুরী আর বাসন্তী বারান্দায় এসে সেই চীৎকারের ঝড়ো ভাষা বুঝবার জন্য উৎকর্ণ হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। মাঝে মাঝে দেখা যায়, লণ্ঠন নিয়ে এদিক ওদিক থেকে লোকজন ছুটাছুটি করছে। হঠাৎ এই চাঞ্চল্যের কি কারণ কিছুই বোধগম্য হয় না। ডাকাত, দাঙ্গা, বাঘ—সবই হতে পারে।

ঘণ্টার পর ঘণ্টা আশঙ্কা ও উৎকণ্ঠায় দুজনে বারান্দায় দাঁড়িয়ে রইল। কিছুক্ষণ পরে দেখা গেল, জনকয়েক লোক আলো হাতে নিয়ে বাসন্তীদের বাড়ির বাগানে ঢুকলো। বাসন্তীর বাড়ির দিকেই তারা আসছে। আশঙ্কায় বাসন্তীর বুকে দুরু দুরু আরম্ভ হয়। মাধুরী ঘরের ভেতর গিয়ে শুয়ে পড়ে।

একটু এগিয়ে এসেই আগন্তুকদের মধ্যে একজন জোরে চেঁচিয়ে হাঁক দেয়—অজয় আছিস্ নাকি রে।

তার পরেই আবার প্রশ্ন হয়—বাসু ঘুমিয়েছিস্?

মেজকাকার কণ্ঠস্বর। আজ বোধ হয় পাঁচ বছর পরে মেজকাকা বাসন্তীদের বাড়িতে পা দিলেন। পাঁচ বছর পরে কথা বললেন। পাঁচ বছর ধরে অজয়দের একটা পুকুরের সরিকী স্বত্ব নিয়ে এক দুর্মর মামলা মেজকাকাকে এ বাড়ির সীমা থেকে দূরে সরিয়ে রেখেছে। কথাবার্তা আলাপ মেলামেশা—সবকিছু মুছে গিয়ে দু'বাড়ির মধ্যে এক দুর্লঙ্ঘ্য ব্যবধান তৈরি করে রেখেছে। একই পুরুষের শোণিতের ধারা আজও দুই পরিবারের ধমনীতে অবিকার আছে, কিন্তু তার প্রবাহ যেন ভিন্নমুখী হয়ে গেছে। তার কারণ, ঐ একফালি পুকুরের সরিকী স্বত্ব। ঐ মামলা।

তবু মেজকাকা আজ এসেছেন। বাসন্তী উত্তর দিল—কি ব্যাপার কাকা? কিসের গোলমাল হচ্ছে? আমার যে ভয়ে ঘুম আসছে না।

মেজকাকা—অজয় বাড়িতে নেই বুঝি?

বাসন্তী—না।

মেজকাকা—তবুও কোন ভয় করিস্ না। আমরা সবাই পাশেই জেগে রয়েছি। কোন ভয় নেই।

বাসন্তী—কি হয়েছে?

মেজকাকা—কারা জানি ঘরে ঘরে আগুন লাগিয়ে দিচ্ছে। কিছুই বুঝতে পারা যাচ্ছে না।

বাসন্তী—কোথায় আগুন লাগলো?

মেজকাকা—স্কুল বাড়িটা পুড়ে ছাই হয়ে

গেছে, ইউনিয়ন বোর্ড অফিসটা পুড়ে গেছে, আর সঞ্জীব চাটুয্যার বাড়ি।

ঘরের ভেতর বিছানার ওপর মাধুরী উঠে বসলো। মেজ কাকা তখনো বাসন্তীকে সমস্ত ঘটনার বিবরণ সংক্ষেপে শোনাচ্ছিলেন—সঞ্জীব চাটুয্যার বাড়িটা এখনো একেবারে পুড়ে শেষ হয়নি। লোকজন সবাই গিয়ে এখনো আগুন নেভাচ্ছে। বাড়িতে কেউ ছিল কি না জানা যাচ্ছে না। আমি শুনেছিলাম, সঞ্জীব চাটুয্যের মেয়েটি আজকাল বাড়িতেই থাকে। যদি সে সত্যিই থেকে থাকে, তাহ'লে, ভগবান্ ভগবান্...।

মেজকাকা ঘটনাটাকে আর কল্পনা করতে পারলেন না। গলার স্বর শিউরে উঠলো।

বাসন্তী—আর কোথাও আগুন লেগেছে, শুনেছেন কিছু?

মেজকাকা—না, আর কোথাও কিছু হয়নি। আমি চারদিক টহল দিয়ে এলাম। চারদিকে ভলান্টিয়ার বসিয়ে দিয়ে এসেছি, পাহারা দেবার জন্য।

বাসন্তী—কেশবদার বাড়িতে একা জেঠিমা রয়েছেন।

মেজকাকা—হ্যাঁ, সেখানে ঘুরে এসেছি, দুজনকে পাহারা রেখে এসেছি। শুধু একটি কথা ভাবতে আমার বুক কেঁপে উঠছে বাসন্তী। সঞ্জীববাবুর মেয়েটি যদি ঘরের ভেতর থেকে থাকে, তাহ'লে ভয়ানক সর্বনাশ হয়ে গেছে বুঝতে হবে...... ভগবান ভগবান!

বাসন্তী চুপ করে দাঁড়িয়েছিল। মেজকাকা বললেন—তুই নিশ্চিন্ত হয়ে ঘুমো গে বাসু। আমরা ঘুরে ঘুরে সারা রাত পাহারা দেব, কোন ভয় নেই।

মাধুরী বিছানার ওপর চুপ করে বসেছিল। আজ আর ঘুমোবার ভরসা নেই। বাকী রাতটুকু জেগে জেগেই ভোর করে দেওয়া ভাল। ঘুমোবার ইচ্ছেও নেই মাধুরীর। জেগে থেকে তবু ঘটনাগুলিকে চোখে চোখে রাখতে পারা যায়। একটু আগুনের জ্বালা লাগে, অপমান সইতে হয়, কিন্তু তার বেশী কিছু নয়। ঘুমিয়ে পড়লে কোন্ দুঃস্বপ্ন এসে শান্তি নষ্ট করবে কে জানে।

বাসন্তী এসে বললো—সব শুনলে তো মাধুরী? মেজকাকার কথাগুলি নিশ্চয় শুনতে পেয়েছ?

মাধুরী—হ্যাঁ।

অনেকক্ষণ চুপ করে থেকে মাধুরী বলে—আমার একটা আপশোষ হচ্ছে।

বাসন্তী—কি?

মাধুরী—যদি আজ তোমাদের এখানে না আসতাম?

বাসন্তী—তাতে কি লাভ হতো? কি ক্ষতি তোমার হয়েছে?

মাধুরী—আজ তা হলে একটা গতি হয়ে যেত।

বাসন্তী—গতি কিছুই হতো না, একটা দুর্গতি হতো।

মাধুরী—যাই বল, সব ল্যাটা চুকে যেত।

বাসন্তী—কিছুই চুকে যেত না। অনেক ল্যাটা সৃষ্টি করতে।

মাধুরী—তর্ক করতে চাই না মাধুরী, শুধু মনে হচ্ছে যদি আজ বাড়িতে থাকতাম, তবে আজকের রাত্রিটা জীবনের শেষ রাত্রি হয়ে যেত। বেশ ভাল রকম নিশ্চিত হয়ে যেতে পারতাম।

বাসন্তী—কিছুই হতো না, কিছুই করতে পারতে না। এটা তোমার একটা সখ, এই মাত্র বলতে পার।

মাধুরী—তুমি আমাকে এত দুর্বল ভাব কেন বাসন্তী?

বাসন্তী—তুমি মোটেই দুর্বল নও। দুর্গতি থেকে নিজেকে সরিয়ে নিয়ে যেতে, সরে পড়তে তুমি পার। সে শক্তি তোমার আছে।

মাধুরী—না, সে শক্তি আমার নেই। এখনো একটা উপায় আছে বাসন্তী।

বাসন্তী—বল।

তুমি যদি লোকের কাছে প্রকাশ না করে দাও তবে বলি।

বাসন্তী—বলে ফেল।

মাধুরী—লোকে জানুক, সত্যিই আমি পুড়ে মরে গেছি, ছাই হয়ে গেছি।

বাসন্তী—তারপর?

মাধুরী—তারপর একদিকে চলে যাই। সবাই রইল, শুধু আমি থাকবো না। না মরেও এই রকম একটা মুক্তি আমায় পেতে দাও।

বাসন্তী তাতে তোমার লাভ?

মাধুরী—আমার লাভ, আমি বেঁচে গেলাম।

বাসন্তী—কিসের থেকে বাঁচবে? কিসে তোমায় এত মর মর করেছে যে বাঁচতে চাইছ?

মাধুরী—আমি ব্যর্থ হয়ে গেছি। কারও কাছে কথা বলার অধিকার আমার নেই। আমার জীবনের চারদিকে শুধু কতগুলি প্রশ্ন ভীড় করে রয়েছে, কিন্তু উত্তর দেবার মত শক্তি আমার নেই। হয় সবার কাছে হার মানতে হবে, নয় সরে যেতে হবে, এ ছাড়া আমার পথ নেই।

বাসন্তী—সবার কাছে হার মানবে কেন?

মাধুরী—সবাইর দাবী, সবারই প্রশ্ন, সবারই উপদেশ, শাসন—এত দাবী মেটাবার, এত প্রশ্নের উত্তর দেবার কৌশল আমি জানি না।

বাসন্তী—সবাই তোমার কি করলো মাধুরী। সবার কাছে তুমি কি অপরাধ করেছ? আমি তো জানি শুধু......।

মাধুরী—তুমি আবার কি জানতে পেলে?

বাসন্তী—না, আমি কিছু জানি না।

বাসন্তী যেন বিরক্ত হয়েই উত্তর দিয়ে একেবারে চুপ করে থাকে। নিস্তব্ধতার মধ্যে রাত্রির ভয়াবহতা ও বেদনা ধীরে ধীরে আরও ভারি হয়ে উঠতে থাকে। বাসন্তী ও মাধুরীর নিঃশব্দ চিন্তার পরমাণুগুলি গভীর বিষণ্ণতায় বাইরের অন্ধকারের সঙ্গে একাকার হয়ে যেন মিশে যায়। এই দুই চিন্তার মধ্যে কোন মিল নেই। মাধুরীর মনে যেন দুর্যোগের নেশা ধরেছে। এই রাত্রির ঝড় অন্ধকার আর অগ্নিজ্বালার অভিশাপটুকু চিরস্থায়ী করে রেখে সে শুধু সরে পড়ার সখের স্বপ্ন দেখে। এ এক অদ্ভুত নেশা। জীবনে কাউকে সুখী করতে পারলো না, কারও প্রশ্নের উত্তর দিতে পারলো না, কারও দাবী মেটাতে পারলো না—এই আনন্দেই ডুব দিয়ে তলিয়ে থাকতে চায় মাধুরী।

বাসন্তীর মনে শত বিষণ্ণতার মধ্যেও কোন জ্বালা নেই। এই কালরাত্রি অচিরে ভোর হয়ে যাক্। আবার সূর্য উঠুক্। সবাই ফিরে আসুক্। সবাই ফিরে আসার পর, সবারই সঙ্গে কথা বলে, সবারই মুখের দিকে শেষবারের মত সব আগ্রহ দিয়ে তাকিয়ে তারপর সে বিদায় নেবে। আর বেশি দেরী নেই। দিন ঘনিয়ে আসছে। এ জীবনকে ফাঁকি দিয়ে আড়ালে সরে পড়তে চায় না বাসন্তী। সবারই আশীর্বাদ নিয়ে, এ জীবনের দুয়ারে মাথা ঠেকিয়ে, সবার হাসিমুখ ভরে নিজের চোখের জল নিয়ে অন্য ঘরে চলে যাবে। কেউ যেন এতটুকু ব্যথা না পায়, কেউ যেন ক্ষুব্ধ না হয়।

মাধুরী বললো আমি সত্যিই চলে যেতে চাই বাসু। যাবার আগে একবার বাবার সঙ্গে যদি দেখা হতো......।

বাসন্তী—দেখা হলে কি করতে?

মাধুরী—বলতাম, তুমি কেশবদার কাছে ক্ষমা চেয়ো।

বাসন্তী—আর কারও কাছে কিছু বলার নেই?

মাধুরী—হ্যাঁ, কেশবদার কাছে একটা কথা বলার ছিল।

বাসন্তী—আর?

মাধুরী—পরিতোষ বাবুর কাছে আর কিছু বলবার নেই।

বাসন্তী—বেশ, আর কারও কাছে?

মাধুরী—না।

মাধুরী গম্ভীর হয়ে বসে থাকে। বাসন্তীর মনে হয়, মাধুরীর মুখটা নিশ্চয় কুৎসিত ও নির্লজ্জের মত দেখাচ্ছে। ভাগ্যিস্ ঘরে অন্ধকার। নইলে, ঐ মুখের দিকে তাকিয়ে ঘৃণায় বাসন্তীর গা শিরু শিরু করতো। জীবনের ওপর কোন শ্রদ্ধা নেই, জীবনের কোন প্রতিজ্ঞা অনুরাগ ও কামনার ওপর কোন নিষ্ঠা নেই শুধু মন

নিয়ে একটা প্রগল্‌ভ বিলাসিতা। লেখাপড়া শিখে, শহরে বসে সখের স্বদেশী ক'রে, এই হৃদয়হীনতাটুকু লাভ করেছে মাধুরী। ওর জবাবদিহির শেষ নেই; নিজেকে বঞ্চনা করেই ওর আনন্দ। জীবন ধরে এই বঞ্চনার তালিকা শুধু বাড়িয়ে এসেছে মাধুরী। কারও কাছে ওর পাওয়ার মত কিছু নেই। তাই সবাইকে অবাধে আহ্বান করে, সবাই অবাধে প্রত্যাখ্যান করে।

মনের সংশয়গুলিকে আজ আর চেপে রাখতে পারে না বাসন্তী। দু'দিন আগে থেকে ভাব্‌বার কোন কারণ ছিল না, যা ভয় করার কোন হেতু ছিল না, আজ সেই আশঙ্কা সত্য বলে মনে হয়। মাধুরীর নিশ্বাসে অকল্যাণ, মাধুরীর দৃষ্টিতে বিষ আছে। এ মেয়েরই মহিমায় সঞ্জীববাবুর ঘর পুড়ছে।

বাসন্তীর চিন্তাগুলি ক্রমেই উত্তেজিত হয়ে ওঠে। মাধুরীকে ক্ষমা করার কোন সংগত কারণ খুঁজে পায় না। কিন্তু এর পরেও, যদি মাধুরী নিজেকে না সাম্‌লায়, যদি নিজের ভুল বুঝে সংযত না হয়, যদি একতিলও প্রায়শ্চিত্তবোধ না জাগে, তবে ওর বিদায় নেওয়াই উচিত। নইলে, আরও অনেকের ক্ষতি করবে মাধুরী। এইবার যার ক্ষতি করতে চলেছে মাধুরী, সে অন্য কেউ নয়। অন্য কেউ হলে বাসন্তী এত ক্ষুব্ধ ও উত্তাক্ত হতো না। মাধুরীকে এত কঠোর ভাবে ঘৃণা করতে পারতো না।

মাধুরী শান্তভাবেই প্রশ্ন করে—অজয়দা কবে ফিরবেন কিছু বলে গেছেন?

বাসন্তীর গলা ঠেলে ধিক্কার ছুটে আসতে চায়। হ্যাঁ, সেই আশঙ্কাই সত্যি। মাধুরীর শুচি-অশুচি বোধ হয় লুপ্ত হয়ে গেছে। ওকে ক্ষমা করা যায় না। ওর জীবনে শাস্তি চাই-ই চাই। নইলে ওর ভ্রান্তি ঘুচবে না। নইলে নিজের জীবনকে কতগুলি মিথ্যা মায়ার রঙ দিয়ে এক নিদারুণ প্রহেলিকা তৈরি করে রাখবে। এক এক করে সবারই চলার পথে দাঁড়িয়ে, সবারই দিক্‌ভুল করিয়ে দেবে মাধুরী।

(ক্রমশ)

বিষয় প্রসঙ্গ

সানফ্রান্সিস্কোতে ৫০টি মিত্ররাষ্ট্রের প্রতিনিধিদের ৯ সপ্তাহ ব্যাপী অধিবেশনের পরে গত ২৫শে জুন বিশ্বশান্তি ও নিরাপত্তার সনদ রচনা শেষ হয়েছে বলে সংবাদ পাওয়া গেছে। ইয়াল্টা সম্মেলনের নির্ধারণ অনুসারে গত ২৫শে এপ্রিল এই সম্মেলন আরম্ভ হয়েছিল। এই সনদে ১০ হাজার শব্দ আছে এবং ২৬শে জুন বেলা দ্বিপ্রহর থেকে ৫০টি রাষ্ট্রের প্রতিনিধিবর্গ এই সনদে স্বাক্ষর করতে আরম্ভ করেছেন। প্রথম স্বাক্ষর করেছেন চীনের প্রতিনিধি ডাঃ ওয়েলিংটন কু। ২৭শে জুন বুধবার সকাল ৬-৪৫ মিনিটের সময় প্রেসিডেণ্ট ট্রুম্যান সম্মেলনের শেষ পূর্ণ অধিবেশনে বক্তৃতা করবেন বলে জানা গেছে।

এই সম্মেলনের প্রথম অবস্থায় প্রধান শক্তিবর্গের মধ্যে দু'একটি মৌলিক বিষয় নিয়ে যেরূপ মতভেদ দেখা দিয়েছিল তাতে মনে হয়েছিল সম্মেলনের সাফল্যপূর্ণ পরিসমাপ্তি সম্ভবতঃ সম্ভবপর হবে না। কিন্তু যেরূপেই হউক সে সমস্ত অতিক্রম করে সর্বসম্মত সনদ রচনা সম্ভবপর হয়েছে। অবশ্য মতভেদগুলোর যে সামঞ্জস্য বিধান করা হয়েছে তা অনেকটা জোড়া-তালি দেওয়া কাজ চালানো ব্যাপারের মত মনে হয়। বিরোধ জমে উঠেছিল বিশেষ করে 'ভিটো' ও অছিগিরির ব্যাপার সম্বন্ধে। স্থির হয়েছে নিরাপত্তা কাউন্সিলের ১১ জন সভ্যের মধ্যে যে ৫টি রাষ্ট্রপ্রতিনিধি স্থায়ী সভ্য থাকবে তাদের প্রত্যেকেরই 'ভিটো' প্রয়োগের অধিকার থাকবে অর্থাৎ কাউন্সিলের সভ্য অন্য সমস্ত রাষ্ট্র যে সিদ্ধান্ত করবেন এই সব রাষ্ট্রের কোন একজন তার বিরুদ্ধে মত প্রকাশ করলেই তা বাতিল হয়ে যাবে। নিরাপত্তা কাউন্সিলের স্থায়ী সভ্য হবে চীন, ফ্রান্স, সোভিয়েট রুশিয়া, গ্রেট ব্রিটেন, উত্তর আয়র্ল্যাণ্ড ও আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র।

দ্বিতীয় মতভেদ সৃষ্টি হয়েছিল অছি-গিরির ব্যাপার নিয়ে। যে সমস্ত দেশ বর্তমানে ম্যাণ্ডেট শাসিত, শত্রু রাষ্ট্রসমূহ থেকে যে সমস্ত দেশ দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের ফলে বিচ্ছিন্ন করে আনা হবে; কোন রাষ্ট্র তাহার শাসনাধীন যে কোন দেশকে অছি-ব্যবস্থার অধীনে সমর্পণ করবেন;—এই সমস্ত দেশ আন্তর্জাতিক অছি ব্যবস্থার মধ্যে আসতে পারবে। যে সব দেশ সম্মিলিত রাষ্ট্রসঙ্ঘের সভ্য তারা অছি-গিরির আওতায় আসবে না।

এখন এই অছিগিরির অধীনে যে সব দেশ থাকবে সেগুলিকে ক্রমে ক্রমে 'স্বাধীনতার' পথে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া হবে না 'স্বায়ত্তশাসনের' পথে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া হবে সম্মেলনে এই এক পরম সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছিল। যাঁরা সর্বরাষ্ট্রের সমানাধিকারের, শান্তি ও নিরাপত্তার সনদ রচনা করতে বসেছেন তাঁদের এই দুটো কথা নিয়ে বাক্যাস্ফোট আর কিছু না হোক কৌতুকের সৃষ্টি করেছিল প্রচুর। অনেক কথার কসরৎ দেখিয়ে এর যা মীমাংসা হয়েছে তা আরও কৌতুকজনক। মীমাংসাটা হলো এইরূপ—

To promote their progressive development towards self-government or independence, as may be appropriate to the particular circumstances of each territory and its people...."

অর্থাৎ প্রত্যেক দেশ বা দেশবাসীর অবস্থা বিবেচনায় "স্বাধীনতা" বা 'স্বায়ত্তশাসন'এর মধ্যে যেটা তাদের উপযোগী হবে সেইদিকে ক্রমশঃ অগ্রসর করে নিয়ে যাওয়া হবে। একে তো 'ক্রমশঃ অগ্রসর করে নিয়ে যাওয়া', তারপর অবস্থানুযায়ী 'স্বায়ত্তশাসন' কিংবা 'স্বাধীনতার' পথে। ভারতবাসী আমরা এই 'progressive development,' 'independence' ও 'self-government' এই তিনটি বহুরূপী কথার বিচিত্র প্রয়োগ ও ব্যাখ্যার সঙ্গে এত বেশী পরিচিত যে বলদর্পিত যে কাউকে এই কথা তিনটি নিয়ে খেলতে দেখলেই আমাদের আতঙ্কিত হয়ে উঠতে হয়। মনে হয় যেখানে শব্দ-প্রয়োগেই এত কার্পণ্য, সেখানে তার প্রয়োগ না-জানি কিভাবে করা হবে। 'স্বাধীনতা' বা 'স্বায়ত্ত শাসনের' এই 'তরলসার' কখনো জমাট বেঁধে ঘনত্ব প্রাপ্ত হবে তো?

যাক্ সে কথা, এবার আসল সনদটা সম্বন্ধেই একটু আলোচনা করা যাক্। সনদের মুখবন্ধে (preamble) বলা হয়েছে—সম্মিলিত রাষ্ট্রসমূহের অধিবাসী আমরা যে যুদ্ধ দু'বার মানব জাতির দুর্ভোগ সৃষ্টি করেছে, সেই যুদ্ধের অভিশাপ থেকে ভবিষ্যৎ বংশধরদের মুক্ত রাখার জন্য দৃঢ় সংকল্প। মানুষের মৌলিক অধিকার, ব্যক্তির মর্যাদা ও মূল্য, নর ও নারীর এবং ছোট ও বড় রাষ্ট্রের সমান অধিকার সম্বন্ধে আমাদের আস্থা আমরা দৃঢ়ভাবে জ্ঞাপন করছি। এমন অবস্থায় আমরা সৃষ্টি করতে সংকল্পবদ্ধ যাতে ন্যায়বিচার হওয়া সম্ভব হয় এবং চুক্তির সর্ত বা আন্তর্জাতিক বিধানের ফলে উদ্ভূত বাধ্যবাধকতা রক্ষিত হয়। সামাজিক

উন্নতি ও ব্যাপক স্বাধীনতার ভিত্তিতে উন্নততর জীবনযাত্রার ব্যবস্থা করা, সহিষ্ণুতা অভ্যাস করা ও প্রতিবেশীদের সঙ্গে শান্তিতে বসবাস করাও আমাদের উদ্দেশ্য হবে। আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তা রক্ষার জন্য আমাদের শক্তি একতাবদ্ধ করতে, সাধারণের স্বার্থ রক্ষার প্রয়োজন ব্যতীত অন্যত্র সশস্ত্র শক্তি প্রয়োগ না করতে, আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানের সাহায্যে সকল জাতির সামাজিক ও আর্থিক উন্নতির ব্যবস্থা করতে আমরা আমাদের সমবেত শক্তি নিয়োগে দৃঢ়-সংকল্প হয়েছি।

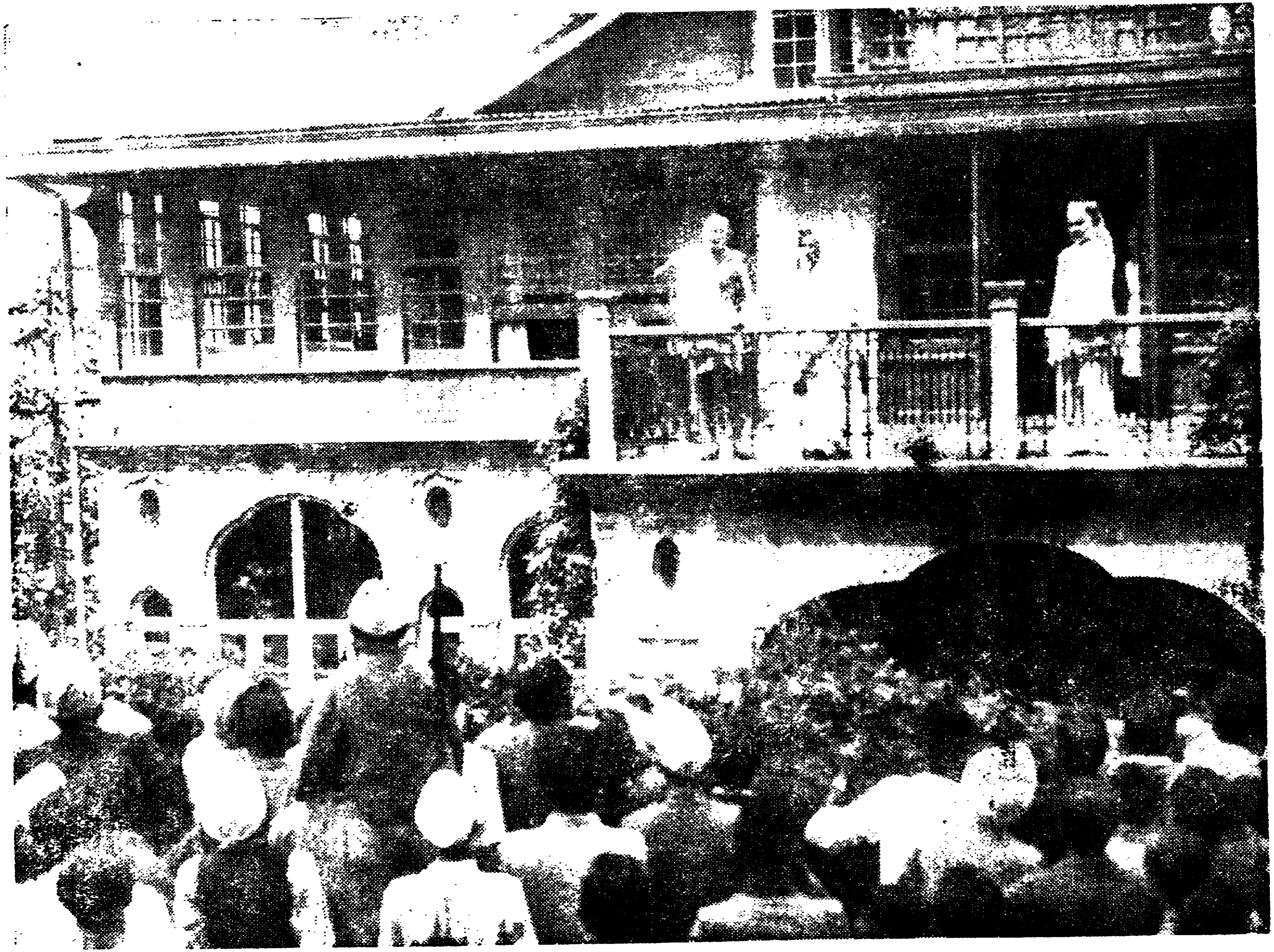
অতএব আমাদের স্ব স্ব গভর্নমেণ্ট সানফ্রান্সিস্কো সহরে সম্মিলিত প্রতিনিধিদের দ্বারা সম্মিলিত রাষ্ট্রসমূহের এই সনদে সম্মতি দিয়েছেন। আমরা ইহার দ্বারা একটি আন্তর্জাতিক সংঘের প্রতিষ্ঠা করছি। এর নাম হবে সম্মিলিত রাষ্ট্র সংঘ (United Nations)।"

এই আন্তর্জাতিক সনদ ১৯টি অধ্যায়ে বিভক্ত। ডাম্বার্টনওক্‌স আন্তর্জাতিক সনদের যে খসড়া করা হয়েছিল, তার সামান্য কিছু অদলবদল করেই এই সনদ রচিত করা হয়েছে। এই সনদে নির্দিষ্ট প্রতিষ্ঠানের নিম্নরূপ গঠন হবে। প্রথমতঃ একটি সাধারণ পরিষদ থাকবে। সম্মিলিত রাষ্ট্রসমূহের সমগ্র প্রতিনিধিই এর সভ্য হবেন। তাঁরা বিভিন্ন সমস্যা সম্পর্কে আলোচনা করে তৎসম্বন্ধে সুপারিশ করতে পারবেন। দ্বিতীয়ত থাকবে নিরাপত্তা পরিষদ। নিরাপত্তা পরিষদে থাকবে ১১জন সভ্য। তন্মধ্যে ৫জন হবে স্থায়ী সভ্য। তা আমরা পূর্বে বলেছি। বাকী ছয়জন নির্বাচিত হবে সাধারণ পরিষদের দ্বারা। সনদের বিধানগত ব্যাপার ছাড়া অন্য ব্যাপার স্থায়ী সভ্যেরা 'ভিটো' করতে অর্থাৎ অগ্রাহ্য করতে পারবে। তৃতীয়ত থাকবে একটি অর্থনীতিক ও সামাজিক পরিষদ। এ পরিষদটি ১৮জন সভ্য নিয়ে গঠিত হবে। এ ১৮জন সভ্যও নির্বাচিত করবেন সাধারণ পরিষদের সভ্যেরা। এ পরিষদের কাজ হবে আন্তর্জাতিক, অর্থনীতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক, শিক্ষাবিষয়ক ও স্বাস্থ্য-সম্পর্কিত বিষয় সম্পর্কে পর্যালোচনা করা ও তৎসম্বন্ধে সুপারিশ করা। চতুর্থত থাকবে একটি অছি-সভা। যে সমস্ত রাষ্ট্র অছি হবে তাদের প্রতিনিধি এবং সাধারণ পরিষদের নির্বাচিত প্রতিনিধি এ সভায় সমসংখ্যক থাকবে। অছি রাষ্ট্রের তত্ত্বাবধানে প্রদত্ত অঞ্চল মাঝে মাঝে পরিদর্শন করবার ক্ষমতা এ সভার থাকবে। পঞ্চমত হেগে যে স্থায়ী আন্তর্জাতিক বিচারালয় আছে, তার স্থলে একটি আন্তর্জাতিক বিচারালয় হবে। ষষ্ঠত, একটি সেক্রেটারিয়েট থাকবে। তা পরিচালনা করবেন একজন সেক্রেটারী জেনারেল। সেক্রেটারী জেনারেল নিযুক্ত হবে নিরাপত্তা সভার সুপারিশক্রমে সাধারণ পরিষদের দ্বারা। সেক্রেটারীয়েট আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানের আদেশের দ্বারাই পরিচালিত হবে কোন বিশেষ গভর্নমেণ্টের আদেশের দ্বারা নয়।

এই হল অতি সংক্ষেপে আন্তর্জাতিক সনদ নির্দিষ্ট প্রতিষ্ঠানের গঠন। সনদের প্রত্যেক খুঁটিনাটি ধরে নিয়ে এখানে আলোচনা করা সম্ভব নয়। তবে সমগ্র সনদে ছোট বড় সকলের সমানাধিকার, আন্তর্জাতিক নিরাপত্তা ও শান্তি প্রতিষ্ঠার ও চিরতরে যুদ্ধ উৎসাদনের প্রতিশ্রুতি, মানুষের সুখস্বাচ্ছন্দ্য ও সংস্কৃতিকে উন্নততর করা প্রভৃতি বড় বড় কথা অনেকই আছে। আর একথাও ঠিক যে আন্তর্জাতিক ভিত্তিতে গঠিত কোন প্রতিষ্ঠান ব্যতীত পৃথিবীতে স্থায়ী শান্তি প্রতিষ্ঠা সম্ভব নয়। কিন্তু পৃথিবীতে ভাল কথা বা ভাল পথের সন্ধানের অভাবে যে ভাল কাজ অনুষ্ঠিত হয় না তাতো নয়। নানা মনীষী, বিভিন্ন মানব নেতা নানাভাবে মানুষকে কল্যাণের পথের সন্ধান দিয়েছেন। কিন্তু মানুষের স্বার্থ বুদ্ধি, বলের উন্মত্ততা, দুর্বল পীড়নের নেশা মানুষের সে কল্যাণ গ্রহণের পথে বাধাস্বরূপ হয়ে দাঁড়িয়েছে। গত যুদ্ধের পর যখন বিশ্ব রাষ্ট্র সঙ্ঘ গঠিত হয়েছিল, তখনও আমরা এমনি সব বড় বড় কথা শুনেছিলাম। কিন্তু দেখা গেল একটা মহাযুদ্ধের পর ২৫ বৎসরও পার হল না, আর একটি ব্যাপকতর ও ভীষণতর যুদ্ধের আগুন সমস্ত পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়ল। এ যুদ্ধের আরম্ভ থেকে এ সনদ রচনা পর্যন্তও অনেক বড় বড় কথা আমরা শুনেছি। কিন্তু যত সৎবচনবিন্যাস করে এবং সতর্ক বিধিব্যবস্থা রচনা করেই প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা হোক না কেন যুদ্ধের যা মূল কারণ তা দূরীভূত না হলে যুদ্ধের উচ্ছেদ পৃথিবী থেকে কখনই হবে না। প্রতিষ্ঠানের শক্তিমানদের মধ্যে বিরোধের সৃষ্টি হলেই সমস্ত প্রতিষ্ঠান তাসের ঘরের মত ধ্বসে পড়ে যাবে। পৃথিবীতে যতদিন শক্তিমান জাতির দ্বারা দুর্বল জাতির উপর শাসন, শোষণ ও নিপীড়ন চলবে—যতদিন শুধু অপরের শোষণের দ্বারা কতিপয়ের স্ফীত হয়ে ওঠবার সুযোগ সুবিধা ও প্রবৃত্তি থাকবে,—অস্ত্রবলই যতদিন ছোটবড় নির্ধারণের মানদণ্ড থাকবে, ততদিন শুধু প্রতিষ্ঠান গঠন করে ও আন্তরিকতাশূন্য আশ্বাসবাণীর জোরে পৃথিবী থেকে যুদ্ধের উচ্ছেদ সম্ভব হবে বলে মনে হয় না। সে অবস্থার সৃষ্টি করতে মানসিকতার যে পরিবর্তন প্রয়োজন, স্বার্থবুদ্ধির ওপরে মানবকল্যাণকে যেভাবে প্রতিষ্ঠিত করার প্রয়োজন সম্মিলিত রাষ্ট্রবৃন্দের মধ্যে তা যে কারো হয়েছে তার পরিচয় আমরা এ পর্যন্ত পাইনি। পৃথিবীর পরাধীন দেশগুলির এখনও পরাধীনতার বন্ধন ঘোচেনি, ইউরোপের শত্রুকবল মুক্ত দেশগুলিতে এখনও শক্তির পাশা খেলা আমরা দেখেছি, সানফ্রান্সিস্কো সম্মেলনের অধিবেশনকালে সিরিয়া আর লেবাননের ব্যাপার ঘটে গেল। কাজেই এ আন্তর্জাতিক সনদ রচনায় ভবিষ্যৎ শান্তির কোন নির্ভরযোগ্য আশ্বাস আমরা পাচ্ছি না বটে। কিন্তু পৃথিবীর মানুষ সুস্থ ও উন্নত মানসিকতার অধিকারী হয়ে পৃথিবীতে শান্তি প্রতিষ্ঠার পথের সন্ধান পাক এ কামনা আমরা মনে প্রাণেই করবো।

—বিষ্ণু গুপ্ত





সিমলায় রাজকুমারী অমৃত কাউরের গৃহ 'ম্যানর ভিলা'র সম্মুখে সমবেত জনতাকে মহাত্মা গান্ধী দর্শন দিতেছেন।

সাপ্তাহিক সংবাদ

দেশী সংবাদ

২০শে জুন—ওয়াভেল প্রস্তাব সম্পর্কে আলোচনার জন্য গান্ধীজী ও অন্যান্য নেতৃবর্গ বোম্বাই শহরে সমবেত হন। ওয়ার্কিং কমিটির সদস্যগণের মধ্যে এক ঘরোয়া বৈঠক হয়।

২১শে জুন—রাষ্ট্রপতি মৌলানা আজাদ অদ্য এগারটায় বোম্বাই পেশীছেন। জিন্না হলে জনসাধারণের পক্ষ হইতে তাঁহাকে রাজোচিত সম্বর্ধনা জ্ঞাপন করা হয়। অদ্য পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু বোম্বাই পেশীছিলে তিনি প্রায় পাঁচ লক্ষ নরনারী কর্তৃক অভ্যর্থিত হন।

প্রায় তিন বৎসর পর অদ্য বেলা ২ ঘটিকার সময় এখানে কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির অধিবেশন আরম্ভ হয়। ওয়াভেল প্রস্তাব সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা হয় এবং কংগ্রেসের পক্ষ হইতে সিমলায় নেতৃ-সম্মেলনে যোগদানের সিধান্ত গৃহীত হয়।

অদ্য মহাত্মা গান্ধী এক বিবৃতি প্রচার করিয়া আটক বন্দী শ্রীযুত শরৎচন্দ্র বসুকে বাঙলার কোন স্বাস্থ্যকর স্থানে স্থানান্তরিত করিবার এবং তাঁহাকে আত্মীয়স্বজনের সহিত দেখা-সাক্ষাৎ করিবার সুযোগ দিবার দাবী করিয়াছেন।

২২শে জুন—অদ্য অপরাহ্ণ ৬॥টায় ওয়ার্কিং কমিটির অধিবেশন শেষ হয় এবং রাষ্ট্রপতি ও অন্যান্য নিমন্ত্রিত কংগ্রেসসেবিগণ সিমলা সম্মেলনে যোগ দিতে পারিবেন বলিয়া একটি বিবৃতি দেওয়া হয়।

মহাত্মা গান্ধী অদ্য সন্ধ্যায় ফ্রণ্টিয়ার মেলে সিমলা যাত্রা করেন।

আজ বৈকালে বড়লাট সদলবলে সিমলায় পেশীছেন।

বঙ্গীয় ব্যবস্থা পরিষদের সদস্য শ্রীযুত চারুচন্দ্র রায় শ্রীযুত শরৎচন্দ্র বসুর মুক্তির নিমিত্ত বড়লাটকে চাপ দিবার জন্য মহাত্মা গান্ধী, রাষ্ট্রপতি আজাদ, পণ্ডিত নেহরু ও সর্দার প্যাটেলের নিকট তার করিয়াছেন।

২৩শে জুন—সিমলা বৈঠকের আলাপ-আলোনায় যাবতীয় ব্যবস্থাদি অবলম্বনের জন্য ওয়ার্কিং কমিটি মহাত্মাজী ও রাষ্ট্রপতিকে পূর্ণ ক্ষমতা দিয়াছেন।

রাষ্ট্রপতি আজাদ সিমলা পেশীছিয়াছেন।

ওয়াভেল প্রস্তাব সম্পর্কে বোম্বাই-এ পণ্ডিত নেহরুকে জিজ্ঞাসা করা হইলে তিনি বলেন যে, এই পরিকল্পনা একটি সাময়িক ব্যবস্থা মাত্র, মূল কাঠামো নহে। কমিউনিস্টদের সম্বন্ধে পণ্ডিতজী বলেন যে, মূলত ইহারা দেশের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া কাজ করে না। রুশ পররাষ্ট্রের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়াই উহারা চলে।

২৪শে জুন—অদ্য বেলা ১১টায় মৌলানা আজাদ ও বড়লাট ওয়াভেলের মধ্যে সাক্ষাৎকার হয় এবং প্রায় দেড়ঘণ্টাকাল উভয়ের মধ্যে আলোচনা হয়।

অদ্য অপরাহ্ণ ২ ঘটিকার সময় মহাত্মা গান্ধী বড়লাটপ্রাসদে লর্ড ওয়াভেল ও পরে লেডী ওয়াভেলের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। বড়লাটের সহিত তাঁহার প্রায় ২ ঘণ্টাকাল আলোচনা হয়।

মিঃ জিন্না পাঁচ ঘটিকার সময় বড়লাট ভবনে গমন করেন এবং ১ ঘণ্টা ৪০ মিনিট বড়লাটের সহিত আলোচনা করেন।

মায়ের জন্য একখানি কাপড় যোগাড় করিতে অক্ষম হইয়া দমদমাতে একটি বালক আত্মহত্যার চেষ্টা করে। পুলিস তদন্ত করিয়া বালকটির বিরুদ্ধে চার্জসীট দাখিল করিয়াছে।

২৫শে জুন—আজ সকাল ১১-৩০ মিনিটে সিমলা লাটপ্রাসাদে নেতৃ-সম্মেলন আরম্ভ হয়। মহাত্মা গান্ধী ব্যতীত অপর সকল নিমন্ত্রিত-গণই যোগদান করেন। গান্ধীজী সম্মেলনে যোগদান করিতেছেন না,—প্রয়োজন ক্ষেত্রে পরামর্শ দানের জন্য তিনি এখানেই অবস্থান করিবেন।

অধুনালুপ্ত 'ভারত' পত্রিকার প্রতিষ্ঠাতা ও সম্পাদক শ্রীযুত মাখনলাল সেন গত সোমবার প্রেসিডেন্সী জেল হইতে মুক্তিলাভ করিয়াছেন।

গত সোমবার রাত্রে চূড়ামণি যোগ উপলক্ষে কলিকাতা ও হাওড়ায় ভাগীরথীর উভয় পার্শ্বে এবং আদি গঙ্গার উভয় তীরে বিভিন্ন ঘাটে সহস্র সহস্র নরনারী গঙ্গা-সলিলে গ্রহণস্নান এবং যোগস্নান সমাপন করে।

২৬শে জুন—আজ বেলা ১১টায় নেতৃ-সম্মেলন আরম্ভ হয়। বেলা ১১॥টায় সাময়িক-ভাবে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় এবং প্রতিনিধিগণ নিজেদের মধ্যে আলোচনার আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ করায় আগামীকল্য ১১টা পর্যন্ত সম্মেলনের অধিবেশন স্থগিত থাকে।

কংগ্রেস সভাপতি ও গান্ধীজীর মধ্যে আলোচনার পর পণ্ডিত গোবিন্দবল্লভ পন্থ অপরাহ্ণ ৬টায় সিসিল হোটেলে. মিঃ জিন্নার সহিত সাক্ষাৎ করেন।

প্রকাশ, শ্রীযুত শরৎচন্দ্র বসু বহুমূত্র রোগে ভুগিতেছেন এবং চক্ষুরোগেও কষ্ট পাইতেছেন। তাঁহার স্বাস্থ্যভঙ্গের সংবাদে গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করিয়া অবিলম্বে তাঁহার মুক্তির দাবী জানাইয়া কলিকাতা হাইকোর্টের বিশিষ্ট এটর্ণীবৃন্দ ভারত সরকারের স্বরাষ্ট্র বিভাগের সেক্রেটারীর নিকট একখানা আবেদন প্রেরণ করিয়াছেন।

বিদেশী সংবাদ

২০শে জুন—ইতালীতে কর্মিদলের নেতা সিনর ফেরুসিও পারি নূতন ইতালীয় গভর্ন-মেণ্ট গঠন করিয়াছেন।

মার্শাল স্ট্যালিন নাকি ব্রিটেন ও আমেরিকার নিকট এই মর্মে প্রস্তাব করিয়াছেন যে, জার্মানী ক্ষতিপূরণ স্বরূপ মিত্রপক্ষকে ৫ শত কোটি পাউণ্ড দিবে।

৮২ দিন সংগ্রামের পর মার্কিন বাহিনী ওকিনাওয়া দখলের যুদ্ধে জয়লাভ করিয়াছে। এই যুদ্ধে ৯০০০০ জাপানীর প্রাণহানি ঘটিয়াছে বলিয়া প্রকাশ।

২১শে জুন—মস্কোতে আজ বন্দী পোল নেতাদের বিচার শেষ হইয়াছে। জেনারেল ওকুলিকিকে দশ বৎসরের জন্য এবং অপর ১১ জনকে অপেক্ষাকৃত কম সময়ের জন্য 'স্বাধীনতা হইতে বঞ্চিত' করা হইয়াছে।

২২শে জুন—জার্মানীর অব্যবহৃত 'গোপন অস্ত্র' জাপানের বিরুদ্ধে প্রয়োগ সম্পর্কে মিত্র-পক্ষীয় বৈজ্ঞানিকগণ গবেষণা করিতেছেন।

আমেরিকার জজ জ্যাকসন এরূপ আভাস দিয়াছেন যে, গোয়েরিং, রিবেণ্ট্রপ ও হেস প্রভৃতি ইউরোপের বড় বড় যুদ্ধাপরাধীদের বিচার ব্রিটেন, আমেরিকা, সোভিয়েট ইউনিয়ন ও ফ্রান্স প্রমুখ চতুঃশক্তি গঠিত আন্তর্জাতিক সামরিক ট্রিবিউণ করিবে। বর্তমান গ্রীষ্মের শেষাশেষি বিচার আরম্ভ হইতে পারে।

মার্কিন সেনাপতিমণ্ডলীর প্রধান জেনারেল জর্জ মার্শাল অদ্য এক বিবৃতিতে বলেন, রুশিয়া জাপানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিবে কি না তাহা জানিবার উপায় নাই বলিয়া, প্রশান্ত মহাসাগরে কবে জয়লাভ হইবে তাহা সঠিক বলা অসম্ভব।

২৩শে জুন—মস্কো হইতে সরকারী ইস্তাহারে ঘোষণা করা হইয়াছে যে, জাতীয় ঐক্যমূলক অস্থায়ী পোলিশ গভর্নমেণ্ট গঠনে পূর্ণ মতৈক্য প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। নূতন গভর্নমেণ্টের মন্ত্রি-সভা শীঘ্রই ওয়ারশ'তে ঘোষণা করা হইবে।

সোভিয়েট লেখক এম ভি মীখিভ 'ভারত পরিক্রমা' শীর্ষক এক ভ্রমণ কাহিনীতে লিখিয়াছেন। "ক্ষীণবক্ষ, কঙ্কালসার, রোগজীর্ণ ক্ষুধারিক্লিষ্ট নরনারীর যে মর্মান্তিক দৃশ্য আমরা দেখিয়া আসিয়াছি, তাহা জীবনভোর আমাদের স্মরণে বিরাজ করিবে।"

২৪শে জুন—মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রীয় প্রতিনিধি পরিষদের যুদ্ধব্যয় কমিটির নিকট উচ্চপদস্থ সামরিক কর্মচারীদের সাক্ষ্যে বলা হইয়াছে যে, আমেরিকানরা যথাসম্ভব শীঘ্র জাপানের শহর অঞ্চলগুলি ধ্বংস করিবার পরিকল্পনা করিয়াছে।

২৫শে জুন—অদ্য জাপ নিউজ এজেন্সী ঘোষণা করিয়াছে যে, জাপ "গৃহরক্ষী বাহিনী"কে এই আদেশ দেওয়া হইয়াছে যে, তাহারা যেন কখনও জীবিত অবস্থায় আত্ম-সমর্পণ না করে। যুদ্ধ যত তীব্রই হউক না কেন, তাহারা জীবিত অবস্থায় বন্দী হইতে এবং অপমানজনক মৃত্যুবরণ করিতে পারিবে না।

পারস্যে আস্তিমেসের নিকটে এক ট্রেন দুর্ঘটনায় ৫০ জন লোক হতাহত হইয়াছে।

সানফ্রান্সিস্কোতে সম্মিলিত রাষ্ট্রপুঞ্জের অছিগিরি কমিশনের প্রকাশ্য অধিবেশনে পৃথিবীর পরাধীন অঞ্চলের জনসাধারণের কল্যাণের জন্য একটি নূতন অছিগিরি ব্যবস্থার প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে।

শ্রীযুক্তা বিজয়লক্ষ্মী পণ্ডিত সানফ্রান্সিস্কো হইতে নিউইয়র্ক যাত্রা করিয়াছেন।

ব্রিয়েস্তের সর্বত্র ৬০ হাজার শ্রমিক ধর্মঘট করিয়াছে।

বিশ্বের ৫০টি জাতি গত ৯ সপ্তাহ ধরিয়া সানফ্রান্সিস্কোতে যে বিশ্বনিরাপত্তা পরিকল্পনা লইয়া আলোচনা করিতেছিল, তাহা অদ্য পাকাপাকিভাবে রচিত ও ৫০টি জাতির প্রতি-নিধি কর্তৃক গৃহীত হইয়াছে। সম্মেলন সম্মিলিত রাষ্ট্রপুঞ্জ নামে একটি নূতন আন্ত-জাতিক প্রতিষ্ঠান গঠন করিয়া ১০ হাজার শব্দের এক সনদ গ্রহণ করিয়াছেন।

২৬শে জুন—মূল ভূখণ্ড দখলের সংগ্রাম শীঘ্রই শুরু হইবে বলিয়া জাপানে আশঙ্কা করা হইতেছে।

মিত্রসৈন্য ডাচ ইস্টইণ্ডিজের টারনেট দ্বীপে অবতরণ করিয়াছে।

দেশ

সম্পাদক ঃ শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র সেন

সহকারী সম্পাদক ঃ শ্রীসাগরময় ঘোষ

১২ বর্ষ । শনিবার, ২৩শে আষাঢ়, ১৩৫২ সাল। Saturday, 7th July, 1945. । ৩৫শ সংখ্যা

সাময়িক প্রসঙ্গ

ওয়ার্কিং কমিটির বৈঠক

রাষ্ট্রপতি মৌলানা আজাদের আমন্ত্রণে কংগ্রেস-নেতৃবৃন্দ সিমলায় সমবেত হইয়াছেন এবং সেখানে কংগ্রেসের ওয়ার্কিং কমিটির অধিবেশন আরম্ভ হইয়াছে। আমাদের এই মন্তব্য লিপিবদ্ধ করিবার সময় কমিটির অধিবেশনের উপসংহার ঘটে নাই; সুতরাং সুদীর্ঘকাল পর এই অধিবেশনে কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি কি সিদ্ধান্ত করিবেন, সে সম্বন্ধে কোন কথা নিশ্চিত-ভাবে বলা আমাদের পক্ষে সম্ভব নহে। তবে আমাদের পক্ষে একথা বলা বোধ হয় অসমীচীন হইবে না যে, মিঃ জিন্না মুসলিম লীগের ভারতীয় মুসলমান সমাজের সর্বময় প্রতিনিধিত্বের যে দাবী লইয়া উপস্থিত হইয়াছেন এবং সেইভাবে কংগ্রেসকে কেবলমাত্র হিন্দুর সাম্প্রদায়িক প্রতিষ্ঠানরূপে প্রতিপন্ন করিবার জন্য তিনি তাঁহার যে চিরন্তন চাতুরী অবলম্বন করিয়াছেন, কংগ্রেস তাহা কিছুতেই স্বীকার করিয়া লইবে না দেখিতেছি। শেষটা কংগ্রেস কর্তৃক পাকিস্থানী দাবী সমর্থিত করিবার উদ্দেশ্যে মিঃ জিন্না সিমলার ব্যাপারের মোড় অন্যদিকে ঘুরাইয়া লইবার জন্য চেষ্টা করিয়াছিলেন, কিন্তু সাম্প্রদায়িকতার এই প্যাঁচক্র কাটাইয়া উঠিবার উদ্দেশ্যে কংগ্রেস নেতৃবৃন্দ বর্তমানে বদ্ধপরিকর হইয়াছেন এরূপ অবস্থায় হয় মিঃ জিন্নাকে তাঁহার প্রগতিবিরোধী মতিগতি পরিত্যাগ করিয়া ভারতের রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতার জন্য সংগ্রামের পথে সোজাসুজি আসিতে হইবে; নতুবা তাঁহাকে সরিয়া দাঁড়াইতে হইবে। কিন্তু মিঃ জিন্নার মর্জির প্রশ্নই এক্ষেত্রে একমাত্র প্রশ্ন নয়। কংগ্রেস ভারতের রাষ্ট্রীয় সমস্যা সমাধানের অগ্রগতির পথের এই অন্তরায় অতিক্রম করিতে সমর্থ হইলেও ওয়ার্কিং কমিটির সম্মুখে আরও অনেক প্রশ্ন রহিয়াছে। বড়লাট কিরূপ ব্যক্তিদিগকে নবগঠিত শাসন-পরিষদের সদস্য নির্বাচিত করেন এবং শাসন সম্পর্কিত বিভিন্ন বিভাগের ভার কাহাদের উপর অর্পিত হয়, তাহার উপর ওয়াভেল প্রস্তাবের ভবিষ্যৎ অনেকখানি নির্ভর করিতেছে। স্বরাষ্ট্র, অর্থ এবং পররাষ্ট্র—এই বিভাগগুলি বিশেষভাবে গুরুত্বসম্পন্ন; স্বদেশপ্রাণ, স্বাধীনচেতা এবং ত্যাগপরায়ণ ব্যক্তিদের উপর এই সব বিভাগের ভার যদি অর্পিত না হয়, তবে কংগ্রেস তাহা সমর্থন করিতে পারিবে না। ভারত-সেবার নামে বিদেশীর স্বার্থ-সেবার দৈন্যবৃত্তি দেশের লোক আর মানিয়া লইতে প্রস্তুত নহে এবং ভারতের জন-সাধারণের একমাত্র প্রতিনিধিস্থানীয় প্রতিষ্ঠানস্বরূপে কংগ্রেস রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতার আদর্শকে সাময়িক মীমাংসার দায়ে কোনক্রমেই ক্ষুণ্ণ করিতে পারে না। ওয়াভেলের প্রস্তাব সম্পর্কে এই সব সর্ত প্রতিপালিত হইলেও ভারতের রাষ্ট্রনীতিক ক্ষেত্রে নূতন আবহাওয়া সৃষ্টি করিবার জন্য রাজনীতিক সমস্ত বন্দীকে মুক্তিদান করিবার জন্য ব্যবস্থা অবলম্বন করানো কংগ্রেসের সর্বপ্রথম কর্তব্য হইবে; আমরা পূর্বেই বলিয়াছি, এই ব্যাপারে হিংসা বা অহিংসের বিচার করিলে চলিবে না। পরাধীন দেশে স্বাধীনতার মৌলিক আদর্শের জন্য বেদনাই বড় কথা, সে দিক হইতে বর্তমানে এইরূপ বৈষম্যমূলক দৃষ্টি অবলম্বন করিবার কোন প্রয়োজন আছে বলিয়া আমরা মনে করি না। এই সঙ্গে কংগ্রেস প্রতিষ্ঠানসমূহের উপর হইতে সকল বাধা-নিষেধও অবিলম্বে প্রত্যাহার করিতে হইবে। কারণ, ওয়াভেল প্রস্তাবকে কার্যকর করিতে হইলে সর্বাগ্রে ইহাই প্রয়োজন, নতুবা উক্ত প্রস্তাবে এমন বিশেষ কিছু নাই যাহাতে দেশের লোকের চিত্ত আকৃষ্ট হইতে পারে। কোন কোন হিসাবে ক্রীপস প্রস্তাবের অপেক্ষাও এই প্রস্তাব অনেক বিষয়ে ত্রুটি-পূর্ণ। তথাপি দেশের লোকে যে এই প্রস্তাব এখনও সরাসরি অগ্রাহ্য করিতে দণ্ডায়মান হয় নাই তাহার কারণ এই যে, তাহারা এই আশা করিতেছে যে, গভর্নমেণ্টের সঙ্গে সাময়িকভাবে এই পথে কোন একটা আপোষ-নিষ্পত্তি সম্ভব হইলে ভারতের রাজনীতিক বন্দীরা সকলে মুক্তিলাভ করিবেন এবং দেশের সর্বত্র নূতন জীবনের সঞ্চার ঘটিবে। তাহারা এই আশা করিতেছে যে, ভারতের স্বদেশপ্রেমিক সন্তানগণ কারাগার হইতে যদি মুক্তিলাভ করেন এবং কংগ্রেস প্রতিষ্ঠানগুলি পুনরায় জীবন্ত হইয়া উঠিয়া স্বাধীনতার সাধনামূলক কর্ম-প্রণালী সর্বত্র সম্প্রসারিত করিতে সুযোগ পায়, তবে জাতির এই সঙ্কট-সন্ধিক্ষণে ভারতের স্বাধীনতা কেহ পশুবলে প্রতিরুদ্ধ করিয়া রাখিতে পারিবে না। আমরা পূর্বেই বলিয়াছি, বাঙলার বর্তমান সমস্যার দিক হইতে কংগ্রেসের শক্তিকে সঙ্ঘবদ্ধ করিবার প্রয়োজনীয়তা সর্বাপেক্ষা অধিক হইয়া পড়িয়াছে। দুর্ভিক্ষ, মুদ্রাস্ফীতি, বস্ত্রাভাব, সকলভাবে যুদ্ধের ফলে বাঙলায় যতটা বিপর্যয় ঘটিয়াছে, অন্য কোন প্রদেশে তাহা ঘটে নাই। বাঙলার শক্তিকে সুগঠিত করিবার প্রয়োজনীয়তা কমিটি নিশ্চয়ই উপলব্ধি করিবেন। আমাদের মতে বড়লাটের 'ভিটো' করিবার বিশেষ ক্ষমতা বা বিলাতের নির্বাচনের ফলাফলে সেখানকার দলবিশেষের নিগ্রহানুগ্রহের বিচার জাতির লক্ষ্যের দিক হইতে সম্পূর্ণ পরোক্ষ ব্যাপার; ওয়াভেল প্রস্তাবের সাম্প্রতিক ব্যবস্থার দোষগুণ অপেক্ষা ভারতের স্বাধীনতা-সংগ্রামে আত্মদাতা স্বদেশ-প্রেমিকদের অগ্নিময় প্রেরণার উদ্দীপনাকেই আমরা অধিক মূল্য প্রদান করি। ওয়াভেল প্রস্তাবের স্বীকৃতি যদি সে উদ্দেশ্য সিদ্ধির পক্ষে সহায়ক না হয়, তবে সে প্রস্তাবের কোন মূল্যই নাই। ওয়ার্কিং কমিটির সিদ্ধান্তে এই সত্যই সুস্পষ্ট হইবে এবং কংগ্রেসের পূর্ণ স্বাধীনতার আদর্শ সমধিক উজ্জ্বল আকার ধারণ করিবে, আমাদের ইহাই দৃঢ় বিশ্বাস।

বিক্রয়-কর বৃদ্ধি

গত ২৫শে জুন হইতে বিক্রয়-করের হার প্রতি টাকায় দুই পয়সার স্থলে বর্ধিত করিয়া তিন পয়সা করা হইয়াছে। বিক্রয়-করের এই বর্ধিত হারের প্রতিবাদ জানাইয়া

মারোয়াড়ী চেম্বার্স অব্ কমার্স বাঙলা সরকারের নিকট সম্প্রতি এক পত্র প্রেরণ করিয়াছেন। বাঙলার জনসাধারণ নানাপ্রকার গুরু কর-ভার-বহনে পূর্ব হইতেই গলদঘর্ম হইয়া উঠিয়াছে। ইহার উপর বিক্রয়-করের হার প্রতি টাকায় এক পয়সা বৃদ্ধি করিয়া সেই সঙ্গে এদেশের জনগণের দুঃখ দুর্ভোগ বৃদ্ধিরও ব্যবস্থা করা হইল। বলা বাহুল্য, বিক্রয়ের উপর কর ধার্য হইলেও ব্যবসায়িগণ কর্তৃক এই বিক্রয়-কর প্রদত্ত হয় না। ক্রেতৃগণের অধিকাংশই দরিদ্র, দুঃস্থ জনসাধারণ। প্রকৃতপক্ষে বিক্রয়-কর দিতে হয় এই দারিদ্র্য-পীড়িত জনসাধারণকেই। বর্তমান মুদ্রা-স্ফীতির বাজারে আবশ্যক জিনিসপত্র অগ্নিমূল্য। এই অগ্নিমূল্যে নিতান্ত প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র ক্রয় করা এদেশের দরিদ্র জনগণের একরূপ সাধ্যের বাহিরে গিয়াছে বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। বর্তমানে যুদ্ধের পূর্ববর্তী-কালে যে জিনিস ক্রয় করিতে যে মূল্য দিতে হইত, এখন গড়পড়তায় কমপক্ষে তাহার চতুর্গুণ মূল্য দিতে হয়। লাভখোরদের উপদ্রবে দেশের লোক অতিষ্ঠ হইয়া উঠিয়াছে। এ ব্যাপারে জনসাধারণের দুঃখ-দুর্ভোগ লাঘব করিতে গভর্নমেণ্ট অক্ষম ইহা প্রতি ক্ষেত্রেই প্রমাণিত হইয়াছে এবং হইতেছে। কিন্তু দেখিতেছি কার্যত কিভাবে জনসাধারণের দুঃখদুর্দশা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়, তাহার ব্যবস্থা করিতেই তাঁহারা সর্বদা তৎপর। বাজেটে বাঙলা সরকারের ৮॥ কোটি টাকা ঘাটতি হইয়াছে বলিয়া তাহার সমাধান-কল্পে বিক্রয়-কর বর্ধিত হইল, কর্তৃপক্ষ এইরূপ কারণ দেখাইয়াছেন। কিন্তু নূতন ট্যাক্স ধার্য ও ট্যাক্স বৃদ্ধি করা ভিন্ন গভর্নমেণ্ট কি বাজেটের ঘাটতিপূরণের অন্য ব্যবস্থা করিতে পারেন না? ঘাটতিপূরণের জন্য ট্যাক্সের আশ্রয় লওয়া সরকারের সাধারণ-নীতি হইয়া দাঁড়াইয়াছে। এই চিরাচরিত নীতি ক্রমাগত অনুসরণ করিয়া চলায় জনসাধারণকে এক অতি শোচনীয় অর্থ-নৈতিক অপমৃত্যুর মুখে ঠেলিয়া দেওয়া হইতেছে। কর্তৃপক্ষ ইহা কিছুতেই উপলব্ধি করিতে পারিতেছেন না। প্রথম যখন বিক্রয়-কর প্রবর্তিত হয়, তখন গভর্নমেণ্ট এই আশ্বাস প্রদান করিয়াছিলেন যে বিক্রয়করলব্ধ অর্থ গঠনমূলক জনহিতকর কার্যে ব্যয়িত হইবে। কিন্তু দেখা যাইতেছে বিক্রয়-লব্ধ অর্থ অন্য উদ্দেশ্যে বিনিয়োগ করা হইতেছে। পূর্বের সেই আশ্বাস অনুযায়ী কার্য করিতে গভর্নমেণ্ট কতদূর সমর্থ হইয়াছেন এবং এই বর্ধিত করের দ্বারা ঘাটতিপূরণ করিয়া গভর্নমেণ্ট সেই গঠনমূলক ও জনহিতকর কার্য করিবার কিরূপ ব্যবস্থা করিবেন, জনসাধারণ তাহা জানিতে চাহে। অধিকন্তু ঘাটতি যেখানে ৮॥ কোটি টাকা, সেখানে এই বিক্রয়-কর বাড়াইয়া আর ঘাটতি পূরণের দিক হইতে কত কি সুবিধা হইবে? বরং সেজন্য ভারত সরকারের উপরই বাঙলা সরকারের সমধিক চাপ দেওয়া উচিত। তাঁহারা সেই চেষ্টা করুন এবং এই বর্ধিত বিক্রয়-করের হার রদ করিয়া দিন, জনগণের ইহাই দাবী।

বস্ত্রাভাবে আত্মহত্যা

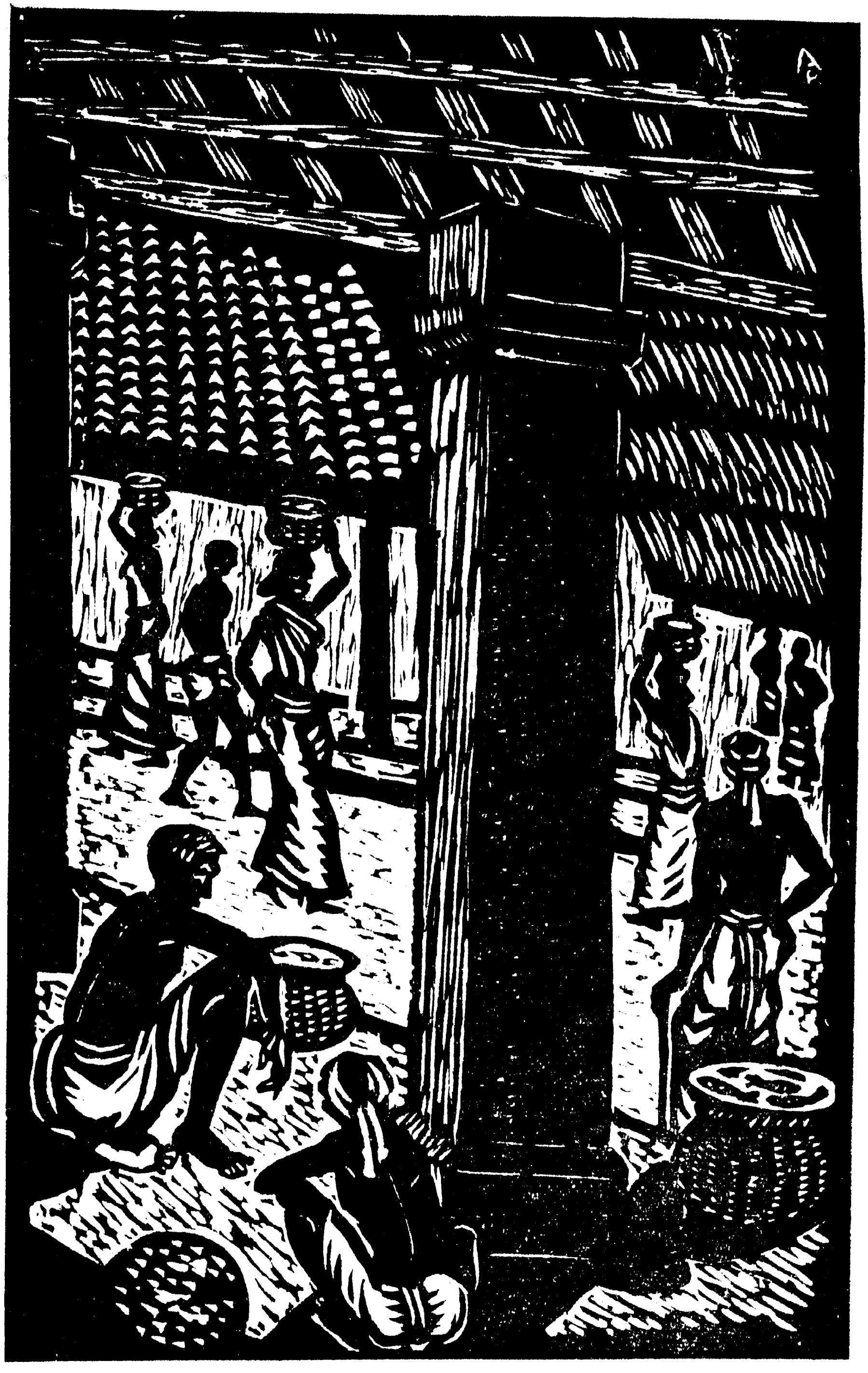
অন্নের দুর্ভিক্ষে বাঙলার লক্ষ লক্ষ লোক অতি শোচনীয়রূপে, অসহায়ভাবে মৃত্যু-মুখে পতিত হইয়াছে। কিন্তু বস্ত্রাভাবে প্রায় প্রত্যহই যে আত্মহত্যার সংবাদ পাওয়া যাইতেছে, তাহা নিরুপায় অবস্থার চাপে স্বেচ্ছাকৃত। কত বড় দুর্গতির দুর্বিপাকে পড়িলে মানুষ আত্মহত্যা করিতে বাধ্য হয়, তাহা ধারণার অতীত। অন্নাভাবে লক্ষ লক্ষ লোক দলে দলে গৃহ-বন্ধন ত্যাগ করিয়া পথে বাহির হইয়াছে, কীটপতঙ্গের মত প্রাণত্যাগ করিয়াছে। বাঙলার বিরাট জন-শক্তির এই অতি শোচনীয় অপচয় শাসক-শক্তির কলঙ্কস্বরূপ এবং তাহার দুর্বিষহ বেদনা শেলের মত বাঙলার বুকে বিদ্ধ হইয়া আছে। কোন স্বাধীন দেশে এই মর্মন্তুদ ঘটনা সংঘটিত হইলে শাসকবর্গের যে যে ব্যক্তির অযোগ্যতা, অবহেলা ও অবিমৃষ্যকারিতায় তাহা ঘটিয়াছে, তাহাদের বিচার হইত এবং তাহারা কঠোরতম দণ্ডে দণ্ডিত হইত। প্রকৃতপক্ষে যুদ্ধাপরাধীর তালিকায় তাঁহারাও অন্তর্ভুক্ত হইবার যোগ্য। কিন্তু পরাধীন দেশে জনগণের স্বার্থের মূল্য অতি সামান্য এবং শাসকবর্গের অযোগ্যতা, উপেক্ষা বা খামখেয়ালী সেখানে অপরাধ নহে। তাই অন্নাভাবের পর শোচনীয় বস্ত্রাভাবেও যখন বস্ত্রহীন নরনারী লজ্জা নিবারণের অন্য কোন উপায় না দেখিয়া আত্মহত্যা করিতেছে, কিংবা আত্মহত্যার চেষ্টায় ব্যাকুল হইয়া পড়িতেছে, তখনও শাসকবর্গ সেই ঔদাসীন্য এবং অবিমৃষ্যকারিতা ও অযোগ্যতা প্রদর্শনে সাহসী হইতেছেন। স্যার নাজিমুদ্দিনের গভর্নমেণ্টের সময় বস্ত্রাভাবের জন্য প্রধানত তাঁহার মন্ত্রিমণ্ডলকেই দায়ী করা হইয়াছিল। সেই গভর্নমেণ্টের অবসানের পর ৯৩ ধারা বলে মিঃ কেসি শাসনভার গ্রহণ করিলে, শাসনের সুব্যবস্থার আশ্বাস দিয়া তিনি যে সব বিবৃতি দান করিয়াছিলেন, তাহাতে বাঙলার জনসাধারণ কথঞ্চিৎ আশান্বিত হইয়াছিল। কলিকাতার স্বাস্থ্যোন্নয়ন সম্পর্কে কিছু দিন আগেও তাঁহাকে কলিকাতার বাজারে ঘুরিয়া বেড়াইতে দেখা গিয়াছিল। কিন্তু তাহার পর তিনি তূষ্ণীম্ভাব অবলম্বন করিয়াছেন। বস্ত্রাভাবে আত্মহত্যার এই সব নিদারুণ সংবাদ কি তাঁহার গোচর হইতেছে না? বস্ত্রাভাবের এই চরম সঙ্কট-জনক অবস্থার গুরুত্ব বাঙলার গভর্নমেণ্ট উপলব্ধি করিয়াছেন কিনা এবং ইহার সমাধানকল্পে তাঁহারা কি ব্যবস্থা অবলম্বন করিতেছেন, তাহা আমরা অবিলম্বে জানিতে চাই। কোন্ সভ্য দেশে ও সভ্য শাসনের অধীনে জনসাধারণ বৃক্ষপত্র পরিধান করে, অনন্যোপায় হইয়া আত্মহত্যা করে এই সঙ্গে আমরা সেই প্রশ্নও তাঁহাকে করিতেছি। সদ্যক্ষান্ত ইউরোপীয় যুদ্ধের ফলে ইউরোপের বহু শিল্প-কেন্দ্র বিধ্বস্ত ও স্বাভাবিক জীবনযাত্রা ব্যাহত হইলেও, তথাকার জনগণকে বস্ত্রা-ভাবে যে আত্মহত্যা করিতে হইয়াছে এমন সংবাদ এ পর্যন্ত পাওয়া যায় নাই। মিঃ আমেরী তাঁহার নির্বাচনী বক্তৃতায় বলিয়াছেন:—

'ভারত ও স্পারবুকের মধ্যে অত্যন্ত নিকট সম্বন্ধ। স্পারবুক ভারতের ব্যবসা ও শিল্পের উপর নির্ভর করে। যদি ভারত উন্নত কৃষি ব্যবস্থা ও ব্যাপক শিল্পের সাহায্যে জীবন যাপনের মান উন্নত করিয়া অত্যধিক জনাকীর্ণ দরিদ্র দেশ হইতে অধিক-তর সমৃদ্ধিশালী দেশে সমুন্নত হয় তাহা হইলে ভারতে বাণিজ্যের জন্য স্পার-বুককে পূর্বাপেক্ষা আরও অধিক কর্মতৎপরতা দেখা দিবে। আমার বিশ্বাস, ভারত সমৃদ্ধি-লাভ করিতেছে এবং তথায় উন্নত কৃষি-ব্যবস্থা ও শিল্প সম্পর্কে ভারত গভর্নমেণ্ট ও আমরা পরিকল্পনা প্রস্তুত করিতেছি।'

বস্ত্রাভাবে আত্মহত্যাই কি মিঃ আমেরীর ভারতে শিল্প-ব্যবস্থা ও জীবনযাত্রার মানের উন্নতি বিধানের পরিচয়? এই ভাবেই কি স্পারবুকের বাণিজ্যের জন্য ভারতে চাহিদা সৃষ্টি করা হইতেছে?

বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষায় উত্তীর্ণের হার

গত আই-এ ও আই এস-সি এই উভয় পরীক্ষায়ই উত্তীর্ণ ছাত্রছাত্রীগণের হার গত বৎসর অপেক্ষা শতকরা ১০ জন হিসাবে কম হইয়াছে। সদ্য প্রকাশিত ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষার ফল হইতেও দেখা যাইতেছে এ বৎসর উক্ত পরীক্ষায় উত্তীর্ণের হার প্রায় শতকরা ১৮ জনের মত কম হইয়াছে। গত বৎসর উত্তীর্ণের হার ছিল শতকরা ৬৩ জনের মত। এবার সেই স্থলে উত্তীর্ণের হার দাঁড়াইয়াছে শতকরা ৪৫·২ জনের মত। আকস্মিকভাবে ছাত্রছাত্রীদের যোগ্যতার এমন হ্রাস ঘটিবার কারণ কি? বিশ্ব-বিদ্যালয়ের পরীক্ষা-নীতি ও তাঁহাদের অনুমোদিত বিদ্যালয়সমূহে পাঠন-নীতির ত্রুটি এক্ষেত্রে কতখানি রহিয়াছে, আমরা সে সম্বন্ধে বিশ্ববিদ্যালয়কে অবহিত হইতে বলি।



মাছের বাজার (উড্‌কাট্‌) শিল্পী: শ্রীঅজিতকেশরী রায়

দেশের কথা

সিমলায় নেতৃ-সম্মেলন

সিমলায় বড়লাট কর্তৃক আহূত সম্মেলনের কাজ শেষ হয় নাই। সংক্ষেপে বলা যায়—প্রথম দিন সাধারণ আলোচনার পরে দ্বিতীয় দিনও তাহাতেই ব্যয়িত হয় এবং তাহার পরে দুই দিনের জন্য অধিবেশন স্থগিত থাকে; তৃতীয় অধিবেশনের পরে পক্ষকালের জন্য অধিবেশন বন্ধ রাখা হইয়াছে। এদিকে বড়লাট, লর্ড ওয়াভেল ভিন্ন ভিন্ন দল হইতে প্রস্তাবিত শাসন-পরিষদের জন্য মনোনীত সদস্যদিগের নামের তালিকা প্রদান করিতে বলিয়াছেন। প্রথমে সকল দলের একমত হইয়া তালিকা প্রদানের যে আশা হইয়াছিল, তাহা পূর্ণ হয় নাই এবং তাহার দায়িত্ব মুসলিম লীগের দলপতি মিঃ জিন্নার। তিনি ভারতের সংখ্যালঘিষ্ঠ মুসলমান সম্প্রদায়ের একাংশের—মাত্র একাংশের নেতা হইলেও চাহিয়াছেন—পরিকল্পিত শাসন-পরিষদে মুসলিম লীগ ব্যতীত আর কোন প্রতিষ্ঠান কোন মুসলমানকে মনোনীত করিতে পারিবেন না। অর্থাৎ তিনি যে কেবল কংগ্রেসকে মুসলমানদিগের কাহারও নাম দিতে অস্বীকৃত, তাহাই নহে—সিয়া, মোমিন প্রভৃতি যে সকল মুসলমান সম্প্রদায় লীগে যোগ দেন নাই, সে সকলের কোন যোগ্য ব্যক্তিকেও মুসলমানদিগের প্রতিনিধি বলিতে বা প্রতিনিধির কর্তব্য পালন করিতে দিতে তিনি সম্মত নহেন। লর্ড ওয়াভেল প্রথমে বলিয়াছিলেন—পরিকল্পিত শাসন-পরিষদে 'বর্ণহিন্দু' সদস্যের সংখ্যা মুসলমানের সংখ্যার সমান হইবে, তাহাতে হিন্দু মহাসভা প্রভৃতি প্রতিষ্ঠানের আপত্তি ছিল। কিন্তু সে আপত্তি যেমনই কেন হউক না—মিঃ জিন্নার প্রস্তাবে লর্ড ওয়াভেলও সম্মত হইতে পারেন নাই।

যাহাতে অচল অবস্থার অবসান ঘটে, সেজন্য কংগ্রেসের আগ্রহের পরিচয় পাওয়া গিয়াছে। এমন কি, রাষ্ট্রপতি মৌলানা আবুল কালাম আজাদ বলিয়াছেন—কংগ্রেস যদি রাজনীতিক কারণে বন্দীদিগের মুক্তি এবং নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটি ও সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের বৈধতা স্বীকার ব্যতীত সম্মেলনে যোগ দিতে অসম্মত হইতেন, তবে তাহা অসংগত বলা যাইত না। কিন্তু কংগ্রেস যে তাহাও না করিয়া—উদ্দেশ্য সম্বন্ধে ভ্রান্ত বিশ্বাস বিস্তৃতির সম্ভাবনা জানিয়াও সম্মেলনে যোগ দিয়াছেন, তাহাতেই অচল অবস্থার অবসান ঘটাইবার কার্যে কংগ্রেসের আগ্রহের পরিচয় সপ্রকাশ। কংগ্রেস যাহা করিয়াছেন, তাহার অতিরিক্ত আর কিছু করা কংগ্রেসের পক্ষে সম্ভব নহে।

মিঃ জিন্নার যে সে আগ্রহ নাই, তাহা তাঁহার দাবীতেই বুঝা গিয়াছে। তিনি হয়ত আশা করিয়াছিলেন, ভেদনীতির অনুরাগী বৃটিশ রজনীতিকরা তাঁহার দাবীর বিরোধিতা করিবেন না। কিন্তু তিনি সে আশায় নিরাশ হইয়াছেন বলিয়াই বোধ হয় নূতন প্রস্তাব করিয়াছেন—মহাত্মা গান্ধী এই সম্মেলনের কার্য ত্যাগ করিয়া পাকিস্থান সম্বন্ধে মুসলমানদিগের সহিত মীমাংসা করুন। 'গান্ধীজী যদি পাকিস্থানের প্রস্তাবে সম্মত হন, তবে এই সম্মেলনের আর কোন প্রয়োজনই থাকিবে না—তখন আমরা আমাদিগের বৃহত্তর সম্মেলনের ব্যবস্থা করিব। প্রথমে পাকিস্থানের প্রস্তাব সম্বন্ধে সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে হইবে।'

মিঃ জিন্নার এই সাম্প্রদায়িকতাদুষ্ট দাবীর জন্যই বড়লাট তাঁহার ইচ্ছানুযায়ী লোককে পরিকল্পিত শাসন-পরিষদের সদস্য মনোনীত করিবার সুযোগ লাভ করিলেন—লোকমত যদি জয়ী না হয়, তবে সেজন্য মিঃ জিন্নাকেই দায়ী করিতে হইবে। মিঃ জিন্নার এই মতিগতি ভারতের বাহিরেও বিশিষ্ট রাজনীতিকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছে। ঔপন্যাসিক জর্জ বার্নার্ড শ'র নিকট সিমলার সম্মেলন সম্পর্কে প্রশ্ন উত্থাপন করা হইলে তিনি বলেন—

কংগ্রেস নেতৃবৃন্দকে গ্রেপ্তার করা আমার মতে ঘোরতর অন্যায় কার্য হইয়াছিল; কিন্তু লর্ড ওয়াভেল সে বিষয়ের নিষ্পত্তি করিয়া ফেলিয়াছেন; এখন সব বিষয়ের মীমাংসার ভার তাঁহার উপর ছাড়িয়া দেওয়াই ভাল। মিঃ জিন্নাকে নিষ্পত্তির পথে আসিতে হইবে।

লর্ড স্ট্রাবলগী শ্রমিক দলের সদস্য ভারতের প্রতি সহানুভূতিসম্পন্ন বলিয়া তাঁহার খ্যাতি আছে। তিনি বলেন—

সিমলার আলোচনা নির্বিবাদে চলিতে পারে না; মিঃ জিন্নার মতিগতিই ইহার কারণ। মিঃ জিন্না নিজের প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠা করিতে চাহেন। দেশরক্ষা বিভাগ ছাড়া অন্যান্য সব বিভাগে ভারতীয়দের কর্তৃত্ব-সমন্বিত নিখিল ভারতীয় মন্ত্রিমণ্ডল গঠন করা হইবে, আমরা এইরূপ কথা দিয়াছি; এক্ষেত্রে উৎকৃষ্ট ব্যক্তিদিগকেই নির্বাচিত করিতে হইবে। মিঃ জিন্না যদি ভারতের সেবা না করিতে চাহেন, তবে তাঁহার পক্ষে সরিয়া দাঁড়ানোই ভাল।

মোশ্লেম জগৎ ও ভারত

মিঃ জিন্নার এই অযৌক্তিক মতিগতি জগতের সর্বত্র নিন্দিত হইবে এবং এতদ্দ্বারা লীগের প্রভাব প্রতিষ্ঠা যে বৃদ্ধি পাইবে এরূপ মনে করাও ভুল। সাম্প্রদায়িকতার পথ প্রগতির পথ নয়; জগতের সর্বত্র মুসলমান সমাজ আজ প্রগতির পথে অগ্রসর হইতেছে এবং স্বাধীনতার প্রাণপাতী সাধনাতে ব্রতী হইয়াছে। এ সম্বন্ধে ডাক্তার সৈয়দ হোসেনের বিবৃতি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। আমেরিকায় ভারতের রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতা কমিটির চেয়ারম্যান স্বরূপে তিনি সম্প্রতি একটি বিবৃতি প্রদান করিয়াছেন। এই বিবৃতিতে তিনি বলেন—

গত ৮ সপ্তাহকালে জগতের বিভিন্ন মুসলিম রাষ্ট্রের বিশিষ্ট নেতা এবং রাজনীতিকদের সঙ্গে আমার আলাপ ও আলোচনা করিবার সুযোগ হইয়াছে; আমি দেখিলাম, ইঁহারা সকলেই মনে করেন যে, ভারতের মুসলমান সমাজ ভারতের স্বাধীনতার জন্য তাঁহাদের সকল শক্তি প্রয়োগ করিতেছেন না। ভারতের স্বদেশপ্রেমিক অন্যান্য সম্প্রদায়ের সঙ্গে যোগ দিয়া ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের সাফল্যের জন্য মুসলিম সমাজের কর্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হওয়া তাঁহারা উচিত বলিয়া মনে করেন। আমি আশা করি, মিঃ জিন্না তাঁহার নেতৃত্বের যোগ্যতা জগৎকে প্রদর্শন করিবেন। জগতের দৃষ্টি সিমলার উপর, বিশেষভাবে ভারতের মুসলমান সম্প্রদায়ের দিকে আকৃষ্ট রহিয়াছে।

বলা বাহুল্য, জগতের মুসলমান সমাজের স্বার্থ ভারতের স্বাধীনতার উপর মুখ্যভাবেই নিহিত রহিয়াছে। ভারতবর্ষ বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের প্রধান ঘাঁটি। সাম্রাজ্যবাদ যদি এই ঘাঁটিতে জোর পায়, তবে এশিয়া এবং আফ্রিকাতেও তাহা শিকড় গাড়িতে চেষ্টা করিবে এবং বর্তমান স্তিমিত ভাব ছাড়িয়া অচিরে শোষণ নীতি দৃঢ় করিবার জন্য সর্বগ্রাসী হিংস্র মূর্তি ধারণ করিয়া উঠিবে। মিঃ ফ্রেনার ব্রকওয়ে বিলাতের শ্রমিক দলের মধ্যে একজন উদারচেতা ব্যক্তি। তিনি সম্প্রতি এ সম্বন্ধে লিখিয়াছেন—

স্বাধীন জাতিস্বরূপে জগতের রাষ্ট্রনীতিক ক্ষেত্রে ভারতের যোগদানের উপর জগতের ভবিষ্যৎ বিশেষভাবে নির্ভর করিতেছে; কারণ আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে ভারতের পররাষ্ট্র নীতি পশ্চিমে সামরিক শক্তির দিকে বেশী না তাকাইয়া সোভিয়েট রাশিয়া এবং মধ্য প্রাচীর শক্তিবর্গের সখ্যের উপরই অধিক জোর দিবে। এই প্রসঙ্গে আরব লীগের কথা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ভারত স্বাধীনতা লাভ করিলে একটি নূতন জাতিসংঘ গঠিত হইবে এবং বিশ্বের রাষ্ট্রনীতির উপর তাহা বিশেষভাবে প্রভাব বিস্তার করিবে।

বিশ্ব-স্বাধীনতার দায়িত্ব

শ্রীযুক্তা বিজয়লক্ষ্মী পণ্ডিত ভারতীয় রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতার এই আন্তর্জাতিক দিকের প্রতি সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ

করিয়াছেন। সিমলার 'অধিবেশন স্থগিত রাখা হইয়াছে, এই সংবাদে তিনি দুঃখ প্রকাশ করিয়া বলিয়াছেন—

বর্তমানের এই রাষ্ট্রীয় এবং আন্তর্জাতিক সমস্যার সন্ধিক্ষণে একটি বিষয় সব চেয়ে বেশী জরুরী, তাহা হইল এই যে, বিশ্বজাতি সমাজে ভারতের আজ রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতা লাভ করা প্রয়োজন এবং তদ্দ্বারা বিশ্ব-সমস্যার জটিলতার সমাধানে তাহার যত্নবান হওয়া উচিত। ভারতের উপর বর্তমানে একটি বিশেষ দায়িত্ব আসিয়া পড়িয়াছে; কারণ তাহার স্বাধীনতার উপর এশিয়ার অপরাপর বৈদেশিক প্রভাবাধীন রাষ্ট্রের পূর্ণ স্বাধীনতা নির্ভর করিতেছে। একথা বলিলে আর চলিবে না যে, প্রগতি-বিরোধী ব্যক্তিরা এবং ধর্মগোঁড়ার দল প্রতিবাদী হইতেছে, সুতরাং ভারতের স্বাধীনতা এখন সম্ভব নয়। আমি আশা করি, ভারতের হিন্দু এবং মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের নেতারা আন্তর্জাতিক সমস্যার এই গুরুত্ব উপলব্ধি করিবেন এবং অপরাপর তুচ্ছ বিষয় সাহসের সহিত উপেক্ষা করিয়া স্বাধীনতা লাভের পথে ভারতকে পরিচালিত করিবেন।

নিখিল ভারত মহিলা সম্মেলনের সভানেত্রীস্বরূপে শ্রীযুক্তা কমলা দেবী চট্টোপাধ্যায় ভারতের রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতার এই গুরুত্বের উপরই জোর দিয়াছেন। তিনি বলেন—

"যতদিন পর্যন্ত ভারতের স্বদেশপ্রেমিক বীর সন্তানগণ কারাগারে অবরুদ্ধ থাকিবেন এবং চোর-ডাকাতের মত পুলিশ তাহাদের পিছনে পিছনে ঘুরিতে থাকিবে, ততদিন পর্যন্ত কংগ্রেস কোন আপোষ- নিষ্পত্তিতে বদ্ধ হইতে পারে না। সর্বোপরি ভারতের স্বাধীনতা-সংগ্রামের ব্রত লইয়া কংগ্রেসের উদ্ভব হইয়াছে; সে প্রতিষ্ঠান কোনক্রমেই ব্রহ্মদেশ, ওলন্দাজ-অধিকৃত পূর্ব ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জ, সিঙ্গাপুর এইসব স্থানকে পরাধীন করিবার যুদ্ধে যোগ-দান করিতে পারে না। আমাদেরই সাহায্যে তাহাদিগকে আমাদের মত পরাধীনতার শৃঙ্খলে আবদ্ধ করা হইবে, কংগ্রেস নিশ্চয়ই ইহা কামনা করে না। পক্ষান্তরে আমাদের স্বাধীনতা আমাদের ন্যায় অন্যান্য পরাধীন জাতির স্বাধীনতা লাভে সহায়ক হইবে, আমরা ইহাই চাই।"

মিঃ জিন্নার জিদ

কিন্তু ভারতের স্বাধীনতা মিঃ জিন্নার কাছে বড় নয়। পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু সম্প্রতি মিঃ জিন্নার মনোভাব সমালোচনা করিয়া বলিয়াছেন, বড়লাটের শাসন পরিষদের মুসলমান সদস্য সকলে মুসলিম লীগের সদস্য হন, মিঃ জিন্না এই মতলব লইয়া চলিতেছেন। তিনি এ ক্ষেত্রে নিশ্চয়ই ভ্রমে পতিত হইয়াছেন। কিন্তু মিঃ জিন্না তাঁহার জিদ ছাড়িতে প্রস্তুত নহেন। সেদিন সিমলায় সাংবাদিকদিগকে একটি সম্মেলনে আহ্বান করিয়া তিনি বলিয়াছেন—

"সম্ভবত একথা কেহ অস্বীকার করিতে পারিবেন না যে, ভারতের মুসলমানদের মধ্যে শতকরা ৯৯ জনই লীগ মতাবলম্বী। ১৯৩৭ সালের প্রথম দিকে প্রায় ৭০টি উপনির্বাচন হইয়াছে, এগুলির মধ্যে একটি ক্ষেত্র ছাড়া আমরা অন্য কোথায়ও পরাজিত হই নাই। প্রাদেশিক আইনসভাসমূহ এবং কেন্দ্রীয় পরিষদে প্রায় ৬ শত জন সদস্য আছেন, ইঁহাদের মধ্যে ত্রিশজন মাত্র কংগ্রেসী মুসলমান; ইঁহারা প্রাদেশিক আইনসভারই সদস্য। কেন্দ্রীয় আইন সভায় কোন মুসলমান নির্বাচনকেন্দ্র হইতে একজনও কংগ্রেসী মুসলমান নির্বাচিত হন নাই। দুইজন মুসলমান আছেন, যাঁহারা নির্বাচনকেন্দ্র হইতে নির্বাচিত হইয়াছেন। সুতরাং মুসলমান সম্প্রদায়ের পক্ষ হইতে বড়লাটের কাছে নাম দিবার ক্ষমতা একমাত্র লীগেরই আছে। জগতের কোথায়ও কোন বিষয়ে সব লোকের মধ্যে মতের ঐক্য দেখিতে পাওয়া যায় না; ভারতে হয়ত মুষ্টিমেয় মুসলমান আছেন, যাঁহারা লীগের অন্তর্ভুক্ত নহেন, ইঁহাদের কেহ কেহ কংগ্রেসী হইতে পারেন; কিন্তু ইঁহারা সংখ্যায় কয়জন? কয়েকজন মাত্র।"

মিঃ জিন্না কয়েক বৎসর পূর্বেকার কথা তুলিয়াছেন, কিন্তু তিনি নিশ্চয়ই জানেন যে, লীগের পূর্ববৎ প্রভাব এখন আর নাই; তিনি সে সত্যটি চাপা দিবার চেষ্টা করিয়াছেন। এ সম্বন্ধে 'হিন্দুস্থান স্ট্যাণ্ডার্ড' পত্রের সিমলার সংবাদ-দাতার মন্তব্য বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তিনি বলেন,—

"মুসলিম লীগের প্রভাব-প্রতিপত্তির দ্রুত পরিবর্ধনশীলতার বিরুদ্ধে কেহ মিঃ জিন্নার সঙ্গে লড়াই করিতে চাহে না; কিন্তু উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ, পাঞ্জাবের বর্তমান অবস্থা কিরূপ? এই দুইটি প্রদেশের আইন-সভায় লীগ একদিন বিশেষ শক্তিশালী ছিল; কিন্তু আজ লীগের প্রভাব নগণ্য হইয়া পড়িয়াছে। যদি মিঃ জিন্নার যুক্তিই মানিয়া লইতে হয় এবং মুসলিম প্যানেলের সদস্যদের মনোনয়ন করিবার ক্ষমতা লীগের ছাড়া অন্য কাহারও না থাকে, তবে উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের কংগ্রেসী মুসলমানগণ এবং পাঞ্জাবের ইউনিয়নিস্টদের প্রতিনিধিত্বের ভার কে লইবে?"

কংগ্রেসী মুসলমানেরা জাতীয়তাবাদী, মিঃ জিন্নার কাছে ইহাই তাঁহাদের অপরাধ। ভারতের সকল সম্প্রদায়ই মিঃ জিন্নার মতে ঐ অপরাধে অপরাধী; সুতরাং মুসলিম লীগের সাম্প্রদায়িকতার পরিপোষকতা কেহ করিবে না, এই দুঃখে তিনি জর্জর। তিনি বলিয়াছেন,—

তপশীলী সম্প্রদায়ের প্রতি আমার সম্পূর্ণ সহানুভূতি রহিয়াছে; কিন্তু হিন্দু সমাজের সামাজিক উৎপীড়ন এবং অর্থনীতিক অত্যাচারের বিরুদ্ধেই তাঁহাদের প্রকৃত অভিযোগ; প্রকৃতপক্ষে রাষ্ট্রনীতিক আদর্শ এবং রাষ্ট্রনীতিক লক্ষ্য সম্বন্ধে অন্যান্য হিন্দুদের সঙ্গে ঐ সম্প্রদায়ের কোন পার্থক্য নাই; সুতরাং তপশীলী সম্প্রদায়ের কোন প্রতিনিধি বা প্রতিনিধিগণ আমাদের দিকে টানিবেন, ইহার বিশেষ কোন কারণ নাই; কাজেই কংগ্রেস অনেক প্রয়োজনীয় বিষয়ে ঐ সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিদের সমর্থন লাভ করিবেন বলিয়াই আমার বিশ্বাস। শিখদের সম্বন্ধে বলিতে গেলে ইহাই বলিতে হয় যে, তাঁহারা ইতিমধ্যেই ভারত-ব্যবচ্ছেদের বিরুদ্ধতা করিতে দণ্ডায়মান হইয়াছেন এবং কংগ্রেসের রাজনীতিক লক্ষ্য ও তাঁহাদের লক্ষ্য এক; সুতরাং তাঁহারাও যে বিশেষভাবে আমাদেরই পক্ষ সমর্থন করিবেন, এমন কোন কারণ নাই। শাসন-পরিষদে অপর দুইজন সদস্য বড়লাট এবং জঙ্গীলাট। তাহা সত্ত্বেও পরিষদের গঠন এমন হইবে যে, কংগ্রেসই সর্বতোভাবে প্রাধান্য লাভ করিবে।

সুতরাং মিঃ জিন্নার নিজের কথাতেই বলিতে হয় যে, তিনি এবং তাঁহার অনুগত মুসলিম লীগের সাম্প্রদায়িকতাবাদীরা ভারতের সকল সম্প্রদায় এবং সকল রাজ-নীতিক দলের বিরুদ্ধতা করিয়াই চলিবেন। তাঁহাদের এই আবদার মানিয়া লইতেই হইবে! কেন? বলা বাহুল্য, মিঃ জিন্না এখনও তাঁহার মুরুব্বি ব্রিটিশ সংরক্ষণশীল দলের দিকে তাকাইয়া আছেন। তিনি এই আশা করিতেছেন যে, সংরক্ষণশীল দল যদি নির্বাচনের সঙ্কট কাটাইয়া উঠিতে পারেন অর্থাৎ বিলাতের নির্বাচনে তাঁহারা জয়লাভ করেন, তবে ভারতে তাঁহাদের সাম্রাজ্যবাদমূলক স্বার্থ কায়েম রাখিবার প্রলোভনে তাঁহারা আবার দ্বিগুণ উৎসাহে মিঃ জিন্নার পৃষ্ঠ-পোষকতা করিতে হঠাৎ মোড় ঘুরিয়া দাঁড়াইবেন। সে ক্ষেত্রে লর্ড ওয়াভেল কংগ্রেসের সঙ্গে মীমাংসা করিলেও চার্চিল সাহেব সে মীমাংসা বাতিল করিয়া দিবেন। অবশ্য বৃটিশ সংরক্ষণশীল দলের মতিগতি সম্বন্ধে আমরা সম্পূর্ণরূপেই সন্দিহান এবং তাঁহারা নিতান্ত দায়ে না পড়িলে যে ভারতবাসীদের স্বাধীনতা স্বীকার করিয়া লইবেন, আমরা ইহা বিশ্বাস করি না এবং লর্ড ওয়াভেলের মারফতে আজ মিঃ চার্চিল ও আমেরীর দল যে প্রস্তাব উপস্থিত করিয়াছেন, নির্বাচনে বাজী জিতিবার জন্য তাহা একটা চাল বলিয়া মনে করাও আমাদের পক্ষে স্বাভাবিক। দেখিতেছি, ভারত সচিব মিঃ আমেরী সেদিন বার্মিংহামে তাঁহার নির্বাচকমণ্ডলীকে সম্বোধন করিয়া এই প্রস্তাবের কথা উত্থাপন করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন,—

"আমি আশা করি, এইসব প্রস্তাব ভারত-বাসীদের দ্বারা গৃহীত হইবে। এই পথে বর্তমানে একটি মাত্র বাধা রহিয়াছে, সে বাধা আমাদের সৃষ্ট নয়। আমি আশা করি, লর্ড ওয়াভেল স্বীয় বুদ্ধিমত্তাবলে সেই অন্তরায় অতিক্রম করিতে সমর্থ হইবেন। ভারতীয় নেতাদের নিজেদের মধ্যে মতভেদের ফলেই এই বাধা দেখা দিয়াছে। প্রত্যেক দল নবগঠিত শাসন-পরিষদে কতটি আসন অধিকার করিবেন, ইহাই মতভেদের কারণ। আমরা সকলেই এই আশা করি যে, এ সম্বন্ধে একটি সাফল্যমূলক সিদ্ধান্তে পেঁৗছা সম্ভব হইবে। ভারতবর্ষ কবে স্বাধীনতা লাভ করিবে এবং ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের মধ্যে সমানাধিকার প্রাপ্ত রাষ্ট্ররূপে পরিগণিত হইবে—সে কবে কানাডা এবং অস্ট্রেলিয়া অথবা গ্রেট ব্রিটেনের ন্যায় মর্যাদা পাইবে, আমি সেই দিনের আশায় আছি। বর্তমান এই নির্বাচন-প্রতিদ্বন্দ্বিতার মুখে প্রধান প্রশ্ন এই যে, মিঃ চার্চিল যে মহান্ ব্রতে ব্রতী হইয়াছেন আপনারা কি তাহা পূর্ণ করিতে তাঁহাকে সুযোগ দান করিবেন? আপনাদের কাছে আমার এই নিবেদন যে, ভারতের সম্বন্ধে আমি

যে কার্যভার গ্রহণ করিয়াছি, আপনারা আমাকে ফিরিয়া গিয়া তাহা সম্পন্ন করিতে দিন।"

ব্রিটিশ ভোটদাতার দল আমেরী সাহেবের এই ধরণের ধাপ্পাবাজীতে ভুলিবে, তৎশ্চর্য হইবার কিছু নাই; কারণ ভারতবাসীদের দুঃখ-দুর্দশা কত বেশী এবং চার্চিল-আমেরী দলের সদাশয়তার প্রভাবে ভারতের যাতনা-লাঞ্ছনা কিরূপ নিদারুণ হইয়া উঠিয়াছে তাহারা তাহা ধারণা করিতে পারিবে না। কারণ ইউরোপের এত বড় একটা যুদ্ধ ইংলণ্ডের একরকম বুকের উপর দিয়া গেলেও ভারতের তুলনায় তাহাদের গায়ে কুশের আঁচড়ও লাগে নাই। শ্রীযুক্তা ইলা সেন এখন বিলাতে আছেন। তিনি এডিনবরা শহর হইতে সম্প্রতি বেতারযোগে উভয় দেশের অবস্থার তুলনা করিয়া একটি বক্তৃতা প্রদান করিয়াছেন। তিনি বলেন,—

"গ্রেট ব্রিটেনে ধনীদের কোন জিনিসেরই কিছুমাত্র অভাব নাই এবং গরীবদের দুঃখ-কষ্টও বিশেষ ঘটে নাই; কারণ রেশনিংয়ের ফলে তাহাদের অন্ন বস্ত্রের কোন কষ্ট দেখা দিতে পারে নাই। লণ্ডন এবং এডিনবরা শহর যুদ্ধের ফলে নিরানন্দ হইয়া পড়িয়াছে, ইহা মনে করিলে ভুল হইবে। প্রকৃতপক্ষে সব লোকই পোষাক-পরিচ্ছদে সজ্জিত এবং দোকানগুলি মালপত্রে ভর্তি রহিয়াছে। বেপরোয়া ভাবে মালপত্র সংগ্রহের চেষ্টা দেখা যায় না। গ্রেট ব্রিটেনের শহরগুলির চেয়ে যুদ্ধক্ষেত্র হইতে অপেক্ষাকৃত দূরবর্তী কলিকাতা, বোম্বাই এবং দিল্লী শহরগুলি সর্বাধিক নিরানন্দ। যুদ্ধের ফলে গ্রেট ব্রিটেনের জনসাধারণ যে খুব কষ্টে পড়িয়াছে, তাহাদের চেহারা দেখিয়া তাহা মনে হয় না। প্রকৃতপক্ষে কণ্ট্রোল-ব্যবস্থা প্রবর্তিত থাকাতে মুদ্রাস্ফীতির সমস্যা দেখা দিতে পারে নাই, মোটামুটি বেশ একটা স্বাচ্ছন্দ্যের ভাবই সর্বত্র বিরাজমান। এইখানেই ভারত ও ব্রিটেনের মধ্যে বিপুল পার্থক্য রহিয়াছে। ভারতবাসীরা যুদ্ধ-জনিত সংকটে ক্লিষ্ট হইয়াছে, মনুষ্যসৃষ্ট দুর্ভিক্ষে তাহারা মরিয়াছে এবং মুদ্রাস্ফীতির জন্য তাহারা আর্থিক পীড়নে অভিভূত হইয়াছে। গ্রেট ব্রিটেনের লোকেরা বুঝিয়াছে যে, নিজেদের স্বার্থের জন্য তাহারা যুদ্ধ করিতেছে এবং তাহা তাহাদের পক্ষে কর্তব্য; কিন্তু ভারতবাসীদের মনে যুদ্ধে যোগদানে তেমন কোন আগ্রহ জাগে নাই। এই ব্যাপারের মধ্যে তাহাদিগকে যেন টানিয়া লইয়া যাওয়া হইয়াছে। গ্রেট ব্রিটেনে সংকট কাটাইবার জন্য সুচিন্তিত পরিকল্পনা লইয়া কাজ হইয়াছিল; কিন্তু ভারত গভর্নমেণ্ট গড়িমসি করিয়া চলিয়াছেন। তাহার ফলে মুষ্টিমেয় লোকের স্বাচ্ছন্দ্য ঘটিলেও লক্ষ লক্ষ নরনারী অনাহারে ছিল।"

ভারত-উদ্ধারের পরম ব্রতে প্রাণপাতকারী আমেরী সাহেব ভারতের এই অবস্থার জন্য সকল দায়িত্ব এড়াইতে চেষ্টা করিয়াছেন। বাঙলা দেশের দুর্ভিক্ষ সম্বন্ধে তিনি বলিয়াছেন যে, বাঙলার দুর্ভিক্ষ সম্বন্ধে তিনি যথাসময়ে খবর পান নাই। ১৯৪৩ সালের জানুয়ারী মাসে তিনি পার্লামেণ্টে সে সম্বন্ধে যে খবর দিয়াছিলেন, ভারত গভর্নমেণ্টই তাহা তাঁহাকে জানাইয়াছিলেন এবং বাঙলা সরকারের নিকট হইতেই তাঁহারা তাহা পাইয়াছিলেন। কিন্তু এক্ষেত্রে প্রশ্ন উঠিবে যে, দায়িত্ব কাহার? ভারত গভর্নমেণ্ট নিশ্চয়ই ভারতবাসীদের নিকট দায়িত্বসম্পন্ন নহেন। ভারতবাসীদিগকে সে অধিকার দেওয়া হয় নাই। ব্রিটিশ মন্ত্রিমণ্ডল সে বিষয়ে নিজেরাই ঘাঁটি আগলিয়া রহিয়াছেন, সুতরাং ভারত গভর্নমেণ্ট ভারত সচিবের নিকটই দায়িত্বসম্পন্ন; অর্থাৎ ভারতের ব্যাপারের জন্য ব্রিটিশ গভর্নমেণ্টই দায়ী। সুতরাং বাঙলার দুর্ভিক্ষের দায়িত্ব এড়াইতে মিঃ আমেরীর এই ধাপ্পাবাজী কোন মূর্খকেও প্রতারিত করিতে সমর্থ হইবে না এবং ইহা সত্য যে, ভারত গভর্নমেণ্ট যদি ভারতবাসীদের নিকট দায়িত্বসম্পন্ন হইতেন, তবে ভারতের এতটা আর্থিক সংকট দেখা দিত না এবং বাঙলার পথে-ঘাটে পড়িয়া সহস্র সহস্র নরনারী কুকুর বিড়ালের মত মারা যাইত না। ভারতবাসীরা এই দিক হইতে নিজেদের অবস্থা ভাল করিয়াই বুঝিয়া লইয়াছে। এখন নির্বাচনে জিতিয়া সাম্প্রদায়িক ভেদ নীতির চালে ব্রিটিশ সংরক্ষণশীল দল ভারতে নিজেদের শোষণ নীতি কায়েম করিতে গেলে ভারতবাসীরা তাহা স্বীকার করিয়া লইবে না এবং সে ক্ষেত্রে মিঃ জিন্নার চালবাজীও আর বেশী দিন চলিবে না; ইহার মধ্যেই সে অবস্থার অনিষ্টকারিতা দেশের লোকের নিকট উন্মুক্ত হইয়াছে।

একমাত্র প্রতিকার

মহাত্মা গান্ধী বলিয়াছেন—'যদি আমার ইচ্ছানুযায়ী কাজ হইত, তবে আমি জাতি-বর্ণ-ধর্মনির্বিশেষে যোগ্যতম ব্যক্তিদিগকেই সরকার-গঠনে গ্রাহ্য করিতাম।' যদি সরকারকে জাতীয় সরকাররূপে জাতির রাজনীতিক, অর্থনীতিক, সামাজিক—সর্ববিধ কার্য সম্পাদন করিতে হয়, তবে যে সেজন্য যোগ্যতম ব্যক্তিরই প্রয়োজন তাহাতে দ্বিমত থাকিতে পারে না। সাম্প্রদায়িকতায় জাতির কিরূপ অনিষ্টসাধন হইতে পারে, তাহার পরিচয় আমরা বাঙলা দেশে বহু ক্ষেত্রে পাইয়াছি। দুর্ভিক্ষ তদন্ত কমিশন বলিয়াছেন, বাঙলায় যখন লোকের খাদ্য-দ্রব্য সরবরাহের জন্য বহুবিলম্বে সরকারী দোকান প্রতিষ্ঠিত করা স্থির হয়, তখন সাম্প্রদায়িক নিয়মে কর্মচারী নিযুক্ত করার জন্য সে কাজে বিলম্ব হইয়াছিল—'সংকট-কালে সাম্প্রদায়িক হিসাবে লোক নিয়োগের জন্য কালবিলম্ব কখনই সমর্থিত হইতে পারে না।' সম্প্রতি বাঙলার শাসন-ব্যবস্থা সম্বন্ধে যে অনুসন্ধান কমিটি নিযুক্ত হইয়াছিল, তাহার রিপোর্টে স্বীকৃত হইয়াছে—'সরকারের চাকুরিয়াদিগের মধ্যে অনাচার এত ব্যাপক হইয়াছে এবং তাহার উচ্ছেদসাধন সম্বন্ধে যেরূপ নিরাশ ভাব লক্ষিত হইতেছে, তাহাতে এ সম্বন্ধে বিশেষ ব্যবস্থা অবলম্বন করা প্রয়োজন।' এই দুরবস্থার সহিত সাম্প্রদায়িকতার অনুমোদিত ব্যবস্থায় যোগ্যতম ব্যক্তির স্থানে অযোগ্য বা অপেক্ষাকৃত যোগ্য ব্যক্তির নিয়োগের সম্বন্ধ যে ঘনিষ্ঠ, তাহাতে সন্দেহের অবকাশ থাকিতে পারে না।'

সুতরাং কংগ্রেস সাম্প্রদায়িকতাকে কিছুতেই প্রশ্রয় দিবে না। কংগ্রেস নেতৃবৃন্দ বাঙলার দুর্ভিক্ষের কথা ভুলেন নাই। সর্দার বল্লভভাই প্যাটেল সে ব্যথা মর্মস্পর্শী ভাষায় ব্যক্ত করিয়াছেন। তিনি বলেন,—

"কংগ্রেস আজ যেরূপ মতিগতিই অবলম্বন করুক না কেন, আগস্ট মাসের 'ভারত ত্যাগ কর' এই প্রস্তাব সে বিস্মৃত হইবে না। ঐ প্রস্তাবের একটি কথাও পরিবর্তন করা হইবে না; প্রকৃতপক্ষে অতঃপর 'এশিয়া ত্যাগ কর' এমন দাবীই আসিতে পারে। ভারত ত্যাগের দাবী আমরা ভুলিব না; কিংবা যাহারা বিগত তিন বৎসর বীরত্বের সহিত দেশের সেবা করিয়াছে, তাহাদের প্রতি আমরা বিশ্বাস-ঘাতকতা করিব না। এই তিন বৎসরে অনেক ঘটনা ঘটিয়া গিয়াছে; কিন্তু বাঙলার দুর্ভিক্ষ এবং তজ্জনিত লক্ষ লক্ষ নরনারীর মৃত্যু জাতির চিরন্তন কলঙ্কস্বরূপ। অনাহারে লোকে মারা গিয়াছে, কিন্তু ভূতপূর্ব বড়লাট লর্ড লিনলিথগো যিনি নিজেকে মহাত্মা গান্ধীর অন্তরঙ্গ বন্ধু বলিয়া দাবী করেন, তিনি সেজন্য সহানুভূতিসূচক একটি কথাও বলেন নাই, অথবা বাঙলা দেশে একবার পদার্পণ করাও প্রয়োজন বোধ করেন নাই।"

ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের ঝুঁকি বাঙলার উপরই সব চেয়ে বেশী করিয়া আসিয়া পড়ে। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদীরা বাঙলার জাগ্রত জাতীয়তাবাদের শক্তি চূর্ণ করিতে তাহার সমগ্র শক্তি বরাবরই নানারূপে কূটনীতিতে প্রয়োগ করিয়া আসিয়াছে। বাঙালী সেজন্য ভীত নহে, সে অনেক সহ্য করিয়াছে এবং প্রয়োজন হয় আরও সহ্য করিবে; কিন্তু কাঞ্চন মূল্যে কাচ কুড়াইয়া লইতে সে প্রস্তুত নয়। বাঙলার ব্যথা আজ সমগ্র ভারতের অন্তরকে উদ্বেলিত করিয়া তুলুক। সাম্প্রদায়িকতার ফাঁদে আমরা আর পড়িতে রাজী নহি। মিঃ জিন্না এবং তাঁহার অনুগত দল যদি ইহাতে অভিমানভরে বাঁকিয়া বসেন, উপায় নাই। তাঁহারা তাঁহাদের পথ দেখুন।

বুদ্বুদ

অনিলকুমার ভট্টাচার্য

ভবতোষ শুনেছিল সেকথা—একশো টাকার কেরানি শেয়ার মার্কেটে কেমন করে স্পেকুলেশনের কাজ করে এককালে লাখ টাকা জমিয়েছিল। একশো টাকা সেদিন মাণিকজীর কাছে ছিল হাতের ময়লা। এতবড় যুদ্ধে আজ যদি তার সে বয়েস আর কর্মশক্তি থাকতো, শুধু শেয়ার বাজারে ঘুরেই এমন ঢের ঢের একশো টাকা সে রোজগার করতো এক একটি দিনে। তিরিশটি দিন ধরে এমনিভাবে তাকে পরিশ্রম করতে যেত না। সবই নসিবের ব্যাপার—তা না হলে আর বুড়ো বয়সে এমনি ঘানি টেনে মরতে হয়।

ভবতোষ জিজ্ঞেস করে কিসে অত টাকা নষ্ট করলে মাণিকজী? মাণিকজী দীর্ঘশ্বাস ফেলে নিজের কপালটিকে দেখিয়ে দিয়ে বলে—সে কথায় আর কাজ কি ভটচারিয়া?

ভবতোষ বিস্ময় বিস্ফারিত নেত্রে প্রশ্ন করে—এক লাখ টাকা তুমি উড়িয়ে দিলে মাণিকজী?

মাণিকজী হেসে উত্তর দেয়—না, এক লাখ টাকার ভেতর হাজার ত্রিশেক টাকার সংস্থান হয়েছে—আর এই চাকরী করতে করতেই হাজার দশেক টাকা কামিয়েছি।

কিসে?

শেয়ার বেচাকেনায় আর রেসের মাঠে। চল্লিশ হাজার টাকার সুদ পাই ব্যাঙ্ক থেকে আর একশো টাকার এই চাকরী—দিন আমার এক রকম কেটে যায়।

রেসের ঘোড়া আর ষ্টক এক্সচেঞ্জের বাইরে যে পৃথিবী—সে পৃথিবীর খবর পার্শির বাচ্চা জানে না, তবুও মাণিকজী জীবনকে যেমনভাবে উপভোগ করেছে, তার সহকর্মী কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফিলজফির গ্রাজুয়েট ভবতোষ ভট্চায তার আস্বাদ পায় নি—জীবনে কোন দিন পাবে, এমন কোন সম্ভাবনাই নেই।

মাণিকজীর ব্যাঙ্ক ব্যালেন্স চল্লিশ হাজার টাকা। দেশী ব্যাঙ্কে চাকরী করে মাইনে পায় সে একশো টাকা—যে একশো টাকা এই বুড়ো বয়সেও এক রাত্তিরে উড়িয়ে দিতে আজও সে কার্পণ্য করে না। আর বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শনশাস্ত্রের গ্রাজুয়েট ভবতোষ ভটচায আশি টাকার কেরানি হয়ে জীবনে চল্লিশটি পয়সাও যে কোনদিন অপব্যয় করেছে কিংবা বিলাসিতায় উড়িয়ে দিয়েছে এমন কোন ইতিহাসের সন্ধান পাওয়া যায় না।

মাণিকজী বলেন—তোমাদের বাঙালী আদমি শুধু লেখাপড়াই করতে জানে আর



বিনীত ভাষায় সাহেবের কটূক্তিতে সে প্রতিবাদ করেছে—

কিছু জানে না। বোম্বাই শহরে এমন কোন পার্শি নেই যারা অনাহারে আত্মহত্যা করেছে। আর তোমাদের দেশে দেখ আচ্ছা আচ্ছা বাবুরা সংসার চালাতে পারে না—আত্মহত্যা করে, বিষ খায়। জেনানারা শুনেছি, মনের দুঃখে আগুনে পুড়ে মরে তাদের গরীব বাপমায়ের অক্ষমতার জন্যে।

ভবতোষ এ কথার প্রত্যুত্তরে হয়ত কোন দর্শননীতি আওড়াতে যাচ্ছিল—কিন্তু ছোট সাহেবের ঘর থেকে ডাক আসতেই তার পেটের পিলে চমকে গেল।

মাণিকজী হেসে বললে—দেখগে, ফিগারে কোথায় কি ভুল বেরিয়েছে, তাইতেই তলব পড়েছে তোমার। এত পাশ করেছো, তবুও তোমার যোগে ভুল হয় ভবতোষ? যোগে ভুল আমরা কখনো করিনে কিন্তু।

ছোট সাহেবের ঘর থেকে ভবতোষ যখন বার হয়ে এলো, উত্তেজনার আধিক্যে তখন তার সর্বশরীর কাঁপছে। অপমানের বিষ জ্বালায় দেহমন তার জর্জরিত হয়ে উঠেছে।

ভুল ভবতোষের অবিশ্যি হয়েছে তাতে কোন সন্দেহ নেই। দিনের মধ্যে শুধু আট ঘণ্টা ধরে যাকে শুধু সংখ্যার সমুদ্রে পাড়ি দিতে হয়, তার পক্ষে ভুলচুক হওয়া স্বাভাবিক। আর এ ভুলের জন্যে ত্রুটি স্বীকারেও তার দীনতা নেই; কিন্তু ভুলের শাস্তি শুধু আশি টাকার কেরানিকেই পেতে হবে এ যুক্তি ভবতোষের শিক্ষিত অন্তর নির্বিবাদে মেনে নিতে পারে না। তাই বিনীত ভাষায় সাহেবের কটূক্তিতে সে প্রতিবাদ করেছে—

Pardon me Sir, You are also liable for this mistake you have finally checked the statement!

বারুদের স্তূপে যেন আগুন জ্বালিয়ে দেওয়া হল—

Don't be Silly young fool! Just give me the explanation in black and white. You are a graduate of the Calcutta University I see! You should have the sense of proportion!

ভবতোষ মাথা হেঁট করে বেরিয়ে আসে। চূড়ান্ত অপমানের জ্বালায় সে ছটফট করতে থাকে। মাসের শেষে আশিটি টাকার বিনিময়ে দাসত্বকে সে অমনভাবে কিছুতেই মেনে নেবে না।

কাগজকলম টেনে নিয়ে ভবতোষ ছাড়পত্র লিখতে বসে গেল। ফিগার ওয়ার্কে সে কাঁচা হলেও ভাষা তার জোরালো—তীক্ষ্ন এবং সতেজ। এককালে সে সাংবাদিকগিরি কোরেছে—ভাষাশিল্প তার করায়ত্ত।

দর্শনের গ্রাজুয়েট ভবতোষ লিখলে তার ভুলের কৈফিয়ৎ—এ কৈফিয়ৎ ছোট সাহেব বড় সাহেবের দরবারে পাঠাবে। সেখানে তার বিচার হবে—যোগ্য শাস্তি প্রয়োগ করা হবে তারপর। ভবতোষ একথাও আজ লিখে দেবে—এমন মারাত্মক ভুলের পর আর সে এখানে কাজ করতে অসমর্থ।

মাণিকজী এসে পিঠ চাপড়ে তার কাগজটা টেনে নেয়—কি করছো ভটচারিয়া? চাকরি করতে গেলে এমন ভুল মানুষের হয়, এমন দু-চারটে কথাও ওপরওয়ালাদের কাছে শুনতে হয়। যাও পাগলামি করো না! লেখ—I regret for the mistake!

ভবতোষ আগুনের ফুলকির মতন জ্বলে ওঠে—নেভার! জীবনে অনেক অপমান সয়েছি—অনেক উঞ্ছবৃত্তি করেছি। এতবড় অপমানকে মেনে নিতে আমার

পৌরুষে বাধে। জান মাণিকজী—এমন স্পিরিট আমার একদিন ছিল, যেদিন খাস বিলিতি সাহেব ঠেঙিয়ে ফাইন দিয়েছি, আর আজ দিশি সাহেবের এত বড় ঔদ্ধত্যকে মেনে নিতে হবে?

বৃদ্ধ মাণিকজী কেরানি হলেও শেয়ার মার্কেটের লোক। মানুষ চিনতে তার দৃষ্টি ভুল করে না। মৃদু হেসে সে বললে—ভবতোষ, এখন তুমি ভয়ানক এক্সাইটেড—জো কুছ করনা পিছু করো—আভি নেহি!

তবুও ভবতোষের কলম চললো খস্‌খস্‌ করে—I hereby tender my resignation.

কিন্তু তাতেই কি ছাই নিস্তার আছে? লোন এবং ওভার ড্রাফটের ফিগার এসে পড়লো সঙ্গে সঙ্গে। হেড অফিস থেকে টেলিগ্রাম এসেছে—এক্সপ্রেস ডেলিভারিতে স্টেটমেণ্ট পাঠাতে হবে।

বড়বাবু ডেকে বললেন—ভবতোষ, একটু হাত চালিয়ে স্টেটমেণ্টটা তৈরী করে দাও—আর ফিগারে এবার যেন ভুল না থাকে। ছোট সাহেবের কাছে পাঠাবার আগে আমাকে দেখিয়ে নিও—চেক করে দেবো। গতবারে ভুলের জন্যে বড়সাহেব শুদ্ধ চটে গেছে তোমার পর।

ভবতোষের বিদ্রোহ আর প্রকাশের পথ পায় না। সংখ্যার সমুদ্রে তার বিদ্রোহী মন আবার নিমজ্জিত হয়ে যায়। হাজার হাজার, লক্ষ লক্ষ, কোটি কোটি টাকার অঙ্ক—এর থেকে সুদ কষে যে লভ্যাংশ পাওয়া যায়, তার কতটুকু প্রাপ্য ভবতোষের? মাসের শেষে আশিটি টাকা—দিন আট ঘণ্টার কঠিন পরিশ্রমের পারিশ্রমিক; বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শনশাস্ত্রের গ্রাজুয়েটের শিক্ষিত জীবনের মূল্য!

—রাম রাম বড়বাবু!

ভবতোষ চোখ তুলে তাকালে। বেঁটে মোটা মসীবর্ণ কদাকার লোকটি—মলিন বেশভূষার মাঝে অপরিচ্ছন্ন দাঁতগুলি বার করে বললে—বাজার কা আজ কিয়া ভাও? বরাকর কা ডিভিডেণ্ড নিকালা?

ঘনশ্যাম ঝুনঝুনওয়ালা—তাকে দেখেই বড়বাবু গদগদ হয়ে উঠলেন। আপ্যায়িতের আধিক্যে কণ্ঠ তাঁর পরিপ্লুত হয়ে উঠলো—আইয়ে ঘনশ্যামবাবু, বহুৎ মেহেরবান—বহুৎ মেহেরবান!

ভবতোষ বুঝলে—বড়বাবুর মুখ্য শ্যালকটির একটা কিছু গতিবিধির জন্যেই এ আপ্যায়ন।

ঘনশ্যাম ঝুনঝুনওয়ালা কোটিপতি। জুটের কারবারে আর ফাটকার বাজারে তাঁর সমকক্ষ খুব কমই আছে। পঞ্চাশটি টাকায় একটা চাকরি দেওয়া তাঁর হাতের ময়লা।

পার্শী মাণিকজী তাল বুঝে উঠে গেল—শনিবারের টিপ্‌টি যদি কোন রকমে বাগানো যায়।

একশো টাকার কেরানি পার্শী মাণিকজীর চল্লিশ হাজার টাকা ব্যাঙ্ক ব্যালেন্স। লেখাপড়া শেখেনি বলে সে তার সহজাত বণিক-বুদ্ধিকে খাটো করে নি—শিক্ষিত বাঙালী কেরানির মতন। চাকরি করেও সে ব্যবসা করে—শেয়ার মার্কেটের খবর রাখে—রেসের মাঠে সর্বস্ব না খুইয়ে বরঞ্চ ব্যাঙ্ক-ব্যালেন্স বাড়ায়। কেমন করে? ভবতোষের দার্শনিক মগজে তা ঢোকে না।

আর বড়বাবু? পঁচিশ বছর কেরানি-গিরি করে, উঞ্ছবৃত্তিতে পাকা ওস্তাদ। অফিসে ঢুকে শ্রীদুর্গার নাম স্মরণ করে পঁচিশটি বছর কাটিয়ে গেল তাদের মতন দর্শনশাস্ত্রের গ্রাজুয়েটদের



"ভবতোষ তুমি এখন ভয়ানক এক্সাইটেড্। জো কুছ্ করনা, পিছু করো, আভি নেহি—"

উপর মাতব্বরি করে। সেকালের এণ্ট্রেন্স পাশ করতে না পারার বাহাদুরি একালের গ্রাজুয়েটদের চেয়ে অনেক বেশি—সে সত্য বড়বাবু নিজের জীবন দিয়েই প্রমাণ করেন। আশি টাকা বেতনের ভবতোষ গ্রাজুয়েট হলেও একত্রিশ বছর বয়সে আজ অবধি অবিবাহিত। বিধবা মা, অবিবাহিতা বোন আর ছোট ভাইকে নিয়ে যে তার সংসার—তা চালাতেই এ বাজারে হিমসিম খেয়ে যেতে হয়। ব্যাঙ্কের এই অমানুষিক পরিশ্রমের পর আরও তাকে খাটতে হয়—প্রাইভেট টিউশানি করে আয় বাড়াতে গিয়ে পরমায়ু ক্ষয় করতে হয়। তাতেও সংসার তার অচল। এর পর বৃদ্ধা মার আবার সাধ—ছেলের বিয়ে দিয়ে নাতির মুখ দেখবেন।

ভবতোষের দিকে বড়বাবুর নজর আছে। পাল্টি ঘর—ভবতোষ ছেলেটিও ভালো, আর লেখাপড়া শিখেছে বেশ। কাজে অবিশ্যি তার ভুল হয়—যোগে ভারি কাঁচা। বয়েস হলে তা শুধরে যাবে নিশ্চয়ই।

ভবতোষের যুক্তি শুনে বড়বাবু হেসে অস্থির হন—আজকালকার ছোক্‌রারা বলে কি? বলে কিনা, আশি টাকার কেরানি বিয়ে করবে কোন্‌ সামর্থ্যে? আরে পঁচিশ টাকার জুনিয়ার ক্লার্ক যখন, তখন বয়েসটা আর কতই-বা হবে? বড় জোর উনিশ-কুড়ি। সেই যে নোলক নাকে মেয়েটির সঙ্গে বিয়ে হল তার বরাতেই আজ না দুশো টাকার বড়বাবু।

কিন্তু ভবতোষ ওসব কথা এখন আর ভাবতে পারে না। মাথার শিরাগুলি তাঁর টনটন করে ওঠে। পঞ্চাশখানি সিটের যোগ এখনও তার বাকী। ভবতোষের পেন্সিল সড় সড় করে নেমে আসে—টিকের পর টিকের চিহ্নে চিহ্নিত করে যন্ত্রগতিতে সে কাজ করে চলে।

ছোট সাহেবের ঘর থেকে আবার ডাক পড়েছে ভবতোষের। স্টেটমেণ্ট এখনও শেষ হোল না কেন? সাহেবকে যেতে হবে আজ তাড়াতাড়ি—কোথায় আর এস ভি পি'র নিমন্ত্রণ আছে। আর ভুলের কৈফিয়ৎই-বা এখনও দেওয়া হোল না কেন?

মাণিকজী আর বড়বাবু দুজনেই এগিয়ে আসেন। নির্বোধ ভবতোষ নির্বুদ্ধিতার দরুণ এখনই বুঝি বা কোন গর্হিত কাজ করে বসে। আশি টাকার চাকরি একটা যা-তা ব্যাপার নয়। বিশেষ করে ভবতোষের মতন ছেলের কাছে—চাকরি ছাড়া যার গত্যন্তর নেই।

ভবতোষের মেজাজ কিন্তু তখনও বেশ উত্তপ্ত। দেহের প্রতিটি শিরা-উপশিরা আবার তার বিদ্রোহের উত্তেজনায় উত্তেজিত হয়ে ওঠে। চাকরি ছাড়া জীবন অচল? দর্শনশাস্ত্রের গ্রাজুয়েট সে—না হয় চল্লিশ টাকার স্কুল মাস্টারি করবে আর তার সঙ্গে আরও অনেকগুলি ছাত্র পড়াবে। তা না জোটে তো সে যুদ্ধের চাকরি নেবে। রণ-ক্ষেত্রের মৃত্যু কী এই মনের হীন অপমৃত্যুর চেয়েও ভয়ংকর? কিংবা সে ব্যবসা করবে—মাণিকজীর পরামর্শ নিয়ে শেয়ার বাজারে ঘোরাঘুরি করলে দিনের অন্ন সংগ্রহ করা কি এতই দুরূহ? কিংবা সে রিক্সা টানবে—যুদ্ধের বাজারে সে দেখেছে রিক্সাওয়ালাদের রোজগার আজকাল অনেক বেশি। ছোট সাহেবের রক্তচক্ষুর কাছে কিছুতেই সে মাথা নত করবে না।

বড়বাবু তখন নিজেই ছোট সাহেবের ঘরে ঢোকেন—অফিসের প্রবল প্রতাপশালী বড়বাবু হলেও তিনি বাঙলা দেশের কালো মেয়ের বাপ।

ছোট সাহেবের কাছে গিয়ে হাত কচলাতে কচলাতে তিনি নিজেই ভবতোষের হয়ে ক্ষমা প্রার্থনা করেন—Pardon him Sir—a Silly young fool! স্টেটমেণ্ট আমি নিজেই পাঠিয়ে দিচ্ছি—ওকে দিয়ে আজ অনেকগুলো করেসপণ্ডেন্সের কাজ করিয়েছি—ছোক্‌রা ফিগারে কাঁচা হলেও ইংরেজি লেখে ভালো।

মাণিকজী বলে—ভবতোষ, বিগরাও মাৎ। বড়বাবুর লেড়কিকে সাদি করে ফেল—কোন ঝঞ্ঝাট থাকবে না। বাঙ্গালী আদমি তোম—বাহার দুনিয়াকো তাপ বহুৎ—নোকরি ছেড়ে



তুমি আমার জামাই হলে—আমার জায়গায় তো তোমার লেজিটিমেট্ ক্লেম হে—

করবে কি শুনি? বুড়ো মা ভাইবোন—এরা সব তোমার ভরসাতেই আছে।

ভবতোষ এতক্ষণে আত্মস্থ হয়। বেকার জীবনের বীভৎসতার অভিজ্ঞতা তার অন্তর হতে আজও মিলিয়ে যায় নি। চাকরির ধান্ধায়, উমেদারির উঞ্ছবৃত্তিকে আজও সে বেশ স্পষ্ট ভাবেই স্মরণ করতে পারে। ক্ষুধার্ত উদরে দুশ্চিন্তার বোঝা মাথায় নিয়ে নগরীর রাজপথে পাকা দুটি বছর যেমন করে সে ঘোরেছে—আত্মীয়স্বজনের হিতোপদেশ শুনেছে—লাঞ্ছনা সহ্য করেছে, তার চেয়েও কী মারাত্মক এবং অপমানকর ছোট সাহেবের ভর্ৎসনা? হাজার হাজার, লক্ষ লক্ষ, কোটি কোটি টাকার সুদ কষে আর যোগ টেনে মাসের শেষে আশিটি রজত মুদ্রা—আর তার সঙ্গে ওপরওয়ালার রক্তচক্ষুর শাসন—এই জীবনই তো সে কায়মনোবাক্যে প্রার্থনা করেছিল। দর্শনের গ্রাজুয়েট চল্লিশ টাকার পাকা চাকরি পেয়ে ঘটা করে সত্যনারায়ণের সিন্নি দিয়েছিল। আজ তার সে সৌভাগ্যকে পদাঘাত করবে কিসের অহঙ্কারে?

অফিস থেকে বাড়ি ফিরলেই মা এসে দাঁড়াবেন—সংসারের শত অভিযোগের ফিরিস্তি নিয়ে। ছোট বোনের বিশীর্ণ অপমানাহতা মুখখানিও ভেসে ওঠে ভবতোষের চোখের সামনে। বিবাহ-প্রস্তাবে তিরিশ টাকার একটা অশিক্ষিত কেরানিও যাকে সদম্ভে উপেক্ষা করে যায়! আর ছোট ভাইটির নগ্ন দারিদ্র্য—এই অল্প বয়েসেই জীবনের সঙ্গে তাকে কী ভীষণ সংগ্রাম করে চলতে হচ্ছে। রাত জেগে পরীক্ষার পড়া পড়ে দু-তিনটে টিউশানি করে তাকে পড়ার খরচ চালাতে হয়—একজামিনের ফিস্ দিতে হয়—সংসারকেও কিছু-না কিছু সাহায্য করতে হয়। ভবতোষ সেখানে বিদ্রোহ প্রকাশ করবে—আত্মসম্মান বজায় রাখবে কিসের অহঙ্কারে—কোন্ মর্যাদায়? ফিলজফির গ্রাজুয়েট আশি টাকার কেরানি ভবতোষ ভটচার্যের আত্মসম্মানের দাম এ পৃথিবীতে কতটুকু?

ভবতোষের বিদ্রোহী শিরাতন্ত্রীগুলি ক্রমশই অবসাদে শিথিল হয়ে আসে—উত্তপ্ত ধমনীর রক্তস্রোতে হিম-শীতলতার নিস্তেজতা। বিদ্রোহী ভবতোষ নিস্তরঙ্গ নিস্পন্দতায় আবার তার নিজের সত্তার মাঝে ফিরে আসে।

বড়বাবু এসে তার পাশে দাঁড়ালেন—নাও, ছেলেমানুষী আর কক্ষণো করো না। সাহেবকে অনেক করে বুঝিয়ে সুঝিয়ে ঠান্ডা করেছি। চট করে একটা এক্সপ্লানেশন লিখে দাও দিকিন। লেখ—I regret for the mistake.

শান্ত ভবতোষ অবনত মস্তকে জবাবদিহি প্রকাশ করে—I regret for the mistake.

অফিস থেকে বার হবার পথে বড়বাবু চুপি চুপি ভবতোষকে ডেকে বললেন—দেখ ভবতোষ—হাতের লক্ষ্মী পায়ে ঠেল না। মেয়ে আমার বলে বলছি নে—এমন লক্ষ্মী মেয়ে তুমি সংসারে খুব কমই দেখবে। গরীবের ছেলে চাকরি-বাকরি করেই যখন খেতে হবে, তখন সব দিকই তো ভেবে-চিন্তে দেখা উচিত। আমার জামাই হলে অফিসে তোমার গায়ে আঁচড়টি লাগতে দেব না। আর আমারও তো বয়েস হচ্ছে হে—কতদিনই বা আর বড়বাবুগিরি করবো। তুমি আমার জামাই হলে—আমার জায়গায় তো তোমার লেজিটিমেট ক্লেম হে—

বড়বাবুর ছোট ছোট চোখ দুটিতে বিজয়ীর জয়চিহ্ন ফুটে উঠেছে। ভবতোষের পিঠে হাত দিয়ে তিনি বললেন—তোমার মাকে নিয়ে রবিবার দিন আমার বাড়ি এসো—আমি গাড়ি পাঠিয়ে দেবো।

কৃতজ্ঞ ভবতোষ শান্তভাবে ঘাড় নেড়ে সম্মতি জানালে।

বিজ্ঞানের কথা

জীবন্ত টেস্ট-টিউব

শ্রীঅমরজ্যোতি সেন

টেস্ট টিউবের বাঙলা করা হয়েছে পরীক্ষা-নল। কথা প্রসঙ্গে যদি আমরা পরীক্ষা নল অথবা টেস্ট টিউব কথাটি উচ্চারণ করি, তাহলে আমাদের চোখের সামনে ভেসে ওঠে ল্যাবরেটরীর দৃশ্য। সেখানে কোন রাসায়নিক একটা হলদে মতো কি একটা তরল পদার্থের খানিকটা টেস্ট টিউবে ঢাললেন, তারপর তাতে কি একটা শাদা তরল পদার্থের দু' ফোঁটা ফেললেন, তারপর টেস্ট টিউবটাকে দু' চারবার নেড়ে নিয়ে বুনসেন দীপে একটু তাপ দিলেন আর অমনি টেস্ট টিউবের সেই হলদে পদার্থের রং বদলে লাল হয়ে গেল। ঠিক যেন ম্যাজিক! কিন্তু ম্যাজিক দেখানো তাঁর উদ্দেশ্য নয়, তাঁর উদ্দেশ্য ঐ হলদে পদার্থটির গুণাগুণ পরীক্ষা করা এবং এই পরীক্ষা করবার জন্যই টেস্ট টিউবের সাহায্য নেওয়া হয়। তাহলে দেখা যাচ্ছে যে, 'পরীক্ষা-নল' বাঙলা পরিভাষা ঠিক হয়েছে।

আমরা প্রায় সকলেই টেস্ট টিউব দেখেছি এবং এও জানি যে ল্যাবরেটরীতে টেস্ট টিউব বোধহয় সবচেয়ে বেশী ব্যবহৃত হয়।

এ টেস্ট টিউব ত' হ'ল কাঁচের, এর প্রাণ নেই, কিন্তু বৈজ্ঞানিকেরা তাঁদের ল্যাবরেটরীতে জীবন্ত টেস্ট টিউব নিয়ে পরীক্ষা করেন।

জীবন্ত টেস্ট টিউবের সবচেয়ে বড় উদাহরণ হ'ল গিনিপিগ ও ইঁদুর। এ ছাড়া খরগোস, মুরগী, কুকুর, নানাপ্রকার পাখী, পোকামাকড় এমন কি মানুষকে পর্যন্ত বৈজ্ঞানিক জীবন্ত টেস্ট টিউবের পর্যায়ভুক্ত করে' নানাপ্রকার পরীক্ষা চালান।

এই সমস্ত জীবের উপর নানাপ্রকার ঔষধের গুণাগুণ অথবা প্রতিক্রিয়া সাধারণত পরীক্ষা করা হয়। মনে করুন একজন বৈজ্ঞানিক যক্ষ্মা রোগের একটি ওষুধ আবিষ্কার করলেন; এখন এই ওষুধ কি করে' পরীক্ষা করবেন? তিনি কতকগুলি ইঁদুর নিলেন, তাদের শরীরে যক্ষ্মা রোগ প্রয়োগ করা হ'ল এবং তাদের দুই দলে ভাগ করে আলাদা করে রাখা হ'ল। কিছু দিন পরে তাদের সকলেরই যক্ষ্মা হল, তখন বৈজ্ঞানিক সেই যক্ষ্মার ওষুধটি দিয়ে একদল ইঁদুরকে চিকিৎসা করতে লাগলেন, অপর দলকে কিন্তু বিনা চিকিৎসায় রাখলেন। কিছুদিন পরে হয়ত চিকিৎসাপ্রাপ্ত ইন্দুরের দলটি সেরে



জীবন্ত টেস্ট-টিউব্ খরগোস। পেনিসিলিনের শ্রেণী বিভাগ করবার আগে এদের উপর পরীক্ষা করা হচ্ছে।

উঠল এবং অপর দলের সব ইঁদুরগুলি হয়ত মরে গেল। এই রকম করে ওষুধটির গুণ পরীক্ষা করা হল। শুধুই যে ওষুধের গুণ পরীক্ষা করা হয়, তা নয় আরও নানাপ্রকার পরীক্ষা যেমন খাদ্য, শরীরতত্ত্ব, জীবের বংশানুক্রম নিয়ে পরীক্ষা করা হয়। এই সমস্ত জীব, বিশেষ করে সাদা ইঁদুর এবং গিনিপিগ নিয়ে পরীক্ষা করার নানাপ্রকার সুবিধা আছে। বিখ্যাত জার্মান জীবাণুতত্ত্ববিদ্ রবার্ট কখ্, যিনি যক্ষ্মা এবং কলেরার জীবাণু আবিষ্কার করেন, তিনিই প্রথমে এই সব জীব নিয়ে পরীক্ষা আরম্ভ করেন।

ইংরাজিতে একটা কথা আছে "So that others may live." কথাটা প্রয়োগ করা হয় সৈন্যদের সম্বন্ধে, যারা তাদের ভবিষ্যৎ বংশধরদের সুখ স্বাচ্ছন্দ্যের জন্য নিজেদের জীবন উৎসর্গ করে। ঠিক এই কাজ আমরা পাই এই সব নিরীহ জীবগুলির কাছ থেকে। আমাদের জীবনের জন্য আমরা সকলেই এই সমস্ত 'নগণ্য' জীবগুলির কাছে ঋণী। "নিঃশেষে প্রাণ যে করিবে দান ক্ষয় নাই তার ক্ষয় নাই।"

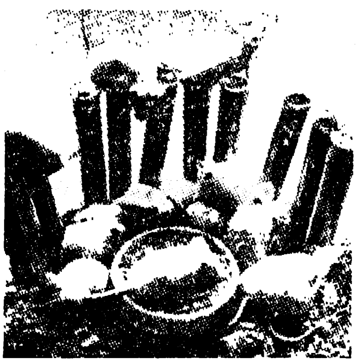
এইরকম কিছু জীবন্ত টেস্টটিউবের আলোচনা করা যাক। প্রথমেই দেখা যাক মটরশুঁটি গাছ নিয়ে পরীক্ষা করে বংশানুক্রমের একটি মূল সূত্র কিরূপে আবিষ্কৃত হয়েছিল।

আমরা অনেকেই দেখেছি, ছেলেমেয়েরা অনেক সময়েই বাপমার চেহারার কিছু না কিছু সাদৃশ্য পায়, তখন আমরা বলে থাকি, মণ্টুর হাতের আঙুল ঠিক তার বাবার মতো কিংবা মিণ্টির নাক ঠিক ওর মার মতো টিকলো ইত্যাদি। কিন্তু কেন এমন হয় আগে জানা ছিল না।

এখন থেকে প্রায় আশি বছর আগে অস্ট্রিয়ার এক ছোট্ট শহরের এক পাদ্রী সাহেব মটর শুঁটি গাছ নিয়ে পরীক্ষা করে বুঝিয়ে দিলেন কেন সন্তানরা পিতামাতার বৈশিষ্ট্য পায়। এই পাদ্রী সাহেবের নাম গ্রিগর মেণ্ডেল। আশ্চর্যের বিষয়, মেণ্ডেলের এত বড় আবিষ্কারের মূল্য

সমসাময়িক বৈজ্ঞানিকেরা উপলব্ধি করতে পারেন নি। এই রকমই হয়ে থাকে, যখন কোন প্রতিভাশালী ব্যক্তি তাঁর সময়ের আগেই জন্মগ্রহণ করেন, যেমন হয়েছিল গ্যালিলিওর। এখন মেণ্ডেল, গ্যালিলিওর অথবা ডারুইনের তথ্য কত সহজই না মনে হয় এবং যতদিন যেতে থাকে আমরা ততই বুঝতে পারি এ'রা কত বড়ো বৈজ্ঞানিক ছিলেন।

যাই হোক, এখন মেণ্ডেলের কথাই বলি। মেণ্ডেল তাঁর বাগানের এক অংশে লম্বা জাতের ও খাটো জাতের মটরশুটির গাছ নিয়ে পরীক্ষা আরম্ভ করলেন। লম্বা গাছের ফুলের রেণু খাটো গাছের ফুলের গর্ভকেশরে মিশিয়ে দিলেন এবং এর ফলে যে বীজ হল সেই বীজ তিনি পরের বছর



কাচের নিষ্প্রাণ টেস্ট-টিউব, আর তার জীবন্ত প্রতীকরূপী ইঁদুর। আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের সরকারী ল্যাবরেটরীতে পরীক্ষার জন্য এদের রাখা হয়েছে।

পুঁতলেন। গাছ হতে দেখা গেল যে, সব গাছই লম্বা জাতের হয়েছে, আবার পরের বছর যখন এই সব লম্বা গাছের বীজ পোঁতা হল, তখন দেখা গেল যে, তিন ভাগ গাছ হয়েছে লম্বা, কিন্তু এক ভাগ খাটো। আবার এর পরের বছর অর্থাৎ চতুর্থ বছরে যখন এই সমস্ত গাছের বীজ পোঁতা হলো, তখন দেখা গেল যে, লম্বা গুলি থেকে আগের বছরের মতোই তিন ভাগ লম্বা এবং এক ভাগ খাটো গাছ হয়েছে, কিন্তু খাটো গাছের বীজ থেকে লম্বা গাছ হয়নি সবই খাটো গাছ হয়েছে। মেণ্ডেল তাঁর পরীক্ষা থেকে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হলেন যে, দুটি বিভিন্ন প্রকৃতির গুণের মধ্যে একটি গুণ প্রবল (dominant) এবং অপরটি দুর্বল (recessive)। এক্ষেত্রে মটরশুটি গাছের দীর্ঘতা গুণ হল প্রবল। তিনি মটরশুটি গাছ নিয়ে আরও পরীক্ষা করে দেখালেন যে, শুটির হলদে রং আর ফুলের লাল রং হল প্রবল। খর্বতা, শুটির সবুজ রং আর ফুলের বেগুনি রং হল দুর্বল।

এই রকমে মটরশুটি গাছ নিয়ে পরীক্ষা করে মেণ্ডেল বংশানুক্রমের মূল সূত্রগুলি পরিষ্কার করে গেছেন।

এইবার দেখা যাক মুরগী, ইঁদুর আর পায়রার ওপর পরীক্ষা করে কি করে ভাইটামিন আবিষ্কৃত হল।

গত শতাব্দীর শেষ অংশে যবদ্বীপে ওলন্দাজ চিকিৎসক ডক্টর আইকম্যান (Dr. Eijkman) ছিলেন জেলখানার ডাক্তার। তিনি অনেক জেলখানা পরিদর্শন করে লক্ষ্য করলেন যে, যে সমস্ত জেল-খানায় কয়েদীদের পালিশকরা কলছাঁটা চালের ভাত খেতে দেওয়া হয় সেইখানেই কয়েদীদের "বেরিবেরি" নামক রোগ হয়, কিন্তু ঢেঁকিছাঁটা চাল খেলেই বেরিবেরি সেরে যায়। তিনি আরও লক্ষ্য করলেন যে, ঐ সমস্ত জেলখানার সীমানায় যে সমস্ত মুরগী আছে, তারা ঐ কলছাঁটা চালের ভাত খেলে তাদের ঘাড় বেঁকে যায়। নির্জীব হয়ে পড়ে এবং একপ্রকার স্নায়বিক রোগে মারা যায়, কিন্তু চালের কুঁড়ো খেতে দিলেই তাদের রোগ সেরে যায়।

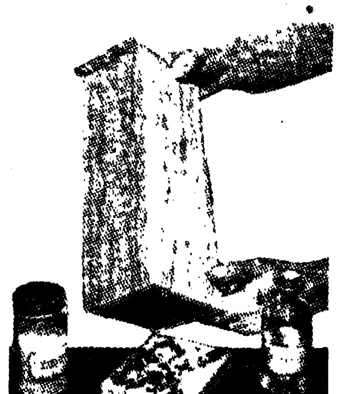
আচ্ছা এইবার আর একটা পরীক্ষার কথা বলি। ভাইটামিন আবিষ্কার হওয়ার আগে আমরা জানতুম যে, আমরা যে খাদ্য গ্রহণ করি তাতে থাকা চাই শর্করা জাতীয় খাদ্য, শরীরের তাপ রক্ষার জন্য চর্বি জাতীয় খাদ্য, শরীর গঠনের জন্য প্রোটিন জাতীয় খাদ্য আর চাই অল্পবিস্তর লবণ জাতীয় খাদ্য, কিছু ধাতব পদার্থ আর জল।

এই শতাব্দীর গোড়ায় অধ্যাপক হপকিনস দুটি ইঁদুর নিয়ে পরীক্ষা আরম্ভ করলেন। ইঁদুর দুটির বয়স ও ওজন সমান। দুধকে পূর্ণ খাদ্য বলা হয়, কারণ খাদ্যের সমস্ত উপাদান দুধে আছে। তিনি ইঁদুর দুটিকে দুধের সমস্ত উপাদান (কিন্তু দুধ নয়) সম পরিমাণে খেতে দিলেন, কিন্তু একটি ইঁদুরকে সিকি চামচে টাটকা দুধ দিতে লাগলেন এবং সেই সামান্য দুধে শর্করা অথবা প্রোটিন যতটুকুই থাকুক না, সেই অল্প পরিমাণ সকল দ্রব্য পুষিয়ে দিলেন। কাজেই দেখা যায় যে, দুটি ইঁদুরের খাদ্যে ওজনের দিক থেকে কোনই পার্থক্য নেই। কিন্তু কিছুদিন পরে প্রথম ইঁদুরটি অর্থাৎ যাকে দুধ দেওয়া হত না, তার ওজন কমতে লাগল, পরন্তু তার দুই একটি ব্যাধিও হতে লাগল অথচ অপর ইঁদুরটির ওজন আস্তে আস্তে বাড়তে লাগল। এই রকম করে যখন আঠারো দিন কাটল তখন হপকিনস দ্বিতীয় ইঁদুরটির দুধ বন্ধ করে প্রথম ইঁদুরটিকে দুধ দিতে লাগলেন। ফল হল দুধ পেয়ে ইঁদুরটির শীর্ণতা হ্রাস পেয়ে ওজন আস্তে আস্তে বাড়তে লাগল, কিন্তু দ্বিতীয় ইঁদুরটির দুধ বন্ধ হওয়ায় তার ওজন কমতে লাগল।

হপকিন্স প্রথমে ব্যাপারটা ঠিক ধরতে পারলেন না। তিনি দেখলেন খাদ্যের যা উপাদান তার সমস্তই ত ইঁদুর দুটিকে দেওয়া হচ্ছে তবে কেন এই তফাৎ হচ্ছে। দুধকে বিশ্লেষণ করলে সেই শর্করা, চর্বিজাতীয়, প্রোটিন ও লবণ জাতীয় খাদ্য ও জল ছাড়া আর কিছুই ত পাওয়া যায় না; অথচ যা পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায় তা এই দুধের জন্যই। তখন হপকিনস ঠিক করলেন দুধে এমন কিছু আছে যা খাদ্যের অন্যতম প্রয়োজনীয় উপাদান (accessory food factor)।

এইবার আর একটি পরীক্ষার কথা বললে ভাইটামিন আবিষ্কারের গল্পটা পরিষ্কার হয়ে যাবে।

১৯১১ সালে লণ্ডন নগরে লিস্টার



'ডি-ডি-টি'-র সাহায্যে মাছির বংশ-ধ্বংসের পরীক্ষা হচ্ছে।

ইনস্টিটিউটে একজন পোলিশ চিকিৎসক নাম কাশিমির (কাশ্মীরী নয়) ফাংক পায়রা নিয়ে পরীক্ষা আরম্ভ করেন। তিনি ইচ্ছামতো খাদ্য বদলে দিয়ে পায়রার শরীরে বেরিবেরির অনুরূপ পলিনিউরাইটিস নামে রোগ উৎপন্ন করতে লাগলেন এবং চালের কুঁড়ো খাইয়ে তাদের রোগ সারিয়ে দিতে লাগলেন। তিনি অবশেষে চালের কুঁড়ো থেকে রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় বেরিবেরি নাশক পদার্থটি পৃথক করে ফেললেন এবং তার মোটামুটি রাসায়নিক গুণাগুণ পর্যবেক্ষণ করে নাম দিলেন ভাইটামাইন (Vitamine) "ভাইটা" মানে জীবন আর প্রোটিনে ভগ্নাংশ অ্যামিনো অ্যাসিডের "অ্যামাইন" এই দুটো কথা যোগ করে ভাইটামাইন নাম দেওয়া হয়েছে। পরে ১৯২০ সালে শেষের 'e' অক্ষরটি বাদ দিয়ে Vitamin নাম দেওয়া হল।

এখন ত ভাইটামিন তত্ত্ব সম্বন্ধে কতই না নতুন নতুন আবিষ্কার হয়েছে এবং কত রকমের-ই না ভাইটামিন আবিষ্কৃত হয়েছে,

এই সবই জীবন্ত টেস্ট টিউবের উপর পরীক্ষা করে। আইকম্যান ও হপকিনস উভয়ে নোবেল প্রাইজ পেয়েছিলেন, কিন্তু ফাংক পাননি।

আরও একজন ভাইটামিন 'কে' আবিষ্কার করে ১৯৪৩ সালের নোবেল পুরস্কার পেয়েছেন; তাঁর নাম হেনরিক ড্যাম, কোপেনহ্যাগেন বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক। তিনিও পরীক্ষা করেছিলেন জীবন্ত টেস্টটিউব নিয়ে। তিনি কিছু পরীক্ষা করবার জন্য তাঁর ল্যাবরেটরীতে কয়েকটি মুরগীর বাচ্চা রেখেছিলেন। তাদের মধ্যে কয়েকটি বাচ্চা মরে গিয়েছিল। সেই বাচ্চাগুলির গায়ে অধ্যাপক ড্যামের হাত লাগতে তিনি দেখলেন যে, আভ্যন্তরিক রক্তপাতের ফলে তাদের গায়ের পাতলা ত্বক ভিজে গেছে এবং এই রক্তপাত তাদের মৃত্যুর কারণ। অধ্যাপক ড্যাম তখন কারণ বুঝতে পারেননি। কারণ তাদের খাদ্যে ছিল সব রকম ভাইটামিন। তিনি অবিলম্বে তাদের রক্ত পরীক্ষা করে রক্তে প্রোথ্রম্বিনের অভাব লক্ষ্য করলেন। রক্ত জমাট বাঁধার জন্য প্রোথ্রম্বিন পরোক্ষভাবে দায়ী। তিনি তখন আর একদল মুরগীর বাচ্চা নিয়ে পরীক্ষা আরম্ভ করলেন। প্রথম দলকে যে খাদ্য দেওয়া হচ্ছিল সেই খাদ্য দেওয়ায় দেখা গেল রক্তপাত হচ্ছে, তখনই খাদ্য বদলে দেওয়া হল ও অন্যান্য খাদ্যের মধ্যে দেওয়া হল শুকরের যকৃত ও আলফা নামক শাক এবং দেখা গেল যে, তাদের রক্তপাত বন্ধ হয়েছে। অধ্যাপক ড্যাম তখন স্থির করলেন যে এই দুটি নতুন খাদ্যে এমন কিছু আছে যার জন্য রক্ত জমাট বাঁধে অর্থাৎ coagulate করে। অধ্যাপক ড্যামের দেশে বোধ হয় coagulate বানান 'C' অক্ষরের স্থলে 'K' দিয়ে করা হয়, তাই তিনি সেই অদৃশ্য জিনিসটির নাম দিলেন ভাইটামিন 'কে'। আমেরিকায় সেণ্টলুই বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্তর্গত মেডিক্যাল স্কুলের অধ্যাপক ডক্টর ডয়সী ১৯৩৮ সালে ভাইটামিন 'কে' বিশ্লেষিত করে অধ্যাপক ড্যামের সঙ্গে একযোগে নোবেল পুরস্কার পেয়েছেন।

আপনারা আমেরিকান চিকিৎসক জেস্ ল্যাজিয়ারের নাম শুনেছেন? না শোনেননি, কিন্তু ফার্ডিনান্ড ডি লেসেপ্স-এর নাম শুনেছেন। লেসেপ্স সুয়েজ খাল খনন করেছিলেন, সেই স্মৃতিরক্ষা করবার জন্য সুয়েজখালের মুখে লেসেপ্সের এক বিরাট প্রতিমূর্তি আছে, কিন্তু পানামা খালের মুখে কোলনে ল্যাজিয়ারের কোন স্মৃতি চিহ্ন নেই, কিন্তু কেন থাকা উচিত সেই কথা বলছি।

সুয়েজ খাল খননের গৌরবে গৌরবান্বিত যখন লেসেপ্স তখন তাঁর উপরে ভার দেওয়া হ'ল পানামা খাল খনন করবার। এই উদ্দেশ্যে একটি যৌথ কোম্পানী স্থাপিত করা হল এবং লেসেপ্সকে পানামা যোজকে পাঠানো হল। কিন্তু পানামা অঞ্চলে ছিল ভীষণ পীতজ্বর, এ খবর সম্ভবত লেসেপ্সের জানা ছিল না; ফলে হল কি অল্পদিনের মধ্যেই বিশ হাজার লোক এই সর্বনাশা রোগের হাতে প্রাণ দিলে বহু অংশীদারের প্রভূত অর্থক্ষয় হল, খাল খনন করা দূরের কথা পরাজয় স্বীকার করে লেসেপ্সকে ফিরে আসতে হল এবং পাঁচ বৎসর কারাবাস পুরস্কার লাভ হল। কিন্তু এ সমস্তর জন্য দায়ী লেসেপ্স নয়, দায়ী পীত জ্বর।

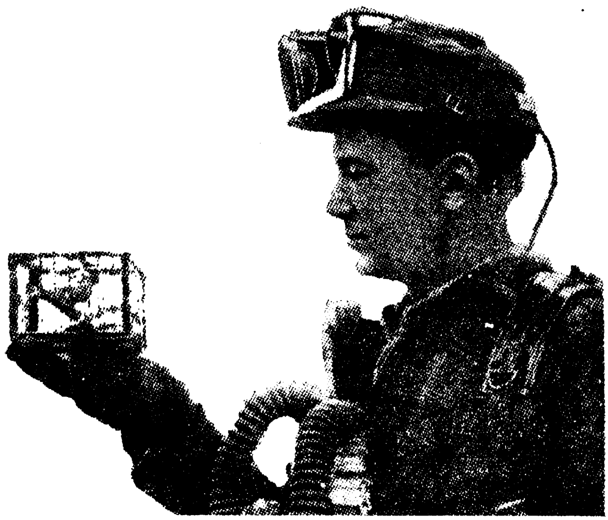
বিংশ শতাব্দীর একেবারে গোড়ায় যখন আমেরিকার যুক্তরাজ্য কিউবা দখল করেন তখন কিউবা ছিল পীতজ্বরের ডিপো। কত আমেরিকান সৈন্য যে মারা পড়েছে এই পীতজ্বরের হাতে তার কোন হিসাব নেই। এই সর্বনাশা রোগকে আয়ত্তে আনবার জন্য এক "ইয়েলো ফিভার কমিশন" নিয়োগ করা হল। এই মিশনের নেতা ছিলেন ওয়াল্টার রীড আর তাঁর সহকারী ছিলেন ডাঃ জেমস ক্যারল, জেস্ ল্যাজিয়ার আর কিউবার একজন অধিবাসী আরিস্টাইডিস আগ্রামোণ্ট। এই চারজন ছিল মিশনের সভ্য।

আরও একজন ছিলেন তাঁর নাম ডাঃ কার্লোস ফিনলে, তিনিও কিউবার অধিবাসী ছিলেন, কিন্তু মিশনের সভ্য ছিলেন না, তিনি প্রচার করে বেড়াতেন মশা পীতজ্বরের জীবাণুর বাহক এবং তাঁর অনুমান সত্য বলে প্রমাণিত হয়েছিল।

পীতজ্বর এক ভীষণ ব্যাধি। ন্যাবা রোগের মতো সমস্ত গায়ের রং হলদে হয়ে যায়। তীব্র মাথার যন্ত্রণা, ১০৫° ডিগ্রি জ্বর হাত পা ও সমস্ত অঙ্গে অসহ্য বেদনা, তলপেটে খিল ধরা আর অবশেষে কালো বমি ও মৃত্যু। সব চেয়ে মুস্কিল এই যে, কোনো জীবের দেহে এই ব্যাধি সংক্রমিত করা যায় না কাজেই এর কারণ অনুসন্ধান করা দুরূহ।

অবশেষে মিশন ঠিক করলেন যে, তাঁরা নিজেরাই গিনিপিগের কাজটা করবেন। ডাঃ কার্লোস ফিনলের অনুমান সত্য কি না নিজেরাই কেউ না কেউ নিজের দেহের ওপর পরীক্ষা করে দেখবেন। প্রথম স্বেচ্ছাসেবক হলেন ল্যাজিয়ার ও ক্যারল। দুজনেরই বাড়িতে আছে স্ত্রী আর কয়েকটি ছেলেমেয়ে, কিন্তু সমগ্র মানবের কল্যাণের জন্য এবং বিজ্ঞানের স্বার্থের জন্য তাঁরা উৎসর্গ করলেন নিজেদের।

পীতজ্বরাক্রান্ত দেহে দংশন করেছে এই রকম মশা ধরে এনে একদা এই দুজন বীর-শ্রেষ্ঠ নিজেদের দেহ যমের সহযোগী সেই মশাদের কামড়াতে দিলেন। তিনদিন



খনিতে বিষাক্ত গ্যাস আছে কিনা, পরীক্ষা করবার জন্য ক্যানারি পাখীর ব্যবহার।

নির্বিঘ্নে কেটে গেল, চতুর্থ দিনের দিন পীতজ্বরের সমস্ত লক্ষণ ক্রমশ তাঁদের শরীরে প্রকাশ পেল। সেই হাতে পায়ে, গায়ে, মাথায় ও তলপেটে তীব্র যন্ত্রণা, খিলধরা কাঁপুনি, হলুদ বর্ণ দেহ, ভুল বকা সমস্ত লক্ষণ ঠিক ঠিক মিলে গেল। ক্যারল কিন্তু আস্তে আস্তে সেরে উঠলেন আর বেচারী ল্যাজিয়ার তার অবস্থা ক্রমশ খারাপ হতে লাগল ও অবশেষে সে কালো বমি করতে লাগল......তারপর? তারপর আর কি, বিজ্ঞানের স্বার্থে সে নিজের জীবন দান করলে।

মশা পীতজ্বরের জীবাণুর বাহক প্রমাণ হল। এই মশার নাম স্টিগোমিয়া ফ্যাসিয়েটা।

পীতজ্বর গবেষণার জন্য আরও অনেকে নিজেদের রীডের হাতে ছেড়ে দিয়েছিলেন, কিন্তু সেজন্য পৃথক্ প্রবন্ধের আবশ্যক।

এইবার একটি কৌতূহলজনক পরীক্ষার কথা বলে প্রবন্ধ শেষ করব। পরীক্ষা করেছিলেন ডক্টর অ্যালেক্সিস ক্যারেল যিনি ১৯১২ সালে ঔষধ ও শারীরবৃত্ত পর্যায়ের নোবেল পুরস্কার পেয়েছিলেন। ডক্টর ক্যারেল মুরগীর হৃদয়ের একাংশ প্রায়

পঁচিশ বৎসর বাঁচিয়ে রাখতে সক্ষম হয়েছিলেন।

আমেরিকার যুক্তরাজ্যে রকফেলার ইনস্টিটিউটের চিকিৎসা শাখার মহলে একটি কুকুর ছিল। কুকুরটি বার্ধক্যে উপনীত হয়েছিল, তার তেজ কমে গিয়েছিল। ক্রমে সে এত দুর্বল হয়ে গেল যে, চার পায়ের ওপর দাঁড়িয়ে বেচারীর খেতেও যেন কষ্ট হত। ডক্টর ক্যারেল ভাবলেন, দেখাই যাক না ওর রক্তের পরিবর্তন করে। তিনি কুকুরটির শরীরে কয়েকবার অস্ত্রোপচার করে তার তিনভাগের দু-ভাগ রক্ত বার করে নিলেন এবং তারপর তার রক্তের সিরাম ও লাল কণিকাগুলি আলাদা আলাদা করে রাখলেন। রক্তে যে সমস্ত লবণ জাতীয় পদার্থ পাওয়া যায়, তিনি এইরূপে লবণ জাতীয় পদার্থের একটি দ্রাবণ প্রস্তুত করলেন এবং সেই দ্রাবণ কুকুরটির লাল কণিকাগুলির সঙ্গে মিশিয়ে দিয়ে কুকুরটির শরীরে প্রবেশ করিয়ে দিলেন। কিছুদিন পরেই কুকুরটি যেন ঘুম থেকে জেগে উঠে ঘেউ ঘেউ করে চীৎকার ও দৌড়াদৌড়ি আরম্ভ করে দিলে। এক কথায় কুকুরটির 'কায়কল্প' হল। কে জানে, এই রকম করে মানুষও হয়ত একদিন বার্ধক্য অনেকটা জয় করতে পারবে।

এই রকম করেই কত জীবজন্তুর ওপর কত রকমে পরীক্ষা করে মানুষকে বাঁচাবার জন্য কতই না নব নব ঔষধ ও প্রক্রিয়া আবিষ্কৃত হচ্ছে।

স্বাস্থ্য প্রসঙ্গ

জন্ম রহস্য

শ্রীশশাঙ্কশেখর সরকার

কিছুকাল পূর্বে 'দেশ' পত্রিকায় (২২শে আশ্বিন, ১৩৫১) জন্মরহস্যের কয়েকটি বৈশিষ্ট্যের আলোচনা প্রসঙ্গে স্ত্রীলোকের পূর্ণ প্রজননকালের মধ্যে অনুর্বর কালের (Sterile Period) উল্লেখ করিয়াছিলাম। প্রায় প্রত্যেক স্ত্রীলোকের প্রথম ঋতু হইতে প্রথম গর্ভের মধ্যে এই অনুর্বর কাল দেখা যায়। প্রশান্ত মহাসাগরের TROBIAND দ্বীপের আদিম অধিবাসীদের মধ্যে গবেষণাকালে প্রসিদ্ধ নৃতত্ত্ববিৎ MALINOWSKI লক্ষ্য করেন যে, বিবাহের পূর্বে যুবক-যুবতীদের মধ্যে অবাধ সংমিশ্রণের ফলেও জারজ সন্তানের জন্ম বিরল (শতকরা ১টি)। ইহার প্রকৃত কারণ অধ্যাপক Malinowski তখন খুঁজিয়া পান নাই। ১৯২৯ সালের পূর্বেও এ বিষয়ে সম্যকরূপে বুঝা যায় নাই। ১৯২৯ সালে এডিনবরার অধ্যাপক CREW ইন্দুরের উপর গবেষণাকালে ঠিক এই প্রকার ঘটনা লক্ষ্য করেন।

অধ্যাপক ক্রু (Crew) ১০০টি স্ত্রী ইন্দুর লইয়া গবেষণা আরম্ভ করেন। ইহাদের প্রত্যেকটিকেই প্রথম যৌনবিকাশের (Oestrous) পরই পুং ইন্দুরের সহিত সঙ্গম করানোর চেষ্টা করা হয়। ১০০টির মধ্যে ২০টি ইন্দুর একেবারেই সঙ্গম করিতে চায় না এবং অবশিষ্ট ৮০টির সঙ্গমের ফলে মাত্র ২৪টির গর্ভ হয়। অথচ এই ইন্দুরগুলির যখন তিন মাস হইতে ছয় মাস বয়স হয়, তখন তাহাদের মধ্যে শতকরা ৮০-৯০টির গর্ভ হয়। উক্ত ২৪টির, যাহাদের প্রথম যৌনবিকাশের সঙ্গে সঙ্গেই গর্ভ হইয়াছিল, তাহাদের মধ্যে সাতটি মারা যায় এবং চারটি তাহাদের শাবকগুলিকে জন্মের অব্যবহিত পরেই খাইয়া ফেলে। এই পরীক্ষা হইতেই বুঝা যাইবে যে, যৌন-বিকাশের বা প্রথম ঋতুর পরই গর্ভ হওয়া সচরাচর বিরল এবং যাহাদের গর্ভ হয়, তাহাদের নিজেদের বা তাহাদের সন্তানদের জীবন সংশয় হওয়ার আশঙ্কা অধিক।

স্ত্রীলোকের ঋতু হইলেই যে সে গর্ভধারণক্ষম হইয়া থাকে, তাহা নহে। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই দেখা যায় যে, গর্ভস্থ বীজের বিকাশ প্রথম ঋতুর বহু পরেই হইয়া থাকে। এদেশে শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যেও দেশভেদে স্ত্রীলোকের প্রথম ঋতুকালের বয়সের তারতম্য লইয়া একটি গভীর ভ্রান্ত ধারণা বর্তমান আছে। তাঁহারা গ্রীষ্মপ্রধান দেশের মেয়েদের ঋতু শীতপ্রধান দেশের মেয়েদের অপেক্ষা পূর্বে হয় বলিয়া মনে করেন। কিছুকাল পূর্বে আনন্দবাজার পত্রিকার (২৬শে ফাল্গুন, ১৩৫১) 'নারীর কথা' বিভাগে শ্রীমতী কাবেরী দেবীর 'বয়ঃসন্ধি' প্রবন্ধে এই প্রকার উক্তি দেখিয়াছিলাম। প্রকৃতপক্ষে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের স্ত্রীলোকদের মধ্যে প্রথম ঋতুর বয়সের মধ্যে যে কোন বিশেষ তারতম্য আছে, তাহা বৈজ্ঞানিকেরা স্বীকার করেন না এবং তাহা নিম্নের তালিকাটি হইতে সুস্পষ্ট হইবে।

বিভিন্ন দেশের স্ত্রীলোকদের প্রথম ঋতুকালীন বয়স

আমেরিকার রেড ইন্ডিয়ান (SIOUX)	১৪.৪	বৎসর
" শ্বেতকায় জাতি	১২.৮৬	"
" নিগ্রো "	১৩.০৯	"
বাঙ্গালী মুসলমান	১৩.৬৪	"
" হিন্দু	১৩.৬২	"
" খৃষ্টান	১৩.৬৯	"
" ৫৬টি কলেজের ছাত্রী	১৩.৮৭	"
চীনা জাতি (Canton প্রদেশের)	১৪.৫	"

সাধারণত ১৩ বৎসর বয়সেই প্রথম ঋতু হইতে দেখা যায়, যদিও ক্ষেত্রবিশেষে ইহা সর্বনিম্নস্তরে ৯ বৎসরেও হইতে দেখা গিয়াছে এবং ঊর্ধ্বে ২০ বৎসর বয়সেও প্রথম ঋতু হওয়া বিরল নহে।

পূর্বোল্লিখিত অনুর্বরকালের আলোচনায় পুনরায় আসা যাউক। ইন্দুরের ন্যায় জীব-জগতের অন্যান্য স্তরেও এই প্রকার অনুর্বর কালও প্রমাণিত হইয়াছে। দেশভেদে মানুষের মধ্যে এই অনুর্বর কালের তারতম্য ঘটিতে পারে। এবিষয়ে আজিও সম্যকরূপে তথ্যাদি সংগৃহীত হয় নাই। সাধারণত প্রথম ঋতু হইতে প্রথম গর্ভের মধ্যে ৪—৫ বৎসরের ব্যবধান হইতে দেখা যায়। এই বিষয়ে ১৮৮০ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত MONDIERE নামক একজন ফরাসী চিকিৎসক ও নৃতত্ত্ববিদের তথ্যই সর্বপ্রথম সংগৃহীত তথ্য। মঁডিয়ের (MONDIERE) অবশ্য তখন ইহা হইতে অনুর্বর কালের কথা ভাবিতে পারেন নাই। অনুর্বর কালের ব্যাপারটি মাত্র কয়েক বৎসর হইল জানা গিয়াছে। প্রথমত ১৯১৫ খৃষ্টাব্দে অধ্যাপক Malinowksi Trobiand দ্বীপের অধিবাসীদের মধ্যে লক্ষ্য করেন এবং পরে অধ্যাপক Crew ১৯২৯ খৃষ্টাব্দে ইন্দুরের উপর পরীক্ষা করিয়া দেখান যে ইহা প্রকৃতির বিধান। স্ত্রীজাতিকে গর্ভধারণক্ষম করিতে এবং সুস্থ সবল শিশুর জন্মদানের পূর্বে যে তাহাকে পুষ্ট (Maturity) করিতে হইবে ইহা প্রকৃতিরই বিধান বলিতে হইবে। ১৮৮০ খৃষ্টাব্দে মঁডিয়ের ফরাসী ইন্দো-চীনের অধিবাসীদের নিম্নলিখিত তথ্য প্রকাশিত করেন:—

অধিবাসী	পরীক্ষিত সংখ্যা	১ম ঋতুর বয়স	১ম শিশুর সংখ্যা	১ম শিশুর জন্মকালীন বয়স	অনুর্বর কাল
আনাম	৯৮০	১৬ব, ৪মা,	৪৪০	২০ব, ৬মা,	৩ব, ৪মা;
চীনা	১০৬	১৬ব, ৬মা,	১৫	১৮ব, ১০মা,	১ব, ৬মা;
মিন-হুয়াং	৬২	১৬ব, ৯মা,	৪০	২০ব, ৯মা,	৩ব, ২মা;
কাম্বোজ	৯৬	১৬ব, ১০মা,	৪৫	২২ব, ৬মা,	৪ব, ১০মা;

একই প্রদেশে বসবাস করিয়াও ৪টি জাতির মধ্যে অনুর্বর কালের এত তারতম্য যে কেন হইল এস্থলে তাহার আলোচনা করা নিষ্প্রয়োজন। প্রত্যেক ক্ষেত্রেই যে অনুর্বর কাল বর্তমান আছে, তাহাই এ স্থলে দ্রষ্টব্য বিষয়। উপরোক্ত তালিকাটি এবং শেষের অনুর্বর কালের গণনাটি মাঁড়িয়ে কৃত নহে আমেরিকার বিখ্যাত নৃতত্ত্ববিদ্ ডাঃ Ashby Montagu করিয়াছেন। অধ্যাপক Ashby Montagu চীনদেশ হইতে আরও কিছু তথ্য সম্প্রতি সংগ্রহ করিয়াছেন। যে সকল দেশে বিবাহ ঋতুর পূর্বে বা সংগে সংগেই হইয়া থাকে সেই সকল দেশের তথ্যই এক্ষেত্রে প্রয়োজন। এজন্য এ বিষয়ে ইউরোপীয় কোন তথ্যই নাই। ভারতবর্ষে এ বিষয়ে তথ্য সংগ্রহের প্রচুর সুযোগ আছে।

চীনের Canton প্রদেশের ২২৯১ জন চীনা স্ত্রীলোকের বেলায় দেখা যায় যে, তাহাদের প্রথম ঋতুকালীন বয়সের গড় হইল ১৪·৫। ইহাদের মধ্যে বিবাহিত হয় ৬৮৩ জন গড়ে ১৭·৬ বৎসর বয়সে আর বিবাহিতাদের মধ্যে ৫৯৬ জনের প্রথম সন্তান জন্মে গড়ে ২০·৫ বৎসর বয়সে। ইহাদের অনুর্বর কাল তাহা হইলে পূর্ণ ৬ বৎসর হইল। ৫৯৬ জনের মধ্যে ১ জনের গর্ভ হয় ১৩ বৎসর বয়সে, ৫ জনের ১৫ বৎসর বয়সে আর ১২ জনের ১৬ বৎসরে।

ভারতীয় তথ্যের মধ্যে অধ্যাপক Ashby Montagu আমেদনগর সেবাসদন হইতে A. H. Clark সংগৃহীত তথ্যাদি হইতে দেখাইয়াছেন যে, প্রথম সন্তানের জন্মের সময় মাতার বয়সের গড় হইল ১৮·৩ বৎসর। বোম্বাই প্রদেশের গড় হইল ১৮·৭ বৎসর আর মাদ্রাজের গড় হইল ১৯·৪। এই সকল প্রদেশের স্ত্রীলোকের প্রথম ঋতুকালীন বয়সের গড় জানা নাই, তবে ১৩—১৪ বৎসর ধরা গেলে উক্ত প্রত্যেক ক্ষেত্রেই ৪—৫ বৎসরের অনুর্বরকাল দেখিতে পাওয়া যায়। অনুর্বরকালের অবস্থান সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ হওয়া যাইতে পারে, তবে আমাদের সামাজিক জীবনের নানাপ্রকার বাধ্যবাধকতার মধ্যে ইহার প্রকৃত বিকাশের কিছু তারতম্য হওয়া বিচিত্র নয়। দৈহিক পুষ্টির সহিত ঋতু বিকাশেরও তারতম্য হইতে পারে এবং বংশানুক্রমের প্রভাব যে নাই সে কথাও অস্বীকার করা যায় না। এই অনুর্বরকালের মধ্যে অর্থাৎ প্রথম ঋতুর পর হইতে ৩—৪ বৎসরের মধ্যে সন্তানাদি হইলে মাতা ও শিশুর উভয়েরই পক্ষে বিপজ্জনক হইয়া থাকে। স্ত্রীলোকের বয়স ভেদে শিশুমৃত্যুর হার দেখিলেই তাহা বুঝা যাইবে। ১৫ হইতে ২০ বৎসরের মধ্যে মাতা ও শিশুর উভয়েরই মৃত্যুর হার সর্বাপেক্ষা অধিক; ২০ হইতে ২৯ বৎসর পর্যন্ত মৃত্যুহার সর্বাপেক্ষা কম এবং এই হার পুনরায় ৩০ বৎসরের পর ক্রমশই বাড়িতে থাকে। শিশু-মৃত্যুর হারও ঠিক এই অনুপাতেই দেখা যায় এবং মনে হয় উভয়েই ওতপ্রোতভাবে জড়িত। স্ত্রীলোকের সর্বাপেক্ষা উপযুক্ত ও নিরাপদ প্রজনন হইল ২০—২৯ বৎসরের মধ্যে।

প্রথম ঋতুর পর হইতে ৪—৫ বৎসরের অনুর্বরকাল এক প্রকার প্রকৃতির বিধান বলিতে হইবে। এই অনুর্বরকালের মধ্যে নারী তাহার শরীরের পুষ্টিসাধন করিয়া তাহার গর্ভধারণের ক্ষমতা বাড়াইয়া লয় নতুবা গর্ভকালীন ক্ষতির পূরণ করা দুঃসাধ্য হইয়া পড়ে।

ভারতবর্ষে প্রত্যেক প্রদেশের স্ত্রীলোকের অনুর্বরকালের গড় কত তাহা জানা বিশেষ প্রয়োজন। বাঙলাদেশের এতটুকুও তথ্য নাই। এই অনুর্বরকালের সীমা কত হইতে কত? ২০ বৎসরই কি উহার ঊর্ধ্ব সীমা? প্রত্যেক প্রদেশের গড় কি এক? এগুলি জানা কেবলমাত্র বৈজ্ঞানিক কৌতূহল পূরণের জন্যই যে প্রয়োজন, তাহা নহে। নিজেদের ব্যক্তিগত জীবনযাত্রার জন্য ইহার প্রয়োজন যে কত তাহা স্বল্প কথায় বুঝান সম্ভব নহে। তবে এস্থলে একটা দিক উল্লেখ না করিয়া পারা যায় না, তাহা জন্মশাসনের দিক। জন্মশাসনের সহিত অনুর্বরকালের সম্বন্ধ সহজেই বুঝা যাইবে। এই সময়ের মধ্যে যদি জন্মশাসনের ব্যবস্থা না করা হয়, তাহা হইলে ক্ষতি কি? এই কালের মধ্যে যে কয়েকটি গর্ভ হয়, তাহার সংখ্যা নিতান্তই অল্প। পূর্বোল্লিখিত Canton প্রদেশের উদাহরণ ধরিলে দেখা যায়, যেমন ৫৯৬ জনের মধ্যে ১৮ জনের অর্থাৎ শতকরা ৩ জনের—এই শতকরা তিনজনের হার জন্ম-শাসন করিলেও হয়ত পাওয়া যাইত।

অস্বাভাবিক জন্মশাসনের প্রয়োজন প্রথম সন্তানের জন্মের পূর্বে এক প্রকার নিষ্প্রয়োজন বলিয়া মনে হয়। প্রকৃতি যে পূর্বেই জন্মশাসন করিয়া রাখিয়াছেন কয়েক বৎসর পূর্বে তাহা কে জানিত?*

*বাঙলাদেশের অনুর্বরকালের গড় কত তাহা নির্ধারণ করিতে হইলে, প্রত্যেক নারীর এই তারিখগুলির প্রয়োজন:—(১) জন্ম-তারিখ, (২) প্রথম ঋতুর তারিখ, (৩) বিবাহের তারিখ, (৪) প্রথম শিশুর জন্ম-তারিখ। পাঠক পাঠিকারা এ বিষয়ে কিছু সাহায্য করিলে ধন্য হইব।—লেখক

সিমলা-সম্মেলনের গতি-প্রকৃতি

নেতৃ-সম্মেলনে যোগদানে কংগ্রেসের সিদ্ধান্ত

গত ২১শে জুন বোম্বাই নগরে কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির সভায় সিমলা নেতৃ-সম্মেলনে কংগ্রেসের পক্ষ হইতে যোগদানের সিদ্ধান্ত করা হয়।

কংগ্রেস প্রেসিডেন্ট মৌলানা আবুল কালাম আজাদ ওয়ার্কিং কমিটির অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন। বিশেষভাবে আমন্ত্রিত হইয়া মহাত্মা গান্ধী এই সভায় যোগদান করেন। পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু, সর্দার বল্লভভাই প্যাটেল, বাবু রাজেন্দ্র প্রসাদ, শ্রীযুক্তা সরোজিনী নাইডু, আচার্য কৃপালনী, ডাঃ পট্টভি সীতারামিয়া, শ্রীযুক্ত শংকররাও দেও, মিঃ আসফ আলী, ডাঃ প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ ও পণ্ডিত গোবিন্দবল্লভ পন্থ সভায় উপস্থিত ছিলেন।

পরবর্তী দিবস ২২শে জুন শুক্রবার কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি আমন্ত্রিত কংগ্রেসী নেতৃবর্গকে ২৫শে জুন সিমলা সম্মেলনে যোগদানের জন্য অনুমতি প্রদান করেন। কংগ্রেস প্রেসিডেন্ট মৌলানা আবুল কালাম আজাদ, যাহাতে তিনি বড়লাটের সহিত তাঁহার ও মহাত্মা গান্ধীর ২৪শে জুন তারিখে আলোচনার ফলে লব্ধ অভিজ্ঞতা সম্পর্কে আরও পরামর্শ লাভ করিতে পারেন, তদুদ্দেশ্যে সম্মেলনে আমন্ত্রিত কংগ্রেসী নেতৃবৃন্দকে ঐ দিবস সিমলায় উপস্থিত হইতে নির্দেশ দান করেন।

কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির প্রথম দিবসের অধিবেশনে কংগ্রেস নেতৃবৃন্দ যে অভিমত প্রদান করেন, তাহা তিন ভাগে বিভক্ত বলিয়া জানা যায়। মহাত্মা গান্ধী ও সর্দার বল্লভভাই প্যাটেল পরিচালিত দল বড়লাটের বেতার বক্তৃতায় উল্লিখিত 'বর্ণ হিন্দু' শব্দের প্রয়োগে তীব্র আপত্তি করেন। দ্বিতীয় দলে পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু ও অপর দুই একজন কংগ্রেস নেতা ওয়াভেল প্রস্তাবে যে পরিমাণ ক্ষমতা ভারতীয়গণের হস্তে অর্পণের জন্য পরিকল্পিত হইয়াছে, তাহাতে সম্পূর্ণরূপে সন্তুষ্ট না হইলেও এইরূপ অভিমত প্রকাশ করেন যে, এই পরিকল্পনা অনুযায়ী কার্য করিলে যদি ভারতের স্বাধীনতার নিমিত্ত জাতীয় দাবী অগ্রসর করিবার ও জনগণের ভাগ্যের উন্নতি বিধানের যথেষ্ট সম্ভাবনা থাকে, তাহা হইলে মধ্যবর্তী ব্যবস্থা হিসাবে এই পরিকল্পনা কার্যে প্রয়োগ করিয়া ভালভাবে পরীক্ষা করিয়া দেখা যাইতে পারে। 'বর্ণহিন্দু' কথাটায় মহাত্মা গান্ধী ও সর্দার বল্লভভাই প্যাটেল প্রভৃতি যতটা আপত্তি করেন, ইঁহারা ততটা আপত্তি করেন না বলিয়া প্রকাশ। ইঁহাদের মতে মহাত্মা গান্ধীর তার-বার্তার উত্তরে বড়লাট সিমলা-সম্মেলনের যে আলোচ্য বিষয় নির্দেশ করিয়াছেন, তদ্দ্বারা কংগ্রেসের পক্ষে সমগ্র পরিষদের জন্য কতকগুলি নাম প্রস্তাব করিবার সম্ভাবনা ব্যাহত হয় নাই। তৃতীয় দলের শ্রীযুক্ত রাজাগোপালাচারী ও শ্রীযুক্ত ভুলাভাই দেশাইয়ের মতে সিমলা সম্মেলনের আলোচ্য বিষয় এত ব্যাপক ও স্থিতিস্থাপক যে, সমস্ত আশংকা ভিত্তিহীন। ইহাতে কোনরূপ ছিদ্র অন্বেষণ না করিয়া কংগ্রেসের পক্ষে ওয়াভেল প্রস্তাব গ্রহণ করা উচিত এবং ইহা ঐকান্তিকভাবে পরীক্ষা করিয়া দেখা ও এই আলোচনায় কংগ্রেসের যোগদানের সিদ্ধান্ত প্রকাশ করা কর্তব্য।

দ্বিতীয় দিন কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির অধিবেশনে শ্রীযুক্ত ভুলাভাই দেশাই "দেশাই-লিয়াকৎ চুক্তি" স্বাক্ষরিত হওয়ার আনুপূর্বিক ঘটনা বিবৃত করেন এবং এতৎসম্পর্কে মহাত্মাজী ও নবাবজাদা লিয়াকৎ আলী খাঁর সহিত তাঁহার যে সমস্ত পত্রালাপ হইয়াছিল সেগুলি কমিটির সমক্ষে উপস্থাপিত করেন। তিনি এই পরিকল্পনার বিভিন্ন ধারার তাৎপর্য ব্যাখ্যা করিয়া বুঝাইয়া দেন। তিনি ওয়ার্কিং কমিটিকে বিশেষ করিয়া মহাত্মা গান্ধীকে বুঝাইয়া দেন যে, ওয়াভেল প্রস্তাবে সমস্ত সম্প্রদায় হইতে প্রতিনিধি মনোনয়নের অধিকার কংগ্রেসের আছে। প্রস্তাবিত শাসন পরিষদে বর্ণহিন্দু ও মুসলমান সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিত্ব সম্পর্কে শ্রীযুক্ত দেশাই বিশেষ জোরের সঙ্গে এইরূপ অভিমত প্রকাশ করেন যে, লর্ড ওয়াভেলের বেতার বক্তৃতায় এতৎসম্পর্কে যে ব্যাখ্যা দেওয়া হইয়াছে, তাহা তাঁহার পরিকল্পনার সংশ্লিষ্ট ধারা অপেক্ষা উৎকৃষ্টতর। তাঁহার মতে, দেশাই-লিয়াকৎ-পরিকল্পনা অপেক্ষা ওয়াভেল প্রস্তাব উন্নততর। কাজেই উহা গ্রহণ করা উচিত।

পূর্ণ আড়াই ঘণ্টাকাল শ্রীযুক্ত দেশাই ওয়াভেল প্রস্তাব বিশ্লেষণ করিয়া যে বক্তৃতা প্রদান করেন, তাহাতে কোন কোন সদস্যের মন হইতে সংশয়ের ভাব দূরীভূত হয় এবং কংগ্রেসের পক্ষে আশাশীলতার ভাব পরিস্ফুট হইয়া উঠে বলিয়া প্রকাশ। এই আশার ভাব লইয়াই কংগ্রেসের নেতৃবৃন্দ সিমলা সম্মেলনে যোগদান করেন।

সম্মেলনের প্রারম্ভে

মোট ২২ জন বিভিন্ন দলের নেতা সিমলা সম্মেলনে যোগদানের জন্য আমন্ত্রিত হন। ইঁহাদের মধ্যে মহাত্মা গান্ধী সম্মেলনে যোগদান না করিবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। তিনি কংগ্রেস ও বড়লাটের পরামর্শদাতারূপে সিমলায় উপস্থিত থাকা স্থির করেন এবং এতদুদ্দেশ্যে তিনি তথায় উপস্থিত আছেন। কংগ্রেসের পক্ষ হইতে প্রেসিডেন্ট মৌলানা আবুল কালাম আজাদ, মুসলিম লীগের পক্ষ হইতে মিঃ জিন্না, কেন্দ্রীয় ব্যবস্থা পরিষদের পক্ষ হইতে কংগ্রেসী দলের নেতা শ্রীযুক্ত ভুলাভাই দেশাই, মুসলিম লীগ দলের ডেপুটি লীডার নবাবজাদা লিয়াকৎ আলী খাঁ, জাতীয় দলের নেতা ডাঃ প্রমথনাথ ব্যানার্জি, ইউরোপীয় দলের নেতা স্যার হেনরি রিচার্ডসন, কেন্দ্রীয় রাষ্ট্রীয় পরিষদের পক্ষ হইতে কংগ্রেসী দলের নেতা শ্রীযুক্ত জি এস মতিলাল, মুসলিম লীগ দলের নেতা মিঃ হোসেন ইমাম, বর্তমান ৯৩ ধারার আমলে শাসিত প্রদেশগুলির সর্বশেষ প্রধান মন্ত্রী হিসাবে বোম্বাইয়ের শ্রীযুক্ত বি জি খের, মাদ্রাজের শ্রীযুক্ত রাজাগোপালাচারী, যুক্তপ্রদেশের পণ্ডিত গোবিন্দবল্লভ পন্থ, মধ্যপ্রদেশের শ্রীযুক্ত রবিশংকর শুক্ল, বিহারের শ্রীযুক্ত শ্রীকৃষ্ণ সিংহ, উড়িষ্যার পার্লাকিমেদীর মহারাজা, বাঙলা দেশের খাজা স্যার নাজিমুদ্দিন, বর্তমান মন্ত্রিত্বের শাসনাধীন প্রদেশগুলির প্রধান মন্ত্রী হিসাবে আসামের স্যার মহম্মদ সাদুল্লা, পাঞ্জাবের মালিক খিজির হায়াৎ খাঁ, সিন্ধুর স্যার গোলাম হোসেন হিদায়েতুল্লা, উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের ডাঃ খাঁ সাহেব, অন্যান্য সংখ্যালঘিষ্ঠ সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিরূপে শিখ সম্প্রদায়ের মাস্টার তারা সিং ও তপশীলী সম্প্রদায়ের রাও বাহাদুর শিবরাজ নিমন্ত্রিত হইয়া সিমলা সম্মেলনে যোগদান করেন।

বড়লাট ভবনের যে কক্ষটিতে নেতৃ-সম্মেলনের অধিবেশন আরম্ভ হইয়াছে, তাহা পূর্বে গ্রন্থাগাররূপে ব্যবহৃত হইত। পরে উহা বড়লাট ভবনের এলাকাস্থিত সৈন্য শিবিরের সৈনিকগণের ভোজন কক্ষরূপে পরিণত করা হয়। এই কক্ষটিকেই তাড়াতাড়ি সম্মেলনের উপযোগী করিয়া তোলা হইয়াছে। লাল কার্পেট আস্তৃত

আয়তাকার কক্ষে সাদাসিধা ধরণের একটি কাঠের দীর্ঘ টেবিল ও তাহার চারি পাশে ২২ খানি আসন পাতা। টেবিলের এক ধারে মধ্য স্থানে বড়লাটের আসন নির্দিষ্ট। কংগ্রেসী দলকে বাম পার্শ্বে ও লীগ দলকে দক্ষিণ পার্শ্বে করিয়া বড়লাট সম্মেলনে সমাসীন হন। বড়লাটের ঠিক বাম পার্শ্বের আসনে কংগ্রেস প্রেসিডেণ্ট মৌলানা আবুল কালাম আজাদ, তাঁহার পরবর্তী আসনগুলিতে পণ্ডিত গোবিন্দবল্লভ পন্থ, শ্রীযুক্ত ভুলাভাই দেশাই ও অন্যান্য কংগ্রেসী নেতৃগণের স্থান নির্দিষ্ট। বড়লাটের দক্ষিণ ভাগে প্রথমে মিঃ জিন্না, তারপর যথাক্রমে নবাবজাদা লিয়াকৎ আলি খাঁ, মিঃ হোসেন ইমাম ও অন্য মুসলিম লীগ প্রতিনিধিগণ।

কেন্দ্রীয় পরিষদের ইউরোপীয় দলের নেতা হেনরি রিচার্ডসনের আসন বড়লাটের বিপরীত দিকে অর্থাৎ সম্মুখ ভাগে এবং শ্রীযুক্ত রাজাগোপালাচারীর ও স্যার গোলাম হোসেন হেদায়েতুল্লার আসন টেবিলের দুই প্রান্তে নির্দিষ্ট হয়।

সম্মেলনের পূর্ব দিবস, ২৪শে জুন শুক্রবার পূর্ব পরিকল্পনা অনুসারে বড়লাটের সহিত প্রথমে কংগ্রেস প্রেসিডেণ্ট মৌলানা আবুল কালাম আজাদ, তৎপর মহাত্মা গান্ধী, অনন্তর মিঃ জিন্না সাক্ষাৎ করেন এবং তাঁহাদের ভিতর প্রারম্ভিক আলোচনা হয়। মহাত্মা গান্ধী কংগ্রেসের প্রতিনিধি নহেন এবং কংগ্রেস প্রেসিডেণ্ট মৌলানা আজাদ সম্মেলনে যোগদান করিতেছেন বলিয়া নিয়মতান্ত্রিকতার দিক হইতে সম্মেলনে যোগদান না করিবার সিদ্ধান্ত বড়লাটকে জানান। তবে তিনি সিমলায় উপস্থিত থাকিয়া বড়লাট প্রমুখ সকল পক্ষকেই আবশ্যক উপদেশ দান করিবেন বলিয়া বড়লাটকে জ্ঞাপন করেন। বড়লাটও মহাত্মা গান্ধীর এই অভিপ্রায় অনুমোদন করেন এবং সম্মেলন শেষ না হওয়া পর্যন্ত সিমলায়ই অবস্থান করিতে তাঁহাকে পত্রযোগে অনুরোধ করেন।

সম্মেলনের প্রারম্ভে বড়লাটের সহিত সাক্ষাতের পর প্রধান প্রধান দলের নেতৃগণের মধ্যে আলোচনা শুরু হয় এবং বিশেষ কর্মতৎপরতা পরিলক্ষিত হয়।

সম্মেলনের কার্যারম্ভ

সম্মেলনের উদ্বোধন করিয়া বড়লাট লর্ড ওয়াভেল বলেন যে, বর্তমান পরিকল্পনা ভারতের প্রকৃত সমস্যা সমাধানের অর্থাৎ স্বাধীনতা লাভের সহায়ক মাত্র। বোম্বাই নগরে কোন সাংবাদিকের প্রশ্নের উত্তরেও পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু বলেন যে, ওয়াভেল প্রস্তাব সাময়িক ব্যবস্থা মাত্র। লর্ড ওয়াভেল সমবেত নেতৃবৃন্দকে স্বাগত সম্ভাষণ জানাইয়া বলেনঃ—

"এই সম্মেলন আরম্ভ করিবার পূর্বে আমি আপনাদিগকে দুই একটি কথা বলিব। এই সম্মেলনের ফলাফল ভারতের ভাগ্যের উপর প্রভূত প্রভাব বিস্তার করিবে। প্রথমত আমি আপনাদের সকলকে অভ্যর্থনা করিতেছি। আপনারা স্বীয় যোগ্যতা ও চরিত্র বলে নিজ নিজ প্রদেশ ও দলের নেতৃত্ব লাভ করিতে সমর্থ হইয়াছেন। ভারতীয় ইতিহাসের এই সংকটময় মুহূর্তে আমি আপনাদিগকে আহ্বান করিয়াছি। কি করিয়া ভারত সমৃদ্ধি, রাজনীতিক স্বাধীনতা ও মহত্ত্বের পথে অগ্রসর হইতে পারে, সে বিষয়ে আমাকে উপদেশ দানের নিমিত্ত আপনাদের সহযোগিতা প্রার্থনা করিতেছি। ব্যাপক সহযোগিতার মনোভাব লইয়া আপনারা এই সাহায্য করিতে পারেন। ইহা শাসনতান্ত্রিক মীমাংসা নহে। যে প্রস্তাব করা হইয়াছে, তাহা দ্বারা ভারতের জটিল সমস্যার চূড়ান্ত সমাধান করা যাইবে না। এই পরিকল্পনা কোন প্রকারেই চূড়ান্ত শাসনতান্ত্রিক মীমাংসার পথে বাধার সৃষ্টি করিতেছে না বা করিবে না। কিন্তু যদি ইহা সাফল্যমণ্ডিত হয়, তাহা হইলে তাহা ভবিষ্যৎ মীমাংসার পথ সুগম করিবে এবং তাহাতে সাফল্যের আশা নিকটবর্তী হইবে।

এখানে উপস্থিত সকলের রাজনীতিজ্ঞান, বিচক্ষণতা ও সদিচ্ছার পরীক্ষা শুধু ভারতবাসীর নিকটই দিতে হইবে না, বিশ্ববাসীর নিকটও তাহা দিতে হইবে। আমার বেতার বক্তৃতায় আমি বলিয়াছিলাম যে, সব পক্ষকেই কোন কোন ব্যাপার ভুলিয়া যাইতে ও ক্ষমা করিতে হইবে। আমাদিগকে পুরাতন সংস্কার ও বৈরতা, দলগত ও সম্প্রদায়গত সুবিধার কথা পরিহার করিয়া ভারতের মঙ্গলামঙ্গল, ৪০ কোটি নরনারীর কল্যাণের কথা ভাবিতে হইবে। বর্তমানে ও ভবিষ্যতে ভারতের অগ্রগতির নিমিত্ত কি করিয়া নূতন প্রস্তাবসমূহ কার্যকরী করিয়া তোলা যায়, তাহাও আমাদের দেখিতে হইবে। ইহা অনায়াসসাধ্য নহে; আমাদের আলোচনা উচ্চ স্তরের না হইলে আমরা সাফল্য লাভ করিতে পারিব না।

বর্তমানের জন্য আপনাদিগকে আমার নেতৃত্ব স্বীকার করিয়া লইতে হইবে। যে পর্যন্ত শাসন যন্ত্রের সর্বজন স্বীকৃত পরিবর্তন সাধিত না হইবে, সে পর্যন্ত ভারতের শাসন-ব্যবস্থা ও নিরাপত্তার জন্য আমি ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের নিকট দায়ী থাকিব। ভারতের অকৃত্রিম হিতৈষী হিসাবে আমার উপর আপনারা বিশ্বাস ন্যস্ত করিতে পারেন। এই দেশের সর্বোত্তম স্বার্থ বলিয়া আমি যাহা মনে করিব, তেমনভাবেই আমি এই সম্মেলনের আলোচনায় সাহায্য করিতে চেষ্টা করিব। বড়লাটের বাসভবনের সম্মুখস্থ সৌধে নিম্নোক্ত কথাগুলি খোদিত আছেঃ— 'চিন্তায় বিশ্বাস, কথায় বুদ্ধিমত্তা, কাজে সাহস, জীবনে সেবার দ্বারাই ভারত মহীয়ান হইয়া উঠিবে।'

আমাদের সম্মেলন পরিচালনার পক্ষে এই কথাগুলি পথ নির্দেশক হইবে।"



তপশীলী নেতা রাও বাহাদুর শিবরাজ।



কেন্দ্রীয় পরিষদের ইউরোপীয় দলের নেতা মিঃ হেনরি রিচার্ডসন।



সিন্ধুর প্রধানমন্ত্রী স্যার গোলাম হিদায়েতুল্লা।

সম্মেলনের দ্বিতীয় দিনে প্রস্তাবিত শাসন পরিষদে সদস্য নির্বাচন সমস্যা লইয়া জিন্না-পন্থ আলোচনা আরম্ভ হয়। কিন্তু এই আলোচনায় মিঃ জিন্নার অনমনীয় মনোভাবের জন্য বিশেষ কোন ফলোদয় হয় না; সম্মেলনের তৃতীয় দিনেই অচল অবস্থার সূচনা পরিলক্ষিত হয়। এই দিন দ্বিপ্রহরেই সম্মেলনের অধিবেশন স্থগিত হইয়া যায় এবং কংগ্রেস-লীগ মীমাংসার জন্য শুক্রবার পর্যন্ত অধিবেশন স্থগিত রাখা হয়।

শুক্রবারেও মীমাংসা সম্পর্কে আশার আলোক দেখা না যাওয়ায়, সম্মেলন ১৪ দিনের জন্য স্থগিত রাখা হয়। এই সময়ের মধ্যে কংগ্রেস ও মুসলিম লীগ, সদস্য মনোনয়ন সম্পর্কে সিদ্ধান্তের জন্য সিমলায় স্ব স্ব ওয়ার্কিং কমিটির অধিবেশন আহ্বান করিবেন।

প্রস্তাবিত শাসন পরিষদে মুসলমান সদস্য মনোনয়ন সম্পর্কে মত-পার্থক্যের জন্যই গুরুতর পরিস্থিতির উদ্ভব হয়।

মিঃ জিন্না প্রস্তাবিত শাসন পরিষদে লীগ দল হইতেই পাঁচজন সদস্য মনোনয়নের দাবী করেন। এরূপ ক্ষেত্রে কংগ্রেসকে কেবল পাঁচজন বর্ণহিন্দু সদস্য মনোনয়ন করিতে হইলে কংগ্রেসকে একটা সাম্প্রদায়িক প্রতিষ্ঠানে পরিণত হইতে হয়। কংগ্রেসের নীতি ও লক্ষ্য, জাতীয়তা ও গণতন্ত্রের দিক হইতে এরূপ সাম্প্রদায়িক দৃষ্টিভঙ্গী কংগ্রেসের পক্ষে কখনও গ্রহণীয় হইতে পারে না। প্রকাশ, এরূপ ক্ষেত্রে প্রস্তাবিত শাসন পরিষদের পাঁচজন মুসলমান সদস্যের মধ্যে কংগ্রেস হইতে দুইজন অথবা অন্ততঃ পক্ষে একজন মুসলমান সদস্য নির্বাচন করিতে বলা হয়। কিন্তু মিঃ জিন্না শাসন পরিষদের লীগ বহির্ভূত মুসলমান সদস্য লইবার প্রশ্নে সম্মতির সর্ত হিসাবে প্রদেশসমূহে অধিক সংখ্যায় লীগ সদস্য এবং শাসন পরিষদে লীগ বহির্ভূত সদস্যকেও মুসলিম লীগের প্রতি সহানুভূতিসম্পন্ন হইতে হইবে বলিয়া দাবী করেন, এইরূপে জানা গিয়াছে।

লীগ ও কংগ্রেসের আপোষ-রফার জন্য প্রস্তাবিত শাসন পরিষদকে সম্প্রসারিত করিয়া উহার সদস্য সংখ্যা ১৮ জন করিবার প্রস্তাবও নাকি করা হইয়াছে। এই প্রস্তাবিত সম্প্রসারিত শাসন পরিষদে ৭ জন মুসলমান, ৬ জন বর্ণহিন্দু, ১ জন খৃষ্টান, একজন শিখ, একজন তপশীল শ্রেণীভুক্ত হিন্দু থাকিবেন। ইহা ছাড়া বড়লাট ও প্রধান সেনাপতি ত থাকিবেনই। ৭ জন মুসলমান সদস্যের মধ্যে ৫ জন লীগ দল হইতে, একজন কংগ্রেস হইতে ও একজন পাঞ্জাবের ইউনিয়নিস্ট দল হইতে মনোনীত হইবেন। ছয়জন বর্ণহিন্দু সদস্যের মধ্যে একজন বর্ণহিন্দু সদস্য হিন্দু মহাসভা হইতে গৃহীত হইবেন।

কিন্তু এই প্রস্তাব একটা জল্পনা বলিয়াই মনে হয়। এই প্রস্তাবে সম্মতি-দানে বড়লাটের পক্ষে বাধা উপস্থিত হইতে পারে বলিয়া মনে হয়। হোয়াইট পেপারে ও বড়লাটের বেতার বক্তৃতায় পরিষ্কাররূপে বলা হইয়াছে যে, প্রস্তাবিত শাসন-পরিষদে বর্ণহিন্দু ও মুসলমান সদস্য সংখ্যা যাহাতে সমসংখ্যক হয়, সেদিকে লক্ষ্য রাখিতে হইবে। এই প্রস্তাবে মুসলমান সদস্য ৭ জন ও বর্ণহিন্দু সদস্য ৬ জন করিতে বলা হইয়াছে। মুসলমান ও বর্ণহিন্দুর সদস্য সংখ্যার এই অসমতা ওয়াভেল প্রস্তাবের নীতি-বিরোধী।

কিন্তু বর্ণহিন্দু ও মুসলমান সদস্য সংখ্যার সমতার তাৎপর্য সম্বন্ধে মহাত্মা গান্ধী এসোসিয়েটেড প্রেসের বিশেষ সংবাদদাতার কাছে যাহা বলিয়াছেন, তাহা হইতে এই বাধা এরূপ ক্ষেত্রে উপস্থিত নাও হইতে পারে। তিনি বলিয়াছেন—"কংগ্রেসীগণ যদি ঐ প্রতিনিধি-সংখ্যাসমতার প্রস্তাব অনুমোদন করিয়াই থাকেন, তবে আপনি যেরূপ বলিতেছেন, সেভাবে তাঁহারা তাহা করেন নাই। আমি বড়লাটের ঘোষণার এই রূপে ব্যাখ্যা করি যে, জাতীয় শাসন পরিষদে ঐ দুই সম্প্রদায়ের কোন সম্প্রদায় অপর সম্প্রদায় অপেক্ষা অধিক প্রতিনিধির কথা বলিতে পারিবেন না। কাজেই তপশীলী সম্প্রদায় ব্যতীত অন্য হিন্দুদের প্রতিনিধির সংখ্যা, (অর্থাৎ বর্ণহিন্দুর সংখ্যা) ইচ্ছা করিলে মুসলমান প্রতিনিধির কম হইতে পারিবে, কিন্তু বেশী হইতে পারিবে না।"

মিঃ জিন্নার অনমনীয় মনোভাব কংগ্রেস-লীগ আপোষের ব্যর্থতার কারণ

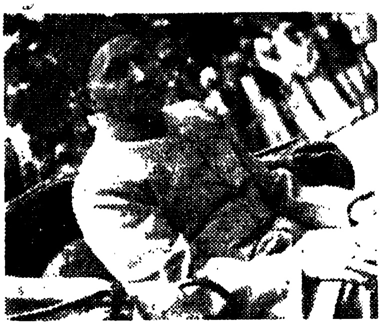
অনেকে মনে করিয়াছিলেন, মিঃ জিন্না মুসলিম লীগের পক্ষ হইতে কংগ্রেসের সঙ্গে আপোষ রফা সম্পর্কে আলোচনায় ইতঃপূর্বে যেরূপ অনমনীয় মনোভাবের পরিচয় প্রদান করিয়াছেন, সিমলা সম্মেলনে হয়ত তাহার সম্পূর্ণ না হইলেও কিছুটা পরিবর্তন করিবেন।

বড়লাট ওয়াভেলও তাঁহার উদ্বোধনী বক্তৃতায় পুরাতন সংস্কার, বৈরতা, দলগত ও সম্প্রদায়গত সুবিধার কথা পরিহার করিয়া ভারতের মঙ্গলামঙ্গল ও ৪০ কোটি নরনারীর কল্যাণের কথা ভাবিতে বলিয়াছেন। কিন্তু তাঁহার সে অনুরোধ মিঃ জিন্নার কাছে ব্যর্থ হইয়াছে। মিঃ জিন্নার সংকীর্ণ দৃষ্টিভঙ্গী কিছুতেই তাঁহাকে সম্প্রদায়গত সুবিধাবাদের কথা ভুলিতে দিতেছে না।

কংগ্রেসের সঙ্গে মুসলিম লীগের এই মতসংঘাতের কারণ উভয় প্রতিষ্ঠানের দৃষ্টিভঙ্গীর মধ্যেই নিহিত। কংগ্রেস ভারতের সর্ব ধর্ম, সর্বশ্রেণী ও সর্ব জাতির জনগণের প্রতিষ্ঠান। কংগ্রেস ভারতের জনগণের স্বাধীনতার আশা-আকাঙ্ক্ষার মূর্ত প্রতীক। সুদূরবিসারী উদার ভিত্তি ভূমির উপর কংগ্রেসের মূলনীতি প্রতিষ্ঠিত। কংগ্রেস কোন সাম্প্রদায়িক বা ধর্মগত প্রতিষ্ঠান নহে, ইহা ভারতের জাতীয় প্রতিষ্ঠান।



শিখ নেতা মাস্টার তারা সিং।

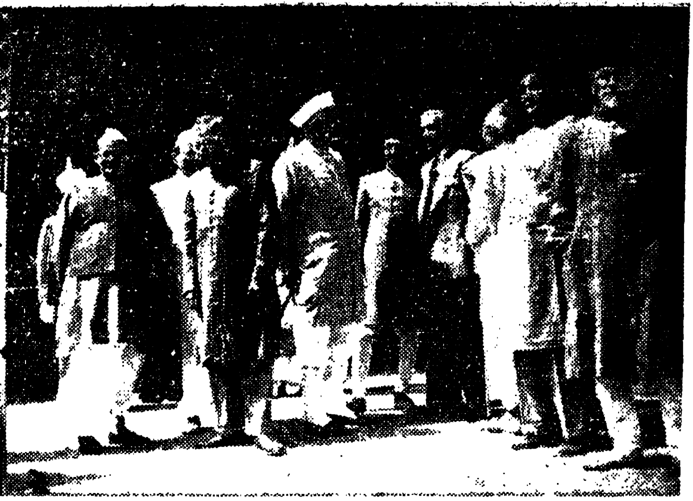


আসামের প্রধানমন্ত্রী স্যার মহম্মদ সাদুল্লা।



মুসলিম লীগের নেতা মিঃ জিন্না।





উপরে:—(১) মহাত্মা গান্ধী বড়লাটের সহিত সাক্ষাৎ করিতে যাইতেছেন; (২) সম্মেলনের প্রাক্কালে বড়লাটের প্রতীক্ষায় নেতৃবৃন্দ। নীচে:—(৩) সম্মেলন আরম্ভের পূর্বে আলাপরত রাষ্ট্রপতি ও পাঞ্জাবের প্রধানমন্ত্রী; (৪) মিঃ জিন্না, মাষ্টার তারা সিং ও মালিক খিজির হায়াৎ খাঁ আলাপ করিতেছেন। দক্ষিণ পার্শ্বে :—কংগ্রেস সভাপতি ও বড়লাটের প্রাইভেট সেক্রেটারী; (৫) কংগ্রেস নেতৃবৃন্দ; (৬) বড়লাট-ভবনের পথে সরকারী রিক্সায় রাষ্ট্রপতি।



৩

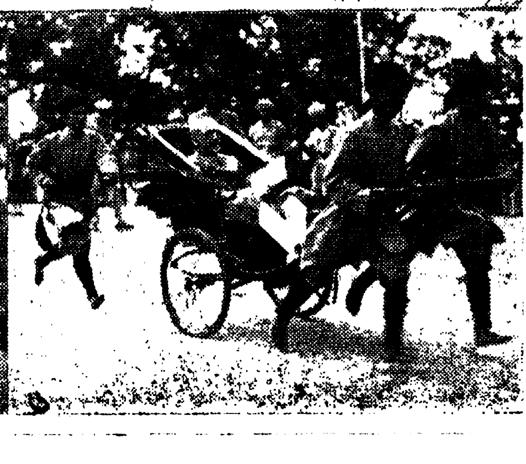


৪

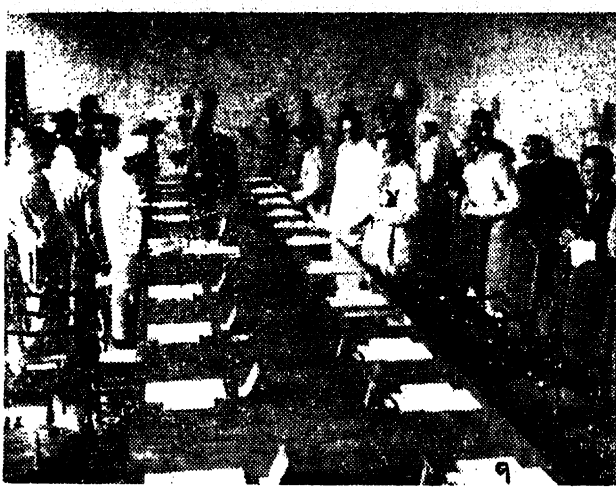




৫



৬





উপরে :—(৭) নেতৃ-সম্মেলনের অধিবেশন-কক্ষ—বিশেষ সংবাদদাতৃগণ প্রতিনিধিগণের নির্দিষ্ট আসন দেখিতেছেন; (৮) লর্ড ওয়াভেল কংগ্রেস-সভাপতি মৌলানা আজাদের সহিত করমর্দন করিতেছেন। নীচে :—(৯) গান্ধীজীর দর্শন-প্রতীক্ষায় বড়লাট-ভবনের ফটকের ভিতর নারী ও শিশুগণ; (১০) লর্ড ওয়াভেল সংবাদদাতৃগণের সহিত কথা বলিতেছেন; (১১) অটোগ্রাফের খাতায় স্বাক্ষররত ডাঃ খাঁ সাহেব।





পক্ষান্তরে মুসলিম লীগ মুসলমান দল বিশেষের প্রতিষ্ঠান। সমগ্র মুসলমান জন-সমাজের সমর্থনও ইহার পশ্চাতে নাই। অহ্‌রার, জমিয়ত উলেমা, মোমিন, মুসলিম-মজলিস, জাতীয়তাবাদী প্রভৃতি মুসলমান দল ও উপদল মুসলিম লীগের বিরোধী। পরন্তু অগণিত মুসলমান কংগ্রেসের সমর্থক, জাতীয় আন্দোলনের উৎসাহী কর্মী এবং দেশের স্বাধীনতা সংগ্রামে অশেষ নির্যাতন সহ্য করিয়াছেন। সাম্প্রদায়িক দল-বিশেষের বলিয়া কংগ্রেসের উদার মতবাদের ভিত্তিতে আসিয়া মিঃ জিন্নার পক্ষে দণ্ডায়মান হওয়া কখনও সম্ভবপর নহে।

সিমলা সম্মেলনে মিঃ জিন্নার আচরণ হইতে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয়, আপোষ-রফা করিতে হইলে যেরূপ ত্যাগ স্বীকারের মনোভাব লইয়া অগ্রসর হইতে হয়, তিনি সেরূপ উদার মনোভাব ও স্বচ্ছ দৃষ্টিভঙ্গী লইয়া সম্মেলনে যোগদান করেন নাই। পাকিস্থানী মতবাদ ও আদর্শ হইতে তিনি এক চুলও বিচ্যুত হইবেন না। সর্বদাই তাঁহার আশঙ্কা, প্রস্তাবিত শাসন-পরিষদে বুঝি মুসলমানগরিষ্ঠতা (লীগ দলীয় অথবা লীগের মতবাদ স্বীকার করিয়া লইবেন, এমন মুসলমানের) ক্ষুণ্ণ হইয়া যাইবে। শিখ, তপশীলী, অন্যান্য সম্প্রদায় সকলেই কংগ্রেসের প্রতি সহানুভূতিসম্পন্ন। ইঁহারা সকলে বর্ণহিন্দু সদস্যগণের সহিত (তাঁহার মতে তথা কংগ্রেসীগণের সহিত) জোট পাকাইয়া বুঝি লীগ দলকে কোণ-ঠাসা করিয়া দিবে। এই সংশয়, অবিশ্বাস ও স্বার্থপরতাদুষ্ট নীতি সর্বদাই তাঁহাকে উদ্বাস্ত করিয়া তুলিতেছে। কেবল বর্ণহিন্দু নয়, ভারতের কোন সম্প্রদায় বা দলের উপর তাঁহার আস্থা নাই।

এই সংশয় ও অবিশ্বাসের কুজ্ঝটিকাচ্ছন্ন মন লইয়াই তিনি সম্মেলন আরম্ভের পূর্ব দিন (২৪শে জুন) বড়লাটের সহিত সাক্ষাৎকালে সংখ্যালঘিষ্ঠ দলগুলিকে প্রস্তাবিত শাসন-পরিষদে কিরূপ সুযোগ-সুবিধা দেওয়া হইবে, তাহা বড়লাটের নিকট হইতে জানিতে চাহেন। প্রকাশ, তিনি বড়লাটকে জানান—

"দশ বৎসর সংগ্রাম করিয়া লীগ দল যাহা পাইতে চলিয়াছে, পরিকল্পিত শাসন-পরিষদে অন্যান্য সংখ্যালঘিষ্ঠ দলকে অসঙ্গত সুবিধা দিয়া তাহা বিনষ্ট না করা হয়, লীগ সে বিষয়ে বিশেষভাবেই সতর্ক রহিয়াছে।"

যদি অন্যান্য সংখ্যালঘিষ্ঠ দলকে অসঙ্গত সুযোগ-সুবিধা দেওয়া হয়, এই জন্য তিনি সর্বদাই উদ্বিগ্ন। কিন্তু ভারতের জন-সংখ্যার এক-তৃতীয়াংশ হইয়াও মুসলমান-গণের জন্য তাঁহার 'সুযোগ-সুবিধা' লাভের চেষ্টা 'অসঙ্গত' নহে।

এসোসিয়েটেড প্রেসের সংবাদে প্রকাশ, মিঃ জিন্না বড়লাটকে ঐদিন আরও জানান—"লীগের আশঙ্কা এই যে, হিন্দু ও মুসলমান প্রতিনিধিবর্গকে সমপ্রতিনিধিত্ব দানের যে কথা লর্ড ওয়াভেলের বেতার-বক্তৃতায় ছিল, অন্যান্য স্বার্থসংশ্লিষ্ট দলকে তাঁহাদের সংখ্যানুপাতিক প্রাপ্য সুবিধা অপেক্ষা বেশী সুবিধা দিয়া তাহা অতি সহজেই নষ্ট করিয়া ফেলা যাইতে পারে। শাসন-পরিষদের প্রত্যেকটি মুসলমান সদস্য নির্বাচনের অবিসংবাদিত অধিকার যে মুসলিম লীগের রহিয়াছে, বড়লাটকে তাহাও জানান হইয়াছে। এ অধিকার ত্যাগ করিলে বা উহা হ্রাস হইতে দিলে মুসলমানদের একমাত্র প্রতিষ্ঠান বলিয়া লীগের যে দাবী রহিয়াছে, তাহাও ত্যাগ করা হয়।"

পরিকল্পিত শাসন-পরিষদে মুসলমান দলের (তথা লীগ দলের) সংখ্যাগরিষ্ঠতা-লাভের দুর্ভাবনায় মিঃ জিন্নার দৃষ্টি এত অস্বচ্ছ যে, তিনি নিতান্ত সুবিধাবাদীর মতই "স্বার্থসংশ্লিষ্ট" দলের 'সংখ্যানুপাতিক প্রাপ্য সুবিধা' ছাড়া যদি তাহা অপেক্ষা তাঁহারা অধিকতর সুবিধা পান, এই উৎকণ্ঠায় তিনি কাতর হইয়া পড়িয়াছেন। পুনঃ পুনঃ ভারতের অন্যান্য নানা মুসলমান দল, যাঁহাদের মোট সংখ্যা লীগ সমর্থক দলের অপেক্ষা বেশী ছাড়া কম নয়, মিঃ জিন্নার নেতৃত্ব অস্বীকার করিয়া প্রতিবাদ করিলেও তিনি মুসলিম লীগকে ভারতের 'একমাত্র মুসলমান প্রতিষ্ঠান' বলিয়া দাবী করিতে দ্বিধা বোধ করেন নাই।

ভারতের স্বাধীনতার পথে হিন্দু-মুসলমানের সাম্প্রদায়িক সমস্যা যে মস্ত বড় বাধা, তাহা বিশ্ববাসীর সমক্ষে প্রচার করিবার উদ্দেশ্যে যাঁহারা এযাবৎকাল মিঃ জিন্নাকে মুসলিম ভারতের একমাত্র নেতা ও মুসলিম লীগকে ভারতের একমাত্র মুসলমান প্রতিষ্ঠান বলিয়া স্বীকার ও ঘোষণা করিয়াছেন, তাঁহাদের অকুণ্ঠ প্রশ্রয়েই, বহু মুসলমান দল কর্তৃক মিঃ জিন্নার নেতৃত্ব অস্বীকৃত হইলেও, তাঁহার স্বয়ংবৃত নেতৃত্বের মোহ কাটিতেছে না এবং মুসলিম লীগকে 'একমাত্র মুসলমান প্রতিষ্ঠান' বলিয়া দাবী করিতে দ্বিধাবোধ হইতেছে না! সিমলা সম্মেলনে এই অচল অবস্থার মূলে যে মিঃ জিন্নার অনমনীয় মনোভাব রহিয়াছে, তাহার কারণও এই চিরপোষিত ভেদনীতির প্রশ্রয়!

বড়লাট কংগ্রেস ও মুসলিম লীগ প্রত্যেক প্রতিষ্ঠানের নিকট আটটি হইতে বারটি সদস্যের নাম ও অন্যান্য সংখ্যালঘিষ্ঠ প্রত্যেক সম্প্রদায়ের নিকট হইতে তিনটি হইতে চারিটি সদস্যের নামের তালিকা চাহিয়াছেন। এই সমস্ত নামের তালিকা হইতে বড়লাট নির্দিষ্ট সাম্প্রদায়িক সদস্য-সংখ্যার দিকে দৃষ্টি রাখিয়া পরিকল্পিত শাসন-পরিষদের সদস্যগণের নাম মনোনয়ন করিবেন। সদস্য-মনোনয়নের ক্ষমতা তিনি নিজের হাতে রাখিয়াছেন। অবশ্য চূড়ান্ত মনোনয়ন সম্পর্কে তিনি প্রত্যেক সম্প্রদায়ের ও প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিগণের মতামত যাচাই করিবেন।

সম্মেলনের উদ্বোধনী বক্তৃতায় বড়লাট বলিয়াছেন—'ভারতের অকৃত্রিম হিতৈষী হিসাবে আমার উপরে আপনারা বিশ্বাস ন্যস্ত করিতে পারেন।' কিন্তু ব্যাপার দেখিয়া মনে হয়, মিঃ জিন্না বড়লাটের উপরও সম্পূর্ণ নির্ভর করিতে পারিতেছেন না। এই জন্যই তিনি 'অন্যান্য স্বার্থসংশ্লিষ্ট দলের' সুযোগ-সুবিধা জানিতে এবং তিনি যে মুসলিম লীগের পাঁচজন সদস্যের নামের তালিকা প্রদান করিবেন, তাহাই যাহাতে বড়লাট স্বীকার করিয়া লন, পূর্বাহ্নে তাহার ব্যবস্থা করিতে এত ব্যস্ত ও আগ্রহান্বিত। সদস্য মনোনয়ন ব্যাপারে বড়লাট তাঁহার (মিঃ জিন্নার) চূড়ান্ত ক্ষমতা মানিয়া লইতে স্বীকৃত হন নাই।

এজন্য এবং মহাত্মা গান্ধী কেবল কংগ্রেসের নয় বড়লাটের, তথা সমগ্র বৃটিশ জাতির পরামর্শদাতারূপে সিমলায় অবস্থান করিতেছেন, এই ব্যাপারে মিঃ জিন্না বিচলিত হইয়া পড়িয়াছেন। তাঁহার আরও বিচলিত হওয়ার কারণ এই যে, প্রকাশ, এইরূপ সম্ভাবনাও দেখা দিয়াছে, শেষ পর্যন্ত তিনি রাজি না হইলে মুসলিম লীগ দলকে বাদ দিয়াই শাসন-পরিষদ গঠিত হইতে পারে। এজন্য তিনি এক নূতন চাল চালিয়াছেন। কিন্তু এই ভাঁওতায় মহাত্মা গান্ধীর মত অদ্বিতীয় ব্যক্তিত্বসম্পন্ন ব্যক্তি কেন, অতি সাধারণ বিচারবুদ্ধিসম্পন্ন লোকও যে ভুলিতে পারে না, তাহা তিনি ভাবিয়া দেখেন নাই।

গত ৩০শে জুন এসোসিয়েটেড প্রেস অব আমেরিকার বিশেষ সংবাদদাতা প্রেস্টন গ্রোভারের নিকট মহাত্মা গান্ধীর উদ্দেশ্যে এক প্রস্তাবের কথা তিনি উত্থাপন করেন। এই প্রস্তাবের দ্বারা গত বৎসরের শরৎ-কালের গান্ধী-জিন্না আলোচনারই পুনরারম্ভের আমন্ত্রণ করা হয়। মিঃ জিন্না এই সংবাদদাতার নিকট যাহা বলিয়াছেন, তাহার সংক্ষিপ্ত মর্ম এই যে, মহাত্মা গান্ধী ভারতের জনগণের স্বাধীনতা চাহেন; মিঃ জিন্নাও বুঝাইয়া দিয়াছেন যে, দেশের জন-গণের স্বাধীনতা ব্যতিরেকে পাকিস্থান প্রতিষ্ঠা অসম্ভব। সুতরাং মহাত্মা গান্ধী যদি পাকিস্থানের দাবী মানিয়া লন, তবে সমস্ত গোলমাল চুকিয়া যায়। মহাত্মাজী যদি এই সর্তে লীগের সঙ্গে চুক্তিবদ্ধ হন, তাহা হইলে এই সম্মেলনের আর দরকার নাই, তাঁহারাই আর এক বৃহত্তর সম্মেলনে মিলিত হইবেন এবং মুসলিম লীগ ও ভারতের

অন্যান্য জনগণ ভারতের স্বাধীনতার জন্য একযোগে কাজ করিতে পারিবেন।

ইতিপূর্বেও কংগ্রেস ও মুসলিম লীগের মধ্যে একটা আপোষ-রফা করিয়া ভারতের স্বাধীনতার জন্য যুক্ত দাবী উপস্থাপিত করিবার চেষ্টা হইয়াছে। মহাত্মা গান্ধীই এ সম্পর্কে উদ্যোগী হইয়াছেন। এবারেও পরিকল্পিত শাসন-পরিষদে সম্মিলিতভাবে নির্বাচনপূর্বক সদস্যগণের নামের তালিকা পেশ করিবার চেষ্টা হইয়াছে। কিন্তু মিঃ জিন্না কোনবারেই ইহাতে কিছুতেই সম্মত হন নাই। এবারও তিনি মনে করিয়াছিলেন, তিনি এতদিন ব্রিটিশ আমলাতন্ত্রের নিকট হইতে যে প্রশ্রয় পাইয়া আসিয়াছেন, লর্ড ওয়াভেলও সেই ভেদ-নীতির সংকীর্ণ পথে চলিয়াই তাঁহার ধনুক-ভাঙ্গা পণই মানিয়া লইবেন। কিন্তু এবার তাহার ব্যত্যয়ের সম্ভাবনা দেখা দিয়াছে। সেই জন্য নিজের মুখরক্ষার উদ্দেশ্যে সিমলা সম্মেলন বর্জন করিয়া পাকিস্থানের দাবী অক্ষুণ্ণ রাখিয়া ভারতের স্বাধীনতার জন্য সম্মিলিতভাবে চেষ্টা করার প্রস্তাব এসোসিয়েটেড প্রেস অব আমেরিকার সংবাদদাতার মারফৎ তিনি গান্ধীজীর নিকট উত্থাপন করিয়াছেন। ইহা যে সম্মেলনে কংগ্রেসের কাজে ব্যাঘাত জন্মাইবার একটা কৌশল মাত্র, তাহা বুঝিতে বিলম্ব হয় না। অবশ্য মহাত্মা গান্ধী মিঃ জিন্নার এই প্রস্তাব সম্পর্কে কোন উত্তর দানে অনিচ্ছা প্রকাশ করিয়াছেন এবং ইহাতে কায়েদে আজমের কৌশল-জাল ব্যর্থ হইয়াছে।

মিঃ জিন্নার এই অশোভন, অনমনীয় মনোভাব অধিকাংশ রাজনীতিক দলকে বিরক্ত করিয়াছে। এমন কি, বিলাত হইতে লর্ড স্ট্রাবল্‌গী পর্যন্ত মিঃ জিন্নার এই মনোভাবে অসন্তোষ প্রকাশ করিয়াছেন। আমেরিকায় স্থানে স্থানে তাঁহার বিরুদ্ধে সমালোচনা হইতেছে। এমন কি, তাঁহার নিজের দলের মধ্যেও ইহার প্রতিক্রিয়া দেখা দিয়াছে বলিয়া প্রকাশ। যে সমস্ত প্রদেশের লীগ প্রধান মন্ত্রিগণ কংগ্রেসী মন্ত্রিগণের কাছে বারংবার পর্যুদস্ত হইয়াছেন তাঁহারা কংগ্রেসের শক্তি সম্বন্ধে সম্পূর্ণ আস্থাবান্ হইয়াই কংগ্রেসের সংগে আপোষ-রফা করিবার পক্ষপাতী। প্রকাশ, এজন্য তাঁহারা মিঃ জিন্নাকে ক্রমাগত চাপ দিতেছেন। কিন্তু তাঁহার অনমনীয় মনোভাবের পরিবর্তন কিছুতেই সম্ভব হইতেছে না।

এসোসিয়েটেড প্রেসের প্রতিনিধির নিকট পণ্ডিত গোবিন্দবল্লভ পন্থ ১লা জুলাই যে বিবৃতি দান করিয়াছেন, তাহাতে তিনি বলিয়াছেন—

"বর্তমান পরিকল্পনায় সংখ্যা-সাম্যের ব্যবস্থা আছে। সুতরাং অ-তপশীলী হিন্দুর সংখ্যা মুসলমানের সংখ্যার বেশী হইবে না। আসলে হিন্দুর সংখ্যা মুসলমানের সংখ্যা অপেক্ষা তিনগুণ অধিক। কিন্তু তৎসত্ত্বেও শাসন-পরিষদে সংখ্যাগরিষ্ঠ হিন্দু সম্প্রদায় সুস্পষ্টরূপে সংখ্যালঘিষ্ঠ হইবে। ইহাও সম্ভবপর যে শাসন-পরিষদের সদস্যগণের দুই-তৃতীয়াংশই সংখ্যালঘিষ্ঠ সম্প্রদায়গুলির এবং মাত্র এক-তৃতীয়াংশ হিন্দু সম্প্রদায়ের লোক হইতে পারে।"

এসোসিয়েটেড প্রেসের সংবাদেও পরিকল্পিত শাসন-পরিষদে হিন্দুগণের এই সংখ্যালঘিষ্ঠতার ব্যবস্থা যে মানিয়া লইবার আয়োজন হইতেছে, তাহার ইংগিত পাওয়া গিয়াছে।

যদি শাসন-পরিষদে সংখ্যাগরিষ্ঠ হিন্দু সম্প্রদায় সংখ্যালঘিষ্ঠ দলে পরিণত হয়, তবে তাহাতে সংখ্যালঘিষ্ঠ হিন্দু সম্প্রদায়ের আত্মত্যাগের দৃষ্টান্তই প্রতিষ্ঠিত হইবে। কিন্তু এই মহত্তর আদর্শে মিঃ জিন্না অনুপ্রাণিত হইবেন কি ? বরং তিনি ইহা হিন্দুগণের দুর্বলতা—ইহাই ধরিয়া লইয়া তাহার পূর্ণ সুযোগ গ্রহণ করিতে প্রয়াসী হইবেন, তাঁহার পূর্বাপর আচরণ দেখিয়া এই প্রশ্নই মনে জাগিতেছে।

যাহা হোক, আগামী ১৪ই জুলাই সিমলা সম্মেলনের গতি-প্রকৃতি কি রূপ পরিগ্রহ করে, তাহা কেবল ভারত নহে, সমগ্র বিশ্ব-বাসী পরম ঔৎসুক্যের সংগে লক্ষ্য করিবে।

কাহিনী নয় খবর
ভবঘুরের

মহাত্মাজীর উষ্মা

এসোসিয়েটেড প্রেস অব আমেরিকার এক সংবাদদাতার খবরে প্রকাশ—২৪শে জুন গান্ধী যখন সিমলায় লর্ড ওয়াভেলের প্রাসাদে আমন্ত্রণ রক্ষা করতে যাচ্ছিলেন, তখন জনতা ও সংবাদপত্রের ফটোগ্রাফারদের ভিড়ের চাপে তাঁর পথ বন্ধ হয়, ফলে উত্তেজিত হয়ে তিনি এক শিখ ফটোগ্রাফারের হাত থেকে ক্যামেরা

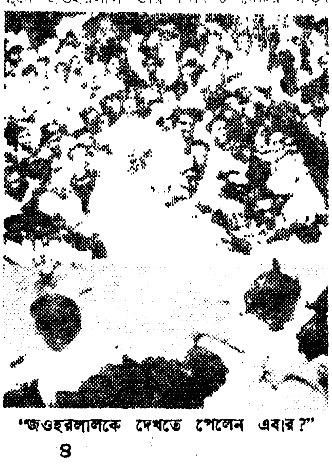


"পিয়ারীলাল—রাখ তো ক্যামেরাটা!"

কেড়ে নিয়ে প্রায় সেটিকে ভেঙে ফেলবার উদ্যোগ করেছিলেন—শেষে তিনি ক্যামেরাটি তাঁর অন্যতম সেক্রেটারী পিয়ারীলালের হাতে দিয়ে দেন এবং সেটি নিয়েই পিয়ারীলাল চলে যান। ফটোগ্রাফারটি তখন তখনই ক্যামেরাটি ফিরে পাবার কোনও চেষ্টা আর করেননি। মহাত্মাজীর এই উষ্মার কারণ, তিনি নাকি যখন তখন এভাবে ফটো তোলার বিরোধী—এর আগেও তিনি বহুবার এর বিরোধিতা করেছেন।

গাড়ির ছাদে জওহরলাল

ওয়াভেল প্রস্তাবের আলোচনা প্রসঙ্গে বোম্বাই সহরে কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির যে অধিবেশন হয়, তাতে যোগ দেবার উদ্দেশ্যে ভারতের অন্যতম নায়ক জওহরলাল যখন বোম্বাই সহরে এসে পৌঁছালেন, তখন হাজারে হাজারে নরনারী তাঁকে সম্বর্ধনা জানাবার জন্য সারাটা রাস্তা জুড়ে এমন ভীড় করলো যে, জওহরলালজীর গাড়ী সে পথ দিয়া যাওয়াই মুস্কিল। সবাই চীৎকার করছে "জওহরলালকে দেখতে চাই", "পণ্ডিতজী দর্শন দিন"। এসব দেখে শুনে জওহরলাল তাঁর নির্দিষ্ট মোটর গাড়ী-



"জওহরলালকে দেখতে পেলেন এবার?"

খানির ভিতরে বসে না থেকে—তড়াক করে লাফিয়ে গাড়ির ছাদে উঠে বসলেন। সবাই তাঁকে দেখতে পেয়ে মহাখুশি হয়ে তাঁর গাড়ী যাওয়ার রাস্তা করে দিলে। জওহরলালও মোটর গাড়ীর চালে বসে—যেতে যেতে সবাইকে নমস্কার জানাতে লাগলেন। আবার গত ১লা জুলাই তিনি যখন সিমলা পৌঁছলেন, তখনও তাঁর দর্শনপ্রার্থী জনতা তাঁর গাড়ী আটক করে—সেদিনও তাঁকে লাফিয়ে গাড়ীর ছাদের উপর উঠে বসতে হলো—তবে গাড়ী চললো। নেতাদের দর্শন-ব্যাকুল জনতা যদি অন্য সব নেতারও দর্শন-আগ্রহে তাঁদের গাড়ী আটকান, তাহ'লে তো মুস্কিল! সব নেতাই তো জওহরলালের মত চট্‌পটে নন্।

ডি' ভ্যালেরার ইংরাজী বর্জন

রয়টারের মারফৎ ডাবলিনের এক খবরে জানা গেছে আয়ারের প্রধান মন্ত্রী ঈমন ডি ভ্যালেরা গত ২৪শে জুন তারিখে আইরিশ ভাষার পুনরুদ্ধার আন্দোলন উপলক্ষে এক বক্তৃতায় বলেন যে, আয়ারবাসীরা যদি তাদের নিজেদের ভাষাকে ত্যাগ করতো—তাহলে তারা অন্য এক জাতির একজন বলেই গণ্য হোত। তিনি বলেন, "এই ছিল বৃটিশ জাতির একমাত্র লক্ষ্য যে আমরা ইংরাজী ভাষাভাষীতে পরিণত হই—একথা তাদের রাষ্ট্রনায়করা একাধিকবার বলেছেন—কারণ তাঁরা জানতেন যে যখন আমরা আমাদের ভাষাকে হারাতাম, তখনই আমরা হয়তো আস্তে ইংরাজ জাতির মধ্যে বিলীন হয়ে যেতাম।" "বৃটিশ জাতি আইরিশ স্বাধীনতার বিরোধী—তাদের সাহিত্য ও ভাষা সেই বিরোধিতার বিষে ভরা—কাজেই ইংরাজের দৃষ্টিভঙ্গী থেকেই আমাদের ভবিষ্যৎ ভেবে ইংরাজী ভাষার এই বিরোধিতা করতেই হবে।" তিনি আরও বলেন—একথা ভাবলে মস্ত বড় ভুল করা হবে, যেহেতু আয়ারবাসীর স্বাধীনতা আছে—সেই কারণে সেই স্বাধীন জাতিত্বের কোন বিপদ ঘটবে না। নিশ্চয়ই তা ঘটতে পারে—যদি না আয়ারবাসীরা তাদের নিজস্ব ভাষাকে আঁকড়ে ধরে। আয়ারের নিজস্ব ভাষা প্রতিষ্ঠিত হলে তা জাতির উন্নতির পথে বিশেষ সাহায্য করবে।" আমাদের দেশের শিক্ষা-ব্যবস্থার কর্তাদেরও ডি' ভ্যালেরার কথাগুলি ভেবে দেখা উচিত।

প্রেসিডেণ্টের পারিবারিক ঝামেলা

আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের নতুন প্রেসিডেণ্ট তাঁর পুরানো আবাস 'ব্লেয়ার হাউস' ছেড়ে প্রেসিডেণ্টের সরকারী বাসভবন 'হোয়াইট হাউসে' এসে উঠেছেন—মে মাসের তৃতীয় সপ্তাহে। এ খবরটা খবর কাগজেই পড়েছেন; কিন্তু যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেণ্টের বাসা বদলের



প্রেসিডেণ্ট-গৃহিণীর মেজাজ ভালো নেই!

খুঁটি-নাটি ও তার পরের পারিবারিক খবরও কিছু জেনে রাখুন। প্রেসিডেণ্টের বাসা বদলানোর দিনে যে খুব একটা হৈ-হাঙ্গামা ঘটেছিল তা নয়! প্রেসিডেণ্ট গৃহিণী বেস্ ট্রুম্যান এসে ঘরে ঢুকে দেখলেন যে ছুতোর, রাজমিস্ত্রী আর পটুয়ারা মিলে একেবারে ঘর-দোরগুলিকে ঝকঝকে তকতকে করে রেখেছে।



"ভগিনী ও মাতাসহ প্রেসিডেণ্ট ট্রুম্যান!"

যেখানে যে জিনিষটি দরকার, সাজানো রয়েছে। কাজেই প্রেসিডেণ্টের নিজস্ব আসবাবপত্র এলো খুব সামান্যই। তবে দেখা গেলো প্রেসিডেণ্টের কন্যা মেরী মার্গারেটের পিয়ানোটাকে এনে কিন্তু তেতলার একটা ঘরে রাখা হোল। ট্রুম্যান সাহেবের নিজস্ব যা আসবাবপত্র ছিল—তা ট্রুম্যান গৃহিণী তাঁর মা মিসেস ডি ডবলিউ ওয়ালেসের কাছে আগেই পাঠিয়ে দিয়েছেন। প্রেসিডেণ্ট ট্রুম্যান 'হোয়াইট হাউসে' এসে ওঠার প্রথম সপ্তাহের শেষেই তাঁর ৯২ বছরের বুড়ী মা মিসেস মার্থা ট্রুম্যান আর ৫৫ বছরের

আইবুড়ো বোন মিস মেরী ট্রুম্যান এসে পেশছেলেন। ট্রুম্যান তাঁর মাকে আর বোনকে আনবার জন্যে ক্যানসাস সিটির গ্রান্ডভিউ বলে জায়গাটিতে পাঠিয়েছিলেন প্রেসিডেন্টের খাস বিমানখানি। সঙ্গে গেছলেন গোয়েন্দা বিভাগের লোক ও তাঁর নৌবিভাগীয় দেহরক্ষীটি। প্রথম উড়োজাহাজে চেপে প্রেসিডেন্টের বুড়ী মা বেশ বহাল তবিয়তে খুশি মনে এক বেতের লাঠি সঙ্গে নিয়ে যুক্তরাষ্ট্রের রাজধানীতে নামলেন। রাজধানীতে তাঁকে প্রথম সম্বর্ধনা জানালেন তাঁর ছেলে আর নাতনী—তারপরেই হাজির হলো একঝাঁক ক্যামেরাম্যান। প্রথমটা বৃদ্ধা একটু হকচাকিয়ে গেছলেন—যাই হোক একটু সামলে নিয়ে বললেন—"একেবারে যাচ্ছেতাই কান্ড! এসব আগে যদি জানতুম তাহলে কি আসতাম।" বুড়ি মা এসে পেশছানোর পর প্রেসিডেন্ট ট্রুম্যান তাঁর দপ্তরে অতি সামান্যক্ষণই ছিলেন। এদিকে মা-বোন, ওদিকে আবার শাশুড়ী ঠাকরুণ মিসেস ওয়ালেস ও শ্যালক ফ্রেড ওয়ালেসও নিমন্ত্রণ পেয়ে হাজির। পারিবারিক হাঙ্গামায় পড়ে ক্যালেন্ডারের ছুটির দিন মার্কা করা না থাকলেও সেদিন প্রথম তাঁকে আপিস ফাঁকি দিতে হয়েছিল। প্রেসিডেন্ট হয়েও এসব ঝক্কি পোয়াতে হয়!

অনুবাদসাহিত্য

লাল ঘোড়া

জন স্টেনবেক

[মার্কিণ লেখক জন স্টেনবেক্ আমেরিকার শক্তিশালী আধুনিক লেখকদের অন্যতম। মার্কিণ জীবনের যে অংশটা শত-তলা প্রাসাদ-ভবন অথবা কোটিসংখ্যক ডলারের আওতার বাইরের দেশের মাটিতে সজীব, তারই কথা বলতে এ'র জুড়িদার খুজে পাওয়া কঠিন। 'লাল ঘোড়া' বহুবিদগ্ধ জনমতে স্টেনবেকের শ্রেষ্ঠতম রচনা।]

দিনের আলো দিগন্তের গায়ে কয়েকটা রেখা টেনেছে। বিলি বাক গোলা-বাড়ির দরোজা ঠেলে বেরিয়ে এলো। এক মুহূর্ত গোলাবাড়ির বারান্দায় নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে থাকার পর সে চোখ তুলে আকাশের দিকে চাইলো। বাতাস তখন সবে বইতে আরম্ভ করেছে।

ছোটখাট চেহারার মানুষ বিলি। হাত-পাগুলো কিন্তু মোটা সোটা, একরাশি গোঁফে ওপরকার ঠোঁট ভর্তি, মাথার চুল খোঁচা খোঁচা—ছোট করে ছাঁটা। চোখের রং তার সবুজ।

বারান্দায় দাঁড়িয়ে সে তার প্যান্টের ভিতরে সার্ট ঢুকিয়ে দিলো। তারপর চললো আস্তাবলের দিকে। আস্তাবলে পেশছে ঘোড়া দুটোকে সে দলাই-মলাই শুরু করলো। দলাই-মলাই তার শেষ হয়েছে, এমন সময় খাবার জন্যে ঘণ্টি বাজতে শুরু হোল। বিলি ব্রুশ আর চিরুণী দেয়ালের গায়ে টাঙিয়ে দিল। সকালের জল খাবার খেতে যখন সে বড় বাড়িতে গিয়ে পেশছলো, তখনও মিসেস টিফ্লিন ঘণ্টা বাজাচ্ছেন। বিলিকে দেখে তিনি তাঁর ধূসর রংয়ের মাথাটা দুলিয়ে আহ্বান জানালেন। বিলি কিন্তু ভিতরে না গিয়ে রান্নাঘরের সিঁড়িতে বসে পড়লো। হাজার হোলেও সে এখনও বাঁধা মাইনের মজুর, খাবার ঘরে সকলের আগে তার ঢোকা অনুচিত।

ঘণ্টির টিং টিং আওয়াজে বাচ্চা জডির ঘুম ভেঙে গেছল। বয়স তার মাত্র দশ। মাথার চুল হলদে ঘাসের রংয়ের, চোখ দুটোতে একটা নম্রভাব। ঘুম তার তখনো ছাড়েনি। কোনোরকমে রাত্রির কাপড় সে ছেড়ে ফেললো। একটা নীল ডোরা কাটা সার্ট আর পুরো পাজামা পরে রান্নাঘরের দিকে সে ছুটে গেল। গরম পড়ে গেছে। জুতো পরবার কোনো প্রয়োজন সে বোধ করলো না। রান্নাঘরের টব থেকে জল নিয়ে সে মুখ ধুলো। তারপর চুল আঁচড়াতে লাগলো।

এমন সময় মা তার দিকে ফিরলেন, বললেন, তোর চুল অনেক বেড়ে গেছে, শীগ্গির কাটতে হবে। যা, আর দেরী করিস নি, খাবার টেবিলে বসগে যা, বিলি তোদের জন্যে আসতে পারছে না।

সাদা অয়েল ক্লথ পাতা লম্বা টেবিলে জডি বসলো। সামনে বড় থালা ভর্তি ডিম ভাজা রয়েছে। জডি তিনটি ডিম তুলে নিল। তিন টুকরো মাংসও নিলো।

জডির বাবা এসে ঘরে ঢুকলেন। লম্বা দৃঢ় চেহারা জডির বাবার। মেঝের ওপর জুতোর যে আওয়াজ উঠছিল, তাতে জডি বুঝলো বাবার পায়ে রয়েছে বুট। তবুও সে নিঃসন্দেহ হবার জন্যে টেবিলের তলা দিয়ে উঁকি মেরে দেখলো।

বাবা আর বিলি কোথায় আজ যাবে, সে কথা জডি জানতো না। তবে তার বড়ো ইচ্ছে করতে লাগলো যে সে তাদের সঙ্গে যাবে। কিন্তু সাহস করে সে কথা জডি বলতে পারলো না। কারণ সে জানে বাবা রাজী হবেন না।

কার্ল থালাটা টেনে নিয়ে বললেন, বিলি, গরুগুলোকে ঠিক করেছো?

—হ্যাঁ। বিলি উত্তর দিলো। আমি একাই নিয়ে যেতে পারবো।

—তা পারবে। তবে আমি তোমার সঙ্গে যেতে বড়ো ভালোবাসি। কথা শেষ করে কার্ল মুচকে মুচকে হাসতে লাগলেন।

জডির মা জিগেস করলেন, কার্ল কটা নাগাদ তোমরা ফিরবে।

—তা বলা মুস্কিল। মালিনাসে অনেকের সঙ্গে দেখা করতে হবে।

থালার ডিম, বিস্কুট আর কেটলীর গরম চা কয়েক মুহূর্তের মধ্যে সাফ হোয়ে গেল। তারপর বিলি বাক আর কার্ল টিফ্লিন ঘোড়ায় চড়ে ছটা বুড়ো গরু তাড়িয়ে নিয়ে চললো মালিনাসের দিকে। ওগুলোকে বিক্রী করে দেওয়া হবে।

জডি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ওদের ওই যাত্রা দেখতে লাগলো। ওরা টিলায় উঠলো। পাহাড়ী বাঁকে ক্রমে অদৃশ্য হোয়ে গেল। জডি বাড়ির পিছনে চললো। সবজি বাগানের ভিতর দিয়ে এগিয়ে যেখানে ঠাণ্ডা জলের ঝরণা ছিল; সেইখানে এসে থামলো। ঝুঁকে পড়ে সেই ঝরণার মিষ্টি জল খানিকটা খেয়ে নিলো। টিলার ওপর দিয়ে রোদ ততোক্ষণে এসে গেছে। সবুজ ঘাস রোদে ঝক্‌মক্ করছে। ঝরন্ত শুকনো পাতার উপর পাখীরা কলরব করে ডাকছে। জডি চলতে গিয়ে থামলো। পাহাড়ের ওপাশ থেকে দুটো কালো শকুন প্রকাণ্ড ডানা মেলে ঘুরে ঘুরে মাটিতে নামছে। জডি বুঝলো কাছাকাছি কোনো জন্তু মারা পড়েছে। হয়তো গরু, হয়তো বুনো খরগোস। শকুনের দৃষ্টিতে কিছু এড়ায় না। জডি শকুনগুলোকে মোটে দেখতে পারে না। তবে মারতেও সে পারে না। যতো কিছু নোংরা ওরা তো খেয়ে খেয়ে পরিষ্কার করে দেয়।

জডি বাড়ি ফিরলো। মা বললেন, ইস্কুলে যাওয়ার সময় হোয়েছে। কোনো কথা না বলে জডি বগলে বইখাতা পুরলো। হাতে দুপুরের খাবার ঝুলিয়ে নিয়ে ইস্কুলের পথ ধরলো।

পথে যেতে যেতে সে পাখী আর খরগোস লক্ষ্য করে ঢিল ছুঁড়তে লাগলো।

বেলা চারটের সময় ফিরে এসে জডি দেখলো বাবা তখনও ফেরেন নি। মা বসে বসে মোজা মেরামত করছিলেন। জডিকে বললেন, রান্নাঘরে খাবার আছে খেয়ে নে। তারপর হাঁস মুরগীর বাক্সগুলো পরিষ্কার করে ফেল। বেশ করে খড় বিছিয়ে দিবি।

ঘাড় নেড়ে জডি ঘরে ঢুকে গেল।

মার কথা মতো কাজ শেষ হোয়ে গেলে জডি তার বাইশ নম্বরের রাইফেলটা বাড়ি থেকে নিয়ে সেই ঝরণার কাছে গেল। সকাল বেলার মতো এবারও সে জল খেলো। তারপর নানান দিক লক্ষ্য করে সে তার রাইফেলের গুলী ছুঁড়তে লাগলো। এমন কি তাদের বাড়ি পর্যন্ত তার নিশানার বাইরে গেল না, দুঃখের বিষয় তার রাইফেলে গুলী ছিল না। কার্ল স্পষ্ট বলে দিয়েছেন, বারো বছর বয়স না হোলে জডিকে গুলী দেওয়া হবে না।

কার্ল আর বিলির ফিরতে সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হোয়ে গেছল। রাত্রির খাওয়াটা তাই দেরীতে শুরু হোল, খাওয়া শেষ হোলে কার্ল বললেন, জডি, শুতে যাও, কাল খুব ভোরে তোমাকে উঠতে হবে।

—কেন বাবা, কাল কি একটা শুয়োর মারা হবে?

—না।

—তবে?

—সে তুমি সকালেই দেখতে পাবে।

জডি বিছানায় গিয়ে শুয়ে পড়লো। শুয়ে শুয়ে সে শুনতে লাগলো গোলা-বাড়িতে পেঁচা ঝট্‌পট্ করে নামছে। নিশ্চয় অনেক ইঁদুর বেরিয়েছে। বাতাসে গাছের ডাল শির্‌শির্ করছে। একটা গরু যেন ডাকলো। জডির চোখে ঘুম তখন জড়িয়ে গেছে।

খুব ভোরে কিন্তু জডির ঘুম ভাঙলো না। জল খাবারের ঘণ্টির আওয়াজে প্রত্যহের মতোন সে বিছানা ছেড়ে উঠলো। তারপর অভ্যাসানুযায়ী খাবারের টেবিলে গিয়ে বসলো। এমন সময় তার বাবা এবং বিলি খেতে এসে ঢুকলো।

কার্লের মুখের দিকে চেয়ে জডি চোখ নামিয়ে নিলো; ভয়ানক গম্ভীর সে মুখ। আড়চোখে সে বিলির মুখের দিকে চাইলো। বিলি মুখ নীচু করে আপন মনে খাচ্ছে। তার চোখের সঙ্গে জডির চোখ মিললো না।

অর্ধেক খাওয়া হোয়েছে। কার্ল হঠাৎ খাওয়া থামালেন, গম্ভীর গলায় জডিকে তিনি বললেন, খাওয়া শেষ হোলে তুমিও আমাদের সঙ্গে চলো।

এ কথার পর জডির খাওয়া শেষ করা মুস্কিল হোয়ে উঠলো। যত তাড়াতাড়ি সে খাওয়া শেষ করতে চায়, গলা দিয়ে খাবারগুলো ততো যেন নামতে চায় না। কার্ল আর বিলির খাওয়া শেষ হোয়ে গেল। তারা দুজন বেরিয়ে গেল। বাকী খাওয়া কোনো রকমে শেষ করে জডি তাদের পিছনে বেরিয়ে পড়লো। তার মন কিন্তু তখন এগিয়ে চলেছে, তার বাবা আর বিলিকে অতিক্রম করে সম্মুখের প্রসারিত পথ ধরে বহু দূরে।

মা পিছন দিক থেকে হঠাৎ ডেকে বললেন, কার্ল ওকে যেন মাতিয়ে দিও না, ও ইস্কুল যাবে।

যেখানে শুয়োর মারা হয়, সেই সাইপ্রাস গাছের তলায় কার্ল আর বিলি চলে গেল। চার পাশে চেয়ে জডি বুঝলো শুয়োর মারা হবে না।

ধীরে ধীরে তারা এগিয়ে চললো। সূর্য উঠে গেলেও পাহাড়ের আড়াল ছাড়িয়ে ওপরে উঠতে পারেনি। তাই এ পাশের অন্ধকার এখনও কাটেনি। আস্তাবলের দরোজার সামনে দাঁড়িয়ে পড়ে জডিকে বাবা বললেন, এইখানে রে!

এক মুহূর্ত, তারপর সমস্ত কিছু রহস্য পরিষ্কার হোয়ে গেল। আস্তাবলের সামনের ঘরটায় একটা লাল ঘোড়ার বাচ্চা দাঁড়িয়ে জডির দিকে মিটমিট করে চাইছে। বদমায়েসী সেই চক্ষু দুটিতে প্রজ্বলিত, গায়ে এক গা লাল রংয়ের মোটা মোটা কর্কশ লোম। ঘাড়ের লম্বা লম্বা চুল এক পাশে কাত হোয়ে পড়েছে।

জডির বিস্মিত মুখের দিকে চেয়ে গম্ভীর গলায় কার্ল বললেন। বাচ্চাটা একেবারে অশিক্ষিত। ওর পেছনে অনেক খাটতে হবে। কিন্তু কখনো যদি শুনি যে ওকে ঠিক সময়ে খাওয়ানো হয়নি, অথবা ওর ঘর নোংরা হোয়ে পড়ে আছে, আমি সঙ্গে সঙ্গে ওটাকে বিক্রী করার ব্যবস্থা করবো।

এগিয়ে এসে বাচ্চাটার মুখে হাত রেখে জডি বললো, সত্যি এটা আমার?

কেউ তার জিজ্ঞাসার উত্তর দিলো না। বাচ্চাটা তার পাটল রংয়ের নাক সিঁটকে একবার জডির আঙুলের গন্ধ শুকলো, তারপর দাঁত দিয়ে আঙুল চেপে ধরলো। হাতটা সরিয়ে নিয়ে দাগ বসে যাওয়া আঙুলের দিকে চেয়ে জডি আপন মনে বলে উঠলো, আরে এ যে বেশ কামড়ায়!

কার্ল আর বিলি দুজনে হাসলো জডির কথা শুনে। কার্ল এইবার চলে গেলেন।

বিলি মুখখানাকে বেজায় গম্ভীর করলো, বললো, তা কামড়াবে বইকি, একদম নতুন কি না। একে হাঁটতে, দৌড়তে শেখাতে হবে। আমি অবশ্য তোমাকে সাহায্য করবো।

—কোথায় একে কেনা হোল বিলি?

—স্যালিনাসে একটা নীলাম হোচ্ছিল। সেই নীলামে।

—এর জিন কি লাগাম কেনা হয় নি?

—হ্যা, হ্যা, কেনা হোয়েছে বই কি। এসো তোমাকে দেখাচ্ছি।

মরক্কো চামড়ার লাল রংয়ের জিনটা হাতে নিয়ে জডি আর একবার হতবাক হোয়ে গেল। তার পক্ষে বিশ্বাস করা কঠিন হোয়ে দাঁড়ালো যে এটাও তার। বার বার আঙুল বুলিয়ে অবশেষে সে বললো, বড়ো সুন্দর মানাবে, না? তারপরই বোধ হয় তার মনে কথাটা উদয় হোতে সে বললো, কই আমার ঘোড়ার নামতো এখনো দেওয়া হয় নি? আমার ইচ্ছে ওর নাম রাখি গ্যাবলিয়ানমাউণ্টেন্স।

—বড্ডো বড়ো নাম হোয়ে গেল যে জডি! ওর চাইতে শুধু 'গ্যাবলিয়ান' বলো না। গ্যাবলিয়ান মানে জানো তো? 'বাজ পাখী'। বেশ মানাবে ওকে। লাল চেহারা ওর!

—চুলগুলো কতো বড়ো বড়ো দেখেছো?

—ও চুল কেটে ফেলতে হবে। কিন্তু ফেলে দিও না যেন। ওই চুল বুনে বুনে আমি একটা ছিপটি বানিয়ে দেবো।

—ওঃ, তা হোলে বড়ো মজা হবে বিলি! লাল ঘোড়া, লালজিন, লাল ছিপটি। বিলি, আজ আমি ওকে ইস্কুলে নিয়ে যাবো সকলকে দেখাতে।

—উঃ হুঃ! ও এখনো হাটতে শেখে নি যে।

—আমি তাহোলে আমার বন্ধুদের নিয়ে আসবো?

তা আনতে পারো।

—জডি, তুমি কখনো ঘোড়ায় চড়েছো? বিকাল বেলায় স্কুল ফেরত ছটি ছেলের একটি সম্মিলিত দল জডির সঙ্গে এসেছিল গ্যাবলিয়ানকে দেখতে। চোখে তাদের বিস্ময়, মনে মনে একটা সশ্রদ্ধ ভাব জডির সম্বন্ধে জাগ্রত।

তাদের প্রশ্নে জডি মুরুব্বীর মতোন মাথা নাড়িয়ে বললো, এখন তো চড়া যায় না। ও এখনো দাঁড়াতে শেখে নি, থামতে বললে থামতে পারে না।

—তাই নাকি? জডির সঙ্গীদের বিস্ময় আরো ঘনীভূত হোল।

বন্ধুদের অজ্ঞতা দেখে জডি ওস্তাদি শুরু করলো। সকালবেলা বিলির কাছে যে কথাগুলো শুনেছিল, সেইগুলোর পুনরাবৃত্তি সে করে চললো। কথা শেষ করার আগে বললো, জিনটা দেখে যাও।

লাল মরক্কো চামড়ার জিনটা দেখে সকালবেলা জডির যে অবস্থা হোয়েছিল, সেই রকম হতবাক হোয়ে গেল ছেলেদের দলটি। কোনো কথাই তারা জিগেস করতে পারলো না। জডি ওস্তাদি ছাড়লো না, বললো, বেশ চমৎকার মানাবে বলে মনে হয়।

হ্যাঁ, তা মানাবে। সকলে একবাক্যে স্বীকার করলো।

এরপর জডির বন্ধুরা ফিরে গেল। কেন না, ইচ্ছা তাদের থাকলেও সূর্যদেব অপেক্ষা করেন নি। পাহাড়ের ওপাশে তিনি গিয়ে দাঁড়িয়েছেন তখন। অন্ধকারের ছায়ায় ধীরে ধীরে সকল আলো অপসারিত করে সন্ধ্যা আসছে। ফিরতি পথে কেউ কারুকে কিছু না বললেও মনে মনে সকলে তারা একই কথা ভাবছিল ঃ তাদের যে জিনিষটা সবচাইতে দামী, তাই তারা দেবে জডিকে যদি জডি তাদের ঘোড়ায় একবার চড়তে দেয়......

বন্ধুরা চলে গেল। জডিও একটা স্বস্তির নিশ্বাস ফেললো। তারপর দেয়াল থেকে রাস আর চিরুণী পেড়ে নিয়ে ঘোড়ার কাছে গিয়ে দাঁড়ালো। জডির হাতে রাস আর চিরুণী দেখে বাচ্চাটার চোখ জ্বলে উঠলো। সমস্ত শরীর সঙ্কুচিত করে সে দাঁড়ালো সুবিধা মত লাথি ছোড়বার জন্যে। জডি কিন্তু প্রথমে তার গায়ে হাত দিলো না। গলায় সুড় সুড়ি দিয়ে বিলির মতো গম্ভীর স্বরে বললো দাঁড়া বেটা দাঁড়া! গলায় সুড়সুড়ি পেয়ে আরামে ঘোড়া চোখ বুজলো, তার-পর লাথি ছোড়বার কথা সে ভুলে গেল। তখন জডি দলাইমলাই শুরু করলো।

কতোক্ষণ ধরে এই দলাইমলাই চলতো তা কে জানে। মার গলার আওয়াজে জডি চমকে উঠলো! শুনলো মা রাগ করছেন ঠিক সময়ে মুরগীদের তদারক না করার জন্যে। দেয়ালের গায়ে রাস আর চিরুণী টাঙিয়ে দিয়ে জডি ছুটে মার সামনে এসে দাঁড়ালো, সন্ত্রস্তভাবে বিনীত জানিয়ে বললো, লক্ষ্মী মামণি, রাগ করো না। বড়ো ভুল হোয়ে গেছে।

মার রাগ জল হোয়ে গেল। হেসে তিনি বললেন, দেখ এ রকম ভুল কিন্তু হোলে চলবে না। একটা একটা করে তাহোলে সব কিছু যে তুই ভুলে যাবি!

—না মা, না।

—বেশ। মা চলে যাচ্ছিলেন। জডি তড়াক করে লাফিয়ে তাঁর সামনে এলো, একটা শাক আলু দেবে মা?

—কি হবে? মা বিস্মিত হোয়ে জিগ্যেস করলেন।

—গ্যাবিলিয়ানকে খাওয়াবো। তাহোলে ওর গায়ের লোম খুব মসৃণ আর নরম হোয়ে যাবে, ...কথাটা অসমাপ্ত রেখে জডি নীরব হোল। তার চোখ দুটো কিন্তু উজ্জ্বল হোয়ে উঠেছে। সেই জ্যোতির্ময় দুটি চোখ মার বড়ো ভালো লাগলো। হেসে তিনি বললেন, তাতে আর কি হোয়েছে, বাগান থেকে নিয়ে আয় না।

জডির জীবনের ধারা সম্পূর্ণ পরিবর্তিত হোয়ে গেছে। ভোরে যখন রাত্রির অন্ধকার গাছের ঘনপাতা আর প্রসারিত ডালে ভারী চাপ চাপ হোয়ে জড়িয়ে থাকে, তখন সে বিছানা ছেড়ে ঘরের দরোজা খুলে নিঃশব্দে বেরিয়ে পড়ে। মাথার ওপরে উর্ধ আকাশ তখন শ্লেট পাথরের মতো ধূসর রংয়ের প্রলেপ মাখা, তারাগুলো হীরার কুচির মতো দেদীপ্যমান, চারিপাশের প্রকৃতি শীতল, শান্ত। সাইপ্রাস গাছের তলা দিয়ে শিশির মাখা ঘাস পদদলিত করে এই যাত্রা তারা কি যে দুর্ভাবনায় তা কি করে সে প্রকাশ করবে! তার মনে হয় গতকাল রাত্রিতে যে ঘরে সে গ্যাবলিয়ানকে রেখে এসেছে, সেখানে যদি না সে থাকে। যদি ইঁদুরে তার লেজের চুল কেটে নষ্ট করে থাকে। অথবা তার পায়ে যদি কামড়ে দিয়ে থাকে। অন্তহীন আশঙ্কার তরঙ্গে দুলতে দুলতে, সংশয় বিজড়িত পদবিক্ষেপণে কোনো রকমে সে এসে পৌঁছায় আস্তাবলে; সঙ্গে সঙ্গে তার সকল দুশ্চিন্তার অবসান ঘটে। আস্তাবলের বড় দরোজা খুললেই গ্যাবলিয়ানের চোখের সঙ্গে তার চোখ মেলে। গ্যাবলিয়ান ডেকে ওঠে চিঁহিঃ চিঁহিঃ হিঃ! তারপর সে সামনের পা ছোড়ে, বলে যেন, কই আমাকে বাইরে নিয়ে চলো!

গ্যাবলিয়ানের আস্তাবল আর গা পরিষ্কার করা সমাপ্ত হোলে জডি তাকে বাইরে নিয়ে যায়। গ্যাবলিয়ান বাইরে এসে প্রথমে খুব খানিকটা ছুটে নেয়। ছোটা শেষ হোলে সামনের দিকে দু পা তুলে বার বার উঠে দাঁড়ায়। অবশেষে ঝরণায় গিয়ে নাক ডুবিয়ে জল খায় চোঁ চোঁ করে। আনন্দে জডি লাফিয়ে ওঠে। ভালো, খুব ভালো ঘোড়া গ্যাবলিয়ান। তা না হোলে অমন করে নাক ডুবাতো না সে।

দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখতো জডি। অনেক কিছু তার চোখে পড়তো। যখন ঘোড়া ভয় পায় অথবা রেগে যায়, তখন তাদের কান দুটো পিছনে সরে যায়। আনন্দে, কৌতুকে অথবা উদ্বিগ্নতায় সম্মুখের দিকে নুইয়ে পড়ে। আর কোনো কারণে উত্তেজিত হয়ে উঠলে কান দুটো দাঁড়িয়ে যায় একেবারে শক্ত হোয়ে।

ধীরে ধীরে শিক্ষা শুরু হোল। বিলি দাঁড়িয়ে থাকতো। জডি শেখাতো। কেমন করে পা ফেলতে হয় শেখানো হোল প্রথমে। একটা শাক আলু সামনে ধরে দাঁড়াতো জডি। পা বাড়িয়ে যেই গ্যাবলিয়ান যেতো অমনি দড়িতে টান পড়তো। গ্যাবলিয়ান থমকে দাঁড়তো। জডি অবশ্য তাকে নিরাশ করতো না। শাক আলুটা গ্যাবলিয়ান খেতে পেতো। এই ভাবে সব চাইতে শক্ত অধ্যায় শেষ করা হোল।

তারপর একে একে শেখানো হোল কদমে ছুটতে, ছুটতে ছুটতে দাঁড়ানো, দুলকি চালে চলা এই সব। জডি টিক্

টিক্ আওয়াজ করলে সে চলতে আরম্ভ করতো। হ্যাট, হ্যাট বললে দৌড়াতো আর 'ওয়া-হোয়া' বলে চীৎকার করলে গ্যাব-লিয়ান থেমে পড়তো যেমন সব ঘোড়া থামে। কিন্তু তার ভেতরেও গ্যাবলিয়ান বদমায়েসী করতে ছাড়তো না। থামবার সময় সে জডির পা মাড়িয়ে দেওয়ার চেষ্টা করতো, না হয় লাথি ছুঁড়তো। জডি বকলে সে বড়ো বড়ো চোখ দুটি মেলে শুনতো জডি কি বলছে, তারপর কান দুটো সামনে বাড়িয়ে স্থির নিস্তব্ধ হোয়ে দাঁড়িয়ে থাকতো।

একদিন কার্ল দেখতে এলেন গ্যাবলিয়ান কি রকম শিখেছে। কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে দেখার পর তিনি বললেন, জডি এবার জিন লাগাও, চলতে ফিরতে ও শিখে গেছে।

কার্ল প্রস্থান করার সঙ্গে সঙ্গে জডি ছুটে সাজ ঘরে চলে গেল। সেখানে কাঠের ঘোড়ার ওপরের সেই লাল মরক্কোর জিনটা লাগিয়ে সে তাড়াতাড়ি উঠে বসলো। তার-পর তার রাইফেলটা সে কাঁধে তুলে নিলো। মনে হোল কত মাইল পথ সে গ্যাবলিয়ানের পিঠে চড়ে পার হোয়ে চলেছে টকাটক্ টকাটক্ ক্ষুরের কঠিন আওয়াজে পথ প্রান্তর বন পাহাড়। দৃশ্যমান হোয়ে উঠছে যেন ছায়া-ছবি আর অদৃশ্য হচ্ছে যেন বাতাসে উপদ্রুত ধূম্রকুণ্ডলী।

প্রচণ্ড কঠিন হোয়ে দাঁড়ালো জিন্ আটকানো। গ্যাবলিয়ান পিছু হটে, পিঠ সংকুচিত করে অনবরত ফেলে দিতে লাগলো জিন্। বহুদিন এ রকম হোয়ে যাবার পর শেষ পর্যন্ত জিন্ আটকানো গেল। লাগাম লাগান হোল। লাগাম লাগাতে গ্যাবলিয়ান দাঁত দিয়ে লাগাম কাটবার চেষ্টা করলো। লাগাম কাটলো না। গ্যাবলিয়ানের কষ কেটে গিয়ে রক্ত পড়তে লাগলো। সে দাঁত দিয়ে লাগাম কাটার চেষ্টা ছেড়ে দিলো।

কার্ল আর একদিন এলেন। গ্যাবলিয়ানের দিকে চেয়ে বললেন, আরে এ তো আর বাচ্ছা নেই, ঘোড়া হয়ে গেছে!

সত্যি, গ্যাবলিয়ানকে আর সেই লাল বাচ্ছা বলে চেনা যায় না। দলাইমলাই করে করে লোমের কর্কশতা বিলুপ্ত হোয়ে গেছে। সমস্ত শরীরে একটা উজ্জ্বল খয়েরি আভা পরিস্ফুট হোয়ে উঠেছে। তেল মাখানো ক্ষুর গুলো চকচক করছে। ঘাড়ের চুল সমান করে ছাঁটা।

জডির দিকে চেয়ে কার্ল বললেন, জডি, থ্যাংকস গিভিং (ধন্যবাদ জ্ঞাপনের) দিনে তুই গ্যাবলিয়ানের পিঠে চড়তে পারিস!

অসহ্য আনন্দে জডির বুকের রক্ত দ্রুত-বেগে চলতে আরম্ভ করলো। আস্তে আস্তে সে বললো, সেদিন যদি বৃষ্টি হয়!

জডির ভয় বৃষ্টির জল লেগে লাল জিনটায় দাগ ধরে যাবে।

—না, না। বৃষ্টি হবে কেন। তবে দেখিস খুব সাবধান, গ্যাবলিয়ান না তোকে ফেলে দেয়। কার্ল সতর্ক করে দিলেন ছেলেকে। তারপর হাসতে হাসতে চলে গেলেন।

বিলির কাছে গিয়ে দাঁড়ালো জডি, বললো, ঘোড়ায় চড়া শেখাতে হবে বিলি!

গরু দুইছিল বিলি। মুখখানা তুলে সে বললো, আজ বিকেল থেকে শেখাবো জডি, এ বেলা আমি বড়ো ব্যস্ত।

ঘোড়ায় চড়া শেখা শুরু হোল। গ্যাব-লিয়ান জডিকে বেশ চিনে গেছে। আজকাল জডি যখন জিন্ লাগায় অথবা লাগাম পরায়, গ্যাবলিয়ান কোনো গোল বাধায় না। বরং স্থির হোয়ে দাঁড়িয়ে বড়ো বড়ো চোখ মেলে সে জডির দিকে চেয়ে থাকে। মধ্যে মধ্যে জিন আর লাগাম লাগান হোয়ে গেলে জডি একখানা রেকাবের ওপর দাঁড়িয়ে ওঠে, গ্যাবলিয়ান কোনো আপত্তি করে না। জডি সে সময় অনায়াসে তার পিঠে চেপে বসতে পারে। কিন্তু বসে না। ধন্যবাদ জ্ঞাপনের দিনের আগে ওটা করা নিষেধ।

প্রত্যহ বিকালে ইস্কুল থেকে ফিরে জডি গ্যাবলিয়ানের লাগাম ধরে বেড়াতে নিয়ে যায়। গ্যাবলিয়ানও বেড়াতে যেতে বড়ো ভালবাসে। মাথা উঁচু করে, নাকের ডগা সামান্য কাঁপিয়ে জডির পিছনে সে গাছ-তলা দিয়ে, ঝোপের পাশ কাটিয়ে হেঁটে চলে, কোনো রকম বদমায়েসী করে না। মনে হয় ছোট শিশুর মতো সে বহির্জগতের অনন্ত প্রকৃতির ঐশ্বর্য দেখে বিস্মিত, নীরব হোয়ে গেছে, বিস্মৃত হোয়ে গেছে স্বভাবজাত দৌরাত্ম্য।

তারা যখন ফিরে আসে তাদের গা হোতে গাছ-গাছালির গন্ধ নির্গত হয়। চোর-কাঁটা গায়ে হাতে লেগে আছে দেখা যায়।

ধন্যবাদ জ্ঞাপনের দিন সন্নিকটবর্তী হোয়ে এলো। শীতের প্রকোপও অকস্মাৎ বর্ধিত হোয়ে গেল। তরঙ্গের পর তরঙ্গ-মালা বিস্তার করে পাহাড়ের মাথায় কালো ছায়া পরিবিস্তার করে মেঘের দল যেন দিগ্বিজয়ের অভিযান করলো, আকাশের নীল আর দেখা গেল না। ওকগাছগুলো থেকে সমস্ত পাতা ঝরে পড়লো, সমস্ত বনভূমি সেই প্রাণহীন পাতায় আবরিত হোয়ে গেল।

জডির আশংকা রূপে পরিগ্রহ করলো। ধন্যবাদ জ্ঞাপনের দুদিন পূর্বে বৃষ্টি নামলো। অবিশ্রান্ত ধারায় গ্রীষ্মদগ্ধ নিষ্করুণ ধূসরতা কোথায় অন্তর্হিত হল, সে জায়গায় প্রকৃতির রূপে সবুজে, শ্যামলতায় ঝলমলিয়ে উঠলো।

এত বৃষ্টিতেও কিন্তু গ্যাবলিয়ান মোটে ভিজলো না। জডি তাকে আগলে বেড়াতে লাগলো। দিন দশেক পরে একদিন হঠাৎ আকাশ থেকে মেঘ সরে গেল, রোদ উঠলো।

জডি এসে দাঁড়ালো বিলির কাছে, বললো, বিলি রোদ উঠেছে, গ্যাবলিয়ানকে রোদে রাখলে কেমন হয়?

—খুব ভালো হয়। কদিন বৃষ্টি গেছে। আজ যদি রোদ লাগে, তবে ওর স্বাস্থ্য আরও ভালো হবে।

—কিন্তু যদি বৃষ্টি আসে? আমি তো ইস্কুলে যাচ্ছি, কে তুলবে ওকে বাইরে থেকে।

—কেন আমি তুলবো। বিলি জডিকে আশ্বাস দিলো।

বাড়ির ভিতর থেকে হাফপ্যাণ্ট, সার্ট আর পায়ে রবার বুট পরে, হাতে ছোট্ট বর্ষাতি নিয়ে জডি ফের এসে দাঁড়ালো বিলির কাছে, বললো, বিলি, আমি তাহলে যাচ্ছি। গ্যাবলিয়ান বাইরে রইলো।

হ্যাঁগো হ্যাঁ। তুমি যাও না। বিলি জডির উদ্বিগ্নতা দেখে হাসতে লাগলো।

সে হাসিতে লজ্জিত হয়ে পড়লো জডি। আর কোন কথা না বলে যে স্কুলের পথ ধরলো। খানিকটা গিয়ে সে হঠাৎ একবার পিছনে ফিরে চাইলো ঃ দেখলো গ্যাবলিয়ান তার দিকে চেয়ে আছে।

শিস্ দিতে দিতে জডি এগিয়ে চললো। আকাশের দিকে বার বার সে চাইলো। আকাশ পরিষ্কার। সোনালী রোদ ঝকঝক করছে, কোথাও মেঘের কালিমার চিহ্নও নেই। নীল আকাশের ছায়া পড়ে যেন বিসর্পিত পথ আর পাহাড়শায়িত দিগন্ত সবুজ হয়ে গেছে। জডি লম্বা লম্বা পা ফেলে চললো, টেনে টেনে শিস্ দিতে লাগলো।

স্কুলের বাইরে এসে সর্বনাশা আশঙ্কায় জডির বুক দুরু দুরু করতে লাগলো। সূর্য এখনো অস্ত যায় নি, কিন্তু দিনের আলো প্রায় অদৃশ্য। বিলির কথা সত্যি হয়নি। দুপুরেই আকাশ কালো করে মেঘ উঠেছে। তারপর প্রচণ্ড বৃষ্টি হয়ে গেছে। এখনো কালো মেঘ আকাশ পরিব্যাপ্ত করে বিস্তৃত।

কনকনে তীব্র বাতাসে চোখ-মুখ ফেটে যেতে লাগলো। গাছের পাতা হতে বৃষ্টির জল ঝরে ঝরে পড়তে লাগলো। জডি সেসব গ্রাহ্য করলো না। সে প্রায় ছুটে বাড়ির দিকে চললো।

ছুটতে ছুটতে টিলার ওপর এসে সে থমকে দাঁড়ালো। তারপর অবসাদগ্রস্ত পায়ে সে ধীরে ধীরে অবতরণ করতে লাগলো। যা ভয় সে করেছিল, তাই ঘটে গেছে। গ্যাবলিয়ান ওই বাইরে দাঁড়িয়ে রয়েছে। খুঁটি থেকে কেউ তাকে খুলে ভিতরে নিয়ে যায় নি। প্রচণ্ড বৃষ্টিতে ভিজে সে একেবারে জবুথবু হয়ে দাঁড়িয়ে আছে।

জড়ি আবার ছুটতে আরম্ভ করলো। সাজঘরে এসে তার বর্ষাতির ওপর বই আর খাবারের ডিবা ফেলে, সে একটা চট তুলে নিলো। তারপর গ্যাবলিয়ানকে আস্তাবলে নিয়ে এসে সেই চট দিয়ে সজোরে তার গা ঘষতে আরম্ভ করলো।

ঘষতে ঘষতে গ্যাবলিয়ানের দেহ উত্তপ্ত হয়ে উঠলো। ঈষৎ ধোঁয়া সেই তপ্ত দেহ থেকে উঠতে আরম্ভ করলো, সমস্ত শরীর একবার থর থর করে কেঁপে উঠলো।

সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হোয়ে গেছে—কার্ল আর বিলি বাড়ি এলো। কার্ল বললেন, উঃ কি বৃষ্টি! বেন হারচ থেকে কিছুতে বেরোতে পারি না!

কার্ল থামলেন। জড়ি বললো, বিলি, তুমি যে বলেছিলে আর বৃষ্টি হবে না।

—আমি ঠিক করতে পারি নি।—কুণ্ঠিত হোয়ে পড়লো বিলি। আস্তে আস্তে জিগ্যেস করলো, কেমন আছে ও!

বড়ো ভিজে গেছে। আমি অবশ্য বেশ করে গা ঘষে দিয়েছি। গরমদানা খাইয়েছি।

—ঠিক করেছো। সামান্য ভিজলে কোনও ক্ষতি নেই।

খাবারের থালা হোতে একটা সিদ্ধ আলু মুখে পুরতে পুরতে কার্ল বললেন, কি খুঁত খুঁত করছিস জড়ি? ঘোড়া কি আদুরে কোলে চড়া কুকুর যে সামান্য ভিজলে মারা পড়বে। ওরকম কাতুরে হওয়া ভালো নয়।

জড়ি নিঃশব্দে খেতে লাগলো। সে জানে বাবা এই সব দুর্বলতা মোটে সহ্য করতে পারেন না।

খাওয়া শেষ করে বিলি একখানা কম্বল নিয়ে আস্তাবলে গেল। জড়ি সঙ্গে গেল। গ্যাবলিয়ান যেন প্রাণচাঞ্চল্য বিহীন হোয়ে পড়েছে। বিলি আর একবার তার গা ঘষে দিলো। নাকের ওপর হাত দিয়ে দেখলো গায়ের উত্তাপ কতো। দাঁত, চোখের পাতা, কান দেখা হোয়ে গেলে বিলি তার গায়ের ওপর কম্বল দিয়ে বেশ করে জড়িয়ে বাঁধলো—কোথাও ফাঁক রাখলো না।

জড়ি বাড়ি ফিরলে মা তার চুল ঠিক করে দিতে দিতে বললেন, আর রাত করিস নি। বিলি কম্বল ঠিক করে বেঁধে দেবে। জানিস তো ও ঘোড়ার ডাক্তার। সকালে আর কোনও গোলমাল থাকবে না।

কোনও কথা বললো না জড়ি। অগ্নি-কুণ্ডের সামনে হাঁটু গেড়ে সে বসে পড়লো। অনেকক্ষণ ধরে যে সে কি প্রার্থনা করলো জানি না। অবশেষে শুতে গেল।

জড়ির ঘুম যখন ভাঙলো খাবার ঘণ্টি তখন বেজে উঠেছে টিং টিং টিং টিং! লাফিয়ে জড়ি বাইরে এলো। কিন্তু খাবার ঘরের দিকে না গিয়ে, চলে গেল আস্তাবলের দিকে। মা একবার উঁকি মেরে দেখলেন। কিছু বললেন না। শুধু একটু হাসলেন।

আস্তাবলের কাছাকাছি এসে জড়ি যা ভয় করছিল তাই ঘটলো। অনড় হোয়ে সে দাঁড়িয়ে গেল ঃ গ্যাবলিয়ান কাঁদছে, টেনে টেনে হাঁপিয়ে। একটি নিদারুণ অবসন্নতায় তার সমস্ত মন অবশ হোয়ে গেল।

বিলি গ্যাবলিয়ানের গা ঘষে দিচ্ছিল। জড়ি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ভালো করে লক্ষ্য করলো তার অবস্থা। দুটো চোখ পিঁচুটিতে ভর্তি হোয়ে গেছে, কানগুলো পাশে ঝুলে পড়েছে, মাথাটা নীচু। জড়ি তার মাথায় হাত বুলালো, কিন্তু সে মাথা তুললো না, অথবা কাণ দোলালো না।

—অসুখ ভয়ানক বেড়ে গেছে।—ভয়ে ভয়ে বললো জড়ি।

—হ্যাঁ, ঠান্ডা লেগেছে।

—আমি আজ আর স্কুলে যাবো না, এর কাছে থাকবো।

—না, না, আজ আমি আছি—তুমি স্কুলে যাও। কাল শনিবার কাল থেকো।

—কিন্তু তুমি যদি অন্য কাজে যাও?—অস্থির হোয়ে উঠলো জড়ি।

—না গো, না। আজ আমি থাকি, তুমি স্কুলে যাও। আমার আজ কোনও কাজ নেই।—প্রায় ধমকে উঠলো বিলি, আমি কোথাও যাবো না।

মন্থর পায়ে জড়ি বাড়ি ফিরলো। খাবার জুড়িয়ে একেবারে কনকনে বরফ হোয়ে গেছে খেতে গেলে দাঁতে লাগে। সে কথা কিন্তু জড়ির মোটেই মনে উদয় হোল না। অম্লান মুখে সে সেই খাবার খেয়ে ঝুলিতে স্কুলের বই পুরে নিয়ে হাতে খাবার ঝুলিয়ে নিলো।

মা তার সঙ্গে বাইরে পথের ওপর এলেন। বললেন, জড়ি ভাবিস নি, বিলি ওকে সমস্ত দিন দেখবে।

স্কুলে জড়ি পড়াশোনায় মন দিতে পারলো না। ঘড়ির কাঁটা যে এতো আস্তে আস্তে সেকেন্ড মিনিট আর ঘণ্টার ঘর পেরিয়ে চলে সে কথা ভাবতে তার কাছে ক্রমে অসহ্য হোয়ে উঠলো। যা হোক শেষ পর্যন্ত পুবের সূর্য পশ্চিম আকাশের গায়ে মাথা হেলিয়ে দিলো। তারপর এক সময় জড়ি দেখলো, যে সূর্যও দেখা যাচ্ছে না—স্কুল থেকে বেরিয়ে সে বাড়ির পথ ধরেছে, পেরিয়ে এসেছে সেই টিলা যার আড়ালে উজ্জ্বল রোদ সমস্ত আলো নিয়ে আটকে গেছে।

গ্যাবলিয়ানের অবস্থা আরো খারাপ হয়েছে। চোখ তার একেবারে বন্ধ, মাথা মোটে তুলতে পারছে না, মধ্যে মধ্যে অতি কষ্টে হাঁচছে নাক পরিষ্কার করার জন্যে। গায়ের লোম এলো মেলো, সামান্য চিক্কণতাও অবশিষ্ট নেই। বিলি তার গা ঘষছে আস্তে আস্তে।

—বিলি, ওকি বাঁচবে না?—জড়ির গলা যেন কাঁপতে লাগলো।

এ প্রশ্নের কোনও উত্তর দিলো না বিলি। তার ডান হাতের একটা আঙুল গ্যাবলিয়ানের গলার নীচে এক জায়গায় দিয়ে বললো, এইখানে হাত দাও।

জড়ি দেখলো কুলের বিচির মতো কি একটা সেখানে রয়েছে।

বিলি বললো, ওটা পেকে উঠলে আমি কেটে দেবো। পুঁজ বেরিয়ে গেলে গ্যাবলিয়ান ভালো হোয়ে যাবে।

—কি অসুখ করেছে বিলি?—আবার আকুল প্রশ্ন করলো জড়ি।

এবারও কোনো উত্তর দিলো না বিলি। বোঝা গেল উত্তর দেওয়ার কোনো ইচ্ছা তার নেই। উলটে সে বললো, আমি এখন গরম জলের সেঁক দেবো। তুমি সাহায্য করবে জড়ি?

—করবো।

বিলি আর কোনো কথা বললো না, রান্নাবাড়ির দিকে চলে গেল।

গরম জলের সেঁক দেওয়ার পর গ্যাবলিয়ান চোখ খুললো। মনে হোল সে অনেকটা সুস্থ।

সন্ধ্যা হোয়ে গেছল। বিলির সঙ্গে জড়ি বাড়ি ফিরে এলো। আসবার সময় সে মুরগীর খোয়াড় পেরিয়ে এলো, একবারও তার মনে পড়লো না আজ সে মুরগীদের খাওয়ায় নি, খড়কুটো বিছায় নি, ঘরের দরজা বন্ধ করে নি।

খাওয়ার টেবিলে কার্ল কোনো কথা বললেন না। বিলি খাওয়া শেষ করে গ্যাবলিয়ানের কাছে শোওয়ার জন্যে দুটো কম্বল নিয়ে চলে গেল। মা উঠে গিয়ে একবার আগুন খুঁচিয়ে দিলেন।

বিলিকে একবার জড়ি বলেছিল তার সঙ্গে সে গ্যাবলিয়ানের কাছে শুতে যাবে। বিলি রাজি হোল না, বললো, কোনো দরকার নেই।

কার্ল মজাদার গল্প বলতে আরম্ভ কোরলেন হঠাৎ। কিন্তু তজ আর তা ভালো লাগলো না জড়ির। ছেলের মুখ দেখে সেকথা বুঝতে পারলেন কার্ল। তিনি শুতে চলে গেলেন।

একটা লণ্ঠন হাতে নিয়ে জড়ি আবার আস্তাবলের দিকে গেল। গিয়ে দেখলো শুকনো খড় বিছিয়ে বিলি ঘুমোচ্ছে। বিলিকে না জাগিয়ে সে গ্যাবলিয়ানের গায়ে হাত বুলালো। গ্যাবলিয়ান চোখ খুলে জড়ির দিকে চাইলো। আনন্দে জড়ির বুক নেচে উঠলো, না, গ্যাবলিয়ান ভালো আছে। লণ্ঠনটা সে তুলে নিলো। তারপর অন্ধকার পথের ওপর আলো ফেলে ফেলে বাড়ি ফিরে এলো।

জড়ি শুয়ে পড়েছে, মা ঘরে এলেন। জড়ির মুখে হাত বুলিয়ে বললেন, জড়ি, মোটা কম্বলটা নিয়েছিস? আজ ভয়ানক ঠান্ডা পড়বে।

—হ্যাঁ মা। নিয়েছি।

—ভালো করে আজ ঘুমিয়ে নে। গ্যাবলিয়ান অনেক ভালো আছে। কাল সকালে নিশ্চয় সেরে যাবে।

জড়ি কোনো কথা বললো না। দু'হাতে মার যে হাত তার মাথায় ছিল সেইটা চেপে ধরলো।

মা নীচু হোয়ে তার কপালে একটা চুমু খেয়ে লণ্ঠন নিভিয়ে চলে গেলেন।

টিং টিং টিং টিং!—খাবার ঘণ্টা বাজছে। জড়ির ঘুম ভাঙলো। কি ঠাণ্ডাই পড়েছে, কি ঘুমই সে ঘুমিয়েছে! খাবার ঘরে বিলি ইতিমধ্যে এসে গেছে।

—খবর কি বিলি?

—ভালোই অছে।—বিলি একগাল খাবার গলা দিয়ে নামিয়ে দিলো। তারপর বললো, গলার অপারেশনটা এখনি করবো। তাহোলেই ভালো হোয়ে যাবে।

জলখাবার খাওয়া শেষ হোলে বিলি সব চাইতে ধারালো ছুরি বার করলো। শানিয়ে শানিয়ে সেই ছুরিটাকে ক্ষুরের মতন করে তুললো। জড়িকে বললো, তুমি আমার সঙ্গে চলো।

পথ যেতে যেতে জড়ির চোখে পড়লো বৃষ্টির জল পেয়ে নতুন ঘাস গজিয়ে উঠেছে। চারপাশে একটা জলসিক্ত বন্যগন্ধ উৎসারিত হোচ্ছে।

আস্তাবলে পৌঁছে জড়ি দেখলো গ্যাবলিয়ানের অবস্থা পূর্বের মতো। চোখ তার পিঁচুটিতে ভর্তি, মাথা একেবারে নুয়ে পড়েছে, প্রত্যেকটা নিশ্বাসের সঙ্গে একটা ঘড়ঘড় আওয়াজ উঠছে।

বিলি তার সেই শিথিল মাথা বাঁ-হাত দিয়ে তুলে ধরলো এবং বিদ্যুদ্বেগে ধারালো ছুরি দিয়ে সেই ফোঁড়াটা চিরে দিলো। খানিকটা হলদে পুঁজ বেরিয়ে গেল। বিলি কার্বলিক লোশন মাখানো তুলো দিয়ে ক্ষতটা বন্ধ করে দিলো।

—ব্যস্, ভাবনার আর কিছু নেই। পুঁজ বেরিয়ে গেল, এবার সেরে উঠবে। ছুরিটা পরিষ্কার করতে করতে বিলি বললো।

—হুঁ! জড়ি চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলো। বিলির কথায় বোধ হয় সে কোনো উৎসাহ বোধ করলো না।

বিলি অন্য কাজে চলে গেল। জড়ি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে লক্ষ্য করতে লাগলো গ্যাবলিয়ানের চালচলন। ফোঁড়াটা কাটার পূর্বে সে যেমন ছিল ঠিক সেই ভাবে মাথা নীচু করে গ্যাবলিয়ান দাঁড়িয়ে আছে। নিশ্বাস ফেলার সময় আগের মতো ঘড়ঘড় করছে। জড়ি এগিয়ে এলো। গ্যাবলিয়ানের কানের পাশে ধীরে ধীরে টোকা মারলো। আগের ন্যায় আনন্দে কান টান করে মাথা তুললো না গ্যাবলিয়ান।

বিলি ফিরে এলো, জিগ্যেস করলো, কেমন বোধ হোচ্ছে জড়ি?

—ভালো না।

বিলি কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখলো। শেষকালে বললো, হুঁ, নিউমোনিয়া হোয়েছে বলে বোধ হোচ্ছে!

—নিউমোনিয়া!—আকুলকণ্ঠে জড়ি বললো, ও কি তবে বাঁচবে না বিলি?

পূর্বের মতো এক কথায় বিলি এবার আর উত্তর দিলো না। শুধু বললো, দেখা যাক্।

আর একবার গরম জলের সেঁক দেওয়া হোল। সঙ্গে সঙ্গে গ্যাবলিয়ানের অবস্থার উন্নতি হোল। গলার ঘড়ঘড়ানি থেমে গেল। তবে মাথা সে তুলতে পারলো না।

শনিবার চলে গেল। সন্ধ্যার সামান্য আগে জড়ি বাড়ি থেকে তার বিছানা নিয়ে এসে গত রাত্রিতে বিলি যেখানে শুয়েছিল, সেই শুকনো খড়ের ওপর বিছিয়ে ফেললো। এজন্যে সে বাবা অথবা মার অনুমতি নিলো না। সকালে খাবার সময় মার মুখ দেখে সে বুঝেছিল আজ সে যা করবে তাতে মার অমত হবে না।

একটা লণ্ঠন জ্বলতে লাগলো। বিলি যাবার সময় জড়ির বিছানাটা আরো ভালো করে বিছিয়ে দিয়ে গেল, বলে গেল, মাঝে মাঝে গা ঘষে দিয়ো।

রাত্রি ন'টা নাগাদ বাতাস উঠলো। গোলাবাড়ির আশেপাশে সেই বাতাস যেন নেচে বেড়াতে লাগলো দুরন্ত শিশুর মতো। কিছুক্ষণের মধ্যে জড়ির দু' চোখ ভরে ঘুম এলো, সমস্ত দিনের উদ্বেগ আর ক্লান্তি যেন চোখের পাতায় শ্রান্তভরে শুয়ে পড়লো।

কপাট-পড়ার প্রচণ্ড শব্দে তার ঘুম ভেঙে গেল। ধড়মড় করে বিছানার ওপর উঠে বসে সে দেখলো : আস্তাবলের কপাট উন্মোচিত, গ্যাবলিয়ান ঘরের মধ্যে নেই। বাইরে দুর্দান্ত বাতাস বয়ে চলেছে।

লণ্ঠনটা তুলে নিয়ে সেই বাতাস ঠেলে জড়ি বেরিয়ে পড়লো। বেশি দূরে তাকে

যেতে হোল না। একটা গাছতলায় দাঁড়িয়ে মাথা নীচু করে গ্যাবলিয়ান কাঁপছিল। ঘাড়ের চুল ধরে তাকে ফিরিয়ে নিয়ে এলো আস্তাবলে।

বাকি রাত্রি জডির কাটলো বিনানিদ্রায়। মুহূর্তের পর মুহূর্তে বসে বসে সে গ্যাবলিয়ানকে দেখতে লাগলো আর বুঝতে পারলো ওর অবস্থা ক্রমশ খারাপের দিকে চলেছে।

এক সময় ভোরের আলো ফুটে উঠলো। বিলি এলো। তাকে দেখে স্বস্তির নিশ্বাস ফেললো জডি। বিলি অনেকক্ষণ ধরে গ্যাবলিয়ানকে পরীক্ষা করলো। তারপর বললো, জডি, তুমি বাড়ি যাও।

—কেন?

—আমি এখন যা করবো তোমার দেখবার দরকার নেই।

অকস্মাৎ অজানিত এক আশঙ্কায় জডির বুক কেঁপে উঠলো। পরমুহূর্তে সে আর্তনাদ করে উঠলো, বিলি, বিলি তুমি ওকে গুলী করবে নাকি?

না, না, আমি ওর কণ্ঠনালীতে একটা গর্ত করে দেবো, যাতে নিশ্বাস ফেলার কষ্ট না থাকে।—জডিকে জড়িয়ে পরম আশ্বাস দিলো বিলি।

শেষ পর্যন্ত জডি গেল না। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সে দেখলো বিলির সেই তীক্ষ্ণধার শাণিত ছুরি কেমন করে গ্যাবলিয়ানের লাল চামড়া কেটে গর্ত করলো, অজস্র রক্তে ছুরি, বিলির হাত, সার্টের হাতা ভেসে গেল। গ্যাবলিয়ান বাধা দেওয়ার জন্যে দুবার সরে দাঁড়াবার চেষ্টা করলো, কিন্তু তার দুর্বল দেহে সে শক্তির অভাব ঘটেছে বলে বেশ বোঝা গেল।

একটা গোল লাল গর্ত তৈয়ার হোয়ে গেল। একবার নিশ্বাস পড়লো, তৎক্ষণাৎ এক ঝলক রক্ত বিলির হাত নতুন করে প্লাবিত করলো। তারপর সেই গর্ত দিয়ে বাতাস টেনে নিয়ে গ্যাবলিয়ান সহসা শক্তি সঞ্চয় করে সামনের দু'পা তুলে দাঁড়াবার ব্যর্থ প্রচেষ্টা করলো।

জডি এগিয়ে এসে সজোরে তার গলা ধরে মাথা নামিয়ে দিলো। ক্ষিপ্রহস্তে বিলি খানিকটা কারবলিক লোশন মাখিয়ে দিলো সেই ক্ষতে। রক্ত বন্ধ হোয়ে গেল। গ্যাবলিয়ান বেশ আরামে নিশ্বাস ফেলতে লাগলো সেই গর্ত দিয়ে।

ঝিরঝির করে বৃষ্টি নামলো। এমন সময় শোনা গেল খাবারের ঘণ্টি বাজছে আহ্বানের শব্দ তুলে।

বিলির হাত ধোয়া হোয়ে গেছল। সে বললো, জডি তুমি খেয়ে এসো, আমি পরে যাবো। গর্তটা এখন অনবরত পরিষ্কার রাখতে হবে, তা না হোলে বুজে যেতে পারে।

জডি আস্তাবলের বাইরে এলো। সংশয়ের দোলায় সে একবার দুললো। তারপর চললো খাবার ঘরের দিকে। সে সাহস করে বিলিকে বলতে পারলো না কাল রাত্রিতে গ্যাবলিয়ান পালিয়ে গেছল। সে নিজেই তো জায়গা দখল করে বিলিকে কাল আস্তাবলে শুতে দেয় নি।

খাওয়া শেষ হোলে মা তাকে শুকনো জামাকাপড় পরিয়ে বললেন, কিছু দানা গরম করে দেবো।

—না। ও আর খেতে পারছে না।—কথাটা বলে জডি ছুটে বাইরে গেল।

আস্তাবলে সে এসে পেঁছিলে বিলি তাকে একটা কাঠির ডগায় কি করে তুলো জড়িয়ে গর্তটা পরিষ্কার রাখতে হবে বোঝাচ্ছে, এমন সময় কার্ল এলেন।

কিছুক্ষণ ধরে দেখবার পর তিনি বললেন, স্যালিনাসে যাচ্ছি। জডি, তুমি আমার সঙ্গে চল।

—না।—জডি ঘাড় নাড়লো।

—না! না মানে? তুই আর এর মধ্যে থাকতে পাবি না। চল আমার সঙ্গে।—কার্লের কণ্ঠস্বর কঠিন হোয়ে উঠলো।

—কেন তুমি জ্বালাতন করছো? ওর ঘোড়ার কাছে ও থাকবে না তো কি আমরা থাকবো?—বিলি অকস্মাৎ কার্লকে খিঁচিয়ে উঠলো।

আর কোনো কথা না বলে কার্ল চলে গেলেন।

সমস্ত দুপুর বিশেষ কিছু সংঘটিত না হোয়ে অতিবাহিত হোল। বৃষ্টি বন্ধ হোয়ে গেল। ধীরে ধীরে বাতাস বইতে লাগলো। আকাশ পরিষ্কার ঝক্‌ঝকে নীলে যেন হাসতে লাগলো। এক ঝলক রোদও উঠলো। সেই সোনার আলোয় গ্রাস পাখির দল অনাবিল কলগুঞ্জন ছড়িয়ে দিলো। মুহূর্তে মধ্যে সমস্ত পরিবেশ পরিবর্তিত হোয়ে গেল।

গর্তটা পরিষ্কার করতে করতে এক সময় জডি চমকে উঠলো। তার হাত থেকে তুলো জড়ানো কাঠিটা পড়ে গেল। গ্যাবলিয়ানের গায়ের লোম সমস্ত মসৃণতা এবং ঔজ্জ্বল্য হারিয়ে দাঁড়িয়ে উঠেছে। ও আর বাঁচবে না। জডির সমস্ত মুখ পাণ্ডুর হোয়ে গেল। এর আগে সে কুকুর আর গরু মরবার সময় এমন ধারা বিবর্ণ লোমের উৎক্ষেপণ দেখেছে......

সন্ধ্যার পূর্ব মুহূর্তে মা এলেন আস্তাবলে। দুপুরে আজ জডি খেতে যায় নি। কোনো কথা তিনি বললেন না। জডির হাত থেকে সেই তুলো জড়ানো কাঠিটা টেনে নিলেন আর তার সামনে ধরে দিলেন গরম এক প্লেট সব্জির তরকারি আর বড়ো দু'টুকরা রুটি।

মার মুখের দিকে একবার চেয়ে জডি নিঃশব্দে সেই খাবার খেয়ে নিলো। মা চলে গেলেন জডির মাথার চুলে হাত বুলিয়ে।

সন্ধ্যার অন্ধকার নেমে এলো। বিলি একবার এলো। লণ্ঠন বদলে একটা তেল-ভর্তি লণ্ঠন রাখলো। তারপর কয়েক সেকেণ্ড দাঁড়িয়ে গ্যাবলিয়ানের অবস্থা দেখে নীরবে বেরিয়ে গেল আস্তাবলের দরজা টেনে দিয়ে।

অন্ধকার ঘনিয়ে গাঢ়তর হোয়ে উঠলো। বাতাসের কলরব অধিকতর বর্ধিত হোল।

সেই নীরন্ধ্র অন্ধকার আর গর্জমান বাতাস দ্বিখণ্ডিত করে কর্কশ স্বরে পেঁচার দল ডাকতে লাগলো। কিচকিচ করে কয়েকটা ইঁদুর আস্তাবলে এলো, তারপর আলো আর মানুষ দেখে সরে গেল অন্ধকারে।

দিনের আলো সমস্ত আস্তাবলটাকে আলোকিত করেছে এমন সময় জড়ির ঘুম ভাঙলো। বিছানার ওপর উঠে বসে সে দেখলো দরজা উন্মোচিত—গ্যাবলিয়ান অন্তর্হিত।

বিছানা ছেড়ে লাফিয়ে উঠলো সে। তারপর দিনের আকাশ প্লাবিত আলোয় ছুটে বেরিয়ে এলো। মরকত বর্ণের ঘাসের আস্তরণের ওপর শুভ্র মুক্তোর মতো উজ্জ্বল হোয়ে রয়েছে শিশির। আর তারই ওপর গ্যাবলিয়ানের নালবাঁধানো পায়ের দাগ একটির পর একটি রেখায়িত।

সেই দাগ ধরে জড়ি ছুটে চললো। দূরের টিলাটার দিকে চলে গেছে দাগটা বিসর্পিল গতিতে। যেতে যেতে অকস্মাৎ যেন কিসের ছায়া পড়লো, আলো যেন আবৃত হোয়ে গেল। জড়ি ওপর দিকে চাইলো। মাথার ওপরের আকাশে এক ঝাঁক কালো শকুন উড়ছে। রুদ্ধশ্বাস জড়ি একবার দাঁড়ালো। সামনের টিলার পারেই শকুনের ঝাঁক তরতরণ করলো।

অবরুদ্ধ ক্ষোভে আকুল উদ্বিগ্নতায় জড়ির সমস্ত বুক মোচড় দিয়ে উঠলো। একটা গভীর প্রশ্বাস টেনে সে আবার ছুটতে আরম্ভ করলো। ভোরের হালকা বাতাস তার কানের পাশ দিয়ে সোঁ সোঁ করে বেরিয়ে গেল। টিলার মাথায় সে এসে উঠলো। সেখান থেকে সম্মুখের দিকে দৃষ্টি প্রসারিত করে স্থির হোয়ে সে দাঁড়িয়ে পড়লো।

ঝোপজঙ্গল ওখানে বড়ো ঘন। তারি মধ্যে একটা ফাঁকা জায়গায় গ্যাবলিয়ান শুয়ে আছে আর মাঝে মাঝে পা ছুঁড়ছে। তাকে পরিবেষ্টিত করে কালো শকুনের দল বসে আছে। ওরা জানে মৃত্যু আসন্ন।

ঝোপ জঙ্গল ডিঙিয়ে জড়ি নামতে শুরু করলো। ভিজে মাটিতে পা বসে যেতে লাগলো। কাঁটা আর ডালপালা লেগে ক্ষত-বিক্ষত হোয়ে গেল তার সর্বাঙ্গ।

জড়ি নামলো। তখন কিন্তু সব শেষ হোয়ে গেছে। একটা কালো শকুন গ্যাবলিয়ানের মাথার ওপর বসে কালো, কঠিন এবং তীক্ষ্ন-ধার চঞ্চু দিয়ে তার একটা চোখ খুবলে তুলে নিয়েছে। চঞ্চু বেয়ে গড়িয়ে পড়ছে ঘন তপ্ত লাল রক্তধারা।

বনবেড়ালের মতোন গর্জন করে জড়ি সেই শকুনের পালে লাফিয়ে পড়লো। আকাশ কালো করে শকুনের পাল উড়লো, কিন্তু পালের গোদাটার গলা ধরা পড়লো জড়ির কঠিন আঙুলের থাবায়। সজোরে সে একটা পাখার ঝাপটা মারলো জড়িকে। জড়ির মুখ প্রায় ছিঁড়ে গেল সেই আঘাতে। কিন্তু ভয় পেয়ে তার মুঠো শিথিল করলো না সে। বরং বাঁ-হাত দিয়ে ধরলো একটা ডানার অগ্রভাগ। তারপর চললো মানুষ আর শকুনে প্রাণান্তকর যুদ্ধ। শকুনের সেই লাল রক্তাভ চক্ষু যেন অধিকতর রক্তাভ আর ভীতিশূন্য হোয়ে উঠতে লাগলো জড়ির হাত থেকে পরিত্রাণ পাবার প্রচেষ্টায়। আর জড়ির বাহুতে কে যেন অপরিমেয় শক্তির সঞ্চার করলো ওই রক্তাভ চঞ্চুকে চিরদিনের জন্যে প্রাণহীন করে দিতে। মুক্ত অপর পাখার সবল ঝাপ্টায় আর তীক্ষ্ন নখরের নির্মম প্রয়োগে জড়ির দেহের বহু স্থান ক্ষত-বিক্ষত হোয়ে গেল। তবু, তবু সে তার লৌহমুষ্টি শিথিল করলো না। মুষ্টি যখন শিথিল হোল, তখন সেই কালো কুৎসিত দেহ রক্তাক্ত জড়পিণ্ডে পরিণত হোয়ে গেছে। তারই ওপর বারবার সে পদাঘাত করে চললো রুদ্ধ আক্রোশে, অদম্য ক্রোধে আর বিজাতীয় ঘৃণায়।

জ্ঞান ওর ফিরে এলো বিলি বাকের সবল বাহুর বেষ্টনীতে আবদ্ধ হোয়ে। তখন কিন্তু তার সমস্ত দেহ থরথর করে কাঁপছে।

কার্ল পকেট থেকে রেশমী রুমালটা টেনে নিয়ে মুখের রক্ত মুছে দিলেন। জড়ি তখন পরিশ্রান্ত, অবসন্ন, নিশ্চল—সমস্ত শক্তি তার নিঃশেষ হোয়ে গেছে।

কার্ল পায়ের জুতোর ডগা দিয়ে শকুনটার দেহে একটা ঠোক্কর মারলেন। জড়ির দিকে ফিরে বললেন, জড়ি, শকুনটা কিন্তু তোমার গ্যাবলিয়ানকে মারে নি।

—জানি।—জড়ি বিষণ্ণ গলায় উত্তর দিলো।

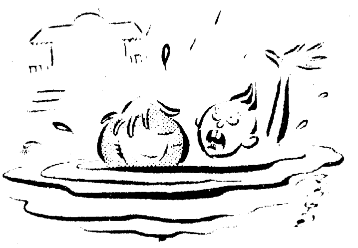
বিলি কিন্তু রেগে উঠলো। দু'হাত দিয়ে সে জড়িকে কোলে তুলে নিলো। কার্লের মুখের দিকে চেয়ে দুচোখে অগ্নিবৃষ্টি করে চীৎকার করে উঠলো, হ্যাঁ, হ্যাঁ জড়ি জানে, খুব জানে। কিন্তু ভগবানের দোহাই তুমি কি হৃদয়ঙ্গম করতে পারো নি শকুনটা গ্যাবলিয়ানের চোখ খায় নি, জড়ির চোখ খেয়েছে।

বাড়ির দিকে ছুটে চলে গেল বিলি। তার কোলের ভিতর জড়ি তখন ফুঁপিয়ে উঠেছে।

অনুবাদক : সমীর ঘোষ

ট্রামে-বাসে

চূড়ামণি যোগে পুণ্যকামী যাত্রীদের স্নানযাত্রা নির্বিঘ্নে সম্পন্ন হইয়াছে এবং জলে ডুবিয়া মরার কোন সংবাদ পাওয়া যায় নাই শুনিয়া আমরা সবাই আনন্দিত হইলাম। কিন্তু বিশু খুড়ো আমাদিগকে স্মরণ করাইয়া দিলেন যে, চূড়ামণি যোগের দিন "এরিয়ান্স ঘাটে" স্নান করিতে যাইয়া 'ভবানী' নামে একটি ছোট ছেলে নাকি



হঠাৎ সাঁতার-জলে ভাসিয়া যায়। ছেলেটির অবশ্য প্রাণনাশ হয় নাই, তবে তার শ্বাস-যন্ত্রটি নাকি সামান্য একটু বিকল হইয়াছে। এই পর্যন্ত বলিয়াই খুড়ো সিমলার উল্লেখ করেন। বলেন, সেখানে যাঁরা চূড়ামণি যোগ উপলক্ষে সমবেত হইয়াছেন, তাঁদের মুক্তি-স্নান এখনও হয় নাই। কোন রকম বিপৎপাতের আগে তাঁরা স্নান সারিয়া ক্লেদমুক্ত হইবেন, এই প্রার্থনাই করিতেছি। তবে কায়েদে আজম একেবারে বিষ্যুতের শেষ বার বেলাটায় বোম্বাই হইত সিমলা যাত্রা করিয়াছেন বলিয়া 'এ-পি' সংবাদ দিয়াছেন—এই জন্যই যা একটু শঙ্কিত হইয়া আছি।

* * * *

কায়েদে আজমের প্রসঙ্গে আরও একটি সংবাদ মনে পড়িয়া গেল। সংবাদটিতে প্রকাশ, তাঁর স্বাস্থ্য বেশ ভালো হইয়াছে এবং সিমলা উপস্থিত হইলে তাঁহার চেহারা দেখিয়া মনে হইল তিনি বেশ মোটাও হইয়াছেন। কারণ জিজ্ঞাসা করিলে কায়েদে আজম নাকি বলিয়াছেন যে, সাংবাদিকদের ছোঁয়াছানি হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া দূরে শান্তিতে কাল কাটাইবার সুবিধা পাওয়ার জন্যই তাঁর স্বাস্থ্যের উন্নতি হইয়াছে। কলেরা-বসন্তের মত সাংবাদিক সংক্রামক ব্যাধি হইতে পাকিস্থানকে রক্ষা করিবার জন্য কোন রকম ইনজেকশানের ব্যবস্থা হইবে কি না, তাহাই আমরা ভাবিতেছি।

* * * *

বিশু খুড়ো স্থানীয় একটি দৈনিকের পৃষ্ঠা হইতে একটি সংবাদ পাঠ করিয়া শুনাইলেন—"জিন্নার বহু স্থান হইতে সর্দিগর্মিতে মৃত্যুর সংবাদ আসিতেছে।" সংবাদটির মর্মান্তিকতায় সত্যই বিভ্রান্ত হইয়া পড়িলাম। কিন্তু পরে নিজের চোখে ভাল করিয়া পড়িয়া বুঝিলাম—এটা ছাপার ভুল। 'জিন্নার বহু স্থান'—জিলার বহু স্থান হইবে, পাকিস্থানের সঙ্গে এর কোন সম্বন্ধ নাই। সম্পাদকের দেখাদেখি কম্পোজিটার আর প্রুফ-রীডারও যদি পাকিস্থানের বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করেন, তাহা হইলে ব্যাপারটা কিন্তু সত্যই বড় দৃষ্টিকটু হইয়া পড়ে।

* * * *

কিভাবে ভারতকে পরাধীনতার স্তর হইতে স্বাধীন ও কমনওয়েলথের মর্যাদা দেওয়া যায়, ইহাই নাকি বিগত পাঁচ বছরের মধ্যে তাঁহার একমাত্র সাধনা ছিল বলিয়া আমেরি সাহেব একটি বিবৃতি দিয়াছেন। সংবাদটি পাঠ করিয়া আমরা 'আ-মরি, আ মরি' বলা ছাড়া কৃতজ্ঞতার আর কোন ভাষা খুঁজিয়া পাইলাম না। অন্য এক সংবাদে প্রকাশ, বাঙলার দুর্ভিক্ষের



জন্য যে আমেরি সাহেব মোটেই দায়ী নহেন, সে সম্বন্ধে স্যার শ্রীবাস্তব নাকি একটি সার্টিফিকেট দিয়াছেন। শ্রীবাস্তবের এই সার্টিফিকেটে বাস্তবতা না থাকিলেও ভারতের স্টেটাস সম্বন্ধে আর সন্দেহের অবকাশ রহিল না। ভারতীয়ের সার্টিফিকেটের দাম স্বীকৃত হইয়াছে দেখিয়া আমরা আনন্দে গদ গদ হইয়া উঠিলাম।

* * * *

এদিকে অন্য একটি স্যারও একটি সারগর্ভ বিবৃতি দিয়াছেন। তিনি হইলেন ভারতের প্রাক্তন অর্থসচিব স্যার জেরেমি রইসম্যান। তিনি বলিতেছেন, ভারত সম্বন্ধে কোন পরিকল্পনাতেই কোন কাজের কাজ হইবে না, কেননা, এখানে জনসংখ্যা বছরে প্রায় এক কোটি করিয়া বাড়িয়া যাইতেছে এবং এই জনবৃদ্ধিই ভারতের দারিদ্র্যের একমাত্র কারণ। অর্থ-সচিব যখন বলিয়াছেন, তখন ইহার পেছনে অর্থ একটা নিশ্চয়ই আছে; শুধু আমরাই তা বুঝিলাম না। যে-কথাটি বুঝিতেছি, সেটা এই যে, যুদ্ধোত্তর পরিকল্পনায় ভারতের ভাগ্যে থাকিবে অষ্টরম্ভা, শুধু মা ষষ্ঠীর উপরই অতঃপর একটি ১৪৪ ধারার নোটিশ জারী হইবে। আমরা বলি, তার চেয়ে ভগবানের কাছে আর একটি মহামারীর প্রার্থনা জানাইলেই সমস্যা সমাধান হইয়া যায়। মহাজন আমেরি আমাদিগকে আগেই জানাইয়া রাখিয়াছেন, দুর্ভিক্ষের উপর একমাত্র হাত ভগবানের। সুতরাং—

* * * *

দুর্ভিক্ষ প্রসঙ্গে পণ্ডিত জওহরলালের উক্তির কথা মনে পড়িল। পণ্ডিতজী বলিয়াছেন যে, তিনি নিজের হাতে সামান্য একটা কীটপতঙ্গও হত্যা করেন না। কিন্তু বাঙলার দুর্ভিক্ষের জন্য দায়ী মুনাফা-খোরদের ফাঁসিতে মৃত্যুর দৃশ্য তাঁহাকে চরম আনন্দ দান করিবে। কিন্তু আমরা জানি পণ্ডিতজী এই আনন্দ হইতে বঞ্চিত হইয়াই থাকিবেন। অন্তত গলায় কাপড় জড়াইয়া ফাঁসীর প্রশ্নই এখন আসে না, কেননা সেই জিনিসটাও মুনাফাখোরদের গাঁইটেই আটকা পড়িয়া আছে।

* * * *

রুশ বিজ্ঞান পরিষদের সাহিত্য ও ভাষা বিভাগের প্রাচ্যসংসদ্ হিন্দী-রুশ ও উর্দু-রুশ অভিধান প্রণয়নের কাজে হাত দিয়াছেন। ইহার পর জাপ-রুশ এবং চীন-রুশ অভিধানও নাকি হইবে। খুব ভাল সংবাদ সন্দেহ নাই। কিন্তু আমরা ভাবিতেছি, বাঙলার প্রতি রুশ-সংসদ এতটা রোষাবিষ্ট হইয়া পড়িলেন কেন ?

* * * *

চন্দ্রলোকে ভ্রমণ করিবার বুকিং ইতি-মধ্যেই আরম্ভ হইয়া গিয়াছে বলিয়া একটি সংবাদ প্রকাশিত হইয়াছে। সংবাদটির প্রতি যথারীতি খুড়োর দৃষ্টি আকর্ষণও করিয়াছিলাম। তিনি আজ হাওড়া আর



শেয়ালদা'র বুকিং অফিসে খোঁজ নিয়া আসিয়া বলিলেন—"গুলি ছাড়বার আর জায়গা পাওনি ? বালি থেকে বর্ধমান যেতে পারিনে, আর ওঁরা যাবেন চন্দ্রলোকে।" খুড়ো বোধ হয় আমাদের চন্দ্রাহতই ভাবিলেন।

বাঙ্গলার কথা

শ্রীহেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ

শ্রীযুত শরৎচন্দ্র বসু ও অন্যান্য রাজনীতিক বন্দী

বাঙলার সকল স্থান হইতে শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র বসুর ও রাজনীতিক কারণে—বিচারে বা বিনা-বিচারে—বন্দী সকলেরই মুক্তির দাবী ধ্বনিত-প্রতিধ্বনিত হইতেছে। শ্রীযুত সত্যরঞ্জন বক্সী, শ্রীযুত সত্যপ্রিয় বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ বহু ঐ শ্রেণীর বন্দী ভগ্নস্বাস্থ্য হইয়াছেন। দেশ তাঁহাদিগের সকলেরই অবিলম্বে বিনাসর্তে মুক্তি চাহিতেছে। যদি শরৎবাবুর মুক্তি সম্বন্ধে বিশেষভাবে আন্দোলন হয়, তবে তাহার কারণ—তাঁহার আটকে বৈশিষ্ট্য আছে ঃ—

(১) ১৯৪১ খৃষ্টাব্দের ১১ই ডিসেম্বর যখন তাঁহাকে গ্রেপ্তার করা হয়, তখন তিনি সাম্প্রদায়িক হাঙ্গামায় ক্ষতবিক্ষত বাঙলায় শান্তি পুনঃপ্রতিষ্ঠার জন্য সম্মিলিত সচিবসংঘ গঠনে আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন এবং আপনিও তাঁহার বিপুল আয়ের আইন-ব্যবসা ত্যাগ করিয়া কংগ্রেসের নির্দিষ্ট মাসিক ৫ শত টাকা পারিশ্রমিকে স্বয়ং অন্যতম সচিব হইবার সংকল্পও করিয়াছিলেন। যেদিন তিনি সেইরূপ সচিবসংঘ গঠনে সমর্থ হ'ন, সেইদিনই তাঁহাকে আটক করা হয়। সেই সময় ভারত-সরকার অতি সংক্ষিপ্ত বিবৃতি প্রদান করিয়াছিলেন—তাঁহার সহিত জাপানীদিগের যেরূপ সম্বন্ধ সম্পর্কে ভারত-সরকার নিঃসন্দেহ হইয়াছেন, তাহাতে তাঁহাকে অবিলম্বে গ্রেপ্তার করা প্রয়োজন। দেশের লোক সেই বিবৃতিতে সন্তুষ্ট হয় নাই এবং হইতে পারে না। যদি সেই অভিযোগ সত্য হয়, তবে আজও কেন সরকার শরৎবাবুকে আদালতে বিচারার্থ পাঠাইয়া তাঁহাদিগের অভিযোগ প্রমাণ করিতে অসম্মত? যদি যুদ্ধজনিত কোন কারণেই তাঁহাকে গ্রেপ্তার করিয়া আটক রাখা হইয়া থাকে, তবে আজ তাঁহাকে মুক্তি দিতে কি আপত্তি থাকিতে পারে? লর্ড মাউণ্টব্যাটেন—দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার প্রধান সেনাপতিরূপে বলিয়াছেন, পূর্ব সীমান্ত হইতে ভারতবর্ষ আক্রান্ত হইবার আর কোন সম্ভাবনা নাই। সে অবস্থায় শরৎবাবুর মুক্তিতে কোনরূপ সামরিক অসুবিধা ঘটিতে পারে না।

(২) সিমলায় লর্ড ওয়াভেল দেশের রাজনীতিক অচল অবস্থার অবসান জন্য নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদিগের সহিত আলোচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছেন। সেজন্য তিনি বিলাতের সরকারের সহিত একমত হইয়া কংগ্রেসের কার্যকরী সমিতির কারারুদ্ধ সদস্যদিগকে মুক্তি দিয়াছেন। কিন্তু কেবল তাঁহাদিগের মুক্তিতেই দেশে অসন্তোষের পরিবেষ্টন দূর হইতে পারে না। কারামুক্ত হইয়া আসিয়া রাষ্ট্রপতি মৌলানা আবুল কালাম আজাদ ও পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু তাহাই বলিয়াছেন। গত ৩০শে জুন সিমলায় শ্রীমতী কমলা দেবী বলিয়াছেন—দেশপ্রেমিকরা কারারুদ্ধ থাকিতে কোন স্থায়ী মীমাংসা সম্ভব হইতে পারে না।

এই প্রসঙ্গে বলা অসংগত নহে যে, ১৯৩১ খৃষ্টাব্দের ২৫শে জানুয়ারী বড়লাট লর্ড আরউইন যখন কংগ্রেসের কার্যকরী সমিতির সদস্যদিগকে মুক্তি দিয়াছিলেন, তখন তিনি শান্তির জন্য আবশ্যক পরিবেষ্টন সৃষ্টিকল্পেই তাহা করিয়াছিলেন। ১৯১৯ খৃষ্টাব্দে মণ্টেগু-চেমস্ফোর্ড শাসন-পদ্ধতি প্রবর্তনকালে রাজা পঞ্চম জর্জ তাঁহার ঘোষণায় বলিয়াছিলেন—নূতন অবস্থার আরম্ভে যাহাতে অতীত তিক্ততার অবসান ঘটে সেইজন্য তিনি—যাঁহারা দেশের স্বাধীনতা লাভের আগ্রহে আইনভঙ্গ করিয়াছেন তাঁহাদিগকে মুক্তি দিবার জন্য বড়লাটকে নির্দেশ দান করিলেন। সরকারের বিরুদ্ধে কোন কাজ করার অপরাধে যাঁহারা বিচারে অথবা কোন বিশেষ আইনে বা আদেশে স্বাধীনতায় বঞ্চিত তাঁহাদিগকেও মুক্তিদান করা হইবে। বলা বাহুল্য, শরৎচন্দ্র প্রমুখ ব্যক্তিরা বিশেষ আইনে বিনাবিচারে আটক আছেন। সেজন্যও তাঁহাদিগকে অবিলম্বে ও বিনাসর্তে মুক্তিদান কর্তব্য।

রাজা পঞ্চম জর্জের নির্দেশে বিলাতের প্রধান মন্ত্রী লয়েড জর্জ যখন আইরিশ নেতা মিস্টার ডিভ্যালেরাকে লণ্ডনে মীমাংসা সম্মেলনে আমন্ত্রণ করেন, তখন তিনি নরহত্যার অভিযোগে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত আইরিশ কর্মী কমাণ্ডাণ্ট ম্যাকিওনকেও মুক্তি দিয়াছিলেন। শরৎচন্দ্র প্রমুখ ব্যক্তিরা কি তদপেক্ষাও অধিক অপরাধে অপরাধী?

(৩) লয়েড জর্জ যখন মিস্টার ডি ভ্যালেরাকে আমন্ত্রণ করেন তখন তিনি উত্তর আয়র্লণ্ডের নেতা স্বীকার করিয়া তাঁহাকে আমন্ত্রণ করিয়াছিলেন। সে হিসাবেও কি শরৎবাবু মুক্তি পাইয়া সিমলার আলোচনায়—পরামর্শদাতৃরূপেও—যোগদান করিবার অধিকারী হইতে পারেন না? বড়লাট লর্ড ওয়াভেল যে নিয়মে সম্মেলনে প্রতিনিধি মনোনয়ন করিয়াছেন, তাহাতে অনেক ত্রুটি আছে; বাঙলা হইতে খাজা স্যার নাজিমুদ্দীনকে আমন্ত্রণ সে সকলের অন্যতম। কারণ, খাজা স্যার নাজিমুদ্দীন বাঙলার শেষ সচিবসংঘে প্রধান-সচিব ছিলেন বটে, কিন্তু তিনি ইচ্ছা করিয়া পদত্যাগ করেন নাই; ব্যবস্থা পরিষদের অনাস্থায় তাঁহাকে পদত্যাগ করিতে বাধ্য করা হইয়াছিল। কাজেই তিনি পরিষদেও নেতৃত্ব দাবী করিতে পারেন না। সে অবস্থায় বিরোধীদলের নেতা শরৎচন্দ্রকে আমন্ত্রণ করা সংগত ছিল।

(৪) শরৎবাবুর স্বাস্থ্যভঙ্গ হইয়াছে। সম্প্রতি সংবাদ পাওয়া গিয়াছে, তাঁহার দৃষ্টিশক্তি ক্ষীণ হইতেছে। তাঁহার স্বাস্থ্যের জন্যও বহুদিন পূর্বে তাঁহাকে মুক্তি প্রদান প্রয়োজন ছিল। বর্তমান সময়ে তাঁহাকে সেজন্যও মুক্তি প্রদানে কোন বাধা থাকিতে পারে না।

এই সকল কারণ বিবেচনা করিয়া আমরা মনে করি—লর্ড ওয়াভেল এবিষয়েও ভুল করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, তাঁহার পরিকল্পিত শাসন পরিষদ যদি গঠিত হয়, তবে তাহার সদস্যগণ ও প্রাদেশিক সরকার বিবেচনা করিয়া ১৯৪২ খৃষ্টাব্দের হাঙ্গামা সম্পর্কে যাঁহারা বন্দী আছেন, তাঁহাদিগের সম্বন্ধে ব্যবস্থা করিবেন। তাঁহার এই উক্তিতেও ১৯৪২ খৃষ্টাব্দের হাঙ্গামা সম্পর্কে বন্দিগণ ব্যতীত রাজনীতিক কারণে বন্দীদিগকে মুক্তিদানের কোনরূপ উল্লেখ নাই।

সিমলা সম্মেলনে কংগ্রেসের প্রতিনিধিরা যে রাজনীতিক কারণে বন্দীদিগের মুক্তি ব্যতীত যোগদান করিতে অস্বীকার করেন নাই, তাহাতেও লর্ড ওয়াভেলের পক্ষে সেই সকল বন্দীকে মুক্তি দিয়া উদারতার ও মীমাংসার জন্য আন্তরিক আগ্রহের পরিচয় প্রদানের সুযোগ ছিল। তিনি যে সে সুযোগ গ্রহণ করিয়া তাহার সম্যক সদ্ব্যবহার করিতে পারিলেন না, ইহা আমাদিগের পক্ষে যেমন দুঃখের বিষয়, ব্রিটিশ রাজনীতিকদিগের পক্ষে তেমনই দূরদৃষ্টির অভাবদ্যোতক। কারণ, দেশপ্রেমিক—দেশসেবক কর্মীদিগকে কারাগারে রাখিয়া যে মীমাংসা হইতে পারে, তাহা কখনই সন্তোষজনক হয় না—কাজেই তাহার স্থায়িত্ব সম্ভাবনাও ক্ষীণ হয়।

লর্ড ওয়াভেল যদি তাঁহার পরিকল্পিত শাসন-পরিষদে যোগদান জন্য মনোনয়নের সঙ্গে সঙ্গেও রাজনীতিক কারণে বন্দীদিগকে মুক্তি দেন, তবেই মনোনীত ব্যক্তিরা দেশের লোকের সদিচ্ছা, সহযোগ ও সহানুভূতি লাভ করিয়া কর্তব্য সম্পাদনে অগ্রসর হইতে পারিবেন—নহিলে নহে।

বস্ত্রাভাব

বাঙলায় বস্ত্রাভাবের উপশম হয় নাই। দুর্ভিক্ষ কমিশন বলিয়াছেন, বাঙলায় যখন অন্নাভাব ঘটে, তখন যে ভারত-সরকার ও প্রাদেশিক সরকার—অভাব নাই বলিয়া মিথ্যা প্রচারকার্য পরিচালিত করিয়াছিলেন, তাহাতে ইষ্ট সাধিত না হইয়া তাহা অনিষ্টের কারণই হইয়াছে। বস্ত্র সম্বন্ধেও তাহাই হইয়াছে। কয় বৎসর হইতে সরকার বস্ত্র সরবরাহ সম্বন্ধে যে সকল আশা দিয়া আসিয়াছেন, সে সকল যে ভিত্তিহীন, কার্যকালে তাহা প্রতিপন্ন হইয়াছে। তদ্ভিন্ন 'হিন্দুস্থান স্ট্যাণ্ডার্ড' ও 'আনন্দবাজার পত্রিকা' প্রমাণ করিয়াছেন, বাঙলা হইতে চীনে অবাধে বস্ত্র রপ্তানির ব্যবস্থার দায়িত্বও সরকারের। বাঙলা হইতে তিব্বতেও বস্ত্র রপ্তানি হইয়াছে। বোধ হয় সেইজন্যই বিহারে উড়িষ্যায় বস্ত্রাভাব বাঙলার অভাবের মত তীব্র হইতে পারে নাই। বাঙলায় এই অভাব, বোধ হয়, আরও এক কারণে তীব্র ও জটিল হইয়াছে। বস্ত্র বিক্রয় ব্যাপারেও বাঙলা সরকার সাম্প্রদায়িকতা বর্জন করিতে পারেন নাই—এমন কি জানা গিয়াছে, হিন্দু ও মুসলমান বস্ত্রব্যবসায়ীর সংখ্যানুপাত যেমনই কেন হউক না—লাভের অংশ দুই সম্প্রদায়ের ব্যবসায়ীদিগের মধ্যে সমভাবে বণ্টন করিবার নির্দেশ দিয়া বিস্ময়কর সাম্প্রদায়িক মনোভাবের পরিচয় প্রদান করিয়াছেন। ১৯৪২ খৃষ্টাব্দ হইতে দুর্ভিক্ষজনিত দুর্দশায় বাঙালীর পরিধের নিঃশেষ হইলেও লোক নূতন বস্ত্র কিনিতে পারে নাই। সেইজন্য অন্যান্য প্রদেশের তুলনায় বাঙলায় লোকপ্রতি বস্ত্রের পরিমাণ অধিক করা প্রয়োজন হইলেও বাঙলায় সরকার মাত্র ১০ গজ কাপড়ের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। পঞ্জাবের বরাদ্দ—১৮ গজ! সরকারের হিসাবও বুঝা যায় না। তাঁহারা অল্পদিন পূর্বে বলিয়া-

ছিলেন—বাঙলায় প্রতি মাসে স্থানীয় কল হইতে ১০ হাজার ও বাহির হইতে ২০ হাজার গাইট বস্ত্র প্রদান করা হইতেছে। যদি তাহাই হয়, তবে গত ২ মাসে মোট ৬০ হাজার গাইট কাপড় আসিয়াছে। তাহার সহিত যে কাপড় লুকান ছিল ও ধরা পড়িয়াছে তাহা (৩০ হাজার গাইট) ধরিলে যে ৯০ হাজার গাইট হয়, তাহার মধ্যে মফঃস্বলে ৭ হাজার ৭ শত ও কলিকাতায় ২ হাজার গাইট দেওয়া হইয়াছে। তাহা হইলে অবশিষ্ট কাপড় কোথায় গেল? সরকার এই হিসাবের অনৈক্য সম্বন্ধে কি কৈফিয়ৎ দিবেন?

নানাস্থান হইতে বস্ত্রাভাবে আত্মহত্যার সংবাদও পাওয়া যাইতেছে। এদিকে রাজসাহীর জিলা ম্যাজিষ্ট্রেট মিস্টার ম্যাকনিল লোকের অভিযোগ প্রকাশপথও ভারতরক্ষা নিয়মের দ্বারা বন্ধ করিতে কৃতসংকল্প হইয়াছেন। তিনি বলেন, কাপড়ের চাহিদা যখন সরবরাহ অপেক্ষা অধিক, তখন লোক যদি কাপড়ের জন্য বিক্ষোভ প্রকাশ করে, তবে তাহার ফলে কেবল হতাশায় পীড়িত হইবে—তাহাতে অসন্তোষ বৃদ্ধি অনিবার্য। অর্থাৎ অভাব যত অধিকই হউক না—দেশের লোক বিনা প্রতিবাদে তাহা সহ্য করিবে—সহ্য না করিলে তাহারা দণ্ডিত হইবে। ভারতরক্ষা নিয়মের এইরূপ প্রয়োগেও যেন কেহ বিস্ময়ানুভব না করেন। সেইজন্যই রবীন্দ্রনাথ একবার বলিয়াছিলেন—আমাদিগের দুঃখ-দুর্দশা আমাদিগকে নীরবেই সহ্য করিতে হইবে—সেজন্য যেন আমরা আমাদিগের শাসকদিগের নিকট কোনরূপ প্রতিকার লাভের আশা না করি।

বাঙলায় বস্ত্র সম্বন্ধে যে অবস্থা ঘটিয়াছে, তাহাতে আইনের ভয় দেখাইয়া লোকের অভিযোগের প্রকাশ বন্ধ করিলে তাহা আমলাতন্ত্রের পক্ষে সুবুদ্ধির পরিচায়ক হইবে কি?

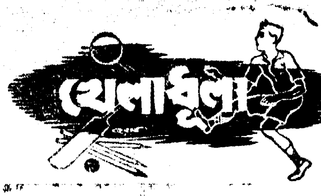
ধান্য ও চাউল ব্যবসা

গত পূর্ব রবিবারে বর্ধমান জিলার ধান্য ও চাউল ব্যবসায়ীদিগের এক সম্মিলনে ব্যবসায়ীদিগের অভিযোগের আলোচনা হইয়া গিয়াছে। বর্ধমানে এখনও সরকারের এক "চীফ এজেণ্ট" সরকারের জন্য ধান্য ও চাউল কিনিতেছেন। "চীফ এজেণ্ট" প্রথার নিন্দা করিয়া দুর্ভিক্ষ কমিশন বলিয়াছেন, বোম্বাই, মাদ্রাজ, মধ্যপ্রদেশ, উড়িষ্যা প্রভৃতি কোন প্রদেশেই সরকার ধান্য ও চাউল কিনিবার ভার "এজেণ্টকে" দেন নাই—যে সকল স্থানে প্রথমে সেরূপ ব্যবস্থা করিয়াছেন, সে সকল স্থানেও পরে তাহা বর্জন করিয়াছেন; কেবল বাঙলায় সেই প্রথার অনিষ্ট লক্ষ্য করিয়াও তাহা বর্জন করেন নাই! আবার বাঙলায় চাউল কলগুলিও "এজেণ্টের" নিয়ন্ত্রণাধীন হওয়ায় অবস্থা আরও শোচনীয় হইয়াছে। এই প্রথায় সরকার যে দেশবাসীর সহযোগ লাভ করিতে পারেন না, তাহাও কমিশন সুস্পষ্টরূপে বলিয়াছেন। কেন যে বাঙলায় ঐ প্রথা বর্জিত হয় নাই, তাহার কারণ আমরা অনুমান করিতে পারি—কিন্তু তাহা কমিশন ব্যক্ত করেন নাই। বাঙলায় ধান্য ও চাউল ক্রয়ের হিসাব সম্বন্ধে নানা বিশৃঙ্খলার কথা কেন্দ্রীয় ব্যবস্থা পরিষদেও উল্লেখিত হইয়াছে। কিন্তু বাঙলার ভূতপূর্ব সচিবসংঘ কোন "এজেণ্টের" গুণ কীর্তন করিয়া, সরকারী ব্যয়ে, পুস্তিকা প্রচার করিতেও কুণ্ঠানুভব করেন নাই।

বর্ধমানে ব্যবসায়ীরা এই প্রথার বর্জন চাহিয়াছেন। বর্ষা আরম্ভ হইয়াছে, এই সময় কৃষকগণ ধান্য বিক্রয় করিয়া ২।৩ মাসের ব্যবহার্য নানা দ্রব্য কিনিবে—ইহার পরে গ্রামের পথে গরুর গাড়িও চলিবে না। কাজেই অবিলম্বে তাহাদিগকে "এজেণ্টের" খেয়ালের বশবর্তিতা মুক্ত করা প্রয়োজন। "এজেণ্টে"র আর এক ব্যবহারের প্রতিবাদ করা হইয়াছে। বাঙলায় একইরূপ ধান্যের চাষ হয় না। ধান্যও নানারূপ এবং ভিন্ন ভিন্ন ধান্যের মূল্যও ভিন্ন ভিন্ন রূপ। কিন্তু "এজেণ্ট" সর্ববিধ ধান্যের মূল্য একই দেন। ফলে, যেসব ধান্যের ফলন অপেক্ষাকৃত অধিক, তাহার চাষ লোপ পাইবার সম্ভাবনা ঘটিয়াছে। ইহাতে ভবিষ্যতে ব্যবসার কিরূপ ক্ষতি অনিবার্য, তাহা সহজেই অনুমেয়। ব্যবসায়ীদিগের একটি অভিযোগ—"এজেণ্ট ইচ্ছামত সময়ে ধান্য ক্রয় করেন—কৃষক বা ব্যবসায়ীদিগের সুবিধা বা অসুবিধা বিবেচনা করেন না।

যদি এই কথাই বলা হয় যে, যুদ্ধজনিত অস্বাভাবিক অবস্থায় সরকার ধান্য ও চাউল সম্বন্ধে নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা করা প্রয়োজন মনে করিয়াছিলেন, তবে এখনও সে ব্যবস্থা কি কারণে রক্ষা করা হইতেছে? যে নিয়ম কৃত্রিম—ব্যবসার সাধারণ নিয়মের বিরোধী ও অনিষ্টকর, তাহা সামরিক কারণে বা দুর্ভিক্ষকালে সমর্থনযোগ্য হইলেও, তাহার পরে রক্ষা করিবার কোন সংগত যুক্তি থাকিতে পারে না। ব্যবসা যাহাতে তাহার স্বাভাবিক খাতে প্রবাহিত হয়, সেই ব্যবস্থা করাই সংগত ও প্রয়োজন।

বর্ধমানে ব্যবসায়ীরা যে দাবী জানাইয়াছেন, সেই দাবী বাঙলার সকল স্থান হইতেই কৃষক, ব্যবসায়ী ও জনসাধারণ জানাইতেছেন ও জানাইবেন। সরকারের সরাসরি বা "এজেণ্টের" মারফতে লোকের নিত্যপ্রয়োজনীয় ও অবশ্য প্রয়োজনীয় পণ্যের ব্যবসায় করিবার অধিকার কিরূপে প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে? আমরা বাঙলায় ব্যবসার স্বাভাবিক নিয়মের পুনঃপ্রবর্তন সমর্থন করি।



ফুটবল

কলিকাতা ফুটবল লীগ প্রতিযোগিতার প্রথম ডিভিসনের সকল খেলা শেষ হইতে আর দুই সপ্তাহ বাকি আছে। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় এই যে, এখনও পর্যন্ত কোন্ দল লীগ-চ্যাম্পিয়ন হইবে, কেহই জোর করিয়া বলিতে পারেন না। লীগের দ্বিতীয়ার্ধের সূচনায় ভবানীপুর দল, ইস্টবেঙ্গল, মোহনবাগান প্রভৃতি দল অপেক্ষা কয়েক পয়েণ্টে অগ্রগামী হওয়ায় অনেকের ধারণা হইয়াছিল ভবানীপুর দল চ্যাম্পিয়ন হইবে। কিন্তু বর্তমানে যেরূপ অবস্থা দাঁড়াইয়াছে, তাহাতে ভবানীপুর দল সম্পর্কে এত বড় আশা পোষণ করা বিশেষ যুক্তিযুক্ত হইবে না। মোহনবাগান ক্লাব এই দলের সহিত সমানে পাল্লা দিতেছে। গত দুই বৎসরের চ্যাম্পিয়ন মোহনবাগান সহজে পিছাইয়া পড়িবে, ইহা ধারণা করাই অন্যায় হইবে। উপরন্তু ইস্ট-বেঙ্গল ক্লাবও ইহাদের তুলনায় খুব কম যাইতেছে না। বরঞ্চ এই দলের খেলা ক্রমশ যেরূপ উন্নততর হইতেছে, তাহাতে ভবানীপুর ও মোহনবাগান—এই দুইটি দলকে পশ্চাতে ফেলিয়া তাহার চ্যাম্পিয়ন হইবারই যথেষ্ট সম্ভাবনা দেখা দিয়াছে। সুতরাং এইরূপ অবস্থায় কোন একটি দল চ্যাম্পিয়ন হইবেই বলা অন্যায় হইবে। তবে এই তিনটি দলের বর্তমান খেলার অবস্থা দেখিয়া এইটুকু বলা চলে যে, ইস্ট-বেঙ্গল দলেরই সম্ভাবনা বেশি। যে ভাবে ইঁহারা প্রত্যেক খেলায় খেলিতেছেন, ঠিক এই অবস্থা যদি শেষ খেলা পর্যন্ত বজায় রাখিতে পারেন, ভবানীপুর বা মোহনবাগান দলের সাধ্য নাই ইহাদের লীগ-চ্যাম্পিয়নশিপ হইতে বঞ্চিত করে। আগামী সপ্তাহে এই সম্পর্কে জোর করিয়া কিছু বলার মত অবস্থা হইবে বলিয়া আশা করি।

তিনটি দলের মধ্যে চ্যাম্পিয়নশিপ লইয়া তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতা আরম্ভ হওয়ায় সাধারণ ক্রীড়ামোদিগণের মধ্যেও এই তিনটি দলের খেলা দেখিবার জন্য বিশেষ উৎসাহ দেখা দিয়াছে। ফলে হইয়াছে এই তিনটি দলের যেদিন খেলা থাকে, সেদিন খেলার মাঠ জনসমুদ্রে পরিণত হয়। সাধারণ দর্শকগণ সবুজ গ্যালারিতে স্থান পাইবার জন্য বেলা ১২টা হইতেই মাঠে সমবেত হইতে আরম্ভ করেন। এক এক দিন মাঠে খেলা দেখিবার জন্য ৩।৪ লক্ষ দর্শক জমায়েৎ হয়। কলিকাতায় এমন একটি মাঠ নাই, যেখানে এত অধিক দর্শককে স্থান দিতে পারে। বিরাট স্টেডিয়াম ব্যতীত এই সমস্যা সমাধান হওয়া অসম্ভব। গত দুই বৎসর হইতে শোনা যাইতেছে কলিকাতায় স্টেডিয়াম নির্মিত হইবে, কিন্তু এখনও পর্যন্ত কার্যকরী কোন ব্যবস্থা হইয়াছে বলিয়া আমরা শুনি নাই। শীঘ্র শুনিতে পাইলে বিশেষ সুখী হইব।

যদি স্টেডিয়াম শীঘ্র নির্মাণের ব্যবস্থা না হয় আমরা জোর করিয়াই বলিতে পারি, আগামী বৎসরে অনেকেই খেলা দেখা ছাড়িয়া দিবেন। এই বৎসরেই অনেকে দিতে আরম্ভ করিয়াছেন। বিশেষ করিয়া গত ৩০শে জুন ক্যালকাটা মাঠে মোহনবাগান ও মহমেডান স্পোর্টিং দলের খেলা দেখিতে গিয়া হাজার হাজার নিরীহ দর্শক যেভাবে নিগৃহীত, লাঞ্ছিত, অবমানিত হইয়াছেন, তাহার পর যাঁহাদের আত্মসম্মানজ্ঞান আছে, তাঁহারা কখনই মাঠের ধারে যাইতে রাজি হইবেন না। আর কোন্ ভরসায়ই বা যাইবেন. এইরূপ ঘটনা যে আর ঘটিবে না, তাহার কোনই নিশ্চয়তা তাঁহারা এ পর্যন্ত পান নাই? আর পাইবেন বলিয়াও মনে হয় না। এই সকল ঘটনার জন্য যাঁহারা প্রকৃত দায়ী, তাঁহাদের বিরুদ্ধে দাঁড়াইয়া প্রতিবাদ করা তো দূরের কথা, প্রতিবাদের সুর তুলিবার মত কোন ক্লাব বা প্রতিষ্ঠান ময়দানে আছে বলিয়া আমাদের ধারণা নাই। এই ধরণের ছোটখাট ঘটনা প্রতি বৎসরই আমাদের কর্ণগোচর হইয়াছে। শুনা যাইতেছে, বাঙলার ফুটবল পরিচালনার ভার যাঁহাদের উপর ন্যস্ত, সেই আই এফ এ'র পরিচালকমণ্ডলী এইরূপ অপ্রীতিকর ঘটনার অবসানের জন্য চেষ্টা করিতেছেন। দেখা যাউক, ইঁহাদের প্রচেষ্টার ফল কি দাঁড়ায়।

মুষ্টিযুদ্ধ

বাঙলা দেশে মুষ্টিযুদ্ধ পরিচালনার জন্য দুইটি প্রতিষ্ঠান গঠিত হইয়াছে। এই দুইটি প্রতিষ্ঠান নিজ নিজ শক্তি অনুযায়ী কার্য করিতেছে। তবে এইভাবে দুইটি প্রতিষ্ঠান একই বিষয়ের জন্য থাকায় অনেক অসুবিধাও আছে। ইহা সাধারণে উপলব্ধি না করিলেও, যাঁহারা বিভিন্ন খেলাধূলার বিভাগ পরিচালনা করিয়া থাকেন, তাঁহারা ইহা ভাল করিয়াই জানেন। তাহা ছাড়া এই দুইটি প্রতিষ্ঠানের একত্রে কাজ করিবার বাধা কি? উদ্দেশ্য যখন এক, তখন দলাদলি করিয়া উদ্দেশ্যের সফলতায় অন্তরায় সৃষ্টি করা হইতেছে না কি? অনেকক্ষেত্রেই কি একে অপরের কার্যে বাধা দিতেছেন না? বেঙ্গলী বক্সিং এসোসিয়েশন সম্পর্কে এইটুকু বলা চলে যে, তাঁহাদের প্রচেষ্টার ফলে এইটুকু হইয়াছে, বাঙালী যে মুষ্টিযুদ্ধে অন্য যে-কোন দেশের মুষ্টিযোদ্ধার সহিত লড়িতে পারে, তাহা প্রমাণিত হইয়াছে। ইহা ছাড়া সারা ভারতে বাঙালী মুষ্টিযোদ্ধাদের যে সম্মানিত স্থান হইয়াছে, তাহাও বেঙ্গলী বক্সিং এসোসিয়েশনের সভ্যদের জন্য সম্ভব হইয়াছে। এমনকি, সম্পূর্ণ বাঙালী দল বৈদেশিক মুষ্টিযোদ্ধাদের বিরুদ্ধে একাধিকবার লড়িয়া সাফল্যলাভ করিয়াছে। ইহা কি খুব গৌরবের বিষয় নহে? বাঙলা দেশে বাঙালীর সম্মান সকল বিষয়ে প্রতিষ্ঠিত হয়, ইহা সকলেরই কাম্য। সুতরাং যে প্রতিষ্ঠান সেই কার্যে ব্রতী, তাহারা সাধারণের সহানুভূতি পাইতে বাধ্য। এই জন্যই বেঙ্গল এমেচার বক্সিং ফেডারেশন কার্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়া বেঙ্গলী বক্সিং এসোসিয়েশনের ন্যায় জনপ্রিয়তা লাভ করিতে পারেন নাই।

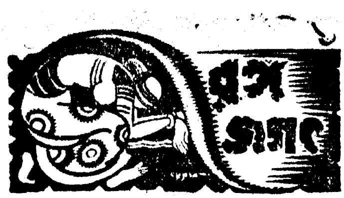

জননীর তুষ্টি
শিশুর
LILY BRAND BARLEY
FOR INFANTS & INVALIDS
THE LILY BISCUIT CO
PROP/— P. SETT & CO
ULTADANGA CALCUTTA
লিলি ব্র্যাণ্ড বার্লি
যুবকের তুষ্টি
বৃদ্ধের সহায়

যুদ্ধোত্তর কালে ভারতীয় চলচ্চিত্র শিল্পকে সমৃদ্ধিশালী ক'রে তোলার উপায় অন্বেষণ করতে এ পর্যন্ত যাঁরাই বিলেত বা আমেরিকায় গিয়েছেন গত ক'মাসে কার্যক্ষেত্রে দেখা গেল তাঁরা সবাই নিজের নিজের কাজ গুছিয়ে ভারতীয় চিত্রশিল্পের স্বার্থ ক্ষুণ্ণ ক'রে আসছেন। এ পর্যন্ত যে ক'জন গিয়েছেন, তাঁরা সবাই বিদেশী যন্ত্রপাতি বা মালমসলার এজেন্ট আগে থেকেই ছিলেন অথবা নতুন এজেন্সী বাগাবার তালে গিয়েছেন। এ'দের হাতে ভারতীয় চিত্রশিল্পের স্বার্থ যে কতটা নিরাপদ থাকবে, তা সহজেই অনুমেয়। এ'দের মধ্যে আবার কেউ কেউ বিদেশী মূলধন আমদানীর জন্যেও উঠেপড়ে লেগেছেন। ইতিমধ্যে দু'তিনটে প্রতিষ্ঠান গড়েও উঠেছে; এর ওপর এখানে



৩রা জুলাই কালিকাতে 'নটীর পূজা' নৃত্যনাট্যাভিনয় অনুষ্ঠিত হয়েছে। প্রধান ভূমিকায় অবতরণ করেন কুমারী মণিকা গাঙ্গুলী।

যে সব বিদেশী প্রতিষ্ঠান আগে থেকেই আছে তারাও চুপ ক'রে বসে নেই, যুদ্ধের পর এখানকার বাজারে আরও জমে বসার চেষ্টায় ব্যাপৃত হ'য়েছে—যুদ্ধের আগে এদেশ থেকে বিদেশী ছবি লোপ পেয়ে যাবার যে অবস্থা আস্তে আস্তে এসে পৌঁছেছিল, যুদ্ধের পর অবস্থা ঠিক উল্টো হওয়ার আশংকা হ'চ্ছে। শুধু বিদেশী চিত্রগৃহই নয়, বিদেশী মূলধনও ছদ্মবেশে আস্তানা নেবার জন্যে তৈরী হ'য়ে আছে. একটু ফাঁক পেলেই তারা এসে জমে বসবে—এখান থেকে ভারতীয় শিল্পের প্রতিনিধি সেজে যাঁরা যাচ্ছেন, তাঁরাই দেখছি, বিদেশী মূলধনকে সেই ফাঁকটা দেখিয়ে দিচ্ছে। বিদেশে যাবার যে হুটোপাটি লেগে গেছে তা যে যুদ্ধের পর ভারতীয় চিত্রশিল্পের কতখানি অংশ খাঁটি ভারতীয় ক'রে রাখায় সাহায্য ক'রবে সে বিষয়ে একটা সতর্ক হিসেব করা দরকার হ'য়েছে। ভারতীয়



শিল্পকে নিজেদের স্বার্থ জলাঞ্জলি দিয়েও গড়ে তোলার জন্যে বিদেশীদের মন যে কেঁদে আকুল নয়, একথাটা চিত্রশিল্পের যে সব কর্ণধার বিদেশে যাচ্ছেন, তাঁদের বুঝিয়ে দেওয়া দরকার।

বিবিধ

ফিল্ম এডভাইসরী বোর্ডের সঙ্গে পরামর্শ না ক'রে ইচ্ছেমত লাইসেন্স দেওয়ার প্রতিবাদে ভারতীয় চলচ্চিত্র সঙ্ঘের সভাপতি চন্ডুলাল শা এবং ভারতীয় স্বাধীন প্রযোজনা সমিতির সভাপতি ছোটুভাই দেশাই ফিল্ম এডভাইসরী বোর্ডের সভাপদ ত্যাগ ক'রেছেন।

* * * *

এখানে যখন একটি চলচ্চিত্র সঙ্ঘের পাশে স্বাধীন প্রযোজকরা আর একটি সঙ্ঘ গড়ে তুলছেন, তখন বম্বেতে স্বাধীন প্রযোজকরা মূল চলচ্চিত্র সঙ্ঘের সঙ্গে মিলিত হয়ে দুটি প্রতিষ্ঠানকে এক প্রতিষ্ঠানে পরিণত কচ্ছেন। এই সংযুক্ত প্রতিষ্ঠানের সভাপতি হয়েছেন, রাও বাহাদুর চুনীলাল আর সহ-সভাপতি স্বাধীন প্রযোজক সঙ্ঘের সভাপতি ছোটুভাই দেশাই।

* * * *

প্রভাতের অভিনয় শিল্পী বেবী সুমন ও পৃথ্বীরাজের জ্ঞাতিভ্রাতা কানওয়াল কিশোরের সম্প্রতি বিবাহ অনুষ্ঠান সম্পন্ন হ'য়েছে। আর একটি বিবাহ সংবাদ হ'চ্ছে নির্বাকযুগের সবচেয়ে সুদর্শন অভিনেতা ব'লে খ্যাত মাধব কালের সঙ্গে গায়িকা ইন্দু ওয়াড়করের।

* * * * * * *

মধু বসু একখানি ছবি তোলার লাইসেন্স পেয়েছেন এবং ছবিখানি তিনি বম্বেতেই তুলবেন। গুজরাটের শিল্পী কানু দেশাইও একখানি ছবির জন্য লাইসেন্স পেয়েছেন।

* * *

সাধনা বসুর জয়ন্ত ফিল্মসে 'উর্বশী'র চিত্রগ্রহণ সমাপ্ত না হ'তেই চলে যাওয়া নিয়ে বম্বের গুজরাটি পত্রিকা বিদ্বেষমূলক মন্তব্য প্রকাশ করায় শ্রীমতী ৫০০০০, টাকার মানহানির মামলা এনেছেন ঐ কাগজের নামে। সাধনা বলেন যে, জয়ন্ত ফিল্মসের সঙ্গে বিগত নভেম্বর পর্যন্ত তাঁর চুক্তি ছিল, কিন্তু তারপরও তিনি 'প্রো-রেটায়' কাজ ক'রে যাচ্ছিলেন, এই সর্তে যে, তিনি তার সুবিধামত কাজ করবেন। সম্প্রতি তিনি যখন কলকাতায় তাঁর নিজের ছবি 'অজন্তা'র জন্য ব্যবস্থা ক'রতে চলে আসেন, তখন জয়ন্ত ফিল্মসের তাঁকে দরকার হ'য়ে পড়ে।

* * *

এই মাসের শেষে আনন্দ পিকচার্সের 'কৃষ্ণলীলা'র চিত্রগ্রহণ ইন্দ্রপুরী স্টুডিওতে আরম্ভ হ'য়ে যাবে। ছবিখানি পরিচালনা ক'রবেন কমল দাশগুপ্ত আর ভূমিকায় আছেন রাধারূপে কানন এবং কৃষ্ণ বিমান বন্দ্যোপাধ্যায়।

'হে বীর পূর্ণ কর'

গত ১৮ই এবং ১৯শে জুন রিক্রিয়েসন ক্লাবের প্রযোজনায় রঙমহল রঙ্গমঞ্চে তরুণ নাট্যকার মন্মথ চৌধুরীর 'হে বীর পূর্ণ কর'



'ভাইচারা' চিত্রে শ্রীমতী সুনেত্রা।

নাটকখানি মঞ্চস্থ হয়েছে। নাটকখানি পরিচালনা করেছিলেন, গঙ্গাপদ বসু। ১৩৫০-এর মহামন্বন্তরের আঘাতে সমাজ জীবনের নানা স্তরেই ফাটল ধরে। তারই এক জীবন্ত চিত্র এই নাটকে রূপায়িত হয়ে ওঠে। অভিনয়ের দিক দিয়ে গঙ্গাপদ বসু, ভূপেশ মজুমদার, নৃপেন ভট্টাচার্য, সতোন বসু, বিজয় দত্ত, মনোরঞ্জন ঘোষ, শেফালী দে ও মমতা ব্যানার্জি বিশেষ কৃতিত্বের পরিচয় দেন। প্রাণবন্ত অভিনয়ে এবং শিল্পসম্মত পরিচালনায় নাটকখানি দর্শকচিত্তে রেখাপাত করে। মন্বন্তরের প্রতিক্রিয়ার প্রতি জাতির দৃষ্টি সজাগ রাখবার জন্যে এই ধরণের নাট্যাভিনয়ের একটা জাতীয় প্রয়োজনও আছে।



(৩৫)

বাসন্তী বললো—অজয়দা একা ফিরে আসবেন। কেশবদাও আসবেন। পরিতোষ-বাবুও আবার আসবেন। সবাই একবার শেষবারের মত আসবেন, তারপর চলে যাবেন।

মাধুরী—সবাই আসবেন?

বাসন্তী—হ্যাঁ।

মাধুরী—কেন?

বাসন্তী—আমাকে বিদায় দেবার জন্য। যতদিন না আমি বিদায় নিচ্ছি সে কটা দিন তাঁরা গ্রামেই থাকবেন।

মাধুরী—কেশবদাও যে আসবেন, সে-বিষয়ে তুমি এত নিশ্চিন্ত হলে কি করে?

বাসন্তী নিশ্চিন্ত হয়েছি, পরিতোষ-বাবুর কথা শুনে।

মাধুরী—উনি কি বললেন?

বাসন্তী—যে জিনিসের জোরে কেশবদাকে মিছামিছি জেলে পাঠানো হয়েছে, সেই জিনিসের জোরেই কেশবদাকে সত্যি সত্যি জেল থেকে ছাড়িয়ে আনা হবে।

মাধুরী—কিসের জোরে?

বাসন্তী—টাকার জোরে। তোমার বাবা হয়তো পাঁচ হাজার খরচ করেছেন, তাই দশ হাজার খরচ করলেই পাঁচ হাজারের কীর্তি ভেঙে দেওয়া যায়।

মাধুরী—সেই রকম একটা ব্যবস্থা হয়েছে নাকি?

বাসন্তী—হ্যাঁ।

মাধুরী—কে করলেন?

বাসন্তী—পরিতোষবাবু করেছেন।

মাধুরী—হঠাৎ পরিতোষবাবুর এত টাকার জোর হলো কোথা থেকে?

বাসন্তী—তা জানি না।

বাইরে আবার মেজকাকার গলার স্বর শুনে উৎকর্ণ হয়ে উঠলো বাসন্তী। অন্ধকার রাত্রের গুমোট শেষ হয়ে গেছে। ক্লান্ত গাছের পাতার আলস্য পাখির ডাকে ভেঙে যাচ্ছিল। ভোরের হাওয়া বইছে। আকাশ ফরসা হয়ে গেছে।

মেজকাকা বললেন—লোকটা ধরা পড়ে গেছে বাসন্তী।

বাসন্তী উঠে বাইরে গিয়ে দাঁড়ালো। কে ধরা পড়েছে কাকা?

মেজকাকা—ঐ যে গাঁয়ের পোষা কাল-সাপটি ছিল, ভজু বাউরী।

বাসন্তী—ভজু কোথায়?

মেজকাকা—তবে লোকটার কপাল ভাল। এই কুকীর্তি করে নিজেও পার পেয়ে গেছে।

বাসন্তী—পালিয়ে গেছে?

মেজাকাকা—মরে গেছে।

কিছুক্ষণের মত বেদনায় রুদ্ধশ্বর অবস্থায় শুধু দাঁড়িয়ে রইল বাসন্তী। সারা রাত্রি ধরে নানা দুশ্চিন্তার বিক্ষেপের মধ্যে একটা অজানা শঙ্কার শিহর বার বার বাসন্তীর বুক কাঁপিয়ে দিয়েছিল। ভজু চলে যাবার পর থেকেই নানা চিন্তার মধ্যেই ওর মূর্তিটা থেকে থেকে মনের দুয়ারে যেন বড় করুণভাবে উঁকি দিয়ে ফিরছিল। জীবনের প্রতিশোধ নেবার জন্য ভজু বোধ হয় শেষ অভিযানে বের হয়েছে। কিন্তু কার ওপর প্রতিশোধ নেবে ভজু, কিসের জন্য, কোন্ ক্ষতির শোধ তুলতে? কেশবদার সঙ্গে কদিনের জন্য বড় ভাব হয়েছিল ভজুর। কতবার এসে ভজু সেই কথা সগর্বে বাখান করে গেছে। কত অভিমানে ভজুর মন ভেঙে গেছে, সেকথাও ভজু মাঝে মাঝে বলতো। কিছুদিন থেকে ভয়ানক রকমের হিংস্র হয়ে উঠেছিল ভজু। যক্ষ্মা হয়ে রক্ত কাশতো, তবু ওর বিষ কমেনি। যার সঙ্গে দেখা হতো তাকেই শুনিয়ে দিত, এইবার সে চরম শিক্ষা শিখিয়ে দিয়ে যাবে সারা গ্রামকে। ভজু আজ পর্যন্ত গাঁয়ের একটা কুকুর বিড়ালের গায়েও লাঠি মারেনি। তবু এই গাঁ ওকে শান্তিতে থাকতে দেয়নি। এইবার সে দেখিয়ে দিয়ে যাবে, কি করে গাঁয়ের সর্বনাশ করতে হয়।

সেই ভজু আজ শেষ হয়ে গেছে, শুধু তার মনের শেষ সাধ, কেশব ঠাকুরের সঙ্গে দেখা, আর পূর্ণ হলো না।

কিন্তু এদিক দিয়েও ব্যর্থ হয়ে চলে গেল ভজু। গাঁয়ের সর্বনাশ করবার প্রতিজ্ঞা নিয়ে এক ভীষণ রাত্রির অন্ধকারে গ্রামের সর্বনাশের গায়ে আগুন লাগিয়ে সরে পড়লো ভজু। আজ পর্যন্ত গাঁয়ের মধ্যে কোন চুরি রাহাজানি করেনি ভজু। ভিন্ গাঁয়ের গৃহস্থ আর পথিকের মাথায় লাঠি মেরেছে ভজু। জীবনে ভজুর এই একটি গর্ব ছিল এবং এই একটি প্রসন্নতা ছিল। নিজের গ্রামকে ভালবাসে ভজু। কালসাপ হয়ে গাঁয়ের প্রাণে কখনো ছোবল দেয়নি। শেষ পর্যন্ত পারলো না। বাইরে থেকে যত অবাঞ্ছিত উপদ্রব গ্রামে এসে ঢুকেছে, তাকে কেশব ভট্‌চায মেনে নিতে পারেনি। ভজুও শেষ পর্যন্ত মানতে পারলো না। ভজু হয়তো শেষ দিনের শেষ নিঃশ্বাসের সঙ্গে একটি সান্ত্বনা নিয়ে চলে গেছে যে, কেশব ঠাকুর তাকে বুঝতে পারবে। কেশব ঠাকুরের মত পণ্ডিত মানুষ যে দুঃখে মনমরা হয়ে গিয়েছিল, ভজুর জীবনব্যাপী নিগৃহীত মনুষ্যত্বের হীনতা ও লাঞ্ছনার মধ্যে সেই একই দুঃখের বীজ রয়েছে। এই একই দুঃখের কারণে এক অভিনব মিতালীর প্রস্তাব দিয়েছিল ভজু। কেশব ঠাকুর সে প্রস্তাব উপেক্ষা করেছে। ভজুর পথে কেশব ঠাকুর আসতে পারলো না। নইলে ভজু কি ভয়ানক প্রতিশোধের ষড়যন্ত্র করতো কে জানে?

অল্পক্ষণ পরে কথা বললো বাসন্তী—আপনি কি ভজুকে দেখতে গিয়েছিলেন কাকা?

মেজকাকা—হ্যাঁ, নিজের ঘরেই মরে পড়ে আছে, শরীরটা অনেকখানি পুড়ে ঝলসে গেছে।

বাসন্তী—এর পর কি হবে?

মেজকাকা—পুলিশে খবর দেওয়া হয়েছে।

বাসন্তী—কিসের জন্য?

মেজকাকা—তুই বুঝবি না বাসু। এ কাজতো আর ভজু নিজের ইচ্ছেয় করেনি। ভজুকে টাকা দিয়ে কেউ করিয়েছে। কারা করিয়েছে সে সব কথাও উঠেছে।

বাসন্তী—কার কথা উঠেছে?

মেজকাকা—বোর্ডের প্রেসিডেন্ট ভূদেব আর হেড মাস্টার বিশ্বেস মশাই বলছেন...

মেজকাকা চুপ করে গেলেন। বাসন্তীর সন্দেহ আরো প্রখর হয়ে উঠলো। বাসন্তী আবার প্রশ্ন করলো—কাকে সন্দেহ করছে সবাই?

মেজকাকা—ওদের কথা ছেড়ে দে। ওরা বলছে, কেশব নাকি ভজুকে আগেই শিখিয়ে রেখেছিল।

বাসন্তী—পুলিশ আসলে আমাকে একবার খবর দেবেন কাকা।

"দেশ"-এর
নিয়মাবলী

বার্ষিক মূল্য—১৩৲ ষাণ্মাসিক—৬॥৹

বিজ্ঞাপনের নিয়ম

"দেশ" পত্রিকায় বিজ্ঞাপনের হার সাধারণত নিম্নলিখিতরূপঃ—

সাধারণ পৃষ্ঠা—এক বৎসরের চুক্তিতে
১০০" ও তদূর্ধ্ব ... ৩৲ প্রতি ইঞ্চি প্রতি বার
৫০"—৯৯" ... ৩।৹ " " " "

সাময়িক বিজ্ঞাপন

৪৲ টাকা প্রতি ইঞ্চি প্রতি বার

বিজ্ঞাপন সম্বন্ধে অন্যান্য বিবরণ বিজ্ঞাপন বিভাগ হইতে জানা যাইবে।

সম্পাদক—"দেশ"
১নং বর্মণ স্ট্রীট, কলিকাতা।

মেজকাকা—কেন রে?

বাসন্তী—আমি সাক্ষ্য দেব। আমি জানি কে ভজুকে দিয়ে কার ঘরে আগুন লাগাবার ষড়যন্ত্র করেছিল। ভজু রাত্রিবেলা এসে আমায় সব বলেছিল।

মেজকাকা এগিয়ে এলেন। একটু সন্ত্রস্ত ভাবে অথচ কৌতূহলী হয়ে বললেন —কে রে বাসু?

বাসন্তী—এখন কিছু বল্‌বো না।

মেজকাকা—পুলিশের কাছে একটা কথা বলে ফেললেই তো হলো না। প্রমাণ দিতে পারবি?

বাসন্তী—হ্যাঁ।

মেজকাকা—কি প্রমাণ?

বাসন্তী—ভজুকে তিনি চিঠি দিয়েছিলেন, টাকা পাঠিয়েছিলেন। সেই চিঠি আর টাকা ভজু কাল রাত্রে আমার কাছে ফেলে রেখে চলে গেল।

মেজকাকা মন্ত্রমুগ্ধ হয়ে বাসন্তীর কথাগুলি শুনছিলেন। এগিয়ে আসতে আসতে দাওয়ার ওপরেই উঠে এসে দাঁড়ালেন। তীব্র আগ্রহে মেজকাকার চোখ দুটো জ্বল্ জ্বল্ করে উঠলো। বাসন্তীর কাছে কাতরভাবে প্রশ্ন করতে লাগলেন—নামটা বলে দে মা একবার। কে ব্যাটা এই কাজ করলো। একবার ব্যাটাকে দেখেনি

বাসন্তী—আজ আর সেটা বলবো না কাকা।

মেজকাকার গলার স্বর আরও কাতর হয়ে উঠলো—একবার বলে দে বাসু। বড় অর্থকষ্টে আছি মা। একবার নামটা তুই জানিয়ে দে, কিছু আদায় করে নেই।

বাসন্তী অপ্রস্তুত হয়ে হেসে ফেললো। মেজকাকার মতিগতির অনেক পরিচয় রাখে বাসন্তী। তাই এটাও কিছু নতুন নয়।

বাসন্তী বললো—আমাকে কোন অনুরোধ করবেন না কাকা।

মেজকাকা অত্যন্ত নিম্ন অথচ তিক্ত স্বরে বললেন—ভুল করলি বাসন্তী, মস্ত ভুল করলি, বড় অকৃতজ্ঞ তোরা। একটা স্নেহের সম্পর্ক ও দাবী পর্যন্ত রাখতে চাস্ না। যেমন অজয়, তেমনি তুই। তোদের সঙ্গে এক পুকুরের জল খাওয়াও ভুল।

বাসন্তী বুঝলো কাকা কথার ইঙ্গিতে সেই পুরোণো মামলার ভয় আবার দেখাচ্ছেন। তবু বাসন্তী চুপ করে থাকে। মেজকাকা কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে মাথা চুলকিয়ে নিলেন, তারপর চুপচাপ দাওয়া থেকে নেমে গেলেন।

মাধুরীও হঠাৎ ঘর থেকে বেরিয়ে এসে বললো—আমার তো আর থাকা চলে না বাসু। আর অপেক্ষা করতে পারি না। আমাকে এখুনি যেতে হবে।

বাসন্তী—যাও, কোথায় যাবে?

মাধুরী—মীরগঞ্জ চললাম।

বাসন্তী—বুঝেছি।

মাধুরী—বুঝতেই পারছো, আগে বাঁচতে হবে।

বাসন্তী—হ্যাঁ, আপনি বাঁচলে বাপের নাম।

মাধুরী আর দাঁড়ালো না, ব্যস্তভাবে দাওয়া থেকে নেমে বাগানে গিয়ে দাঁড়ালো। মেজকাকার মূর্তিটা তখনো বাগানের বেড়া ঘেঁসে বিষণ্ণভাবে চলেছে। মাধুরী চেঁচিয়ে ডাকলো—মেজকাকা।

মেজকাকা চমকে মুখ ফিরিয়ে তাকালেন। ব্যস্তভাবে ফিরে এসে বললেন—তুমি এখানে কোথা থেকে এলে? তুমি আইনে বেঁচে গেছ?

মাধুরী বললো—না, এখনো বেঁচে উঠতে পারিনি। আপনি আমার একটু উপকার করুন।

মেজকাকা—বল। সঞ্জীবদার মেয়ে তুমি। তোমাকে বিপদে আপদে একটু উপকার করতে পারবো না, কি যে বল!

বাসন্তী শুধু দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে একদৃষ্টি তুলে তাকিয়ে রইল। মেজকাকার সঙ্গে মাধুরী তখনই মীরগঞ্জের দিকে ধাওয়া করেছে, সোজা পথ ধরে, আর তিলমাত্র বিলম্ব না করে চলেছে। বাসন্তীর চোখ দুটো জলে ভরে উঠলো। হয়তো নেহাৎ অকারণে। কিন্তু ভয় পেয়ে গিয়ে নয়। পরক্ষণেই চোখ দুটো একটা জ্বালাকর অনুভূতির স্পর্শে শুকনো হয়ে ওঠে। জ্বলু জ্বলু করতে থাকে। জ্বলতে থাকে।

কতক্ষণ এভাবে দাঁড়িয়েছিল বাসন্তী তা সে নিজেই জানে না। তার সমস্ত সম্বিৎ যেন এক মৌনতার আনন্দে ডুব দিয়ে সকল ঝঞ্ঝাটের রূঢ়তা থেকে ক্ষণিকের জন্য মুক্তি পেয়েছিল। বাসন্তী বুঝতে পারে, বড় বেশী অবসন্ন হয়ে পড়েছে সে। এ কাজ তার সাজে না, তার শক্তিতে কুলোয় না। চিরদিন নিভৃতের ভালবাসায় একা মনের চিন্তায় সে বড় হয়ে উঠেছে। কোন দিন কোন বড় কথায়, বড় কাজে ও বাদবিসম্বাদে তার ক্ষুদ্র ব্যক্তিত্বকে সে ব্যস্ত হতে দেয় নি। জীবনে চাওয়া ও পাওয়ার কোন রীতিনীতিকে নিয়ে দুশ্চিন্তা করার চেষ্টা সে করে নি। যা আপনা থেকেই আসে, তাকে সে মেনে নেয়। যা আপনা থেকেই অসম্ভব হয়ে ওঠে, তাকে সে টেনে রাখতে চায় না। যে পথে তার চলে যাবার নিয়ম, সে পথের মাটিকেও সে কাঁটা দিয়ে উত্যক্ত করতে চায় না।

(ক্রমশ)

সাপ্তাহিক সংবাদ

দেশী সংবাদ

২৭শে জুন—বেলা ১১টায় সিমলা লাট-প্রাসাদে নেতৃসম্মেলনের তৃতীয় দিনের অধিবেশন আরম্ভ হয় এবং দ্বিপ্রহরেই উহা স্থগিত রাখা হয়।

ইউনিভারসিটি ইনস্টিটিউটের হলে এক বিপুল জনসভায় শ্রীযুত শরৎচন্দ্র বসু ও সমস্ত রাজবন্দীর মুক্তির দাবী জানাইয়া প্রস্তাব গৃহীত হয়। বঙ্গীয় ব্যবস্থা পরিষদের স্পীকার সৈয়দ নৌসের আলী সভাপতিত্ব করেন।

২৮শে জুন—কুড়িগ্রামের ২৬শে জুনের খবরে প্রকাশ, মোগলবাচা গ্রামের একটি স্ত্রীলোক বস্ত্রের অভাবে আত্মহত্যার চেষ্টা করে। দুমকাতে কৃষ্ণকুমার নামে এক ব্যক্তি বস্ত্রাভাবে উদবন্ধনে আত্মহত্যার চেষ্টা করিলে প্রতিবেশীরা তাহাকে প্রতিনিবৃত্ত করে।

লারকানা স্টেশনে ট্রেনের একখানি তৃতীয় শ্রেণীর কামরায় ভিড়ের চাপে শ্বাসরুদ্ধ হইয়া দুইজন যাত্রী মারা গিয়াছে।

২৯শে জুন—সকাল ১১টায় নেতৃ-সম্মেলন আরম্ভ হইয়া ১২টা ১৫ মিনিটের সময় স্থগিত থাকে। প্রতিনিধিগণকে ঘরোয়া আলোচনার নিমিত্ত অধিকতর সময়দানের জন্য অধিবেশন স্থগিত রাখা হইয়াছে। ১৪ই জুলাই, শনিবার সম্মেলনের পুনরাধিবেশন হইবে। বিভিন্ন দলকে চূড়ান্ত বাছাইয়ের জন্য বড়লাটের নিকট স্ব-স্ব দলের মনোনীতদের নামের তালিকা দাখিলের জন্য আহ্বান করা হইয়াছে।

রাষ্ট্রপতি আজাদ পণ্ডিত নেহরুকে জরুরী তার করিয়া সিমলায় আহ্বান করেন।

মুক্তাগাছা থানার এলাকাধীন নাগদাবোলিয়া গ্রামের আসোরণ বিবি নাম্নী জনৈকা বিবাহিতা নারী গত ২৬শে জুন ঘরের কড়িকাঠে ফাঁসি দিয়া আত্মহত্যা করিয়াছে বলিয়া জানা গিয়াছে। পাহাড় পাবজান গ্রামের রাইয়েসা বেওয়া নাম্নী একটি স্ত্রীলোকও বস্ত্রাভাবে আত্মহত্যা করিয়াছে। কোয়েটায় কাপড়ের দোকানে ভিড়ের চাপে একটি স্ত্রীলোক ও একটি শিশু পদদলিত হইয়া মারা গিয়াছে।

৩০শে জুন—এলাহাবাদের জেলা কর্তৃপক্ষ স্বরাজভবনের (নিখিল ভারত রাষ্ট্রীয় সমিতির কার্যালয়) সমস্ত ঘর খুলিয়া দিবার জন্য আদেশ জারী করিয়াছেন।

একটি সরকারী ইস্তাহারে বলা হইয়াছে যে, ২৯শে জুন অপরাহ্নে বাঙ্গালোরের নিকটবর্তী কোন এক গ্রামে একটি সামরিক বিমান ভূপাতিত হইয়া বিধ্বস্ত হওয়ায় ৩৮জন গ্রামবাসী নিহত ও অনুমান ২০ জন আহত হইয়াছে। ভূপাতিত হইয়া বিমানটি বিদীর্ণ হয় এবং বিস্ফোরণের ফলে বহু ঘর বাড়ি ধ্বংস হয়।

'ইণ্ডাষ্ট্রি' পত্রের ম্যানেজিং এডিটর শ্রীযুত কে এম বানার্জি গত ২৯শে জুন পুরীতে পরলোক গমন করিয়াছেন।

মার্গারিটার নুর্মলিগড় বনের কাছে একটি রয়েল বেঙ্গল টাইগারের আক্রমণে ৭ জন লোক প্রাণ হারাইয়াছে।

এসোসিয়েটেড প্রেস অব আমেরিকার বিশেষ সংবাদাতার নিকট মিঃ জিন্না এইরূপ প্রস্তাব করেন যে, গান্ধীজী ওয়াভেল সম্মেলনের সংস্রব ত্যাগ করিয়া মূলগতভাবে পাকিস্তানের দাবী মানিয়া লইয়া মুসলিম লীগের সহিত এক নূতন চুক্তিতে আবদ্ধ হউন।

১লা জুলাই—পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু সিমলা পৌঁছিয়াছেন।

জব্বলপুরের খিন্দাঘাটে মহানদী পার হইবার সময় একখানি নৌকা ডুবিয়া ২৩ জন লোক প্রাণ হারাইয়াছে।

২রা জুলাই—সিমলায় বড়লাট ও পণ্ডিত জওহরলাল নেহরুর মধ্যে অদ্য সাক্ষাৎকার ঘটিয়াছে। বড়লাট কর্তৃক আমন্ত্রিত হইয়া পণ্ডিতজী তাঁহার সহিত আড়াই ঘণ্টাকাল আলোচনা করেন। পণ্ডিতজী অদ্য মহাত্মা গান্ধী ও কংগ্রেস সভাপতির সহিতও দুই ঘণ্টাকাল আলোচনা করেন।

৩রা জুলাই—মৌলানা আজাদের সভাপতিত্বে ও মহাত্মা গান্ধীর উপস্থিতিতে গান্ধীজীর সিমলা-আবাস ম্যানর ভিলায় কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির অধিবেশন আরম্ভ হইয়াছে। ওয়াভেল প্রস্তাব সম্পর্কে চারি ঘণ্টা আলোচনার পর অধিবেশন মুলতুবী থাকে।

৪ঠা জুলাই—ইউ পি আই-এর রাজনৈতিক সংবাদদাতা লণ্ডনে বিশ্বাসযোগ্য মহল হইতে অবগত হইয়াছেন যে, বাঙলার কতিপয় আটক বন্দীর মুক্তির কথা বিবেচনা করিয়া দেখা হইতেছে। বাঙলার গভর্নর শ্রীযুত শরৎচন্দ্র বসুর মুক্তিদান সম্পর্কে অনুকূল মত পোষণ করিতেছেন।

বিদেশী সংবাদ

২৭শে জুন টোকিও রেডিয়োয় প্রকাশ, মিত্রবাহিনী দক্ষিণ ওকিনাওয়ায় অবস্থিত নাহার ৫০ মাইল পশ্চিমে কুমে দ্বীপে অবতরণ করিয়াছে।

সুপ্রীম সোভিয়েটের আদেশে মার্শাল স্ট্যালিনকে জেনারেলিসিমো পদে উন্নীত করা হইয়াছে।

২৮শে জুন—মিঃ এডওয়ার্ড আর স্টেটিনিয়াস (জুনিয়ার) যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রসচিবের পদত্যাগ করিয়াছেন।

মস্কো বেতারে বলা হইয়াছে যে, চীনের প্রধান মন্ত্রী ডাঃ টি ভি সুং চুংকিং হইতে মস্কো যাত্রা করিয়াছেন।

জেনারেল ম্যাক আর্থার ঘোষণা করেন যে, ফিলিপাইনের সমগ্র লুজন দ্বীপ জাপকবলমুক্ত করা হইয়াছে। লুজনের অধিবাসীর সংখ্যা আট লক্ষ।

২৯শে জুন—বিলাতের নির্বাচনে মিঃ আমেরীর প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী মিঃ পামি দত্তের নির্বাচন সাফল্য কামনা করিয়া এবং তাঁহাকে সমর্থন করার জন্য আবেদন করিয়া জর্জ বার্ণার্ড শ' এক বাণী প্রচার করিয়াছেন।

ফরাসী রাষ্ট্রসচিব মঃ আঁদ্রিয়ে তিজিয়ের আলজিয়ার্স বেতারে বলেন, আলজিরিয়ার সম্প্রতি যে গোলযোগ ঘটিয়া গিয়াছে তাহাতে প্রায় ৫০ হাজার মুসলমান জড়িত ছিল। ইহার মধ্যে ১২ শত হইতে ১৫ শত মুসলমান নিহত হইয়াছে।

৩০শে জুন—ইতালীতে পুলিশ বাহিনী ও কমিউনিষ্টদের মধ্যে সংঘর্ষ ঘটিতেছে। প্রকাশ, ৬ হাজার সশস্ত্র লোক "রাজতন্ত্রকে কমিউনিষ্ট-দের হাত হইতে রক্ষা করার" ষড়যন্ত্র করিয়াছে।

চেকোশ্লোভাকিয়ার ভূতপূর্ব প্রেসিডেণ্ট ডাঃ এমিল হাচা ৭০ বৎসর বয়সে প্রাগে মারা গিয়াছেন। গত ৫ই মে প্রাগে বিদ্রোহ আরম্ভ হইলে তাঁহাকে গ্রেপ্তার করা হইয়াছিল।

মার্কিন সৈন্যরা বিনা বাধায় কুমে দ্বীপ অধিকার করিয়াছে।

মিঃ জেমস বারনেসে মার্কিন রাষ্ট্রসচিব নিযুক্ত হইয়াছেন।

লিউবেক নামক একটি ক্ষুদ্র শহরে বৃটিশ নিয়ন্ত্রিত জার্মান রাজধানী স্থাপন করা হইয়াছে।

১লা জুলাই—গতকল্য টোকিও রেডিও খবর দেয় যে, মিত্রপক্ষীয় সৈন্যগণ বালিক পাপানে অবতরণ আরম্ভ করিয়াছে।

২রা জুলাই—জাঁদরেল কমিউনিষ্ট বিদ্বেষী সেনেটর জন র‍্যাঙ্কিন হলিউডের সর্বত্র জোর তদন্ত করিতেছেন। তিনি জানাইয়াছেন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে হলিউড "বিধ্বংসাত্মক কার্য-কলাপের সর্বাপেক্ষা বড় ঘাঁটি।"

লণ্ডন জুলজিক্যাল সোসাইটির প্রাক্তন সেক্রেটারী স্যার পিটার চামার্স মিচেল পরলোক-গমন করিয়াছেন।

৩রা জুলাই—৫ হাজার মিত্রসৈন্য বালিক-পাপানে অবতরণ করিয়াছে। অষ্ট্রেলিয়ানরা বোর্ণিওতে দুইটি বিমানক্ষেত্র দখল করিয়াছে।

দেশ

সম্পাদক ঃ শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র সেন | সহকারী সম্পাদক ঃ শ্রীসাগরময় ঘোষ

১২ বর্ষ] শনিবার, ৩০শে আষাঢ়, ১৩৫২ সাল। Saturday, 14th July, 1945 [৩৬শ সংখ্যা

সাময়িক প্রসঙ্গ

স্বাধীনতা সংগ্রামের নূতন পর্ব

কংগ্রেসের ওয়ার্কিং কমিটি বড়লাট লর্ড ওয়াভেলের নিকট তাঁহাদের নির্বাচিত নব-প্রস্তাবিত শাসন পরিষদের সদস্যদের নামের তালিকা দাখিল করিয়াছেন। এখন বড়লাটের সিদ্ধান্তের উপর তাঁহার প্রস্তাবের ভবিষ্যৎ নির্ভর করিতেছে; কিন্তু ওয়াভেল প্রস্তাবই কংগ্রেসের পক্ষে একমাত্র বিবেচ্য বিষয় নয়। কংগ্রেস-প্রেসিডেণ্ট মৌলানা আবুল কালাম আজাদ সম্প্রতি একটি বিবৃতিতে এই সম্পর্কে দেশবাসীর দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, এই প্রস্তাবের উপর যেমন আমাদের অতিরিক্ত গুরুত্ব আরোপ করা উচিত হইবে না, সেইরূপ বর্তমান বাস্তব অবস্থার সম্বন্ধে বিবেচনা করিয়া নিজেদের মুখ্য উদ্দেশ্য সিদ্ধির পক্ষে সময়োপযোগী ব্যবস্থা অবলম্বনের প্রশ্নের দিকটা উপেক্ষা করিলেও চলিবে না। মহাত্মা গান্ধী ইতঃপূর্বেই এ সম্বন্ধে বলিয়াছিলেন যে, পূর্ণ স্বাধীনতাই হইল আমাদের একমাত্র লক্ষ্য এবং সেই লক্ষ্যের অভিমুখেই কংগ্রেসের সমগ্র কর্মপ্রচেষ্টা নিয়ন্ত্রিত হইবে। ওয়াভেল প্রস্তাব যদি কংগ্রেসের সেই উদ্দেশ্য সিদ্ধির পক্ষে সহায়ক হয়, তবেই কংগ্রেস তাহা স্বীকার করিয়া লইবে এবং সে প্রস্তাব অনুসারে কাজ করিতে অগ্রসর হইবে। সুতরাং কংগ্রেসকে শক্তিশালী করাই বর্তমানে জাতির পক্ষে প্রধান প্রয়োজন হইয়া পড়িয়াছে, ওয়াভেল প্রস্তাবের গুরুত্ব এক্ষেত্রে পরোক্ষ ব্যাপার মাত্র। সুতরাং মিঃ জিন্নার দুরভিসন্ধির ফলে ওয়াভেল প্রস্তাব যদি ব্যর্থও হয়, তথাপি কংগ্রেসের সম্মুখে অনেক কর্তব্য রহিয়াছে। পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু সেদিন বলিয়াছেন যে, কংগ্রেসের শক্তি দুর্বল হয় নাই; সরকারের দুর্দম দমননীতি সত্ত্বেও সমগ্র দেশ এখনও কংগ্রেসের অভিমতই অনুসরণ করিতে প্রস্তুত আছে। কিন্তু কংগ্রেসের সেই শক্তিকে জনগণের সাহচর্যে সুদৃঢ় এবং সুনিয়ন্ত্রিত করিতে হইলে কংগ্রেস-প্রতিষ্ঠানগুলিকে দেশের সর্বত্র পুনর্গঠিত করা প্রয়োজন। এই সঙ্গে কংগ্রেসের আদর্শ ভারতের সর্বশ্রেণীর জনসাধারণের মধ্যে সমধিক সুষ্ঠুভাবে প্রচার করাও দরকার। দীর্ঘ পরাধীনতা জাতির নৈতিক শক্তিকে নানাদিক হইতে দুর্বল করিয়া ফেলে এবং বৃহত্তর স্বার্থসাধনের উপযোগী জাতির সাধনা এবং স্বচ্ছ চিন্তার ধারা সংকীর্ণ স্বার্থের প্রলোভনে আচ্ছন্ন হইয়া যায়। জাতির অন্তর হইতে এই দৈন্য এখনও দূর হয় নাই। সাম্প্রদায়িকতা এবং উপদলীয় স্বার্থের আবর্তনে জাতির শক্তি নানাদিক হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িতেছে। স্বয়ংসিদ্ধ সাম্প্রদায়িকতাবাদী এবং উপদলীয় নেতার দল কংগ্রেসের প্রভাব ক্ষুণ্ণ করিবার দুর্বুদ্ধি লইয়া এখনও চলিতেছেন। ইঁহাদের অবলম্বিত নীতির ভ্রান্তি জনসাধারণের দৃষ্টির কাছে উন্মুক্ত করিতে হইবে। কংগ্রেস-প্রেসিডেণ্ট মৌলানা আজাদ সেদিন তাঁহার বিবৃতিতে এদেশের মুসলমান সমাজকে এ সম্বন্ধে সচেতন করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, যেসব মুসলমান কংগ্রেসের কর্মপন্থা অনুমোদন করেন, মুসলমান সমাজের স্বার্থ এবং মর্যাদা সম্বন্ধে তাঁহাদের দৃষ্টি কম নয়। দেশবাসীর দৃষ্টিতে এই সত্য ক্রমশ স্পষ্টতর হইয়া উঠিতেছে; তাই কংগ্রেসের প্রভাবের পুনঃপ্রতিষ্ঠার সম্ভাবনা বুঝিয়া মুসলিম লীগের সাম্প্রদায়িকতাবাদীর দল আজ ক্ষিপ্ত হইয়া উঠিয়াছেন এবং তাঁহাদের পক্ষের প্রচারক দল কংগ্রেস প্রতিষ্ঠানকে অন্ধভাবে আক্রমণে উদ্যত হইয়াছেন। দেশের স্বাধীনতা সংগ্রাম হইতে দূরে থাকিয়া যাঁহারা এতদিন নিজেদের স্বার্থ ও পদমর্যাদার বিচারেই প্রমত্ত ছিলেন এবং নিজেরা সুখাসনে সমাসীন থাকিয়া লক্ষ লক্ষ দরিদ্র, পীড়িত এবং বুভুক্ষিত মুসলমানদের জন্য যাঁহারা কার্যত কোন ত্যাগই স্বীকার করেন নাই, শুধু বাক্-বলেই তাহাদিগকে প্রবঞ্চিত করিয়াছেন, ভারতের স্বাধীনতা-সংগ্রামে আত্মদাতা বীর সন্তানদের আদর্শ নিশ্চয়ই তাঁহাদের এমন ইতর-জনোচিত আস্ফালনে বিন্দুমাত্রও পরিম্লান হইবে না। কংগ্রেসের বিরুদ্ধে এমন অযথা গ্লানি প্রচারের ফলে এইসব স্বার্থভীরুদের নিজেদের প্রকৃতিই উন্মুক্ত হইয়া পড়িবে।

প্রাদেশিকতার সংকীর্ণ দৃষ্টি

ব্যক্তিবিশেষের মত সমাজ অথবা জাতির দেহেও উগ্র বিষ প্রবেশ করিলে তাহা প্রতি ধমনীতে ও স্নায়ু কেন্দ্রে বিসর্পিত হইয়া ব্যক্তি, সমাজ অথবা জাতিকে হতচেতন করিয়া ফেলে। সাম্প্রদায়িকতার বিষে এদেশ জর্জরিত হইয়াছে এবং তাহার কুফল আমরা প্রতি-নিয়ত লক্ষ্য করিতেছি। সাম্প্রদায়িকতার মত প্রাদেশিকতার বিষও কিছুকাল হইতে উগ্র হইয়া উঠিতেছে। কেবল সিংহল, আফ্রিকা ও পৃথিবীর অন্যান্য দেশে যে ভারতবাসীকে তাহার ন্যায্য অধিকার হইতে বঞ্চিত করিবার ব্যবস্থা পরিলক্ষিত হয়, তাহা নহে, কিছুদিন হইল ভারতের অভ্যন্তরেও কোন কোন প্রদেশে অন্য প্রদেশের অধিবাসীর, বিশেষ ভাবে বাঙ্গালীর, সর্ববিধ নাগরিক অধিকার ও বিশিষ্ট সংস্কৃতিকে সংকুচিত করিবার ব্যবস্থা অবলম্বনে বিশেষ ব্যস্ততা পরি-লক্ষিত হইতেছে। সম্প্রতি উড়িষ্যার নব-প্রতিষ্ঠিত বিশ্ববিদ্যালয়ের কয়েকজন সদস্য উক্ত বিশ্ববিদ্যালয় হইতে বাঙলা ভাষার উচ্ছেদ সাধনে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। বাঙলা ভাষাভাষীদিগের জন্য বাঙলা ভাষার মারফতে শিক্ষাদান ও পরীক্ষা গ্রহণ উড়িষ্যার শিক্ষায়তনসমূহে বহুকাল যাবৎ প্রচলিত আছে। বর্তমানে বাঙলা ভাষার এই অধিকারের উচ্ছেদ-সাধনের জন্য দুর্বুদ্ধি ইঁহাদের কেন দেখা দিল তাহা বুঝি না। স্থানীয় বাঙালী-সমাজ এই অপচেষ্টার প্রতিবাদ জানাইয়াছেন। বাঙলা ভাষা কেবল আধুনিক মানচিত্রে বঙ্গদেশ বলিয়া যে অংশটুকুকে সীমারেখা টানিয়া চিহ্নিত করা হয়, শুধু সেই ভূখণ্ডের ভাষা

নহে, পরন্তু তাহা বৃহত্তর বঙ্গের সাধারণ ভাষা। এই বৃহত্তর বঙ্গে বাঙলা ছাড়াও আসাম, বিহার ও উড়িষ্যার অংশবিশেষ অন্তর্ভুক্ত। ইহা ছাড়া সংস্কৃতির দিক হইতেও বাংলা ভাষার একটা অসামান্য মর্যাদা আছে। সুতরাং শিক্ষায়তনসমূহ হইতে যদি বাঙলা ভাষার সংকোচ অথবা উচ্ছেদ সাধন করা হয়, তাহা হইলে সমগ্র ভাবে উড়িষ্যাই ক্ষতিগ্রস্ত হইবে। উড়িষ্যা বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনেটের যে সমস্ত সদস্য এই ভ্রান্ত পথে অগ্রসর হইয়াছেন, আমরা তাঁহাদিগকে একথা হৃদয়ঙ্গম করিতে বলি। এই প্রসঙ্গে বিভিন্ন ভারতীয় ভাষার সম্পর্কে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উদার দৃষ্টিভঙ্গী লক্ষ্য করিতেও আমরা তাঁহাদিগকে অনুরোধ করি। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্তর্ভুক্ত শিক্ষায়তনসমূহে ও এই বিশ্ববিদ্যালয়ে বিভিন্ন ভারতীয় ভাষা পাঠন ও তাহার মারফতেই পরীক্ষা গ্রহণের ব্যবস্থা আছে। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কোন ভারতীয় ভাষার সংকোচ অথবা উচ্ছেদ-সাধনের কথা কোন কালেই চিন্তা করেন নাই। এরূপ অবস্থায় উড়িষ্যা বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনেটের সদস্যগণের ভাষা সম্পর্কে সংকীর্ণ নীতি অবলম্বনের কারণ কি? কিন্তু এখানেই উড়িষ্যার সংকীর্ণ প্রাদেশিক দৃষ্টিভঙ্গীর শেষ নহে। উড়িষ্যার ডোমিসাইলড কমিটি সম্প্রতি পণ্ডিত গোদাবরীশ মিশ্রের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত কমিটির অধিবেশনে তাঁহাদের রিপোর্ট দাখিল করার সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। ভূতপূর্ব মন্ত্রিমণ্ডলের আমলে এই কমিটি গঠিত হয়। শুনিতেছি, উড়িষ্যার ডোমিসাইল আইনের কোন কোন বিষয়ের পরিবর্তন সাধনের জন্য এই কমিটি সুপারিশ করিয়াছেন। ডোমিসাইল সার্টিফিকেট প্রদানের প্রচলিত আইন পরিবর্তনের জন্য এরূপ সুপারিশ করা হইয়াছে যে, ভিন্ন প্রদেশের যে সমস্ত ব্যক্তি উড়িষ্যায় পিতৃ-পিতামহক্রমে অন্যূন ৫০ বৎসর যাবৎ বসবাস করিতেছে, কেবল তাহাদিগকেই উক্ত সার্টিফিকেট দেওয়া হইবে। প্রস্তাবিত সংশোধনের পর এই আইন অনুসারে যাহারা ডোমিসাইল সার্টিফিকেট পাইবে, তাহাদের শিল্প ব্যবসায়, অর্থনীতিক ব্যবস্থা ও ভোটদান ক্ষমতার সংকোচসাধনের প্রস্তাবও এই কমিটি করিয়াছেন। বাঙলা দেশে ভারতের অন্যান্য প্রদেশের ব্যক্তিগণের নাগরিক অধিকার, শিল্পব্যবসায়, সম্পত্তি অর্জন প্রভৃতি কোন বিষয়েই সংকোচসাধক কোনরূপ ব্যবস্থা এ পর্যন্ত অবলম্বন করা হয় নাই। পরন্তু নানাক্ষেত্রে বাঙলা অবাঙালীর কর্তৃত্বই মানিয়া চলিয়াছে। কিন্তু বিহার, উড়িষ্যা প্রভৃতি প্রদেশের সুবিধা-বণ্টনে প্রাদেশিকতাদুষ্ট নীতির প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে মনে আমাদের এই প্রশ্ন স্বতঃই জাগে যে, অন্য প্রদেশবাসীরা বাঙালীদের উপর যতই দুর্ব্যবহার করুক না কেন, বাঙলা জগতের সর্বসাধারণের জন্য কি শিক্ষা-ব্যবস্থায়, কি নাগরিক অধিকারে, কি শিল্প-ব্যবসায় ও অর্থনৈতিক সুবিধা বণ্টনে দানসত্র খুলিয়া বসিয়াছে। উড়িষ্যার এই সংকীর্ণ নীতির যথাযোগ্য প্রতিবাদ ও উপযুক্ত প্রতিকার ব্যবস্থা অবলম্বন করা বাঙালীর পক্ষে অত্যাবশ্যক হইয়া উঠিয়াছে।

পরাধীনতার গ্লানি

মার্কিন যুক্তপ্রদেশে ভারতবাসীদের বসবাস করিবার এবং নাগরিক অধিকার প্রদানের সম্বন্ধে বিবেচনা করিবার উদ্দেশ্যে মার্কিন সিনেট হইতে একটি কমিটি নিযুক্ত করা হইয়াছিল। এই কমিটি সম্প্রতি তাঁহাদের রিপোর্ট দাখিল করিয়াছেন। কমিটির অধিকাংশ সদস্য ভারতবাসীদের অধিকার প্রদানের যৌক্তিকতা সমর্থন করিয়া রিপোর্টে বলিয়াছেন,—"ভারতবর্ষে প্রায় ৩৯ কোটি নরনারী বাস করে। চীনাদের ন্যায় ১৯১৭ সাল হইতে ভারতবাসীদেরও মার্কিন দেশে আসিয়া বসবাস করা নিষিদ্ধ হইয়াছে। এই বিধান ভারতবাসীদের অন্তরে অত্যন্ত বিক্ষোভের সৃষ্টি করিয়াছে; কারণ তাহাদের বিশ্বাস জন্মিয়াছে যে, ভারতীয়েরা কৃষ্ণাঙ্গ জাতি বলিয়াই এদেশে তাহাদিগকে এই ভাবে উপেক্ষা করা হইয়া থাকে। এই বিল যদি পাশ হয়, তবে বৎসরে মাত্র একশত জন ভারতবাসীকে মার্কিন যুক্তরাজ্যে বসবাস করিবার জন্য আসিতে দেওয়া হইবে। নাগরিক অধিকার দানের প্রশ্ন সম্বন্ধে এই কথা বলা চলে যে, মার্কিন যুক্তরাজ্যে প্রায় ৪ কোটি ভারতবাসী আছে, উহাদের মধ্যে অনেকেই নানা কারণে নাগরিক অধিকার লাভের যোগ্য বলিয়া বিবেচিত হইবে না, অথচ এই দুই দেশের অধিবাসীদের প্রতি বর্তমানে যে একটা বিদ্বেষের ভাব রহিয়াছে, তাহা দৃঢ়ীভূত হইবে।" এই বিল বিধিবদ্ধ হইবে কি না আমরা এখনও বলিতে পারি না; তবে দেখা যাইতেছে, এই বিলের স্বপক্ষে প্রেসিডেণ্ট রুজভেল্ট, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের এটর্ণী-জেনারেল ফ্রান্সিস্ বিডল, সহকারী পররাষ্ট্র সচিব মিঃ ব্রু প্রভৃতির সুপরামর্শ কোন কোন মার্কিন সংবাদপত্রে উদ্ধৃত করা হইয়াছে। দেখিতেছি ভারতবাসীরা যে মানুষের মর্যাদা পাইবার অধিকারী ইহা প্রমাণ করিতে মার্কিণ দেশের বড় বড় লোকের সুপারিশের এখনও প্রয়োজন হইয়া থাকে। আমাদের মনে আছে, কয়েকমাস পূর্বে এই বিল যখন মার্কিণ রাষ্ট্র-সভায় প্রথম উপস্থিত করা হইয়াছিল, তখন তৎকালীন মার্কিন প্রেসিডেণ্ট মিঃ রুজভেল্টের সমর্থন সত্ত্বেও ইহা নাকচ হইয়া যায়; শুনিতেছি, উহার পর ভারতবাসীদের অনুকূলে তথাকার অবস্থার অনেকটা পরিবর্তন সাধিত হইয়াছে; তথাপি দেখা যাইতেছে, কমিটির সদস্যদের মধ্যে এই সম্পর্কে মতভেদ ঘটিয়াছে। পরাধীনতার গ্লানি এমনই দুরপনেয়।

রবীন্দ্র-স্মৃতি ভাণ্ডারে সাহায্য

শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র মজুমদার মহাশয় কিয়ৎকাল যাবৎ রোগশয্যায় শায়িত আছেন। নিঃ ভাঃ রবীন্দ্রনাথ স্মৃতি-রক্ষা সমিতির সাধারণ সম্পাদক হিসাবে তাঁহার স্কন্ধে যে গুরুদায়িত্ব ন্যস্ত রহিয়াছে, তাহার চিন্তা তাঁহাকে পীড়িতাবস্থায়ও উৎকণ্ঠিত করিয়া তুলিয়াছে এবং তিনি এই স্মৃতি-রক্ষা ভাণ্ডারে অর্থ সাহায্যের জন্য দেশবাসীর কাছে পুনঃ পুনঃ আবেদন জানাইতেছেন। সম্প্রতি তিনি অর্থ সাহায্যার্থে দেশবাসীর উদ্দেশ্যে যে আবেদন প্রচার করিয়াছেন, তাহা হইতে জানা যায়, গত ৩০শে জুন পর্যন্ত এই ভাণ্ডারে সংগৃহীত মোট অর্থের পরিমাণ ৫ লক্ষ ৩৫ হাজার ৭ শত ১৪ টাকা। স্মৃতি-রক্ষা সমিতি পূর্বেই ঘোষণা করিয়াছেন, কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের স্মৃতি-রক্ষাকল্পে ন্যূনপক্ষে এক কোটি টাকার প্রয়োজন। সংগৃহীত অর্থ এতদুদ্দেশ্যে আবশ্যক অর্থের নগণ্য ভগ্নাংশ মাত্র। দুঃখের বিষয়, রবীন্দ্রনাথ স্মৃতিরক্ষা সমিতির আবেদনে যথোপযুক্ত ও উৎসাহজনক সাড়া পাওয়া যায় নাই। যে কবি আমাদের এত প্রিয়, যে কবির অতুলনীয় সাহিত্যিক অবদান আমাদের গৌরবের বস্তু, যাঁহার অনন্যসাধারণ সাধনা বাঙলার সংস্কৃতিকে আজ বিশ্বমানবসমাজে গৌরবজনক আসনে অভিষিক্ত করিয়াছে, তাঁহার স্মৃতি-রক্ষা ব্যক্তিবিশেষ বা সমিতি বিশেষের দায়িত্ব নহে, পরন্তু তাহা সমগ্র জাতিরই অপরিহার্য দায়িত্ব ও পবিত্র কর্তব্য। যতদূর বুঝিতে পারা যায়, এই স্মৃতি ভাণ্ডারে অর্থ সাহায্যদানে সাধারণ অবস্থার মধ্যবিত্ত শ্রেণী বিশেষ কার্পণ্য করিতেছেন না। কিন্তু যাঁহারা ধনী, তাঁহারা এই মহান কার্যে মুক্তহস্তে অর্থদানে অগ্রণী না হইলে এক কোটি টাকা সংগৃহীত হওয়া অসম্ভব। শোচনীয় কলঙ্কের হাত হইতে জাতিকে রক্ষার জন্য কবির যথাযোগ্য স্মৃতি-রক্ষাকল্পে তাঁহাদের উদ্যোগী হওয়া একান্ত আবশ্যক। এই মহান ব্রত উদ্‌যাপনের জন্য আমরা আশা করি, জাতিবর্ণ নির্বিশেষে সকলেই এই স্মৃতি-ভাণ্ডারে অবিলম্বে মুক্তহস্তে অর্থ সাহায্য প্রেরণ করিবেন।

গভর্ণরের বক্তৃতা

গত ২০শে আষাঢ় বুধবার বাঙলার গভর্নর মিঃ আর জি কেসি বাঙলার ঘরোয়া সমস্যা সম্বন্ধে বেতারযোগে বিস্তৃতভাবে আলোচনা করিয়াছেন। অন্নবস্ত্র হইতে মাছ দুধ তরিতরকারী রোগশোক, স্বাস্থ্য ব্যবস্থা—তিনি মোটামুটি সকল কথাই তুলিয়াছেন। প্রথমত অন্নের কথা। গভর্নরের মতে এইটিই প্রধান সমস্যা। এ সম্বন্ধে তিনি বলেন,—

গভর্নমেণ্টের কর্তৃত্বে আমরা বহু সংখ্যক গুদাম তৈয়ারী করিয়াছি। সেগুলি কেবল যে যুদ্ধের সময়ই আমাদের কাজে লাগিবে, তাহা নয়, বর্তমান সমস্যা কাটিয়া যাইবার পরও দুর্গতদের সাহায্যকল্পে এবং প্রাকৃতিক বিপদ-আপদ ও অস্বাভাবিক মূল্যে বৃদ্ধির প্রতীকার-কল্পে গভর্নমেণ্টের পক্ষে নিজেদের হাতে যথেষ্ট পরিমাণে চাউল ও ধান্য উহাতে মজুদ রাখা একান্ত উচিত হইবে বলিয়া আমি মনে করি। গত কয়েক মাস যাবৎ এই একটি বিষয় বিশেষ-অনুভব করা যাইতেছে যে, আমাদের বর্তমান মজুদ চাউলের অধিকাংশই বেশ উত্তম হইলেও ও যদি আমরা আরও দ্রুততার সঙ্গে গুদাম হইতে চাউল বাহির করিয়া দিয়া নূতন আমদানী চাউল দ্বারা গুদাম ভর্তি করিতে না পারি, তবে গুদামজাত করার ব্যবস্থা ভাল হওয়া সত্ত্বেও বেশী দিন মজুদ চাউল ভাল থাকিতে পারে না। এইজনাই আমাদের অপেক্ষা খারাপ অবস্থায় পতিত ভারতের অন্য কোন কোন অংশের সাহায্যার্থ ভারত সরকারকে এক লক্ষ টন চাউল দিব ব্যবস্থা করিয়াছি এবং বৃটিশ গভর্নমেণ্ট ও ভারত সরকারের সঙ্গে ব্যবস্থা করিয়া সিংহলের জন্যও কর্জ হিসাবে চাউল দিব স্থির করিয়াছি। ১৯৪৫ সালের বাকী কয় মাসের সম্বন্ধে আমরা চাউলের সম্পর্কে সঙ্গতভাবেই নিশ্চিন্ত থাকিতে পারি। আগামী আউস ফসল বেশ ভাল হওয়ারই সম্ভাবনা রহিয়াছে। এতদ্ব্যতীত ১৯৪৫ সালে ব্রহ্মদেশ হইতে চাউল আমদানীর সম্ভাবনাও রহিয়াছে।

বাঙলাদেশে চাউলের অভাব ঘটিবে না, এমন কারণ থাকিলে বাহিরে চাউল পাঠাইতে আপত্তির কোন কারণ থাকিতে পারে না; কিন্তু গভর্নর তাঁহার বক্তৃতায় সে সম্বন্ধে কোন নিশ্চয়তা দিতে পারেন নাই; ভাবী ফসল কেমন হইবে, ব্রহ্মদেশ হইতে চাউল পাওয়া যাইবে কি যাইবে না, এ সবই অনুমানের ব্যাপার; কিন্তু ইতিমধ্যেই দেখা যাইতেছে যে, মফঃস্বলের প্রায় সর্বত্র চাউলের দর বাড়িতে আরম্ভ করিয়াছে এবং কোন কোন স্থানে দর নিয়ন্ত্রিত মূল্যের হার ছাড়াইয়া আঠারো হইতে কুড়ি টাকায় উঠিয়াছে। এমন অবস্থায় চাউল দুষ্প্রাপ্য না হইতে পারে; কিন্তু এখনও দুর্মূল্য হইবার আশংকা রহিয়াছে। বর্তমানে যে দর আছে, তাহাও বাঙলার দরিদ্র এবং মধ্যবিত্ত পরিবারের পক্ষে সুলভ মূল্যে বলা চলে না। এরূপ অবস্থায় নিজের ঘরের জিনিস বাহির করিয়া পরের মুখাপেক্ষী হইয়া থাকিবার ঝুঁকি লওয়া সঙ্গত হইবে কি?

কলিকাতায় চাউলের ব্যবস্থা

কলিকাতার চাউল রেশনিংয়ে চাউলের ব্যবস্থার কিছু পরিবর্তন সাধিত হইবে, গবর্নর তাঁহার বক্তৃতায় আমাদিগকে এই আশ্বাস প্রদান করিয়াছেন। তিনি বলেন,—

আপনারা জানিয়া সম্ভবত আনন্দিত হইবেন যে, শীঘ্রই কলিকাতায় রেশন এলাকায় আরও দুই শ্রেণীর চাউল সরবরাহের ব্যবস্থা করা হইতেছে। তন্মধ্যে এক শ্রেণীর চাউল প্রতি মণ ১০৲ টাকা দরে বিক্রয় করা হবে। ইহা মোটা চাউল; অন্য শ্রেণীর খুব সরু চাউল ২৫৲ টাকা মণ দরে বিক্রয় হইবে। ইহা ছাড়া বর্তমানে ১৬৷৹ আনা মণ দরে যে চাউল দেওয়া হয়, তাহা পূর্ববৎ চলিবে।

সত্য কথা বলিতে গেলে মিঃ কেসির এই বিবৃতিতে আমরা বিশেষ আশ্বস্ত হইতে পারি নাই। বর্তমানে ১৬৷৹ আনা মণ দরে কলিকাতায় চাউল সরবরাহ করা হইতেছে। তদপেক্ষা কম দরে অর্থাৎ ১০৲ টাকা মণ দরে চাউল সরবরাহ করা হইবে, গরীবের পক্ষে শুনিতে ইহা আশার কথা বটে; কিন্তু বর্তমানে যে চাউল সরবরাহ করা হইতেছে, তাহারও বিশেষ প্রশংসা নাই এবং তাহাকে দস্তুরমত মোটাই বলা চলে; এই ধরণের চাউল যদি ১০৲ টাকায় দেওয়া হইত, তবে আশ্বস্তির বিষয় ছিল; কিন্তু ইহার চেয়েও মোটা বা খারাপ যে চাউল ১০৲ টাকা মণ দরে দেওয়া হইবে, তাহা মানুষের আহার্য হইবে তো? গরু ঘোড়ার পক্ষেও যাহা অখাদ্য, তেমন চাউলও রেশনিংয়ের ব্যবস্থার দৌলতে শহরের লোককে উদরস্থ করিতে হইয়াছে; নূতন ব্যবস্থায় সেই ধরণের মালই চালাইতে চেষ্টা করা হইবে কি? এদেশের লোকও মানুষ, এ ক্ষেত্রে সেই বিবেচনা করিয়া যেন অন্তত মানুষের আহার্যের ব্যবস্থা করা হয়; ২৫৲ টাকা মণ দরে শহরে যেসব চাউল সরবরাহ করা হইবে সে সম্বন্ধে আমাদের বিশেষ কিছু বলিবার নাই; কারণ তাহা শুধু ধনীরই ভোগ্য, গরীব বা মধ্যবিত্ত গৃহস্থের জন্য নয়, বিশেষত সপ্তাহে এক পোয়া করিয়া প্রথম শ্রেণীর এই চাউলের ব্যবস্থা পাখীর আহারও নহে; সুতরাং ধনীরও ক্ষুধা ইহাতে মিটিবে না।

মাছ ও দুধ

দুধ সম্বন্ধে গভর্নর, আমাদিগকে কোন আশ্বাসই দিতে পারেন নাই। পক্ষান্তরে নিতান্ত নিরাশার কথাই শুনাইয়াছেন। তিনি বলেন,—

দুগ্ধের ব্যাপারে কঠিন সমস্যা দেখা দিয়াছে। দুগ্ধ সরবরাহের পরিমাণ অল্প এবং মূল্যও অনেক বেশী। গুণের দিক দিয়াও এদেশের দুধ নিকৃষ্টতর। বহু বালক-বালিকা ও সন্তানবতী নারী তাহাদের প্রয়োজনের অপেক্ষা অনেক কম পরিমাণ দুধ পাইতেছে এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তাহাদিগকে ভেজাল মিশ্রিত দুগ্ধ গ্রহণ করিতে হয়। প্রধানত আমাদের গাভীগুলি কম দুধ দেয় বলিয়া দুগ্ধ সরবরাহের পরিমাণ কম। এই সমস্যা সমাধানের উদ্দেশ্যে উন্নত শ্রেণীর ষাঁড়ের প্রয়োজন। অথচ উত্তম ষাঁড় উৎপাদনের জন্য বাঙলা দেশে কোন প্রতিষ্ঠান নাই। কাজেই কলিকাতার ৩৫ মাইল উত্তর-পূর্বে হরিণঘাটা নামক স্থানে আমরা পশু সম্বন্ধীয় একটি বৃহৎ গবেষণাগার ও প্রজনন-কেন্দ্র স্থাপন করিবার ব্যবস্থা করিয়াছি।

ভারতের ভূতপূর্ব বড়লাট লর্ড লিনলিথগোর ঘাড়ে কিছুদিন ষাঁড়ের বাতিক চাপিয়াছিল। এদেশে বৃষভ কুলের উন্নতি সাধনে তাঁহার ব্যাকুল কণ্ঠের সে স্বর এখনও আমাদের কানে আসিয়া বাজিতেছে; কিন্তু তথাপি এদেশে ষাঁড়ের উন্নতি ঘটে নাই; অন্যভাবেই তাহাদের সম্প্রীতির পথ উন্মুক্ত হইয়াছে। সর্দার বল্লভভাই প্যাটেলের ভাষায় লর্ড লিনলিথগো এদেশের নরনারীকে দুরন্ত দুর্ভিক্ষের মুখে ঠেলিয়া দিয়া স্বচ্ছন্দে সাগরপারে পাড়ি জমাইয়াছেন এবং তাঁহার প্রশ্রয়ে শাসন বিভাগে ক্ষমতাদৃপ্ত ষাঁড়ের দলের দৌরাত্ম্যে দেশের লোক অস্থির হইয়াছে। যাউক সে কথা; আমাদের গাভীগুলি কম দুধ দেওয়া সত্ত্বেও আমাদের ভাগ্যে যেটুকু দুধ জুটিতেছিল, তাহাই বা গেল কোথায়? দুধে জলের পরিমাণও বা এমনভাবে বাড়িল কেন? হরিণঘাটার ৫ হাজার একর জমির ঘাসে পুষ্ট ষাঁড়গুলির কল্যাণে কবে আমাদের গো-কুল পর্যাপ্ত পয়স্বিনী হইয়া উঠিবে, এখন আমাদিগকে সেই দিনের আশায় তাকাইয়া থাকিতে হইবে। এদিকে এদেশের গরীবের ঘরের ছেলে-মেয়েরা এক ছটাক দুধও খাইতে পাইবে না। এতদিন তো সমস্যা এতটা জটিল আকার ধারণ করে নাই। পরাধীন জাতির ইহাই বিড়ম্বনা। তারপর মাছের কথা। গভর্নরের উক্তি এ সম্বন্ধে নিম্নরূপ,—

বাঙলার আমিষ জাতীয় প্রধান খাদ্য হিসাবে মাছের গুরুত্বের বিষয় আমি সম্পূর্ণরূপে অবগত আছি। বিগত দুর্ভিক্ষে মৎস্যজীবিকুল বিশেষ দুর্দশাগ্রস্ত হয় বলিয়া তাহাদের সাহায্যের ব্যবস্থা করা হইয়াছে। তাহারা যাহাতে মাছ ধরিতে পারে ও তাহাদের ব্যবসায়ে পুনঃ-প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে, সেজন্য চেষ্টা করা হইতেছে। উপযুক্ত পরিমাণ বরফ ব্যতীত শহর অঞ্চলে মৎস্যের সরবরাহ বৃদ্ধি করা সম্ভব নয়; বরফ নিয়ন্ত্রণের ফলে কলিকাতায় বরফ সরবরাহের পরিমাণ ইতিমধ্যেই যথেষ্ট বাড়িয়াছে।

দুর্ভিক্ষে পড়িয়া এদেশের মৎস্যজীবি-কুল দুর্দশাগ্রস্ত হইয়াছে বলিয়া গভর্নর আমাদিগকে জানাইয়াছেন; নূতন কথা কিছু নয়, কিন্তু তাহারা শুধু দুর্দশাগ্রস্ত হইয়াছে বলিলেও ঠিক বলা হয় না। বাঙলার মৎস্যজীবিকুল একরূপ নির্মূল হইয়াছে। মনুষ্যসৃষ্ট দুর্ভিক্ষ ইহার কারণস্বরূপে তো আছেই তাহা ছাড়া অন্য কারণও আছে। স্যার জন হার্বার্টের আমলে

সরকার কর্তৃক অবলম্বিত জেলেদের নৌকা জব্দ করিবার নীতির কথাই আমরা বলিতেছি। তারপর ইহাদের দুঃখ দূর করিবার জন্য সরকারী অনেক বড় বড় ব্যবস্থার কথা আমরা শুনিয়াছি; কিন্তু কোনটিই এ পর্যন্ত যথাযোগ্য কাজে আসে নাই। ভারত সরকার হইতে আরম্ভ করিয়া বাঙলা সরকার ইতঃপূর্বে মাছের শোকে চোখে অনেকখানি সাগরপানি বহাইয়াছেন; কিন্তু সে সব সত্ত্বেও আট আনা সেরে যে রুই মাছ কলিকাতার বাজারে বিকাইত, তাহা এখন সাড়ে তিন টাকা সেরেও মিলে না। এখন দেখিতেছি, সর্বক্ষেত্রে অগতির গতি ভারতরক্ষা আইন লইয়া বাঙলা সরকার এক্ষেত্রেও অবতীর্ণ হইয়াছেন। সম্প্রতি তাঁহারা একটি বিবৃতিতে জানাইয়াছেন,—

> বাঙলা সরকার কলিকাতার মৎস্যের ব্যবসা সম্পর্কিত সব কমিশন এজেণ্ট ও বড় বড় আমদানীকারদের লাইসেন্স গ্রহণের আবশ্যকতা জানাইয়া ভারতরক্ষা আইন অনুসারে এক আদেশ জারী করিতেছেন। এতদ্দ্বারা সরকার কলিকাতায় মোট যে পরিমাণ মাছ সরবরাহ হইয়া থাকে ও যে সকল স্থান হইতে উহার সরবরাহ হয়, তাহার পূর্ণ বিবরণ জানিতে পারিবেন এবং সেই সঙ্গে ব্যবসায়ীরা জোট-পাকাইয়া কৃত্রিম উপায়ে মাছ ধরিয়া রাখে কিনা তাহা নির্ধারণ করা যাইবে। ইহাতে ন্যায়সংগত ভাবে ব্যবসা পরিচালনা কিংবা ধীবরদের মাছের ব্যবসায়ে হস্তক্ষেপ করা হইবে না। যাহারা পাইকারী ও খুচরা ব্যবসায়ী হিসাবে সরাসরি মাছ আমদানী করে, তাহাদের জন্যই এই ব্যবস্থা।

ব্যবস্থা তো দেখিলাম; কিন্তু অবস্থার পরিবর্তন ঘটিবে কি? আপাতত কতকগুলি লোকের এই উপলক্ষে চাকুরীর ব্যবস্থা হইল এবং সেই সূত্রে অপরের ঘাটে-মাঠে চরিয়া খাইবার সুবিধা জুটিল—ইহাই দেখা যাইতেছে।

সরিষার তেল

দেশে অন্যান্য দ্রব্যের সরবরাহ সমস্যার আলোচনা করিয়া গভর্নর মিঃ কেসি বলিয়াছেন,—

> লবণের পরিস্থিতি বেশ সন্তোষজনক। চিনির সরবরাহের বরাবরই ঘাটতি রহিয়াছে। কেরোসিনের ঘাটতি আছে। সরিষার তেলের সমস্যা যদিও সম্পূর্ণ সন্তোষজনক নয়; তথাপি বলা চলে যে, অবস্থার উন্নতি সাধিত হইয়াছে।

মিঃ কেসি কথার চেয়ে কাজকেই বেশি মূল্য দান করেন, তাঁহার বক্তৃতায় তিনি নিজেই আমাদিগকে এই কথা শুনাইয়াছেন। সরিষার তেলের অবস্থার উন্নতি ঘটিয়াছে, তিনি এই কথা আমাদিগকে শুনাইয়াছেন; কিন্তু দুঃখের বিষয়, আমরা এ পর্যন্ত তাহা দেখিতে পাইতেছি না। বাঙলার ভূতপূর্ব অসামরিক সরবরাহ বিভাগের সচিব মিঃ সুরাবর্দী আমাদিগকে এই আশ্বাস দিয়াছিলেন যে, ভেজাল তেল তিনি আর বাজারে রাখিবেন না; কিন্তু গভর্নরের উক্তি অনুসারে অবস্থার উন্নতি ঘটা সত্ত্বেও আমরা দেখিতেছি, বাজার ঘুরিয়াও কুত্রাপি খাঁটি সরিষার তেল মিলে না। প্রকৃতপক্ষে সরিষার তেল নাম দিয়া নিয়ন্ত্রিত দরে যে দ্রব পদার্থ বিক্রীত হয়, তাহা মানুষের স্বাস্থ্যের পক্ষে বিষতুল্য বলিলেও অত্যুক্তি হইবে না। এই তেল ব্যবহারের ফলে যে বেরিবেরি, শোথ, উদরাময় প্রভৃতি রোগের প্রাদুর্ভাব ঘটিবে, ইহাতে আশ্চর্য হইবার কিছুই নাই।

অন্নের পর বস্ত্রের সমস্যা। বস্ত্রের অভাবে লোকে আত্মহত্যা করিতেছে বলিয়া যে সব সংবাদ প্রকাশিত হইতেছে, গভর্নর সেগুলিকে বিশেষ গুরুত্ব প্রদান করেন নাই। তাঁহার মতে কাপড়ের জন্যই হউক, অথবা অন্য কোন কারণেই হউক, প্রত্যেক দেশেই কিছু কিছু লোক আত্মহত্যা করিয়া থাকে। তিনি বলিয়াছেন যে, বিশ্বের সর্বত্রই প্রয়োজনের তুলনায় কাপড় অনেক কম উৎপন্ন হইতেছে। গ্রেট ব্রিটেন ও আর অনেক দেশে অনুরূপ সমস্যা দেখা দিয়াছে এবং সে সব দেশেও 'বস্ত্রের দুর্ভিক্ষ' ঘটিয়াছে বলা চলে। গভর্নরের এমন গা-ছাড়া কথায় ভুক্তভোগীদের কোনই সান্ত্বনা মিলিবে না। অন্যান্য দেশেও বস্ত্রের সমস্যা দেখা দিয়াছে জানা গেল; কিন্তু মফঃস্বলের শহরে শহরে অর্ধনগ্ন নরনারীর শোভাযাত্রা কোন দেশের সংবাদপত্রের স্তম্ভ তো শোভা করে না; বিলাতী কাগজে তো নয়ই। বস্ত্র সংগ্রহের জন্য ব্যাকুল নিরীহ নরনারীর উপর পুলিশ কোন দেশে গুলী চালাইয়াছে কি? গাইবাঁধায় সেদিন যে ব্যাপার ঘটিয়াছে, বিলাতে তাহা ঘটিলে সেখানে হুলস্থুল পড়িয়া যাইত। রাজসাহী জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের ন্যায় বস্ত্রের অভাবের জন্য আন্দোলন বন্ধ করিয়া কোনও দেশের হাকিম জরুরী বিধান জারী করিয়াছেন, এমন নজীর আমরা আধুনিক যুগে কোন সভ্য দেশেই দেখিতে পাই নাই। দুই মাসের অধিক হইতে চলিল, বাঙলা সরকার বস্ত্রের পুরাপুরি রেশনিংয়ের প্রতিশ্রুতি প্রদান করিয়াছেন; কিন্তু অদূর-ভবিষ্যতে যে সে প্রতিশ্রুতি প্রতিপালিত হইবে, গভর্নর তাঁহার সেদিনের বক্তৃতাতেও তেমন কোন আশ্বাসই আমাদিগকে প্রদান করিতে পারেন নাই। বস্ত্র বণ্টন সম্পর্কে যে সিণ্ডিকেট গঠন করিবার কথা শুনিতেছি, গভর্নর সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তরেও সে সম্বন্ধে যেন খোলাখুলি সব কথা বলিতে চাহেন নাই বলিয়া মনে হইল। এ ব্যাপারে আর কতদিন চাপাচাপির ভাব চলিবে এবং তাহার কারণই বা কি?

গোড়ায় গলদ

প্রকৃতপক্ষে গোড়ায় গলদ রহিয়াছে। বাঙলাদেশে আমলাতান্ত্রিক শাসন বিভাগে নানারূপ দুর্নীতি জড়াইয়া উঠিয়াছে। রোল্যান্ড কমিটি সে বিষয়ের প্রতি কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছেন। তাঁহারা বলিয়াছেন, "ইতঃপূর্বে বাঙলার রাজকর্মচারীদের কর্তব্যনিষ্ঠা এবং সততার জন্য খ্যাতি ছিল; কিন্তু সে অবস্থার অনেক অবনতি ঘটিয়াছে, যুদ্ধের পর হইতে সে অবনতি বিশেষভাবে গুরুতর আকার ধারণ করিতেছে।" বাঙলার গবর্নর মিঃ কেসীও তাঁহার বক্তৃতায় এই অবস্থার কথা স্বীকার করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন,—সপ্তাহের প্রতিদিনই ন্যায়বিচারকে ব্যর্থ করিবার জন্য অথবা অসঙ্গতভাবে কাহারও নিমিত্ত সুবিধালাভ করিবার উদ্দেশ্যে রাজকর্মচারীদিগকে উৎকোচ দিতে চাওয়া হইতেছে এবং তাহা গৃহীত হইতেছে। শাসন-বিভাগের এমন কলঙ্ক আর কিছুতে হইতে পারে না; কিন্তু আশু ইহার প্রতিকার সাধনের জন্য উপযুক্ত ব্যবস্থা অবলম্বিত হইতেছে না। এই সব দুর্নীতি এবং তজ্জনিত বঙলার বর্তমান সঙ্কট দূর করিতে হইলে দেশের জনসাধারণের প্রতি সহানুভূতি, প্রগতিশীল এবং জনমতের দ্বারা সুদৃঢ়ভাবে নিয়ন্ত্রিত এবং দুর্নীতির মূলোৎখাতে সংকল্পবদ্ধ শাসন ব্যবস্থা প্রবর্তিত হওয়া প্রয়োজন। এজন্য ৯৩ ধারা প্রত্যাহৃত হওয়া আবশ্যক এবং তৎস্থলে মন্ত্রিমণ্ডলকে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করা দরকার; কিন্তু নাজিম মন্ত্রিমণ্ডলীর মত মন্ত্রিমণ্ডল দেশের লোকে চায় না; তাহারা তেমন মন্ত্রিমণ্ডলের নাম শুনিলেও বিক্ষুব্ধ হইয়া উঠিবে। দেশের স্বার্থ সম্বন্ধে জাগ্রত নেতার দ্বারা শাসন-ব্যবস্থা নিয়ন্ত্রিত হওয়া এখানে সর্বপ্রথম প্রয়োজন হইয়া পড়িয়াছে। গত শুক্রবার হাওড়ার টাউন হলে একটি জনসভার সভাপতি-স্বরূপে শ্রীযুক্ত নির্মলচন্দ্র চন্দ্র বাঙলার এই বেদনা ব্যক্ত করিয়াছিলেন। তিনি বলেন—

> বাঙলায় আজ দেশপ্রেমিক সাধক নেতার প্রয়োজন। কর্মীর কর্মশক্তি, বাগ্মীর বাগ্মিতা বাঙলা দেশে শ্রীযুত শরৎচন্দ্র বসুর অপেক্ষা অন্যান্য নেতাদের কাহারও কাহারও মধ্যে হয়ত বেশী থাকিতে পারে; কিন্তু অধঃপতিত জাতিকে তুলিয়া ধরিয়া তাহার মুক্তি আনিতে হইলে যেমন সাধকের প্রয়োজন বাঙলার একমাত্র শরৎচন্দ্র বসুর মধ্যেই তেমন সাধনা আছে। বাঙলার বিগত দুর্ভিক্ষে চোখের সম্মুখে যখন শত শত লোক মারা গিয়াছে, তখন আমার শুধু এই-কথাই মনে হইয়াছে যে, আজ যদি শরৎচন্দ্র তাঁহাদের মধ্যে উপস্থিত থাকিতেন, তবে তিনি জাতিকে এমন মহদাদর্শে উদ্বুদ্ধ করিয়া তুলিতে পারিতেন এবং বাঙলার যুবশক্তিকে এমনভাবে সুগঠিত করিতে পারিতেন যাহাতে মৃত্যুর ধ্বংসলীলার উগ্রতা হ্রাস পাইত। অনেকে সে সময়, অবশ্য নানাভাবে দুর্ভিক্ষ প্রশমনের জন্য চেষ্টা করিয়াছিলেন; কিন্তু দুর্ভিক্ষের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করিতে হইলে বাঙলার শক্তি যেভাবে সঙ্ঘবদ্ধ করা প্রয়োজন, তাঁহারা তাহা করিয়া

উঠিতে পারেন নাই। বাঙলার ইতিহাসে এই যে, মসীলেপ ঘটিয়াছে, বাঙালী তাহা কোনদিন ভুলিতে পারিবে না; ক্ষমা হয়ত করিতে পারে, কিন্তু সেজন্য বাঙালীর অন্তরে যে ক্ষত হইয়াছে, তাহা দূর করা দুষ্কর। এখনও যদি শরৎচন্দ্রকে বন্দী করিয়া রাখা হয় এবং বাঙলার যেসব সন্তান দেশের স্বাধীনতা লাভের জন্য আজও কারাগারে অবরুদ্ধ রহিয়াছেন, এখনও যদি তাঁহাদিগকে মুক্ত না করা হয়, তবে এই কথাই বলিতে হয় যে, বৃটিশ গভর্নমেণ্ট শান্তি চাহেন না, তাঁহারা বাঙলাকে ভারতবর্ষের মানচিত্র হইতে মুছিয়া ফেলিতে চাহেন।"

সিমলায় কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির বৈঠকে শ্রীযুত কিরণশঙ্কর রায় বাঙলার এই সমস্যার কথা উত্থাপন করিয়াছিলেন। তিনি বলেন, দায়িত্বহীন শাসন এবং মনুষ্যসৃষ্ট দুর্গতির ফলে বাঙলা সর্বস্বান্ত ও নিঃশেষে শোষিত হইয়াছে। বাঙলার এই অবস্থা সম্বন্ধে আমাদের সিমলাস্থ প্রতিনিধির নিকট জনৈক কংগ্রেস-নেতা বলেন,—

"বাঙলা এবং বাঙলার জনসাধারণকে দক্ষিণ-পূর্ব এসিয়ার যুদ্ধোত্তাপ সর্বাধিক সহ্য করিতে হইয়াছে। দুর্ভিক্ষের সময় হাজার হাজার টন খাদ্যশস্য গুদামে পচিয়াছে, অথচ মানুষ সেখানে অনাহারে পথে পড়িয়া মরিয়াছে। মানুষ জীবনের প্রতি এমন নির্বিকার ঔদাসীন্যের উদাহরণ জগতের ইতিহাসে আর দেখা যায় নাই। কিন্তু ইহাতে বিস্ময়ের কোন হেতু নাই। শাসকদের কার্যকর প্রতীকার ব্যবস্থা অবলম্বনে শিথিলতা বা ঔদাসীন্যই ইহার কারণ। সোজাসুজি কাজ ছাড়া বাঙলাদেশ আর বাগাড়ম্বর ও প্রতিশ্রুতিতে ভরসা করিতে পারে না। বাঙলা সত্যই আজ জীবন-মরণের সন্ধিস্থলে পৌঁছিয়াছে।"

এই অবস্থা কাটাইয়া বাঙালীকে বাঁচিতে হইবে। তাহার উপায় কি?

দেশের কথা

(২০শে আষাঢ় হইতে ২৬শে আষাঢ়)

সিমলায় আলোচনা—মুসলিম লীগ ও মুসলমান—বস্ত্র সংকট ও বিদেশী বস্ত্র—বাঙলা

সিমলায় আলোচনা (কংগ্রেস)

গত ৩রা জুলাই (১৯শে আষাঢ়)—সিমলায় মহাত্মাজী যে গৃহে অবস্থান করিতেছেন, তথায় রাষ্ট্রপতি মৌলানা আবুল কালাম আজাদের সভাপতিত্বে কংগ্রেসের কার্যকরী সমিতির এক অধিবেশন হয় এবং মহাত্মাজী অধিবেশনে উপস্থিত ছিলেন। বেলা ২টা হইতে অপরাহ্ণ ৬টা পর্যন্ত অধিবেশনে ওয়াভেল পরিকল্পনা আলোচিত হয়। পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু, সর্দার বল্লভভাই প্যাটেল, শ্রীমতী সরোজিনী নাইডু, ডক্টর রাজেন্দ্রপ্রসাদ, আচার্য কৃপালনী, মিস্টার আসফ আলী, পণ্ডিত গোবিন্দবল্লভ পন্থ, ডক্টর সীতারামিয়া, শ্রীযুত শঙ্কররাও দেও ও ডক্টর প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ উপস্থিত ছিলেন। ডক্টর খাঁ সাহেব আলোচনায় যোগ দেন। মহাত্মাজী যে বক্তৃতা করেন, তাহা শেষ হইবার পূর্বেই অধিবেশন শেষ হয়।

কংগ্রেস ও মুসলিম লীগ স্ব স্ব কার্যকরী সমিতির অধিবেশন করায় মনে হয়—পরিকল্পনা ব্যর্থ হইবে না।

রাষ্ট্রপতি আজাদ এক বিবৃতিতে বলেন— জাতীয় জীবনের এই সংকটকালে আমরা যেন ওয়াভেল পরিকল্পনায় অকারণ গুরুত্ব আরোপ বা বর্তমানের প্রয়োজন অবজ্ঞা—কিছুই না করি।

শিখ নেতা মহারাজ প্রতাপ সিংহ কংগ্রেসের নেতৃত্বে আস্থা প্রকাশ করেন এবং সর্দার মঙ্গল সিংহ প্রমুখ শিরোমণি আকালী দলের প্রতিনিধিরা পণ্ডিত গোবিন্দবল্লভ পন্থের সহিত শিখগণ ও কংগ্রেস একযোগে কাজ করিবার বিষয় আলোচনা করেন।

লর্ড ওয়াভেল আমন্ত্রিত ব্যক্তিদিগকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন।

৪ঠা জুলাই ২বার কংগ্রেসের কার্যকরী সমিতির অধিবেশন হয় এবং অধিবেশন-শেষে মৌলানা আজাদ জানান—কোন সিদ্ধান্ত হয় নাই।

প্রকাশ হয়—৬ই জুলাই কংগ্রেস বড়লাটের শাসন পরিষদের জন্য মনোনীত ব্যক্তিদিগের নামের তালিকা বড়লাটকে প্রদান করিবেন।

কংগ্রেস প্রতিষ্ঠানের ভবিষ্যৎ কি হইবে, কাহাদিগকে যোগ্যতম মনে করিয়া ব্যবস্থা পরিষদের জন্য মনোনীত করা হইবে, অন্যান্য দলের সহিত সম্মিলিতভাবে কিরূপে কাজ করা যাইবে—কার্যকরী সমিতি সেই সকল বিষয় বিবেচনা করেন।

৫ই জুলাই রাষ্ট্রপতি আজাদ বলেন, পরদিন কংগ্রেস মনোনীত ব্যক্তিদিগের নামের তালিকা প্রেরণ করা হইবে। তিনি আশা প্রকাশ করেন—সম্মেলনের কার্য সুফল প্রসব করিবে। জাতীয় দলের কোন ব্যক্তিকে মনোনীত করিবার বিষয়ে পরামর্শের জন্য ব্যবস্থা পরিষদে জাতীয় দলের নেতা ডক্টর প্রমথনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়কে এইদিন কংগ্রেসের কার্যকরী সমিতির অধিবেশনে আহ্বান করা হয়।

মুসলিম লীগ যদি লর্ড ওয়াভেলের পরিকল্পনা বর্জন করেন, তবে কি হইবে? এই প্রশ্নে মৌলানা আজাদ বলেন—তাহা লর্ড ওয়াভেলের ভাবিবার বিষয়—তাঁহাদিগের নহে।

৬ই জুলাই স্থির হয় কংগ্রেস পরদিন ১৫ জনের নাম প্রেরণ করিবেন। মনোনয়নে ৩টি বিষয়ে লক্ষ্য রাখা হইয়াছে, বলা হয়—

(১) উপযুক্ত লোক মনোনয়ন, (২) দলের মধ্যে মনোনয়ন সীমাবদ্ধ না রাখিয়া কংগ্রেসাতিরিক্ত দল হইতেও উপযুক্ত ব্যক্তি মনোনয়ন, (৩) যথাসম্ভব অধিক সংখ্যালঘিষ্ঠ সম্প্রদায়ের প্রতিনিধি মনোনয়ন।

এইদিন—জাতীয় দলের পক্ষে ডক্টর প্রমথনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও শিখনেতা মাস্টার তারা সিংহ স্ব স্ব মনোনীত নামের তালিকা প্রেরণ করেন।

৭ই জুলাই—কংগ্রেস মনোনীত ব্যক্তিদিগের নামের তালিকা বড়লাটের নিকট প্রেরণ করেন। নামের তালিকা লইয়া অনেক জল্পনাকল্পনা হয় এবং অনেকের বিশ্বাস নিম্নলিখিত নামসমূহ তালিকায় স্থান পাইয়াছে:—

(১) মৌলানা আবুল কালাম আজাদ, (২) পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু, (৩) সর্দার বল্লভভাই প্যাটেল, (৪) ডক্টর রাজেন্দ্রপ্রসাদ, (৫) মিস্টার আসফ আলী, (৬ ও ৭) ডক্টর শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় ও আর একজন অ-কংগ্রেসী হিন্দু, (৮) মিস্টার মহম্মদ আলী জিন্না, (৯) নবাবজাদা লিয়াকৎ আলী খান, (১০) নবাব মহম্মদ ইসমাইল খান, (১১) মাস্টার তারা সিংহ, (১২) স্যার আর্দেশীর দালাল, (১৩) রাজ-

কুমারী অমৃত কাউর, (১৪ ও ১৫) তপশীলভুক্ত সম্প্রদায়ের মিস্টার মনুস্বামী ও একজন বাঙালী।

বলা হয়, শাসন পরিষদের জন্য মনোয়নে ডক্টর শ্যামাপ্রসাদ মহাত্মাজীর অনুরোধ প্রত্যাখ্যান করিয়াছেন—কারণ তিনি মুসলিম লীগের ৫ জন ও কংগ্রেসের ৫ জন সদস্য অসংগত বলিয়া বিবেচনা করেন। কিন্তু তিনি আমন্ত্রণের কথা অস্বীকার করিয়াছেন।

এইদিন শ্রীযুত কিরণশংকর রায় বাঙলার অবস্থা—দুর্ভিক্ষের পরে পুনর্গঠনের বিষয় কংগ্রেসের কার্যকরী সমিতিকে জ্ঞাপন করেন। ইহার পূর্বে বাঙলার কৃষক-প্রজা দলের নেতা মৌলবী সামসুদ্দীন আমেদ এ বিষয়ে মৌলানা আজাদকে তার করিয়াছিলেন।

৮ই জুলাই—কংগ্রেসের কার্যকরী সমিতি সানফ্রান্সিস্কো বৈঠকের সম্পর্কে কংগ্রেসের আন্তর্জাতিক ব্যবস্থা আলোচনা করেন। মৌলানা সাহেব বলেন, সমিতিকে বাঙলার দুর্ভিক্ষ, দেশের সাধারণ অবস্থা, অস্তি ও চিমুরের বন্দীদিগের বিষয় প্রভৃতি বিবেচনা করিতে হইবে। শাসন পরিষদ গঠিত হইলে সর্বাগ্রে জনগণের অধিক খাদ্যদ্রব্য ও বস্ত্র প্রাপ্তির ব্যবস্থা করিতে হইবে।

৯ই জুলাই—মুসলিম লীগ মনোনীত ব্যক্তিগণের নামের তালিকা দেন নাই।

মুসলিম লীগ ও মুসলমান

লর্ড ওয়াভেল মুসলিম লীগকে যে গুরুত্ব প্রদান করিয়াছেন, তাহাতে যে আপত্তির কারণ আছে, তাহা বলা বাহুল্য। কারণ উহার ব্যবস্থায় কংগ্রেসকে বর্ণহিন্দুর প্রতিষ্ঠানে পরিণত করা হইয়াছে, লীগপন্থী ব্যতীত আর সকল দলের মুসলমানদিগকে অবজ্ঞা করা হইয়াছে—অথচ মুসলিম লীগ শতকরা ৪০ জনের অধিক মুসলমানের প্রতিনিধিত্ব দাবী করিতে পারেন না, কংগ্রেসপ্রধান প্রদেশসমূহেও অতঃপর সচিবসংঘে সংখ্যানুপাতে অধিক সংখ্যক মুসলমান গ্রহণ করিতে হইবে।

মিস্টার জিন্না কিন্তু ইহাতেও সন্তুষ্ট হইতে পারেন নাই। 'টাইমস অব ইন্ডিয়া' বলেন, তিনি এবার প্রথম সাক্ষাতে লর্ড ওয়াভেলকে ৩টি প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন:-

(১) লীগই মুসলমানদিগের একমাত্র প্রতিনিধি প্রতিষ্ঠান, একথা লর্ড ওয়াভেল স্বীকার করেন কিনা? লর্ড ওয়াভেল নাকি উত্তরে বলিয়াছেন—না।

(২) লীগ যাঁহাদিগকে মনোনীত করিবেন, তাঁহাদিগকেই গ্রহণ করা হইবে কিনা? লর্ড ওয়াভেল নাকি বলিয়াছেন—না।

(৩) যদি লীগ পরিকল্পনায় সম্মত না হ'ন, তবে কি হইবে? লর্ড ওয়াভেল নাকি বলিয়াছেন—যদি তাহা হয়, তবে তিনি অবস্থা বুঝিয়া ব্যবস্থা করিবেন।

মিস্টার জিন্না লর্ড ওয়াভেলের এই দৃঢ়তায় অসন্তুষ্ট হইয়া ক্রোধ প্রকাশ করিয়াছিলেন।

কিন্তু আমরা দেখিয়াছি—

(১) শিয়া সম্প্রদায় ও মোমিন দল মুসলিম লীগের প্রতিনিধিত্ব অস্বীকার করিয়াছেন। (২রা জুলাই)

(২) মোমিন সম্মেলন রাঁচীতে জানাইয়া দেন, মুসলিম লীগ মুসলমানদিগের একমাত্র প্রতিনিধি প্রতিষ্ঠান নহেন। (৪ঠা জুলাই)

(৩) কেন্দ্রী মুসলমান এসোসিয়েশনের সভাপতি স্যার আবদুল হালিম গজনভী লর্ড ওয়াভেলকে জানান (৪ঠা জুলাই)—"মুসলিম লীগ ভারতের সকল মুসলমানের প্রতিনিধিত্ব দাবী করিতে পারেন না।"

গত ৬ই জুলাই সিমলায় মুসলিম লীগের কার্যকরী সমিতির অধিবেশনের পরে মনে হয়—লীগ সকল মুসলমানের প্রতিনিধিত্বের দাবী ত্যাগ করিতে অসম্মত।

কিন্তু কংগ্রেস ওয়াভেল পরিকল্পনায় যে ভাব প্রকাশ করিয়াছেন, তাহাতে লীগের বহু সভ্য কিংকর্তব্যবিমূঢ় হইয়াছেন।

মিস্টার জিন্না পুনঃ পুনঃ বড়লাটের নিকট তাঁহার পরিকল্পনা ও প্রস্তাব সম্বন্ধে নানা বিষয়ের ব্যাখ্যা চাহিয়াছেন।

গত ৮ই জুলাই মিস্টার জিন্না বড়লাটের সহিত সাক্ষাৎ করিতে যাইয়া দেড় ঘণ্টাকাল অলোচনা করেন। ৯ই তারিখে লীগ মনোনয়ন করিবেন কিনা স্থির করিবেন—ইহাই জানা যায়।

বস্ত্রসংকট ও বিদেশী বস্ত্র

গত ৩রা জুলাই গাইবান্ধা (রংপুর) হইতে সংবাদ পাওয়া যায়—বামনডাঙ্গা ইউনিয়ন হইতে কাপড়ের "ছাড়ের" জন্য এত লোকসমাগম হয় যে, জনতা অশান্ত হইয়া উঠে এবং পুলিশ গুলী চালায়।

৪ঠা জুলাই বাঙলার গভর্নর বলিয়াছেন—বস্ত্রের অভাব অনিবার্য। তবে বস্ত্রাভাবে যে লোক আত্মহত্যা করিতেছে, ইহা তিনি বিশ্বাস করেন না। তিনি বলেন, পূজার পূর্বেই বস্ত্র "রেশনিং" ব্যবস্থা হইবে (গত পূর্ব দুর্গোৎসবের পূর্বে কেন্দ্রী সরকারের বাণিজ্য সদস্য বলিয়াছিলেন, পূজার পূর্বেই স্ট্যান্ডার্ড কাপড়ে বাজার পূর্ণ হইবে।)

কলিকাতায় বাঙলা সরকারের বস্ত্র বিভাগের অব্যবস্থায় সকল ওয়ার্ড কমিটি একযোগে পদত্যাগ করিবেন কি না, তাহা বিবেচনা করিবার জন্য গত ৮ই জুলাই এক সভা হইয়া গিয়াছে—১১ই জুলাই আর এক সভা হইবে।

গত ২রা জুলাই বোম্বাই হইতে সংবাদ পাওয়া গিয়াছে, 'গেজেট অব ইন্ডিয়ায়'—৯ই জুন টেক্সটাইল কমিশনারের বিদেশ হইতে আমদানী বস্ত্রের হিসাব দিবার জন্য আমদানীকারীদিগকে নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে। ইহাতেই বুঝা যায়—ইতিমধ্যেই বিদেশ হইতে এদেশে কাপড় আমদানী হইতেছে।

মৃত্যু-সংবাদ

গত ৬ই জুলাই রাত্রি সাড়ে ১১টার সময় তাঁহার কলিকাতাস্থ ভবনে দ্বারকানাথ চক্রবর্তীর মৃত্যু হইয়াছে। মৃত্যুকালে তাঁহার বয়স ৯১ বৎসর হইয়াছিল। চক্রবর্তী মহাশয় কলিকাতা হাইকোর্টের প্রসিদ্ধ উকীল ছিলেন। তিনি ১৮৮৩ খৃস্টাব্দে ওকালতী আরম্ভ করিয়া ১৯৩০ খৃস্টাব্দে অবসর গ্রহণ করেন। ইহার মধ্যে ১৯২৩ খৃস্টাব্দ হইতে ১৯২৬ খৃস্টাব্দ পর্যন্ত হাইকোর্টের অন্যতম বিচারক ছিলেন।

রাজনীতিক কারণে বন্দী

গত ৪ঠা জুলাই বিলাত হইতে সংবাদ প্রচারিত হইয়াছে, বাঙলার কয়েকজন রাজনীতিক কারণে বন্দীকে মুক্তিদানের বিষয় বিবেচিত হইতেছে এবং বাঙলার গভর্নর নাকি শ্রীযুত শরৎচন্দ্র বসুকে মুক্তিদানের পক্ষপাতী।

বাঙলার নানাস্থানে রাজনীতিক কারণে বন্দীদিগের—বিশেষ শ্রীযুত শরৎচন্দ্র বসুর মুক্তি চাহিয়া সভা হইয়াছে। সে সকলের মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য:—

(১) ৫ই জুলাই কলিকাতা ইউনিভার্সিটি ইনস্টিটিউট হলে শ্রীযুত যোগেশচন্দ্র গুপ্তের সভাপতিত্বে সভা।

(২) ৬ই জুলাই হাওড়া টাউন হলে শ্রীযুত নির্মলচন্দ্র চন্দ্রের সভাপতিত্বে জনসভা।

অতি সাধারণ ঘটনা

শ্রীপ্রমথ নাথ বিশী

মানুষের মাথা যে এমন করিয়া কাঠের উপরে ঢুঁ মারিতে পারে এই লাইনের 'বাসে' না উঠিলে তাহা কখনই জানিতে পারিতাম না। উঁচু নীচু রাস্তায় বাসখানা এক একবার হুঁচোট খায় আর আট দশটা মাথা ছাদের কাঠের তক্তায় গিয়া আঘাত করে। কাঠও ফাটে না, মাথাও ভাঙে না—দুই-ই সমান শক্ত। আমি মাথায় ছোট, আমার মাথা ততদূর পৌঁছায় না বটে, কিন্তু সম্মুখবর্তীর পিঠে গিয়া গুঁতা মারে, গুঁতাটাকে সে আগে চালান করিয়া দেয়, এমনি করিয়া গুঁতাটা অগ্রসর হইতে হইতে গতির তীব্রতা হারাইয়া ফেলিয়া প্রথম সারির লোকের একটা শিরঃকম্পনে গিয়া অবসিত হয়। বাসের গায়ে পুরাতন অক্ষরে লেখা আছে বটে ষোলজন যাত্রী বসিবে, কিন্তু আমরা প্রায় পঞ্চাশজন লোক বসিয়া, দাঁড়াইয়া, বাঁকিয়া, দুমড়িয়া, ঝুলিয়া এবং দুলিয়া চলিয়াছি; পঞ্চাশজন এবং পঞ্চাশজনের আনুষঙ্গিক পোঁটলা পুঁটলি। ভিড়টা এমনই সূচীভেদ্য যে সহযাত্রীদের কাহারো পূর্ণ মূর্তি দেখিবার সুযোগ নাই। কাহারো চেহারার সিকি, কাহারো দু' আনা, কাহারো মাথা, কাহারো জুতো মাত্র দেখিতেছি। আবার একজনের দেহটাকে অনুসরণ করিয়া আর একজনের পায়ে গিয়া দৃষ্টি ঠেকে, একজনের হাতটাকে অনুসরণ করিলে আর একজনের কাঁধে গিয়া পৌঁছায়—গন্তব্যস্থলে পৌঁছান অবধি যখন এইভাবে ঝুলিয়া থাকা ছাড়া গত্যন্তর নাই, কাজেই ওই এক ধাঁধার মীমাংসা লইয়া কাটাইতেছি। পা দুখানা এত পুষ্ট অথচ মুখখানা রোগা! পা এবং মুখ একই জীবের কি না মীমাংসা করিতে ব্যস্ত এমন সময়ে কাঠামো শুদ্ধ একবার নড়িয়া গেল, আর একটু হইলে একখানা মিলিটারী গাড়ীর সঙ্গে ধাক্কা লাগিয়াছিল আর কি! ধাক্কা না দিলে কাহারো বাঁচিবার আশা ছিল কি?—পথের পাশেই গভীর নালা। বোধ করি কেহই বাঁচিত না' মুখ তুলিতেই বাসের দেয়ালের গায়ে লেখা চোখে পড়িল—"No chance!" কি সর্বনাশ! কোম্পানী তো স্পষ্ট করিয়া সতর্কবাণী লিখিয়া রাখিয়াছে—'নো চান্স!' যে রকম ব্যাপার দেখিতেছি তাহাতে 'নো চান্সই' বটে তো! কোন রকমে একবার নামিতে পারিলে হয়। পরে জানিয়াছি কথাটা 'No chance নয়, 'No Change' অর্থাৎ ভাঙানী পাওয়া যাইবে না। কিন্তু G-টা C-এর মতো দেখায়—লেখাটা বোধ হয় দ্ব্যর্থক!

এমন সময়ে নর ব্যূহের অবকাশে একখানা হাতের মণিবন্ধের অংশ চোখে পড়িল। আর কিছু দেখা যাইতেছে না। ধাঁধার মীমাংসায় আবার লাগিয়া গেলাম—এ মণিবন্ধ যার, তার মুখ কোথায়? মণিবন্ধটা কোমল, সুকুমার, বর্ণ উজ্জ্বল! কিশোর বালকের হওয়াই সম্ভব। এমন সময়ে একটা গুঁতার ফলে সম্মুখে ঝুঁকিতে বাধ্য হইলাম—তখনি চোখে পড়িল মণিবন্ধের প্রান্তে একখানি শাখা। তবে তো বালিকার হাত। আর একবার হুঁচোট—আরও একটু অগ্রসর হইতেই চোখে পড়িল শাঁখার নীচেই একখানি লোহা। এবারে আর সন্দেহ নাই যে বিবাহিতা স্ত্রীলোকের ওই মণিবন্ধ। তার মুখখানা বোধ করি ওই পাঞ্জাবীদ্বয়ের দাড়ির মেঘের আড়ালে অন্তর্হিত। এমন সময়ে গোটা দুই আচ্ছা রকম ধাক্কা দিয়া বাসখানা থামিয়া গেল। একটা স্টেশন। এই লাইনের ইহাই উপান্ত স্টেশন। অধিকাংশ লোক ভারতীয় বহু জাতির বিচিত্র প্রতিনিধির দল—দাড়ি, পাগড়ী, টুপি, টিকি, টাক ও পোঁটলা পুঁটুলি লইয়া প্রস্তর খণ্ডবাহী জলস্রোতের মতো সবেগে নামিয়া গেল। বাস প্রায় খালি—এতক্ষণে বসিবার জায়গা পাওয়া গেল।

বসিয়া পড়িলাম। হাত, পা, ঘাড়, মাথা সব যেন আর কাহারো। বাঁকিয়া চুরিয়া দাঁড়াইয়া থাকিতে থাকিতে সব অবশ হইয়া গিয়াছিল। হাত পা টান করিয়া ঘাড়টাকে কয়েকবার ঘুরাইয়া চেতনা ফিরাইয়া আনিবার চেষ্টায় নানারূপ কসরৎ করিতেছি। ঘাড়টাই সবচেয়ে অসাড় হইয়াছে—বারংবার দুই বিপরীত দিকে ঘুরাইয়া লইতেছি। একবার ঘাড় ঘুরাইতেই পাশের দিকের বেঞ্চিতে একটি মেয়ের উপরে চোখ পড়িল। কচি বয়স, সিঁথায় সিঁদুর, মুখে কচি ডাবের শ্যামল সৌকুমার্য এবং অনবদ্য স্নিগ্ধ রমণীয় একটি নিটোলতা; শ্যামল বাঙলার শ্যামা বালিকা।

লাবণ্য মসৃণ দুখানি বাহু ক্রমঃ সূক্ষ্ম হইয়া অবশেষে পাঁচটি নীরব আঙুলে পর্যবসিত হইয়াছে। কোমল মণিবন্ধে শুধু একখানি করিয়া শাঁখা ও লোহা। ওঃ তবে ইহারি মণিবন্ধের অংশ জনতার অবকাশে চোখে পড়িয়াছিল। কিন্তু ঘাড়টা এখনো স্ববশে ফেরে নাই—এখনো মাঝে মাঝে ঘুরাইতেছি। একবার মেয়েটিকে চোখে পড়ে আর একবার পথের পাশের কৃষ্ণচূড়ার অফুরন্ত পুষ্পিত আবীরের ছটা। হঠাৎ মনে হইল কিন্তু এ কি! মেয়েটি বিবাহিত অথচ হাতে কোন অলঙ্কার নাই কেন? বাঙলা দেশের বিবাহিত মেয়ে যত গরীবই হোক না কেন, আর মেয়েটিকে তো চেহারায় ও পোষাকে মধ্যবিত্ত ঘরের বলিয়াই মনে হয়, দুএকখানা সোনার অলঙ্কার পরিয়াই থাকে। একটা রুলি, দুখানা চুড়ি, যা সকলেরই জোটে, বিবাহের সময়ে এই সামান্য অলঙ্কার না পায় এমন মেয়ে বাঙলাদেশে বিরল, ইহার কি তাহাও জোটে নাই? ইহার দারিদ্র্য কি এমনি অসাধারণ! অথচ মেয়েটির মধ্যে



প্রস্তরখণ্ডবাহী জলস্রোতের ম তো সবেগে নামিয়া গেল।

আর কোন অসাধারণত্ব চোখে পড়ে না। কিম্বা এমনও হইতে পারে যে, অলঙ্কার-গুলো কোন আসন্ন বিপদের পথ রোধ করিতে গিয়াছে? এই অল্প বয়সে এমন কি বিপদ ইহার ঘটিল যাহাতে শাঁখা ও নোহা ছাড়া আর সব খুলিয়া দিতে হইয়াছে? ওই রিক্ত মণিবন্ধের নিরঞ্জন কোমলতা কেবলি মনের মধ্যে খোঁচা দিতে লাগিল। অলঙ্কারের মধ্যেই মেয়েদের ইতিহাস নিহিত—তাহাদের সৌভাগ্যের দুর্ভাগ্যের এবং পতনের।

বাস শেষ স্টেশনে আসিয়া থামিল। এখানে একটি প্রসিদ্ধ যক্ষ্মানিবাস অবস্থিত। যাহারা আসে—ওই যক্ষ্মানিবাসের আত্মীয়-স্বজনকে দেখিতেই আসে। অন্য কাজে বড় কেহ আসে না। মেয়েটি নামিল—হাতে ছোট একটি ফলের পুঁটুলি। আর পাঁচজনের সঙ্গে সে অদূরস্থিত যক্ষ্মা-নিবাসের দিকে দ্রুত পদে চলিয়া গেল। অমনি এক বিদ্যুতের ঝলকে তাহার মণিবন্ধচ্যুত অলঙ্কারের ইতিহাস বেদনার বাহ্য ভাষায় আমার মনে উচ্চারিত হইয়া গেল। কোথায় কেন সেই অলঙ্কারগুলি গিয়াছে বুঝিতে বিলম্ব হইল না। লুপ্ত অলঙ্কারের মধ্যে তাহার গুপ্ত ইতিহাসের একটা আভাস পাওয়া গেল। গাছ পালার আড়ালে পথের বাঁকে মেয়েটি অন্তর্হিত হইয়া গেল কিন্তু আসন্ন অস্ত আভায় করুণ তাহার সেই মুখ, শঙ্খমাত্র সহায় অনন্য অলঙ্কার সেই শূন্য মণিবন্ধ কিছুতেই ভুলিতে পারিলাম না। অনেক দিন ধরিয়া এই দুটি ছবি আমার চেতনার মধ্যে সূচী চালনা করিয়া বেদনার কন্থা বুনিয়া যাইতে লাগিল। ভাবিলাম, যক্ষ্মানিবাসে গিয়া একবার খোঁজ করিলেই তো সব জানা যায়—সব জানাতেই সব কৌতূহলের পরি-সমাপ্তি! কিন্তু তাহা আর সম্ভব হইল কোথায়? ভাবিলাম, নিজের মনেই মেয়েটির ইতিহাস রচনা করিয়া কৌতূহল শান্ত করি না কেন? তাহার ইতিহাসের কাঠামোটা তো সর্বজন বিদিত—তাহার ভাগ্যে নূতন আর কি ঘটিবে? তাহার ব্যক্তিগত বেদনার মেঘের মধ্যেই তো সহস্রের অশ্রুজল সঞ্চিত হইয়া আছে! তাহার অজ্ঞাতে তাহার কাহিনী রচনা স্থির করিয়া ফেলিলাম। দুঃখের চক্রাবর্তনে তাহার কাহিনী শিল্প-সামগ্রী হইয়া উঠিল। শিল্পেই পূর্ণতা—পূর্ণতাই শান্তি।

অতি সাধারণ ঘটনা, অতি সাধারণ মানুষ। অমিত আর শমিতার মাথা ভিড়ের মধ্যে তলিয়ে যাবার মাপে বিধাতা তৈরি করেছিলেন বলেই হোক আর ইচ্ছার অভাবেই হোক কখনো তারা ভিড়ের উর্ধ্বে নিজেদের মাথা উদ্ধত করে তোলেনি। পাহাড়ের সানুতে দৃষ্টির অতীত যে-সব শিলাখণ্ড পড়ে থাকে তারাও একদিন অগ্ন্যুৎপাতের ঠেলায় অন্তিম ভাস্বরতায় আকাশ পথে উৎক্ষিপ্ত হয়ে দৃষ্টি আকর্ষণ করে—অমিত শমিতার ভাগ্যে এমনকি সেই বেদনার দ্যুতিরও সৌভাগ্য ছিল না, বিধাতা নিতান্তই কৃপণ হাতে তাদের গড়ে ছিলেন। তারা ছিল ইতিহাসের রাজপথের 'ক্যাম্প-ফলোয়ার'—যেখানে কেবল রাজা মন্ত্রী পাত্র মিত্রকেই চোখে পড়ে বাকি অগণ্য লোক যেখানে নগণ্য; তারা জন নয় জনতা মাত্র।

অমিত-শমিতা নাম এক সঙ্গে করলাম বটে এক জায়গায় তাদের জীবনে গ্রন্থিও পড়েছিল সত্য, কিন্তু বরাবর তারা এমন এক ছিল না। গোড়া থেকে এক থাকলে মাঝখানে এক হবার আনন্দ থেকে তারা বঞ্চিত হত। বিধাতা তাদের নগণ্য করে ছিলেন কিন্তু নিরানন্দ করেন নি।

অমিত-শমিতার বিবাহের কথারই আভাস দিলাম। আধুনিক মতে স্ত্রী এক, পুরুষ এক, বিবাহে একে একে গ্রন্থি বেঁধে মিলন হয় বটে কিন্তু সে দুইয়ের মিলন; সংসারের উচ্চাবচ্চ পথে একটু জোর হুঁচোট খেলেই গ্রন্থি ছিড়ে মিলিত দুই আকার হয়ে যায় এক আর এক। আধুনিক মতে স্ত্রী আধ, পুরুষ আধ; বিবাহের হোমানলে দুই আধ গলিত হয়ে একে পরিণত হয়। সংসারের আবর্তে তাতে টান পড়ে বটে কিন্তু ভিন্ন হবার কথাই ওঠে না- রাসায়নিক প্রক্রিয়ায়, আধে আধে পূর্ণতা ঘটেছে যে!

অমিত-শমিতার বিবাহ হল। কিন্তু অমনিতে হয় নি। প্রজাপতি অবশ্য অনুকূল ছিলেন কিন্তু সেই প্রজাপতির গুটি থেকে ঠিক কতখানি স্বর্ণসূত্র পাওয়া যাবে তা পরিমাপ করার ভার যার উপরে তিনি হয়ে দাঁড়ালেন প্রতিকূল। অমিতের পিতা অর্ধেন্দুবাবু একালের নূতন বোতলে সেকালের পুরানো মদ। ছিপি না খোলা পর্যন্ত হালের চোলাই বলে মনে হয়, কিন্তু ছিপি খুললেই বেরিয়ে আসে মনুসংহিতার গন্ধ। সেকালের মদ বলল, পুত্রের বিবাহের কর্তা পিতা; একালের বোতল বলল, দেখই না, ছেলে যদি নিজের শক্তিতে সোনার খনি আবিষ্কার করেই ফেলে—অত গোল করা কিছু নয়। তখন মদে বোতলে আপোষ হয়ে গিয়ে গ্রামের তারিণীচরণকে চিঠি লিখে দিল—ব্যাপারটার একবার খোঁজ খবর করা দরকার। তারিণী-চরণ অর্ধেন্দু বাবুর গ্রামের লোক—থাকে কলকাতায়, যেখানে এখন রয়েছে অমিত এম-এ পাঠের উপলক্ষ্যে। তারিণীচরণের চিঠি এলো—শমিতরা জাতের এক আধ ধাপে নীচে হলেও তা চোখ বুজে সহ্য করবার মতো—কারণ গুটিতে স্বর্ণসূত্রের দৈর্ঘ্য বললেই হয়। তারিণী চরণ আবগারী বিভাগের লোক—জানে যে সত্যে পৌঁছবার পথ। অত্যুক্তি। অর্ধেন্দুবাবু চোখ বুজেই রইলেন, সব জেনেও কিছু জানলেন না। বরঞ্চ না জানার পথ খোলা রাখবার জন্যে পুত্রকে একখানি চিঠি লিখে 'ফরমাল প্রটেষ্ট' জানালেন অথচ তার ভাষা এমন হল না যাতে বিবাহ ভেঙে যাবার আশঙ্কা আছে। অতএব অর্ধেন্দুবাবুর অনুপ-স্থিতিতেই অগত্যা অমিতের সঙ্গে শমিতার বিবাহ সম্পন্ন হয়ে গেল।

ওরা ছিল এক কলেজের পড়ুয়া। কল্‌কাতায় তখন সবে দ্বৈতী শিক্ষার ধারা স্বর্গলোক থেকে অবতীর্ণ হয়েছে। স্ত্রী-পুরুষের দ্বৈতী ধারার মিলনে কলেজের কলরোল নদনদী সঙ্গমের কলধ্বনিকে ছাপিয়ে গিয়েছে। কিছুদিন এমন চলবার পরে কর্তৃপক্ষের মনে কি হল যার ফলে দ্বৈতী শিক্ষা অদ্বৈতপাঠে পরিণত হল। মেয়েদের সময় ধার্য হল সকালে; ছেলেদের দুপুরে। তবু ঐ এগারটার কাছ ঘেঁসে রইলো একটা দেখা শোনার দিগন্ত।

অমিত-শমিতা মাত্র এক বছর দ্বৈত সাধনার সুযোগ পেয়েছিল—তার পরে এলো এই অসি-পত্রের ব্যবধান। প্রেম দুর্মর, সহজে তার অঙ্কুর মরতে চায় না; বাস্তব থেকে উৎপাটিত মূল হয়ে গেলেও আশার মধ্যে বায়ুজীবীরূপে বেঁচে থাকে। অমিত-শমিতার আশা রইলো কলেজের গণ্ডী পার হতে পারলে আবার শিক্ষা জগতের পরলোক অর্থাৎ পোষ্ট গ্রাজুয়েটে গিয়ে দেখা হবে। সেখানে বিরহের আশঙ্কা নেই। হ'লও তাই। কিন্তু এখানে একটু কৈফিয়ৎ দেওয়া প্রয়োজন মনে করি। কলেজের সীমাতেই তাদের সম্বন্ধে প্রেম শব্দটা প্রয়োগ উচিত হয়নি—কারণ সে অনুভূতি ওখানে তাদের ঘটেনি। অমিতের কথাই বলি। সে প্রথমে দেখতো প্রেমের একান্তে এক গুচ্ছ মেয়ে—সকলকেই একসঙ্গে চোখে পড়তো অর্থাৎ কাউকেই চোখে পড়তো না। এ সেই যুধিষ্ঠিরের অস্ত্র পরীক্ষার ব্যাপার আর কি! যুধিষ্ঠির তো শুধু পাখীটাকে দেখেননি, গাছ এবং আকাশের সঙ্গে এক করে পাখীটাকে দেখেছিলেন বলেই তিনি দ্রোণাচার্যের "ফেল করা" ছাত্র। তারপরে অমিত এক বিচিত্র অভিজ্ঞতা অনুভব করলো। মাঝে মনে হত সব মেয়েই এসেছে—তবু যেন ও-দিকটা শূন্য—সবই আছে তবু কি যেন নেই। কেউ যদি তখন তাকে রহস্যে বলে দিত যে, অমিত, একেই বলে প্রেমের পূর্বাভাষ, তবে সে কথাটা নিশ্চয়ই হেসে উড়িয়ে দিত। যখন এইরকম চলছে, অর্থাৎ ক্লাসের স্বাদ-বিস্বাদ এমন সময়ে হঠাৎ সে করিডরে শমিতাকে দেখতে পেলো। চমকে উঠলো, সে যেন এক আবিষ্কার। আমে-রিকার ডাঙা চোখে পড়বার আগে তার ভাঙা ডালপালা সমুদ্রে দেখে কলম্বাস যেমন চমকে উঠেছিলেন, অমিতের মনে



হঠাৎ সে করিডরে শমিতাকে দেখ্‌তে পেলো।

হল, তাই তো! এই মেয়েটিই তো ক্লাসের লাবণ্য, যার অভাবে সমস্ত এমন বিস্বাদ বোধ হচ্ছে। পরীক্ষা করতেও বিলম্ব হল না। তারপর দিন ক্লাসে শমিতা এলো, অমিতের মনে হল—ক্লাস যে শুধু হৃদ্য হয়েছে তা নয়, এতক্ষণে পূর্ণ হল। এতদিনে সে জনতা ভেদ করে বিশেষ একটি জনকে দেখতে পেলো। এবারে সে অস্ত্র পরীক্ষায় যুধিষ্ঠিরের স্থান থেকে অর্জুনের স্থানে ডবল প্রমোশনে উন্নীত হল।

তারপরে এলো তারা পোষ্ট গ্র্যাজুয়েটের ক্লাসে। সেখানে প্রতিদিন প্রেমের নূতন নূতন অভিজ্ঞতা কচি গাছের নূতন কিশলয়ের মতো খেলতে লাগলো তাদের হৃদয়ে। কিন্তু অমিত-শমিতার প্রেমের অভিজ্ঞতা বর্ণনা করতে আমি বসিনি তো। আর বসলেই কি হত। এমন কোনো অভিজ্ঞতা তাদের জীবনে ঘটেনি যাকে নূতন বলা যায়, বিধাতা যে তাদের প্রতি অকৃপণ নন সে তো গোড়াতেই বলে রেখেছি। জগতের আদি যুগে কোন কোন প্রবল জ্যোতিষ্ক আর একটা গ্রহের কাছ ঘেঁষে চলে যাবার সময়ে তার হৃদয়ের আগুনের জোয়ার জাগিয়ে দিয়ে যেতো, কিন্তু নিজে ধরা দিত না। অনেকেরই প্রথম প্রেমের অভিজ্ঞতা ঐ জাতীয়। জ্যোতিষ্কের টানে হৃদয়ে জোয়ার জাগে—কিন্তু না দেয় ধরা, না পারে ধরতে। কিন্তু ওরা প্রথম বারেই পরস্পর পরস্পরের কাছে ধরা দিল। অমিত-শমিতা বিবাহে প্রতিশ্রুত হল।

শমিতার সংসারে ছিলেন বিধবা মা। হিন্দু সংসারে স্ত্রীর মূল্য শূন্য কিন্তু স্বামীর পাশে অধিষ্ঠিত হবার ফলে তার মূল্য যায় বেড়ে; সেই স্বামীর অবর্তমানে আবার সে শূন্যতায় পর্যবসিত হয়। শমিতার মা-র মূল্য এখন শূন্য। তার হাতে কিছু টাকা ছিল, কিন্তু টাকাকে মূলধন করে কি ভাবে সংসারে নিজের প্রভাব-প্রতিপত্তি বাড়াতে হয়, সে কৌশল তাঁর জ্ঞাত ছিল না। বিশেষ ও টাকাকে তিনি মেয়ের সম্পত্তি বলেই জানতেন—সংসারে তার আর কেউ তো নেই। তিনি বিবাহে খুসিই হলেন।

ওদের বিবাহ হয়ে গেল। বলা বাহুল্য অর্ধেন্দুবাবু এলেন না—কেননা, বিবাহে উপস্থিতিতে বিবাহকে কতখানি স্বীকার করে নেওয়া হয় সে সম্বন্ধে তাঁর সন্দেহ ছিল—অথচ মনে মনে অনিচ্ছা ছিল না, কাজেই এ-দুয়ের সামঞ্জস্য করবার উদ্দেশ্যে বিবাহে হল তার কূটনৈতিক অনুপস্থিতি।

বিবাহের পরে দুটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা ওদের সম্মিলিত জীবনে ঘটলো। অমিত সামান্য একটি চাকুরী পেলো আর শমিতার মা মারা গেলেন। যাই হোক, ইতিহাসের পাতার বাইরে যে অগণ্য লোকের জীবন-স্রোত বইছে, তাদের সঙ্গে মিলিয়ে তাদের জীবনও চলা শুরু করলো কখনো বা দুঃখের কালো পাথর ডিঙিয়ে, কখনো বা উচ্ছল হাসির অজস্রতায়, আবার কখনো বা পঙ্কিল আবর্তের মন্থন সহ্য করে।

ওদের একটি দুঃখ ছিল যে অর্ধেন্দুবাবু এলেন না। কিন্তু সে দুঃখ দীর্ঘকাল রইলো না। অর্ধেন্দুবাবু এলেন না বটে, কিন্তু তাঁর পত্র এলো। সে পত্রের ছত্রে ছত্রে পুরাতন মদের ছিটা। অর্ধেন্দুবাবু পুত্রের অবিমৃষ্যকারিতার জন্য তাকে তিরস্কার করেছেন। প্রাচীন কালের রাম ও পরশুরাম প্রভৃতি প্রাতঃস্মরণীয় ভদ্রলোকগণ পিতৃ আজ্ঞা পালনের জন্য কত কি অপ্রত্যাশিত কাজ করতে কুণ্ঠিত হননি—তার দীর্ঘ ফর্দ সেই পত্রে রয়েছে। অবশেষে আছে পিতার প্রতি পুত্রের কর্তব্যের স্মারক। অর্ধেন্দু-বাবু উদারভাবে লিখেছেন যে, যদিচ বধূ-মাতার জলগ্রহণ করা তাঁর পক্ষে সম্ভব নয়, তত্রাচ অমিত যদি তাঁকে মাসে মাসে কিছু টাকা পাঠায় তবে তা তিনি গ্রহণ করতে সম্মত আছেন।

চিঠি পড়ে শমিতা বলল—মার তো কিছু টাকা আছে, তাই থেকে মাসে মাসে কিছু পাঠালেই হয়।

অমিত বলল—তা কি হয়? আমি দেখি কি করতে পারি।

সে কাজের উপরে খুচরো আর একটা কাজ জোগাড় করে নিলো এবং উদ্বৃত্ত অর্থ পিতাকে পাঠাতে লাগলো। এতে তার খাটুনি বেড়ে গেল। স্বাস্থ্য তার কোন-দিনই ভালো ছিল না, এখন তাতে ঘাটতি দেখা দিতে শুরু হল।

শমিতা বলে,—তুমি কাজ ছেড়ে দাও, ওই টাকা থেকে পাঠালেই চলবে।

অমিত বলে—ও টাকাও তো আমার, প্রয়োজনকালে ও টাকা কাজে লাগবে। এখন চলছে—চলুক।

অর্ধেন্দুবাবু টাকা পেয়ে খুসি হলেন, কিন্তু সন্তুষ্ট হলেন না। যে এত দিচ্ছে সে আরও কত দিতে পারতো এই চিন্তা তাঁকে অসন্তুষ্ট করে রাখলো। একটা না একটা উপলক্ষ্য করে তিনি টাকার দাবী চড়িয়ে যেতে লাগলেন, অমিতও সাধ্যাতীত পরিশ্রম করে সে চাহিদা মিটিয়ে যেতে লাগলো। অর্ধেন্দুবাবু মনে মনে হাসেন, বৈবাহিক তাঁকে ঠকিয়েছিল বটে, এখন তিনি তার সঞ্চিত স্বর্ণ সূত্রে টান দিচ্ছেন। আর হাসতেন বিধাতা পুরুষ, অর্ধেন্দুবাবু স্বর্ণসূত্র উপলক্ষ করে নিজের পুত্রের স্বাস্থ্যে টান দিচ্ছেন, দেখতে পেয়ে।

২

অবশেষে ডাক্তারে একদিন স্পষ্ট করে বলতে বাধ্য হল যে রোগটা টি বি বলেই মনে হচ্ছে, তবে কি না ভগবান আছেন। বাঘে যখন ধান খায় আর ডাক্তারে যখন ভগবানের নাম উচ্চারণ করে তখন বুঝতে হবে সর্বনাশের আর অধিক বিলম্ব নেই।

সেদিনও প্রতিদিনের মতো অমিত অফিসে বেরুতে উদ্যত হচ্ছিল, শমিতা একেবারে দরজা রোধ করে দাঁড়ালো। বলল, —তুমি কি সর্বনাশের কিছুই বাকি রাখবে না।

অমিত বলল,—কিন্তু চাকুরী না করলে চলবে কি করে-?

শমিতা বলল,—তুমি চলে গেলে আমার চলে কি সুখ। শমিতা চাপা মেয়ে—এর বেশি বলা তার স্বভাবসিদ্ধ নয়। অমিত বুঝলো যে ওই কথা কয়টিতে আর দশজন মেয়ের অনেক কান্না, অনেক মাথা খোটা ঘনীভূত হয়ে শ্বাসরুদ্ধ হয়ে রয়েছে। অগত্যা সে বেরুবার আশা ছাড়লো।

তবু অমিত আর একবার বলবার চেষ্টা করলো—শমি, চলবে কেমন করে?

শমিতা শুধু বলল,—সে আমি দেখবো। মেয়েরা যখন দেখবো বলে, তারা সত্যিই দেখে। পুরুষের মুখে ওটা একটা কথার মাত্রা মাত্র। অমিত শয্যা গ্রহণ করতে বাধ্য হল, শমিতা সংসারের ভার তুলে নিল।

যক্ষ্মা ব্যাধিটা রাজকীয় ব্যাধি। প্রাচীন কালে রাজারা মানুষের দণ্ডাতীত ছিলেন,

তাই ওদের দণ্ডিত করবার জন্যে অদৃষ্ট এই ব্যাধিটির সৃষ্টি করেছিল, সেই জন্যেই তো ওর পুরো নাম রাজযক্ষ্মা। কিন্তু যেহেতু আধুনিক গণতন্ত্রের যুগে প্রত্যেক মানুষেই একটি ছোট-খাটো রাজা, ওই ব্যাধিটা তাই ক্ষুদে রাজাদের ঘাড়ে এসে চেপেছে। কিন্তু স্বভাব বদলাতে পেরেছে কি? ওকে রাজকীয় আড়ম্বরে চিকিৎসা করতে হয়। সে সামর্থ্য আছে ক'জনের? আবার লোকেও ব্যাধির পূর্ব কৌলীন্য ভুলতে পারেনি, কাজেই যক্ষ্মাবাসগুলোতে খরচের উদারতা ঘটিয়ে সাধারণের আয়ত্তের বাইরে করে রেখেছে।

শমিতা সংসারের ভার নিয়ে দেখলে আয় বাড়াবার একমাত্র উপায় খরচ কমানো। শ্বশুরের মাসোহারার দিকেই তার প্রথম দৃষ্টি পড়লো। শমিতা অনেক ভেবে চিন্তে রাত জেগে অর্ধেন্দুবাবুকে সব অবস্থা জানিয়ে একখানা চিঠি লিখে ফেলল। শ্বশুরকে এই তার প্রথম চিঠি। অর্ধেন্দুবাবুর উত্তর এলো—কিন্তু তা অমিতের নামে, তাতে পুত্রবধূর উল্লেখ পর্যন্ত নেই। পিতৃ আজ্ঞা লঙ্ঘন করে বিবাহ করবার দণ্ডস্বরূপ এই ব্যাধি যে তাকে আক্রমণ করেছে—একথা তিনি স্পষ্ট ভাষায় জানিয়ে দিয়েছেন। অদৃষ্টের উপরে তাঁর হাত নেই। পুনশ্চ জানিয়ে লিখেছেন এখন থেকে অমিত যেন তাঁর মাসোহারা চুনারের ঠিকানায় পাঠায়। ওখানকার স্বাস্থ্য ভালো বলে তিনি সেখানে কিছুকাল থাকবেন। শমিতা চিঠিখানা প'ড়ে ছিঁড়ে ফেলল, অমিতকে কিছু জানালো না। অমিত মাঝে মাঝে শুধাতো—বাবার টাকা নিয়মিত পাঠানো হচ্ছে কিনা? শমিতা বলতো হচ্ছে বইকি? কি ক'রে যে হচ্ছে অমিত আর তা জানবার পীড়াপীড়ি করতো না। এই মিথ্যা কথাটা বলে শমিতা এমন আনন্দ পেলো যা সত্যকথা বলেও তেমনটি কখনো সে পায়নি।

ওদের সংসার কেমন ক'রে চলে এ প্রশ্ন অবান্তর, কারণ সংসার চলে না, চালাতে হয়। শমিতা কিছু কিছু সঞ্চয় ক'রে ছিল, তার সঙ্গে মায়ের টাকা যুক্ত হ'য়ে একরকম ক'রে তাদের দিন চলে যায়—যাতে ভিতরে ভিতরে টান পড়ে অথচ বাইরে টোল খায় না।

অমিতের রোগ সারবার নয়, কিন্তু হয়তো কমতো যদি মনে তার দুশ্চিন্তা না থাকতো। সে যে অসহায় একটি মেয়ের ঘাড়ে নিজের ভার তুলে দিতে বাধ্য হ'য়েছে এই গ্লানি তাকে ভিতরে ভিতরে চাবকাচ্ছিল।

তাদের বিবাহিত জীবনের প্রথম দিকে শমিতা কতবার চাকুরি করতে চেয়েছে—অমিত হেসে জবাব দিয়েছে, তুমিও যদি আয়ের পথ দেখো, তবে খরচ করবে কে? অমিত কিছুতেই তাকে চাকুরি করতে দিতে সম্মত হয়নি—ওতে তার পৌরুষ ব্যথা পেয়েছে। এখন তাই শমিতা চাকুরি করবার প্রস্তাব আর পাড়েনি, জানতো ওতে তাকে মর্মান্তিক কষ্ট দেওয়া হবে। কিন্তু সেদিন হঠাৎ অমিতই তাকে চাকুরি নেবার জন্যে অনুরোধ করলো। বলল—শমি, একটা ভাল চাকুরির বিজ্ঞাপন দেখ্‌ছিলাম, একবার চেষ্টা ক'রে দেখ না। এই কথা শুনে শমিতার চোখ ছল ছল ক'রে উঠ্‌লো, তার কাছে কি লুকোনো থাকবে না—কত দুঃখ, কত সংস্কার দমন ক'রে তবে ওই প্রস্তাব অমিত করতে পেরেছে? অমিত তখন কি দেখ্‌ছিল? দেখ্‌ছিল সকালবেলার স্থলপদ্মের পাপড়ির মতো শাড়িখানা প'রে শমিতা সবে ফিরেছে, গ্রীষ্মের দুপুর তখন আড়াইটে, রৌদ্রের তাপে গাল দুটিতে তপ্ত আভা, কপালে অর্শাসিত চূর্ণ কুন্তল নানা বিচিত্র রেখায় লিপ্ত, কণ্ঠে স্বেদ বিন্দুর মুক্তার পাঁতি, চোখের কোণে ঈষৎ রক্তিমা। অমিত দেখ্‌ল, শমিতা সুন্দর। বাস্তবিক রৌদ্রে ঘুরে না এলে মেয়েদের সত্যকার সৌন্দর্য। খোলে না!

অমিত ভাবলো—এখন আর বৃথা পৌরুষের গর্ব ক'রে কি হবে? শমিতা চাকুরি নিলে আয়ের পথ প্রশস্ত হ'য়ে তার দুশ্চিন্তা কমবে।

শমিতা বল্‌লে, সে কি হয়! এখন চাকুরি করতে গেলে তোমাকে দেখবে কে?

আসলে দেখবার সময়ের অভাবটা সত্য নয়। যে-কষ্ট সুস্থ সময়ে অমিতকে সে দিতে পারেনি, অসুস্থতার মধ্যে তা দেবার কল্পনাও শমিতার কাছে অসহ্য। কাজেই শমিতার আর চাকুরি করা হ'ল না। ওদের সংসার কি করে চলে? সংসার চলে না—সংসারকে চালাতে হয়।

৩

এই রকমে সুখে দুঃখে যখন ওদের জীবনযাত্রা চলছিল তখন অমিতের দেহের যক্ষ্মার বীজাণুগুলো নিশ্চিন্ত ব'সে ছিল না। ওই অন্ধ রোগ বীজাণুর শ্রেষ্ঠ আবাস মানুষের দেহ বটে, কিন্তু মানুষের সঙ্গে তাদের হৃদ্যতার কোন সম্বন্ধ নেই; তারা দিনরাত্রি মানুষের স্নেহদয়ামায়ার প্রতি সম্পূর্ণ অন্ধনিরপেক্ষতায় নিজেদের নিজেদের ধ্বংসমূলক কাজ করে যায়; নিরন্তর তারা মানুষের ফুসফুসে সুড়ঙ্গ খুঁড়ে চলেছে—জীবন থেকে মৃত্যুতে পৌঁছবার নিশ্চিততম সরলতম একান্ততম পথ। ওরা স্নেহহীন দয়াহীন, মায়ামমত্বহীন, ওরা অন্ধ, অজ্ঞান, সম্পূর্ণ এক স্বতন্ত্র জগতের অধিবাসী: মানুষের বুকের মধ্যে আর এক বিচিত্র জগৎ; মানুষের জগৎ ও বীজাণুর জগৎ এমন সমান্তরাল যে কোনকালে তাদের মিলিত হ'বার সম্ভাবনা নেই। তারপরে হঠাৎ একদিন দুই সমান্তরাল রেখা এক জায়গায় গিয়ে থেমে যায়—একই সঙ্গে দুইয়ের চিরাবসান।

এমন সময়ে শমিতার এক আত্মীয় শহরের নিকটের এক যক্ষ্মাবাসের ডাক্তার হ'য়ে এলেন। শমিতা তাকে গিয়ে ধরলো। তিনি অমিতের প্রতি বিশেষ আগ্রহ দেখিয়ে তাকে কিছু কম খরচে যক্ষ্মাবাসে ভর্তি ক'রে নিলেন।

অমিত টাকার কথা তুল্‌ল না, জানে যে ওতে শমিতাকে কেবল কষ্ট দেওয়াই হবে। তাছাড়া ভাবলো—আর কতদিনই বা। এক'টা দিন শমিতার ইচ্ছেয় বাধা দেবার উৎসাহ তার হল না। ও ভাব্‌লো—এক'টা দিনের সেবার স্মৃতি শমির মনে অক্ষয় হ'য়ে থাক্। আমার যখন আর কিছু করবার সাধ্য নেই—ওর মনে দুঃখের খোঁচা দেবার অহংকারই বা করি কেন?

অমিত যক্ষ্মাবাসে ভর্তি হ'লে শমিতা রোজ বিকেলে দেখা করতে যায়। অমিত টাকার প্রশ্ন তোলে না দেখে শমিতার ভাল লাগে না। বুঝতে পারে যে তার মনে প্রশ্নটা অব্যক্ত কাঁটার মতো বিঁধে আছে। তাই সে একদিন নিজেই কথাটা তুলে বস্‌ল—জানো আমি ইস্কুলে একটা চাকুরি নিয়েছি। কিন্তু পাছে এই কথায় ও মনে করে যে তার জন্যেই শমিতার এই কাজ গ্রহণ করতে হ'য়েছে, তাই ব্যাখ্যা স্বরূপে বল্‌ল এখন তো সারাদিন ব'সে থাকা, একা একা ভাল লাগে না, তাই কাজ নিয়ে কোনরকমে ভুলে থাকি।

অমিত কি একথা বিশ্বাস করলো? কি জানি। হয়তো সে বিশ্বাস করতেই চায়। কিন্তু টাকা যে কোত্থেকে আস্‌ছে তা অমিতের চোখ এড়াতে পারলো না। সে দেখ্‌ছে শমিতার হাতের চুড়ির গোছা ক্রমে ক্ষীণ হ'য়ে আস্‌ছে। সে দেখ্‌তো, সবই বুঝতো তবু চুপ ক'রে থাক্‌তো, কারণ চুপ ক'রে থাকা ছাড়া আর যা করবে তাতেই শমিতার কষ্ট বাড়বে বই কমবে না। কেবল সে রাতের বেলায় জেগে থেকে অনেকক্ষণ ধ'রে ভগবানের কাছে প্রার্থনা করতো, সেরে উঠবার নয়, কারণ তা বিধাতারও অসাধ্য, সে প্রার্থনা করতো মরবার; শমিতার চুড়ির গোছা নিঃশেষ হ'বার সঙ্গে সঙ্গেই যেন তার জীবনান্ত ঘটে। যে বিধাতা জীবন দান করতে অশক্ত, তিনি কি এই ইচ্ছা মৃত্যু দানেও সমর্থ নন?

নিজের হাতের চুড়ির গোছা যে ক্রমে ক্ষীণ হ'য়ে আসছে সেদিকে শমিতার খেয়াল ছিল না। হঠাৎ একদিন আচম্বিতে তার খেয়াল হ'ল। শমিতা এলে অমিত তার অগোচরে একবার ক'রে চুড়ির সংখ্যা গুণে দেখ্‌তো। শমিতা এতদিন তা লক্ষ্য করেনি।' আজ হঠাৎ দু'জনের দৃষ্টি পরস্পরের কাছে ধরা পড়ে গেল। কিন্তু



"কতকগুলি চুড়ি খুলে রেখেছি। কেমন, ভালো করিনি?"

শমিতা যেন কিছুই বোঝেনি এমন ভাবে বল্‌ল,—একলা আসতে হয়, ফিরতেও একলা, তাতে আবার সন্ধ্যে হয়ে যায়, দিন-কাল খারাপ, কতকগুলো চুড়ি খুলে রেখেছি। কেমন ভালো করিনি!

অমিত শুধু বল্‌ল, ভালোই করেছো। সে রাত্রে অমিত একা বিনিদ্র জেগে প্রার্থনা করলো—হে সুখ-দুঃখের দাতা, যে একই সঙ্গে মানুষের বুকের আত্মবিস্মৃত প্রেম আর যক্ষ্মার বীজাণু বিতরণ ক'রে রেখেছ, তোমার কাছে কি ক'রে প্রার্থনা করতে হয় জানিনে। সে প্রার্থনার কতটুকু তুমি গ্রহণ করো, কতখানি বর্জন করো তাও জানিনে। তবু এ বিশ্বাস আছে সুখের প্রার্থনার চেয়ে দুঃখের প্রার্থনা তুমি হয়তো দ্রুত হস্তে মঞ্জুর ক'রে থাকো। আমার দেহাবসান শমির ওই চুড়ি ক'গাছার সঙ্গে ঘটিয়ে দাও প্রভু। তারপরে তার মনে হ'ল এ প্রার্থনা কি তার সুখের নয়? এ অবস্থায় একমাত্র সুখ যা সম্ভব তাইতো সে চেয়েছে! সর্ব-দুঃখের দাতা কি তা মঞ্জুর করবেন? দুঃখের ছদ্মবেশে এই সুখটুকু কি সে ফাঁকি দিয়ে আদায় ক'রে নিতে পারবে? আর যদি শমির চুড়ি নিঃশেষ হ'বার পরেও তার জীবনান্ত না ঘটে তখন কি হবে? সে শঙ্কিত-সম্ভাবনাকে আর সে কিছুতেই চিন্তা করতে পারলো না। ঘুমিয়ে পড়লো।

শমিতার সে রাত্রে বাড়ি ফিরে এসে ঘুম হ'ল না। ঘুম না হওয়া তার নূতন নয়। কিন্তু আজকার নিদ্রাহীনতা একপ্রকার নূতন আনন্দের। সে ঘর থেকে উল্লাসে পায়চারি ক'রে ফিরতে লাগ্‌লো—আমি মিথ্যা কথা বলেছি, আমি মিথ্যাবাদী। মিথ্যা কথা সে অমিতের জন্যে আগেও বলেছে—কিন্তু আগে এমন মিথ্যা কথায় প্রত্যুৎপন্নমতিত্বের পরিচয় দেয়নি। আজকার বিশেষ আনন্দ ওতেই। শমিতার মনে হচ্ছিল কাছাকাছি যদি কোন ঘনিষ্ঠ বন্ধু থাকতো তবে তাকে এখনি এত রাত্রে ঠেলে তুলে সব ঘটনা বর্ণনা করলে যেন আনন্দ দ্বিগুণিত হ'য়ে ফিরে পাবে। এই মিথ্যা ভাষণের আনন্দ প্রণয়ের বিদ্যুৎ শিখার মতো তার আসন্ন বৈধব্যের শুভ্রশূন্যতার প্রান্ত বেষ্টন ক'রে চিরায়ুষ্মতীর রঙিন পাড় অঙ্কিত ক'রে দিল।

এর পরে ঘটনা অতিশয় সংক্ষিপ্ত। সুখদুঃখের বিধাতা, সুখের চেয়ে দুঃখ দিতে যিনি অধিকতর তৎপর তিনি অন্তত একবারের জন্যেও অমিতের কথা রাখলেন। শমিতার শেষ চুড়িখানা নিঃশেষ হ'বার সঙ্গে সঙ্গেই অমিতের জীবনান্ত ঘট্‌লো।

সেদিন শমিতা যখন এলো—তার হাতে একখানাও চুড়ি নেই। সেদিন সকালেই শেষ চুড়ি ক'খানা বেচে যক্ষ্মাবাসের আগামী মাসের পাওনা সে মিটিয়ে দিয়েছে।

শমিতা নিজেই প্রসঙ্গ তুল্‌ল। কালকে ফিরবার পথে হঠাৎ মাঠের মাঝখানে 'বাসের' কল বিগড়ে গেল। তখন সন্ধ্যা হ'য়ে গিয়েছে, 'বাসে' আমরা দু'জন মাত্র যাত্রী—চারদিক নির্জন, অনেক কিছুই ঘট্‌তে পারতো। যাক্ কোন বিপদ অবশ্য ঘটেনি। আমি ফিরে গিয়েই স্থির করলাম—আর নয়। তখনি চুড়ি ক'গাছা খুলে তুলে রেখে দিলাম। কেমন ভাল করিনি!

অমিত ঘাড় নেড়ে সমর্থন জানাল। তারপরে একদিন সব অবসান হ'ল। তার হাতের শুভ্রশঙ্খের ক্ষীণ শশীকলা শুক্লা চতুর্থীর নবযৌবনের অকাল দিগন্তে কখন্ খসে পড়ে গেল। তার সিঁথির সিঁদুরের শেষ রেখাটির চিহ্নমাত্রও আর কোন দিক্ প্রান্তে রাখলো না। এতদিনে শমিতার নব নব মিথ্যা ভাষণের শেষে আনন্দের অবকাশও অন্তর্হিত হ'ল।

অমিতের মৃত্যুর পরে যক্ষ্মাবাসের কর্তৃপক্ষ তার একখানি চিঠি শমিতাকে পাঠিয়ে দিল।

অমিত লিখ্‌ছে—

"শমি,

তোমার জন্যে কিছুই রেখে যেতে পারলাম না। শুধু রইলো আমার ভালবাসা, আর তোমার অলঙ্কারগুলো। তুমি এম-এ পাশ করেছ, কোনরকমে তোমার চলে' যাবেই জেনে আমি নিশ্চিন্ত হ'য়ে চললাম।

অমি।"

মিথ্যা কথার প্রতিদান অমিত মিথ্যা কথায় দিয়ে গিয়েছে। শমিতা চিঠি পড়ে ভাবলো—তবে তো উনি আমার মিথ্যা ধরতে পারেননি। বিধাতার আশীর্বাদে মিথ্যাই আমার সত্যের চেয়ে বড়ো হ'য়ে উঠ্‌ল। তবু কি তার সর্বত্যাগ অমিত জান্‌তে পারলে শমিতা আরও বেশি সুখী হ'ত না! হয়তো! নিশ্চয় ক'রে কে পরের মনের কথা বল্‌তে পারে!

শ্রীমদ্ভাগবত কোথায় রচিত হইয়াছিল

শ্রীহরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়

সমগ্র ভারতে সুপ্রচলিত রহস্য গ্রন্থগুলির মধ্যে শ্রীমদ্ভাগবত অন্যতম। একাধারে দর্শন ও কাব্য রসাত্মক কর্ম জ্ঞান ও ভক্তিযোগের সামঞ্জস্যমূলক, বহু মনোজ্ঞ আখ্যান ও উপাখ্যানে পরিপূর্ণ এইরূপ সর্বাংগসুন্দর গ্রন্থ সংস্কৃত ভাষাতেও কম আছে। শাক্ত বৈষ্ণব নির্বিশেষে ভারতের সকল সম্প্রদায়েরই শিক্ষিত ও রসজ্ঞ ব্যক্তিগণ, সংস্কৃতে অনভিজ্ঞ সাধুসন্ত, এমন কি নিরক্ষর পুণ্যাভিলাষী জনসাধারণও এই গ্রন্থের সমাদর করিয়া থাকেন। শ্রীমদ্ভাগবতের বহু প্রাচীন টীকা প্রচলিত আছে। প্রাচীন ও অর্বাচীন প্রায় শতাধিক টীকার নামও পাওয়া গিয়াছে। তত্ত্ব সন্দর্ভের ভূমিকায় শ্রীপাদ জীব গোস্বামী হনুমৎ ভাষ্য, বাসনা, ভাষ্য, সম্বন্ধোক্তি, বিদ্বৎ কামধেনু, তত্ত্বদীপিকা, ভাবার্থ দীপিকা, পরমহংসপ্রিয়া প্রভৃতি প্রাচীন টীকার নাম উল্লেখ করিয়াছেন। মধ্ব, রামানুজ, নিম্বার্ক, বল্লভাচার্য প্রভৃতি সকল সম্প্রদায়ের বৈষ্ণবগণই শ্রীমদ্ভাগবত গ্রন্থকে প্রামাণ্যরূপে পূজা করিয়া আসিতেছেন। এ হেন গ্রন্থ সম্বন্ধে বিনা প্রমাণে আপ্তবাক্যের মত কোন কথা বলা দুঃসাহসের পরিচায়ক। সম্প্রতি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে প্রকাশিত শ্রীকৃষ্ণ বিজয়ের ভূমিকায় প্রখ্যাতনামা সম্পাদক রায় শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ মিত্র বাহাদুর এম এ মহাশয় শ্রীমদ্ভাগবত গ্রন্থ সম্বন্ধে যে কয়েকটি কথা বলিয়াছেন—নানা কারণে তাহার আলোচনা কর্তব্য মনে করিতেছি। প্রথম কারণ "শ্রীকৃষ্ণ বিজয়" কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক প্রকাশিত। লোকে জানে সাধারণত বিশেষজ্ঞগণই বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থসমূহ সম্পাদন করিয়া থাকেন। দ্বিতীয় কারণ সম্পাদক রায় বাহাদুরের দার্শনিক, পদাবলী রসিক ও ঐতিহাসিক প্রভৃতি উপনামে খ্যাতি রটিয়াছে। সুতরাং তাঁহার লেখার গুরুত্ব অস্বীকার করিবার উপায় নাই। বিশেষ সুকুমারমতি ছাত্রগণের মধ্যে, বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুগ্রহপ্রার্থিগণের মধ্যে এবং এক শ্রেণীর ভক্ত মহলে রায় বাহাদুরের উক্তি প্রায় প্রামাণ্যরূপেই গৃহীত হইয়া থাকে। তৃতীয় কারণে, বৈষ্ণব সাহিত্যানুরাগী সাধারণ পাঠকসমাজের আমাদের পক্ষ হইতে রায় বাহাদুরের উক্তির যুক্তি বিচারের প্রয়োজনীয়তা রহিয়াছে।

রায় বাহাদুর বলিতেছেন—(শ্রীকৃষ্ণ বিজয়ের ভূমিকা ৩৮—৩৯) "শ্রীমদ্ভাগবতের ভিতরে বহু স্থানে দ্রাবিড় দেশের এই বৈষ্ণব ধর্মের কথা পাওয়া যায়। একাদশ স্কন্ধের পঞ্চম অধ্যায়ে বলা হইয়াছে—কলিযুগে নারায়ণ পরায়ণ অনেক ভক্ত জন্মগ্রহণ করিবেন; অন্যান্য দেশে কিছু কিছু হইবেন, কিন্তু দ্রাবিড় দেশেই ভুরি ভুরি জন্মগ্রহণ করিবেন। সেখানে তাম্রপর্ণী নদী, কৃতমালা, পয়স্বিনী, মহাপুণ্যা কাবেরী এবং পশ্চিমে মহানদী প্রবাহিত। যাঁহারা এই সকল নদীর জল পান করিবেন, তাঁহারা প্রায়ই অমলাশয় হইয়া ভগবান বাসুদেবে ভক্তিসম্পন্ন হইবেন। বলরাম তীর্থ ভ্রমণে বাহির হইয়া দাক্ষিণাত্যের প্রধান প্রধান বৈষ্ণব কেন্দ্রগুলি ভ্রমণ করিয়াছিলেন। দ্রাবিড়ের বিষ্ণুভক্ত আলোয়াড় সম্প্রদায় খুব সম্ভবত ভাগবত রচিত হইবার পূর্বেই আবির্ভূত হইয়াছিলেন। এই বৈষ্ণবগণ জ্ঞান মার্গ পরিত্যাগ করিয়া প্রপত্তিমার্গ অবলম্বন করিতেন এবং একান্তভাবে বিষ্ণুর ভজনা করিতেন। তাঁহারা দিনরাত নামপ্রেমে মত্ত হইয়া থাকিতেন, তাঁহারা বাদ্য ও করতাল সংযোগে কৃষ্ণ বা বিষ্ণুর নাম গান করিতেন, নাম লইতে লইতে তাঁহারা ভাবস্থ হইয়া পড়িতেন। তাঁহাদের দেহে অশ্রু পুলকাদি সাত্ত্বিক ভাবের উদয় হইত; ভাবে বিহ্বল হইয়া তাঁহারা কখনো হাসিতেন, কখনো কাঁদিতেন, কখনো উন্মত্তের ন্যায় নৃত্য করিতেন। অনেক সময়ে ইঁহারা নায়িকা ভাবে ভাবিত হইয়া মধুর ভাবের ভিতর দিয়া বিষ্ণুর উপাসনা করিতেন। এই আলোয়ারদের রচিত বহু বৈষ্ণব কবিতা তামিল ভাষায় পাওয়া যায়। সাহিত্যে গোপালকৃষ্ণের এই সব লীলা দাক্ষিণাত্যের বৈষ্ণব তামিল কবিতাগুলির ভিতরেই প্রথম পাওয়া যায়। আলোয়াড়গণ শ্রীকৃষ্ণের এই বৃন্দাবন লীলা খুব সম্ভব উত্তর ভারত হইতেই পাইয়াছিলেন এবং মহিলা কবি আণ্ডালের 'তিরুপ্পা বাই'র ভিতরে দেখিতে পাই শ্রীকৃষ্ণকে 'উত্তর ভারতের শিশু' আখ্যা প্রদান করা হইয়াছে এবং মথুরা বৃন্দাবনের উল্লেখও স্থানে স্থানে পাওয়া যায়। ভাগবত পুরানের উপরে যে দ্রাবিড় দেশের ভক্তি ধর্মের প্রভাব ছিল সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। তা ছাড়া ভাগবতের বর্ণিত উপাখ্যান এবং নদনদী পাহাড় পর্বত প্রভৃতির বর্ণনা দেখিয়া মনে হয় ভাগবত পুরাণ খুব সম্ভব দক্ষিণ ভারতেই রচিত হইয়াছিল।"

শ্রীকৃষ্ণ বিজয়ের পাঠ নির্ণয়ে নানান ভ্রমপ্রমাদ থাকিলেও (পুরানো পুঁথির পাঠোদ্ধার একটু শক্ত) পুস্তক সম্পাদনে রায় বাহাদুর যে অকথ্য পরিশ্রম করিয়াছেন, তজ্জন্য আমরা তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞ। শ্রীকৃষ্ণবিজয়ের পাণ্ডিত্যপূর্ণ ভূমিকায় একান্ত অপ্রাসংগিকভাবে বিনা প্রমাণে এমন অসংলগ্ন কথা কেন তিনি বলিলেন ভাবিয়া বিস্মিত হইতেছি। শ্রীমদ্ভাগবতে কোথাও দাক্ষিণাত্যের দুইটি নদী বা তিনটি পাহাড় পর্বত বা চারিটা তীর্থের বর্ণনা থাকিলেই যদি গ্রন্থখানি দাক্ষিণাত্যে রচিত বলিয়া সাব্যস্ত করিতে হয়, তাহা হইলে ৪র্থ স্কন্ধের ৬ অধ্যায়ে কৈলাস পর্বত বর্ণনায় মন্দার, পারিজাত, সরল শাল, তমাল, তাল রক্তকাঞ্চন, আসন অর্জুন, কাঁঠাল, ডুমুর, অশ্বত্থ, জাম, খেজুর, আমড়া, আম পিয়াল প্রভৃতি গাছের নাম দেখিয়া কিরূপ অনুমান করিব? দাক্ষিণাত্যে আমড়া গাছের কি নাম জানিতে পারিলে বাধিত হইব। এক স্বর্গগত পণ্ডিত আমাদিগকে একবার বলিয়াছিলেন যে, তেলেগু ভাষায় ডব্ব শব্দ আছে। ডব্ব অর্থে ডাব অর্থাৎ নারিকেল। আমরা তাঁহাকে ডব্ব পণ্ডিত বলিতাম। শ্রীমদ্ভাগবতে তপস্যানিরত বালক ধ্রুব তিন দিন উপবাসের পর কৎবেল খাইয়াছিলেন। বলদেবের তীর্থদর্শন প্রসংগে বক্তব্য এই যে, তিনি প্রয়াগ ও গয়া দেখিয়া গংগাসাগর সংগম গমনেও বিস্মৃত হন নাই। সুতরাং এই সমস্ত বিষয় কোন গ্রন্থ রচনার প্রমাণরূপে গ্রাহ্য হইতে পারে না।

রায় বাহাদুর দার্শনিক এবং ঐতিহাসিক বৈষ্ণব হইয়াও অসম্বদ্ধ কথা বলিবার লোভ সম্বরণ করিতে পারেন নাই। বলিয়াছেন—"সাহিত্যে গোপালকৃষ্ণের এই সব লীলা দাক্ষিণাত্যের বৈষ্ণব তামিল কবিতাগুলির ভিতরেই প্রথম পাওয়া যায়।" তাহার পরই বলিতেছেন—"আলওয়ারগণ শ্রীকৃষ্ণের এই বৃন্দাবন লীলা খুব সম্ভবত উত্তর ভারত হইতেই পাইয়াছিলেন।" এই দুইটি উক্তির সামঞ্জস্য কিরূপে করিব? আলওয়ারগণ উত্তর ভারত হইতে বৃন্দাবন-লীলা কিরূপে পাইয়াছিলেন? বৃন্দাবন-লীলা কোনরূপে পিণ্ড পদার্থ, মুদ্রা বা প্রস্তরখণ্ড নহে। বৃন্দাবন-লীলা উত্তর ভারত হইতে দক্ষিণ ভারতে গান, গল্প, কিম্বদন্তী অথবা পুরাণ শাস্ত্র ইত্যাদির মাধ্যমে যেরূপেই প্রচারিত হউক, নিশ্চয়ই সাহিত্যের মধ্য দিয়াই হইয়াছিল? বৃন্দাবন-লীলা উত্তর ভারতে কোন্ আধারে রক্ষিত ছিল, উত্তর হইতে কোন মাধ্যমে দক্ষিণে রপ্তানি হইয়াছিল?

রায় বাহাদুর এসব বিষয়ে কোন প্রমাণের উল্লেখ করেন নাই।

বৈষ্ণব-তামিল সাহিত্যের বয়স কত? ভাস খ্রীষ্ট পূর্বাব্দের লোক। তাঁহার বালচরিতের উপাদান কি তামিল সাহিত্য হইতে গৃহীত? অন্ধ্র ভৃত্যবংশীয় নরপতি হাল তাঁহার সপ্তশতী গ্রন্থে রাধাকৃষ্ণের প্রেম লীলাত্মক যে চমৎকার শ্লোকটি সংগ্রহ করিয়াছিলেন, তাহার আকর কি তামিল সাহিত্য?

দাক্ষিণাত্যের বৈষ্ণব সাহিত্যে আমরা সুস্পষ্ট দুইটি ধারা লক্ষ্য করিতেছি। ইহার এক দিকে ব্রহ্মসংহিতা, অন্যদিকে কৃষ্ণ-কর্ণামৃত। গোপাল তাপনী কোথায় প্রণীত হইয়াছিল জানি না। গোপাল তাপনীর আধারের উপরই ব্রহ্মসংহিতা এবং শ্রীমদ্ভাগবতের প্রতিষ্ঠা, কেহ কেহ এইরূপই বলিয়া থাকেন। যাহা হউক, আমরা দেখিতেছি যে, শ্রীগোপাল তাপনী ও ব্রহ্ম-সংহিতায় এবং বিশেষরূপে শ্রীমদ্ভাগবতে গোপী-কথার প্রচুর প্রসঙ্গ ও প্রাধান্য থাকিলেও এই তিনখানি গ্রন্থে প্রকাশ্যে শ্রীরাধা নামের কোন উল্লেখ নাই। তাপনী গোপীজনবল্লভকেই ব্রহ্মরূপে উল্লেখ করিয়াছেন; কিন্তু তিনি রুক্মিণীকান্ত। অবশ্য গোপীপ্রধানা গান্ধর্বীর নাম উত্তর তাপনীতে পাওয়া যায়। ব্রহ্মসংহিতায় গোপীজনবল্লভের উপাসনা করিয়াই ব্রহ্মা সিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন। কিন্তু সমস্ত গ্রন্থের মধ্যে অন্যত্র (শ্রীরাধা বা) গোপীগণের কোন প্রসঙ্গ নাই। গোপীগণ 'বিলাসিনী' অথবা শ্রীলক্ষ্মী শব্দের মধ্যেই আত্মগোপন করিয়া আছেন। ব্রহ্মসংহিতা বলিতেছেন—'নির্মিত সা রমা দেবী।' এই গ্রন্থে শিব-শক্তির সঙ্গে বিষ্ণু ও রমা দেবীর—শৈব ও শাক্ত ধর্মের সঙ্গে বৈষ্ণব ধর্মের এমন একটি সামঞ্জস্য ও সমন্বয় করা হইয়াছে যে, দেখিলে বিস্মিত হইতে হয়। দাক্ষিণাত্যে শৈব ও বৈষ্ণবের বিবাদের কথা চিরপ্রসিদ্ধ। শিবকাঞ্চী ও বিষ্ণুকাঞ্চীই তাহার অন্যতম উদাহরণ। সুতরাং ব্রহ্মসংহিতা যে দাক্ষিণাত্যেই রচিত হইয়াছিল, এ বিষয়ে কোন সংশয় নাই। কিন্তু শ্রীমদ্ভাবগত সম্বন্ধে সে কথা জোর করিয়া বলা চলে না। দাক্ষিণাত্যের প্রভাব আছে, রায় বাহাদুরের এই কথাতেও আমাদের আপত্তি আছে।

শ্রীকৃষ্ণ-কর্ণামৃতও দাক্ষিণাত্যের গ্রন্থ। এই গ্রন্থে গোপী-কথার যে বর্ণনা পাওয়া যায়, তাহার তুলনা নাই। কর্ণামৃত গ্রন্থ যেন রসভাব মাধুর্যের অফুরন্ত অমৃত প্রস্রবন। এই গ্রন্থে শ্রীরাধার নাম আছে। কর্ণামৃতের দ্বিতীয় ও তৃতীয় শতকে বহু স্থানেই শ্রীরাধার নাম পাইতেছি; প্রথম শতকে ও ৭৬ সংখ্যক শ্লোকে শ্রীরাধা উল্লিখিত হইয়াছেন—

'তেজসেঽস্তু নমো ধেনু
পালিনে লোক পালিনে।
রাধা পয়োধরোৎসঙ্গ
শায়িনে শেষ শায়িনে॥'

কৃষ্ণ-কর্ণামৃতে দ্বিতীয় শতকে ও তৃতীয় শতকে শ্রীকৃষ্ণকে বসুদেব নন্দন, দেবকী নন্দন, নন্দ নন্দন ও যশোদা নন্দনরূপে উল্লেখ করা হইয়াছে। কর্ণামৃতের বহু পূর্বেই শ্রীমদ্ভাগবত রচিত হইয়াছিলেন, এ বিষয়ে কোন সংশয় নাই। তবে বিল্ব-মঙ্গল ঠাকুরের বৈশিষ্ট্য এই যে, তিনি শ্রীরাধার নাম প্রকাশ্যে উল্লেখ করিয়াছিলেন। আমরা দেখিতেছি, হাল সপ্তশতী ও পঞ্চতন্ত্র হইতে আরম্ভ করিয়া শ্রীগীত-গোবিন্দ পর্যন্ত রাধাকৃষ্ণ লীলাকথা অব্যাহতভাবে প্রবাহিত হইয়া আসিয়াছে

এবং খ্রীষ্টাব্দের আরম্ভকাল হইতে খ্রীষ্টীয় দ্বাদশ শতকের মধ্যে এই লীলাকথা উত্তর-দক্ষিণ, পূর্ব-পশ্চিম, সারা ভারতময় পরিব্যাপ্ত হইয়াছে। এই বার শত বৎসরের মধ্যে শ্রীমদ্ভাগবত কোন সময়ে কোথাও যদি রচিত হইয়া থাকেন, তাহা হইলে কেন তিনি সুস্পষ্টরূপে শ্রীরাধার নাম উল্লেখ করিলেন না, রায় বাহাদুরকে তাহারও কারণ নির্ণয় করিতে হইবে। তাঁহাকে গোপাল তাপনী ও ব্রহ্ম-সংহিতারও রচনাকাল নির্দেশ করিতে হইবে। প্রসঙ্গত বলিয়া রাখি, 'নারদ পঞ্চরাত্র' ব্রহ্মসংহিতারই অপরাংশ মাত্র। নারদ পঞ্চরাত্রে দুর্গাকে মহাবিষ্ণুস্বরূপিণী বলা হইয়াছে। অবশ্য ইহার সঙ্গে বিষ্ণুপুরাণ বা মার্কণ্ডেয় পুরাণ, গীতা বা চণ্ডীর কোন বিরোধ নাই। ব্রহ্মসংহিতার বিশেষত্ব, ইহার মধ্যে বেশ একটি ধারাবাহিক সামঞ্জস্য পাওয়া যাইতেছে। ইতস্তত খুঁজিয়া লইতে হয় না।

আমাদের বিশ্বাস, ভগবান বেদব্যাস বদরিকাশ্রমে দেবর্ষি নারদের নিকট শ্রীমদ্ভাগবত প্রাপ্ত হইয়া নিজ পুত্র শ্রীমন্ শুকদেবকে উপদেশ করিয়াছিলেন। রাজা পরীক্ষিত যে শ্রীশুকমুখনির্গলিত এই মদ্ভাগবত শ্রবণ করিয়াছিলেন, সে বিষয়ে আমাদের কোন সন্দেহ নাই। দেশবিদেশের মুনি ঋষি, পণ্ডিত মুর্খ, রাজা প্রজা অনেকেই সেই সভায় উপস্থিত ছিলেন; সুতরাং তাঁহারাও সেই সভাতেই শ্রীমদ্ভাগবত শুনিয়াছিলেন এবং তাহার পর হইতেই ইহার বহুল প্রচার হইয়াছে, এ বিষয়েও আমরা কোনরূপে সন্দেহ পোষণ করি না। আমাদের বিশ্বাস, ব্রহ্মসংহিতা শ্রীমদ্ভাগবতের পরে সঙ্কলিত বা সংগৃহীত হইয়াছে।

রায় বাহাদুর শ্রীমদ্ভাবগত দাক্ষিণাত্যে প্রণীত হইয়াছিল, ইহাই সপ্রমাণ করিতে একটি 'অধিকন্তু' জুড়িয়া লিখিয়াছেন "বৈষ্ণবগণ ভগবানের নাম লইয়া উন্মত্তের মত হাসেন, কাঁদেন, নাচেন ও গান করেন—শ্রীমদ্ভাগবত কথিত এই লক্ষণের সঙ্গে আলোয়ারগণের আচরণ হুবহু মিলিয়া যায়। অতএব— × ×

আমরা শ্রীকৃষ্ণবিজয়ের ভূমিকায় লিখিত এই সমস্ত অসঙ্গত উক্তি প্রত্যাহারের জন্য বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি। আমার অনুরোধ, পূজনীয় বৈষ্ণবাচার্য রসিকমোহন বিদ্যাভূষণ প্রমুখ পণ্ডিতগণ এবং শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুত মৃণাল কান্তি ঘোষ ভক্তিভূষণ প্রভৃতি নেতৃস্থানীয় ভক্ত বৈষ্ণবগণ এই বিষয়ে তাঁহাদের বক্তব্য বিবৃত করিবেন। আশা করি, রায় বাহাদুর শ্রীমদ্ভাগবত যে দাক্ষিণাত্যে রচিত, তাহার এই মত সমর্থনে যুক্তিগ্রাহ্য প্রমাণাদি প্রদর্শনে কার্পণ্য করিবেন না।

অনুবাদসাহিত্য

ফারকোট

হলমার সোডারবার্গ

শীতটা পড়েছিল সেবার একটু বেশীই। শীতে কুকড়ে লোকে মারা যাবার উপক্রম। অবশ্য যাদের ফারকোট আছে তাদের কথা আলাদা।

জজ জন রিচার্ডের একটা ফারকোট আছে। তার উচ্চপদমর্যাদারই তা উপযুক্ত! কিন্তু তার পুরোনো বন্ধু হেঙ্কের কোন লোমশ কোট নেই। তার বদলে আছে একটি সুন্দরী স্ত্রী ও গুটি কয়েক ছেলেমেয়ে। ডাক্তার হেঙ্ক লম্বা, রোগাটে মানুষটি। বিয়ে করে কেউ যায় মুটিয়ে, কেউ বা যায় শুকিয়ে। ডাক্তার হেঙ্ক রোগা হয়ে যাচ্ছিলেন।

খৃীষ্টমাসের সন্ধ্যা। তিনটে না বাজতেই ঘনিয়ে এসেছে সন্ধ্যা। ডাক্তার হেঙ্ক চলেছেন তার পুরানো বন্ধু জজ রিচার্ডের বাড়ি। উদ্দেশ্য খৃীষ্টমাসের জন্য কিছু টাকা ধার করা। এ বৎসরটা নেহাৎই তার পক্ষে গেল খুব দুর্বৎসর। রোগীপত্তরের দেখা নেই। তাকে কলা দেখিয়ে পটপট করে সব যেন সেরে উঠেছে—তাই কারও দেখা নেই তার ডাক্তারখানায়। ওদিকে তার স্বাস্থ্যও দিন দিন পড়ছে ভেঙে। হয়ত শীঘ্রই হবে তার ইহলীলা সাঙ্গ। স্ত্রীও যেন তার একথা বুঝতে পেরেছে। তার হাবভাব দেখেই তিনি তা অনুমান করতে পারেন। হয়ত জানুয়ারীর শেষে ঠিক যখন তার সেই লাইফ ইন্সিওরের চাঁদা দেবার সময় আসবে, তার আগেই তিনি মারা পড়বেন।

এমম্বিধ চিন্তাধারায় যখন তার মস্তিষ্ক সমাচ্ছন্ন, তখন তিনি এসে পৌঁছালেন একটা চৌরাস্তার মোড়ে। রাস্তা পার হতে যাবেন, অকস্মাৎ দ্রুত ধাবমান একটা শ্লেজের মুখে পা ফসকে বরফের উপর খেলেন আছাড়। তেরিয়া হয়ে মুখ খিস্তি করতে লাগলে গাড়োয়ান......ঘোড়াটা আপনা থেকেই তার পাশ কাটিয়ে গেল। কিন্তু তা হলেও তার কাঁধে লাগল প্রচণ্ড এক ধাক্কা। গাড়ির একটা লোহার খোঁচা খেয়ে তার পুরোনো ওভার কোটটা ফর ফর করে অনেকখানি গেল ছিঁড়ে।

দেখতে দেখতে লোক জড় হয়ে গেল তার চারিদিকে। একজন পুলিশ তাকে তুলে ধরে ওঠালে। একটি মেয়ে ঝেড়ে দিলে তার গায়ের বরফ। একজন বুড়ী তার দিকে এমনভাবে তাকাতে লাগল, যেন বললে সে এখনি সুঁচসুতো দিয়ে ছেঁড়া কোট সেলাই করতে লেগে যায়। একজন ছোকরা বাবু তার ছিটকে পড়া টুপিটা কুড়িয়ে তার মাথায় পরিয়ে দিলে। ব্যস, মুহূর্তের মধ্যেই যা ছিল সবই ঠিক হয়ে গেল, শুধু কোটটা ছাড়া।

জজের অপিসে ঢুকতেই তার দিকে তাকিয়ে জজ রিচার্ড বলে উঠলেন ঃ সর্বনাশ! এ কি হাল তোমার.....

একটু আগে রাস্তায় গাড়ী চাপা পড়েছিলাম আর কি। হেঙ্ক বললে।

হেসে বললেন জজঃ যেমন অসাবধান তুমি...কিন্তু এমনি ভাবে ত তোমার বাড়ি যাওয়া চলবে না। আমার এই ফারকোটটা পরে নাও এখন—তারপর আমি লোক পাঠিয়ে তোমাদের বাড়ি থেকে আনিয়ে নেব।

একশত ক্রাউন ধার নিলে ডাক্তার। টাকা নিয়ে ধন্যবাদ জানিয়ে পরদিন সন্ধ্যায় তাকে করলেন নিমন্ত্রণ তার বাড়িতে।

রিচার্ড অবিবাহিত। প্রতি বৎসরই খৃীষ্টমাস সন্ধ্যা কাটান হেঙ্কের গৃহে।

২

ফেরবার পথে হেঙ্কের মন গভীর প্রসন্নতায় ভরে ওঠে। এমন প্রসন্নতা বহুদিন তিনি অনুভব করেন নাই। হয়ত এই ফারকোটটার জন্য। ধার করে হলেও অনেক আগেই তার এমন একটা ফারকোট কেনা উচিত ছিল। এতে তার নিজের উপর আত্মবিশ্বাস বাড়ত। লোকের কাছে সম্ভ্রমও তার বাড়ত ঢের। পুরোনো ময়লা ওভারকোটপরা ডাক্তারের চেয়ে ফারকোট পরা ছিমছাম ফিটফাট ডাক্তারের ফিসও হত অনেক বেশি। আশ্চর্য! কেন যে এতদিন একটা ফারকোট কেনেননি তিনি। কিন্তু এখন আর চলে না—অনেক দেরী হয়ে গেছে।

পুরোনো রাস্তা দিয়েই ফিরে চললেন। বেশ অন্ধকার হয়ে এসেছে। সঙ্গে সঙ্গে বরফও পড়ছে। দু-একজন পুরোনো পরিচিতের সঙ্গে পথে দেখা হল। কেউ তাকে বিশেষে লক্ষ্য করলে না।

সত্যই কি খুব দেরী হয়ে গেছে! ডাক্তার মনে মনে ভাবতে লাগলেঃ এখনও ত তিনি খুব বুড়ো হননি। আর তার স্বাস্থ্যের কথা? তার ধারণা তো ভুলও হতে পারে? এখন তার আর্থিক অবস্থা খুব খারাপ, সেজন্য স্ত্রীও তাকে আর আগের মত ভালোবাসে না। অবশ্য জজ রিচার্ডের অবস্থাও পূর্বে এমনি খারাপ ছিল। কিন্তু আজ থেকে তিনি যদি আরও বেশি আয় করেন,

জজ রিচার্ডের মত এমনি জমকালো দামী ফারকোট পরেন, তাহলে স্ত্রী হয়ত পুনরায় আগের মতই তাকে ভালোবাসবে। একটা বিষয় তিনি লক্ষ্য করেছেনঃ সম্প্রতি এই ফারকোটটা কেনার পর রিচার্ডের প্রতি তার স্ত্রীর আকর্ষণটাও যেন একটু বেড়েছে। অবশ্য বিবাহের পূর্বে রিচার্ডের প্রতিই ছিল তার অনুরাগ বেশি। কিন্তু এলেনের দুর্ভাগ্য, রিচার্ড কোনদিনই তাকে বিবাহের প্রস্তাব করলে না। বছরে অন্ততঃ দশ হাজার ক্রাউন আয় না হলে তার বিয়ে করতে সাহস হয় না—এই ছিল রিচার্ডের মত। কিন্তু তিনি সহজেই বিবাহে রাজি হলেন। এলেন ছিল গরীব, বিয়ের জন্য তারই ব্যগ্রতা ছিল বেশি। তাই সহজেই তিনি তাকে বিয়ে করতে পেরেছিলেন। না হলে এমন নিবিড় ভালোবাসার বন্ধনে তারা বাঁধা পড়েন নাই, যার দ্বারা উভয়ের মিলন না হলে তাদের জীবন ব্যর্থ হত বলা চলে, কিন্তু সেই নিবিড় উন্মত্ত ভালোবাসার কামনা কি তার মধ্যে ছিল না? ষোল বছর বয়সেই থিয়েটারে ফাউস্টের অভিনয় দেখে কোন মেয়েকে এমনি উদ্দাম ভালোবাসার বাসনায় তার হৃদয় ভরে উঠেছিল। বিবাহের প্রথম কয়েক বছর তিনি এলেনের কাছ থেকে এমনি ভালোবাসা পেয়েছিলেন। আজো কেন এলেন তাকে তেমনি ভালোবাসবে না?

তাদের বিয়ের পরে রিচার্ডের প্রতি এলেন দেখাতো অতি নির্দয় ব্যবহার। কিন্তু তারপর ধীরে ধীরে একটু একটু করে রিচার্ড যেন তার সে নেতিবাচক মনোভাবকে মুছে এনেছে। এখন ত এলেনের সঙ্গে তার বেশই হৃদ্যতা।

৩

খৃষ্টমাসের বাজার সেরে ডাক্তার হেংক যখন বাড়ি ফিরলেন তখন বেলা সাড়ে পাঁচটা। দুর্ঘটনার কথা মন থেকে এক রকম মুছেই গেছে তার। গায়ের ফারকোটটা ছাড়া সে কথা স্মরণ করিয়ে দিতে আর কিছুই নেই। কাঁধটা যা কিছু একটু কন্‌কন্‌ করছিল।

এই ফারকোট পরা দেখলে স্ত্রীর কত আনন্দ হবে। মনে মনে পুলকিত হয়ে উঠলেন তিনি।

হল ঘরটা ঘন অন্ধকার। রোগী দেখবার সময় ছাড়া সেখানে আলো জ্বালা হয় না।

ডাক্তার যেন পাশের ঘরে স্ত্রীর উপস্থিতি অনুভব করতে লাগলেন। আশ্চর্য তার লঘুগতি চলা। পায়ের শব্দ হয় না চলতে গেলে। মনে মনে হাসি পেল এই ভেবে, এখনও স্ত্রীর সাড়া পেলে তার হৃদয় উদ্বেল হয়ে ওঠে!

ডাক্তার হেংক ঠিকই ধরেছিলেন। এই ফারকোট পরার জন্য আদরের মাত্রাটা সেদিন একটু বেশী উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠল। হলের অন্ধকারাচ্ছন্ন কোণটিতে দাঁড়িয়ে ছিল সে। ডাক্তার কাছে আসতেই দু'বাহুতে তার গ্রীবা বেষ্টন করে ধরল, তারপর তার বুকের মধ্যে মুখ লুকিয়ে ফিস্‌ফিস্‌ করে বললে ঃ হেংক এখনও ফেরেনি......

দপ করে হেংকের সকল আনন্দ বিস্বাদ হয়ে গেল। তিনি অন্যমনস্কভাবে স্ত্রীর চুলগুলি নাড়াচাড়া করতে লাগলেন।

৪

ডাক্তারের পাঠাগারে হেংক ও জজ। টেবিলে হুইস্কি। একখানা আরাম কেদারায় জজ দেহ এলিয়ে দিয়ে সিগার টানছেন। সোফার এক কোণে চুপ করে বসে আছে হেংক। খোলা দরজা দিয়ে রান্নাঘরের খানিকটা দেখা যায়। সেখানে মিসেস্ হেংক ও ছেলেরা খৃষ্টমাসের গাছ সাজাচ্ছে......

নিঃশব্দে দুজনে আহার সারলে।

জজ রিচার্ড বললেঃ আজ যে তুমি মোটেও কথা বলছ না। এখনও কি সেই ছেঁড়া কোটটার কথা ভাবছ তুমি?

কোট নয়, আমি ভাবছি, ফারকোটের কথা।

কিছুক্ষণ চুপ করে পুনরায় আরম্ভ করলেনঃ এই হয়ত আমাদের দুজনের শেষ একত্র খৃষ্টমাস সন্ধ্যা কাটানো। আমি ডাক্তার তাই বুঝতে পারি, দিন আমার ঘনিয়ে এসেছে, সেজন্য তুমি আমাকে এবং সম্প্রতি আমার স্ত্রীর প্রতিও যে দাক্ষিণ্য প্রকাশ করেছ তার জন্য ধন্যবাদ জানিয়ে যাই।

মৃদু স্বরে বললেন রিচার্ডঃ ওসব তুমি ভুল বলছ।

হেংক অন্য দিকে মুখ ফিরিয়ে নিলেন। বললেন, ভুল আমি বলছি না কিছু। তা ছাড়া, সেদিন ঐ ফার কোটটা ধার দেবার জন্য পুনরায় আমি তোমাকে ধন্যবাদ দিই। কারণ ওরই জন্য সেদিন আমার জীবনে সর্বাপেক্ষা আনন্দময় মুহূর্তটি এসেছিল...

অনুবাদক—**শ্রীঅধীরকুমার রাহা**

"ভাবিয়াছিলাম, দশ টাকার বদলে যখন পাঁচ টাকা মিলিবে, তখন whitewash না করিয়া পাঁচ টাকার আন্দাজ limework-ই করিব। কিন্তু শেষ পর্যন্ত whitewash-ই করিতে হইল, limework করিতে পারিয়া উঠিলাম না। ভাই, এইখানেই বোধ হয় শিল্পীর ট্র্যাজেডি। যে শিল্পীর হাতে whitewash আসে, সে তাহার উপযুক্ত প্রাপ্য দশ টাকা না পাইয়া পাঁচ টাকা পাইলেও limework করিতে পারে না, whitewash-ই করে। ......"

* * * *

লিখিয়াছেন জনৈক লেখক বন্ধু। লেখেন ভালো, কিন্তু পান খারাপ। খারাপ পাইতে পাইতে মন খারাপ করিয়াছেন, কিন্তু লেখা খারাপ করিতে পারেন নাই। ইহাই তাঁহার দুঃখ।

অবশ্য এই দুঃখবোধের সহিত আনন্দ-বোধও মিশিয়া আছে, তাহা না হইলে লেখা তাঁহাকে চেষ্টা করিয়া খারাপ করিতে হইত না, লেখা আপনিই খারাপ হইত। যখনই ভালো লেখার বদলে পান কম, তখনই স্বভাবত তাঁহার মন খারাপ হইয়া উঠে এবং তিনি ভাবেন, পরের লেখাটা আর মিছামিছি অত পরিশ্রম করিয়া whitewash না করিয়া অল্প পরিশ্রমে অথবা স্রেফ ফাঁকি দিয়া limework-ই করিবেন। কিন্তু লেখা শুরু করিলেই তাহার ভিতরকার শিল্পী জাগিয়া উঠে, শেষ পর্যন্ত limework আর সম্ভব হইয়া উঠে না। শিল্পী জীবনের ইহাই ট্র্যাজেডি; আবার শিল্পী জীবনের ইহাই গৌরব। এই ট্র্যাজেডির মূল্যেই শিল্পীদের গৌরব ক্রয় করিতে হয়।

* * * *

একটা চমৎকার ফরাসী গল্প পড়িয়াছিলাম—অবশ্য ইংরেজি তর্জমায়। একটা লোক সার্কাসে ছোরা ছোড়ার খেলা দেখাইত। অদ্ভুত দক্ষ শিল্পী ছিল সে, নামও ছিল তার খুব। একটা বড় কাঠের বোর্ডের গা ঘেঁষিয়া দাঁড়াইত সার্কাস দলের একটি মেয়ে। লোকটা অনেকগুলি ছোরা হাতে লইয়া খানিকটা দূর হইতে একটির পর একটি ছোরা সজোরে ছুঁড়িয়া দিত; ছোরাগুলি একটির পর একটি পর পর খুব কাছাকাছি মেয়েটির গা ঘেঁষিয়া এমনভাবে কাঠের বোর্ডটির গায়ে বাঁকাভাবে বিঁধিয়া থাকিত যে, খেলার শেষে ছোরাগুলিকে বোর্ডের গা হইতে জোর করিয়া টানিয়া বাহির না করিলে মেয়েটির বন্দিনী-দশা ঘুচিত না।

খেলা যতক্ষণ চলিত, ততক্ষণ সবাই যেন দমবন্ধ করিয়া খেলা দেখিত। লোকটার লক্ষ্যভেদে এক চুল এদিক-ওদিক হইলেই সর্বনাশ—মেয়েটি যেন প্রাণ হাতে করিয়া বোর্ডের গায়ে হেলান দিয়া মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড়াইয়া আছে। শেষ ছুরিটি ছোড়া হইয়া গেলে পর দর্শকদল হাততালিতে প্রেক্ষাগৃহ মুখর করিয়া তুলিয়া এই ছুরিকা-নিক্ষেপ শিল্পীকে অসাধারণ নৈপুণ্যের জন্য অভিনন্দন জানাইত। শিল্পী নতমস্তকে

লেখু-ওক
অ · কৃ · ব

স্মিতহাস্যে সবিনয়ে সেই অভিনন্দন গ্রহণ করিত।

কিন্তু মুগ্ধ দর্শকদল জানিত না, এই অসাধারণ শিল্পীর জীবনের ট্র্যাজেডি। ঐ যে অসমসাহসিনী মেয়েটি মৃত্যুভয় ত্যাগ করিয়া ছুরিকা-বৃষ্টির মুখোমুখি নির্ভয়ে দাঁড়াইত, উহাকে হত্যা করাই ছিল শিল্পী লোকটার ঐকান্তিক কামনা। মেয়েটিকে সে প্রেম-নিবেদন করিয়াছিল, কিন্তু মেয়েটি পরম অবহেলায় সবিদ্রূপে তাহা প্রত্যাখ্যান করিয়া তাহার প্রেমের অপমান করিয়াছিল। শিল্পী প্রেমিক তখনই মনে মনে শপথ করিয়াছিল, এই হৃদয়হীনা নারীকে হত্যা করিয়া সে তাহার প্রেমের অপমানের প্রতিশোধ নিবে। হত্যা করিবার উপায়ও তাহার হাতেই আছে। খেলা দেখাইবার আগে শিল্পী রোজ ভাবে, একটা ছুরি ছুঁড়ীর হৃদয়হীন বক্ষে আমূল বিদ্ধ করিয়া দিবে। কেহই বুঝিবে না, ইহা ইচ্ছাকৃত হত্যা, সবাই ভাবিবে দৈবক্রমে সে লক্ষ্যভ্রষ্ট হইয়াছে। প্রতিশোধের কামনা পূর্ণ হইবে, অথচ সেজন্য মৃত্যুমঞ্চে মাশুল দিতে হইবে না।

কিন্তু খেলা দেখাইতে শুরু করিবার সঙ্গে সঙ্গেই তাহার ভিতরকার শিল্পী বড় হইয়া দাঁড়ায়, প্রতিশোধকামী, অপমানিত প্রেমিক তাহার আড়ালে ঢাকা পড়িয়া যায়! এই শিল্পীর লক্ষ্য অব্যর্থ, লক্ষ্যভ্রষ্ট হওয়া তাহার পক্ষে সম্ভব নয়। এতগুলি প্রশংসা-নীরব দর্শকের মুগ্ধ দৃষ্টি তাহার উপর নিবদ্ধ; লক্ষ্যভ্রষ্ট হইয়া ইঁহাদের শ্রদ্ধা-বিস্ময়মুগ্ধ দৃষ্টির সম্মুখে শিল্পীর এতদিনের অটুট সম্মান ধূলায় মিশাইয়া দিবে? অসম্ভব। খেলা শেষ হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত মন্ত্রমুগ্ধের মত সে ছুরি ছুঁড়িতে থাকে নির্ভুল দক্ষতার সহিত। খেলা শেষ হইয়া গেলে বিজয়ী শিল্পী হাসিয়া বিদায় নেয়; প্রতিশোধকামী ব্যর্থ প্রেমিক প্রতিশোধ-সুযোগ হারাইয়া আফশোষ করে। দিনের পর দিন এইভাবেই সে খেলা দেখাইয়া চলে, কিন্তু প্রতিশোধ তাহার আর নেওয়া হয় না। শিল্পীর সুনামকে সে হত্যা করিতে পারে না বলিয়াই হৃদয়হীনা মেয়েটাকে সে হত্যা করিতে পারে না।

ঠিক এই ছুরি খেলোয়াড় শিল্পীর মত অবস্থা আমার বন্ধু সাহিত্য-শিল্পীর। প্রতিবার সে লেখার খেলা সুরু করিবার আগে ভাবে এইবার সে whitewash-এর বদলে limework করিয়া প্রতিশোধ নিবে, পরিশ্রম করিয়া খাঁটি জিনিস সৃষ্টি না করিয়া ফাঁকি দিয়া বাজে মাল চালাইবে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত সে ফাঁকি দিয়া নিজের ভিতরকার শিল্পীর অপমান করিতে পারে না—ফলে limework করিতে গিয়া শেষ পর্যন্ত whitewash-ই হয়।

* * * *

এ কথাটা প্রায়ই বলা হয় এবং অনেকটা ঠিকই বলা হয়—যে সাহিত্য ব্যবসায়ের জগতে সাহিত্যিকরাই প্রধান উপেক্ষিত। মুদ্রাকর, কম্পোজিটার, দপ্তরী ইত্যাদি সকলকেই অম্লান বদনে পয়সা দেওয়া হয়, কিন্তু যাহাদের রচনার উপর ভিত্তি করিয়াই এত ব্যাপার তাহাদের পয়সা দিবার বেলায় পয়সাদাতাদের বদন ম্লান হইয়া আসে। লেখেন, অথচ পয়সা পান না এরূপ আত্মত্যাগী আপনি পথে ঘাটে অসংখ্য পাইবেন—আজকালও পাইবেন—কিন্তু পয়সা না পাইয়াও মুদ্রণ কার্য করেন এরূপ দাতাকর্ণ মুদ্রাকর, বিনা বেতনে কম্পোজ করেন এরূপ দধীচি চরিত্র মহাত্যাগী কম্পোজিটার অথবা বিনা মজুরীতে বই বাঁধাইয়া দিতে রাজী হয় এরূপ প্রাতঃস্মরণীয় দপ্তরী আপনি দুনিয়া তচনচ করিয়া ফেলিলেও পাইবেন বলিয়া মনে হয় না।

* * * *

ইহার কারণ অতি সহজ। সাহিত্যিক শিল্পী, কিন্তু মুদ্রাকর, কম্পোজিটর এবং দপ্তরী শিল্পী নয়—অন্ততঃ সাহিত্যিক যে অর্থে শিল্পী সে অর্থে নয়। সাহিত্যিকের লেখায় সৃষ্টির যে আনন্দ আছে, মুদ্রাকর, কম্পোজিটার এবং দপ্তরীর কাজে তাহা নাই। তাই লেখার জন্য পয়সা না পাইলেও সাহিত্যিক ভিতরের তাগিদেই হয়তো লিখিবে ('হয়তোই'-বা বলি কেন, শেষ পর্যন্ত না লিখিয়া পারিবেই না, যদি সে সত্যিকারের সাহিত্যিক হয়), কিন্তু মুদ্রাকর মুদ্রণকার্য শুরু করিবার পূর্বে মুদ্রাপ্রাপ্তি সম্বন্ধে নিশ্চিত হইয়া নিবে, কম্পোজিটার শুধু কম্পোজ করিবার আনন্দে কখনোই কম্পোজ করিবে না এবং কোনো দপ্তরী কখনো বলিবে না, "দিন না আপনার বই-গুলো বাঁধাই করে দিই। পয়সা না হয় আপনি না-ই দিলেন।" সাহিত্য সৃষ্টিতে আনন্দ আছে—সাহিত্যিকের মুস্কিল এবং ট্র্যাজেডি ঐখানেই। সেই জন্যেই পয়সা কম পাক বা বেশী পাক, এমন কি, পাক বা না পাক, সে লেখে, আরও লেখে, আরও আরও লেখে। কিন্তু লেখা পাঠক-পাঠিকারই জন্যে—তাঁহাদের কাছে না পৌঁছানো পর্যন্ত লেখার কোন সার্থকতা নাই। সেই জন্যেই পয়সা কম পাক বা বেশী পাক, এমন কি, পাক বা না পাক, লেখক কাগজে লেখা ছাড়ে, আরও লেখা ছাড়ে, আরও আরও লেখা ছাড়ে।

"দেশ"-এর নিয়মাবলী

বার্ষিক মূল্য—১৩৲   ষান্মাসিক—৬৷৷৹

বিজ্ঞাপনের নিয়ম

"দেশ" পত্রিকায় বিজ্ঞাপনের হার সাধারণত নিম্নলিখিতরূপঃ—

সাধারণ পৃষ্ঠা—এক বৎসরের চুক্তিতে

১০০" ও তদূর্দ্ধ ... ৩৲ প্রতি ইঞ্চি প্রতি বার

৫০"—৯৯" ... ৩৷৷৹ " " " "

সাময়িক বিজ্ঞাপন

৪৲ টাকা প্রতি ইঞ্চি প্রতি বার

বিজ্ঞাপন সম্বন্ধে অন্যান্য বিবরণ বিজ্ঞাপন বিভাগ হইতে জানা যাইবে।

সম্পাদক—"দেশ"

১নং বর্ম্মণ স্ট্রীট, কলিকাতা।

জীবন-চরিতে বৈজ্ঞানিক রীতি

শ্রীসত্যচরণ ঘোষ

জগতের জীবমাত্রেই নশ্বর। কিন্তু আবার কালেরই ধর্মগুণে ধ্বংসের পর নূতনের সৃষ্টি হয়; আর এই নূতন সৃষ্টির সঙ্গে সঙ্গে জীব-জগৎ ক্রমোন্নতির পথে ধীরে ধীরে এগিয়ে চলে কোন এক অজানা পরিণতির দিকে। জীবশ্রেষ্ঠ মানুষ ভবিষ্যতে যারা আস্‌বে, তাদের জন্যে যেমন ভাবে, তেমন যারা অতীতে ছিল, তারা কিরূপ ছিল, তাদের কর্ম কি ছিল এবং এই বর্তমানের জন্যে তারা কি রেখে গেছে সে বিষয় জান্‌বার জন্যেও বর্তমানকালের মানুষ আগ্রহশীল। বিলুপ্তির হাত থেকে মহিমান্বিত স্মৃতিকথা, বিপুল কর্মশক্তির নিদর্শনস্বরূপ নানা স্মরণীয় কীর্তিচিহ্ন বাঁচিয়ে রেখে নূতন জগতের সঙ্গে অটুট বন্ধন রাখবার জন্যেই ইতিহাসের সৃষ্টি হ'য়েছে। ইতিহাস আছে বলেই সুদূর অতীতের মানবসমাজের নীতি, ধর্ম, বিজ্ঞান, দর্শন, শিল্পকলা প্রভৃতি সকল প্রকারের পরিচয় আমরা পাই। যাদের মহান্ আদর্শে সমগ্র সমাজের জাতির বা দেশের আদর্শ প্রভাবান্বিত হয়েছিল সেই মহান্ বরেণ্য ব্যক্তিগণের আদর্শকেই অনুকরণীয় বলে মেনে নেওয়া হয়। রাজা, রাজনীতিক, পণ্ডিত, কবি, বিজয়ী বীর, সাহিত্যিক, বৈজ্ঞানিক, ধর্মপ্রচারক প্রভৃতি জননায়ক ও চিন্তানায়কগণের কর্মময় জীবনের কথাতেই ইতিহাসের কলেবর পরিপূর্ণ। সুতরাং একটা সমগ্র জাতির, সমগ্র সমাজের কতকগুলি বিশিষ্ট মানবের বা মানব-গোষ্ঠীর সংক্ষিপ্ত জীবনকথার সমষ্টিই ইতিহাস। ইতিহাসে সন্নিবেশিত হয়েছে বহু ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জীবনচরিত। কিন্তু ইতিহাস চায় অতীত সমাজের ঘটনা বৈচিত্র্যময় মানবের কর্মের রূপকে ফুটিয়ে তুলতে। কিন্তু এই কর্মের রূপে যারা রূপায়িত হয়ে উঠেছে তাদের প্রতি পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে, বিশেষ করে' দৃষ্টি দেবার—অবসর ও সুযোগ ইতিহাস লেখকের নেই। কাজে কাজেই ইতিহাসের অতিদ্রুত ঘটনা ও সময়ের প্রবল-প্রবাহে ব্যষ্টিজীবনের সমষ্টিগতরূপ ফুটে উঠলেও ব্যক্তির জীবনের প্রকৃতরূপ ঠিক ধরা যায় না। এখানেই ইতিহাসে আর জীবনচরিতে পার্থক্য। জীবনচরিত থেকে ইতিহাস রচনা, কিংবা ইতিহাসের মালমশলা সংগ্রহ করা যায়, কিন্তু ইতিহাস থেকে জীবনচরিত রচনা করা চলে না। ইতিহাসে বর্ণিত বিশিষ্ট ব্যক্তির বিপুল কর্ম-কাহিনীর আড়ালে তার ভিতরের প্রকৃত মানুষটির কথা অনেক সময়েই চাপা পড়ে যায়। তার খাঁটি রূপটিকে ঠিক স্পষ্টভাবে দেখ্‌তে পাওয়া যায় না। কিন্তু এই বিরাট কর্মের অনুষ্ঠাতা যে মানুষ তাকে তার প্রকৃতরূপে দেখ্‌বার জন্যে জীবন-চরিতের সৃষ্টি হ'য়েছে।

ঘটনা-প্রবাহের সূত্র ধরে' ইতিহাসের পৃষ্ঠায় দেখা দেয় এক একজন মানুষ। ইতিহাসের সমগ্র রূপের ভিতরেই তাদের স্থান, তাদের জীবনকে পৃথক করে, খুঁটিয়ে দেখ্‌বার অবসর সেখানে অল্প। কিন্তু সমগ্র ইতিহাসের মধ্য থেকে যে-কোন একটি মানুষের রূপকে স্বতন্ত্রভাবে ফুটিয়ে তোলে জীবন-চরিত। ইতিহাস চায় মানুষের চরিত্রের ও কার্যকলাপের সঙ্গে তৎকালের অন্যান্য চরিত্র ও ঘটনা-প্রবাহের সংমিশ্রণ, কিন্তু ইতিহাসের সমষ্টিগত রূপ থেকে মানুষকে বিশ্লিষ্ট করে তার জীবনের পরিপূর্ণ রূপ ফুটিয়ে তোলাই জীবন-চরিতের কাজ। অসংখ্য বিভিন্ন ঘটনার বিবরণে ইতিহাস পূর্ণ; এর আরম্ভ অনেক ক্ষেত্রে আকস্মিক; কালবিভাগ ও ঘটনা-বিভাগ হিসাবে, ইতিহাসের স্থানে স্থানে ছেদ টানা হ'লেও সমগ্রতার দিক দিয়ে দেখ্‌তে গেলে ইতিহাসের সমাপ্তি নেই, সুপ্রাচীন তিমিরান্ধকার যুগ থেকে এগিয়ে চলেছে নানা পরিবর্তন ও বিবর্তনের পথ ধরে ভবিষ্যতের দিকে। ইতিহাস সাধারণতঃ নিরপেক্ষভাবে বহুসংখ্যক জীবনের ও ঘটনার কথাই ব্যক্ত ক'রে যায়। কিন্তু প্রধানত দুটি নির্দিষ্ট ঘটনা, জীবন-চরিতের সীমারেখা টেনে দিয়েছে,—এর বাইরে জীবনচরিত এতটুকু যেতে পারবে না। এই দুটি ঘটনা, হচ্ছে জন্ম ও মৃত্যু। জন্মে আরম্ভ এবং মৃত্যুতে এর শেষ। নাটকের বিভিন্ন চরিত্র যত বড়ই হোক না কেন, তবু সেসব চরিত্র নাটকের নায়কের চরিত্রের অনেক নীচেই থাক্‌বে—নায়কের ওপর তার স্থান হ'তে পারে না। ঠিক সেই রকমই জীবনচরিতের নায়ক হ'বে মাত্র একজন; তাঁর জীবনের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট যিনি বা যাঁরা, তাঁরা যত মহৎ হোন্ না কেন, তাঁর উপরে যেতে পারবেন না। জীবনচরিতের সমগ্র পরিধির মধ্যে মাত্র একজনেরই প্রাধান্য থাক্‌বে। ইতিহাস যে যুগে লিখিত সেই যুগের, ধর্ম ও আকর্ষণীয় ঘটনাপ্রবাহকে বিবৃত করাই ইতিহাসের লক্ষ্য। কিন্তু জীবনচরিতের লক্ষ্য তা নয়। ইতিহাসে ঘটনাই মুখ্য, ব্যক্তি গৌণ, জীবনচরিতে ব্যক্তিই মুখ্য, আর ব্যক্তিকে আশ্রয় করেই রূপায়িত হয় ঘটনা। কিন্তু যে আদর্শের জন্য জীবনচরিতের সৃষ্টি হ'য়েছে ঠিক সেই আদর্শকে আমরা সাধারণত জীবন-চরিতে পাই না। বাঙলা সাহিত্যে জীবন-চরিতের স্থান খুব উল্লেখযোগ্য নয়। অবশ্য সাহিত্যের এতে কোন দোষ নেই। মাইকেল মধুসূদন, বঙ্কিমচন্দ্র, শরৎচন্দ্র এবং রবীন্দ্র-নাথের মহামূল্য দানে বাঙলা সাহিত্যের স্থান আজ অনেক উঁচুতে। কিন্তু সমসাময়িক সাহিত্যে নূতন রস সৃষ্টি করবার ক্ষমতা বুঝি জীবনচরিতের নেই। অপরাজেয় কথা-শিল্পিগণের এবং অলোকসামান্য প্রতিভার অধিকারী কবি'র যে সন্ধানী আলোর দ্বারা বাঙলার উপন্যাস ও কাব্য-সাহিত্য আলোকিত হয়েছে, সেই আলো দিয়ে জীবনচরিতের অন্তর্নিহিত কক্ষটি আলোকিত হয়নি। বিজ্ঞানসম্মত, অথচ রস-ভূয়িষ্ঠ সাহিত্য-রীতিতে জীবনচরিত সাধারণত লেখা হয়নি, তাই বাঙলা সাহিত্যে জীবনচরিতের স্থান এত নীচে —তাই জীবনচরিত আজ বল্‌তে গেলে অনাদৃত। জীবনচরিত পড়তে বড় একটা কেউ চায় না, দেখ্‌তে পাওয়া যায়। তবে আদর্শবাদী ছাত্রদের মধ্যে অনেকে মহৎ ব্যক্তিদের সম্বন্ধে কিছু জান্‌বার জন্য তাঁদের জীবন-চরিত পড়বার আগ্রহ প্রকাশ ক'রে থাকে এবং সুযোগ হ'লে পাঠও ক'রে থাকে। পাঠান্তে মহৎ ব্যক্তির আদর্শে তারা অনুপ্রাণিত হয়ে তাদের জীবনের ধারাও কেউ কেউ গড়ে তুল্‌তে চেষ্টা করে। এইরূপ স্থলে জীবনচরিত একপ্রকার হিতোপদেশের কাজ ক'রে থাকে। নৈতিক শিক্ষার দিক্ দিয়ে এর দামও কম নয়। কিন্তু জীবন-চরিতে আমরা দেখ্‌বো যে জীবন কতদূর সত্য হ'য়ে ফুটে উঠেছে—জীবনচরিতের লেখকের পক্ষে নীতি-শিক্ষার প্রচারক হওয়া অপেক্ষা কঠোর সত্যের আবিষ্কারক হওয়াই প্রথমত প্রয়োজন। অনেকে আছে যারা রাজা রামমোহন, ঈশ্বরচন্দ্র, বঙ্কিমচন্দ্র, চিত্তরঞ্জন, জগদীশ বসু, গোখ্‌লে, রাণাডে, রাস-বিহারী, স্বামী বিবেকানন্দ, সুরেন্দ্রনাথ, সুব্রহ্মণ্য, স্যার আশুতোষ প্রভৃতি খ্যাতনামা বরেণ্য মনীষিগণের জীবনচরিতের বিষয়ে বিশেষ কিছুই জানেন না বা জানবার আগ্রহও তাঁদের নেই। জীবনচরিত রচনার ত্রুটি এর জন্য কতখানি দায়ী, তাও ভাববার বিষয়।

বাঙলা সাহিত্যে আজ পর্যন্ত যতগুলি জীবনচরিত লেখা হয়েছে, তার অনেকগুলি

যেমন সাহিত্যের রসে বঞ্চিত, তেমনি জীবনচরিতের প্রকৃত ধর্ম হ'তেও বঞ্চিত। তাতে শুধু আছে, জীবনের জন্ম, মৃত্যু আর এই উভয় ঘটনার মধ্যে জীবনের কতকগুলি কর্মের বিবরণ। ইতিহাসের মত এও ঠিক সেই রকম করেই জীবনকে নীরস ক'রে এঁকে যাওয়া। সুতরাং এতে সাহিত্যও নেই বিজ্ঞানও নেই—এ যেন কোন নদীর একটানা একটা স্রোত। ক'বে জীবনচরিতে বর্ণিত ব্যক্তিটি জন্মেছেন, কোথায় শিক্ষিত হ'য়েছেন, ক'বে জননায়ক হ'য়েছেন, অথবা কবে দাতাকর্ণ হ'য়েছেন, ক'বে জজ, ম্যাজিস্ট্রেট হ'য়েছেন কবে বড় বড় দেশী বিদেশী খেতাব পেয়েছেন ইত্যাদি গুণ কীর্তনের পরই কবে তিনি দেশবাসীকে চোখের জলে ভাসিয়ে ইহলোক ত্যাগ করে' পরলোকে চলে গেছেন, এই নিয়েই জীবনচরিত লেখা হয়।

অনেক সময় জীবনচরিত লেখক, যাঁর জীবনী তিনি লিখছেন, তাঁর প্রশংসায় এমন পঞ্চমুখ হ'য়ে ওঠেন যে, অতিরঞ্জিত বর্ণনায় সেই জীবন-কথা অবাস্তব হ'য়ে ওঠে, তবে প্রশংসা ও কৃতিত্বের সুদীর্ঘ ফিরিস্তির আড়ালে আসল মানুষটি দুর্ণিরীক্ষ্য হয়ে ওঠেন। নায়কের জীবনের সমস্ত ঘটনা আনুপূর্বিক লিপিবদ্ধ করলে জীবনচরিতের কোন বৈশিষ্ট্য থাকে না। প্রধান প্রধান ঘটনার অবলম্বনে প্রকৃত মানুষটিকে খুব সংক্ষেপের ভিতরে বাঁচিয়ে রাখাই জীবনচরিতের আধুনিক বিজ্ঞান। কর্ম ও মানুষ, ন্যায় ও অন্যায়, দোষ ও গুণ প্রভৃতি আলো ছায়ার নিখুঁত সমাবেশেই প্রকৃত জীবনচরিত রচিত হওয়া উচিত। নাটকীয় ঘটনার ন্যায় চমকপ্রদ সংক্ষিপ্ত রচনার ভিতর দিয়ে একটা গোটা জীবনকে, সুখ-দুঃখ, বাধাবিঘ্ন এবং জয় পরাজয়ের ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্যে পূর্ণরূপে প্রকাশ করাই জীবনচরিত রচনার প্রকৃত রীতি।

কি প্রকারে জীবনচরিত রচনা ক'রলে জীবনচরিতের আদর্শ বজায় থাকবে, নায়কের প্রকৃতরূপ পূর্ণভাবে প্রকাশ করে' সর্বশ্রেণীর পাঠকবর্গের চিত্ত আকর্ষণ করবে তা-ই হ'ল সত্যিকারের বড় প্রশ্ন।

এই গুরুতর প্রশ্নের সমাধানের জন্য জীবনচরিত লেখকের পক্ষে কতকগুলি বিশেষ সত্যের প্রতি দৃষ্টিনিবদ্ধ করে জীবনচরিত রচনায় প্রবৃত্ত হওয়া আবশ্যক।

এই প্রসঙ্গে ইংরাজ কবি এবং চিত্রকর Dante Gabriel Rossettiর রচিত 'The Portrait' নামক কবিতার প্রথম অংশটি আমি উদ্ধৃত করছি। পরলোকগত প্রিয়তমার চিত্রের দিকে তাকিয়ে বিরহকাতর প্রেমিক বলছে—

"This is her picture as she was:
It seems a thing to wonder on,
As though mine image in the glass
Should tarry, when myself am gone.
I gaze until she seems to stir,—
Until mine eyes almost aver
That now, even now, the sweet lips part
To breathe the words of the sweet-heart:
And yet the earth is over her."

একটু তফাৎ নেই, প্রিয়তমার অবিকল নিখুঁত আকৃতি। এত প্রাণময় এই চিত্র! প্রেমিক বলছে, কালের অনন্ত অন্ধকার তাকে গ্রাস করেছে, তবু এই চিত্রের ভিতর দিয়ে সে যেন দেখতে পাচ্ছে যে হৃদয়ের আবেগপূর্ণ প্রেমের কথা বলবার জন্যে তার সুন্দর অধর দু'খানি স্ফুরিত হচ্ছে। এমনিই জীবন্ত এই চিত্র। ঠিক এইরূপ জীবন্ত ভাবে জীবনচরিত লেখককে জীবনচরিত ফুটিয়ে তুলতে হবে।

জীবনচরিত লেখক হবেন চিত্রকর আর জীবনচরিত হবে তাঁর চিত্র। সমানুপাত আলো ও ছায়ার সমাবেশ না হলে চিত্র সম্পূর্ণ হয় না। বেশি আলোও ভাল নয় আবার বেশি ছায়াও ভাল নয়। এ যেন দুটি চোখ, একটির অভাবে দৃষ্টিশক্তি সম্পূর্ণ হয় না—দুটিই অত্যাবশ্যক।' ঠিক এই রকমই মানুষের চরিত্রের দুটি দিক, একটি আলো অপরটি ছায়া, একটি উৎকর্ষ, অপরটি অপকর্ষ। এ যেন ঠিক বৈজ্ঞানিকের Laws of Relativity. মানব চরিত্রের অংকনে চরিত্রের এই দুটি বিপরীত দিক ঠিক ভাবে লিপিবদ্ধ করা বিশেষ প্রয়োজন। এই দুটির সমানুপাত সমাবেশে মানবের চরিত্র সম্পূর্ণ হয় এবং সুন্দরও হয়। ঠিক আসল মানুষকে আঁকতে হলে চিত্রের এই দুটি দিক অংকন অপরিহার্য।

কিন্তু এইখানেই জীবনচরিত লেখকের সামনে আসে এক দুর্জয় বাধা। চরিত্রের দুর্বলতার দিকটা আঁকতে গিয়ে আসে দ্বিধা। আর জীবনচরিত লেখক এই

দ্বিধার বশেই মানুষের চরিত্রের উজ্জ্বল দিকটাই বেছে নেন আর তারই প্রশংসায় নায়কের জীবনীর উপসংহার করেন।

অবশ্য এ অন্তরায় আসাটাও স্বাভাবিক। কারণ, মৃত ব্যক্তির নিন্দাগান দেশাচার বিরুদ্ধ। কেহই চায়না যে তার প্রিয়জনকে কেউ নিন্দা করুক। যে লোক জীবিত ছিল, সে যেমন পরের উপকার করতো তেমনি আবার তার দ্বারা অপরের অপকারও সাধিত হয়েছে।

কিন্তু প্রকৃত জীবনচরিত লেখক হতে হলে দ্বিধাগ্রস্ত, দুর্বলমনা হলে চলবে না। তাঁকে কঠোর হতে হবে, নির্মম হতে হবে। বিচারকের মতো নিরপেক্ষ ভাবে চরিত্রের ভালো-মন্দ উভয় দিকের সমাবেশে মানব চরিত্রকে—জীবনচরিতের নায়ককে—নিখুঁত ভাবে অঙ্কিত করতে হবে।

মানবের কার্যাবলীই তার চরিত্রের সাক্ষী। তার কর্মের ভিতর দিয়েই আসল মানুষের পরিচয় পাওয়া যায়। কোন জাতির সাহিত্য সেই জাতির আলেখ্য। ঠিক সেই রকম ভাবেই মানুষকে চেনবার জন্য তার কর্মের বিষয়ই বিশেষভাবে প্রয়োজন।

কর্মের ভিতর দিয়েই মানুষের সত্যিকারের চেহারাটি সাধারণের কাছে অভিব্যক্ত হয়। সুতরাং জীবনচরিত লিখতে হলে জীবনচরিত লেখককে এই কর্মের দিকে বিশেষ দৃষ্টি রাখতে হবে। কর্মই চরিত্র অঙ্কনের প্রকৃত মাল-মশলা।

অবশ্য আমাদের প্রচলিত জীবনচরিতে যে কর্মের বর্ণনার অভাব পরিদৃষ্ট হয়, তা নয়। কর্মের বিবরণ আছে, কিন্তু অনেক ক্ষেত্রেই তাতে একদেশ-দর্শিতার পরিচয় পাওয়া যায়।

জীবনচরিত লেখককে সন্ধানী আলোর সাহায্যে তাঁর নায়কের হৃদয়ের নিগূঢ়তম কক্ষটিকে আলোকিত করে প্রকৃত মানুষটিকে লোকচক্ষুর সামনে এনে তুলে ধরতে হবে।

এই উদ্দেশ্যে নায়কের বিভিন্ন কর্মগুলিকে সংগ্রহ করতে হইবে। নায়ক কবে কি করেছিল, কবে কোথায় গিয়েছিল—কাহার সহিত পরিচয় হয়েছিল, কাকে কয়খানি পত্র লিখেছিল এবং তাহাকেই বা কে কয়খানা পত্র লিখেছিল—এই সমস্ত পত্রের সার মর্ম অথবা পত্রগুলি সম্পূর্ণ প্রকাশ প্রভৃতি ব্যাপারে আসে আসল নির্বাচন ও ওজনের প্রশ্ন। আর এইখানেই প্রয়োজন হয় লেখকের জীবন-চরিত রচনায় বৈজ্ঞানিক জ্ঞান। অনাবশ্যক ঘটনাগুলিকে বাদ দিয়ে আসল ও প্রধান প্রধান ঘটনার অবলম্বনে নায়কের উভয় চরিত্রকে ফুটিয়ে তুলতে হবে অথচ এমন কতকগুলি ঘটনা বাদ দিতে হবে যার জন্যে চরিত্র অঙ্কনের কোনরূপ অসুবিধা হবে না। যা মহান্, মানব চরিত্রে যা আদর্শ-

স্থানীয়, যা চরিত্রকে দেবত্বে উন্নীত করে, তার সঙ্গে তার চরিত্রের নিকৃষ্ট দিকটার সমান অনুপাত বজায় রাখাই জীবনচরিত রচনার প্রকৃত আঙ্গিক।

এখন প্রশ্ন, কিরূপ ব্যক্তির জীবনচরিত রচনায় লেখক প্রবৃত্ত হবেন। সাধারণত আমরা দেখতে পাই যে, যাঁরা অসাধারণ কাজ করে জগতে শ্রেষ্ঠ বলে পরিচিত হয়েছেন, সেই সমস্ত অসাধারণ ব্যক্তিকেই জীবনচরিতের নায়করূপে নির্বাচন করা হয়। সমাজে ও রাষ্ট্রে যাঁরা বড়, তাঁদের নামই ইতিহাসে স্থান পায়। তাঁদেরই জীবনচরিত লেখা হয়। সাধারণ লোকের জীবনচরিতে স্থান নেই। এ বিষয়ে A. C. Benson লিখেছেন,—

"Biographies, as a rule, are concerned only with the men of notable performance; that seems to me a most inartistic business".

সত্যিই এরূপ জীবনচরিত প্রায়ই নিরস হয়ে ওঠে ঠিক ইতিহাসের মতন। এরূপ জীবনচরিতে কোন রকম শিল্পের চাতুর্য নেই—এ যেন ঠিক মুখস্থ করা কবিতার আবৃত্তি।

এখন প্রশ্ন উঠতে পারে যে, অসাধারণ ব্যক্তিদের নিয়ে লেখা জীবনচরিত সত্য সত্যই যদি সাহিত্যের রস থেকে বঞ্চিত হয় তাহলে কিরূপ জীবনচরিত রচিত হওয়া আবশ্যক? যাঁরা অসাধারণ কাজ করে, জগতে শ্রেষ্ঠ বলে পরিচিত হয়েছেন, তাঁদের বাদ দিয়ে এমন কোন্ শ্রেণীর লোকের জীবনচরিত আঁকলে জীবনচরিত artistic ও বিজ্ঞানসম্মত হবে।

এ প্রশ্নের উত্তরের আগে দেখতে হবে যে, জগতের ইতিহাসে যাঁরা শ্রেষ্ঠ হয়ে আছেন, তাঁদের নিজস্ব ব্যক্তিগত জীবনের প্রকৃত পরিচয় কতখানি প্রকাশ পেয়েছে।

অধিকাংশ মহৎ ব্যক্তিই, ইতিহাসের পৃষ্ঠায় যাঁদের নামেরই কেবল একচেটিয়া দখল, তাঁরা নিজেদের ব্যক্তিগত রূপটি প্রকাশের মোটেই অবসর পান না। বিজয়ী বীর, অপরাজেয় যোদ্ধা, পরাক্রমশালী রাজা, ভুবন বিখ্যাত রাজনৈতিক নেতা প্রভৃতি বরেণ্য ব্যক্তিগণের বিশাল কর্মের স্রোতে তাঁদের ভিতরকার ব্যক্তিটি ডুবে যায়। পারিবারিক, লৌকিক ও সামাজিক জীবনের ক্ষুদ্র গণ্ডির বাইরে তাঁদের সমুদয় কর্ম ও চিন্তাধারা প্রকাশ পায়। সাধারণ মানব সমাজের শাসনের বাইরে অতি উর্ধ্বে তাঁরা থাকেন দুর্নিরীক্ষ হয়ে।

সমাজে, সভা সমিতিতে, আমোদ-প্রমোদ, হাস্য-পরিহাসে, বন্ধুবান্ধব, আত্মীয় স্বজনের সঙ্গে অবাধ মেলামেশায় প্রভৃতিতে যে মানুষটির অখণ্ড, সত্য পরিচয় লোকলোচনে সুস্পষ্টভাবে ধরা পড়ে, তার জীবনচরিত যতটা বাস্তব রূপ নিয়ে ফুটে ওঠে, মানব সমাজের অতি উর্ধ্ব স্তরে বিচরণশীল, অসাধারণ ব্যক্তির জীবন ততটা পরিষ্কাররূপে জীবনচরিতে রূপায়িত করা সম্ভব নয়। তাঁর কার্যকলাপের যতটুকু মানবচক্ষে প্রত্যক্ষীভূত হয়েছে, বড় জোর তাঁর সম্বন্ধে শোনা কথা হল তাঁর জীবনচরিতের প্রধান উপজীব্য। তবে কেউ যদি তাঁর সঙ্গে ঘনিষ্ঠ ভাবে মেশবার সুযোগ পান এবং তিনি যদি নিরপেক্ষ ভাবে লিখতে পারেন, তবেই তাঁর প্রকৃত জীবনচরিত রচনা সম্ভব; অন্যথায় তা অবাস্তব ও inartistic হয়ে পড়ারই সম্ভাবনা। বেনসনের কথার তাৎপর্য হল এই। কিন্তু তা অনেক ক্ষেত্রে সম্ভব না হওয়াটাই স্বাভাবিক। কারণ অতিরিক্ত প্রভাব-প্রতিপত্তিশালী ব্যক্তির জীবনী লিখতে গিয়ে, লেখকের পক্ষে বাস্তবতার দিকে ঝুঁকে পড়া অস্বাভাবিক নয়। এইখানেই আসছে আবার সেই চিত্রের কথা—fine proportion of light and shed. শুধু আলো দিয়ে কিম্বা শুধু ছায়া দিয়ে যেমন কোন ছবি অঙ্কিত হতে পারে না, সেই রকম শুধু যশের আলো দিয়ে জীবনচরিত লেখা যায় না। সমানুপাত আলো-ছায়ার সম্পাতেই তা সম্ভব।

জীবন-চরিত লেখককে আর একটি বিষয়ের প্রতি বিশেষ ভাবে দৃষ্টি রাখতে হবে—এ বিষয়ে দৃষ্টি না দিলে জীবনচরিত সম্পূর্ণ হয় না। জীবনচরিত রচনার সময়ে অনেকেই ভুলে যান, যে নিজস্ব মতবাদ, নায়ক সম্বন্ধে নিজের মতামত প্রকাশ করা জীবনচরিত লেখকের পক্ষে একটি প্রধান দুর্বলতা।

জীবনচরিত লেখক হবেন নাট্যকার আর তাঁর জীবচরিত হবে নাটক। নাট্যকার নাটকের কোন্ চরিত্র কিরূপ, এক কথায় কখনও প্রকাশ করেন না। উপন্যাসেও কাহিনীর গতি ও ঘটনার ঘাত-প্রতিঘাতের ভিতর দিয়ে চরিত্র ফুটে ওঠে। জীবনচরিতেও ঘটনা-প্রবাহের ভিতর দিয়েই উদ্দিষ্ট ব্যক্তির যথাযথ পরিচয় দেওয়া আবশ্যক। তিনি উদার কি অনুদার, মহৎ কিম্বা ক্ষুদ্র এক কথায় সে সম্বন্ধে রায় দেওয়া লেখকের পক্ষে সমীচীন নয়। ঘটনার গতির সাহায্যেই লেখককে তাঁর বক্তব্য ফুটিয়ে তুলতে ও প্রমাণিত করতে হবে।

স্বাস্থ্য প্রসঙ্গ

বীজাণু বিভীষিকা

ডাঃ পশুপতি ভট্টাচার্য

বেঁচে থাকলেই রোগে ভুগতে হবে, এটা যেন অবধারিত বলেই আমরা চিরকাল মেনে আসছি। জীবনের অবসানে যেমন মৃত্যু, জীবদ্দশায় তেমনি রোগের আক্রমণ যেন আমাদের ভোগ করতেই হবে। তবে মৃত্যু সম্বন্ধে আমাদের কোন কিছুই করবার নেই, কারণ সেটা নিতান্তই অনিবার্য। কিন্তু চেষ্টা করলে হয়তো রোগকে নিবারণ করা যেতে পারে, হয়তো কখনো কখনো তার আক্রমণ থেকে নিষ্কৃতি পেয়ে যেতে পারি। সহজ বুদ্ধিতে এটা বুঝতে পেরে মানুষ বহুকাল আগের থেকেই রোগের কারণ কোথায়, সে সম্বন্ধে অনুসন্ধান করে এসেছে। আগেকার যুগে মানুষেরা মনে করতো যে, রোগ বুঝি কোন যুক্তিবিহীন অন্ধ দেবতার আক্রোশ। দেবতা যেমন বন্যা আর বজ্রপাত দিয়ে, দুর্ভিক্ষ আর দুর্যোগ দিয়ে মানুষকে আঘাত করে, রোগও বুঝি তেমনি তার একটা অন্যতম উৎপীড়নের অস্ত্র। দেবতাকে যদি কোন উপায়ে প্রসন্ন করতে পারা যায় তাহলেই হয়তো রোগ নিবারণ করতে পারা সম্ভব হবে। এই ধারণা অনুসারে তারা যেমন প্রকৃতির দেবতাকে পূজা করতো, তেমনি রোগের দেবতাকেও পূজা করতো। এর জন্য স্বতন্ত্র পূজারি ছিল, বিপদের সময় সকলে তার কাছেই আগে ছুটে যেতো। কিন্তু তোষামোদ করলেও দেবতা প্রসন্ন হবেন কিনা সে সম্বন্ধে কিছুই নিশ্চয়তা ছিল না। রোগ সম্বন্ধে এবং রোগের দেবতা সম্বন্ধে তাই সকলের মনে দারুণ একটা বিভীষিকা ছিল। সেই বিভীষিকা পুরুষানুক্রমে এখনও পর্যন্ত আমাদের মনে বদ্ধমূল সংস্কারের মতো স্থান পেয়ে এসেছে।

কিন্তু ইতিমধ্যে হয়ে গেল বিজ্ঞানের জন্ম। বিজ্ঞান দেখিয়ে দিলে যে জগতের প্রত্যেক ঘটনার মধ্যেই একটা কার্যকারণের সম্পর্ক আছে, রীতিমত কারণ ব্যতীত কোনো কাজই ঘটতে পারে না। প্রথম প্রথম লোকে বিজ্ঞানকে তেমন আমল দিত না, কিন্তু তার বিচার অভ্রান্ত দেখে ক্রমে ক্রমে সকলেই তার কথা মানতে লাগলো। ক্রমে একদিকে যেমন নানারকম প্রাকৃতিক সত্য আবিষ্কার হ'তে লাগলো, অন্যদিকে তেমনি রোগের কারণ সম্বন্ধেও বৈজ্ঞানিক রীতিতে নানা অনুসন্ধান চলতে লাগলো। প্রত্যেক রোগেরই নিশ্চয় একটা নির্ধারিত রকমের বীজ আছে, এই সন্দেহ নিয়ে কাজ করতে পাস্তুর প্রথমে বর্তমান বীজাণুতত্ত্বের গোড়া পত্তন করলেন। তখন থেকে একটির পর একটি ক'রে রোগের নির্দিষ্ট ধরণের বীজাণুকে আবিষ্কার করা চলতে থাকলো। যে সকল রোগকে হঠাৎ দুর্যোগের মতোই আক্রমণ করতে দেখা যায়, তার অধিকাংশেরই বীজাণু ইতিমধ্যে আবিষ্কৃত হ'য়ে গেছে, অনাবিষ্কৃতকরণের রোগ এখন সংখ্যায় খুবই কম। এই বীজাণুতত্ত্বের কল্যাণে এখন আমরা জানতে পেরেছি যে, কোন্ বিশিষ্ট বীজাণুর দ্বারা কোন্ রোগের সৃষ্টি হয়, আরো আমরা জানতে পেরেছি যে, সেই বীজাণুকে নষ্ট করতে পারলে আমরা নিশ্চয়ই সেই রোগের আক্রমণ থেকে নিষ্কৃতি পেতে পারি। এই কথাটি জানার দ্বারা আমাদের অনেক উপকার হয়েছে তাতে কোনো সন্দেহ নেই, কারণ এই ধারণা অনুসারে কাজ করে আমরা হাতে হাতে অনেক সুফল পেয়েছি। বীজাণু মারবার উপায় আবিষ্কৃত হয়েছে, অনেক ওষুধ বেরিয়েছে, সে সকল একেবারে অব্যর্থ। ইদানীং আবার এমন কতকগুলি ওষুধ পাওয়া গেছে, যেমন সাল্ফা-নামধেয় কয়েক রকমের রাসায়নিক পদার্থ, যেমন এখনকার উচ্চপ্রশংসিত পেনিসিলিন, যা রোগ চিনে সময়মত প্রয়োগ করতে পারলে নিশ্চিত সে রোগ আরোগ্য হয়ে যায়। এই সকল আবিষ্কারের ফলে খুব কম রোগই এখন ভীষণ আকার ধারণ করবার সুযোগ পায়, কারণ প্রথম থেকে প্রয়োগ করতে পারলে শীঘ্রই রোগের জড় মরে গিয়ে, রোগী সুস্থ হ'য়ে ওঠে। শুধু তাই নয়, বীজাণুতত্ত্বের আবিষ্কারের ফলে রোগ সম্বন্ধীয় সকল বিভাগেই অভাবনীয় উন্নতি ঘটেছে। অস্ত্রচিকিৎসা এখন খুবই সার্থক, তার আয়োজন কচিৎ ব্যর্থ হয়, সুতরাং অস্ত্রচিকিৎসা করাতে এখন আর কেউই ভয় পায় না। এদিকে সাধারণ স্বাস্থ্যরক্ষা বিভাগেও যথেষ্ট রকমের কাজ করা সম্ভব হয়েছে। প্রত্যেকটি সংক্রামক রোগের বীজাণু কোথা থেকে আসে আর কেমনভাবে সাধারণের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ে তা অনুধান ক'রে দেখা হচ্ছে, প্রত্যেক দেশে দেশে স্বাস্থ্য বিভাগীয় কর্তৃপক্ষ ঐ সকল রোগের উৎপত্তির কারণগুলিকে সমূলে নষ্ট ক'রে দেবার ব্যবস্থা করছে। যেখানে বীজাণুকে মারা যায় সেখানে তাই করা হচ্ছে, যেখানে তা সম্ভব নয় সেখানে সাধারণকে প্রতিষেধক ইনজেকশন বা টিকা প্রভৃতি দেবার ব্যবস্থা হচ্ছে। সাধারণের স্বাস্থ্যরক্ষার জন্য এই সকল সুবন্দোবস্ত করাতে এখন সংক্রামক রোগের এপিডেমিক বা মড়ক আগেকার চেয়ে অনেক কমে গেছে। এটা হয়তো আমাদের দেশে এখনও তেমন বোঝা যায় না, তার কারণ এখানে প্রতিষেধের প্রচেষ্টা এখনও তেমন ব্যাপক হয়নি, তা ছাড়া সাধারণের মন এই সমস্ত ব্যবস্থাকে গ্রহণ করবার জন্য এখনও তেমন তৈরি হয়নি। কিন্তু অন্যান্য উন্নতিশীল দেশে এর যথেষ্টই সুফল যে ফলেছে তাতে সন্দেহ নেই। আমাদের দেশে এখনও যে সকল রোগের মড়ক লাগে, ঐ সব দেশে সে রোগগুলি আর প্রায় ঘটতেই দেখা যায় না।

যাই হোক, বীজাণুই যে রোগের কারণ সে বিষয়ে কোনো সন্দেহই নেই, আর বীজাণুতত্ত্ব যে সার্থক হয়েছে সে বিষয়েও কোনো সন্দেহ নেই। কিন্তু তবুও একটা দুঃখের কথা এই যে, আমাদের বিভীষিকা এখনও ঘোচেনি, আর অন্ধ বিশ্বাসের প্রবৃত্তিও এখনও ঘোচেনি। এই দুটিতেই আমাদের মহা অনিষ্ট করছে, সত্যকে সামনে পেয়েও আমরা সাদা চোখে তাকে দেখতে পারছি না। আগেকার যুগে যে বিভীষিকা ছিল দেবতার আক্রোশ সম্বন্ধে, এখনকার যুগে সেই বিভীষিকাই দেখা যাচ্ছে বীজাণুর সম্বন্ধে। তখনকার দিনে যে অন্ধবিশ্বাস ছিল দেবতার পূজারির প্রতি, এখনকার দিনে সেই রকম ধরণেরই অন্ধবিশ্বাস দেখা যাচ্ছে বীজাণুতত্ত্বের প্রতি। যেন বীজাণু ছাড়া আমাদের অনিষ্ট ঘটবার হেতু আর দ্বিতীয় কিছুই নেই, বীজাণুতত্ত্বের আশ্রয় নেওয়া ছাড়া রক্ষা পাবার উপায়ও আর দ্বিতীয় কিছু নেই। অন্ধবিশ্বাস মাত্রেরই এই প্রধান দোষ যে, তাতে যদিও আমাদের দুই চক্ষু অন্ধ হ'য়ে থাকে না বটে, কিন্তু তার দ্বারা আমরা ঠিক সেই একচক্ষু হরিণের মতো অবস্থাটি প্রাপ্ত হই। অর্থাৎ তখন আমরা কেবল একটা দিকেই লক্ষ্য রাখি, তা ছাড়া অন্য দিকও যে থাকতে পারে সেটা ধারণাই করিনা।

বীজাণু সত্য, বীজাণুর দ্বারা রোগ জন্মায় তাও সত্য। কিন্তু রোগ সম্বন্ধে এই

একটিমাত্র সত্যই সম্পূর্ণ কথা নয়, আরো অনেক কথা আছে। গাছ যখন জন্মায় তখন তার বীজটাই যে একমাত্র সত্য তা নয়, বীজ ছাড়া আরো একটা বস্তু নিতান্ত প্রয়োজন, সেটা হচ্ছে তার উপযুক্ত ভূমি। গাছ জন্মাতে হ'লে প্রথমেই চাই অনুকূল রকমের ভূমি, অতঃপর চাই বীজ। বীজের চেয়ে জমিটাই এখানে প্রধান, কারণ জমি থাকলে উদ্ভিজ্জ জন্মাবার কোনো অভাব হয় না, পতিত জমিতেও অনেক আগাছা জন্মায়। কোথা থেকে কখন যে কোন জাতের বীজ বাতাসে উড়ে আসে কিম্বা পাখীতে ফেলে দিয়ে যায় তার কোনো ঠিকানাই নেই, কিন্তু জমিকে হতাদরে রাখলেই কিছুদিন পরে দেখা যায় যে, সেখানে বিস্তর আগাছা জন্মে গেছে। আবার জমিকে যদি তেমন যত্ন ক'রে রাখা যায় তা'হলে সেখানে কোনো আগাছা জন্মাতে পারে না, সেখানে উৎকৃষ্ট ফুল-ফলের বাগান তৈরি হ'তে পারে। সুতরাং কোনখানে যে কোন রকমের গাছ জন্মাবে সেটা যদিও সাক্ষাৎসম্বন্ধে নির্ভর করে বিভিন্নরূপ বীজবপনের উপর তাতে কোনো সন্দেহ নেই, কিন্তু তার সার্থকতা সম্পূর্ণই নির্ভর করে জমির অবস্থার উপর। যেমন জমি হবে তার মতোই সেখানে গাছ জন্মানো চলবে, অনুপযুক্ত ক্ষেত্রে উৎকৃষ্ট বীজ পড়লেও সে বীজ ব্যর্থ হয়ে যাবে। শুধু তাই নয়, উপযুক্ত ক্ষেত্রে বীজবপন হবার পরেও তার অনেক তোয়াজ করা চাই, তাতে জল দেওয়া চাই, গাছের উপযোগী সার দেওয়া চাই, গরু ছাগলের অত্যাচার থেকে তাকে বাঁচিয়ে রাখা চাই, তবেই গাছটি জন্মাবে। অতএব ক্ষেত্রে বীজ পড়লেই সেখানে গাছ হয় না, তৎপক্ষে বিস্তর অন্তরায় ঘটবার অবকাশ আছে।

আমরা বীজাণুর সম্বন্ধে বলতে গিয়ে যে উপমা প্রয়োগ করছি সেটা কেবল নিছক উপমাই নয়, বস্তুত রোগ জন্মাবার ইতিহাস ঠিক গাছ জন্মাবার ইতিহাসেরই অনুরূপ, অর্থাৎ বীজ যেমনভাবে জমিতে উপ্ত হয় রোগের বীজাণুরাও ঠিক তেমনিভাবে আমাদের শরীরে উপ্ত হয়। প্রকৃতপক্ষে অধিকাংশ রোগের বীজাণুই ভিন্ন ভিন্ন রকমের নিম্নস্তরের উদ্ভিজ্জ জাতীয় পদার্থ। তার মধ্যে আগাছাও আছে, পরগাছাও আছে, আবার শৈপশৈবাল প্রভৃতির মতো জিনিসও আছে। আমাদের দৃশ্যজগতের মধ্যে বীজাণুরা এক অতি বিস্তৃত অদৃশ্য জগৎ নির্মাণ ক'রে অধিষ্ঠান করছে, সেখানে তাদের সংখ্যাও যেমন অপরিমেয়, তাদের স্বাতন্ত্র্যও তেমনি অপরিসীম। আমাদের গণিতশাস্ত্রে যে সংখ্যাগণনার রাশি নির্দেশ করা আছে তার দ্বারা ওদের সংখ্যার গণনাই করা যায় না, কারণ ওরা ক্ষণে ক্ষণে আপনা থেকেই বহুধা বিভক্ত হয়ে সংখ্যায় অত্যন্তই বেড়ে যায়, দণ্ডে দণ্ডে এক থেকে কোটিতে রূপান্তরিত হয়। ওরা বাতাসে ওড়ে, ধুলোয় মেশে, জলে ভাসে, গাছে পাতায় খাদ্যে শস্যে পথে প্রান্তরে ঘরে বাইরে সর্বত্র ভূরি ভূরি পরিমাণে পরিব্যাপ্ত হয়ে থাকে। ওরা গাছের বীজের মতোই অন্তর্লীন প্রাণযুক্ত সামগ্রী, বহুকাল পর্যন্ত প্রতিকূল অবস্থায় পড়ে থাকলেও ভবিষ্যতে কখনো উপযুক্ত ক্ষেত্র পেলে অঙ্কুরিত হবার সম্ভাবনা নিয়ে জীবন্ত থাকে। জল বাতাস ধুলো মাটি খাদ্য ও নানাবিধ সংস্পর্শের দ্বারা সকল রকম বীজাণুরই আমাদের শরীরের মধ্যে প্রবেশের সম্ভাবনা আছে, কিন্তু তাতে কিছুই ক্ষতি হয় না। যারা রোগবীজাণু তাদেরও প্রত্যেক জাতের পক্ষে নির্দিষ্ট রকমের ক্ষেত্র আছে, সেই নির্দিষ্ট ক্ষেত্রটি ভিন্ন অন্য কোথাও তারা প্রসারলাভ করে না। কতক বীজাণুর ক্ষেত্র কেবল মানুষের শরীর, কতক বীজাণুর ক্ষেত্র মানুষ ছাড়া অন্যান্য জীবের শরীর। আবার মানুষের মধ্যেও কতক বীজাণু কেবল শিশুদের শরীরেই সুসার পায়, কতক পায় বয়স্থদের শরীরে। মানুষের শরীরের বীজাণু মাত্রেই যে অনিষ্টকারী আর রোগ প্রসবকারী তাও নয়, এর মধ্যে এমন অনেক রকমের বীজাণু আছে যারা আমাদের শরীরের পক্ষে পরম উপকারী, যারা আমাদের শরীরের মধ্যে বাস করে অন্যান্য অনিষ্টকারীদের নষ্ট করে,

আর আমাদের শরীরকে সুস্থ রাখে। সুতরাং বীজাণু মাত্রেই যে আমাদের শত্রু তা নয়,—আবার বীজাণুর মধ্যে যারা শত্রু-জাতীয় তারাও যে শরীরের মধ্যে প্রবেশ-লাভ করলেই অমনি শত্রুতার আচরণের দ্বারা রোগের সৃষ্টি করে দেবে তাও নয়। অনেক রকম মারাত্মক রোগের বীজাণু আমাদের সুস্থ শরীরে ঢুকে বসবাস করতে থাকে, অথচ তারা আমাদের কোনোই ক্ষতি করে না, তাদের অস্তিত্বের কথা আমরা জানতেই পারি না। পরীক্ষা ক'রে অনেক লোকের গলার মধ্যে ডিফ্‌থীরিয়া বা নিউ-মোনিয়ার বীজাণু পাওয়া গেছে, এমনকি হয়তো যক্ষ্মা রোগের বীজাণুও অনেকের দেহের মধ্যে মিলে গেছে, অথচ তাদের জীবনে কখনো ঐ সকল রোগ জন্মায় নি। কারো কারো পেটে টাইফয়েড ও কলেরার বীজাণু পাওয়া গেছে, অথচ তাদের ঐ সকল রোগ আদৌ নেই। এই সকল লোককে আমরা বলি কেরিয়ার (carriers), অর্থাৎ এদের যদিও নিজেদের কোনো রোগ নেই, কিন্তু এদের সংস্পর্শে এসে বীজাণু সংক্রমিত হ'য়ে অন্য লোকের রোগ জন্মাতে পারে। সেটা নির্ভর করে তাদের শরীরের অবস্থার উপর, কেমনভাবে তারা শরীরকে রক্ষা করছে তার উপর। সুরক্ষিত বাগানের মধ্যেও যে একেবারেই কোনো ঘাস কিংবা আগাছা নেই এমন কথা বলা চলে না, খুঁজে দেখলে দু'চারটে মিলেই—কিন্তু যত্নের গুণে সেগুলো বাড়তেও পারে না আর তেমন নজরেও পড়ে না। কিন্তু পাশের পতিত জমিতে যদি সেই আগাছার বীজ একবার গিয়ে পড়ে তাহ'লে তার রক্ষা নেই, তার থেকে বনজঙ্গল হ'য়ে সমস্ত জমিটা ছেয়ে যাবে। এখানেও ঠিক সেই কথা, অর্থাৎ যত্নরক্ষিত শরীরে যে বীজাণু সংখ্যাতেও বেশি বাড়ে না কিংবা রোগেরও সৃষ্টি করে না, অযত্নরক্ষিত শরীরে সেই বীজাণুই সংখ্যায় অনেক বেড়ে যাবে আর রোগের সৃষ্টি করবে।

রোগের আতঙ্কে আমরা বীজাণুর সম্বন্ধে নানারূপ বিভীষিকার কল্পনা করি, মনে ভাবি যে, ওরা বুঝি সর্বদাই আমাদের জন্য ওৎ পেতে বসে আছে, সুবিধা পেলেই কোথা থেকে এক লাফে এসে আক্রমণ করবে। তাই আমরা সর্বদা খুব ভয়ে ভয়ে থাকি আর শুচিবাইগ্রস্তের মতো আচরণ করি, কারো কোনো রোগ হয়েছে শুনলে পারতপক্ষে তাকে ছুঁই না, যেন হাত দিয়ে স্পর্শ করলেই রোগটা আমাদের হাতে লেগে যাবে। এই সকল আচরণ আমাদের ভ্রান্তিপূর্ণ ধারণার ফল। যেন বীজাণুরা অতি হিংস্র প্রাণী,—কিন্তু বাস্তবিক তা কিছুই নয়। বীজাণুরা অতি নিরীহ, অধিকাংশই নিশ্চল উদ্ভিজ্জ জাতীয়, কোনো কোনোটি হয়তো অতি নিম্নস্তরের প্রাণীজগতের অন্তর্গত। ওদের কোনো পর্যটন শক্তি নেই, কোনো ইচ্ছা-



শক্তি নেই, কোনো আক্রমণস্পৃহাও নেই। ওরা কেবল অপর বস্তুর মধ্যস্থতায় আমাদের শরীরের মধ্যে নীত হয়, নিজের চেষ্টায় নয়। প্রবেশ করবামাত্রই যে ওরা সক্রিয় হ'য়ে উঠতে পরে তাও নয়, অধিকাংশ স্থলে শরীরের মধ্যে ঢুকে তারা নষ্টই হয়ে যায়। আমাদের শরীরের রসে একটা স্বাভাবিক প্রতিরোধশক্তি আছে, রক্তস্রোতের মধ্যে বীজাণুখাদক সান্ত্রীরা (phagocytes) অনবরত ঘুরে বেড়াচ্ছে, অনিষ্টকারী জাতের বীজাণু দেখলেই তারা তাকে তৎক্ষণাৎ নষ্ট ক'রে ফেলে। সুতরাং শরীর যদি সুস্থ থাকে আর বীজাণুর প্রবেশ যদি খুব অধিক সংখ্যায় না হয় তাহ'লে আমাদের ভয় করবার কিছুই নেই। কিন্তু ঐ ভয়টাই আমাদের অতিমাত্রায় উদ্বিগ্ন করে তোলে। তাই দেখা যায় যে, একটুতেই আমরা ব্যতিব্যস্ত হয়ে উঠি, একটু কোথাও কেটেছিঁড়ে গেলে তৎক্ষণাৎ প্রাণপণে সেখানে টিঞ্চার আইডিন লাগাতে থাকি। এই বিদ্যাটা আমাদের ডাক্তারদের কাছেই শেখা, আর অল্প একটু আইডিন লাগিয়ে ক্ষতস্থানে ব্যাণ্ডেজ বেঁধে রাখলে তাতে ভালই হয় সন্দেহ নেই, কিন্তু উদ্বেগের মাথায় এই বিদ্যাটুকুও তখন অতিবিদ্যায় পরিণত হয়। অনেক স্থলে তাই দেখা যায় যে, এতই বেশি টিঞ্চার আইডিন লাগানো হয়েছে যে, সেখানে চামড়া পুড়ে গিয়ে একেবারে ঘা হয়ে গেছে, তখন সেই চিকিৎসারই আবার চিকিৎসা করবার প্রয়োজন হয়। প্রসঙ্গক্রমে বলে রাখি যে, টিঞ্চার আইডিন আমাদের দেহের সূক্ষ্ম তন্তুগুলিকে নষ্ট ক'রে দেয়, সুতরাং আজকালকার সার্জারির ক্ষেত্রে এর ব্যবহার প্রায় উঠেই গেছে। এর চেয়ে আরো অনেক উৎকৃষ্ট বীজাণুমার অথচ শরীরবস্তুর অনপকারী ওষুধ আবিষ্কৃত হয়েছে, সেইগুলোই এখন ব্যবহৃত হয়। কিন্তু সাধারণের মাথায় যে শিক্ষা একবার ঢুকেছে তাতেই এখনও তাদের অন্ধবিশ্বাস লেগে আছে, তার আর কোনো সংশোধন নেই।

শিক্ষিত সাধারণের মধ্যে আরো একটা আতঙ্ক দেখা যায় খাদ্যাদির সম্বন্ধে। খাদ্যাদিকে বীজাণুমুক্ত করার সম্বন্ধে যে শিক্ষাটুকু পাওয়া যায় সেটা সব চেয়ে বেশি ক'রে প্রযুক্ত হ'তে থাকে তাদের আপন ঘরের শিশুদের সম্বন্ধে। পাছে পেটের মধ্যে কোনো বীজাণু ঢুকে পড়ে, তাই উত্তমরূপে অগ্নিসিদ্ধ না ক'রে তাদের কোনো জিনিস খাওয়ানো হয় না। এর ফলে স্বাভাবিক দুধকেও এতই অধিক জ্বাল দেওয়া হয় যে তাতে তার অনেক খাদ্যগুণ নষ্ট হ'য়ে যায়। তাছাড়া স্বাভাবিক দুধের চেয়ে টিনে আঁটা কৃত্রিম দুধই অধিকাংশস্থলে খাওয়ানো হয়, কারণ সেটা নির্বিঘ্নে দেওয়া যেতে পারে, অন্ততপক্ষে তাতে বীজাণুর ভয় নেই। এ ছাড়া তাদের ধূলোবালি ঘাঁটতে দেওয়া হয় না, ফোটানো জল ছাড়া স্বাভাবিক জলে স্নান পর্যন্ত করতে দেওয়া হয় না, বাইরের কারো সংস্পর্শে যেতে দেওয়া হয় না, বাইরের আলো বাতাস লাগতে দেওয়া হয় না, পাছে কোনো অনিষ্ট হয়। এমনিভাবে সকল দিক দিয়ে তাদের এতই পুতুপুতু ক'রে বাঁচিয়ে রাখা হয় যে, তারা বীজাণুকে প্রতিরোধ করবার স্বাভাবিক শক্তিটুকুও অর্জন করবার সুযোগ পায় না। অবশেষে যখন তাদের শরীরে শত্রুজাতীয় বীজাণুরা প্রবেশ করবার সুযোগ পায় তখন তারা উপযুক্ত উর্বরা ভূমি পেয়ে সেখানে পরিপূর্ণরূপে প্রসারলাভ করতে থাকে, আর একটির পর একটি রোগের সৃষ্টি করতে থাকে। শিক্ষিত ভদ্রলোকদের ছেলেমেয়েরা যে কেন এত রোগপ্রবণ ও ক্ষীণজীবী হয় তার একটা অন্যতম কারণই এই। এটা তারা ভুলে যায় যে, অতি সাবধানতার দ্বারা কাউকে চিরকাল আগ্‌লে রাখা যায় না। বরং তাদের স্বাভাবিক পৃথিবীর সংস্পর্শে আসবার স্বাভাবিক সুযোগটুকু দেওয়া উচিত, তাতে তারা রোগ বীজাণুদের সাক্ষাৎ সংস্পর্শে এসে এবং হয়তো কখনো অল্পসল্প রোগে ভুগে তাদের বিরুদ্ধে প্রতিরোধশক্তিটা অর্জন ক'রে নিতে পারে, এবং ভবিষ্যতে মারাত্মক রোগসংঘটনের হাত থেকে নিষ্কৃতি পেতে পারে। এও একটা বৈজ্ঞানিক সত্য, তাই

প্রায়ই দেখা যায়, যে ছেলে বয়সে যে-রোগে আমরা ভুগেছি, বড়ো বয়সে সে রোগ প্রায়ই আর আমাদের ধরে না। এই সত্যের উপরে ভিত্তি ক'রেই বসন্ত কলেরা টাইফয়েড প্রভৃতি রোগের বীজাণু থেকে ভ্যাক্সিন প্রস্তুত ক'রে তার ইনজেকশন দিয়ে কৃত্রিম উপায়ে রোগের বিষ দিয়ে রোগ প্রতিরোধ করবার পদ্ধতি প্রচলিত হয়েছে।

আরো একটা কথা এই যে, বীজাণুদের মধ্যে অপকারীর দলও আছে, আবার উপকারীর দলও আছে। আমাদের পেটের মধ্যে যে সুবৃহৎ অন্ত্রনালী রয়েছে তার মধ্যে যে অসংখ্য বীজাণু নিত্যই বসবাস করছে তারা অধিকাংশই উপকারীর দল (intestinal flora)। তাদের কাজই এই যে, খাদ্যের দূষিত দ্রব্য ও দূষিত বীজাণুর বিরুদ্ধে তারা সংগ্রাম করে এবং সেই সংগ্রামের ফলে তারা অনেক বীজাণুকে মেরে এবং নিজেরাও মরে মলের সঙ্গে ভূরিভূরি পরিমাণে নির্গত হ'য়ে যায়। স্তন্যপায়ী শিশুদের অন্ত্রে এই সকল বীজাণু থাকে না, যখন থেকে তারা বাইরের খাদ্য খেতে শুরু করে তখন থেকেই এরা সেখানে বসবাস করতে শুরু করে। খাদ্য ও জলের মধ্যস্থতাতেই এরা আমাদের অন্ত্রে প্রবেশাধিকার পায়। অতএব সম্পূর্ণ বীজাণুমুক্ত খাদ্যই যে আমাদের পক্ষে আদর্শ খাদ্য তা নয়, তাই খেয়ে জীবনধারণ করতে থাকলে আমরা উপকারী দলের বীজাণুদের সাহায্যটুকু থেকে চিরকাল বঞ্চিত হ'য়েই থাকবো।

একেই তো বীজাণু সম্পূর্ণ অদৃশ্য বস্তু, তার উপরে সংখ্যায় অতি অসংখ্য। সুতরাং তাদের সংস্পর্শ সম্পূর্ণরূপে বাঁচিয়ে চলবার কোনোই পথ নেই। সর্বদা সর্বত্রই তাদের সংস্পর্শের মধ্যে আমাদের চলাফেরা করতে হয়। কেবল অপারেশনের সময় সার্জনেরা বহু আয়োজন ক'রেও বহুরকম আচ্ছাদনাদি ব্যবহার ক'রে তাঁদের রোগীদের কিছুকালের জন্য বাইরের বীজাণু সংস্পর্শ থেকে বাঁচিয়ে রাখতে পারেন। সকল সময়ের জন্য এরূপ আয়োজন ক'রে বেঁচে থাকা কারো পক্ষেই সম্ভব নয়, এমন কি অতি সাবধানী সার্জনেরা নিজেরাও তা পারেন না, আর সে বিষয়ে চেষ্টাও করেন না। বীজাণুকে পরিহার ক'রে এই পৃথিবীতে বাস করা অসম্ভব, আর তার প্রয়োজনও নেই। শরীরটা যদি হয় আমাদের প্রাণের দুর্গ, আর বীজাণুদের যদি মনে করি তার আক্রমণকারী সৈন্যদল, তবু দেখা যাবে যে, তারা সংখ্যায় এত অধিক যে কিছুতেই আমরা তাদের প্রতিরোধ করতে পারবো না। তার চেয়ে বরং তাদের সঙ্গে সন্ধি ক'রে ফেলাই ভালো। দুর্গে এসে প্রবেশ করুক তাতে ক্ষতি নেই, কেবল দেখতে হবে যেন তারা সেখানে কোনো অধিকার স্থাপন না করে। সুতরাং তাদের অনিষ্টকারী শক্তির চেয়ে আমাদের জীবনীশক্তিকে বলবান রাখতে হবে। যখন নিতান্তই তা সম্ভব হবে না, তখন অবশ্য তারা খানিক অধিকার নিয়ে রোগের সৃষ্টি করবে,—তখন বাইরের থেকে যাতে সাহায্য এনে তাদের মারতে পারা যায় তারই জন্য এতরকম ওষুধের আবিষ্কার হয়েছে। কিন্তু সেই সকল ওষুধের ক্রিয়াকে সার্থক করবার জন্যও শরীরে কিছু শক্তি অবশিষ্ট থাকা চাই। শরীরের স্বাভাবিক শক্তির সঙ্গে যুক্ত হ'য়ে তবেই ওষুধের শক্তি ক্রিয়া করতে পারে। নতুবা যে ওষুধ যতই অব্যর্থ হোক, নিশ্চেষ্ট ও নির্বল শরীরের মধ্যে গিয়ে একা একা সে কিছুই করতে পারে না। আমরা তাই দেখতে পাই যে, ম্যালেরিয়াতেও কুইনিন ব্যর্থ হ'য়ে মাঝে মাঝে রোগী মারা যায়, নিউমোনিয়াতেও পেনিসিলিন ব্যর্থ হ'তে দেখা যায়। ওষুধের ফলাফল সমস্তই নির্ভর করে রোগীর তখনকার অবশিষ্ট জীবনীশক্তিটুকুর উপর।

পৃথিবীতে বীজাণু আছে বলেই যে আমাদের রোগে ভুগতে হবে এমন কোনো কথা নেই। আসলে রোগপ্রতিরোধ সম্বন্ধে বীজাণুপ্রতিরোধই সব চেয়ে বড়ো কথা নয়। অবশ্য যতটা সম্ভব বীজাণুসংক্রমণ নিবারণের চেষ্টাও করা দরকার, কারণ অধিক সংখ্যায় সংক্রমিত হ'তে থাকলে কেউই তখন রোগের হাত থেকে নিষ্কৃতি পেতে পারে না। তার জন্য সর্বতোভাবে বীজাণুবাহনদের ধ্বংস করতে পারলেই অনেক সুফল পাওয়া যায়,—যেমন মশা না থাকলেই ম্যালেরিয়া দূর হ'য়ে যায়, ইঁদুর না থাকলেই প্লেগ দূর হ'য়ে যায় ইত্যাদি। কিন্তু এমন কথা সকল রোগের পক্ষেই বলা চলে না। প্রত্যেক রোগের নিবারণ সম্বন্ধে আলাদা রকমের ব্যবস্থা করতে হয়। সমষ্টিগতভাবে রোগনিবারণের জন্য এই সকল উপায় অবলম্বন করতে স্বাস্থ্যবিভাগীয় কর্তৃপক্ষের উপরেই ভার দিতে হয়। কিন্তু তাতেও তেমন ফল হবে না যদি আমরা ব্যক্তিগতভাবে নিজেদের স্বাস্থ্যকে রক্ষা না করি।

মোট কথা শরীরকে সুরক্ষিতভাবে রাখলেই আমরা রোগশূন্য হ'য়ে বেঁচে থাকতে পারি। কিন্তু তার উপায় কী? উপায় খুবই সহজ। শুধুই সহজ ও স্বাভাবিক নিয়মে জীবনধারণ করা, প্রকৃতির বিরুদ্ধে না যাওয়া, আর দৈনন্দিন জীবনযাত্রার মধ্যে কোনো কৃত্রিমতাকে ঢুকতে না দেওয়া। এটা শুনতে যত সহজ মনে হচ্ছে বাস্তবিক কিন্তু তত সহজ নয়। আগেকার যুগে যখন উপকরণের কোনো বাহুল্য ছিল না, মন নিয়ে বিলাস করবার কোনো অবসর ছিল না, যখন নিছক প্রাণধারণের জন্যই মানুষের সমস্ত শক্তিকে নিয়োগ করতে হতো, তখন হয়তো স্বাভাবিক জীবনযাত্রা ছিল সহজ। তখন প্রত্যেক মানুষই শরীর দিয়ে খেটে খেতো, ক্লান্ত হ'লে বিশ্রাম নিতো, রাত্রি হ'লে ঘুমোতো। এখন এই সহজ ব্যবস্থারও অনেক ব্যতিক্রম ঘটে গেছে। এখন বাঁচার চেয়ে বিলাসই প্রধান, স্বাস্থ্যের চেয়ে সম্পদই প্রধান,

স্বাভাবিকের চেয়ে কৃত্রিমতাই প্রধান। এখন সহজভাবে থাকাই সকলের চেয়ে কঠিন।

উদাহরণ স্বরূপে এখনকার যে-কোনো একজন ভদ্রলোকের জীবনযাত্রার ধারা পর্যালোচনা ক'রে দেখলেই একথা বোঝা যাবে। কম্বুলেটোলার কালীকৃষ্ণবাবুর পঁয়তাল্লিশ বছর বয়স হয়েছে, তিনি মার্চেণ্ট অফিসে চাকরি করেন। আগে তিনি প্রত্যহ চার বাণ্ডিল বিড়ি খেতেন, কিন্তু এখন বিড়ির দাম অনেক বেড়ে গেছে, তবু তিন বাণ্ডিল না হ'লে তাঁর চলেই না, বিড়ি মুখে না দিলে তিনি কোনো কাজ করতে পারেন না। তার সঙ্গে অবশ্য পান-দোক্তাও চিবানো চাই। এ ছাড়া প্রত্যহ তাঁর সাত কাপ্ চা খাওয়া চাই। সকালে দু কাপ্ খেতেই হয়, নতুবা দাস্ত পরিষ্কার হয় না। আফিসে হাড়ভাঙা খাটুনি, সেখানে দু কাপ্ খেতেই হয়, আর তার জন্য কিছু পয়সা লাগে না। বিকেলে বাড়িতে এসে দু কাপ্, কারণ এক কাপে তখন শানায় না। তারপর তাসের আড্ডায় গিয়ে অন্তত এক কাপ্, এ-ছাড়া মাঝে মাঝে মদ্যপান-টুকুও আছে, সেটা অবশ্য খুব গোপনে আর কালেভদ্রে, মাসের মধ্যে বড়জোর দু'তিনবার। ভদ্রলোক আবার একটু পেটুকও আছেন, হোটেলের রান্না মাংসের কারি খেতে খুব ভালোবাসেন। আর কম্বুলেটোলার মোড়ের দোকানের সন্দেশটা খুব পছন্দ করেন, মাঝে মাঝে নিজের জন্যে আলাদা ক'রে এক আধসের কিনে আনেন। মাসকাবারে যেদিন অফিসে খুব বেশি কাজ পড়ে যায় সে রাত্রে সেখানেই থাকেন, বাড়ি ফিরতে পারেন না। ভদ্রলোকের মাথায় ইতিমধ্যেই টাক পড়ে গেছে, কয়েকটা দাঁত পড়ে গেছে, হাঁপিয়ে কথা বলেন, পেটের গণ্ডগোল আছে, মাঝে মাঝে বুকে একটা ব্যথা ওঠে। এই সকল কষ্ট নিবারণের জন্য তাঁকে নিত্য নানারকমের ওষুধ খেতে হয়, ব্যথার জন্য অ্যাস্‌পিরিন, হাঁপের জন্য এফিড্রিন, হজমের জন্য সোডা, পেট পরিষ্কারের জন্য হরেক রকমের জোলাপ, আরো কত কী। ডাক্তার বলে ওঁর সমস্ত বদ্‌অভ্যাসগুলিকে ছেড়ে দিতে, কেবল স্বাভাবিক খাদ্য খেয়ে প্রাণধারণের অভ্যাস করতে। তিনি তাই ডাক্তারের উপর ভারী বিরক্ত হন, বলেন যে সবই যদি ছেড়ে দেবো তাহ'লে বেঁচে থেকেই বা লাভ কী। আর তোমার ওষুধের গুণেই বা কী হলো? ডাক্তারের ওষুধ তিনি অনেক খান বটে, কিন্তু উপদেশগুলো মোটেই গ্রাহ্য করেন না। এই ভদ্রলোকের হয়তো এখনো কিছু জীবনীশক্তি অবশিষ্ট আছে, কিন্তু আর পাঁচ বছর পরে কতটুকু থাকবে? তখন যদি কোনো মারাত্মক রোগের বীজাণু তাঁকে আক্রমণ করে তাহ'লে যতই উৎকৃষ্ট ওষুধ প্রয়োগ করা হোক, তাঁকে মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা করতে পারবে কী? এ কিন্তু খুব অসাধারণ উদাহরণ নয়, আমাদের সকলেরই দৈনিক অভ্যাসের মধ্যে এমন অনেক কৃত্রিম জিনিস ঢুকে গেছে যা জীবনধারণের পক্ষে নিতান্তই অপ্রয়োজনীয় ও অনিষ্টকারী। সেগুলো ছাড়বার যে কোনোই উপায় নেই, এমন কথা বলা চলে না, কিন্তু তার জন্য রীতিমত চেষ্টার দরকার।

স্বাভাবিকভাবে জীবনযাত্রা করা আমাদের নতুন করে শেখা দরকার, অনিষ্টের অভ্যাসকে বর্জন করে ইষ্টের অভ্যাসকে সাধারণের মধ্যে প্রচলিত করা দরকার। হঠাৎ সহজ হওয়া অবশ্য অনেকের পক্ষেই সহজ নয়, কিন্তু তাতে তাদের কোন অপরাধ নেই, তারা চিরদিন বিকৃতভাবে চলতেই অভ্যস্ত হয়েছে। এখন তাদের নতুন করে উচিত রকমের জীবনযাত্রার অভ্যাসটুকু ধরিয়ে দেওয়া বিজ্ঞানের কর্তব্য। যুক্তি প্রমাণের দ্বারা বিজ্ঞানেরই দেখিয়ে দেওয়া উচিত যে, রোগ মাত্রই অস্বাভাবিক জীবন-যাত্রার ফল, আর শরীরকে নীরোগ রাখতে হলে অবিচলিতভাবে স্বাভাবিক নিয়মগুলি মেনে চলা ছাড়া দ্বিতীয় কোন পন্থা নেই। বীজাণুর দ্বারাই রোগের সৃষ্টি হয় একথা সত্য, কিন্তু আমাদের সুস্থ শরীর বীজাণুর চেয়েও অধিক বলবান। এই কথাটাই বিজ্ঞানের দ্বারা সাধারণের মধ্যে যথাযথভাবে প্রচার হওয়া দরকার। এখন বিজ্ঞান দিনে দিনে সম্পূর্ণতর হতে চলেছে। বীজাণুকে নাশ করবার এখন বহু রকমের ওষুধ আবিষ্কৃত হয়ে গেছে। সম্প্রতি পেনিসিলিনের আবিষ্কারের পর থেকে চিকিৎসা জগতে আবার ছত্রাকের যুগ এসে গেছে। শোনা যাচ্ছে নাকি এমন ছত্রাক আবিষ্কৃত হয়েছে যা যক্ষ্মা বীজাণুকে নষ্ট করতে পারে। সুতরাং বীজাণুকে ভয় করবার আর কোনই হেতু নেই। এখন সবচেয়ে প্রধান কথা বীজাণু নয়, প্রধান কথা আপন আপন জীবনীশক্তিকে অক্ষুণ্ণ রাখা।

ট্রামে-বাসে

সিমলা সম্মেলন দুই সপ্তাহের জন্য স্থগিত আছে সুতরাং ইহার ভবিষ্যৎ সাফল্য সম্বন্ধে মতামত প্রকাশ করা সহজ নয়। ইতিমধ্যে সিমলায় অনেকগুলি টুকি-টাকি সংবাদ আমরা পাঠ করিলাম, আপাতত এইগুলিই আমাদের আলোচ্য বিষয়। শুনিলাম পণ্ডিত নেহরু বড়লাটের সঙ্গে একশত পঞ্চাশ মিনিট পর্যন্ত আলাপ আলোচনা করিয়াছেন। এই সঙ্গে সঙ্গেই একটি অসমর্থিত সংবাদে শুনিলাম কায়েদে আজম নাকি বড়লাটের নিকট পুনরালোচনার জন্য আরও দশটি মিনিটের দাবী জানাইয়াছেন, কেননা জিন্না সাহেবকে আলোচনার জন্য মাত্র একশত চল্লিশ মিনিট সময় দেওয়া হইয়াছিল।

* * * *

দ্বিতীয় দফায় শুনিলাম পণ্ডিতজী নাকি অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন যে, কংগ্রেসীরা সিমলাতে তামাসা দেখিতে আসেন নাই। অথচ সম্মেলন স্থগিতের পূর্ব পর্যন্ত মুসলিম লীগীয়দের কার্যকলাপের বিবরণ আমরা যতটা পাইয়াছি, তাহাতে আমাদের ধারণা কিন্তু হইয়াছিল সম্পূর্ণ বিপরীত!

* * * *

লাট সাহেবের গদিটি কোন ব্রাহ্মণকে দান করিবার প্রস্তাব আসিয়াছে। এই সংবাদ পাঠ করিয়া ডাঃ আম্বেদকর নাকি বলিয়াছেন যে, তাহা হইলেই দেশের আদ্যশ্রাদ্ধের কাজটা যথারীতি সম্পন্ন হয়। সংবাদটি অবশ্য অসমর্থিত।

* * * *

জনৈক জ্যোতিষী রাষ্ট্রপতিকে এক পত্রে নাকি জানাইয়াছেন যে, তাঁহার রাশি-নক্ষত্র বর্তমানে ঊর্ধ্বগামী এবং তাঁহার ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল। পর্বতও যদি তাহার উপর পতিত হয়, তাহা হইলে তাহা সামান্য কীটের মতই অনুভূত হইবে! পত্র পাইয়া রাষ্ট্রপতি নাকি নির্ভয়ে সিমলা শৈলে ভ্রমণ করিয়া বেড়াইতেছেন। কিন্তু হিন্দু জ্যোতিষীর গণনায় বিশ্বাস করায় কংগ্রেস একমাত্র হিন্দুদেরই প্রতিষ্ঠান প্রমাণিত হইল—এই প্রচার করিয়া বেড়াইতেছেন লীগপন্থীরা। অবশ্য এই সংবাদটাও অসমর্থিত!

* * * *

বিলাতে নির্বাচনী প্রচারে এবার গর্দভ ব্যবহার করা হইতেছে। একটি গর্দভের গায়ে লেবেল মারিয়া লেখা হইয়াছে—"আমি রক্ষণশীলদের প্রতিশ্রুতিতে বিশ্বাস করি!" ভারতে অনুরূপ ব্যবস্থা অবলম্বিত হইলে গর্দভকুল কণ্ট্রোলের আওতায় পড়িত; মা শীতলাকে অতঃপর ভীড় ঠেলিয়া ট্রামে চড়িতে হইত এবং ধোপা-ধর্মঘট হইয়া উঠিত অনিবার্য। ডি এল রায়ের ভুল,—বিলাত দেশটা নিশ্চয় মাটির নয়!

* * * *

নির্বাচনী বক্তৃতায় আমেরী সাহেব তাঁর দোসর সম্বন্ধে গদগদ হইয়া বলিয়াছেন,—"Mr. Churchill had a first class team." কিন্তু ইহারা জল-কাদায় ভাল খেলিতে পারিবেন না আশংকা করিয়াই শ্রমিকদল নূতন করিয়া "টিম্" সংগঠনে মন দিয়াছেন। শ্রমিকদল জয়ী হইলে ভবিষ্যতে তাঁরা একবার ভারতের জল-কাদায় আই এফ এ খেলিয়া যাইবেন আমরা এই



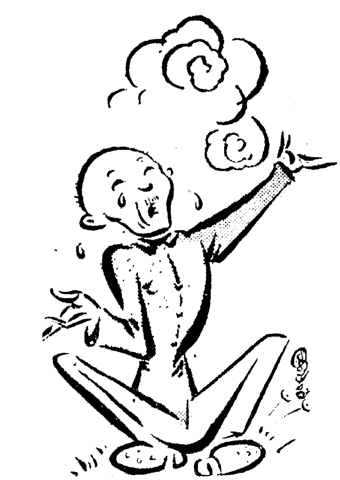
আশা করিতেছি। অবশ্য তাঁদের খেলা দেখার সৌভাগ্য হইবে কি না বলা শক্ত, কেননা টিকিট সংগ্রহের প্রশ্ন তখনও হয়ত থাকিয়া যাইবে। কলিকাতাতে স্টেডিয়াম বোধ হয় কোন গবর্ণমেণ্টই সমর্থন করিবেন না!

* * * *

ট্রামে-বাসের কোন কোন পুরুষ যাত্রী ভীড়ের সুযোগ গ্রহণ করিয়া মহিলাদের "অঙ্গ স্পর্শ-সুখ অনুভব" করেন বলিয়া জনৈকা মহিলা একটি অভিযোগ প্রকাশ করিয়াছেন। আমরা যাঁরা কোন অবস্থাতেই লজ্জা অনুভব করি না সেই আমরাও এই অভিযোগ শুনিয়া বিস্ময়ে হতবাক্ হইয়া গিয়াছি। কিন্তু আমরা "ভীড়-প্রেমিক হইতে সাবধান থাক" (অর্থাৎ পকেটমার হইতে সাবধান থাক"র অনুরূপ) এই ধরণের একটি বিজ্ঞাপন দিতে ট্রাম কোম্পানীকে অনুরোধ করা ছাড়া আর কিছুই করিবার বা বলিবার খুঁজিয়া পাইলাম না। সত্যই প্রেমের কি বিচিত্র গতি!

* * * *

প্রসংগত মাদাম চিয়াং কাইশেকের সংবাদটা মনে পড়িয়া গেল। "Domestic Complications"এর অজুহাতে তিনিও নাকি আর দেশে ফিরিবেন না বলিয়া অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন। এই মেঘ-মেদুর আষাঢ়ের দিনে শ্রীযুক্ত কাইশেকের কি নূতন করিয়া মেঘ-



দূতের সাহায্য নেওয়া ছাড়া আর কোন পথই থাকিবে না?

* * * *

ব্লাডব্যাংকের মত এই বারে নাকি "স্কীন ব্যাংকের" ব্যবস্থা হইতেছে। বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার করিয়াছেন যে, মৃত ব্যক্তির চর্ম নাকি জীবিত ব্যক্তির গায়ে জুড়িয়া দেওয়া সম্ভব হইবে। কিন্তু কৃষ্ণকায়ের চর্ম শ্বেত-কায়ের গায়ে লাগানো যাইবে কি না কিম্বা

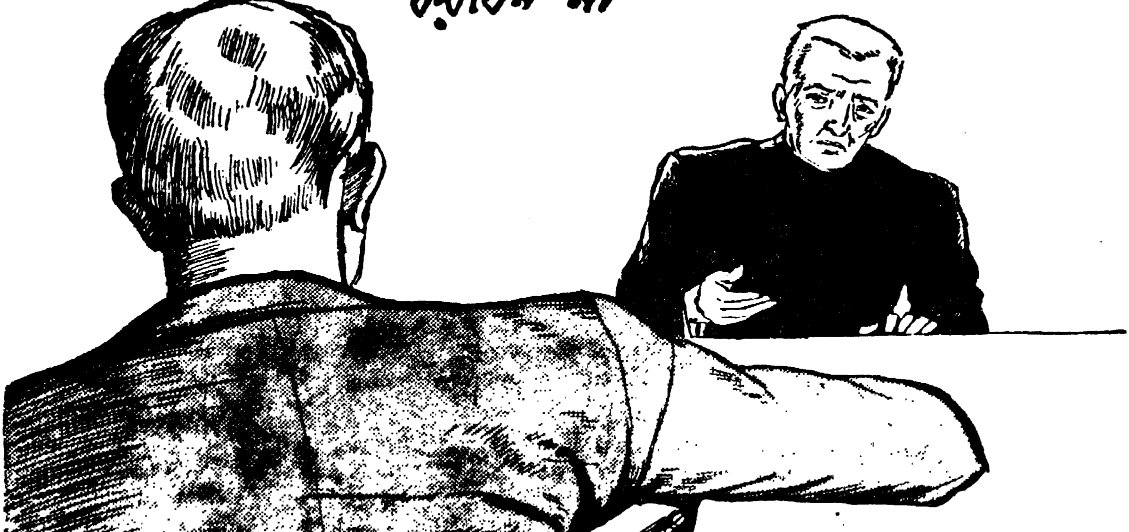


শ্বেতকায়ের চর্ম কৃষ্ণকায় ব্যবহার করিতে পারিবে কি না সে সম্বন্ধে এখনও কোন বিধি-ব্যবস্থা হয় নাই। হয়ত ফিল্ড মার্শাল স্মার্টস-এর মতামতের জন্য অপেক্ষা করা হইতেছে। বিশু খুড়ো বলেন, আবিষ্কারটা নূতন নয়। গণ্ডারের চামড়া বহুদিন হইতেই মানুষের গায়ে জুড়িয়া দিবার ব্যবস্থা চলিয়া আসিতেছে।

যুদ্ধের কাজে নিযুক্ত পঁচিশ লক্ষ বিবাহিতা নারীদের মধ্যে পাঁচ লক্ষ নাকি পুনরায় গৃহে ফিরিয়া যাইতে অনিচ্ছুক। আমাদের দেশের বিবাহিতা শ্রীমতীদের মধ্যে যাঁরা অফিসের কাজে নিযুক্ত আছেন তাঁরা এই গণনায় পড়িয়াছেন কি না জানিনা। কিন্তু তাঁরাও যদি "যাবো না আজ ঘরে-রে ভাই, যাবো না আজ ঘরে" বলিয়া গান ধরেন তাহা হইলে পরিস্থিতিটা কিন্তু সত্যই গুরুতর হইয়া পড়িবে—ঘরে এবং ট্রামেও।

কর্মজীবনের শেষে যখন অর্থ উপার্জনের ক্ষমতা দিন দিন কমে আসে তখন ভয় ও চিন্তা আমাদের ঘিরে ধরে। সেই ভয়কে বৃথা দমন করার প্রয়াসে অনেককেই বলতে শোনা যায়···

"মশাই, চেহারা দেখে আমার বয়সের অনুমান করবেন না"



আজকালকার দিনে যিনি বিচক্ষণ তিনি ভবিষ্যতের কথা ভেবে উদ্বৃত্ত আয় ন্যাশনাল সেভিংস্ সার্টিফিকেটে খাটান। ভবিষ্যতের চিন্তা তাঁকে জর্জরিত করে না। আপনিও কি তাই করবেন না?

আমরা মুখে যাই বলি বয়সের সঙ্গে সঙ্গে আমাদের বার্ধক্য এসে পড়বেই এবং সেই বার্ধক্য দুর্বহ হয়ে উঠবে যখন দেখবো যে এই অক্ষম অবস্থার জন্য দিন থাকতে অর্থের সংস্থান করা হয়নি। এই অবস্থায় পুনরায় চাকরিতে ঢোকাই হয় একমাত্র গতি এবং সে চাকরি যতই তুচ্ছ হোক তা উপেক্ষা করার মতো জোর যায় চলে। গভীর নিরাশায় চিত্ত ভরে ওঠে। কিন্তু সবারই কি এ অবস্থা হতে হবে? আপনি যদি চান আপনার বর্তমান জীবনকে এমন ভাবে নিয়ন্ত্রিত করতে পারেন যাতে আপনার ভবিষ্যৎ জীবনে যথেষ্ট অর্থের সংস্থান থাকবে এবং আপনার জীবনের সায়াহ্ন সুখে, স্বচ্ছন্দে এবং নির্ভাবনায় কেটে যাবে।

ন্যাশনাল সেভিংস্ সার্টিফিকেট কিনুন

যাঁরা অল্পে অল্পে সঞ্চয় করতে ইচ্ছুক তারা পাঁচ টাকার সার্টিফিকেট কিংবা চার আনা, আট আনা ও এক টাকার সেভিংস্ স্ট্যাম্প কিনতে পারেন। সার্টিফিকেট ও সেভিংস্ স্ট্যাম্প সরকারের নিযুক্ত এজেন্টের কাছে, ডাকঘরে ও সেভিংস্ ব্যুরোতে পাওয়া যায়।

★ বারো বছরে প্রতি দশ টাকায় পনেরো টাকা হয়।

★ শতকরা ৪% টাকা সুদ। ইন্‌কাম্ ট্যাক্স লাগে না।

★ তিন বছর পরে সুদ সমেত টাকা তুলতে পারেন।
(পাঁচ টাকার সার্টিফিকেট্ দেড় বছর পরেই ভাঙ্গানো যায়)

AAA 128

বাঙ্গলার কথা

শ্রীহেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ

গভর্নরের বাঙলা

বাঙলার বর্তমান গভর্নর মিস্টার কেসী মধ্যে মধ্যে সাংবাদিকদিগকে আহবান করাইয়া বাঙলার অবস্থা-ব্যবস্থা সম্বন্ধে আপনার মত প্রকাশ করেন এবং সময় সময় বেতারে সে বিষয়ে বিস্তৃত বক্তৃতাও করেন। গত ২০শে আষাঢ় (৪ঠা জুলাই) তিনি সাংবাদিকদিগের নিকট যেমন স্বীয় মত ব্যক্ত করিয়াছেন, তেমনই আবার বেতারে বক্তৃতাও করিয়াছেন। সাংবাদিক সম্মিলনের বিবরণে ও বক্তৃতায় বাঙলার যে রূপ তাঁহার দৃষ্টিতে প্রতিভাত হইয়াছে, তাহা বুঝা যায়। কিন্তু সরকারের দৃষ্টিতে যাহা প্রতিভাত হয়, জনসাধারণের দৃষ্টিতে যে তাহাই প্রতিভাত হয়, এমনও নহে। কারণ, রাজা ও রাজপ্রতিনিধিদিগের সম্বন্ধে কথা আছে—তাঁহারা শুনিয়া দর্শন করেন—নিম্নস্থ কর্মচারী প্রভৃতির কথায় নির্ভর করেন।

মিস্টার কেসী বলিয়াছেন, তিনি রাজনীতির কথা বলিবেন না—বাঙলার "গার্হস্থ্য" ব্যাপারের কথাই বলিবেন।

অন্ন সম্বন্ধে তাঁহার বক্তব্য—তিনি যে ১৮ মাসকাল বাঙলায় আছেন, তাহার মধ্যে পূর্বে কখনও বাঙলার খাদ্যদ্রব্যের অবস্থা বর্তমানের মত সন্তোষজনক হয় নাই। সেই সন্তোষজনক অবস্থা বিনা চেষ্টায় ঘটে নাই—খাদ্য-সমস্যার সম্পর্কিত ব্যক্তিদিগের চিন্তায় ও চেষ্টায় হইয়াছে। এবার বাঙলায় সরকারের চাউলের অবস্থা অসাধারণ, সরকার ২ শত ৭০ লক্ষ মণেরও অধিক চাউল কিনিয়াছেন এবং ব্যবস্থাগুণে এবার চাউলও ভাল। এবার সঞ্চয়ের জন্য যে সকল পাকা গোলা নির্মিত হইয়াছে ও হইতেছে, তাহাতে অপচয়ও অল্প হইবে। আর সরকার শীঘ্রই কলিকাতায় সরু চাউল ২৫৲ টাকা মণদরে, মাঝারী ১৬৲ টাকা ৪ আনা ও মোটা ১০৲ টাকায় বিক্রয়ের ব্যবস্থা করিয়াছেন। কেবল তাহাই নহে—পাছে গুদামে চাউলের আধিক্যে চাউল নষ্ট হয়, সেই আশঙ্কায় অন্যান্য প্রদেশে—এমন কি যে সিংহলে ভারতবাসীরা আশানুরূপ সদ্ব্যবহার পায় না সেই সিংহলেও প্রদান জন্য প্রায় এক লক্ষ টন চাউল ভারত-সরকারকে ঋণ হিসাবে দিতেছেন।

এ সম্বন্ধে আমাদিগের বক্তব্য মিস্টার কেসী যে বাঙলায় চাউলের অবস্থা সন্তোষজনক হওয়ায় চাউল সম্পর্কে সম্পৃক্ত কর্মচারীদিগের জন্য প্রশংসা দাবী করিয়াছেন, তাহাতে আমরা বিস্ময়ানুভব করি না। কারণঃ—

"The love of praise, how'er conceal-
ed by art,
Reigns more or less and glows
ev'ry heart.'

কিন্তু গত ২১শে সেপ্টেম্বর তিনি বলিয়াছিলেন—বাঙলায় ধানের ফসলে অসাধারণ অধিক ফলন হইয়াছে এবং পরে লর্ড ওয়াভেলও তাহাই বলিয়াছিলেন। সেই অতিরিক্ত ফসলের জন্য রাজকর্মচারীদিগের চিন্তার ও চেষ্টার কোন প্রয়োজন হয় নাই। যাহাতে ধান্য ও চাউল নষ্ট না হয় সেইরূপ গোলা নির্মাণের প্রয়োজন যে সরকার এতদিনে অনুভব করিয়াছেন, ইহা নিশ্চয়ই সুখের বিষয়। কারণ, সরকারের হিসাবেই প্রকাশ, ভারতবর্ষে বৎসরে ৩ কোটি টাকারও অধিক মূল্যের চাউল পোকায়, ইন্দুরে ও আর্দ্রতায় নষ্ট হয়। যে সকল কীট খাদ্যশস্য নষ্ট করে সে সকলের মধ্যে এক জাতীয় কীট ৬ মাসে ২টি হইতে ১২৮,০০০০০ কোটিতে পরিণত হয়।

মিস্টার কেসী যাহাই কেন শুনিয়া থাকুন না—আজও কলিকাতায় যেসব গুদামে ধান্য ও চাউল মজুদ করা হইতেছে, সে সকলে মজুদ মাল নষ্ট হইবার সব সম্ভাবনাই বিদ্যমান। সে সকলের চাল হইতে জলপড়া ও মেঝে হইতে আর্দ্রতা বিস্তার অবাধে হইতে পারে। সর্বাপেক্ষা জিজ্ঞাসার বিষয়—যখন বাঙলায় এত চাউল সরকারই মজুদ করিয়াছেন যে, পাছে কিছু নষ্ট হয় এই আশঙ্কায় ভারত-সরকারকে প্রায় লক্ষ টন চাউল ঋণদান করা হইতেছে—তখন সরু চাউলের দাম ২৫৲ টাকা ও মোটা চাউলের দাম ১০৲ টাকা মণ হয় কেন? সে চাউলে কি বাঙালীর—বাঙলার জনসাধারণের অধিকারই সর্বাগ্রে স্বীকার্য নহে? দুর্ভিক্ষের সময় মাঝারী চাউল যে দামে বিক্রীত হইয়াছে, এখনও সেই দাম থাকিবার কারণ কি? যদি সরকার লাভ করিবার জনাই এই ব্যবস্থা করেন, তবে তাহা কি সমর্থনযোগ্য? বাঙলার—দুর্ভিক্ষ-পীড়িত বাঙলার পুনর্গঠনের জন্য যে সর্বাগ্রে লোকের পক্ষে অন্ন সুলভ করা কর্তব্য, তাহা—আশা করি, মিস্টার কেসী অস্বীকার করিবেন না। চাউলের দাম হ্রাস করা কি সরকারের পক্ষে সঙ্গত নহে? আবার যে সরু চাউল ২৫৲ টাকা মণদরে বিক্রীত হইবে, তাহাও কি সরকার মোটা চাউলের দরেই কিনেন নাই? সেদিন বর্ধমানে ধান্য ও চাউল ব্যবসায়ীদিগের সম্মিলনে সেই অভিযোগ উপস্থাপিত করিয়াই ব্যবসার সাধারণ ও স্বাভাবিক পথ মুক্ত করিতে বলা হইয়াছে।

বিশেষ যখন ব্রহ্ম হইতে চাউল আমদানীর সম্ভাবনা ঘটিয়াছে, তখন সরকারের পক্ষে ব্যবসার পথে বাধা স্থাপিত করিবার কি কারণ থাকিতে পারে? চাহিদা ও সরবরাহের সাধারণ নিয়ম পুনঃপ্রবর্তিত হইলে যে চাউলের মূল্য অনেক কমিবে, তাহাতে সন্দেহ থাকিতে পারে না।

অধিক ফলনের ধান্যের চাষ বর্ধিত করিয়া বাঙলায় ধান্যের ফলন বৃদ্ধির কি উপায় অবলম্বিত হইয়াছে? লর্ড রোনাল্ডসে যখন বাঙলায় গভর্নর ছিলেন, তখন তিনি বলিয়াছিলেন, অধিক ফলনের ধান্য উৎপন্ন করা গিয়াছে। তিনি বলিয়াছিলেন—সেই ধান্যের চাষে ১৯১৯ খৃষ্টাব্দেই আড়াই লক্ষ একর জমিতে ১৫ লক্ষ টাকা মূল্যের অধিক ধান্য উৎপন্ন হইয়াছিল। তিনি বলিয়াছিলেন—বঙ্গোপসাগরের নিকটেই ২ কোটি একর জমিতে ধান্যের চাষ হয়; সেই জমিতে উৎকৃষ্ট ধান্যের চাষ হইলে কত অধিক ফলন হইবে, তাহা সহজেই অনুমেয়। গত ২৫ বৎসরেও কি সেই জমিতে উৎকৃষ্ট ধান্যের চাষের ব্যবস্থা করা সম্ভব হয় নাই? যদি না হইয়া থাকে, তবে এখনও তাহা হইবে কি? বাঙলাকে চাউল সম্বন্ধে স্বাবলম্বী করার প্রয়োজন আমরা বিশেষ অনুভব করিয়াছি। ব্রহ্ম জাপান কর্তৃক অধিকৃত হইবার পূর্বেও যে ব্রিটিশের অধীন ব্রহ্ম-সরকার একবার আকিয়াব হইতে বাঙলায় চাউল রপ্তানি বন্ধ করিয়াছিলেন, তাহা মনে রাখা প্রয়োজন। সমগ্র ব্রহ্ম ব্রিটিশ কর্তৃক পুনরধিকৃত হইলে যে সেই ব্যবস্থার পুনরভিনয় হইতে পারে না, এমনও নহে।

বাঙলা সরকার "অধিক খাদ্যদ্রব্য উৎপন্ন কর" আন্দোলনে গত ১৮ মাসে কত টাকা ব্যয় করিয়াছেন এবং তাহার ফলে অধিক চাকরী (চাকরীতে সাম্প্রদায়িক বণ্টন-ব্যবস্থা আছে) উৎপন্ন হইলেও খাদ্যদ্রব্য কিরূপ বৃদ্ধি পাইয়াছে, তাহার হিসাব কি বাঙলার গভর্নর গ্রহণ করিয়াছেন? যে সরু চাউলের জন্য ক্রেতাকে মণকরা ২৫৲ টাকা দাম দিতে হইবে, তাহার জন্য কৃষক কি মূল্য পাইয়াছে, তাহা বিবেচনা করিয়া দেখিবার অবকাশ বাঙলার গভর্নরের হইবে কি?

আজও যে বাঙলায় "চীফ এজেণ্ট" রহিয়াছে, তাহার কারণ কি?

বাঙলায় ধান্যের ফসলে ফলন অধিক হইলে তাহাতে কি বাঙালীর কেবল শ্রুতিসুখই হইবে; তাহার অন্নের অভাব দূর হইতে পারিবে না?

অন্নের পরে বস্ত্রের কথা। মিস্টার কেসী কবুল জবাব দিয়াছেন, যদি অতিলাভের ও চোরাবাজারের অত্যাচার না থাকিত, তবুও বস্ত্রের অবস্থা সন্তোষজনক হইতে পারিত না। কারণ, কয়লার, শ্রমিকের ও বিদেশ হইতে আমদানী কাপড়ের অভাব অনিবার্য। কেন? এদেশে কয়লার অভাব নাই—শ্রমিকেরও অভাব নাই। তথাপি কেন যে কয়লার অভাবে কাপড়ের কল সময় সময় বন্ধ থাকে, কেনই বা কোন কোন কলে সরকার কর্তৃক অপসারিত নৌকার কাষ্ঠ জ্বালানী করিতে হয়, তাহা কে বলিবে। ব্যবস্থার ত্রুটিই যে ইহার জন্য দায়ী, তাহা অস্বীকার করিবার উপায় কোথায়?

আমরা দেখিয়া বিস্মিত হইয়াছি—বস্ত্রাভাবে লোকের আত্মহত্যার সংবাদ বাঙলার গভর্নর বিশ্বাস করেন না। অবশ্য তাঁহার অবিশ্বাসে প্রকৃত অবস্থার কোন পরিবর্তন হইতে পারে না—হয় না। বাঙলার গভর্নরেরও যে ভুল হয়, তাহার একটিমাত্র প্রমাণ দিতেছি। ঢাকায় বাঙলার ভূতপূর্ব গভর্নর লর্ড লিটন চরমনাইয়ের ব্যাপার সম্পর্কে পুলিশের প্রশংসা করিতে করিতে এমন কথাও বলিয়াছিলেন যে, পুলিশের প্রতি ঘৃণায় প্রণোদিত হইয়া এদেশে লোক আপনাদিগের পুরস্ত্রীদিগকেও পুলিশের বিরুদ্ধে সম্মানহানি করার অপরাধের মিথ্যা অভিযোগ উপস্থাপিত করায়।—

"The thing that has distervcd me more than anything else.. is to find that mere hatred of authority can drive Indian men to induce Indian women to invent offences against their own honour merely to bring discredit upon Indian policemen·

আমরা জানি, এই ধৃষ্ট উক্তির জন্য লর্ড লিটনকে পদচ্যুত করিবার কথাও হইয়াছিল; কেবল রবীন্দ্রনাথ তাঁহাকে তাঁহার উক্তি সম্বন্ধে যে পত্র লিখিয়াছিলেন, তাহার উত্তরে প্রকারান্তরে ত্রুটি স্বীকার করিয়া তিনি অব্যাহতি লাভ করিয়াছিলেন।

আমরা মিস্টার কেসীকে জিজ্ঞাসা করি, তিনি কি জানেন না, রংপুরে জিলায় গাইবান্ধায় বস্ত্রাভাবে যে অবস্থার উদ্ভব হইয়াছিল, তাহাতে পুলিশ শেষে জনতার উপর গুলী ছুঁড়িতে বাধ্য হইয়াছিল? মানুষ অকারণে আত্মহত্যা করে না। তবে কিরূপে নিশ্চিত হওয়া যায়—বস্ত্রাভাবেই লোক আত্মহত্যা করে নাই?

বিলাতেও বস্ত্রাভাব ঘটিয়াছে। কিন্তু সরকারের সুব্যবস্থায় লোকের এদেশের লোকের মত দুরবস্থা ঘটে নাই। বাঙলা সরকার যেসব ব্যবস্থা করিয়াছেন, সে সকলের ফলে বহু লোক বস্ত্র-বণ্টন ব্যবস্থার সহিত সম্পর্ক ত্যাগ করিয়াছেন। কলিকাতায় অবস্থা যেরূপ দাঁড়াইয়াছে, তাহাতে প্রত্যেক ওয়ার্ডের কমিটিই কার্যভার ত্যাগ করিতে চাহিতেছেন। অতি সামান্য অনুসন্ধান করিলেই মিস্টার কেসী জানিতে পারিবেন—যে সময় মিস্টার গ্রিফিথস সংবাদপত্রে ঘোষণা করিতেছেন, সরকার "দরাজ" হাতে বস্ত্র দিতেছেন, ঠিক সেই সময়েই তাঁহার বিভাগ কমিটিগুলিকে বস্ত্র-বণ্টন সঙ্কোচ করিতে নির্দেশ দিতেছেন। এমন কি "ছাড়" ছাপা নাই এই অজুহাতেও অনায়াসে দিনের পর দিন অতিবাহিত করিতে বিভাগ লজ্জানুভব করিতেছেন না। তাঁহার সরকার যাঁহাদিগকে "হ্যাণ্ডলিং এজেণ্ট" নিযুক্ত করিয়াছেন, তাঁহারা বস্ত্রব্যবসায়ে অভিজ্ঞতাশূন্য। আর কেন যে ১২ বৎসরের ন্যূন বয়সের বালক-বালিকাদিগকে বস্ত্র প্রদান করা হইতেছে না এবং কিরূপেই বা ১২ হাত কাপড়ও সরবরাহ হইতেছে, তাহা কে বলিবে? "ছাড়" লইবার জন্য লোককে কত সময় নষ্ট করিতে হয়, তাহার সন্ধান মিস্টার কেসী লইয়াছেন কি? সরকারের হিসাবেই কাপড়ের জমা ও খরচ হিসাব মিলান দুঃসাধ্য।

আমরা দেখিয়াছি, মিস্টার কেসী স্বয়ং স্বীকার করিয়াছেন—

প্রতিদিন বাঙলায় ন্যায়সঙ্গত বিচার ব্যাহত করিবার বা স্বার্থসিদ্ধির জন্য উৎকোচ প্রদত্ত ও গৃহীত হইতেছে।

বস্ত্র সরবরাহের অনাচারেও তাহার দৃষ্টান্ত পাওয়া যায় না কি? গত ১৮ মাসেও যে তিনি এই অনাচারের অবসান ঘটাইতে পারেন নাই, তাহা দেখাইয়া দিবার জন্যই কি রহস্যজনকভাবে একদিন লাটভবনের দ্বারদেশে মুদ্রাবর্ষিত হইয়াছিল এবং সে রহস্য ভেদ করা যায় নাই?

অর্থ দিয়া সরকারী ব্যবস্থায় বস্ত্র লইবার ছাড় লইতেও যে লোককে আত্মসম্মান লুপ্ত করিতে হয়, তাহার অনেক দৃষ্টান্ত আমরা দিতে পারি—দিতে প্রস্তুতও আছি। লর্ড রোনাল্ডসে একবার হিসাব করিয়া বলিয়াছিলেন—ম্যালেরিয়ায় বাঙলায় বৎসরে লোক ২০ কোটি দিন হিসাবে পীড়িত থাকে, তাহাতেই বাঙলায় ম্যালেরিয়াজনিত অর্থনীতিক ক্ষতির পরিমাণ অনুমান করা যায়। সরকারের ব্যবস্থায় কাপড় পাইতে লোকের কতদিন কার্যের ক্ষতি হয়, তাহার হিসাব পাওয়া যায় কি? আর সরকারের সেই ব্যবস্থায় মাসিক কত টাকা ব্যয় হয়, তাহাও জানিবার বিষয়, সন্দেহ নাই। ব্যবস্থা ও অব্যবস্থা উভয়ের মধ্যে যে সীমারেখা আছে, তাহা কিরূপে অতিক্রান্ত হইতেছে?

এদেশে বিদেশী কাপড় আমদানীর যে-সব সংবাদ পাওয়া যাইতেছে, সে সকলেও যে লোকের সন্দেহের উদ্ভব ও আশঙ্কা বৃদ্ধি হইতেছে, তাহা অনায়াসে বলা যায়। কর্মচারীর সংখ্যা বৃদ্ধিতে বেকার-সমস্যা সমাধানের সুবিধা হইতে পারে, কিন্তু তাহাতে সুব্যবস্থা হয় না। আর কর্মচারী, "এজেণ্ট", ব্যবসায়ী—এই সকলের নিয়োগে যদি সাম্প্রদায়িকতার প্রভাব বর্ধিত না হয়, তবে তাহাতেই ব্যবস্থা অব্যবস্থায় পরিণত হইতে পারে।

মিস্টার কেসী বাঙলায় মৎস্যের প্রয়োজন ও অভাব উভয়ই স্বীকার করিয়াছেন। তিনি "বরফ নিয়ন্ত্রণকারী" কর্মচারীর নিয়োগ করিলেও কেন যে কলিকাতায় মৎস্যের সরবরাহ বৃদ্ধি হইতেছে না, তাহাতে মিস্টার কেসী বিস্ময় প্রকাশ করিয়াছেন। কিন্তু বরফের পরিমাণ বর্ধিত হইলেই বাজারে মৎস্যের পরিমাণ বর্ধিত হয় না। অভাবের প্রধান কারণ—সহস্র সহস্র মৎস্যজীবী দুর্ভিক্ষে প্রাণ ত্যাগ করিয়াছে—দুর্ভিক্ষের পূর্বেই সরকারের প্রবর্তিত নীতিতে তাহাদিগের নৌকা কাড়িয়া লওয়া হইয়াছিল; তাহারা অনাহারে মরিয়াছে। আর যাহারা জীবিত—কিন্তু জীবন্মৃত, তাহারাও জালের ও নৌকার অভাবে মাছ ধরিতে পারে না। কুমার স্যার জগদীশপ্রসাদ ১৯৪৩ খৃষ্টাব্দের ১০ই সেপ্টেম্বর তাঁহার বিবৃতিতে এদিকে সরকারের দৃষ্টি আকৃষ্ট করিয়াছিলেন; কিন্তু তাহার পরে যে ২২ মাসকাল গত হইয়াছে, তাহাতেও সে অবস্থার প্রতিকার হয় নাই। ইহা নিশ্চয়ই বাঙলা সরকারের পক্ষে গৌরবজনক নহে।

সিনেমার মূল কথা হ'চ্ছে 'একটা নতুন কিছু করো'—সব ছবিতেই একটু আনকোরা কিছু না দিতে পারলে নির্মাতারা যেমন স্বস্তি পান না তেমনি চিত্রপ্রিয়দের মনেও শান্তি থাকে না। এই নতুন চাওয়া ও দেওয়ার অনবরত তাগিদটাই ছবির জনপ্রিয়তা অর্জনের প্রধান সহায়ক হয়। আর সেই জনপ্রিয়তাকে জাগিয়ে রাখার চেষ্টা থেকেই উৎপত্তি 'রেকর্ড' করার ঝোঁক। কিন্তু মুস্কিল হচ্ছে আমাদের চিত্রশিল্পের ক্ষেত্রটা অপরিসর হ'য়ে। নতুন কিছু করো বললেই তা কাজে ফলে না, অবশ্য তার প্রধান কারণ বর্তমান চিত্রনির্মাতাদের ততখানি জ্ঞানবুদ্ধির অভাব। একথা শিল্পপতি মানতে পারেন কখনো? তাই তাঁদের নূতন কিছু করার ঝোঁক আজব পথ ধরে চলে। তাদের জ্ঞানবুদ্ধি ও বিদ্যেতে যা সম্ভব তাই নিয়েই তারা 'রেকর্ড' স্থাপন করতে এগিয়ে যান। সে সব 'রেকর্ড'ও সত্যিই পৃথিবী ছাড়া হয়ে থাকে। আমাদের এখানে রেকর্ড হয় একখানা ছবিকে একই চিত্রগৃহে একশো সপ্তা ধরে চালিয়ে; এখানে রেকর্ড হয় একই শহরে চার ছ'টা চিত্রগৃহে একই দিনে একই ছবির মুক্তি দিয়ে; একটা চিত্রগৃহ তৈরী করতে বারো বছর সময় ব্যয় করে; রেকর্ড হয় আঠারো মাস সময় একখানা ছবি তোলার পিছনে ব্যয় করে; আমরা রেকর্ড করি নায়িকাকে দু' লাখ টাকা আর সেই ছবিরই নায়ককে হাজার পাঁচেক টাকায় অভিনয় করিয়ে; আমরা রেকর্ড করি দেশের চল্লিশ কোটি লোককে কত কম ছবি দিয়ে তৃপ্ত রাখা যায় তাই নিয়ে—এইসব রেকর্ড স্থাপনে ভারতবর্ষ জগতের মধ্যে সেরা ব'লে অনায়াসেই দাবী ক'রতে পারে এবং আমাদের ধারণা কোন দেশই তা অগ্রাহ্য ক'রবে না।

নূতন ও আগামী আকর্ষণ

এ সপ্তাহের উল্লেখযোগ্য আকর্ষণ প্যারাডাইস, শ্রী, পূরবী ও পূর্ণতে একযোগে মুক্তিপ্রাপ্ত ফিল্মিস্তানের বহুপ্রতীক্ষিত প্রথম উপহার 'চল চলরে নওজোয়ান'। ছবিখানি সম্পর্কে অনেকদিন থেকে অনেক কথাই প্রচারিত হয়ে আসচে, সুতরাং এখন ছবিখানি দেখে মত দেওয়া ছাড়া আর কিছু বলবার নেই, তবে এইমাত্র বলা যায় যে, ভারতীয় চলচ্চিত্রের ইতিহাসে আর কোন ছবি এতটা হৈ চৈ সৃষ্টি ক'রতে পারেনি।

* * * *

এ সপ্তাহের আর একখানি ছবি হ'চ্ছে সিটি, ছায়া ও ম্যাজেস্টিকে প্রদর্শিত প্রভাকর পিকচার্সের ধর্মমূলক ছবি 'মহারথী কর্ণ' যার প্রধান ভূমিকায় আছেন পৃথিরাজ,



দুর্গা খোটে, স্বর্ণলতা, সাহু মোদক, নিম্বলকর প্রভৃতি।

বিবিধ

এ বছরের প্রথম ছ' মাসে কলকাতায় সবশুদ্ধ মুক্তিলাভ ক'রেছে হিন্দি ছবি ৩২খানি আর বাঙলা ৫খানি—গত বছরের তুলনায় বেশ কম।

* * * *

কিছুদিন আগে রাধা ফিল্মস্ স্টুডিওটি মানসাটা ফিল্ম ডিস্ট্রিবিউটার্স কিনে নিয়েছিল, তারা আবার সম্প্রতি সেটিকে চিত্রবাণী লিমিটেডকে বিক্রী করে দিয়েছে। এই নব ব্যবস্থার প্রথম ছবি তোলার দাবী হচ্ছে বম্বের রামনীক লাল শাহুর; স্টুডিওতে এর একটা ভাগ আছে ব'লে শুনলাম।

* * * *

ভারতীয় চিত্রশিল্পের জনকয়েক প্রতিনিধি আমেরিকা ও ইংলণ্ডে যাবার যে সংকল্প ক'রেছিলো তা বোধ হয় শেষ পর্যন্ত কেঁচে যাবে—যাওয়া নিয়ে সর্বজনের বিরুদ্ধ অভিমতই দায়ী।

* * * *

'পৃথ্বীরাজ-সংযুক্তা'তে নায়কের ভূমিকায় অভিনয় করার জন্য শালিমার পিকচার্স অভিনেতা পৃথ্বিরাজকে এক লক্ষ টাকার চুক্তিতে আবদ্ধ করেছে, তাও মাসে মাত্র দশ দিন কাজ করার সর্তে।

* * * *

ভারতের সাইকেল-চ্যাম্পিয়ন জানকী দাসও একটা ছবি তোলার লাইসেন্স পেয়েছে।

বম্বের জনক পিকচার্সের 'সন্তান' নামে একখানি ছবি সম্ভবত কলকাতায় তোলা হবে। এর নায়ক হবেন বিমান বন্দ্যোপাধ্যায়।

* * * *

চলচ্চিত্র-সাংবাদিক খগেন রায় চিত্র পরিচালনা কাজে হাত দিয়েছেন। শৈলজানন্দের সহকারীরূপে তিনখানি ছবিতে কাজ করার পর এবার চিত্ররূপার আগামী বাঙলা ছবিখানি পরিচালনা করার ভার পেয়েছেন।

* * * *

বম্বের প্রযোজক শেঠ সিরাজ আলি হাকিম টোয়েণ্টিয়েথ সেঞ্চুরী ফক্সের কর্ণধার মিঃ নিউবেরীর সঙ্গে যুক্ত হ'য়ে দেশী ও বিদেশী মূলধন জড়িয়ে একটা বিরাট চিত্রব্যবসা ফাঁদবার আয়োজনে ব্যস্ত আছেন বলে খবর পাওয়া গেল।

* * * *

বম্বের পরিচালক চিমনলাল লুহার মাসখানেক ধ'রে কলকাতায় রয়েছেন, তাঁর পরবর্তী ছবির গানগুলি এখানকার গাইয়েদের দিয়ে গাইয়ে এবং রেকর্ড ক'রে নিয়ে যাবার জন্যে।

* * * *

'শিরী ফরহাদ' ছবিখানি লোকে পছন্দ না করায় তার শেষটাকে বদলে নতুনভাবে ক'রে দেখানো হ'চ্ছে।

পাইওরিয়া নাশে

ওরিয়েণ্ট

টুথ পাউডার

দাঁতের মর্যাদা

দাঁত থাকিতেই দেওয়া ভালো। অনাদৃত, অপরিচ্ছন্ন দন্তপাঁতি যে কত অনর্থের মূল তাহা আপনার নিকটতম ডাক্তারকে জিজ্ঞাসা করিলেই জানিতে পারিবেন।



'ওরিয়েণ্ট'যোগে নিত্য দন্তসেবা করিলে দাঁত এবং মাঢ়ি নীরোগ ও সবল থাকে, মুখের দুর্গন্ধ দূর হইয়া নিঃশ্বাস সুরভিত হয়।

—*—

স্ট্যাণ্ডার্ড
ফার্মাসিউটিক্যাল ওয়ার্কস লিঃ
কলিকাতা

মনে রাখার মত দিন!

অদ্য ১৩ই জুলাই

সুপ্ত যৌবনকে জাগিয়ে তুলবে



ফিল্মিস্তানের

'চল চল রে নওজোয়ান'

প্যারাডাইস

শ্রী ※ পূর্ণ ※ পূরবী

প্রত্যহ—৩ বার অভিনয়

মিনার-বিজলী-ছবিঘর

৩০ সপ্তাহ!

নিউ টকিজের

বন্দিতা

প্রত্যহ
৩, ৬, ৮-৪৫ মিঃ
এ, ডি, রিলিজ



মাতৃ-হৃদয়ের ন্যায় মহান্ আর কিছুই নাই!

সত্য, ত্যাগ, সেবাধর্মের মহান আদর্শ কর্ণ-চরিত্রকে মহীয়ান করিয়া তুলিয়াছিল মহাভারতের সেই অনুপম চিত্র

মহারথী

কর্ণ

শ্রেষ্ঠাংশে :

পৃথ্বীরাজ, দুর্গা খোটে, সাহু মোদক, নিম্বালকর, স্বর্ণলতা

==অদ্য ১৩ই জুলাই হইতে==

সিটী-ছায়া-ম্যাজেষ্টিক

প্রত্যহ ৩টা, ৬টা, ৯টায়

মিনার্ভা

প্রত্যহ :
৩টা, ৬টা ও ৯টায়

৭ম সপ্তাহ

জয়ন্ত দেশাইয়ের

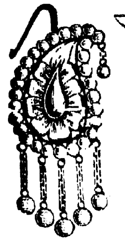
সম্রাট

চন্দ্রগুপ্ত

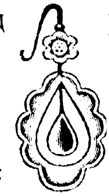
শ্রেঃ—**রেণুকা — ঈশ্বরলাল**

—বিলিমোরিয়া এণ্ড লালজী রিলিজ—

নিউ ইণ্ডিয়ান রোল্ড এণ্ড ক্যারেট গোল্ড কোং ১নং কলেজ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।



অর্দ্ধ মূল্যে কনসেসন



এ্যাসিড প্রুভড 22Kt.

মেট্রো রোল্ডগোল্ড গহনা

রংয়ে ও স্থায়িত্বে গিনি সোনারই অনুরূপ

গ্যারাণ্টি ১০ বৎসর

চুড়ি—বড় ৮ গাছা ৩০, স্থলে ১৬,, ছোট—২৫, স্থলে ১০,, নেকলেস অথবা মফচেইন—২৫, স্থলে ১৩,, নেকচেইন—১৮" এক ছড়া—১০, স্থলে ৬,, আংটি ১টি—৮, স্থলে ৪,, বোতাম—১ সেট—৪, স্থলে ২,, কানপাশা, কানবালা ও ইয়ারিং প্রতি জোড়া—৯, স্থলে ৬,, আর্মলেট অথবা অনন্ত এক জোড়া—২৮, স্থলে ১৪,। ডাক মাশুল ৸৹।

একত্রে ৫০, মূল্যের অলঙ্কার লইলে মাশুল লাগিবে না।

বিঃ দ্রঃ—আমাদের জুয়েলারী বিভাগ—২১০নং বহুবাজার ষ্ট্রীটে **আইডিয়েল জুয়েলারী কোং** নামে পরিচিত। উপহারোপযোগী হাল-ফ্যাসানের হাল্কা ওজনে খাঁটি গিনি সোনার গহনা সর্বদা বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত থাকে। সচিত্র ক্যাটালগের জন্য পত্র লিখুন।

সিলেট ইণ্ডাষ্ট্রীয়াল

ব্যাঙ্ক লিঃ

রেজিঃ অফিসঃ **সিলেট**

কলিকাতা অফিঃ ৬, ক্লাইভ ষ্ট্রীট

কার্যকরী মূলধন

এক কোটী টাকার উর্দ্ধে

জেনারেল ম্যানেজার—জে, এম, দাস

ব্যবসা বাণিজ্য

লৌহ

শ্রীকালীচরণ ঘোষ

বর্তমান সভ্যতায় লৌহ যে স্থান অধিকার করিয়া আছে, তাহা একটি ক্ষুদ্র প্রবন্ধের মধ্যে বুঝাইয়া বলা অসম্ভব। সকল সময় চক্ষু মেলিয়া চাহিলেই লৌহের প্রভাব দৃষ্টিগোচর হইবে, সুতরাং ইহা আমাদের জীবন যাত্রার সহিত এমন ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত যে তাহা না লিখিয়া প্রত্যেক লোকের জ্ঞানের উপর ইহার বিচার ছাড়িয়া দিলেই যুক্তিযুক্ত হয়। কিন্তু সকল বস্তু এক সঙ্গে দৃষ্টিতে না পড়াই সম্ভব এবং নানা কারণে যাহাদের লৌহ সংক্রান্ত যাবতীয় বস্তু সম্বন্ধে ধারণা করার সুযোগের অভাব আছে, তাহাদের সুবিধার জন্য একটা সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেওয়া প্রয়োজন।

খনিজ সম্বন্ধে যে ধারায় আলোচনা চলিতেছে, লৌহের ব্যাপারে তাহার কিছু ব্যতিক্রম করা হইয়াছে। লৌহের ব্যবহার সম্বন্ধে প্রথমেই লেখা হইল; ইহাতে সমস্ত প্রবন্ধের উপর পাঠকের একটু আগ্রহ জন্মিবে এই ক্ষীণ আশা। ভারতবাসীর অর্থনৈতিক জীবনের সহিত লৌহের যে নিকট সম্পর্ক তাহা বিভিন্ন অংশে বিশদভাবে দেখাইবার চেষ্টা করিব।

ব্যবহার

লৌহের ব্যবহারের কথা লিখিতে যাওয়া অত্যন্ত কঠিন ব্যাপার; তালিকা কোথায় আরম্ভ আর কোথায় শেষ করা যাইবে তাহা লইয়া বিশেষ চিন্তার কথা।* যাহা দামে সস্তা; যাহাকে ইচ্ছামত ঢালাই করা যায়, সূক্ষ্ম তার, পাত অথবা যে কোনও রকম আকৃতি, প্রয়োজন মত তীক্ষ্ণতা গ্রহণে যাহা সমর্থ; যাহাকে বাঁকাইয়া মোচড়াইয়া আকৃতি দিতে একমাত্র তাপের সাহায্য যথেষ্ট বলিয়া পরিগণিত হইয়াছে; যাহাকে আকারে বিরাট হইতে অতি ক্ষুদ্র অবস্থায় সহজেই পরিণত করা যায়; আকৃতির অনুপাতে অন্য যে কোনও ধাতুর সহিত শক্তির বিচারে সহজেই তুলনা করা যায়, তাহা যে জগতের প্রভূত উপকার সাধনে সমর্থ হইবে, তাহাতে কোনও সন্দেহ নাই। অপরাপর ধাতু বা অন্যান্য খনিজের সহিত মিশ্রণে লৌহের কাঠিন্য বহুগুণে বৃদ্ধি পায় এবং সেই কারণে সাধারণ লৌহ যে সকল কার্যের অনুপযোগী বলিয়া বিবেচিত হইয়াছে, সেরূপ স্থানেও নবকলেবর প্রাপ্ত লৌহ আপনার আসন আপনিই বাছিয়া লইয়াছে।

লৌহ ব্যবহারের বিস্তারিত বিবরণ দিতে গেলে যাহা সর্বপ্রধান স্থান অধিকার করিয়া আছে তাহা দিয়া আরম্ভ করিতে হয়; কিন্তু সে বস্তুটি যে কি তাহা লইয়াই সমস্যা। আকার ধরিয়া হিসাব করিলে গঠন সংক্রান্ত দ্রব্যাদির কথা মনে করা যাইতে পারে। লৌহ না থাকিলে বর্তমানের বৃহদাকার পুলের কথা স্মরণ করা যাইত না; সভ্যতার গতি অনেক পরিমাণে হ্রাস বা লঘু হইয়া পড়িত। আধুনিক সভ্য-জগতের ঘরবাড়ি হইতে আকাশচুম্বী স্তম্ভ (যথা, ইফেল টাওয়ার) ও গৃহাদি (skyscrapers) কিছুই সম্ভব হইত না।*

আজ জগতের গতি নির্ভর করিতেছে লৌহের উপর। এখনকার কোনও যানই লৌহ ব্যতিরেকে সৃষ্টি হয় না।* বাষ্পীয় রথ বা রেল অর্থাৎ ইঞ্জিন, গাড়ীর মূল কাঠাম (platform) চাকা, পাতার রেল বা পথ এবং তৎসংক্রান্ত যাবতীয় যাহা কিছু লৌহ ছাড়া কিছুই নয়। বৃহদাকার জলযানের জন্য লৌহের চাদর না হইলে চলিতে পারে না। মোটর সাইকেল প্রভৃতি সকল কাজেই লৌহ চাই।

আকার হিসাবে যুদ্ধাস্ত্র বা মারণযন্ত্র নিতান্ত হেয় নয়। কামান, গোলা, গুলী, বোমা, মাইন, ট্যাঙ্ক, সাবমেরিণ, বিমানপোত লৌহ সংক্রান্ত বস্তু। তন্মধ্যে শেষের দুইটিতে হয় লৌহ মিশ্রিত কঠিন অথচ হাল্কা চাদর অথবা কাঠ আসিয়া দেখা দিতেছে। যাহাই হউক অজস্র লোক মারিবার জন্য লৌহই প্রধান ধাতু।

লৌহের প্রভাবে যন্ত্রপাতির (Machinery) বিস্তার সম্ভব হইয়াছে। সকল প্রকার যন্ত্রের তালিকা দেওয়া কখনই সম্ভব নহে। এই সকল যন্ত্র চালাইবার শক্তি সৃষ্টি করিতে যে বয়লার প্রভৃতি লাগে, তাহা লৌহের পাত হইতে উদ্ভূত। যন্ত্র তৈয়ারী করিতে যে যন্ত্রের দরকার তাহাও লৌহমাত্র। লোহার চাদরের অন্য যে কাজই থাকুক তাহা ঢেউ খেলানো (corrugated) তরঙ্গায়িত আকারে আমরা পাইয়া গৃহ নির্মাণে লাগাইতেছি। ঘর ছাউনীতে আগে যাহা লাগিত, অর্থাৎ উলু, খড়, গোলপাতা, তালপাতা, চাঁচ, পাটকাটি, নারিকেল পাতা ও কাঠি, খোলা, টাইল, প্রভৃতি তাহা ক্রমেই পিছাইয়া পড়িতেছে। বড় কারখানার ছাউনীতে এখন 'করগেট' লোহাই প্রধান সহায়।

ছোটখাট হাতিয়ার (tools and implements) লৌহের সমাবেশ। ঘরের তৈজসপত্রের মধ্যে লৌহের সহিত অপরাপর ধাতব পদার্থের কিছু কিছু ভাগাভাগি আছে। কিন্তু যাহার আধার বড় এবং কিছুদিন ধরিয়া কাজে লাগিবে তাহা লোহার পাত বা চাদর। ছাদের উপর জলের ট্যাঙ্ক, সঙের পাইপ বা নল, দেয়ালের গায়ের বৃষ্টির জল নামিবার পাইপ; কড়া, চাটু, বেড়ী, হাতা, খুন্তি সবই লোহার। এনামেল বা কলাইকরা বাসনের মধ্যে লোহার অংশ বেশী, লোহা সেখানে আত্মগোপন করিয়া রহিয়াছে। টিনের কানাস্তারা (canister) বা টিনের কৌটা (tin containers) বলিয়া আমরা টিন বা রাঙকে অযথা প্রাধান্য দিয়া থাকি, কিন্তু সেখানে লোহাই সব; রাঙের সংস্পর্শ আছে মাত্র।

---

* According to Dr. Ure, "it is capable of being cast into moulds of any form, of being drawn into wire of any desired length and fineness of being extended into plates and sheets, of being bent into every direction, of being sharpened and hardened, or softened at pleasure. Iron accommodates to all our wants and desires, and even to our caprices; it is generally serviceable to the arts, the sciences, to agriculture and war, the same ore furnishes the sword, the ploughshare, the scythe, the pruning hook, the graver, the spring of a watch or of a carriage, the chisel, the chain, the anchor, the compass, the cannon and the bomb. It is a medicine of much virtue and the only metal friendly to the human frame." —Dr. Ure's **Dictionary.**

* Constructional Engineering : beams, girders, channels, bolts, nuts, rivets, rods, sheets, etc., hinges, screws, nails, fittings, etc.

* Transport services : Rail : engines boilers, line, tyres, poles, wire, signalling apparatus, fencing material, etc., ship and parts; motor chassis and other accessories, cycles, chains, rims, spoke etc., etc.

তার, পেরেক, স্ক্রু, স্প্রীং, বালতি, তালা, চাবি, খাট, টেবিল, চেয়ার, আলমারি, আসবাব, তৈজস প্রভৃতি সকল রকম মিলিয়া আমরা লোহার শৃংখলে বাঁধা পড়িয়াছি। কর্তন যন্ত্রের সবই লোহা, মোটা দা কুঠার, করাত, বটী হইতে ছুরি, চাকু, ক্ষুর, কাঁচি, টেবিলের শোভা, চামচ, কাঁটা, অস্ত্র চিকিৎসার সূক্ষ্ম যন্ত্রপাতি লোহেরই বিভিন্ন সংস্করণ। আমরা ইহার বিভিন্ন রূপের মাত্র খানিক পরিচয় নিত্য নৈমিত্তিক ব্যবহারের মধ্যে দেখিতে পাই।

রাসায়নিক পদার্থ হিসাবে লোহ আজ বহু আকৃতি ধারণ করিয়া জগতের কাজে লাগিতেছে, লৌহ অক্সাইড (iron oxide) রবার, পেণ্ট, মেঝে প্রভৃতিতে লাল রঙ করিতে মিশ্রিত করা হয়। প্রাকৃতিক লোহ-অক্সাইডগুলি গ্যাস হইতে গন্ধক দূর করিবার জন্য কাঠের গুঁড়া বা র‍্যাঁদা চাঁছা কাঠের সহিত মিশাইয়া কাজে লাগাইবার ব্যবস্থা আছে। প্রত্যেকটি রাসায়নিক পদার্থের ভিন্ন ভিন্ন ব্যবহার রহিয়াছে, তাহার মোটামুটি রঙ (paint) বা রঞ্জনের (dye) জন্য। প্রুসিয়ান ব্লু (Prussian blue) নামক সুন্দর নীল বর্ণপাইতে ফেরিক ফেরোসায়েনাইড (Ferric ferrocyanide) ব্যবহৃত হয়। ফটোর ছবি এবং ব্লু প্রিণ্টিং (blue printing)* এর জন্য ফেরস অকসালেট (ferrous oxalate) ও ফেরিক সোডিয়ম) অকসালেট (ferric sodium oxalate) এবং কেবল ব্লু প্রিণ্টিংএর জন্য ফেরিক-এ্যামোনিয়ম অকসালেট (ferric ammonium oxalate) ও ফেরিক সাইট্রেট (ferric citrate) কাজে লাগে। ইহার মধ্যে ফেরিক এ্যাসিটেট (ferric acetate) ও ফেরিক সাইট্রেট ঔষধে ব্যবহৃত হয়। কাপড় প্রভৃতি ছাপাই কাজে রঙ ধরানো ফেরিক এ্যাসিটেটের অপর ব্যবহার। তাহা ছাড়া চামড়া, লোম, পালক প্রভৃতি রঙগীন করিতে ইহার সাহায্য লইতে হয়। কাষ্ঠ সংরক্ষণে আমরা ইহাকে দেখিতে পাই। ফেরিক ক্লোরাইড (ferric chloride) অপর এক অতি প্রয়োজনীয় পদার্থ। কাঁচ ও চীনা মাটির পাত্র তৈয়ারী করিতে ইহা বিশিষ্ট বর্ণ দিয়া থাকে; রঞ্জনের কার্যে ইহার প্রয়োজন; চর্বি ও তৈল শিল্পে রঙ (paint) ও বার্ণিস এবং শান পাথর (abraisives) মাজা-ঘষা কাজে, রাসায়নিক পদার্থ উৎপাদনের সাহায্যকারী (catalytic agent) বা অনুঘটক হিসাবে প্রচুর পরিমাণে এবং ফটোর কাজে সামান্য পরিমাণ লাগিয়া থাকে। ফেরস এ্যাসিটেট (ferrous acetate), ফেরস-ক্লোরাইড (ferrous chloride) প্রভৃতি লোহের আরও বহু প্রকার রাসায়নিক পদার্থ বাহির হইয়াছে এবং প্রত্যেকেরই স্বতন্ত্র ব্যবহার জানা গিয়াছে, বর্তমান প্রবন্ধে তাহার বিবরণ একান্ত নিষ্প্রয়োজনবোধে দেওয়া হইল না।

কত সহস্র বৎসর ধরিয়া আয়ুর্বেদে লোহ ব্যবহার হইতেছে, আজ তাহার সঠিক কাল নির্ণয় করিয়া বলা কঠিন ব্যাপার। লোহ ভস্ম* করা এবং তাহা রোগ নিরাময় করিবার অপরাপর ঔষধের সহিত মিলাইয়া ব্যবহার আবহমানকাল প্রচলিত রহিয়াছে। ইহা ছাড়া, লোহ সংযুক্ত আরও বহুপ্রকার ঔষধাদি প্রচলিত আছে এবং তাহাদের সম্মিলিত সংখ্যা দুইশত পঁয়ষট্টি।

এ্যালোপ্যাথিক চিকিৎসা শাস্ত্রে লোহ-ঘটিত নানা ঔষধ প্রচলিত রহিয়াছে তাহারা প্রধানত ধাতব অম্ল† (mineral acids) উদ্ভিজ্জ অম্ল‡ (organic acids) ও অঙ্গারাম্ল, অক্সিজেন, ব্রোমিন ও আওডিন সহ§ প্রস্তুত হয়। অন্যান্য চিকিৎসা শাস্ত্রেও লোহের নানারূপে ব্যবহার প্রচলিত আছে। লোহের ব্যবহারের কথা সম্পূর্ণভাবে বলিতে গেলে লোহ নিষ্কাসনের সময় যে গাদ বাদ যায়, তাহার ব্যবহারের কথা মনে করা দরকার। প্রধানত ভাল রাস্তা করিতে বা সিমেণ্ট পাথর জমাইয়া (concrete) কনক্রীট করিতে বা সিমেণ্ট প্রস্তুতের উপাদান হিসাবে ইহা ব্যবহৃত হয়। রেল লাইনের গায়ে যে পাথরের টুকরা দেখা যায়, তাহার জন্য পাথর কাটা এবং ভাঙগা প্রয়োজন হয়। অথচ তাহা স্বস্থানে থাকিলে কাহারও বিশেষ কোনও ক্ষতি নাই। সেই পাথরের পরিবর্তে লোহার গাদের টুকরা ব্যবহার প্রচলিত হইতেছে। কর্মশক্তি হিসাবে দুই-ই এক। অথচ এই গাদ বিনা ব্যবহারে যদি স্তূপাকার হইয়া পড়িয়া থাকে, তাহা হইলে কারখানার ধারে ধারে অত্যন্ত প্রয়োজনীয় স্থান আবদ্ধ হইয়া যায়। যাঁহারা এই 'গাদের পাহাড়' দেখিয়াছেন তাঁহারা বুঝিতে পারিবেন যে, এই পর্বত প্রমাণ গাদ সরল সহজ কাজ চালাইবার পক্ষে, লোক, মাল-পত্রাদি চলা-চলের পক্ষে কত বিরাট অন্তরায়। সুতরাং পাথরের পরিবর্তে গাদ ভাঙ্গিয়া চালাইলে কেবল যে পাথর বাঁচিয়া যায় তাহা নয়, লোহার গাদ সরিয়া গিয়া যায়গা খালি হইয়া কাজের সুবিধা হয়।

* প্রধানতঃ বাড়ী পুল প্রভৃতি নক্সা (plan) কাপড়, কাগজ প্রভৃতির উপর আঁকিয়া নিখুঁত নকল রাখিবার জন্য যে নীল কাগজে ছাপ তুলিয়া লওয়া হয়, তাহাকে ব্লু-প্রিণ্টিং বা নীল-ছাপ বলা হয়।

* লোহকে উত্তপ্ত অবস্থায় পিটিয়া খুব পাতলা করা হয়! তাহার পর উহা এক এক-বার উত্তপ্ত করিয়া যথাক্রমে তৈল, তক্র, কাঁজি, গোমূত্র ও কুলত্থ কলায়ের ক্বাথে ভিজাইতে হইবে। এই প্রক্রিয়া তিনবার পালিত হইলে লোহ শোধিত হইল। শোধিত লোহ গোমূত্র-সহ মর্দন করিয়া গজপুটে পাক করিতে হয়। বারংবার গজপুটে দগ্ধ হইবার পর যখন প্রাপ্ত লোহ অঙ্গুলি পেষণে বেশ মসৃণ বলিয়া মনে হয়, তখন লোহ প্রকৃত ভস্ম হইয়াছে বলা হয়।

† ফেরি-সলফ, ফেরি ফসফেট, ফেরি পারক্লোর প্রভৃতি

‡ ফেরি সাইট্রাস, ফেরি টর্টারাস প্রভৃতি

§ ফেরাস ব্রোমাইড, ফেরাস আওডাইড, ফেরাস অক্সাইড, ফেরি কার্ব প্রভৃতি।

অনাস্বাদিত

রথীন্দ্রকান্ত ঘটক-চৌধুরী

পথ ঘাট তেতে ওঠা গরম দুপুরে।

মহানগরীর শিরা দ্রুত, উড়ন্ত ধূলির
পংকিল পতাকা ওড়ে মোটরের পিছে ঃ
একটানা বোঁ-বোঁ শব্দ,
ট্রাম-বাস গতির মিছিল—
ছোট আকাশের নীল উত্তাপ-রক্তিম।
আমি চলি ফুটপাতে—পেট্রোলের ভারি গন্ধ আসে,
ধোঁয়ার ঝাপটা চোখে, শিরায় ঝিমুনী ঃ
ধাবমান জনতার অতি ক্ষুদ্র ভগ্নাংশ আমিও।
মহানগরীর রূপমুগ্ধ মনে পরিশ্রান্ত ভাটা ঃ
সুরম্য প্রাসাদ সারি, উপভোগ্য আসবাবের হাতছানি পাই,
ধূলিকীর্ণ দৃশ্যপটে রূপলীলা মহানগরীর
তরল রক্তের স্রোতে তার স্বাদ উচ্ছল ফেনিল।
আমি চলি ফুটপাতে—পংকিল ডাস্টবিন ঘেঁসে—
ধূলিলিপ্ত জনতার স্রোতে,
ধূলির ঝাপটা চোখে। মহানগরীর সুস্থ স্বাদ
কার জিভে সে খোঁজ জানিনে।

কাহিনী খবর ভরপুরে

ঘোড়সওয়ার জওহরলাল

বর্তমানে সিমলায় বহু নেতা-উপনেতা জড়ো হয়েছেন এবং সাধারণত তাঁরা তাঁদের বাহন হিসাবে রিক্সাগাড়ি ব্যবহার



"ঘোড়ার পিঠে জওহরলালকেই মানায়"

করছেন সে তা খবরের কাগজে রিক্সারোহণে একাধিক নেতার ছবি দেখেই বুঝতে পারছেন। পণ্ডিত জওহরলাল কিন্তু এই রিক্সা চাপা মোটেই পছন্দ করেন না—তাই তাঁকে গত ৩রা জুলাই মঙ্গলবার তাঁর সিমলার বাসভবন 'আর্মসডেল' থেকে মহাত্মা গান্ধীর বাসভবন 'ম্যানর ভিলা'য় কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির সভায় যাওয়ার জন্য এক ঘোড়া এনে দেওয়া হয়। তিনি ঘোড়ার পিঠে চেপে যখন 'ম্যানর ভিলায়' চলেছিলেন—তখন একজন দর্শক বলে ওঠেন—"ঘোড়ার পিঠে জওহরলালকেই মানায়।" জিন্নাকে কিসের পিঠে মানায় সেকথা কিন্তু সেই দর্শকটি বলেননি।

হিমলারের শেষ

খবরের কাগজে পড়েছেন, মিত্রপক্ষের হাতে ধরা পড়ে জার্মানীর অন্যতম রাষ্ট্রনায়ক হিমলার বিষ খেয়ে আত্মহত্যা করে মিত্রপক্ষের হাতে লাঞ্ছনা ও অপমান থেকে নিজেকে মুক্ত করেছেন। কিন্তু কিভাবে বিষ খেলেন—কোথায় ধরা পড়লেন তা হয়তো জানেন না?

বার্লিন থেকে উত্তর জার্মানীর ফ্লেনসবার্গে চলেছেন তিনি। লোকটিকে দেখলে হিমলার বলে চেনবার জো নেই—তিনি তাঁর গোঁফটিকে কামিয়ে ফেলেছেন—নাকে তাঁর সেই 'পাঁসনে' চশমা আর নেই—তার বদলে শুধু কালিপড়া এক জোড়া চোখ। হিমলার নাম বদলে হয়েছেন—'হের হিট্‌জিন্‌গার' আর সেইমতই তাঁর নতুন নামের পরিচয়-পত্রটিও নিখুঁত ভাবে তৈরী করিয়ে সঙ্গে রেখেছেন। নিতান্ত সাধাসিধে ভদ্রলোক হয়ে তিনি চলেছেন।

কিন্তু এই নিখুঁত জাল-পরিচয়পত্র আর সাধারণ বেশভূষাই তাঁর কাল হোল। 'ব্রিমারফোর্ডে'র এক পুলের ওপরে বৃটিশ রক্ষীরা তাঁকে আটক করে পরিচয়পত্র দেখলে—নিতান্ত নিরীহ এক জার্মান অধিবাসীর পরিচয়—তবু এই হের হিট্‌জিন্‌গার সম্বন্ধে কেমন যেন তাদের সন্দেহ হলো। বৃটিশ রক্ষীরা তাঁকে এক বন্দী-শিবিরে নিয়ে গিয়ে আটক করলে। সেখানে তিন দিন থাকার পর তিনি বন্দী-শিবিরের কম্যাণ্ডাণ্টকে বললেন, "আমিই হেন্‌রিক হিমলার", তখনই এই খবর পেয়ে মিত্রপক্ষের সামরিক নিরাপত্তা বিভাগের বড় বড় কর্তারা হন্তদন্ত হয়ে ছুটে এলেন সেখানে। তাঁরা এসে হিমলারকে কড়া পাহারায় বন্দিশিবিরের বাইরে 'লুনেবার্গে'র এক ইঁট দিয়ে গাঁথা ঘরে নিয়ে গেলেন। সেখানে তাঁর দেহ থেকে পোষাক পরিচ্ছদ সমস্ত খুলে নিয়ে তন্ন-তন্ন করে পরীক্ষা করা হলো—তাঁর জামার ভিতরে লুকানো একটা ছোট্ট নীল কাঁচের শিশিতে বিষ পাওয়া গেল। তখন এক বৃটিশ সার্জেণ্ট আর এক ডাক্তার তাঁর বগলের তলা, কান, চুল উল্টে পাল্টে দেখে শরীর-তল্লাসী শেষ করে তাঁকে হাঁ করতে বললেন—মুখের ভেতরটা দেখার জন্য। সঙ্গে সঙ্গে হিমলার দাঁতে দাঁত চেপে কড়মড় শব্দ করলেন—আর সঙ্গে সঙ্গে ঘরের মেঝেয় লুটিয়ে পড়লো তাঁর দেহ। দেখা গেল তিনি তাঁর মুখের মধ্যে আর একটা ছোট্ট বিষের শিশি লুকিয়ে রেখেছিলেন। পটাসিয়াম সায়ানাইড বিষ ছিল তাতে—সঙ্গে সঙ্গে মৃত্যু ঘটলো তাই হিমলারের। হিমলারকে যাঁরা বন্দী করেছিল—তারা হিমলারের এইভাবে শাস্তি এড়ানোর ফন্দীতে ঠকে গিয়ে চটেমটে তাঁকে সেই ঘরের মেঝেতেই ফেলে রেখে দিলে দুদিন। সামরিক চিকিৎসা বিভাগের কর্তারা তাঁর মাথার খুলির প্লাস্টারের ছাপ তুলে নিয়ে রাখলেন। সবশেষে বৃটিশ সামরিক বাহিনীর কয়েকজন খুব গোপনে লুনেবার্গের তটভূমির মাটি খুঁড়ে হিমলারের দেহ পুঁতে দিলে, সেই হলো তাঁর কবর। কবর দেওয়ার সময় তাঁকে কফিনে ঢাকা



কফিন নেই—স্মৃতিস্তম্ভ নেই! পড়ে আছে হিমলারের দেহ!

হয়নি—কবরের ওপর কোনও স্মারক চিহ্ন দেওয়া হয়নি। তটভূমির বালুকারাশি কবরের মাটির শেষ চিহ্নও শিগ্‌গিরই হয়তো নিশ্চিহ্ন করে দেবে। জার্মাণ সহিদের স্মৃতিস্তম্ভ গড়ে তোলার জন্যে এ জায়গাটি যাতে কেউ কোনও-দিন খুঁজে না পায় তাই নাকি এই ব্যবস্থা। হিমলারের কবর খুঁজে পাওয়া না গেলেও হিমলারের খবর পাওয়া যাবে—ভবিষ্যতের ইতিহাসে।

চীনে কমিউনিস্টদের কীর্তি

আমেরিকার 'টাইম' পত্রিকার এক খবরে প্রকাশ—চীনের কোয়াংসি প্রদেশে জেনারেল চ্যাংকাইশেকের মরিয়া সৈন্যবাহিনীরা



চীনা কমিউনিস্ট বাহিনী,—কাঁধে ওদের কাঠের কামান!

যেখানে পশ্চাদপসরণকারী জাপানী সৈন্য-বাহিনীদের তাড়া করে নিয়ে যাচ্ছিল—সেখানে প্রাদেশিক কর্তৃপক্ষ চারজন দেশদ্রোহী কমিউনিস্টকে প্রাণদণ্ড দিয়েছেন। এই দেশদ্রোহীরা কমিউনিস্ট কর্তৃপক্ষের হুকুম অনুসারে চীনের জাতীয় সরকারের বিরুদ্ধে মিথ্যা প্রচারকার্য চালাচ্ছিল—দেশের রাষ্ট্রনায়ক ও সেনাপতিদের নামে যা তা রটিয়ে দেশের জাতীয়তাবাদী লোকদের দল ভাঙানোর চেষ্টা করছিল। এছাড়া আরও খবর পাওয়া গেছে—বহু চীনা কমিউনিস্ট গরিলা জাপানী সৈন্যবাহিনীর রক্ষাধীনে থেকে মধ্যচীনের ভেতরে ঢুকে পড়ে চীনের কেন্দ্রীয় গভর্নমেণ্টের সৈন্যবাহিনীর সঙ্গে এখানে সেখানে লড়াই বাধিয়ে জাপানী-দের সহায়তা করছিল। চুংকিং-এর সমরসচিব জেনারেল চেনচং এইসব খবর প্রকাশ করে ঘোষণা করেছেন যে, এসব সত্ত্বেও সরকারী সৈন্যবাহিনীর উপর এই নির্দেশ ছিল যে, যতক্ষণ না তারা আগে আক্রান্ত হয়, ততক্ষণ তারা কমিউনিস্টদের সঙ্গে লড়াই করবে না। কমিউনিস্টরা যে জাতীয়তা বিরোধী হয়ে উঠে দেশের সর্বনাশ করতে চায়—এটা চীন দেশেও প্রমাণিত হবে তাহলে এবার!

নির্বাচনী বক্তৃতায় অর্বাচীন কাণ্ড

গ্রেট বৃটেনের নির্বাচন দ্বন্দ্বের অনেক খবরই পড়েছেন খবরের কাগজে। সবচেয়ে মজার



"আমি না থাকলে বৃটিশ রাজত্ব উল্টে যাবে।"

খবর বেরিয়েছে বিদেশের এক কাগজে—"যখন ব্ল্যাকপুল অঞ্চলে শ্রমিকদল চার্চিলের বিরুদ্ধে বক্তৃতা দিচ্ছিলেন ঠিক সেই সময়ে এসেক্স অঞ্চলে উডফোর্ডের বড় রাস্তার ধারে এক বাগানে ঝিমঝিমে বৃষ্টিতে খালি মাথায় চার্চিল তাঁর নির্বাচন বক্তৃতার ঝুলি খুললেন। শ্রোতারা যাঁরা একটু আগেই এসে হাজির হয়েছিলেন তাঁরা বড় বড় গাছের তলায় এসে ভীড় করে দাঁড়িয়েছেন ছাতা খুলে—গ্রামের যেসব গরু ঘোড়া ঐ বাগানে চরছিল তারা ভীড় বাড়তে দেখে বেগতিক বুঝে ভয় পেয়ে হাঁক ডাক দিয়ে নিজের নিজের খোঁয়াড়-গোয়াল আস্তাবলে দৌড় মারলে চার্চিল সাহেব এসে পেঁছবার কয়েক মিনিট আগেই। চার্চিল বড় রাস্তার ধারে গাড়ি দাঁড় করিয়ে তাঁর মোটর গাড়ির পেছনের সীটে দাঁড়িয়ে বক্তৃতা আরম্ভ করলেন—বড় রাস্তার গাড়ি চলাচল বন্ধ হলো না এ জন্যে। এমন সময় প্রধান মন্ত্রী উইনস্টন চার্চিলকে গলাবাজী করতে দেখে—বড় রাস্তার এক চলন্ত বাসের দোতলার জানলা থেকে ঐ বাসের কনডাক্টরটি গলা বাড়িয়ে জোরসে চেঁচিয়ে উঠলো—"হি! উইনি!"—শ্রোতারা প্রত্যেকেই হেসে উঠলেন। উইনস্টন চার্চিলকে 'উইনি' বলে ডাকবার মত। ইয়ার-বন্ধু যে তাঁর অনেক এবং তিনি যে মহাসম্মানিত ব্যক্তি তা এবার জানলেন তো?

পুস্তক পরিচয়

সদুক্তি মুক্তাহার—পণ্ডিত শ্রীবামদেব তর্কতীর্থ সর্বদর্শনাচার্য'। প্রাপ্তিস্থান—আদর্শ পুস্তক বিতান, ১।১ গোঁসাই লেন, বাগবাজার, কলিকাতা। মূল্য আট আনা।

গ্রন্থকার পণ্ডিত ব্যক্তি। তিনি আলোচ্য গ্রন্থে উপনিষদের মহাবাক্য, চণ্ডী এবং গীতার সর্বজন পাঠ্য শ্লোকগুলির যে ব্যাখ্যা প্রদান করিয়াছেন তাহার কৌশলটি আমাদের খুব ভাল লাগিয়াছে। সংস্কৃতে অনভিজ্ঞ পাঠক পাঠিকারাও এতদ্দারা মূলের সমগ্র রস আস্বাদন করিতে সমর্থ হইবেন। মোহ মুদগরের অনুবাদও সুন্দর হইয়াছে।

চকমকি—শ্রীতারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত। প্রকাশক—শ্রীনরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, ৮সি, রমানাথ মজুমদার ষ্ট্রীট, কলিকাতা। দাম এক টাকা।

তারাশঙ্করবাবুর এই সরস নাটিকাটি 'দেশের' শারদীয়া সংখ্যায় প্রকাশিত হইয়াছিল। সাধারণের ইহা উপভোগ্য হইবে। নাটিকাটি বাঙলার সুপ্রসিদ্ধ ঔপন্যাসিক তারাশঙ্করবাবুর প্রথম বয়সের রচনা হইলেও রস বেশ জমিয়াছে।

কাঁথিত—বনফুল, (শ্রীবলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায়) প্রণীত। প্রকাশক—শ্রীজিতেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, ৮সি, রমানাথ মজুমদার ষ্ট্রীট, কলিকাতা। দাম এক টাকা।

তিন অঙ্কের নাটিকা। আমাদের ভালো লাগিয়াছে।

হিন্দু সংগীত—প্রমথ চৌধুরী, শ্রীইন্দিরা দেবী-চৌধুরাণী। বিশ্বভারতী গ্রন্থাগার, ২, বঙ্কিম চাটুজ্যে ষ্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য আট আনা।

সরল এবং সহজ ভাষায় হিন্দু সংগীতের পরিচয় দেওয়া হইয়াছে। আলোচনা বেশ জমাট। সংগীত শাস্ত্রের সম্বন্ধে মোটামুটি জ্ঞানলাভ করিতে আলোচ্য পুস্তিকাখানি বিশেষ সাহায্য করিবে।

প্রাচীন ভারতের সংগীত চিন্তা—শ্রীঅমিয়নাথ সান্যাল প্রণীত। বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়, ২, বঙ্কিম চাটুজ্যে ষ্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য আট আনা।

আলোচ্য পুস্তকখানিতে ভারতের প্রাচীন সংগীতের সম্বন্ধে বৈজ্ঞানিকভাবে আলোচনা করা হইয়াছে। সমগ্র আলোচনা গভীর চিন্তাশীলতার দ্যোতক। লেখক পারিভাষিক জটিলতা হইতে মুক্ত করিয়া দার্শনিকতার দিকটা বুঝাইয়া দিয়াছেন, এজন্য আলোচনা সহজবোধ্য এবং সরস হইয়াছে।

যেতে নাহি দিব—শ্রীরুদ্রকান্ত দাস প্রণীত। সারথী পাবলিশিং হাউস, ২৭, ফড়িয়াপুকুর ষ্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য আট আনা।

ছোট গল্পের বই। যেতে নাহি দিব, ভুলিয়া গেও স্মৃতি, বুভুক্ষু মায় হু এই তিনটি গল্প আছে। লেখক তরুণ সাহিত্যিক, জীবনে তাঁহার এই প্রথম লেখা; গল্প কয়টিতে তাঁহার ক্ষমতার পরিচয় পাওয়া যায়।

শেষ ট্রেন—আধুনিক কবিতার বই। লিপি সদন সাহিত্য সংসদ, ২৪বি, নূরমহম্মদ লেন, কলিকাতা। মূল্য দশ আনা।

বাঙলার আধুনিক কবিদের লিখিত কুড়িটি কবিতা এই পুস্তকে আছে। প্রেমেন্দ্র মিত্র, অমিয় চক্রবর্তী, অন্নদাশঙ্কর রায়, সঞ্জয় ভট্টাচার্য, জগদীশ ভট্টাচার্য, গোপাল ভৌমিক, কামাক্ষীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়, অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত, জীবনানন্দ দাস। ইঁহাদের ন্যায় যশস্বী লেখকদের লেখা সর্বত্র সমাদৃত হইবে।

বনফুলের আরও গল্প—শ্রীবলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায় প্রণীত। প্রকাশক—শ্রীজিতেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়। ৮-সি, রমানাথ মজুমদার ষ্ট্রীট, কলিকাতা। দ্বিতীয় সংস্করণ, মূল্য তিন টাকা।

বনফুলের ছোট গল্পের পরিচয় বাঙলার পাঠক সমাজকে দেওয়া অনাবশ্যক। আলোচ্য পুস্তকের প্রথম সংস্করণে গল্পগুলি যথেষ্ট খ্যাতি লাভ করিয়াছে। প্রত্যেকটি গল্প রস-ধর্মে ভরপুর। ছাপা, বাঁধাই সুন্দর।

গঙ্গোত্রী

সুবোধ ঘোষ

(৩৬)

বাসন্তীর অবসন্ন মনে একটি কল্পনার রঙ শুধু লেগে থাকে। একটি উৎসবের দিন। সেদিন সবাই থাকবে। সবার কাছে থেকে বিদায় নিয়ে চলে যেতে হবে। এই প্রতীক্ষার মেয়াদ শীঘ্রই ফুরিয়ে যাক্। জীবনের একটা নির্বাচিত মুহূর্তে হঠাৎ গোধূলির আভা দেখা দিক্, শাঁখ বাজুক। ধীরে ধীরে দশ দিক উদাস হয়ে আসুক। জীবনে মুখ ফুটে চাইবার সকল লজ্জাকে সেই লগ্নে বলিদান দিয়ে, এক অপরিচয়ের জগতে একজনের হাত ধরে অদৃশ্য হয়ে যাবে সে। সেদিন যেন বিদায়ের বেদনা আর এক তিল স্পর্শ না করে। তারপর দেখা যাবে। ভিন্ন পৃথিবীতে ভিন্ন নিয়মে জীবন আরম্ভ হবে, তার জন্য কোন ভয় নেই, দুঃখ নেই বাসন্তীর। সে শুধু চায়, সারা জীবন ধরে যেন কোন দীর্ঘশ্বাস তার পেছু পেছু ছায়ার মত ঘুরে না বেড়ায়। তা হ'লে আর জীবনে চল্‌তে পারবে না কখনও, শুধু পালিয়ে পালিয়ে বেড়াতে হবে।

কে জানে সে কেমন, যার সঙ্গে আর কটি দিন পরেই তার জীবন গ্রন্থিবন্ধ হয়ে যাবে। বাসন্তী বিশ্বাস করে, যেমনই হোক্ সে জগৎ, সেখানেও সাধে আহ্লাদে কাজে ও আগ্রহে মিশে যাবার মত সব কিছুই আছে। কোন ভুল যেন তার এই নতুন জীবনের অধ্যায় দুর্বোধ্য না করে দেয়।

আজ ভাবতে গিয়ে লজ্জিত হয়ে পড়ে বাসন্তী। নিজেকে অত্যন্ত ছোট মনে হয়, সমস্ত ব্যাপারটাই যেন শুধু লোক হাসাবার মত। কিন্তু লোকে জানে না, এই একমাত্র রক্ষা। সমস্ত পৃথিবীর মধ্যে সে শুধু একলাই জানে যে কেশবদাকে তার ভাল লাগে। কেশবদার মত মানুষের সঙ্গে জীবনে আপন হয়ে থাকতে ইচ্ছে করে। কিন্তু এই ইচ্ছা আজ পর্যন্ত তারই মনের একান্তে একটা প্রতিধ্বনি মাত্র। কেউ আজ পর্যন্ত শুনতে পায় নি। কেশব ভট্টচাযের কল্পনায় অনুমানে ও সংশয়ে কোন মুহূর্তে এই আবেদনের আভাষ পর্যন্ত পৌঁছয় নি, যার জন্য বাসন্তীর জীবনের সব চেয়ে মূল্যবান সত্যটি উৎসর্গ হয়ে আছে। কিন্তু সে যে নিতান্তই অলক্ষ্য অগোচর ও নিভৃতের বন্দী। তাই তার বেদনাও বুঝি এত তীব্র এত প্রতিকারহীন। এই অনর্থক অধ্যায় সমাপ্ত করে দেবার দিন আগত।

আর কিছু নয়। মাধুরীর জীবনের বিকৃতি যেন কারও মনুষ্যত্বকে আর পথ ভুল না করিয়ে দিতে পারে, তারই আয়োজন পূর্ণ করে দিয়ে, একটি উৎসবের বিদায়ী সন্ধ্যার আলো বাঁশী শাঁখ আর মন্ত্রের জন্য শুধু অপেক্ষা করে থাকে বাসন্তী।

সঞ্জীববাবু কিছুক্ষণ হতভম্বের মত মাধুরীর দিকে তাকিয়ে রইলেন। তারপরেই ভ্রূকুটি করে বললেন—হঠাৎ চলে এলি যে, গ্রামের সুখ সইলো না বুঝি?

মাধুরী—সব পুড়ে গেছে।

চমকে উঠলেন সঞ্জীববাবু। কিন্তু এই চমকিত চেহারার মধ্যে আতঙ্ক বা বেদনার ছাপ ছিল না। একটু লক্ষ্য করলেই বোঝা যায়, সঞ্জীববাবুর দু'ঠোঁটে একটা হাসির কুটিল রেখা ধীরে ধীরে ফুটে উঠছে, যেন একটা ঈপ্সিত ঘটনার সংবাদ দু'কান ধন্য করে শুনছিলেন সঞ্জীববাবু।

মাধুরী—কিন্তু তোমার ইচ্ছে পূর্ণ হয়নি।

এইবার সত্যিই আতঙ্কিতের মত চমকে উঠলেন সঞ্জীববাবু। চেঁচিয়ে উঠলেন—আমার ইচ্ছা? এসব কথা কোথায় শুনলি?

মাধুরী—আমাদের বাড়ি পুড়ে গেছে। কেশব ভট্টচাযের বাড়ী পোড়েনি।

সঞ্জীববাবুর সারা মুখ বীভৎসভাবে বিবর্ণ হয়ে উঠলো। যেন তার পায়ের তলার মাটি সরে যাচ্ছে, সেইরকম একটা শঙ্কায় অসহায়ভাবে এক একটা আর্ত শব্দ ছাড়তে লাগলেন—অকৃতজ্ঞ, সব অকৃতজ্ঞ, নরাধম, গাঁয়ের মানুষ সাপের চেয়ে ভয়ানক, কী বিশ্বাসঘাতক!

মাধুরীও হেসে ফেললো। কিন্তু চোখের দৃষ্টিতে অদ্ভুত রকমের একটা প্রদাহ ছিল।—হ্যাঁ সত্যিই বিশ্বাসঘাতক।

মাধুরী আবার হঠাৎ একটু নিষ্ঠুর রকমের ধূর্ত হয়ে যেন ঠাট্টা করলো—তুমি কার কথা বলছো বাবা? কে বিশ্বাসঘাতক?

সঞ্জীববাবু—সবাইরে সবাই। কে নয়? তোর স্বর্গাদপি গরীয়সী ঐ মান্দার গাঁ আমার কাছে নরকেরও অধম। আমার সর্বনাশ ছাড়া এরা আর কিছু করতে শেখেনি।

মাধুরী—বেছে বেছে তোমার ওপর ওদের এত রাগ কেন বাবা!

সঞ্জীববাবু—হিংসে, আমাকে হিংসে করে। কেন আমি বড়লোক হয়ে গেলাম, এই আমার অপরাধ।

মাধুরী—কিন্তু তোমার মতে যার ঘর পুড়ে যাওয়া উচিত ছিল, সে কি তোমার ওপর হিংসে করে?

সঞ্জীববাবু—একটু কঠোরভাবে তাকিয়ে বললেন—তুই কি সবই জেনে ফেলেছিস্?

মাধুরী—হ্যাঁ।

সঞ্জীববাবু—কে বললে!

মাধুরী—ভজু নিজ মুখে বলে গেছে।

—বুঝেছি, ছোট একটা প্রতিহিংসার হুঙ্কার ছেড়ে সঞ্জীববাবু একেবারে চুপ করে গেলেন। তার পর যেন তাঁর স্মৃতির ভাণ্ডার তন্ন তন্ন করে খুঁজে এক একটা পুরানো ক্ষত ক্ষতি বেদনা ও অপমানের জ্বালাকে টেনে বার করতে লাগলেন,—আমাকে চিরদিন অপমান করে এসেছে কেশব, চল্লিশ বছর আগে কেশবের বাবা আমাকে অপমান করেছিল। আমার জীবনের

আকাঙ্ক্ষাকে সব দিক দিয়ে ব্যর্থ ও অপমান করার জন্যই এই বংশটীর জন্ম হয়েছিল।

মাধুরী বিস্মিতভাবে সঞ্জীববাবুর মুখের দিকে তাকিয়েছিল। মাথা ভরা পাকা চুল, বার্ধক্যের জীর্ণতার আভাষ লেগেছে, সারা শরীরটা শীতাহত বনস্পতির রিক্ততার মত। আর কদিনই বা বাঁচবেন। জীবন ও আয়ুর উত্তাপ শেষ অঙ্গারের মত ধীরে ধীরে ধুক্ধুক্ করছে, তবু আজ বৃদ্ধ সঞ্জীববাবুর চোখের দৃষ্টিতে, মুখের ভাবে ও বুকের নিশ্বাসে এক অদ্ভুত চাঞ্চল্য! কী জ্বলন্ত অভিমান ও প্রতিহিংসা! তাঁর যৌবনের অভিমান আজও যেন স্পষ্ট শবমূর্তি ধরে রয়েছে। তাঁর চলার পথে সম্মুখের মাঠে মান্দার গাঁয়ে সন্ধ্যা নামছে, সকল গতি অবসন্ন হয়ে আসছে, তবু জীবনের সেই প্রথম আক্ষেপকে আজও সহচর করে রেখেছেন।

শোনা যায়, মানুষের মৃতদেহকে সৎকারের জন্য যখন আগুনে দেওয়া হয়, তখন সেই মৃতের মুখটা কেমন হাসিহাসি দেখায়। অতিবৃদ্ধের চেহারাও কেমন তরুণ ললিত ও করুণ হয়ে ওঠে। মাধুরী হয়তো সেই রকমেরই একটা বিস্ময়কর দৃশ্যের দিকে তাকিয়েছিল। সঞ্জীববাবুর বেদনারক্ত উত্তেজিত মুখটা অত্যন্ত কমবয়সের মনে হয়। তরুণ জীবনের স্মৃতির জ্বালাগুলি শিখা হয়ে যেন সঞ্জীববাবুকে ঘিরে ধরেছে। অদ্ভুত দেখাচ্ছিল সঞ্জীববাবুকে।

মাধুরীর বিস্ময় ধীরে ধীরে গলে গিয়ে মমতার প্লাবনের মত সারা হৃদয় সিক্ত করে তুলছিল। সঞ্জীববাবুকে এভাবে কখনো চিনতে ও বুঝতে পারেনি মাধুরী। কোন দিন মুহূর্তের মতও কোন কথাচ্ছলেও সঞ্জীববাবুর এই পরিচয় সে জানতে পারেনি। এতদিন ধরে শুধু বিষয়ে সম্পদে ও বিজ্ঞতায় কৃতী পিতাকে শ্রদ্ধা করে এসেছে মাধুরী। সঞ্জীববাবুর বিজ্ঞতার ত্রুটি দেখলে মাধুরী ক্ষুণ্ণ হয়েছে। সঞ্জীববাবুর কৃপনতা দেখলে কুণ্ঠিত বোধ করেছে মাধুরী। এর বেশী কোন ত্রুটি সঞ্জীববাবুর মধ্যে আবিষ্কার করতে পারেনি। কিন্তু আজ হঠাৎ মেঘভাঙা চাঁদের আলোকের মত একটা ইতিহাসের রহস্য যেন দূর অতীতের বেদনাকে স্পষ্ট করে ধরিয়ে দিয়েছে। মাধুরী বিহ্বল হয়ে ভাবতে থাকে, তাই কি সত্যি? কেশবদার বাবা কি অপমান করেছিলেন? কোন্ ধরণের অপমান? কেশবদার বাবার কাছে সঞ্জীববাবু পরাজিত হয়েছিলেন—কি সেই পরাজয়? কী এত করুণ ও মর্মান্তিক সেই পরাজয়, যার বেদনা আজও এই বৃদ্ধের বিশ্বাসকে পুড়িয়ে মারছে? চিন্তার এই সংশয় ও কৌতূহলের আলোড়নের মধ্যে কোন স্পষ্ট উত্তর না শুনতে পেলেও মাধুরীর হঠাৎ মনে পড়ে যায়—কেশবদার মা, সারদা জেঠীমা সত্যিই খুব সুন্দরী।

জীবনে সঞ্জীববাবুকে নতুন করে শ্রদ্ধা করতে পারছে আজ মাধুরী। এই শ্রদ্ধার আবেশে সঞ্জীববাবুর সব অপরাধের তালিকা ভেসে চলে যায়। কে বলতে পারে, সঞ্জীববাবু গ্রাম-ছাড়া মানুষ, সদর মীরগঞ্জের বড় উকীল, বিষয়ী, যশস্বী ও বিজ্ঞ। কিছুই বদলাননি তিনি। জোর করে একটা কপট তপস্যার জোরে নতুন একটা মূর্তি ধরে রয়েছেন। কিন্তু এই ঘোর পরিবর্তনের আড়ালে সেই চল্লিশ বছর আগের এক গ্রাম্য কিশোরের রাগ ও অভিমান অটুট রয়ে গেছে। গ্রাম থেকে সরে এলেছেন সঞ্জীববাবু, কিন্তু এই গ্রামেরই কোন্ এক দূর অতীতের স্বপ্নাবিষ্ট প্রহেলিকার ছবিটিকে ছাড়তে পারেননি। এই একটি অপ্রাপ্তি তার জীবনের সহস্র অর্জন ও প্রাপ্তিকে একেবারে না-পাওয়া করে রেখেছে।

সঞ্জীববাবু বললেন—যখন বুঝলাম, কেশবের হাতে তোকে সঁপে দিতে হবে তখন.....।

মাধুরী—তখন আমায় সাবধান করে দিলেই পারতে বাবা। তুমি চুপ করে থেকে আমার সব ভুল করে দিয়েছিলে।

সঞ্জীববাবু—হ্যাঁ, আমি চুপ করেই সব অপমান সহ্য করেছি, শুধু হেরে যাবার জন্যই আমি জন্মেছিলাম।

মাধুরীর মুখ হঠাৎ অস্বাভাবিক রকমের রক্তিম হয়ে ওঠে, অন্তরের গহনে একটা রূঢ় প্রতিধ্বনি শুনতে পায়। বহু মোহ, বহু ছলনা, বহু ভীরুতাকে চূর্ণ করে দিয়ে তার জীবনের এক নতুন প্রতিজ্ঞা আজ স্পষ্ট ভাবে নিজেকে ঘোষণা করতে চাইছে, মাধুরী বলে—কিন্তু তুমি হেরে যাওনি বাবা।

সঞ্জীববাবু—তার অর্থ?

মাধুরী—কেশব ভট্চার্যের মত মানুষের কাছে আমাকে যদি তুমি আজ সঁপে দাও, তাহলে আমার ওপর অন্যায় করা হবে।

সঞ্জীববাবু যেন একটু বিরত হয়ে উঠলেন। একটু গম্ভীর ভাবে চিন্তাবিষ্ট থেকে বললেন—পরিতোষ তোকে কিছু বলেছে না কি?

মাধুরী—পরিতোষের কথা থাক্।

সঞ্জীববাবু—কেন?

মাধুরী—তাকে আমি বুঝতে পারি না। তাকেও বিশ্বাস নেই।

সঞ্জীববাবু—কেন?

মাধুরী—সেও কেশব ভট্চার্যের একজন ভক্ত।

সঞ্জীববাবু হাসলেন—দেখছিস তো, কেশব ভট্চাযের মহিমা। আমার যা কিছু কেড়ে নেবার জন্যই ওদের জন্ম।

মাধুরী—ওরা তোমার শত্রু হয়ে দাঁড়িয়েছে, কিন্তু তুমি আজ ইচ্ছে করলেই ওদের জব্দ করতে পার।

সঞ্জীববাবু—হ্যাঁ, ওরা শত্রু হয়েই দাঁড়িয়েছে। পরিতোষ আর অজয় এসেছে কেশবকে জেল থেকে ছাড়িয়ে নেবার জন্য।

মাধুরী—ওঁদের মধ্যে একমাত্র খাঁটি মানুষ অজয়দা।

সঞ্জীববাবু একটু কৌতূহলী হয়ে বললেন—কে বললে!

মাধুরী—আমি জানি।

সঞ্জীববাবু—আর কিছু জেনে লাভ নেই মাধুরী। তুই কিছু ভাবিস না। আবার কলেজে ভর্তি হয়ে যা। আমিও আর বেশি দিন এখানে থাকবো না। তোর পরীক্ষা হয়ে গেলেই মীরগঞ্জ ছেড়ে চলে যাব। পশ্চিমের কোন একটা শহরে বাকি ক'টা দিন কাটিয়ে দেব, আর যেন মান্দার গাঁয়ের কোন ভাষা কানে শুনতে না হয়।

মাধুরী—ওরা বোধ হয় তোমার বিরুদ্ধে একটা জঘন্য মামলা দাঁড় করাবে।

সঞ্জীববাবু—কিসের মামলা।

মাধুরী—কেশব ভট্চাযের ঘরে আগুন লাগাবার ষড়যন্ত্র করেছ তুমি, এই অভিযোগ আনবে।

সঞ্জীববাবু হাসছিলেন।—কে কে সাক্ষী দেবে রে মাধুরী?

মাধুরী—সাক্ষী দেবার লোক আছে।

সঞ্জীববাবু—আমার পক্ষে সাক্ষী আছে।

মাধুরী—তোমার পক্ষে?

সঞ্জীববাবু—হ্যাঁ, আমার পক্ষে তোর সারদা জেঠিমাই সাক্ষী দেবে। কেশব ভট্চাযের ঘরে আমি আগুন দিতে পারি না। এটা অসম্ভবের চেয়েও অসম্ভব। এই কথা সব চেয়ে ভাল করে, শপথ করে যে বলতে পারবে, সে হলো তোর সারদা জেঠিমা।

মাধুরী—কিন্তু বাসন্তীর কথায় বুঝলাম, তোমার হাতের লেখা চিঠি আর টাকা ভজুর কাছে ছিল। ভজু সে চিঠি অজয়দার বাড়িতে ফেলে রেখে গেছে।

সঞ্জীববাবু আবার হেসে উঠলেন,—তোর বন্ধু বাসন্তী আমার ওপর ভয়ানক রেগে আছে। ও চিঠিতে কিছু নেই। ওসব বাসন্তীর কথার চালাকি।

মাধুরী—সত্যি কিছু নেই না বাবা?

সঞ্জীববাবু—আরে না।

মাধুরীর মন থেকে যেন একটা পাথরের বোঝা নেমে গেল। ইস, বাসন্তীর মত গেঁয়ো মেয়েও কি ধূর্ত বাবা!

সঞ্জীববাবু—ভয়ানক! আমি জানি গেঁয়ো মেয়ে কি ভয়ানক জীব!

মাধুরী কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে কি একটা কথা ভেবে নেয়, মনের শেষ দুশ্চিন্তাকে দূর করে দিয়ে মুক্ত হবার জন্য যেন সমবয়সী সুহৃদের মতই সঞ্জীববাবুকে সাগ্রহে জিজ্ঞাসা করে—ভজুকে তুমি সত্যিই কিছু বলেছিলে কি বাবা? অবশ্য আর কোন ভয় নেই, ভজু নিজেই শেষ হয়ে গেছে।

সঞ্জীববাবু ভীরু ভয়ার্তের মত বললেন—কবে?

মাধুরী—কাল রাত্রেই মারা গেছে ভজু। আজ সকালে খবর শুনেছি।

সঞ্জীববাবুর ভয়ার্ত ভাব পরমুহূর্তে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেল। যাক, সব জ্বালা মিটে গেছে ভজুর। জীবনে আমাকেই একমাত্র সহযোগী হিসাবে পেয়েছিল ভজু।

মাধুরী চমকে উঠলো—তাহলে কথাটা সত্যি?

সঞ্জীববাবু—হ্যাঁ সত্যি। কেশবের ঘরে আগুন দেবার জন্য আমি বলেছিলাম।

মাধুরী—মাপ করো বাবা, আমি বুঝতে পারছি না, তুমি এত বুদ্ধিমান হয়ে একাজ করতে পার।

সঞ্জীববাবু—বুদ্ধিমান বলেই এ কাজ করতে চেয়েছিলাম।

মাধুরী—তোমার এতে কি লাভ বাবা?

সঞ্জীববাবু—লাভ ছিল বৈকি। একটা আশা ছিল।

মাধুরী উৎকর্ণ হয়ে রইল।

সঞ্জীববাবু যেন মনে মনে দূর অতীতের এক রাশি ঘটনার অস্পষ্ট স্মৃতির আড়ালে ঝাপসা হয়ে নিজের মনে বিড় বিড় করতে লাগলেন—আশা ছিল, ওরা এইবার শিক্ষা পাবে। সারা গাঁয়ে মানুষ নেই, ঘর পুড়ে গেলে ওদের কে আশ্রয় দিত। আমিই দিতাম, আমিই দিতাম। আমার আশ্রয়েই সারদাকে আসতে হতো। আশা ছিল বৈকি।

মাধুরী স্তম্ভিত হয়ে দাঁড়িয়ে শুধু দেখছিল, সঞ্জীববাবুর চোখ দিয়ে ঝর ঝর করে জল পড়ছে। মাধুরী অনুযোগ করলো—তুমি বড় ছেলেমানুষ বাবা!

(ক্রমশঃ)

কবিতা

নিরাশায়

শ্রীজাহাঙ্গীর ভকিল

[শ্রীজাহাঙ্গীর ভকিল—জাতিতে পার্শী। ইনি অক্সফোর্ডের উচ্চ ডিগ্রিধারী। এক সময়ে ইনি শান্তিনিকেতন—বিশ্বভারতীতে অধ্যাপনা করিতেন। তখন বাংলা শিখিয়াছিলেন। ইনি ইংরাজিতে খুব ভালো কবিতা লেখেন। বিদেশী পত্রিকায় ইঁহার ইংরাজি কবিতা প্রকাশিত হয়। ইঁহার রচিত বাঙলা কবিতা অনেক সাময়িক পত্রে প্রকাশিত হইয়াছে। এই কবিতাটি প্রায় কুড়ি বৎসর পূর্বে রচিত]

তবে যাত্রা করো শেষ
নাহি শক্তি-লেশ।
তুমি দিশাহারা
রাতির নিঃশ্বাস দিয়াছে নিবায়ে তব যত শশী তারা।
হৃদয়ে তোমার নাহি গান,
ক্ষীণ তব প্রাণ
বলে অবিশ্রাম, বলে শুধু যাই, যাই, যাই
বলে দুঃখ হ'তে, সুখ হ'তে চাই পরিত্রাণ।
নাহি তব শস্ত্র, নাহি আত্ম বল,
নাহি মুখে অন্ন, নাহি কূপে জল,
নাহি গৌরবের লেশ
যাত্রা করো শেষ।
পাথেয় নাহিকো আর,
তবে কেন অশ্রু-ভরা আঁখি
নির্দয় আকাশে রাখি
ভিক্ষা-মাগা শুধু বারে বারে?
তার চেয়ে শেষ গান গাও,
বীরের হৃদয়ে, ধীর পদে ধাও,
মহা শান্তি যেথা আছে জাগি,
তোমা লাগি,
যেথা সন্ধ্যার নয়ন
আলো-ছায়ার মিলন
নিজেরে হেরিয়া থাকে সুবিরলে
ধ্যান-রত জলে।
সেথা হ'তে শুধু চাও
শুধু হেসে নাও,
—ও চরম অভিমান, ও গরবী মন,
প্রেমপদে মাথা রাখা শীতল মরণ॥



"আর্মসডেলে" সংবাদপত্রের প্রতিনিধিগণের এক সম্মেলনে পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু হাস্য-পরিহাস করিতেছেন।



মৌলানা আবুল কালাম আজাদ ওয়ার্কিং কমিটির একজন সদস্যকে পরিহাস করিতেছেন। পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু এবং ডাঃ রাজেন্দ্রপ্রসাদ উহা উপভোগ করিতেছেন।

ফুটবল

কলিকাতা ফুটবল লীগ প্রতিযোগিতার প্রথম ডিভিসনের চ্যাম্পিয়ানসিপ লইয়া বর্তমানে মোহনবাগান ও ইষ্টবেঙ্গল দলের মধ্যে তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতা আরম্ভ হইয়াছে। গত সপ্তাহ পর্যন্ত ভবানীপুর দল এই দুইটি দলের সমপর্যায় ছিল; কিন্তু বর্তমানে এই দলের সেইরূপ গৌরবজনক অবস্থা আর নাই। লীগ প্রতিযোগিতার শেষ তালিকা যখন রচিত হইবে তখন ভবানীপুর দলকে তালিকার তৃতীয় স্থানেও দেখা যাইবে কিনা সেই বিষয় যথেষ্ট সন্দেহ আছে। গোলরক্ষক ইসমাইল মোহনবাগানের খেলায় আহত হইয়া খেলা হইতে অবসর গ্রহণ করিবার পর হইতেই ভবানীপুর দল সমানে পয়েন্ট হারাইতে আরম্ভ করিয়াছে। দলের পরিচালকগণ বিভিন্ন স্থান হইতে খেলোয়াড় আনাইয়া শক্তি বৃদ্ধি করিতে চেষ্টা করিতেছেন; কিন্তু সেই প্রচেষ্টা ব্যর্থ হইয়াছে। দল একেবারেই শক্তিহীন হইয়া পড়িয়াছে। ভবানীপুর দলের এইরূপ শোচনীয় পরিণতি আমরা কল্পনা করিতে পারি নাই। তবে ইহা প্রথমার্ধের সকল খেলা শেষ হইলে জোর করিয়াই বলিয়াছিলাম "ভবানীপুর শেষ পর্যন্ত লড়িতে পারিবে না। ফলত তাহাই হইল।

মোহনবাগান দল গত দুই বৎসরের চ্যাম্পিয়ান। সুতরাং এই বৎসর পুনরায় চ্যাম্পিয়ান হইলে মহমেডান স্পোর্টিং দল পর পর তিন বৎসর চ্যাম্পিয়ান হইয়া ভারতীয় দলের মধ্যে সর্বপ্রথম যে কৃতিত্ব অর্জনে সক্ষম হইয়াছিল মোহনবাগান তাহারই পুনরাবৃত্তি করিবে। কিন্তু সেই গৌরব লাভ করিবে বলিয়া ভরসা করা যায় না। ক্রীড়ানৈপুণ্যের বিচারে ইষ্টবেঙ্গল দলই মোহনবাগান অপেক্ষা বিভিন্ন খেলায় উন্নততর নৈপুণ্য প্রদর্শন করিতেছে। ইহা ছাড়াও দলের প্রত্যেক খেলোয়াড় অধিকাংশ খেলায় অপূর্ব দৃঢ়তার পরিচয় দিতেছে। লীগের দ্বিতীয়ার্ধের খেলা আরম্ভ হইবার পর হইতে এই পর্যন্ত কোন খেলায় কোন পয়েন্ট নষ্ট করে নাই। এমন কি প্রত্যেক খেলায় প্রতিদ্বন্দ্বী দলকে শোচনীয়ভাবে পরাজিত করিয়াছে। কিন্তু মোহনবাগান দল সেইরূপ কৃতিত্ব অর্জনে সক্ষম হয় নাই। দ্বিতীয়ার্ধের সূচনা হইতে এই পর্যন্ত কোন খেলায় পরাজিত হয় নাই সত্য, প্রত্যেক খেলায় কোনরূপে নিজেদের সম্মান রক্ষা করিয়াছে। সেই জন্যই মনে হয়, ইষ্টবেঙ্গল দলই এই বৎসরের লীগ চ্যাম্পিয়ান হইবে। কোন দল এই সৌভাগ্যলাভে সক্ষম হয় দেখা যাক।

চ্যারিটী ম্যাচ

লীগ প্রতিযোগিতার সকল খেলা অনুষ্ঠিত হইবে, আর কোনই চ্যারিটী ম্যাচ অনুষ্ঠিত হইবে না। এমন কি আই এফ এ-র পরিচালকমণ্ডলী "রবীন্দ্রনাথ মেমোরিয়াল ফাণ্ডের" অর্থ সংগ্রহের জন্য যে চ্যারিটী ম্যাচের বন্দোবস্ত করিয়াছিলেন, তাহাও শেষ পর্যন্ত অনুষ্ঠিত হইবে, ইহাই ছিল সকলের দৃঢ় ধারণা। কিন্তু বর্তমানে সেইরূপ আশঙ্কা করিবার মত আর অবস্থা নাই। পুলিশ কমিশনার ও আই এফ এ-র পরিচালকমণ্ডলীর মধ্যে দর্শকদের বসিবার স্থান লইয়া যে গণ্ডগোল আরম্ভ হইয়াছিল তাহা সন্তোষজনক সর্তে মিটমাট হইয়াছে। পুলিশ কমিশনার গ্যালারী ছাড়া মাঠে বসিবার অনুমতি দিয়াছেন। এমনকি বিভিন্ন ক্লাবের সভ্যদের বসিবার স্থান লইয়া কণ্ট্রাক্টরের সহিত যাহাতে কোনরূপ গোলমাল না হয় তাহার দিকে বিশেষ দৃষ্টি রাখিবেন। বিভিন্ন ক্লাব যাহাতে উপযুক্ত স্থান লাভ করে



তাহার ব্যবস্থা করিবেন। আই এফ এ-র পরিচালকগণ এই সকল সর্তে যে খুব সন্তুষ্ট হইয়াছেন তাহা নহে। তাঁহারা খেলার মাঠের সকল অসুবিধা দূর করিবার জন্য বাঙলার গভর্নর বাহাদুরের নিকট ডেপুটেশন পাঠাইবেন বলিয়া যে সিদ্ধান্ত পূর্বে গ্রহণ করিয়াছিলেন তাহা বলবৎ রাখিয়াছেন। আই এফ এ-র সভাপতি স্যার খাজা নাজিমুদ্দীন সিমলা হইতে প্রত্যাবর্তন করিলেই "ডেপুটেশন" প্রেরণ করা হইবে। চ্যারিটী ম্যাচসমূহ একেবারে বন্ধ রাখিলে অনেক দরিদ্র প্রতিষ্ঠানের ক্ষতি হয় বিবেচনা করিয়া আই এফ এ চ্যারিটী অনুষ্ঠানের যে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছিলেন তাহা প্রত্যাহার করিয়াছেন। সেইজন্য পুনরায় পাঁচটি চ্যারিটী ম্যাচ অনুষ্ঠিত হইবে বলিয়া স্থির হইয়াছে। ২১শে জুলাই ইষ্টবেঙ্গল ও মোহনবাগানের লীগ প্রতিযোগিতার শেষ খেলাটি রবীন্দ্র মেমোরিয়াল ফাণ্ডের অর্থ সংগ্রহের উদ্দেশ্যে অনুষ্ঠিত হইবে বলিয়া স্থির করিয়াছেন। অন্যান্য যে সকল চ্যারিটী ম্যাচ খেলা হইবে সেই সম্পর্কে আমাদের বলিবার কিছুই নাই, তবে রবীন্দ্র মেমোরিয়াল ফাণ্ডের এই চ্যারিটী ম্যাচে যাহাতে বেশী টাকা সংগৃহীত হয়, তাহার জন্য যদি বিশেষ ব্যবস্থা করা হয় আমরা সুখী হইব।

সাধারণ দর্শকদের স্থান

চ্যারিটী ম্যাচসমূহ অনুষ্ঠিত হইবে ইহা সুখের বিষয়। বিভিন্ন ক্লাবের সভ্যগণ প্রয়োজনীয় বসিবার স্থান পাইবেন ইহাও আনন্দের কথা। কিন্তু সাধারণ দর্শকদের খেলা দেখা সম্পর্কে যে সকল অভাব অভিযোগ আছে তাহার কি হইল? তাঁহারা কি যে তিমিরে ছিলেন সেই তিমিরেই থাকিবেন? তাঁহাদের জন্য কি বিশেষ ব্যবস্থা কোনদিনই হইবে না? "ষ্টেডিয়াম নির্মিত না হইলে সাধারণ দর্শকদের অসুবিধা কোনদিনই বিদূরিত হইবে না" বলিয়া যে বিভিন্ন পত্রিকা, বিভিন্ন বিশিষ্ট ব্যক্তি বিবৃতি দিলেন তাহা কি কেবল অরণ্যে রোদনের সামিল হইল? ইহাদের জন্য কি কোনরূপ আন্দোলন হইবে না? আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস এই আন্দোলন শীঘ্রই আরম্ভ হইবে এবং আন্দোলন এমন তীব্রভাব ধারণ করিবে যে, বিভিন্ন ক্লাবের অস্তিত্ব রাখা অসম্ভব হইয়া পড়িবে। কারণ সাধারণ দর্শকগণই বিভিন্ন ক্লাবের সভ্যসংখ্যা বৃদ্ধি করিয়া থাকেন। তাঁহাদের মধ্যে যদি সকল সময় তীব্র অসন্তোষ বর্তমান থাকে তবে ভবিষ্যৎ ফল কখনই ভাল হইতে পারে না।

সন্তরণ

বাঙলার সন্তরণ পরিচালকমণ্ডলী নবভাবে গঠিত হইবে শোনা যাইতেছে। যাঁহারা এইরূপ গঠনের উদ্দেশ্যে উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়াছেন তাঁহারা সাফল্যমণ্ডিত হইলে আমরা আনন্দিত হইব। তবে তাঁহাদের এইটুকু স্মরণ করাইয়া দিতে চাহি যে, এই নবগঠিত এসোসিয়েশনের পরিচালকমণ্ডলীতে অধিকাংশ লোক এমন থাকা প্রয়োজন যাঁহাদের সন্তরণের বিভিন্ন বিষয়ের বিশেষ জ্ঞান আছে। উচ্চপদস্থ, বিত্তশালী জ্ঞানহীন লোকদের সংখ্যা বেশী হইলে পূর্বে গঠিত এসোসিয়েশনের ন্যায় কোন কিছু না করিতে দেখা যাইবে। বাঙলায় সন্তরণোৎসাহীর অভাব নাই, অভাব কেবল প্রকৃত পরিচালনার এবং কেবল তাহা সম্ভব হইতে পারে যদি জ্ঞানসম্পন্ন লোকদের এসোসিয়েশনের পরিচালকমণ্ডলীতে গ্রহণ করা হয়। আমরা আশা করি এই সকল বিষয়ে বিশেষ দৃষ্টি রাখিয়াই নূতন পরিচালকমণ্ডলী গঠন করা হইবে।

সাপ্তাহিক সংবাদ

দেশী সংবাদ

৫ই জুলাই—মৌলানা আজাদের ভবনে ওয়ার্কিং কমিটির তৃতীয় দিনের অধিবেশন হয়।

বড়লাটের শাসন পরিষদে কংগ্রেসের প্রতিনিধি মনোনয়ন সম্পর্কে ওয়ার্কিং কমিটির সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

করাচীতে এক অগ্নিকাণ্ডের ফলে প্রায় ১ লক্ষ ৩০ হাজার টাকা ক্ষতি হইয়াছে।

৬ই জুলাই—বড়লাটের নিকট নামের তালিকা পেশ করা সম্পর্কে ওয়ার্কিং কমিটির আলোচনা অদ্য সন্ধ্যায় শেষ হয়।

শ্রীযুত কিরণশঙ্কর রায় ওয়ার্কিং কমিটির সকালবেলার অধিবেশনে যোগদান করেন এবং বাঙলার দুর্ভিক্ষের ও পার্লামেণ্টারী পরিস্থিতির একটি বিবরণী দাখিল করেন বলিয়া প্রকাশ।

শ্রীযুত শরৎচন্দ্র বসুকে প্রস্তাবিত শাসন পরিষদে গ্রহণের অনুরোধ জানাইয়া হাওড়া মিউনিসিপ্যালিটি ও বাঙলার অপর কয়েকটি প্রতিষ্ঠান রাষ্ট্রপতি আজাদের নিকট 'তার' পাঠাইয়াছেন।

শুক্রবার হাওড়া টাউন হলে অনুষ্ঠিত এক জনসভায় বাঙলার তথা ভারতের সমস্ত রাজনৈতিক বন্দীর অবিলম্বে বিনাসর্তে মুক্তির দাবী করা হয়। সভায় বিশেষ করিয়া শ্রীযুত শরৎচন্দ্র বসুর মুক্তির দাবী জ্ঞাপন করা হয়।

আল্লাবক্স হত্যা মামলার রায় ১৬ই জুলাই প্রদত্ত হইবে বলিয়া জানা গিয়াছে।

৭ই জুলাই—লর্ড ওয়াভেলের নিকট প্রস্তাবিত শাসন পরিষদে কংগ্রেস কর্তৃক মনোনীত ব্যক্তিগণের নাম অদ্য দাখিল করা হইয়াছে।

প্রকাশ যে, মুসলিম লীগ ওয়ার্কিং কমিটি তাঁহাদের 'সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত' লাটপ্রাসাদে দাখিল করিয়াছেন।

ডাঃ মেঘনাদ সাহা মস্কো হইতে অদ্য প্রত্যাবর্তন করিয়াছেন।

৮ই জুলাই—অদ্য কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির চারি ঘণ্টাব্যাপী এক বৈঠকে কংগ্রেসের আভ্যন্তরীণ সংগঠন ও আন্তর্জাতিক অবস্থা সম্পর্কে আলোচনা হইয়াছে।

মিঃ জিন্না অদ্য বড়লাটের সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছেন।

সাহিত্যসম্রাট বঙ্কিমচন্দ্রের ১০৭তম জন্মদিবস উপলক্ষে নৈহাটি কাঁঠালপাড়ায় এক জনসভার অধিবেশন হয়।

বিহার প্রদেশে বক্তৃতা দেওয়া নিষিদ্ধ করিয়া বিহার গভর্নমেণ্ট স্বামী সহজানন্দের প্রতি এক নোটিশ জারী করিয়াছেন।

ঢাকার সংবাদে প্রকাশ, আলমগঞ্জস্থিত সরকারী গুদামের ভারপ্রাপ্ত অসামরিক সরবরাহ বিভাগের সাব-ইন্সপেক্টার শ্রীযুত এম সি হালদারের বিরুদ্ধে ঐ গুদামের ৮৮৭ মণ ২০ সের চাউল ঘাটতি সম্পর্কে বিশ্বাসভঙ্গের অভিযোগ আনা হইয়াছে। সূত্রাপুরের সরকারী গুদামের ভারপ্রাপ্ত অসামরিক সরবরাহ বিভাগের সাব-ইন্সেপেক্টার এ হানিফের বিরুদ্ধে ঐ গুদামের ৭১৪ মণ সাড়ে ৯ সের চাউল ঘাটতি সম্পর্কে বিশ্বাসভঙ্গের অভিযোগ আনা হইয়াছে।

প্রকাশ, কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটিতে কংগ্রেস পুনর্গঠন সম্পর্কে আলোচনা কালে কমিউনিস্টদের প্রতি কংগ্রেসের মনোভাব কিরূপ হওয়া উচিত, তাহাও আলোচনা করা হইবে। আরও প্রকাশ, ওয়ার্কিং কমিটির সদস্যদের মুক্তির পর রাষ্ট্রপতি ও ওয়ার্কিং কমিটির সদস্যগণের নিকট ১৯৪২ সালের আগস্ট মাসের পর হইতে কমিউনিস্টদের কার্যকলাপ সম্পর্কে বহু অভিযোগ আসিয়াছে। আরও প্রকাশ, কোন কোন বিশিষ্ট নেতা মহাত্মা গান্ধীকে বলিয়াছেন, কমিউনিস্টগণকে কংগ্রেসের সদস্য পদ হইতে বিতাড়নের জন্য ব্যবস্থা অবলম্বিত হওয়া প্রয়োজন।

৯ই জুলাই—মুসলিম লীগকে তাঁহাদের প্রার্থিত প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয় নাই বলিয়া লীগের পক্ষ হইতে নামের তালিকা দাখিল করিতে অসম্মতি জ্ঞাপন করিয়া ওয়ার্কিং কমিটির সভায় সর্বসম্মতিক্রমে যে সিদ্ধান্ত গৃহীত হইয়াছে, মিঃ জিন্না তাহা বড়লাটকে জ্ঞাপন করিয়াছেন বলিয়া জানা গিয়াছে।

প্রকাশ, দুই এক দিনের মধ্যেই বড়লাট মহাত্মা গান্ধী ও মিঃ জিন্নাকে সম্ভবত আহ্বান করিবেন।

অদ্য কংগ্রেস সভাপতির একখানা পত্র বড়লাটের নিকট প্রেরিত হয়।

পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু প্রেস-প্রতিনিধির নিকট বলেন যে, কমিউনিস্টদের সদস্যসংখ্যা ও প্রভাব অতিশয় সীমাবদ্ধ; জাতীয় আন্দোলনের স্বাভাবিক গতির বিরোধিতা করিয়া তাহারা ভারতের জাতীয়তাবাদ ও নিজেদের মধ্যে এমন একটা প্রাচীর সৃষ্টি করিয়াছে, যাহার দ্বারা তাহাদের প্রভাব অনেক হ্রাস পাইয়াছে।

নয়াদিল্লীর নয়াসড়কে গত রাত্রিতে এক ভীষণ অগ্নিকাণ্ডের ফলে একটি পরিবার সাংঘাতিকভাবে দগ্ধ হইয়াছে।

১০ই জুলাই—অদ্য সিমলায় কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির আর এক অধিবেশন হয়।

আচার্য বিনোবা ভাবে সহ মধ্যপ্রদেশের ছয়জন বিশিষ্ট কংগ্রেসী বন্দী মুক্তি পাইয়াছেন।

১১ই জুলাই—আজ বেলা তিন ঘটিকায় মিঃ জিন্না বড়লাটের সহিত সাক্ষাৎ করিবেন।

বিদেশী সংবাদ

৫ই জুলাই—অস্ট্রেলিয়ার প্রধান মন্ত্রী মিঃ জন কার্টিন পরলোকগমন করিয়াছেন।

অদ্য সকালে ইংলণ্ডে নির্বাচন পর্ব আরম্ভ হইয়াছে।

মিসর প্রতিনিধি পরিষদের সরকারপক্ষীয় সদস্য তাহারিয় খোয়াই আলী জামার আততায়ীর গুলীতে নিহত হইয়াছেন।

বাগদাদে ইরাক-তুর্কী বাণিজ্য ও বিনিময় চুক্তি স্বাক্ষরিত হইয়াছে।

খাদ্যদ্রব্যের মূল্য বৃদ্ধির দরুণ ইতালীস্থ মিলানে শ্রমিকেরা ধর্মঘট করিয়াছে।

বৃটিশ ও মার্কিন সরকার নূতন পোল সরকারকে স্বীকার করিয়া লইয়াছেন।

কানাডীয় সৈন্যেরা আল্ডারসট শহরে ভীষণ হাঙ্গামা বাধাইয়া প্রভূত ক্ষতি সাধন করিয়াছে বলিয়া জানা গিয়াছে।

ফ্রান্স, ডেনমার্ক, হল্যাণ্ড ও উত্তর ইতালীতে গ্যাস-শ্রমিক, ব্যাঙ্ক-কেরানী, খনিশ্রমিক, শিক্ষক ও ডাকহরকরারা ব্যাপক ধর্মঘট করিতেছে বলিয়া জানা গিয়াছে।

৬ই জুলাই—বোর্নিওর বালিকপাপান শহর মিত্রসৈন্য কর্তৃক অধিকৃত হইয়াছে।

বিমান বিভাগের ঘোষণায় প্রকাশ, মণ্ট্রিল হইতে লণ্ডনে আসিবার সময় একটি লিবারেটার বিমান নিখোঁজ হয়। উহাদের যাত্রীদের মধ্যে ইণ্ডিয়া অফিসের বহির্ব্যাপার বিভাগের সেক্রেটারী মিঃ রোল্যাণ্ড টেনিসন পীল, পররাষ্ট্র দপ্তরের আইন বিষয়ক পরামর্শদাতা স্যার উইলিয়াম ম্যানকিন এবং দেশরক্ষা দপ্তরের কর্নেল ডি সি ক্যাপেলডান ছিলেন।

৭ই জুলাই—বালিকপাপানে আরও ১৫ হাজার মিত্রসৈন্য অবতরণ করিয়াছে।

মিঃ এণ্টনী ইডেনের জ্যেষ্ঠপুত্র সার্জেণ্ট সাইমন ইডেন ব্রহ্মে বিমানযুদ্ধ পরিচালনাকালে নিখোঁজ হইয়াছেন।

৮ই জুলাই—সিতাং নদীর বাঁকে জাপ ও মিত্রসেনাদের মধ্যে ১০ মাইল রণাঙ্গনে ঘোরতর যুদ্ধ চলিতেছে।

৯ই জুলাই—রোমের সংবাদে প্রকাশ, পার্টিসান বাহিনী কর্তৃক জার্মানগণ বিতাড়িত হওয়ার পর হইতে উত্তর ইতালীতে ২০ হাজার ফ্যাসিস্টকে সরাসরি হত্যা করা হইয়াছে।

প্যারিস বেতারের সংবাদে প্রকাশ, তুরস্কের রাজ্যখণ্ড লইবার জন্য রুশিয়ার দাবীর সমর্থনে তুর্ক-বলুগার সীমান্তে লালফৌজের সমাবেশ হইতেছে।

ভারত-সচিবের পুত্র জন আমেরীর প্রতি রাষ্ট্রদ্রোহের অভিযোগে ৩০শে জুলাই পর্যন্ত হাজত বাসের আদেশ দেওয়া হইয়াছে।

ব্যাভেরিয়ায় ১০০ জার্মাণ ব্যবসায়ী ও শিল্পপতিকে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে।

১০ই জুলাই—বিমানবাহী হাজাজ হইতে অদ্য এক হাজারেরও বেশী বিমান টোকিওতে হানা দিয়াছে।

ব্রহ্ম রণাঙ্গনে অদ্য মিত্র সৈন্যেরা থাজি হইতে টাউঙ্গীগামী সড়কের পার্শ্বে অবস্থিত হোহো দখল করিয়াছে।

সিরিয়ার আলেপ্পো সহরে আবার এক নূতন গোলযোগের সৃষ্টি হইয়াছে বলিয়া জানা গিয়াছে।

ডানকার্কে একটি পুরাতন জার্মাণ অস্ত্রাগারে এক ভয়ঙ্কর বিস্ফোরণের ফলে দেড়শতাধিক লোক নিহত হইয়াছে।

দেশ

সম্পাদক ঃ শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র সেন

সহকারী সম্পাদক ঃ শ্রীসাগরময় ঘোষ

১২ বর্ষ] শনিবার, ৫ই শ্রাবণ, ১৩৫২ সাল। Saturday, 21st July, 1945 [৩৭শ সংখ্যা

সাময়িক প্রসঙ্গ

সিমলা সম্মেলনের ব্যর্থতা

সিমলা সম্মেলন ব্যর্থ হইয়াছে। ইহা আমাদের পক্ষে কিছু অপ্রত্যাশিত নয়; কারণ আমরা আগাগোড়াই ভারতের রাজনীতিক সমস্যা সমাধানের জন্য ব্রিটিশ গভর্নমেণ্টের উদ্যমের আন্তরিকতা সম্বন্ধে সন্দেহ পোষণ করিয়া আসিয়াছি। সুতরাং লর্ড ওয়াভেলের প্রস্তাবের এই পরিণতিতে আমরা বিস্মিত হই নাই এবং দুঃখিতও হই নাই। বিশেষতঃ আমরা লর্ড ওয়াভেলের প্রস্তাবকে কোনদিনই তেমন গুরুত্ব প্রদান করিতে পারি নাই; কারণ ভারতের স্বাধীনতার মূল দাবী এতদ্দ্বারা স্বীকৃত হইয়াছিল না; সাময়িক ব্যবস্থা হিসাবে দেশের বর্তমান সমস্যাসমূহের প্রতিকারের দিক হইতে এই প্রস্তাব কতটা কার্যকরী হইত, সে বিষয়েও আমাদের সম্পূর্ণ সন্দেহ ছিল; কারণ প্রকৃত কর্তৃত্ব এ ব্যবস্থাতেও ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্টেরই হাতে ছিল। এরূপ অবস্থায় কংগ্রেস-নেতৃগণ বড়লাটের নবগঠিত শাসন-পরিষদে স্থানলাভ করিলেও কতদিন তাঁহাদের পক্ষে কাজ চালানো সম্ভব হইত, অতীতের অভিজ্ঞতা হইতে এ সম্বন্ধেও সকলের মনে প্রশ্ন উঠে। এসব সত্ত্বেও কংগ্রেস-নেতৃগণ ওয়াভেল প্রস্তাব সমর্থন করিয়াছিলেন এবং সে প্রস্তাব সফল করিবার জন্য সহযোগিতা করিতে উদ্যোগী হইয়াছিলেন, ইহার কারণ কি? ওয়াভেল প্রস্তাব এইভাবে ব্যর্থতায় পর্যবসিত হওয়াতে কংগ্রেসের রাষ্ট্রনীতিক মর্যাদা কি ক্ষুণ্ণ হয় নাই? যদি কেহ এইরূপ প্রশ্ন উত্থাপন করেন, তাহার উত্তরে আমরা বলিব, ওয়াভেল প্রস্তাব ব্যর্থ হওয়াতে কংগ্রেসের রাষ্ট্রনীতিক মর্যাদা ক্ষুণ্ণ তো হয়ই নাই; পক্ষান্তরে আন্তর্জাতিক দৃষ্টিতে এতদ্দ্বারা কংগ্রেসের সে মর্যাদা অনেক গুণে বর্ধিত হইয়াছে এবং ভারত সম্বন্ধে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদীদের স্বার্থান্ধ নীতির স্বরূপ সমধিক উন্মুক্ত হইয়াছে। ব্রিটিশ গভর্নমেণ্টের একান্ত গণতন্ত্রবিরোধী সাম্রাজ্যবাদসুলভ সঙ্কীর্ণ দৃষ্টির ফলেই যে, সিমলা সম্মেলন ব্যর্থতায় পর্যবসিত হইয়াছে, এ সম্বন্ধে কি ভারতে, কি অন্যত্র কাহারও মনে আর কিছুমাত্র সন্দেহের অবকাশ নাই। দেখিলাম, লর্ড ওয়াভেল সম্মেলনের ব্যর্থতার জন্য নিজেকেই দায়ী করিয়াছেন। সৌজন্য এবং বিনয়ের দিকটা বাদ দিয়া তাঁহার এই উক্তির অন্তর্নিহিত একান্ত সত্যই আমাদের দৃষ্টিতে এক্ষেত্রে সুস্পষ্ট হইয়া পড়ে। সম্মেলনের উদ্যোক্তা স্বরূপে ইহার ব্যর্থতার জন্য লর্ড ওয়াভেলের দায়িত্ব কেহই অস্বীকার করিতে পারেন না; এইসঙ্গে আমরা ইহাও স্বীকার করিয়া লইতে প্রস্তুত আছি যে, তিনি আন্তরিকতার সহিতই এক্ষেত্রে অগ্রসর হইয়াছিলেন; কিন্তু তাহা সত্ত্বেও তাঁহার প্রচেষ্টা ব্যর্থ হইয়াছে, কারণ কলকাঠি অন্যদিক হইতে ঘুরিয়াছে; তিনি তাহা প্রতিরুদ্ধ করিতে পারেন নাই। এক্ষেত্রে সেদিক হইতে তাঁহার দুর্বলতা দেখা গিয়াছে। ওয়াভেল যখন তাঁহার প্রস্তাব লইয়া অগ্রসর হন, মোশ্লেম লীগের মতিগতি তাঁহার অপরিজ্ঞাত ছিল না। মিঃ জিন্নাকে তিনি ষোল আনাই জানিতেন; প্রকৃতপক্ষে তিনি কংগ্রেস-প্রেসিডেণ্টকে বারংবার একথা জানাইয়াছিলেন যে, ভারতের সমগ্র মুসলমান সমাজের প্রতিনিধিত্ব করিবার জন্য মোশ্লেম লীগ যে দাবী করিতেছে, তিনি তাহা স্বীকার করিয়া লইতে পারেন না। গত ৯ই জুলাই বড়লাট মিঃ জিন্নাকে পত্র দ্বারা সুস্পষ্টভাবেই ইহা জানান যে, প্রস্তাবিত নূতন শাসন পরিষদে সমস্ত মুসলমান সদস্য মুসলিম লীগের সদস্য হইবেন তিনি এইরূপ কোন প্রতিশ্রুতি দিতে পারেন না। এ সব সত্ত্বেও শেষটা লর্ড ওয়াভেলকে মিঃ জিন্নার অযৌক্তিক এবং অসঙ্গত দাবীর কাছেই নিজের যুক্তি ও বুদ্ধি সব বিসর্জন দিতে হইয়াছে। তিনি সাহসের সঙ্গে অগ্রসর হইতে পারেন নাই; ইহার কারণ এই যে, তাঁহার নিজের হাতে প্রকৃত কোন ক্ষমতা ছিল না। তিনি ব্রিটিশ গভর্নমেণ্টের হস্তে ক্রীড়নক মাত্র এবং সেই হিসাবেই তাঁহাকে শেষটা কাজ করিতে হইয়াছে। আমেরী-চার্চিল দলের নীতিই এক্ষেত্রে জয়যুক্ত হইয়াছে। মিঃ জিন্নাকে যাঁহারা এতদিন তুষ্টপুষ্ট করিয়া তুলিয়াছেন এবং তাঁহাকে আড়াল করিয়া ভারতে সাম্রাজ্যবাদের ভিত্তি দৃঢ় করিয়াছেন, তাঁহারা তাঁহাকে রুষ্ট করিবার ঝুঁকি গ্রহণ করেন নাই। মিঃ জিন্না ইহা জানিতেন এবং জানিতেন বলিয়াই সমগ্র ভারতের প্রগতির গতি রুদ্ধ করিবার স্পর্ধা তিনি অন্তরে পোষণ করিয়া চলিয়াছেন; নতুবা তাঁহার দাবীর মূলে কোন নীতি নাই, কোন যুক্তি নাই। ব্রিটিশ গভর্নমেণ্টের কর্ণধারগণ স্বাধীনতা ও গণতান্ত্রিকতার বড় বড় কথা মুখে বলিয়া থাকেন; কিন্তু কার্যত তাঁহারা ভারতের ক্ষেত্রে মিঃ জিন্নার অন্যায় জিদকে প্রশ্রয় দিতেছেন। কংগ্রেস এ সম্বন্ধে তাঁহাদের অবলম্বিত নীতির নির্লজ্জতাকে একেবারে উন্মুক্ত করিয়া দিয়াছে এবং কংগ্রেসের শক্তি সমগ্র ভারতের জনমতের দ্বারা কতটা সুদৃঢ় এক্ষেত্রে তাহাই প্রতিপন্ন হইয়াছে। সুতরাং সিমলা সম্মেলনের ব্যর্থতার জন্য আমাদের দিক হইতে আপশোষের কোন কারণ আছে বলিয়া আমরা মনে করি না।

বাঙলার দায়িত্ব

সম্প্রতি সিমলার বঙ্গীয় সম্মিলনী ও সিমলা প্রবাসী বাঙালীদের উদ্যোগে সর্বভারতীয় নেতৃবৃন্দকে অভিনন্দিত করিবার জন্য সিমলার কালীবাড়িতে একটি সভা অনুষ্ঠিত হয়। এই সভায় শ্রীযুক্ত রাজাগোপাল আচারী ভারতের পরাধীনতার জন্য

বাঙলা এবং পাঞ্জাবকে বিশেষভাবে দায়ী করেন। তিনি বলেন, বাঙলা ও পাঞ্জাব হইতে যদি সাম্প্রদায়িকতা বিদূরিত হয়, অবিলম্বে ভারতবর্ষ স্বাধীন হইতে পারে। তিনি বাঙলা ও পাঞ্জাবকে এই বলিয়া সতর্ক করিয়া দেন যে, যদি এই দুই প্রদেশের অধিবাসীরা তাহাদের নিজেদের ভিতরকার মতবিরোধ বিস্মৃত হইয়া ঐক্যবদ্ধ না হয়, তবে তাহাদিগকে পশ্চাতে ফেলিয়াই ভারতের অন্যান্য প্রদেশ অগ্রসর হইয়া যাইবে। বাঙালীদিগের কথা উল্লেখ করিয়া তিনি বিশেষ জোর দিয়া বলেন যে, বাঙালী যদি একতাবদ্ধ হয়, তবে আগামী-কল্যাই ভারতবর্ষ স্বাধীন হইবে ভারতের রাষ্ট্রগত স্বাধীনতার জন্য শ্রীযুক্ত রাজাগোপাল আচারী মহাশয়ের অন্তরের আবেগের গভীরতা আমরা উপলব্ধি করিতেছি; কিন্তু আমরা বাঙালী, আমাদের নিজেদের দিক হইতে আমাদের এ সম্বন্ধে কয়েকটি কথা বলিবার আছে। পঞ্জাবের কথা আমরা তুলিব না। আমাদের বক্তব্য এই যে, ভারতের স্বাধীনতার সাধনায় বাঙালীর দায়িত্ব রহিয়াছে, ইহা আমরা অস্বীকার করিতেছি না; কিন্তু শ্রীযুত রাজাগোপাল ভারতের ব্রিটিশ শাসনের ঐতিহাসিক পটভূমিকার প্রতি সম্পূর্ণ লক্ষ্য রাখেন নাই বলিয়াই আমাদের মনে হয়। প্রকৃতপক্ষে বাঙলাদেশে যদি সাম্প্রদায়িকতা সত্যই থাকে, সেজন্য বাঙালীরা বিশেষ দায়ী নয়, ব্রিটিশ গভর্নমেণ্টের ভারত শাসন নীতিই এজন্য মুখ্যভাবে দায়ী। শিক্ষা ও সংস্কৃতিতে বাঙালী একান্ত জাতীয়তাবাদী এবং বাঙালীই ভারতের স্বাধীনতার সাধনার অগ্নিময় প্রেরণা জাগাইবার পক্ষে অগ্রদূতের কাজ করিয়াছে। আজ রাষ্ট্রনৈতিক যে চেতনা ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে এতটা সম্প্রসারিত হইয়াছে, বাঙালার সন্তানগণের শোণিতোৎসর্গের শক্তি তাহার মূলে অনেকখানি রহিয়াছে। সাম্রাজ্যবাদীরা বাঙালীর এই প্রকৃতির পরিচয় ভালভাবেই রাখে এবং সেজন্য বাঙালীকে তাহারা নিজেদের স্বার্থসিদ্ধির পথে কণ্টকস্বরূপে মনে করে। তাহাদের সেই প্রতীতি বাঙলা সম্পর্কে তাহাদের নীতিকে নিরন্তর কলুষিত করিয়াছে এবং ভেদনীতির বিষ বিস্তার করিয়া তাহারা বাঙলার জাগ্রত জাতীয়তাবাদকে দমিত রাখিবার জন্য নিরন্তর কূটনীতি প্রয়োগ করিয়াছে। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের পীড়ন এবং পেষণ বাঙলার উপর যতটা উগ্রভাবে আপতিত হইয়াছে, ভারতের অন্য কোন প্রদেশেই ততটা হয় নাই; ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ এবং শ্বেতাঙ্গ বণিক সম্প্রদায়ের স্বার্থ-প্রেরণামূলক নীতির কূটচক্রে বাঙলাদেশে সাম্প্রদায়িকতার ভাব একান্তই কৃত্রিমভাবে সৃষ্ট হইয়াছে এবং পুষ্ট হইয়াছে; কিন্তু এই প্রতিকূল প্রতিবেশের মধ্যেও ভারতের স্বাধীনতার বর্তিকা বাঙালী বুক দিয়া আগলাইয়া রাখিয়া চলিয়াছে। কোন বিঘ্ন বাধা বাঙালীর বীর সন্তানদিগকে বিচলিত করিতে পারে নাই। শ্রীযুত রাজাগোপাল আচারী মহাশয় বাঙালীকে দোষী করিয়াছেন; কিন্তু তিনি নিজের প্রদেশের কথা ভুলিয়া গিয়াছেন। পাকিস্থানের সমর্থক দ্রাবিড়ীস্থানের পাণ্ডা আচারী মহাশয় অন্য প্রদেশের সহযোগিতাকে এবং প্রদেশসমূহের পারস্পরিক সহযোগিতায় ভারতের অখণ্ড জাতীয়তাকে বড় বলিয়া দেখিবেন না, ইহাতে আশ্চর্য নাই; কিন্তু তাঁহার সেই দ্রাবিড়ীস্থানেও কি সাম্প্রদায়িকতা কিছু কম? ব্রাহ্মণ ও অব্রাহ্মণের লড়াই সেখানকার রাজনীতিকে কি কলুষিত করে নাই; তাঁহার প্রদেশের পারিয়াপঞ্চমের অস্পৃশ্যতার গ্লানি কি সমগ্র ভারতের সংস্কৃতিকে নিন্দিত করে নাই এবং সেই পথে ভারতের রাজনীতিক অগ্রগতির পথে অন্তরায় ঘটায় নাই? সেসব চাপা দিয়া তিনি ভারতের রাষ্ট্রসাধনায় বাঙালীর অপরিসীম অবদানকে স্বীকার করিতে সঙ্কুচিত হইয়াছেন দেখিয়া আমরা বিস্ময়বোধ করিতেছি।

শিক্ষার সার্থকতা

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তন সংস্কার উপলক্ষে ভাইস-চ্যান্সেলার ডক্টর রাধাবিনোদ পাল যে বক্তৃতা দিয়াছেন, তাহা বিশেষ শিক্ষাপ্রদ এবং কালোপযোগী হইয়াছে। ডক্টর পাল ডিগ্রীপ্রাপ্ত ছাত্রগণকে সম্বোধন করিয়া বলিয়াছেন, "আপনারা যদি আপনাদের মাতৃভূমির স্বাধীনতা লাভে সাহায্য করিতে পারেন, তবেই আপনাদের শিক্ষা সার্থক হইয়াছে বোঝা যাইবে। স্বাধীনতা ও আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার প্রত্যেক জাতিরই জন্মগত এবং সে অধিকার হইতে কেহ কাহাকেও বঞ্চিত রাখিতে পারে না; সুতরাং ভারতবর্ষ স্বাধীনতা লাভ করিবেই; তবে সে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত থাকিয়া সেই স্বাধীনতা ভোগ করিবে অথবা তাহা বাহিরে গিয়া স্বাধীন জাতিস্বরূপে গণ্য হইবে, তাহা ভবিষ্যতের ঘটনাবলী দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হইবে; কিন্তু প্রকৃত সত্য এই যে, মাতৃভূমিতে অধিকার লাভ প্রতিষ্ঠিত করিতে সাহায্য করিবার ব্রত অপেক্ষা কোন ব্রতই মহত্তর নহে। আপনাদের দেশ এই আশাই করে যে, আপনাদের শিক্ষাদীক্ষা আপনাদিগকে প্রধানতঃ এই ব্রতের যোগ্য করিয়া তুলিবে। আপনারা কিছুতেই এই ব্রত উদ্‌যাপনে পশ্চাৎপদ হইবেন না।" ডক্টর পালের এই উক্তি সহজ এবং সুস্পষ্ট। প্রকৃতপক্ষে বৃহত্তর আদর্শের প্রতি চিত্তবৃত্তিকে সম্প্রসারিত করাই শিক্ষার প্রকৃত উদ্দেশ্য। পরাধীন দেশের বৃহত্তর সকল আদর্শের সাধনার সঙ্গে রাজনীতি প্রত্যক্ষভাবে জড়িত থাকে; এরূপ অবস্থায় দেশের যুবকদিগকে যাঁহারা রাজনীতি হইতে দূরে থাকিতে বলেন, আমরা তাঁহাদের যুক্তি সমর্থন করি না; এক্ষেত্রে রাজনীতির জুজুর ভয় দেখাইয়া যুবকদের চিত্তের স্বতঃস্ফূর্ত শক্তিকেই ক্ষুণ্ণ করা হয়। আমরা দেখিলাম বিশ্ববিদ্যালয়ের চ্যান্সেলারস্বরূপে বাঙলার গভর্নর মিঃ কেসি যে অভিভাষণ প্রদান করিয়াছেন, তাহাতে তিনিও যুবকদিগকে রাজনীতি হইতে দূরে থাকিতে বলেন নাই; কিন্তু কোন রাজনীতিক দলে যোগদান করিবার পূর্বে তাঁহাদিগকে বিশেষ যত্নসহকারে বাস্তব দৃষ্টিভঙ্গী লইয়া বিবেচনা করিতে বলিয়াছেন। সংস্কৃতি বুদ্ধিবৃত্তিকে পরিমার্জিত করে, সুতরাং এক্ষেত্রে বিচার বিবেচনা আসিবে, ইহা স্বাভাবিক; কিন্তু বুদ্ধি বিচারের সেই বাস্তব দৃষ্টিভঙ্গী যদি নির্বিঘ্ন ও নিরাপদ জীবনই বাছিয়া লয় এবং বলিষ্ঠ ত্যাগের পথে অগ্রগতিকে শঙ্কিত করিয়া তোলে, তবে শিক্ষার উদ্দেশ্য ব্যর্থ হইয়াছে বুঝিতে হইবে; কারণ বৃহত্তর ত্যাগের অভিমুখে চিত্তবৃত্তিকে উন্মুখ করিয়া তোলাই শিক্ষার প্রকৃত উদ্দেশ্য এবং তাহাতেই মনুষ্যত্বের প্রতিষ্ঠা।

দুর্গত মেদিনীপুর

পরাধীন দেশে স্বদেশপ্রেম অপরাধ বলিয়া গণ্য হইয়া থাকে। বাঙলার সব জেলার মধ্যে মেদিনীপুর এই অপরাধে অপরাধীস্বরূপে গণ্য হইয়া সর্বাপেক্ষা অধিক দুঃখ-কষ্ট এবং নির্যাতন-লাঞ্ছনা সহ্য করিয়াছে। প্রাকৃতিক দুর্যোগ হৃদয়হীন আমলাতন্ত্রের সেই পীড়ন নীতির সঙ্গে যোগ দিয়া এই জেলার অধিবাসীদের দুর্গতি সহস্র গুণে বৃদ্ধি করিয়াছে। মেদিনীপুরের এই দুর্গতির আজও অবসান ঘটে নাই। বঙ্গীয় ব্যবস্থা পরিষদের সদস্য শ্রীযুক্ত নিকুঞ্জবিহারী মাইতি সম্প্রতি সংবাদপত্রে একটি বিবৃতি প্রদান করিয়া দেশবাসীর দৃষ্টি এইদিকে আকৃষ্ট করিয়াছেন। তাঁহার বর্ণনা অত্যন্ত মর্মস্পর্শী। তিনি লিখিয়াছেন—"শ্রমিকের অভাবে বহু জমি অকর্ষিত রহিয়াছে। শিশুরা শুকাইয়া যাইতেছে, তাহাদের শরীর বাড়িতেছে না। জেলার দক্ষিণ অঞ্চলের গবাদি পশু বন্যায় ভাসিয়া গিয়াছে; ফলে পুষ্টির পক্ষে প্রয়োজনীয় দুধের অভাব দেখা দিয়াছে এবং চাষের জন্য প্রয়োজনীয় পশুর অভাবে খাদ্যশস্য উৎপাদন

কম হইয়াছে। ম্যালেরিয়া এখনও প্রভাব বিস্তার করিয়া আছে। এমন একটি পরিবারও দেখিতে পাওয়া যায় না, যেখানে একজন কিংবা দুইজন ম্যালেরিয়ায় শয্যাশায়ী নহে।" এই বিবৃতি হইতে স্পষ্টই প্রতিপন্ন হয় যে, প্রাকৃতিক দুর্যোগ, দুর্ভিক্ষ এবং মহামারীর প্রকোপ হইতে মেদিনীপুর-বাসীদিগকে রক্ষা করিবার জন্য যাহা করা উচিত ছিল বাঙলা গভর্নমেণ্ট তাহা করিতে পারেন নাই। বাঙলার কোন কোন জেলায় কংগ্রেস কমিটির উপর হইতে সরকারী নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহৃত হইয়াছে; ইহাতে দেশ সেবককর্মিগণ সে সব স্থানে লোক-কল্যাণ ব্রতে আত্মনিয়োগ করিতে অপেক্ষাকৃত সুযোগ লাভ করিয়াছেন; কিন্তু দুর্গত মেদিনীপুরের সম্বন্ধে আমলাতন্ত্রের সহানুভূতিহীন দৃষ্টি অদ্যাপি সমভাবেই বিদ্যমান রহিয়াছে এবং জেলার সেবাব্রতী কর্মীদের সঙ্গে সহযোগিতার ভাব প্রতিষ্ঠা করিবার জন্য এখনও তেমন চেষ্টা হইতেছে না। এখনও সেখানে স্বাধীনভাবে লোকের সভা-সমিতি করিবার অধিকার নাই; সুতরাং দমননীতি নানারূপে চলিতেছে বলিতে হয়। মেদিনীপুরের সম্বন্ধে এই কলঙ্ককর অধ্যায়ের কবে অবসান হইবে আমরা কর্তৃপক্ষকে সেই কথা জিজ্ঞাসা করিতেছি। দুর্গত মেদিনীপুর পুনরায় প্রাণশক্তিতে সঞ্জীবিত হইয়া উঠুক, আমরা ইহাই দেখিতে চাই।

রাজনীতিক বন্দীদের মুক্তি

সিমলার আলোচনা ব্যর্থ হইল এবং শাসনতান্ত্রিক পরিবর্তনের আশু কোন সম্ভাবনা আছে বলিয়া মনে হয় না; অন্তত বিলাতে নূতন গভর্নমেণ্ট গঠিত না হওয়া পর্যন্ত বড়লাট এ বিষয়ে বোধ হয় নূতন উদ্যমে প্রবৃত্ত হইবেন না। রাজনীতিক বন্দীদের মুক্তির সম্বন্ধে বিবেচনাও কি এইসঙ্গে চাপা পড়িবে, দেশের লোকের মনে আজ এই প্রশ্নটি বড় হইয়া উঠিয়াছে। লর্ড ওয়াভেল এখনও কংগ্রেসের সহযোগিতা কামনা করেন বলিয়া অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন এবং অতীতের ত্রুটি-বিচ্যুতি বিস্মৃত হইতে বলিয়াছেন। যদি তাঁহার এই উক্তিতে আন্তরিকতা থাকে তবে রাজনীতিক বন্দীদিগকে অবিলম্বে মুক্তি-দান করাই তাঁহার কর্তব্য। কংগ্রেস প্রেসিডেণ্ট মৌলানা আবুল কালাম আজাদ সেদিন সংবাদপত্রের প্রতিনিধিদের নিকট বলিয়াছেন যে, যে সব কংগ্রেসকর্মী এখনও বন্দী আছেন, তাঁহাদের মুক্তি সম্পর্কে তিনি বড়লাটের সঙ্গে পত্রালাপ করিতেছেন। তিনি বড়লাটকে ইহাও জানাইয়াছেন যে, পারস্পরিক বিশ্বাসের আবহাওয়া সৃষ্টি করিতে হইলে কংগ্রেসকর্মীদিগকে, বিশেষভাবে নিখিল ভারত রাষ্ট্রীয় সমিতির সদস্যগণকে মুক্তি দেওয়া এবং নিখিল ভারত রাষ্ট্রীয় সমিতির উপর হইতে নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহৃত হওয়া একান্ত আবশ্যক। এই সম্পর্কে আমাদের বক্তব্য এই যে, দেশে সত্যই যদি আপোষ-নিষ্পত্তির অনুকূল আশ্বস্তিপূর্ণ আবহাওয়া সৃষ্টি করিতে হয়, তবে রাজনীতিক কারণে যাঁহারা বন্দী আছেন তাহাদের সকলকেই মুক্তিদান করা কর্তব্য। এই সম্পর্কে ১৯৪২ সালের পূর্ব হইতে যাহারা বন্দী আছেন, তাঁহারা এবং রাজনীতির অপরাধে দণ্ডিত হইয়া যাঁহারা দীর্ঘদিন কারাগারে আছেন, তাহাদের কথাও বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র বসুর মুক্তির জন্য শুধু বাঙলা নহে, ভারতের বিভিন্ন প্রদেশ হইতেও দাবী করা হইতেছে; কিন্তু তাঁহার পীড়া ক্রমশ বৃদ্ধি পাওয়া সত্ত্বেও ভারতের এই জনমান্য নেতাকে বিনা বিচারে এখনও অবরুদ্ধ রাখা হইয়াছে, অথচ সেক্ষেত্রে যুক্তিসঙ্গত কোন কারণ আছে বলিয়াই আমরা মনে করি না। এই অবস্থার মধ্যে মুখের ফাঁকা কথায় দেশের আবহাওয়া ফিরে না এবং শাসকদের সম্বন্ধে শাসিতের মনস্তাত্ত্বিক গতিরও পরিবর্তন ঘটে না। লর্ড ওয়াভেল এখনও এই সত্য উপলব্ধি করিবেন কি?

বস্ত্র বণ্টনে বিভ্রাট

বস্ত্র বণ্টনের সাময়িক ব্যবস্থা দেশের লোকের সমস্যার কোন দিক হইতেই কিছুমাত্র সমাধান করিতে পারে নাই। এই ব্যবস্থার অন্তর্নিহিত ত্রুটি ক্রমেই উন্মুক্ত হইয়া পড়িতেছে। দেখা যাইতেছে, ইহার মধ্যেও কারচুপি শুরু হইয়াছে। সরকারী এই বস্ত্র বণ্টন ব্যবস্থার সহযোগিতা করিবার উদ্দেশ্যেই বিভিন্ন ওয়ার্ড কমিটিগুলি গঠিত হইয়াছিল; কিন্তু সরকার ইহাদিগকেও বিশ্বাস করিয়া উঠিতে পারিতেছেন না। তাঁহারা সম্প্রতি একটি সার্কুলার জারী করিয়া নির্বাচিত দোকানগুলির মালিকদের উপর এই নির্দেশ দিয়াছেন যে, তাঁহারা যেন তাহাদের দোকানে কত মাল মজুত আছে, সে সম্বন্ধে কোন খবর কমিটিগুলিকে না দেন। সরকারী এই আদেশের ফলে কমিটিগুলি অদ্ভুত অবস্থার মধ্যে পতিত হইয়াছেন; কারণ জনসাধারণকে কাপড়ের পারমিট দিবার ক্ষমতা তাঁহাদের উপর ন্যস্ত আছে; অথচ যে সব দোকানের মালের উপর ভিত্তি করিয়া তাঁহারা এই সব পারমিট দিবেন, তাহার হিসাবের খোঁজ লইবার অধিকার তাঁহাদের নাই। এতদ্দ্বারা ইহাও স্পষ্ট হইয়া পড়িয়াছে যে, সরকার এ সম্পর্কে দেশের লোকের সহযোগিতা প্রয়োজন বোধ করেন না; তাঁহারা ষোল আনা কর্তৃত্ব নিজেদের হাতেই রাখিতে চাহেন। বস্ত্র বণ্টন সম্পর্কে আকস্মিকভাবে কর্তৃপক্ষের এইরূপ নীতি পরিবর্তনের ফলে অবস্থার যদি উন্নতি সাধিত হইত, আমাদের আপত্তি করিবার কোন কারণ ছিল না; কিন্তু তাহা দূরে থাকুক, ইহার ফলে নানারূপে গোলযোগই দেখা দিয়াছে এবং আমরা প্রতিনিয়ত বস্ত্র বণ্টন ব্যবস্থা সম্পর্কে দুর্নীতির অভিযোগ শুনিতে পাইতেছি। এইরূপ অভিযোগ শোনা যাইতেছে যে, দোকানদারেরা ব্যক্তিগত স্বার্থ সিদ্ধ করিবার উদ্দেশ্যে কাজ করিতে বেশ সুবিধা পাইয়াছে এবং দোকানগুলিতে যে সব কাপড় সরবরাহ করা হইতেছে, তাহার অনেকাংশ চোরাবাজারে চলিয়া যাইতেছে। দোকানের মালের সম্বন্ধে খোঁজ লইবার ক্ষমতা যতদিন পর্যন্ত বিভিন্ন ওয়ার্ড কমিটিগুলির হাতে ছিল ততদিন এইভাবে চোরা-কারবার চালাইবার সুবিধা ছিল না। এই নূতন ব্যবস্থার জন্য আমরা কাহার তারিফ করিব বুঝিয়া উঠিতে পারিতেছি না। বোম্বাই প্রভৃতি অপর কয়েকটি শহরে ইতিমধ্যেই বস্ত্রের পূর্ণাঙ্গ রেশনিং প্রবর্তিত হইয়াছে; কিন্তু বাঙলা সরকার আজও এই সমস্যার সমাধান করিতে পারিলেন না; অথচ এই কাজের জন্য যোগ্যতাসম্পন্ন কর্মচারীদের দলবল তাঁহারা যথেষ্টই ভারী করিয়া তুলিয়াছেন বলিয়া আমরা জানি। মোটা বেতনস্বরূপে গরীবের শ্রমার্জিত অর্থে পকেট পূর্ণ করিবার কার্যেই কি তাঁহাদের যোগ্যতা সীমাবদ্ধ থাকিবে?

পরলোকে মুরারিমোহন চট্টোপাধ্যায়

বিশিষ্ট সাংবাদিক শ্রীযুক্ত মুরারিমোহন চট্টোপাধ্যায় গত ৩১শে আষাঢ় শনিবার পরলোকগমন করিয়াছেন। তাঁহার এই অকাল মৃত্যুর সংবাদে আমরা অত্যন্ত মর্মাহত হইয়াছি। মুরারিবাবু সাংবাদিক জীবনের সূত্রে বহুদিন হইতেই আমাদের সঙ্গে আত্মীয়তার সম্পর্কে সংবদ্ধ ছিলেন। তাঁহার জীবনের অধিকাংশ সময়ই সংবাদপত্র-সেবায় ব্যয়িত হয়। কিশোর বয়সেই তিনি স্যার সুরেন্দ্রনাথের পরিচালিত 'বেঙ্গলী'তে সাংবাদিকের কাজ গ্রহণ করেন। 'বাঙালী' পত্রেও তিনি কিছুদিন সহকারী সম্পাদক-স্বরূপে কাজ করিয়াছিলেন; তৎপর তৎকালীন 'দৈনিক হিন্দুস্থান' পত্রে সম্পাদকীয় বিভাগে তিনি যোগদান করেন। ইহার পর অধুনালুপ্ত দৈনিক 'বন্দে-মাতরম্' পত্রে তিনি সহকারী সম্পাদকের কাজ গ্রহণ করেন। ইহার পর তিনি 'আনন্দবাজার পত্রিকায়' যোগদান করেন এবং সহকারী সম্পাদকস্বরূপে কাজ করিতে থাকেন। মৃত্যুর দিন পর্যন্ত তিনি এই পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। এই কাজ করার সঙ্গে

সঙ্গে তিনি 'স্বদেশ' সাপ্তাহিক পত্রিকার অন্যতম সম্পাদকরূপে উহা যোগ্যতার সহিত পরিচালনা করিতেছিলেন। ব্যক্তিগত জীবনে তিনি অতি অমায়িক এবং মধুর-স্বভাব ও নির্বিরোধ প্রকৃতির লোক ছিলেন। তাঁহার সংস্পর্শে যিনিই একবার আসিয়াছেন, তিনিই তাঁহার মধুর ব্যবহারে মুগ্ধ হইয়াছেন। আমরা তাঁহার শোক-সন্তপ্ত পরিজনবর্গকে আমাদের গভীর সমবেদনা জ্ঞাপন করিতেছি।

নরপশুর জন্য দয়া

হাওড়ার মালতী দাসীর উপর পাশবিক অত্যাচারের অভিযোগে অভিযুক্ত কাজিন্স ও কেন নামক দুইটি ব্রিটিশ নৌ-সৈন্যের মামলায় হাইকোর্টের সিদ্ধান্ত দেখিয়া আমরা বিক্ষুব্ধ হইয়াছি। হাওড়ার দায়রা জজ মিঃ সেন জুরীদের সম্মতি অনুসারে কাজিন্সকে ভারতীয় দণ্ডবিধির ৪৪৮ ধারা এবং ৩৭৬ ধারা অনুসারে ১০ বৎসর সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত করেন। কাজিন্সের আপীলে হাইকোর্টের বিচারপতিদ্বয় মিঃ ব্লকবার্ণ ও মিঃ এলিস দণ্ডের পরিমাণ কমাইয়া ছয় বৎসর করিয়াছেন। আসামী কেনকে জুরীরা মাত্র ৪৪৮ ধারা অনুযায়ী দোষী সাব্যস্ত করেন এবং বলাৎকারের অভিযোগে তাহাকে অব্যাহতি দেন। দায়রা জজ কেনের সম্বন্ধে জুরীদের এই সিদ্ধান্তে সন্তুষ্ট হইতে পারেন নাই। তিনি কেনকে ৩৭৫ এবং ৪৫৮ ধারা (অপরাধজনক কার্য অনুষ্ঠানের উদ্দেশ্যে রাত্রিতে ঘর ভাঙ্গিয়া প্রবেশের অভিযোগ) দণ্ড দানের জন্য হাইকোর্টকে সুপারিশ করেন। বিচারপতিদ্বয় সে সুপারিশ অগ্রাহ্য করিয়া ৪৪৮ ধারা অনুযায়ী কেনকে এক বৎসর সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত করিয়াছেন। দেখিতেছি, হাইকোর্টের বিচারপতিদ্বয় কাজিন্সকে অপরাধী সাব্যস্ত করিয়াছেন; কিন্তু তাঁহারা এই নরপশুর দণ্ড হ্রাস করিবার পক্ষে কি যৌক্তিকতা দেখিলেন, আমরা তাহা বুঝিয়া উঠিতে পারিলাম না। রিভলবার হাতে লইয়া রাত্রির অন্ধকারে ভদ্রলোকের গৃহে প্রবেশ করিয়া একটি রুগ্না বালিকার উপর সে পাশবিক অত্যাচার করে। অপরাধের গুরুত্ব এবং তাহার পাশবিকতার বিচার করিলে, তাহার প্রাণদণ্ড হওয়াই উচিত ছিল, কিন্তু এদেশের আইনে তেমন বিধান যখন নাই, তখন কঠোরতম দণ্ড বিধান করাই এক্ষেত্রে সমীচীন। হাওড়ার জজ শুধু কারাদণ্ডই দিয়াছিলেন; আমরা পূর্বেই বলিয়াছি, তিনি যদি সেইসঙ্গে এমন নরপশুকে প্রকাশ্যভাবে টিকটিকিতে তুলিয়া বেত মারিবার আদেশ দিতেন তাহাও সঙ্গত হইত; কিন্তু হাই- [illegible] দশ বৎসর কারা-দণ্ডও এক্ষেত্রে অতিরিক্ত হইয়াছে, সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। ইহার কারণ কি? কাজিন্স কিসে বিচারপতিদ্বয়ের করুণার উদ্রেক করিল এবং তাঁহারা তাহার দণ্ড হ্রাস করিবার পক্ষে যৌক্তিকতা উপলব্ধি করিলেন, আমরা বুঝিয়া উঠিতে পারি না। অপরাধীর দণ্ড হ্রাসের পক্ষে এবং তাহার সম্বন্ধে সদয়-ভাবে বিবেচনা করিবার যে সব কারণ আছে, কাজিন্সের ক্ষেত্রে আমরা তাহার কিছুই দেখি না। এমন নরপশুদের এরূপ দণ্ড-বিধান করা উচিত, যাহাতে এই শ্রেণীর অপরাধের চিন্তা করিলে তাহারা দণ্ডের ভয়ে শঙ্কিত হয়,—দয়ামায়া কোন প্রশ্নই এখানে উঠে না; আমরা ইহাই বুঝি।

মৌলবী আবদাস সামাদ

মুর্শিদাবাদের বিখ্যাত জাতীয়তাবাদী মুসলমান নেতা মৌলবী আবদাস সামাদের পরলোকগমনে বাঙলাদেশ একজন সত্যকার দেশসেবককে হারাইল। অত্যন্ত প্রতিকূল প্রতিবেশ-প্রভাবের মধ্যেও যাঁহারা নিষ্ঠার সঙ্গে জাতীয়তার আদর্শকে অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছেন এবং সেজন্য কোনপ্রকার ত্যাগ স্বীকারেই কুণ্ঠিত হন নাই, সামাদ সাহেব তাঁহাদের অন্যতম। শক্ত মানুষের অভাব পরাধীন জাতির মধ্যে সর্বত্রই পরিলক্ষিত হয়। তিনি আদর্শে সুদৃঢ় একজন সত্যকার শক্ত মানুষ ছিলেন। সমগ্র দেশ এই নিরহংকার, সমাজসেবকের অভাব একান্ত-ভাবেই অনুভব করিবে। আমরা এই স্বর্গগত দেশসেবকের উদ্দেশ্যে আমাদের হৃদয়ের গভীর শ্রদ্ধা নিবেদন করিতেছি।

দায়িত্বহীন সমালোচনা

কাশ্মীরের পথে পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু গত ১৭ই জুলাই লাহোর স্টেশনে সমবেত বিরাট জনতার সম্মুখে ভারতের বর্তমান রাজনীতিক অবস্থার পর্যালোচনা করিয়া একটি বক্তৃতা প্রদান করেন। ১৯৪২ সালের ঘটনাবলী উল্লেখ করিয়া তিনি বলেন, ঐ সব ঘটনার সঙ্গে ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দের ভারতবাসীদের স্বাধীনতা লাভের জন্য জাতীয় অভ্যুত্থানেরই শুধু তুলনা করা চলে। আরাম বিলাসী সমালোচকদের পক্ষে এই বিদ্রোহের দোষ-ত্রুটি অন্বেষণ খুবই সহজ। হয়ত এমন কিছু ঘটিয়া থাকিতে পারে, যাহা সমর্থন করা চলে না; কিন্তু যাহারা ঐ সব ঘটনার সমালোচনা করিয়া জনসাধারণকে বিভ্রান্ত করে, তাহারা কাপুরুষ। আমি একথা স্পষ্ট করিয়া ঘোষণা করিতে চাই যে, ১৯৪২ সালের আন্দোলনে যাহারা যোগ দিয়াছিল, আমি তাহাদিগকে নিন্দা করিতে পারি না।" ভারতের স্বাধীনতা-কামী স্বদেশপ্রেমিক ব্যক্তিমাত্রেই পণ্ডিত-জীর আবেগের গভীরতা উপলব্ধি করিতে পারিবেন। প্রকৃতপক্ষে নিজদিগকে ক্ষুদ্র স্বার্থ বিচারের গণ্ডীর মধ্যে নিরাপদ রাখিয়া যাহারা মানবতার প্রেরণায় প্রণোদিত হইয়া কাজ করে, আমরা অনেক ক্ষেত্রেই তাহাদের সমালোচনা করিতে গিয়া মানবের হৃদয় ধর্মের সম্যক্ মর্যাদা দান করিতে পারি না। স্বাধীনতার আন্দোলন সম্পর্কে এ কথা বিশেষভাবে প্রযোজ্য। বিক্ষুব্ধ মানবতার গতি এক্ষেত্রে ঠিক নিক্তির ওজনে চলিতে পারে না; এজন্য স্বাধীনতার প্রেরণায় প্রণোদিত হইয়া যাঁহারা কাজ করেন, তাঁহাদের কার্যের খুঁটিনাটির মধ্যে দোষত্রুটি বাছিয়া বাহির করা খুব কঠিন হয় না। মানুষের প্রাথমিক অধিকার প্রতিষ্ঠার আকুলতা বা অধীরতার ফলে ইহাদের কার্যে হয়ত কখনও কখনও ব্যবহারিক নীতির দিক হইতে অসমীচীনতা পরিলক্ষিত হয়। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে সেজন্য তাহাদিগকে দায়ী করা চলে না। সেজন্য বস্তুতঃ মানুষকে স্বাধীনতার অধিকার হইতে যাহারা বঞ্চিত করিয়া রাখে তাহারাই দায়ী। মানুষের অন্তর স্বাধীনতা চাহিবেই, এবং মানুষের সেই স্বাভাবিক প্রবৃত্তি অত্যাচার ও উৎপীড়নের দ্বারা পিষ্ট করিতে গেলে তাহার ফলে তিক্ততার সৃষ্টি হইবে, ইহাও স্বাভাবিক। এই দিক হইতে বিচার করিলেই বোঝা যাইবে, স্বাধীনতার জন্য জগতের ইতিহাসে যেসব বিক্ষোভ বা বিদ্রোহ ঘটিয়াছে, পরাধীন অবস্থা জনিত মানব-স্বভাব-বিরোধী প্রতিবেশ-প্রভাবই কার্যত তাহার কারণ সৃষ্টি করিয়াছে। সুতরাং এক্ষেত্রে হৃদয়ের ধর্মের প্রেরণাই যাহাদিগের কার্যের মূলে থাকে, তাহাদের নিন্দা করিবার আগে যাহাদের হৃদয়-হীনতা মানুষের স্বাভাবিক ধর্মের বিপর্যয় ঘটাইয়া বিদ্রোহের আবহাওয়া সৃষ্টি করে, তাহাদিগকেই নিন্দা করা উচিত। প্রকৃত-পক্ষে আরাম বিলাসী সমালোচকেরা স্বাধীনতার আন্দোলনকারীদের কার্যের সম্বন্ধে যেমন মন্তব্য করুন না কেন, পরিশেষে ঐতিহাসিক দৃষ্টিতে মানুষের হৃদয়ের সত্য ধর্মই জয়যুক্ত হয়, এবং মিথ্যার গ্লানি টিকে না। ১৮৫৭ সালের সিপাহী বিদ্রোহকে একদিন বিদেশী সমালোচকগণ শুধু নিন্দনীয় প্রচেষ্টা বলিয়াই অভিহিত করিয়াছেন; কিন্তু এখন ঐতিহাসিকগণ সে আন্দোলনকে ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলন বলিয়া সাধারণভাবে স্বীকার করিয়া লইয়াছেন। এক্ষেত্রে মানুষের মনোধর্ম হৃদয়কেই জয়যুক্ত করিয়াছে; স্বাধীনতার আন্দোলন সম্বন্ধে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এই একই কথা বলা চলে।

দেশের কথা

(২৬শে আষাঢ় হইতে ৩২শে আষাঢ়)
সিমলায় আলোচনা—দায়িত্ব বিচার—প্রতিক্রিয়া

সিমলায় আলোচনা

সিমলায় আলোচনা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হইয়াছে। মিস্টার জিন্না বড়লাটের নিকট মুসলিম লীগের পক্ষ হইতে মনোনীত নামের তালিকা পেশ করিতে অসম্মতি জ্ঞাপন করেন। নামের তালিকা পেশ না করাই মুসলিম লীগের কার্যকরী সমিতির সিদ্ধান্ত। মিস্টার জিন্না "ইউনাইটেড প্রেস অব আমেরিকার" প্রতিনিধিকে জানান, কংগ্রেস যে ২ জন মুসলমানকে মনোনীত করিতে চাহিয়াছেন, তাহাতে তিনি অসম্মত।

২৬শে আষাঢ় কংগ্রেসের কার্যকরী সমিতির অধিবেশন হয়। ইহার পরে ২৮শে আষাঢ় বড়লাটের সহিত রাষ্ট্রপতি মৌলানা আবুল কালাম আজাদের সাক্ষাৎ হয় এবং ২৮শে আষাঢ় ঐ সাক্ষাতের পরে রাষ্ট্রপতি কংগ্রেসের কার্যকরী সমিতিকে লর্ড ওয়াভেলের সহিত তাঁহার আলোচনার বিবরণ দেন।

লর্ড ওয়াভেল পূর্ব নির্ধারণ অনুসারে ৩০শে আষাঢ় মধ্যাহ্নের পরেই সম্মিলনের অধিবেশনে প্রকাশ করেন—সম্মিলন ব্যর্থতায় পর্যবসিত হইয়াছে। তিনি বলেন, "তিনি বলিতে চাহেন ব্যর্থতার দায়িত্ব তাঁহার।" কারণ, সম্মিলনের পরিকল্পনা তাঁহার এবং সম্মিলন সার্থক হইলে যখন তিনিই তাহার কারণ বলিয়া বিবেচিত হইতেন, তখন ব্যর্থতার দায়িত্বও তিনিই গ্রহণ করিবেন।

লর্ড ওয়াভেল আশঙ্কা ব্যক্ত করেন—সম্মিলনের ফলে হয়ত সাম্প্রদায়িক অবস্থা আরও শোচনীয় হইবে এবং সেইজন্য সকল দলের দলপতিকে সংযত হইতে ও পরস্পরের সহিত বিবাদে নিবৃত্ত থাকিতে অনুরোধ করেন।

ঐদিনই মিস্টার জিন্না বলেন, লর্ড ওয়াভেলের পরিকল্পনা তাঁহার দল ফাঁদ বলিয়া গ্রহণ করিয়া তাহাতে পা দিতে অসম্মত হইয়াছেন। তিনি গান্ধীজী, কংগ্রেস, পঞ্জাবের গভর্নর, পঞ্জাবের প্রধান-সচিব, লর্ড ওয়াভেল সকলকে মুসলমান-দিগকে আত্মহত্যায় সম্মত করাইতে সচেষ্ট বলিতেও ত্রুটি করেন নাই—ইঁহারা সকলেই নাকি একযোগে ষড়যন্ত্র করিয়াছিলেন।

মৌলানা আবুল কালাম আজাদ বলেন, এদেশে বর্তমান সাম্প্রদায়িক অবস্থার জন্য ব্রিটিশ সরকারেরও দায়িত্ব যে নাই এমন নহে। তিনি লর্ড ওয়াভেলকে বলেন, কংগ্রেস অগ্রসর হইতে প্রস্তুত; কোন দল যদি সেই প্রগতিযাত্রায় যোগ দিতে অস্বীকার করেন, তবে সে দলকে বর্জন করিলেই হয়।

সম্মিলন ব্যর্থ হইলেও ভারত-সচিব লর্ড ওয়াভেলকে তাঁহার চেষ্টার জন্য ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন।

প্রতিক্রিয়া

এদেশে ও বিদেশে সিমলা সম্মিলনের ব্যর্থতা আলোচিত হইতেছে। ৩০শে আষাঢ় পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু বলেন, সিমলা সম্মিলনের ব্যর্থতায় তিনি দুঃখিত বটে, কিন্তু তিনি নিরাশ নহেন। তিনি বলেন, সাম্প্রদায়িক সমস্যা—মধ্যযুগের ও বর্তমান সময়ের মনোভাবে সংঘর্ষ ব্যতীত আর কিছুই বলা যায় না।

বিলাতে স্যার স্টাফোর্ড ক্রীপস প্রথমে "পাকিস্থানের" মীমাংসা করিতে পরামর্শ দিয়াছেন এবং লর্ড হেলী বলিয়াছেন, তিনি মুসলমানদিগের অধিকারের সমর্থক হইলেও বর্তমান ব্যাপারে মুসলিম লীগের কার্যের সমর্থন করিতে পারেন না।

৩০শে আষাঢ় আমেরিকায় সম্মিলনের ব্যর্থতার সংবাদ পাইয়া শ্রীমতী বিজয়লক্ষ্মী পণ্ডিত বলেন—বহুদিনব্যাপী জাতীয় বিশৃঙ্খলাই ব্যর্থতার মূলে কারণ। তিনি বলেন, ভারতবাসীকে এখন ভবিষ্যতের কথাই মনে করিয়া বাস করিতে হইবে—ব্যর্থতায় ভারতবাসীর দেশপ্রেম প্রবলতর হইবে।

প্রতিক্রিয়া যেমনই কেন হউক না, ফল দেখিয়া দায়িত্ব বিচার করা সহজসাধ্য।

বিলাতে 'রেনল্ডস নিউজ' জিজ্ঞাসা করিয়াছেন, আর কতদিন ইংরেজ মিস্টার জিন্নার প্রত্যেক আশাপ্রদ চেষ্টা নষ্ট করা সহ্য করিবেন?

'সান্ডে এক্সপ্রেস' আশঙ্কা প্রকাশ করিয়াছেন, লর্ড ওয়াভেল পদত্যাগ করিবেন।

নৌবহরের ইংরেজ কর্মচারীর দণ্ড

রুগ্ন বিবাহিতা নারীর গৃহে বলপূর্বক প্রবেশ করিয়া তাঁহার উপর অবৈধভাবে অত্যাচার করার অভিযোগে হাওড়ায় দায়রা জজের বিচারে সামরিক নৌবিভাগের কর্মচারী যে ইংরেজ কাজিন্সের ১০ বৎসর সশ্রম কারাদণ্ডের আদেশ হইয়াছিল, হাই-কোর্টের বিচারে ২৬শে আষাঢ় তাহার দণ্ড-ভোগকাল ৬ বৎসর করা হইয়াছে। সে আদালতকে লিখিয়াছিল—সে যে দেশ হইতে আসিয়াছে, সে দেশে লোক স্ত্রীলোক-দিগকে বিশেষ সম্মান দেখান এবং মাতৃজাতির সম্মানরক্ষার্থ রক্তদানও করেন। সে নিরপরাধ। খোড়িন গুলীমারা মামলায় আসামী রীডের সম্বন্ধে আসামের তৎকালীন চীফ কমিশনার বলিয়াছিলেন—খৃস্টান পরিবারের প্রভাব হইতে আগত ইংরেজ কি কুলি বালিকার জন্য অনাচারী হইতে পারে?

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কনভোকেশন

১২ই, ১৩ই ও ১৪ই জুলাই ৩ দিন কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কনভোকেশন হইয়াছে। চ্যান্সেলার মিস্টার কেসী বলেন—যে সকল সরকারী চাকরীতে মাসিক বেতন ৫ শত টাকা বা তাহার অধিক সে সকলে বাঙলায় ইউরোপীয়ের সংখ্যা ২ শত ৬৬ জন আর ভারতীয়ের সংখ্যা ২ হাজার ৮ শত ৭৬ জন। কিন্তু যাঁহারা নীতি স্থির করেন, তাঁহাদিগের কয়জন ভারতীয় আর কয়জন ইউরোপীয়, তাহা তিনি বলেন নাই। ভাইস-চ্যান্সেলার ডক্টর শ্রীযুক্ত রাধাবিনোদ পাল বলিয়াছেন, শিক্ষার জন্য সরকার যে টাকা দেন, তাহা যৎসামান্য।

খাদ্যশস্য সঞ্চয়

গত ৩০শে আষাঢ় বাঙলার গভর্নর কলিকাতার উপকণ্ঠে কাশীপুরে সরকারের একটি শস্য গোলার উদ্বোধন করিয়াছেন। উহাতে ৭৩ হাজার ৮ শত টন খাদ্যশস্য মজুদ রাখা যাইবে। খাদ্যশস্যের ব্যবসা অবশ্য লাভজনক। সরকারই কি বাঙলায় সে ব্যবসা একচেটিয়া করিয়া রাখিবেন?

হিসাবে গলদ

শ্রীযুক্ত বিমলচন্দ্র সিংহ ২৯শে আষাঢ়ের 'হিন্দুস্থান স্টান্ডার্ড' পত্রে লিখিয়াছেন—বাঙলা সরকারের অসামরিক সরবরাহ বিভাগ যে বলিতেছেন, বাঙলায় হাতের তাঁতের সংখ্যা ২ লক্ষ ৮৯ হাজার ৪ শত ৮০, তাহা তাঁহারা কোথায় পাইলেন? কারণ 'ফ্যাক্ট ফাইণ্ডিং কমিটি' দেখাইয়াছেন, বাঙলায় হাতের তাঁতের সংখ্যা এক লক্ষ ৪২ হাজার ৬ শত ৬১ মাত্র।

সময়ের প্রসঙ্গ

ত্রি-রাষ্ট্রনেতার বৈঠক

পটস্‌ডামে ত্রি-রাষ্ট্রনেতার বৈঠক আরম্ভ হয়েছে বলে সংবাদ পাওয়া গেছে।

পটস্‌ডাম বার্লিনের ১৬ মাইল দক্ষিণ-পশ্চিমে অবস্থিত জার্মানীর একটি শহর। ইউরোপের ইতিহাসে এ শহরের প্রসিদ্ধি আছে। এই শহরে বসেই ফ্রেডারিক দি গ্রেট্ প্রুশীয় সামরিকবাদের পরিকল্পনা করেছিলেন।

ইয়াল্টাতে ত্রি-রাষ্ট্রনেতার সম্মেলনের পরে এই তাঁদের প্রথম বৈঠক। কিন্তু ইতিমধ্যে অনেক ব্যাপার ঘটে গেছে। অনেক বিষয়ে অবস্থার অনেক ওলটপালট হয়েছে। প্রথমেই উল্লেখযোগ্য হল, ইয়াল্টাতে বৈঠক হয়েছিল মিঃ চার্চিল, যুক্তরাষ্ট্রের তদানীন্তন প্রেসিডেন্ট মিঃ রুজভেল্ট এবং মার্শাল স্ট্যালিনকে নিয়ে। তারপর মিঃ রুজভেল্টের আকস্মিক মৃত্যুতে প্রেসিডেন্ট ট্রুম্যান যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট হয়েছেন। পৃথিবীর বৃহত্তম ত্রিশক্তির বৈঠকে তিনি এই প্রথম। বহু জটিল ও গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের আলোচনা ও মীমাংসার প্রাথমিক পর্ব যে বৈঠকের আলোচ্য বিষয় হবে এবং যার সিদ্ধান্তের প্রভাব প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে পৃথিবীর ভবিষ্যনীতির নিয়ামক হবে সেই বৈঠকে মিঃ রুজভেল্টের মত ব্যক্তিত্বসম্পন্ন রাজনীতিজ্ঞের অভাব যে বিশেষভাবেই অনুভূত হবে তা বলা বাহুল্য। তাঁর স্থলাভিষিক্ত প্রেসিডেন্ট ট্রুম্যান সে অভাব কতটা পূরণ করতে পারবেন, তা তাঁর কাজ দেখেই আমাদের বিচার করতে হবে। কারণ এরূপ বৃহৎ ও জটিল ব্যাপারে নেতৃত্ব করবার সুযোগ তাঁর এর আগে কখনও হয়নি।

তারপর মিঃ চার্চিলের কথা। এর আগেকার সব বৈঠকে তিনি ইংলন্ডের জাতীয় গভর্ণমেন্টের প্রতিনিধিরূপে যোগ দিয়েছেন। কিন্তু এ বৈঠকে আর তিনি জাতীয় গভর্ণমেন্টের প্রতিনিধি নন। পাকা রক্ষণশীল সাম্রাজ্যবাদী মিঃ চার্চিল। তা ছাড়া, মাঝখানে রুশিয়া, সমাজতন্ত্রবাদ সম্বন্ধে তাঁর মতামত যেরূপ নরম ও উদার হয়ে উঠেছিল, বর্তমানে তার অনেক পরিবর্তন হয়েছে। কিছুদিন পূর্বেকার তাঁর কথায় আবার রুশ-জার্মান যুদ্ধের আগেকার চার্চিলের সুরের ঝাঁঝ পাওয়া গেছে।

ইয়াল্টাতে যে সম্মেলন হয়েছিল তাতে কি করে সত্বর জার্মানীকে পরাজিত করা যায়, তাই ছিল প্রধানত চিন্তনীয়। জার্মানীর বিনাসর্তে আত্মসমর্পণের পর সমস্যা হল প্রধানত ইউরোপের ভবিষ্যৎ ভাগ্যনির্ণয়। ত্রিশক্তির সাধারণ শত্রু নাৎসী জার্মানীকে পরাজিত করার সমস্যার চাপে ইয়াল্টাতে যেমন বহু বিরোধ ও অসামঞ্জস্যকে সাময়িকভাবে ধামাচাপা দিয়ে মতৈক্য সাধনের প্রচেষ্টা বড় হয়ে উঠেছিল, জার্মানীর আত্মসমর্পণের পর মতসামঞ্জস্যের সে তাগিদ আর অনুভূত হবে না বলেই মনে হয়। কাজেই এ বৈঠকে মতসামঞ্জস্যের চেয়ে পারস্পরিক স্বার্থসংরক্ষণের প্রশ্নই বড় হয়ে দেখা দেবে এবং প্রত্যেকেই তার জন্যে পূর্বাপেক্ষা বেশী অনমনীয় মনোভাবের পরিচয় দেবেন এ আশঙ্কা করা হয়তো অমূলক নয়।

সম্মেলনের আলোচ্য বিষয় কি, সে সম্বন্ধে অত্যন্ত কড়া গোপনীয়তা অবলম্বন করা হয়েছে। যে ব্যাপারের সঙ্গে সমগ্র ইউরোপের তথা পরোক্ষভাবে সমস্ত পৃথিবীর ভবিষ্যৎ জড়িত তার আলোচ্য বিষয়ের মোটামুটি কথাগুলোও জনসাধারণ জানতে পারবে না, এরূপ ব্যবস্থাকে স্বতঃই কেমন অশোভন বলে মনে হয়। এতে শুধু জনসাধারণেরই যে ক্ষতি হবে তাই নয়, আলোচ্য বিষয় সম্বন্ধে ব্যাপক আলোচনা হলে রাষ্ট্রনেতারাও সমস্যাগুলোর বিভিন্ন দিক সম্বন্ধে পরিচিত হওয়ার যে সুযোগ পেতেন তা থেকে বঞ্চিত হবেন। এই গোপনীয়তার বিরুদ্ধে সাংবাদিক মহলে ইতিমধ্যেই প্রতিবাদ উত্থিত হয়েছে।

যা' হোক সম্মেলনের আলোচ্য বিষয় রহস্যের সিন্দুকে তালা বন্ধ করে রাখলেও আন্তর্জাতিক ঘটনাবলী সম্বন্ধে উৎসুক ব্যক্তিমাত্রেই সে সম্বন্ধে অনুমানের সাহায্যেও অন্তত অল্পবিস্তর জল্পনাকল্পনা করবে।

পূর্বেই বলেছি ইউরোপের সমস্যাই এই বৈঠকে প্রধান আলোচ্য বিষয় হবে বলে মনে হয়।

ইউরোপীয় সমস্যার প্রধান সমস্যা হল জার্মানী। ইয়াল্টা সম্মেলনে স্থির হয় যে, জার্মানীকে চারটি এলাকায় বিভক্ত করে রুশিয়া, ফ্রান্স, বৃটেন ও আমেরিকার সামরিক কর্তৃত্বাধীনে পরিচালিত করা হবে। আর সামরিক শাসন-নীতির নির্দেশ দেওয়ার জন্যে থাকবে চতুঃশক্তি সমন্বিত একটি কেন্দ্রীয় প্রতিষ্ঠান। জার্মানীর পরাজয়ের পর দু'মাস সময় অতীত হয়ে গেছে, কিন্তু এই এলাকা ভাগ পাকাপাকিভাবে এখনও হয়নি।

কিন্তু সেকথা ছেড়ে দিলেও জার্মানী সম্বন্ধে আরও অনেক সমস্যা থেকে যায়। তার মধ্যে কয়েকটার এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে। কতদিন জার্মানীকে সামরিক শাসনাধীনে রাখা হবে ও তারপর জার্মানীতে কিরূপ শাসনব্যবস্থা প্রবর্তিত হবে, জার্মানী তখনও চতুর্ধা বিভক্ত থাকবে না একটি অখণ্ড রাষ্ট্রে পরিণত হবে, যুদ্ধের ক্ষতিপূরণ কি পরিমাণ ও কিভাবে জার্মানীর নিকট থেকে আদায় করা হবে আর তার কত অংশই বা কে পাবে ইত্যাদি।

জার্মানী ছাড়া আরও যে সব সমস্যা এই বৈঠকে আলোচিত হবে বলে মনে হয়, তন্মধ্যে [illegible] বিষয়গুলোর উল্লেখ করা যেতে পারে।

প্রথমত অস্ট্রিয়ার সমস্যা। অস্ট্রিয়াতে সোভিয়েট রুশিয়ার সমর্থনে একটি গভর্ণমেণ্ট প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। কিন্তু বৃটেন ও আমেরিকা সে গভর্ণমেণ্টকে এখনও মেনে নেয় নি। ত্রিরাষ্ট্রের মধ্যে মতৈক্য সাধনের ব্যাপার এ বিষয়ের সুমীমাংসার উপর যে অনেকটা নির্ভর করবে তা সহজেই অনুমান করা চলে।

তারপর ইতালী, গ্রীস ও বেলজিয়মে প্রতিক্রিয়াপন্থীদের প্রাবল্য ও জনসাধারণের স্বার্থ চাপা দিয়ে নিজেদের প্রতিষ্ঠিত করার প্রচেষ্টা এবং জনস্বার্থকামী দলসমূহের উপর তাদের অত্যাচার ও নির্যাতন বৈঠকে আলোচনার বিষয়ীভূত হতে পারে বলে মনে হয়। যুগোস্লাভিয়া ও গ্রীসের সীমান্ত নির্ণয় সমস্যাও এই সমস্যারই অন্তর্ভুক্ত। এছাড়া রুশিয়া কৃষ্ণসাগরের কূলে সামরিক ঘাঁটি নির্মাণের দাবী করাতে ও দার্দানালেসে নৌবহর রাখার দাবী করাতে যে রুশ-তুরস্ক সমস্যা ঘনিয়ে উঠেছে, মধ্যপ্রাচ্যের তৈলখনির অধিকার সম্পর্কে যে স্বার্থদ্বন্দ্বের রূপ এখনও সুস্পষ্ট হয়ে সংবাদপত্রের পাতায় পাতায় দেখা না দিলেও দূর থেকে যে অন্তর্নিহিত ধূমাভাস দেখা যাচ্ছে, পারস্য উপসাগরে রুশিয়া নৌবহর রাখার দাবী জানিয়েছে বলে যে জনরব রটেছে, সে সমস্যাগুলোরও আলোচনা এ বৈঠকে হওয়া সম্ভব।

পোল্যাণ্ডের গভর্ণমেণ্ট গঠন সম্বন্ধে ত্রিরাষ্ট্রের ইতিপূর্বে মতৈক্য হয়েছে বটে, কিন্তু তার সীমা নির্ধারণের ব্যাপার নিয়ে যদি পুনরায় মতবিরোধের সৃষ্টি হয়, তাতে আশ্চর্য হওয়ার কোন কারণ ঘটবে না।

সঙ্গে সঙ্গে প্রাচ্যের যুদ্ধও আলোচনার অন্যতম বিষয় হবে বলে মনে হয়। কারণ জাপানের বিরুদ্ধে রুশিয়াকে যুদ্ধে নামানো সম্ভব হলে প্রাচ্যের যুদ্ধের যে ত্বরিত অবসানের সম্ভাবনা আছে সে সুযোগ গ্রহণ করতে বৃটেন ও আমেরিকা উভয়েরই আগ্রহশীল হওয়া সম্ভব।

আলোচনার ফলাফল কি হবে, তা আগে থেকে অনুমান করা শক্ত। বৈঠক শেষ হলেও এ সম্বন্ধে সঠিক খবর কিছু পাওয়া যাবে কি না এবং কতটা পাওয়া যাবে, তাও বলা মুস্কিল। তবে তিন রাষ্ট্রের পক্ষ থেকেই কাজ চালানো গোছের একটা মতসামঞ্জস্য সাধনের যে চেষ্টা করা হবে, তা অনুমান করা চলে। এ সম্বন্ধে যা কিছু বাধা তা প্রধানতঃ আসার সম্ভাবনা বল্কান ও বাল্টিক অঞ্চলে এবং ইউরোপের অন্যান্য স্থানে রুশিয়ার প্রভাব বিস্তারে সাম্রাজ্যবাদী সন্দিগ্ধতা থেকে আর গ্রীস, ইতালী, পোল্যাণ্ড, জার্মানী প্রভৃতি সম্বন্ধে সাম্রাজ্যবাদী আচরণের অকপটতা সম্বন্ধে সোভিয়েট রুশিয়ার সন্দেহ থেকে।

—বিষ্ণুগুপ্ত

ফেরার

—শ্রীজীবানন্দ ঘোষ

পর পর তেরোদিন পাট বোঝাই নৌকার দাঁড় টানিয়া আজ মাত্র একটা রাত্রির জন্য ছুটি মিলিয়াছে।

কাল বেলা দুইটা হইতে আবার শুরু হইবে। তাই আজ ভালো করিয়া ডাঙগায় উঠিয়া মাঝিরা ইটের উনান করিয়া ভাত রাঁধিতে বসিয়া গিয়াছে।

ক্ষেত্র বৈরাগী ওধারে বসিয়া পেঁয়াজ ছাড়াইতেছে, বিনোদ মণ্ডল জলে নামিয়াছে চালের পাত্র লইয়া। আর ইটের উনানের সামনে বসিয়া দুরন্ত সাগরে হাওয়ার সহিত যুদ্ধ করিয়া মাটির হাঁড়িতে ভাতের জন্য জল ফুটাইতেছে অন্নদা হালদার।

পেঁয়াজের ঝাঁজের জের এড়াইতে না পারিয়া ক্ষেত্র চোখ রগড়াইতে রগড়াইতে বলিল, ভাত খাবো বোধ হয় আজ চোদ্দ দিন বাদে কী বল অনা?

উনানের আগুন নিভিয়া গিয়াছিল, ঘাড় নীচু করিয়া একটা ফুঁ দিয়া অন্নদা বলিল, তা হবে।

ক্ষেত্র বলিল—শুধু চিড়ে আর খই খেয়ে আমরা কতদিন বাঁচবো বল দিকি?

অন্নদা কিছু বলিল না, সে তাহার উনান লইয়াই ব্যস্ত।

বিনোদ আসিয়া হুস করিয়া চালগুলি হাঁড়িতে ঢালিয়া দিয়া ক্ষেত্রর কথার জবাব দিল—যতদিন ভগবান রাখে। কিন্তু অনা, আজ কিন্তু বেশ ভালো করে রাঁধা চাই মাইরি! বেশ জ্যোচ্ছোনা রাত আছে, আলোয় আলোয় খাসা একখান তরকারি করাদিনি! অনেকদিন তরকারির মুখ দেখিনি।

ক্ষেত্র বলিল, আচ্ছা একটা দ্যাখ বিনে, আমরা দুজনে নৌকার দাঁড় টানতে টানতে যেন হালের কাছি হয়ে যাচ্ছি, কিন্তু অনাটা মাইরি ঠিক আছে। চেহারা তো নয়, যেন যমদূত!

অন্নদা কমই কথা কয় এবং যখনই যতটুকু কথা কয়, ততটুকু কাজের। ক্ষেত্রর কথার উত্তরে সে কেবল বলিল,—তোরা খাস গাঁজা, তাড়ি চরস, কিন্তু আমি তো ওসব খাইনে!

ক্ষেত্র বলিয়া উঠিল—এই রে! ওকথা তো আমার মনেই ছিল না। বিনে তুই ভাই পেঁয়াজ কুচো, আমি ওস্তাদের গাঁজার পুরিয়া থেকে খানিকটা গাঁজা নিয়ে আসি। ছুটির রাত—বেশ ভালো করে জমাবো'খন।

কাজ ফেলিয়া ক্ষেত্র একরকম লাফাইয়াই ঘাটে বাঁধা নৌকার দিকে ছুটিয়া গেল। নৌকার মধ্যে নৌকার কর্তা-মাঝি বৃদ্ধ নফর মণ্ডল ঘুমাইতেছিল। ক্ষেত্র ধীরে ধীরে তাহার কৌটা হইতে খানিকটা গাঁজা লইয়া পুনরায় এখানে আসিয়া হাজির হইল।

ভাত টগবগ করিয়া ফুটিতেছে, আগুনের আলোয় অন্নদার বলিষ্ঠ চেহারাখানি মাঝে মাঝে দেখা যাইতেছিল। অন্নদা বলিল,—ওসব খাসনে ক্ষেত্তোর।

ক্ষেত্র হাতের চেটোয় গাঁজার টুকরাটিকে আরও টুকরা টুকরা করিতে করিতে বলিল—যা যা! মাঝি হয়ে যে গাঁজা না খায়, সে আঁটকুড়ে! কী বলিস বিনে?

—নিশ্চয়ই! বিনোদ পেঁয়াজের ঝাঁজ সামলাইতে সামলাইতে বলিল।

ক্ষেত্র নিজের কথার জের টানিয়াই বলিয়া চলিল,—তোর বিয়ে হয়েছে, অনা?

না। বিবাহের কথাটি ক্ষেত্র প্রায়ই জিজ্ঞাসা করে, আর অন্নদা ছোট্ট করিয়া কেবল একটি না বলে।



ভাতের হাঁড়ির পানে চাহিয়াই মনে মনে ভাবে—

—তবে? অথচ আমাদের এক-একজনার পাঁচ ছটা করে ছেলেমেয়ে। যা যা! তুই আমাদের কথার মধ্যে থাকিসনে। সখ করে মাঝিগিরি করতে এসেছিস তুই গাঁজার মর্ম কী বুঝবিরে? সারা ভূভারতের মাঝিরা গাঁজা খায়, তা জানিস? দে এই গাঁজার ওপর দু ফোঁটা জল ফেলে দে দিনি!...ব্যস, ব্যস, থাক।

অন্নদা ভাতের হাঁড়ির পানে চাহিয়াই মনে মনে ভাবেঃ হয়তো সত্যই সে সখ করিয়া মাঝিগিরি করিতেছে। নইলে তাহার কিসের অভাব? ঘরে কি তাহার ভাত নাই, গোলায় কি তাহার ধান নাই, সংসারে কি তাহার আপনার বলিতে কেহ ছিল না? কিসের জন্য কিসের অভাবে সে এই অস্বাভাবিক পরিশ্রমের কাজ বাছিয়া লইয়া দেশত্যাগী হইয়াছে?

অন্নদা নিজের মনেই হাসে। দেশত্যাগী হইয়াছে সে আজ দুই বৎসর। নিজেকে লুকাইবার জন্য সে নাম পাল্টাইয়াছে, গোঁফ-দাড়ি রাখিয়াছে, মাথায় রাখিয়াছে চুল।

ক্ষেত্র একটা মৌতাতী টান টানিয়া বিনোদের দিকে কলিকাটি ধরিয়া বলিল,—অনাটা এর স্বাদ বুঝলোনারে বিনে!

বিনোদ আপন মনেই স্বর্গ-মর্ত-পাতাল ভুলিয়া গাঁজার কলিকাকে লইয়া পড়িল।

ক্ষেত্র বলিল,—অনা, একটা টান টেনে দ্যাখ, ভব-যন্ত্রণা দূর হয়ে যাবে, মাইরি! দেখবি মন থেকে একটা জগদ্দল পাথর নেমে গেছে, প্রাণভরে হাসতে পারবি, কথা কইতে পারবি। ওরকম গোমড়া মুখ করে আর তোকে থাকতে হবে না। খাবি?

না। ছোট্ট একটি কথা বলিয়া পেঁয়াজ-গুলি ধুইবার জন্য অন্নদা ঘাটের দিকে অগ্রসর হইল।

কিন্তু ঘাটে নামিতে গিয়া অন্নদা জ্যোৎস্নার আবছা আলোয় যেন দেখিল দুইজন মানুষ এইদিকেই আসিতেছে। এত রাত্রে গঙ্গার ধারে কোনও ভদ্রলোক আসিতে পারে, একথা অন্নদা ভাবিতেই পারিল না। পেঁয়াজ ধুইয়া লইয়া সে আপনমনেই চলিয়া গেল। মানুষ দুটিকে রাত্রে ঠিক দেখা গেল না।

ক্ষেত্র বলিল,—অনার আবার পিটপিটুনি দ্যাখ বিনে! পেঁয়াজ—তাও ধুয়ে রাঁধা। হুঃ! দে কলকেটা দে।

ঠিক এই সময় অকস্মাৎ নৌকার ভিতর হইতে নফর মণ্ডলের বজ্রের মত কণ্ঠ শোনা

গেল, নফর মণ্ডল ডাকিতেছে—ওরে বিনে, ওরে ক্ষেত্তোর, বলি ওরে অনা।

বিনোদ বলিয়া উঠিল,—বুড়োর বোধ হয় বাতের ব্যথাটা বাগিয়েছে রে! চীৎকার করিয়া বলিল,—আমরা এখেনে গো কর্তা! রাঁধছি।

—রান্না বন্ধ করে তোরা এদিকে চট করে একবার আয়দিকি! নফর চীৎকার করিয়াই বলিল। কথাগুলি রাত্রের নিস্তব্ধতায় অনেক দূর পর্যন্ত ছড়াইয়া পড়িল।

ক্ষেত্র কলিকাটিকে আরও জোরে চাপিয়া ধরিয়া একটা সুখ টানের আয়োজন করিয়া বলিল, তুই শুনে আয় গে বিনে। আমি বাবা এখন নড়ছিনে।

বিনোদই গেল।

এবং কয়েক মিনিটের মধ্যেই ফিরিয়া আসিয়া বলিল,—খাওয়া বন্ধ কর, অনা।

অন্নদা মুখ তুলিয়া বলিয়া উঠিল,—কেন?

ক্ষেত্র এক গাল ধোঁয়া শুদ্ধ মুখে বিনোদের মুখের পানে তাকাইয়া রহিল।

বিনোদ বলিল,—কোত্থেকে একটা লোক একটা মেয়েছেলে নিয়ে হাজির। যাবে কোলকেতায়—এই রাত্তিরেই তেনাদের পোঁছুতে হবে। বুড়োকে মোটা টাকার লোভ দেখিয়েছে। ওঠ।

—তা বলে ভাত কটা খাবে না? অন্নদা বলিল।

—তেরো চোদ্দদিন পরে? ক্ষেত্র বলিয়া উঠিল।

—সে আমি জানিনে। তুই তবে বলে আয় গে অনা। বিনোদ বসিয়া পড়িল।

অন্নদা গেল। নফর মণ্ডল এদিকেই আসিতেছিল। অন্নদা তাহাকে বলিল—ভাত কটা গালে দিয়ে নিই কর্তা।

—ভাত খেতে গেলে অনেক দেরী হবে বাবা! ও না খেয়েই চল। নফর মণ্ডল বলিল, পঞ্চাশটে টাকা দিচ্ছে। কোলকেতায় গিয়ে তোদের পেট পুরে মোণ্ডা খাওয়াবোখন।

—সে হয় না কর্তা। আমরা মানুষ তো! আধ ঘণ্টাখানেক দেরী করতে বলো সোয়ারীকে। অন্নদা উত্তরের অপেক্ষা না করিয়াই ফিরিয়া আসিল।

আধ ঘণ্টাও দেরী হইল না, তাহার ভিতরেই অন্নদা, ক্ষেত্র ও বিনোদ আধফোটা ভাত কোনরকম খাইয়া নৌকার ধারে আসিয়া হাজির হইল।

নফর বাহিরেই দাঁড়াইয়া ছিল, বিনোদ ও ক্ষেত্রকে অন্য নির্দেশ দিয়া অন্নদাকে দাঁড় টানিতে বলিল।

ক্ষেত্র বলিল, সোয়ারী তোমার কই গো কর্তা?

—তেনারা নৌকার ছইয়ের মধ্যে আছে। ওরকম চেঁচাসনে ক্ষেত্তোর। সোয়ারী,—নফর আস্তে আস্তে বলিল,—বড্ড ভদ্দরলোক। বোধ হয় কোথাকার জমিদার টমিদার হবে।

—তা, এই পাটের নৌকোয় ক্যান কর্তা? অন্নদা জিজ্ঞাসা করিল।

—জরুরি কাজে তেনারা কোলকেতায় যাচ্ছে। কেরায়া নৌকো পায় নি, তাই। নে নে এখন দাঁড়ে বস গে দেখি।

যে যাহার কাজে চলিয়া গেল, অন্নদাও নিজের জায়গায় গিয়া বসিল। নফর আসিয়া তাহার পাশটায় বসিল।

নৌকা ধীরে ধীরে অগ্রসর হইল।

অন্নদা বলিল,—অনেকদিন পরে ভাত খেয়েছি, হয়তো ঝিমুনি আসতে পারে, তুমি একটু আমার দিকে নজর রেখো কর্তা।

নফর হাসিয়া বলিল,—আচ্ছারে বাবা আচ্ছা। তুই হলি বাঘা। বাঘের কখন ঝিমুনি আসে?

নফর সস্নেহে অন্নদার পিঠে হাত বুলাইতে থাকিল।

নৌকা চলিয়াছে।

অকস্মাৎ ছইয়ের ভিতর হইতে শোনা গেলঃ এখানে একটা আলোর ব্যবস্থা করো মাঝি। ভেতরটা বড্ড অন্ধকার।

নফর উত্তর দিল,—আলো নেই কর্তা। ওদিকের পর্দাটা উঠিয়ে দেন—চাঁদের আলো আসবেখন।

—চাঁদের আলো তো আসবে, গঙ্গার হাওয়ায় যে অসুখ করবে মাঝি।

অন্নদা নফরকে বলিল,—তোমার কেরোসিনের কুপিটা দাওনা।

নফর তাহাই করিল।

খানিকবাদে আবারঃ বড় পাটের আঁশ উড়ে আসছে মাঝি, ব্যবস্থা করো।

নফর বলিল, ভয়ানক কাণ্ড তো। চীৎকার করিয়া বলিল, আপনাকে তো গোড়াতেই বলেছি কর্তা—এটা আমাদের পাটের নৌকো। আঁশ একটু আধটু উড়বেই।

—নাকের মধ্যে ঢুকছে যে।

অন্নদা আবার নফরকে বলিল,—বিনোদকে ওধারটায় একটা কাপড় টেনে বেঁধে দিতে বলো না। নফর তাহাই করিল।

নৌকা মাঝগঙ্গায় পড়িয়া ঊর্ধশ্বাসে চলিতেছে।

বিনোদ একরকম বসিয়াই ছিল,—সে এক সময় আসিয়া বলিল, আমি একটু ধরবো নাকিরে অনা? একলা পারবি তো?

—খুব। তুই বরং একটু হালের পাশে বসে ঘুমিয়ে নেগে। অন্নদা মাতালের মত দাঁড় টানিয়া চলিল।

এক সময় নফর মণ্ডলও সেখানে শুইয়া পড়িল।

ক্ষেত্রটাও হয়তো বসিয়া বসিয়া ঝিমাইতেছে।

রাত্রি প্রায় দুইটা হইবে।

ছইয়ের ভিতর হইতেও কোন সাড়া শব্দ আসে না।

চারিদিকে নিস্তব্ধ, দূরে জোয়ার আসিবার কেবল একটা ভাসা ভাসা শব্দ আসিতেছে। অশান্ত জল-কল্লোলের একটা চাপা গর্জন ভাসিয়া আসিতেছে যেন। জোয়ার আসিলে সুবিধাই হয়। জোয়ারের মুখে নৌকা ছাড়িয়া দিতে পারিলে অন্নদাকে আর তেমন পরিশ্রম করিতে হইবে না।

নৌকা হেলিয়া দুলিয়া চলিতেছে।

অন্নদা ভাবিতেছে, তাহার এই অজ্ঞাতবাসের পূর্বদিনের কথা। ভাবিতেছে তাহার কথা, যাহাকে না পাইয়া সে আজ পথের ভিখারী, বিরাগী। কেন সে পাইল না কমলকে? কিসের জন্য সে কমলকে পাইবার অধিকার হইতে বঞ্চিত হইল? শৈশবের খেলা হইতে সুরু করিয়া যাহার সহিত সে কাটাইল কৈশোরের মধুময় দিবস আর যৌবনের প্রথম দিনগুলি যাহাকে ঘেরিয়া জাগিল তাহার প্রথম প্রেমের দেবতা, যাহার সাহচর্যে সাড়া দিল তাহার অন্তরে বসন্তের প্রলুব্ধ উন্মাদনা,—সেই কমল—সেই আবাল্যসঙ্গিনী কমলকে কেন পাইলনা সে?

জোয়ারের ঢেউ আসিয়া লাগে নৌকার গায়েঃ ছলাৎ, ছলাৎ!

তাহার মনেও তখন যেন কিসের জোয়ার আসিয়া লাগিয়াছে? তাহারই টানে সে ভাসিয়া চলিয়াছে অতীত জীবনের দিকে, পূর্ব স্মৃতির প্রাশ্রিত রোমন্থনে। জোয়ারের প্রবল টানে নৌকা দুলিয়া উঠে প্রবলভাবে।

অন্নদা চীৎকার করিয়া ওঠেঃ ক্ষেত্তোর, জেগে আছিস্ তো রে! ক্ষেত্তোর রে—

নৌকার ওদিক হইতে নিদ্রাজড়িত কণ্ঠে জবাব আসেঃ আছি।

জোয়ার এসেছে। সজাগ থাকিস্।

ক্ষেত্র একটু নড়িয়া-চড়িয়া বসে। নফর পাশ ফিরিয়া শোয়। বিনোদের কোন সাড়ই পাওয়া যায় না। আবার খানিক পরে নিস্তব্ধতা। সকলেই ঘুমাইয়া পড়ে। জাগিয়া থাকে একা অন্নদা। অকস্মাৎ ছইয়ের ভিতর হইতে কে যেন বাহির হইল।

সবিস্ময়ে অন্নদা দেখিলঃ নারী।

জলে-পড়া পূর্ণিমার চাঁদের দিকে একদৃষ্টে চাহিয়া মেয়েটি দাঁড়াইয়া আছে।

অন্নদা হাঁ করিয়া দেখেঃ অপূর্ব সুন্দরী! গঙ্গার হাওয়ায় তাহার অবগুণ্ঠন খুলিয়া পড়িয়াছে, কেশ অবিন্যস্ত, দুই এক গোছা চুল তাহার মুখের উপর হাওয়ায় উড়িয়া আসিয়া নাচিতেছে। মাঝে মাঝে সে চুলগুলিকে সরাইয়া দিতেছে। অপূর্ব!

অন্নদা নিজেকে ভুলিয়া যায়। অজ্ঞাতবাসের পূর্বদিনের কথায় তাহার সারামন ভরিয়া উঠে। সারা অন্তর কাঁদিয়া উঠে কমলের জন্য। পাথরের মত দেহ তাহার, বলিষ্ঠ তাহার মাংসপেশী,—কিন্তু ভিতরটায় তাহার শিশু মন অত্যন্ত অসহায়ভাবে



সবিস্ময়ে অন্নদা দেখিল ঃ নারী!

কাঁদিতেছে। দুর্বল, ক্ষীণ, আর শক্তিহীন অন্নদা হাহাকার করিয়া মরিতেছে তাহার বুকের মাঝে।

মেয়েটি আবার ছইয়ের মধ্যে চলিয়া যায়।

দূরে জাহাজের বাঁশী বাজে। আরও দূর হইতে ভাসিয়া আসে ভাটিয়ালী সুরের বাঁশীর ক্রন্দন।

অন্নদা অনেকদিন পরে আজ যেন একটু চঞ্চল হইয়া পড়িয়াছে।

পাটের নৌকায় কাজ করিয়া সে হইয়া গিয়াছিল নির্জীব, প্রাণহীন; মুখে তাহার হাসি ছিল না, অন্তরে তাহার উল্লাস ছিল না, মুখে তাহার কথা ছিল না। কিন্তু আজ যেন হঠাৎ তাহার ভিতরটা আগ্নেয়-গিরির ন্যায় ফাটিয়া যাইতে চায়। অজ্ঞাত-বাসের পর দীর্ঘ দুই বৎসর পরে এই সে প্রথম নারীকে এত কাছাকাছি দেখিল।

অন্নদার হাত হইতে দাঁড়ের হাতলটা শিথিল হইয়া যায়। জোয়ারের জোরে নৌকার গতি ঠিকই থাকে।

কমল! অন্নদার চোখের সম্মুখে ভাসিয়া উঠে সেই সুন্দর মুখখানি, সেই হাসি, সেই কথা। মনে পড়ে, কিশোরী কমল একদিন তাহাকে বলিয়াছিল, তোমাকে ছাড়া আমি বাঁচবো না। মনে পড়ে, তাহার একটি সাংঘাতিক অসুখের সময় কমলের জীবন-পণ করা সেবার কথা। কমলের আরও কত সাহচর্যের স্মৃতি অন্নদার মনে ভাসিয়া উঠে। তাহার চোখ দুইটি ঝাপসা হইয়া যায়। তাহার পর কমলের মায়ের কাছে তাহার মায়ের সেই বিবাহের প্রস্তাবের কথা। আড়াল হইতে অন্নদা শুনিয়াছিল সে কথা? কমল সেদিন ছুটিয়া আসিয়া তাহাকে আড়ালে ডাকিয়া কি বলিয়াছিল? বলিয়া-ছিল—বিবাহ হইবে! কি আনন্দ! সব ঠিকঠাক।

কিন্তু তারপর কি হইল? কোথা হইতে এমন কাণ্ড বাধিল?

কমলকে কেন ছিনাইয়া লইলেন রায়-পুরের বৃদ্ধ জমিদার হীরেন্দ্রনারায়ণ? জমিদারীতে বেড়াইতে আসিয়া কমলের রূপে মুগ্ধ হইয়া কেন তিনি কমলের বাবাকে প্রলুব্ধ করিলেন কমলকে তাঁহার গৃহিণী করিবার জন্য? কেন সেই পঞ্চাশ বছরের বৃদ্ধ হীরেন্দ্রনারায়ণ দ্বিতীয়বার বিবাহ করিয়া কমলকে কাড়িয়া লইলেন তাহার চিরদিনের স্বপন ভাঙ্গিয়া দিয়া? নিজের চোখে অন্নদা দেখে নাই হীরেন্দ্র-নারায়ণকে, শুধুমাত্র শুনিয়াছিল তাঁহার নাম। ধনী হীরেন্দ্রনারায়ণের কাছে হইল দরিদ্র অন্নদার পরাজয়? কিন্তু কমলা? বৃদ্ধ জমিদারের গৃহিণী হইয়া সেও কি সুখী হইয়াছে?

তারপর হইতেই অন্নদা নিরুদ্দিষ্ট। সুদীর্ঘ দুই বৎসর কাটিয়া গিয়াছে। দূরে হইতে সে দেখিয়াছে, তাহার কত খোঁজ হইয়াছে, আত্মীয়-স্বজন কত কাঁদিয়াছে। কিন্তু তবুও অন্নদা ফিরে নাই, ফিরিবেও না।

এই সব কথা ভাবিতে ভাবিতে নিজেরই অজ্ঞাতে অন্নদা কখন ছইয়ের মধ্যে আসিয়া পড়িয়াছে। পুরুষটি ঘুমাইতেছে, মেয়েটি তাহার পাশে চুপচাপ চোখ বুজিয়া পড়িয়া আছে। অবগুণ্ঠনের আড়ালে তাহার মুখটি দেখা যাইতেছে না। কিন্তু দেখা যাইতেছে আভরণের আড়ম্বর আর আবরণের বৈচিত্র্য। কেরোসিনের কুপি হইতে নির্গত আগুনের শিখাটি হাওয়ায় দুলিতেছে।

অন্নদা নিঃশ্বাস বন্ধ করিয়া দেখিতেছে, দৃষ্টি তাহার ক্ষুধিত, মন তাহার উন্মত্ত হইয়া উঠিয়াছে।

কাঁচা সোনার মত গায়ের রঙ আর কালো এক রাশ চুলের গোছা অন্নদা বেশ দেখিতে পাইতেছে।

অন্নদা দেখিতে থাকে।

মেয়েটি পাশ ফিরিল; অবগুণ্ঠন একটু-খানি সরিয়া গেল। কেরোসিনের স্তিমিত আলোয় বিশেষ কিছু দেখা গেল না মুখখানির; কিন্তু যতটুকু দেখা গেল ততটুকুই যথেষ্ট। নৌকাটা একটু ঘুরিতেই ছইয়ের ফাঁক দিয়া চাঁদের আলো আসিয়া পড়িল।

অন্নদা বিস্ময় বিস্ফারিত চোখে তাকাইয়া রহিল। এই মুখের পাশাপাশি তাহার মনের চোখে আর একখানি মুখ ভাসিয়া উঠিল। সে মুখ কমলের।

অন্নদার বুকের স্পন্দন বাড়িয়া গেল, সারা দেহ থর থর করিয়া কাঁপিতে থাকিল। এই তো কমল, যাহার জন্য সে বিবাগী হইয়া ফিরিতেছে পথে পথে? আর এই নিদ্রিত পুরুষটিই কি সেই হীরেন্দ্রনারায়ণ, কমলের বৃদ্ধ স্বামী তবে—?

তবে কি এই মুহূর্তেই অন্নদা ইহাদের গঙ্গার জলে......

অথবা দুই হাতে দুইটি কণ্ঠ চাপিয়া ধরিয়া......

অথবা......

অন্নদা আর ভাবিতে পারে না। বিমূঢ়ের মত দাঁড়াইয়া রহিল সে।

তাহার সারা অন্তর উন্মাদের মত বিভ্রান্ত হইয়া উঠে। ঠোঁট দুইটি থর-থর করিয়া কাঁপিতেছে, চুলগুলি খাড়া হইয়া উঠিয়াছে, হাতের আঙুলগুলি নিশপিস্ করিতেছে।

অকস্মাৎ কমল চাহিল, কিন্তু পদ্মের পাপড়ির মত চোখ মেলিতেই সে সম্মুখে অন্নদার ভয়াবহ মূর্তি দেখিয়া আঁৎকাইয়া উঠিল।

তাহার চীৎকারে জাগিয়া উঠিল হীরেন্দ্রনারায়ণ সম্মুখে দেখিলেন অন্নদার ভয়াবহ মূর্তি। ছুটিয়া আসিল নফর মণ্ডল, ক্ষেত্র আর বিনোদ। সকলেই দেখিল ছইয়ের ভিতর অন্নদা দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। কমল তখন অজ্ঞান।

হীরেন্দ্রনারায়ণ চীৎকার করিয়া বলিলেন --আমি রায়পুরের জমিদার হীরেন্দ্রনারায়ণ। এমনি ছাড়বোনা। পুলিশে দেবো শয়তানকে, জেল খাটাবো।

নফর মণ্ডল, ক্ষেত্র, বিনোদ সকলেই হীরেন্দ্রনারায়ণের পায়ে পড়িয়া অন্নদার জন্য ক্ষমা চাহিল। কিন্তু হীরেন্দ্রনারায়ণ শুনিলেন না।

হীরেন্দ্রনারায়ণ বলিলেন,--কলকাতায় গিয়েই আমি এর ব্যবস্থা করবো। ব্যাটা মাঝির কতখানি আস্পর্ধা আমি দেখে নেবো, তবে আমার নাম হীরেন্দ্রনারায়ণ রায় চৌধুরী।

নফর অন্নদাকে হীরেন্দ্রনারায়ণের নিকট ক্ষমা চাহিতে বলিল, কিন্তু অন্নদা একটি কথাও কহিল না, পাথরের মূর্তির মত বুকের উপর দুইটি হাত আড়াআড়িভাবে রাখিয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

হীরেন্দ্রনারায়ণ সকলকে বাহির করিয়া সস্ত্রীক নামিয়া গেলেন। আধ ঘণ্টার মধ্যেই দুইজন কনস্টেবল ও একজন ইনস্পেক্টর সহ নৌকার কাছে ফিরে এলেন তিনি।

হীরেন্দ্রনারায়ণ অন্নদাকে দেখাইয়া দিলেন। পুলিশ অন্নদার হাতে তৎক্ষণাৎ হ্যাণ্ডকাপ্ পরাইল।

ইন্স্পেক্টরকে হীরেন্দ্রনারায়ণ ইংরাজীতে সমস্ত ঘটনা বুঝাইয়া দিলেন।

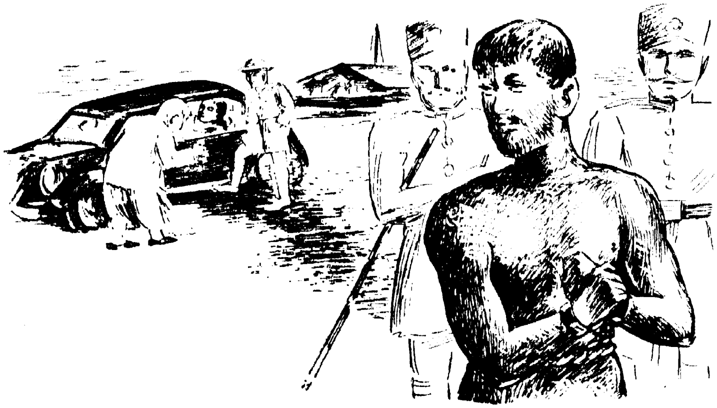
অন্নদা একটুও প্রতিবাদ করিল না, একটুও আপত্তি করিল না, একটুও বাধা দিল না।

হাত দুটি বাঁধা অবস্থায় অন্নদা, নফর, ক্ষেত্র ও বিনোদকে উদ্দেশ্য করিয়া বলিল, মাঝিগিরি আমার শেষ হ'লো ভাই, এবার সুরু হ'ল কয়েদীগিরি।

ঘাট হইতে একটু দূরেই হীরেন্দ্রনারায়ণের মোটর দাঁড়াইয়াছিল, ভিতরে জমিদারের স্ত্রী এখনও বসিয়া আছেন।

দুইজন পুলিশের পাহারায় অন্নদা হাতবাঁধা অবস্থায় চলিয়াছে। মোটরের পাশ দিয়া যাইবার সময় সে একবার দাঁড়াইল, তারপর স্থিরনেত্রে স্পষ্টভাবে কমলের মুখের পানে একবার তাকাইল।

অন্নদার গোঁফ দাড়ি ভরা মুখের দিকে তাকাইয়া কমল প্রথমটা যেন কাহাকে খুঁজিয়া পাইল, কিন্তু তাহার পরেই সে



মাঝিগিরি আমার শেষ হলো ভাই—এবার শুরু হলো কয়েদগিরি!

দিয়া স্ত্রীকে সুস্থ করিবার কাজে লাগিয়া গেলেন।

অন্নদা পুনরায় দাঁড় টানিবার স্থানে গিয়া বসিল।

নফর তাহাকে নানাভাবে ক্ষমা চাহিবার জন্য অনুরোধ করিল, কিন্তু অন্নদা একটি কথাও বলিল না, পূর্ববৎ সে চুপ করিয়াই রহিল। সহস্র কথার উত্তর হিসাবে সে কেবল একটি মাত্র কথা বলিল—কোনো অপরাধ তো আমি করিনি কর্তা!

সকাল হইতেই নৌকা আসিয়া কলিকাতায় পৌঁছিল। হীরেন্দ্রনারায়ণ দ্বিতীয়বার অজ্ঞান হইয়া পড়িল।

ইন্স্পেক্টরকে লইয়া জমিদার হীরেন্দ্রনারায়ণ তাড়াতাড়ি মোটরের দিকে আসিলেন।

নফর মণ্ডল, ক্ষেত্র ও বিনোদ তখনও নৌকা হইতে দেখিতেছে বাঘের মত একটি মানুষকে দুইটি পুলিশ ধরিয়া লইয়া যাইতেছে। অশ্রুর বন্যায় তাহাদের দৃষ্টি ঝাপসা হইয়া আসে।

অন্নদা পিছনে একবারও তাকাইল না। পুলিশের গতির সঙ্গে সমান তালে সে চলিয়াছে।

স্বাস্থ্য প্রসঙ্গ

গ্রন্থিতত্ত্ব

শ্রীঅমরজ্যোতি সেন

আমাদের দেহের ভেতরে কতকগুলি gland অর্থাৎ গ্রন্থি আছে, যেমন লিভার অথবা যকৃত, প্যানক্রিয়াস অথবা অগ্ন্যাশয়। এই গ্রন্থিগুলির প্রত্যেকটির একটি নিজস্ব স্রাব আছে, যেমন লিভারের স্রাব পিত্তরস। এই স্রাবগুলি বিশেষ নলীর সাহায্যে পরিবাহিত হয়ে' আমাদের বিভিন্ন প্রকারের খাবার হজম করতে সাহায্য করে। এ ছাড়া আরও সব গ্রন্থি আছে, যাদের প্রত্যেকের নির্দিষ্ট কায আছে; যথা সোয়েট গ্ল্যাণ্ড, টিয়ার গ্ল্যাণ্ড।

কিন্তু আমাদের শরীরে এমন কতকগুলি গ্রন্থি আছে যেগুলির স্রাব সোজাসুজি রক্তের সঙ্গে মিশে দেহে নানাপ্রকার কার্যকরী শক্তি জাগিয়ে তোলে। এই গ্রন্থি-গুলির নাম Ductless gland অথবা নলীহীন গ্রন্থি। এদের আরও একটি নাম আছে, endocrine (endon-within, krino=I secrete)। এই সমস্ত গ্রন্থির স্রাবের বিশেষ নাম হ'ল হর্মোন (Hormone)। হর্মোন কথাটির অর্থ হ'ল "আমি উত্তেজিত করি।" এই হর্মোনগুলির রাসায়নিক গঠন জানা গেছে ও আজকাল কৃত্রিম উপায়ে প্রস্তুত করা সম্ভব হয়েছে।

এই হর্মোনগুলি আমাদের শরীরের আশ্চর্যজনক কায করে। খাদ্যে যেমন ভিটামিনের অভাব কল্পনা করা যায় না, তেমনি শরীরের অভ্যন্তরে হর্মোনের অভাব কল্পনা করা যায় না। হর্মোন বিজ্ঞানের আরও উন্নতি হ'লে এবং কৃত্রিম উপায়ে প্রস্তুত হর্মোন আরও নিখুঁত হ'লে আমরা বোধ হয় আমাদের দেহ যেমন ইচ্ছা গঠন করতে পারব। শুধু তাই নয়, যে সমস্ত ব্যাধি এখনও আমরা নিরারোগ্য বলে জানি, সেগুলি যে হর্মোন চিকিৎসার সাহায্যে সহজেই নিরাময় করা যাবে তাতে আর সন্দেহ কি! এখন এই গ্রন্থিগুলি এবং তাদের হর্মোনগুলি সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করা যাক।

প্রথমেই ধরা যাক থাইরয়েড গ্রন্থি যার বাঙলা নাম গলগ্রন্থি। গলায় ম্যাডাম আপেলের অর্থাৎ উঁচু হাড়টির ঠিক নীচেই এর অবস্থান। থাইরয়েড গ্রন্থির স্রাবের নাম থাইরকসিন যাতে অনেকটা আয়োডিন আছে। আমাদের শরীরে শ্রম দ্বারা নিয়ত যে ক্ষয় ও তার পূরণ হয় অর্থাৎ ভাঙাগড়ার প্রক্রিয়া (metabolism)কে সংযমে রাখে এই গ্রন্থিটি।

থাইরকসিনের অভাব হ'লে মানুষের 'চির-খোকা' ভাব হয় (cretinism)। যে শিশুর এই গ্রন্থিটি পরিপুষ্ট হয়নি তার শারীরিক ও মানসিক পুষ্টি যেন বাধা পেয়ে থেমে যায়। সে মাথায় বাড়তে পায় না, চামড়া কর্কশ হয়ে' পড়ে, শরীর কেশবিরল হয়, আঙুলগুলি মোটা মোটা আর বেঁটে হয়, বুদ্ধির বিকাশ হয় না, হাবাগোবা হয়ে পড়ে। এই রকম ছেলেকে ক্রিটীন (cretin) বলা হয়। এদের থাইরকসিন ইনজেকসান দিলে উপকার হয়।

প্রৌঢ় ব্যক্তিদের থাইরকসিনের অভাব হলে দেহ মনে যেন জড়ত্ব আসে, চুল উঠে যায়, চামড়া কর্কশ হয়। এই রোগকে মিক্সিডিমা (myxoedema) বলা হয়। রসের যদি আধিক্য হয় তাহলে শরীরের সব যন্ত্র যেন উত্তেজিত হয়ে' পড়ে। নাড়ী দ্রুত চলে, গায়ের চামড়া গরম ও ঘর্মাক্ত থাকে, চোখ যেন ঠেলে বেরিয়ে আসে, যাকে বলে 'ছানাবড়া' চোখ। থাইরয়েড গ্রন্থি-গুলিও যেন আকারে বড় হয়। ঠিক সময়ে চিকিৎসকের উপদেশমত চিকিৎসা করালে সুফল পাওয়া যায়।

আগেই বলেছি থাইরকসিনে অনেকটা আয়োডিন আছে। শরীরে যদি আয়োডিনের অভাব হয় তাহলে গলগণ্ড অর্থাৎ গয়টার (Goitre) হয়। সমুদ্র থেকে বেশি দূর দেশেই গলগণ্ড রোগের প্রাদুর্ভাব দেখা যায়, কারণ সমুদ্র থেকে যতদূরে যাওয়া যায় বাতাসে আয়োডিনের অংশ ততই কমে আসে। আমরা অবশ্য মাছ, দুধ, ডিম ইত্যাদি থেকে অনেকটা আয়োডিন পাই।

থাইরয়েড গ্রন্থির অন্তর্গত গমের দানার মতো ছোট ছোট চারটি গ্রন্থি আছে যাদের নাম প্যারাথাইরয়েড। বাঙলায় বলা যেতে পারে উপগলগ্রন্থি। রক্তে আর দাঁতে ক্যালসিয়ামের (চুণ জাতীয় পদার্থ) সমতা রক্ষা করে এই গ্রন্থিগুলি। এই গ্রন্থিরসের তথা রক্তে ক্যালসিয়ামের অভাব হ'লে রক্তে জমাট বাঁধে না। শরীরে ভিটামিন সি অথবা ভিটামিন কে এর অভাব হলে অনুরূপ অবস্থা হয়। প্যারাথাইরয়েড গ্রন্থিগুলি কেটে বাদ দিলে অথবা এই হর্মোনের ঘাটতি পড়লে রক্তে ক্যালসিয়ামের অভাব হয়, যার ফলে টিটানি নামে ব্যারাম হয়, হাত-পা কাঁপতে থাকে, পেশীতে খিল ধরে, শ্বাসনালী সংকুচিত হয়। শিশুদের রিকেট ব্যারামকে বোধ হয় টিটেনীয় অবস্থা বলা যায়। প্যারাথাইরয়েড হর্মোনের আধিক্য হলে রক্তে ক্যালসিয়ামের ভাগ বেড়ে যায় এবং স্নায়ুমণ্ডলীর অবনতি লক্ষিত হয়। প্রতিদিন কিছুক্ষণ রৌদ্র সেবন করলে এই গণ্ডসমূহের স্বাস্থ্য ভাল থাকে, ফলে হাড়-গুলি বেশ কিছু ক্যালসিয়াম সঞ্চয় করতে পারে। এই প্রসঙ্গে ভিটামিন ডি এর উপকারিতাও উল্লেখযোগ্য।

মাথার পিছনে মগজের কাছে এবং নাকের গোড়ায় মটরের দানার মতো একজোড়া গ্রন্থি আছে যারা বারো হাত কাঁকুড়ের তেরো হাত বীচির মতো কায করে। এদের নাম হলো পিটুইটারি অথবা পোষণিকা গ্রন্থি। এই গ্রন্থির দুটি ভাগ, সম্মুখ (Anterior) এবং পশ্চাৎ (Posterior) ভাগ। এদের স্রাবের নাম পিটুইট্রিন।

সম্মুখ ভাগ থেকে যে হর্মোন নিঃসৃত হয় তা শরীরের বিশেষ হাড়ের বৃদ্ধি সাধন, শরীরের ভাঙাগড়ার কায (metabolism) এবং জননসংক্রান্ত অঙ্গাদির কার্য নিয়ন্ত্রিত করে। স্ত্রীলোকের স্তনে দুগ্ধস্রাবী গণ্ডের (mammary gland) উপরও এর প্রভাব আছে। যদি এমন শিশু জন্মায় যার পিটুইটারি গ্রন্থি অসম্পূর্ণ অর্থাৎ বিকশিত হয়নি তাহলে সে আকারে শিশুই থেকে যাবে, অথচ যতই দিন যাবে ক্রমশ সে বয়স্ক মানুষের অন্য সব গুণই পাবে অথচ মাথায় বাড়তে পাবে না। এই রকম বামন আমরা সার্কাস সিনেমা এবং পথে ঘাটে প্রায়ই দেখতে পাই, অথচ তখন আমাদের একবারও মনে হয় না যে, শরীরের একটি ছোট্ট গ্রন্থির রসের অল্পতা ওদের এই অবস্থার কারণ।

একজন মানুষের পিটুইটারির পুরোভাগ ব্যাধিগ্রস্ত হলে সে মাথায় আর বাড়তে পায় না, দিন দিন যেন কুঁকড়ে যায়, মানসিক শক্তির অবনতি ঘটে, অস্থির বৃদ্ধি সাধন হয় না, যৌন অঙ্গাদিরও অবনতি হয় এবং শরীরে চর্বি জমতে থাকে।

আবার যদি এই পুরোভাগের পিটুইটারির হর্মোনের আধিক্য হয় তাহলে ঠিক উল্টো ফল হয়। হাড় বাড়তে থাকে ও চওড়া হয়; সে মানুষ বেশ লম্বা চওড়া হয়। হাত, পা বড় বড় হয়, ঠোঁট পুরু হয়। মাথাটাও বড় হয়। (Gigantism, Acromegaly)।

এই হর্মোন থাইরয়েড গ্রন্থির উপরও প্রভাব বিস্তার করে। এর স্রাবের ফলে অণ্ডকোষ, গর্ভাশয় প্রভৃতি থেকে কতক-গুলি রস নিঃসৃত হয়ে জননেন্দ্রিয়দের স্বাস্থ্য ভাল রাখে এবং স্ত্রী ও পুরুষের

বৈশিষ্ট্য পরিচায়ক অঙ্গসমূহের বিকাশ সাধন করে।

শেষোক্ত অর্থাৎ পশ্চাদ্বর্তী পিটুইটারির হর্মোন গর্ভাশয়কে সংকুচিত করতে ও রক্তের চাপ বৃদ্ধি করতে পারে বলে স্বীকৃত হয়েছে। তা ছাড়া মগজের অনৈচ্ছিক পেশী (involuntary muscles), স্নায়ুকোষ-সমূহ এবং যৌনাদির সুস্থতাও রক্ষা করে এই হর্মোন। জীবনধারণের জন্য পিটুইটারির হর্মোন একান্ত আবশ্যক।

কিড্নি অর্থাৎ দুইটি মূত্রাশয়ের উপরে আছে দুটি গ্রন্থি যাদের নাম অ্যাড্রিনাল অথবা সুপ্রারেনাল। প্রত্যেকটি গ্রন্থি দুই অংশে বিভক্ত, একটি কর্টেক্স (cortex) অপরটি মেডালা (medulla)। কর্টেক্সকে কমলালেবুর খোসা ও মেডালাকে তার কোয়ার সঙ্গে তুলনা করা যেতে পারে। মেডালার হর্মোন একটি অত্যন্ত তেজস্কর রস, যার নাম অ্যাড্রিন্যালিন। অ্যাড্রিন্যালিন এখন কৃত্রিম উপায়ে প্রস্তুত করা সম্ভব হয়েছে। ইনজেকসান দিলে অ্যাড্রিন্যালিন বিশেষ প্রকার নার্ভের উপর মন্ত্রের মতো কায করে, এমন কি মৃতপ্রায় ব্যক্তিরও জীবন ফিরিয়ে আনে। অ্যাড্রিন্যাল গ্রন্থির একপ্রকার মারাত্মক ব্যারাম হয় যার নাম অ্যাডিসনের রোগ। এই রোগ হলে দেহে দারুণ অবসাদ আসে, রক্তের চাপ কমে যায়। এই রোগ থেকে বাঁচাতে হ'লে রুগীকে কর্টেক্স এর হর্মোন যার নাম কর্টিসন তাই দেওয়া হয়। অ্যাড্রিন্যাল কর্টেক্স থেকে হেক্সোনিউরিক অ্যাসিড নামে ভিটামিন-সি পাওয়া যায়।

কম বয়সে এই গণ্ডের অতিরিক্ত কার্যকারিতার ফলে জনন-সংক্রান্ত অঙ্গাদি অকালেই পুষ্ট হয়, বালকদের পেশীসমূহের উপযুক্ত সময়ের আগেই পুষ্টিলাভ হয় এবং বালিকাদের অকালে ঋতু-বিকাশ হয়। মেয়েদের মুখে দেহে চুলের প্রাচুর্য দেখা যায় এবং ক্রমশ পুরুষের লক্ষণাদি প্রকাশ পায় ও গলার স্বরও গম্ভীর হয়। যদি এই রোগগ্রস্ত অ্যাড্রিন্যাল কর্টেক্স এর উপযুক্ত চিকিৎসা করান যায় তাহলে স্ত্রীলোকের স্ত্রীসুলভ গুণসকল আবার ফিরে আসবে।

আমরা সাধারণত যখন বিশ্রাম নিই তখন রক্তে অ্যাড্রিন্যালের হর্মোন অ্যাড্রিন্যালিন থাকে না, কিন্তু ভয় উদ্বেগ দুশ্চিন্তা, শোক অথবা ক্রোধরূপ মানসিক অবস্থার বিপর্যয় অনুসারে রক্তে অ্যাড্রিন্যালিন এসে মেশে।

ইংরাজীতে একটা কথা আছে দুশ্চিন্তা মৃত্যুর কারণ (worry kills)। ক্রমাগত দুশ্চিন্তা করতে থাকলে অ্যাড্রিন্যালিনের ক্রমাগত স্রাব হতে থাকে এবং অতিরিক্ত স্রাবের ফলে দুরারোগ্য ব্যাধি হয়।

কিন্তু আমরা যদি নিয়মিত ব্যায়াম এবং যথেষ্ট খেলাধুলা ইত্যাদি করি তাহলে অ্যাড্রিন্যাল উত্তেজনার ফলে যে স্রাব হয় তা অন্য গণ্ডগুলির সৌকর্যে সাহায্য করে, যা আমাদের স্বাস্থ্যের অনুকূল।

পাকস্থলীর পশ্চাতে অগ্ন্যাশয় (Pancreas) নামে একটি গ্রন্থি আছে, এরই বিশেষ অংশে আইলেট অফ ল্যাঙ্গারহানে (islet of Langerhan) ইনসুলিন নামে হর্মোন প্রস্তুত হয়। জার্মানীর আর্নস্ট রবার্ট ল্যাঙ্গারহান এইগুলি আবিষ্কার করেন এবং টরন্টো মেডিক্যাল স্কুলে ১৯২১ সালে ডাঃ ব্যান্টিং ইনসুলিন আবিষ্কার করে' নোবেল পুরস্কার লাভ করেন।

আমরা যে কার্বোহাইড্রেট খাদ্য (ভাত, আটা, আলুজাতীয়) খাই তা গ্লুকোজ নামক চিনিতে পরিণত হয়ে রক্তে মিশে যকৃতে প্রবেশ করে এবং এক প্রকার রাসায়নিক প্রক্রিয়ার সাহায্যে গ্লাইকোজেন নামক পদার্থে পরিণত হয়ে যকৃতে সঞ্চিত থাকে। শরীরের ইন্ধনের জন্য সর্বদাই গ্লাইকোজেন আবশ্যক।

আইলেট অফ ল্যাঙ্গারহান থেকে ইনসুলিন সর্বদা ক্ষরিত হয়ে রক্তের সঙ্গে মেশে এবং গ্লুকোজকে গ্লাইকোজেনে পরিণত করবার রাসায়নিক শক্তি দান করে। ইনসুলিনের অভাবে যকৃত কোনোমতে গ্লাইকোজেন তৈরী করতে পারে না। সুতরাং শরীর থেকে যদি কারও প্যাংক্রিয়াসটি কেটে বাদ দেওয়া যায় কিংবা কোনো কারণে যদি প্যাংক্রিয়াস নিষ্ক্রিয় হয়ে যায় তখন দেখা যাবে যে, কার্বোহাইড্রেট খাদ্য যতই খাওয়া যাকনা কেন গ্লুকোজ আর কোথাও জমতে পারছে না, রক্তের ভেতর প্রবেশ করেও কিছুক্ষণ পরেই মূত্রের সঙ্গে নির্গত হয়ে যায়। অতএব সর্বশরীরে ইন্ধন যোগানোর জন্য গ্লুকোজের যে কাজ তা আর সফল হয় না। প্যাংক্রিয়াস গ্রন্থির আভ্যন্তরিক রসের অভাব ঘটলে এইরূপ একটি রোগ হয় যার নাম ডায়াবেটিস। শরীরে গ্লুকোজ সঞ্চিত না থাকতে পেরে যথেষ্ট খাদ্য খাওয়া সত্ত্বেও ইন্ধনের অভাবে শরীর ক্রমশ দুর্বল হতে থাকে।

এই ব্যারামে ইনসুলিন ইনজেকসান দিলে ডায়াবেটিস রোগীকে রোগমুক্ত করা যায়। একটি মাত্র গরুর অগ্ন্যাশয় থেকে যে ইনসুলিন পাওয়া যায় তার সাহায্যে এক হাজার খরগোশের রক্ত থেকে শর্করা কমিয়ে দেওয়া যায়। ইনসুলিন খাওয়ালে কিন্তু কোনো উপকার হয় না, কারণ পরিপাক যন্ত্রের ট্রিপসিন নামক পাচক-রসের প্রভাবে ইনসুলিন নিষ্ক্রিয় হয়ে যায়।

এইবার আমরা স্ত্রী ও পুরুষের জনন অঙ্গ সংক্রান্ত গ্রন্থি নিয়ে আলোচনা করব। পুরুষের হ'ল শুক্রাশয় (testes) এবং নারীর হ'ল ডিম্বাশয় (ovary), এদের এক কথায় বলা হয় গোনাড (Gonads)।

এই গ্রন্থি নারীকে দেয় তার সৌন্দর্য, মসৃণ ত্বক, কোমল অঙ্গ, মিষ্ট কণ্ঠস্বর, দেহের কমনীয় রেখা আর নারীসুলভ যা কিছু বৈশিষ্ট্য। আর পুরুষকে দেয় দৃঢ় পেশী, তার সাহস, তার গম্ভীর কণ্ঠস্বর, তার গুম্ফ শ্মশ্রু আর যা কিছু পৌরুষব্যঞ্জক।

বিখ্যাত জার্মান রাসায়নিক বুটেনান্ট যিনি ১৯৩৯ সালে রসায়নে নোবেল পুরস্কার পেয়েছেন, ১৯৩১ সালে নরমূত্র থেকে একটি শক্তিশালী হর্মোন বিশ্লেষিত করেন, যার সামান্য মাত্র প্রয়োগে গিনিপিগের জননেন্দ্রিয় বৃদ্ধি পেতে দেখা গেছে। এই পদার্থের নাম অ্যানড্রোস্টেরন। পুরুষের শুক্রাশয়ে এই পদার্থটি গঠিত হয়। কোলেস্টেরল থেকে বিখ্যাত সুইশ রাসায়নিক রুজিকা অ্যানড্রোস্টেরন প্রস্তুত করতে সক্ষম হয়েছেন। ১৯৩৯ সালে রুজিকা বুটেনান্টের সঙ্গে একযোগে নোবেল পুরস্কার লাভ করেছেন। পুরুষের পুং-গ্রন্থির ক্ষরণের অভাব হলে দেহ খর্ব ও কেশবিরল হয়। গলার স্বর মেয়েদের মতো সরু হয়, প্রজনন শক্তি ও কামেচ্ছা লোপ পায়, তাছাড়া দৈহিক ও মানসিক দৌর্বল্য পরিলক্ষিত হয়।

১৯২৯ সালে বুটেনান্ট এবং এডওয়ার্ড ডয়সী গর্ভবতী স্ত্রীলোকদের মূত্র থেকে একটি হর্মোন পৃথক করেন যার নাম ওস্ট্রোন (oestrone)। ডয়সী ১৯৪৪ সালে অধ্যাপক হেনরিক ডামের সঙ্গে ভিটামিন-কে আবিষ্কার করে শারীরবৃত্ত ও ঔষধ পর্যায়ের নোবেল পুরস্কার পেয়েছেন। ওস্ট্রোনের প্রভাবে মেয়েদের ঋতু নিয়মিত হয় এবং বেশী বয়স পর্যন্ত যাদের ঋতু-স্রাব হয়নি অথবা অন্যান্য স্ত্রীঅঙ্গের পুষ্টি স্থগিত আছে, ওস্ট্রোন প্রয়োগে তাদের বেশ উপকার হয় দেখা গেছে। ওস্ট্রোন প্রয়োগ করলে অপ্রাপ্ত বয়স্কাদের ঋতু বিকাশ হয়। এই পদার্থও খাদ্যের কোলেস্টেরল থেকে জন্মায়।

স্ত্রীলোকদের ডিম্বাশয় অর্থাৎ ওভারী সংশ্লিষ্ট কর্পাস লিউটিয়াম (পীত অঙ্গ) থেকে প্রোজেস্টেরন বা লিউটিওস্টেরন নামে একটি হর্মোন নিঃসৃত হয়, যার কাজ হ'ল গর্ভসঞ্চারের আগে জরায়ুকে সুস্থ ও কার্যক্ষম রাখা। তাছাড়া এই হর্মোন গর্ভ অক্ষুণ্ন রাখে ও গর্ভস্রাব নিবারণ করে। এ ক্ষেত্রে ভাইটামিন-ই এর অনুরূপ কার্য উল্লেখযোগ্য। ওস্ট্রোন আর প্রোজেস্টেরন একত্রে স্ত্রীলোকের ঋতু বিকাশ নিয়মিত করে। কোলেস্টেরলও এই পদার্থের উৎপাদক বলে জানা গেছে।

উপরের এই গ্রন্থিগুলি ছাড়া, আরও কয়েকটি গ্রন্থি আছে যেমন ক্যারটিড, পাইনিয়াল ইত্যাদি।

ব্যবসা বাণিজ্য

সয়াবিনের চাষ ও ব্যবহার

শ্রীবীরেন্দ্রলাল দাস, ডিপ্‌ এগ্রি

সয়াবীন একটি শুটিপ্রদ ও ডালজাতীয় ফসল (Leguminous pulse crop)। উহার বৈজ্ঞানিক নাম Glycine Hispida অথবা Glycine Max. সয়াবীন গাছ দেখিতে ঠিক ডাল গাছের মত, কিন্তু উহার ডালা বিশেষ লতাইয়া যায় না। এই গাছগুলি সোজা উপর দিকে খাড়া হইয়া উঠে। ইহাদের উচ্চতা ৩' ফুটের অধিক হয় না। সীমগুলি দেখিতে অনেকটা ফরাসী সীমের মত (French Bean) এবং শুটিগুলি ৪"—৬" ইঞ্চি লম্বা, এক একটি গাছে এইরূপ বহু শুটি (pod) হইতে দেখা যায়।

এই সয়াবীনের আদি জন্মস্থান চীন, মাঞ্চুরিয়া এবং জাপান। বহুকালাবধি ঐ সকল দেশে ইহার আবাদ হইতেছে। বর্তমানে আমেরিকায়ও ইহার বিস্তীর্ণ আবাদ আরম্ভ হইয়াছে। একমাত্র হেন্‌রি ফোর্ডের কৃষিক্ষেত্রেই ২৩,০০০ একর জমিতে সয়াবীনের আবাদ হয়। সেখানে এই সয়াবীনকে কলে নিষ্পেষিত করিয়া জমাট করা হয়। উহা দ্বারা মোটর গাড়ীর নানারকম অংশ তৈয়ার হইতেছে। ইহা লোহা বা ইস্পাত হইতে অনেক হাল্কা ও শক্ত।

ইহা ব্যতীত সয়াবীনের খাদ্যমূল্য (food value) অত্যন্ত অধিক। চীন ও জাপান ভাতের পরই ইহাকে খাদ্য হিসাবে ব্যবহার করে। মানুষের শরীর পুষ্টির জন্য যে সকল উপাদানের প্রয়োজন, সবই সয়াবীনের মধ্যে পর্যাপ্ত পরিমাণে পাওয়া যায়। ইহা হইতে যে তৈল উৎপন্ন হয়, উহা ঘি হইতে কম পুষ্টিকর নহে। খাওয়ার তৈলের পরিবর্তে এই তৈল নির্বিঘ্নে ব্যবহার করা চলে। উহা ছাড়াও এই তৈল সাবান, রং এবং বার্নিস প্রভৃতি নানাবিধ প্রয়োজনীয় দ্রব্য প্রস্তুতের জন্য বহুলাংশে ব্যবহৃত হয়। আবার এই সয়াবীনের খৈল একটি উৎকৃষ্ট পশুখাদ্য। সয়াবীনের গাছও পশুখাদ্যরূপে ব্যবহৃত হইতে পারে। আবার উহা একটি শুটিপ্রদ ফসল বলিয়া, ইহার চাষে জমির উর্বরতা যথেষ্ট বর্ধিত হয়।

যাহারা ডাল হিসাবে ব্যবহার করিতে ইচ্ছুক, তাদের পক্ষে সাধারণ মুগ বা মুসুরী ডালের মত উহাকে পাক করিয়া খাওয়া চলে। উহা রোগীর পথ্য হিসাবে বিশেষ উপকারী।

চীন এবং জাপানে এই সয়াবীন বিবিধ প্রক্রিয়ায় নানাপ্রকার খাদ্যে পরিণত হয়। সে সকল দেশের অধিবাসীরা সকলেই উহার ব্যবহার খুব ভালভাবে জানে এবং সেজন্য প্রচুর পরিমাণে ইহার আবাদ করে। তাহারা এই সয়াবীন হইতে দুইটি মূল্যবান খাদ্য প্রস্তুত করে। একটি সয়াবীনের দুগ্ধ এবং অপরটি উহার দধি। সয়াবীনের দুগ্ধ খাদ্য হিসাবে যেমন মুখরোচক, আবার উহার পুষ্টিকারিতাও গো-দুগ্ধ হইতে কোন অংশে কম নহে। অপরদিকে সয়াবীনের দধি একটি উৎকৃষ্ট সহজপাচ্য পুষ্টিকর খাদ্য।

পাশ্চাত্য দেশে এবং আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রেও নানারকমভাবে এই সয়াবীনকে খাদ্যে রূপান্তরিত করা হয়। আজকাল গম বা চাউল হইতে এই সয়াবীন অধিক পুষ্টিকর ও উপকারী বলিয়া প্রমাণিত হওয়ায়, ঐ সকল দেশে এই সয়াবীনের বিস্তৃত আবাদ হইতেছে, কিন্তু ভারতে অদ্যাবধি উহার সেরূপ আদর হয় নাই। তার প্রধান কারণ এদেশের লোকেরা এখনও ইহার ব্যবহার সম্বন্ধে বিশেষ অজ্ঞ। তবে সুখের বিষয় এই যে, আজকাল কেহ কেহ ইহার চাষ সম্বন্ধে বিশেষ আগ্রহশীল। সেজন্য এদেশে ইহার চাষ সম্বন্ধে বিশেষ পরীক্ষা চলিতেছে। বিশেষত বরোদা এবং বোম্বাই প্রদেশের কৃষি বিভাগ এইজন্য যথেষ্ট উৎসাহ দেখাইয়া অনেকাংশে সফলকাম হইয়াছে। ভারতীয় কৃষি বিভাগ হইতে যে সকল তত্ত্বানুসন্ধান হইয়াছে, তাহাতে প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে যে, এই সয়াবীনের মত এক প্রকার ডাল অনেক পূর্বেই কাশ্মীর এবং উত্তর ভারতের অনেক স্থানে আবাদ হইত। কিছুদিন যাবত ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে এই সয়াবীন চাষের পরীক্ষা হইয়াছে। উহাতে প্রমাণিত হইয়াছে যে, যে সকল উঁচু জমিতে ডাল জন্মিতে পারে এবং বর্ষার জল দাঁড়ায় না, সয়াবীন সে সকল জমিতে বেশ ভালভাবে জন্মে। ইহার ব্যবহার জানে না বলিয়া অদ্যাবধি এদেশে ইহার বিস্তৃত আবাদ আরম্ভ হয় নাই। তবে এখন ধীরে ধীরে এই বিষয়ে উন্নতি দেখা যাইতেছে।

মিঃ কেলির মতে নিম্নলিখিত উপায়ে ভারতীয়েরা এই সয়াবীনকে ব্যবহার করিতে পারে।

১। প্রথমত উহাকে ডালের মত ভাঙ্গিয়া ছোলার ডালের মত পাক করিয়া খাওয়া যায়। তবে উহাকে পাক করিবার পূর্বে অন্তত বার ঘণ্টা জলে ভিজাইয়া রাখিতে হয়।

২। ইহাকে চীনা বাদাম অথবা মটরের মত লংকা ও লবণ সহযোগে ভাজিয়া খাওয়া চলে।

৩। ইহার ডাল বা আটাকে খুব সুসিদ্ধ করিয়া ফেলিতে হয় এবং তৎপর উহাকে ছাঁকিয়া লইলে দুধের মত জিনিস তৈয়ার হয়। ইহাকে পরে শুকাইয়া চিনি সহযোগে বরফির আকারে ব্যবহার করা চলে।

৪। সয়াবীন হইতে খুব ভাল আটা তৈয়ার হয়। আটা তৈয়ার করিতে হইলে সয়াবীনগুলিকে দুই-তিন দিন খুব প্রখর রৌদ্রে শুকাইয়া লইতে হয় অথবা রৌদ্রাভাবে অল্প আঁচে সামান্য ভাজিয়া নিতে হয়। তৎপর যাঁতা দ্বারা সহজেই ইহাকে চূর্ণ করিয়া নেওয়া যায়। এই আটা হইতে ভূষি বা খোসাগুলি ছাড়াইয়া নিলেই এই আটা ব্যবহারোপযোগী হয়।

এই আটা হইতে আবার নিম্নলিখিত সুস্বাদু খাদ্য তৈয়ার হয়।

(ক) রসগোল্লা—রসগোল্লা তৈয়ার করিতে হইলে প্রতি ১১ ভাগ ছানার মধ্যে ১ ভাগ সয়াবীনের আটা ও অন্যান্য আবশ্যকীয় মসলা মিশাইয়া সাধারণ রসগোল্লার মত তৈয়ার করিতে হয়।

(খ) চাপাটি—শতকরা ৮০ ভাগ গমের আটার সহিত ২০ ভাগ সয়াবীনের আটা মিশাইয়া চাপাটি তৈয়ার করিতে হয়।

(গ) পুরী—পুরী তৈয়ার করিতে হইলে ৮ ভাগ আটার সহিত ১ ভাগ সয়াবীনের আটা মিশাইয়া নিতে হয়। তবে উহাতে সামান্য লবণ মিশাইয়া পুরী তৈয়ার করিলে পুরীগুলি খাইতে বেশ সুস্বাদু হয়।

এই সকল প্রকারে ব্যবহার ভিন্নও আজকাল বহু বলকারী ঔষধের (Tonic) উপকরণ হিসাবে এই সয়াবীনের যথেষ্ট চাহিদা আছে। সুতরাং এখন উহার চাষ সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা করিয়া এই প্রবন্ধ শেষ করিব। *

চীন ও জাপানে হাজার হাজার প্রকারের সয়াবীন দেখিতে পাওয়া যায়। উহারা বিভিন্ন বর্ণের ও আকারের। তন্মধ্যে হলদে,

---

"As a food for humans its nutritive value is high—having twice the amount of protein and calories found in beefsteak and five times the caloric value, twenty times the protein value and two hundred times the fat value of the potato."

James Sweinhart.

কাল বা ধূসর এবং সাদা রংয়ের সয়াবীন গুলি আমাদের বাঙলার মাটির পক্ষে উপযোগী। বিহারেও এই জাতীয় সয়াবীন ভালভাবে জন্মিতে পারে।

হলদে জাতীয় সয়াবীনগুলি একটু কম কষ্টসহিষ্ণু, কিন্তু একটু যত্ন করিলে বেশ ভালভাবে জন্মিতে পারে। পরের দুইটি যে কোন প্রকার জলবায়ু সহ্য করিতে পারে। হলদে এবং সাদা রংয়ের সয়াবীন মানুষের খাদ্য হিসাবে বিশেষ পুষ্টিকর। কাল রংয়ের সয়াবীন অধিক ফলে এবং ইহার গাছও খুব ভাল পশু-খাদ্য (Fodder)। এই সয়াবীনের শুষ্ক গাছ অথবা সাইলেজও (Silage) দুগ্ধবতী গাভী এবং বলদের একটি উৎকৃষ্ট খাদ্য। ইহা ছাড়া হাঁস মুরগী ছাগল ভেড়া প্রভৃতিকে এই সয়াবীন ডাল চূর্ণ করিয়া নির্বিঘ্নে খাওয়ান যায়।

এই সয়াবীন প্রায় সর্বপ্রকার জমিতেই উৎপন্ন হয়। যে জমিতে মুগ, মুসুরী, ছোলা ইত্যাদি ডাল জন্মে, এই সয়াবীন সেখানে ভালভাবে জন্মিতে পারে। তবে বালিমাটি অথবা কাঁকুরে মাটি হইলে উহাতে একর প্রতি অন্তত ১০০/০ মণ হিসাবে গো-শালার আবর্জনা, গোবর, কম্পোস্ট প্রয়োগ করা উচিত। ইহা ছাড়া অন্যান্য জমিতে বিশেষ সারের দরকার হয় না। তবে মেদিনীপুর, বাঁকুড়া, রংপুর, চট্টগ্রাম, ঢাকা প্রভৃতি জেলার লালমাটিতে (Red laterite soil) একর প্রতি ১০/০ মণ হিসাবে চূণ প্রয়োগ করা বিধেয়।

এই সকল সয়াবীন বৎসরে দুইবার উৎপন্ন হয়। মে-জুন মাসে সাধারণত উহাদের আবাদ হয়। উহাদের মধ্যে কতকগুলি নভেম্বর মাস পর্যন্ত বেশ সতেজ থাকিয়া জানুয়ারী মাসে ফসল পাকে। আর এক জাতীয় সয়াবীন কিছু জলদি হয়। উহারা সেপ্টেম্বর-অক্টোবর মাসেই ফসল দেয়। প্রথম জাতীয় সয়াবীনগুলি অধিক দিন সতেজ থাকে বলিয়া যখন ঘাসের অভাব হয়, তখন উহাকে মটর, বরবটি, মাসকলাই প্রভৃতির মত মূল্যবান পশু-খাদ্য হিসাবে ব্যবহার করা যায়।

ইহার চাষের জন্য বিশেষ যত্ন দরকার হয় না। মে-জুন মাসে ধান পাট প্রভৃতি ফসলের মত দুই-তিনটি চাষ ও মই দিয়া জমি তৈয়ার করিতে হয়। যাহারা পশু-খাদ্য হিসাবে এই সয়াবীনের চাষ করিতে ইচ্ছুক, তাহাদিগকে একর প্রতি ২০-২৫ সের বীজ ছিটাইয়া বুনিতে হয় (Broadcast)। আর ফসলের জন্য এই সয়াবীনের চাষ করিতে হইলে ইহাকে লাইন করিয়া লাগাইতে হয়। চীনাবাদামের মত দুই ফুট অন্তর এক ফুট দূরে দূরে লাইনের মধ্যে বীজ লাগাইতে হয়। দশ সের বীজে এক একর জমি লাগান চলে। এই-ভাবে লাইন করিয়া বীজ লাগাইলে বীজ অঙ্কুরিত হইবার পর ঐ জমিতে আগাছা ইত্যাদি পরিষ্কার করিতে সুবিধা হয় এবং গাছগুলি ফাঁকা ফাঁকা হওয়ায় সতেজে বর্ধিত হয়। বীজগুলি খুব বেশী মাটির নীচে লাগাইলে বীজ সহজে অঙ্কুরিত হইতে পারে না। সেজন্য যাহারা চীনা-বাদামের চাষ জানেন, তাদের পক্ষে সয়াবীন চাষ করা সহজ। বীজগুলি যেন এক ইঞ্চি-দেড় ইঞ্চির অধিক মাটির নীচে না যায়, সে বিষয়ে বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করিতে হয়।

এই সয়াবীনের বীজ অঙ্কুরিত হইতে বেশ কিছুদিন সময় নেয়। প্রায় ছয়-সাত দিন পর উহারা অঙ্কুরিত হয়। লাইন করিয়া লাগাইলে সয়াবীনের লাইনের মধ্যে Planet Jr. Hand Hoe নামক আমেরিকান হাতে-ঠেলা যন্ত্রে দুইখানা ছুরি (Blade) লাগাইয়া আগাছা বাছা ও নিড়ানীর কাজ সহজেই করা যায়। উহাতে গাছগুলির গোড়ায় নাড়া পড়ায় মাটি আলগা হইয়া উহাতে যথেষ্ট বাতাস প্রবেশ করিতে পারে (aeration) এবং গাছগুলি আরও সতেজে বর্ধিত হইতে থাকে। এইরূপে দুইবারের বেশী জমি আলগা করিবার (Interculture) দরকার হয় না। তবে গাছের ফুল আসিবার পূর্বে যেন গাছের গোড়া নাড়া না হয় সে বিষয়ে বিশেষ দৃষ্টি রাখিতে হয়। তাহা না হইলে গাছ একদিকে যেমন নিস্তেজ হইয়া পড়িবে, আবার অপর-দিকে গাছের ফুল-ফলও অধিক হইবে না। এই গেল খরিফ ঋতু বা বর্ষার ফসলের চাষ।

যাহারা এই সয়াবীনকে রবি-ফসল হিসাবে চাষ করিতে ইচ্ছুক, তাহাদিগকে বিশেষভাবে লক্ষ্য রাখিতে হইবে যেন জমিতে উপযুক্ত পরিমাণ রস (Moisture) থাকে এবং শীতের মরসুমে অনেকদিন পর্যন্ত এই রসের অভাব না হয়। যদি জমি বিশেষ শুকাইয়া উঠিবার সম্ভাবনা দেখা দেয়, তবে জমিতে অবস্থানুসারে দুই-একবার সেচ (Irrigation) করিতে হয়। এই প্রকারের সয়াবীনও লাইন করিয়া লাগাইতে হয়।

সয়াবীনের সাথে ভুট্টা মিশ্রিত করিয়া বপন করা যায়। তিন-চার মাসের মধ্যেই ভুট্টা উঠিয়া যায়। উহাতে সয়াবীনের কোন ক্ষতি হয় না। তবে উপরি একটা ফসল পাওয়া যায়। ভুট্টা ও সয়াবীন এক সাথে লাগাইতে হইলে উভয় বীজই লাইন করিয়া বপন করিতে হয়। এক লাইন পর পর সয়াবীন ও ভুট্টা লাগাইতে হয়। /৫ সের সয়াবীন ও /৪ সের ভুট্টা বীজ হইলে এক একর জমি লাগান যায়। আখ লাগাইবার পূর্বে সে জমিতে সয়াবীনের চাষ করিয়া নিতে পারিলে আখ খুব ভাল ফল দেয়।

এক একর জমিতে ২০০—২৫০/০ মণ কাঁচা পশু-খাদ্য (Green fodder) পাওয়া যায়। যখন গাছে শুঁটি ধরিতে আরম্ভ হয়, তখন এই গাছ কাটিয়া গাভী বা বলদকে খাওয়াইতে হয় অথবা সাইলেজ (Silage) করিয়া রাখিতে হয়। এক একর জমিতে ১০—১৫/ সয়াবীন উৎপন্ন হয়। ভুট্টার সহিত মিশ্রিত করিয়া উহার আবাদ করিলে সয়াবীন অর্ধেক হইয়া যায় অর্থাৎ ৬—৭/ সয়াবীন ও ৩—৪/ মণ ভুট্টার দানা পাওয়া যায়। তবে ভুট্টা কাঁচা অবস্থায় বিক্রি করিলে দাম বেশী পাওয়া যায়। এক একর জমিতে মিশ্রিত ফসল হিসাবেও (mixed crop) নয়-দশ হাজার কাঁচা ভুট্টার মোচা (cob) পাওয়া দুষ্কর নহে, কিন্তু সয়াবীনকে ভুট্টার সহিত মিশ্রিতভাবে আবাদ না করাই বিধেয়। কারণ, উহাতে সয়াবীনের ফলন (out-turn) অনেক কমিয়া যায়।
বাজারে উভয়ের দর হিসাবেও সয়াবীনের দাম অনেক বেশী।

নিম্নে এক একর জমিতে সয়াবীন চাষের একটি হিসাব দেওয়া গেলঃ—

দুইবার লাঙ্গল ও মই দেওয়া	১২৲
১০/ মণ চূণ (যদি দরকার হয়)	৫০৲
১০০/ মণ বা দশ গাড়ী গোবর বা কম্পোস্ট	৪৫৲
১০ সের সয়াবীন বীজ (বর্তমান বাজার অনুসারে)	৩০৲
জমিতে সার প্রয়োগ করা ও বীজ লাগান	১২৲
দুইবার ঘাস বাছা ও জমি আলগা করা (hoeing and weeding)	২০৲
ফসল তোলা, শুকান ও বীজ ছাড়ান	১৬৲
জমির এক বৎসরের খাজনা	১৫৲
অন্যান্য আনুষঙ্গিক খরচ	২০৲
খরচ মোট	২২০৲

এখন লাভের অঙ্ক হিসাব করা যাক। বর্তমান বাজারে সয়াবীনের পাইকারী দামও মণপ্রতি ষাট টাকার কম নহে। সুতরাং এক একর জমির ফলন ১২/ মণ হিসাবে ধরিলে উহার দাম ৭২০৲ টাকায় দাঁড়ায়। এইবার আমাদের মোট খরচ ২২০৲ টাকা বাদ দিলে আমাদের নিট মুনাফা দাঁড়ায় পাঁচশত টাকা। এই লাভ কি অন্য কোন অর্থকরী ফসলে এত সহজে পাওয়া যায়। তামাক, কপি, আলু প্রভৃতি অর্থকরী ফসলে (economic crop) যথেষ্ট লাভ হয় স্বীকার করি, কিন্তু উহার জন্য জেরূপ কষ্ট ও ধৈর্যের দরকার, সয়াবীন চাষে তাহার শতাংশের একাংশ দরকার হয় কি না সন্দেহ।

মানসী

শ্রীপ্রমথ নাথ বিশী

মানসী রবীন্দ্রনাথের পরিণত শক্তির কাব্য কিন্তু তাঁহার বিশিষ্ট শক্তির কাব্য নহে। রবীন্দ্রনাথের বীণা বহুতার, তাহার নানা তারে নানা সুরের সংগীত ঝঙ্কৃত হইয়াছে। কিন্তু সব সংগীত তাঁহার বিশিষ্ট প্রতিভাজাত নহে। এই বিশিষ্ট কবিপন্থায় তিনি নিশ্চিতরূপে সোনার তরী কাব্যে আসিয়া পেঁৗছিয়াছেন। কিন্তু ইহার সূচনা সন্ধ্যাসংগীত হইতে। সন্ধ্যাসঙ্গীত হইতে মানসী পর্যন্ত পাঁচখানি কাব্য গ্রন্থে একটি পরীক্ষামূলকতার ভাব আছে। সে পরীক্ষা তাঁহার বিশিষ্ট শক্তির স্বরূপ-অন্বেষণে। একদিকে সন্ধ্যাসঙ্গীত, প্রভাত সঙ্গীত; আবার একদিকে ছবি ও গান, কড়ি ও কোমল। আর মানসীতে এই দুই কাব্যরীতির যুক্তবেণী গ্রথিত হইয়াছে। এখন এই দুটি কাব্যরীতি কি? কবির একখানি কাব্যের নামের দ্বারা তাহা প্রকাশ করিতে পারা যায়। ছবি ও গান। তাঁহার কাব্য চিত্ররীতি অবলম্বন করিবে না সংগীতরীতি অবলম্বন করিবে নিজের অগোচরে কবি যেন তাহারই পরীক্ষা করিতেছিলেন। সঙ্গীতাখ্য কাব্যদ্বয়ে সঙ্গীতরীতির পরীক্ষা; ছবি ও গান এবং কড়ি ও কোমলে প্রধানতঃ চিত্ররীতির পরীক্ষা। মানসীতে এই দুই রীতিই আছে। সোনার তরীকে যে তাঁহার বিশিষ্ট রীতির কাব্য বলিয়াছি, তাহার কারণ এই কাব্য হইতে চিত্ররীতি পরিত্যক্ত হইয়াছে। একেবারে হইয়াছে এমন নয়, কল্পনাকাব্য প্রধানতঃ চিত্ররীতির কাব্য; মহুয়া কাব্যেও চিত্ররীতির কবিতা আছে। কিন্তু তাহা নিয়মের ব্যতিক্রমরূপেই থাকিয়া নিয়মের অলঙ্ঘ্যনীয়তা যেন প্রমাণ করিতেছে।

এইজন্যই মানসীতে পরিণত শক্তির কবিতা থাকা সত্ত্বেও ইহা রবীন্দ্রনাথের পরীক্ষাপর্বের শেষ কাব্য। পরীক্ষোত্তীর্ণ পর্বের আদি কাব্য নহে। মানসীতে আসিয়া একটা পথের শেষ; সোনার তরীতে আর একটা স্রোতের আরম্ভ, যে স্রোত দীর্ঘজীবনের অভাবনীয় বঙ্কিমতার মধ্যে দিয়া রবীন্দ্রকাব্যের সমুদ্রসঙ্গম পর্যন্ত প্রবাহিত।

কাব্যে চিত্ররীতি ও সঙ্গীতরীতি বলিতে ঠিক কি বুঝায় তাহার বিস্তৃত আলোচনা অন্যত্র করিয়াছি। এখানে বাহুল্য। রবীন্দ্রনাথের বিশিষ্ট কবি প্রতিভা বস্তুর রূপকে ধরিবার প্রতিভা নয়; বস্তুর স্বরূপকে ধরিবার প্রতিভা। সেইজন্য যাহা কিছু একান্তভাবে স্থানিক, কালিক ও ব্যক্তিক তাহার চেয়ে সর্বস্থানিক, সর্বকালিক ও সর্বব্যক্তিক তাঁহাকে বেশি আকর্ষণ করে। এটাকেই বলা চলে বস্তুর স্বরূপ। বস্তুরূপে পেঁৗছিবার উপায় চিত্র; আর বস্তুস্বরূপে পেঁৗছিবার উপায় সংগীত; সেইজন্য সংগীতকেই তিনি তাঁহার বিশিষ্ট বাহন করিয়া লইয়াছেন। সংগীত নিজে অশরীরী বলিয়া অশরীরী স্বরূপকে প্রকাশ করিতে সক্ষম।

মানসীতে চিত্ররীতি ও সংগীতরীতির কবিতা আছে। তাহার প্রারম্ভে চিত্ররীতি পরিণামে সংগীতরীতি। তাহার এক কোটিতে মেঘদূত, অন্য কোটিতে সুরদাসের প্রার্থনা। মাঝখানে নানা বিচিত্র পর্যায়ের কাব্য আছে, বিশেষ বিশেষ কারণে সেগুলিও উল্লেখযোগ্য। কিন্তু রবীন্দ্রকাব্য প্রবাহের অনুসরণে এই দুই রীতির কাব্যের যেমন গুরুত্ব এমন আর কোন পর্যায়ের নহে।

কালিদাসের মেঘদূত কাব্যের অনুবাদ করিবার ইচ্ছা স্বাভাবিক--কিন্তু তাহার সার্থক অনুবাদ সম্ভব নয়। সন্ধিসমাস স্বরব্যঞ্জনের গুরুলঘুতার প্রতি উদাসীন বাংলা ভাষায় সংস্কৃত কাব্যের অনুবাদ এক প্রকার অসম্ভব। কালিদাসের মেঘদূতের বাংলা ভাষায় সার্থকতমরূপে মানসীর মেঘদূত কবিতা। ইহা অনুবাদও নয়, আবার মৌলিকও নয়, ইহাকে মৌলিক-অনুবাদ বলা যাইতে পারে। রবীন্দ্রনাথ কলম ধরিয়াছেন, কিন্তু তাঁহার হাতকে পরিচালিত করিতেছেন এমনি এক অসম্ভব প্রক্রিয়ায় এই আশ্চর্য কবিতাটির সৃষ্টি। এই কবিতা সৃষ্টির মূলে রহিয়াছে রবীন্দ্রনাথের মন এবং আধুনিক মন; কিন্তু ইহার কাব্য রীতিটি কালিদাসীয়। কালিদাসের কাব্যরীতি বস্তুরূপকে ধরিতে সচেষ্ট, বস্তুরূপের ভিতর দিয়াই তিনি বস্তুস্বরূপকে ফুটাইয়া তুলেন, যেমন বস্তুস্বরূপের ভিতর দিয়া বস্তুরূপকে ফুটাইতে রবীন্দ্রনাথ অভ্যস্ত। বস্তুরূপে পেঁৗছিবার মাধ্যম ইন্দ্রিয় এবং ইন্দ্রিয়ের সেরা চোখ। কালিদাস ও রবীন্দ্রনাথ দুজনেরই মেঘদূত ইন্দ্রিয় নির্ভর, ইন্দ্রিয় বিলাসী কবির কাব্য: চোখ দেখিয়াছে, তুলি আঁকিয়াছে, ছবির পরে ছবি ফুটিয়া উঠিয়াছে, সে ছবির রং কবির ভালোমন্দ লাগা দিয়া গুলিয়া লওয়া। বিধাতা যেমন জগৎ সৃষ্টি করিয়া বলিয়াছেন,—এই দিলাম, দেখো এবং দেখিয়া ইহার রসরূপে গিয়া পেঁৗছিতে চেষ্টা করো। কাব্যে চিত্ররীতি অনেকটা সেইরকম। কবি বিধাতার জগতের সমান্তরালে আর একটা জগৎ সৃষ্টি করিয়া বলেন—এই সৃষ্টি করিলাম, ইহাকে ভোগ করার দ্বারা ইহার রসরূপ উদ্ঘাটন করিতে চেষ্টা করো। কবি ও বিধাতা উভয়েই সাংখ্যের পুরুষের মতো নিষ্ক্রিয়, নিরপেক্ষ এবং নির্বিকার। আর সংগীতরীতির কবি সাংখ্যের প্রকৃতির মতো সক্রিয়, পাঠকাপেক্ষী এবং চঞ্চল। তিনি সৃষ্টি করিয়াই ক্ষান্ত নহেন; সৃষ্টির অন্তর্নিহিত সত্য না বুঝাইয়া দেওয়া পর্যন্ত তাঁহার শান্তি নাই। তিনি যেন বলেন—আমি বাঁশীর সুরে বস্তুর রূপ উদ্ঘাটন করিতে করিতে স্বরূপের দিকে অগ্রসর হইয়া যাইতেছি, তুমি আমাকে অনুসরণ করিয়া প্রবেশ করো। তোমাকে বাহির দরজায় দাঁড় করাইয়া রাখিয়া আমার চিন্তা মেটে না, তুমি না বোঝা পর্যন্ত আমার সৃষ্টির সার্থকতা নাই। এইজন্যই মানসীর মেঘদূতের শেষে রবীন্দ্রনাথ স্পষ্ট করিয়া যাহা বলিয়াছেন—কালিদাস তাহা খুলিয়া বলিবার প্রয়োজন বোধ করেন নাই।

> "ভাবিতেছি অর্ধরাত্রি অনিদ্র-নয়ান,
> কে দিয়েছে হেন শাপ, কেন ব্যবধান?
> কেন ঊর্ধ্বে চেয়ে কাঁদে রুদ্ধ মনোরথ?
> কেন প্রেম আপনার নাহি পায় পথ?
> সশরীরে কোন্ নর গেছে সেইখানে,
> মানস সরসী-তীরে বিরহ-শয়ানে,
> রবিহীন মণিদীপ্ত প্রদোষের দেশে
> জগতের নদী গিরি সকলের শেষে।"

কালিদাস এ ব্যাখ্যার প্রয়োজন বুঝেন নাই; রবীন্দ্রনাথ এ ব্যাখ্যা না দিয়া কবিতাটি শেষ করিতে পারেন নাই। এ কয়টি ছত্র লিখিবার সময়ে কালিদাস রবীন্দ্রনাথের হাত ছাড়িয়া দিয়াছিলেন। এতক্ষণ বস্তুরূপের সৃষ্টি চলিতেছিল, এই কয়টি ছত্রে বস্তু স্বরূপের উদ্ঘাটন। কবিতাটির চরম লগ্নে চিত্ররীতি পরিত্যাগ করিয়া কবি সংগীতরীতি অবলম্বন করিয়া সুরের সিঁধকাঠি দিয়া একেবারে জগতের প্রেম রহস্যের অন্তর্লোকে প্রবেশ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। ইহাই কাব্যে সংগীতরীতি। মেঘদূত কাব্যে দুইটি রীতিরই পরিচয় পাওয়া গেল।

ইহার বিপরীত কোটির কবিতা সুরদাসের প্রার্থনা। ইহা সঙ্গীত রীতির কাব্য। সুরদাস অন্ধ এবং গায়ক।

কালিদাস চক্ষুষ্মান কবি। কাব্য অমরার তিনি সহস্র চক্ষু। কালিদাস ও সুরদাসকে কাব্যের বিষয়ীভূত করিয়া রবীন্দ্রনাথ নিজের অগোচরেই যেন এই দুই রীতির আভাস দিয়া রাখিয়াছেন। মানসীর কবিতাগুলি নূতন করিয়া সাজাইবার অধিকার পাইলে প্রারম্ভে মেঘদূত ও প্রান্তে সুরদাসের প্রার্থনা বিন্যাস করিয়া চিত্ররীতি ও সংগীত রীতির মর্ম পরিষ্কার করিয়া বুঝাইয়া দিতে চেষ্টা করিতাম।

সুরদাস দেবীকে লক্ষ্য করিয়া বলিতেছে যে একদা আমি তোমাকে চোখের দৃষ্টিতে দেখিয়া তোমার বিলাসের মূর্তি দেখিয়াছি, সে আমারি অপরাধ। এবার আমি চোখের দৃষ্টি ঘুচাইয়া দিয়া তোমাকে দেখিতে চাই, এখন কেমন করিয়া তোমার নির্মল মূর্তি ঢাকিয়া রাখিবে? এই দেবী কে? সুরদাস যেখানে প্রেমিক সেখানে এই দেবী নিশ্চয় তাহার প্রেমের আশ্রয়। সুরদাস সেখানে কবি, এই দেবী তাহার সরস্বতী। এই কবিতার মধ্যে রবীন্দ্রনাথের ব্যক্তি জীবনের কোন্ ইতিহাস লুক্কায়িত আছে তাহা উদ্ঘাটিত করিবার চেষ্টা বৃথা—কিন্তু কবি রবীন্দ্রনাথের যে মানসিক ও শিল্প ইতিহাস অবগুণ্ঠিত আছে তাহার মূল্য সামান্য নয়। রবীন্দ্রনাথের ক্ষেত্রে এই দেবী তাঁহার কাব্যলক্ষ্মী বা সরস্বতী, এই দেবী তাঁহার জগৎ-মূর্তি, চোখের দৃষ্টিতে যাঁহার রূপ মাত্র তিনি দেখিয়াছিলেন, এবারে ইন্দ্রিয়াতীত দৃষ্টিতে তাঁহার স্বরূপ দেখিতে তিনি উদগ্রীব। এই দেবী এতদিন চিত্ররীতিতে আত্মপ্রকাশ করিয়াছিলেন। এবার সংগীত রীতিতে তিনি কবির কাছে আত্মপ্রকাশ করুন। কবির শিল্প চিত্ররীতি পরিত্যাগ করিয়া সংগীতরীতিতে সংক্রামন করিতেছে—সুরদাসের প্রার্থনা তাহার পতাকাস্থান।

জান কি এ আমি পাপ-আঁখি মেলি
তোমারে দেখেছি চেয়ে,
গিয়েছিল মোর বিভোর বাসনা
ওই মুখ পানে ধেয়ে,

এবারে—

আনিয়াছি ছুরি তীক্ষ্ণ দীপ্ত
প্রভাতরশ্মি সম;
লও, বিঁধে দাও বাসনা-সঘন
এ কালো নয়ন মম।

সুরদাস বলিতেছে কেবল দেবী মূর্তি নয়, এই বিশ্ব ভুবনের সৌন্দর্য চোখের দৃষ্টিতে মাত্র ধরা দিয়াছে—কিন্তু ইহাতে তৃপ্তি কই? বিশ্ব ভুবনের সৌন্দর্য মাত্র নয়, সৌন্দর্য স্বরূপ না দেখা অবধি শান্তি নাই।

ইন্দ্রিয় দিয়ে তোমার মূর্তি
পশেছে জীবন-মূলে,
এই ছুরি দিয়ে সে মূরতিখানি
কেটে কেটে লও তুলে।

তারি সাথে হায় আঁধারে মিশাবে
নিখিলের শোভা যত,
লক্ষ্মী যাবেন, তারি সাথে যাবে
জগৎ-ছায়ার মতো।
যাক্, তাই যাক্! পারিনে ভাসিতে
কেবল মূরতি স্রোতে,
লহ মোরে তুলি আলোক-মগন
মূরতি-ভুবন হতে।

কিন্তু চোখের আলো গেলে যে অন্ধকার ঘিরিয়া আসিবে তাহা কি একান্তই অন্ধকার? সেই অন্ধকারের পটে কি কোন নূতন সৃষ্টির সম্ভাবনা নাই? তখন—

শান্তরূপিণী এ মূরতি তব
অতি অপূর্ব সাজে
অনল রেখায় ফুটিয়া উঠিবে
অনন্ত নিশি মাঝে।
চৌদিকে তব নূতন জগৎ
আপনি সৃজিত হবে।

* * * * *

সে নব জগতে কাল-স্রোত নাই,
পরিবর্তন নাহি
আজি এই দিন অনন্ত হয়ে
চিরদিন রবে চাহি।

সুরদাসের কথা বিশ্বাস করিতে হইলে বলিতে হয় যে, ইন্দ্রিয়াতীত সে জগৎ ইন্দ্রিয়গত জগতের চেয়ে সত্যতর—কারণ তাহা বস্তু স্বরূপের জগৎ। এখন এ দুটা জগতের মধ্যে কোন্‌টা সত্যতর সে তত্ত্ব বিচার নিষ্ফল, দুই জাতীয় কবি-মনের কাছে দুই জগৎ সত্য, কাজেই কাব্যজগতে দুটোই সমান সত্য। এক্ষেত্রে যাহা উল্লেখযোগ্য তাহা এই যে, মেঘদূত কবিতা ও সুরদাসের প্রার্থনা দুই স্বতন্ত্র কবি-মনের সৃষ্টি, একই কবির মধ্যে যে দুই মন প্রাধান্য লাভের জন্য সচেষ্ট। রবীন্দ্রনাথের কবি-দৃষ্টি ও শিল্প-দৃষ্টি যেন ধীরে ধীরে এক রাশি হইতে আর এক রাশিতে সঞ্চারিত হইতেছে এবং এই সঞ্চারের ফলে কবির দৃষ্টিতে মানব ও জগতের মূর্তি বদল হইতেছে; কায়াময় জগৎ ছায়াময় হইতেছে; ছায়াময় বলিয়া অলীক মনে করিবার কারণ নাই, দান্তে যে ছায়াময় জগৎ প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন তাহা কোন্ কায়ার চেয়ে অসত্য?

তাহা হইলে দেখা গেল মানসী বস্তুরূপে হইতে বস্তুস্বরূপে, কায়াময় সত্য হইতে ছায়াময় সত্যে, কালিদাসীয় মানস হইতে সুরদাসীয় মানসে অর্থাৎ চিত্ররীতি হইতে সংগীতরীতিতে সংক্রমনের কাব্য। এখন এই পরিবর্তন মানব ও প্রকৃতির দৃষ্টিতে লক্ষিত হইবে। রবীন্দ্রনাথ বহু প্রেমের কবিতা লিখিয়াছেন, কিন্তু তাহার অধিকাংশই যেন প্রেমিকের চেয়ে প্রেমের প্রতি লিখিত। সগুণ প্রেমিকের চেয়ে নির্গুণ প্রেমের প্রতিই তাঁর যেন আকর্ষণ প্রধানতর। কিন্তু প্রেমিকের প্রতি যে কবিতা নাই এমন নয়, তবে তাহার অধিকাংশই মানসীতে; মানসীর আগেও আছে, পরে অতি অল্পই; বেশি সংখ্যক প্রেমিকের প্রতি কবিতা পূরবীর আগে আর দুটে হয় না, সে একেবারে জীবনের শেষে সগুণ প্রণয়িনী নির্গুণ প্রেম হইয়া উঠিল এ সেই বস্তুরূপে হইতে বস্তুস্বরূপে যাইবার ফল। কায়াময়ের

ছায়াময়ী ভবনন ভুলে, ভুল ভাঙা, ক্ষণিক মিলন, শূন্য হৃদয়ের আকাঙ্ক্ষা, সংশয়ের আবেগ, বিচ্ছেদের শান্তি, তবু আকাঙ্ক্ষা, মানসিক অভিসার, অপেক্ষা, বর্ষার দিনে প্রভৃতি কবিতার জন্মইতিহাস নিপুণ হস্তে মুছিয়া দিলেও বুঝিতে বিলম্ব হয় না যে, ইহাদের জন্ম-লগ্নে কোন বিশিষ্ট ব্যক্তির দৃষ্টি কবির প্রতি লক্ষ্য করিয়াছিল। ঠিক এই শ্রেণীর বিশিষ্ট ব্যক্তি-অনুপ্রাণিত কবিতা পূরবীতে পৌঁছিবার আগে ক্বচিৎ মিলিবে। ইহা প্রেমের বস্তুরূপের কবিতা। আবার বিপরীত কোটির অর্থাৎ প্রেমের বস্তুস্বরূপের কবিতাও আছে—যথাসময়ে তাহাদের আলোচনা করা যাইবে।

এ যেমন মানুষ সম্বন্ধে গেল তেমনি প্রকৃতি সম্বন্ধেও সমান পরিবর্তন লক্ষ্য করিবার যোগ্য। প্রকৃতির প্রতি গভীর আকর্ষণ লইয়াই রবীন্দ্রনাথ জন্মিয়াছিলেন কাজেই তাঁহার কাব্যে আদিম পর্ব হইতে প্রকৃতির প্রতি প্রীতির পরিচয় পাওয়া যায়। কিন্তু প্রীতি এক কথা পরিচয় আর এক কথা। প্রকৃতির বিশিষ্ট মূর্তির সঙ্গে কবির পরিচয় পরবর্তী কালে ঘটিয়াছে, সে এই মানসী কাব্যের কাল। মানসী কাব্যে আসিয়া প্রথমে রবীন্দ্র-কাব্যে প্রথম প্রকৃতির স্থানিক মূর্তির পরিচয় মেলে। ইহার পূর্বে যে প্রাকৃতিক চিত্র তিনি অঙ্কিত করিয়াছেন তাহা প্রীতি-জাত বটে, কিন্তু তেমন করিয়া অভিজ্ঞতাজাত নহে।* আবার মানসীর পরে অজস্র প্রকৃতিচিত্র তাঁহার কলমে ফুটিয়া উঠিয়াছে, সেগুলি মূলতঃ মানসীর চিত্র হইতে ভিন্ন। এই প্রভেদটা কিসের? ইহা বস্তুরূপ হইতে বস্তুস্বরূপের ভেদ। সেইজন্যই মানসীর স্থানিক চিত্র পরবর্তী কাব্যে সর্বস্থানিক হইয়া উঠিয়াছে।

য়া মেলি সারি সারি স্তব্ধ আছে তিন চারি
শিশুগাছ পাণ্ডু-কিশলয়,
নিম্ববৃক্ষ ঘন শাখা গুচ্ছে গুচ্ছে পুষ্পে ঢাকা
আম্রবন তাম্র ফলময়।

* * * *

বসি আঙিনার কোণে গম ভাঙে দুই বোনে,
গান গাহে শ্রান্তি নাহি মানি;
গেঁধা কূপ, তরুতল, বালিকা তুলিছে জল
খরতাপে ম্লান মুখখানি।

এই শ্রেণীর স্থানিক লক্ষণ যুক্ত চিত্র মানসীর পরে বিরল; এই জাতীয় স্থানিক চিত্র গদ্য-কবিতায় পৌঁছিবার আগে আর বেশি মিলিবে না; সে তো কবির শেষ জীবনের কথা। কি মানুষ, কি প্রকৃতি দুই বিষয়েই রবীন্দ্রনাথ চিত্ররীতি ত্যাগ করিয়া সংগীত রীতির পথের মোড়ে আসিয়া দাঁড়াইয়াছেন।

এখন মেঘদূত ও সুরদাসের প্রার্থনাকে দুই কোটি বলিয়া স্বীকার করিলে অনেকগুলি কবিতা স্বতঃই বিভক্ত হইয়া দুই কোটি প্রান্তে গিয়া পড়ে। এবারে যেসব কবিতার উল্লেখ করিব, সেগুলি সুরদাসের প্রার্থনা, বস্তুস্বরূপের বা সংগীত-রীতির অন্তর্গত কবিতা। নিষ্ফল কামনা, একাল ও সেকাল, মরন-স্বপ্ন, ধ্যান, মেঘের খেলা, নিষ্ফল প্রয়াস, হৃদয়ের ধন, নিভৃত আশ্রম প্রভৃতি কবিতায় বস্তুরূপকে লঙ্ঘন করিয়া বস্তুস্বরূপে পৌঁছিবার চেষ্টা অতিশয় স্পষ্ট। এগুলিও প্রেমের কবিতা। কিন্তু ইহাদের জন্মলগ্নে কোন বিশেষ ব্যক্তির মুগ্ধনেত্রের দৃষ্টির অনুপ্রেরণা নাই; প্রেমের দেহহীন ভাব-মূর্তির দ্বারা এগুলি উদ্বোধিত। মেঘদূত শ্রেণীর কবিতায় যে বিশিষ্ট স্থানিকতা, কালিকতা, যে বিশিষ্ট ব্যক্তি-মূর্তি আছে, এ সব কবিতায় তাহার একান্ত অভাব।

ক্রমে মিলাইয়া গেল সময়ের সীমা
অনন্তে মুহূর্তে কিছু ভেদ নাহি আর।
ব্যাপ্তিহারা শূন্য সিন্ধু শুধু যেন এক বিন্দু
গাঢ়তম অনন্ত কালিমা।
আমারে গ্রাসিল সেই বিন্দু-পারাবার।

মানসীকাব্যের ভূমিকাস্বরূপ 'উপহার' কবিতায় কবি বলিয়াছেন যে,

এ চির জীবন তাই আর কিছু কাজ নাই
রচি শুধু অসীমের সীমা;

*অচলিত সংগ্রহের কোন কোন কাব্যে হিমালয়ের বর্ণনায় অভিজ্ঞতার প্রমাণ আছে।

আশা দিয়ে ভাষা দিয়ে তাহে ভালোবাসা দিয়ে
গড়ে তুলি মানসী-প্রতিমা।

মানসী কাব্য অসীমের সীমা টানিবার প্রয়াস। মেঘদূতে ও তৎশ্রেণীর কাব্য সসীমের কোটি, সুরদাসের প্রার্থনা ও তৎশ্রেণীর কাব্য অসীমের কোটি। অসীমের সীমা তখনি রচনা সম্ভব হয়, যখন সসীম অসীমে রবীন্দ্রনাথের ভাষায় অনন্ত ও শান্ত বা Ideal ও Real-এর সমন্বয় ঘটে। অন্তত সে দুরূহ সমন্বয় মানসীতে ঘটে নাই, পরবর্তী কাব্যে ঘটিয়াছে কি না, তাহা পরে আলোচ্য, কিন্তু মূল কথাটা এই যে, এই দুরূহ সমন্বয়ের দিকেই কবির প্রতিভাও সিদ্ধ-তীর্থ যাত্রী; এই দুরূহ সমন্বয়-রূপে সিদ্ধি ব্যতীত যে কবি-জন্মের সার্থকতা নাই, সে বিষয়ে কবি নিঃসন্দেহ। মানসী-কাব্য এই দুই বিপরীত লক্ষণাক্রান্ত কোটি-যুক্ত বিরাট হরধনুতে জ্যারোপ করিবার প্রাথমিক প্রয়াস ছাড়া আর কিছু নয়।

দেখো শুধু ছায়াখানি মেলিয়া নয়ন;
রূপ নাহি ধরা দেয়—বৃথা সে প্রয়াস।

কিম্বা—

নাই, নাই, কিছু নাই, শুধু অন্বেষণ,
নীলিমা লইতে চাই—আকাশ ছাঁকিয়া।
কাছে গেলে রূপ কোথা করে পলায়ন,
দেহ শুধু হাতে আসে শ্রান্ত করে হিয়া।
প্রভাতে মলিন মুখে ফিরে যাই গেহে,
হৃদয়ের ধন কভু ধরা যায় দেহে?

এই দুটি কাব্যাংশে অসীমে সীমা রচনার ব্যর্থতাজাত ক্ষুব্ধতা। অসীমের সীমা রচনা করা সম্ভব হইল না বটে, কিন্তু এটুকু কবি বুঝিতে পারিলেন যে, সীমার মধ্যে ছলনাময় একটা অসীমী সত্তা রহিয়াছে। ওটুকু বড়ো কম লাভ নয়। প্রেমিক সসীম, প্রেম অসীম; এ দুয়েরই রহস্য কবিকে আকর্ষণ করিতেছে, কিন্তু কি উপায়ে যে এই দুই বিরুদ্ধ সত্তাকে মিলিত করিয়া ভোগ করা যায়, তাহা কবি বুঝিতে অক্ষম। প্রেমিক ছাড়া প্রেমের অস্তিত্ব কোথায়? উপলব্ধি কেমন করিয়া হয়? আর প্রেমিককে বুকে টানিতে গিয়া দেখা যায়—

দেহ শুধু হাতে আসে!

একাল ও সেকাল কবিতায় অসীমের সীমা রচনার আর একটা চেষ্টা। একটি বিশেষ দিনের বর্ষা চিরকালীন বর্ষার ভূমিকায় আজ দণ্ডায়মান; একটি বিশেষ লৌকিক প্রেমিকার কথা মনে হইবামাত্র চিরকালীন প্রণয়িনীর মুখ কবির চিত্তে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল। লৌকিক বৃন্দাবন অলৌকিক সত্তায় মানুষের মনে বিরাজমান এবং সেদিনকার সেই বংশীধ্বনিত কুটীর-প্রান্তের রাধিকা লৌকিক বিরহীর বিষাদের তমালচ্ছায়া নিবিড় সুপ্তপ্রায় বনপথ দিয়া চিরকালীন অভিসারিকার বেশে যাত্রা করিয়াছে। একাল ও সেকাল কবিতায় এই দুই বিপরীত ধর্মের সার্থক মিলন যেমন ঘটিয়াছে, এমন আর মানসীর কোন কবিতায় নহে। মেঘদূত ও সুরদাসের প্রার্থনা যদি দুই প্রান্ত হয়, তবে একাল ও সেকাল তাহাদের মিলন-বিন্দু।

এ পর্যন্ত যে কবিতাগুলির উল্লেখ করিলাম, তাহারা মানসীর মূল ভাবধারার সঙ্গে সঙ্গতি রক্ষা করিয়া চলিতেছে; এই ভাবধারা আবার কবির পূর্বাপর কাব্য-গ্রন্থের পৌর্বাপর্য রক্ষা করিয়া চলিয়াছে বিশেষ একটা পরিণতির পথে বিশেষ একটা লক্ষ্যের মুখে। কিন্তু এবারে কয়েকটি কবিতার উল্লেখ করিব, যাহাদের বৈশিষ্ট্য অন্য কারণে। রবীন্দ্রনাথের প্রতিভা ও শিল্প নিয়ত পরিবর্তনশীল, নানাবিধ পরীক্ষা ও অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়া তাহারা গিয়াছে—কিন্তু একটি বিষয়ে কখনো তাহাদের পরিবর্তন ঘটে নাই, এমন কি, সে বিষয়ে কখনো তাহারা সংশয়িত অনুভব করিয়াছে। বিশ্ব-বিধানের পরিণাম মঙ্গলময়, বাহ্য দুঃখ-কষ্ট ও অমঙ্গল উদারতর দৃষ্টিতে শুভেরই ছদ্মবেশ, বিশ্ব-ব্যাপারে যিনি কর্তা, তিনি আনন্দ ও কল্যাণস্বরূপ এবং তিনি একম্। মোটের উপরে এই ভাবটিকে রবীন্দ্র-কাব্য ও রবীন্দ্র-জীবনের ভিত্তি বলা যাইতে পারে। এই ভাব তাঁহার জীবন পরিণতির সঙ্গে সঙ্গে পরিণত হইলেও গোড়া হইতেই তাঁহার কাব্যে আছে; যেন মাতৃ-স্তন্যের সঙ্গেই ইহা তিনি পান করিয়াছিলেন; যেন পিতৃ-সম্পত্তির উত্তরাধিকাররূপে তিনি ইহা পাইয়াছিলেন, যেন পূর্বজন্মের সংস্কার-রূপে তিনি ইহা রক্তের মধ্যে বহন করিয়াই জন্মিয়াছিলেন।

কাজেই এই ভাবধারা রবীন্দ্র-কাব্যের প্রধান প্রবাহ হইলেও বিস্ময়জনক নহে, কিন্তু ইহার ব্যতিক্রম বিশেষ প্রণিধানযোগ্য। মানসী কাব্যে কয়েকটি কবিতায় এই ব্যতিক্রম দৃষ্ট হয়। মানসীর পরবর্তী কাব্যে এই জাতীয় স্পষ্ট ব্যতিক্রম আছে কি না সন্দেহ-জনক। নিষ্ঠুর সৃষ্টি, প্রকৃতির প্রতি, মরণ-স্বপ্ন, শূন্য গৃহে, জীবন-মধ্যাহ্ন, ভৈরবী গান ও সিন্ধুতরঙ্গ রবীন্দ্র-কাব্য

প্রবাহের বিরুদ্ধ ধর্মবিশিষ্ট কবিতা এবং সেই জন্যই বিশেষভাবে আলোচনার যোগ্য।

মনে হয় দৃষ্টি বুঝি বাঁধা নাই নিয়ম-নিগড়ে,
আনাগোনা মেলামেশা সবি অন্ধ দৈবের ঘটনা।
× × ×
মোরা শুধু খড়-কুটো স্রোতোমুখে চলিয়াছি ছুটি,
× × ×
সৃষ্টি-স্রোত-কোলাহলে বিলাপ শুনিবে কে বা কার।
× × ×

এই জাতীয় কথা রবীন্দ্র-কাব্যে একান্ত বিরল। কিন্তু এই অন্ধকার নৈরাশ্যে কবিতাটির শেষ নয়—

সত্য আছে স্তব্ধ ছবি
যেমন ঊষার রবি,
নিম্নে তারি ভাঙে গড়ে
মিথ্যা যত কুহক কল্পনা।

মঙ্গলের আশ্বাসে কবিতাটির শেষ—কিন্তু তাহা যেন হঠাৎ মনে-পড়া। কিন্তু আসল কবিতাটি যে দোলায় দুলিতেছে, তাহা কবি-মনের এক প্রকার অবিশ্বাসজাত তিক্ততা।

হৃদয় কোথায় তোর খুঁজিয়া বেড়াই
নিঠুরা প্রকৃতি!
এত ফুল, এত আলো, এত গন্ধ, গান,
কোথায় পিরিতি।
আপন রূপের রাশে
আপনি লুকায়ে হাসে,
আমরা কাঁদিয়া মরি
এ কেমন রীতি।
× × ×
বিশ্ব নিবু-নিবু, যেন দীপ তৈলহীন;
× × ×
সমস্ত মানব প্রাণ বেদনায় কম্পমান
নিয়মের লৌহবক্ষে বাজিবে না ব্যথা!
× × ×
এই মায়াময় ভবে চিরদিন কিছু
রবে না।
× × ×
তবে সত্য মিথ্যা কে করেছে ভাগ,
কে রেখেছে মত আঁটিয়া
× × ×
যদি কাজ নিতে হয়, কত কাজ আছে
একা কি পারিব করিতে।
× × ×
সেই যেখানে জগৎ ছিল এককালে
সেইখানে আছে বসিয়া।
× × ×
নাই সুর, নাই ছন্দ, অর্থহীন, নিরানন্দ-
জড়ের নর্তন।
সহস্র জীবনে বেঁচে ওই কি উঠিছে নেচে
প্রকাণ্ড মরণ?
× × ×

এ রকম তিক্ততা রবীন্দ্র-কাব্যে অতিশয় বিরল, মানসীর বাহিরে কোথাও আছে বলিয়া মনে পড়ে না। অবশ্য প্রত্যেকটি কবিতার শেষে বিশ্বাসের সুর আছে—কিন্তু তাহা যেন হঠাৎ মনে-পড়া, বিশেষ ব্যতিক্রম অংশটাই আলোচ্য বিষয়, সামান্য অংশ নয়।

এখন অভূত-পর এই তিক্ততার কারণ কি? সিন্ধুতরঙ্গ ও ভৈরব গান বাদ দিলে বাকি পাঁচটি কবিতাই ১৮৮৮ সালের বৈশাখ মাসের অল্প কয়েক দিনের মধ্যে রচিত। ভৈরবী গান ওই সালের জ্যৈষ্ঠ মাসে রচিত; সিন্ধুতরঙ্গ প্রায় এক বছর পূর্বে লিখিত। ওই সময়টাতে কবির জীবনে এমন কি, বিষাদের কারণ ঘটিয়াছিল—যাহা এই কবিতাগুলির কারণ হইয়াছে? ওই সময়ে সেরূপ কোন ঘটনা ঘটিয়াছে বলিয়া জানা যায় না। ইহার আগে রবীন্দ্রনাথ জীবনে একবার নিদারুণ শোক পাইয়াছিলেন—কিন্তু সে তো ১৮৮৪ সালের বৈশাখ মাসের কথা।

'কিন্তু আমার চব্বিশ বছর বয়সের সময় মৃত্যুর সঙ্গে যে পরিচয় হইল, তাহা স্থায়ী পরিচয়। তাহা তাহার পরবর্তী প্রত্যেক বিচ্ছেদ শোকের সঙ্গে মিলিয়া অশ্রুর মালা দীর্ঘ করিয়া গাঁথিয়া চলিয়াছে। × ×

'জীবনের এই রন্ধ্রটির ভিতর দিয়া যে একটা অতলস্পর্শ অন্ধকার প্রকাশিত হইয়া পড়িল, তাহাই আমাকে দিনরাত্রি আকর্ষণ করিতে লাগিল। × ×

'যাহা আছে এবং যাহা রহিল না, এই উভয়ের মধ্যে কোনমতে মিল করিব কেমন করিয়া।' [জীবন-স্মৃতি]

চার বৎসর আগেকার এই মৃত্যুর স্মৃতিই কি এই তিক্ততার কারণ? তিক্ততা সত্ত্বেও এ কবিতাগুলি তো পূর্ণ নৈরাশ্যের কবিতা নয় এগুলি 'যাহা আছে এবং যাহা রহিল না, এই উভয়ের মধ্যে কোনমতে মিল করিবার' একটা চেষ্টা ছাড়া আর কিছু কি? বৈশাখের সেই কবি হৃদয়ভেদী মৃত্যুর স্মৃতিই কি চার বৎসর পরের বৈশাখে আবার ঘুরিয়া আসিল? তবে কি ইহা দুঃখের স্মৃতির বার্ষিকী নিবেদন মাত্র! রবীন্দ্র-জীবনের প্রচুরতর তথ্য হস্তগত না হওয়া পর্যন্ত এ বিষয়ে গবেষণা নিতান্তই নিরর্থক। তবে একটি কথা উল্লেখ করা দরকার, এই সব কবিতায় 'যাহা ছিল এবং যাহা রহিল না' এই দুইয়ের মধ্যে সমন্বয় ঘটে নাই; জোড়া-তাড়া ঘটিয়াছে মাত্র; সে সমন্বয় বহু পরবর্তী কাব্যের কথা।

নিন্দুকের প্রতি নিবেদন, কবির প্রতি নিবেদন, পরিত্যক্ত পত্র প্রভৃতি কবিতায় কবির লেখক-জীবনের তিক্ত অভিজ্ঞতার প্রকাশ আছে। অবশ্য এ তিক্ত অভিজ্ঞতা পূর্বোল্লিখিত তিক্ততার চেয়ে অনেক নিম্ন-স্তরের অনুভূতি।

দেশের উন্নতি, বঙ্গবীর, ধর্মপ্রচার ও নববঙ্গ দম্পতির প্রেমালাপ দেশের রাজনীতি ও সামাজিক প্রথার প্রতি বিদ্রূপাত্মক কবিতা। রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন যে, যুগপৎ তাঁহার হৃদয়ে দেশের প্রতি ভালোবাসা ও তথাকথিত দেশহিতৈষণার প্রতি ব্যঙ্গের ভাব আছে। কিংবা বলা উচিত, তাঁহার ব্যঙ্গ দেশপ্রেম হইতেই উদ্বুদ্ধ। এই কবিতাগুলি সেই যুগল ভাবের সাক্ষী।

এই কবিতাগুলিতে দেশের যে সংকীর্ণ গণ্ডির, বিশ্ববিমুখ কূপমণ্ডূকতার প্রতি ব্যঙ্গ আছে—তাহারই আর এক প্রকাশ দুরন্ত আশা কবিতায়। দেশের ক্ষুদ্র গণ্ডি হইতে বৃহৎ, মুক্ত, বর্বর জীবনে পলায়নের উল্লাস এই কবিতাটিতে। বধূ কবিতাটির পরিবেশ নিতান্তই গার্হস্থ্য—কিন্তু ইহাও দুরন্ত আশার অনুসঙ্গী। নূতন ঘরের প্রতিকূল সংকীর্ণতায় বধূ যে দুঃখ অনুভব করিতেছে, সে দুঃখ কবির জীবনেরই দুঃখ; কবি প্রতিদিন এই সংকীর্ণতা সহ্য করিতেছিলেন—যে বেদনা হইতে মুক্তির উল্লাস দুরন্ত আশাতে।

এবারে যে কবিতাগুলির উল্লেখ করিব, তাহাদের অধিকাংশই পরীক্ষামূলক রচনা, কোনটাতে বা ছন্দের পরীক্ষা, কোনটাতে বা

নূতন গঠন রীতির পরীক্ষা। পরীক্ষামূলক কবিতা রচনার চিহ্ন রবীন্দ্রনাথের প্রায় সমস্ত কাব্যগ্রন্থেই আছে, কোন পরীক্ষার ধারাকে তিনি অনুসরণ করিয়া পরীক্ষোত্তীর্ণ সিদ্ধিতে পৌঁছিয়াছেন,—কোনটা বা পরিত্যাগ করিয়াছেন। বিরহানন্দে যতিপাতে পরীক্ষা। নিষ্ফল উপহারে যুক্তাক্ষরকে দুই মাত্রা গণনা করিয়া নূতন ছন্দ প্রবর্তনের পরীক্ষা। ছন্দ-রহস্যের ইহা এক গুরুত্বপূর্ণ আবিষ্কার—পরবর্তী রবীন্দ্র-সংগীত ও কাব্যে ইহা বিপ্লবকারী পরিবর্তন আনিয়াছে। কিন্তু ইহা নিষ্ফল উপহার জাতীয় 'কথা' কাব্যের পক্ষে সুপ্রযোজ্য নহে মনে করিয়াই তিনি নিষ্ফল উপহারের পাঠান্তরে এই নিয়ম বর্জন করিয়াছেন। *

নারীর উক্তি, পুরুষের উক্তি, ব্যক্ত প্রেম, গুপ্ত প্রেম পাত্রপাত্রীর দ্বারা কথিত 'নাটকীয় উক্তি' শ্রেণীর কবিতা। এই পরীক্ষার ধারাকে রবীন্দ্রনাথ পরবর্তী কাব্যে আর অনুসরণ করেন নাই।

গুরুগোবিন্দ ও নিষ্ফল উপহার 'ব্যালাড' বা 'কথা' জাতীয় কাব্য। এই ধারা পরবর্তীকালে অনুসৃত হইয়াছে—ইহাদের সংকলন কথা ও কাহিনী কাব্যে। তবে এখানে দুটিই পরীক্ষামূলকতার স্তরে। গুরুগোবিন্দর সবটাই গুরুগোবিন্দের উক্তি—ঘটনার বিন্যাস ইহাতে নাই। কেবল শেষ শ্লোকটি উক্তি নয় —ঘটনার বিন্যাস। কিন্তু এই শ্লোকটি পরবর্তীকালে পরিত্যক্ত হইয়াছে। নিষ্ফল উপহারে ঘটনা-বিন্যাস আছে।

মানসীতে রবীন্দ্রনাথ আর একটি ছন্দ-রূপ আবিষ্কার করিয়াছেন—ইহাকে মুক্ত পয়ার বলা যাইতে পারে। মেঘদূত ও অহল্যার প্রতি কবিতা নবপ্রবর্তিত মুক্ত পয়ারে লিখিত। মুক্ত পয়ার অমিত্রাক্ষর ও পয়ার মিলাইয়া গঠিত। ইহাতে অমিত্রাক্ষরের যতিপাতের স্বাধীনতার সহিত পয়ারের অন্ত্যানুপ্রাস মিশ্রিত। এই ছন্দরূপ পরবর্তীকালে রবীন্দ্রনাথের ভাব-প্রকাশের একটি প্রধান বাহন হইয়া দাঁড়াইয়াছে; বহু কবিতায় ও নাটকে এই ছন্দ ব্যবহৃত হইয়াছে দেখিয়া মনে হয় কবি ইহাকে নিজের শক্তির অনুকূল বাহন বলিয়া মনে করিতেন। মধুসূদনের পক্ষে যেমন অমিত্রাক্ষর, রবীন্দ্রনাথের পক্ষে তেমনি এই মুক্ত পয়ার।

এবারে মানসীর কয়েকটি বিশিষ্ট কবিতার উল্লেখ করিব—বর্তমান লেখকের মতে এইগুলিই মানসীর শ্রেষ্ঠ কবিতা। মেঘদূত, অহল্যার প্রতি, একাল ও সেকাল কুহুধ্বনি এবং সিন্ধুতরঙ্গ। মেঘদূত সম্বন্ধে পূর্বে আলোচিত হইয়াছে।

'অহল্যার প্রতিকে' সোনার তরীর 'বসুন্ধরা' কবিতার প্রথম খসড়া বলিয়া ধরা উচিত। অহল্যা বসুন্ধরা ছাড়া আর কেহ নহে। বসুন্ধরা জীবমাত্রেরই জননী, কিন্তু এক সময়ে সে লালনশীলা, স্নেহময়ী অন্নদায়িনী ছিল না; সে অহল্যার মতোই অভিশপ্ত ও বন্ধ্যা ছিল; মরুতে মরুতে ও নির্বান্ধব আদিম অরণ্যের শ্বাপদসংকুল

*বাঙলা ছন্দের প্রধান দুই ভাগ, লাচাড়ী ও পয়ার। লাচাড়ী অর্থ নৃত্যচার, পয়ার অর্থ পদচার। নৃত্যচার বা লাচাড়ী ছন্দ নাচিয়া চলে; পদচার বা পয়ার পদাতিক শ্রেণীর, হাঁটিয়া চলে। একটা গানের ও নাচের ছন্দ, অপরটা ঘটনা বিবরণ করিবার বা কথা বলিবার ছন্দ। লাচাড়ী জাতীয় ছন্দে যুক্তাক্ষরকে দুই মাত্রা ধরা বিধেয়, যাহার ফলে ছন্দ লঘুতা বা নৃত্যশীলতা লাভ করে; পয়ার জাতীয় ছন্দে যুক্তাক্ষর এক মাত্রা — কারণ তাহার নাচিবার প্রয়োজন নাই। নিষ্ফল উপহার 'কথা'কাব্য, ইহা একটি ঘটনাকে বিবৃত করিতেছে, কাজেই এখানে যুক্তাক্ষরের দুই মাত্রা গণনা সুপ্রয়োগ নহে বিবেচনা করিয়াই কবি পাঠান্তরে ইহার পরিবর্তন করিয়াছেন। অপর পক্ষে 'ভুল-ভাঙা' কবিতা লাচাড়ী বা নাচিয়া-চলা ছন্দ — ইহাতে যুক্তাক্ষরের দুই মাত্রা গণনা সুপ্রযুক্ত হইয়াছে—

বাহুলতা শুধু বন্ধন পাশ
বাহুতে মোর।

দুর্গম ভীষণতায়। কিন্তু এই অভিশাপ কাটাইয়া এখন বসুন্ধরা জননী হইয়া প্রসন্নদাক্ষিণ্যে জীবমাত্রকেই আলিঙ্গনপাশে বন্ধ করিয়া রাখিয়াছেন। অহল্যার এখনো সে অভিশাপের অবস্থা সম্পূর্ণ কাটে নাই—কেবল সে অভিশাপ মুক্ত হইয়া মাতৃত্বের মধ্যে নূতন জন্ম লাভ করিবার মুখে। কাজেই অহল্যার প্রতি যেখানে শেষ, বসুন্ধরার সেখানে সূচনা। এইভাবে দুটিকে মিলাইয়া পড়িলে দুটিরই পূর্ণতর রূপে উপলব্ধি হইবে।

একাল ও সেকাল সম্বন্ধেও কিছু আলোচনা পূর্বে করিয়াছি। এই নিখুঁৎ ক্ষুদ্র কবিতাটির একমাত্র খুঁৎ ইহার ষষ্ঠ শ্লোক—সেখানে বিরহিনী যক্ষনারীর চিত্র উদ্ঘাটিত হইয়াছে। পঞ্চম শ্লোকে পথিক বধূর উল্লেখ থাকিলেও সে ত্রুটি একেবারে অমার্জনীয় নহে। এই ক্ষুদ্রকায় কবিতাটিতে রসের জটিলতার স্থানাভাব—প্রারম্ভ হইতে শেষ অবধি এক-রসত্বই ইহার সাফল্যের প্রধান কারণ। একালের বিরহের প্রতিবিম্ব সেকালের রাধার বিরহের মধ্যে স্পষ্ট হইয়াছে—আগাগোড়াই যমুনা ও বৃন্দাবন বিহারিনী বিরহিনীর চিত্র—তন্মধ্যে একটি শ্লোকে কালিদাসের যক্ষনারী আসিয়া পড়াতে রসবোধের অখণ্ডতা খণ্ডিত হইয়াছে বলিয়া মনে হয়। শেষ দুই শ্লোকে একালের বিরহ ও সেকালের বিরহকে চিরকালের বিরহের সংগীতের মধ্যে গ্রথিত করিয়া দিয়া চিরকালীন বিরহ-ব্যথা ধ্বনিত করিয়া তোলা হইয়াছে।

কুহুধ্বনি রবীন্দ্রনাথের একটি রসোত্তীর্ণ কবিতা। এই কবিতাটির উপরে কীটসের নাইটিংগেল কবিতার প্রভাব আছে বলিয়া মনে হয়। কীটসের নাইটিংগেল পৃথিবীর সাহিত্যের একটি শ্রেষ্ঠ কবিতা; কুহুধ্বনির পক্ষে সে দাবী কেহ উত্থাপন করিবে না। মৃত্যুশীল জন্মস্রোতের মধ্যে ওই নাইটিংগেলই জীবনের শাশ্বত রূপ—ইহাই কীটসের বক্তব্য। কর্মস্রোতের সুরহীন তালকাটা সংগীতের মধ্যে ওই কুহুধ্বনি সৌন্দর্যের ও পূর্ণতার ধুয়া বা ধ্রুবপদ ধরিয়া রাখিয়াছে। মানব-জীবনের খণ্ডিত সংগীতকে সে অনাদিকাল হইতে বিশ্বের সৌন্দর্য-অভিপ্রায়ে সঙ্গে মিলাইতে চেষ্টা করিতেছে। সফল সে হোক বা না হোক, ওইটাই জীবনের শাশ্বত রূপ—যতক্ষণ না মানবের খণ্ডিত জীবনসংগীত ওই অখণ্ড রস-রূপের সঙ্গে মিলিত হইতেছে, ততক্ষণ মানবের মুক্তি নাই। তত্ত্ব আলোচনা করিয়া কাব্য বুঝিবার প্রয়াস বৃথা—কবিতাটি বারংবার পাঠ করা দরকার।

সিন্ধুতরঙ্গ রবীন্দ্রনাথের সমুদ্রবিষয়ক কবিতাগুলির মধ্যে শ্রেষ্ঠ। অন্য কারণে 'সমুদ্রের প্রতি' ইহার চেয়ে উচ্চতর স্থানে অধিষ্ঠিত—কিন্তু সমুদ্রের কবিতায় যদি সমুদ্রের বিশেষ রূপ, বিশেষ স্পর্শ, বিশেষ সংগীত অনিবার্য হয়—তবে সিন্ধুতরঙ্গ কেবল যে রবীন্দ্রনাথের সমুদ্রবিষয়ক কবিতাগুলির মধ্যে শ্রেষ্ঠ তাহা নয়, বাঙলা ভাষাতেই ইহা শ্রেষ্ঠ সামুদ্রিক কবিতা। ইংরেজি সাহিত্যে যে শ্রেণীর সামুদ্রিক কবিতা আছে, বাঙলা ভাষায় তাহার একান্ত অভাব—তার কারণ বাঙ্গালী সমুদ্রচারী, সমুদ্রবিলাসী, সমুদ্রলালিত জাতি নহে। সমুদ্রকে আমরা কদাচিৎ দেখি, দূরে হইতে দেখি—তাহার সহস্র মূর্তির সঙ্গে আমাদের পরিচয় নাই। সেই জন্য সমুদ্রের কবিতা বাঙ্গালী কবির হাতে সমুদ্রের রূপের কবিতা না হইয়া তাহার স্বরূপের বা ভাব-মূর্তির কবিতা হইয়া ওঠে। ইংরেজি কবিতায় সমুদ্রের লবণাম্বুস্পর্শ, তাহার তাণ্ডব দোল, তাহার প্রলয় নৃত্যে পাই, অথবা তাহার মুগ্ধ শান্ত শিশুসম রূপে পাই; যেভাবেই পাই, বিশিষ্টভাবে সমুদ্রকেই পাই।—বাঙলায় তেমন সম্ভব নহে। সিন্ধুতরঙ্গ কবিতায় বাঙলা কাব্যের সেই অভাব কিঞ্চিৎ পূর্ণ হইয়াছে। ইহা বিশেষভাবে সমুদ্রেরই কবিতা—সমুদ্রকে উপলক্ষ্য করিয়া কবির ভাবনার প্রকাশ মাত্র নয়। ইহার বুক-ফাটা ছন্দের উদার নৈরাশ্যে মজ্জমান জাহাজের ঝঞ্জোৎকণ্ঠ অন্তিম ক্রন্দন ধ্বনিত; জড় ও জীবে, বিশ্বের মঙ্গলময় পরিণামে ও আপাত নিষ্ঠুর ক্রিয়ায় যে মন্থন চলিতেছে—তাহার আন্দোলন অনুভূত হয় ছন্দ ব্যবহারে। শ্লোকের প্রথম চারটি ছত্র অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র; যেন তাহা ঝড়ের প্রাথমিক ঝাপটা,—কিন্তু তারপরেই দীর্ঘায়ত চারটা ছত্র আসল ঝড়টার মতো একেবারে ঘাড়ের উপরে আসিয়া পড়ে; বাঁচিলাম কি মরিলাম স্থির করিবার আগেই সে নিদারুণ ঝাপট চলিয়া যায়,—তখন আবার ক্ষুদ্রতর দুটো ছত্র অপেক্ষাকৃত সুস্থ অবস্থা। শেষে একটি একক ছত্র—একটু নিশ্বাস ফেলিবার সুযোগ—

দাঁড়াইয়া কর্ণধার তরীর মাথায়।

ছন্দে ভাবে ছবিতে সমুদ্রের এমন অনিবার্য কবিতা বাঙলা সাহিত্যে আর নাই,—এই দ্বিরুক্তি করিয়া আমার রস-বিস্ময় পুনরায় প্রকাশ করিলাম।



অনুবাদসাহিত্য

স্বপ্ন

স্টিফেন লিক্‌ক্‌

এই সেদিন আমি স্বপ্ন দেখ্‌ছিলাম যে, আমি এক বিখ্যাত মাসিক পত্রের সম্পাদক হয়ে গেছি। খুব বড় কাগজ, তেমনি খাতির সম্পাদকের,—অবিশ্যি এরকম স্বপ্ন আমি হামেশাই দেখে থাকি, এর চেয়েও ঢের বিশ্রী স্বপ্ন আমার দেখা অভ্যেস, যেমন ধরা যেতে পারে, একদিন আমি আমেরিকার রাষ্ট্রপতি হয়ে গেছি, অথবা টাটা কিংবা বিরলার চেয়েও বড়লোক হয়ে গেছি। এ আমার বিলাস। কিন্তু কাগজের সম্পাদক হওয়ার স্বপ্ন—একটা দুর্ঘটনা। বসে বসে নামজাদা একজন দেশপ্রেমিকের জীবনী লিখছিলাম, মানে—কর্পোরেশনের নির্বাচন যুদ্ধ এগিয়ে আসছে, তাই একজন অর্ধ-খ্যাত ভদ্রলোকের (?) অনুমান করা জীবনী (যা সত্য নয়) লিখ্‌ছি। ইনি এবারে নির্বাচনে প্রার্থীদের একজন। যাক সে কথা—আমাদের মত লিখিয়েদের এইরকম লেখাই বেশি লিখ্‌তে হয়। বাজার বুঝে, হিসেব করে লিখ্‌তে না পারলে উপায় নেই। শীতকালে বর্ষার কবিতা লিখে ফেলতে ন পারলে আষাঢ় মাসে ছাপা হয় না—কাজেই ঘোর শীতে আমাদের মনে 'গুরু গুরু মেঘ' গুমরে ওঠে। তারপর গরমকালে পুজোর লেখা তৈরি করবার সাড়া পড়ে—বাজারে পুজোর লেখার চাহিদা তখন খুব।

কিন্তু এ ধরণের হিসাববুদ্ধি সজাগ রেখে চলা ভয়ানক শক্ত, একটু হিসাবের এদিক ওদিক হ'লেই সব মাটি। সব সময় বাজারের হাওয়ার দিকে নজর রেখে চল্‌তে ক'জন পারে মশাই!

আসল কথার খেই হারিয়ে কি সব বাজে বকছি তার ঠিক নেই—হ্যাঁ, আমি বলতে বসেছি কেমন করে আমি সম্পাদক হবার স্বপ্ন দেখলাম। তার পিছনে যে ইতিহাস রয়েছে তাই বলব।

ঘরের আসবাবপত্র আর আয়তন দেখে বুঝতে আমার কোনো অসুবিধে হয়নি যে, এটি একটি সম্পাদকের ঘর—ঘরের চেয়ার টেব্‌লে বিলাসের যে প্রসন্নতা তা একমাত্র সম্পাদকেই সম্ভব এবং শোভন। যে মেহগনী কাঠের টেবলে বসে আমি লিখছি, যে সুন্দর মূল্যবান কলমে এবং যে দামী কাগজে আমার লেখা চল্‌ছে তাও একমাত্র সম্পাদকের পক্ষেই সম্ভব। এগুলো সবই ব্যবসায়ীরা উপহার দিয়েছে—তাদের তৈরি জিনিস দিয়ে ধন্য হয়েছে তারা।

লিখতে লিখতে আমি বেশ গর্ব অনুভব করছি। আমার এক একটি কথার মূল্য আট আনা। ইচ্ছে করে ছোট ছোট কথা লিখ্‌ছি—ব্যবসায়ের এটাই রীতি। এক সময়ে আমি মনে মনে নিজেকে বোঝাবার জন্য বল্লাম,—"আমি একজন সম্পাদক, ফতোয়া দিচ্ছি।"

যদিও জীবনে কোনো সম্পাদক চোখে দেখিনি এবং ফতোয়া দেওয়ার সৌভাগ্য আমার হয়নি, তবু সে সম্বন্ধে আমার সুস্পষ্ট ধারণা আছে। কত লেখা যে কত কাগজে পাঠিয়েছি এবং সেগুলো সম্পাদকের বাণী বহন করে (আমারই দেওয়া ডাক খরচায়) যে ফেরৎ এসেছে, তা থেকেই সম্পাদক মহাশয়দের লেখার দস্তুরটা আমার কাছে দুরস্ত হয়ে গেছে। চোখের সাম্‌নে সম্পাদকের কাজের চেহারা ঘুরে বেড়ায়।

আমি বসে আছি, মাঝে মাঝে বেঁটে মুখে মোটা চুরুট দিয়ে ভ্রূকুঞ্চন করে কি যেন ভাব্‌ছি। এমন সময়ে আমার দোরে কে খুট্‌খুট্‌ কড়া নাড়ল।

সুশ্রী তরুণী একটি—সে এখানেই থাকে, আমার সেক্রেটারী। পুরোহাতা জামার আস্তিন গুটানো, সুন্দর বাহুর খানিকটা অবারিত, কতকটা হাসপাতালের নার্সদের মত তার চলন ধরন।

মেয়েটি ঘরে ঢুকে বলে—"আপনার কাজের কোনো অসুবিধে হ'ল না ত, আমি এলাম বলে!"

সম্পাদকী মুরুব্বিয়ানায় বলি—"না গো মেয়ে অসুবিধে আবার কি। বস, ওসব বাজে কথা থাক। সকাল থেকে খুব পরিশ্রম হয়েছে তোমার, কিছু খাবার আনতে বলি কি বল।" তরুণীটি আমার প্রায় পত্নী হবার যোগ্য, কিন্তু আমি সম্পাদক, ওকথা ভাবতে পারি না।

সেক্রেটারী বলে—"আপনাকে একটা কথা বল্‌তে এসেছিলাম। একটি লোক আপনার সঙ্গে দেখা করতে চায়, নীচে বসে আছে।"

আমার চেহারা বদ্‌লে যায়, আমি বলি—"কেমন লোক? ভদ্রলোক, না লেখক টেখক?"

—"দেখে ত ঠিক ভদ্রলোক বলে মনে হয় না।"

—"বেশ! তাহলে আর দেখতে হচ্ছে না ও নিশ্চয় লেখক। তা একটু বসতে বল। দারোয়ানকে বল লোকটাকে কয়লার ঘরে নিয়ে গিয়ে তালা দিয়ে রাখতে। আর খবর কর কাছেই পুলিশ আছে কিনা, দরকার হলে যেন পাই একজন পুলিশ—"

সেক্রেটারী বলে "আজ্ঞে আচ্ছা—"

আমি ঘণ্টাখানেক বসে থাকি, তারপর, জনসাধারণের দাবী আর অধিকার সম্বন্ধে এক সম্পাদকীয় প্রবন্ধ লিখে ফেল্লাম চট্‌ করে। সিগারেট ধরাই—তুর্কীর সৌখীন সিগারেট—তারপর একটু উত্তেজক পানীয় (শেরী) দিয়ে মূল্যবান মাথার তোয়াজ করি। কিছু খাবারও খেলাম বইকি—যা পরিশ্রম, না খেলে শরীর থাকবে কি করে?

তারপর ঘণ্টা বাজিয়ে বলে দিই—"সেই লোকটাকে নিয়ে আয়—"

তারা লোকটিকে এনে হাজির করল। কিরকম মিটমিটে তার চোখের দৃষ্টি, কতকটা কুণ্ঠিত আর অনেকখানি বিব্রত মুখের ভাব, তাছাড়া লেখকের ধূর্ততা আর নীচতার ছাপটুকুও রয়েছে, হ্যাঁ, আছে। লোকটার হাতে একটা কাগজের তাড়া, ওইত ওটা নিশ্চয় লেখার বাণ্ডিল।

আমি বলি—"এবারে মশাই, চট্‌পট্‌ বলুন দেখি, কি চাই, কেন এসেছেন। বলুন, বলুন, তাড়াতাড়ি—"

সে বল্‌তে শুরু করে—"আমার একটি লেখা—"

আমার গলার স্বর হঠাৎ রুক্ষ হয়ে ওঠে—"কী? লেখা? আপনার সাহস ত কম নয় দেখ্‌ছি। কোন সাহসে এখানে লেখা নিয়ে এলেন শুনি? মুদিখানা নয় এটা—"

থতিয়ে বলে লোকটা—"একটা গল্প—"

—"গল্প? আমাদের আর কাজ নেই, গল্প ছাপব, হুঃ! আপনার ওই পাগলের প্রলাপ ছেপে সময় নষ্ট করব, ভাবেন কি? কাগজ ছাপার খরচা সম্বন্ধে আপনার ধারণা আছে কিছু? পঞ্চাশ পাতা বিজ্ঞাপন ছাপতে হবে। সাতরঙা কালিতে, সুন্দর কাগজে, দামী দামী ছবি ছাপতে কত খরচ জানেন? এই দেখুন"—বলে সামনের প্রুফের কাগজগুলো তুলে নিলাম। সুন্দর

নক্সা আর ছবিগুলো দেখিয়ে বলি—"এই দেখুন সব দামী দামী বিজ্ঞাপন—এমন চমৎকার উনুনের বিজ্ঞাপন, এই মোটরগাড়ির ছবি, এ মোটরের গুণ হচ্ছে এই যে—চমৎকার কুশন দেওয়া আসন, এসবের বর্ণনার একপাতা বিজ্ঞাপন—এসবের কোনো মূল্য নেই বলতে চান? একবার ভেবে দেখুন ত কী অসম্ভব পরিশ্রম হয়েছে এসব কথা লিখতে আর সাজাতে। আপনার ও ছাইপাঁশ গল্প আমাদের কোন্ কাজে আসবে?"

আমি উঠে দাঁড়িয়ে বলি—"জানেন, আপনাকে আমি খুন করতে পারি।"

সে কাতরভাবে বলে—"দোহাই আপনার—খুন করবেন না—না, না। আমি চলে যাচ্ছি আমার লেখা নিয়ে। আপনাকে বিরক্ত করব না।"

বাধা দিয়ে বলি—"না, আপনি পাবেন না লেখা নিয়ে যেতে। ওসব চালাকি চলবে না এখানে। আমাকে লেখা দিয়ে আবার ফেরৎ নিয়ে যাবার আপনার কোনো অধিকার নেই। এটা থাকবে। আমার পছন্দ না হয় আপনাকে জেলে দেবো, সাজা হয়ে যাবে আপনার।"

সত্যি কথা বলতে কি, আমার একবার মনে হয়েছিল যে, হয়ত লেখাটা কিনে নিলে কাজে আসবে। হোক না বাজে, তবু—। লোকটার ওপর রাগ বেড়ে যাচ্ছে—বেশ বুঝতে পারছি সংযত হওয়া উচিত। কিন্তু লোকটার দাসমনোভাব দেখে মনে হ'ল যে, এই মনোভাবসম্পন্ন মানুষ আমাদের দেশে বেড়ে যাচ্ছে দিন দিন; এদের শোধরানো দরকার। যেমন পৃথিবীর যাবতীয় কর্তব্য আমার মত সম্পাদকের ঘাড়েই এসে চেপেছে—এটাও তেমনি। মাথা গরম হয়ে গেল—এমনি করে দেশের সব মানুষই যদি অধঃপাতে যায়! জাতির মেরুদণ্ড ভেঙে যায় যদি!

...অবশ্য জনসাধারণের যেরকম রুচিবিকার ঘটেছে তাতে করে বেশ বোঝা যায় যে বাজে গল্প এক আধটা দিতেই হবে কাগজে নইলে বিজ্ঞাপন জমবে না।

আবার ঘণ্টা দিলাম। সেক্রেটারী এলো।

তাকে বললাম—"এঁকে নিয়ে গিয়ে বন্ধ করে রাখ—দেখো একটু খেয়াল রেখো, পালায় না যেন—লোকটা আবার লেখক।"

সেক্রেটারী বলে—"আজ্ঞে, আচ্ছা।"

তাকে বলে দিলাম—"খবরদার কিছু খেতে দিও না যেন ওকে।"

মেয়েটি বলে—"বেশ!"

আমার সামনেই পাণ্ডুলিপিটি পড়ে আছে টেবিলে। বেশ মোটা বলে মনে হচ্ছে। ওপরে লেখা আছে—অবন্তী রায় বা পুরোহিতের মেয়ে।

আবার ঘণ্টা বাজিয়ে হুকুম করি—"একবার দ্বারবানকে পাঠিয়ে দাও ত।"

সে এসে দাঁড়ায় সামনে—"হুজুর—"

তার মুখচোখের দৃপ্ত ভাবভঙ্গি দেখে মনে হ'ল আমার—ওর পরে স্বচ্ছন্দে দায়িত্ব দিয়ে নিশ্চিন্ত থাকা যায়।

আমি বলি—"আচ্ছা, তুমি পড়তে পারো?" সে বিনীতভাবে বলে—"হুজুর পারি কিছু কিছু—"

—বহুৎ আচ্ছা! তুমি এই লেখাটা নিয়ে যাও, তারপর সবটা পড়া হয়ে গেলে ওটা নিয়ে আসবে আমার কাছে।"

দ্বারবান পাণ্ডুলিপি নিয়ে চলে গেল। তারপর আমি কাজ করতে আরম্ভ করি। পাইপওয়ালারা পুরো একপাতা বিজ্ঞাপন দিয়েছে—সেটা সাজিয়ে গুছিয়ে দিতে হবে। একটা সুন্দর ছবি দিয়ে তার মাথায় "গৃহই সুখের নীড়" বলে বড় এক কবিতার খানিকটা লাগিয়ে দিলাম। ফাঁক ফাঁক করে আঠারো পয়েন্ট অ্যান্টিক টাইপে সাজিয়ে ফেলে মনে বেশ তৃপ্তি পাই—ব্যবসায়ী পাঠকেরা খুব তারিফ করবে। এমনি সব কাজের মধ্যে ডুবে থাকতে থাকতে কখন যে একঘণ্টা পার হয়ে গেছে জানতেও পারিনি—হঠাৎ একসময়ে দ্বারবান ঘরে ঢুকতে খেয়াল হ'ল যে অনেকখানি সময় কেটে গেছে।

তাকে দেখে প্রশ্ন করি—"তারপর, তোমার পড়া হয়ে গেছে?"

—"আজ্ঞে হ্যাঁ হুজুর—"

—"কিরকম দেখলে? দাঁড়ি, কমা সব ঠিক আছে? বানান ভুল নেই ত? কি হে—"

—"আজ্ঞে, না সেসব কোনো কিছু নেই। চমৎকার—"

"আচ্ছা আর একটা দরকারী কথা। গল্পের মধ্যে হাল্কা কথা কিছু নেই ত? মানে যা পড়লে মানুষের হাসি পায়—এমন কিছু? দেখ ঠিক করে বল, হাসির কথা কিছু আছে—একটা আধটা?"

—"আজ্ঞে না হুজুর, সেসব একদম নেই।"

—"এবারে বল দেখি, ঠিক ভেবে বল—গল্পটা পড়ে তোমার মনে কোনো ছাপ পড়েনি ত? মনের মধ্যে রেখাপাত করেছে? খুব সমঝে বলবে, মনে রেখো তোমার কথার 'পরে আমাদের পত্রিকার মানসম্মান নির্ভর করছে।—" বলে আড় চোখে তার দিকে তাকাই, তাকে মনে করিয়ে দিই আমাদের প্রতিদ্বন্দ্বী পত্রিকার কথা—"জানো তো অমুক কাগজ কি রকম বিজ্ঞাপন করছে, পাতায় পাতায় ভয়ঙ্করের সঙ্কেত, লাইনে লাইনে লোমহর্ষক ঘটনার জোয়ার—প্রতীক্ষায় থাকুন বলে বিজ্ঞাপন করেছে। যদি এতে সে রকম লোমহর্ষক কিছু না থাকে তবে আমি কিছুতেই এ লেখা কিনব না। বেশ ভেবে জবাব দাও—"

সে জবাব দেয়—"আজ্ঞে আছে ওসব।"

—"বেশ কথা—এবারে নিয়ে এস লেখককে।"

সে চলে গেল লেখককে আনতে। আমি এই অবসরে গল্পের পাতা উল্টে দেখে নিলাম।

লেখককে নিয়ে ওরা হাজির হ'ল। লোকটা কি রকম মনমরা হয়ে গেছে বলে বোধ হচ্ছে।

—"আপনার লেখা নেওয়া হবে।"—আমি বলি।

তার মুখে চোখে হাসি উপ্‌ছে ওঠে হঠাৎ। লোকটা আমার কাছে এমনভাবে এগিয়ে এলো যেন আমার হাত চেটে দেবে। পাক খাচ্ছে আনন্দে—।

আমি গম্ভীরভাবে বলি—"দাঁড়ান, আমার কথা শেষ করি। আপনার গল্প নেবো ঠিক করেছি বটে, কিন্তু মাঝে মাঝে প্রয়োজন মত অদলবদল করতে হবে।—"

—"তাই নাকি? সে কি মশাই?" লোকটি একটু কুঁকড়ে গিয়ে বলে।

—"প্রথম কথা হচ্ছে, আপনার গল্পের নাম একেবারে অচল। অবন্তী রায় বা পুরোহিতের মেয়ে, এ নামটা নেহাতই পানসে, আমি বলি কি নামটা দিই এই গোছের—চঞ্চলা অবন্তীকা বা সমাজের চোরাবালি।

লেখক হাত কচ্‌লে বলে—"কিন্তু আপনার—"

ধমক দিয়ে বললাম—"থামুন মশাই, কথা শুনুন। আর দ্বিতীয়ত আপনার গল্পটা বড্ড বড়।" বলে দর্জির দোকানের বড় একখানা কাঁচি ছিল টেবিলে, সেটা হাতে নিয়ে বল্লাম—"আপনার গল্পে ন'হাজার কথা আছে কিন্তু আমরা মোট ছ'হাজার কথার যায়গা দিতে পারি। কাজেই খানিকটা বাদ দিতে হবে।"

টেবিলের ওপর মাপের ফিতে ছিল, সেটা তুলে নিয়ে আমি খুব ভেবেচিন্তে হিসেব করে মেপে নিলাম গল্পটা—তারপর মেপে তিন হাজার কথা কাঁচি দিয়ে কেটে নিয়ে সেটা লেখকের হাতে দিয়ে দিলাম—"আপনি ইচ্ছে করলে এগুলো নিজের কাছে রেখে দিতে পারেন। আমরা এগুলো মোটেই দাবি করব না। এগুলো নিয়ে আপনি যা খুশি করতে পারেন।"

সে বলে—"কিন্তু দেখুন, আপনারা গল্পের শেষের দিকটা ষোল আনাই বাদ দিলেন? সিদ্ধান্তের অংশটা যে একেবারেই লোপ হয়ে গেল, ওতে গল্পটা নষ্ট হয়ে যায়। পাঠকেরা বুঝতে পারবে না—"

আমি আর হাসি চাপতে পারলাম না, লোকটা কি পাগল? করুণা হয় ওকে দেখলে!

আমি বলি—"একটা কথা নিবেদন করি মশাই! কেউই আপনার ওই হাজার হাজার কথার জঙ্গল পড়ে দেখবে না—মাসিক পত্রের

গল্প কেউ আগাগোড়া পড়ে না মশাই। কাজেই ও নিয়ে মিছে মাথা ঘামানো। অবিশ্যি আরম্ভটা লোকে দেখে থাকে কিন্তু শেষ—। থাক্‌গে, শুনুন—গল্পের শেষ অংশ আমরা আলাদা করে ছেপে দিই, বিজ্ঞাপনের সঙ্গে মিশিয়ে। কিন্তু এবারে আমাদের সে যায়গাও নেই। আগের অনেক গল্পের শেষ অংশ পড়ে রয়েছে, বুঝলেন। একটা দিকে নজর রাখতে হয়—গল্পের শেষ লাইন পড়লে যেন মনে হয় যে কোনো পরিণতির ইঙ্গিত হয়েছে এটাই লক্ষ্য করতে হয়, ব্যাস্ আর কিছু চাই না।" বলে লোকটার মুখের দিকে তাকাই একবার, তারপর বলি—"আচ্ছা, এবারে দেখা যাক, আপনার গল্পের শেষ লাইনটা—'অবন্তী চেয়ারে গা এলিয়ে দিয়ে বসে পড়ে।' এখন আমরা তার কাছ থেকে বিদায় নেবো। বাঃ, চমৎকার। এর চেয়ে আর ভালো কি হতে পারে? সে চেয়ারে বসে পড়ল, আমরা তার কাছ থেকে বিদায় নিলাম, বেশ কথা। খুব স্বাভাবিক পরিণতি।"

লেখক যেন একটা আপত্তি তোলবার চেষ্টা করে, কিন্তু আমি তাকে থামিয়ে দিই—"আর একটা সামান্য কথা বলবার আছে। আমাদের আগামী সংখ্যা কেবল মোটর-গাড়ি আর গৃহসজ্জার বিজ্ঞাপন দিয়ে বিশেষ সংখ্যা হিসাবে প্রকাশিত হবে। গৃহ-সজ্জার মধ্যে কেবল পাইপওয়ালাদের বিজ্ঞাপন থাকবে। তা আপনার গল্পের মধ্যে ওই পাইপের গুণাগুণ ব্যাখ্যার ব্যবস্থা করিয়ে নেবো। মানে, আপনার গল্পের ঘটনাস্থল হচ্ছে কলকাতা গরম কালে, কিন্তু ওটা করতে হবে দার্জিলিং শীতকালে—এমন শীত যে সাধারণ পাইপ ফেটে যায়। এতে আপনার কিছু ক্ষতি হবে না। আমরা সে সব ঠিক করে নেবো।"

কপালে হাত তুলে নমস্কার করে বলি—"আচ্ছা তাহলে এখনকার মত আসুন, নমস্কার।"

লেখকটি যেন দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সাহস সঞ্চয় করে, তার নড়বার লক্ষণ দেখছি না। একটু চুপ করে থেকে সে বলে—"তাহলে, পারিশ্রমিকের কি ব্যবস্থা!" থতিয়ে বলে সে।

আমি গম্ভীরভাবে বললাম—"আমাদের নির্ধারিত হারেই আপনাকে টাকা দেওয়া হবে। লেখা প্রকাশিত হবার দু'বছর পরে আপনি চেক পাবেন। তাতে আপনার সব খরচা উঠে আসবে। মায় কাগজ, কালি, ক্লিপ—এমনকি আপনার পরিশ্রমের ঘণ্টা হিসাবে মজুরিও পুষিয়ে যাবে। আচ্ছা, নমস্কার।"

সে চলে গেল। আমি বেশ শব্দ পেলাম ওরা লেখককে ধাক্কা দিয়ে নীচে নামিয়ে দিল।

আমি বসে বসে খসড়া করলাম, এই গল্পটিরই এক চটকদার বিজ্ঞাপন **আগামী সংখ্যার বিশেষ আকর্ষণ, অক্ষরে অক্ষরে লোমহর্ষণে পরিপূর্ণ বিচিত্র কাহিনী : চঞ্চলা অবন্তীকা বা সমাজের চোরাবালি।**

সহসা সাহিত্য সৌরজগত আলোকিত করিয়া নূতন বেদব্যাসের অভ্যুত্থান। ছোট গল্পে যুগান্তর আনিয়াছে এই নূতন লেখকের নূতনতম গল্পটি। এই লেখকের রচনাশৈলী অনবদ্য, ভাষার নির্বাচন নিক্তিতে ওজন করা...। সমাজের চোরাবালি গল্পটির জন্য আমরা লেখককে যে পরিমাণ টাকা দিয়াছি, তাহা বর্তমান জগতে কল্পনাতীত। একটি গল্পের জন্য এত বেশি টাকা আর কেহ পান নাই একথা নিঃসন্দেহে বলা যায়। গল্পটি পড়িতে পড়িতে পাঠক দিশাহারা হইয়া পড়িবেন। সেইসঙ্গে **মেসার্স স্নিপগট এণ্ড ফসেট কোম্পানীর গৃহসজ্জায়** পাইপের প্রয়োজন সম্বন্ধে মূল্যবান বিজ্ঞপ্তি।"

বিজ্ঞাপন লিখে ফেল্লাম এক নিঃশ্বাসে, তারপর ঘণ্টা দিয়ে আমার সেক্রেটারীকে ডাকলাম।

সে আসতেই বিশেষ লজ্জিত হয়ে বলি—"তুমি কিছু মনে কর না লক্ষ্মীটি, খুব খিদে পেয়েছে ত! চল তোমায় সঙ্গে করে একটু—"

হঠাৎ এই সময়ে আমার ঘুম ভেঙে যায়, এমনি এর আগে কতবার বিশেষ মূল্যবান মুহূর্তে কাছাকাছি হয়ে স্বপ্ন ভঙ্গ হয়েছে।

অনুবাদক—**শ্রীগৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্য।**

হাক্স্‌লির সাধনা

শ্রীবিশ্বনাথ লাহিড়ী

সিনিক হাক্স্‌লির প্রতিটি কথা ওদেশের বুদ্ধিমান যুবক সম্প্রদায়ের মুখে মুখে ফেরে। আমরা যেমন ফ্রয়েড এবং আজকাল মার্ক্স আউড়ে মান্ধাতা-গন্ধীদের জব্দ করবার প্রয়াস পাই, হাকসলিকেও ঠিক সেইভাবে ব্যবহার করে' ওদেশের যুবক-সম্প্রদায়। হাক্স্‌লির লেখা কলেজের ছাত্রদের সবচেয়ে প্রিয়, পরীক্ষার ফলে দেখা গেছে ওদেশে। "The God of the intelligent young men is Aldous Huxley" লিখেছেন যোয়াড (C. E. M. Joad), উদাহরণ স্বরূপ একটি ঘটনার উল্লেখ করেছেনও তিনি। যোআডের এক ছাত্র পড়াশুনো ফেলে রেডিও শুনছিল। "কেন্ট-এর দর্শন ব্রডকাস্ট করছে নাকি ওরা?" জিজ্ঞেস করেন যোআড।

'না' গম্ভীরভাবে ছাত্র উত্তর দেয়।

যোআড বলেন, "কিন্তু রেডিও রেখে পড়াশুনো করলে আপাতত ভাল হয় না কি?"

উত্তরে ছাত্রটি লম্বা বক্তৃতা আরম্ভ করল হাক্স্‌লির বই থেকে কথা ধার করে। ভালমন্দের ভেদ হাস্যকর। এটা ওর চেয়ে ভাল, সেটা তার চেয়ে খারাপ, এসব কথার মানে হয় না কোন ইত্যাদি ইত্যাদি।

সেই হাক্স্‌লির সাম্প্রতিক পরিবর্তন অদ্ভুতভাবে আকস্মিক ও অপ্রত্যাশিত নয় কি? অন্তত তাই মনে হয়েছে অধিকাংশ লোকের কাছে। যেসব বুদ্ধি-বিলাসীদের তিনি দেউলে করলেন, যাদের প্রতি তিনি করলেন বিশ্বাসঘাতকতা (?) তারা তাঁর নিজের ভাষাতেই হয়ত বলবে তাঁর সম্বন্ধে, "He betrayed his own nature, betrayed his art, betrayed life itself in order to fight against the devil's party of his earlier allegiances". কথা সর্বস্ব বুদ্ধিবিলাসীর দল তাঁকে গালাগালি করবে খুব, সান্ত্বনা পাবার চেষ্টা করবে এই ভেবে যে, এ তার এক বুদ্ধিগত চাল মাত্র, শুধু এক intellectual tour de force—মতবাদের দীর্ঘ জটিল পথে ক্ষণেকের বিশ্রাম; কিংবা হয়ত এ আকস্মিক পরিবর্তন তাঁর ইণ্টেলেকচুয়াল ইনস্যানিটির সূচক, প্রজ্ঞামূলক শক্তৈষণার অচরিতার্থতায় যার সূত্রপাত।

কিন্তু সত্যিই কি হাক্স্‌লির চিন্তাধারার সাম্প্রতিক পরিবর্তন একেবারেই অপ্রত্যাশিত ও অর্থহীন?· তাঁর মননশীলতার আধুনিকতম রূপ কি পরগাছার শূন্যে ঝোলান মূল, না তার শিকর তাঁর চরিত্রের গভীর স্তর থেকে নিঃসারিত? তিনি কি তার পূর্ব মতবাদের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করেছেন, না তাঁর নবতম রূপ তাঁর পূর্ব ব্যক্তিসত্তারই স্বাভাবিক পরিণতি? সংক্ষেপভাবে বিচার করলে দেখা যাবে, হাকসলির মননশীতার বর্তমান রূপ তাঁর পূর্ব মানসেরই স্বাভাবিক অভিব্যক্তি। যে সম্ভাবনার বীজ তাঁর মানসে সুপ্ত ছিল, তাই ফলে ফুলে প্রকাণ্ড মহীরূহে পরিণত হয়েছে আজ।

যতই আশ্চর্য শুনাক, কথাটা খাঁটি। হাক্স্‌লির সিনিসিজমের অত্যুগ্রতাই তার গলদ ধরিয়ে দেয়। আসলে অত্যুগ্র সিনিসিজম বা স্কেপ্টিসিজম বিশ্বাসপ্রবণতারই নামান্তর। যে বিশ্বাসের মূলে রয়েছে আমার অচেতনার নিগূঢ় গুহায়, যাকে আমি গ্রহণ করতে চাই মনে প্রাণে, কিন্তু প্রতিপক্ষের সমক্ষে যাকে রাখতে চাই অপ্রকাশিত, যে মত সর্বসমক্ষে সুপ্রতিষ্ঠ করবার মত নাই শক্তি সাহস, যার জন্য বোধ করি লজ্জাও, তাকেই অন্যের কাছ থেকে এবং সঙ্গে সঙ্গে নিজের কাছ থেকেও ঢাকবার জন্য হয়ে উঠি সিনিক। সিনিসিজম বুদ্ধি বিলাসীদের খুবই একটি সুবিধাজনক 'পোজ'। নিজের মত ও সঙ্গে সঙ্গে অপর সকলের বিশ্বাস বাঙ্গের ঝড়ে উড়িয়ে দেওয়া এবং নির্দিষ্টভাবে কোন মত গ্রহণ না করার ভাণ করা বুদ্ধি-অভিমানীদের পক্ষে খুবই একটা আরামপ্রদ অবস্থার সৃষ্টি করে। এতে করে শক্তিশালী প্রতিপক্ষের আক্রমণ থেকে নিজেকে মুক্ত রাখা যায় এবং নিজের দুর্বল মনের অবচেতন ধিক্কার বোধের উপর প্রতিহিংসা নেওয়া যায় সুন্দর। হাক্স্‌লির 'সিনিসিজম' তাঁর অধ্যাত্ম জীবন দর্শনে বিশ্বাসের নামান্তর বলে মনে করলে ভুল হয় না। তাঁর আক্রমণাত্মক ভাব আত্মরক্ষারই তাগিদে। হাকসলির চিত্ত অত্যন্ত বুদ্ধি অভিমানী। তাঁর বৌদ্ধিক উৎকর্ষ সম্পর্কে অতিরিক্ত সচেতন তিনি। তাঁর স্পর্শালু চিত্ত সদাই ভয়ে ভয়ে থাকে, কখন তাঁর বুদ্ধি-উৎকর্ষ প্রতিপক্ষের আক্রমণে বিপর্যস্ত হয়। স্পর্শকাতর বুদ্ধি-অভিমানী মনের ভয়-প্রবণতা (Fear Complex) থেকেই তাঁর উগ্র সিনিসিজমের জন্ম।

স্বাস্থ্যহীনতার জন্য বিজ্ঞান চর্চার অসামর্থ্য হাকসলির জীবনে একটি স্মরণীয় ঘটনা বলে মনে করি। ছোটপনা (ইনফেরিওরিটি কমপ্লেক্স) দূর করবার জন্য হাকসলিকে গ্রহণ করতে হয় সাহিত্য-সাধনা। বিজ্ঞানের দিকে না যাওয়ার জন্য যে ক্ষোভ, তা হাক্স্‌লি অনেকটা মিটিয়ে নেন, তাঁর উপন্যাসে প্রাবন্ধিকতার আমদানী করে। খাঁটি গল্পমূলক বা উপলব্ধিমূলক সাহিত্য বৈজ্ঞানিকদের ও অন্যান্য বুদ্ধিবিলাসীদের যে কতকটা করুণার পাত্র, হাকসলির তা জানা ছিল ভালভাবেই। এজন্য তার সাহিত্যে বিজ্ঞান দর্শনমূলক নানা আলোচনা আমদানী করে তাকে গুরুত্বপূর্ণ করে তুলবার চেষ্টা করেন তিনি। এদিকে শিল্পী বা সাহিত্যিক হিসাবে (যাঁদের 'বিশেষত্ব' অনেক বিজ্ঞানী ও বৈজ্ঞানিক ভাবাপন্ন ব্যক্তি কৃপার চক্ষে দেখে থাকেন) নিজ সম্মান সুদৃঢ় করবার জন্য তিনি প্রথম হতেই বিজ্ঞানের বিরুদ্ধে অস্ত্র চালনা শিক্ষা করেন এবং এই উদ্দেশ্যেই নানা অধ্যাত্ম-দর্শনের সঙ্গে পরিচিত হন প্রথম থেকেই। বিজ্ঞানের ত্রুটিগুলির সঙ্গে হাকসলি গোড়া থেকেই ছিলেন সুপরিচিত। 'এণ্ডস অ্যাণ্ড মিন্‌স্'-এ বিজ্ঞানের ও বিজ্ঞানমূলক 'মেটেরিয়ালিজম'-এর (যাকে তিনি বিজ্ঞানের স্বাভাবিক পরিণতি বলে মনে করেন) উপর তাঁর প্রচণ্ড আক্রমণ সম্পূর্ণ স্বাভাবিক ও প্রত্যাশিত। বিজ্ঞানকে এভাবে উড়িয়ে দেবার পর অধ্যাত্মদর্শন ও আত্মবাদ গ্রহণ না করে উপায় থাকে না। হাকসলি তাই গ্রহণ করেছেন নিজ স্বভাবেরই তাগিদে। তিনি যে অধ্যাত্মবাদের সমর্থন করেছেন, তা সম্পূর্ণ তাঁর চরিত্র-সংগত। তাঁর সমর্থিত মত তাঁর নিজেরই মতের Rationalisation একথা হাকসলি অকুণ্ঠ ইঙ্গিতে বলতে চেয়েছেন।

হাকসলি Cerebrotonic (য়ুংএর ভাষায় Introvert) জাতীয় লোক। অর্থাৎ তাঁর ভেতর ভাবানুভূতির অবকাশ কম। তাঁর ব্যক্তিসত্তায় জ্ঞানএর প্রাধান্যই বেশী। তিনি নিজেও তাঁর 'Asceticism of mind' নিয়ে দুঃখ (অর্থাৎ প্রকারান্তরে গর্ববোধ) করেছেন। এ জাতীয় লোক সাধনক্ষেত্রে যে শংকরাচার্যের ভাবশক্তিহীন তীব্র জ্ঞানমূলক অদ্বৈতবাদ গ্রহণ করবেন, তাতে আর আশ্চর্য কি? যে অনাসক্তির প্রশংসায় তাঁকে পঞ্চমুখ দেখা গেছে তা' Viscerotonic বা ভাবাকুল লোকের পক্ষে একেবারেই অসম্ভব। অনাসক্তি তাঁর নিজের চরিত্রের সঙ্গে খাপ খায় ভাল। খাঁটি Introvert শিল্পীর মুখে অনাসক্তির প্রশস্তি অস্বাভাবিক নয় কিছু। যোগ-

সাধনার প্রতি তাঁর আকর্ষণও স্বাভাবিক। উচ্চস্তরের 'ইণ্টেলেকচুয়াল' গভীর চেতনাময় জীবনযাপনের উপযুক্ত প্রাণিক ও আত্মিক শক্তির অভাব সম্ভবত তিনি বোধ করেছেন। যে জীবনবেদ তিনি সম্প্রতি প্রচার করেছেন তা শুধু একটি 'ইণ্টেলেকচুয়াল অ্যাটিচুড'-এ পর্যবসিত করবার মত নয়—তাকে জীবনে সত্য করে তোলাই আসল কথা এবং তা করতে হলে রীতিমত সাধনার দরকার। শুধু বুদ্ধি কণ্ডূয়নে তা হয় না। এসব কথা বুঝতে পেরেছেন হাকসলি—সে জন্যই তাঁর যোগসাধনার প্রতি এতটা টান দেখা যাচ্ছে। যোগসাধনায় প্রাণিক ও আত্মিক শক্তি বাড়ানোর প্রচেষ্টা তাঁর মত 'ইণ্টেলেকচুয়াল'-এর পক্ষে নিতান্ত স্বাভাবিক। 'ইণ্টেলেকচুয়াল' জীবনযাপনে প্রাণিক শক্তির খর্বতা সর্বজনবিদিত এবং যাঁদের ভেতর ভাবাকুলতার প্রাধান্য কম, কিংবা যাঁরা ভাবাকুলতা চেপে রাখবার চেষ্টা করেন, তাঁদের পক্ষে এটা আরও সত্য। হাকসলি ঠিক এ ধরণের লোক। তিনি যে রকম উগ্র রকমের 'ইণ্টেলেকচুয়াল' তাতে তাঁর পক্ষে প্রাণিক ও আত্মিক শক্তির অভাব বোধ ও তার জন্য যোগ সাধনার মত কোন সাধনার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করা মোটেই আশ্চর্য নয়। এ ব্যাপারে বার্টরাণ্ড রাসেল কিন্তু অন্য রকম পথ নির্দেশ করেছেন। রাসেল সম্বন্ধে আগামী প্রবন্ধে তা দেখবার চেষ্টা করব।

হাকসলির যোগসাধনা ও মিস্টিকদের প্রতি অনুরক্তির আর একটি সংগত ব্যাখ্যা হতে পারে বলে মনে করি। সকলেই জানেন শিল্পীদের, যাঁরা ধ্যানজীবন যাপন করেন তাঁদের এক সমস্যা ধ্যান ও কর্মের সমন্বয় সাধন। শিল্পীচেতনা হয়ে ওঠে অন্তর্মুখী, আত্মকেন্দ্রিক, অসামাজিক। অথচ পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ মিস্টিক যাঁরা তাঁদের জীবনে ধ্যান ও কর্মের সমন্বয় কত সুন্দর ও সার্থক। তাঁদের ধ্যানে ও কর্মে বিরোধ অস্পষ্ট। ধ্যানে যে সুন্দরের দেখা তাঁরা পান, যে পূর্ণের আদর্শ তাঁদের কল্পনায় ফুটে ওঠে, কথায় ও কাজে তাকেই তাঁরা ফুটিয়ে তোলেন ছন্দরূপে। তাঁদের ব্যক্তিক ও সামাজিক জীবনে তাঁদেরই ধ্যান-ঐশ্বর্য মূর্তি পায়। ধ্যানের আলোকে তাঁরা শুধু নিজ জীবনই রচনা করেন না সৌন্দর্যে সুষমায়—সামাজিক জীবন সুসমঞ্জস করে গড়ে তুলবার প্রচেষ্টায়ই তাঁদের জীবনের শক্তি হয় ব্যয়িত। শিল্পী হাকসলির, Introvert, আত্মকেন্দ্রিক হাকসলির এ সমন্বয় পরম আকাঙ্ক্ষিত; যোগ ও মিস্টিসিজমে হাক্সলির অনুরক্তি Introversion থেকে Extroversion এ বা আত্মকেন্দ্রিকতা থেকে সামাজিকতায় আসবার আকাঙ্ক্ষাসূচক। ধ্যানজীবনের কূপমণ্ডূকতা থেকে, আত্মরতির অসহনীয়তা থেকে মুক্তি পাবার পথ খুঁজে পেয়েছেন তিনি যোগে ও মিস্টিক সাধকদের সাধন-পদ্ধতিতে।

হাক্সলি সাধনক্ষেত্রে Recollection-এর উপর জোর দিয়েছেন। এ ব্যাপারে তাঁর শিল্পীমনের প্রভাব পরিস্ফুট। শিল্পী হিসাবে স্মৃতিবিলাস বা ধ্যানে অভ্যাস ত রয়েছেই তাঁর। সাধনমার্গে উচ্চ হতে উচ্চতর স্তরে আরোহনকালে এই ধ্যানই ক্রমে ক্রমে বস্তুনিরপেক্ষ হয়ে তীব্র ও বিশুদ্ধ হয়ে ওঠে। হাক্সলির আধ্যাত্মিকতার সঙ্গে তাঁর বিশুদ্ধ শিল্পী মানসের যোগ রয়েছে। তাঁর সংগীতানুরক্তি ও সংগীত উপভোগের ক্ষমতা তাঁর সাহিত্য-সাধনার মতই উপলব্ধি ঐশ্বর্যের পরিচায়ক।

বাইরে থেকে দেখে মনে হয়, হাক্সলির দৃষ্টিভঙ্গীর পরিবর্তন, তাঁর নবতম জীবন-বেদ শুধু তাঁর বুদ্ধি-বিলাসেরই এক নব রূপ। বাইরে থেকে হাক্সলির জটিল মনের সমীক্ষণের বিপদ সম্পর্কে অবহিত থাকলে এ মতের অযৌক্তিকতা স্পষ্ট হবে। হাক্সলির ধীশক্তি অসীম—তাঁর মনন-কল্পনার গভীরতা দুরবগাহ। তাঁর মনের জটিলতা যেমন সীমাহীন, তাঁর আত্মিক শক্তির প্রাখর্যও তেমনই দুর্বিগম্য। নানা বিপরীত ধর্মী মত ও উপলব্ধির সমবায়ে হাক্সলি-মানস অতি জটিল আকার ধারণ করেছে। তাঁর মনের গভীরে বাসা বেঁধে আছে অনেক স্ফুট অস্ফুট ভাব ও উপলব্ধি, পরস্পরবিরোধী নানা চিন্তা কল্পনা। সাধারণ মাপকাঠিতে এ মনের বিচারে ভুলের সম্ভাবনাই বেশী। এটা খুবই সম্ভবপর মনে হয় যে, হাক্সলি সত্যের নিগূঢ়তম রূপ উপলব্ধি করেছেন দৃষ্টি-সীমার ভেতর। সত্যের তীব্র আলোর সামনে তাঁর দৃষ্টির কুয়াসা লুপ্ত হয়েছে নিঃশেষে, তাঁর দৃষ্টি হয়ে উঠেছে স্বচ্ছ, সত্যের অন্তর্ভেদী। তাঁর চেতনার গভীরতম স্তরের উদ্বোধন হয়ত হয়েছে আজ, নূতনভাবে তিনি দেখেছেন তাঁর চেতনার মর্মকোষে ঢাকা পুরাতন সত্যকে। সত্যের গভীরতম উপলব্ধিতেই তাঁর সমস্ত দ্বিধা, সন্দেহ, সমস্ত 'সিনিসিজম' স্কেপ্টিসিজম বিলুপ্ত হয়েছে এবং সেখানে দেখা দিয়েছে সরল, দ্বিধাকুণ্ঠাহীন দৃপ্ত ভাষণভঙ্গী। 'something far fore deeply interfused' আজ আর তাঁর বাক্যের বিষয় নয়, অকুণ্ঠ সত্যদৃষ্টির সামনে আজ তার রহস্য ধরা দিয়েছে। তাঁর জীবনে, অসংখ্য মতবাদের ঘূর্ণির মাঝখানে যে স্থির বিন্দুটি আধো আলো আধো অন্ধকারের মধ্যে বাসা বেঁধেছিল, প্রজ্ঞার আলোকে তাই উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছে আজ।

ট্রামে-বাসে

সিমলা-সম্মেলনের ভবিষ্যৎ আমাদের কাছে ক্রমেই ঘোরালো হইয়া উঠিতেছে। নির্ভেজাল মুসলমান অর্থাৎ "কুইস্‌লিং"-ইতর মুসলমানদের স্বার্থহানি হয় এমন কোন প্রস্তাবে কায়েদে আজম সম্মতি দিবেন না বলিয়া বিবৃতি প্রকাশিত হইয়াছে। এক্ষেত্রে গোঁসা করিয়া সিমলা ছাড়িয়া আসাই তাঁহার কর্তব্য। অথচ সে সম্বন্ধে তাঁহার কোনই উৎসাহ দেখা যাইতেছে না। পরিস্থিতিটি আমাদের কাছে তাই বড়ই বিভ্রান্তকর হইয়া উঠিয়াছে এবং সেই জন্যই বিশু খুড়োর শরণ লইতে



হইল। তিনি বলিলেন—"বড়লাটের শাসন-পরিষদের আসন নিয়ে আর জিন্না সাহেবের মাথা ব্যথা নাই। যে রকেট্‌টিকে চন্দ্রলোকে পাঠাবার ব্যবস্থা হয়েছে সেই রকেট খাঁটি মুসলমানের আসন ক'টি হবে তারই একটা পাকাপাকি ব্যবস্থার জন্য তিনি এখনও সিমলা অবস্থান করছেন"। বুঝিলাম জিন্না সাহেবের আব্দার এখন পৃথিবীর সীমা ছাড়িয়া চন্দ্রলোক পর্যন্ত ঠেলিয়া উঠিয়াছে!

* * * *

বাঙলার গভর্নর সম্প্রতি বাঙলার ভাঁড়ার সম্বন্ধে একটি বিবৃতি দিয়াছেন। প্রায় সব-কিছুই ভাঁড়ারে "বাড়ন্ত" এই সংবাদ ছাড়া অন্য কোন নূতন কথা তিনি আর শুনাইতে পারেন নাই। যাহা হউক বাঙলার পরিবারের কল্যাণে তিনি পাকা গৃহিণীর মত অচিরেই সব গোছগাছ করিয়া নিতে পারিবেন বলিয়া আমরা আশা করিতেছি। ৯৩টি চাবির গোছা যখন তিনি আঁচলে তুলিয়া নিয়াছেন, তখন—এ সংসারের ভাল-মন্দের জন্য লোকে একমাত্র তাঁহাকেই দায়ী করিবে। আশা করি তিনি একথা স্মরণ রাখিবেন।

* * * *

"বৃষ্টি থেমে গেছে"—ইহাই সাংবাদিক-দের নিকট মহাত্মাজীর শেষ বিবৃতি। তিনি আপাতত আর কোন বিবৃতি দিতেছেন না। কারণ অবশ্য সুস্পষ্ট। ডাঃ আম্বেদকার মহাত্মাকে চৌদ্দটি প্রশ্নমালা প্রেরণ করিয়াছেন। সেই প্রশ্নের যথাযথ উত্তর দেওয়ার জন্যই হয়ত মহাত্মা



পাঠাভ্যাসে ব্যস্ত আছেন। তিনি সসম্মানে পরীক্ষা-উত্তীর্ণ হউন—এই প্রার্থনাই করিতেছি। কিন্তু পাশকরা ছাত্রের হার এইবারে যেভাবে কমিয়াছে তাহা দেখিয়া মনে হয় মহাত্মা হয়ত আম্বেদকারী পরীক্ষায় ফেল্‌ হইবেন।

* * * *

দুগ্ধ বণ্টনের ব্যবস্থা বোম্বাইতে কি ভাবে চলিতেছে—তাহা পরীক্ষা করিবার জন্য বাঙলা গভর্নমেণ্ট কয়েকজন অফিসারকে সেখানে পাঠাইয়াছেন। উদ্দেশ্য মহৎ সন্দেহ নাই। কিন্তু আমাদের সন্দেহ হইতেছে বোম্বাইর ব্যবস্থায় বাঙলার দুধ খাঁটি রাখা শক্ত হইয়া পড়িবে। এখান-কার জলবায়ুই আলাদা। মাছ সহজেই পচিয়া যায়, তেলে হঠাৎ দুর্গন্ধ হয়, আটা-চালে রাতারাতি কত কি হইয়া যায়। ভয় হইতেছে দুধও হয়ত সহজেই জমিয়া যাইবে!

* * * *

মালদহের "গম্ভীরা" গানের উপর জেলা ম্যাজিস্ট্রেট নিষেধাজ্ঞা জারী করিয়া-ছেন। গম্ভীরার মত একটি নির্দোষ লোক-সংগীতের প্রতি জেলা-কর্তার এই নিরাসক্তিতে আমরা মহাকবি সেক্ষপীয়রের সতর্কবাণী স্মরণ করিয়া শঙ্কিত হইয়া পড়িতেছি। যাহা হউক মালদহের বিখ্যাত ফজ্‌লি আমটার উপর যে এখনও কো নিষেধাজ্ঞা জারী হয় নাই ইহাই আমাদে একমাত্র সান্ত্বনা!

* * * *

কোনও একটি স্থানীয় দৈনিকে ছ সংবাদের শিরোনামা বিশুখুড়োক পড়িয়া শুনাইতেছিলাম—"টিম সমূহের শে অবস্থা"। কথাটি শুনিয়াই বিশুখুড়ে "আহা ষাট ষাট বালাই" বলিয়া চেঁচাইয় উঠিলেন। খুড়োকে অগত্যা বুঝাইতে হই যে কোন রকম আকস্মিক বিপৎপাত বা রোগাক্রান্ত হইয়া যে টিমগুলি মরণদশা উপস্থিত হইয়াছে তা নয়। লীগে তালিকায় কাহার কোথায় স্থান এই কথ বুঝাইবার জন্য উক্ত শিরোনামা ব্যবহার কর হইয়াছে। স্বস্তির নিশ্বাস ফেলিয়া বিশু খুড়ো বলিলেন—"তাই বল।"

* * * *

যুদ্ধোত্তর কালে বিলাতে অন্তত পঞ্চাশটি মেয়েদের ফুটবল টিম মাঠে খেলিতে নামিবে বলিয়া একটি সংবাদ প্রকাশিত হইয়াছে। আমাদের গড়ের মাঠে

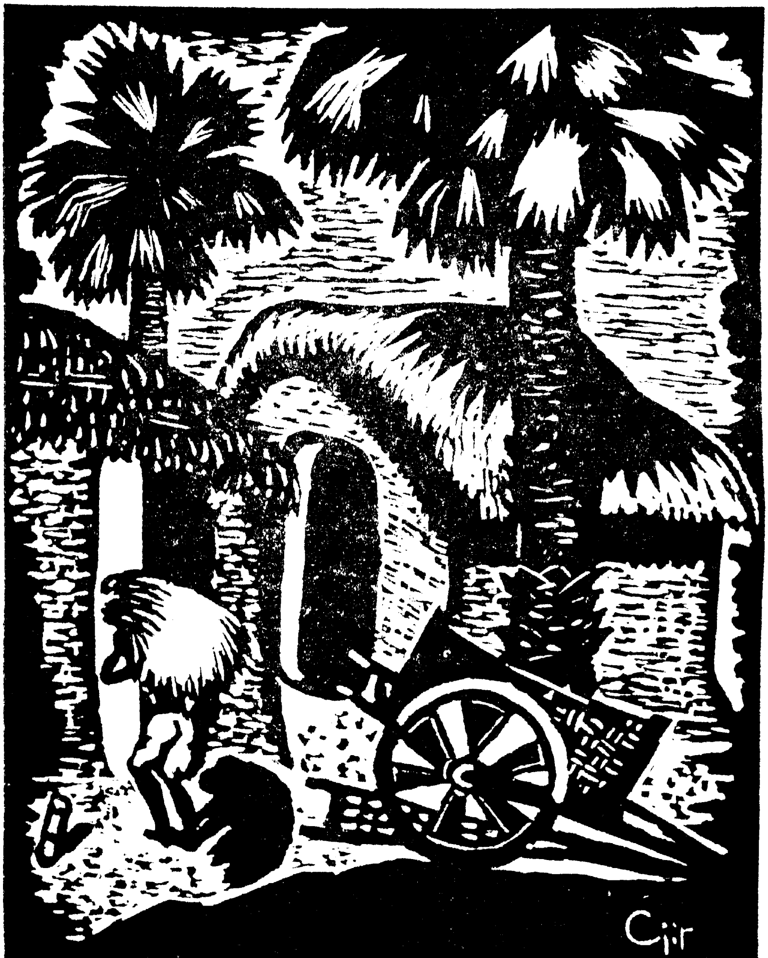


এই রকম একটি অভাবনীয় ব্যাপার সংঘটিত হইলে ব্যাপারটি কি রকম দাঁড়ায় জিজ্ঞাসা করাতে বিশুখুড়ো দুই চক্ষু মুদ্রিত করিয়া ভক্তি-আপ্লুত-কণ্ঠে গান ধরিলেন—"এমন দিন কি হবে মা তারা!"

* * * *

স্থানীয় মাঠ-কর্তৃপক্ষের সঙ্গে পরামর্শ না করিয়া পুলিশ আর কখনও খেলার মাঠের গেট বন্ধ করিবেন না বলিয়া নাকি আশ্বাস দিয়াছেন। আমরা পুলিশের এই বদান্যতায় যৎপরোনাস্তি আনন্দিত হইয়াছি এবং প্রার্থনা করিতেছি—তাহাদের টিমটি আগামী বৎসরে যেন লীগে-শীল্ডে লক্ষ্মী লাভ করেন।

কাঠখোদাই : শান্তিনিকেতন কলাভবনের সৌজন্যে



ধানের আটী

শিল্পী—শ্রীঅজিতকেশরী রায়



ফুটবল

কলিকাতা ফুটবল লীগ প্রতিযোগিতার প্রথম ডিভিসনের সকল খেলা আগামী সপ্তাহের প্রথমেই শেষ হইবে সত্য, কিন্তু আলোচ্য সপ্তাহেই এই বিভাগের চ্যাম্পিয়ানসিপ একরূপ যে নির্ধারিত হইয়া যাইবে ইহা নিঃসন্দেহে বলা চলে। কোন দল বিজয়ীর সম্মান লাভ করিবে তাহা এখনও পর্যন্ত কেহ জোর করিয়া বলিতে পারে না। ইস্টবেঙ্গল ও মোহনবাগান এই দুইটি দল এখনও পর্যন্ত সমপর্যায়ভুক্ত আছে। মোহনবাগান অথবা ইস্টবেঙ্গল অবশিষ্ট খেলা তিনটির মধ্যে কোনটিতে কিরূপ ফলাফল প্রদর্শন করিবে, কেহই পূর্ব হইতে বলিতে পারে না। কারণ, লীগের দ্বিতীয়ার্ধের খেলা আরম্ভ করিবার সময় এই দুইটি দলের মধ্যে জয়লাভের জন্য যেরূপ দৃঢ়তা পরিদৃষ্ট হইয়াছিল এখন তাহা নাই। ইহারা যে কোন খেলায় জয় অথবা পরাজয় বরণ করিতে পারে। তবে বর্তমান অবস্থায় এইটুকু বলা চলে যে, এই দুইটি দলের মধ্যে ইস্টবেঙ্গল দলের অবস্থাই একটু ভাল। এই দল মোহনবাগান অপেক্ষা এক পয়েন্টে অগ্রগামী আছে। এমন কি খেলোয়াড়গণও মোহনবাগান দলের খেলোয়াড়দের অপেক্ষা ভাল খেলিতেছেন। সেই জন্যই আশা হয় ইস্টবেঙ্গল দলই শেষ পর্যন্ত লীগ বিজয়ীর সম্মানলাভ করিবে। তবে মোহনবাগান দল লীগ চ্যাম্পিয়ান হইলে মহমেডান স্পোর্টিং পর পর লীগ চ্যাম্পিয়ান হইয়া ভারতীয় দলের মধ্যে যে একমাত্র দল বলিয়া খ্যাতি অর্জন করিয়াছেন তাহা আরও একটি দলের পক্ষে সম্ভব হইল বলিয়া সকলের বলিবার সুযোগ হইবে। এই গৌরব অর্জনের জন্য মোহনবাগান ক্লাবের খেলোয়াড়গণ যদি এখনও দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হন, হয়তো বা তাঁহারা সফলকাম হইতে পারেন। দেখা যাক, শেষ ফলাফল কি হয়।

লীগ প্রতিযোগিতা শেষ না হইতেই আই এফ এ শীল্ড প্রতিযোগিতার খেলা আরম্ভ হইয়াছে। বাহিরের কয়েকটি দল এই প্রতিযোগিতায় যোগদান করিবে বলিয়া তালিকায় দেখা গেল। তবে ইঁহারা যতক্ষণ না আসিতেছেন, ততক্ষণ বিশ্বাস নাই। বাইটন হকি প্রতিযোগিতার সময় বাহিরের দলসমূহ সম্বন্ধে যে তিক্ত অভিজ্ঞতা হইয়াছে তাহাতেই এইরূপ আশংকা করিবার কারণ হইয়াছে। যদি এই সকল দল শেষ পর্যন্ত আসে খেলা বেশ দর্শনযোগ্য হইবে; আর যদি না আসে পুনরায় হকি প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠানের ন্যায় হতাশ হইতে হইবে। সেই জন্য আমাদের মনে হয়, আই এফ এর পরিচালকদের উচিত এখন হইতেই এই দিকে বিশেষভাবে দৃষ্টি দেওয়া। এমন কি করে এই সকল দল আসিতেছে তাহা সাধারণ ক্রীড়ামোদীর মধ্যে প্রচার করা। যদি কোন দলের আসিবার পথে বাধা থাকে তবে তাহাও প্রকাশ করা।

সন্তরণ

বেঙ্গল এমেচার সুইমিং এসোসিয়েশনের এই বৎসরের কর্মকর্তাদের তালিকা দেখিয়া আমরা সন্তুষ্ট হইয়াছি। আশা হইতেছে বাঙলার সন্তরণ পরিচালনায় গত দুই বৎসর এসোসিয়েশন যেরূপ শৈথিল্য প্রকাশ করিয়াছে তাহার আর পুনরাবৃত্তি হইবে না। শোনা যাইতেছে, এই নবগঠিত এসোসিয়েশনের কর্মকর্তাগণ শীঘ্রই নাকি বিভিন্ন সন্তরণ প্রতিযোগিতা ও ওয়াটারপোলো খেলার তালিকা প্রকাশ করিবেন। এই সকল বিষয় পরিচালনা করিবার জন্য বিভিন্ন সাব কমিটি গঠিত হইয়াছে। নবগঠিত এসোসিয়েশনের পরিচালকগণ নব উৎসাহে বিভিন্ন কার্যকরী ব্যবস্থার মধ্য দিয়া বাঙলার সন্তরণ স্ট্যান্ডার্ড উন্নততর করিয়া তুলুন ইহাই আমদের একমাত্র কামনা।



শ্রীমান সুনীলকুমার দাস সুন্দর স্বাস্থ্যের জন্য কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের দেবেন্দ্রনাথ হেমলতা সুবর্ণ পদক লাভ করিয়াছে।

এই নবগঠিত কর্ম পরিষদের মধ্যে বিভিন্ন জেলার কোন প্রতিনিধির নাম না দেখিয়া আমরা একটু আশ্চর্য হইয়াছি। হয়তো বা ভুলক্রমে ইহা প্রকাশিত হয় নাই। শীঘ্র এই সকল প্রতিনিধিদের নাম কর্মপরিষদের অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে দেখিলে সন্তুষ্ট হইব।

ক্রিকেট

বাঙলার ক্রিকেট পরিচালনার গোলমালের অবসান হইবার মত অবস্থা হইয়াছে দেখিয়া আমরা বিশেষ আনন্দিত হইয়াছি। কিরূপে এই অবস্থা দেখা দিল অনেকেরই জানিতে ইচ্ছা হয়। আমরা সব কিছু প্রকাশ করিতে না পারিলেও কিছুটা যে পারি সে বিষয় কোন সন্দেহ নাই। তবে উহা প্রকাশ হইতে বিরত হইতেছি এইজন্য যে হয় তো ইহাতে "হিতে বিপরীত" হইতে পারে। এই গণ্ডগোলের যত শীঘ্র অবসান হয় ততই মঙ্গল।

এম সি সির ভারত ভ্রমণ

এম, সি, সি ক্রিকেট দল ভারত ভ্রমণ করিবে—ইহাই ছিল সকলের ধারণা। ভারতীয় ক্রিকেট কণ্ট্রোল বোর্ড যেরূপ প্রচার করিয়াছিল তাহাতে এইরূপ আশা সাধারণ ক্রীড়ামোদিগণের প্রাণে না জাগিলেই অন্যায় হইত। তবে দুঃখ হয় যে, এই ভ্রমণের বিরুদ্ধে ইংল্যাণ্ডে যে একটি বিরুদ্ধ দল দেখা দিয়াছিল তাহারই শেষ পর্যন্ত জয় হইবে। ভারতীয় ক্রিকেট কণ্ট্রোল বোর্ডের সম্পাদক আজ প্রচার করিতেছেন বোধ হয় এই ভ্রমণ সম্ভব হইবে না। এইরূপ সন্দেহের কারণ পূর্বে যে ছিল না তাহা নহে, তাহা সত্ত্বেও তিনি কিরূপে ভ্রমণের তালিকা পর্যন্ত প্রকাশ করিলেন? বর্তমানে যদি ভ্রমণ বন্ধ হইয়া যায়, সকলেই উক্ত সম্পাদককে দোষী করিবে। নিখিল ভারত ক্রিকেটের পরিচালনা কমিটির সম্পাদক হইয়া এইরূপ ভাবে যে ব্যবস্থার স্থিরতা নাই, তাহা প্রচার করা অন্যায় হইয়াছে। মিঃ সি, পি, জনস্টনের নিকট হইতে কোন কিছু না শুনিয়া এই ভাবে হঠাৎ প্রচার করিয়া নির্বুদ্ধিতার পরিচয় দিয়াছেন। ভবিষ্যতে এইরূপ না করিলেই আমরা সুখী হইব।

সিংহল ভ্রমণ

আগামী বৎসরে সিংহলে এক ভারতীয় ক্রিকেট দল প্রেরণ করা হইবে বলিয়া ভারতীয় ক্রিকেট কণ্ট্রোল বোর্ডের সম্পাদক প্রচার করিয়াছেন। এই প্রচার ব্যবস্থা পাকাপাকি ভাবে আগামী কণ্ট্রোল বোর্ডের যে সভা কলিকাতায় হইবে তাহাতেই গৃহীত হইবে। এই ভ্রমণের জন্য যে সকল ভারতীয় খেলোয়াড়কে আমন্ত্রণ করা হইয়াছে বলিয়া জানান হইয়াছে, তাহাতে বিশেষ করিয়া লক্ষ্য করিবার একটি বিষয় আছে। এই আমন্ত্রিতদের মধ্যে বোম্বাই অথবা বাঙলার কোন খেলোয়াড়ের নাম নাই। মাদ্রাজ হইতে কয়েকজনের নাম দেওয়া হইয়াছে যাঁহাদের ক্রীড়া-কৌশল সম্পর্কে অনেকেই কোনদিন কিছু শুনে নাই। এইরূপ খেলোয়াড় নির্বাচনে পক্ষপাতিত্ব করিবার কি কারণ থাকিতে পারে জানিতে ইচ্ছা হয়। বোম্বাই ও বাঙলাদেশে কি নিখিল ভারত দলে স্থান পাইবার মত কোন ক্রিকেট খেলোয়াড় নাই?

বঙ্গলার কথা

শ্রীহেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ

শ্রীযুক্ত রাজাগোপালাচারী আবিষ্কার করিয়া ঘোষণা করিয়াছেন—"ভারতের স্বাধীনতার পথে বাঙ্গলা ও পাঞ্জাব দুইটি বাধা। দেশের দুই প্রান্তে অবস্থিত এই প্রদেশদ্বয়ই ভারতের পরাধীনতার জন্য দায়ী। যদি বাঙলা ও পাঞ্জাব সম্প্রদায়িকতা বর্জন করিতে পারে, তবে তাহার পরদিনই ভারতবর্ষ স্বাধীন হইবে।"

তিনি যে মনে করেন নাই বাঙলার বুদ্ধিবল ও পাঞ্জাবের বাহুবল পরস্পরের সহিত সম্মিলিত হইলে ভারতবর্ষে স্বাধীনতার জয়যাত্রা সফল হইতে আর বিলম্ব হইবে না, তাহা তাঁহার উক্তি পাঠ করিলে বুঝিতে বিলম্ব হয় না। অবশ্য আমরা জানি—১৮৯৪ খৃষ্টাব্দের ২৭শে আগষ্ট বোম্বাই নগরের 'ইন্দু প্রকাশ' পত্রে অরবিন্দ যাহা লিখিয়াছিলেন ("What Bengal thinks to-morrow, India will be thinking to-morrow week.") তাহারই প্রতিধ্বনি করিয়া গোপালকৃষ্ণ গোখলে কয় বৎসর পরে বলিয়াছিলেন—আজ বাঙ্গলা যাহা মনে করে—আগামী-কল্য সমগ্র ভারত তাহাই মনে করিবে। অর্থাৎ ভাব সম্বন্ধে বাঙলাই ভারতবর্ষে অগ্রণী। আর পাঞ্জাবীদিগের বাহুবলের কথা সর্বজন বিদিত। কিন্তু মনে হয়, সেই উভয়বিধ নেতৃত্বের আদর করিবার যোগ্যতাও শ্রীযুক্ত রাজাগোপালাচারী অনুশীলন করেন নাই।

তিনি কিরূপ মনোভাবের অনুশীলন করিয়াছেন, তাহার পরিচয় আমরা বহু ব্যাপারে পাইয়াছি—সেদিনও সে পরিচয় পাওয়া গিয়াছে। লর্ড ওয়াভেলের যে পরিকল্পনা নানারূপে ত্রুটিপূর্ণ হইলেও গঠনকার্যে সাহায্য করিবার অভিপ্রায়ে কংগ্রেস তাহার সাফল্যে যোগ দিতে স্বীকৃত হইয়াছিলেন, সেই পরিকল্পনা কি তাহা না জানিয়াই তিনি বলিয়াছিলেন, তাহা যেমনই কেন হউক না—অর্থাৎ তাহা ভারতের মুক্তি সহায় বা বিরোধী যাহাই কেন হউক না, তাহা গ্রহণ করাই সঙ্গত।

আজ আমরা তাঁহার যে উক্তির আলোচনা করিতেছি, তাহাতে তাঁহার স্থান কাল পাত্র বিবেচনারও অভাব সূচিত হয়। লর্ড ওয়াভেলের পরিকল্পনার আলোচনাপ্রসঙ্গে যে সকল ভারতীয় সিমলায় সমবেত হইয়াছিলেন—সিমলা বঙ্গীয় সম্মিলনী ও সিমলার বাঙালী অধিবাসীরা—কালীবাড়ীর প্রতিমা মিত্র কক্ষে তাঁহাদিগকে সম্বর্ধিত করিয়াছিলেন। সিমলা কালীবাড়ী বাঙালীদিগের প্রতিষ্ঠান এবং তথায় বাঙালীরাই তাঁহাদিগকে সম্বর্ধিত করিয়াছিলেন। যেদিন এই সম্বর্ধনা হয়, সেইদিন মুসলিম লীগের অসঙ্গত দাবীতে ওয়াভেল পরিকল্পনা ব্যর্থ হইয়া গিয়াছে। সেই কারণে দেশের রাজনীতিক অবস্থা জটিল ও মলিন হইয়াছে। সেই সময়ে ও সেই অবস্থায় নিমন্ত্রিত হইয়া অতিথি শ্রীযুক্ত রাজা-গোপালচারী সম্বর্ধনাকারীদিগকে লক্ষ্য করিয়া ঐরূপ উক্তি করিয়াছেন। তাঁহার উক্তির অসারতা তাঁহার পরবর্তী কথায় আরও প্রতিপন্ন হইয়াছে—"হয়ত এককালে সাম্প্রদায়িক হাঙ্গামার অবসান হইবে এবং অবিচ্ছিন্ন বাঙলার আবির্ভাব ঘটিবে। আজ যদি বাঙলা ঐক্যবদ্ধ হয়, তবে পরদিনই ভারতবর্ষ স্বাধীন হয়।"

ভারতবর্ষের মুক্তির আগ্রহ যে বাঙলায় প্রথম আত্মপ্রকাশ করিয়াছে, তাহা কোন সত্যসন্ধ ঐতিহাসিক অস্বীকার করিতে পারিবেন না। যখন কংগ্রেস প্রতিষ্ঠিত হয়, তখন তাহার সভাপতির জন্য সমগ্র ভারত-বর্ষকে বাঙলায়ই আসিতে হইয়াছিল। কিন্তু তাহার বহুপূর্বে বাঙলার কবি, সাহিত্যিক ও ভাবুকগণ স্বাধীনতার স্বপ্ন দেখিয়া আসিয়াছিলেন। হেমচন্দ্র, রঙ্গলাল, নবীন-চন্দ্র, মনোমোহন, গোবিন্দচন্দ্র কবিতায় সেইভাব প্রচার করিয়াছিলেন এবং হিন্দু-মেলায় ও চৈত্রমেলায় তাহা জনগণের মধ্যে ছড়াইবার চেষ্টা হইয়াছিল। চৈত্রমেলার এক অধিবেশনে মনোমোহন বসুর বক্তৃতার একাংশ আমরা নিম্নে উদ্ধৃত করিতেছি:—

"স্থির চিত্তে বিবেচনা করিলে এই বোধ হয়, আজ আমরা একটি অভিনব আনন্দ-বাজারে উপস্থিত হইয়াছি। সারল্য আর নির্মৎসরতা আমাদের মূলধন, তদ্বিনিময়ে ঐক্যনাম মহাবীজ ক্রয় করিতে আসিয়াছি। সেই বীজ স্বদেশ ক্ষেত্রে রোপিত হইয়া সমুচিত যত্নবারি এবং উপযুক্ত উৎসাহ তাপপ্রাপ্ত হইলেই একটি মনোহর বৃক্ষ উৎপাদন করিবেক। এত মনোহর হইবে যে, যখন জাতির গৌরবরূপ তাহার নব পত্রাবলীর মধ্যে অতি শুভ্র সৌভাগ্য পুষ্প বিকশিত হইবে, তখন তাহার শোভা ও সৌরভে ভারতভূমি আমোদিত হইতে থাকিবে। তাহার ফলের নাম করিতে এক্ষণে সাহস হয় না; অপর দেশের লোকেরা তাহাকে 'স্বাধীনতা' নাম দিয়া তাহার অমৃতাস্বাদ ভোগ করিয়া থাকে।"

যমুনার কূলে বসিয়া যখন গোবিন্দচন্দ্র রায় গাহিয়াছিলেন—

"কত কাল পরে বল, ভারত রে,
দুঃখ-সাগর সাঁতারি' পার হবে?"

১২৮০ বঙ্গাব্দে যখন মনোমোহন গাহিয়া-ছিলেন:—

"তাঁতি কর্মকার করে হাহাকার,
সূতা জাঁতা ঠেলে অন্ন মেলা ভার;
দেশী বস্ত্র অস্ত্র বিকায় নাক আর—
হ'ল দেশের কি দুর্দিন।"

তখন ভারতবর্ষের আর কোন প্রদেশে রাজনীতিক দেশাত্মবোধের ও অর্থনীতিক জাগরণের পরিচয় পাওয়া গিয়াছিল?

স্বদেশী যুগেও বিপিনচন্দ্র পাল যে মাদ্রাজে যাইয়া দেশাত্মবোধের প্রচার করিয়া-ছিলেন, তাহা কে না জানে?

দেশের মুক্তির জন্য বাঙলা যে ত্যাগ-স্বীকার করিয়াছে, আর কোন্ প্রদেশ তাহার সন্নিহিত হইতে পারে?

সেই বাঙলাকে যাঁহারা দেশের মুক্তির অন্তরায় বলেন, তাঁহাদিগের দেশপ্রেমে সন্দেহ প্রকাশ না করিয়া উপায় কি?

রাজনীতিক ব্যাপারে শ্রীযুক্ত রাজা-গোপালচারী যে গোপালকৃষ্ণ গোখলের পদাঙ্ক গ্রহণ করিতেও পারেন না তাঁহার সভাপতিত্বে ১৯০৫ খৃষ্টাব্দে বারাণসীতে কংগ্রেসের যে অধিবেশন হয়, তাহাতে পঞ্জাবের বীরপুত্র লালা লজপত রায় বঙ্গ বিভাগ উপলক্ষে বাঙলায় যে অনাচার হয়, তাহার জন্য বাঙালীদিগকে অভিনন্দিত করিয়া বলিয়াছিলেন—তিনি সেজন্য বাঙালীদিগের দ্বারা ভারতে নবযুগ প্রবর্তন লক্ষ্য করিয়াছেন—

"I am inclined to congratulate them on the splendid opportunity to which an all-wise Providence in his dispensation, has afforded to them by heralding the dawn of a new political era for this country. I think the honour was revered for Bengal."

বাঙলায় যে সম্প্রদায়িক বিরোধ আজ দেখা দিয়াছে, তাহা কাহার সৃষ্টি এবং কি উদ্দেশ্যে তাহা সৃষ্ট তাহা—মর্লি-মিণ্টো শাসন-সংস্কার হইতে ম্যাকডোনাল্ডের ব্যবস্থা পর্যন্ত লক্ষ্য করিয়া যাঁহারা বুঝিতে

না পারেন, তাঁহাদিগকে প্রকৃত অবস্থা—রোগের নিদান বুঝাইবার চেষ্টা করা বৃথা।

বাঙলা ও পঞ্জাব ব্যতীত অন্য সকল প্রদেশের নেতারা কি চেষ্টা করিয়া মীমাংসার কোন উপায় করিতে পারিয়াছেন? যদি পারিয়া থাকেন, তবে সিমলা সম্মিলন ব্যর্থ হইল কেন? সে দোষ বাঙলার নহে। তাঁহারা মুসলমানদিগকে পুষ্ট করিবার জন্য—সংখ্যাগরিষ্ঠ সম্প্রদায়কে সংখ্যালঘিষ্ঠ করিয়াও—যে চেষ্টা করিয়াছেন, তাহাও কি বিফল হয় নাই?

শ্রীযুক্ত রাজাগোপালাচারী কি বাঙলাকে আরও অগ্রসর হইতে—বাঙলার হিন্দুদিগকে জাতীয়তা বর্জন করিতে বলেন? তাহাতেই বা কি হইতে পারে?

শ্রীযুক্ত রাজাগোপালাচারীর যে সকল নেতার প্রতি প্রভাব বিস্তারের ক্ষমতা আছে, তিনি যদি মনে করেন—বাঙলা ও পাঞ্জাবকে বাদ দিয়া ভারতবর্ষ স্বাধীন হইতে পারে, তবে বাঙলা —ত্যাগী বাঙলা তাঁহাকে সেই চেষ্টাই করিতে বলিতে পারে। সে ক্ষেত্রে বাঙলা তাহার অধিকার মাত্র চাহিবে—বাঙলা বলিলে বর্তমান শাসনব্যবস্থাসৃষ্ট বাঙলা না বুঝাইয়া যে সকল স্থানে বাঙলা ভাষাভাষীর প্রাধান্য সেই সকল স্থানকে বাঙলাভুক্ত বলিতে হইবে। সাঁওতাল পরগণা, মানভূম, সিংহভূম, পূর্ণিয়া প্রভৃতি স্থান বাঙলাকে ফিরাইয়া দিলে বাঙলার আর বর্তমান অবস্থা থাকিবে না। তখন বাঙলা অনায়াসে আয়র্লণ্ডের "আয়ারের" মত থাকিতে দ্বিধানুভব নাও করিতে পারে।

শ্রীযুক্ত রাজাগোপালাচারী বাঙলার নেতৃগণের তুলনায় রাজনীতিতে বালকমাত্র। তিনি বাঙলার প্রতি কিরূপ মনোভাবসম্পন্ন তাহার পরিচয় বাঙালী গত দুর্ভিক্ষেও জানিতে পারিয়াছে। সেই মানবসৃষ্ট দুর্ভিক্ষের জন্য সাম্প্রদায়িকতাদুষ্ট সচিবসংঘ যে বহুলাংশে দায়ী তাহা দুর্ভিক্ষ কমিশনও বলিয়াছেন। সেই দুর্ভিক্ষের ফল—

(১) অনাহারে ৩৫ লক্ষ নরনারীর মৃত্যু
(২) ৫০ লক্ষ পরিবারের ভিত্তিনাশ
(৩) শতকরা ১০ জনের নিঃস্বতা
(৪) ১০ লক্ষ গৃহের সংস্কারাভাব
(৫) ১০ লক্ষ লোক নিরাশ্রয়
(৬) শতকরা ৫০জন লোক ম্যালেরিয়ায় পীড়িত—দুর্বল।
(৭) ১২ লক্ষ লোক রুগ্ন
(৮) বেশ্যাবৃত্তির বিস্তার

সেই দুর্ভিক্ষের সময়েও যাঁহারা বাঙলার সাহায্যের জন্য অঙ্গুলী উত্তোলনও করেন নাই, তাঁহাদিগের উপদেশ বাঙলা কিভাবে গ্রহণ করিবে, তাহা বলা বাহুল্য।

পেখু-ভেক

অ·কৃ·র

"দুধের সাধ ঘোলে মেটে না" বলিয়া একটা প্রবাদ প্রচলিত আছে সেই সংগে আর একটি প্রবাদও প্রচলিত থাকা উচিত ছিল, কিন্তু নাইঃ "ঘোলের সাধ দুধে মেটে না।" নাই কেন তাহার অবশ্যই কারণ আছে। দুধের দাম বেশী, ঘোলের দাম কম— প্রবাদে দুধকেই তাই ঘোলের চাইতে বেশী মর্যাদা দেওয়া হইয়াছে। "ঘোলের সাধ দুধে মেটে না" বলিলে দুধকে ঘোলের কাছে খাট করিয়া ফেলা হয়, এই অর্থ-প্রাধান্যের যুগে যাহার আর্থিক মর্যাদা বেশী তাহাকে অমন খাট করিতে এ পর্যন্ত কেহ রাজী হন নাই। এ ব্যাপারে আশা করি আমিই সর্বপ্রথমত্বের দাবী করিতে পারি।

* * * * * *

সিগারেটের সাধ বিড়িতে মেটে না তাহা সত্য; কিন্তু তাই বলিয়া বিড়ির সাধও যে সিগারেটে না-ও মিটিতে পারে একথা অস্বীকার করিব কেন? কখনও কখনও দেখা যায় বটে যে বিড়ি যে ফুঁকিতেছে সে কাহারও নিকট হইতে সিগারেট উপহার পাইলে তৎক্ষণাৎ বিড়ি ফেলিয়া দিয়া (ফেলিয়া দিবার মত অতটা মনের বা পকেটের জোর না থাকিলে ভবিষ্যৎ ব্যবহারের জন্য পকেটে রাখিয়া দিয়া) পরম আনন্দিত হইয়া হাসিমুখে সিগারেট ধরায়। কিন্তু এরূপ যাহারা করে, তাহারা খাঁটি বিড়ি-খোর নহে; তাহারা, আমাদের গোবর্ধন বৈরাগীর ভাষায়, "বিড়ি খায় না, চাখে।"

আমি অন্ততঃ একজন খাঁটি বিড়িখোরের সহিত অন্তরংগ হইবার সৌভাগ্য লাভ করিয়াছি। সে বিড়ির বিড়িত্বের জন্যই (অথবা বিড়ি খাইবে বলিয়াই) বিড়ি খায়, বিড়ি সস্তা বলিয়া নয়। তাহার বিড়িখোরত্ব এমন খাঁটি যে তাহাকে পাশা-পাশি সিগারেট ও বিড়ি দুই-ই 'অফার' করিলে সে সিগারেট ফেলিয়া বিড়িই খাইবে। এমন কি একবার একজায়গায় বরযাত্রী হইয়া গিয়া কন্যা-পক্ষীয় জনৈক সিগারেট-টিন হস্ত বিনীত অভ্যর্থনাকারী ভদ্রলোককে সে কহিয়াছিল "আপনাদের এখানে বিড়িটিড়ির ব্যবস্থা নেই মশাই?" শুনিয়া সেই বিনীত ভদ্রলোকটি পরম বিনীতভাবেই হাস্য করিয়াছিলেন এবং বিড়ি-টিড়ির (অর্থাৎ এক প্যাকেট বিড়ির) ব্যবস্থা করিয়া দিয়াছিলেন।

ইহাতে বরযাত্রীরা সকলেই চটিয়া লাল হইয়া 'নির্লজ্জ বিড়িখোর'কে যাহা খুশী তাহা কহিল—অবশ্য কন্যাপক্ষীয়দের অগোচরে। একজন কহিল, "তুই একটা আস্ত ইডিয়ট্।" আরেকজন কহিল, "তোর জন্যে লজ্জায় আমা-দের মাথা কাটা যাচ্ছে।" অন্য আরেকজন কহিল, "ভদ্রলোক কি ভাবলেন বল্ দেখি?" এমন কি বর পর্যন্ত কহিল, "আগে জান্‌লে তোকে কোন্......বরযাত্রী আন্‌তো, মাইরি।" অর্থাৎ তাহাদেরি একজন হইয়াও সে সিগারেটের বদলে বিড়ি চাহিয়া নিজের রুচির ও কৃষ্টির দৈন্য প্রমাণিত করিয়া যে তাহাদের সকলকে কন্যা-পক্ষীয় ভদ্রলোকটির কাছে এমন খেলো করিয়া দিবে, ইহা আগে জানা থাকিলে, তাহাকে মোটে আনাই হইত না। কিন্তু নানারূপ কটু মন্তব্য শুনিয়াও বিড়িখোর বরযাত্রীটির বদন বিন্দুমাত্রও ম্লান হইল না, সে অম্লান বদনে বিড়ি ফুঁকিতে ফুঁকিতে মৃদু মৃদু হাস্য করিতে লাগিল। ভাবটা যেন "বিড়ির যে একটা নিজস্ব মজা আছে, তোরা সিগারেটখোরেরা তার কি বুঝবি?"

* * * * * *

অন্যান্য বরযাত্রীরা সেদিন যে কারণে তাহাকে পরম অশ্রদ্ধার চোখে দেখিয়াছিল আমি ঠিক সেই কারণেই তাহাকে পরম শ্রদ্ধার চোখে দেখিয়াছিলাম। তাহার পক্ষে ওকালতী করিয়া তাহার অপমান করি নাই। শুধু মনে মনে ভাবিয়াছিলাম, "হে বীর, তোমার বেপরোয়া সৎসাহসের প্রশংসা করি। তোমার নিষ্কলুষ বিড়ি-প্রীতি এই সিগারেট আভিজাত্যের যুগে সিগারেট বিলাসীদের সভায় নিঃসংকোচে তুমি প্রকাশ করিতে পারিয়াছ; চক্ষুলজ্জা বা মান যাইবার ভয়ে গতানুগতিকভাবে তুমি বিড়ি-ভক্তি গোপন করিয়া সিগারেট ভক্তির ছল কর নাই। কে কি মনে করিবে না করিবে তোয়াক্কা না রাখিয়া নিজের মত ও পছন্দ এমন বেপরোয়া-ভাবে প্রকাশ করা কম কথা নহে। হে বীর, তোমাকে আর যে যাহাই বলুক, তুমি আমার শ্রদ্ধার অঞ্জলি গ্রহণ করো। তোমার আদর্শ আমাকে অনুপ্রাণিত করুক, বল প্রদান করুক, যেন অন্যের কাছে তাহা হাস্যকর বিবেচিত হইবে কি না হইবে সে বিষয়ে ভ্রূক্ষেপও না করিয়া অকুণ্ঠিত চিত্তে আমার মত বা পছন্দ প্রকাশ করিতে কখনও পশ্চাৎপদ না হই।"

* * * * * *

ঘোলের সাধ যদি দুধে মিটিত তাহা হইলে দুধ খাইবার মত পয়সা যাঁদের আছে এবং খরচে কার্পণ্য নাই, তাঁহারা ঘোল খাইতেন না। এরূপ লোকেরাও যে ঘোল খাইয়া (বিশুদ্ধ ভাষায় বলিতে গেলে 'পান করিয়া') থাকেন, তাহার ভূরি ভূরি প্রমাণ আমি দিতে পারি।

* * * * * *

আমার জনৈক স্বচ্ছল বন্ধু আভিজাত্য বজায় রাখিবার জন্য আসল রেশমের জামা পরিতেন, কিন্তু তাহার লোভ ছিল নকল রেশমের প্রতি। নকল রেশমের জামা তিনি প্রবল বাসনা সত্ত্বেও পরিতেন না এই ভয়ে, যে লোকে তাহা হইলে মনে করিবে ভদ্রলোকের আসল রেশম ব্যবহার করিবার মত পয়সা জোটে না বলিয়াই তিনি নকল রেশম ব্যবহার করিতেছেন। হায়রে আভিজাত্যাভিমান। হায়রে মিথ্যা লোকলজ্জা! আমাদের ধনপতি বলে এই লোকলজ্জাতেই আমরা গোল্লায় গেলাম। ইহাই আমাদের জাতির মেরুদণ্ড শিথিল করিয়া দিয়াছে। একবার যদি আমরা জাতিগতভাবে দলবদ্ধ হইয়া ঘাড় হইতে এই মহা ভূতটিকে ঝাড়িয়া ফেলিতে পারি, তাহা হইলে পরদিনই ইংরাজ তল্পী তল্পা গুটাইয়া ইংলণ্ডে পলাইবে।

অর্থাৎ দেশের দুর্দশা মোচন করিতে হইলে, কিঞ্চিৎ পূর্বে বর্ণিত বিড়িখোরের মত সংকোচ-হীন, নির্ভীক, খাঁটি লোক দরকার।

* * * * * *

আমি ট্রেনের নীচু ক্লাসে 'ট্র্যাভেল্' করি দেখিয়া কেহ কেহ মনে করেন উঁচু ক্লাসে 'ট্র্যাভেল' করিবার মত আমার ট্যাঁকের অবস্থা নহে বলিয়াই আমি দুধের (অর্থাৎ উঁচু ক্লাসে ট্র্যাভেল করার) সাধ ঘোলে (অর্থাৎ বাধ্য হইয়া নীচু ক্লাসে ট্র্যাভেল করা) মিটাই।

এইরূপ মনে করাটা অর্ধ সত্য। ট্যাঁকের অবস্থাটা এই কেহ কেহ গণ ঠিকই ধরিয়াছেন, কিন্তু এই কথাটা ধরিতে পারেন নাই যে, থার্ড ক্লাস থার্ড ক্লাস বলিয়াই আমি থার্ড ক্লাসে ট্র্যাভেল করিয়া থাকি, ট্রেনের ক্লাস চতুষ্টয়ের মধ্যে থার্ড ক্লাসই ট্যাঁকের উপর সর্বাপেক্ষা কম জুলুম করে বলিয়া নয়। আপনারা বিশ্বাস করুন বা না-ই করুন, আমার পকেটে প্রথম, দ্বিতীয় বা মধ্যবর্তী শ্রেণীর টিকেট থাকিলেও আমি থার্ড ক্লাসেই ট্র্যাভেল করিতাম।

উঁচু ক্লাসের দুধ অপেক্ষা এই নীচুতম ক্লাসের ঘোল আমার কাছে ঢের বেশী রোম্যা-ন্টিক্। উঁচু ক্লাসে যে সব সৌভাগ্যবান নাক উঁচু করিয়া ট্র্যাভেল করেন, তাহাদের ঐ উঁচু নাকের আড়ালে নীচু শ্রেণীর যাত্রীদের প্রতি যে অবচেতন অবহেলা আত্মগোপন করিয়া থাকে, তাহা আমার ধাতে সয় না বলিয়াই তাহাদের সাহচর্যে আমি অস্বস্তি বোধ করিয়া থাকি, অন্ততঃ আনন্দ যে বোধ করিনা ইহা সত্য আমার দেশের অধিকাংশ লোকই হতভাগ্য তৃতীয় শ্রেণীর যাত্রী, আমি এই অধিকাংশের মধ্য হইতে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করিয়া উঁচু ক্লাসে ঠেলিয়া দিব কোন্ লজ্জায়? যাহাদের দুঃখ দূর করিবার জন্য মন কাঁদিতেছে, কিন্তু হাতে ক্ষমতা নাই, তাহাদেরই একজন হইয়া তাহাদের সহদুঃখভোগী হইবার আনন্দ-গৌরব হইতে নিজেকে আমি বঞ্চিত করিব কেন?

তাছাড়া থার্ড ক্লাসে যে বৈচিত্র্য পাওয়া যায়, উঁচু ক্লাসে তাহা কোথায় পাইব? ট্রেনের উঁচু ক্লাসে কোন অন্ধ বা চক্ষুষ্মান ভিখারী বা ভিখারিণী গান গাহিয়া ভিক্ষা করিতে ওঠে না; নানাপ্রকারের মহৌষধ, দাঁতের মাজন ইত্যাদি কেহ বক্তৃতা করিয়া বিক্রয় (অথবা বিক্রয় করিবার জন্য বক্তৃতা) করে না; কেরাণী খেলোয়াড়গণ কেরাণী জাতির জাতীয় খেলার (অর্থাৎ তাস-খেলার) হুল্লোড়ে কাম্‌রা গরম করিয়া তোলে না...... ইত্যাদি। উঁচু ক্লাসে উঁচুরা নাক উঁচু করিয়া যথাসাধ্য বৈচিত্র্যহীনভাবে নিজেদের স্বরূপ কৃত্রিমতার খোলসে ঢাকিয়া ঢাকিয়া চলেন— তাদের সর্বদা ভয় এই বুঝি নাক নীচু হইয়া গেল।

* * * * * *

রুচিবাগীশগণ এই পর্যন্ত পড়িয়াই ক্ষান্ত হোন, আর অগ্রসর হইবেন না, কেন না এইবার যাহা বলিব তাহা তাঁহাদের অরুচিকর হইতে পারে। সেদিন এক ভদ্রলোক দুঃখ করিয়া বলিতেছিলেন, "অমুকবাবুর বড় ছেলেটি ঘরে অমন সুন্দরী সতীসাধ্বী স্ত্রী ফেলে কিনা—দেহিপদপল্লবমুদারম্ করছে গিয়ে এক ইয়েকে। দুধ ফেলে সে ছুটছে ঘোলের পেছনে। দেখে-ছেন কাণ্ডটা "

শুনিয়া, আরেক ভদ্রলোক বলিলেন—এবং ঠিকই বলিলেন—"এতে অমন অবাক্ হবার কিছুই নেই মশাই এ হচ্ছে সাধারণ মনস্তত্ত্বের কথা। বাইরের ঘোলের নেশা হচ্ছে একটা আলাদা জিনিস, যার জন্যে ঘরের দুধ ফেলে কোনও কোনও লোক ঐ বাইরের ঘোলের জন্যে পাগল হয়। ঘোলের সাধ কি আর দুধে মেটে?"

গোবর্ধন বৈরাগী মাঝে মাঝে গাহিয়া থাকেঃ

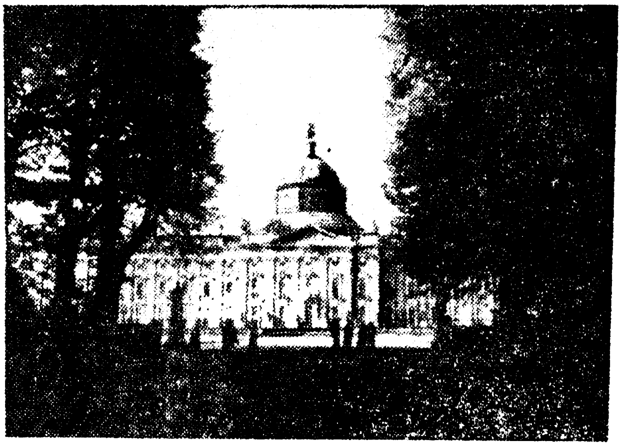
"(যারে) ঘোলের নেশায় পাগল কইরাছে—
(তার) দুধের স্বাদে সাধ মিটে না,
মন ছোটে যে ঘোলের পাছে।
(তার) কাঁচাই ভাল, বাঁধাই পথে চরণ না চলে,
(ওসে) রতন ফেলিয়া কাচ বান্ধে আঁচলে,
(ও তার) কোকিল-ডাকে মন মজে না
কাকের গানে পরাণ নাচে।"......

ইত্যাদি



পট্‌স্‌ড্যামের পরিচয়

আপনারা খবরের কাগজে পড়েছেন যে এবারকার ত্রি-নেতৃ সম্মেলনে—চার্চিল, ট্রুম্যান, স্ট্যালিন—এই তিন-প্রধান মিলিত হয়ে বৈঠক করেছেন পট্‌স্‌ড্যামে। বার্লিনের কাছাকাছি রুশ অধিকৃত এলাকায় কানন-বনে ঘেরা একাধিক প্রাসাদে সাজানো পট্‌সড্যাম দাঁড়িয়ে আছে। এইখানেই ইতিহাসপ্রসিদ্ধ বীর ফ্রেড্‌রিক দি গ্রেট—তাঁর শত্রুদের বিচ্ছিন্ন করে দেওয়ার মতলব ভ'জেছিলেন! এইখানেই তিনি তাঁর চারমহলা প্রমোদভবন গড়ে তোলেন। পট্‌স্‌ড্যামের এই প্রাসাদটি নাকি বিভিন্ন মহলে তেমনভাবেই ভাগ করে তৈরী ঠিক যেমনটি রুশ, বৃটিশ ও আমেরিকানদের আলাদা আলাদা থাকার জন্যে দরকার। অর্থাৎ এক মহলের লোক



পট্‌স্‌ড্যাম প্রাসাদ—এখানে ত্রি-শক্তি মিলিত হয়েও পৃথক থাকবেন!

আর এক মহলের লোকের সঙ্গে মুখ দেখাদেখি না করেই থাকতে পারবেন। ত্রি-শক্তি সম্মেলনের স্থান নির্বাচন উপযুক্ত হয়েছে কি বলেন?

কুওমিনটাঙের কঠোরতা

জেনারেলিসিমো চ্যাং-কাই-শেককে যে এবার বেশ একটু কড়া হাতেই চীনের শাসন ব্যাপারটা চালাতে হবে—তা সম্প্রতি কুওমিণ্টাঙ কংগ্রেসের প্রস্তাব এবং কুওমিণ্টাঙের কর্তাদের হুকুম আর নির্দেশেই বোঝা গেছে। তিনটি নতুন ব্যবস্থায় এটা আরও স্পষ্ট হয়ে উঠেছে, তাঁরা হুকুম জারী করেছেন—সমস্ত স্কুল ও সৈন্যবাহিনী থেকে সমস্ত দলগত শাখাগুলিকে এবং প্রদেশ ও জেলাগুলির 'পিপলস' কাউন্সিলের জনপ্রিয় নির্বাচন প্রথাকে বিলুপ্ত করতে হবে।

সৈন্যবাহিনীর সরবরাহ যোগানোর ব্যাপারে যেসব গলতি গাফিলতি এতদিন চলছিল, তার ওপর কড়া নজর রাখবার জন্য পাঁচজন সামরিক কর্তাকে নিয়ে পঞ্চায়েৎ গড়ে চুংকিং এর সরবরাহ বিভাগের তিনজন পদস্থ কর্মচারীকে মৃত্যুদণ্ডও দেওয়া হয়েছে।

এই সঙ্গে চীনের সমাজ ও ঘরোয়া ব্যাপারের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রীরা চীনের সংবাদ-



চ্যাং লিখছেন কড়া হুকুম!

পত্রওয়ালাদের জাতীয় স্বার্থবিরোধী কোনও কিছু ছাপতে মানা করে, কঠোর বিধিনিষেধ জারী করেছেন। 'কুওমিনটাঙের কঠোরতা' দেখে এদেশের নেতারা 'ভারতের ভদ্রতাও' কমানো দরকার বলে মনে করবেন নিশ্চয়ই?

গোয়েরিং গৃহিণীর বরাত ভাল

গোয়েরিংয়ের খবর কাগজে পেয়েছেন—তাঁর গৃহিণীর খবর পান নি তো?



ফ্র-গোয়েরিং—
ভাবছেন কি ক'রে কৃতজ্ঞতা জানাবেন!

জুন মাসের মাঝামাঝি ন্যুরেনবার্গের কাছাকাছি নিউস্টাড্রট্ বলে একটি জায়গায় এসে তিনি পৌঁছুলেন। তিনি একটি মার্সিডেজ বেঞ্জ গাড়িতে চেপে চলেছেন—আর সেই গাড়ির পেছনে আড়াইটনী এক মোটর ট্রাক চলেছে এক মাসের মত খাবারদাবার, কাপড়চোপড়, গয়নাগাটির বাক্স তোড়ংগ বয়ে নিয়ে। গোয়েরিং গিন্নির সঙ্গে রয়েছে তার সাত বছরের মেয়ে ইড্ডা, একটি আয়া, একজন জার্মান লেফ্‌টেনান্ট, আর তাঁর আর্দালী। আমেরিকান সৈন্যরা তাঁর গাড়ি থামালে—তখন জার্মান লেফটেনান্ট মিত্রপক্ষের এক মেজর জেনারেলের হুকুমনামা দেখালেন—তাতে লেখা রয়েছে "গোয়েরিং গৃহিণীকে যেন সবরকমে সাহায্য করা হয়।"

আমেরিকান সৈন্যরা নিতান্ত ভাল ছেলের মত গোয়েরিং গৃহিনী তাঁর মেয়ে এবং আয়াটিকে নিয়ে গোয়েরিংয়ের একটি বাড়িতেই রাখল—মালপত্তর সব গাড়ি থেকে নামিয়ে তুলে দিলে যথাস্থানে। আমেরিকানরা গোয়েরিং-গৃহিণীর প্রতি কর্তব্য শেষ ক'রে জার্মান লেফ্‌টেনান্ট কর্ণেলটিকে ও তাঁর আর্দালীকে যুদ্ধ-বন্দীদের খাঁচায় পুরে ফেললেন। কী অদ্ভুত সৌজন্যবোধ এই আমেরিকান সৈন্যদের!

প্রতিভার শত্রু

শ্রীকালীপদ চট্টোপাধ্যায়

পথে-ঘাটে চলিতে পরিচিত লোকে প্রশ্ন করে, 'কেমন আছ?' চিরদিনের অভ্যাসবশে ঘাড় কাত করিয়া বলি, 'ভালই আছি'। তাহার পরেই অনুতাপ হয়, মিথ্যা-কথা বলিয়াছি। কথাটিতে তিলমাত্র সত্য থাকিলেও অনুশোচনা হইত না। বাঁধাধরা প্রাত্যহিকতার বিশ্লেষণে লাগিয়া যাই, যদি তার কোন মুহূর্তে অনুপরিমাণ ভালোর সন্ধান পাওয়া যায়।

আমার মধ্যে সাহিত্যসৃষ্টির প্রতিভা ছিল। তাহারই অবলম্বনে একদিন আমার জীবনে গৌরবসম্ভাবনারও উদয় হইয়াছিল। এখন প্রতিভাটা 'বোধ হয় নাই'—একেবারে 'নাই' বলিতে বেদনাবোধ করি। কিন্তু নেশাটা আছে। মনের কথাগুলিকে কাগজের উপর আখরে সাজাইতে পারিলে বড় আনন্দ পাই। প্রতি প্রভাতের স্নিগ্ধতায় শান্তমনের আধারে অন্তরের ভাবগুলি সুসংবদ্ধ হইয়া বাহিরে প্রকাশ পাইবার জন্য মিনতি জুড়িয়া দেয়। কিন্তু ধমক মারিয়া তাহাদের চাপিয়া রাখিতে হয়: তখন যে তাড়াতাড়ি প্রাতঃকৃত্য সারিয়া, স্নান করিয়া, নাকে মুখে যাহা হোক দুটি গুঁজিয়া আমাকে অফিসে যাইতে হইবে।

নিঃশক্তি, রক্তলেশহীন ভূতগ্রস্ত-শবাকৃতি যে গৃহিণী আমাকে সকাল আটটায় খাওয়াইয়া দিবার জন্য ভোর পাঁচটা হইতে অগ্নিকুণ্ডের সামনে যন্ত্রের মতো খাটিয়া চলিয়াছে, মাসখানেক আগে তাহার সপ্তম সন্তান জন্মলাভ করিয়াছে। বিছানায় পড়িয়া প্রাণপণে হাত-পা ছুঁড়িয়া দুর্বল কণ্ঠে ছেলেটি অবিশ্রাম ট্যাঁ ট্যাঁ শব্দে চিৎকার করিতেছে, মনে হয় গলা দিয়া রক্ত উঠিবে। তাহাকে একটু ধরিব এমন উপায় নাই, আমাকে অফিস যাইতে হইবে। ছেলেটির ক্রন্দন শুনিয়া তাহার মায়ের প্রাণ কি করিতেছে, তাহা অনুমান করিবার চেষ্টা করিতেও সংকোচ হয়, অপরাধীর মত পলাইয়া যাই—স্নান করিবার অজুহাত দেখাইয়া যেন পলাইয়াই যাই। জন্মের পর কয়েক দিন ছেলেটি মায়ের দুধ পাইয়াছিল, এখন আর পায় না, দুধ শুকাইয়া গিয়াছে। বন্ধু হলধর ডাক্তার একটি ঔষধের নাম করিয়া গ্যারান্টি দিয়াই বলিয়াছিল যে, তাহা খাওয়াইতে পারিলে প্রসূতির দেহে বলাধান এবং স্তনে দুধ হইবে। সে ঔষধ এ পর্যন্ত খাওয়াইতে পারি নাই, পারিব এমন সম্ভাবনাও দেখিতেছি না। ছেলেটির জন্য এক পোয়া দুধ রোজের ব্যবস্থা আছে, সে দুধ বেলা আটটার আগে আসে না। ছেলেটিকে বেলা আটটা পর্যন্ত ঘুম পাড়াইয়া রাখিবার কোন পরিকল্পনাই ফলপ্রসূ হইতেছে না।

চার বছরের যে দ্বিতীয় পুত্রটি তাহারই জন্য ওই এক পোয়া দুধ বরাদ্দ ছিল। নানান রকম ব্যাধিতে ভুগিয়া ছেলেটি এখনো যে বাঁচিয়া আছে তাহাতে বুঝিতেছি ওর কপালে অশেষ দুর্ভোগ আছে। তাহার পুষ্টি বর্ধনের জন্য ওই দুধের ব্যবস্থা করিতে হইয়াছিল; তাহার উদরসর্বস্ব কঙ্কালদেহে কিছুমাত্র পুষ্টিলক্ষণ দেখা দিবার আগেই দুধ বন্ধ করিতে হইয়াছে, নহিলে ছোটটির জুটিবে না। মেজটি দিবাভাগে দুইবার ভাত খাইত, সন্ধ্যার পরে ওই দুধটুকু পান করিয়া নেশাগ্রস্তের মতো ঘুমাইয়া পড়িত। এখন তিনবার ভাত খাইয়া তাহার উদরাময় লাগিয়াই আছে। গেঁড়ির ঝোল ব্যবস্থা করিয়াছি, বাঁচিতে হয় তাহাতেই বাঁচিবে।

দশ বছরের বড়ছেলে খোলা বহি সামনে নিয়া সকাল-সন্ধ্যায় হাঁ করিয়া আকাশপানে চাহিয়া থাকে। খলু সংসারের অসারতা বোধ হয় ইহারই মধ্যে তাহার চোখে ধরা পড়িয়া গিয়াছে। যতক্ষণ বাড়িতে থাকি, মুহুর্মুহু গর্জনশব্দে প্রহারের বিভীষিকা দেখাইয়া তাহাকে পড়িবার নির্দেশ দান করি। প্রতিবার গর্জনে সে চমকিয়া উঠিয়া খানিকক্ষণ বিড়বিড় করিয়া পড়েই হয়তো, তাহার পর আবার হাঁ করিয়া থাকে। তাহার প্রকাণ্ড মুণ্ডসার চর্মাবৃত-অস্থি-দেহের দিকে চাহিয়া পড়িবার জন্য বলিতে ইচ্ছা হয় না। কিন্তু না পড়িলে চলিবে কেন? বাঁচিয়া থাকে যদি, কুলিগিরি ধাতে সহিবে না, কেরানিগিরি না করিলে খাইবে কি? সুতরাং তাহাকে পড়িতেই হইবে। না পড়িলে ঠ্যাঙাইব। কয়েক মাসের মাহিনা বাকি পড়ায় বিদ্যালয়ের ঠ্যাঙানি চরমে উঠিয়াছিল। মাহিনা শোধ করিয়া দিতে পারা পর্যন্ত আপাতত তাহার বিদ্যালয় গমন বন্ধ আছে। যাক, কয়দিন ব্যাচারির হাড় জুড়াক।

এই গেল জমার ঘরের তিনটি। আমার গৃহিণী আরো চারিটি সন্তানের জন্মদান করিয়াছিল, তাহারা মরিয়া খরচের ঘরে নাম লিখাইয়াছে। জ্বর, আমাশয় প্রভৃতি যে-সব রোগে তাহারা মরিয়াছে, তাহার কোনটিই মারাত্মক রোগ ছিল না। বিনা ভিজিটের বন্ধু ডাক্তার হলধরকে না ডাকিয়া তাহাদের রোগে যদি দুই টাকা ভিজিটের জলধর ডাক্তারকেও ডাকিতে পারিতাম, তাহা হইলে তাহারা মরিত না বলিয়াই আমার নিশ্চয় বিশ্বাস। কিন্তু জলধরকে ডাকিতে পারি নাই, তাহারাও বাঁচে নাই। মরিতে মরিতে বাঁচিয়া থাকার চেয়ে মরিয়া-বাঁচিয়া তাহারা ভালোই করিয়াছে।

অফিসে যতক্ষণ চাকরি করি, ততক্ষণের মধ্যে ভালোর সন্ধান করিয়া লাভ নাই, তাহা ছাড়া সে সন্ধান করিবার সময়ই বা কোথায়? চাকরিমাত্রই অনিচ্ছার কাজ। নিজের ইচ্ছায় মাটি কাটাতেও সুখ, পরের ইচ্ছায় নিদ্রাতেও দুঃখ। তবু চাকরির মাহিনা যদি পেট ভরাইয়া যাওয়ার মতনও হয়, তবু তাহাতে স্বস্তি আছে। চাকরির কাজেও প্রেরণা পাওয়া যায়। কিন্তু যে চাকরিতে খাটিয়াও মরিতেছি, পেটও ভরিতেছে না, তাহার কথা এই কেরানির দেশে বলিলেই বা কান পাতিয়া শুনিবার উৎসাহ বোধ করিবে কে?

নিত্যই অফিসের কিছু বাড়তি কাজ বাড়ি নিয়া আসি। তাহার জন্য কিছু উপরি পারিশ্রমিক পাওয়া যায়। সন্ধ্যাবেলা চারিদিকে অবকাশের হিড়িক দেখিয়া আমার লেখার নেশার ভূত বাহির হইয়া আসিবার জন্য মনের অন্ধকারায় মাথা কুটিতে থাকে। দীর্ঘশ্বাসের বিষবাষ্পে তাহাকে আচ্ছন্ন করিয়া রাখিয়া অফিসের কাজ নিয়া পড়ি। তাহাই কি নিরুপদ্রবে করিবার জো আছে? যুদ্ধের দোহাই দিয়া কেরোসিন দুর্লভ দুর্মূল্য হইয়াছে। রেড়ির তেলের প্রদীপে রাত্রির কাজ করিতে হয়। চশমার এ কাঁচে আর চলিতেছে না, আরো বেশি শক্তির কাঁচ দরকার, কিন্তু দরকার বলিলেই তো আর সেই কাঁচ পুরানো কাঁচকে সরাইয়া দিয়া আমার চশমার কাঠামোতে লাফাইয়া উঠিয়া আঁটিয়া বসিবে না। বায়ুভয়কম্পিত ক্ষীণ দীপশিখার মন্দ আলোকে আমি বিছানায় বসিয়া সামনের জলচৌকির উপর প্রায় নাক ঠেকাইয়া অফিসের কাজ করি। পাশেই জ্যেষ্ঠ নন্দনটি খোলা বহি সামনে করিয়া উদাস দৃষ্টিতে সম্মুখের অন্ধকারের দিকে চাহিয়া থাকিতে থাকিতে ঝিমাইতে শুরু করে এবং মাঝে মাঝেই আমার বিকট ধমকে আঁতকাইয়া উঠিয়া বিড়বিড় করিতে থাকে। ঘুমাইবার সময় পেটের ব্যথায় মাঝে মাঝে চমকিয়া চ্যাঁচাইয়া উঠিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে আবার চুপ করিয়া যাওয়া মেজ ছেলেটির নিত্য ব্যাপার দাঁড়াইয়া গিয়াছে। আমি ভাত খাইব সেই মধ্যরাত্রে। ততক্ষণ গৃহিণী

একটু বিশ্রাম করিতেছে। তাহার নিদ্রিত শবাকার দেহের দিকে চাহিয়া মাঝে মাঝে শিহরিয়া তাহার নাকের কাছে হাত নিয়া পরীক্ষা করি নিশ্বাস পড়িতেছে কিনা। আমায় নিশ্চিন্ত করিয়া সেই জাগিয়া যায়। তাহার কোলের মধ্যে নবজাত ছোট ছেলেটি রহিয়া রহিয়া ট্যাঁ ট্যাঁ শব্দ করিয়া উঠিতেছে।

কয়দিন হইতে সন্ধ্যারাতে কালবৈশাখীর ঝড় উঠিতেছে। আমার বাসগৃহ লোহকাষ্ঠের সংশ্রবমাত্রহীন বিশুদ্ধ কুটির। তাহার গোলপাতার ছাউনি, বাঁশের খুঁটি; দরমার বেড়া, দরজা জানালায় দরমার ঝাঁপ। কাকে আর ইঁদুরে মিলিয়া ঘরের চালায় অজস্র ছিদ্র করিয়াছে; গত দুই বছর খুঁটি পালটানো হয় নাই, এবারও হইবার কোন উপায় দেখিতেছি না। যুদ্ধের বাজারে বাঁশ-খড়-গোলপাতার অগ্নিমূল্য আমার ক্রয়সাধ্যের বহু ঊর্ধ্বে উঠিয়া গিয়াছে। ঝড় উঠিলেই তাহার দোলায় মড়মড় শব্দে ঘর যে রকম হেলিতে দুলিতে শুরু করে, আমি কবি হইলে এবং এ ঘর আমার না হইলে হয়তো তাহাতে বাত্যাচপল নদীর উপর নৌকায় বসিয়া থাকার সুখানুভব করিতে পারিতাম। জল নামিলে ঝড় পড়িয়া যায়, তাই বিস্মৃত চিত্তে বৃষ্টি কামনা করিতে থাকি। কিন্তু বৃষ্টি নামিলে আমার বিপদের অন্ত নাই; বৃষ্টির জল উঠানে পড়িবার আগেই বোধ হয় আমার ঘরের মেজেতে পড়ে। কালবৈশাখীতে ঘর যদিবা টিঁকিয়া যায়, সামনে সুদীর্ঘ বর্ষাকাল; কি করিব ভাবিয়া পাইতেছি না।

এই সুখ সমারোহে রাতের চাকুরি না করিয়া আমার উপায় নাই। সূর্যোদয় হইতে রাত্রির সার্ধদ্বিতীয় যাম অবধি নীরন্ধ্র খাটুনি খাটিয়া যে অশনের ব্যবস্থা করিতে পারিতেছি, নিতান্তই আত্মপ্রবোধের জন্য তাহাকে অর্ধাশন বলিয়া থাকি। আমার দৈহিক আলোটাও, সুতরাং সনাতন সত্যাবলম্বনে মানসিকের অনুগামী।

রাতের একটা দেড়টা পর্যন্ত বসিয়া বসিয়া চাকুরী করিতে করিতে মেরুদণ্ডে বেদনা ধরিয়া যায়। যখন আর জাগিয়া থাকা সম্ভব হয় না, তখন ঘুমাইতে হয়। তাহাতেও কি শান্তি আছে? দুঃখজীবনের নিদ্রা দুঃস্বপ্ন সমাকুল হইয়া উঠে।

সেদিন স্বপ্ন দেখিয়াছি

জীবন দেবতার জীর্ণ মন্দিরে বেদীর উপর দেবতা নাই। কোন দূর দিনের পূজার ফুলপত্র শুকাইয়া পচিয়া পূতিগন্ধ ছড়াইয়া চারিদিকে বিক্ষিপ্ত হইয়া আছে। শূন্য বেদীমূলে লুণ্ঠিত হইয়া মাথা কুটিতেছি আর ডাকিতেছি—দেবতা, ওগো দেবতা!

ডাকিয়া ডাকিয়া কণ্ঠ শুকাইয়া গিয়াছে, কোন সাড়া পাইতেছি না, আমার আর্ত আহ্বানও বিরতি মানিতেছে না।

অবশেষে অতি দূর হইতে বিষণ্ণ বিরক্ত কণ্ঠের সাড়া মিলিল—কেন আমায় ডাকিতেছ?

বলিলাম—মন্দির ছাড়িয়া কোথায় তুমি চলিয়া গিয়াছ?

উত্তর শুনিলাম—মন্দিরে তুমি পাপ পশাইয়াছ, তাই আমি ছাড়িয়া আসিয়াছি।

আর্ত বিস্মিতকণ্ঠে বলিলাম—পাপ পশাইয়াছি! কেমন করিয়া?

শুনিলাম—বিবাহ করিয়া।

প্রশ্ন করিলাম—বিবাহ কি পাপ?

উত্তর পাইলাম—দরিদ্রের পক্ষে বিবাহ পাপ। বাড়ি-করা গাড়ি-কেনার মতো বিবাহ করা ধনীর বিলাসেই পোষায়।

বলিলাম—তবে গরীব বিবাহ করে কেন?

শুনিলাম—ধনীর অনুকরণ করিতে যাইয়া গরীব অজস্র প্রকারে মৃত্যু ডাকিয়া আনিতেছে, এ মৃত্যুই তাহার মধ্যে করুণতম।

বলিলাম—হিতৈষীরা আত্মীয়েরা যে বলিয়াছিল, বিবাহ আবশ্যিক পুণ্যকর্ম।

উত্তর পাইলাম—মানুষের জয়যাত্রার পথে কুসংস্কারের কৃষ্ণধ্বজাবাহী তাহার মৃত্যু-মায়াচ্ছন্ন মহাশত্রু। ভালো বিবাহ যদি আবশ্যিক পুণ্যকর্মই হয়, নিজের প্রতিভার সঙ্গে তোমার বিবাহ তো হইয়াই গিয়াছিল, দ্বিতীয় বিবাহ করিয়া তুমি মহাপাপ করিয়াছ।

অভিমানাহত কণ্ঠে কহিলাম—তখন একথা বলিয়া দাও নাই কেন?

সহানুভূতিহীন স্বরে উত্তর আসিল—দিয়াছিলাম। আত্মীয়বন্ধু হিতৈষীগণের উদ্যোগ আর উৎসাহবাণীর কোলাহলে তখন তোমার কর্ণ বধির, কামনার মোহে তখন তোমার অন্তর আচ্ছন্ন; আমার কথা হয়তো শুনিতে পাও নাই, পাইলেও তাহা মানিবার মতো মূল্যবান মনে কর নাই।

বেদনাদীর্ণ কণ্ঠে স্বীকার করিলাম—শুনিতে পাইয়াছিলাম, ওগো দেবতা, তোমার বারণ সেদিনের কোলাহলের মাঝেও আমি মাঝে মাঝে শুনিতে পাইয়াছিলাম, কিন্তু সে বারণ মানিবার শক্তি সত্যই সেদিন মোহের রঙে রঙে আচ্ছন্ন হইয়া গিয়াছিল। এখন উপায়?

উত্তর হইল—উপায় নাই। যতদিন শ্বাস আছে পাপের ফল ভুগিতেই হইবে।

পরামর্শ চাহিলাম—শ্বাসটাকে রুদ্ধ করিয়া ফেলিব? মরিব?

দেবতার ব্যথিত কণ্ঠের উত্তর আসিল—মরিয়া তো গিয়াছ। প্রতিভাকে যে দিন কণ্ঠরোধ করিয়া হত্যা করিয়াছ, সেদিনই তুমি মরিয়াছ; প্রতিভার মৃত্যুতেই যে প্রতিভাশালীর মৃত্যু। এমন মরণই মরিয়াছ যে নিজের শ্বাসরোধ করার ক্ষমতাও আজ তোমার নাই।

দেবতার কণ্ঠ আর শুনিতে পাইলাম না। শুনিলাম আমার চতুর্দিকে এক অশরীরী ক্রন্দন মুহুর্মুহু রণিয়া রণিয়া উঠিতেছে।

ঘর্মাক্ত দেহে ঘুম ভাঙিয়া গেল। শুনিলাম, ওদিকের বিছানায় নবজাত সেই 'প্রাণসাক্ষী শিশুর ক্রন্দন' নিরুপায় মাতৃবক্ষে আঘাত হানিতেছে।

আকাশে নূতন দুঃখদিবসের রক্তরঙ-বিভীষিকা ফুটিয়ে উঠিয়াছে।

বাহিরে গিয়া প্রতিদিনের অভ্যাসবশে ভগবানের উদ্দেশে নমস্কার নিবেদন করিলাম। সঙ্গে সঙ্গে নিজের আর্তকণ্ঠ ধ্বনিয়া উঠিল—ওগো ভগবান, আত্মহত্যার ক্ষমতা নাই, এত দুর্বল হইয়া পড়িয়াছি। অবসান করো—তোমার দেওয়া এ জীবনের তুমিই অবসান করো—অবসান করো। অসমাপ্ত কামনা লইয়া মরিলে নাকি মানুষ পরজন্মে আবার মানুষ হইয়া জন্মলাভ করে। তাই যদি হয় তবে, ওগো ভগবান, এ জীবনের অভিজ্ঞতা লইয়া পরজন্মে আমায় জাতিস্মর হইয়া জন্মগ্রহণ করিতে দিয়ো।

চল চলরে নওজোয়ান

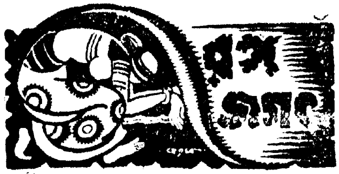
(ফিল্মিস্তান)—কাহিনী: জ্ঞান মুখোপাধ্যায়, সংলাপ: এস এম মণ্টো, গান: প্রদীপ, পরিচালনা: জ্ঞান মুখার্জি; আলোকচিত্র: এস হরদীপ, শব্দযোজনা: এস বি ওয়াচা, সুরযোজনা: গোলাম হায়দার, প্রযোজনা: শশধর মুখার্জি।

কাপুরচাঁদের পরিবেশনায় ছবিখানি গত ১৩ই জুলাই প্যারাডাইস, পূর্ণ, পূরবী ও শ্রী'তে একত্রে মুক্তিলাভ ক'রেছে।

ভারতীয় চিত্রজগতের ইতিহাসে এতো পাবলিসিটি আর কোন ছবি পায় নি, যা পেয়েছে, "চল চলরে নওজোয়ান" এবং সেই সঙ্গে এ কথাও যোগ করে দিতে হয় যে, ছবিখানি তুলতে অবিরাম ১৮ মাস সময় ও এতো অর্থব্যয়ও হয়নি বড় একটা; তার ওপরে রয়েছে নির্মাতাদের 'বন্ধন', 'ঝুলা' ও 'কিসমৎ' তোলার হাতযশ। সব মিলিয়ে 'চল চল রে' মুক্তিলাভ করার আগেই দেশময় যাকে বলে একটা Craze সৃষ্টি করতে সমর্থ হয়। ছবি তোলা আরম্ভ থেকে নানারকম ঘটনা ছবিখানির প্রচারে সহায়তা করে এসেছে, যার ফলে লোকে অনেক কিছুই আশা করে রেখেছে ছবিখানি থেকে। সে আশা কিন্তু পূরণ হয়নি। প্রযোজক শশধর মুখোপাধ্যায় সত্যিই একটা বিরাট কিছু দেবার যে চেষ্টা করেছিলেন, সে পরিচয় পাওয়া গেলেও তিনি লোকের আশাকে মেটাতে অক্ষম হয়েছেন। স্পষ্টই বোঝা যায় যে, ছবির ফলাফল সম্পর্কে নিশ্চিন্ত এরা হতে পারেন নি, আর তাই প্রতি পদেই লোককে সহজে জমিয়ে দেবার হাল্কা জিনিষ এনে তুলে ধরেছেন যার ফলে সব জগাখিচুড়ী পাকিয়ে গেছে। ছবিখানিতে আছে অনেক কিছুই, এমন জিনিসও আছে যার জন্যে অবদানকারীরা গর্বিত হতে পারেন, কিন্তু সব মিলিয়ে একটা বড় রকমের ছাপ মনেতে ধরিয়ে দিতে পারে না।

ছবির আসল নায়ক ও নায়িকা জয়পাল সিং ও তার স্ত্রী সাবিত্রী। জয়পাল স্ত্রীকে ভালবাসতেন খুবই, কিন্তু বন্ধু যমুনাদাসের সঙ্গে সাবিত্রীর অবাধ মেলামেশাকে কেন্দ্র করে এদের বিচ্ছেদ হয়ে যায়। সাবিত্রী যমুনাপ্রসাদের বাড়ীতে গিয়ে ওঠে এবং সেখানেই পনের বছর কেটে যায়। ইতিমধ্যে জয়পাল ভারত সেবাদল গড়ে দেশহিতব্রতী হিসেবে নাম কেনেন। তার কাজের সহকারিণী কন্যা সুমিত্রা। ঘটনাচক্রে সুমিত্রার সঙ্গে আলাপ হয়ে যায় যমুনাপ্রসাদের পুত্র অর্জুনের সঙ্গে; আলাপ দাঁড়ায় প্রেমে। কিন্তু জয়পাল মিলনে বাধা দিলেন, যেহেতু অর্জুন যমুনাপ্রসাদের সন্তান। পরে ঝড়বাদলের অবসানে সাবিত্রীর সতীত্ব সম্পর্কে জয়পালের মনে যে ধারণা ছিল, সে রহস্যের অবসান হয় এবং তারপরই মিলন।

ছবিখানি আরম্ভ হয়েই একটা চমক এনে দেয় কিন্তু মাঝখানে হাল্কারসের মাত্রাধিক্য ওপরের আসন থেকে ঠেলে



একেবারে নীচে নামিয়ে দেয়। শেষ অংশে আবার ওপরে ওঠার চেষ্টা হয়েছে, কিন্তু তাও তেমন সাফল্য অর্জন করতে পারেনি।

ছবিখানির মধ্যে হিন্দু-মুসলিম মিল সংক্রান্ত গান 'হর হর মহাদেও আল্লা হো আকবর' সত্যিই মনকে বেশ নাড়া দিয়ে যায়, শেষের গান আয়া তুফানও। ছবিখানির মধ্যে টুকরো টুকরো ভাবে প্রশংসা করার অনেক কিছুই আছে, কিন্তু সমষ্টিগতভাবে একে তেমন উঁচু আসনে বসাতে পারেনি। কলাকৌশলের দিক খুবই তারিফ করার মত। অভিনয়ে জগদীশ ও মতিবাঈ-ই নজরে পড়েন সবচেয়ে, অশোককুমারও খ্যাতি বজায় রেখে গিয়েছেন। নসীম সত্যিই মর্মরমূর্তি। সঙ্গীতাংশ ছবির মাধুর্য বাড়িয়ে দেবার একটা কারণ হয়েছে। 'হর হর মহাদেও' ও 'আয়া তুফান' ছাড়া কোন গানই মনে ধরে না।

বিবিধ

কে এস হিরলেকর, কেদার শর্মা, পি এন রায় ও রূপ শোরে ভারতীয় চিত্রজগতের প্রতিনিধি হ'য়ে গত সপ্তাহ থেকে বিলাত ভ্রমণে ব্যাপৃত আছেন। এদের উদ্দেশ্য সঠিক জানতে পারলে সাফল্য কামনা করা যেতো।

* * * *

শ্রীরঙ্গমে শীঘ্রই রবীন্দ্রনাথের 'ঘরে-বাইরে' মঞ্চস্থ হবে যার দুটি প্রধান ভূমিকায় অভিনয় ক'রবেন দেবী মুখোপাধ্যায় ও শৈলেন চৌধুরী।

* * * * * * *

বম্বে টকীজ ও ফিল্মিস্তান এক হ'য়ে যাবার গুজব কানে এলো—সম্ভব হ'তে পারে এইজন্য যে, দুটো প্রতিষ্ঠানেরই অন্যতম মহাজন একই ব্যক্তি এবং এ চেষ্টা তিনিই ক'রছেন।

* * * * * * *

প্রকাশ পিকচার্সে'র 'ভগবান বুদ্ধ' চিত্রের নাম ভূমিকায় অভিনয় ক'রবেন বিমান বন্দ্যোপাধ্যায়।

* * * * * *

শিল্পী কানু দেশাই তার লাইসেন্সে 'গীত গোবিন্দ' তুলবেন ব'লে ঠিক ক'রেছেন।

* * * * * * *

যুক্তরাষ্ট্রের কংগ্রেসওয়ালা জন র‍্যাঙ্কিন হলিউডকে কম্যুনিস্টদের আড্ডা ব'লে আখ্যাত ক'রেছেন।

* * * * * *

নলিনী জয়ন্ত নাম নিয়েছেন পঙ্কজ দেশাই।

* * * * * *

গত সপ্তাহে প্রভাতের অংশীদার এবং খ্যাতনামা পরিচালক বিষ্ণুগোবিন্দ দামলে দীর্ঘকাল রোগ ভোগের পর পরলোকগমন ক'রেছেন। দামলের বিশেষ কৃতিত্ব হ'চ্ছে "গোপালকৃষ্ণ", "তুকারাম" ও "রামশাস্ত্রী"।

* * * *

অভিনেত্রী খুরশীদও একটা লাইসেন্স পেয়েছেন।

* * * * * *

কলকাতার ইন্দ্রপুরী স্টুডিওতে আসছে মাস থেকে সাধনা বসুর ছবি 'অজন্তা'র চিত্রগ্রহণ কার্য আরম্ভ হবার কথা। সাধনা বসু ছাড়া অন্য প্রধান দুটি ভূমিকায় নবাগত কেউ কেউ থাকবেন যার মধ্যে একজন হ'লেন কৃষ্ণা দত্ত।

* * * *

অনুপম ঘটক এখন পাঞ্জাবে 'চম্পা'র সুরযোজনা শেষ করে ঐ প্রতিষ্ঠানেরই পরবর্তী ছবিতে কাজ ক'রবেন।



(৩৭)

বাসন্তী প্রস্তুত হলো। সারা রাত ঝড়ের সংগে যুদ্ধ করে ক্লান্ত হয়ে ও বর্ষার জলে স্নান করে মান্দার গাঁ এখন শান্ত হয়েছে। সকাল বেলার রোদে চারদিক স্বচ্ছ হয়ে উঠেছে, এই ঘোর সবুজের সজীবতা, আলোকের স্বচ্ছতা ও মৃদু বাতাসের দোলার মধ্যে মাত্র তিনটে জায়গা খাপছাড়া হয়েছিল। তিনটে কদর্য ছন্দহীন রূপ। বোর্ড অফিস, ইংরিজী স্কুল আর সঞ্জীববাবুর বাড়ী—ছাই আর পোড়া কালির স্তূপের মত পড়েছিল। মন্দার গাঁয়ের তিনটে পাপের আবর্জনা যেন ভস্মীভূত হয়েছে।

তার চেয়ে আরও বড় খবর—ভজু বাউরী মরেছে। দলে দলে গাঁয়ের লোক ভজুর ঘরের কাছে ভীড় করেছিল। পুলিশ এসেছে তদন্ত করতে।

বড় বিমর্ষ হয়ে পড়েছে পুলিশ। সাক্ষী প্রমাণ ও বিবরণ যা পাওয়া যাচ্ছে তা মোটেই মনের মত হচ্ছে না। গৃহদাহের মত এত বড় একটা কাণ্ড, এর সংগে দশজনকে অন্তত জড়িয়ে বেঁধে ফেলতে না পারলে মনের পকেট ভরে না। অথবা বলতে পারা যায়, পকেটের মন ভরে না। কেসটা যেভাবেই দাঁড় করানো যাক্ না কেন, দু'পয়সার ভরসা কোন দিক থেকেই নেই।

ভজুর মত আসামী জ্যান্ত ধরা পড়লেই বা কি লাভ হতো? পুলিশ নিজের বিমর্ষ মনকে সান্ত্বনা দেয়। একটু আশা তবুও করা যেত হয়তো, ভজুকে দিয়ে কতগুলি কাহিনী একবার কবুল করিয়ে নিয়ে যদি দু'দশটা শাঁসালো গেঁয়োকে ফাঁসানো যেত। কিন্তু সে আশাও বৃথা। ভজুর মৃতদেহটা আধপোড়া হয়ে পড়ে আছে। নাক দিয়ে একটা ক্ষীণ রক্তের ধারা গড়িয়ে চোয়াল বেয়ে মাটিতে পড়েছে, এতক্ষণে শুকিয়ে গেছে। ভজুর নির্জীব মূর্তির দিকে তাকিয়ে পুলিশ যেমন ক্ষুণ্ণ তেমনি হতাশ হয়ে পড়ছিল।

বাসন্তী প্রস্তুত হচ্ছিল। সারদা জেঠীমার সংগে একবার দেখা করে আসবে। আর দেরি করার সময় নেই। মাধুরী আজ সূর্য না উঠতেই গাঁ ছেড়ে মীরগঞ্জে চলে গেছে। নাগিনীর বিষ বোধ হয় ফুরিয়ে গেছে, নতুন করে মান্দার গাঁয়ের প্রাণকে জ্বালাতন করার জন্য, নতুন ভাবে কামড় দেবার জন্য মাধুরী যেন একটা হিংস্র প্রতিজ্ঞা পুষে নিয়ে সদরে গেছে।

বাসন্তী তাই আর দেরি করতে পারে না। মান্দার গাঁয়ের সীমানার চারিদিকে মন্ত্র পড়ে বেঁধে রাখতে হবে, আর কোন বিষাক্ত আবির্ভাব সেই মন্ত্রপূত বেড়া ডিঙিয়ে যেন প্রবেশ না করতে পারে।

বাধা পড়লো। বাসন্তী ঘরের বাইরে এসে একটু অপ্রস্তুত হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। পুলিশ এসেছে।

পুলিশ—আপনার কাছে কয়েকটা কথা জিজ্ঞাসা করার আছে।

পুলিশ বাসন্তীর মুখের দিকে তাকিয়ে গলার স্বর আর একটু ভারি করে নিল,—অজয়বাবু কোথায়?

বাসন্তী—মীরগঞ্জে গেছেন।

পুলিশ—কেন?

বাসন্তী—জানি না।

পুলিশ—সংগে আর কেউ গেছেন?

বাসন্তী—হ্যাঁ।

পুলিশ—তিনি কে?

বাসন্তী—চিনি না।

পুলিশ তার গাম্ভীর্যকে আর একটু কঠিন করে নিল।—সঞ্জীববাবুর মেয়ে মাধুরী কি কাল রাত্রে এখানে ছিল?

বাসন্তী—না।

পুলিশ আশ্চর্য হয়ে বাসন্তীর দিকে তাকিয়ে আবার প্রশ্ন করলো—এখানে ছিল না।

বাসন্তী—না।

পুলিশ—ভজু বাউরীকে আপনি চেনেন?

বাসন্তী—হ্যাঁ।

পুলিশ—আপনাদের বাড়িতে সে প্রায়ই আসতো?

বাসন্তী—না।

পুলিশ—তবে?

বাসন্তী—তবে আর কি শুনতে চান?

পুলিশ একটু বিব্রত ভাবে বললো—না না, আর কিছু শুনতে চাই না। তবে কিনা, কেসটা এখনো কিছুই বুঝতে পারছি না। কেউ কিছু বলতে চাইছে না। গাঁয়ের লোকের স্বভাবই এই রকম! এটা কেউ বুঝছে না যে, একটু খবর ধরিয়ে দিতে পারলেই ভাল মত পুরস্কার পাবে।

বাসন্তী চুপ করে রইল। পুলিশ যেন একটা প্রত্যুত্তরের আশায় প্রলুব্ধ ভাবে বাসন্তীর মুখের দিকে তাকিয়েছিল।

নিতান্ত দুঃখিত ভাবেই পুলিশ চলে গেল।

সারদা জেঠীমা সাজি হাতে নিয়ে ফুল তুলছিলেন। কারও পায়ের সাড়া শুনতে পেয়ে একটু আশ্চর্য হয়েই পেছন ফিরে তাকালেন।

আগন্তুক মূর্তির দিকে তাকাবার পর আরও আশ্চর্য হলেন সারদা দেবী। ঠিক চিনতে পারছেন না। এ কি মান্দার গাঁয়েরই মেয়ে? কিন্তু কোন্ বাড়ির? আন্দাজ করেও কিছু ঠাউরে উঠতে পারছিলেন না সারদা দেবী।

সমস্ত গাঁয়ের মধ্যে মাত্র একটি মেয়েকে ভাল করে চিনে রেখেছেন সারদা দেবী। আজও তাকে ভুলতে পারেন না। জীবনে সেই মেয়েটিকেই শুধু তাঁর প্রয়োজন। তার নাম মাধুরী। তিনি শুনতে পেয়েছেন, মাধুরী গাঁয়ে ফিরেছে, কিন্তু আজও তার দেখা পাননি। কেশব পাঁচ বছর পরে গাঁয়ে ফিরলো, সেই সংগে সংগে ঘটনার নির্বন্ধে যেন মাধুরীও ফিরে এল। সারদা দেবী আসন্ন একটা উৎসবের স্বপন দেখছিলেন। কিন্তু সে স্বপন ক'দিনের মধ্যেই আবার ফাঁকি দিয়ে পালিয়ে গেছে। কেশব ফিরে এল আবার শুধু চলে যাবার জন্যই। অদৃষ্টের চক্রান্ত শুধু কেশবকেই গ্রামের স্নেহাশ্রয় থেকে দূরে সরিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। আর কাউকে নয়। আবার গ্রামে হাংগামা হলো, আবার মামলা হলো। কিন্তু ভগবানের কি বিধান! সবাই ফিরে এল কেশবকে পেছনে রেখে।

সারদা দেবী সবই জানেন। কেশব আর মাধুরীর মাঝখানে একটা দৈবের অভিশাপ যেন অলক্ষ্যে সব আনন্দকে ব্যর্থ করে দিচ্ছে। এ কিসের অভিশাপ? কেশবের মন, কেশবের মনের ইতিহাসের কথা সারদা দেবীর কিছু জানতে বাকি নেই। তবু সেই ইতিহাস আজ কিছুতেই পথ পাচ্ছে না। এই বেদনাই সারদা দেবীর জীবনের সব হাসি আলো ও চাঞ্চল্যকে মলিন করে রেখেছে। তাই ক'দিনের মধ্যেই ভয়ানক রকমের কৃশ ও করুণ হয়ে উঠেছেন সারদা দেবী। যেন খুব বড় রকমের একটা

অসুখের আক্রমণে পড়েছেন। শেষ আশার চিহ্নগুলিও একে একে মিটে যাচ্ছে।

কেশবের সঙ্গে মাধুরীর বিয়ে হবে, এই ঘটনাকে একটা সঞ্চারিত সত্যের মত ধরে রেখেছিলেন সারদা দেবী। সব দুঃখ, বিরহ, নির্বাসন ও মামলা হাঙ্গামার বেদনা ও বাধা উত্তীর্ণ হয়ে একদিন এই সত্য উৎসবের রূপে বর্ণে ও শব্দে সফল হয়ে উঠবে, এই একটি আকাঙ্ক্ষার স্বপ্নকে নিয়েই বছরের পর বছর পার করে দিয়েছেন সারদা দেবী। মাধুরীকেও ভাল করে চেনেন। সেই পাঁচ বছর আগেকার দেখা মাধুরীর চোখের আগ্রহ থেকে তিনি সবই বুঝতে পারতেন। তাই তাঁর সব সংশয় দূরে হয়ে গিয়েছিল। শুধু তাঁর আশাই বড় হয়েছিল এতদিন।

কিন্তু কেন? এ প্রশ্নকে সারদা দেবী তার বিচার করে দেখেননি। এটা তাঁর জীবনের একটা সাধ, এই মাত্র।

সারদা দেবীর কাছে এগিয়ে এসে দাঁড়ালো বাসন্তী। সারদা বুঝতে পারেন, এ নিশ্চয় মাধুরী নয়, কিন্তু এ কে? তাঁর মনের ছবির মাধুরী পাঁচ বছরের মধ্যে কি ঠিক এইরকমটি হয়ে উঠেছে? মাধুরী কি এই মেয়েটির চেয়েও দেখতে সুন্দর হয়েছে?

সারদা বললেন—তোমাকে তো চিনতে পারলুম না গো।

বাসন্তী—আমি বাসু।

সারদা নিষ্পলক চোখে তাকিয়ে রইলেন। নামটা তবু যেন জানা-শোনা মনে হয়। একটা পুরাতন প্রতিধ্বনির ক্ষীণ আভাসের মত অস্পষ্ট স্মৃতির মধ্যে চেষ্টা করলে শুনতে পায়। কিন্তু এই মূর্তিটা একেবারে নতুন।

সারদা—কাদের বাসু? চিনলাম না।

বাসন্তী—আমি বাসন্তী।

সারদা—অজয়ের......

বাসন্তী—বোন।

সারদা—সে কি রে বাসু!

সারদা দেবী বিস্মিত হয়ে যেন একটা আনন্দ ধ্বনি করলেন। অজয়ের বোন বাসন্তীকে আজ পাঁচ বছরের মধ্যে সত্যিই একবারও দেখেননি। কিন্তু পাঁচ বছর আগের বাসন্তীকে মনে পড়ে। ম্যালেরিয়ায় ভোগা কাঠির মত রোগা চেহারা। বোকা বোকা বিষণ্ন একটা মূর্তি। গাঁয়ের মেয়েদের মধ্যে বাসন্তী একটা ধর্তব্যই ছিল না। লোকে জানতো, গরীব অজয়ের জীবনের দুশ্চিন্তাকে আরও তিক্ত করার জন্য এই একটা দায় অকারণে টিম্ টিম্ করতো। বাঁচবার আশা নেই, তবু মরেও না। বেচারা অজয়ের কপাল। এমনিতেই অজয়ের ভিটে মাটি দেনা আর মামলার দায়ে বিকিয়ে যেতে বসেছে। তার ওপর এই রকমের একটি মড়া চেহারার ভগ্নীর বিয়ে দেবার দায়! সারদা দেবী বাসন্তীকে যেন বিশ্বাস করতে পারছিলেন না। বাসন্তী মনে মনে লজ্জিত হয়ে উঠছিল। সেই লজ্জান্বিত মুখের দিকে সারদা দেবী আরও মুগ্ধভাবে তাকিয়ে দেখছিলেন।

সারদা—তুই কবে অসুখ থেকে সেরে উঠলি রে বাসু?

বাসন্তী—অনেকদিন হলো। প্রায় পাঁচ বছর।

সারদা—আর অসুখ হয়নি।

বাসন্তী—না।

সারদা—তুই তো মাধুরীর চেয়েও ছোট।

বাসন্তী—না জেঠীমা। আমিই দু'বছরের বড়।

সারদা উৎফুল্ল ভাবে মুক্তকণ্ঠে আশীর্বাদ করছিলেন—আহা! তোকে দেখে বড় ভাল লাগতো রে বাসু। বেঁচে থাক্। চিরজীবন নীরোগ থেকে ঐ সুন্দর মুখ নিয়ে বেঁচে থাক্ মা।

কিছুক্ষণের জন্য অন্যমনস্ক হয়ে পড়লো বাসন্তী। সারদা দেবী যদি এখুনি হঠাৎ জিজ্ঞাসা করে ফেলেন—কবে থেকে তুই সেরে উঠ্লি? কার আশীর্বাদে? কোন্ দেবতার কৃপায়? বাসন্তী তাহ'লে আর উত্তর দিতে পারবে না। এ প্রশ্নের উত্তর নেই, সেকথা সত্য নয়, কিন্তু জীবনে কারও কাছে এর উত্তর মুখ ফুটে ব্যক্ত করার মত দুঃসাহস নেই বাসন্তীর।

পাঁচ বছর আগের একটি রাত্রির কথা মনে পড়ে বাসন্তীর। অজয়দা ফিরে এলেন মীরগঞ্জ থেকে, অনেক রাত্রি করে। একটা কাঁথা গায়ে জড়িয়ে ঘরের মেঝেতে অন্ধকারে শুয়ে জ্বরের ঘোরে ছটফট করছিল বাসন্তী। অজয়দা ধরা গলায় বললেন—কেশবকে পার করে দিয়ে এলাম বাসু। পাঁচ বছর কয়েদ হয়ে গেল। কত চেষ্টা করলাম, কিছু হলো না।

কথাগুলি শুনেই বাসন্তী ধড়ফড় করে উঠে বসলো। জ্বরের জ্বালার চেয়েও একটা

হঠাৎ বেদনার আঁচ যেন বাসন্তীর মনের গভীরে গিয়ে লাগলো। যেন কিছু না বুঝতে পেরেই স্তব্ধ হয়ে রইল বাসন্তী। দু'চোখের কোণ থেকে কয়েকটা তপ্ত জলের ফোঁটা ঝরে পড়লো। তারপরেই চমকে উঠেছিল, শিউরে উঠেছিল বাসন্তী। কিছু না বুঝতে পেরেই।

সেই দিন থেকে, ধীরে ধীরে এই অবোধ্য ঘটনার সব তাৎপর্যকে যেন বুঝতে পারলো বাসন্তী। ধুকপুক রোগজীর্ণ জীবনের একটা মুহূর্তে, অস্থিসার দেহের বিষন্ন শোণিতকণিকার মধ্যে, অকারণ বেঁচে থাকার দুঃসহ ধৈর্যের মধ্যে কি এক অভিনব স্পর্শের সাড়া জেগে উঠলো। জীবনের বাতায়ন পথের মুখে যেন নিরেট একটা অনর্থকতার বাধা এঁটে ছিল, হঠাৎ চোখের জলে সেই বাধা সরে গেল। এক নতুন আলোকের মোহ ফুটে রয়েছে আকাশের গায়ে। এগিয়ে গিয়ে তাকে ধরবার সামর্থ্য নেই। এই নিভৃতে সীমানার মধ্যে আত্ম-গোপন করে দিনযামিনীর প্রতিমুহূর্তে তাকে ধ্যানের কাছে আহবান করতে হয়। বাসন্তী আজ নিজেই স্পষ্ট করে জানে, সেইদিন থেকে তার রোগের অভিশাপ যেন সভয়ে সরে গেছে। শোনা যায়, কোন পুণ্য লগ্নে তীর্থসলিলে স্নান করে কত হতাশ রোগীর রোগ ভয় ইহকালের মত দূর হয়ে গেছে। বাসন্তীও তাই মনে করে, নিজের জীবনের দিকে তাকিয়ে সে আজ অকুন্ঠভাবে সেকথা বলতে পারে। কিন্তু কেউ যেন না শুনতে পায়, এ শুধু তার নিভৃতের রহস্য, তার একান্তের পাওয়া সত্য। সারদা জেঠীমা যতই বিস্মিত হোন, আর প্রশ্ন করুন, বাসন্তী সেই আসল কথাটা কখনই বলতে পারবে না।

সারদা দেবীও আর কিছু বলবার মত কথা খুঁজে পাচ্ছিলেন না। যা হওয়ার ছিল না, পৃথিবীতে তাই যদি হয় এবং যা হওয়া উচিত, তা যদি না হয়—তবে বিস্ময়ের কারণ আছে বৈকি। কেশবের অদৃষ্ট তাকে মাধুরীর কাছ থেকে দূরে সরিয়ে নিয়ে যাচ্ছে, এটা উচিত ছিল না। এটা নিয়মের ব্যতিক্রম। অজয়ের বোন বাসু এইভাবে অপরূপ হয়ে উঠবে এটাও ব্যতিক্রম। এতদিনে মাধুরীর এসে একবার দেখা করা উচিত ছিল, কিন্তু তা হয়নি। বাসন্তীকে কোনদিনই আশা করেন নি, বাসন্তীর আসবার কোন কারণ ছিল না, তবু সে এসেছে।

সারদা দেবীর চিন্তা এলোমেলো হয়ে যায়। এক একবার হঠাৎ মনের ভুলে ভেবে বসেন—মাধুরী দেরী করতে পারে, সে বড়লোকের মেয়ে, কলেজে পড়ে নতুন রকম হয়ে গেছে, বড়লোকের বাপের ইঙ্গিতও হয়তো আছে, তাই মাধুরী একবার আসতে পারেনি, কিন্তু জীবনের রীতিনীতি কারও মুখ চেয়ে দেরী করে না। বাসন্তী যেন সেই নিয়মের জোরেই না জেনে শুনে চলে এসেছে।

—ঘরের ভেতরে আয় বাসন্তী। সারদা দেবী বাসন্তীকে ঘরের ভেতর ডেকে নিয়ে চলেন।

আবার জিজ্ঞেস করলেন—মাধুরী এখন কোথায় আছে?

বাসন্তী—মীরগঞ্জে আছে।

সারদা দেবীর মুখটা আরও অনুজ্জ্বল হয়ে উঠলো।

বাসন্তী বললো—আপনি এত শুকিয়ে গেছেন কেন জেঠীমা?

সারদা—বড় দুঃখে আছি রে বাসন্তী।

বাসন্তী—দুঃখে তো আমরাও রয়েছি।

সারদা দেবী হেসে ফেললেন। কি সুন্দর গুছিয়ে মিষ্টি মিষ্টি কথা বলছে বাসু। এভাবে কথা বলতে কবে শিখলো। এই তুচ্ছ গেঁয়ো মেয়েটা কোথা থেকে রূপ, গুণ কথা ও হাসির মধ্যে এই সৌষ্ঠব কুড়িয়ে পেল?

সারদা দেবী আবার মনের অজানিতে ভেবে ফেলেন—মাধুরী চলে গেছে, মাধুরীর বদলেই যেন বাসন্তী এসেছে।

সারদা দেবী বলেন—আমার দুঃখ তো আর ঢাকা নেই মা। সবই দেখতে পাচ্ছিস্। আর কদিন এভাবে বেঁচে থাকতে পারি বল? জানি না কেশবের কপালে কোন্ কুগ্রহের দৃষ্টি লেগেছে। পাঁচ বছর ঘর ছাড়া হয়ে রইল। আবার এল যদি, দু'দিন না যেতেই চলে গেল। এভাবে আসবে আর চলে যাবে কেশব, আমি একা পড়ে আছি মিছিমিছি। এখনো শ্মশানে যাইনি, কিন্তু এই ঘর আমার কাছে শ্মশান হয়ে গেছে।

বাসন্তী বেশি ভাববেন না জেঠীমা। অজয়দা গেছেন মীরগঞ্জে, এইবার কেশবদাকে গিয়ে ছাড়িয়ে আনবেন।

সারদা—বেশ তো। ছাড়িয়ে আনলেই কি সব হয়ে গেল, তারপর?

বাসন্তী—তারপর কি?

সারদা—তারপর কেশবকে ধরে রাখতে পারবি তো? পারবি তো বাসন্তী?

বাসন্তীর সারা মুখ রক্তিম হয়ে ওঠে। একথা শোনার জন্য বাসন্তী প্রস্তুত ছিল না। দাবীর কথাই যেখানে ওঠে না, সেখানে এই উপহার চলে আসে কেন? জীবনের এক অপ্রাপ্য স্বর্গকে এক কথায় এত সস্তা করে দিলে কি রকম বিদ্রূপের মত মনে হয়। ভয় করে, বুক দুরু দুরু করে। বাসন্তীর মাথা হেঁট হয়ে আসে। মনে মনে নিজেকেই ধিক্কার দেয়—এখানে আসা উচিত হয়নি তার। (ক্রমশ)

সাপ্তাহিক সংবাদ

দেশী সংবাদ

১১ই জুলাই—মহাত্মা গান্ধী লর্ড ওয়াভেলের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া আসিলে পর ওয়াকিবহাল মহল বলেন যে, ওয়াভেল প্রস্তাব ব্যর্থ হইয়াছে। মিঃ জিন্নার দাবী মানিয়া লওয়া যায় না।

১২ই জুলাই—কংগ্রেস সভাপতি অদ্য অপরাহ্নে বড়লাটের সহিত সাক্ষাৎ করেন।

অদ্য সিমলাতে দর্শনপ্রার্থী জনতার উচ্ছৃঙ্খল আচরণের নিন্দা করিয়া গান্ধীজী একটি বক্তৃতা দেন।

বৃহস্পতিবার অপরাহ্নে কলিকাতার সিনেট হাউসে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বার্ষিক সমাবর্তন উৎসব আরম্ভ হয়। ভাইস চ্যান্সেলার ডাঃ রাধাবিনোদ পাল উৎসবের উদ্বোধন করেন। এই অনুষ্ঠান তিনভাগে তিনদিন ধরিয়া অনুষ্ঠিত হয়।

জানা গিয়াছে, কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি যুদ্ধপ্রচেষ্টায় সহযোগিতা করিতে স্বীকৃত হওয়ায় গভর্নমেণ্ট কংগ্রেস প্রতিষ্ঠানের উপর হইতে নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করিয়া লইতে পারেন।

ব্যবস্থা পরিষদের নির্বাচন ১৯৪৬ সাল পর্যন্ত স্থগিত রাখা হইবে বলিয়া জানা গিয়াছে।

১৩ই জুলাই—ওয়াভেল পরিকল্পনা ব্যর্থ হইয়া গিয়াছে। বড়লাট তজ্জন্য দুঃখ প্রকাশ করিয়াছেন এবং কংগ্রেসের সহযোগিতা কামনার অনুরোধ জানাইয়া গান্ধীজী ও রাষ্ট্রপতি আজাদের নিকট অনুরোধ করিয়াছেন। বড়লাট সারাদিন ধরিয়া বিভিন্ন দলের নেতাদের সহিত আলোচনা করেন।

গত বুধবার নয়াদিল্লীতে একটি দোতালা গৃহের একাংশ ভাঙিয়া পড়ার ফলে দুইজন নন্‌কমিশনড্ অফিসার নিহত ও একজন আহত হইয়াছেন।

শুক্রবারে দোকান খোলার প্রতিবাদে বোম্বাইএ কাটা কাপড় ব্যবসায়ের এক বাজারে হাঙ্গামার ফলে ৭ ব্যক্তি জখম হইয়াছে।

চলন্ত রেলগাড়ির পা-দানি হইতে পড়িয়া গিয়া বর্ধমানের ভাদিয়া ও দুস্করা ষ্টেশনের মধ্যবর্তী একস্থানে একজন যাত্রী প্রাণ হারাইয়াছে এবং একজন যাত্রী আহত হইয়া হাসপাতালে মারা গিয়াছে।

১৪ই জুলাই—বেলা ১১টায় নেতৃ-সম্মেলনের পুনরধিবেশনে বড়লাট সরকারীভাবে ঘোষণা করেন যে, নেতৃসম্মেলন ব্যর্থতায় পর্যবসিত হইয়াছে। বড়লাট অতঃপর বলেন যে, বিভিন্ন দলের প্রতিনিধিগণকে লইয়া সাময়িক গভর্নমেণ্ট গঠন যখন সম্ভব হইল না, তখন বর্তমান ব্যবস্থাই চলিতে থাকিবে।

যুক্তপ্রদেশের ভূতপূর্ব কংগ্রেসী মন্ত্রী মিঃ রফী আহমদ কিদোয়াই ও অন্যান্য কতিপয় রাজনৈতিক বন্দীকে অদ্য নৈনী সেণ্ট্রাল জেল হইতে মুক্তি দেওয়া হইয়াছে।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পদবী বিতরণ সভায় শ্রীমতী ইন্দিরা দেবী ভুবনমোহিনী দাসী সুবর্ণ পদক (১৯৪৪) লাভ করিয়াছেন। ইনি বিখ্যাত সাহিত্যিক শ্রীযুত প্রমথ চৌধুরীর সহধর্মিণী।

সিমলা সম্মেলন ব্যর্থ হওয়ার পর রাষ্ট্রপতি মৌলানা আজাদ অদ্য এক সাংবাদিক সম্মেলনে ওয়াভেল পরিকল্পনা ও কংগ্রেস প্রতিক্রিয়ার বিশদ বর্ণনা দেন।

গতকল্য সিমলা বঙ্গীয় সম্মিলনী ও সিমলার প্রবাসী বাঙালীদের উদ্যোগে কতিপয় সর্বভারতীয় নেতাকে সম্বর্ধনা জ্ঞাপন করা হয়। সভায় শ্রীযুত রাজাগোপালাচারী বলেন যে, ভারতের দাসত্বের জন্য বাঙলা ও পাঞ্জাব দায়ী—কারণ এই দুই প্রদেশের সাম্প্রদায়িক অনৈক্যের দরুণই স্বাধীনতা লাভ ব্যাহত হইয়াছে।

দিল্লীতে একটি বাড়ি ধ্বসিয়া পড়ায় বহুলোক হতাহত হইয়াছে বলিয়া অনুমান করা যাইতেছে। এযাবৎ পাঁচটি মৃতদেহ উদ্ধার করা হইয়াছে।

১৫ই জুলাই—কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির দীর্ঘতম অধিবেশনের অন্যতম অধিবেশনটি অদ্য শেষ হইল। ১৩ দিনের মধ্যে কমিটির ১৮টি সভা হইয়াছে।

গান্ধীজীকে ওয়ার্ধায় পৌঁছাইবার জন্য বড়লাট একখানি স্পেশ্যাল ট্রেনের ব্যবস্থা করিয়াছেন।

মহাত্মা গান্ধী সিমলা হইতে সম্ভবতঃ ১৮ই জুলাই বুধবার সদলবলে সেবাগ্রামে উপনীত হইবেন।

১৬ই জুলাই—গান্ধীজী সদলবলে অদ্য ওয়ার্ধা রওনা হইয়াছেন। সর্দার বল্লভভাই প্যাটেল বোম্বাই, রাষ্ট্রপতি আজাদ কলিকাতায় এবং পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু কাশ্মীর রওনা হইয়াছেন।

আল্লা বক্স হত্যা মামলার রায় অদ্য বাহির হওয়ার কথা ছিল, কিন্তু জজ ২৮শে জুলাই রায় দিবেন বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন।

কলিকাতার বিশিষ্ট সাংবাদিক শ্রীযুত মুরারীমোহন চ্যাটার্জি গত শনিবার পরলোকগমন করিয়াছেন। তিনি আনন্দবাজার পত্রিকার অন্যতম সহকারী সম্পাদক ছিলেন।

স্বামী সহজানন্দ সরস্বতীর সভাপতিত্বে বিহার প্রাদেশিক কিষাণ কাউন্সিলের এক অধিবেশনে গতকল্য শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র বসুর বিনাসর্তে মুক্তি দাবী করিয়া এক প্রস্তাব গৃহীত হয়।

১৭ই জুলাই—কাশ্মীরের পথে পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু অদ্য লাহোর পৌঁছেন। তাঁহাকে সম্বর্ধনা করিবার জন্য এক বিরাট জনতা সমবেত হয়। জনতাকে লক্ষ্য করিয়া পণ্ডিতজী এক বক্তৃতায় ১৯৪২ সালের ঘটনাবলী, সিমলা সম্মেলন, পাঞ্জাব গভর্নমেণ্ট, পাঞ্জাবের কংগ্রেস নেতৃবৃন্দ এবং জনসাধারণের কার্যকলাপ সম্পর্কে তীব্র মন্তব্য করেন। তিনি বলেন, "১৯৪২ সালের ঘটনাবলী সম্পর্কে আমি গর্ব অনুভব করি। জনসাধারণ যদি বিনা প্রতিবাদে বৃটিশ গভর্নমেণ্টের নিকট নতি স্বীকার করিত, তাহা হইলে সত্যই আমি দুঃখিত হইতাম। কেননা, উহা দ্বারা কাপুরুষতারই পরিচয় দেওয়া হইত।......আমি একথা স্পষ্ট করিয়া ঘোষণা করিতে চাই যে, ১৯৪২ সালের আন্দোলনে যাঁহারা যোগ দিয়াছিল, আমি তাহাদিগকে নিন্দা করিতে পারি না।"

প্রকাশ, সিমলা সম্মেলনের ব্যর্থতা হইতে উদ্ভূত অবস্থা বিবেচনা এবং অন্যান্য সমস্যা সমূহ পর্যালোচনা করিবার জন্য লর্ড ওয়াভেল সত্বর গভর্নরবৃন্দের এক বৈঠক আহ্বান করিবেন।

বিদেশী সংবাদ

১১ই জুলাই—প্রিটোরিয়ার সংবাদে প্রকাশ, অদ্য প্রাতে দক্ষিণ আফ্রিকার বিমান বাহিনীর একখানি ডাকোটা বিমান কেনিয়ার কিসুমুতে ভাঙিয়া পড়ায় ২৪ জন যাত্রী ও ৪ জন লস্কর মারা গিয়াছে।

১২ই জুলাই—ইরাকের রিজেণ্ট আমির আবদুল্লা ইল্লা জানাইয়াছেন যে, ১৯৪১ সালের ইরাক বিদ্রোহের নেতা রসিদ আলীকে ইরাকের কর্তৃপক্ষের হস্তে সমর্পণ করা হইলে আর কোন অনুষ্ঠান না করিয়াই তাঁহাকে ফাঁসী দেওয়া হইবে।

জাপ সৈন্যেরা সিতাং নদীর বাঁকে নিয়াউংকাসে অধিকার করিয়াছে এবং কতিপয় স্থানে শক্ত ঘাঁটি স্থাপন করিয়াছে।

১৩ই জুলাই—এক ইস্তাহারে বলা হইয়াছে, ৫ই জুন তারিখে মার্কিন ৩য় নৌবহর ভীষণ ঝড়ের মধ্যে পড়ায় তিনটি নবনির্মিত ব্যাটেলশিপ এবং দুইটি এসেন শ্রেণীর বিমানবাহী পোতসহ উক্ত নৌবহরের অন্যান্য ২১টি রণতরী ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে।

ইংলণ্ডের বিভিন্ন স্থানে শ্রমিক ধর্মঘট চলিতেছে। তিনটি বড় রকমের ধর্মঘট শুরু হওয়ায় বৃটিশ যানবাহন ও জাহাজ চলাচলের ব্যাপারে গুরুতর ক্ষতি হইতেছে বলিয়া প্রকাশ।

১৪ই জুলাই—মার্কিন নৌবহর খাস জাপ দ্বীপপুঞ্জের উপর এই প্রথমবারের জন্য প্রবল গোলা বর্ষণ আরম্ভ করিয়াছে।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সমর সচিব জানাইয়াছেন যে, জাপানকে পরাজিত করিতে হইলে মিত্রপক্ষকে প্রবল প্রচেষ্টা করিতে হইবে, যেহেতু মূল জাপ বাহিনী এখনও অটুট আছে।

ইতালী জাপানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণার সিদ্ধান্ত করিয়াছেন।

১৫ই জুলাই—প্রশান্ত মহাসাগরীয় মার্কিণ রণতরীবহর হোকাইডোর অন্তর্গত এরোরানের উপর গোলাবর্ষণ করিয়াছে। এক হাজার নৌবাহিত বিমান উত্তর জাপানে যুগপৎ হানা দিয়া চলিয়াছে।

উত্তর গ্রীসের স্লাভ মাসিডোনিয়ানদের বিরুদ্ধে যে সকল উৎপীড়নমূলক ব্যবস্থা অবলম্বিত হইয়াছিল, যুগোস্লাভ সংবাদপত্রসমূহ তজ্জন্য প্রকাশ্যভাবে গ্রেট বৃটেনকে দায়ী করিতে আরম্ভ করিয়াছে।

১৬ই জুলাই—বার্লিনের ১৬ মাইল দক্ষিণ-পশ্চিমে 'জার্মাণীর ভার্সাই' পটসডামে বৃটিশ প্রধান মন্ত্রী মিঃ চার্চিল, মার্কিন প্রেসিডেণ্ট ট্রুম্যান ও জেনারেলিসিমো ষ্ট্যালিনের মধ্যে আলোচনা বৈঠক আরম্ভ হইয়াছে। সম্ভবতঃ কয়েক সপ্তাহ ধরিয়া বৈঠক চলিবে।

চিকাগো টাইমস পত্রিকায় প্রকাশিত উহাদের মণ্টিভিডোস্থিত সংবাদদাতার এক সংবাদে বলা হইয়াছে—"বুনো আয়ার হইতে সদ্যপ্রাপ্ত সংবাদে আমি একরূপ নিশ্চিত হইয়াছি যে, হিটলার এবং তাঁহার স্ত্রী ইভা ব্রাউন আর্জেণ্টিনায় অবতরণ করেন। পাটাগোনিয়ায় একটি বড় জার্মাণ জমিদারীতে তাঁহারা আছেন।

১৭ই জুলাই—বিমানবাহী জাহাজ হইতে ১৫শত মার্কিন ও বৃটিশ বিমান টোকিও এলাকায় হানা চালাইয়াছে।

মস্কো বেতারে বলা হইয়াছে, অদ্য অপরাহ্ন পাঁচ ঘটিকায় ত্রিনেতৃ সম্মেলন আরম্ভ হইয়াছে।

দেশ

সম্পাদক ঃ শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র সেন

সহকারী সম্পাদক ঃ শ্রীসাগরময় ঘোষ

১২ বর্ষ। শনিবার, ১২ই শ্রাবণ, ১৩৫২ সাল। Saturday, 28th July, 1945 [৩৮শ সংখ্যা

সাময়িক প্রসঙ্গ

আগস্ট 'বিদ্রোহ'

১৯৪২ সালের আগস্ট মাসের ব্যাপার ভারতের ইতিহাসে চিরস্মরণীয় স্থান অধিকার করিবে। পণ্ডিত জওহরলাল নেহর, একথা দৃঢ়তার সংগে বলিয়াছেন যে, ১৯৪২ সালের আগস্ট মাসে ভারতের উত্তর এবং পূর্ব অঞ্চলে জনসাধারণের বিপুল জনশ্রেণী যেভাবে স্বাধীনতার জন্য সাড়া দিয়াছিল, তিনি সেজন্য গর্ববোধ করিয়া থাকেন। সেদিন শ্রীনগরের বক্তৃতায়ও তিনি বলিয়াছেন, ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দে ভারতবর্ষ প্রথমে স্বাধীনতা লাভের জন্য চেষ্টা করে, ১৯৪২ সালে দ্বিতীয়বার এই প্রচেষ্টা হয়। সেদিন কংগ্রেসের জেনারেল সেক্রেটারী আচার্য কৃপালনীও এই ধরণের উক্তি করিয়াছেন; ইহাতে কাহারও কাহারও মনে এই প্রশ্ন উঠা " অসম্ভব নয় যে, কংগ্রেস অহিংস নীতিতে বিশ্বাসী: কিন্তু ১৯৪২ সালে দেশের নানাস্থানে এমন অনেক ব্যাপার ঘটে, যেগুলি অহিংস নীতির দ্বারা সমর্থিত হইতে পারে না। সেই সব কাজে কি তবে কংগ্রেসের সমর্থন ছিল? ডাক্তার পট্টভী সীতারামিয়া কিছুদিন পূর্বে বেজওয়াড়ার এক জনসভায় স্পষ্টভাবেই একথা বলিয়াছেন যে, অন্ধ্র কংগ্রেস কমিটির সার্কুলারের জন্য তিনিই দায়ী। অন্ধ্র কংগ্রেস কমিটির এই সার্কুলার গভর্নমেণ্ট কংগ্রেসের বিরুদ্ধে প্রয়োগ করিবার জন্য বহু ক্ষেত্রে চেষ্টা করিয়াছেন; তাঁহারা দেখাইতে চাহিয়াছেন যে, ঐ সার্কুলারে হিংসাত্মক কার্যে প্ররোচনা প্রদান করা হইয়াছে। কিন্তু তাঁহাদের ঐ যুক্তি সম্পূর্ণই ভিত্তিহীন; পক্ষান্তরে কংগ্রেসের বিরুদ্ধে দমন নীতি অবলম্বনের জন্য তাঁহাদের পক্ষে ইহা একটা ছল মাত্র। কারণ, ১৯৪২ সালের জুলাই মাসে ঐ সার্কুলার প্রচার করা হয়; ইহার পর আগস্ট মাসে নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। সে সিদ্ধান্তে ইহা সুস্পষ্টভাবেই নির্দেশিত ছিল যে, গান্ধীজী নূতন সংগ্রামের নেতৃত্ব গ্রহণ করিবেন; বলা বাহুল্য, নিখিল ভারতীয় রাষ্ট্রীয় সমিতির অব্যবহিতকাল পরেই গান্ধীজী এবং কংগ্রেসের ওয়ার্কিং কমিটির সদস্যদিগকে গ্রেপ্তার করা হয়; সুতরাং গান্ধীজীর পক্ষে নেতৃত্ব পরিচালনা করিবার কোন অবসরই ঘটে নাই; সুতরাং আগস্ট হাঙ্গামার ফলে কংগ্রেসের নীতির বিরোধী যদি কোন কাজ হইয়া থাকে, গান্ধীজী কিংবা কংগ্রেস সেজন্য দায়ী হইতে পারেন না। কংগ্রেস স্বাধীনতা লাভের জন্য দেশে অগ্নিময় উদ্দীপনা সঞ্চার করিয়াছিল, বড় জোর তাহার পক্ষে এই অপরাধ হইতে পারে। কিন্তু সত্যই কি তাহা অপরাধ? সেদিন বাস্তিল দিবসের স্মৃতি উদ্‌যাপন উপলক্ষে মার্কিণ প্রেসিডেণ্ট মিঃ ট্রুম্যান ফ্রান্সের তৎকালীন বিপ্লবীদের প্রচেষ্টার প্রশংসা করিয়া বলিয়াছেন—"বাস্তিল দিবসের ব্যাপারের ভিতর দিয়া ফ্রান্সের জনসাধারণ পৃথিবীকে স্বাধীনতার একটা অমর প্রতীক দিয়াছে। যুক্তরাষ্ট্রের জনসাধরণ বাস্তিল দিবসের পশ্চাতে যে আদর্শ ছিল, তাহার সম্পূর্ণ সমর্থন করিয়াছে। মানব জাতিকে দাসত্ব শৃংখলে আবদ্ধ করিবার জন্য অত্যাচারীরা ভীষণ প্রচেষ্টায় অবতীর্ণ হইয়াছিল। ফ্রান্সের জনগণ সে প্রচেষ্টা সম্পূর্ণরূপে ব্যর্থ করিয়া দেয়। এই আদর্শের সার্থকতা এখন সর্বাপেক্ষা অধিক অনুভূত হইতেছে।" ফ্রান্সের তৎকালীন অবস্থার সংগে আমরা ভারতের বর্তমান অবস্থার তুলনা করিতে চাহি না; কিন্তু ভারতের ৪০ কোটি অধিবাসী পরাধীনতার শৃংখলে আবদ্ধ রহিয়াছে। সম্প্রতি শ্রীযুত সুন্দর যোশী চিকাগো শহরের একটি বক্তৃতায় এই অবস্থার কথা উল্লেখ করিয়া বলিয়াছেন, ১৭০ বৎসর পূর্বে পরাধীন আমেরিকার অবস্থা বিদেশীর শোষণে যেরূপ ছিল, ভারতের অবস্থা আজও সেইরূপ আছে। ঐ সময় ব্রিটিশ পার্লামেণ্টের সদস্যগণ আমেরিকার অধিবাসীদের স্বাধীনতা লাভের অযোগ্যতা প্রতিপন্ন করিবার নিমিত্ত যেমন ধর্মগত এবং রাজনীতিগত মতভেদের যুক্তি উপস্থিত করিতেন, এখন ভারতের বিরুদ্ধে তাঁহারা সেই সব যুক্তিই উপস্থিত করিতেছেন। ভারতবর্ষকে সাম্রাজ্যবাদীদের শোষণের ক্ষেত্ররূপে পরিণত রাখিবার জন্য সমভাবেই চেষ্টা হইতেছে। বলা বাহুল্য, ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদীদের এই মানবতার বিরোধী নীতির বিরুদ্ধে ভারতের জনসাধারণের অন্তরে তীব্র বিক্ষোভ পুঞ্জীভূত হইয়া উঠিতেছে। আগস্ট মাসের ব্যাপারের মূলে সেই বিক্ষোভই কার্য করিয়াছে। ইহা মানব হৃদয়ের স্বাভাবিক প্রেরণা হইতে সঞ্জাত হইয়াছে। গভর্ণমেণ্ট যদি কংগ্রেস-নেতৃবৃন্দকে সুযোগ দান করিতেন তবে ব্যাপার অন্যরূপ ধারণ করিত এবং স্বাধীনতা লাভের প্রচেষ্টা সমধিক যোগ্যতার সহিত পরিচালিত হইত; কিন্তু তাঁহারা কংগ্রেসের সহযোগিতাকে উপেক্ষা করেন এবং নিতান্ত অবিবেচিতভাবে দেশের জননায়কদিগকে কারারুদ্ধ করিয়া কঠোর দমননীতি প্রয়োগে অবতীর্ণ হন; প্রকৃতপক্ষে নেতারা এজন্য দায়ী হইতে পারেন না। স্বাধীনতা লাভে জাগ্রত জাতিকে অন্ধ শক্তি প্রয়োগে পিষ্ট করিতে গেলে তাহার প্রতিক্রিয়া দেখা দিলে, ইহা স্বাভাবিক। আগস্ট মাসের ঘটনাবলী যেভাবে হউক, স্বাধীনতা লাভে সংকল্পবদ্ধ জাতির অন্তরের শক্তির পরিচয় দিয়াছে। ব্রিটিশ গভর্নমেণ্ট এই সত্যকে উপলব্ধি করিয়া যদি ভারতের স্বাধীনতাকে এখনও স্বীকার করিয়া লন, তবেই তাঁহাদের পক্ষে সুবুদ্ধির পরিচয় প্রদান করা হইবে।

সহিষ্ণুতার মাত্রা

মিস এলিনার র‍্যাথবোন ব্রিটিশ পার্লামেণ্টের স্বতন্ত্র দলের সদস্য। বিলাতের তথাকথিত ভারত-হিতৈষীদের ন্যায় ভারতবর্ষ সম্বন্ধে মস্তিষ্ক সঞ্চালন করিবার প্রবৃত্তি ইঁহারও আছে। কিছুদিন হইল অক্সফোর্ড প্রবাসী মিঃ ডি এম সেন 'নিউ স্টেটস্‌ম্যান এণ্ড নেশন' পত্রে ভারতের কারাগারসমূহের অবস্থা বর্ণনা করিয়া একখানা চিঠি প্রকাশিত করেন। এই চিঠিতে তিনি লিখিয়াছিলেন যে

মেদিনীপুর, ঢাকা এবং আন্দামানের কারাগারে যে সব ঘটনা ঘটিয়া গিয়াছে, তাহার সঙ্গে বুচেন ওয়াল্ডের বন্দীশালায় জার্মানদের নিষ্ঠুরতারই শুধু তুলনা করা চলে। মিস্ র‍্যাথবোর্ন এই উক্তিতে ক্রুদ্ধ হইয়াছেন। তিনি ঐ চিঠির জবাব স্বরূপে উক্ত পত্রে লিখিয়াছেন যে, মেদিনীপুর ও ঢাকা এই দুইটি স্থানই বাঙলাদেশে, এবং সম্প্রতি কয়েক মাস হইল বাঙলার শাসনতন্ত্র স্থগিত আছে, উহার পূর্বে এই প্রদেশের শাসনভার, সেই সঙ্গে কারাবিভাগের পরিচালনার দায়িত্ব দেশবাসীর নিকট দায়িত্বসম্পন্ন মন্ত্রীদের হাতেই ছিল। যদি সত্যই জেলে ঐরূপ অত্যাচার হইয়া থাকে, তবে ভারতবাসীরা তাহা সহ্য করিল। কেন? মিস র‍্যাথবোর্ন এ স্থলে ভাবের ঘরে চুরি চালাইয়াছেন। তিনি ভারতবর্ষের খুঁটিনাটি সকল খবর রাখেন, কিন্তু একথা কি জানেন না যে, মন্ত্রীদের হাতে প্রকৃত ক্ষমতা কিছুই নাই। বাঙলার প্রধান মন্ত্রী স্বরূপে মৌলবী ফজলুল হক মেদিনীপুরের ব্যাপার এবং ঢাকা জেলের গুলী চালনা সম্বন্ধে তদন্ত করা হইবে এই প্রতিশ্রুতি প্রদান করেন; কিন্তু তাহার ফলে তাঁহাকে গভর্নর স্যার জন হার্বার্টের চাপে প্রধান মন্ত্রীর পদ হইতেই অপসৃত হইতে হয়। শাসনতান্ত্রিক এই সত্য মিস র‍্যাথবোর্নের অপরিজ্ঞাত নহে। তারপর মনস্তাত্ত্বিকতার বড় প্রশ্ন উঠিতে পারে; সে প্রশ্ন এই যে, ভারতবাসীরা এই ধরণের অন্যায় সহ্য করে কেন? ইহার উত্তর এই যে, দীর্ঘ পরাধীনতায় ভারত দুর্বল হইয়া পড়িয়াছে; ভারত নির্জীব হইয়াছে; সহ্য না করিলে উপায় নাই, তাই সহ্য করে। বাঙলার দুর্ভিক্ষে লক্ষ লক্ষ লোক মরিল। উডহেড কমিশনও বিস্ময় প্রকাশ করিলেন—কোথাও শান্তিভঙ্গ হইল না, গভর্নমেণ্টের একটি শস্যের গুদামও লুঠতরাজ হইল না! ব্রিটিশের শাসন-নীতির এইখানেই মহিমা; ইহা ভারতবাসীর নৈতিক শক্তিকে দুর্বল করিয়া ফেলিয়াছে।

সিমলা সম্মেলনের পর

সিমলা সম্মেলনের ব্যর্থতার কারণ কি, তৎসম্বন্ধে কোন নিশ্চিত সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া এখন আর অসম্ভব নহে। প্রত্যক্ষভাবে এই সম্মেলনের ব্যর্থতার জন্য মিঃ জিন্নাকে দায়ী করা হইলেও, ইহার পরোক্ষ কারণ আরও সুদূরপ্রসারী। এই সম্মেলন সফল হইলেও, তদ্দ্বারা ভারতের বৃহত্তর সমস্যাসমূহের কোনপ্রকার আশু সমাধান হইত না। কিন্তু তৎসত্ত্বেও বাস্তবতার দৃষ্টিভঙ্গি লইয়া দেশের কল্যাণ কামনায় কংগ্রেসের নেতৃবৃন্দ বিরোধের পথ ত্যাগ [illegible] করিতে প্রস্তুত হইয়াছিলেন এবং সেইরূপ অকপট ঐকান্তিক মনোভাব লইয়াই তাঁহারা সিমলা সম্মেলনে যোগদান করিয়াছিলেন। দেশ-হিতৈষণার এই উদার দৃষ্টিভঙ্গি লইয়াই ভারতের সংখ্যাগরিষ্ঠ হিন্দু-সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিগণকে পরিকল্পিত কেন্দ্রীয় পরিষদে সংখ্যালঘিষ্ঠ দলে পরিণত করিতেও তাঁহারা কুণ্ঠাবোধ করেন নাই। কিন্তু মুসলিম লীগের নির্লজ্জ, স্বার্থান্ধ অযৌক্তিক দাবীর যূপকাষ্ঠে জাতীয়তাবাদী মুসলমানগণকে তাঁহারা বলি দিতে পারেন নাই। ন্যায় নীতির দিক দিয়াই তাঁহাদের পক্ষে ইহা সম্ভবপর হয় নাই। লর্ড ওয়াভেল মিঃ জিন্নার দাবী কিছুতেই মানিয়া না লইলেও এবং তাঁহার দাবী যে অযৌক্তিক, তাহা স্বীকার করিলেও, সর্বাপেক্ষা আশ্চর্যের বিষয় এই যে, তিনি শেষ পর্যন্ত মিঃ জিন্নার অনমনীয় দাবীর কাছেই অসহায়ভাবে আত্মসমর্পণ করিয়াছেন। এই শোচনীয় আত্মসমর্পণের দ্বারা তিনি মিঃ জিন্নার দাবীর যৌক্তিকতা প্রকারান্তরে স্বীকার করিয়া লইয়াছেন, এবং সম্মেলনের সূচনায় তিনি যে দৃঢ়তার পরিচয় দিয়াছিলেন, তাহা শেষ পর্যন্ত অতি অদ্ভুতভাবেই পাক ঘুরিয়া গিয়াছে। তাঁহার সদিচ্ছা সম্বন্ধে কোন সন্দেহ না থাকিলেও, ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদীদের চিরপ্রশ্রিত মুসলিম লীগের কাছে তিনি যে একান্ত নিরুপায়, তাহা প্রমাণিত হইয়াছে। আসল কথা হইল এই যে, তাঁহার সদিচ্ছা যতই থাকুক না কেন, ব্রিটিশ গভর্নমেণ্টের চিরাচরিত নীতির দ্বারাই তাঁহাকে প্রভাবিত ও পরিচালিত হইতে হইয়াছে। তাঁহার মারফতে ভারতের কাছে ব্রিটিশ গভর্নমেণ্টের এই প্রস্তাব উত্থাপনের কি হেতু ছিল? তাঁহারা কি মিঃ জিন্নার স্বরূপ ও তাঁহার সুবিদিত মনোভাবের কথা জানিতেন না? আসলে মিঃ জিন্না ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদীদেরই সৃষ্টি। এরূপ ক্ষেত্রে সম্মেলনের সম্মুখে মিঃ জিন্নার বাধা সৃষ্টির কথা না জানার কোন হেতুই ব্রিটিশ গভর্নমেণ্টের থাকিতে পারে না। কিন্তু তৎসত্ত্বেও ব্রিটিশ গভর্নমেণ্টের পক্ষে এরূপ একটি প্রস্তাবের প্রহসন করিবার কি কারণ ছিল? বিলাতের নির্বাচনদ্বন্দ্বে অনুকূল আবহাওয়া সৃষ্টির জন্যই ভারতের সম্মুখে এরূপ একটি প্রহসন করিবার প্রয়োজন চার্চিল, আমেরী প্রভৃতি সংরক্ষণশীল টোরী দলের ছিল, এরূপ অভিমতও পাওয়া গিয়াছে। কিন্তু ভারতের সমস্যাই যে বিলাতী নির্বাচনদ্বন্দ্বে মস্ত বড় প্রশ্ন, তাহা মনে করিবার কোন হেতু নাই। প্রকৃত প্রস্তাবে বিশ্ববাসীর কাছে, ব্রিটিশ গভর্নমেণ্টের অতঃপর ইহাই প্রচার করার পক্ষে সুবিধা হইল যে, ভারতকে স্বাধীনতা ও [illegible] তাঁহাদের কোনরূপ সদিচ্ছার অভাব নাই, তবে এদেশের সাম্প্রদায়িক সমস্যা এত গুরুতর যে, ভারত এখনও স্বাধীনতা লাভের যোগ্যতা অর্জন করিতে পারে নাই। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের কাছে সম্মেলনের ব্যর্থতার সার্থকতা এইখানে। সিমলা সম্মেলন ব্যর্থ হওয়ায় এদেশের রাজনীতিক অগ্রগতি দুই দিক হইতে ব্যাহত হইয়াছে, মনে হইবে। প্রথমত কেন্দ্রে সাময়িক পরিষদ গঠন স্থগিত রহিল। দ্বিতীয়ত ৯৩ ধারা শাসিত প্রদেশগুলিতে মন্ত্রিমণ্ডল গঠনের সম্ভাবনাও অপেক্ষাকৃত অনিশ্চিত হইল। ইহা অবশ্যই স্বীকার্য যে, কেন্দ্রে জনগণের দ্বারা সমর্থিত পরিষদ গঠিত না হইলে ৯৩ ধারা শাসিত প্রদেশগুলিতে মন্ত্রিমণ্ডল গঠিত হইলেও, তাহা সাম্প্রতিক জাতীয় সমস্যাগুলি সমাধানে বিশেষ কাজে আসিবে না। এই কারণে বর্তমানে কংগ্রেস মন্ত্রিত্ব-গ্রহণের অনুকূলে মত দিতে পারেন নাই। মৌলানা আবুল কালাম আজাদ ও পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু এতৎসম্পর্কে বিরুদ্ধ মতই প্রকাশ করিয়াছেন। কিন্তু তৎসত্ত্বেও দেশের এই সংকটজনক মুহূর্তে মন্ত্রিত্ব গ্রহণ করিলে দেশের অনেক অনাচার ও দুর্নীতি দূরীভূত হইতে পারে। যে সমস্ত প্রদেশে কংগ্রেসী প্রতিনিধিগণ সংখ্যালঘু দল, সেখানেও তাঁহারা অন্যান্য প্রগতিবাদী দলের সমর্থনে ও তাঁহাদের সহযোগিতায় কংগ্রেসের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠা করিতে পারেন ও জনসেবার ক্ষেত্রে নিঃস্বার্থ কার্যের দ্বারা জনগণের দুর্গতি মোচনে অনেক কাজ করিতে পারেন। বিশেষত যে সমস্ত প্রদেশে ৯৩ ধারার শাসন প্রবর্তিত আছে, যে সমস্ত প্রদেশে কংগ্রেস সংখ্যাগরিষ্ঠ, সে সমস্ত প্রদেশেও জনগণের কল্যাণ সাধনে কংগ্রেস আত্মনিয়োগ করিতে পারেন। মন্ত্রিত্ব গ্রহণে কংগ্রেসের বিমুখতার সুযোগ লইয়া এই সমস্ত প্রদেশে প্রতিক্রিয়াশীল দলগুলি, ব্রিটিশ আমলাতন্ত্রের প্রশ্রয়পুষ্ট হইয়া যে ক্ষমতার অপব্যবহার করিয়াছে, তাহা কাহারও অবিদিত নাই। কংগ্রেস সীমান্তে ও আসামে কংগ্রেসী মন্ত্রিমণ্ডল গঠনে অনুমতি দান করিয়াছেন। আমাদের মতে অন্যান্য প্রদেশকেও এইরূপ অনুমতি দান করা কর্তব্য। নির্বাচনদ্বন্দ্বে কংগ্রেসকে প্রতিযোগিতায় আহ্বান করিয়া লীগ বহ্বাস্ফোট করিতেছে। কংগ্রেসের পক্ষে আশু কর্তব্য সমস্ত জাতীয়তাবাদী ও প্রগতিবাদী দলের সহিত ঐক্যবদ্ধ হইয়া লীগের এই স্পর্ধা চূর্ণ করা এবং লীগের যে যৎসামান্য প্রভাব রহিয়াছে, তাহার সম্পূর্ণরূপে উচ্ছেদসাধন করা। কংগ্রেস মন্ত্রিত্ব গ্রহণ না করিলে লীগের মত প্রতিক্রিয়াপন্থী দলেরই সুযোগ ঘটিবে এবং এদেশের সামাজিক জীবন নানা দুর্গতি ও ভেদনীতির ক্লেদপঙ্কে পর্যুদস্ত হইবে।

কলিকাতায় দুগ্ধ সরবরাহ

কলিকাতা শহরে দুগ্ধের অপ্রাচুর্য ক্রমশই যেরূপ শোচনীয় হইয়া উঠিতেছে, তাহাতে যে দুগ্ধের দুর্ভিক্ষ আসন্ন, তাহা কলিকাতায় দুগ্ধ সরবরাহ সম্পর্কে বাঙলা সরকারের রিপোর্ট পাঠে বিশেষ করিয়া মনে হইল। এই রিপোর্ট হইতে জানা যায়, ১২ বৎসর ও তাহার নিম্নবয়স্ক এবং সন্তানবতী ও সন্তান-সম্ভবা রমণীদের জন্য মাথাপিছু দৈনিক এক পাউন্ড এবং অন্যান্য পূর্ণবয়স্কদের জন্য মাথাপিছু আধ পাউন্ড পড়তায় কলিকাতা শহরের মোট জনসংখ্যার জন্য দৈনিক ২০ হাজার ১ শত ১১ **মণ** দুগ্ধের প্রয়োজন। দুগ্ধজাত বস্তু প্রস্তুতের জন্য দৈনিক ১৯৪৬ ও সৈন্যবাহিনীর জন্য দৈনিক ৩০০ মণ দুগ্ধ আবশ্যক। সুতরাং এই হিসাবে দেখা যাইতেছে, কলিকাতার জন্য দৈনিক প্রায় ২২ হাজার মণ দুগ্ধ সরবরাহের প্রয়োজন। কিন্তু তাহার মধ্যে মাত্র ৩ হাজার ৭ শত মণ দুগ্ধ কলিকাতায় সরবরাহ করা হয়। এই হিসাব হইতে দেখা যাইতেছে, কলিকাতায় প্রত্যহ যে পরিমাণ দুগ্ধের প্রয়োজন, তাহার ছয়ভাগের একভাগ মাত্র সরবরাহ পাওয়া যায়। এরূপ ক্ষেত্রে চাহিদার টানে দুগ্ধ যে ক্রমশ তরল হইতে তরলতর হইবে এবং তাহার মূল্য উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইবে, তাহাতে আশ্চর্যের কিছুই নাই। কিন্তু দুগ্ধের এই দুর্ভিক্ষের কারণ কি? যুদ্ধের পূর্বে বাঙলার বাহির হইতে প্রতিবৎসর ৪০ হাজার গো-মহিষাদির আমদানী হইত। বর্তমানে ট্রেনে বুক করার অসুবিধায় নানাস্থান হইতে গরু ইত্যাদি রপ্তানি নিষিদ্ধ হইয়াছে। তাহার পরে গো-মড়কে বহু গরু মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছে। তাহার পর প্রত্যহ নির্বিচারে গো-হত্যা করা হইতেছে। কলিকাতা শহরে দুগ্ধের অপ্রতুলতা দূরীভূত করিতে হইলে গো-হত্যা যথাসম্ভব কমাইয়া যাহাতে গোজাতি রক্ষা পায়, বাঙলার বাহির হইতে আবশ্যক-সংখ্যক গরু আমদানী করা যায়, গরু উপযুক্ত আহার্য পায় ও গো-মড়ক নিবারিত হয়, তাহার ব্যবস্থা করা দরকার। কলিকাতায় দুগ্ধ সরবরাহেরও কোনরূপ সুপরিচালিত ও সুনির্দিষ্ট রীতি নাই। যদি ডেয়ারি ফার্ম ইত্যাদি যৌথ কারবার দ্বারা গোপালন ও দুগ্ধ সরবরাহ হয়, তাহা হইলে কলিকাতায় দুগ্ধ সরবরাহের উপর অনেকটা নির্ভর করা যায়। সরকারী রিপোর্টেও এইরূপ পরিকল্পনার আভাস দেওয়া হইয়াছে। কেবলমাত্র পরিকল্পনা নয়, জনস্বাস্থ্যের কল্যাণ কামনায় এ বিষয়ে অবিলম্বে বাঙলা গভর্নমেন্টের অবহিত হওয়া আবশ্যক। আমরা সরকারের তেমন কোন প্রচেষ্টার পরিচয়ই পাইতেছি না। আমাদের ভাগ্যের দোষ বলিতে হইবে।

প্রাদেশিক লাটগণের সম্মেলন

সিমলার নেতৃ-সম্মেলনের উৎসাহ-উত্তেজনা জুড়াইয়া যাওয়ার পর লর্ড ওয়াভেল নয়াদিল্লীতে প্রাদেশিক গভর্নরগণের এক সম্মেলন অনুষ্ঠান করিতে মনস্থ করিয়াছেন। সরকারীভাবে ঘোষণা করা হইয়াছে যে, আগামী ১লা ও ২রা আগস্ট এই সম্মেলন হইবে। সিমলা সম্মেলন শেষ হইয়া যাওয়ার পর হইতেই শোনা যাইতেছিল, লর্ড ওয়াভেল প্রাদেশিক গভর্নরগণের এক সম্মেলন আহ্বান করিবেন। প্রকাশ, এই সম্মেলনে প্রাদেশিক লাটগণকে সিমলা সম্মেলনের ফলাফল জানান হইবে এবং পরবর্তী কর্মপন্থা নির্ধারণ করা হইবে। কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক আইনসভাগুলির নির্বাচন ও রাজনৈতিক বন্দীদের মুক্তি সম্পর্কিত প্রশ্নও এই সম্মেলনে আলোচিত হইবে বলিয়া প্রকাশ। নয়াদিল্লীর এই আসন্ন প্রাদেশিক গভর্নরগণের সম্মেলন লইয়া বিলাতে নানারূপ জল্পনা-কল্পনার সূত্রপাত হইয়াছে। নয়াদিল্লীর লাট-সম্মেলনে কি কি বিষয় আলোচিত ও স্থিরীকৃত হইবে, তাহা এখনও ভবিষ্যতের গর্ভে নিহিত। সে সম্বন্ধে এখনও কোন অনুমান করা চলে না। ৯৩ ধারা শাসিত প্রদেশগুলির স্বৈরশাসনের অবসান ঘটাইয়া যদি নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় এবং তাহার ফলে জনগণের দ্বারা সমর্থিত মন্ত্রিমণ্ডল গঠিত হয়, তবে তদ্দ্বারা দেশের কল্যাণ সাধিত হইতে পারিবে। তবে এই নির্বাচনে সর্বসাধারণকে অকৃপণ সুযোগ দান করিতে হইলে, এখনও যে সমস্ত রাজনৈতিক কর্মী কারারুদ্ধ আছেন, তাঁহাদিগকে অবিলম্বে মুক্তিদান করা আবশ্যক। কারণ রাজনৈতিক বন্দিগণের মধ্যে অনেকেই বিদেশীরা যাহাই মনে করুক, জনসাধারণের শ্রদ্ধা ও আস্থাভাজন। তাঁহারা যদি আইনসভাগুলিতে নির্বাচিত হন তবে জনসেবার ক্ষেত্রে আত্মনিয়োগ করিবার সুযোগ তাঁহারা লাভ করিবেন এবং তাহার ফলে প্রতিক্রিয়াপন্থী দলের ও স্বার্থান্ধ চক্রান্তের অবসান অথবা তাহার সঙ্কোচসাধন হইবে। ৯৩ ধারা শাসিত প্রদেশগুলির মধ্যে বাঙলার অবস্থা সর্বাপেক্ষা অদ্ভুত। বাঙলার সর্বজনশ্রদ্ধেয় নেতা শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র বসু এখনও কারারুদ্ধ। তিনি কারামুক্ত হইলে, যদি সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়, তবে সাম্রাজ্যবাদী বিদেশীদের অনুগৃহীত দল যে এখানে মাথা তুলিতে পারিবে না ইহা নিশ্চিত। বাঙলা আইনসভায় তাঁহার মত একজন প্রভাব প্রতিপত্তিশালী নেতা সদস্যরূপে নির্বাচিত হইলে বাঙলার প্রগতি ও জাতীয়তাবাদী দলের শক্তি বৃদ্ধি পাইবে এবং তাহার ফলে আইনসভায় প্রতিক্রিয়াশীল লীগ দলের প্রতিপত্তি খর্ব এমন কি নিশ্চিত। তবে ব্রিটিশ গভর্নমেন্ট দেশবাসীর ব্যাপক আবেদন-নিবেদন সত্ত্বেও যেরূপ নির্লিপ্ত মনোভাবের পরিচয় প্রদান করিতেছেন, তাহাতে আশঙ্কা হয়, প্রকারান্তরে বাঙলায় প্রতিক্রিয়াশীল দলের প্রভাব জীয়াইয়া রাখিয়া তাঁহারা এখনও বঙ্গব্যাপী বিক্ষোভের সম্মুখীন হইতে চাহেন। লাট সম্মেলনে কি সিদ্ধান্ত হয় এবং গভর্নমেন্টের ভবিষ্যৎ কার্যক্রম কি রূপ পরিগ্রহ করে, তাহা লক্ষ্য করিবার বিষয়।

বাঙলার দুর্ভিক্ষের জন্য দায়িত্ব

বাঙলার বুকের উপর দিয়া পঞ্চাশের মন্বন্তরের ও মহামারীর যে বীভৎস মর্মন্তুদ তাণ্ডবলীলা বহিয়া গেল, এবং তাহার জন্য বাঙলার জনশক্তির যে শোচনীয় অপচয় হইয়াছে, তাহার স্মৃতি কখনও ভুলিবার নহে। অন্য কোন স্বাধীন দেশ হইলে, এই শোকাবহ ঘটনা যাঁহাদের অযোগ্যতা ও অবিমৃষ্যকারিতার ফলে ঘটিয়াছে, যুদ্ধাপরাধীর তালিকায় তাঁহাদের নামও অন্তর্ভুক্ত হওয়া এবং তজ্জন্য বিচারে তাঁহাদের কঠোরতম দণ্ডে দণ্ডিত হওয়া কিছুমাত্র অসম্ভব ও অস্বাভাবিক ছিল না। কিন্তু পরাধীন দেশের দুর্ভাগ্য-নিপীড়িত জনগণের পক্ষে অসহনীয় বলিয়া কিছুই নাই। দুর্ভিক্ষের দায়িত্বরূপ দুরপনেয় ও ক্ষমার অযোগ্য কলঙ্ক হইতে যাঁহারা মুক্ত নহেন, তাঁহারা সে দায়িত্ব অনায়াসে ঝাড়িয়া ফেলিতে এবং জনগণের সমক্ষে নিজেদের সাফাই গাহিতে, তাই তাঁহাদর নির্লজ্জ স্পর্ধার ও অতি অশোভন সাহসের অভাব হয় না। দুর্ভিক্ষ তদন্ত কমিশন ১৯৪৩ সালের দুর্ভিক্ষের জন্য বাঙলা গভর্নমেণ্টকে দায়ী করিয়াছেন,—সম্প্রতি এক সাংবাদিক সভায় স্যার নাজিমুদ্দীনকে এ কথা স্মরণ করাইয়া দিলে, তিনি বলেন, এজন্য তাঁহার মন্ত্রিমণ্ডল দায়ী নহেন, কারণ অধিকাংশ ব্যাপারই ঘটে হক্ মন্ত্রিসভার আমলে। লক্ষ্ণৌয়ে মুসলিম লীগের উদ্যোগে অনুষ্ঠিত এক সভায় স্যার নাজিমুদ্দীন এই কথারই প্রতিধ্বনি করিয়াছেন। উক্ত সভায় বাঙলার দুর্ভিক্ষের কথা উল্লেখ করিয়া তিনি বলেন,—উডহেড কমিটির রিপোর্ট মনোযোগ সহকারে পাঠ করিলে দেখা যাইবে যে, রিপোর্টে যেসব সমালোচনা করা হইয়াছে, তাহার অধিকাংশই মিঃ ফজলুল হক্ ও ডাঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় যখন মন্ত্রিমণ্ডলীতে ছিলেন, সেই সময়কার বাঙলা গভর্নমেণ্টকে লক্ষ্য করিয়াই সেসব মন্তব্য করা হইয়াছে। এই ধরণের ফাঁকা ছেঁদো কথায় স্যার নাজিমুদ্দীন অজ্ঞ জনসাধারণের চক্ষে ধূলা দিতে পারেন। কিন্তু সর্বাপেক্ষা বিস্ময়বোধ হইতেছে এই ভাবিয়া যে, ১৯৪৩ সালে যে ঘটনাবলী ঘটিয়া গিয়াছে, তাহা এই মাত্র

স্মৃতিভ্রংশ সমস্ত লোকেরই হইবে, এই ধারণা করিয়া লইয়া এইরূপ ভিত্তিহীন উক্তি তিনি নিতান্ত নির্লজ্জের মত করিলেন কিরূপে? তিনি বলিয়াছেন,—অধিকাংশ ব্যাপারই হক্ মন্ত্রিমণ্ডলের আমলে ঘটে। এই "অধিকাংশ ব্যাপার" বলিতে তিনি কি বুঝেন? যে অতি অশোভন ও লজ্জাকর উপায়ে ১৯৪৩ সালের ২৮শে মার্চ তারিখে তদানীন্তন বাঙলার লাট স্যার জন্ হার্বার্ট মিঃ ফজলুল হক্‌কে মন্ত্রিত্ব ত্যাগ করিতে বাধ্য করেন, তাহা নিশ্চয়ই স্যার নাজিমুদ্দীনের স্মরণে আছে। দুর্ভিক্ষ তদন্ত কমিশনের রিপোর্টের একস্থানে বলা হইয়াছে—"১৯৪৩ সালের মে মাসে বাঙলা গভর্নমেণ্ট পূর্ব অঞ্চলে অবাধ বাণিজ্যের জন্য জেদ প্রকাশ করিয়া ভ্রমে পতিত হ'ন। ইহাতে উক্ত অঞ্চলে ব্যাপক দুর্দশা ও অনাহার দেখা দেয়।" উক্ত রিপোর্টের আর একস্থানে বলা হইয়াছে—"ভারতের অন্যান্য স্থান হইতে খাদ্যবস্তু প্রাপ্তির, মজুতের ও বণ্টনের যে ব্যবস্থা ১৯৪৩ **সালের শরৎকালে** অবলম্বিত হয়, তাহাও নিতান্ত ত্রুটিপূর্ণ ছিল। এই সময় যখন দুর্ভিক্ষের তাণ্ডব চলিতেছিল, তখন বাঙলা গভর্নমেণ্টের হাতে যে খাদ্যশস্য ছিল, তাহাও অভাবগ্রস্ত জেলাগুলিতে পাঠাইবার ব্যবস্থা হয় নাই।" ১৯৪৩ সালের মে মাসে ও শরৎকালে মিঃ ফজলুল হক্ ও ডাঃ শ্যামাপ্রসাদ নিশ্চয়ই মন্ত্রিত্বের আসন দখল করিয়া ছিলেন না। উডহেড্ কমিটির বাঙলার দুর্ভিক্ষ সম্পর্কে এই মন্তব্যগুলি কোন্ মন্ত্রিমণ্ডলকে লক্ষ্য করিয়া করা হইয়াছে, স্যার নাজিমুদ্দীন বলিতে চান? মিঃ ফজলুল হক্ ও বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার জাতীয়তাবাদী দলের নেতা শ্রীযুক্ত হরিদাস মজুমদার তাঁহার এই উক্তির যথাযোগ্য প্রতিবাদ করিয়াছেন। আমরা এতৎসম্পর্কে তাঁহাকে কয়েকটি প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতে চাই: (১) মিঃ ফজলুল হকের মন্ত্রিত্বের আমলে কি চাউলের দর ১৫৲ হইতে ২০৲ টাকার মধ্যে ছিল না এবং তাঁহার মন্ত্রিমণ্ডলের আমলে চাউলের দর ধারণাতীতরূপে বাড়িয়া কলিকাতায় ৪০৲ ত্রিপুরায় ৮০৲ ও ঢাকায় ১০০৲ টাকা পর্যন্ত হয় নাই? (২) তৎকর্তৃক ১৯৪৩ সালের ২৪শে এপ্রিল লীগ মন্ত্রিমণ্ডলের কার্যভার গ্রহণের ১২ দিন পরে ৮ই মে তারিখে মিঃ এইচ এস সুরাবর্দী কি বলেন নাই—"বাঙলার জনসাধারণের জন্য যথেষ্ট খাদ্যশস্য রহিয়াছে!" (৩) ইহার পর ১৪ই মে বাঙলার লীগ মন্ত্রিসভার সমর্থক মিঃ আজিজুল হক্ কি বলেন নাই—"বাঙলায় এখনও চাউলের ঘাট্‌তি হয় নাই। এক সপ্তাহের মধ্যেই চাউলের দর বেশ কিছু কমিবে।" (৪) তাঁহারই প্রধান মন্ত্রিত্বের **আমলে** কি ৪ঠা মে তারিখের অসামরিক সরবরাহ বিভাগ কর্তৃক প্রচারিত এক প্রেস নোটে বলা হয় নাই—"মাননীয় মন্ত্রীর এ বিষয়ে দৃঢ় বিশ্বাস আছে যে, এ বৎসর কোন ঘাট্‌তি হইলেও, ১৯৪১-৪২ সালের বাড়তি হইতে তাহা পূরণ করা হইবে।...... মোটের উপর বাঙলায় যখন দুর্ভিক্ষের ভয়াবহ তাণ্ডব চলিতেছিল, স্যার নাজিমুদ্দীনের গভর্নমেণ্ট তখন জনসাধারণকে অলীক আশ্বাসবাণী শুনাইতেছিলেন ও বাঙলার বাহিরে ভারতের সর্বত্র, এমনকি বিলাতেও বাঙলার দুর্ভিক্ষের গুরুত্ব ও ভয়াবহতা সম্বন্ধে ভ্রান্ত ধারণা সৃষ্টি করিতেছিলেন। এইরূপভাবে যতই পর্যালোচনা করা যাইবে, ততই দেখা যাইবে, বাঙলার দুর্ভিক্ষের জন্য স্যার নাজিমুদ্দীনের মন্ত্রিমণ্ডলী ও কেন্দ্রীয় সরকার উভয়েই সমভাবে দায়ী। বাঙলার দুর্ভিক্ষের ভয়াবহরূপ সম্পর্কে কেন্দ্রীয় সরকার নিশ্চয়ই অবগত ছিলেন। এদেশের সংবাদপত্রগুলিতে দুর্ভিক্ষের করাল রূপ প্রত্যহই প্রকটিত হইত এবং তাহাতে কেবল সমগ্র ভারত নহে, পৃথিবীর অন্যান্য দেশও স্তম্ভিত হইয়াছিল। কিন্তু কেন্দ্রীয় সরকার বাঙলার দুর্ভিক্ষের প্রকৃত তথ্য অবগতির জন্য কোনরূপ আগ্রহ প্রকাশ করেন নাই, বরং নিষ্ক্রিয় ঔদাসীন্যের পরিচয়ই দিয়াছেন। তাঁহাদেরই মুখে ঝাল খাইয়া বিলাতে পার্লামেণ্টের সভায় মিঃ আমেরী বাঙলার দুর্ভিক্ষের উপর কোনরূপ গুরুত্ব আরোপ করেন নাই। পঞ্চাশের মন্বন্তরে বাঙলার যে ক্ষয়-ক্ষতি হইবার, তাহা হইয়াছে। কিন্তু আমরা স্যার নাজিমের মিথ্যা উক্তির সাহায্যে আত্মদোষ ক্ষালনের অপচেষ্টা ও দুঃসাহস দেখিয়া বিস্মিত হইতেছি।

রাজবন্দিগণের মুক্তি

বাঙলার রাজবন্দিগণের স্বাস্থ্য সম্পর্কে যে সমস্ত সংবাদ পাওয়া যাইতেছে, তাহাতে যথেষ্ট উদ্বেগের সঞ্চার হইয়াছে। কয়েকদিন পূর্বে নিরাপত্তা বন্দী শ্রীযুক্ত সত্যরঞ্জন বক্সী সম্বন্ধে মিঃ রফি আহম্মদ কিদোয়াই বলিয়াছেন—"শ্রীযুক্ত বক্সী অসুস্থ। তিনি অত্যন্ত দুর্বল হইয়া পড়িয়াছেন। কাহারও সাহায্য ব্যতীত তিনি শয্যা হইতে নড়িতে পারেন না। তিনি ঘন ঘন হৃদ্‌রোগে আক্রান্ত হইতেছেন। জেলে কোনরূপ সুচিকিৎসার ব্যবস্থা নাই।" শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র বসু মহাশয়ের একমাত্র জীবিত পুত্র নিরাপত্তা বন্দীরূপে পাঞ্জাবের ক্যাম্বেলপুর জেলে আটক ছিলেন। তথা হইতে তাঁহাকে লাহোর সেণ্ট্রাল জেলে এবং তাহার পর লাহোরের মেয়ো হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হইয়াছে। তাঁহার স্বাস্থ্য সম্বন্ধেও উদ্বেগজনক সংবাদ পাওয়া গিয়াছে। প্রেসিডেন্সি জেল হইতে কিছুদিন পূর্বে মুক্ত শ্রীযুক্ত অশ্বিনীকুমার গুপ্ত যে বিবৃতি প্রদান করিয়াছেন, তাহা হইতে জানা যায়, প্রদেশের নানা জেল হইতে রোগাক্রান্ত বন্দিগণকে প্রেসিডেন্সি জেলে আনিয়া জমা করা হইতেছে। এতগুলি রুগ্ন বন্দীর একত্র সমাবেশ যে তাঁহাদের স্বাস্থ্যের পক্ষে কখনও হিতকর হইতে পারে না, তাহা অনায়াসেই বলা চলে এবং আমরা তজ্জন্য উদ্বেগ বোধ করিতেছি। তিনি ১৮ জন রাজবন্দীর নাম উল্লেখ করিয়াছেন, যাঁহাদের স্বাস্থ্য সম্পূর্ণরূপে ভাঙিগয়া পড়িয়াছে। তদ্ভিন্ন তিনজন রাজবন্দিনীর নাম উল্লেখ করিয়াছেন যাঁহারা যক্ষ্মারোগে ও সাতজন বন্দী দুরারোগ্য ব্যাধিতে ভুগিতেছেন। সদ্যমুক্ত শ্রীযুক্ত জিতেন্দ্রনাথ কুশারী ও কালীপদ মুখোপাধ্যায় বন্দীদের সম্পর্কে যে বিবৃতি প্রদান করিয়াছেন, তাহাতে স্বতঃই উৎকণ্ঠিত হইতে হয়। সর্বাপেক্ষা বিস্ময়ের বিষয় এই যে, এতগুলি বন্দীর একসঙ্গে পীড়িত হইবার কারণ কি এবং পীড়িত শয্যাগত বন্দিগণকে গভর্নমেণ্ট এখনও কেন আটক রাখিয়াছেন এবং তাঁহাদের মুক্তি সম্বন্ধে শোচনীয় হৃদয়হীনতার পরিচয় দিতেছেন। কারাভ্যন্তরে এই সমস্ত বন্দীদের সুচিকিৎসার কোনরূপ ব্যবস্থা নাই। তাঁহাদের চিকিৎসার জন্যও তাঁহাদের অবিলম্বে মুক্তি প্রদান করা আবশ্যক। গভর্নমেণ্ট ইঁহাদের স্বাস্থ্যের শোচনীয় অবস্থার কথা এখনও উপলব্ধি করিতেছেন না, ইহা পরম আশ্চর্য ও দুঃখের বিষয়। ১৯৪২ সালের আগস্ট মাসের পর হইতে জাপানী আক্রমণের অজুহাতে ইঁহাদিগকে বন্দী রাখা হইয়াছে। শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র বসুকেও ঐ একই কারণে বন্দী রাখা হইয়াছে বলিয়া কর্তৃপক্ষের কৈফিয়ৎ শুনিতে পাই। কারাগারে তাঁহারও স্বাস্থ্য শোচনীয়রূপে ভাঙিগয়া পড়িয়াছে এবং তাঁহার মুক্তির জন্য দেশব্যাপী আন্দোলন হইতেছে। ইঁহাদের কাহাকেও আদালতে বিচারার্থ উপস্থিত করা হয় নাই, কিংবা ইঁহাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ প্রমাণিত করা হয় নাই। এতৎসম্পর্কে যে জাপানী আক্রমণের অজুহাত দেখান হইয়া থাকে, তাহার আশঙ্কা সম্পূর্ণ দূরীভূত হইয়াছে। কিন্তু তৎসত্ত্বেও বিনাবিচারে এতগুলি ব্যক্তিকে আটক রাখিবার কি যুক্তি থাকিতে পারে, তাহা ধারণার বহির্ভূত। লর্ড ওয়াভেল ঘোষণা করিয়াছিলেন, পরিকল্পিত শাসন-পরিষদ গঠিত হইলে বন্দিমুক্তির প্রশ্ন সেই পরিষদের হাতেই ছাড়িয়া দিবেন। প্রস্তাবিত কেন্দ্রীয় পরিষদ যখন গঠিত হইল না, তখন লর্ড ওয়াভেলেরই কর্তব্য রাজবন্দিগণের মুক্তি সম্বন্ধে অবিলম্বে যথোপযুক্ত ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়া এতগুলি মূল্যবান জীবন রক্ষা করা।

দেশের কথা

(১লা শ্রাবণ হইতে ৭ই শ্রাবণ)

আলোচনার পরে—আগস্ট মাসের হাঙ্গামা—রেশনিং ও দুগ্ধ

আলোচনার পরে

সিমলায় লর্ড ওয়াভেলের আহ্বানে তাঁহার পরিকল্পনার আলোচনা ব্যর্থ হইবার পরে ব্যর্থতার কারণ ও ফল লইয়া আলোচনা—এ দেশে ও বিদেশে হইতেছে। পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু বলিয়াছেন,—সম্মেলন যাহাতে সফল হয় সেজন্য কংগ্রেস যথাসম্ভব চেষ্টা করিয়াছিলেন। কিন্তু উহার ব্যর্থতায় নিরাশ হইবার কোন কারণ নাই। কংগ্রেস স্বাধীনতালাভের জন্য যে চেষ্টা করিয়া আসিতেছেন, ওয়াভেল পরিকল্পনা ও সিমলায় বৈঠক তাহার নানা উপায়ের মধ্যে অন্যতম উপায়রূপে কংগ্রেস কর্তৃক পরিগৃহীত হইয়াছিল।

বিলাতে সম্মেলনের ব্যর্থতার সংবাদে "সানডে টাইমস", "অবজারভার", "নিউজ ক্রনিকল", "ডেলী মেল" প্রভৃতি পত্র ব্যর্থতার জন্য মিঃ জিন্নাকে ও তাঁহার দ্বারা শাসিত মুসলিম লীগকে দায়ী করিয়াছেন।

পাঞ্জাবের প্রধান সচিব মালিক খিজির হায়াৎ খান সিমলা ত্যাগ করিবার পূর্বেই বলিয়াছিলেন,—মিঃ জিন্না কংগ্রেসের সহিত মতভেদ উপেক্ষা করিয়া তাঁহাকেই আক্রমণ করিয়াছেন; এবং লর্ড ওয়াভেল পরস্পরকে আক্রমণ করিতে বিরত থাকিতে অনুরোধ করিলেও, সে অনুরোধ রক্ষা করেন নাই। মিঃ জিন্না যে দাবী করিয়াছেন, কেবল মুসলিম লীগই শাসন-পরিষদে মুসলমান সদস্য মনোনয়নের অধিকারী—তাহা স্বীকার করা যায় না।

সিমলা হইতে দিল্লীতে আসিয়া লর্ড ওয়াভেল প্রাদেশিক গভর্নরদিগকে আগামী ১লা ও ২রা আগষ্ট তাঁহার সহিত আলোচনা বৈঠকে সম্মিলিত হইতে নির্দেশ দিয়াছেন। সম্মেলনের ব্যর্থতার পরে কি করা হইবে, কেন্দ্রী ও প্রাদেশিক ব্যবস্থা পরিষদ সমূহের সভ্য নির্বাচন সম্বন্ধে কি ব্যবস্থা অবলম্বিত হইবে ও রাজনীতিক কারণে আটক বন্দীদিগকে মুক্তিদান করা কর্তব্য কি না—এই সকল বিষয় বৈঠকে আলোচনা হইবে বলিয়া অনেকে অনুমান করিতেছেন।

বিলাতে অনেকের অনুমান—যে সকল প্রদেশ এখন ভারতশাসন আইনের ৯৩ ধারা অনুসারে গভর্নরের দ্বারা শাসিত সে সকলে পুনরায় প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন প্রবর্তিত করা অর্থাৎ সচিবসঙ্ঘ গঠন লর্ড ওয়াভেলের অভিপ্রেত।

নৈনীতালে (২১শে জুলাই) পণ্ডিত গোবিন্দবল্লভ পন্থ বলিয়াছেন, যখন মুসলিম লীগ ব্যতীত আহূত আর সকল দলই শাসনের দায়িত্ব গ্রহণ করিতে সম্মত ছিলেন, তখনও যে বৃটিশ সরকার লীগের সভাপতি মিস্টার জিন্নাকে সব ব্যবস্থা ব্যর্থ করিতে দিয়াছেন, তাহাতে বলিতে হয়—সম্মেলনের ব্যর্থতার জন্য বৃটিশ সরকারই দায়ী।

আমেরিকায় (২২শে জুলাই) তখন ভারতীয় লীগের সভাপতি মিস্টার জে জে সিংহ বলিয়াছেন—যখন অধিকাংশ ভারতীয় একযোগে কাজ করিতে সম্মত ছিলেন, তখন যে বৃটিশ রাজনীতিকরা সংখ্যাগরিষ্ঠ সমস্যায় অকারণ অতিরিক্ত গুরুত্ব আরোপ করিয়া সিমলা সম্মেলন ব্যর্থতায় পরিণত হইতে দিয়াছেন, তাহাতেই বুঝিতে হয়, দোষ বৃটিশ সরকারের। তাঁহার বিশ্বাস বৃটিশের রুশিয়া ভীতি সিমলা সম্মেলনের ব্যর্থতার কারণ। বৃটেন মধ্য প্রাচীর আরব রাজ্যগুলির প্রীতি অর্জনের চেষ্টা করিতেছে। মধ্য প্রাচীতে রুশিয়ার ক্রমবর্ধমান প্রভাব প্রহত করিবার জনাই বৃটেন ঐ সকল রাজ্যকে আদর করিতেছে। বৃটিশ সরকার, বোধহয়, আশঙ্কা করিয়াছেন, তাঁহারা ভারতে মিস্টার জিন্না ও তাঁহার মুসলমান অনুবর্তীদিগের দাবী অস্বীকার করিলে মধ্যপ্রাচীতে আরব রাষ্ট্রসমূহের অপ্রীতিভাজন হইবেন এবং সেই সকল রাষ্ট্রের উপর রুশিয়ার প্রভাব বর্ধিত হইতে পারে। হয়ত সেই জন্য বৃটেনের কোন কোন রাজনীতিক লর্ড ওয়াভেলের পরিকল্পনা ব্যর্থ করিয়া দিবার জন্য উপদেশ বা নির্দেশ দিয়াছিলেন। এই অনুমান সত্য কিনা, তাহা কে বলিতে পারে?

আগস্ট মাসের হাঙ্গামা

আগস্ট মাসের (১৯৪২ খৃষ্টাব্দের) হাঙ্গামার জন্য ভারত সরকার কংগ্রেসকে দায়ী করিবার চেষ্টাই করিয়া আসিয়াছেন। কংগ্রেসের নেতারা বিনাবিচারে বন্দী হইবার পরে সেই হাঙ্গামা আরম্ভ হয়। কাশ্মীরের পথে লাহোর রেল স্টেশনে ১লা শ্রাবণ পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু বলিয়াছিলেন, সেই আলোড়নের তুলনা—১৮৫৭ খৃষ্টাব্দের সিপাহী বিপ্লব। "১৯৪২ খৃষ্টাব্দে যে সকল ঘটনা ঘটিয়াছিল, সে সকলের জন্য আমি গর্বানুভব করি। লোক যদি নম্রভাবে বৃটিশ সরকারের কাজ গ্রহণ করিত, তবে আমি দুঃখিত হইতাম।" যেভাবে নেতৃহীন, ব্যবস্থাহীন, আয়োজন হীন, অস্ত্রহীন জনগণ স্বতঃই নিরাশা চালিত হইয়া কার্যে প্রবৃত্ত হইয়াছিল, তাহা ভাবিলে স্তম্ভিত হইতে হয়। তাহারা সাহসে ভর করিয়া বহু ত্যাগ স্বীকার করিয়াছিল—অনেক সহ্য করিয়াছিল। নিরাপদ স্থানে বসিয়া সেই আন্দোলনের অনেক ত্রুটি প্রদর্শন করা যায়। হয়ত সেই আন্দোলন সম্পর্কে যে সকল কাজ হইয়াছিল, সে সকলেরই সমর্থন করা যায় না। কিন্তু যাহারা দেশকে ভ্রান্ত করিবার চেষ্টা করিয়াছিল, লোকের কাজের সমালোচনাই করিয়াছিল, তাহারা কাপুরুষ ব্যতীত আর কিছুই নহে। "লোক ভুল করিয়াছিল—কিন্তু অগ্রগামীই হইয়াছিল। পুলিশ ও সৈনিকরা অনেক স্থানে গুলী চালাইয়াছিল। কিন্তু লোক ভয় পায় নাই।"

গত ৪ঠা শ্রাবণ আন্দোলন সম্পর্কে ডাক্তার পট্টভী সীতারামিয়া তাঁহার বিবৃতি প্রচার করিয়াছেন। মাদ্রাজ সরকার আগস্ট মাসের হাঙ্গামা সম্পর্কে যে বিবৃতি প্রচার করিয়াছেন, তাহাতে ১৯৪২ খৃষ্টাব্দে অন্ধ্র প্রদেশের কংগ্রেস কর্মীদিগের জন্য প্রচারিত এক বিজ্ঞাপনের উল্লেখ ছিল। ডাক্তার সীতারামিয়া বলেন, তিনিই সেই বিজ্ঞাপন রচনা করিয়াছিলেন এবং তিনিই তাহার জন্য দায়ী। তিনি গান্ধীজীর নিকট হইতে লব্ধ নির্দেশানুসারে ঐ বিজ্ঞাপন প্রচার করিয়াছিলেন। ১৪ই জুলাই কংগ্রেসের কার্যকরী সমিতির অধিবেশনের পরে গান্ধীজীর সহিত আলোচনার ফলে তিনি নির্দেশ লাভ করিয়াছিলেন। ঐ বিজ্ঞাপনে যে কার্যপদ্ধতি প্রদত্ত হইয়াছিল, তাহাতে মিউনিসিপ্যাল ট্যাক্স ব্যতীত আর সব ট্যাক্স বন্ধের ও টেলিগ্রাফের তার কাটার কথা ছিল। গান্ধীজীর মনে টেলিগ্রাফের তার কাটা নিষিদ্ধ ছিল না বটে, কিন্তু অনুমোদিতও নহে। গান্ধীজী যে "প্রকাশ্য বিপ্লবের" অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়াছিলেন, উল্লেখিত বিজ্ঞাপনে বিবৃত সকল উপায়ই তাহার উপায় ছিল, কেবল রেলের পাটী তুলিয়া ফেলা এবং মাল গাড়িতে বা যাত্রী গাড়িতে অগ্নিযোগ বিশেষভাবে নিষিদ্ধ ছিল। তিনি (ডাক্তার সীতারামিয়া) ১৪ই জুলাই (১৯৪২ খৃঃ) তারিখের নিখিল ভারত কংগ্রেস কার্যকরী সমিতির অধিবেশনের পরেই প্রত্যাবৃত্ত হইয়া অন্ধ্র প্রাদেশিক কংগ্রেস কার্যকরী সমিতির এক অধিবেশন ব্যবস্থা করেন। তাহাতে জেলা কমিটিসমূহের সভাপতি ও সম্পাদকগণও আহূত হইয়াছিলেন। মশুলীপট্টমে তাঁহারই গৃহে ঐ অধিবেশন হয় এবং

তাহাতে অন্ধ্রের নানাস্থান হইতে ২৮জন কংগ্রেস কর্মী সমবেত হইলে তিনি নির্দেশ জানাইয়া বলেন—বোম্বাই শহরে নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির অধিবেশন হইতে অনুমতি পাইলেই ঐ সকল কার্যপদ্ধতি অবলম্বন করিতে হইবে।

৭ই শ্রাবণ তিনি বলিয়াছেন, গান্ধীজীর সহিত আলোচনায় তিনি যাহা বুঝিয়াছিলেন, তাহাই তিনি বিজ্ঞাপনে লিপিবদ্ধ করিয়াছিলেন—গান্ধীজী বিজ্ঞাপনের বিষয় জানিতেন না।

গত ২রা শ্রাবণ কটকে শ্রীযুক্ত বিশ্বনাথ দাসের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এক সভায় শ্রীযুক্ত হরেকৃষ্ণ মহাতাপ বলেন, যখন বৃটেন স্বৈরশাসনবিলাসী ইতালীর ও জাপানের সহিত বন্ধুত্ব করিতেছিল, তখনই কংগ্রেস যুদ্ধ সম্বন্ধে নিজ মনোভাব ব্যক্ত করিয়াছিল। তিনি বলেন, ১৯৪২ খৃষ্টাব্দের আগস্ট মাসে গৃহীত প্রস্তাব কংগ্রেসের ইতিহাসের অন্যতম সমুজ্জ্বল অধ্যায়। তাহাতে স্বৈরশাসনের বিরুদ্ধে যুদ্ধে বৃটেনের সহিত কংগ্রেসের সহযোগের মনোভাব—সংখ্যালঘিষ্ঠ সম্প্রদায় সম্বন্ধে ও আত্মনিয়ন্ত্রণ সম্পর্কে কংগ্রেসের মত সুস্পষ্টরূপে ব্যক্ত হইয়াছিল।

কংগ্রেসের ঐক্য ও রাজনীতিক কারণে বন্দীর মুক্তি

১৪ই জুলাই পাটনায় ডক্টর রাজেন্দ্র প্রসাদ বলিয়াছিলেন—কংগ্রেস এখনও নিষিদ্ধ প্রতিষ্ঠান। একান্ত পরিতাপের বিষয়, কোন কোন প্রদেশে এখনও মত ও ব্যক্তি লইয়া কংগ্রেসে দলাদলি রহিয়াছে। গত ৩ বৎসর দেশের লোককে যে অনাহার-পীড়িত হইতে ও যে ত্যাগ স্বীকার করিতে হইয়াছে, তাহার ফলে আমাদিগের পক্ষে ঐক্যবদ্ধ হইয়া কাজ করাই সঙ্গত। বাঙলায় শ্রীযুক্ত কিরণশঙ্কর রায় কংগ্রেসের দুই দলে মিলনের প্রয়োজন প্রতিপন্ন করিয়া সে জন্য আগ্রহ প্রকাশ করিয়াছেন। মৌলানা আবুল কালামের যত্নে তাহা ঘটিতে বিলম্ব হইবে না। মৌলানা সাহেব রাজনীতিক কারণে বন্দীদিগকে মুক্ত করিবার জন্য লর্ড ওয়াভেলের সহিত পত্র ব্যবহার করিতেছেন বলিয়াছেন। সিমলায় কংগ্রেসী নেতৃবৃন্দের স্বাস্থ্য পরীক্ষার যে ফল ডক্টর বিধানচন্দ্র রায় বিবৃতিতে প্রকাশ করিয়াছিলেন—তাহাতেই বুঝা গিয়াছে (১৬ই জুলাই) বন্দিদশায় তাঁহাদিগের সকলেরই স্বাস্থ্য অস্বাভাবিক ক্ষুণ্ণ হইয়াছে। মৌলানা আবুল কালাম আজাদের দেহের ওজন সাড়ে ২২ সের কমিয়াছে এবং তিনি অল্পশ্রমেই শ্রান্ত হইয়া পড়েন। ইহা হইতেই অন্যান্য বন্দীর স্বাস্থ্যের অবস্থা অনুমান করা যায়। বাঙলায় প্রায় সকল স্থানে শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র বসু ও রাজনীতিক কারণে বন্দী অন্যান্য ব্যক্তির মুক্তির দাবী জানাইয়া সভা হইতেছে। মৌলানা আবুল কালাম আজাদ সিমলায় সম্মেলনের পরে জাতীয়তাবাদী (মুসলিম লীগের সহিত সম্পর্ক শূন্য) মুসলমানদিগকেও ঐক্যবদ্ধ করিবার প্রয়োজনের বিষয় বলিয়াছেন।

কংগ্রেসের কাজ

গত ২১শে জুলাই কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক মিস্টার কৃপালনী জানাইয়াছেন—নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির কার্যালয় এখনও সরকারের অধিকারে; কিন্তু এলাহাবাদে 'স্বরাজভবনে' কার্যকরী সমিতির কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে কাজ আরম্ভ হইয়াছে।

২২শে জুলাই মিস্টার কৃপালনী এক বিবৃতিতে জানাইয়াছেন—যতদিন নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটি ও বহু প্রাদেশিক কমিটি বে-আইনী বা সংকুচিত-ক্ষমতা ততদিন কংগ্রেসের কার্য কিভাবে পরিচালিত হইবে, সে সম্বন্ধে সাধারণভাবে কোন নির্দেশ প্রদান করা সম্ভব নহে। কাজেই প্রত্যেক প্রদেশকে স্থানীয় অবস্থা বিবেচনা করিয়া ব্যবস্থা করিতে হইবে।

রেশনিং ও দুগ্ধ

মিস্টার কার্বি ভারত সরকারের রেশনিং বিষয়ে পরামর্শদাতা। তিনি দিল্লীতে বলিয়াছেন (১৯শে জুলাই), যুদ্ধের পরেও ৩ হইতে ৫ বৎসর কাল রেশনিং চলিবে। এখন সরকারের খাদ্য দ্রব্য সম্বন্ধে সব হিসাব রচিত হইতেছে এবং যে ৫০ হাজার লোক রেশনিং কার্যে নিযুক্ত আছেন—তাঁহাদিগের অর্জিত অভিজ্ঞতার সুযোগও সরকার পাইবেন। কাজেই ভবিষ্যতে আর কখন তাঁহারা (গত দুর্ভিক্ষের সময়ের মত) অতর্কিত ব্যাপারে বিব্রত হইবেন না। যাহাতে খাদ্যদ্রব্যের মিশ্রণ পরিবর্তন করিয়া ঈপ্সিত ফল লাভ হয়, সে চেষ্টা করিতে হইবে। শ্রম কেন্দ্রে শ্রমিকদিগের আহারের ব্যবস্থা, দুগ্ধ সরবরাহ, বিদ্যালয়ে ছাত্রছাত্রীদিগকে আহার্য প্রদান—এই সকল সমস্যার সমাধান প্রয়োজন। তিনি আদর্শ আহার্যের দোকান প্রতিষ্ঠার ও লোককে আদর্শ খাদ্য সম্বন্ধে উপদেশ ও শিক্ষা দানের ব্যবস্থা করিতেও বলিয়াছেন।

কলিকাতায় দুগ্ধের অভাব কিরূপে হ্রাস করা যায় সেইজন্য বোম্বাই শহরে মিউনিসিপ্যালিটির অবলম্বিত ব্যবস্থা অধ্যয়ন করিবার জন্য বাঙলা সরকার যে দুইজন কর্মচারীকে বোম্বাই সহরে প্রেরণ করিয়াছিলেন, তাঁহারা ফিরিয়া আসিয়াছেন। শিশু, সন্তান-সম্ভবা ও শিশুসন্তানের মাতাদিগের জন্য মিউনিসিপ্যালিটির ব্যয়ে অপেক্ষাকৃত অল্প মূল্যে দুগ্ধ বিক্রয়ের যে ব্যবস্থা বোম্বাই শহরে হইয়াছে, কলিকাতায় তাহা প্রবর্তিত করিবার চেষ্টা হইবে বলিয়া শুনা যাইতেছে।

আসামের সচিবসংঘ

আসামে যে সচিবসংঘ রহিয়াছে, তাহা সম্মিলিত সচিবসংঘ। তাহা পতনোন্মুখ হইয়াছে। প্রকাশ কংগ্রেসপক্ষীয় সচিবদিগের কথা—গত মার্চ মাসে যে কথা হইয়াছিল, আসামে রাজনীতিক কারণে বন্দী সকলকেই মুক্তি দেওয়া হইবে, সচিবসংঘ সে কথা রক্ষা করেন নাই। মুসলিম লীগ দলের অভিযোগ—জমী বন্দোবস্ত সম্বন্ধে যে ব্যবস্থা করা হইয়াছিল, প্রধান সচিব ও মিস্টার আবদুল মাতিন চৌধুরীর অনুপস্থিতি কালে কংগ্রেসী ও হিন্দু সচিবরা একযোগে তাহা বর্জন করিয়া নূতন প্রস্তাব গ্রহণ করিয়াছেন। কংগ্রেসী নেতা শ্রীযুক্ত গোপীনাথ বরদলৈ প্রধান সচিব স্যার মহম্মদ সাদুল্লাকে জানাইয়া দিয়াছেন, তাঁহার দলের সিদ্ধান্ত না হওয়া পর্যন্ত ব্যবস্থা-পরিষদে কংগ্রেসী দল সরকারের সহিত সহযোগে বিরত থাকিবেন। কংগ্রেসী সচিবরা যদি পদত্যাগ করেন, তবে সচিবসংঘের পতন অনিবার্য হইবে। ২১শে জুলাই গৌহাটী হইতে প্রেরিত সংবাদে প্রকাশ আসামে রাজনীতিক অবস্থা—বিশেষ তথায় ব্যবস্থা পরিষদে যে সমস্যার উদ্ভব হইয়াছে, তাহা জানাইয়া শ্রীযুক্ত গোপীনাথ বরদলৈ রাষ্ট্রপতি মৌলানা আবুল কালাম আজাদকে পত্র লিখিয়াছেন অর্থাৎ সকল বিষয় কংগ্রেসকে জানাইয়াছেন।

শিবনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতির মামলার আপীল

ভারতরক্ষা নিয়মের ২৬ ধারা অনুসারে বাঙলা সরকারের আদেশে—(১) শিবনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, (২) বিজয় সিং নাহার, (৩) দেবব্রত রায়, (৪) নরেন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত, (৫) ননীগোপাল মজুমদার, (৬) নীহারেন্দু দত্তমজুমদার, (৭) বীরেন্দ্রচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় ও (৮) প্রতুলচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়—৮জনকে বন্দী করিয়া রাখা হয়। কলিকাতা হাইকোর্টের বিচারে তাঁহাদিগকে মুক্তি দিতে বলা হইলে সরকার যে আপীল করেন, তাহাতে ফেডারেল কোর্ট হাইকোর্টের রায় বহাল রাখায় সরকার বিলাতে প্রিভি কাউন্সিলে সেই বিচারের বিরুদ্ধে আপীল করিয়াছিলেন।

আপীল শুনানীর পূর্বে নরেন্দ্রনাথ ও বিজয় সিং মুক্তি পাইয়াছেন। অবশিষ্ট ৬জনের মধ্যে প্রিভি কাউন্সিল শিবনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও ননীগোপাল মজুমদারের আটক অসিদ্ধ বলিয়া তাঁহাদিগকে মুক্তিদানের নির্দেশ দিয়াছেন। অবশিষ্ট ৪জনের সম্বন্ধেই সরকারের আপীল মঞ্জুর হইয়াছে। ১৭ই জুলাই এই রায় প্রদান করা হইয়াছে।

মলিবডেনম্

কালীচরণ ঘোষ

জগতে সামান্য পরিমাণে ব্যবহৃত হইলেও প্রয়োজনীয়তায় মলিবডেনম্ বেশ উচ্চস্থান অধিকার করিয়াছে। প্রতি বৎসর ভ্যানেডিয়ম অপেক্ষা মলিবডেনম প্রায় পাঁচগুণ অধিক ব্যয় হয় এবং ইহার অধিকাংশ লৌহ ইস্পাত শিল্পে প্রয়োজন।

পরিচয়

মলিবডেনম-এ ধাতব উজ্জলতা আছে। স্বতন্ত্রভাবে, সাধারণত ইহাকে পাওয়া যায় না; অপরাপর মলযুক্ত অবস্থায় আকরিক প্রস্তর হইতে উদ্ধার করিতে হয়। ইহার প্রধান সূত্র মলিবডেনাইট (Sulphide) বা মলিবডেনাম গন্ধক প্রস্তর। অপরাপর "প্রস্তর"-এর মধ্যে উলফেনাইট (wilfenite) ও পাওয়েলাইট (powellite) উল্লেখযোগ্য।

গ্রীসীয় ভাষায় সীসকের নামে মলিবডেনম নামকরণ হইয়াছে। এই সময় কতকগুলি সীসক প্রস্তর, মলিবডেনাইট ও গ্রাফাইট সকল প্রস্তরকেই মলিবডেনম আখ্যা দেওয়া হইত।

মলিবডেনাইট ও গ্রাফাইটের ঘনিষ্ঠ সাদৃশ্য থাকায় বহুকাল ইহাদের একই বস্তু বলিয়া ভ্রম করা হইত। ১৭৭৮ সালে সুইডেনের প্রসিদ্ধ রাসায়নিক সিল (Scheele) ইহাকে গ্রাফাইট হইতে ভিন্ন বস্তু বলিয়া প্রতিপন্ন করেন। ইহার চার বৎসর পরে ১৭৮২ সালে বৈজ্ঞানিক হিলম (Hjelm) ইহাকে অন্যান্য মল হইতে স্বতন্ত্র করেন। বহির্দেশে ইহা লৌহের গুণসম্পন্ন বলিয়া তখন লোকে অবগত হইল।

পৃথিবীর বহু স্থানে বিক্ষিপ্ত অপরাপর মলের সহিত সংযুক্ত হইয়া মলিবডেনম অবস্থান করিতেছে। কিন্তু ব্যবহারিক জগতে এই সকল স্থানের মূল্য খুব বেশী নয়।

ভারতবর্ষ

জগতে মলিবডেনম উৎপাদনে ভারতবর্ষের কোনই স্থান নাই। স্থানে স্থানে ইহার ক্ষুদ্র ভাণ্ডার আছে, ভূতত্ত্ববিদরা এই পর্যন্ত বলিয়া থাকেন। ছোট নাগপুর, রাজপুতানার কিষণগড়ের নিকট মান্দাওরিয়ায় এবং ত্রিবাঙ্কুরের স্থানে স্থানে অপরাপর নানাপ্রকার ধাতু খনিজের সংমিশ্রণে মলিবডেনমের সন্ধান পাওয়া গিয়াছে।* ইহা ছাড়া হাজারিবাগ জেলায় মহাবাগ ও বারগণ্ডা নামক স্থানেও ইহার কিছু পরিচয় আছে।

দেশ হিসাবে অংশ

জগতের মলিবডেনম উৎখাতনে আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের স্থান কেবল সর্বপ্রথম নয়, একাধিপত্য বলিলে অত্যুক্তি হয় না। বৎসরে ১৬,৭০০ টন মলিবডেনম্ ধাতু পাওয়া যায়, তন্মধ্যে এক আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রে ১৫,৫৭৫ টন ধাতু পাওয়া যায়। বাকী অংশ মেক্সিকো, নরওয়ে, পেরু ও তুরস্কের ভাগে পড়ে। অস্ট্রেলিয়া, চিলি, ফরাসী অধিকৃত মরক্কো হইতে কতক পরিমাণ মলিবডেনম পাওয়া যায়।

১৯৩৯ ও ১৯৪০ সালে উৎখাত প্রস্তরে বিশুদ্ধ মলিবডেনম্ ধাতুর পরিমাণ

	১৯৩৯ মেট্রিক টন	১৯৪০ মেট্রিক টন
আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র	১৩,৭৫৫	১৫,৫৭৫
নরওয়ে	৪২৩	—
পেরু	১১৬	১৭৯

তুরস্ক ৪১ টন (১৯৩৮), চিলি ৩০ টন (১৯৩৯), ফরাসী অধিকৃত মরক্কো ১০০ টন (১৯৩৮), অস্ট্রেলিয়া ৩০ টন (১৯৩৮) মলিবডেনম ধাতু সরবরাহ করিয়াছে।

আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র

আমেরিকার মধ্যে কলোরাডো, ক্লাইম্যাক্স মাইন-এর নিকটে এবং মেইন প্রদেশে বা বিভাগে ক্যাথারাইন হিল (পর্বত) অঞ্চলে প্রচুর পরিমাণ মলিবডেনাইট প্রস্তর উৎখাত হইয়া থাকে।

নরওয়ে

পৃথিবীতে মলিবডেনম সরবরাহে নরওয়ের স্থান দ্বিতীয় হইলেও, আমেরিকার সহিত তুলনায় উহা কিছুই নহে। আমেরিকার কমবেশ ১৪,০০০ টনের স্থলে নরওয়ের মাত্র চার শত টন। নরওয়ের দক্ষিণ অঞ্চলে ফ্লেক্কেফিওর্ড (Flekkeford)-এর সন্নিকটে কুয়াবেহাইন (Knabehein)-এ প্রধান খনি অবস্থিত। অন্য কোনও স্থানের বিশেষ পরিচয় নাই।

পেরুর অংশ নামমাত্র, অর্থাৎ ১৫০ টন। অপরাপর স্থানের কথঞ্চিৎ মাত্র পরিচয় আছে। কুইন্সল্যান্ডের উলফ্রাসক্যাম্প (অস্ট্রেলিয়া) নিউ সাউথ ওয়েলস-এ গ্লেন ইন্নেস-এর সন্নিকটে কিংসগেট মাইন এবং লাম্বুলার নিকট হুইপ-স্টিক মাইন, (কানাডা), অন্টারিওতে রেনফ্রু (Renfrew) এবং উত্তর টাসমানিয়ায় মিডলসেক্স ও মাউন্ট ক্রড জেলায়, জাপানে সিরাকাওয়া হিডা প্রভৃতি স্থানে মলিবডেনম পাওয়া যায়।

ব্যবহার

টংস্টেন, নিকেল, ক্রোমিয়ম প্রভৃতির সংযোগে ধাতুকে কাঠিন্য দান করিতে মলিবডেনমের প্রধান ব্যবহার। তাহা ছাড়া ক্ষয়রোধ এবং হঠাৎ আঘাত বা সংঘাত (shock) সহ্য করিবার উপযোগী করিয়া ধাতু প্রস্তুত করিতেও মলিবডেনম্ বিশেষ সহায়তা করে। "স্টেলাইট" নামক মিশ্রিত ধাতুর এক প্রধান উপাদান মলিবডেনম। ইহা অম্লের (acid) প্রভাবমুক্ত এবং তীক্ষ্ণধার যন্ত্রের উপাদান হিসাবে ইহার বহুল প্রচলন আছে। মলিবডেনম ধাতু প্রধানত কোবাল্ট, ক্রোমিয়ম ও টংস্টেনযোগে ব্যবহৃত হয়।

বৃহদাকার কামান, জাহাজের "চাকা"র শলা (propeller shafts), যুদ্ধাস্ত্রের বম প্রভৃতি বহুতর প্রয়োজনের অতিশয় কঠিন দুর্ভেদ্য ধাতব চাদর বা আস্তরণ প্রস্তুতকার্যে মলিবডেনম্ কাজে লাগে।

নীল রঙ প্রস্তুত করিতে মলিবডেনম্ বিশেষ উপযোগী। এমোনিয়ম মলিবডেনেট মলিবডেনম ধাতু হইতে প্রস্তুত হইয়া থাকে, ইহা রাসায়নিক বিশ্লেষণ ও রঙ প্রস্তুতকার্যে ব্যবহৃত হয়।

ঝরণা কলমের মুখে আগে নিব প্লাটিনাম ধাতুর সহিত ইরিডিয়ম মিশাইয়া নির্মিত হয়। কিন্তু ৬০ ভাগ মলিবডেনম, টংস্টেন ১০, প্লাটিনাম ১০ এবং তামানিকেল খাদ ২০ ভাগ যোগে যে মিশ্রিত ধাতু উৎপাদিত হয়, তাহাতে প্রস্তুত নিব সর্বোৎকৃষ্ট বলিয়া পরিগণিত হইয়াছে।

আমাদের দেশে মলিবডেনম্ বিশেষ নাই, তাহা প্রবন্ধের সূত্রপাতেই উল্লেখ করা হইয়াছে, কিন্তু সেইরূপ আরও বহু দেশেই ত নাই, কিন্তু তাহারা আমাদের মত লৌহ বা ধাতব শিল্পে পিছাইয়া নাই। আশা হয়, শীঘ্রই আমাদের শিল্পপতিদের এ বিষয়ে দৃষ্টি আকৃষ্ট হইবে এবং আমাদের দেশেই মলিবডেনম্ ধাতুযোগে যে সকল পদার্থ প্রস্তুত হয়, তাহাও নির্মিত হইবে।

---

*Records of the Geological survey of India, Vol. XXXIX (1910), P. 268:—

"Molybdenite has been found in small plates in the crystalline rocks and in quartz in various parts of Chota Nagpur and also in elaeolite-sodalite—cancrinite pegmatite in Rajputana at Mandaoria, near Kishanggrh. Molybdenite also occurs disseminated through the Travancore pyrrhotites."

অনুবাদ সাহিত্য

সহযাত্রী

"আল্‌ফা অব্‌ দি প্লাউ"

অনুবাদকঃ **শ্রীশুভময় ঘোষ**

আমাদের মধ্যে কে যে আগে গাড়িতে উঠেছে তা জানি না। সে যে গাড়িতে রয়েছে তাই-ই প্রথমে জানতে পারিনি। লণ্ডন থেকে মফঃস্বলে ফিরবার শেষ গাড়িটা আস্তে আস্তে ঝিমিয়ে ঝিমিয়ে আফিং খোরের মত চলেছে; মনে হচ্ছে কিছুরই যেন শেষ নেই, সব কিছুই যেন কেবল চলেইছে। ফুরোতে চায়না কিছুতেই।

গাড়িতে যখন উঠলাম তখন বেশ ভীড় ছিল। কিন্তু দু ষ্টেশন পরেই সব ফাঁকা হয়ে গেল। কেবল আমি একলা রয়েছি (অন্ততঃ তখন তাই ভেবেছিলাম)।

একটা বিচ্ছিরি লাফানে, শব্দওয়ালা গাড়ির পুরো একটা কামরা তোমার একার দখলে। সারারাত্তির এখন মজাসে কাটাও। একটা বিরাট কামরা, তার সবটা এখন তুমিই ব্যবহার করতে পারো। ভাবতেই কি একটা অদ্ভুত আরাম। একটা সুন্দর স্বাধীনতা। তোমার যা খুসী তাই করো। তুমি নিজে নিজে খুব চেঁচিয়ে কথা বলো, কেউ শুনবে না। 'জোনস্'র সঙ্গে সেই পুরোণো তর্কটা আবার চালিয়ে তাকে হারিয়ে দিয়ে, বিজয় গর্বে ধুলোয় মিশিয়ে দাও, সে আর উল্টো তর্ক করতেও আসবে না। কি না পাব তুমি! কত ফিরিস্তি দেব! সব—সব পার। যা চাও,—মানে যা তোমার খুসী, ইচ্ছে মত সব কিছুই করতে পার। তুমি আকাশে পা দুটো তুলে দিয়ে মাথা নীচু করে দাঁড়াও, কেউ দেখবে না। গাও, নাচো ট্যাংগো কিম্বা ফক্সট্রট্। তা নইলে গল্ফের মার ভাঁজ, মেঝেতে বিনা মার্বেলেই মার্বেল খেলো। জানলা ইচ্ছে মত খুলতে পার, বন্ধ করতে পার। কেউ প্রতিবাদ করবে না। সবকটা জানলাই তুমি খোল আর বন্ধ কর, কিচ্ছু হবে না। তাতেও যদি না হয় তবে জানলাগুলি কেবল খোল আর বন্ধ করো, খোল আর বন্ধ করো। যে কোন একটা কোণ বেছে জমিয়ে বস। হাত পা ছড়িয়ে বেঞ্চের উপরে আরামে শুয়ে থাক 'ডি ও আর এ'র নিয়ম ভেঙ্গে তার হৃদয়ও ভেঙ্গে দাও। কেবল, 'ডি ও আর এ'ই জানতে পারবে। তাতে অবশ্য কিছুই হবে না।

আমি অবশ্য সে রাত্রে এ-সব কিছুই করিনি। ও সব আমার মাথাতেই আসেনি। আমি এর চাইতে অতি সাধারণ কিছু একটা করেছিলাম। গাড়ি একেবারে ফাঁকা হয়ে যেতেই আমি খবরের কাগজটা ফেলেই তড়াক্ করে লাফিয়ে উঠে জানলা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে রইলাম। গ্রীষ্মকালের সন্ধ্যা, ট্রেনের শব্দ ছাড়া তার কোনও সাড়া শব্দ নেই। সূর্যের আলো তখনও একটু রয়েছে, দিনটা একেবারে ফুরিয়ে যায়নি। কামরাটা পেরিয়ে গিয়ে অন্য জানলা দিয়ে একটু তাকিয়ে থেকে সিগারেট ধরিয়ে বসে বসে আবার পড়তে লাগলাম।

তখন আমি বুঝতে পারলাম যে কামরায় আমি একা নই। হঠাৎ সে কোথা থেকে উড়ে এসে আমার নাকের উপর জুড়ে বসল। ছোট্ট পাখাওয়ালা পতঙ্গ যাকে আমরা মশা বলে থাকি। তাড়িয়ে দিলাম মশাটাকে। সেটা কামরা পরিদর্শনে বেরিয়ে হল। বার পাঁচেক এদিক ওদিক ঘুরে, প্রত্যেকটি জানলায় একবার করে বসল। তারপর আলোর কাছে খানিকটা প্রদক্ষিণ ক'রে দেখল, "নাঃ। কোণের ওই বিরাট জন্তুটার মত আর কিছুই নেই।" আবার তোমার ঘাড়ে এসে বসল।

আবার তাড়ালাম। সঙ্গে সঙ্গে সশব্দে পুরো কামরাটা ঘুরে এসে আমার হাতে নির্ভয়ে বসে পড়ল, যেন হাতটা ওরই সম্পত্তি, আমায় রাখতে দিয়েছে কেবল। রেগে উঠে বলে ফেল্লাম, "দেখো হে! ভালমানুষিরও একটা সীমা আছে। দুবার তোমায় আমি জানিয়ে দিয়েছি যে, আমিও একটা প্রাণী, আমার মধ্যেও একটা নিজত্ব আছে। আমার মধ্যে যে মানী লোকটা রয়েছে সে তোমার মত একটা অকেজো প্রাণীর এই বেয়াদবিকে রীতিমত অপমানজনক মনে করে। এখন আমি বিচারক। আমি এবার সাদা টুপির বদলে কালো টুপি পরলাম। আর তোমায় মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করলাম। বিচারে তাই ঠিক হল। তোমার বিরুদ্ধে অনেক অভিযোগ আছে। তুমি একটা পাজি ভবঘুরে, একটা বিরাট উৎপাত, বিনাটিকিটে ঘুরে বেড়াও, তোমার মাংস কেনার কুপন নেই। এ ছাড়াও আরও অনেক অভিযোগ রয়েছে। এই সবের জন্য তোমায় এবার মরতে হবে।—" বিচারকের পদ থেকে জহ্লাদের পদে নেমে মশাটার উদ্দেশে একটা চড় মারলাম। সে মহাওস্তাদ ঠিক ঘুরে পালিয়ে গেল। মেজাজ একেবারে চড়ে গেল। হাতের কাগজ শুদ্ধই তার উপর ঝাঁপিয়ে পড়লাম। তাড়া করে আলোর কাছে নিয়ে গেলাম। ক্ষিপ্রতা আর তৎপরতার সঙ্গে মশাটাকে মারতে গেলাম, কিন্তু সবই বৃথা। সে অতি সহজেই আমাকে নাচিয়ে বেড়াতে লাগল। আমি স্পষ্ট বুঝতে পারলাম যে মশাটা ব্যাপারটা খুব উপভোগ করছে। আমায় জ্বালাতন করে ওর খুব স্ফূর্তি। আমার মত একটা ধুপসো, বিরাট, অকেজো, অসহায় বোকা অথচ সুস্বাদু লোক পেয়ে সে এই 'হা-ডু-ডু খেলায়' খুব মজা পেল। আমি ক্রমশ ওর মনোভাব বুঝতে পারলাম। আমি যে একা কামরাটা দখল করে যাব, সেট ও চায় না। আমি খুব চটে যেতে লাগলাম। আমি যে ওর চাইতে সব দিক দিয়েই বড় সে কথা যেন ভুলে যেতে লাগলাম। কি করেই বা মনে থাকবে, কি নাস্তানাবুদটাই না করেছে আমায়। চটেও কোন লাভ নেই। ধরতে তো পারব না। হঠাৎ মনে পড়ে গেল আচ্ছা ওকে ক্ষমা করলে কেমন হয়? ক্ষমাই তো মানুষের সব চেয়ে বড় ধর্ম। হ্যাঁ; ক্ষমা করেই মান বাঁচান যাবে। মশার পেছনে ছুটে ছুটে আর লোক হাসাতে চাই না। তারপর কোনে চেপে বসে ভারিক্কি চালে বল্লাম "আমি মৃত্যুদণ্ড ফিরিয়ে নিলাম। তোমাকে ক্ষমা ক'রলাম। নেহাৎ ছোট্ট পোকা।"

আবার কাগজটা নাকের সামনে তুলে ধরলাম। মশাটাও কাগজটার উপরে পরম আরামে এসে বসল। হত্যা করার ইচ্ছা আমার মোটেই নেই। বল্লাম, "আরে বোকা! খবরের কাগজের—হারান প্রাপ্তি, নিরুদ্দেশ, আর বস্ত্রবণ্টন—না প্রহসন, এর মধ্যে পড়ে একেবারে স্যাণ্ডুইচ বনে যাবে! অবশ্য আমি তা করব না। ক্ষমা যখন করেইছি, তখন করেইছি। তাছাড়া তোমাকে মারবারও আর ইচ্ছে নেই। তোমায় দেখে টেখে আমি,—(বলব? বলেই ফেলি!) আমি তোমার প্রতি আসক্ত হয়ে পড়েছি। ভাগ্যক্রমে আমরা দুজনে আজ সহযাত্রী। আমি তোমায় অনেক হাসির খোরাক জুগিয়েছি, তুমিও আমায় অনেক আনন্দ দিয়েছ। আমাদের দুজনের মধ্যে মিলও রয়েছে অনেক। আমারও মনে হয় তুমি কোথায় যাবে তা ঠিক জান না। আমিও ঠিক মত জানি না আমি কোথায় যাচ্ছি।

আরও মিল রয়েছে; আমরা দুজনেই অন্ধকার থেকে হঠাৎ এই আলোয় ভর্তি গাড়িতে উঠলাম, তারপর কিছুক্ষণ আলোর সামনে নাচানাচি করে আবার অন্ধকারে চলে যাব। বোধহয়—" "নামবেন নাকি বাবু?" জানালা দিয়ে কে যেন বলে উঠল। তাকিয়ে দেখি গন্তব্য ষ্টেশন এসে গেছে। ভাগ্যে কুলিটা ডেকেছিল। আমার তো খেয়ালই ছিল না। আমাকে চম্‌কে উঠতে দেখে লোকটা হেসে ফেলেছিল। আমি অপ্রস্তুত হয়ে গিয়ে বোকার মত হাসতে হাসতে বল্লাম "ধন্যবাদ, একটু ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। ভাগ্যে ডেকেছিলে।" টুপী আর লাঠি তুলে নিয়ে নেবে গেলাম। দরজাটা বন্ধ করার সময় দেখলাম আমার সহযাত্রী আলোর কাছে উড়ে বেড়াচ্ছে।

[Leaves in the wind—by Alpla of the Plag to থেকে Fellow Traveller গল্পের অনুবাদ।]

ঘেঘু-ডেক

অ·কৃ·ব

কাল আবার গোবর্ধন বৈরাগী আসিয়াছিল, কয়েকখানা নূতন গান শুনাইয়া গিয়াছে। ঐ একটা তাহার দোষ (অথবা গুণ)—আসিলেই গান না শুনাইয়া ছাড়ে না। এবং কথায় কথায় গান ধরে।

আমার মনে হয় গোবর্ধন সিনেমা জগতে প্রবেশ করিলে দ্রুতবেগে নাম করিয়া ফেলিত, কেননা যখন তখন যেখানে সেখানে গান সিনেমায় যেমন দরকার তেমন আর কোথাও নহে। এ ব্যাপারটা আগে হিন্দী ছবিতেই ছিল, কয়েক বছর যাবৎ বাঙলা ছবিগুলি এ ব্যাপারে হিন্দী ছবির সহিত টক্কর দিতেছে। এমন কি ধনপতি মাঝে মাঝে তাহার পাগ্‌লামীর ভাষায় বলিয়া থাকে আজকাল বাঙলা ছবিগুলির বেশীর ভাগেই শুধু ভাষাটা বাঙলা, আর সব হিন্দী।

* * * * * *

মনে করুন রূপালী পর্দার বুকে দেখিতেছেন ফুলবাগানে তরুণী নায়িকার সঙ্গে তরুণ নায়কের দেখা হইয়া গেল। গান যে একখানা শুরু হইবেই ইহা আপনি ধরিয়াই নিতে পারেন। তবে নায়কনায়িকা এরূপ অপ্রত্যাশিতভাবে মুখোমুখি হওয়াতেও একটু না ঘাবড়াইয়া তৎক্ষণাৎ মুখে মুখে রচনা করিয়া এবং সুর-সংযোগ করিয়া দ্বৈত-সঙ্গীত গাহিবে, না অদূরে নদীর বুকে জনৈক ভাটিয়াল মাঝি (অথবা অদূরে পথের বুকে জনৈক ভাটিয়াল পথিক বা গাড়োয়ান) ভাটিয়ালী গাহিবে তাহা ডিরেক্টরের উপর নির্ভর করিবে।

* * * * * *

অথবা মনে করুন, একটি বিদায় ব্যথাতুর দৃশ্য—অতি করুণ এবং মর্মস্পর্শী। নায়ক-নায়িকার বিবাহ হইতে পারে না। কিছুতেই না। নায়িকাকে না পাইলে নায়কের প্রিয় বন্ধু অসীমকুমার কিছুতেই প্রাণে বাঁচিবে না, অথচ নায়ক চায় না যে অসীমকুমার মারা যায়। এই কারণেই নায়কের পক্ষে নায়িকাকে বিবাহ করা একেবারেই অসম্ভব; নায়িকা-প্রেমের চাইতে বন্ধু-প্রেমকেই সে উঁচুতে স্থান দিয়াছে। নায়ক ইহাও ভাবিয়া দেখিয়াছে, সে একজন ছন্নছাড়া সর্বহারা কিন্তু বন্ধু অসীমকুমার বড়লোকের ছেলে—নায়িকাকে বিবাহ করিয়া সুখে রাখিতে পারিবে। তাছাড়া নায়িকাকে না পাইলে দুজনের একজনকে যখন মরিতে হইবেই, তখন নায়কের মরাই ভাল। পৃথিবীতে তাহার আপন বলিতে কেহ নাই, মরিলে কেহ কাঁদিবে না—নায়িকা যদি একটু কাঁদে তো আলাদা কথা। কিন্তু অসীম মরিলে তাহার পিতা, মাতা, ভ্রাতা, ভগ্নী অনেকে কাঁদিবে। 'এতজনকে কাঁদাইয়া অসীমকুমারের মরার চাইতে কাহাকেও না কাঁদাইয়া আমার মরাই ভাল' ইহাই নায়ক মনে মনে ঠিক করিয়াছে। ইহা নায়িকা জানে না, অসীমকুমার জানে না, জানে শুধু পর্দার বুকে নায়ক নিজে এবং পর্দার বাহিরে দর্শক আমরা। (ছবির ডিরেক্টার, সিনারিও লেখক...ইঁহাদের কথা অবশ্য এখানে ধরিতেছি না।)

...কিন্তু নায়ক বড়ই মুস্‌কিলে পড়িয়াছে। সে প্রিয় বন্ধু অসীমকুমারকে যেমন মারিতে চাহে না, নায়িকাকেও তেমনই মারিতে চাহে না। অথচ জানে যে নায়িকা তাহাকে (নায়ককে) না পাইলে নির্ঘাত আত্মহত্যা করিবে। মেয়েরা একবার যাহাকে প্রাণ সঁপিয়া ফেলে তাহাকে না পাইলেই আত্মহত্যা করে, নায়কের ইহাই দৃঢ় বিশ্বাস। (হায় নায়ক!) নায়িকা তাহারই কারণে জীবন যৌবন বরবাদ করিয়া দিয়া পরলোকযাত্রা করিবে ইহা নায়ক কিছুতেই সহ্য করিতে পারিবে না। সুতরাং যেমন করিয়াই হোক্‌ নায়িকাকে সে বাঁচাইবেই।

নায়ক তাই ঠিক করিয়াছে নায়িকার জীবন হইতে সে চিরদিনের জন্য সরিয়া যাইবে—চিরদিনের জন্য না হোক্‌, অন্ততঃ যতদিন না নায়িকা ও অসীমকুমারের মিলন বাসি হইয়া যায় ততদিনের জন্য।

নায়িকা জানে অসীমকুমার তাহার (নায়িকার) জন্য পাগল। এজন্য অসীমকুমারের প্রতি একটা গভীর সহানুভূতি। একটা "হায় বেচারা!" ভাব আছে নায়িকার মনে। এই ভাবটাই প্রেমে রূপান্তরিত করিয়া দিবার জন্য একটা মর্মান্তিক মতলব আঁটিয়াছে নায়ক। নায়িকাকে সে আজ বুঝাইয়া দিবে যে তাহার এতদিনের প্রেম শুধু ভাণ মাত্র; এমনভাবে বুঝাইবে যেন নায়িকার অন্তর তাহার নায়কের প্রতি ঘৃণায় ভরিয়া উঠে এবং নায়িকা তাহাকে (নায়ককে) দূর দূর করিয়া তাড়াইয়া দেয়।

নায়ক বেশ পাকা অভিনয়ই করিল। শেষ পর্যন্ত পকেট হইতে সে জনৈকা বিদেশিনী সুন্দরীর ফোটো বাহির করিয়া দেখাইয়া দিল এবং নায়িকাকে জানাইয়া দিল ইহাকেই সিভিল ম্যারেজ করিয়া সে কিছুদিনের জন্য বিদেশযাত্রা করিতেছে: নায়িকার মন নিয়া এতদিন সে যে খেলা করিয়াছে, সেজন্য নায়িকা যেন দুঃখ না করে।

নায়িকা জানে না, কিন্তু আমরা (পর্দার বাহিরের দর্শকগণ) জানি ফোটোটা নায়ক জনৈক ফোটোগ্রাফার বন্ধুর আলবাম হইতে সংগ্রহ করিয়াছে। এবং তাহার সিভিল ম্যারেজের কাহিনী একেবারে ভুয়া। ঘৃণায়, দুঃখে, লজ্জায় অনুশোচনায় জর্জরিতা নায়িকা নায়ককে বাস্তবিকই তাড়াইয়া দিয়া অসীমকুমারের কাছে ক্ষমা চাহিতে চাহিতে সোফায় দেহ এলাইয়া দিয়া ফুলিয়া ফুলিয়া কাঁদিতে লাগিল।

তখনই বোঝা গেল আমরা একটু ভুল বুঝিয়াছিলাম। ভিতরের ব্যাপারটা শুধু যে নায়ক এবং আমরাই জানি তাহা নহে, আরেকজন জানে—জনৈক অদ্ভুত ক্ষমতাশালী দৈবজ্ঞ ভিখারী।

যেদিককার ঘরের সোফায় নায়িকা ফুলিয়া ফুলিয়া কাঁদিতেছে, তাহার বিপরীত দিকের উঠানে ঢুকিয়াই সে খঞ্জনী বাজাইয়া যে গান গাহিতে লাগিল, তাহা হইতেই পরিষ্কার বোঝা গেল এ লোকটা সব জানে। প্রকাশ্যে খঞ্জনী এবং নেপথ্যে বেহালা, হারমোনিয়াম, বাঁশী প্রভৃতি সহযোগে সে গাহিতে লাগিলঃ

"ওলো রাই, ভুল করে তুই বুঝলি না হায়
বিদায় দিলি কারে!....."

ইত্যাদি।

গানের ছলে সমস্ত ব্যাপারটাকে লোকটা একেবারে এমনভাবে জল করিয়া ছাড়িয়া দিল যে মনে হইল এ লোকটা খঞ্জনী বাজাইয়া দুয়ারে দুয়ারে ভিক্ষা না করিয়া ভবিষ্যদ্-বক্তৃতার ব্যবসা করিয়া বড়লোক হয় না কেন?

* * * * * *

উদাহরণটি যখন তখন তৈয়ারী করিয়া দিলাম বটে, কিন্তু তাই বলিয়া এটা ভুয়া উদাহরণ নয়। যে কোন বাঙলা ছবি দেখিতে যান, এই জাতীয় ব্যাপার দেখিবেনই।

সেজন্যই ভাবি গোবর্ধন বৈরাগী সিনেমায় গেলে নিশ্চয় সুবিধা করিতে পারিত।

কহিলাম "শুটিং (Shooting) দেখতে যাবে নাকি বৈরাগী?"

বৈরাগী দুই চোখ কপালে তুলিয়া কহিল, "কন কি কর্তা সব্বোনাইশা কথা! ওই সব খুনখারাবী আমার সৈহ্য হয় না।"

গোবর্ধন দিনকতক যাবৎ ধনপতির কাছে ইংরাজী শিখিতেছিল একটু একটু। বুঝিলাম শুটিং-এর (Shooting) অর্থ সে সাধারণভাবে 'গুলী করা' বুঝিয়াছে। সিনেমা জগতের শুটিং যে গুলী করা নহে, তাহা বুঝাইয়া দিলাম এবং বিস্তারিত ব্যাখ্যার সাহায্যে তাহার কৌতূহল উদ্রিক্ত করিবার চেষ্টা করিলাম।

গোবর্ধন বৈরাগী শুনিয়া মৃদু হাস্য করিয়া কহিল, "একডা কথা আপ্‌নারে কই কর্তা। যাত্রা দেখনের মজা চান তো সাজঘরে ঢুক্‌বান্ না কখনও। নিমন্ত্রণ খাওনের মজা চান্ তো ভাড়ার ঘরে ঢুক্‌বান্ না। আর মদের মজা যদি চান....." বলিতে বলিতে হঠাৎ গম্ভীর হইয়া থামিয়া গিয়া বৈরাগী ডুগডুগি বাজাইয়া গান শুরু করিয়া দিলঃ

"মদ যদি পান কর্‌বারে মন
যাইও না রে ভাটিতে;
বোতল হৈতে পান করিও
বৈসে আপন বাটীতে।"....

পচুই মদ কি শরীরের উপকারী ?

শ্রীনিশাপতি মাজি

পশ্চিম বঙ্গের হরিজনরা ক্ষয়প্রাপ্ত হচ্ছে। এইরূপ ক্ষয়প্রাপ্ত হবার প্রধান কারণ যুদ্ধ, দুর্ভিক্ষ, ম্যালেরিয়া ও পচুই মদের দোকান। পচুই মদের দোকানগুলি হরিজনদের কু-অভ্যাস ও অশিক্ষায় একেবারে পঙ্গু করে ফেলেছে। এজন্য হরিজনদের আর্থিক মেরুদণ্ড ভেঙ্গে পড়েছে। দিন দিন তারা স্বাস্থ্যহীন, দুর্বল হয়ে চলেছে। আজও দেখা যায়, পশ্চিম বঙ্গের হরিজনদের মধ্যে শতকরা আশিজন মদের মাতাল। স্ত্রী-পুরুষ, বালক-বালিকা অবাধে মদ্যপান করে। প্রায় অর্ধকোটি নরনারী এজন্য পশুতুল্য জীবনযাপন করছে।

পচুই মদ খাদ্য নয়। এই মদের প্রধান উপকরণ চাউল ও বাখর। বাখরে ১৬০ রকমের জিনিস থাকে। তার মধ্যে ৩০ রকমের গাছগাছড়া। ডাক্তার চোপরা লিখেছেন, এর মধ্যে এমনও অনেক গাছ-গাছড়া আছে, যা বিষতুল্য এবং উগ্রতাসাধক। চাল থেকে ভাত তৈরী করে বাখর মিশালেই চার দিন পরে মদ হয়। বাখরের উগ্রদ্রব্যে চাউল পচে' চার দিনের মধ্যেই গন্ধ বেরোতে থাকে। সামান্য পরিমাণ রসি বা রস ভাসতে দেখা যায়। এই রসিতে সুরাসার শতকরা দু-ভাগও থাকে না। অথচ অনেকে বলেন, ভিটামিন শর্করা ও শ্বেতসার প্রচুর পরিমাণে পচুই মদে থাকে। কিন্তু পরীক্ষার দ্বারা দেখা গিয়েছে, বাখর যাবতীয় খাদ্যদ্রব্যকে বিষময় করে তোলে। এমন কি, বাখরের উগ্র গন্ধেই মস্তিষ্কের বিকৃতি ঘটে; পা ঠিকমত ফেলতে পারে না; পর পর ঠিকমত কথা বলতে পারে না; হিতাহিত জ্ঞান হারায়। তবুও হরিজনরা সারাদিন কঠোর পরিশ্রম করে গরম জলসমেত পচুই মদ পান করতে চায়। তার প্রধান কারণ, এতে শরীরের সামান্য তাপবৃদ্ধি হয়; দুঃখ-ভারাক্রান্ত মনে ক্ষণিকের জন্য আনন্দ দান করে। এজন্য হরিজনরা কাজকর্ম ছেড়ে গলা বাড়িয়ে হাঁ করে মদ খায়। বাপ বেটার মুখেও মদ তিন হাত উপর হতে ঢেলে দিয়ে আনন্দ লাভ করে।

বাখরমিশ্রিত পচুই মদ অন্যান্য খাদ্য-দ্রব্যকে পরিপাক হতে দেয় না। যকৃত বৃক্ক পাকস্থলী ফুসফুস ও রক্তবহানালীগুলির অনিষ্ট সাধন করে। এজন্য হরিজনদের পরমায়ু দশ হতে পনের বছর অযথা ক্ষয়প্রাপ্ত হচ্ছে। তাছাড়া পচুই মদের জন্যই শরীরের রক্তকণা রোগবীজাণুর সাথে ভালভাবে লড়াই করতে পারে না। মহামারী অতি সহজেই হরিজন পল্লীতে শুরু হয়। দূষিত ব্যাধি ও অন্যান্য রোগের সুচিকিৎসার প্রতি তাই হরিজনদের দরদ নেই। কথায় কথায় মদ গাঁজা মুরগী প্রভৃতি উপচার মানসিক দিয়ে সাপ ভূত প্রেত ডান ডাকিনীকে সন্তুষ্ট করতে চায়। এজন্য হরিজনদের দৈহিক ও আর্থিক দুর্গতি অচল হয়ে রয়েছে।

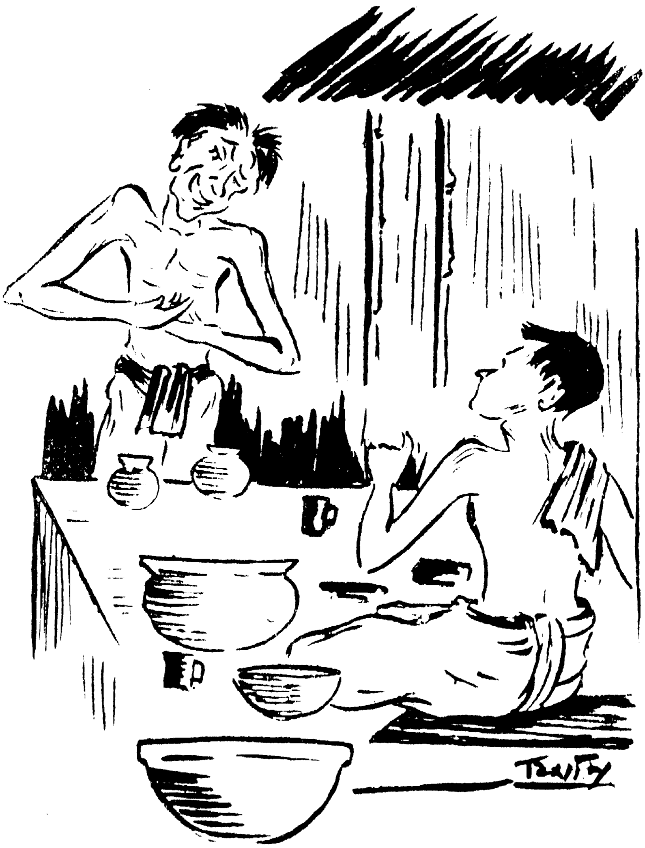
হরিজনদের বালিকারা মাতালদের খেয়ালে বিবাহ করতে বাধ্য হয়। এমন কি, মাতাল-দের খেয়ালেই বহু-বিবাহ করে থাকে। মাতাল স্বামীর বেদম প্রহার সহ্য করে। স্বেচ্ছাচারী পুরুষের অত্যাচারে দিনরাত চোখের জল ফেলে। সন্তানসম্ভবা হয়েও গতর না খাটালে খেতে পায় না। বিপদের উপর বিপদ বরণ করতে হয়। অশিক্ষিতা ধাত্রী বুড়িরা প্রসূতিদের প্রচুর মদ ঝাল ও পিপুল খাইয়ে দেয়। সর্বরোগের মহৌষধ বলে মদের রসি পান করিয়ে আতুরের রোগ ভাল করতে চায়। এজন্য অনেক মেয়ে প্রসূতি ঘরে মৃত্যুমুখে পতিত হয়। অনেকে উন্মাদিনী হয়ে মাচায় বসে থাকে। আবোল-তাবোল ভুল বকলেও মাতাল স্বামীর চেতনা হয় না।



পিতা পুত্রের মুখে মদ ঢেলে দিচ্ছে।



মদ, গাঁজা ও মুরগী ঠাকুর তলায় এনেছে।

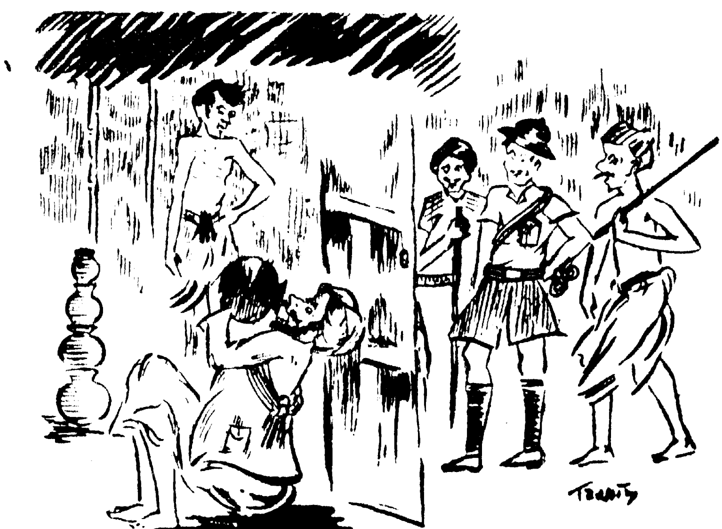


পচুই মদের দোকানে জনৈক হরিজন।

সভ্যতার আলোক হরিজন ও সাঁওতালদের মধ্যে আজও যে বিস্তৃত হয়নি, তার অপর একটি কারণ মাদকদ্রব্য। সাঁওতাল মেয়েরা মদ ও তাড়ি খেয়ে হাটে পথে বাজারে ও কলকারখানায় প্রায় বেসামাল হয়ে পড়ে। পশ্চিম বঙ্গের মেলাগুলিতে সারারাত্রি মাদল বাজিয়ে নৃত্য করে। এতে সাঁওতালদের কঠোর ও দৃঢ় সমাজ-বন্ধন শিথিল হয়ে পড়েছে।

আবগারী বিভাগের পচুই মদ বিক্রীর জন্য একটি বড় রকমের আয় হয়ে থাকে। এই টাকাটার লোভ সরকারের নেই বললে অন্যায় হয়। আড়াই সের চাউলে সাড়ে সাত সের মদ হয়। সাড়ে সাত সের মদের দাম দুই টাকা চারি আনা। প্রায় এক টাকা খরচ বাদে পাঁচসিকা লাভ হয়। কমিশন বাবদ আবগারী বিভাগ এক টাকা আদায় করেন। বাকী প্রায় চার আনা পচুই মদের দোকানের শুঁড়িরা আজকাল পাচ্ছে। যদি অর্ধকোটি হরিজন গড়ে দুই টাকার মদ খায়, তাহলে এক কোটি টাকার অপব্যয় হরিজনরা করে থাকে। সেক্ষেত্রে হরিজনদের লেখাপড়া শেখাবার জন্য পাঁচ লক্ষ টাকা সরকারী সাহায্য করা যথেষ্ট হতে পারে না। অবশ্য সরকার বাহাদুর বলতে পারেন, এজন্য পুলিশ আছে। কিন্তু সকলেই জানে, পুলিশের সর্বকনিষ্ঠ চৌকিদারও পচুই মদের মাতাল। তারাও মদ ধরতে গিয়ে আগে মদ হাঁড়ি হতে বার করে খেয়ে আসে। দরজার নিকট দারোগা হাতকড়া নিয়েও আর গোপন মদ তৈরী ধরতে পারে না।

শ্রীনিকেতন পল্লীসেবা বিভাগ, পচুই মদ খাওয়া ছাড়াবার জন্য প্রায় কুড়ি বৎসর আন্দোলন চালিয়ে আসছেন। কিন্তু বীরভূম জিলার প্রায় পাঁচ লক্ষ হরিজনদের সুসংঘবদ্ধ করার কাজে প্রধান বাধা পচুই মদ। শ্রীনিকেতনের ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় এই কয় বৎসর হরিজনদের গৃহে গৃহে মদ খাওয়া ও তৈরী করার বদঅভ্যাসের আংশিক প্রতিকার হয়েছে। ভোজে-কাজে বড় কেউ মদ খাওয়ার আয়োজন করে না বললেই হয়। কিন্তু পচুই মদের দোকান খোলা থাকায় হরিজনদের অস্বাস্থ্যকর আবহাওয়া আজও আশানুরূপ দূর হয়নি। সত্বর পচুই মদের দোকানগুলি যদি সরকার তুলে দেন, তাহলে হরিজনদের বিশেষ উপকার করবেন। তাতে অতি সহজে শিক্ষার প্রতি হরিজনরা দরদী হতে পারে। কৃষি-শিল্প শিক্ষায় উন্নত হতে পারে। স্বাস্থ্যরক্ষায় যত্নবান হয়ে অকালমৃত্যুর প্রতিবিধানে যত্নবান হয়ে উঠতে পারে। নতুবা পশ্চিম বঙ্গের হরিজনদের পঞ্চাশ বৎসরের মধ্যেই গুরুতর সংখ্যাহ্রাস হবে তাতে কোন সন্দেহ নেই।

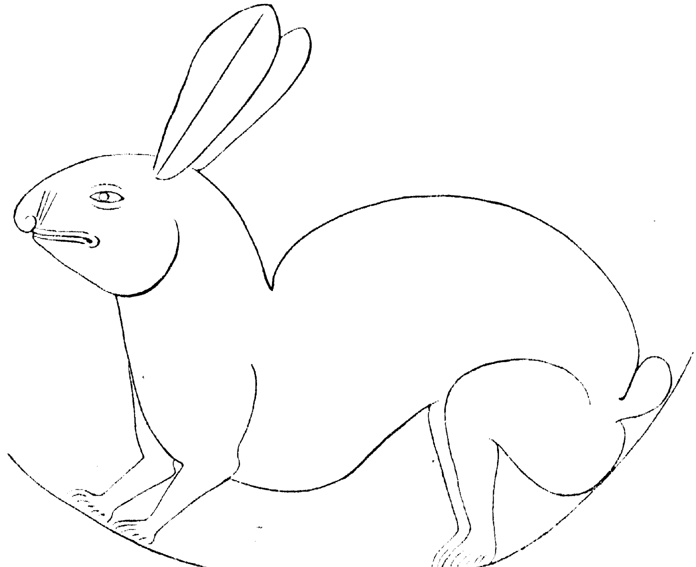


অনুসন্ধানী চৌকিদারের কীর্তি

সিংহলের রাষ্ট্র ও শিল্প

শ্রীমণীন্দ্রভূষণ গুপ্ত

চতুর্দশ শতাব্দীর পর হইতে সিংহলের শিল্প প্রাদেশিক ও লোকশিল্পে পরিণত হইয়াছে; কিন্তু এতবড় লোক-শিল্প সম্ভবত পৃথিবীতে হয় নাই। স্থাপত্য, ভাস্কর্য, চিত্র, এমন কি গৃহের আসবাবপত্র, তৈজস সকলি শিল্প নৈপুণ্যের পরিচায়ক। একটা সামান্য নারিকেলের মালা শিল্পী খোদাই করিয়া অপূর্ব সৌন্দর্যমণ্ডিত করিয়াছে। শিল্পীর সময় ছিল অফুরন্ত, তার অন্নবস্ত্রের অভাব ছিল না; রাষ্ট্র তার ভার নিয়াছিল।

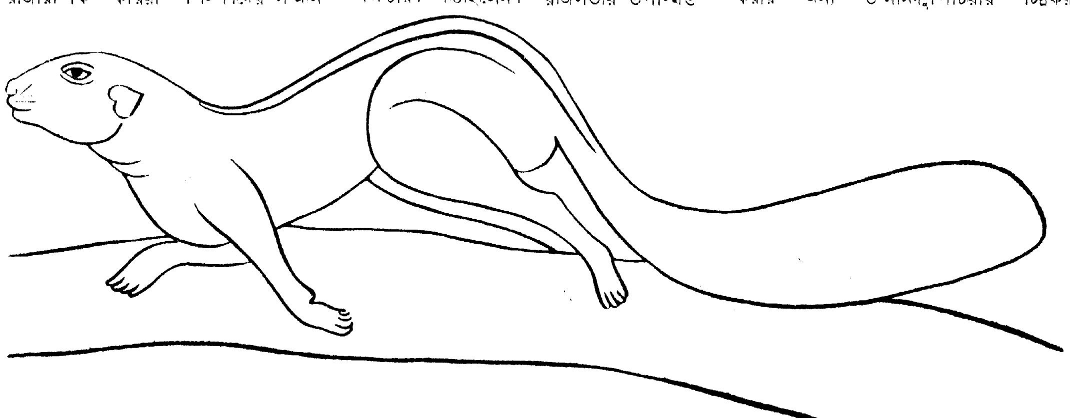


১৮শ শতাব্দীর ফ্রেস্কো চিত্র (কাণ্ডির মন্দির গাত্রস্থ অঙ্কণ)

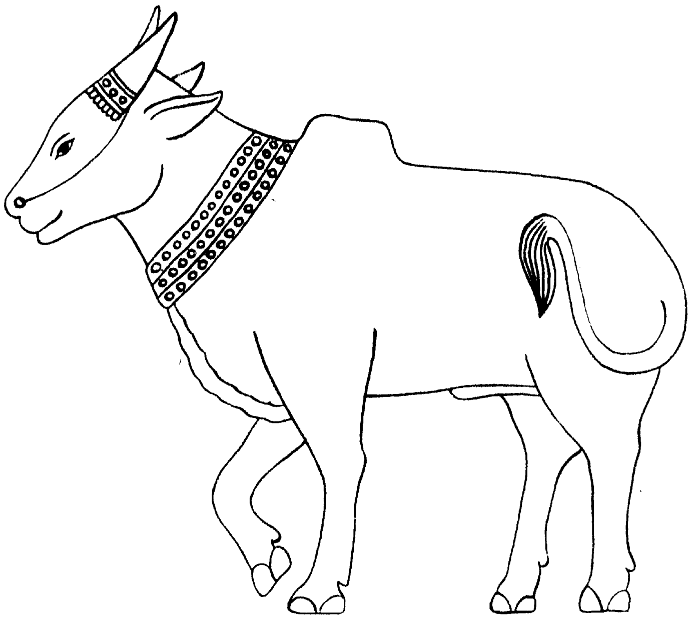
বাজারে ব্যবসায়ের জন্য শিল্পী তার শিল্পদ্রব্য গড়ে নাই। সিভিল সার্ভিস বা রাজকার্যে তার নির্দিষ্ট স্থান ছিল। রাজা তাহাকে বংশানুক্রমিক ভূমিদান করিয়া, অর্থদান করিয়া অর্থচিন্তা হইতে নিষ্কৃতি দিয়াছেন; সেজন্য তাহাকে প্রতিযোগিতার বাজারে লড়িতে হয় নাই। বংশানুক্রমে শত শত বৎসর ধরিয়া শিল্পী তাহার পৈতৃক ব্যবসায় চালাইয়া আসিয়াছে। জাতি হিসাবে একার্য চলিয়াছে। অফুরন্ত ভালবাসা ও ধৈর্য সহকারে শিল্পী তাহার কাজ করিয়াছে। সিংহলে প্রবল পরাক্রান্ত সম্রাট ছিল, দরবার ছিল, কিন্তু মোগল আমলের ন্যায় দরবারী শিল্প গড়িয়া ওঠে নাই! কেননা রাজা শিল্পের পোষকতা করিয়াছেন, ধর্মের জন্য,জনগণের জন্য। "It was the art of a people whose kings were one with religion and the people." রাজা জনগণ ও ধর্মের সঙ্গে এক ছিলেন।

রাজারা কি করিয়া শিল্পীদের সম্মান করিতেন, পারিশ্রমিক দিতেন, তাহার কয়েকটি উদাহরণ দেওয়া যাইতেছে। চতুর্দশ শতাব্দীতে ভুবনেকাবাহু কোট্টেতে রাজত্ব করিতেছিলেন, শুনিতে পাইলেন, মান-দুয়াতে ভারতবর্ষ হইতে একজন ওস্তাদ শিল্পী আসিয়াছেন। তিনি তখনি শিল্পীকে হাজী করিয়া আনিবার জন্য একজন কর্মচারী পাঠাইলেন। রাজসভায় উপস্থিত হইলে, শিল্পী রাজাকে একটি দূরবীন, এবং সময় দেখিবার জন্য একটি যন্ত্র উপহার দিলেন। রাজা তাহাকে যথেষ্ট উপহার দিলেন, "মঙ্গলগাম" দান করিলেন, এবং "মণ্ডলাবল্লিনায়াড" উপাধি দিলেন। মণ্ডলাবল্লিনায়াড বংশপরম্পরা রাজ অনুগ্রহ পাইয়া আসিতেছে। এখনো এই শিল্পীর বংশধরেরা "মঙ্গলগামে" বাস করিয়া পৈতৃক কারুশিল্পের কাজ করিয়া যাইতেছে।

যখন ১৫১৫ শকে ওয়েসাক মাসে (বৈশাখ মাসে) বৃহস্পতিবার পূর্ণিমা দিনে জেতবলরাম সমাপ্ত হইয়াছিল, মহারাজা বিমলধর্ম সূর্য পুণ্য অর্জন করিয়া আনন্দিত হইলেন, এবং বংশানুক্রমে ভোগ করার জন্য উম্নানদুপিটিয়ার চিত্রকর



কাঠ বিড়ালী (১৮শ শতাব্দীর ফ্রেস্কো)



ষাঁড় (১৮শ শতাব্দীর ফ্রেস্কো)

রাজেশ্বর ছিন্ডারা আচারিয়াকে দান করিলেন একটি বাগান, এবং তিনহেনা জমি।

কীর্তিশ্রীর রাজত্বকালে গয়োরুয়ো মুহন্দিরাম ওস্তাদ স্বর্ণকার ছিলেন। তিনি রাজার প্রাসাদে কাজ করিতেন। রাজা তাহাকে জমি অর্থ হাতী দান করিয়াছিলেন।

দুটুঠগামিনি রুয়ানবেলিদাগোবা নির্মাণকালে শিল্পীদের প্রচুর অর্থদান করিয়াছিলেন। তিনি সাবধান ছিলেন, কেউ বিনা অর্থে গোপনে কাজ না করিয়া যায়, কেননা, তাহাতে, রাজার ভাগে পুণ্য কম পড়িয়া যাইবে।

রাজা কাহাকেও সম্মান দিতে ইচ্ছা করিলে, রাজকীয় পোষাক ও পাগড়ি দান করিতেন। কান্ডি অঞ্চলে, কোনো কোনো কারিগর পরিবারের অধিকারে এরূপ রাজকীয় পোষাক এখনো দেখা যায়। তাহাদের পূর্ব-পুরুষ কেহ হয়ত রাজা হইতে খেলাত লাভ করিয়াছিলেন, তাহা সগৌরবে বংশানুক্রমে রক্ষা করিয়া আসিতেছে।

রাজা দ্বিতীয় জেঠ্ঠটা তিস্স (৩৩২—৩৩৯ খৃঃ অব্দ) নিজেই একজন শিল্পী ছিলেন। তিনি নিজে অনেক শ্রমসাধ্য চিত্র ও ভাস্কর্য করিয়াছিলেন এবং প্রজাদের শিখাইয়াছিলেন।

পর্টুগীজ, ডাচ ও বৃটিশ যুগে বৈদেশিক প্রভাব, সিংহলের শিল্পে পড়িয়াছে কিন্তু এসব সত্ত্বেও কয়েকজন শিল্পী প্রাচীন পদ্ধতিকে জীয়াইয়া রাখিয়াছে। তাহারা যে সরকার বা দেশের লোক হইতে উৎসাহ পাইয়াছে তাহা নহে, স্বজাতীয় কারুকর্মে নিতান্ত নিষ্ঠা ও ভালবাসা আছে বলিয়াই বর্তিয়া আছে।

কারিগর জাতির সংখ্যা

বিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে আদমসুমারীতে দেখা যায়—কান্ডি প্রদেশের জনসংখ্যার শতকরা ৪ জন করিয়া কারিগর জাতির। অষ্টাদশ শতাব্দীতে অনুমান করা যাইতে পারে, কারিগর জাতির সংখ্যা (পরিবারস্থ সকলকে ধরিয়া) অন্ততঃ শতকরা দশজন ছিল।

বিশ্বকর্মা

বিশ্বকর্মা কাম্মালারদের পূর্বপুরুষ। ইনি শিল্প এবং কারুকলার ইষ্টদেবতা। কাম্মালার হইল উচ্চশ্রেণীর কারিগর। পাঁচ রকমের উচ্চশ্রেণীয় কারুশিল্প কাম্মালারদের মধ্যে প্রচলিত। (১) চিত্র, (২) হাতীর দাঁতের কাজ, (৩) কাঠ খোদাই, (৪) সোনা রূপা, পিত্তল ইত্যাদি ধাতুর কাজ ও (৫) জহুরি—এই সব শিল্পকার্য কাম্মালারদের জানা থাকিত।



সিংহ—১৮শ শতাব্দীর ফ্রেস্কো

বিশ্বকর্মা মানুষের নির্মাণকার্যে সাহায্য করেন। রাজা এক শিল্পীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'তুমি চেতিয়কে (চৈত্য) কোন্ আকার দান করিবে?' বিশ্বকর্মা সেই মুহূর্তে শিল্পীকে প্রেরণা জোগাইলেন। শিল্পী স্বর্ণপাত্রে জল লইল, হাতের চেটোতে জল লইয়া ছুঁড়িয়া মারিল, জলের মধ্যে বুদ্বুদ ফুটিয়া উঠিল। শিল্পী বলিল, 'এই আকারে নির্মাণ করিব।' রাজা সন্তুষ্ট হইলেন, তাহাকে এক হাজার কাহাপন (কার্ষাপণ) মূল্যের একপ্রস্থ পোষাক এবং বার হাজার কাহাপন (মুদ্রা) দান করিলেন।

সিংহলীদের শিল্পশাস্ত্র 'রূপাবলিয়তে' বিশ্বকর্মার রূপ বর্ণনা আছে। 'বিশ্বকর্মাকে প্রণাম করি। তিনি গৌরবর্ণ, মহান্, বিখ্যাত ও স্বাধীন—যাঁহার তিলকযুক্ত পঞ্চমুখ আছে। তিনি ধারণ করিয়া আছেন পুস্তক, 'লেখনিয়া' (তালপাতায় লিখিবার লৌহশলাকা), তরবারী, গদা, লেবু বাটী, জলপাত্র, জপমালা, গোখুরো মালা (গলদেশে) এবং পাশ। হাতে রুদ্র এবং আশীর্বাদের ভঙ্গী (একটি হাত বন্ধ, অপরটি খোলা) এবং ধারন করিয়া আছেন সোনার যজ্ঞোপবীত।'

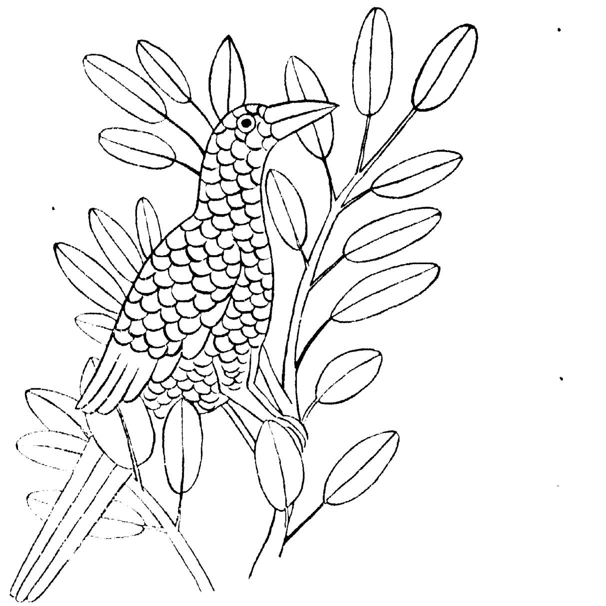
বিশ্বকর্মার কোন পূজার বিধি নাই। কিন্তু কারিগরেরা গৃহনির্মাণকালে বিশ্বকর্মার উদ্দেশ্যে মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া থাকে; যাহাতে কোন অমঙ্গল না হয় এবং নির্বিঘ্নে নির্মাণকার্য শেষ হয়।

শিল্পশাস্ত্র

কারিগরেরা তাহার পুত্রকে শিক্ষা দিয়া থাকে। ঠিক জাত হইলে বাহিরের ছাত্রকেও গ্রহণ করে। ছয় বছরের সময় দিনক্ষণ দেখিয়া শিল্পারম্ভ হয়। প্রথম শিখিতে হইবে ফুলপাতা অবলম্বনে আলঙ্কারিক ড্রয়িং। পরে আঁকিতে হইবে সংযুক্ত ষাঁড়-হাতী (উসম্ব কুঞ্জর), চতুর নারী পাল্কী (চতুর নারী পালাক্কিয়া), ছয় নারী তোরণ, সপ্ত নারী তোরণ, অষ্ট নারী বক্ষ, সপ্ত-নারী তুরঙ্গ, নব-নারী কুঞ্জর ইত্যাদি। লক্ষ্য করা যাইতে পারে—এ-জাতীয় চিত্র বাঙলা নটচিত্রেও আছে। প্রচলিত আলঙ্কারিক ও ফিগার ড্রয়িং শেষ হইলে মুখস্থ করিতে হইবে শিল্পশাস্ত্র, যথা—রূপাবলিয়, সারিপুত্র এবং তৈজয়ন্তয়। কোন কারিগর পাঁচটি কারুকর্মে দক্ষ হইলে শিল্পাচার্য বলিয়া অভিহিত হইবে।

রূপাবলিয়

কান্ডির চিত্রকরেরা সংস্কৃতে শিল্পশাস্ত্র 'রূরাবলিয়ের' বিধির উপর কতকটা নির্ভর করিয়া থাকে। সিংহলে যাহা প্রচলিত আছে, তাহা অসম্পূর্ণ ও ভ্রমপূর্ণ। ইহাতে আছে দেবদেবীর ধ্যান, রূপ বর্ণনা ও পরিমাপ। নাথদেবিয়ো, অন্টনাম, দশ অবতার, ষোল প্রকার সিংহ, হংসরূপ,



পাখী (১৮শ শতাব্দীর ফ্রেস্কো)

অশ্বয়, লতা কিন্নর ও মকর। জগন্মোক-মাতার ধ্যান এইরূপ—'পৃথিবীর একমাত্র মাতার বন্দনা করি, যাঁহার চার হাত-পা আছে, যাঁহার কপালের রক্ত চন্দ্র, যাঁহার উন্নত বক্ষ, যিনি সোনার মত উজ্জ্বল, যাঁহার হাতে আছে নির্মল শ্বেতপদ্ম, অঙ্কুশ এবং ফুলের মালা।' পরিমাপ সম্বন্ধে আছে 'পরিমাপ সম্বন্ধে বর্ণনা করিয়াছি, পৃথিবীতে যে উচ্চতা ও দৈর্ঘ্য, তা দেওয়া হইয়াছে। দেহের আকার ও পার্থক্য বলা হইয়াছে। ব্রহ্ম ও পৃথিবীর অন্যান্য অধিপতি, সর্বজ্ঞ, দেবতা, অসুর, দানব, রাক্ষস, যক্ষ, নাগ, গরুড়, কিন্নর ভূত, খুম্ভাণ্ড (?) এবং সেই সঙ্গে মানুষ বাচা চতুষ্পদ জন্তু এবং পাখীরও পরিমাপ দেওয়া হইয়াছে।'

মূর্তি নির্মাণে মাপের ভুল হইলে কি হইবে? 'মূর্তি নির্মাণে মাথার (মাপের) কমতি হইলে পিতামাতার মৃত্যু হইবে; পিঠের হইলে গোষ্ঠীর ধ্বংস হইবে; গলার এবং দুই পায়ের হইলে স্ত্রীর মৃত্যু হইবে; যদি সব কিছুর কমতি হয়, সব ধ্বংস হইবে।'

সারিপুত্র

মূর্তি নির্মাণে (ভাস্কর্যে) বিশেষ করিয়া বুদ্ধমূর্তি নির্মাণে সিংহলের শিল্পীরা সারিপুত্র নামক শিল্পশাস্ত্রের নির্দেশ মানিয়াছে। এই শিল্পশাস্ত্রখানি সংস্কৃত ভাষায় রচিত। সিংহলী শিল্পীরা সংস্কৃত জানে না বলিয়া অনেকস্থলে ইহা বিকৃত হইয়াছে। গ্রন্থকারের নামানুসারে ইহারও নাম সারিপুত্র হইয়াছে। কোন পুঁথির সিংহলী ভাষার টীকায় আছে, ১১৬৫ খৃষ্টাব্দে রাজা সর্বজ্ঞ পরাক্রমবাহু লঙ্কার সিংহাসনে আরোহণ করিলে, ডিম্বলগালার (ডাম্বুল) মহাথেরা কাশ্যপের এক শিষ্যের হাতে অনুবাদের ভার দিয়াছিলেন শিল্পীদের নির্দেশ দেওয়ার জন্য।

বুদ্ধের বন্দনা করিয়া তাহার পরিমাপ দেওয়া হইয়াছে 'শোন এখন বুদ্ধের তিন ভঙ্গির পরিমাপের বর্ণনা করিব—বসা, দাঁড়ান এবং শোওয়া।'

'বুদ্ধের মূর্তি নির্মাণ হয় সোনা, তামা, মাটী, পাথর, কাঠ, পোরামাটী এবং চূণ দিয়া।'

বৈজয়ন্তয়

বৈজয়ন্তয় কারুশিল্পের গ্রন্থ। ৬৪ প্রকার অলঙ্কারের পরিচয় আছে। দেবতা রাজা এবং মানুষের বিভিন্ন প্রকারের অলঙ্কার। প্রত্যেক অলঙ্কারে কত ওজনের সোনা লাগিবে, তাহার উল্লেখ আছে ও তাহার নক্সা আছে। তরবারী, সিংহাসন ও দাগোবার মাপ দেওয়া আছে।

মায়ামাতায়া

'মায়ামাতায়া' আর একটি শিল্পশাস্ত্র। ইহা স্থাপত্য ও জ্যোতিষাদি গণনাবিষয়ক গ্রন্থ। সিংহলী কারিগরগণ দিনক্ষণ দেখিয়া কাজ শুরু করে। গৃহনির্মাণে কিসে মঙ্গল-অমঙ্গল হয়, ইহাতে লিপিবদ্ধ আছে। মূল রচনা সংস্কৃতে। ১৮৩৭ খৃষ্টাব্দে সিংহলী ভাষায় ইহার অনুবাদ হয়।

পরিচয়

শ্রীপরিমল মুখোপাধ্যায়

ব্যারাকপুর স্টেশন!

কলকাতা যাবার গাড়ির অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে আছি। স্টেশনে ভিড় মন্দ হয় নি—জাতি, ধর্ম ও রকমারি বেশভূষার বিচিত্র সমাবেশ। চীনে বাদাম, হরেক রকম ওষুধ, তেল, হাত পাখা, ইজের গেঞ্জি, পান বিড়ি-সিগারেটের ফেরিওয়ালা ও ক্যানভ্যাসারের ঐক্যতান!

একটি শ্বেতাঙ্গ যুবক এসে আমার অনতিদূরেই দাঁড়াল। খাঁকি পোষাক পরা, মুখে পাইপ, কাঁধে ডোরাকাটা কালো ফিতের ব্যাজ,—অফিসার হবে বোধহয়, আকৃতি ও চাহনিতে বুদ্ধির পালিশ জ্বল্ জ্বল করছে। সম্ভবত নতুন এসেছে ভারতবর্ষে—কুতূহলী দৃষ্টিতে চারদিকের লোকের কথাবার্তা, চালচলন লক্ষ্য করছিল, দেয়ালে থুতু আর পানের পিকের শিল্পকলা এবং ইতস্তত বিক্ষিপ্ত ঠোঙা আর শালপাতার দাক্ষিণ্যে মাঝে মাঝে বিরক্তিও বোধ করছিল হয় তো।

বুট পালিশ সাব, জুতি বুরুশ?—বারো-তেরো বছরের একটি হিন্দুস্থানী ছেলে এসে দাঁড়াল। হাতে কাঠের বাক্স একটি—ভিতরে গোটাতিনেক কালির কৌটা, আর দুটি ব্রাশ, ডান কানে আধখানা সিগারেট, পরনে শতচ্ছিন্ন বস্ত্রখণ্ড নোংরা রুক্ষ শীর্ণ চেহারার বীভৎসতা বাড়িয়েছে মাত্র।

পালিশ্ সাব?—ছেলেটা বসে পড়ল সাহেবের পায়ের কাছে।

—নেই, ভাগো।—বলে একটু পেছিয়ে গেল সাহেব।

ছেলেটা ভয় পেল না, উঠে দাঁড়িয়ে পেটে হাত দিয়ে বললে,—নট্ ফুল সাব, আজ পুরা খানা নেহি মিলা। তব্ভি খানেকে লিয়ে নেহি। একঠো কালিকা ডিব্বা খরিদনা হোগা। ওনলি ফোর অ্যানাস সাব, একদম ফাইন পালিশ হো যায়গা। সাহেবের দিকে এগিয়ে গেল।

সাহেব বিব্রত হয়ে এদিকে ওদিকে তাকাতেই আমার দিকে নজর পড়ল। জিজ্ঞেস করলে, What does he say, this dirty creature—কী বলছে এ, নোংরা জানোয়ারটা?

বুঝিয়ে দিলাম।

বোধহয় নরম হল একটু। তবু এড়াবার শেষ চেষ্টা করে হাতঘড়ির দিকে তাকিয়ে বললে, টাইম নেই হ্যায়, ভাগো।

ছেলেটা ছাড়ে না, পা জড়িয়ে ধরে বলে, —আভি তক্ সিগন্যাল ডাউন নেহি দিয়া সাব, হো যায়গা।

আচ্ছা, জলদি করো। —বিরক্ত হয়ে সাহেব সম্মতি দিলে।

ছেলেটার মুখে আনন্দের একটু ঝিলিক উঠেই মিলিয়ে গেল। সোৎসাহে লেগে গেল কাজে।

সিগ্ন্যাল দিয়েছে।

—জলদি করো, এ-এ। —সাহেবের স্বরে অসহিষ্ণুতা।

হো গিয়া সাব্। —ছেলেটা আরও তাড়াতাড়ি ন্যাকড়া ঘষে।

গাড়ি দেখা দিয়েছে দূরে, ঘণ্টা বাজল।

—হো গিয়া, হো গিয়া সাব।—ছেলেটা নিজে থেকেই বলে। শেষ দুবার ন্যাক্ড়াটা ঘষে উঠে দাঁড়ায়, দক্ষিণ তর্জনী দিয়ে কপালের ঘাম ঝেড়ে ফেলে, চক্চকে জুতোর দিকে একবার চেয়ে নিয়ে সগর্বে তাকায় সাহেবের দিকে—দু চোখে প্রত্যাশা ও ঔৎসুক্য।

ব্যাগ খুলতেই সাহেবের চোখেমুখে প্রকাশ পেল অসীম বিরক্তি ও ভয়—চেঞ্জ নেই! বার করল দু টাকার একটা নোট।

—চেঞ্জ হ্যায়?—জিজ্ঞেস করল বজ্রকণ্ঠে।

নেহি সাব। অপরাধীর সুরে উত্তর দিলে ছেলেটা।

—নেহি হ্যায়? সাচ্ বোলো।

ট্যাঁক ও বাক্সটার দিকে দেখিয়ে বললে ছেলেটা,—সাচ্, আপ দেখিয়ে না।

আমাকেও জিজ্ঞেস করল সাহেব। চেঞ্জ ছিল না, বললাম।

দিজিয়ে না, আভি লাতা হুঁ।

—নো উল্লুক। —নোটটা দিয়ে সাহেব বললে, But রাখ্ যাও বাকস।

ছেলেটা রেল লাইন ডিঙিয়ে ওপারে অদৃশ্য হয়ে গেল।

গাড়ি এসে পড়ল প্রায়, ছেলেটা আর আসে না, —সাহেব চঞ্চল।

গাড়ি মন্থর গতিতে প্রবেশ করছে স্টেশনে। তবু আসে না ছেলেটা। সাহেব ঘনঘন তাকাতে লাগল ওপারে।

গাড়ি থামল। যাত্রীদের ওঠানামার কোলাহলে মুখর হয়ে উঠল প্ল্যাটফর্ম।

শেষ মুহূর্তে হতাশ হয়ে সাহেব একটা কটূক্তি উচ্চারণ করে এক লাথিতে বাক্সটাকে ফেলে দিলে গাড়ির নীচে। তারপর উঠে বসল দ্বিতীয় শ্রেণীতে।

গাড়ি ছাড়ল। কিন্তু কয়েক সেকেণ্ডের মধ্যেই উঠল একটা অতর্কিত আতঙ্কের সম্মিলিত আর্তস্বর। গাড়িটা থেমে গেল। ব্যাপার কি?

'চাপা পড়েছে', 'গরু একটা', নেহি নেহি, 'একঠো জানানা,' 'বাঁচ গিয়া' 'বহুত খুব'—অর্ধেক লোক নেমে পড়েছে গাড়ি থেকে।

কেমন একটা ভয় হল। নামলুম। অতি কষ্টে ভিড় ঠেলে সামনের দিকে এগিয়ে দেখি, যা ভয় করছিলাম তাই। চিৎ হয়ে পড়ে রয়েছে, বাঁ পায়ের হাঁটু থেকে অর্ধেকটা নেই, চোট লেগে মাথা ফেটে এক পাশ দিয়ে রক্ত ঝরছে, হাতের মুঠোয় এক টাকার একখানা নোট, চারদিকে ইতস্তত বিক্ষিপ্ত কয়েকটি আনি-দুআনি।

গার্ড পরীক্ষা করল দেহটিকে, তারপর কুলিদের দিয়ে সরিয়ে একধারে রাখলো।

একসময় চেয়ে দেখি, সেই সাহেবটি ভিড় ঠেলে এগিয়ে এল। দেখেই চিনতে পারলো 'বেইমান' ছেলেটাকে।

থ' হয়ে রইল প্রায় আধ মিনিট। তারপর বললে গার্ডকে,—Would you kindly arrange to lift the boy up into my compartment—ছেলেটিকে তুলে দেবেন আমার গাড়িতে দয়া করে?

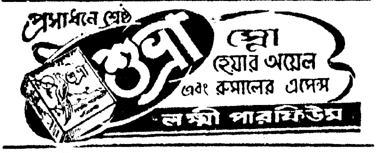
গার্ড প্রথমে একটু আশ্চর্য হয়ে গেল, পরক্ষণেই বললে,—But he is finished —কিন্তু সব শেষ হয়ে গেছে যে।

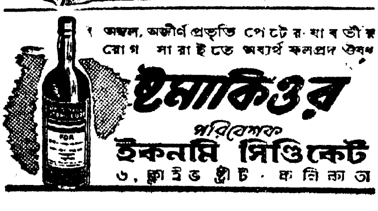
সাহেব এগিয়ে গেল মৃতদেহটার দিকে। পাশেই ছিলাম আমি। চিনতে পারল আমাকে।

বললে,—Money can't make up this loss—isn't it?—টাকা দিয়ে এ ক্ষতির পূরণ হয় না, না?—বলেই একটু হাসল, সত্যিসত্যিই বেদনার হাসি।

মৃদু হাসিতেই তার জবাব দিলাম। ঘণ্টা বাজল। সকলে উঠল গিয়ে গাড়িতে সঙ্গে সঙ্গে আমিও। সাহেব মাথা মাটির দিকে ঝুঁকিয়ে, ধীর পায়ে চল্ল তার সেকেণ্ড ক্লাস কম্পার্টমেণ্ট লক্ষ্য করে। পিছন ফিরে আর একবার তাকাল ছেলেটার রক্তাপ্লুত দেহটার দিকে,—পরক্ষণেই ঘাড় বাঁকিয়ে তাকাল জুতোর দিকে। সদ্য বুরুশ করা জুতো,—পালিশ ঝক্ঝক করছে।


শ্রীকল্যাণ
জেম কেমিক্যাল · কলিকাতা


প্রসাধনে শ্রেষ্ঠ
শুভ্রা
স্নো
হেয়ার অয়েল
এবং রুমালের এসেন্স
লক্ষ্মী পারফিউম


অম্বল, অজীর্ণ প্রভৃতি পেটের যাবতীয় রোগ সারাইতে অব্যর্থ ফলপ্রদ ঔষধ
ইমাকিওর
পরিবেশক
ইকনমি সিণ্ডিকেট
৬, ক্লাইভ ষ্ট্রীট · কলিকাতা

'দেবানাং প্রিয় প্রিয়দর্শী'

শ্রীদিলীপ বিশ্বাস

প্রাচীন ভারতবর্ষীয় নৃপতিগণের রাজকীয় উপাধি ও উপোপাধিগুলির বিবর্তন এতই চিত্তাকর্ষক যে তা ঐতিহাসিকের কৌতূহল ও মনোযোগ আকর্ষণ না করেই পারে না। যথোচিত ঐতিহাসিক উপাদানের অভাবে, ভারতবর্ষের, অন্তত প্রাচীন ভারতবর্ষের ইতিহাসের অনেকটাই অস্পষ্ট, একথা না মেনে যেমন উপায় নেই—তেমনি একথাও স্বীকার্য যে রাজকীয় খোদিতলিপি (inscription) ও মুদ্রার উপর কিছু অধিক মাত্রায় নির্ভরশীল হওয়ার জন্যই ভারতবর্ষের ঐতিহাসিকগণ সাড়ম্বর ঘোষিত রাজকীয় উপাধিগুলির সঙ্গে ঘনিষ্ঠ পরিচয়ের সুযোগ পান প্রচুর। ভারতে হিন্দু যুগের গোড়া থেকে শেষ পর্যন্ত এই অগণ্য উপাধিগুলিকে শাখা প্রশাখা সমেত বিশ্লেষণ করে তাদের বিবর্তনের স্বরূপ উদ্ঘাটন করা বর্তমান প্রবন্ধের উদ্দেশ্য নয়। স্থানান্তরে সে প্রচেষ্টা করা যাবে। এখানে শুধু প্রাচীন ভারতের শ্রেষ্ঠ নরপতি অশোকের স্বগৃহীত দুটি উপাধি সম্পর্কে কিছু আলোচনা করব।

অশোক মৌর্য বংশের তৃতীয় রাজা এবং রাজত্ব করেছিলেন খৃষ্টপূর্ব তৃতীয় শতকে। তাঁর সুপ্রসিদ্ধ খোদিতলিপিগুলি পাঠ করলে দেখা যায় যে, তিনি তাঁর রাজ্যে সমধিক পরিচিত ছিলেন, "দেবানাং প্রিয় প্রিয়দর্শী" এই নামে। তাঁর পূর্ণাঙ্গ উপাধিটি অবশ্য দাঁড়ায় "দেবানাং প্রিয় প্রিয়দর্শী রাজা।" কালসিতে প্রথম ও সাহবাজগড়িতে দ্বিতীয় পর্বতলিপিতে "রাজা" শব্দটি অনুপস্থিত। সাহবাজগড়ির প্রথম লিপিতে "প্রিয়দর্শী" শব্দটি দেখা যায় না। ধৌলি ও জৌগড়ার পর্বতলিপিতে শুধু "দেবানাং প্রিয়" শব্দটি ছাড়া আর কিছুই নেই। ঐ স্থানদ্বয়ের বিশেষ লিপি দুটি রাজ্ঞীর স্তম্ভলিপি (বা Queen's edict) এবং কৌশাম্বীর স্তম্ভলিপি সম্পর্কে একই কথা। দ্বাদশ ও ত্রয়োদশ পর্বতলিপিতেও প্রথম উল্লেখের পর পূর্বোক্ত প্রণালীতে উপাধি সংক্ষেপ করা হ'য়েছে। সারনাথ স্তম্ভ, রূপনাথ সাহসরাম, বৈরাট ও মহীশূরের তিনটি পর্বতলিপিও বহন করছে সেই সংক্ষিপ্ত সার। ভাবরু লিপিতে পাই "রাজা প্রিয়দর্শী"।১ অপরাপর প্রায় সর্বস্থলেই সম্পূর্ণ আকারে "দেবানাং প্রিয় প্রিয়দর্শী রাজা" লক্ষ্য করা যায়।

আশ্চর্যের বিষয় অশোকের অসংখ্য খোদিতলিপির মধ্যে একমাত্র মাস্কি লিপিতেই তাঁর ব্যক্তিগত নাম (অশোক) উল্লিখিত হ'য়েছে।২ যখন মাস্কি লিপি আবিষ্কৃত হয়নি—ভারতে ইতিহাস চর্চার সেই শৈশবে, উক্ত প্রিয়দর্শীর পরিচয় একটি সমস্যায় দাঁড়িয়ে গিয়েছিল। ব্রাহ্মী লিপির প্রথম পাঠোদ্ধার কর্তা প্রিন্সেপ স্থির করেছিলেন যে, লিপিগুলি সিংহলরাজ তিষ্য বা তিস্স কর্তৃক প্রচারিত। কারণ তিষ্যও রাজত্ব করেন খৃষ্টপূর্ব তৃতীয় শতকে এবং পালিতে লেখা সিংহলের প্রাচীন ঐতিহ্য সংগ্রহ "মহাবংশ" (রচনাকাল আনুমানিক ষষ্ঠ বা সপ্তম খৃষ্টাব্দ) পাঠ করলে জানা যায় যে, তিনিও "দেবানাং প্রিয়" এই উপাধিতে সুপরিচিত ছিলেন।৩ কিন্তু এই ভ্রান্ত অনুমান শীঘ্রই দূর করলেন টার্নুর। প্রাচীন সিংহলের অনুরূপ অপর একটি ঐতিহ্য সংগ্রহ দীপবংশে (রচনাকাল আনুমানিক চতুর্থ বা পঞ্চম খৃষ্টাব্দ) মৌর্য সম্রাট অশোককে "পিয়দস্সি" (প্রিয়দর্শী) ও "পিয়দসসন" (প্রিয়দর্শন) বলে যে উল্লেখ করা হ'য়েছে এ বিষয়ে তিনি ঐতিহাসিকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। মাস্কি লিপিতে অশোকের নাম আবিষ্কৃত হওয়াতে অবশ্য এ বিষয়ে সকল তর্কের অবসান ঘটেছে।

আক্ষরিক অর্থে "দেবানাং প্রিয়" কথাটি বোঝায় "দেবগণের প্রিয় পাত্র"। পাণিনির দুইটি সূত্রের উপর (যথাক্রমে ২।৪।৫৬ এবং ৫।৩।১৪) ভাষ্য করতে গিয়ে পতঞ্জলি এই শব্দটিকে "ভবান" "দীর্ঘায়ুঃ" এবং "আয়ুষ্মান্" ইত্যাদি শ্রীবাচক শব্দের সমগোত্রীয় বলে নির্দেশ করেছেন। বাণভট্টের হর্ষচরিতেও দুবার এই শুভ অর্থে শব্দটির প্রয়োগ পাওয়া যায়।৪।

কিন্তু এ ছাড়াও শব্দটির একটি বিশেষ অর্থ আছে- যার কিছু আভাস পাওয়া যায় পাণিনির অপর একটি সূত্রে—যেখানে তিনি বলেছেন যে, ভর্ৎসনা বা অবজ্ঞা অর্থে সমাসের প্রথম বাক্যটিতে ষষ্ঠী বিভক্তির রূপ অটুট থাকে (ষষ্ঠ্যা আক্রোশে ৬।৩।২১)। কাশিকা বৃত্তিতে এর দুটি উদাহরণ দেওয়া হ'য়েছে যথা "চৌরস্য কুলম্" (চোরের বংশ বা পরিবার) এবং "বৃষলস্য কুলম" (নীচ জাতীয়ের কুল)। কাত্যায়ন এই সূত্রের উপর যে বার্তিকগুলি করেছেন তার একটিতে বলেছেন যে, "দেবানাং প্রিয়" শব্দটিও ঐ শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত। "সিদ্ধান্ত কৌমুদী"-কার ভট্টোজি দীক্ষিত এ বিষয়ে আর কোনও সন্দেহ রাখেননি—অতি স্পষ্ট ভাষায় বলেছেন বার্তিকোক্ত শব্দটির অর্থ হচ্ছে "মূর্খ"। হেমচন্দ্র তাঁর "অভিধান চিন্তামণি"তে শব্দটির ঐ একই অর্থ নির্দেশ করেছেন।৫

পাণিনির কালনির্দেশ নিয়ে পণ্ডিতদের মধ্যে বিস্তর মতভেদ আছে তবে ঐ তর্কারণ্যে প্রবেশ না করেও বলা চলে যে, খৃষ্টপূর্ব পঞ্চম শতকে তাঁর স্থান নির্দেশ করা বর্তমানে সর্বাপেক্ষা যুক্তিযুক্ত।৬ পতঞ্জলিকে সাধারণত ফেলা হয় খৃষ্টপূর্ব দ্বিতীয় শতকে যদি ও অনেকের সন্দেহ যে, তিনি আরও পরবর্তী। কাত্যায়নের কাল আনুমানিক খৃষ্টপূর্ব চতুর্থ অথবা তৃতীয় শতক। কাশিকা বৃত্তি রচিত সম্ভবত খৃষ্টীয় সপ্তম শতকে। হেমচন্দ্র ও ভট্টোজি দীক্ষিত তাঁদের গ্রন্থ রচনা করেন যথাক্রমে খৃষ্টীয় দ্বাদশ ও সপ্তদশ শতাব্দীতে।৭ আর একথা তো সুবিদিত যে, হর্ষের সভাকবি বাণভট্ট খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীর লোক। সুতরাং উপরি উক্ত সাক্ষীদের জবানবন্দীগুলি পর পর সাজালে একথা স্বভাবতই মনে হয় যে, অপেক্ষাকৃত প্রাচীনকালে (যথা পতঞ্জলির যুগে) "দেবানাং প্রিয়" কথাটি আক্ষরিক অর্থে "দেবগণের প্রিয়" হিসাবেই ব্যবহৃত হ'ত এবং সম্মানসূচক উপাধি হিসাবে চলত। অন্তত বাণভট্টের যুগ পর্যন্ত এর জের চলেছিল সন্দেহ নেই। কিন্তু এর পূর্ব হ'তেই কথাটির একটি বিশেষ কদর্থ গড়ে উঠতে শুরু করে এবং ক্রমে তা বেশ কায়েম হ'য়ে শব্দটিকে দখল করে নেয়। এই অর্থান্তরের কারণ রহস্যাবৃত। কিন্তু হয়তো শব্দটির এই দুটি বিপরীত অর্থের ভিতর এত স্পষ্ট সীমারেখা নির্দেশ করা চলে না। দুটি অর্থ পর পর গড়ে না উঠে অনেকটা পাশাপাশি গড়ে উঠেছে—এ'ও অসম্ভব নয়। জার্মান পণ্ডিত হুলটশ দেখিয়েছেন যে, খুব সম্ভব পতঞ্জলি নিজেও ঐ শব্দটির কদর্থের সঙ্গে অপরিচিত ছিলেন না।

1. E. Hultzsch—Corpus Inscriptionum Indicarum Vol. I pp. XXVIII—XXIX.

2. D. R. Bhandarkar & S. N. Majumdar Sastri—The Inscriptions of Asoka (Calcutta 1920) p. 93, line 10

"দেবানং পিয়স অসোকস"......

৩। মহাবংশ—একাদশ অধ্যায়।

4. Hultzsch—Corpus Inscriptionum Indicarum, Vol. I, pp. XXVIII—XXX.

5. Ibid.

6. H. C. Rai Chaudhuri—Early History of the Vaisnava Sect (2nd ed.) p. 30.

7. Keith—A History of Sanskrit Literature (1928), pp. 119, 414, 426, 430.

অশোকের খোদিত লিপিগুলি পাঠ করলে এ ধারণা দৃঢ় হয় যে, "দেবানাং প্রিয়" শব্দটি কেবল যে তাঁর বিরুদ হিসাবে ব্যবহৃত হ'ত তা নয়—তা সেখানে অনেক সময়েই "রাজা" শব্দের সমর্থবাচক ছিল। তাই কোনও কোনও স্থানে আমরা দেখি অশোক তাঁর পূর্ববর্তী নৃপতিগণকে উল্লেখ করেছেন "দেবানাং প্রিয়" বলে।৮ স্থানান্তরে তাঁরাই আবার "রাজা" বলে উল্লিখিত হ'য়েছেন।৯ ধৌলির দ্বিতীয় বিশেষ লিপিতে "দেবানাং প্রিয়" কথাটি ব্যবহৃত হ'য়েছে এবং জৌগড়ার দ্বিতীয় বিশেষ লিপিতে একই স্থানে অনুরূপ অর্থে "রাজা" শব্দটি পাওয়া যাচ্ছে।১০ সুতরাং এ বিষয়ে সন্দেহের বিশেষ অবকাশ নেই।

এখন প্রশ্ন হ'ল অশোক কোথাকার রাজা ছিলেন? অবশ্য তাঁর খোদিত লিপিগুলির অবস্থান ও আভ্যন্তরীণ সাক্ষ্য একথা প্রমাণ করে যে, দাক্ষিণাত্যের কিয়দংশ বাদ দিয়ে সমগ্র ভারতবর্ষই তাঁর আধিপত্য স্বীকার করেছিল। কিন্তু ভারতের কোন্ বিশেষ প্রদেশ এই বিশাল সাম্রাজ্যের কেন্দ্র ছিল এই প্রশ্নের উত্তরও অশোকের খোদিত লিপিতেই মেলে। ভাবরু লিপিতে অশোক স্পষ্ট ভাষায় নিজেকে "মাগধ" বা বিশেষ করে মগধের রাজা বলে ঘোষণা করেছেন (পিয়দসি লাজা মাগধে.....)।১১ বর্তমান বিহার প্রদেশের দক্ষিণ ভাগ (পাটনা এবং গয়া জেলা) প্রাচীন যুগে মগধ নামে পরিচিত ছিল। প্রথমেই বলেছি অশোক তাঁর পূর্ববর্তী রাজগণকে "দেবানাং প্রিয়ঃ" বলে উল্লেখ করেছেন। এই পূর্ববর্তিগণ কারা? ভারতবর্ষের ইতিহাসে মগধের প্রাধান্য আরম্ভ হয় খৃষ্টপূর্ব ষষ্ঠ শতকে হর্যঙ্ক কুলের রাজা বিম্বিসারের সিংহাসনে আরোহণের সঙ্গে সঙ্গে। বিম্বিসারের রাজত্বকাল থেকে অশোকের কলিঙ্গ জয় পর্যন্ত মগধের ইতিহাস মগধ সাম্রাজ্যবাদের অবিরাম প্রসারেরই ইতিহাস। বিম্বিসার সম্বন্ধে আমাদের জনৈক আধুনিক ঐতিহাসিক ডাঃ শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র রায় চৌধুরী যা বলেছেন তা যথার্থ যে বিম্বিসার "launched Magadha into that career of conquest and aggrandisement which only ended when Asoka sheathed his sword after the conquest of Kalinga.

সুতরাং অশোক যখন তাঁর পূর্ববর্তী সদনুষ্ঠানকারী রাজাদের "দেবানাং প্রিয়" বলে উল্লেখ করেন তখন আমাদের পক্ষে এ অনুমান করা স্বাভাবিক যে, তিনি তাঁর পূর্ববর্তী মগধ রাজদের কথাই বলছেন। কেননা নিজেও তো তিনি মগধের রাজা—এই বিশেষ পরিচয় দিতে কুণ্ঠিত হননি। সৌভাগ্যবশত এ অনুমানের সমর্থক প্রমাণও কিছু পাওয়া যায়। দ্বাদশ জৈন উপাঙ্গের প্রথম উপাঙ্গ উব্বাইয় বা ঔপপাতিক সূত্রে রাজা বিম্বিসারের পুত্র ও মগধের সিংহাসনে তাঁর উত্তরাধিকারী কুণিক অজাতশত্রুকে "দেবানুপ্পিয়" বলে উল্লেখ করা হয়েছে (চংপাত্র নয়রীএ কোনিয়স্স রন্নো গিহে জেনেব বাহিরিয়া ঔবঠ্‌ঠাণসালা জেনেব কুনিও রায়া ভিংভসারপুত্তে তেণেব উবাগচ্ছ জম্সনং দেবানুপ্পিয় দংশনং ক...

8. Hultzsch—Corpus Vol. 1. pp. 59—60, 77—78.

9. Ibid. pp. 98, 109.

10. Ibid. pp. 98, 115—16.

11. Ibid. pp. XXX, 172—73; D. R. Bhandarkar-Asoka (2nd ed.) p. 102.

12. H. C. Rai Chaudhury—Political History of Ancient India (4th ed.) p. 99.

জম্পসণং দেবানম্পিপয়া দংশনং পবীহংতি, জম্পসণং দেবানংপিপয়া দংশনং পন্থেতি, জম্পসণং দেবানংপিপয়া দংশনং অভিসংসংতি)।[১৩] "দেবানংপিপয়" কথাটি "দেবানাং প্রিয়" শব্দটির আর একটি প্রাকৃত রূপান্তর। সুতরাং অজাতশত্রু যে "দেবানাং প্রিয়" উপাধিতে পরিচিত ছিলেন একথা মেনে নেবার পথে কোনও বিঘ্ন নেই। অপর পক্ষে দেখা যাচ্ছে অশোকের পৌত্র দশরথ তাঁর নাগার্জুনী পর্বতের খোদিত লিপিতে "দেবানাং প্রিয়" বলে উল্লিখিত হয়েছেন।[১৪] এই শিলালিপির দশরথ যে মৎস্য ও বিষ্ণু পুরাণদ্বয়ে বর্ণিত অশোকের পুত্র দশরথ এ সম্পর্কে পণ্ডিতগণ প্রায় একমত। অতএব "দেবানাং প্রিয়" উপাধি গ্রহণ করার ধারাটি মগধ রাজবংশে অশোকের পরেও যে অক্ষুণ্ণ ছিল, একথা ধরে নেওয়া যেতে পারে।

এ সম্বন্ধে অনুমানের ভিত্তি আরও দৃঢ় হয় "প্রিয়দর্শী" শব্দটির আলোচনায়। এর অর্থ নিয়ে কোনও মতভেদ নেই। প্রিয়দর্শন বা সুদর্শন অর্থেই তা ব্যবহৃত হয়েছে। পূর্বেই বলেছি যে দীপবংশে অশোক "পিয়দস্সি" বা "প্রিয়দস্সন" বলে উল্লিখিত হওয়ায় তাঁর খোদিত লিপিগুলির সমর্থন সেখানে পাওয়া যায়। অশোকের পিতামহ চন্দ্রগুপ্ত মৌর্যও সিংহলী ঐতিহ্যে "পিয়দস্সন" বলে পরিচিত ছিলেন এবিষয়ে অধ্যাপক ভাণ্ডারকর আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন।[১৫] বহু শতাব্দী পরে রচিত বিশাখদত্তের মুদ্রারাক্ষস নামক সংস্কৃত নাটকও ঐ ঐতিহ্যের স্মৃতি বহন করছে। সেখানেও মৌর্য চন্দ্রগুপ্ত বর্ণিত নাটকের উপাখ্যান মৌর্য যুগের। "প্রিয়দর্শন" এই উপাধিতে ভূষিত (বঅসস্স জদি মে সুনিদববং তদো বহেহি কিং তং পিঅং জং পিঅদংশণস্স চন্দসিরিণো নিবেদিদং)। কেউ কেউ মুদ্রারাক্ষসকে খৃষ্টীয় পঞ্চম বা ষষ্ঠ শতকের রচনা বলে মনে করেন। অধ্যাপক কীথ খৃষ্টীয় নবম শতাব্দীতে এ নাটক রচিত হয়েছে বলে অনুমান করেছেন।[১৭] কিন্তু রচনাকাল যাই হোক না কেন, সিংহলী ঐতিহ্যের সঙ্গে মিলিয়ে দেখলে সন্দেহ করবার উপায় থাকে না যে, এই নাটকের সাক্ষ্যটি মূল্যবান। সুতরাং একথা বিশ্বাস করবার যথেষ্ট হেতু পাওয়া যাচ্ছে যে, চন্দ্রগুপ্ত মৌর্যও তাঁর পৌত্রের ন্যায় "দেবানাং প্রিয় প্রিয়দর্শী" উপাধিতে ভূষিত ছিলেন। উপরে যা বলা হয়েছে তার থেকে মনে হয় এ অনুমান চন্দ্রগুপ্ত সম্বন্ধে যেমন খাটে, বিম্বিসার থেকে অশোক পর্যন্ত মগধের সমস্ত রাজার প্রতি তেমনি খাটে। অতএব একথা মনে করতে খুব বেশী বাধা নেই যে "দেবানাং প্রিয় প্রিয়দর্শী" উপাধি বিম্বিসারের সময় থেকেই ছিল মগধ রাজবংশের বিশেষত্ব। এবং বিম্বিসারোত্তর মগধের রাজগণ ছাড়া প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্যে বা খোদিত লিপিতে উল্লিখিত অন্য কোনও নরপতির নামের সঙ্গে এই উপাধি সংযুক্ত দেখতে পাওয়া যায়নি। হয়তো মৌর্যবংশের পতনের সঙ্গে সঙ্গে এর ব্যবহারও ক্রমশ লুপ্ত হয়েছিল।

•

অশোকের সমসাময়িক ও সুপরিচিত মিত্র ছিলেন সিংহলরাজ "দেবানাং প্রিয়" তিষ্য।[১৮] তিনি স্বদেশে "দেবানাং প্রিয়" উপাধিতে পরিচিত ছিলেন। কিন্তু তিষ্যের পূর্ববর্তী কোনও সিংহলরাজ এই উপাধি ধারণ করেননি। আশ্চর্যের বিষয় তিষ্যের পরবর্তী সিংহল রাজদের মধ্যে এই উপাধিটির চল হয় এবং গজবাহুগামিনী, মহল্লকনাগ প্রভৃতি রাজগণ এই উপাধি গ্রহণ করেন।[১৯] সিংহলে এই উপাধিটির অকস্মাৎ এমন বহুল ব্যবহার আমাদের বিস্ময়ের কারণ হতে পারে, যদি আমরা একটি সামান্য কথা মনে না রাখি। অশোক তাঁর দ্বিতীয় এবং দ্বাদশ পর্বত-লিপিতে স্পষ্ট ভাষায় ঘোষণা করেছেন যে, অপরাপর দেশের মধ্যে সিংহল (তাম্রপর্ণী) তার ধর্মবিজয়ের এলাকাভুক্ত ছিল। বৌদ্ধ ধর্মের ঐতিহ্যও শিলালিপির এই উক্তিকে সমর্থন করে। তাতে প্রকাশ যে, অশোক তাঁর ভ্রাতা, পুত্র মহেন্দ্র ও কন্যা সংঘমিত্রাকে বৌদ্ধ ধর্ম প্রচারার্থ সিংহলে পাঠিয়েছিলেন এবং তাঁদের প্রচারের ফলে সিংহলরাজ চল্লিশ হাজার অনুচরসহ বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করেন। এ কাহিনীর সবখানি হয়তো ইতিহাস নয়, কিন্তু অশোকের বৌদ্ধ ধর্ম প্রচার যে সমসাময়িক সিংহলকে গভীর ভাবে প্রভাবান্বিত করেছিল এতে কোনও সন্দেহ নেই। দুই দেশের মধ্যে বন্ধুভাবে ভাবের আদান প্রদানে সিংহলরাজ যে প্রবলতর নৃপতির প্রভাব এড়াতে পারবেন না—এ আর বিচিত্র কি? খুব সম্ভব ঐ প্রভাবের ফলেই তিনি মগধ রাজবংশের উপাধি "দেবানাং প্রিয়" গ্রহণ করেন এবং তার ফলেই তা সিংহল রাজবংশে প্রচলিত হয়। পরবর্তী নৃপতিদের সমসাময়িক ভিন্ন রাজবংশের প্রচলিত নাম ও উপাধি গ্রহণের দৃষ্টান্ত প্রাচীন ভারতবর্ষের ইতিহাসে বিরল নয়। গুপ্তসম্রাট সমুদ্রগুপ্তের প্রভাবে তাঁর সমসাময়িক কামরূপের অধিপতি সমুদ্র বর্মণ নাম গ্রহণ ও গুপ্ত সম্রাজ্ঞীর অনুকরণে স্বীয় রাজ্ঞীর নামকরণ করেন দত্ত দেবী—এ রকম অনুমান পণ্ডিতেরা করে থাকেন।[২০] মগধের পরবর্তী গুপ্তরাজগণের (later Guptas) ইতিহাস আলোচনা করলে দেখা যায়, তাঁদের ভিতর অন্তত দুজন রাজা আদি গুপ্তসম্রাটগণের মধ্যে দুজন সম্রাটের নাম গ্রহণ করেছিলেন—এরা হলেন যথাক্রমে কুমারগুপ্ত এবং দেবগুপ্ত।[২১] এই দুই গুপ্তবংশের মধ্যে কোনও সম্পর্কের অস্তিত্ব খুঁজে পাওয়া যায় না। বাদামীর চালুক্য রাজগন অনেকেই শ্রীপৃথিবীবল্লভ ও শ্রীবল্লভ উপাধিতে পরিচিত ছিলেন। তাঁদের পতনের পর বিজয়ী রাষ্ট্রকূট বংশ যখন তাঁদের রাজ্য অধিকার করেন—তখন বিজিত চালুক্য রাজবংশের উক্ত উপাধিগুলিও রাষ্ট্রকূট নৃপতিদের ভূষণস্বরূপ ব্যবহৃত হতে থাকে।[২২] সুতরাং দেখা যাচ্ছে প্রাচীন ভারতবর্ষে প্রবলতর রাজার প্রভাবে সমসাময়িক অন্য রাজার তাঁর শক্তিশালী প্রতিবেশীর উপাধি বা নাম গ্রহণের দৃষ্টান্ত রয়েছে এবং লুপ্ত রাজবংশের নাম ও উপাধিগুলি পরবর্তী রাজশক্তি কর্তৃক গ্রহণের দৃষ্টান্তেরও অভাব নেই।

পরিশেষে একথা উল্লেখযোগ্য যে, তক্ষশীলায় প্রাপ্ত আরামায়িক ভাষায় লেখা একখানি খোদিত লিপিতে "প্রিয়দর্শন" কথাটির উল্লেখ পাওয়া গিয়েছে।[২৩] অক্ষরতত্ত্ব খৃষ্টপূর্ব চতুর্থ বা পঞ্চম শতকে কালনির্দেশ করলেও কেউ কেউ বলেন যে, "প্রিয়দর্শন" কথাটি থাকার জন্য লিপিটি অশোকের কালের বলে অনুমান করাই সংগত। এ অনুমানের মধ্যে হয়তো কিছু যুক্তি আছে,—কিন্তু একথাও মনে রাখা কর্তব্য যে, "প্রিয়দর্শী" বা "প্রিয়দর্শন" উপাধি সম্ভবত অশোকের একচেটিয়া ছিল না, সুতরাং চন্দ্রগুপ্ত বা তাঁর পূর্ববর্তী কোনও রাজাকে বোঝালে, আশ্চর্য হবার কিছু নেই।

---

13. Quoted by Pt. Bhagwanlal Indraji in Indian Antiquary (1881) p. 108.
14. Indian Antiquary, Vol. XX, pp. 364 ff.
15. Bhandarkar-Asoka (2 nd ed.) p 5.
১৬। বিশাখদত্তের মুদ্রারাক্ষস (তেলাং সম্পাদিত সংস্করণ) পৃঃ ২৩৫।
17. Keith—The Sanskrit Drama (1924) p. 204.
১৮। মহাবংশ—১১।১৮—১৯; Smith-Asoka (3rd ed.) pp. 237—38.
19. E. Muller—Ancient Inscriptions in Ceylon (London, 1883). pp. 25—27.
20. H. C. Ray—The Dynastic History of Northern India, Vol. I, p. 238.
21. Fleet—Gupta Inscriptions, pp. 203, 215.

ট্রামে-বাসে

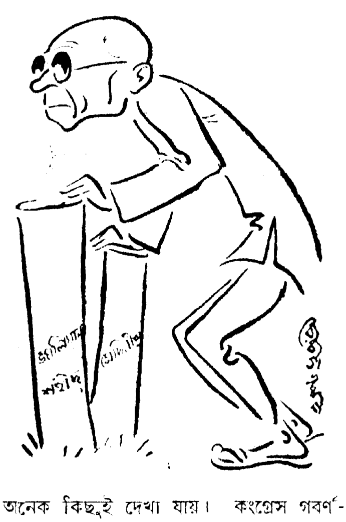
সিমলা সম্মেলন ব্যর্থ হওয়ায় নিরাশ হওয়ার কোন কারণ নাই। সম্মেলনের সার্থক পরিসমাপ্তিতে আমাদের সম্মুখে একটি মাত্র জানালা উন্মুক্ত হইত। সেই জানালা দিয়া আমরা ভবিষ্যতের পথের একটু ক্ষীণ আভাস পাইতাম মাত্র। কথাগুলি বলিয়াছেন পণ্ডিত জওহরলাল। কিন্তু এটা নিশ্চয়ই পণ্ডিতজীর দৃষ্টি বিভ্রম। তিনি যেটাকে জানালা বলিয়াছেন সেটা একটা 'ফাঁদ' ছাড়া আর কিছুই নয়। এই আবিষ্কার করিয়াছেন জনাব জিন্না। কিন্তু জিন্না সাহেবের অবগতির জন্য জানাইতেছি যে, আমাদের বিশুখুড়োর দিব্যদৃষ্টি আরও প্রখর। সিমলা লইয়া আমরা যখন মাতামাতি করিতেছিলাম সেই সময় খুড়ো আমাদের হাতে একটি সীল-করা খাম দিয়া বলিয়াছিলেন সম্মেলনের শেষে যেন আমরা খুলিয়া দেখি। যথাসময়ে খুলিয়া দেখা গেল তাহাতে আছে এক টুকরা কাগজে একটি ছোট্ট কবিতাঃ—

সিমলায় নেতৃসভা মহাধুমধাম
তালিকায় লেখে লোকে পরিষদী নাম।
ভাবে সবে deadlockএ পড়িবেই সব
অন্তরালে বসি হাসে কায়েদে আজম!

অর্থাৎ খুড়ো তাঁর দিব্যদৃষ্টির-প্রভাবে ঘুঘু এবং ফাঁদ দুটাই একসঙ্গে দেখিয়া রাখিয়াছিলেন।

* * * *

অনুরূপ দিব্যদৃষ্টির পরিচয় আমরা আরও পাইয়াছি। শ্রীযুক্ত রাজাগোপালাচারী আবিষ্কার করিয়াছেন "The Punjab and Bengal are two stumbling blocks on the way to freedom." রঙীন চশমার ভিতর দিয়া দেখিতেছি



অনেক কিছুই দেখা যায়। কংগ্রেস গবর্ণমেণ্ট দেশে প্রতিষ্ঠিত হইলে রাজাজীর এই আবিষ্কারের জন্য যথাস্থানে তাঁর একটি মর্মর মূর্তি স্থাপনের অনুরোধ আমরা এখন হইতেই করিয়া রাখিতেছি।

* * * *

সানফ্রান্সিস্কোর ব্যবসায়ীরা সম্মেলনে সমাগত প্রতিনিধিদের নিকট অনেক জিনিসপত্র বিক্রয় করিয়া খুব লাভবান হইয়াছে বলিয়া একটি সংবাদ প্রকাশিত হইয়াছে। এণ্টনী ইডেনের সাজের অনুকরণে অনেকেই নাকি হ্যাট, জামা-মোজা ক্রয় করিয়াছেন। "জহর কোর্তার" চলটাও এদেশে এই অনুকরণ প্রীতি হইতেই হইয়াছে। কিন্তু আমাদের দেশের জামা-কাপড়ের যা অবস্থা দাঁড়াইয়াছে তাহাতে মহাত্মার পোষাকের অনুকরণটাই হইবে সর্বদিক হইতে সঙ্গত এবং শ্রেয়। কিন্তু এইদিকে কাহারও বড় একটা উৎসাহ দেখা যায় না!

* * * * * *

প্রসঙ্গত মনে পড়িয়া গেল আমেরিকার অনেক মহিলাই নাকি এখন ভারতীয়াদের অনুকরণে শাড়ী পরিতে আরম্ভ করিয়া-



ছেন। আমাদের গর্বের কথা সন্দেহ নাই। কিন্তু শাড়ীর সঙ্গে শাঁখা ও সিন্দুরের প্রতি কতটা প্রীতি তাঁরা অর্জন করিয়াছেন সেই খবর না জানা পর্যন্ত পরিপূর্ণ আনন্দ উপভোগ করিতে পারিতেছি না। নোয়াটাও যে অপরিহার্য সেই সংবাদটাও জানিয়া রাখা প্রয়োজন।

* * *

সম্প্রতি করাচীর গভর্নর নাকি একদিন সস্ত্রীক পথ হারাইয়া অশেষ দুর্ভোগে পড়িয়াছিলেন। বাঙলার গভর্নর বাহাদুর ভগবৎ কৃপায় অনুরূপ পরিস্থিতিতে পড়েন নাই। কিন্তু বাঙলার পণ্যদ্রব্য প্রায় সমস্তই পথ হারাইয়া বিপথে চলিয়া যাইতেছে। পথ-হারাণার সাম্প্রতিক তালিকায় মাছটাও আসিয়া যুক্ত হইয়াছে। ফলে আমাদের চোখে পথের রেখাই অন্ধকারে বিলীন হইয়া যাইতেছে।

* * * *

একটি সংবাদে প্রকাশ, প্যারিসে প্রায় পঞ্চাশ হাজার গৃহিণী চোরাবাজার দমন করিবার জন্য উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়াছেন। আমাদের দেশের মেয়েরা আপাতত ট্রামে



চোয়া-প্রেম নিবারণের জন্য কোমরে আঁচল জড়াইতেছেন। বাজার সম্বন্ধে তাঁহারা এখনও উদাসীন।

* * * *

লুসিয়ানার একটি মুরগী নাকি ৩৬৫ দিনে ৩৩৬টি ডিম পাড়িয়া ১৯৪৪ সালের চেম্পিয়ান হইয়াছে। কিন্তু এর চাইতেও জোর খবর এই যে, ভারতবর্ষের একটি প্রসিদ্ধ পর্বত প্রকাণ্ড একটি অশ্বডিম্ব পাড়িয়া অনাগত কালের জন্য চেম্পিয়ান হইয়া রহিল!

* * * *

আমাদের সহযাত্রী নিরীহ শ্যামলাল ট্রামের এই ভীড়ের মধ্যেও আজ বসিয়া বসিয়াই নাক ডাকাইতেছে। অনুসন্ধানে জানা গেল, শ্যামলাল কাল সারারাত ঘুমায় নাই। কে নাকি তাকে বলিয়াছে যে, একটি কাগজে ১০৮টা "পুরের" নাম—যেমন হস্তিনাপুর, ভাগলপুর, ফরিদপুর—লিখিয়া জলে ভাসাইয়া দিলে বৃষ্টি হয়। বেচারী কাল সারা রাত জাগিয়া জাগিয়া ৭৮টির বেশী "পুর" মনে করিতে পারিল না। অথচ বৃষ্টিটার প্রয়োজন তার খুব বেশী। ক্যালকাটা-ইস্টবেঙলের খেলা। বৃষ্টি না নামিলে ইস্টবেঙলের পরাজয়ের আশা নাই। বলা বাহুল্য শ্যামলাল গঙ্গাচরবাসী। বিশুখুড়ো বলিলেন—এক বাপের এক মেয়ে কুলা মাথায় নিয়া নাচিলেও বৃষ্টি হয়। মোহনবাগান-ইস্টবেঙল খেলার দিনে পদ্মাচরবাসীরা নাকি তাই করিবে। শুনিয়া শ্যামলালের ঘুম চটিয়া গেল। সে দিন যে আবার বৃষ্টি চাই না!

কাপড়

আদিত্য ওহদেদার

পিছন হইতে আসিয়া পড়া মোটরের মুখ হইতে নিজেকে বাঁচাইতে গিয়া ফুট-পাথে লাফ্ দিতেই শিবনাথ শব্দ শুনিতে পাইল 'ফ্যাঁ—চ'

কি হইল বলিয়া চাহিয়া দেখিতেই শিবনাথের সারা বুক দুমড়াইয়া মুচড়াইয়া উঠিল। তাহার হৃদপিণ্ডটাই কে যেন ছুরি দিয়া চিরিয়া দিল।

লাফাইবার সময় রাস্তার ধার ঘেঁষিয়া রাখা একটা রিক্সার চাকার পেরেকে লাগিয়া পরণের কাপড়টা বেশ খানিকটা ছিঁড়িয়া গিয়াছে। আর এমন বিশ্রীভাবে ছিঁড়িয়াছে যে, তৎক্ষণাৎ কোঁচার খুঁট ধরিয়া ঢাকিয়া না দিলে নয়, নহিলে লজ্জার মাথা খাইতে হয়। সুতরাং একবার ভালো করিয়া ছিন্ন স্থানটি নাড়িয়া চাড়িয়া মায়ের কোলে মড়া ছেলের মত তাহার কাপড়খানির পরিণতি উপলব্ধি করিতে তা আর হইল না।

যাহারা দেখিয়াছিল, তাহারা বলিল—আহা! কাপড়টা বড় ছেড়াই ছিঁড়ল যে! এই বাজারে, একে কাপড় পাওয়া যায় না, তার উপর এমনি করে কাপড় ছিঁড়লে লোক কি করবে, তার ঠিক নেই।

লোক কি করিবে? কেন, পাগল সাজিয়া বস্ত্রের সহিত সম্পর্ক চুকাইয়া বেড়াইলে কেমন হয়? তাহা হইলে তো আর কাপড়ের ভাবনা ভাবিতে হয় না!

এই একখানি মাত্র কাপড়ে আসিয়া ঠেকিয়াছে। শিবনাথ কতো সন্তর্পণে কাপড়টিকে বাঁচাইয়া চলিয়াছে। বাড়িতে তো গামছা পরিয়াই কাটাইয়া দেয়—বাজারে লুঙ্গি; শুধু অফিসে কাপড়খানি জড়াইয়া আসে।

কিন্তু এখানিও যে এবার বাদ সাধিল! আর কাপড়েরই বা দোষ কি! পরিতে পরিতে প্রায় জীর্ণ হইয়া আসিয়াছে। সুতরাং একটু খোঁচাতেই অনেকটা ফাল হইয়া গেল। আসলে তাহার কপালই মন্দ। নহিলে অমন সহসা মোটরটা পিছন হইতে প্রায় তাহার ঘাড়ের উপর পড়িয়া হর্ন দিবে কেন, আর লাফাইতে গিয়া রিক্সার চাকার পেরেকে অমনভাবে কাপড়টা ফাঁসিয়া যাইবেই বা কেন?

না, দোষ কাহারও নাই। সবই তাহার অদৃষ্ট। তাহার স্ত্রী কামিনী রাগের মাথায় যে বলিয়া থাকে, এমন পোড়াকপাল পুরুষের হাতে যে মেয়েমানুষ পড়ে, তার কপালেও সকাল-সন্ধ্যে ঝাঁটা মারতে হয়—ঠিকই বলে কথাটা। সত্যই তো তার হাতে পড়িয়াছে বলিয়াই তো কামিনীর আজ এই দশা! পরণে একখানা আস্ত কাপড় নাই। অথচ তাহার এই বয়সে শাড়িতে জামাতে দেহ সাজাইবার কথা। একখানা শায়া-সেমিজ বা ব্লাউস নাই কামিনীর—শুধু একটা বস্ত্র-খণ্ড দিয়া কোনমতে নিজের দেহকে আবৃত করিয়া রাখে। এবার কোনমতে একখানি শাড়ি না কিনিতে পারিলে সেটুকুও আর চলিবে না।

স্বামী হইয়া স্ত্রীর পরিধেয় জোগাইতে পারে না—ইহা দুস্তর লজ্জার কথা বৈকি!

কিন্তু কি সে করিবে? কাপড় যদি না পাওয়া যায় তো, সে কি করিতে পারে! চোরাবাজারের কাপড় কিনিবার তাহার সাধ্য কোথায়? অফিসের মাহিনা ৩৮ টাকা সাড়ে দশ আনা, আর তাহার বিদ্যার অনুপাতে একটা ছেলে-পড়ানো দশ টাকা—এই ৪৮ টাকা সাড়ে দশ আনায় চোরাবাজারের খাঁই সে মিটাইবে কি ভাবে? এ-যুদ্ধ কেন যে বাধিয়াছিল? কে চাহিয়াছিল এই যুদ্ধ! রাজায় রাজায় যুদ্ধ হইবে, আর উলু-খাগড়ার এইভাবে প্রাণ যাইতে থাকিবে! শিবনাথ হাঁটিতে হাঁটিতে উহারই ভিতর বেশ জটিল দার্শনিক বিচারে গম্ভীর হইয়া ওঠে।

কণ্ট্রোলের দোকানে শাড়ি পাওয়া যাইতেছে শুনিয়া শিবনাথ চলিয়াছিল একটু পা ফেলিয়াই সে দিকে। পথে এই বিপদ। মনটা তাহার এতো খিঁচাইয়া গেল যে, সে একবার ভাবিল, মরুক গে, কাপড় কেনার দরকার নাই। সে বাড়ি চলিয়া যাইবে। কিন্তু পরক্ষণেই চিন্তা আসিল, আজ গাফিলতি করিলে হয়ত আর কোনমতেই কাপড় পাওয়া যাইবে না। কামিনীর এক-খানা কাপড় চাই-ই, তাহার কাপড়খানার যে অবস্থা, তাহাতে আর বোধ হয় দু-চার দিন পরেই বিবস্ত্র হইয়া থাকিতে হইবে। ভাবিতেই শিবনাথ কেমন এক আতঙ্কে শিহরিয়া উঠে। বুঝিতে পারে, ভবিষ্যতের সেই দিনটার কথাই স্মরণ করিয়া কামিনী অহরহ তাহাকে অমন কথার হুলে বিঁধিয়া থাকে। তাইতো শিবনাথ রাগ করিতে পারে না; উপরন্তু কামিনীর উপর আরও তাহার মায়া হয়।

বেচারি কামিনী! কিন্তু উঃ, কী দিন-কালই না পড়িয়াছে। ভগবান, এতো সহ্য করিতে হইবে! এতো চেষ্টা করিয়াও সে স্ত্রীর পরণের একখানি শাড়ি যোগাড় করিতে পারে না! যে দেহে যৌবন কাণায় কাণায় উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিয়াছে, তাহার শালীনতা কি একখানি পাতলা শতচ্ছিন্ন কাপড়ে রক্ষা হয়? বিশেষত পাশের বাড়িতে দুইটি কৌতূহলী চোখের লুব্ধ দৃষ্টি সর্বদাই উন্মুখ হইয়া আছে। শিবনাথের চোখেও এ ব্যাপার কতবার ধরা পড়িয়াছে। কামিনীকে এ সম্বন্ধে সতর্ক করিয়া দিতেই সে ফুঁসিয়া জবাব দিয়াছিল, তবু তো এখনো গাটা কতকটা ঢাকা থাকে গো; করে—? তোমাদের জাতের মুখে আগুন।

সত্যি, কামিনীর গাটুকুও বুঝি আর ঢাকা থাকে না। তাইতো শিবনাথ খবর পাইয়াই চলিয়াছে কাপড় কিনিতে। বন্ধুর কাছ হইতে অনেক বলিয়া কহিয়া দশ টাকা ধার নিয়াছে। মনে পড়িল বন্ধুর উপদেশ, এখন কাপড় কেনা কি পোষায় হে! আগে থেকে কিনে না রেখে এই কাণ্ড বাধিয়েছ। আমার বৌভাগ্যে আগে হতে শাড়ি কাপড় কয়েক জোড়া কিনে রেখেছিল, তাই এখন বেঁচেছি। জিনিস মজুদ করা দরকার হে!

মজুদ করা! তাহার বন্ধু করতে পারে। কিন্তু চল্লিশ-পঁয়তাল্লিশ টাকার ভিতর দেশের বাড়িতে মা, বিধবা বোন ও ভাইকে খরচ পাঠাইয়া মজুদ করিবে শিবনাথ! যাই হোক, আজ সে যে করিয়াই হউক কাপড় কিনিবে। কণ্ট্রোলের দোকানের বিভীষিকা সে জানে। আগে চারবার চেষ্টা করিয়া পায় নাই। কিন্তু শিবনাথ স্থির করিয়াছে, যে করিয়াই হউক আজ সে একটা কামিনীর জন্য কাপড় কিনিবেই। কামিনী কিছুই জানে না; সুতরাং হঠাৎ আজ কাপড় পাইয়া কামিনী নিশ্চয় খুশী হইবে। তাহার মুখে হাসি ফুটিবে। কামিনী কতদিন হাসে নাই; সে যেন হাসিতেই ভুলিয়া গিয়াছে।

আজ কামিনী হাসিবে; দুটো মিষ্টিকথা কহিবে শিবনাথের সাথে।

ভগবান, অন্তত সেইটুকুর জন্য আজ শত কষ্টের পরেও একখানি শাড়ি যেন পাওয়া যায়।

কণ্ট্রোলের দোকানে আসিয়া শিবনাথের চক্ষু চড়কগাছে উঠিল। সর্বনাশ, এবারেও বুঝি তাহার কপালে কাপড় মিলিল না। এই ভিড় ঠেলিয়া সে কি দরজার কাছে পৌঁছিতে পারিবে?

দোকানের দরজার একটি কপাট বন্ধ, অন্য কপাট ঈষৎ খুলিয়া রাখা হইয়াছে—মাত্র একজন লোক যাহাতে হাত গলাইতে পারে। সেই ঈষৎ মুক্ত ফাটলে হাত গলাইবার জন্য

ত্রিশ চল্লিশ হাত দূরে হইতে গুণ্ডাকৃতি লোকেরা ঠেলাঠেলি গুঁতোগুঁতি করিতেছে। প্রত্যেকেই চাহিতেছে অপর সকলকে পায়ের তলায় চাপিয়া পিষিয়া দরজার কাছে যদি যাওয়া যায়।

নির্ম্মম সে চেষ্টা! শুধু একখানি কাপড়। কিন্তু সে প্রয়োজন যে কত, শিবনাথ নিজেও তাহা ভালো করিয়া জানে।

কণ্ট্রোলের দোকানে এই অবস্থা দেখিয়াই তো শিবনাথ ইতিপূর্ব্বে চার বার ফিরিয়া গিয়াছে। কিন্তু আজ সে মরিয়া। শিবনাথ ভিড়ের মধ্যে ঢুকিয়া পড়িল।

কিন্তু কিছুক্ষণ ভিড়ের মধ্যে ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হইয়া দলিত মথিত হইবার পর শিবনাথ বুঝিল এভাবে থাকিলে শেষ পর্যন্ত তাহার হাড়গুলিই চূর্ণ হইবে; তাছাড়া জামা কাপড়ের সূতোগুলি পিঁজিয়া তুলো হইয়া উঠিবে।

পরিত্রাহি ডাক ছাড়িয়া সেই ভিড় হইতে শিবনাথ কোনমতে বাহির হইয়া আসিল।

পিছন হইতে কে বলিল, আরে মশাই, জামাটার পেছনটা যে ফাল্লা হয়ে গেছে।

শিবনাথ ভাবিল বোধ হয় তাহার নয়। কিন্তু পিঠে হাত দিতেই বুঝিল তাহার জামাটাই গিয়াছে।

সে শুধু চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল—এমন যে ঘটিবে তাহা সে যেন আগে হইতেই জানিত। মনে তখন তাহার কোনই ভাব নাই; সকল সুখদুঃখের অতীত বেশ একটা স্বচ্ছন্দ, নির্ব্বিকার অবস্থা।

চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া শিবনাথ ভিড় দেখিতে লাগিল।

—বাবু শুনিয়ে হাম্‌রা বাত!

ফিরিয়া চাহিতে শিবনাথ দেখিল একটা লম্বাচোড়া চেহারার হিন্দুস্থানী একখানি শাড়ি হাতে লইয়া তাহাকেই ডাকিতেছে।

শিবনাথ বিস্মিত হইয়া তাহার কাছে আসিল। লোকটা বলিল, আইয়ে হামারা সাথ। একটু আড়ালে লইয়া গিয়া বলিল, বাবু, আপনার সাড়ির বহুত জরুরত থাকে তো এটা লইয়া লিতে পারেন। কিন্তু চারটা টাকা বেশি দিতে হোবে।

শিবনাথ যেন কৃতার্থ হইয়া গেল। আরও বেশি চাহিলেও সে অনায়াসে দিতে রাজি হইত। শিবনাথ তাহাকে আশীর্ব্বাদ করিয়া শাড়িখানি বগলদাবা করিল। না, কপালটা তাহার নেহাৎ মন্দ নয়। এমন সহজে একটা আস্ত নতুন শাড়ি কে পাইয়া থাকে! ছিল তো অত লোক দাঁড়াইয়া!

ভগবান বলিয়া সত্যই তাহা হইলে উপরে একজন আছেন। শিবনাথ কপালে জোড়-হাত ঠেকাইল।

আজ কামিনী নিশ্চয় হাসিবে। হয়ত পুরোণো দিনের মতো নিজে হইতে কিছু সোহাগও জানাইতে পারে।

নিজের কাপড়জামা এভাবে ছিঁড়িয়া গিয়াছে বলিয়া শিবনাথের কোন দুঃখ নাই। কামিনীর জন্য কাপড় যোগাড় করিতে শিবনাথের এই দুর্ভোগ ঘটিয়াছে—আজ কামিনী তাহা বুঝিবে। সেজন্য সে যেটুকু আহা-উহু করিবে শিবনাথ তাহাতেই ধন্য হইয়া যাইবে।

শীঘ্র বাড়ি যাইবার নিমিত্ত শিবনাথ একটা গলির সোজা রাস্তা ধরিল।

সহসা 'আরে আরে' বলিয়া পিছন হইতে তাহার ঘাড়ের উপর কে যেন পড়িল। শিবনাথ অকস্মাৎ সে আঘাতে মাটিতে উপুড় হইয়া পড়িয়া গেল। বগল হইতে শাড়িখানি খসিয়া পড়িতেই সেই লোকটা তাহা তুলিয়া লইয়া চম্পট দিল। শিবনাথ চীৎকার করিবার পূর্ব্বেই লোকটা অন্য গলিতে অদৃশ্য হইল।

শিবনাথ চিনিল—সেই লোকটাই তাহাকে কাপড়খানা দিয়াছিল। গলিতে তখন এমন একটা লোক ছিল না যে সেই লোকটার পিছনে তাড়া করিতে পারে।

ব্যাপারটা শিবনাথের কাছে বেশ মজার বলিয়া বোধ হয়। লোকটা দিব্যি ফন্দি খাটাইয়াছে তো! এই রকম কতো লোককে সে ঠকাইয়াছে ও ঠকাইবে তাহার ঠিক নাই।

একখানি কাপড় মূলধন করিয়া কি অপূর্ব্ব ব্যবসা! শিবনাথ লোকটার বুদ্ধির তারিফ করিয়া লইল।

তারপর যখন উঠিয়া বাড়ি ফিরিবার পথে পা বাড়াইল, তাহার চোখে তখন জল আসিয়া চারিদিক ঝাপসা করিয়া দিল।

কামিনী দরজা খুলিয়া দিল। কামিনীর কোমরে জড়ানো একখানি দেড় হাত গামছা—

কামিনীর এ বেশ শিবনাথ জীবনে এই প্রথম দেখিয়া যেমন চমকাইল, তেমনি রাগিল। ভিতরে ঢুকিয়া উপরের দিকে চাহিতেই দেখিল পাশের বাড়ির সেই লোকটা সরিয়া গেল।

তাহা হইলে লোকটা এতক্ষণ তাহার লুব্ধ দৃষ্টি চরিতার্থ করিতেছিল।

শিবনাথ জ্বলিয়া উঠিল।

খপ্ করিয়া কামিনীর হাত সজোরে ধরিয়া তাহাকে টানিয়া ঘরের মধ্যে আনিয়া রাখিয়া কহিল, এর মানে কি?

অকস্মাৎ আক্রান্ত হইয়া কামিনী হকচকিয়া গেল। কিন্তু পরক্ষণেই প্রবল বেগে নিজেকে মুক্ত করিয়া দৃপ্ত হইয়া বলিল, কিসের মানে শুনতে চাও, তুমি?

—তোমার কাপড় কোথায়?

—ক গণ্ডা শাড়ি জামা যুগিয়েছ তাই শুনি?

কামিনী রাগিলে যে শিবনাথ কোন কথা বলিত না, সেই শিবনাথ আজ কামিনীর গালে সজোরে চড় মারিয়া বলিল, ন্যাকামী রাখ। কোমরে গামছা জড়িয়ে লোকের চোখের ওপর ঘুরে বেড়াতে ভারী সাধ, না? এযে বেবুশ্যেরও বাড়া। এর চেয়ে মরাই ভাল।

শিবনাথ বাহিরে আসিল। দেখিল কামিনীর একমাত্র ছেঁড়া শাড়িখানা মেলিয়া দেওয়া হইয়াছে—ভিজে জবজব করিতেছে।

ঝপাৎ করিয়া ঘরের দরজা বন্ধ করিল কামিনী। বলিতে শোনা গেল, একি পুরুষ। শুধু বৌ ঠেঙানোর মুরোদ! আমার মরণও হয় না ভগবান্!

শিবনাথ চেঁচাইয়া বলিল, গলায় দড়ি দাও।

উদ্দেশ্যহীনভাবে সে বাহির হইয়া গেল।

রাত্রে হাজার ডাকিতেও কামিনী দোর খুলিল না। শিবনাথ যতো বলিল দোর খুলিতে তত সে বলিল, না।

রাগিয়া দালানে শুইয়া পড়িল শিবনাথ। তারপর তাহার রাগ কমিল। অবশেষে তাহাকে ঘিরিয়া নামিল প্রচণ্ড, অসহনীয় অবসাদ, গ্লানি, ক্লান্তি।

শিবনাথ উঠিয়া পড়িল।......

পরদিন সকালে পাড়ার সকলে জড় হইয়া দেখিল শিবনাথ কড়িকাঠের গায়ে ফাঁসি লাগাইয়া ঝুলিতেছে।

কামিনী গায়ের উপর কালকের কাচা কাপড়টি শুধু চাপা দিয়া নির্বাক হইয়া বসিয়া আছে।

কাহিনী খবর ভবঘুরে

সানফ্রান্সিসকো সনদ সংবাদ

সানফ্রান্সিসকোতে বিশ্বশান্তি সম্মেলনে বহু অশান্তির পর ৫০টি সদস্য-জাতির প্রতিনিধিরা যে শান্তি-সনদ সই করেছেন, এ সব খবর পেয়েছেন খবরের কাগজে। কিন্তু অস্তিত্ব বিহীন 'আটলান্টিক সনদ'এর খবরটা প্রকাশ হওয়ার পর থেকেই আপনাদের মনে বোধ হয় সন্দেহ জাগছে—সানফ্রান্সিসকোর শান্তি সনদও বুঝি তেমনি ভুয়ো মাল! আজ্ঞে না তা নয়। এবারের এই সনদটির অস্তিত্ব আছে। সম্মেলনের দপ্তরের জন্য সনদের মূল নথিখানি ১৪৫ পাতার এক কেতাবে—১৪ পয়েণ্ট বোদনি



আমেরিকান প্রতিনিধিরা স্বাক্ষর পর্বের আয়োজন দেখছেন।

হরফে খাস ইংরাজী ভাষায় ছাপানো হয়েছে এবং সেটি বাধানো হয়েছে নীল চামড়ার মলাট দিয়ে এবং সেই সঙ্গে রুশ ভাষায় এর একটি অনুবাদও রাখা হয়েছে, তবে সেটি এর চেয়ে আকারে বড় হয়ে পড়াতে ১২ পয়েণ্ট হরফে ছাপতে হয়েছে। সনদের এই মূল নথিখানিতে ৫০টি সদস্য-জাতির প্রতিনিধিরা সই করেছেন। সনদ স্বাক্ষরিত হওয়ার সংবাদ সংবাদপত্রে পড়েছেন—কিন্তু এই স্বাক্ষর পর্বের পিছনে যে কত আড়ম্বর, আয়োজন ছিল, সে খবর নিশ্চয়ই জানেন না। সানফ্রান্সিসকো সম্মেলন শেষটায় যেন 'হলিউড' হয়ে উঠেছিল। চার ধারে বড় বড় চলচ্চিত্রের ছবি তোলার উপযুক্ত ক্যামেরা খাটানো হলো, এই সনদের স্বাক্ষর পর্বের ছবি তোলার জন্য। তারপর যে ঘরে সনদ স্বাক্ষরিত হবে, সেই ঘরের চার ধারের নীল রঙের পর্দা গোল করে ছাদ থেকে মাটি অবধি ঝুলিয়ে দেওয়া হলো। ঘরের ঠিক মাঝখানে ছিল একটা গোল টেবিল ধোয়াটে নীল রঙের আবরণে আগাগোড়া মোড়া। ঘরের দেওয়ালের ঝোলানো পর্দার এক জায়গায় একটু ফাঁক, সেখানে ময়ূরকণ্ঠী নীল রঙের এক লম্বা গালিচা পাতা—এই ফাঁকটুকুই প্রতিনিধিদের প্রবেশ পথ—ঐখান দিয়ে তাঁরা একের পর একে এসে স্বাক্ষর করবেন সনদটি। তাঁরা বসবেন কোথায়? সে কথা আর বলবেন না, স্বাক্ষরকারীর বসবার আসন নিয়ে রীতিমত ফাসাদ বেধেছিল!—যুক্তরাষ্ট্রের এম এচ ডে ইয়ং মেমোরিয়েল মিউজিয়ম পাঠাতে চেয়েছিলেন, প্রকাণ্ড আর সেকেলে সেই আমেরিকান চেয়ারটি—যেটি ড্যানিয়েল ওয়েবস্টার ব্যবহার করতেন। কিন্তু দেখা গেল ওয়েবস্টারের চেয়ারটি কোনও কোনও প্রতিনিধির দেহের পরিধি অনুপাতেও বসবার পক্ষে অত্যন্ত ছোট হয়ে পড়তে পারে তাই সোনায় মোড়া 'লুই কুইঞ্জ' চেয়ারটি এনে বসানো হলো ঐ টেবিলের সামনে। প্রতিনিধিরা একে একে এই সনদ সই করেছেন—এই সোনায় মোড়া চেয়ারে বসে। এর পরেও পৃথিবীতে যুদ্ধ অশান্তি ঘটবে ব'লে কি আপনাদের মনে হয়?

রুশিয়ায় পোলদের বিচার

কিছুদিন আগে রুশিয়ায় সোভিয়েট গভর্ণমেণ্ট ষোল জন পোলিশ রাজনীতিকের বিরুদ্ধে সোভিয়েটবিরোধী কার্যকলাপ ও গোপন ষড়যন্ত্রের অভিযোগ এনে বিচার করে দণ্ড দিয়েছে—এ খবর কাগজে পড়েছেন, কিন্তু বিচারটা কোথায় হলো? কে করলেন? তাকি জানতে পেরেছেন? বেশ তাহলে সেই বিচার সভার হুবহু বর্ণনাটা শুনুন। মস্কোর 'ডম সোয়ুজোভ' বা 'হাউস অব ইউনিয়নসে'র সভাগৃহে এঁদের বিচার হচ্ছে। প্যাকিং কেসের



আসামীর কাঠগড়ায় বিদ্রোহী পোল নেতা— 'জাসিউকোউইজ'

তক্তা মেরে—বেড়া দিয়ে ঘেরা এক কাঠগড়া তৈরী হয়েছে, এর মধ্যে চার সারি আসন—প্রত্যেক সারিতে চার চারজনের বসবার জায়গা। কাঠগড়ার চারদিকে লাল-নীল টুপী আর উদীপরা এক দল পাহারাওয়ালা। কাঠগড়া আর দর্শকদের বসবার মাঝখানে দুজন শান্ত্রী গুলীভরা কার্তুজে সাজানো কোমরবন্ধ কোমরে না বেঁধে চকচকে খোলা সঙ্গীন বন্দুকে লাগিয়ে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে। আসামীদের কাঠগড়ায় ১৫জন পোল বন্দী হাজির, মাত্র একজন অনুপস্থিত। তাঁর নাকি অসুখ করেছে। প্রত্যেক বন্দীর হাতে একটি করে কাগজে বাঁধানো ছাপা বই—এতেই লেখা আছে, তাঁদের কোন কোন অপরাধে অপরাধী করা হয়েছে। বন্দীদের কেউ এটি নিয়ে নাড়াচাড়া করছেন—কেউ কি সব লিখে নিচ্ছেন—কেউ বিচার সভার দর্শকদের দিকে হাঁ করে চেয়ে আছেন—কেউ বা দেখছেন বিচারের তোড়জোড়টা। এঁদের বিচার করবেন তিনজন বিচারপতি। চাকামুখো জোড়া থুৎনি—চনমনে চোখওয়ালা কর্ণেল জেনারেল ভাসিলি ভি-উলরিখ বিচারপতিদের সভাপতি। তিনি মাঝে মাঝে মুখ বিকৃতি করছেন। অন্যধারে দাঁড়িয়েছেন এসে সরকারী দুই অভিযোগকারী মেজর জেনারেল নিকোলাই-এ-আফানাসিয়েফ আর স্টেট কাউন্সেলর—"আর-এ-রুদেনকো।" চলচ্চিত্র গ্রহণের চারটি যন্ত্র (দুটি সবাক ও দুটি নির্বাক) ছবি তোলার কাজে ব্যস্ত তাই প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড আলো জ্বলছে বিচার সভা আলো ক'রে। এ ছাড়া সংবাদপত্রের তরফ থেকে ডজন খানেক ফটোগ্রাফার এদিক থেকে সেদিক থেকে ফটোগ্রাফ তুলছে।

বিচার সভায় বিচার আরম্ভ হলো—প্রথমেই এই সব অভিযুক্ত পোলদের বিরুদ্ধে তাদের অপরাধ ও তার প্রমাণ হাজির করার পালা চলল। এঁদের বিরুদ্ধে সাক্ষী দেবার জন্য পোল্যাণ্ড থেকে ঐ গুপ্তদলের এক নায়ক, এক মহিলা রেডিও অপারেটার ও আরও কয়েকজনকে রুশিয়ায় আনা হয়েছিল। সেইসব সাক্ষীরাই একে একে বিচারপতিদের সামনে হাজির হয়ে দর্শকদের দিকে পিছন করে দুটি মাইক্রোফোনের সামনে তাঁদের বক্তব্য বলতে লাগলেন। একটি মাইক চলচ্চিত্রের শব্দ গ্রহণের জন্য—অপরটি বিচার সভার জন্য বসানো হয়েছিল। সাক্ষীদের কারুর কারুর হাত কাঁপছিল—সেই সঙ্গে হাঁটুও—কিন্তু তাদের গলার স্বরটি বেশ ধীর-স্থির ভারিক্কী গম্ভীর। তারা সবাই বেশ নানা বর্ণনা দিয়ে গড়গড় করে বলে যেতে লাগলো—কি করে লালফৌজের সৈন্যদের ষড়যন্ত্র করে মারা হয়েছে; কিন্তু কেউ এমন একটি কথাও বললে না, যাতে প্রমাণিত হয় যে, এইসব কার্যকলাপের সঙ্গে অভিযুক্ত পোলদের যোগাযোগ ছিল। কিন্তু তাদের অপরাধ প্রমাণিত হলো শুধু এই কারণেই, যে তাঁরা স্বীকার করেছিলেন যে তাঁরা বিদ্রোহী পোলদের নেতৃত্বের দায়িত্ব নিয়েছিলেন। রুশবিদ্রোহী পোল নেতাদের মধ্যে জেনারেল লিওপোল্ড ব্রোনিসল ওকুলিকি—সবচেয়ে নির্ভীক ভাবে তাঁর বক্তব্য বললেন বিচারকের সামনে। সব শেষে তিনি বললেন—"আমি জানি পোল জাতি চায় সোভিয়েটের সঙ্গে বন্ধুত্ব করতে। আমিও যদি তা না চাইতুম তাহলে আমি আমার জাতির কাছে বিশ্বাস-ঘাতক হতাম। তবু আমি লড়ছিলাম আমার দেশের স্বাধীনতার জন্য। আমি ব্যক্তিগতভাবে বলেছিলাম—আমি নূতন গণতান্ত্রিক পোল্যাণ্ড গড়ে তোলার ভিত্তি হিসাবে 'ক্রিমিয়া বিধান'কে মেনে নিতে পারি, কিন্তু তবুও আমি বিপ্লবাত্মক কার্যকলাপ বন্ধ করিনি; কারণ দেশের পক্ষে কয়েকটা বিষয়ে সোভিয়েটের সঙ্গে মতের মিল হওয়াই বা বিধানই সব নয়। আমি নিশ্চিত জানি—আমাদের দুই দেশের বন্ধুত্বে কোনও শক্তিই বাধা দিতে পারবে না—যদিনা সোভিয়েট ইউনিয়ন পোল্যাণ্ডকে দাস করে রাখতে চাইতো। পোল জাতির অনেক দোষ আছে, কিন্তু একটি গুণ আছে—সেটি হচ্ছে



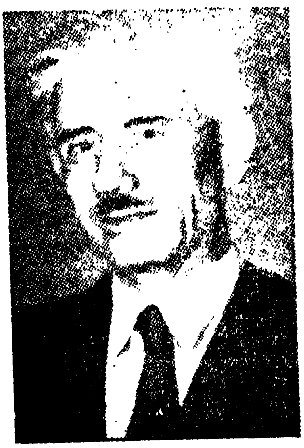
মাইকের সামনে বিদ্রোহী পোল নেতা 'ওকুলিকি' ও 'বাইয়েন'

তাদের স্বাধীনতা-প্রীতি; ইতিহাসে এর প্রমাণ ঢের আছে।"

সব অপরাধীদের চেয়ে 'ওকুলিকি'র শাস্তিটাই হয়েছে বেশী—দশ বছর জেল। এ বিষয়ে সোভিয়েট সুহৃদ্‌রা এই বিচারে নিশ্চয়ই গর্ব বোধ করবেন! কারণ তাঁদের মতে নিজের দেশের স্বাধীনতাকামী হয়েও সোভিয়েটবিরোধী যাঁরা থাকবেন—তাঁদের জেল বা ফাঁসি হওয়াই নাকি উচিত।

ইতালীর নূতন মন্ত্রী নির্বাচন

মাস ধরে ঝামেলা-ঝঞ্ঝাটের পর ইতালী কিছুদিন আগে তার নূতন প্রধান মন্ত্রীকে পেয়েছে। এ খবরটি কাগজে পড়েছেন, কিন্তু নূতন প্রধান মন্ত্রী 'ফেরুচ্চিও পারি'র পরিচয়টা



পেরুচ্চিও পারি—অতি সাধারণ একজন লোক

আপনাদের জানা নেই, সেটাই জেনে রাখুন। 'ফেরুচ্চিও পারি'র বাড়ি উত্তর ইতালীতে—তাঁর বয়স পঞ্চান্ন—ঢিলেঢালা পোষাক পরা লম্বা কুঁজো লোকটি —এলোমেলো চুলে ঢাকা পাকা বুদ্ধিতে ভরা মাথা—কপালে অনেক দুঃখের ধাক্কা খাওয়ার দাগ। কারণ প্রথম বিশ্বযুদ্ধে তিনি লড়েছিলেন—তার প্রমাণ দেহে চারটি আঘাতের চিহ্ন এবং চারটি সম্মানজনক পদক। তিনি সাংবাদিক হিসাবে এবং গুপ্ত কর্মী হিসাবে ফ্যাসিস্টদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করেছিলেন। এছাড়া এবারকার যুদ্ধে তিনি উত্তর ইতালীর পার্টিসান দলের ভাইস কম্যাণ্ডাণ্ট হয়ে জার্মানদের বিরুদ্ধেও লড়েছিলেন। তিনি বরাবরই মধ্যপন্থী, কাজেই আপোষ মন্ত্রিসভার আপোষ নেতা তিনিই নির্বাচিত হয়েছেন। মন্ত্রী হয়ে পারি তাঁর বক্তৃতায় কি বলেছেন জানেন, "Uomo della Strada"—আমি এক অতি সাধারণ ব্যক্তি। Uomo qualunque আমি শুধু আর একটি লোক একটি চরিত্র বিশেষ। দক্ষিণ-পন্থী ও বামপন্থীদের রাষ্ট্র ব্যবস্থায় অন্যায় প্রভাব বিস্তারে বাধা দেওয়াই শুধু আমার কাজ নয়, বরং আমাকে আরও ভাবতে হবে—রোদে পুড়ে মাথার ঘাম পায়ে ফেলে মাঠে যে চাষীরা দলে দলে খাটছে, তাদের কথা ভাবতে হবে, গ্রামে গ্রামে যে সব কামাররা লোহা পিটছে—যে সব নেয়েমদ্দ মজুর রাজনীতির তোয়াক্কা না রেখে—দলাদলির বাইরে থেকে কাজ করছে তাদের কথা।" সত্যিই তো এর বেশী প্রধান মন্ত্রী আর কি ভাবতে পারেন বলুন? তিনি তো নিজেই বলেছেন,—Uomo della Strada—আমি এক অতি সাধারণ ব্যক্তি। এমন প্রধান মন্ত্রী পাওয়া ইতালীর ভাগ্য বলতে হবে!

সাহিত্য-সংবাদ

২৪ পরগণা রামচন্দ্রনগর তরুণ সমিতির সাহিত্য বিভাগ সমগ্র বাঙলার ২০ বৎসর বয়স পর্যন্ত ছেলে মেয়েদের নিকট হইতে নিম্নলিখিত বিষয়ে রচনা আহ্বান করিতেছে। প্রত্যেক বিষয়ে ১ম স্থান অধিকারীকে ১টি রৌপ্যকাপ এবং ২য় ও ৩য় স্থান অধিকারীকে ১টি করিয়া রৌপ্য-পদক দেওয়া হইবে। প্রবন্ধ ফুলস্‌কেপ সাইজের ৬ পাতায়, গল্প ৪ পাতায় ও কবিতা ২ পাতায় শেষ করা চাই। প্রত্যেক প্রতিযোগী ইচ্ছা করিলে একাধিক বিষয়ে যোগদান করিতে পারিবে এবং রচনা প্রত্যেকের নিজস্ব হওয়া চাই। প্রত্যেক বিষয়ে সমিতির সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত। রচনা ৩০শে শ্রাবণের মধ্যে নিম্নলিখিত ঠিকানায় পাঠাইতে হইবে। কবিতা ও গল্পে অনুবাদ চলিবেনা। ১। প্রবন্ধ, ছেলেদের জন্য—রবীন্দ্র জীবনী, মেয়েদের জন্য—"মাতা"। ২। গল্প—উভয়ের জন্য যে কোন বিষয়ে। ৩। কবিতা—উভয়ের জন্য যে কোন বিষয়ে।

ঠিকানা—সিদ্ধেশ্বর ব্যানার্জি, C/o. পোঃ বক্স ৬২৬, কলিকাতা অথবা জয়দেব ঘোষাল, ২নং হেয়ার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।



ফুটবল

কলিকাতা ফুটবল লীগ প্রতিযোগিতার প্রথম ডিভিসনের চ্যাম্পিয়ান এখনও নির্ধারিত হয় নাই। মোহনবাগান দল লীগের সকল খেলা শেষ করিয়া লীগ তালিকার শীর্ষস্থান অধিকার করিয়াছে। কিন্তু এই সম্মানজনক স্থানে মোহনবাগান শেষ পর্যন্ত থাকিবেই ইহা বর্তমান অবস্থায় কেহই জোর করিয়া বলিতে পারে না। ইস্টবেঙ্গল ও ভবানীপুর দলের খেলার ফলাফলের উপর এই দলের ভাগ্য বিশেষভাবে নির্ভর করিতেছে। এই খেলাটিতে যদি ভবানীপুর দল বিজয়ী হয়, তবেই মোহনবাগান দল লীগ চ্যাম্পিয়ান হইবে। যদি বিপরীত ফল হয়, ইস্টবেঙ্গল দল লীগ চ্যাম্পিয়ান হইবার সৌভাগ্যলাভ করিবে। আর যদি খেলাটি অমীমাংসিতভাবে শেষ হয়, তবে ইস্টবেঙ্গল ও মোহনবাগান দলকে পুনরায় চ্যাম্পিয়ানসিপের জন্য আর একটি খেলায় প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিতে হইবে। যেখানে এতগুলি সম্ভাবনা বর্তমান সেখানে কোন উক্তি করা যুক্তিযুক্ত হইবে না। ভবানীপুর ও ইস্টবেঙ্গলের এই খেলাটি আলোচ্য সপ্তাহের প্রথমেই অনুষ্ঠিত হইবার কথা ছিল, কিন্তু পিছাইয়া দেওয়া হইয়াছে। কবে হইবে, তাহাও সঠিক জানা যায় নাই। এইরূপ একটি গুরুত্বপূর্ণ খেলা স্থগিত রাখিয়া পরিচালকগণ কেন বিভিন্ন দলের সমর্থকদের উৎকণ্ঠার মধ্যে রাখিলেন জানি না। খেলাটি শীঘ্র অনুষ্ঠিত হইলেই ভাল হইত। শোনা যাইতেছে খেলাটি কোন এক বিশেষ চ্যারিটির উদ্দেশ্যে অনুষ্ঠিত হইবে। ইস্টবেঙ্গল ক্লাবের পরিচালকগণ ইহাতে রাজী হইবেন বলিয়া মনে হয় না। ইস্টবেঙ্গল দল লীগ প্রতিযোগিতায় ইতিমধ্যেই তিনটি চ্যারিটি খেলায় যোগদান করিয়াছেন। পুনরায় চতুর্থ খেলা যদি খেলিতে হয়, তাহা হইলে ইস্টবেঙ্গলের সাধারণ সভ্যগণ বড়ই বিব্রত হইয়া পড়িবেন। পরিচালকগণ অনায়াসে এই খেলাটি সাধারণভাবে শেষ করিয়া শীল্ডের কোন এক বিশেষ খেলা চ্যারিটির উদ্দেশ্যে অনুষ্ঠিত হইবে বলিয়া স্থির করিতে পারিতেন। গুরুত্বপূর্ণ খেলা বলিয়া অধিক টাকা সংগৃহীত হইবার যে আশা পরিচালকগণ মনে মনে পোষণ করিতেছেন, তাহা শীল্ডের কোন বিশেষ খেলা চ্যারিটির উদ্দেশ্যে অনুষ্ঠিত হইলে, টাকা কম সংগৃহীত হইবে না। একই ক্লাবের সভ্যগণকে বার বার চ্যারিটির জন্য টাকা দিতে বাধ্য করা, অর্থে সভ্যগণকে ক্ষতিগ্রস্ত করা হইবে। আমরা আশা করি সকল দিক বিবেচনা করিয়া পরিচালকগণ ভবানীপুর ও ইস্টবেঙ্গলের খেলাটি সাধারণভাবে অনুষ্ঠিত হইবে বলিয়া নির্দেশ দিবেন।

রবীন্দ্র স্মৃতি ভাণ্ডার

রবীন্দ্র স্মৃতি ভাণ্ডারের উদ্দেশ্যে অনুষ্ঠিত ইস্টবেঙ্গল ও মোহনবাগান দলের খেলায় রেকর্ড সংখ্যক টাকা সংগৃহীত হইয়াছে দেখিয়া সন্তুষ্ট হইয়াছি। তবে যে টাকা সংগৃহীত হইয়াছে তাহা অপেক্ষা আরও অধিক টাকা পাওয়া যাইত কেবল কলিকাতার কমিশনারের জন্যই তাহা সম্ভব হয় নাই। তিনি অতিরিক্ত বর্ধিত হারে টিকিট বিক্রয়ের যে প্রস্তাব হইয়াছিল, তাহা অনুমোদন করেন নাই। বাঙলায় জাতির শ্রেষ্ঠ মানবের স্মৃতি রক্ষার ভাণ্ডারের জন্য অর্থ সংগ্রহের এই ব্যবস্থায় কোনরূপ আপত্তি না করিলেই পারিতেন।

কবিগুরুর পুত্র শ্রীযুত রথীন্দ্রনাথ ঠাকুর অনুষ্ঠানের সময় উপস্থিত থাকিয়া উভয় দলের খেলোয়াড়গণকে, এমন কি রেফারী ও লাইনস্‌ম্যানদের পর্যন্ত পুরস্কৃত করিয়া ভালই করিয়াছেন। ইহা দ্বারা তিনি নূতন আদর্শ প্রতিষ্ঠা করিলেন। ইতিপূর্বে স্যার আশুতোষ মুখার্জির স্মৃতিরক্ষা ভাণ্ডারের জন্য যে চ্যারিটি ফুটবল খেলা হয়, তাহাতে অনুরূপ কাহাকেও পুরস্কার দিতে দেখা যায় নাই। সেই সময়ে কয়েকটি সংবাদপত্র এই সম্পর্কে নানারূপ মন্তব্য করিবারও সুযোগ পায়। কিন্তু শ্রীযুত রথীন্দ্রনাথ ঠাকুর সেইরূপ মন্তব্য করিবার সুযোগ তো দিলেনই না, উপরন্তু পুরস্কার দান করিয়া ভবিষ্যতে এইরূপ অনুষ্ঠানে পুরস্কার দানের রীতি প্রবর্তন করিলেন। আমরা আশা করি এই রীতি চিরকাল অনুসৃত হইবে।

আই এফ এ শীল্ড

আই এফ এ শীল্ড প্রতিযোগিতার খেলা আরম্ভ হইয়াছে। বিভিন্ন জেলা হইতে যে সকল দল আসিয়াছিল, প্রতি বৎসরের ন্যায় একটি, দুইটি করিয়া ম্যাচ খেলিয়া বিদায় গ্রহণ করিতেছে। কয়েকটি জেলার ফুটবল দল খুবই নিম্নস্তরের ক্রীড়ানৈপুণ্য প্রদর্শন করিয়াছে। এই সকল দল ভবিষ্যতে রীতিমত অনুশীলন করিয়া প্রতিযোগিতায় যোগদান করিলে সুখী হইব। ইহা দ্বারা কেবল যে তাহারা বিভিন্ন খেলায় সাফল্যলাভে সমর্থ হইবে তাহা নহে, জেলার ফুটবল খেলোয়াড়গণেরও সুনাম বৃদ্ধিতে বিশেষ সাহায্য করিবে। বাহিরের সকল দলকে প্রতিযোগিতায় যোগদান করিতে দেখিয়া আনন্দিত হইলাম। এই সকল দল যোগদান না করিলে, প্রকৃতই সাধারণ ক্রীড়ামোদিগণ বিশেষ মনঃক্ষুণ্ণ হইত। তাহা ছাড়া শীল্ড প্রতিযোগিতারও গুরুত্ব থাকিত না। আগত বাহিরের দলসমূহের মধ্যে বোম্বাইর ট্রেডস্‌ ক্লাবকে বিশেষ শক্তিশালী বলিয়া মনে হইতেছে। এই দলে বোম্বাই ফুটবলের কয়েকজন বিশিষ্ট খেলোয়াড় আছেন। এই দল শীল্ড প্রতিযোগিতা হইতে সহজে বিদায় গ্রহণ করিবে বলিয়া মনে হয় না।

চ্যারিটি ম্যাচের টিকিট

কলিকাতা ফুটবল মাঠের চ্যারিটি খেলার টিকিট সংগ্রহ করার সমস্যা ক্রমশই তীব্র হইতে তীব্রতর হইতেছে। কাহাদের জন্য যে এই জঘন্য পরিণতি হইয়াছে জানি না, তবে এই পরিণতির অবসান হওয়া খুবই প্রয়োজন। টিকিট বিলি ব্যবস্থা যতদিন সুনিয়ন্ত্রিত না হইতেছে, ততদিন সাধারণ ক্রীড়ামোদিগণের অধিকাংশই এইরূপ সকল চ্যারিটি ফুটবল খেলা হইতে বঞ্চিত হইবেন। এই অত্যাচার বা অনাচার বর্তমানে সকলেই সহ্য করিতেছেন, কিন্তু শীঘ্র একদিন আসিতেছে, যেদিন এই সকল ব্যবস্থা ভাঙিয়া চুরিয়া নূতন করিয়া গঠিত হইবে।

ক্রিকেট

ইতিপূর্বে অস্ট্রেলিয়া ও ইংল্যাণ্ডের মধ্যে যে দুইটি 'ভিকট্রী' টেস্ট ম্যাচ খেলা হয়, তাহাতে উভয় দল একটি করিয়া খেলায় বিজয়ী হওয়ায় উভয় দলই সমপর্যায় ছিল। কিন্তু বর্তমানে সেই অবস্থা নাই। অস্ট্রেলিয়া দল অগ্রগামী হইয়াছে। তাহারা তৃতীয় টেস্ট খেলায় ইংল্যাণ্ড দলকে ৪ উইকেটে পরাজিত করিয়াছে। অবশিষ্ট দুইটি খেলার মধ্যে অস্ট্রেলিয়া দল যদি আর একটি খেলায় জয়ী হইতে পারে, তবে এইবারের টেস্ট পর্যায় অস্ট্রেলিয়া দলই বিজয়ীর সম্মানলাভ করিবে। ইংল্যাণ্ড দলের পরিচালকগণ নিজেদের অবস্থা সম্পূর্ণভাবে উপলব্ধি করিয়া তৃতীয় টেস্টের জন্য বেশ শক্তিশালী দল গঠন করিয়াছে। দেখা যাক্‌ কি ফল হয়।



রবীন্দ্র স্মৃতি ভাণ্ডারের উদ্দেশ্যে অনুষ্ঠিত ইস্টবেঙ্গল ও মোহনবাগান দলের খেলার দিনে প্রবেশপথে দর্শকদের ভীড়।

সেন্ট্রাল ক্যালকাটা

ব্যাঙ্ক লিঃ

হেড অফিস—৯এ, ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

ভারতের উন্নতিশীল ব্যাংকসমূহের অন্যতম

চেয়ারম্যান:

শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র দত্ত, আই-সি-এস (রিটায়ার্ড)

কার্যকরী মূলধন—১ কোটি টাকার উপর

—শাখাসমূহ—

এলাহাবাদ	দুবরাজপুর	পাটনা
আসানসোল	হিলি	পাবনা
আজমগড়	জলপাইগুড়ী	রায়বেরেলী
বালুরঘাট	জৌনপুর	রংপুর
বাঁকুড়া	কাঁচড়াপাড়া	সৈয়দপুর
বেনারস	লাহিড়ী মোহনপুর	সাহাজাদপুর
ভাটপাড়া	লালমণিরহাট	শ্যামবাজার
বর্ধমান	নৈহাটী	সিরাজগঞ্জ
কুচবিহার	নিউ মার্কেট	দক্ষিণ কলিকাতা
দিনাজপুর	নীলফামারী	সিউড়ী

সেক্রেটারী:
মিঃ এস্ কে নিয়োগী, বি এ

ম্যানেজিং ডাইরেক্টর:
মিঃ ডি ডি রায়, বিএ

ক্যাল: ২৭৬৭ গ্রাম: "জনসম্পদ"

ব্যাঙ্ক অব ক্যালকাটা লিমিটেড

(ক্লিয়ারিংয়ের সর্বপ্রকার ব্যবস্থা আছে)

১৯৪৪ সনের শেষে মোটামুটি আর্থিক পরিচয়

অনুমোদিত মূলধন	১০,০০০,০০০, টাকা
বিলিকৃত ও বিক্রীত মূলধন	১,৪০০,০০০, টাকা
আদায়ীকৃত ও মজুত তহবিল	৮০০,০০০, টাকা
কার্যকরী মূলধন	১০,০০০,০০০, টাকা

ম্যানেজিং ডিরেক্টর: ডাঃ এম এম চ্যাটার্জী

মেয়েদের পছন্দ নিখুঁত!

বিবাহের উপহারগুলোর যখনই তুলনা করা হবে তখনই আপনার জিনিষই সেরা বলে মানতে হবে কারণ সেগুলো

ডালিয়ার।

শাড়ী, পোষাক
হোসিয়ারী ও শয্যাদ্রব্য

চেয়ারম্যান—শ্রীপতি মুখার্জী



E. P. S.

ডালিয়া

টেলারিং কোং লিঃ

ওয়েলেসলি স্ট্রীট মার্কেট, কলিকাতা

দোকান আইনে বন্ধ
রবিবার— বেলা ২টার পর
সোমবার— পূর্ণ দিন

মেদ হ্রাস করুন

৮ দিনে অত্যাশ্চর্য ফল পাইবেন

১৫ দিনে ৩০ পাউন্ড ওজন হ্রাস পাইবে অথচ তৃপ্তি সহকারে দিনে ৩বার করিয়া আহার করিতে পারিবেন। এজন্য এতটুকুও অতিরিক্ত পরিশ্রম করিতে হইবে না।

আনন্দ উপভোগের সঙ্গে সঙ্গে মেদ হ্রাস করার এই নূতন আমেরিকান পদ্ধতি দ্বারা ইহা সম্ভব হইয়াছে। কোন মারাত্মক গ্ল্যাণ্ড বা অনিষ্টকর ঔষধের প্রয়োজন নাই। সহজ ও নিরাপদ চিকিৎসার গ্যারাণ্টী।



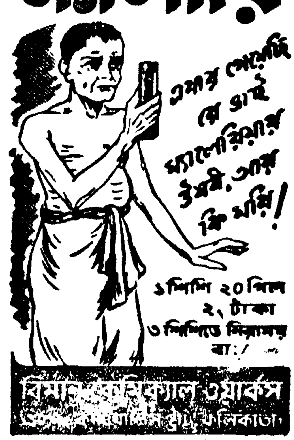
শ্লিমম্যান

প্রত্যেক প্যাকেটে মেদ হ্রাসের ছবি দেওয়া আছে।
মূল্য—৫।৹ আনা।
ডাক ও প্যাকিং খরচা লাগে না।
ঠিকানা পরিষ্কার করে লিখবেন।
ওয়াধসন এণ্ড কোং (ডিপার্ট টি ২)
পি ও বক্স ৫৫১৬, বোম্বে ১৪।

চিরজীবনের গ্যারাণ্টী দিয়া—

জটিল পুরাতন রোগ, পারদসংক্রান্ত বা যে-কোন প্রকার রক্তদুষ্টি, মূত্ররোগ, স্নায়ুদৌর্বল্য, স্ত্রীরোগ ও শিশুদিগের পীড়া সত্বর স্থায়ীরূপে আরোগ্য করা হয়। শক্তি, রক্ত ও উদ্যমহীনতায় 'টিস্যুবিল্ডার' ৫,।
ম্যানেজার: **শ্যামসুন্দর হোমিও ক্লিনিক** (গভঃ রেজিঃ)
(শ্রেষ্ঠ চিকিৎসাকেন্দ্র), ১৪৮, আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীট, কলিঃ।

ম্যালারি



বিমান কেমিক্যাল ওয়ার্কস
কলিকাতা

বাংলার কথা

শ্রীহেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ

গত সোমবারে বাঙলার বহু কংগ্রেস কর্মী রাষ্ট্রপতি মৌলানা আবুল কালাম আজাদের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া বর্তমান অবস্থার আলোচনা করিয়াছেন। বাঙলার বর্তমান সমস্যাসমূহের মধ্যে পুনর্গঠনের সমস্যাই সর্বপ্রধান। সিমলায় যাইয়া বাঙলার কংগ্রেসের পক্ষে শ্রীযুক্ত কিরণশংকর রায় দুর্ভিক্ষের পরে বাঙলার যে শোচনীয় অবস্থা হইয়াছে, সে বিষয় কংগ্রেসের নেতৃগণকে অবগত করান। তাঁহাদিগের মধ্যে অনেকেই দীর্ঘকাল বন্দী ছিলেন এবং বাঙলার অবস্থা প্রত্যক্ষ করেন নাই; গান্ধীজীও মুক্তিলাভের পরে বাঙলায় আসিতে পারেন নাই। প্রকাশ, কিরণশংকরবাবু বলিয়াছেন—দুর্ভিক্ষের ফলে বিনষ্টপ্রায় গ্রামসমূহের পুনর্গঠনই বাঙলার সর্বপ্রধান সমস্যা।

সেই কার্যে সরকারের সাহায্য যে যৎসামান্য এবং প্রয়োজনের তুলনায় যথেষ্ট নহে, তাহা বলা বাহুল্য। সেই সাহায্যের ফল আমরা লক্ষ্য করিতেই পারিতেছি না।

অল্পদিন পূর্বে বাঙলার অবস্থা সম্বন্ধে বেতার বক্তৃতায় গভর্নর মিস্টার কেসি বলিয়াছিলেন—মৎস্য চালানের জন্য বরফের বরাদ্দ বর্ধিত করিলেও যে মৎস্যের আমদানী বাড়িতেছে না, তাহার কারণ অনুসন্ধান করা প্রয়োজন।

তিনি কি জানেন না—নৌকা বাজেয়াপ্ত করায় কত ধীবর বৃত্তিচ্যুত হইয়াছে, তাহাদিগের মাছ ধরিবার জালও নাই—মূলধনের কথা না বলাই ভাল?

গত ১৯৪৪ খৃষ্টাব্দের জানুয়ারী মাসে মেজর জেনারেল ডগলাস বলিয়াছিলেন:—

"দুর্ভিক্ষে ও দুর্ভিক্ষের পরবর্তীকালে বহুলোক মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছে এবং তাহার ফলে গ্রামে দৈনন্দিন জীবনে বিশৃঙ্খলার উদ্ভব হইয়াছে। কর্মকার, সূত্রধর প্রভৃতি গার্হস্থ্য কর্মে অভিজ্ঞ শিল্পীরা অনেক স্থানে উজাড় হইয়া গিয়াছে এবং তাহাদিগের শূন্যস্থান পূর্ণ করা দুষ্কর।"

১৯৪৩ খৃষ্টাব্দের ১৬ই নভেম্বর বোম্বাইএর 'টাইমস্ অব ইণ্ডিয়া' পত্রের প্রতিনিধি লিখিয়াছিলেন:—

"বাঙলায় শ্রমিকদিগের মধ্যে নমঃশূদ্রদিগের সংখ্যা ৩০ লক্ষ। তাহাদিগের এক-তৃতীয়াংশ উজাড় হইয়া গিয়াছে—ইহা অসম্ভব নহে।"

দুর্ভিক্ষের সময়ে শ্রীমতী বিজয়লক্ষ্মী পণ্ডিত সেবাকার্যের জন্য বাঙলায় আসিয়া গ্রামসমূহের যে অবস্থা দেখিয়াছিলেন, তাহা তিনি বিবৃত করিয়াছিলেন। তাহার পরে শ্রীমতী সরোজিনী নাইডু বাঙলায় আসিয়া পুনর্গঠনের প্রয়োজন অনুভব করিয়াছিলেন।

আজ যখন বাঙলা সরকারের সে বিষয়ে চেষ্টা প্রয়োজনানুরূপ নহে, তখন বাঁচিতে হইলে সেই কার্যের ভার বাঙালীকেই গ্রহণ করিতে হইবে। বর্তমানে মেদিনীপুরের অবস্থা কিরূপ তাহা সম্প্রতি শ্রীযুত নিকুঞ্জবিহারী মাইতী তাঁহার বিবৃতিতে জ্ঞাত করিয়াছেন।

এক দিকে এই কথা। অপরদিকে কথা—কংগ্রেস গঠনমূলক কার্যে আত্মনিয়োগ করিবার বিষয় বিশেষভাবে বিবেচনা করিতেছেন। বাঙলার সম্বন্ধে বলা যায়—মানুষে বাঁচিয়া থাকিলে তবে আর সব হয়। দুর্ভিক্ষে বাঙলার সমাজের অর্থনীতিক ভিত্তি শিথিল হইয়া গিয়াছে; তাহার পুনর্গঠন প্রয়োজন।

সে কার্যের ভার কংগ্রেসকে লইতে হইবে এবং সে জন্য কংগ্রেসে ঐক্য সর্বাগ্রে প্রয়োজন। সেই প্রয়োজন আজ আমরা তীব্রভাবেই অনুভব করিতেছি। সেইজন্য আমরা মনে করি, কংগ্রেসে দলাদলি বর্জন করিতে হইবে। ব্যবস্থা পরিষদ সামান্য ব্যাপার—ভারত শাসন আইনের ৯৩ ধারা প্রয়োগের ফলে তাহাও আর নাই। আমাদিগের কাজ বাহিরে—গ্রামে। সেই কাজের ভার কংগ্রেসকেই গ্রহণ করিতে হইবে—সে কাজ সম্মিলিত ঐক্যবদ্ধ—আন্তরিকতায় শক্তিসম্পন্ন—সেবার আগ্রহে প্রণোদিত কংগ্রেসকে সে কাজ করিতে হইবে—সেজন্য অবশ্যক ত্যাগ স্বীকার করিতে হইবে। বাঙলার তরুণদিগের সেবার ও ত্যাগের আগ্রহের অনেক পরিচয় আমরা বহু বিপদের সময় পাইয়াছি। বর্ধমানে প্রবল বন্যার সংবাদ পাইয়াই যে সকল যুবক কলিকাতা হইতে সেবাকার্যের আগ্রহে ঘটনাস্থলে গিয়াছিল, তাহাদিগের মধ্যে কেহ কেহ সেই কার্যে জীবনদানও করিয়াছিল। তাহাদিগের কার্যের প্রশংসা করিয়া একজন ইংরেজ সিভিল সার্ভিসে চাকুরীয়া বলিয়াছিলেন—সেবাব্রতীদিগের কাজ বিস্ময়কর, তাহাদিগের কার্যের জন্য যে অর্থ প্রদত্ত হইবে, তাহার প্রতি-কপর্দক সৎকার্যে ব্যয়িত হইবে। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের চান্সেলাররূপে বড়লাট লর্ড হার্ডিং তাহাদিগের কার্যের জন্য বিশ্ববিদ্যালয় যে গর্বানুভব করিতেছে, তাহাই বলেন।

আজ বাঙলায় সেবাকার্যের,—গঠনকার্যের অভাব কোন কোন স্থানেই আবদ্ধ নহে; তাহা সমগ্র প্রদেশের। যখন দুর্ভিক্ষের পরে ফসল হইতেছে, তখনই 'টাইমস্ অব ইণ্ডিয়া' পত্রের প্রতিনিধি লিখিয়াছিলেন—তখনও শস্যক্ষেত্রে নরকঙ্কাল—

"A grim but not entirely uncommon spectacle in East Bengal to-day is to find a whitened skeleton in the corner of a field bearing the richest rice crop in half-a-century."

সরকার যদি জাতীয় সরকার হইতেন, তবে অবশ্য গত দুর্ভিক্ষের আবির্ভাব বা তীব্রতা সম্ভব হইত না। কিন্তু তাহার ধ্বংসলীলার পরে পুনর্গঠনের যে সুযোগ আসিয়াছিল, তাহা কি গৃহীত হইয়াছে? যতদিন দেশের সরকার জাতীয় সরকার না হইবে—ততদিন অনেক অত্যাবশ্যক কার্য অসম্পন্নই রহিয়া যাইবে। সেচের সুব্যবস্থার যেমন প্রয়োজন—দেশে বিদ্যুতের শক্তি সুলভ করারও তেমনই প্রয়োজন। রুশিয়া দুই শত বিশেষজ্ঞ নিযুক্ত করিয়া দেশে বিদ্যুতের শক্তি সৃষ্টির ও বণ্টনের ব্যবস্থা করিয়াছে। এদেশে তাহা স্বপ্ন ব্যতীত আর কিছুই বলা যায় না। যে প্রদেশ খাদ্য সম্বন্ধেও স্বাবলম্বী নহে, সেই প্রদেশে কচুরিপানার উপদ্রবে বহুক্ষেত্রে ধান্যের ফসল নষ্ট হয়—পানীয় জল অপেয় হইতেছে। গত দুর্ভিক্ষের পরে বাঙলা সরকার লোককে যে বীজ চাষের জন্য দিয়াছিলেন, কোন কোন ক্ষেত্রে তাহা যে অঙ্কুরিত হয় নাই, তাহা সরকারের সচিবরা অস্বীকার করিতে পারেন নাই! তৎকালীন বাঙলা সরকার নিরন্নদিগকে অন্নদানের নামে যে খাদ্য দিয়াছিলেন, তাহাতে যে লোকের জীবনরক্ষা হইতে পারে না, তাহা বিশ্লেষণে জানা গিয়াছে—সেই খাদ্য যে নানা লোকের স্বাস্থ্যভঙ্গের কারণ হইয়াছে, তাহাও অস্বীকার করা যায় না। দেশের লোকের সহযোগ গ্রহণ করিলে যে

সময় লক্ষ লক্ষ লোক অনাহারে মরিয়াছে, সেই সময় লক্ষ লক্ষ টাকার চউল আটা পচিয়াই নষ্ট হইত না।

কারামুক্ত হইয়া আসিয়া পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু আবার জাতির উন্নতিসাধক পরিকল্পনার কার্যে অবহিত হইয়াছেন।

সে কার্যের প্রয়োজন যে আজ "অন্নাভাবে শীর্ণ—চিন্তাজ্বরে জীর্ণ" বাঙালীর জন্য বিশেষ প্রয়োজন, তাহা বলা বাহুল্য। সে কাজ ব্যক্তির দ্বারা স্বতন্ত্রভাবে সম্পন্ন হইতে পারে না—তাহা সঙ্ঘবদ্ধভাবে করিতে হইবে।

কংগ্রেস তাহার সম্ভ্রম লইয়া লোকের আস্থায় ও আপনার ত্যাগনিষ্ঠায় নির্ভর করিয়া সে কাজে অগ্রণী হইলে তাঁহার পক্ষে সকল দলের ও সকল সম্প্রদায়ের সহযোগ আকর্ষণ করিতে বিলম্ব হইবে না।

বাঙলার অনেক দুঃস্মদুর্গতির কারণ—সাম্প্রদায়িকতা। কংগ্রেস জাতীয় প্রতিষ্ঠান—তাহা সাম্প্রদায়িকতার বহু ঊর্ধ্বে অবস্থিত। কংগ্রেস গঠনমূলক কার্যে প্রবৃত্ত হইলে যেমন সাম্প্রদায়িকতায় অভিভূত হইবে না, তেমনই সম্প্রদায়-নির্বিশেষে সকলেই যে কংগ্রেসের সহযোগিতা করিতে অগ্রসর হইবেন, তাহাতে সন্দেহ নাই।

ব্যাধি, বন্যা, ভূমিকম্প—এ সকল সম্প্রদায়-বিশেষকেই পীড়িত করে না। গত দুর্ভিক্ষে দেখা গিয়াছে, তাহার আক্রমণের সঙ্গে সাম্প্রদায়িকতার কোন সম্বন্ধ নাই। যে সময় সেই দুর্ভিক্ষ লোকক্ষয় করিয়াছে, তখন বাঙলায় সাম্প্রদায়িকতাদুষ্ট মুসলিম লীগ সচিবসঙ্ঘ কায়েম ছিলেন। তাঁহাদিগের বিরুদ্ধে সাহায্যদানে সাম্প্রদায়িকতার অভিযোগও যে শুনা যায় নাই, এমন নহে। কিন্তু সেই সচিবসঙ্ঘ ও তাঁহাদিগের প্রভু মুসলিম লীগ—ত্যাগস্বীকারে অসম্মতি হেতু মুসলমানদিগকেও আবশ্যক সাহায্য প্রদান করেন নাই—তাঁহারা বলিয়াছিলেন, ভগবান যাহাদিগকে মারেন, মানুষ কি তাহাদিগকে রক্ষা করিতে পারে?

সাম্প্রদায়িকতা মুষ্টিমেয় লোককে প্রকৃত অবস্থায় অন্ধ করিতে পারে; কিন্তু জনগণকে বিভ্রান্ত করিতে পারে না। সেই জন্যই যে জাতীয় প্রতিষ্ঠান সাম্প্রদায়িকতা হইতে বহু ঊর্ধ্বে অবস্থিত, জনগণের কল্যাণকর কার্য—গঠনমূলক কার্য তাহাকেই করিতে হইবে। সে সে-কাজে সকলেরই সাহায্য পাইবে।

সেই কাজের জন্য সর্বাগ্রে শক্তিসংগ্রহ প্রয়োজন এবং ঐক্য ব্যতীত সে শক্তি সংগৃহীত হইবে না। সেই জন্য বাঙলায় কংগ্রেসে ঐক্যের প্রয়োজন যত অধিক, তত আর কিছুরই নহে। সে প্রয়োজন কংগ্রেসের সকল দলই অনুভব করিতেছেন। তাঁহারা ঐক্যবদ্ধ হউন—যে সকল কর্মী এখনও কারাগারে তাঁহাদিগের মুক্তির দাবী অকুণ্ঠকণ্ঠে অকুতোভয়ে করুন—আর গঠন কার্যের পরিকল্পনা প্রস্তুত করিয়া সেই কার্যে আত্মনিয়োগ করুন।

পুস্তক পরিচয়

ভবঘুরের বিলাত যাত্রা—ভূপর্যটক রামনাথ বিশ্বাস লিখিত; ১০নং শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট হইতে মিত্র এণ্ড ঘোষ কর্তৃক প্রকাশিত। বোর্ড বাধাই, মূল্য ১৷৷৹ টাকা।

নোয়াখালীর গৌরীশচন্দ্র গুহরায় নামক জনৈক ভ্রমণ-পিপাসু যুবকের সহিত তাহার মুমূর্ষু অবস্থায় বিদেশের এক হাসপাতালে রামনাথ বিশ্বাসের দেখা হইলে উক্ত যুবক তাঁহার আত্মবিবরণী রামনাথবাবুকে প্রদান করেন। রামনাথবাবু উক্ত যুবকের জবানীতে এই গ্রন্থমালা প্রণয়ন করিয়াছেন।

বাঙ্গালী যুবক গৌরীশচন্দ্র দেশভ্রমণের নেশা চরিতার্থ করিবার জন্য জাহাজে খালাসীর চাকুরী গ্রহণ করিয়া সিঙ্গাপুর হইতে বিলাত যাত্রা করেন। অতঃপর শ্যাম, চীন, জাপান প্রভৃতি হইয়া গন্তব্য স্থানে যান। গৌরীশচন্দ্র যে সকল স্থান দেখিয়াছেন, বেশ পর্যবেক্ষকের দৃষ্টি দিয়াই দেখিয়াছেন এবং তথাকার চালচলন বেশ অনুসন্ধিৎসার সহিত লক্ষ্য করিয়াছেন। বিবরণটি বেশ চিত্তাকর্ষক হইয়াছে। রামনাথ দাস মহাশয় এই কাহিনীটি লিপিবদ্ধ না করিলে গৌরীশচন্দ্র হয়ত চিরদিন লোকলোচনের অন্তরালে থাকিয়া যাইতেন। বাঙ্গালী যুবকের এইরূপ অ্যাডভেঞ্চারের কাহিনী লিপিবদ্ধ করিয়া লেখক একটি দুঃসাহসী ঘরছাড়া মনের পরিচয় বাঙলার ছেলেদের চোখের সামনে তুলিয়া ধরিয়াছেন। এই হিসাবে বইটির বহুল প্রচার কাম্য।

দি ম্যান এণ্ড হীজ রিলিজিয়ন—এস সি চক্রবর্তী, এম এ, বি এল, বাঙলা দেশের অবসর-প্রাপ্ত জেলা এবং দায়রা জজ। পাটনা স্টেট হাইকোর্টের চীফ জজ। দাশ গুপ্ত এণ্ড কোং, ৫৪।৩ কলেজ স্ট্রীট, কলিকাতা কর্তৃক প্রকাশিত। মূল্য আড়াই টাকা।

গ্রন্থকার সুপণ্ডিত ব্যক্তি; আলোচ্য গ্রন্থখানাতে তাঁহার অগাধ শাস্ত্র জ্ঞানের পরিচয় পাওয়া যায়; তদপেক্ষা উল্লেখযোগ্য বিষয় এই যে তিনি অধ্যাত্মতত্ত্বসমূহ সাধনা প্রভাবে স্বীয় জীবনে উপলব্ধি করিয়াছেন; এজন্য প্রতিপাদ্য বিষয়টি অত্যন্ত দুরধিগম্য হইলেও সকলের বোধগম্য সহজ ভাষায় অভিব্যক্ত করা তাঁহার পক্ষে সম্ভব হইয়াছে। আলোচ্য গ্রন্থখানিতে হিন্দু ধর্মের সার্বভৌমত্ব এবং উদার বিশ্বজনীন অনুভূতি সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। প্রচলিত বিধি বিধানের সম্বন্ধে অনেকের অনেক ভ্রান্ত কুসংস্কার এই গ্রন্থের দ্বারা বিদূরিত হইবে। ভাষা সহজ ও সরল এবং বর্ণনাভঙ্গী সুন্দর। আমরা এই পুস্তকের বহুল প্রচার কামনা করি।

পুতুলের সংসার—ইবসেনের A Dool's House-এর অনুবাদ। অনুবাদক—দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়। প্রাপ্তিস্থান—সংকেত ভবন, ৩, শম্ভুনাথ পণ্ডিত স্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য ১৷৷৹।

বাঙলা মঞ্চের বিস্ময়কর উন্নতি সত্ত্বেও হালে যে ধরণের নাটক অভিনয় হইতে দেখি তাহাতে বিতৃষ্ণার উদ্রেক হয়। সেদিক হইতে পৃথিবীর দিকপাল নাট্যকার ইবসেনের শ্রেষ্ঠ নাটক-এর অনুবাদ করিয়া ও বাঙলা মঞ্চে তাহার অভিনয় সম্ভাবনা আলোচনা করিয়া অনুবাদক সকলের ধন্যবাদ-ভাজন হইয়াছেন। এ নাটক ঠিকমত অভিনীত হইলে জনপ্রিয় হইবে সন্দেহ নাই।

VIDYASAGAR COLLEGE MAGAZINE, Summer Number, 1945—বিদ্যাসাগর কলেজ ম্যাগাজিনের ১৯৪৫ সালের নিদাঘ-সংখ্যা পাঠ করিয়া আমরা প্রীতিলাভ করিলাম। ইংরাজী, বাঙলা ও হিন্দী ভাষায় লিখিত ছাত্র ও অধ্যাপকবর্গের অনেকগুলি রচনায় সংখ্যাটি সমৃদ্ধ। শিক্ষা, সাহিত্য ও শিল্প-বাণিজ্য বিষয়ক কয়েকটি মনোজ্ঞ প্রবন্ধ আলোচ্য সংখ্যাটিকে বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত করিয়াছে। পত্রিকাখানার মুদ্রণ-পারিপাট্যও প্রশংসনীয়।

স্বাস্থ্য প্রসঙ্গ

চিকিৎসাশাস্ত্রে রসায়নের দান

শ্রীকালীপদ বসু, ডি এস্‌সি, পিএইচ ডি

গত দশ পনর বৎসরের চিকিৎসাশাস্ত্রের ইতিহাস পর্যালোচনা করলে, রোগ-জয়ে ও স্বাস্থ্যরক্ষায় রসায়নের দানই খুব বেশী করে চোখে পড়ে। ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ ভাগ পর্যন্তও চিকিৎসকগণ যে সব ঔষধ ব্যবহার করতেন, তা উদ্ভিজ্জ বা জান্তব জিনিস থেকে রাসায়নিকেরা বের করে দিতেন। তখন পর্যন্ত কৃত্রিম উপায়ে রসায়নাগারে প্রস্তুত ঔষধের প্রচলন হয় নাই। ফিনাছেটিন (phenacatin) ও অ্যাস-পিরিনই (aspirin) কৃত্রিম উপায়ে তৈয়ারী সর্বপ্রথম ঔষধ। অ্যাসপিরিনএর ব্যবহার আরম্ভ হয় ১৮৯৯ খৃষ্টাব্দে। জ্বর, মাথাধরা ও বিভিন্ন ব্যথা সারিতে এর পর থেকে যে কত অ্যাসপিরিনের ব্যবহার হয়েছে ও হচ্ছে তা অনেকে জানেন। অ্যাস-পিরিন তৈয়ারী করে রাসায়নিক প্রমাণ করেন যে, প্রকৃতি-জাত ঔষধ থেকে ভিন্ন, অথচ বেশী কার্যকরী ঔষধ তিনি তৈয়েরী করতে পারেন। এই সব কৃত্রিম ঔষধের অণুর গঠন রাসায়নিক তাহার ইচ্ছানুসারে করেন। অ্যাসপিরিন তৈয়েরীর পর থেকেই ঔষধ তৈয়েরীর ইতিহাসে এক নূতন যুগ আরম্ভ হল। সিফিলিস, ম্যালেরিয়া, কালাজ্বর প্রভৃতি কঠিন ব্যাধির প্রতিষেধক ঔষধ রসায়নাগারে কৃত্রিম উপায়ে প্রস্তুত হতে লাগল। বহুমূত্র প্রতিষেধক ইনসুলিন, গল গণ্ড নাশক থাইরক্সিন (thyroxin) রক্তের চাপ বর্ধক অ্যাড্রিনালিন (Adrinaline) প্রভৃতি হরমোনের আবিষ্কার ও এদের মধ্যে অনেকগুলি কৃত্রিম উপায়ে তৈয়েরী করে রাসায়নিক চিকিৎসা জগতে যুগান্তর আনয়ন করলেন। ভাইটামিনগুলো বিশুদ্ধরূপে প্রস্তুত ও কৃত্রিম উপায়ে বীক্ষণাগারে তৈয়ারী হওয়াতেও বিভিন্ন চক্ষুরোগ, চর্মরোগ, বেরিবেরি স্কার্ভি, রিকেট্ এবং আরও অনেক অসুখ সারানোর ও এ সব ব্যাধি হতে না দেওয়ার উপায় বের হয়েছে। শুধু রোগ সারানোই নয়, সুস্থ, সবল ও দীর্ঘজীবন লাভের জন্যও বিভিন্ন ভাইটামিনগুলোর খুবই প্রয়োজন।

জীবাণুগঠিত ব্যাধির চিকিৎসায় বিপ্লব এনেছে সালফোনামাইড জাতীয় ঔষধ ও নবাবিষ্কৃত পেনিসিলিন (penicillin)। কৃমি প্রভৃতি কীটজনিত রোগগুলো বাদ দিলে বীজাণুগঠিত (parasitic) ব্যাধিগুলোকে তিন ভাগে ভাগ করা যায়। প্রথম শ্রেণীতে হল ম্যালেরিয়া, সিফিলিস sleeping sickness প্রভৃতি রোগ যার মূলে রয়েছে protozoa শ্রেণীর বীজাণু। নিউমোনিয়া, গনোরিয়া, এরিসিপ্লাস (erysipelas), সেপ্টিসিমিয়া (septicaemia), দূষিত জ্বর, মেনিনজাইটিস (meningitis), প্লেগ, কলেরা প্রভৃতি রোগ ব্যাক্‌টেরিয়া (bacteria) গঠিত এবং এরা পড়ে দ্বিতীয় শ্রেণীতে। তৃতীয় শ্রেণীর রোগ হয় ভাইরাস (virus) থেকে,—সর্দি, হাম ইনফ্লুয়েঞ্জা বসন্ত infantile paralysis প্রভৃতি রোগ এই শ্রেণীর। protozoa জান্তব শ্রেণীর সূক্ষ্ম জীবাণু এবং ১৯৩৫ সন পর্যন্ত কৃত্রিম উপায়ে তৈয়ারী ঔষধগুলো কেবল protozoa জনিত ব্যাধিতেই কার্যকরী হয়েছে। ব্যাক্‌টেরিয়া বা সূক্ষ্ম উদ্ভিজ্জ জীবাণু-গঠিত ব্যাধিতে কার্যকরী রাসায়নিক পদার্থ এখন পর্যন্ত তৈয়ারী সম্ভব হয় নাই। ব্যাক্‌টেরিয়াজনিত রোগাক্রান্ত জন্তুর উপর বিভিন্ন antiseptic বা জীবাণুনাশক প্রয়োগে দেখা যায় যে, ব্যাক্‌টেরিয়া বৃদ্ধি বন্ধ হওয়ার পূর্বে জন্তুরই antiseptic-এর ক্রিয়ার মৃত্যু ঘটে। ফলে ব্যাক্‌টেরিয়াজনিত ব্যাধি প্রশমনের জন্য সিরাম (serum) চিকিৎসা উদ্ভাবিত হয়; এ চিকিৎসার অনেক অসুবিধা আছে। ১৯৩৫ সনে প্রোন্‌টোসিল (Prontosil) নামক সালফনা-মাইড-যুক্ত রঞ্জক দ্রব্যের Streptococcus নামক ব্যাক্‌টেরিয়াঘটিত ব্যাধিতে কার্যকরী প্রমাণিত হয় এবং এর পর থেকে সালফোনামাইড জাতীয় ভিন্ন ভিন্ন পদার্থ কৃত্রিম উপায়ে তৈয়ারী, সেগুলোকে নিউমোনিয়া, গনোরিয়া, এরিসিপ্লাস ও সেপ্টিসিমিয়া প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন রোগে বিশেষ ফলপ্রদ বলে প্রমাণ করা হয়—এতে চিকিৎসা জগতে এক যুগান্তর উপস্থিত হয়। Virus অতি সূক্ষ্ম, এরা ফিল্টারের (filter) ভেতর দিয়ে চলে যায়; এখন পর্যন্ত রাসায়নিক উপায়ে virus জনিত রোগ নিবারণ সম্ভব হয় নাই।

প্রোণ্টসিলের ব্যাক্‌টেরিয়া-জনিত ব্যাধি নাশ করার ক্ষমতার কথা প্রথম ঘোষণা করেন ডোমাগ (Domagk) ১৯৩৫ সনে। প্রোণ্টসিল প্রথম তৈয়ার করেন মিটস্ ও ক্লায়ার (Mietzsch and Klare) নামক ডোমাগের দুই সহকর্মী। Streptococcus জীবাণুজনিত রোগে এর কার্যকারিতা প্রথম এঁরা দেখেন ১৯৩২ খৃষ্টাব্দে এবং এই ঔষধটি ব্যবহার করে ডোমাগ তাঁহার শিশুর প্রাণরক্ষা করেন। তিন বৎসর ধরে জন্তুর উপর এর ক্রিয়া পরীক্ষা করে পরে এই ঔষধ জনসাধারণের ব্যবহারার্থ বাজারে দেওয়া হয়।

প্রোণ্টসিল একটি azo শ্রেণীর রঙ্গীন জিনিস সাল্‌ফানিলামাইডের সঙ্গে মেটা-ফিনিলিন-ডাই-অ্যামিন সংযোগে তৈয়ারী। ১৯৩৬ সালে ফরাসী দেশীয় কর্মিগণ ফুরনোর (fourneau) বীক্ষণাগারে প্রমাণ করেন যে, প্রোণ্টসিল শরীরের ভেতর সাল্‌ফানিলামাইড ও মেটাফিনিলিন-ডাই-অ্যামিনে ভেঙ্গে যায় এবং ব্যাকটেরিয়ার উপর প্রোণ্টসিলের ক্রিয়া কেবল মাত্র এই সালফানিলামাইডের জন্য। প্রোণ্টসিল চাইতে সালফানিলামাইডের ব্যবহারে সুবিধা এই যে, ইহা জলে অধিক দ্রবণীয় ও বেশী তাড়াতাড়ি শরীরের ভেতর প্রবেশ করে রক্তের সঙ্গে মিশে যায়। কাজেই এর পর থেকে প্রোণ্টসিল ব্যবহার না করে তার পরিবর্তে সালফানিলামাইডের ব্যবহার চলতে থাকে। সালফানিলামাইড জিনিসটি কিন্তু অনেক দিন থেকেই জানা ছিল—ইহা তৈয়ারী হয় ১৯০৮ খৃষ্টাব্দে এবং এর থেকে রঞ্জনদ্রব্য তৈয়ারী হত। কিন্তু ১৯৩৬ সালের পূর্বে এর ব্যাকটেরিয়া নাশক ক্ষমতা জানা ছিল না। হিসেব করে দেখা গিয়েছে যে, যদি এর কার্যকারিতা ১৯১৪ সালে জানা থাকত, তাহলে ১৯১৪ থেকে ১৯১৮ সালের যুদ্ধে ১০ লক্ষ লোকের প্রাণ রক্ষা করা সম্ভব হত। সেই যুদ্ধের সময় ক্ষতস্থানে Streptococcus প্রভৃতি ব্যাক্‌টেরিয়া সংস্পর্শে যে ভীষণ অবস্থার সৃষ্টি হত, তার কোন প্রতিষেধ বা প্রতিবিধান জানা ছিল না।

১৯৩৬ সালের পর থেকে সালফানিলা-মাইডের ব্যাকটেরিয়ানাশক শক্তি বাড়াবার চেষ্টা চলতে থাকে। Streptococcus বাকটেরিয়ার উপর কার্যকরী হলেও সাল-ফানিলামাইড Pneumococcus, menin-gococcus, Gonococcus, Stapsylococcus প্রভৃতি ব্যাকটেরিয়াগুলোর উপর কোন ক্রিয়াই করে না। নিউমোনিয়া রোগের উৎপত্তি হয় Pneumococcus জীবাণু থেকে, meningococcus জীবাণু থেকে হয় মেনিনজাইটিস রোগ এবং গণোরিয়া রোগ হয় Gonococcus জীবাণুর ক্রিয়ায়। সালফানিলামাইডের সঙ্গে পিরিডিন, থায়াজোল, পিরিমিডিন, ডাইমিথাইল পিরিমিডিন ও গুয়ানিডিন প্রভৃতি পদার্থ সংযোগে বিভিন্ন জিনিস তৈয়েরী করা হয় এবং দেখা যায় উল্লিখিত ব্যাকটেরিয়া

গুলোর উপর এরা খুব কার্যকরী। এর মধ্যে পিরিডিনযুক্ত জিনিসটি—যা Sulpher-Pyridine বা M+B ৬৯৩ নামে চলছে—যে শুধু Streptococcus জীবাণুর উপর ক্রিয়া করে তা নয়—Pneumnococcus ও meningococcus-এর উপরও এর ক্রিয়া খুব দ্রুত ও আশ্চর্যজনক। পূর্বে নিউমোনিয়া একটি সাংঘাতিক ব্যাধি বলে পরিগণিত ছিল—এতে মৃত্যুর হার ছিল শতকরা পঁচিশজন। বিখ্যাত চিকিৎসক স্যার উইলিয়াম অসলার এই রোগটিকে যমদূতের সর্দার (Captain of the Men of death) বলে বর্ণনা করেছেন। সালফা-পিরিডিন আবিষ্কারের পর নিউমোনিয়ায় মৃত্যুর হার শতকরা ৫-এর কম হয়ে গিয়েছে। এই ঔষধে যে কত লোকের জীবন রক্ষা হয়েছে, তার ইয়ত্তা নেই। Suiphathiazole বা cibazol পিরিমিডিন যুক্ত Sulphadazine ও Sulphadimethylpriymedine বা Sulphamethaume নিউমোনিয়াতে Sulpha-Pyridine-এর চাইতেও বেশি কার্যকরী বলে দেখা গিয়েছে। মেনিনজাইটিস রোগে Sulphathiazole, Sulphadiarine ও Sulpha-Pyridine কার্যকরী। ফোঁড়া (Boils), ব্রণ (Carbuncle) ও Whitlow প্রভৃতি Staphylococcus জীবাণুজনিত ব্যাধিতে Sulphathiazole ও Sulphadiarine বেশ কাজ করে। গণোরিয়ায় Sulphathiazole খুব উপকারী ও কর্নেল সোখীর মতে এ ঔষধ ব্যবহারে প্লেগেও খুব ফল পাওয়া যায়। খুব ধীরে ধীরে অন্ত্রের ভিতর দিয়ে প্রবেশ করে বলে Sulphaguanidine ব্যাসিলারি আমাশয় ও এমন কি, কলেরা রোগেও ফলপ্রদ হয়েছে। উক্ত সালফানিলামাইড শ্রেণীর ঔষধ কয়টি দানাযুক্ত পদার্থ, জলে খুবই কম দ্রবণীয় এবং বড়ী করে রোগীকে গিলতে দেওয়া হয়। অনেক সময় খুব শীঘ্র কাজ করার জন্য এই জাতীয় ঔষধ মাংসপেশী বা রক্তের মধ্যে সূচীপ্রয়োগ করা দরকার হয়—সূচীপ্রয়োগের ঔষধ জলে দ্রবণীয় হওয়া দরকার। এইজন্য গ্লুকোজ জাতীয় জিনিসের সঙ্গে রাসায়নিক সংযোগে এদের জলে দ্রবনীয়তা বাড়ানোর চেষ্টা হয়েছে এবং এদিকে কতকটা সাফল্যও পাওয়া গেছে।

সালফানামাইড শ্রেণীর ঔষধগুলোর সাধারণত তিন রূপে ব্যবহার চলে। প্রথমত, বড়ীরূপে গিলে খাওয়া, দ্বিতীয়ত, ক্ষতস্থানে মলম বা গুঁড়ারূপে প্রয়োগ ও তৃতীয়ত, সূচীপ্রয়োগ। গিলে খেলে এ ঔষধগুলো বেশ তাড়াতাড়িই শরীরের ভিতর প্রবেশ করে রক্তের সঙ্গে মিশে যায়। এই সব ঔষধ প্রয়োগে ফল পেতে হলে খুব তাড়াতাড়ি রক্তের মধ্যে এদের বেশ খানিকটা পরিমাণ থাকা দরকার। এজন্য প্রথমত একটু বেশি মাত্রায় প্রয়োগ করে পরে নির্দিষ্ট সময় পর পর এই ঔষধ প্রয়োগ করে যেতে হয়। সাধারণত প্রথমেই দুই গ্রাম পরিমিত ঔষধ খাইয়ে প্রথম দুই দিন চারি ঘণ্টা অন্তর এক গ্রাম করে খাওয়ান উচিত—পরের দুই দিন প্রতি ছয় ঘণ্টা এবং তার পরের দুই দিন প্রতি আট ঘণ্টা অন্তর এক গ্রাম করে খাওয়ান বিধি। এইরূপে ছয় দিনে প্রায় ২৮ গ্রাম ঔষধ খাওয়ানো দরকার। প্রথমে অণুমাত্রায় ঔষধ প্রয়োগ করলে এই ঔষধে না মরে টিকে থাকতে পারে, এরূপে ব্যাকটেরিয়ার সৃষ্টি হয়, তখন পরে বেশি-মাত্রায় ঔষধ প্রয়োগ করেও প্রায়ই ফল পাওয়া যায় না।

খুব বেশিক্ষণ রক্তের ভেতর থাকলে এই সব ঔষধের একটু বিষক্রিয়া হতে পারে। বিশেষত এই সমস্ত ঔষধ শরীরের ভিতর কিছুটা Acetyl-এর সঙ্গে যুক্ত হতে পারে—এই Acetylযুক্ত পদার্থ জলে কম দ্রবণীয়। কাজেই এরা মূত্রাশয় হতে নির্গমনের রাস্তা বন্ধ করতে পারে। যাতে এ না হয় ও যাতে ক্রিয়ার পর ঔষধ শরীর থেকে বেরিয়ে যেতে পারে, সেজন্য প্রভূত জল ও কিছুটা সোডি-বাই-কারবনেট খাওয়া ভাল। এই সমস্ত কুফল ও বিষক্রিয়া যাতে না হতে পারে, এজন্য এই সব ঔষধ একজন অভিজ্ঞ চিকিৎসকের তত্ত্বাবধানে খাওয়া দরকার। ক্ষতস্থানে ও পোড়া জায়গায় সালফনামাইডের গুঁড়া ব্যবহার করে খুব ভাল ফল পাওয়া গিয়েছে। এতে ক্ষতস্থানের ভিতর দিয়ে ব্যাকটেরিয়া প্রবেশ করে ক্ষত ও রক্ত বিষাক্ত করে তোলা অনেকটা নিবারিত হয়। আহত হওয়া ও অস্ত্র-চিকিৎসার সাহায্য পাওয়া এই সময়ের মধ্যে ক্ষতস্থানে Streptococcus প্রভৃতি বীজাণুর প্রবেশ ঘটে। এর কোন প্রতিবিধান জানা ছিল না বলে গত যুদ্ধে অনেক আহত লোকের মৃত্যু ঘটেছে। আজকাল যুদ্ধক্ষেত্রে আহতদিগের ক্ষতস্থানে সালফনামাইড বা সালফনামাইড ও Sulphathiazole-এর মিশ্রণের গুঁড়ো ছড়িয়ে পরে ক্ষতস্থান বেঁধে অস্ত্র-চিকিৎসার জন্য হাসপাতালে পাঠানো হয়। অস্ত্রোপচারের পরেও খোলা ক্ষতস্থানে এই গুঁড়ো ছিটিয়ে দেওয়া হয়। এতে জীবাণুর ক্রিয়ার বিষম ফল নিবারিত হয়। মস্তিষ্কে ক্ষত হলে সেখানে এই ঔষধ প্রয়োগ করা উচিত নয়—এতে অনেক সময় মৃগী রোগীর ন্যায় খিচুনী দেখা দেয়।

পোড়া জায়গায় সালফনামাইডযুক্ত মলম প্রয়োগে খুব ভাল ফল পাওয়া গিয়েছে। পোড়া ঘা প্রায়ই Haemolytic Streptococcus জীবাণু দূষিত হয়ে ওঠে, কারণ সাধারণত অনেকটা জায়গা পুড়ে যাওয়ায় জীবাণু দূষিত হওয়ার আশঙ্কা বেড়ে যায়, এবং দ্বিতীয়ত, পোড়া জায়গা থেকে যে জলীয় নিঃসরণ বেরিয়ে আসে, তার ভেতর জীবাণু খুব তাড়াতাড়ি বাড়তে পারে। পোড়া জায়গা পরিষ্কার না করেই তাতে সালফনামাইড ও Cetyl Trimethyle Amonium bromideযুক্ত মলম প্রয়োগে এই সমস্ত ভয়াবহ জীবাণুর ক্রিয়া নিবারিত হয় দেখা গিয়েছে। এই মলমে কিছুটা ক্যাস্টর তেল, মোম, গ্লিসারিণ, Cetyl Alcohol এবং জলও থাকে।

পূর্বে ধারণা ছিল যে, সালফনামাইড প্রয়োগের সময় ডিম প্রভৃতি গন্ধকযুক্ত খাদ্য বা গন্ধকযুক্ত ঔষধ খাওয়ালে খারাপ ফল হয়। আধুনিক পরীক্ষায় এই ধারণা মিথ্যা বলে প্রমাণিত হয়েছে।

এখন কথা হচ্ছে, সালফনামাইড জাতীয় জিনিসগুলো কিরূপে ব্যাকটেরিয়ার ক্রিয়া প্রতিরোধ করে। পরীক্ষা দ্বারা প্রমাণিত হয়েছে এরা Antiseptic জাতীয় জিনিস-গুলোর মত ব্যাকটেরিয়া ধ্বংস করে না। এরা শুধু ব্যাকটেরিয়ার সংখ্যা বৃদ্ধি বন্ধ করে, ফলে শরীরের জীবাণু ধ্বংসী প্রক্রিয়া-গুলো প্রবল হয়ে উঠে ও জীবাণুগুলো ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। কাজেই সালফনামাইডের ক্রিয়া জীবাণুধ্বংসী বা Bactricidal নহে; এদের ক্রিয়া Bacteriostatic বা জীবাণু বৃদ্ধি নাশক। প্রশ্ন হচ্ছে, জীবাণুর বৃদ্ধি সালফনামাইড কিরূপে বন্ধ করে। Fields ও Woods বিশুদ্ধ দ্রব্য সব জলে গুলে তাতে জীবাণুর সংখ্যাবৃদ্ধি করে প্রমাণ করেন যে, জীবাণুর সংখ্যাবৃদ্ধি ও পুষ্টির জন্য P-aminobenzoic acid নামক জিনিসটি চাই—এই পি-আমিনো-বেনজয়িক এসিড Peptone (যা জীবাণু বৃদ্ধির জন্য ব্যবহার করা হয়) ও ইস্টে বর্তমান। এই জিনিসটির অভাব ঘটলে Streptococcus প্রভৃতি জীবাণু বাঁচতে ও বৃদ্ধি পেতে পারে না।

সালফোনামাইড জাতীয় জিনিষগুলোর উপস্থিতিতে জীবাণু P aminobenzoic acid তার পুষ্টির কাজে লাগাতে পারে না—ফলে জীবাণুর গঠন বন্ধ হয়ে যায়। জীবাণুর আর বৃদ্ধি না হওয়ায় ও উপযুক্ত পুষ্টির অভাবে তখন Streptococcus প্রভৃতি জীবাণুগুলো মরে যায় ও এদের থেকে উৎপন্ন toxin বা বিষাক্তপদার্থগুলোর জন্য যে-সব উপসর্গ দেখা দিয়াছিল, সে-গুলোও দূরীভূত হয়। সালফোনামাইডের প্রক্রিয়ার এই তথ্য প্রকাশ পাওয়াতে ভবিষ্যতে বিভিন্ন ফলোৎপাদক জীবাণুর পুষ্টি ও বৃদ্ধি বন্ধ করে তাদের ধ্বংস করার জন্য রাসায়ণিক পদার্থ কৃত্রিমরূপে তৈয়ার ও তাদের বিভিন্ন রোগে ব্যবহার খুবই বেড়ে যাবে আশা করা যাচ্ছে।

কামরূপের কামাখ্যা দেবীর মন্দির

শ্রীবিনয়ভূষণ ঘোষ চৌধুরী, প্রাচ্যতত্ত্বসার

কামাখ্যা পাহাড়ের উপরিভাগে কামাখ্যা দেবীর সুপ্রসিদ্ধ মন্দির। এইরূপ জনশ্রুতি—"কামদেব এই স্থানে মহাদেবের কৃপায় পূর্বরূপ প্রাপ্ত হওয়ায়, দেবীর একটি মন্দির নির্মাণ করাইয়া দিয়াছিলেন।" আমাদের মতে পুরীর শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের মন্দিরকে আদর্শ করিয়া কামাখ্যার মন্দির প্রস্তুত করা হইয়াছে। পুরীর এই সুপ্রসিদ্ধ মন্দিরে যেরূপ তথাকথিত কুরুচিপ্রসূত মূর্তি দৃষ্ট হয়, কামাখ্যা দেবীর মন্দিরেও তাহার অভাব নাই। যাহা হউক বিগত ১৯১৩ খৃঃ অব্দে আমরা সর্বপ্রথম কামাখ্যা মন্দিরের গাত্র দেশে চৌষট্টি যোগিনী ও অষ্টাদশ ভৈরব মূর্তি ক্ষোদিত দেখিয়াছিলাম। তাহাও কামদেব কর্তৃক নির্মিত হইয়াছিল বলিয়া শ্রীযুত গৌরীপ্রসাদ ও শ্রীযুত কালিদাস শর্মা প্রভৃতি তত্রত্য পাণ্ডাগণের নিকট অবগত হইয়াছিলাম। এই মন্দির নাতি বৃহৎ, নাতি ক্ষুদ্র। উহার মধ্যস্থল দৈর্ঘ্য-প্রস্থে ৮ হাত। মন্দিরটির দুইটি দ্বার আছে। উহা সিংহদ্বার নামে অভিহিত। প্রথম দ্বারের সম্মুখ ভাগে একটি বৃহৎ ঘণ্টা দোদুল্যমান থাকে। দ্বিতীয় সিংহ-দ্বার দিয়া প্রবেশ করিবার কালে মন্দির মধ্যে প্রাচীরের এক স্থানে কুলুঙ্গী (recess) মধ্যে একটি মূর্তি দৃষ্ট হয়। পাণ্ডাগণ উহাকে ভগবান শঙ্করাচার্যের মূর্তি বলিয়া নির্দেশ করিয়া থাকেন। মন্দিরের অভ্যন্তরভাগ ঘোর অন্ধকারময়—যেন পাতালপুরী। এ কারণ আলোক সাহায্যে দর্শকগণকে দেবীমূর্তি দর্শন করিতে হয়। কামাখ্যা দেবীর মন্দিরের পূর্বদিকে কেদারেশ্বরের মন্দির। যাহা হউক, আসাম বুরঞ্জীর মতে কোচরাজ বিশ্বসিংহের পুত্র নরনারায়ণ, কালাপাহাড় কর্তৃক বিধ্বস্ত কামাখ্যা দেবীর মন্দিরটি পুনর্নির্মাণ করাইয়া দেন।" কামাখ্যা তীর্থের পাণ্ডাগণও যাত্রীদিগকে বলিয়া থাকেন—রাজা নরনারায়ণের এই পুণ্যময় কার্যের জন্য তদীয় প্রস্তরময় মূর্তিটি স্মৃতি স্মারকরূপে অদ্যাবধি মন্দির মধ্যে সংস্থাপিত রহিয়াছে।

৮৯৯ হিজরী সনে বা ১৪৯৩ খৃঃ অব্দে আলাউদ্দিন হোসেন শাহ কর্তৃক কামতাপুর বিজয়ের কিয়ৎকাল পরে ভূঞা রাজা হারিয়া বা হরিদাস মণ্ডল নামক মেচ সর্দারের শৌর্যশালী পুত্র বিশ্বসিংহ স্বকীয় প্রভাবে পশ্চিম কামরূপ হইতে মুসলমানদিগকে বিতাড়িত করিয়া কোচবিহার রাজ্যের এবং বর্তমান রাজবংশের প্রতিষ্ঠা করেন। ইঁহার অষ্টাদশ পুত্রের মধ্যে রাজা নরনারায়ণ (নামান্তর মল্লদেব) মধ্যম পুত্র। স্বর্গীয় রায় গুণাভিরাম বড়ুয়া বাহাদুরের 'আসাম বুরঞ্জী' পাঠে অবগত হওয়া যায়, "রাজা নরনারায়ণের কামরূপে আধিপত্যকালে বাঙলার স্বাধীন সুলতান সোলেমান কিরাণীর সেনাপতি কালাপাহাড় ১৪৭৫ শকে (১৫৫৩ খৃঃ অব্দে) কামরূপ আক্রমণ করিয়া কামাখ্যা দেবীর মন্দির বিধ্বস্ত করিয়াছিলেন।" ইহা সর্ববাদিসম্মত, হিন্দু দেবালয় সমূহের বিলোপ সাধনের জন্য কালাপাহাড় কৃতসংকল্প হইয়াছিলেন। তিনি কখনও কোনও নারীর মর্যাদায় হস্তক্ষেপ করেন নাই। কামরূপে প্রচলিত প্রবাদ অনুসারে রাজা নরনারায়ণ কালাপাহাড়কে বাধা দিতে পারেন নাই। তিনি তাঁহার প্রবল প্রতাপে ভীত হইয়া সন্ধি স্থাপন করিতে বাধ্য হন। রায় গুণাভিরাম বড়ুয়া তদীয় আসাম বুরঞ্জীতে বলেন, "কালা পাহারর এই দেশত পোরাসুঠার, পোরাকুঠার, কালাসুঠান বা কালযবন নাম প্রচলিত আছে। এওঁ ধর্ম বিদ্বেষী বুলি এতিয়ালৈকে মানুহে কয়।"

১৫৫৩ খৃঃ অব্দে কালাপাহাড় কর্তৃক কামাখ্যা দেবীর মন্দির এবং ব্রহ্মপুত্র নদের উত্তরে অবস্থিত 'মণিকূট' (ইহার দেশ-প্রসিদ্ধ নাম হাজো) নামক টিলা বা পাহাড়ের উপর অবস্থিত হয়গ্রীব মাধবের মন্দির ধ্বংসের উল্লেখ আসাম বুরঞ্জীতে পাওয়া যায়। তাহা কতদূর সত্য এক্ষণে আলোচনা করা যাউক। বাঙলার ইতিহাস পাঠে অবগত হওয়া যায় "সুলেমান কিরাণি ১৫৬৩ খৃঃ অব্দ হইতে ১৫৭২ খৃঃ অব্দ পর্যন্ত বঙ্গদেশ শাসন করেন। কালাপাহাড় তাঁহার সেনানায়ক ছিলেন। মুসলমান ইতিহাস "রিয়াস উস সলাতিন" অনুসারে সুলেমান কিরাণি ১৫৬৮ খৃঃ অব্দে কোচবিহার আক্রমণ করেন। তাহা হইলে ১৪৭৫ সনে বা ১৫৫৩ খৃঃ অব্দে কালাপাহাড় কিরূপে ঐ মন্দির ধ্বংস করিয়াছিলেন, তাহার সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া সুকঠিন।

নরনারায়ণের পরিচয়—উক্ত বিশ্বসিংহের মধ্যম পুত্র রাজা নরনারায়ণ প্রকৃতপক্ষে ১৪৫৫ শকাব্দে বা ১৫৩৩ খৃঃ অব্দে কামরূপ ও কামতা রাজ্যের সিংহাসনে সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়া স্ব নামে মুদ্রা প্রচার করেন। কিন্তু মিঃ রবিনসন ও স্বর্গীয় রায় গুণাভিরাম বড়ুয়া বাহাদুরের মতে "নরনারায়ণ ১৫২৮ খৃঃ অব্দে সিংহাসনে আরোহণ করিয়া ১৫৮৪ খৃঃ অব্দ পর্যন্ত রাজত্ব করিয়াছিলেন। মহামতি স্যার এডোয়ার্ড গেইট বাহাদুর নরনারায়ণের রাজপ্রাপ্তির কাল ১৫৩৪ খৃঃ অব্দ বলিয়া উল্লেখ করিবার পর একটু ইতস্ততঃ করিয়া বলিয়াছেন—

"It is less easy to come to a definite conclusion regarding his date of accession."

নরনারায়ণের রাজত্বের শেষকাল যে ১৫৮৪ খৃঃ অব্দ ছিল, গেইট বাহাদুরও তৎসম্বন্ধে স্থির সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। নরনারায়ণের রাজ্যাভিষেককালে গৌহাটির সমীপস্থ পাণ্ডু নামক ক্ষুদ্র রাজ্যের কায়স্থ-কুলোদ্ভব ভূঞা (সামন্ত রাজা) প্রতাপ রায়ের বিদুষী কন্যা কুমারী ভানুমতী দেবীর সহিত তাঁহার শুভ পরিণয় হইয়াছিল। এই সময় রাজভ্রাতা শুক্লদেব প্রতাপ রায়ের ভ্রাতুষ্পুত্রী কুমারী চন্দ্রপ্রভা দেবীর পাণিগ্রহণ করিয়াছিলেন। ইহার কিছুদিন পরে উক্ত বিশ্বসিংহের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা শিষ্যসিংহের মৃত্যু হয়। তিনি রাজ্যের 'রায়কত' (প্রধান সেনাপতি) ছিলেন। কুমার শুক্লধ্বজ প্রধান মন্ত্রীর পদ প্রাপ্ত এবং তাহার পদে প্রতিষ্ঠিত হন। উভয় ভ্রাতা রাম-লক্ষ্মণের মত ভ্রাতৃপ্রেমের আদর্শ ছিলেন। মহারাজ নরনারায়ণ প্রগাঢ় সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত ছিলেন। তিনি স্বকীয় রাজ্যের প্রজাবৃন্দের মধ্যে শিক্ষা, সভ্যতা এবং সদাচার বিস্তার করিবার উদ্দেশ্যে গৌড়, মিথিলা প্রভৃতি স্থান হইতে কতিপয় ব্রাহ্মণ পণ্ডিতকে আনয়নপূর্বক তাঁহাদিগকে বৃত্তি এবং ভূমি দান পূর্বক স্বরাজ্যে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। কামরূপের মহাপুরুষ কায়স্থ জাতীয় শংকরদেব নরনারায়ণের ও তাঁহার কনিয়ান ভ্রাতা শুক্লধ্বজের আশ্রয়ে তাঁহার ধর্মমতের প্রচার করিয়াছিলেন। মহারাজ নরনারায়ণ তাঁহার রাজধানী হইতে আসামের পূর্ব প্রান্তস্থ পরশুরাম কুণ্ড পর্যন্ত এক দীর্ঘ রাজপথ প্রস্তুত করিয়াছিলেন। উহা তাঁহার অন্যতম ভ্রাতা কমলনারায়ণের তত্ত্বাবধানে প্রস্তুত হইয়াছিল বলিয়া 'গোসাই কমল আলি' নামে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিল।

যাহা হউক, সাধনমালার মতে—কামাখ্যা, শ্রীহট্ট, পূর্ণগিরি ও উড্ডিয়ন বজ্রযান

মতের প্রধান স্থান ছিল। হিন্দু ও বৌদ্ধ তান্ত্রিকগণের মিলনের ফলে উত্তরকালে যে কামাখ্যা দেবীর প্রতিষ্ঠা হইয়াছিল, তাহা আমরা পরবর্তী অধ্যায়ে কামাখ্যা দেবী প্রসঙ্গে বিবৃত করিব। মহারাজ নরনারায়ণ তদীয় পিতা বিশ্বসিংহের ন্যায় শাক্ত ধর্মপরায়ণ ছিলেন। তিনি যোগিনীতন্ত্রে নিজ বংশ পরিচয়, কামাখ্যা দেবীর মাহাত্ম্য এবং তাঁহাকে নিজ বংশের কুলদেবী অবগত হইয়া মনের আবেগবশত তাঁহার প্রতিষ্ঠিত স্থান নির্ণয়ে ঐকান্তিক ভাবে ব্রতী হন। ইহার ফলে বর্তমান কামাখ্যা শৈলে বহুকালের একটি প্রাচীন ও বিধ্বস্ত মন্দির প্রাপ্ত হন। তৎকালে সেখানে জনমানবের সমাগম না থাকায় ঐ স্থানটি গহন কাননে পরিণত হইয়া ভয়াবহ এবং হিংস্র শ্বাপদসঙ্কুল হইয়া উঠিয়াছিল। এ কারণ মন্দিরাভ্যন্তরস্থ কোন দেব বা দেবী অথবা যন্ত্রের পূজার্চনা হইত না। যে হিন্দু জাতি চিরদিন দেবদেবীর পূজার্চনায় ঐকান্তিক ভক্তিপরায়ণ, কি কারণে তাঁহাদিগের সকলেই তত্রত্য দেবীর প্রতি শ্রদ্ধাহীন হইয়া পড়িয়াছিলেন, তাহা চিন্তা করিয়া আধুনিক কালের কোন কোন ঐতিহাসিক এইরূপ ধারণার বশবর্তী হইয়াছেন— "কামাখ্যা দেবী বৌদ্ধগণ কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত না হইলে তিব্বত ও ভুটানের বৌদ্ধগণ আজিও প্রতি বৎসর এখানে আসিয়া এই দেবীর পূজা প্রদান করিবেন কেন? পরবর্তীকালে অন্যান্য ধর্মাবলম্বীদিগের সহিত কামরূপস্থ বৌদ্ধদিগের যে বিরোধ ও সংঘর্ষ হয়, তাহার ফলে বৌদ্ধ ধর্মের বিলোপ প্রাপ্তি ঘটিতে থাকিলে তত্রত্য বৌদ্ধগণ কামরূপ পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হন। এদিকে তথায় তান্ত্রিক ধর্ম প্রবল হইয়া উঠিল। বৌদ্ধ ধর্মের কিছুই সারত্ব নাই বুঝিয়া সেখানকার লোকেরা উহার প্রতি আস্থাহীন হইয়া পড়িলেন। কামাখ্যা বৌদ্ধকুলদেবী বলিয়া হিন্দুরা তাঁহাকে পূজা করা নিষ্প্রয়োজন বোধে সেখানে যাইতে বিরত হইলেন। ইহার ফলে স্থানটি জনমানব সমাগম বিরহিত হওয়ায় প্রাকৃতিক নিয়মে সেখানে জঙ্গল বসিল—মন্দির বিধ্বস্ত হইল; ক্রমে সেখানকার যাবতীয় চিহ্ন লোপ পাইল। এ কারণ যোগিনী তন্ত্রোক্ত কামাখ্যা দেবীর স্থাননির্দেশে কোচরাজ নরনারায়ণকে বহু আয়াস পাইতে হইয়াছিল।

কামাখ্যা ধামের অন্যতম প্রধান ও বয়োবৃদ্ধ পাণ্ডা শ্রীযুত গৌরীপ্রসাদ শর্মার নিকট আমরা শুনিয়াছিলাম যে, কামাখ্যা দেবীর বর্তমান মন্দিরের প্রত্যেক ইট এক রতি স্বর্ণসহ গাঁথা হইয়াছিল। বর্তমান কামাখ্যার মন্দিরাভ্যন্তরস্থ দেবালয় গাত্রে সুরক্ষিত প্রস্তর ফলকে উৎকীর্ণ লিপি পাঠে অবগত হওয়া যায় যে, নরনারায়ণের ভ্রাতা শুক্লদেব "শাকে তুরঙ্গ গজবেদ শশাঙ্ক সংখ্যে" অর্থাৎ ১৪৮৭ শকাব্দে (বা ১৫৬৫ খৃঃ অব্দে) নীল শৈলে কামাখ্যা দেবীর মন্দির নির্মাণ করাইয়া দেন।

আসামের ভূতপূর্ব চীফ কমিশনার স্যার এডোয়ার্ড গেইট বাহাদুর ১৮৯৩ খৃঃ অব্দের Journal of the Assiatic Society of Bengal নামক পত্রিকায় (২৮৬ পত্রাঙ্ক) "The Koch Kings of Kamarupa" শীর্ষক প্রবন্ধে লিখিয়াছেনঃ—

"Gunaviram says that Visva Sinha went to Nilachala, where he found only a few houses of riches. No one was at home except one old woman, who was resting under a fig tree, where there was a mound which she said contained a deity. Visva Sinha prayed that his followers might be caused to arrived and his prayer was at once fulfilled. He therefore sacrificed a pig and a cock and resolved, when the country became quiet to build a golden temple there. He ascertained that the hill was the site of the old temple of Kamakha the ruins of which he discovered, which the immage of the goddess, herself was dug up from under the mound. Subsequently he rebuilt the temple but instead of making it of gold he placed a gold coin between each brick."

এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য—উক্ত Gunaviram গোহাটি আরল ল' কলেজের প্রিন্সিপ্যাল Mr. J. Borooah-র পিতা। রায় বাহাদুর গুণাভিরাম বড়ুয়া দীর্ঘকাল কঠোর পরিশ্রম করিয়া 'আসাম বুরঞ্জী' প্রণয়ন করিয়াছেন।

কামাখ্যা দেবীর প্রকৃত মন্দির ব্যতীত উহার সংলগ্ন আরও দুইটি নাটমন্দির পরবর্তীকালে নির্মিত হইয়াছিল। তন্মধ্যে একটির নাম পঞ্চরত্ন আর অপরটিকে নবরত্ন বলা হইত। নবরত্ন একটি প্রকাণ্ড দালানের মত ছিল। আহোমরাজ প্রমত্ত সিংহ স্বর্গদেবের আদেশে তরুণ দুয়রা ফুকন ১৭৬২ শকে কামাখ্যার ফল্গুৎসব মন্দির এবং আহোমরাজ রাজেশ্বর সিংহের আদেশে দশরথ বড়ফুকন "ক্ষিতিবসু স্বাদেন্দু শাকে" (১৬৮১ শকে) কামাখ্যা দেবীর নাটমন্দির বা উৎসব মন্দির নির্মাণ করাইয়া দেন। বিগত ১৩১৬ বঙ্গাব্দে দ্বারবঙ্গেশ্বর কামাখ্যা দেবীর মন্দির সংস্কার করিয়া দিতে ইচ্ছুক হইয়া কোচবিহারের মহারাজা স্যার নৃপেন্দ্রনারায়ণ ভূপ বাহাদুরের সম্মতি চাহিয়াছিলেন কিন্তু তিনি তাহাতে মত দেন নাই।

আমরা পূর্বে বলিয়াছি যে, কোচবিহারের রাজা নরনারায়ণ কামাখ্যা দেবীর মন্দির পুনর্নির্মাণ করিয়া দিয়াছিলেন। স্যার এডোয়ার্ড গেইট বাহাদুর তদীয় আসাম ইতিহাসে (পৃঃ ৫৬) লিখিয়াছেন—"কামাখ্যা দেবীর মন্দির প্রতিষ্ঠা উপলক্ষে অন্যূন ২৪০টি নরবলি দেওয়া হইয়াছিল। তাঁহার এই উক্তির মূলে আসাম গভর্নমেন্ট কর্তৃক ১৯১৭ সালে অসমীয়া ভাষায় প্রকাশিত "দরঙ্গরাজ বংশাবলী" নামক গ্রন্থের নিম্নলিখিত পদটি বলিয়া মনে হয়ঃ—

মহিষ ছাগল হংস মৎস্য পারাবত।
হরিণ কচ্ছপ বলি উপহার যত॥
পূজা করাইলন্ত চতুঃষষ্টি উপচারে।
সপ্তদিন আছে দুইভাই নিরাহারে॥ ৫৪৭
তিন লক্ষ হোম দিলা একলক্ষ বলি।
সাতকুড়ি পাইক দিলা করি তাম্রফলি
সুবর্ণ রজত তাম্র কাংস পাত্রচয়।
অখণ্ড প্রদীপ উর্চাগিলা মনোময়॥ ৫৪৮

গেইট বাহাদুর যে দেশীয় কর্মচারীর উপর উল্লিখিত পদ কয়টির ইংরাজী অনুবাদ করিবার ভার দিয়াছিলেন, তিনি "সাত কুড়ি পাইক দিলা করি তাম্রফলি"—এই পংক্তির অর্থ বুঝিতে ভ্রম করায় কামাখ্যা মন্দির প্রতিষ্ঠার সময়ে দেবীর নিকট অন্যূন ২৪০টি নরবলি দেওয়ার কথা লিখিয়াছেন। ঐ পংক্তির প্রকৃত অর্থ এই—রাজা দেবীর নিত্য সেবা পূজার জন্য তাম্রফলক দলিল সম্প্রদান করিয়া জায়গীর প্রদান পূর্বক সাতকুড়ি অর্থাৎ ১৪০টি "পাইক" সেবক নিযুক্ত করিয়াছিলেন। ফলি শব্দের অর্থ ফলক। তাম্রফলকের সাহায্যে কেহ নরবলি দেয় না—দিতে পারেও না। গেইট মহোদয়ের ঐ কর্মচারী উপরের "মহিষ, ছাগল, হংস, মৎস্য, পারাবত, হরিণ, কচ্ছপ বলি" এবং পুনশ্চ "তিন লক্ষ হোম দিলা এক লক্ষ বলি" পংক্তিগুলির সহিত নীচের পংক্তির "সপ্তকুড়ি পাইককে" অনর্থক সংযুক্ত করিয়া এই ভুলের সৃষ্টি করিয়াছেন।

নিবেদন

নটগুরু গিরিশচন্দ্র ঘোষের একাধিক জীবনী আছে। কিন্তু তাহার কোনটিতেই তাঁহার সমগ্র নাট্যগ্রন্থের প্রকাশকাল-সমেত একটি কালানুক্রমিক তালিকা পাইবার উপায় নাই, অথচ ইহার প্রয়োজনীয়তাও অস্বীকার করা যায় না। আমরা এরূপ একটি তালিকা সংকলন করিতেছি। কিন্তু তাঁহার কতকগুলি পুস্তকের প্রথম সংস্করণ আজিকার দিনে সংগ্রহ করা দুরূহ। আমরা তাঁহার রচিত নিম্নলিখিত চারিখানি পুস্তকের প্রথম সংস্করণের প্রকাশকাল জানিতে পারি নাই;—(১) পাণ্ডবের অজ্ঞাতবাস, (২) ভোট মঙ্গল, (৩) বেল্লিক বাজার, (৪) সপ্তমীতে বিসর্জন। পুস্তকগুলি কাহারও নিকট থাকিলে, তিনি যদি অনুগ্রহ করিয়া এগুলির প্রথম প্রকাশকাল ও পৃষ্ঠাসংখ্যা আমাকে জানান, তাহা হইলে বিশেষ উপকৃত হইব।—শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ, কলিকাতা।



জমকালো ছবির প্রযোজকদের খুব শিক্ষা হলো কিন্তু। এই এক বছরের মধ্যে খুব কম করে প্রায় এক ডজন দশ লাখ টাকাওয়ালা ছবি মুক্তিলাভ করলো, কিন্তু তার কোনখানিই সাফল্য অর্জন করতে পারলো না। এখানে অবশ্য কোনখানিই মুক্তিলাভ করেনি এখনো, কিন্তু বম্বে বা অন্যান্য স্থানের সংবাদ—এই ছবিগুলি সম্পর্কে মোটেই আশার সঞ্চার করে না। "শিরী ফরহাদ"এর কথা ধরুন—উনিশ লাখ টাকা খরচ হলো ছবিখানির জন্যে কিন্তু ফল কি হলো?—কিংবা "ফুল," "হুমায়ুন" অপর যে কোন ছবির কথা ধরা যাক না, কোনখানিই কি জনগণের তৃপ্তি সাধনে সমর্থ হয়েছে? এই সব ছবির অসাফল্য জনগণের রুচির সঠিক নির্ধারণে সহায়তা করে নাকি? ভারতীয় চিত্রজগতের ইতিহাসে আজ পর্যন্ত এমন কোন জমকালো ছবি বা costume play পাওয়া যায় না যা কোন সাফল্যমণ্ডিত সামাজিক ছবির সঙ্গে পাল্লা দিতে সমর্থ হয়েছে। অর্থাৎ স্পষ্টই দেখা যায় যে, লোকে যে কোন ধরণের ছবির চেয়ে সামাজিক ছবিই পছন্দ করে বেশী। এ সত্য আজকেই আবিষ্কৃত হয়নি বহুকাল আগেই জানতে পারা গিয়াছে, তবুও যে প্রযোজকরা পৌরাণিক, ধর্মমূলক বা ঐতিহাসিক ছবি তোলার দিকে কেন ঝোঁক দেয় তার কোন যুক্তি আমাদের বুদ্ধিতে তো আসে না। এ যেন মনে হয় একদল পরিচালক প্রযোজকদের, অথবা একদল প্রযোজক তাদের মহাজনদের ফাঁসাবার জন্যেই পৌরাণিক অথবা ধর্মমূলক ছবি তুলে প্রচুর অর্থ খরচ করিয়ে দেবার সঙ্গে নিজেদের ভাগেও কিছু টানবার জন্যেই এমন করছে। এ একটা মস্ত জুয়াচুরী ছাড়া কিছু নয়। দেখা যাচ্ছে স্পষ্ট যে, লোকে সামাজিক ছবিই চাইছে অথচ লোকের সেই অসন্তুষ্টিকেই গ্রাহ্য না করে কোন কিছু করতে কেউ এগিয়ে এলে তাকে স্বার্থপর ফন্দিবাজ ছাড়া আর কি বলা যায়? শুধু এক আধ বছর নয়, ভারতীয় চিত্রজগতের এই বত্রিশ বছর আগের হিসেব নিলেও দেখা যাবে যে, সামাজিক ছবিই পেয়েছে লোকের কাছে সবচেয়ে বেশী আদর। এ সত্যকে যারা এড়িয়ে চলতে চায় তাদের হিতৈষী বলা যায় না কোন মতে। লোকের মন এখন আর পুরাণের ওপর পড়ে নেই—ধর্মের ওপর আস্থা রেখে ঠকেছে লোকে, আজ কয়েকশত বছর ধরে তাই ধর্মের ওপর থেকে টান যাচ্ছে আস্তে আস্তে কমে—বাস্তবের সঙ্গে তারা আজ ঘনিষ্ঠতর যোগ স্থাপন করতে চাইছে: চাইছে নিজেকে বাস্তবের মধ্যে ডুবিয়ে দিতে এবং বাস্তবের সঙ্গে যার কোন যোগ থাকে না তার সঙ্গে নিজেদের যোগ রাখতে আর তারা চায় না। আজকের দিনে এইটেই সত্য, এবং এ সত্যকে, অবহেলা করলে হালে কেউ টিকতে পারবে না কিছুতেই। জীবন সমস্যাই এখন একমাত্র কথা, তাই নিয়ে গড়া সামাজিক ছবিই হবে আদরের।



পূর্ণিমা প্রডাকসন্সের 'রামায়ণী' চিত্রে শ্রীমতী নার্গিস

পরলোকে মিঃ মালভেলী

এম্পায়ার টকী ডিষ্ট্রিবিউটার্স ও আর-কে-ও রেডিও পিকচার্সের স্থানীয় ম্যানেজর মিঃ গণেশ রাও মালভেলী গত ১৯শে এক বাস দুর্ঘটনায় প্রাণ হারিয়েছেন। গণেশ রাও এখানকার চলচ্চিত্র মহলে সকলের সঙ্গে পরিচিত ছিলেন এবং অতি অমায়িক মিশুকে ভদ্দরলোক বলে সর্বত্রই তাঁর খাতির ছিল। প্রায় দশ বছর আগে "সানডে টাইমস"-এর প্রতিনিধি হয়ে কলকাতায় আসেন এবং পরে চিত্রজগতে প্রবেশ করেন সামান্য কেরাণী হয়ে; তারপর তিনি ক্রমে ম্যানেজার পদে উন্নীত হন। গণেশ রাওয়ের বন্ধুত্ব চিত্রজগতের বহুলোকের স্মৃতিতে জেগে থাকবে। মৃত্যুকালে তার বয়স হয়েছিল মাত্র ৩৬ বৎসর এবং মাত্র এক বৎসর পূর্বে তিনি বিবাহিত হন।

বিবিধ

কাঁচা ফিল্মের আমদানী উন্নততর অবস্থায় পৌঁছলেও লাইসেন্স ব্যবস্থা আরও কিছুকাল বজায় রাখা হবে বলে সরকারি মত শোনা যাচ্ছে।

* * * * * *

বম্বের রামনীক শাহ্ কলকাতার রাধা ফিল্মস্ ষ্টুডিওতে যে পৌরাণিক ছবি তুলবেন তার পরিচালনা করবেন মণি ঘোষ, আর উপদেষ্টা হবেন প্রমথেশ বড়ুয়া।

* * * * * * *

"দাসী" চিত্রের সহকারী পরিচালক বিষ্ণু পাণ্ডোলী করাচীর বেচারলাল দাভের কন্যা মালতী দেবীকে গত ১৫ই জুলাই বিবাহ করেছেন। আর একজন সম্প্রতি বিবাহিতদের মধ্যে হচ্ছেন জহুর রাজা এবারে অভিনেত্রী বিবাহ না করে গৃহস্থ-কন্যাকেই গৃহিণী করেছেন।

* * * * * * *

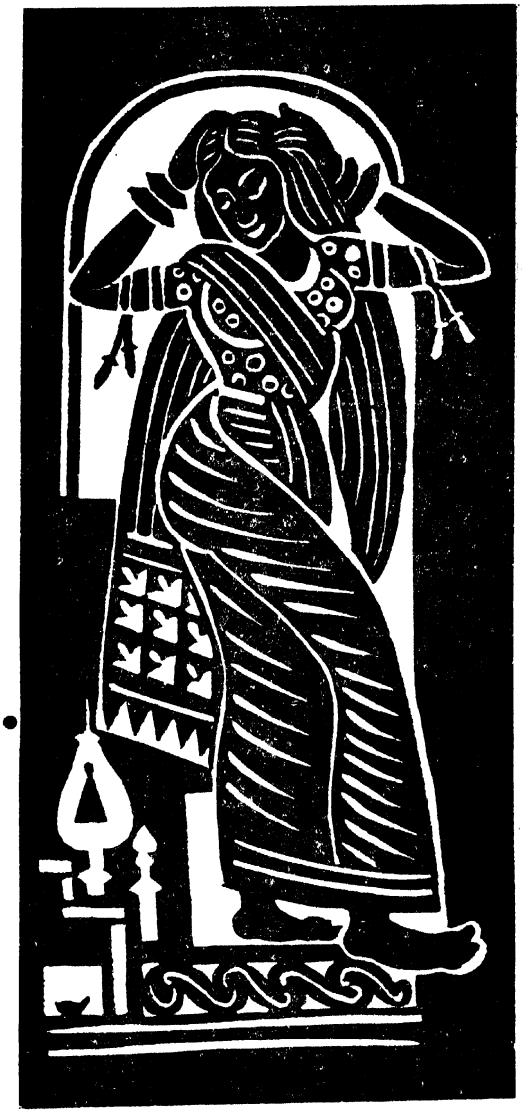
মহম্মদ হাসান নামক এক উদ্যোগী যুবক "রফতর-ই জমানা" নামে আমেরিকার "মার্চ অফ্ টাইম"-এর মত ছোট ছবি তোলার এক প্রতিষ্ঠান গড়েছেন। এদের প্রথম ছবি "হামারা লেবাস" যার বিষয়বস্তু হচ্ছে আদিকাল থেকে আজ পর্যন্ত ভারতের বিভিন্নকালে বিভিন্ন প্রদেশে নারীর বেশভূষা। তারপরের ছবি "বাদল" এবং তারপর "অরপশী" যাতে জলসিচন ব্যবস্থা দেখান হবে।

* * * * * * *

ইউরেকা পিকচার্সের পরবর্তী বাঙলা ছবি "বাক্‌দত্তা"-র চিত্রগ্রহণ ইন্দ্রপুরী ষ্টুডিওতে আরম্ভ হয়ে গেছে। এর বিভিন্ন ভূমিকায় আছেন ছবি বিশ্বাস, চন্দ্রাবতী, ইন্দু মুখার্জী প্রভৃতি।

* * * * *

নিউ টকীজের আগামী হিন্দী ছবি "পহচান"-এর আসল পরিবেশককে চেনা মুস্কিল দেখছি। প্রথমে ন্যাশনাল পিকচার্স পরিবেশক বলে বিজ্ঞাপন দিলে, তারপর এলো এসোসিয়েটেড পিকচার্স, তারপর বাসন্তী ফিল্ম ডিষ্ট্রিবিউটার্স আর এখন দেখছি কোন এক কপুরচাঁদ শেঠের নাম।



প্রসাধন

শিল্পী—শ্রীশান্তিরঞ্জন বসু

কবিতা

এষাস্য পরমা গতি?

সত্যপীর

"সত্যেরে দেখিব আমি জ্যোতির্ময় রূপে;
আমার চরম মোক্ষ, আমি গন্ধ ধূপে
ভস্ম হব পরি' লয়ে সে দীপ্ত তিলক
অগ্নিতে আছেন যিনি, জলে বিশ্বলোক—
অন্তরীক্ষে, ওষধিতে, বনস্পতি মাঝে—
মম সর্বাঙ্গ যেন তাঁরি স্পর্শে রাজে॥"

সে যুগ অতীত হল। তারপর ঋষি
কহিলেন, "এ জীবন অন্ধ অমানিশি।
সত্য বাক্য, সত্য চিন্তা, তথা সত্য কর্ম—
ত্রিরত্ন তোমার হোক—সঙ্ঘ, বুদ্ধ, ধর্ম
দীপ্যমান সর্বলোকে অন্ধ তমোনাশা
ঈশ্বরের দাস্য ত্যজ, ত্যজ শূন্য আশা।"
বুদ্ধ-জৈন ক্ষত্রিয়ের অমিতাভ ভাষা।
তাপিত শূদ্রের বুকে এনেছিল আশা॥

অতিক্রমি আরবের দুস্তর মরুরে
ভারতের শ্যাম-সুধা-পঞ্চনদ ক্রোড়ে
আশ্রয় লভিল যবে নব সত্যদূত
বক্ষেতে বাহুতে তার এক ধর্ম পূত
একেশ্বর। প্রণমিয়া এ ভূমিরে
—যে দেশ ত্যজিয়া এল নাহি চাহি ফিরে—
কহিল, "সত্যেরে আমি যে সুন্দর রূপে
লভিয়াছি, তব শুভ্র পাষাণের স্তূপে
করিব প্রকাশ আমি। এস সর্বজন,
জাতিবর্ণ নাহি হেথা। মুক্ত এ প্রাঙ্গণ
আচণ্ডাল তরে।" শুনি সে উদাত্ত বাণী
শান্ত হল অভিযান, যুদ্ধে হানাহানি॥

তারপর? তারপর লজ্জা, ঘৃণা, পাপ,
অপমান, প্রকাশিল অন্তহীন শাপ।
যুদ্ধক্ষাত্র তেজে তার পাপ-প্রক্ষালন
চেষ্টা হল ব্যর্থ যবে। করিল বরণ
ভেদমন্ত্র ছিদ্রান্বেষী, পরস্পরাঘাত
হইল বিজয়টিকা—সে অভিসম্পাত।

দীর্ঘ রাত্রি অবসানে অরুণ আলোকে
মেলি সুপ্ত আঁখি দেখি চলে মুক্তস্রোতে
নাগরিক বৃদ্ধ ক্ষুদ্র; জনপদে জাগে
দীন দুঃখী, পাপী-তাপী। তাঁর পুরোভাগে
মোহনের সাথে চলে যে ছিল নির্ভয়
মহাপুরুষের নামে দিতে পরিচয়,
আজাদি মোতিলাল। চিত্ত কেড়ে লয়
সরোজিনী পঙ্কে ফোটে—জয় জয় জয়।
চক্রনেমি আবর্তন পূর্ণ হল ভেবে
কৃতজ্ঞ হৃদয় নিয়ে প্রণমিনু দেবে।

হায়রে বিদীর্ণ ভাল, হারে অর্বাচীন
চক্রনেমি আবর্তিল; কিন্তু হল লীন
সম্মুখের সুখস্বর্গ। কি অভিসম্পাতে
ভাগ্যচক্র প্রবেশিল সেই অন্ধরাতে॥

ভূতনাথ গিরিশৃঙ্গে উভয়ে প্রয়াণ
নববীজমন্ত্র লাগি। নাহি অসম্মান!
নাহি অসম্মান তাহে! হেথা নাগরিক
দ্বিধা হয়ে তর্ক করে দীর্ণ দিগ্বিদিক।
কৌলিন্য বিচারে তাই কী জাত্যাভিমান!
দম্ভ কিবা?—কে পড়িছে বেশী স্টেটসম্যান!

গঙ্গোত্রী

সুবোধ ঘোষ

(৩৮)

সারদা দেবী বললেন—তুই কি বলতে পারবি বাসু, মাধুরী আর গাঁয়ে ফিরবে কি না?

বাসন্তী—বোধ হয় না।

সারদা দেবী যেন একটু উদ্বিগ্ন হয়ে উঠলেন—তাহ'লে কি করে হয়?

বাসন্তী জিজ্ঞাসুর মত সারদা দেবীর দিকে তাকিয়ে রইল। সারদা বললেন—তাহলে তো সবই ভেঙে গেল।

বাসন্তী—কি ভেঙে যাবে জেঠীমা?

সারদা—এতদিন যা ভেবে এসেছিলাম বিশ্বাস করেছিলাম, তা সবই ভুল হয়ে গেল।

বাসন্তী—মাধুরী, মাধুরীর বাবা, আর কেউ এ-গাঁয়ে ফিরবেন না। তাদের ফেরবার পথও বন্ধ হয়ে গেছে। ফিরে এসে থাকবার স্থানও নেই।

সারদা—কি হলো?

বাসন্তী—কাল রাত্রে মাধুরীদের বাড়ি পুড়ে গেছে।

হা ভগবান! সারদা দেবী আরও অসহায়ের মত করুণ আক্ষেপ করে উঠলেন।

বাসন্তী—মাধুরীর সঙ্গে কেশবদার বিয়ে হবে, আপনি এই আশার কথাই তো বলছেন জেঠীমা?

সারদা—হ্যাঁ, আমি ওদের দুজনের মনের খবর জানি বলেই আশা করে আছি।

বাসন্তী—আপনি অনেক দিন আগের কথা বলছেন।

সারদা—হ্যাঁ।

বাসন্তী—পাঁচ বছর আগেকার কথা।

সারদা—হ্যাঁ।

বাসন্তী—তারপর কেশবদার জেল হয়ে গেল, সঞ্জীববাবু বড় লোক হয়ে গেলেন, মাধুরী কলেজে পড়লো, স্বদেশী মেয়ে হয়ে উঠলো...... ।

সারদা—তুই তো সব খবর জানিস্ দেখছি।

বাসন্তী—এত ঘটনা ঘটে গেল, তাই ভয় হয়, আপনার আশার কথাটাও এখনো ঠিক আছে কি না।

সারদা—তুই কি ভয় করছিস্?

বাসন্তী—ওদের দুজনের যে মনের কথা আপনি বলছেন, পাঁচ বছর আগে যা ছিল, পাঁচ বছর পরে ঠিক তাই আছে কি না কে জানে।

সারদা কিন্তু কেশবের কথা আমি জানি, আমি স্বচক্ষে আবার দেখলাম, পাঁচ বছর পরে ফিরে এসেও...... ।

একটু থেমে নিয়েই সারদা বলেন—মাধুরীর কথা আজও কেশব ভাবে। সত্যি কথা বলবো কি, আমার একবার সন্দেহও হয়েছিল, ভেবে ভেবে মাথা খারাপ হবার লক্ষণ দেখা দিয়েছিল।

বাসন্তীর চোখের দৃষ্টি ধীরে ধীরে প্রখর হয়ে উঠছিল। কেশবদা আজও পাঁচ বছর আগেকার স্বপ্নে ডুবে আছেন। সারদা জেঠীমা পাঁচ বছর আগেকার বিশ্বাস নিয়েই পড়ে আছেন। এই বিশ্বাসের ছলনায় দুজনেই আজ এক ভয়ানক প্রবঞ্চনার সম্মুখে এসে দাঁড়িয়েছেন। দু'জনেই ঠকবেন। সঞ্জীববাবুকে ও মাধুরীকে এরা আজ সবচেয়ে বেশী ভুল করে বুঝেছেন।

বাসন্তী বললে—আপনি পরিতোষবাবুকে চেনেন?

সারদা—কোন্ পরিতোষ? ওবাড়ীর নন্দর ভাগ্নে হয়, বিলেত গেল পড়তে, সেই ছেলেটি?

বাসন্তী—হ্যাঁ, সে ফিরে এসেছে।

সারদা—ছেলেটি কেমন রে বাসু?

বাসন্তী—খুব ভদ্রলোক।

সারদা—তুই তাকে দেখেছিস্?

বাসন্তী—হ্যাঁ, কালই তিনি এখানে এসেছিলেন।

সারদা—মাধুরীর বাপ ছেলেটিকে খুব ভালবাসে।

বাসন্তী—আপনি সে খবর জানেন তাহ'লে।

সারদা—জানি বৈকি। সবই জানি। কিন্তু মাধুরী সেরকম মেয়ে নয়।

বাসন্তী—কিন্তু মাধুরীর বাবাকে হয়তো আপনি ভাল করে চেনেন না? মাধুরীর বাবার ইচ্ছে...।

সারদা দেবী হেসে ফেললেন। শুষ্ক বেদনার্ত মুখটা হঠাৎ এক মর্মান্তিক উজ্জ্বলতায় সজীব হয়ে উঠলো। সারদা দেবী অনুযোগের সুরে বললেন—তুই থাম্ বাসু। মাধুরীর বাবাকে আমি চিনি, ভাল করেই চিনি, তাঁর ইচ্ছেও জানি।

বাসন্তী যেন বিস্মিত ও সন্দিগ্ধভাবে সারদা দেবীর কথাগুলির তাৎপর্য লক্ষ্য করছিল। কিছুক্ষণ আগে সারদা দেবীর কথায় যে ইঙ্গিত এত স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল, কিছুক্ষণের মধ্যেই যেন তিনি ইচ্ছে করে সেসব উল্টে দিচ্ছেন। মনের সহজ প্রসন্নতার আবেগে কিছুক্ষণ আগে যে কথা বলছিলেন, হঠাৎ কোথা থেকে গোপন এক চিন্তার বাধা সেই কথারই প্রতিবাদ করছে। কেশব এবার ফিরে আসলে, আর যেন তাকে চলে যেতে না হয়, তাকে ধরে রাখতে হবে—সারদা দেবী মুহূর্তের আবেগে বাসন্তীর মুখের দিকে সুস্থভাবে তাকিয়ে এই অনুরোধ করেছিলেন, কিন্তু তার পরেই নিষ্ঠুরভাবে সেই অনুরোধকে মিথ্যে করে দিচ্ছেন।

বাসন্তী আজ জোর করে নিজেকে নির্লজ্জ ও মুখরা করে তোলে। এর জন্য সে প্রস্তুত হয়ে এসেছে। তার মনের গভীরে এক অতি কুট ষড়যন্ত্রের অঙ্কুর লুকিয়ে আছে। আর একটা ষড়যন্ত্রকে ব্যর্থ করার জন্যই এই ষড়যন্ত্র।

বাসন্তী তার অধৈর্য, অস্থিরতা ও দুঃসাহসের জন্যও লজ্জিত নয়। একাজ তাকে করতেই হবে। এর জন্য যদি নিজেকে হিংসুক বলেও মনে করতে হয়, তার জন্যও প্রস্তুত বাসন্তী। প্রকাণ্ড একটা অনিয়মের অহংকারকে চূর্ণ করে দিয়ে যাবে বাসন্তী। মাধুরীর মত মেয়ের মনের কোন দাবী নেই।

কোন মোহকে বুকের নিশ্বাসের মত আপন করে রাখতে জানে না মাধুরীরা। পৃথিবীটা ওদের কাছে খেলাঘরের মত, যখন যাকে ভাল লাগছে, তার সঙ্গে অনুরাগের এক অভিনয় করে ওরা সরে পড়ে। তবু মাধুরীর দাবীই আজ সব চেয়ে বড়। সারদা দেবী মুক্তকণ্ঠে সেই কথা ঘোষণা করছেন, কেশবের মনেও সেই স্বপ্ন গেঁথে আছে। অথচ, বাসন্তী একবার যেন দৃষ্টি ফিরিয়ে নিয়ে নিজের জীবনের দিকে তাকায়। তার জীবনের সকল নিষ্ঠা আগ্রহ ও মোহ দিয়ে তৈরি সবাকার অবহেলায় ঘেরা হয়ে আছে। আজও কেউ সেই ধ্বনি শুনতে পেল না। চিরকালের মতই এই কামনা নীরব হয়ে থাকবে, কখনো দাবী সৃষ্টি করতে পারবে না। যদি দাবী করেও, সবাকার উপহাসে সে দাবী ধিক্কৃত হয়ে নিঃশেষে নিজের অপমানে লুপ্ত হয়ে যাবে।

বাসন্তী বললো—আপনি নিশ্চয় জানেন না জেঠীমা, মাধুরীর বাবা পরিতোষের সঙ্গে মাধুরীর বিয়ে দিতে চান।

সারদা—ওটা তাঁর অভিমান।

বাসন্তীর বাচালতা স্তব্ধ হয়ে এল, বোকার মত অর্থহীন উদাস দৃষ্টি নিয়ে সারদা দেবীর দিকে তাকিয়ে রইল।

সারদা দেবী বললেন—আমি স্পষ্ট জানি, তিনি সব জেনে শুনে যেন আমাকে ভয় দেখাচ্ছেন।

বাসন্তীর দৃষ্টির মূঢ়তা যেন সারদা দেবীর রহস্যভরা কথার ছোঁয়ায় আরও গভীর হয়ে ঘনিয়ে উঠলো।

সারদা দেবী যেন নিজের জীবনের অন্তর্লোকের এক দূরে বেদনার দিকে তাকিয়ে এক কাহিনী পড়ে শোনাচ্ছেন—যাতে আমি তাঁকে গিয়ে একবার অনুরোধ করি, এইটুকুর জন্যেই তিনি এত কাণ্ড করছেন। ধনী মানুষের অভিমান। এক যুগ কেটে গেলেও যেন শান্ত হতে চায় না।

সারদা দেবী কিছুক্ষণের মত একেবারে চুপ করে রইলেন। বিস্ময়ে অপ্রস্তুত হয়েও, বাসন্তী সারদা দেবীর মুখের এই ক্ষণিক বর্ণোচ্ছ্বাসের ইঙ্গিত বুঝতে পারছিল। হেঁয়ালীর চেয়েও জটিল ও অবাস্তব মনে হয়। কিন্তু বিশ্বাস না করে উপায় নেই। এক অতি পুরাতন দিনের বনানীর বর্ণ-ছায়া-সৌরভের ইতিহাস স্তব্ধ হয়ে গেছে, কিন্তু তার ঝড়টুকু আজও যেন রয়ে গেছে প্রতি নিশ্বাসের আড়ালে। সারদা দেবীর কথায় কথায় তারই সাড়া ফুটে উঠছে।

সারদা দেবী বললেন—কিন্তু আমি অনুরোধ করতে পারবো না। কোন দিন পারিনি, আজ তো শ্মশানে যাবার সময় ঘনিয়ে গেল, আর কেন?

বাসন্তীর কাছে হেঁয়ালি ক্রমেই স্বাদু হয়ে উঠছে। জীবনে এধরণের কাহিনী এই প্রথম শুনলো বাসন্তী। এক পরম বিচিত্রতার আস্বাদ আছে এই কাহিনীতে। জীবনের ধর্মের একটি সব চেয়ে বড় রহস্যে ভরা সত্যের আশ্বাস আছে এই কাহিনীর মধ্যে। বাসন্তীর বিহ্বল ও বিব্রত চিন্তার মধ্যে এক নূতন শান্তির প্রসাদ ছড়িয়ে পড়ে। চাঁদ ডুবে গেলেও, তার জ্যোৎস্না যদি গাছের পাতায় লেগে থাকে, কী সুন্দর সেই দৃশ্য! কে জানে কবে সারদা দেবীর জীবনে এক আকাঙ্ক্ষিত পূর্ণিমা দেখা দিয়েই মিলিয়ে গেছে, কিন্তু সেই আলোকের বন্ধন আজও তাঁকে জড়িয়ে আছে। কে জানে কবে সঞ্জীববাবু জীবনের আকাশের এক ক্ষণিক রামধনুর উদয় দেখতে পেয়েছিলেন, আজও তাঁর সেই দেখার তৃষ্ণা মিটে যায়নি। জীবনের আঙিনায় এই হেলাফেলা খেলা করার নুড়িকেই কবে যে কখনু মুক্তা মনে করে বসে, তার ঠিক নেই।

সারদা দেবী বললেন—সঞ্জীববাবু লোকটি চিরদিনই অভিমানী। বড় ভীতু মানুষ।

বাসন্তী—কিন্তু এখন তিনি আর মোটেই ভীতু মানুষ নন। তিনি বড়লোক হয়ে গেছেন। তিনি এখন আপনার বাড়িতে আগুন লাগাতে পারেন।

সারদা—তুই দেখছি খুব রেগেছিস্ বাসু, কেন বলতো?

বাসন্তী হঠাৎ লজ্জিত হয়ে পড়লো।

সারদা বললেন—মাধুরীর বাবাকে মোটেই ভয় করি না। ভয় হয় মাধুরীকে। কি জানি, যদি মতিগতি বদ্‌লে গিয়ে থাকে, হালফ্যাসনের মেয়ে, কে জানে কি হয় শেষ পর্যন্ত।

বাসন্তী—আপনার কাছে একটা কথা বলতে এসেছিলাম জেঠীমা। রাগের কথা নয়।

— সারদা—বল।

বাসন্তী—কেশবদার ওপর মাধুরীর বাবার রাগ আছে।

সারদা—থাক্‌তে পারে।

বাসন্তী—তাই তিনি শেষ পর্যন্ত মাধুরীকে দিয়েই কেশবদাকে অপমান করাবেন।

সারদা—সে কি করে হয়? কেশবের মনের কথা কি মাধুরী জানে না?

বাসন্তী—সেইজন্যই ওঁদের সুবিধে হয়েছে।

সারদা—কিন্তু এতে তাঁদের কি লাভ হবে?

বাসন্তী—তা জানি না। কেশবদার জীবনের একটা দাবী ব্যর্থ হয়ে যাক্, তিনি তাই চাইছেন। এ ছাড়া এত শত্রুতা করার আর কি কারণ হতে পারে?

সারদা দেবীর মুখটা হঠাৎ কালো হয়ে উঠলো।—তুই ছেলেমানুষের মত কথা বলছিস্ বাসু, তবু তোর কথাগুলি একেবারে মিথ্যে নয়। কি জানি কেন এত শত্রুতা!

একটু থেমে নিয়ে যেন শোকাহত সুরে সারদা দেবী বললেন—বুঝেছি এইভাবেই তিনি শিক্ষা দিতে চান। নিজে যেভাবে ভুলেছেন, কেশবের ওপর তারি প্রতিশোধ নিয়ে তিনি বোধ হয় খুশি হতে চান।

সারদা দেবীর শুকনো বিমর্ষ ও ভীত চেহারা হঠাৎ বদ্‌লে গেল। বাসন্তীর হাত ধরে যেন অনুরোধ করলেন—তুই সত্যি খুব চালাক মেয়ে বাসু। তোকে একটা কাজ করতে হবে।

অনুরোধ নয়, সারদা দেবীর ভাষা ভঙ্গী ও আবেগ, সবই যেন হঠাৎ একটা ষড়যন্ত্রের মত হয়ে গেছে। বাসন্তী যেন এই ষড়যন্ত্রের অপর একটি আসামীর মত নির্দেশ নেবার জন্য প্রস্তুত হয়েই ছিল।

সারদা দেবী বললেন—কেশব ফিরে আসবার পর, সব ব্যাপার কেশবকে বুঝিয়ে বল্‌তে হবে।

বাসন্তী—বলবেন।

সারদা দেবী বাসন্তীর হাতদুটো ধরে একটু আদরের ভঙ্গিতে নাড়া দিয়ে বললেন—আমি আবার এসব কথা কেশবকে বলবো কি রে? সব তুই বল্‌বি।

বাসন্তী ভয়ার্তের মত বিচলিত হয়ে বললো—না জেঠীমা, আমি বলতে পারবো না। আমি বললে সব ভুল হয়ে যাবে।

(ক্রমশ)



চুরট

সুশীল রায়

আমি একটু চুরটের ভক্ত। কম খরচে চরম মৌতাতের এই একটা সহজ রাস্তা আবিষ্কার ক'রে আমি নিজেকে ধন্য মনে করতে আরম্ভ করেছি। মাঝে মাঝে সুদিন আমার আসে, হঠাৎ হয়ত গোটা কতক টাকা পেয়ে যাই। দুর্দিনের জন্যে সংস্থান রাখার কথা তখন আমি ভুলিনে। অন্য কেউ স্বীকার না করলেও, আমি আমার চরিত্রের এই বিশেষ গুণের কথা মানি। হাতের সব ক'টা টাকা ফুরিয়ে যাবার ঠিক আগের মুহূর্তে আমি এক বাক্স চুরট কিনে রাখি। আর্থিক স্বাচ্ছন্দের স্বাভাবিক উত্তেজনার মধ্যেও দিক ভুল হয় না। সেই মারাত্মক মুহূর্তটি হঠাৎ হাত ফসকে বেরিয়ে গেলে, অর্থাৎ নিয়মিতভাবে দুর্দিন এসে পড়লে, খালি হাত দিয়ে কপালে করাঘাত করা ছাড়া আর কোনো কাজ পাওয়া যেত না। কিন্তু চরিত্রের বিশেষ গুণের দরুণ শূন্য পেটে শূন্য ঘরে বসে কপালে শূন্য করের আঘাত করতে হয় না। আমি বসে বসে চুরট ফুঁকি।

এর মতো ভদ্র নেশা আর নেই। ধূমপানের জন্যে নত রকমের সামগ্রী আছে, তার মধ্যে চুরটের আভিজাত্য আলাদা। এর চেহারার মধ্যেই বনেদি গন্ধ পাওয়া যায়। নিটোল নধর এর স্বাস্থ্য, ভারিক্কে ও গুরুগম্ভীর এর চালচলন। অন্য যে প্রকারের খুসি ধূমের সঙ্গে চুরটের ধূমের তুলনা করলেই এর প্রমাণ পাওয়া যায়। কত রকমের ধূম আছে, কেউ শীর্ণ ও দুর্বল, কেউ বা ধূসর ও ধোঁয়াটে, বাতাসের সঙ্গে সামান্য সঙ্ঘর্ষেই তারা কাবু হ'য়ে যায়, ভেঙে গুঁড়ো হয়ে যায়। এদের আমি বলি ক্ষণস্থায়ী ধূম। এরা নিস্তেজ নিরীহ ও ভীত। এদের হাত-পা অসাড় যেন পক্ষাঘাতের রোগী। বাতাস দেখলেই ভয়ে জড়োসড়ো হ'য়ে পড়ে, পলকের মধ্যেই শেষ হ'য়ে যায়। কিন্তু চুরটের ধোঁয়া উগ্র, আভিজাত্যে উদ্ধত। সহজে পরাজয় স্বীকার করতে এর আত্মসম্মানে বাধে। বাতাসকে এ বিশেষ কেয়ার করে না। ধীর মন্থর-গতিতে বাতাসের উপর ভর ক'রে খানিকটা সময় উড়ে উড়ে কাটায়। এর চালচলনে সদ্বংশের একটা চটক আছে। চুরটের আমি যে ভক্ত, তার একটা কারণ এই।

অনেকে হয়ত আপত্তি তুলবেন। সামান্য তামাক পাতা জড়িয়ে পাকিয়ে সংক্ষিপ্ত একখণ্ড ছড়ির আকারে দাঁড় করালেই তা সদ্বংশজাত হ'য়ে গেলো, এ কেমন কথা। তাঁদের যুক্তি অকাট্য সন্দেহ নেই। কিন্তু তাঁরা যে দৃষ্টিকোণ থেকে দেখে বংশমর্যাদা যাচাই করেন, আমার দৃষ্টি সে কোণ থেকে নয়। তাঁরা হয়ত খানিকটা অহমিকা, কয়েক বিন্দু চটুল ফাজলামো এবং কিঞ্চিৎ হালকা বাবুয়ানা চান। তাঁরা হয়ত বাইরের ধোপ-দুরস্ত পরিচ্ছন্নতাও কিছুটা চান, ভিতরে তার যাই থাকুক না কেন।

আমি চাই বাইরের অসতর্ক ও অসাবধান জীবন, পোষাকের পারিপাট্যের অভাব। বাইরে তার রুক্ষ উগ্র চেহারা, ভিতরে তার মোলায়েম ধূম্রকুণ্ডলী—স্তরে স্তরে চিন্তার ঠাসবুনন। আমার চুরটের কত অজস্র স্তরভেদ। স্তরে স্তরে চিন্তার চেষ্টায় নিজেকে সে যেন একটি সুঠাম অবয়বে দাঁড় করিয়েছে। একটি শুভ্র খোলসে নিজের হীনতা সে ঢেকে রাখেনি। বাহির আর ভিতর তার এক প্রতিটি স্তরে তার কর্মের কাহিনী যেন নীরব ভাষায় স্তব্ধ কবিতার মতন সাজানো।

যখন দুর্দিন আর দুর্দশার মাঝে পড়ে হাবুডুবু খাই, তখন সেই দুস্তর তরঙ্গ ঠেলে জীবন নদীর কিনার খুঁজতে গিয়ে সর্বাগ্রে খোঁজ পড়ে চুরটের। আমি নির্বাক নির্লিপ্ত ভঙ্গীতে চোখ বুজে এক মনে চুরট ফুঁকি। ভাবি, কিনার একদিন পাবোই। জীবন-নদীর কিনার খুঁজতে গিয়ে এ রকমের লগি ঠেলা জীবনে প্রায়ই আসে। তাই ঠিক সহচর নয়, চুরটকে সহায় বলে বোধ হয়। কেবল জীবন নদীর উচ্ছৃঙ্খল স্রোতের মধ্যেই এর প্রয়োজনীয়তা একমাত্র উল্লেখযোগ্য ঘটনা নয়। চিন্তা-প্রবাহের মধ্যেও চুরটের প্রয়োজন অসামান্য। যাঁরা চুরটের ভক্ত, তাঁরা এ কথা নিশ্চয় জানেন।

ধোয়া ধুতি আর রেশমী চাদর পরিহিত কেউ কখনো কারো উপকারে এসেছে, ইতিহাসে এমন কোন দুর্ঘটনার কথা লেখে না। কিন্তু ইতিহাসের নীরস পাতাগুলি ওল্টালে চুরটের মত রুক্ষ ও উগ্র স্বভাবের কতজনের দেখা পাওয়া যায়, যারা অকপটচিত্তে মানবতার পরিচয় দিয়েছে। যুদ্ধক্ষেত্রে তারা হয়ত নির্মম যোদ্ধা, মানবতার ক্ষেত্রে হয়ত কোমলতম মনুষ্যত্বের দাস। তাদেরই জন্যে কত রাজত্বের বিনাশ ও বিকাশের ইতিকথা পাশাপাশি রচিত হয়েছে। লক্ষ্মীছাড়া ছন্নছাড়া মানুষের কাছে যা আশা করা যায়, লক্ষ্মীমন্ত পরিচ্ছন্ন মানুষের কাছে তা আশা করা শাস্ত্রবিরুদ্ধ। চুরট ছন্নছাড়া প্রকৃতির আত্মকেন্দ্রিক নয়, স্বার্থান্বেষী নয়। এর পরিসর বিস্তৃত ও পরিব্যাপ্ত। আমাদের ধূম্রমান পৃথিবীর ইতিহাসে সে নেপোলিয়ন। ধীরে ধীরে পাটে পাটে নানা কর্মের সংঘাতে জীবন বোনা হয়েছিল বলেই নেপোলিয়নের নাম বোনাপার্ট রাখা হয়নি। চুরটও পাটে পাটে বোনা বলেই ধূম্রজগতে তাকে নেপোলিয়নের সঙ্গে তুলনা করা হচ্ছে না। এদের দুয়ের মধ্যে চরিত্রের সাদৃশ্য জ্বলন্ত ও স্পষ্ট।

আমি অগ্নির উপাসক, রৌদ্রের ভক্ত। মোমবাতির ক্ষীণ শিখার চেয়ে জ্বলন্ত মশালই আমাকে আকর্ষণ করে বেশি। তাই

আমি চুরট এত পছন্দ করি। এর স্বাদ মিষ্টি নয়, এতে ঝাঁজ আছে। এতে শুধু উত্তাপ নয়, উত্তেজনাও আছে।

সহজ সরল স্বচ্ছন্দগতিতে জীবন-প্রবাহ চালনা করার যারা পক্ষপাতী, তাদের সঙ্গে মতের মিল আমার হয় না। বাধা আর বিপদে যে প্রবাহ পদে পদে হোঁচট খাচ্ছে, আমি সেই প্রবাহে গা এলিয়ে প'ড়ে থাকতে ভালোবাসি। জীবন-প্রবাহে শুধু জল নয়, জ্বালা থাকা চাই। মুহূর্তে মুহূর্তে প্রতিটি নিশ্বাসে চেতনা জাগ্রত রাখতে চাই—যে আমি জীবন-ধারণ করছি। আমার অজ্ঞাতে আমার জীবন যদি মরা নদীর মত চোরাবালির তলে তলে নীরবে ব'য়ে চলে যায়, তাহ'লে আমার জীবনধারণ করার তাৎপর্য রইলো কোথায়? আমি প্রতিটি মুহূর্তে জীবন-স্পন্দন অনুভব করতে চাই। এতে বাঁচার আনন্দ আছে। জীবন যেন আমাকে ধারণ না করে, আমি যেন জীবনকে ধারণ করার অধিকারী হ'য়ে উঠতে পারি, এই আমার সাধনা। উল্কার মতন সহসা জ্বলে উঠে সহসা নিভে যাওয়া আমার কাছে সহজ ব'লে বোধ হয়। সূর্যের মতো অনির্বাণ দাহ নিয়ে বাঁচবার যে গৌরব, সেই গৌরব লাভের জন্যে আমি লালায়িত। স্মরণীয় সূর্যের আমি পদাঙ্ক অনুসরণ ক'রে চলবো, মুহূর্ত-বিলাসী উল্কার অনুসরণ আমি করতে চাইনে। এই জন্যেই সহজমার্গ আমার পছন্দ নয়, বক্র কঠিন পথের আমি পথচারী।

কঠিন পথে কঠিন সঙ্গী দরকার। জীবনের এই কঙ্করময় বাঁকা রাস্তার অনুষঙ্গী ক'রেছি তাই কড়া ধাতের কুশ্রী চুরটকে। এর চেহারাই আসল ভুপর্যটকের মত। যেন কত ঘা খেয়ে, কত বাধা ডিঙিয়ে, কত বিচিত্র অভিজ্ঞতায় পোক্ত হ'য়ে একটা শক্ত কাঠামোয় নিজেকে বেঁধে রেখেছে। অল্পে কাবু হবার মত ননীর পুতুলী এ নয়। একে দেখলেই তা টের পাওয়া যায়।

যখন কোনো কারণে মন ভেঙে পড়ে, বা শরীরে অবসন্নতা আসে, তখন হাতে এক-খণ্ড চুরট নিলেই মনে যেন বল পাওয়া যায়, শরীর যেন সোজা হ'য়ে দাঁড়ায়। এত বড় সহায় পাওয়া সবার জীবনে সচরাচর ঘটে না, এদিক থেকে আপনারা আমাকে একজন সৌভাগ্যবান্ ব'লে হিংসা করতে পারেন বটে।

অনেককে দেখেছি, যাঁরা প্রচুর পরিমাণে চুরট ফোঁকেন। অনেকেই হয়ত আমার মত শস্তা চুরট খান্ না, বাছাই-করা সাচ্চা চুরট টানেন। তাঁরা চুরট খান বটে, কিন্তু খাওয়ার ধরণ দেখেই বোঝা যায় চুরটের তাঁরা মোটেই ভক্ত নন। একটা নেশা দরকার, হাতের কাছে পেয়ে গেলেন চুরট, টানতে আরম্ভ করলেন। তারপর অভ্যাসে দাঁড়িয়ে গেলো, আর ছাড়তে পারলেন না। এ-ভাবে চুরট খাওয়ার কোনো মানে হয় না। চুরট যদি খেতেই হয় তাহ'লে সর্বপ্রথম তার সঙ্গে নিজের আত্মার আত্মীয়তা ঘটিয়ে নিতে হবে। পরস্পরের মধ্যে নীরব ভাষার কথোপকথন আরম্ভ করিয়ে দিতে হবে। তা না হ'লে আর চুরট খাওয়ার সার্থকতা কি। ভাড়াটে শোক-কারীদের পাঠিয়ে শোকের অভিনয় করাবার রীতি নাকি সভ্যজগতে আছে, প্রকৃত শোক প্রকাশ এদের দিয়ে কখনই সম্ভব নয়। যাঁরা অনর্গল চুরট ফোঁকেন, বিশেষ একটা মুডের জন্যে যাঁরা চুরটের শরণাপন্ন হন না, তাঁরা চুরটের ভক্ত নন্, চুরট-বিলাসী। চুরটকে বিলাসের পণ্য হিসাবে ব্যবহার ক'রে যাঁরা জীবন টেনে চ'লেছেন, তাঁরা প্রকৃতপক্ষে চুরটের মর্যাদা নষ্ট করছেন।

মনকে মেরামত করার এ একটা মস্ত টনিক। যাদের মন নেই, হায়, তারা কেন চুরট খায় এ-কথা ভেবে পাইনে। বিরাট ব্যাঙ্ক-ম্যানেজার, ততোধিক বিরাট লক্ষ-পতির নধর হৃষ্টপুষ্ট বংশধর দামী দামী চুরট খাচ্ছেন। এর চেয়ে মারাত্মক ট্র্যাজেডি পৃথিবীতে আর হয় না। ধনী-নন্দনদের কবিতা-চর্চার সৌখিনতা তবুও বরদাস্ত করা যায়, কিন্তু তাঁদের চুরট খাওয়া কিছুতেই অনুমোদন করা চলে না। তাঁদের বিলাসের সামগ্রী অনেক আছে, যে-সব জিনিসের ধারে-কাছে পৌঁছবার সাধ্য আমাদের নেই, তাঁরা সেই সব নিয়ে তুষ্ট থাকলেই সবাই রক্ষে পায়। কিন্তু সেই ধনবানেরা মনবানদের এলাকায় ট্রেসপাস্ কেন করেন বোঝা শক্ত। এটা তাঁদের অভিলাষ নয়, বিলাস মাত্র।

চুরট আমার কাছে বিলাসের জিনিস যে নয়, এতক্ষণের কথাবার্তায় আপনারা নিশ্চয় তা বুঝতে পেরেছেন। চুরট আমার সহায় ও সঙ্গী। কতদিন কত ধূসর সন্ধ্যায় দাঁতে নিভন্ত চুরট চেপে ধ'রে মানসিক উত্তেজনায় সারা ঘরময় পায়চারী ক'রে ঘুরে বেড়িয়েছি। চুরটের উগ্র ধূমের বদলে উগ্র রস পান ক'রে বুকে জ্বালা ধরিয়েছি। চুরটের জ্বালাময় সেই উদগ্র রস যে মনের পক্ষে এত হিতকর আগে বুঝিনি। ধীরে ধীরে মনের উত্তেজনা নিভে এসেছে। আরাম কেদারায় আরাম ক'রে ব'সে নিভন্ত চুরট পুনরায় জেলে একমনে ধোঁয়া ছেড়েছি আর ঝুলন্ত বাল্বের আলোয় সেই ধূম্রকুণ্ডলীর চঙ্ক্রমণ লক্ষ্য ক'রেছি একা একা ব'সে। সময় কত সহজে কেটে গেছে।

চুরটের এমন মন-হিতকর কাজের খবর ক'জন রাখে? ঢাক পিটিয়ে নিজের কীর্তি জাহির যারা করে, তারা কৃতী ও কীর্তিমান। আমার চুরট নীরবকর্মী।

শুক্লা উর্বশী

শ্রীবিমলচন্দ্র ঘোষ

শুক্লপক্ষের কন্যা তুমি চন্দ্রলোকের সুধা
বক্ষে তোমার ছন্দে গাঁথা অশ্রু-মোতির মালা
পিকের পাখার নম্র-হাওয়ায় দোলে!
        হে সুন্দরী,
চোখের মণি জ্বলছে তোমার শুকতারাটির মতো
স্বপ্নে দেখা অনেক দূরের স্মরণ-আকাশ জুড়ে
মর্মগিরির রক্তশিখর চূড়ে।
        হে কল্যাণি,
নীরব রাতে অস্ফুট কোন্ সাত সাগরের বাণী
শোনাও আমায় জুঁই-ফোটানো আলোর কুঞ্জবনে
রাত-জাগানো তরঙ্গিনীর সুরে।
        হে অপ্সরা,
বিশ্বে ছন্দ-সরস্বতীর আদিম জন্মদিনে,
রোমাঞ্চিত কৌতূহলের বিপুল বিস্ময়েতে
যে সুর তুমি বাজিয়েছিলে বিশ্ববীণার তারে
সকল কাব্য জন্মেছিল আদিম সে ঝঙ্কারে।

লক্ষ যুগের সাগর বেয়ে আবার কিগো তুমি
ঋতুর নাট্যমন্দিরেতে সুরের ঐকতানে
মর্তে এলে নূপুর-ঝঙ্কারিণী?
        লাস্যে তব
পাদপ্রদীপের বহ্নিশিখা কাঁপছে অভিনব
নীলাঞ্চলের চপল হাওয়ার পরশ লেগে লেগে
মেঘের ফাঁকে মৃগাঙ্ক রয় জেগে।
        হে উর্বশী,
তোমার দ্রুত নৃত্যতালে উল্কা পড়ে খসি'
দারুণ ব্যথায় গ্রহের পাঁজর তনুর বাঁধন ভাঙি'
ক্ষণপ্রভার ছড়ায় দ্যুতি হঠাৎ আকাশ রাঙি'।

সাপ্তাহিক সংবাদ

দেশী সংবাদ

১৮ই জুলাই—রাষ্ট্রপতি মৌলানা আজাদ সিমলা হইতে কলিকাতা প্রত্যাবর্তন করিয়াছেন।

প্রিভি কাউন্সিলের জুডিসিয়াল কমিটি গভর্নমেণ্ট বনাম শিবনাথ ব্যানার্জি ও অপর কয়েক ব্যক্তির আপীল মামলার রায়ে বলিয়াছেন যে, শ্রীযুত শিবনাথ ব্যানার্জি ও শ্রীযুত ননীগোপাল মজুমদারকে আটক রাখার আদেশ অবৈধ হইয়াছে।

পণ্ডিত নেহরু এক সাংবাদিক সম্মেলনে বক্তৃতা প্রসঙ্গে প্রদেশসমূহে কংগ্রেস গভর্নমেণ্ট গঠন বর্তমান সময়ে উপযুক্ত নহে বলিয়া মত প্রকাশ করেন এবং সিমলা সম্মেলনে লীগের দাবীর প্রসঙ্গে মিঃ জিন্নার মধ্যযুগীয় চিন্তাধারার নিন্দা করেন।

মিঃ জিন্না অদ্য বোম্বাইয়ের পথে দিল্লী অতিক্রমকালে কতিপয় মুসলমান কৃষ্ণপতাকা লইয়া তাঁহার বিরুদ্ধে বিক্ষোভ প্রদর্শনের চেষ্টা করে।

স্বীকারোক্তি আদায়ের জন্য দুইজন গ্রামবাসীর শরীরে তপ্ত তৈল ও জল ঢালিয়া, তাহাদের একজনের মৃত্যু ঘটাইবার অপরাধে জব্বলপুরের জনৈক সাব-ইনস্পেক্টর, একজন হেড কনস্টেবল ও তিনজন কনস্টেবল গ্রেপ্তার হইয়াছে।

প্রয়োজন বিবেচনা করিলে আসামে একটি কংগ্রেসী মন্ত্রিমণ্ডল গঠনের জন্য কংগ্রেসের হাইকম্যাণ্ড আসামের ভূতপূর্ব প্রধানমন্ত্রী এবং আসাম ব্যবস্থা পরিষদে কংগ্রেস দলের নেতা শ্রীযুত গোপীনাথ বরদলৈকে ক্ষমতা দিয়াছেন।

গান্ধীজী অদ্য সেবাগ্রামে উপনীত হইয়াছেন।

নাটোরে মৎস্যাভাব চরমে পৌঁছিয়াছে। গতকল্য এখানে এক একটি ইলিস মাছ ৭, টাকা দরে বিক্রয় হইয়াছিল।

কাঁথির ১৯৪২ সালের আন্দোলন সম্পর্কিত ভগবানপুর থানা আক্রমণ মামলায় বিচারক ১৯ জনকে সশ্রম কারাদণ্ড ও ১৬ জনকে মুক্তি দিয়াছেন।

১৯শে জুলাই—ভারত সরকারের রেশনিং এডভাইসর মিঃ কারবি ঘোষণা করিয়াছেন যে, ভারতের খাদ্য কণ্ট্রোল ও রেশনিং যুদ্ধের পরেও ৩ বৎসর হইতে ৫ বৎসর পর্যন্ত চালু রাখিতে হইবে।

ওয়ার্ধাগঞ্জে মহাত্মা গান্ধী আশ্রমবাসীদিগকে বলেন, সিমলা সম্মেলন ব্যর্থ হইয়াছে বলিয়া নৈরাশ্যের কারণ নাই। নিজেদের শক্তি বৃদ্ধি করা এবং জনসাধারণের সেবা করার জন্য আপনাদিগকে অদম্য উৎসাহের সহিত গঠনমূলক ও অন্যান্য জাতীয় কার্যকলাপ চালাইয়া যাইতে হইবে।

কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির ও ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের অফিস স্বরাজভবনে খোলা হইয়াছে।

২০শে জুলাই—সরকারীভাবে ঘোষণা করা হইয়াছে যে, আগামী ১লা ও ২রা আগস্ট বড়লাট নয়াদিল্লীতে প্রাদেশিক গভর্নরদের এক সম্মেলন আহ্বান করিয়াছেন।

আগামী বড়দিনের ছুটিতে অথবা ইস্টারের ছুটিতে সুদীর্ঘ পাঁচ বৎসর পর সর্বভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের প্রকাশ্য অধিবেশন অনুষ্ঠিত হওয়ার সম্ভাবনা আছে বলিয়া রাষ্ট্রপতি আজাদ ব্যক্ত করিয়াছেন।

কংগ্রেস মহল আশা করিতেছেন যে, আগামী ছয় হইতে আট সপ্তাহের মধ্যেই নিখিল ভারত রাষ্ট্রীয় সমিতির অধিবেশন হইবার সম্ভাবনা আছে।

১৯৪২ সালের আগস্ট হাঙ্গামা সম্পর্কে মাদ্রাজ গভর্নমেণ্ট এক ইস্তাহারে অন্ধ্র কংগ্রেস কমিটির সার্কুলার বলিয়া যাহার উল্লেখ করিয়াছিলেন, কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির সদস্য ডাঃ পট্টভি সীতারামিয়া গত রাত্রে এক সভায় ঘোষণা করেন যে, অন্ধ্র কংগ্রেস কমিটির উক্ত সার্কুলার তাঁহারই রচনা।

২১শে জুলাই—শ্রীনগরের সংবাদে প্রকাশ, গতকল্য পাহাল গ্রামে এক বিরাট জনসভায় পণ্ডিত নেহরু সিমলা সম্মেলনের প্রসঙ্গ উল্লেখ করেন। তিনি বলেন যে, স্বাধীনতা অর্জনই ভারতের সমস্যা; হিটলারের পক্ষে যেমন ইউরোপের বিজিত জাতিসমূহের স্বাধীনতাস্পৃহা দমন করা সম্ভব হয় নাই, তেমনই চার্চিলের পক্ষেও কংগ্রেস ও গান্ধীজীকে ধ্বংস করা সম্ভব হইবে না।

২২শে জুলাই—গত রবিবার দেশপ্রিয় যতীন্দ্রমোহনের দ্বাদশ স্মৃতিবার্ষিকী অনুষ্ঠিত হইয়াছে।

প্রকাশ যে, আগস্ট হাঙ্গামা হইতে উদ্ভূত মামলা সম্পর্কে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত সমস্ত ব্যক্তির প্রাণদণ্ড স্থগিত রাখিবার অনুরোধ জানাইয়া মহাত্মা গান্ধী বড়লাট লর্ড ওয়াভেলের নিকট পত্র প্রেরণ করিয়াছেন।

সিটি কলেজ ও কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ল' কলেজের বিশিষ্ট ব্যায়ামশিক্ষক শ্রীযুত রাজেন্দ্র গুহঠাকুরতা কলেরা রোগে আক্রান্ত হইয়া ২১শে জুলাই প্রাণত্যাগ করিয়াছেন।

২৩শে জুলাই—মিঃ রফি আমেদ কিদোয়াই এক সাক্ষাৎকার প্রসঙ্গে বলেন যে, কমিউনিস্টদিগকে কংগ্রেসে স্থান দিলে উহার পরিণাম আত্মবিনাশতুল্য হইবে

মৌলানা আবুল কালাম আজাদ ও পণ্ডিত জওহরলাল নেহরুকে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় যথাক্রমে ১৯৩৫ ও ১৯৩৬ সালের কমলা লেকচার দিতে অনুরোধ করিয়াছেন। মৌলানা আজাদের বক্তৃতার বিষয় 'মুসলিম ও ভারতীয় সংস্কৃতির সমন্বয়' এবং পণ্ডিত নেহরুর বক্তৃতার বিষয় 'ভারত আবিষ্কার'।

চাঁদপুরের সংবাদে জানা যায়, ২ হাজার বস্তা পচা আটা তথাকার অসামরিক সরবরাহের গুদামে পড়িয়া আছে। এবং ফেরী ঘাটের নিকটে খোলা জায়গায় প্রায় ৫ শত বস্তা ঐ শ্রেণীর আটা ফেলিয়া রাখা হইয়াছে। তাহা হইতে গন্ধ বাহির হইতেছে।

বিদেশী সংবাদ

১৮ই জুলাই—অদ্য টোকিও এলাকায় ৫০০ পোতবাহিত বিমান আক্রমণ চালায় এবং প্রতি ঘণ্টায় ১৫০০ টন গোলা বর্ষিত হয়।

হিটলার তাঁহার নব-বিবাহিতা পত্নী সহ আর্জেণ্টাইনে অবস্থান করিতেছেন বলিয়া যে সংবাদ রটিত হইয়াছিল, আর্জেণ্টাইনের পররাষ্ট্র-সচিব তাহার সত্যতা অস্বীকার করিয়াছেন।

চীনের পিপলস্ পলিটিক্যাল কাউন্সিলে জাপ সম্রাট হিরোহিতোকে যুদ্ধাপরাধী বলিয়া ঘোষণার জন্য এবং বৃটেন, রুশিয়া ও ফ্রান্সের সহিত চীনের বিশ বৎসরের জন্য মৈত্রী-চুক্তির আলোচনা চালাইবার জন্য অনুরোধ করিয়া একটি প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে।

১৯শে জুলাই—হ্যালিফাক্সস্থিত কানাডিয়ান নৌবাহিনীর অস্ত্রাগারে উপর্যুপরি কয়েকবার বিস্ফোরণ ঘটে।

যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিনিধি সভায় মিসেস্ ক্লেয়ার বুথ লুস সিমলা সম্মেলন সম্পর্কে বলেন,—"ধর্মের ভিত্তিতে রাজনীতিক দল বিভাগ করা উচিত নহে, গণতন্ত্রের ইহাই নীতি। সিমলা সম্মেলনের ব্যর্থতা এই সহজ ও সরল সত্যটিকে প্রকাশ করিয়াছে যে, কংগ্রেস ঐ গণতান্ত্রিক নীতিতে অটল এবং মুসলিম লীগ উহার বিরোধী।"

২০শে জুলাই—লণ্ডনে এসোসিয়েটেড প্রেস অব আমেরিকার এক সংবাদে বলা হইয়াছে যে, ভারতের অবস্থা ভাল হইবার পর পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু ইংলণ্ড ও আমেরিকা পরিদর্শন করিবেন।

জাপানের পাঁচটি শহরে পুনরায় বিমানহানা চলিয়াছে।

মিত্রশক্তির দখলীকার কর্তৃপক্ষ ইতালীতে যে-সকল ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়াছেন, উহার প্রতিবাদে উত্তর ইতালীর নানা স্থানে রাজনৈতিক বিশৃঙ্খলা দেখা দেয় ও ধর্মঘট শুরু হয় বলিয়া জানা গিয়াছে।

চীনা সৈন্যেরা ফুকিয়েন শহর অধিকার করিয়াছে।

ইরানে অবস্থিত বৃটিশ ও সোভিয়েট বাহিনী আপাতত আরও কিছুকাল অবস্থান করিবে বলিয়া জানা গিয়াছে।

মার্কিন প্রতিনিধি পরিষদের রিপাবলিকান সদস্য মিঃ হুবার্ট এলিস ঋণ ও ইজারা প্রথা অবিলম্বে রহিত করার আবশ্যকতা বিবৃত করিয়া বলেন যে, এই ব্যবস্থায় যুক্তরাষ্ট্রের নিকট হইতে অন্যান্য জাতিবৃন্দ সুবিধালাভ করিতেছে।

সিঙ্গাপুরের সহিত জাপানীদের যোগসূত্র প্রায় বিচ্ছিন্ন করিয়া দেওয়া হইয়াছে বলিয়া জনৈক বৃটিশ নৌ-বিভাগীয় মুখপাত্র সংবাদ দিয়াছেন। সিঙ্গাপুর এক সাঁড়াশী অভিযানের মুখে পড়িয়াছে।

এইরূপ সংবাদ পাওয়া গিয়াছে যে, মিশরীয় রাজনৈতিক মহল মিঃ জিন্নার মনোভাবের জন্য দুঃখিত। তাঁহাদের অভিমত এই যে, মিঃ জিন্নাকে বাদ দিয়াই বৃটিশ গভর্নমেণ্টের অস্থায়ী গভর্নমেণ্ট গঠন করা উচিত ছিল।

২১শে জুলাই—বৃটিশ সৈন্যের সহিত আলাপ ও পরিহাস করার জন্য জার্মাণগণ শত্রুর সহিত সহযোগিতার তুল্য ব্যবহারের অনুরূপ উপায়ে কতিপয় জার্মাণ কুমারীর মাথা মুড়াইয়া দিয়াছে।

২২শে জুলাই—রোমের পুরাতন জেল রেজিণা কোয়েলিতে কয়েদীদের বিদ্রোহ চলিতেছে। দুই সহস্র কয়েদী পলায়নের চেষ্টা করে।

২৩শে জুলাই—গত সপ্তাহের শেষভাগে আমেরিকান অধিকৃত জার্মানীতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ৫ লক্ষ সৈন্য ৮০ হাজারেরও অধিক লোককে গ্রেপ্তার করিয়াছে।

প্যারিসে ইতিহাসপ্রসিদ্ধ প্যালেস দি জাস্টিশ আদালতভবনে দেশের আভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা ক্ষুণ্ণ করার ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হওয়া এবং শত্রুর চরের কার্য করা—এই দুই অভিযোগে ফ্রান্সের ৮৯ বৎসর বয়স্ক মার্শাল ভার্দুন-বিজয়ী বীর ফিলিপ পেতাঁর বিচার আরম্ভ হইয়াছে।

শ্রীরামপদ চট্টোপাধ্যায় কর্ত্তৃক ৫নং চিন্তামণি দাস লেন, কলিকাতা, শ্রীগৌরাঙ্গ প্রেসে মুদ্রিত ও প্রকাশিত।
স্বত্বাধিকারী ও পরিচালক:—আনন্দবাজার পত্রিকা লিমিটেড, ১নং বর্ম্মণ স্ট্রীট, কলিকাতা।

দেশ

সম্পাদক ঃ শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র সেন সহকারী সম্পাদক ঃ শ্রীসাগরময় ঘোষ

১২ বর্ষ] শনিবার, ১৯শে শ্রাবণ, ১৩৫২ সাল। Saturday, 4th August, 1945 [৩৯শ সংখ্যা

সাময়িক প্রসঙ্গ

শ্রমিক দলের জয়

বিলাতের সাধারণ নির্বাচনে শ্রমিক দল জয়লাভ করিয়াছেন। ইংলণ্ডের ইতিহাসে সত্যই এই ব্যাপারকে বিপর্যয়কর ঘটনা বলিয়া উল্লেখ করা যায়; কারণ, বিলাতের কোন নির্বাচনে তথাকার শ্রমিক দল এরূপ বিপুল ভোটাধিক্যে জয়লাভ করিতে সমর্থ হয় নাই এবং অন্য দল হইতে নিরপেক্ষভাবে শাসন ব্যাপারে নিজেদের নীতি সুনিয়ন্ত্রিত করিতে সুযোগ লাভ করে নাই। সুতরাং শ্রমিক দলের এই সাফল্য একরূপ অভাবনীয় বলা চলে। বিলাতের সাধারণ নির্বাচনে শ্রমিক দলের এই সাফল্যে ভারত সম্পর্কে ব্রিটিশনীতির কিরূপ প্রতিক্রিয়া ঘটিবে, এ সম্বন্ধে নানারূপ জল্পনা ও কল্পনা, আশা ও নৈরাশ্যের দ্বন্দ্বে রাজনীতিক মহলের চিত্তকে আবর্তিত করিতেছে। কেহ কেহ এমন সম্ভাবনাও



চার্চিল

প্রকাশ করিতেছেন যে, ছয় মাসের মধ্যেই ভারতবর্ষ ঔপনিবেশিক স্বায়ত্তশাসনের অধিকার লাভ করিবে। আমাদের নিজেদের দিক হইতে আমরা এইরূপ উল্লসিত হইবার কোন কারণ দেখি না। একথা সত্য যে, নির্বাচনের ফলে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদী দলের মদান্ধ নেতা চার্চিল ব্রিটিশের শাসন-নীতি নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্র হইতে অপসারিত হইয়াছেন এবং ভারতের স্বাধীনতার শত্রু আমেরী ধিকৃত এবং বিতাড়িত হইয়াছেন। সেই সঙ্গে সাম্রাজ্যবাদী সংরক্ষণশীল দলের বিশিষ্ট শ্রেণীর যে সব নেতা চার্চিল-আমেরী দলের সমর্থক এবং পৃষ্ঠপোষকস্বরূপে ব্রিটিশ মন্ত্রিমণ্ডলে বিরাজিত ছিলেন, বিপুল পরাজয়ের গ্লানিতে তাঁহারা অনেকেই আজ বিমলিন হইয়াছেন এবং সংরক্ষণশীল দলের গরিমার বাতি অকস্মাৎ যেন আঁধার রাত্রিতে আচ্ছন্ন হইয়াছে; এইভাবে উপরে উপরে দেখিতে অবস্থা অবশ্য খুবই আশাপ্রদ মনে হয়; কিন্তু সেই সঙ্গে ইহাও বিবেচনা করিতে হইবে যে, বিলাতের এই নির্বাচনে ভারত সম্পর্কিত ব্রিটিশ-নীতি মুখ্য বিবেচনার বিষয় ছিল না। মিঃ বেভিন, সোরেনসেন প্রভৃতি ব্রিটিশ শ্রমিক দলের যেসব নেতা আমেরীর ভারত সম্পর্কিত নীতির বিরোধী ছিলেন। তাঁহারা সকলেই বিপুল ভোটাধিক্যে প্রতিপক্ষ সংরক্ষণশীলদের প্রধান পুরুষগণকে পরাজিত করিয়া নির্বাচিত হইয়াছেন; ইহা উপলক্ষ্য করিয়া কেহ কেহ আমাদিগকে অনেক আশার কথা শুনাইতেছেন; কিন্তু উক্ত শ্রমিক নেতারা কেহই নির্বাচনদ্বন্দ্বে ভারতের স্বাধীনতার প্রশ্ন লইয়া অবতীর্ণ হন নাই। বিলাতের নির্বাচনে একজন মাত্র ভারতের প্রশ্নকে অনেকটা মুখ্যভাবে গ্রহণ করিয়াছিলেন। আমরা মিঃ পামি দত্তের কথা বলিতেছি। ইনি ভারতসচিব মিঃ আমেরীর সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় দাঁড়াইয়াছিলেন এবং বাঙলার দুর্ভিক্ষের জন্য মিঃ আমেরীর ভারত সম্পর্কিত নীতিকেই দায়ী করিয়াছিলেন। সংরক্ষণশীল দলের ভারত সম্পর্কিত নীতি যদি বিলাতের জনগণের চিত্তে কোনরূপ বিক্ষোভের কারণ সৃষ্টি করিত, তবে মিঃ পামি দত্ত নিশ্চয়ই নির্বাচিত হইতেন; কিন্তু আমেরী শ্রমিক দলের সদস্য মিঃ শ্রুমারের কাছে পরাজিত হইলেও মিঃ পামি দত্ত এত কম ভোট পাইয়াছেন যে, তাঁহার জমার টাকা পর্যন্ত বাজেয়াপ্ত হইয়াছে। ইহা হইতে ইহাই প্রতিপন্ন হয় যে, দুর্ভিক্ষজনিত ভারতের বিশেষভাবে বাঙলার লক্ষ লক্ষ নরনারীর শোচনীয় মৃত্যু ব্রিটিশ জনসাধারণের মনে কোন চাঞ্চল্য সৃষ্টি করিতে পারে নাই এবং ভারতের পক্ষ লইয়া যিনি ব্রিটিশ-নীতির এই নির্মমতাকে উন্মুক্ত করিয়াছিলেন এবং তাহার বিরুদ্ধতা করিতে দাঁড়াইয়াছিলেন, ইংলণ্ডের জনসাধারণ তাঁহাকে সমর্থন করিবার মত মানবতায় অনুপ্রাণিত হয় নাই; প্রকৃতপক্ষে বর্তমান নির্বাচনেও ব্রিটিশ জাতি নিজেদের স্বার্থকেই বড় করিয়া দেখিয়াছে। অবশ্য এই নির্বাচন পরোক্ষভাবে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে উদারতার প্রতিবেশ সৃষ্টিতে



এটলী

সাহায্য না করিতে পারে, এমন কথা আমরা বলিতেছি না; কিন্তু প্রত্যক্ষভাবে ব্রিটিশ জাতির স্বার্থবুদ্ধির দ্বারাই ইহা পরিচালিত হইয়াছে। শ্রমিক দল জয়লাভ করিলে ব্রিটিশ জনসাধারণের স্বার্থ সমধিক ব্যাপকভাবে পরিপুষ্ট হইবে; তাঁহারা দুর্গত জনসাধারণের আর্থিক অবস্থার উন্নতি সাধনের জন্য পুঁজিপতিদের সংকীর্ণ দৃষ্টি

পরিত্যাগ করিয়া কর্মোদ্যমে অবতীর্ণ হইবেন, ব্রিটিশ জনসাধারণ বিশেষভাবে শ্রমিক ও মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়, এই সত্য অন্তরে একান্তভাবে উপলব্ধি করিয়া একযোগে তাঁহাদের পক্ষে ভোট দিয়াছে। শ্রমিক দলের কর্মনীতির আর্থিক পরিকল্পনাই তাঁহাদের বিজয়লাভে বিশেষভাবে সাহায্য করিয়াছে। তাঁহাদের সেই পরিকল্পনার কার্যক্রম ভারতের স্বাধীনতার পক্ষে বস্তুত কতটা সহায়ক হইবে, এ বিষয়ে আমাদের মনে সম্পূর্ণই সন্দেহ রহিয়াছে; কারণ, ব্রিটিশের রপ্তানি বাণিজ্য বৃদ্ধির উপরই সেই পরিকল্পনার সাফল্য প্রধানভাবে নির্ভর করিতেছে। এবং বাণিজ্য সম্প্রসারণ-সূত্রে শোষণ যে শাসন-নীতিরই অঙ্গ, তাহা যে সাম্রাজ্যবাদ ব্যতীত অন্য কিছু নয়, এ সম্বন্ধে আমাদের যথেষ্টই অভিজ্ঞতা রহিয়াছে। ভারতবর্ষ ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের কামধেনুস্বরূপ; শ্রমিক দল নিজেদের হাতে ক্ষমতা লাভ করিয়া সেই কামধেনুকে দোহন করিবার সুযোগ যে স্বেচ্ছায় পরিত্যাগ করিবেন, আমরা ইহা বিশ্বাস করিয়া উঠিতে পারি না। এই দিক হইতে সংরক্ষণশীল এবং শ্রমিক এই দুই দলের দৃষ্টি আমরা একই বলিয়া মনে করি।

শ্রমিক দলের প্রতিশ্রুতি

ব্রিটিশ শ্রমিক দল জয়লাভ করিয়াছে; সুতরাং ভারতের দুঃখনিশি পোহাইল, 'দাও করতালি জয় জয় বলি।' যাঁহারা আনন্দে অধীর হইয়া এই ধরণের বড় বড় কথা বলিতেছেন, প্রকৃতপক্ষে তাঁহাদের দাসমনোবৃত্তি এবং তজ্জনিত চিত্তের দৈন্য দেখিয়া আমরা অন্তরে দুঃখই অনুভব করি। বস্তুতঃ ব্রিটিশ শ্রমিক দলের মতি এবং প্রকৃতি তাঁহারা জানেন না। অপর জাতিকে শোষণ করিয়া নিজের জাতিকে পোষণের দৃষ্টিতে বিলাতের সংরক্ষণশীল এবং শ্রমিকে কোন পার্থক্যই নাই। সামরিক বিপর্যয়ের 'পর দেশের লোকের পোষণ এবং তজ্জন্য অপরকে শোষণের আগ্রহ ব্রিটিশের স্বার্থ-বুদ্ধির পাকে সর্বাধিক উগ্র হইয়া উঠিবে, ইহাই স্বাভাবিক। দেখা যাইবে, শ্রমিক দলের নেতারা এইদিকে ফাঁক রাখিয়াই তাঁহাদের নির্বাচন-সম্পর্কিত যত রকম প্রতিশ্রুতি প্রদান করিয়াছেন। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের এলাকাধীন কোন দেশকে তাঁহারা স্বাধীনতা দান করিবেন, এমন কথা কেহই বলেন না। ভারতের সম্পর্কে তাঁহারা বিশেষ সতর্কতার সঙ্গে এই সম্বন্ধে স্বীকৃতি এড়াইয়া গিয়াছেন। নির্বাচনে জয়লাভ করিবার পরও তাঁহারা ভারতের স্বাধীনতার কথাটা কেহ ঘুণাক্ষরে উচ্চারণ করিতে সাহসী হইতেছেন না। প্রধানমন্ত্রী মিঃ এটলী হইতে আরম্ভ করিয়া বর্তমান পররাষ্ট্র সচিব বেভিন, ভূতপূর্ব সহকারী ভারতসচিব লর্ড লিস্টোয়েল ইঁহারা সকলেই সিমলা সম্মেলনের প্রচেষ্টার মধ্যেই ঘুরাইয়া ফিরাইয়া কথা বলিতেছেন। আলোচনা আরও চালান হইবে, মীমাংসার জন্য চেষ্টা চলিবে, তাঁহাদের সকলেরই কথা এই পর্যন্ত; কিন্তু আমাদের মতে ইঁহাদের এই সব সদিচ্ছার কোন অর্থই হয় না এবং ধাপ্পাবাজি ছাড়া এসব আর কিছুই নয়। কারণ, সিমলা সম্মেলন যদি ব্যর্থ হইয়া থাকে, তবে ভারত সম্পর্কে ব্রিটিশের সাম্রাজ্যবাদমূলক সংকীর্ণ নীতির ফলেই তাহা ঘটিয়াছে। গণতান্ত্রিক নীতির মর্যাদা তাঁহারা রাখেন নাই এবং বুঝিয়া সুঝিয়াই ব্রিটিশ সংরক্ষণশীল দল মিঃ জিন্নার একান্ত অন্যায় দাবীকে প্রশ্রয় দিয়াছেন। এ সম্বন্ধে তাঁহারা জ্ঞানপাপী। সে পাপের বোঝা শ্রমিক দল সোজাসুজি ঘাড় হইতে নামাইতে প্রস্তুত আছেন কি? মিঃ জিন্নার মুষ্টিমেয় অনুরাগী দলের অন্যায় জিদকে উপেক্ষা করিয়া তাঁহারা ভারতের সকল দল এবং সকল সম্প্রদায়ের দাবী স্বীকার করিয়া লইতে পারিবেন কি না, আমরা তাঁহাদিগকে এই প্রশ্নই জিজ্ঞাসা করিতেছি। প্রকৃতপক্ষে এ পর্যন্ত তাঁহারা এ সম্বন্ধে নীরব রহিয়াছেন। আমরা ইহা সুলক্ষণ বলিয়া মনে করি না।

আশার মাত্রা

বিলাতের নূতন শ্রমিক দলের গভর্নমেন্টে এ পর্যন্ত ভারতসচিবের পদ শূন্য রহিয়াছে। শুনিতেছি, ভারতসচিবের পদটি তুলিয়া দেওয়া হইবে এবং ভারতের ব্যাপার পরিচালনার ভার উপনিবেশ বিভাগের উপর ন্যস্ত হইবে। শ্রমিক দলের অন্যতম নেতা বর্তমান মন্ত্রী মিঃ বেভিন নির্বাচনের পূর্বে এমন কথা বলিয়াছিলেন। কিন্তু ইন্ডিয়া অফিসের পরিবর্তে উপনিবেশ বিভাগের আফিসে ভারতের কর্তৃত্ব স্থানান্তরিত করা হইলেই ভারতের সমস্যার সমাধান হইবে না। মিঃ জর্জ বার্নার্ড শ' এ সম্বন্ধে সত্যই বলিয়াছিলেন যে, ইহাতে রাস্তার এ-ধার হইতে ভারতের ব্যাপার ও-ধারে লওয়া হইবে মাত্র। ভারতের কর্তৃত্ব-নিয়ন্ত্রণে ভারতবাসীরা বিদেশীর প্রভাব হইতে মুক্ত অবাধ ক্ষমতা পাইবে কি না, ইহাই হইতেছে প্রশ্ন এবং শ্রমিক মন্ত্রিমণ্ডলীর গুণ-দোষের বিচার ভারতবাসীরা এইদিক হইতেই করিবে। ইন্ডিয়া অফিসের পরিবর্তে উপনিবেশ বিভাগের হাতে ভারতের ব্যাপারের ভার দিবার প্রশ্নে ইতিমধ্যেই নাকি আইন সম্পর্কিত সমস্যা দেখা দিয়াছে; কারণ ভারতবর্ষ ওয়েস্টমিনস্টার বিধান অনুসারে অধিকার পায় নাই। এইভাবে গড়িমসি করিয়া প্রশ্নটা চাপা দিবার চেষ্টা হইতেছে। আমরা বেশই বুঝিতেছি, অন্যান্য ক্ষেত্রেও শ্রমিক দলপতিদের সুর ক্রমেই ঘুরিয়া যাইবে এবং তাঁহাদের ভারত সম্পর্কিত নীতি কার্যত চার্চিলের নীতির সঙ্গে গিয়াই মিশ খাইবে। দেখিতেছি, ভারতের রাজনীতিক বন্দীদিগকে এখনও মুক্তিদান করা হইতেছে না। নিখিল ভারত রাষ্ট্রীয় সমিতির উপর নিষেধাবিধি এখনও বলবৎ রহিয়াছে। কংগ্রেস আন্দোলন এখনও সরকারী বাধা-নিষেধ হইতে মুক্ত নয়। আমলাতান্ত্রিক শাসনের নীতির অসংযত স্পর্ধায় জাতির অধিকার প্রতিষ্ঠার উদ্যম এখনও পিষ্ট হইতেছে। সীমান্ত-নেতা খান আব্দুল গফুর খানের প্রতি আটক জেলার কর্তৃপক্ষের আচরণে ইহা উন্মুক্ত হইয়াছে। শ্রমিক দল এই সব দিক হইতে ভারতের সম্পর্কে কিরূপ নীতি অবলম্বন করেন, আপাতত সমগ্র ভারতের দৃষ্টি সেই দিকে আকৃষ্ট রহিয়াছে। ইহা ছাড়া অতিরিক্ত কিছু আমরা আশা করিয়া উঠিতে পারিতেছি না। কারণ, আমরা অন্তরে ইহা স্থির বুঝিয়া লইয়াছি যে, পূর্ণ স্বাধীনতার অধিকার আমাদের নিজেদের শক্তিতেই অর্জন করিতে হইবে এবং দাতব্য হিসাবে ব্রিটিশ জাতির কোন দলের নিকট হইতেই আমরা তাহা পাইব না।

শ্বেতাঙ্গদের ভারত সেবা

সম্প্রতি বিলাতের ইস্ট ইন্ডিয়া এসোসিয়েশনের এক সভায় কলিকাতার শ্বেতাঙ্গ বণিক সভার সভাপতি মিঃ সি পি লসন শ্বেতাঙ্গ বণিকদের ভারতসেবার মহিমা কীর্তন করিয়া একটি বক্তৃতা দিয়াছেন। বক্তা অনুনয়ের সুরে ভারতবাসীদিগকে উদ্দেশ করিয়া বলিয়াছেন, আমরা শ্বেতাঙ্গ বণিকেরা ন্যায্য যেটুকু অধিকার তাহাই চাই; অতিরিক্ত কিছু কামনা করি না। ভারতের জন্য তাঁহাদের অকৈতব সেবাপ্রবৃত্তির প্রশস্তি গাহিয়া তিনি বলেন, ভারতের ইংরেজ সমাজ আগাগোড়া স্বায়ত্তশাসনাধিকার লাভের পক্ষে ভারতের অগ্রগতিকেই সর্বপ্রযত্নে সাহায্য করিয়াছে। মিঃ লসনের সঙ্গে আমরা তর্কে অবতীর্ণ হইতে চাহি না; সম্ভবত ভারতবাসীদিগকে উদ্দেশ করিয়া তিনি এই সব কথা বলিলেও সভায় ভারতবাসী কেহ ছিল না। কারণ, তাহা হইলে অন্তত লজ্জার খাতিরে, এমন কথা বলা তাঁহার পক্ষে সম্ভব হইত না। দূর অতীতের কথা আমরা ছাড়িয়াই দিলাম, আধুনিক ভারতের শাসনতান্ত্রিক ইতিহাসের সম্বন্ধে যাঁহাদের কিছুমাত্র অভিজ্ঞতা আছে, তাঁহারাই জানেন, ভারতের রাজনীতিক অধিকার সম্প্রসারণের যখনই কোন উদ্যম হইয়াছে, স্বার্থের তাড়নায় অন্ধ

হইয়া ভারত প্রবাসী শ্বেতাঙ্গ সমাজ সর্বপ্রকারে তাহাতে অন্তরায় সৃষ্টি করিয়াছেন। আমরা বাঙালী, এ সম্বন্ধে আমরা সর্বাপেক্ষা অধিক ভুক্তভোগী। বাঙলার জাতীয় আন্দোলনকে পিষ্ট করিবার জন্য ইঁহাদের নির্মম এবং নির্লজ্জ প্রয়াসের কথা এবং তজ্জনিত গভীর ব্যথা আমরা কোন দিনই ভুলিতে পারিব না। বাঙলাদেশের স্বেচ্ছাচারী শাসকদের অত্যাচারমূলক নীতিকে ইঁহারা ক্রমাগত কিভাবে উস্কাইয়া দিয়াছেন, সে স্মৃতি আমাদের জাতীয় ইতিহাসে শোণিতের অক্ষরে উদ্দীপ্ত থাকিবে। মিঃ লসন ন্যায় এবং নীতির কথা তুলিয়াছেন, কিন্তু ইহা তিনি না তুলিলেই ভাল করিতেন; কারণ, এই সত্য তাঁহার অবিদিত নহে যে, এই বাঙলাদেশে গণতন্ত্রসম্মত নিতান্ত সাধারণ ন্যায় ও নীতির মর্যাদাকে লঙ্ঘন করিয়াই তাঁহারা সংখ্যার অনুপাতের অপেক্ষা আইনসভায় প্রতিনিধিত্বের অধিকার ভোগ করিতেছেন এবং সেই অধিকারের অপপ্রয়োগেই তাঁহাদের ভারতসেবার প্রবৃত্তি এখনও সার্থকতা লাভ করিতেছে। ভারতবর্ষ যদি স্বাধীনতা লাভ করে, তবে এ সুবিধা তাঁহাদের হাতছাড়া হইয়া যাইবে এই আশঙ্কায় বিচলিত হইয়াই মিঃ লসন নিজেদের স্বপক্ষে প্রচারকার্যের এই ধাপ্পাবাজি চালাইতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন, ইহা বুঝিতে বেগ পাইতে হয় না। তাঁহার নিকট আমাদের নিবেদন শুধু এই যে, তাঁহারা যথেষ্ট দিন নিষ্ঠার সঙ্গে ভারতসেবা করিয়াছেন, এখন নিজেরা যদি নিজেদের পথ দেখিয়া সেবার এই পীড়ন হইতে আমাদিগকে নিষ্কৃতি প্রদান করেন এবং আমাদিগকে নিজেদের পথে চলিতে দেন, তবেই আমরা কৃতার্থ হই।

ধর্মের স্বরূপ

সম্প্রতি স্যার সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণণ আধ্যাত্মিকতার সঙ্গে মানব জীবনের সম্পর্ক সম্বন্ধে কলিকাতার ভারতীয় বণিক সভা ভবনে একটি বক্তৃতা প্রদান করিয়াছেন। মানব জীবনে ধর্মের আত্যন্তিক প্রয়োজন নাই বলিয়া এদেশে একটা মতবাদ গড়িয়া উঠিতেছে, সেই কথা উত্থাপন করিয়া তিনি বলেন, ধর্ম অনুষ্ঠান মাত্র নয়। জীবনের দৃষ্টিভঙ্গীর পরিবর্তন সাধন করিয়া বিশ্ব জীবনের সঙ্গে সঙ্গতি প্রতিষ্ঠার দ্বারা মনোবৃত্তিকে পূর্ণাঙ্গভাবে বিকসিত করিয়া তোলাই ধর্মের উদ্দেশ্য। বিজ্ঞান মানুষের জীবনকে অনেক দিক হইতে সমৃদ্ধ করিয়াছে, ইহা সত্য; কিন্তু মনের বৃত্তিনিচয়কে পরিমার্জিত করিবার ক্ষমতা বিজ্ঞানের নাই। বিজ্ঞান ঈর্ষা ও বিদ্বেষ, কিংবা লোভ বা তৃষ্ণা উপশম করিতে পারে নাই। অন্তরের মহিমায় মানুষকে সমৃদ্ধ এবং সম্পন্ন করিবার মত প্রাচুর্য বিজ্ঞানের মধ্যে মিলে না। মননের অনপেক্ষ একটা সম্পদ আছে; এই সম্পদেই মানুষ প্রকৃত মনুষ্যত্ব লাভে অধিকারী হয়। ত্যাগ এবং সেবাই ধর্মের স্বরূপ, মননের অনপেক্ষ মাধুর্যরসে নিমগ্ন না হইলে ত্যাগের এই প্রাণময়ী প্রবৃত্তি মানুষের মধ্যে উদ্দীপ্ত হয় না এবং বৃহতের অনুভূতির চেতনা জাগ্রত হয় না। বৃহতের সেবায় নিজেকে নিবেদন করিয়া একান্ত আনন্দ লাভ করাতেই ধর্মের প্রতিষ্ঠা। মানুষ বিজ্ঞানের বলে বাহিরের উপচারে যতই সমৃদ্ধ হউক, অন্তরের এই সম্পদের জন্য বেদনা তাহার থাকিবেই এবং এই সত্যকে চাপা দিয়া সে নিজের স্বাচ্ছন্দ্য লাভ করিতে পারিবে না। স্যার সর্বপল্লী ধর্মের যে স্বরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন, বাঙলা দেশ সেই ধর্মকেই বড় করিয়া দেখিয়াছে; সেবা এবং ত্যাগের সেই প্রেরণাই বাঙলার তরুণদিগকে দেশ এবং জাতির জন্য আত্মদানে একান্তভাবে প্রণোদিত করিয়া তুলিয়াছে। বাঙালীর জাতীয়তার মূল ভিত্তি প্রবল সেই প্রাণধর্মের উপরই প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়া স্বার্থ ও সংকীর্ণতার আঁধারে আলোক রেখা বিকীর্ণ করিয়াছে। বড়ই দুঃখের বিষয় এই যে, বাঙলা দেশের এই প্রাণ ধর্ম আজ বিপন্ন হইতে বসিয়াছে। সমগ্র ভারতে বর্তমানে দুর্নীতির প্রবল স্রোত বহিয়া চলিয়াছে। অপরকে পীড়ন এবং পেষণ করিবার রাক্ষসী বৃত্তি সর্বত্র অবাধে সম্প্রসারিত হইতেছে। যাহারা এইসব দৌরাত্ম্য করিতেছে, তাহাদের কোন লজ্জা নাই, সঙ্কোচ নাই, অথচ ধর্মের দোহাই সমানভাবেই আছে। দেশের এই অবস্থা দেখিয়া মহাত্মাজী বিচলিত হইয়াছেন; শুনিতেছি, এই পাপের প্রায়শ্চিত্তস্বরূপে তিনি নাকি পুনরায় অনশনব্রত অবলম্বন করিবার সম্বন্ধে বিবেচনা করিতেছেন। গান্ধীজী মহামানব; তাঁহার বেদনার গভীরতা আমরা উপলব্ধি করি। আমরা বুঝিতেছি, বাঙলা দেশ আজ দুর্নীতির চরম স্তরে পতিত হইয়াছে। অন্ধ মতবাদের নানা কুজ্ঝটিকার মধ্যেও বাঙলার তরুণ দল মানব সেবার ধ্রুব আদর্শের অনুসরণ করিয়া চলিবে এবং অকুতোভয় প্রাণবলে দুর্নীতিকে দলন করিয়া জাতির মহিমাকে সুপ্রতিষ্ঠিত করিবে, এই দুর্গতির দিনে ইহাই আমাদের একমাত্র আশা।

অহেতুক তৎপরতা

কোনরূপ জাতীয় অনুষ্ঠানের নাম শুনিলেই সরকারী কর্তৃপক্ষের টনক নড়ে। এক্ষেত্রে দমননীতি অবলম্বনে তাঁহাদের যেরূপ অশোভন ও অহেতুক তৎপরতা পরিদৃষ্ট হয়, সেরূপ দেশের গঠনমূলক কার্যে কুত্রাপি পরিলক্ষিত হয় না। সম্প্রতি এলাহাবাদে আগস্ট সপ্তাহ-পালনে বাধাদানের জন্য কর্তৃপক্ষ তোড়জোড় করিতেছেন বলিয়া প্রকাশ। এ সম্পর্কে যুক্তপ্রদেশের গভর্নমেণ্ট নাকি ভারত গভর্নমেণ্টের নিকট একটি কড়া 'নোট' প্রেরণ করিয়াছেন। দাঙ্গাহাঙ্গামা বাধিলে, কিংবা ঐরূপ কোন জরুরী অবস্থার উদ্ভব হইলে, আইন ও শৃঙ্খলা-রক্ষাকল্পে কিরূপ ব্যবস্থা অবলম্বন করা হইবে, তৎসম্পর্কে এলাহাবাদ ও কানপুরের কর্তৃপক্ষ বিশেষ তোড়জোড় করিতেছেন বলিয়া সংবাদ পাওয়া গিয়াছে। পুলিশ এলাহাবাদ শহরের সমস্ত বাড়ির বাসিন্দাদের নামধাম সম্পর্কেও নাকি খোঁজ-খবর লইয়াছে। কানপুরেও সভা-সমিতি নিষিদ্ধ হইয়াছে। এইসব আয়োজন দেখিয়া প্রত্যাসন্ন আগস্ট সপ্তাহের অনুষ্ঠান অন্যান্য অনেক স্থানেও নিষিদ্ধ হইবে বলিয়া আশঙ্কা হইতেছে। আমরা এলাহাবাদ জেলার, তথা যুক্তপ্রদেশের গভর্নমেণ্টের এই অতিরিক্ত উৎসাহের কারণ বুঝিতে পারিতেছি না। অনর্থক অতীতের বেদনা খোঁচাইয়া ঘা করিবার দুর্বুদ্ধি ইঁহাদের দেখা দিল কেন? এদেশের আমলাতন্ত্রের চিরাচরিত নীতি পর্যালোচনা করিলে দেখা যায়, তাঁহারা তাঁহাদের অতিরিক্ত উৎসাহ এবং অহেতুক ও অশোভন তৎপরতার ফলে দেশের শান্তিপূর্ণ আবহাওয়া বিক্ষুব্ধ করিয়া তোলেন এবং একটা অশান্তিজনক অবস্থা সৃষ্টি করিবার ব্যবস্থা করেন। পরিশেষে সব কিছুর দায়িত্ব কংগ্রেস ও দেশের জনগণের উপর চাপাইয়া নিজেদের মহিমা কীর্তন করিতে থাকেন। বিলাতে শ্রমিক গভর্নমেণ্ট প্রতিষ্ঠার পরে এদেশের রাজনীতিক্ষেত্রে এই ধরণের সরকারী নীতির পরিবর্তন পরিলক্ষিত হইবে, দেশের লোকে ইহাই মনে করিতেছে। পাঞ্জাব গভর্নমেণ্ট আগস্ট হাঙ্গামায় সংশ্লিষ্ট বন্দীদিগকে মুক্তিদানের আদেশ দিয়াছেন। অন্যান্য স্থানেও এই নীতি অনুসৃত হইবে এবং ব্যক্তিগত স্বাধীনতার উপর হস্তক্ষেপের দুষ্প্রবৃত্তি সংকুচিত হইবে, আমরা অন্তত এটুকু আশা করিয়াছিলাম। এরূপ অবস্থায় প্রত্যাসন্ন আগস্ট সপ্তাহ পালনের অনুষ্ঠানে অনর্থক বাধা দিতে গেলে তাহার ফল শুভ হইবে না; আগস্ট সপ্তাহ ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের গৌরবজনক স্মৃতিকে জাতির অন্তরে উদ্দীপ্ত করিয়া তোলে। স্বাধীনতার সাধনায় আত্মদানের সেই অমোঘ আহ্বানে ভারতের স্বাধীনতা যাঁহারা সত্যই কামনা করেন, তাঁহাদের শঙ্কিত হইবার কিছুই নাই। কংগ্রেস-প্রেসিডেণ্ট বিশেষ সতর্কতার সঙ্গেই এই উৎসব উদ্যাপন

সম্পর্কে নির্দেশ প্রদান করিয়াছেন। আমরা জানি, জনমতের বিরুদ্ধতা করিবার একটা স্বাভাবিক দুর্বুদ্ধি এ দেশের আমলাতন্ত্রের আছে; কিন্তু এ ব্যাপারে তাহা সংযত রাখাই ভালো। কর্তৃপক্ষকে আমরা এ সম্পর্কে পূর্বাহ্ণেই সতর্ক করিয়া রাখিতেছি। স্বাভাবিক ও শান্তিপূর্ণ ঘটনা-প্রবাহের স্রোতে অহেতুক বাধা প্রদান করিলেই তাহা অশান্ত ও বিক্ষুব্ধ হইয়া উঠে, অতীতের শিক্ষা হইতে তাঁহাদের এ বিষয় হৃদয়ঙ্গম করা উচিত। আমরা আশা করি, এই সত্য উপলব্ধি করিয়া গভর্নমেণ্ট এ বিষয়ে সর্বত্র অবহিত হইবেন।

রবীন্দ্র-স্মৃতিরক্ষার্থ রাষ্ট্রপতির আবেদন

রবীন্দ্রনাথের চতুর্থ মৃত্যুবার্ষিকী উৎসব আগতপ্রায়। চিরাচরিত প্রথায় এতদুপলক্ষে সভা-সমিতির অনুষ্ঠান রবীন্দ্রনাথের লোকোত্তর সৃজনী প্রতিভার নানাদিক লইয়া আলোচনা ও রবীন্দ্র-গীতির অনুষ্ঠানের দ্বারা তাঁহার স্মৃতি-তর্পণের উপযোগিতা থাকিলেও, তদ্দ্বারা তাঁহার প্রতি আমাদের শ্রদ্ধা-নিবেদনের যে অভিব্যক্তি, তাহা স্থায়ী রূপ পরিগ্রহ করে না। তাঁহার স্মৃতি-রক্ষার ব্যবস্থাই তাঁহার স্মৃতিতর্পণের যোগ্যতম ও সর্বপ্রকৃষ্ট উপায়। এতদুদ্দেশ্যে প্রত্যেকেরই অপরিহার্য কর্তব্য হইতেছে, রবীন্দ্র স্মৃতি-ভাণ্ডারে মুক্তহস্তে অর্থসাহায্য করা। রবীন্দ্র-স্মৃতিরক্ষা কমিটির পক্ষ হইতে রবীন্দ্র-স্মৃতিভাণ্ডারে অর্থসাহায্যের জন্য বহু আবেদন-নিবেদন প্রচার করা হইয়াছে। কিন্তু তৎসত্ত্বেও এ পর্যন্ত যে অর্থ সংগৃহীত হইয়াছে, তাহা মোট আবশ্যক অর্থের তুলনায় অতি সামান্য। আগামী ৭ই অগস্ট কবিগুরুর চতুর্থ মৃত্যুবার্ষিকী দিবস। এই তারিখের মধ্যে যাহাতে কেবল বাঙলা হইতেই ১০ লক্ষ টাকা সংগৃহীত হয়, তজ্জন্য রাষ্ট্রপতি মৌলানা আবুল কালাম আজাদ সম্প্রতি দেশবাসীর উদ্দেশ্যে এক আবেদন প্রচার করিয়াছেন। আমরা আশা করি, দেশবাসী রাষ্ট্রপতির আবেদনে অত্যন্ত সহৃদয়তার সহিত সাড়া দিবেন। তিনি তাঁহার আবেদনের শেষাংশে বলিয়াছেন ঃ—

"আমি অবগত হইলাম, কমিটি স্থির করিয়াছেন, এ বৎসর আগামী ৭ই আগস্টের মধ্যে বাঙলাদেশ হইতে ১০ লক্ষ টাকা সংগ্রহের চেষ্টা করা হইবে। বাঙলার জন-সাধারণ এই আবেদনে যথোপযুক্তভাবে সাড়া দিবে এবং নির্দিষ্ট দশ লক্ষেরও অধিক টাকা সংগৃহীত হইবে , তাহাতে সন্দেহ নাই। কেননা, আমি মনে করি, এই জাতীয় কবিকে সম্মানিত করিয়া বাঙলা নিজেকেই সম্মানিত করিবে। বাঙলা ব্যতীত ভারতের অন্যান্য প্রদেশও এই বিষয় পশ্চাতে পড়িয়া থাকিবে না, এই দৃঢ় প্রত্যয়ও আমার আছে।" কস্তুরবা স্মৃতিভাণ্ডারে যে পরিমাণ অর্থসংগ্রহের জন্য আবেদন প্রচার করা হইয়াছিল, অল্প সময়ের মধ্যে তদতিরিক্ত পরিমাণ অর্থ সংগৃহীত হইয়া গিয়াছে। কিন্তু আমাদের দুর্ভাগ্য এই যে, যে কবি এদেশের সাহিত্য ও সংস্কৃতিকে বিশ্ব-বাসীর চোখে শ্রদ্ধেয় ও আদরণীয় করিয়া তুলিয়াছেন, যে কবির অসামান্য সাহিত্য-



সৃষ্টি আমাদের গৌরবের বস্তু, সেই কবির স্মৃতির প্রতি আমরা আমাদের দায়িত্ব সম্যক-রূপে পালন করিতে পারি নাই। আজ চার বৎসর হইল কবির মহাপ্রয়াণ হইয়াছে। এই চার বৎসরের মধ্যে কবির স্মৃতিরক্ষার উপযুক্ত ব্যবস্থা হয় নাই। ইহা বিশেষ করিয়া বাঙালী জাতির দুরপনেয় কলঙ্ক। বাঙলাদেশে একসঙ্গে এক এক লক্ষ টাকা দান করিবার মত ধনী ব্যক্তির



অভাব নাই। কিন্তু দুঃখের বিষয় এতাবৎকাল তাঁহাদের নিকট হইতে যথোপযুক্ত সাড়া পাওয়া যায় নাই। অথচ তাঁহারা অগ্রসর না হইলে এ বিষয়ে বাঙলার দায়িত্ব সম্পূর্ণরূপে পালন সম্ভবপর হইবে না। রাষ্ট্রপতির এই আবেদনে আশা করি, শুধু বাঙলা নহে, ভারতের অন্যান্য প্রদেশও যথাযোগ্য সাড়া দিবে। রবীন্দ্রনাথ কেবল বাঙলার কবি নহেন, তিনি সমগ্র ভারতের জাতীয় কবি। ভারতের জাতীয় জীবন-উদ্বোধনে তাঁহার দান অসামান্য। আমরা আশা করি, এই কথা মনে করিয়া রাষ্ট্রপতির আবেদনে অন্যান্য প্রদেশের অধিবাসিগণও মুক্তহস্তে এই স্মৃতিভাণ্ডারে অর্থসাহায্য প্রেরণ করিবেন।

জাতিভেদ প্রথা ও রাজাগোপাল আচারী

জাতিভেদের ফলে এদেশের জাতীয় জীবন ও ঐক্যসাধনা যে বিপর্যস্ত হইয়াছে, তাহা সকলেই স্বীকার করিবেন। বর্তমানে এই জাতিভেদ দুইটি প্রধান শ্রেণীতে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে,—উন্নত বা বর্ণহিন্দু ও অনুন্নত বা তপশীলী সম্প্রদায়। সমগ্র হিন্দুসমাজ হইতে তপশীলী নাম দিয়া এদেশের অনুন্নত শ্রেণীগুলিকে চিহ্নিত ও পৃথক করিয়া দেওয়ায় জাতীয় ঐক্যের পথে বিঘ্ন-সৃষ্টি করা হইয়াছে। অবশ্য উন্নত শ্রেণী বা বর্ণহিন্দুগণের মধ্যে বর্ণবিভেদ থাকিলেও শিক্ষা, সংস্কৃতি ও সামাজিক পদমর্যাদার দিক দিয়া তাহা তত সুস্পষ্ট নহে। কাজেই জাতীয় অগ্রগতির পথে এই বর্ণবৈষম্য বাধার সৃষ্টি করে নাই। কিন্তু তৎসত্ত্বেও ইহাতে সমাজের স্তরে স্তরে যে জটিলতার সৃষ্টি হইয়াছে, তাহাতে হিন্দুসমাজ ধ্বংসের দিকে অগ্রসর হইতেছে। বিবাহ-ব্যাপারে বর্ণবৈষম্য ছাড়াও কুল, মেল, প্রবর, পর্যায় ইত্যাদি বহু রকমের বাধা বিদ্যমান। ইহার ফলে সুস্থ শক্তিশালী সামাজিক জীবন গড়িয়া উঠিতে পারিতেছে না। স্ব স্ব গণ্ডির মধ্যে বিবাহ-ব্যাপারে বহুপ্রকারের বাধা ও নিষেধের অস্তিত্বের জন্য বহু পুরুষ ও নারীকে অবিবাহিত জীবনযাপন করিতে হয়। ইহা ছাড়া অর্থ-নীতিগত প্রশ্ন ত আছেই। এরূপ অবস্থায় অসবর্ণ বিবাহ-প্রথা প্রচলিত হইলে সমাজের একটি গুরুতর সমস্যার সমাধান হয়। সম্প্রতি রাজাগোপাল আচারী শ্রীমতী নাথুবাঈ দামোদর থ্যাকার্সে নারীগণের বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তন উৎসবে এই কথাই বলিয়াছেন। তিনি বলেন, "আমি আশা করি, "একত্র আহার, কাজ ও ক্রীড়া করিলেই জাতিভেদ প্রথা উঠিয়া যাইবে না। কেবলমাত্র অন্তর্বিবাহ দেওয়ার ফলেই তাহা সম্ভব হইতে পারে।" হিন্দুগণের মধ্যে এই অসবর্ণ বা অন্তর্বিবাহ প্রচলিত হইলে সমগ্র হিন্দু সমাজের অশেষ দুর্গতি ও বহুবিধ জটিলতার অবসান হইবে; এক অখণ্ড, সুদৃঢ় ঐক্যবন্ধনে হিন্দুজাতি শক্তিশালী হইয়া উঠিবে। জাতিভেদ প্রথার বিলোপসাধনে অসবর্ণ বিবাহ অত্যাবশ্যক এবং তাহার ফল সমাজের পক্ষে কল্যাণকর হইবে, আমাদেরও ইহাই বিশ্বাস।

দেশের কথা

(৮ই শ্রাবণ—১৪ই শ্রাবণ)

খান আবদুল গফ্ফর খান—বাঙলায় প্রাচুর্য—সম্মেলনের পরে—মুক্তি

খান আবদুল গফ্ফর খান

খান আবদুল গফ্ফর খান হাজারা জেলায় যাইবার সময় পথে আটক সেতুর কাছে পাঞ্জাবের পুলিশ কর্তৃক গ্রেপ্তার হন। (৯ই শ্রাবণ) আটক জিলার ডেপুটী কমিশনার পূর্বেই তাঁহাকে জানাইয়াছিলেন, তিনি বিনানুমতিতে আটক জেলায় প্রবেশ করিতে বা বক্তৃতা করিতে পারিবেন না। ঐ আদেশ পাইয়া খান আবদুল গফ্ফর খান তাঁহাকে লিখিয়াছিলেন, তিনি হাজারা জেলায় যাইবার পথে আটক জিলায় রাস্তায় ২ দিন থাকিয়া কয়জন পুরাতন বন্ধুর সহিত সাক্ষাৎ করিবেন। তথাপি আদেশের উদার ব্যাখ্যা না করিয়া ভারতরক্ষা নিয়ম ভঙ্গ করায় তাঁহাকে আটক করা হয়। পর দিনই তাঁহাকে আটক সেতু হইতে ক্যাম্পবেলপুরে লইয়া যাওয়া হয় এবং তথা হইতে কোহাট জেলায় নিয়া মুক্ত করা হয়। পাঞ্জাবের সরকার (সচিবরা) এ বিষয়ে কিছুই অবগত ছিলেন না। তাঁহারা ডেপুটি কমিশনারের নিকট হইতে ঘটনার বিবরণ অবগত হইতেছেন, জানা যায়। গত ১৩ই শ্রাবণ খান আবদুল গফ্ফর খান বলিয়াছেন, আটকের ম্যাজিষ্ট্রেট ও পুলিশ সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টই তাঁহার গ্রেপ্তারের জন্য দায়ী। তিনি তাঁহার পত্রেই জানাইয়াছিলেন—পাঞ্জাব সরকারের ইচ্ছার বিরুদ্ধে আটকে বক্তৃতা করিবার কোন অভিপ্রায় তাঁহার ছিল না। কিন্তু বন্ধু-বান্ধবের সহিত সাক্ষাতের যে অধিকার শান্তিপ্রিয় নাগরিক মাত্রেরই আছে, তাহার বিরোধী কোন আদেশ মানা করিতে তিনি বাধ্য নহেন। তিনি অভিযোগ করিয়াছেন—পাঞ্জাব পুলিশ তাঁহার প্রতি যে ব্যবহার করিয়াছেন, তাহা আপত্তিকর।

বাঙলায় প্রাচুর্য

ভারত সরকার জানাইয়াছেন—যে-বাঙলা ১৯৪৩ খৃষ্টাব্দে দুর্ভিক্ষপীড়িত হইয়াছিল, ফসল ভাল হওয়ায় এবং কেন্দ্রী ও প্রাদেশিক সরকারের নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থায় সেই বাঙলায় বাঙালীর প্রয়োজনাতিরিক্ত চাউল সঞ্চিত হইয়াছে। আগামী শরৎকালে যে সকল স্থানে চাউলের অভাব, সে সকল স্থানে বহু পরিমাণ চাউল বাঙলা হইতে রপ্তানী করা সম্ভব হইবে। যুক্তপ্রদেশ নাকি, পরে বাঙলা সরকারের সহিত দর স্থির হইলে—২৫ হাজার টন চাউল বাঙলা হইতে লইবেন। প্রকাশ, কলিকাতায় ইতিমধ্যেই ১৬ মাসের জন্য যে চাউল প্রয়োজন হয়, তাহা মজুদ করা হইয়াছে।

এই সংবাদ প্রকাশিত হইবার পূর্বেই বাঙলার গবর্ণর বাঙলা হইতে চাউল রপ্তানীর ব্যবস্থার সংবাদ দিয়াছিলেন।

কিন্তু বাঙলায় সরকার চাউলের মূল্য এখনও হ্রাস করেন নাই।

সম্মেলনের পরে

সিমলায় সম্মেলন ব্যর্থতায় পর্যবসিত হওয়ার পরে পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু কাশ্মীরে পহালগাঁওএ বলিয়াছেন,—ভারতবর্ষের সমস্যা স্বাধীনতার সমস্যা। হিটলার যেমন ইউরোপে বিজিত দেশের লোকের মনে স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা নষ্ট করিতে পারেন নাই, চার্চিল তেমনই কংগ্রেসকে ও গান্ধীজীকে চূর্ণ করিতে পারেন নাই। তিনি বলিয়াছেন,—১৯৪২ খৃষ্টাব্দের আন্দোলনের ও বাঙলার দুর্ভিক্ষের সহিত ভারতের স্বাধীনতার কথার সম্বন্ধ অতি ঘনিষ্ঠ। বাঙলার দুর্ভিক্ষের কথায় তিনি বলিয়াছেন,—সরকারী হিসাবেই দুর্ভিক্ষে ১৫ লক্ষ লোকের জীবনান্ত হইয়াছে এবং অতি লোভীরা প্রত্যেক লোকের মৃত্যুতে এক হাজার টাকা লাভ করিয়াছে। ঐ জীবননাশের দায়িত্ব তৎকালীন সরকারের।

খাজা স্যার নাজিমুদ্দিন মতপ্রকাশ করিয়াছেন—পাঞ্জাবের প্রধান সচিব ও লর্ড ওয়াভেলই সম্মেলনের ব্যর্থতার জন্য দায়ী। অর্থাৎ পাঞ্জাবের প্রধান সচিব যে মুসলিম লীগের সহিত সম্পর্কশূন্য একজন মুসলমানকে বড়লাটের শাসন পরিষদে সদস্য করিতে বলিয়াছিলেন এবং লর্ড ওয়াভেল যে প্রস্তাব বর্জন করেন নাই, তাহাতেই সম্মেলন ব্যর্থ হইয়াছে।

মিঃ জিন্না যে বলিয়াছেন, মুসলিম লীগ এদেশের ৯০ জন মুসলমানের প্রতিনিধি কংগ্রেসের পক্ষ হইতে তাহা স্বীকার করা হয় নাই এবং কংগ্রেসের মত এই যে, মিঃ জিন্নার অসঙ্গত ও অন্যায় দাবীই এ দেশে রাজনীতিক উন্নতির পথ বিঘ্নবহুল করিতেছে।

২৫শে জুলাই (৯ই শ্রাবণ) দিল্লীতে নবাবজাদা লিয়াকৎ আলী খাঁ এক বিবৃতিতে বলিয়াছেন,—শ্রীযুত রাজাগোপালাচারী যে বলিয়াছেন, তিনি প্রথমে কংগ্রেসী ও লীগ-পন্থীর সংখ্যা সম্বন্ধে শ্রীযুত ভুলাভাই দেশাইএর সহিত যে চুক্তিতে সম্মত হইয়াছিলেন, পরে তাহাতে অসম্মত হইয়াছেন—তাহা মিথ্যা; মুসলিম লীগ ব্যতীত আর কাহারও যে বড়লাটের শাসন-পরিষদে একজনও সদস্য মনোনয়নের অধিকার আছে—ইহা তিনি কখনই স্বীকার করেন নাই। শ্রীযুত রাজাগোপালাচারীর মত লোক যে মুসলিম লীগকে হেয় করিবার অভিপ্রায়ে মিথ্যার আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছেন, ইহাতে তিনি বিস্মিত হইয়াছেন।

মশুলীপট্টমে পট্টভী সীতারামিয়া বলিয়াছেন,—ক্রীপসের প্রস্তাবেও যেমন সিমলায় আলোচনায়ও তেমনই বৃটিশ সরকার প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করিয়াছেন। লর্ড ওয়াভেল প্রথমে মৌলানা আবুল কালাম আজাদকে বলিয়াছিলেন, কোন এক দলের বা ব্যক্তির আপত্তিতে সম্মেলন ব্যর্থ হইতে পারিবে না। কিন্তু শেষে তিনি জিন্নার আপত্তিতেই সম্মেলন ব্যর্থতায় পর্যবসিত হইতে দিয়াছেন। ডক্টর সীতারামিয়া বলিয়াছেন,—লর্ড ওয়াভেলের ঐ কথা মিঃ জিন্নাও জানিতেন। কিন্তু যখন সম্মেলন চলিতেছিল, সেই সময় বিলাত হইতে (বড়লাটের নিকট) সংবাদ প্রেরিত হয়—মিঃ জিন্নাকে যেন অসন্তুষ্ট করা না হয়। তাহাই লর্ড ওয়াভেলের সঙ্কল্পভ্রষ্ট হইবার কারণ।

ডক্টর সীতারামিয়া কিন্তু নিরাশ হন নাই। তিনি বলেন, অজ্ঞাত দিকে ভবিষ্যৎ নানা সম্ভাবনা রহিয়াছে।

এদিকে বিলাতে পার্লামেণ্টে সদস্য নির্বাচন ফল ঘোষিত হইয়াছে এবং মিঃ আমেরী নির্বাচিত হইতে পারেন নাই ও শ্রমিক দলের সংখ্যাগরিষ্ঠতা ঘটিয়াছে। শ্রমিক দলের অন্যতম নেতা মিঃ বেভিন বলিয়াছেন, (২৭শে জুলাই) সিমলায় সম্মেলনের ব্যর্থতাহেতু শ্রমিক দল ভারতীয় সমস্যার সমাধান চেষ্টা ত্যাগ করিবেন না। ভারতীয় সমস্যার সমাধান বিশেষ প্রয়োজন। আর পরাভূত মিঃ আমেরী বলিয়াছেন,—তিনি পরাভূত হইয়াছেন বটে, কিন্তু ভারতীয় নীতি সম্বন্ধে শ্রমিক দল তাঁহার সহিত একমত (২৬শে জুলাই)।

ভারত সম্বন্ধে প্রচার কার্য

স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করিয়া ডক্টর হৃদয়নাথ কুঞ্জরু বলিয়াছেন,—আমেরিকাবাসীরা ভারতবর্ষের অবস্থার স্বরূপ প্রায়ই জানিতে পারে না। তথায় বৃটেনের পক্ষ হইতে ভারতবাসীর আশা ও আকাঙ্ক্ষার বিরোধী যে প্রচার কার্য পরিচালিত হইতেছে, তাহার প্রতিকার করিবার জন্য

যোগ্য ব্যক্তিদিগের দ্বারা ধারাবাহিক ভাবে প্রকৃত অবস্থা ব্যক্ত করা প্রয়োজন। আমেরিকায় কয়েকজন ভারতীয় সে কাজ করিতেছেন বটে, কিন্তু আরও উদ্যম প্রয়োজন।

আমেরিকায় মিসেস ক্লেয়ার বুথ লুস সিমলা সম্মেলনের ব্যর্থতা সম্বন্ধে মন্তব্য করিয়াছেন: তিনি আশা করেন, লর্ড ওয়াভেল কংগ্রেস-লীগ বিচার না করিয়া গণতন্ত্রানুরাগী স্বদেশপ্রেমিক ভারতীয়দিগকে আহ্বান করিয়া তাঁহার সরকার পুনর্গঠিত করিবেন। মুসলিম লীগ যে বলিতেছেন,—ভারতীয় প্রথমে হিন্দু বা মুসলমান এবং তাহার পরে ভারতীয় ও স্বদেশপ্রেমিক ইহাতে আমেরিকার লোক দুঃখিত। তাঁহারা আশা করেন, ভারতবর্ষের লোকের দুর্দশা অপনোদন কল্পে কর্তব্যপালন করিবার আগ্রহ বহু হিন্দুর ও মুসলমানের আছে।

বিলাতে শ্রমিক দলের লর্ড লিস্টওয়েলও অনুরূপ মত প্রকাশ করিয়াছেন। তিনি বলেন, সিমলা সম্মেলনে প্রতিপন্ন হইয়াছে বর্তমান শাসনপদ্ধতি অক্ষুণ্ণ রাখিয়া, যুদ্ধোদ্যমে কোনরূপ বাধা না দিয়া, শাসন-দায়িত্ব গ্রহণ করিতে আগ্রহশীল অনেক হিন্দু ও মুসলমান আছেন। রাজনীতিক বোধসম্পন্ন ভারতীয়দিগের মধ্যে তাঁহারাই সংখ্যাগরিষ্ঠ।

ডক্টর হৃদয়নাথ কুঞ্জরুর কথা—

এলাহাবাদে ডক্টর হৃদয়নাথ কুঞ্জরু বলিয়াছেন, বর্তমানে ভারতে যে সমস্যা সমুদ্ভূত হইয়াছে, তাহার সমাধান নিম্নলিখিত উপায়-দ্বয়ের একটির দ্বারা হইতে পারে। হয় স্বরাষ্ট্র, অর্থ, যুদ্ধের যানবাহন ও বিদেশীয় সম্পর্কিত বিভাগ চতুষ্টয়ের ভার ভারতীয় সদস্যদিগকে প্রদান করিয়া শাসন পরিষদের সদস্য নিয়োগের ভার বৃটিশ সরকার বড়লাটকে প্রদান করুন; নহে ত ১৯৪০ খৃষ্টাব্দের ঘোষণা ন্যায়ানুগভাবে ব্যাখ্যা করিয়া কাজ করা হউক। যদি কোন বা কোন কোন দলের প্রতিনিধি বলিয়া পরিগণিত হইবার অধিকার সম্বন্ধে সন্দেহের কারণ ঘটে, তবে ব্যবস্থা পরিষদসমূহে সভ্য নির্বাচনের ব্যবস্থা করিয়া তাহার পরীক্ষা করা হউক। বিলাতে যখন যুদ্ধের সময়েও পার্লামেন্টে সভ্য নির্বাচন সম্ভব হইয়াছে, তখন এদেশে নির্বাচন কখনই অসম্ভব হইতে পারে না। শাসন পরিষদ পুনর্গঠনের জন্য বড়লাট যদি বিভিন্ন দলের প্রতিনিধিদিগকে আহ্বান করেন, তবে যে দল সে আহ্বান প্রত্যাখ্যান করিবেন সে দলকে বাদ দিয়াই কাজ করিতে হইবে।

বাঙলায় গত সচিবসঙ্ঘের পতনের পরে আর সচিবসঙ্ঘ গঠন করা হয় নাই। কিন্তু সিমলায় কংগ্রেসী নেতাদিগের সহিত আলোচনার পরে কলিকাতা প্রত্যাবৃত ব্যবস্থা পরিষদের খাস কংগ্রেসী দলের নেতা শ্রীযুক্ত কিরণশঙ্কর রায় বাঙলার গভর্নরের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া আসিয়াছেন। প্রকাশ, তিনি গভর্নরকে বলিয়া আসিয়াছেন, বাঙলায় সচিবসঙ্ঘ গঠন করিয়া সরকারের কার্য পরিচালিত করা হয়, ইহাই বাঙলার লোকের অভিপ্রেত। বাঙলার গভর্নর সে বিষয়ে কি করেন, তাহা দেখিবার বিষয়।

মুক্তি—

পাঞ্জাব সরকার ১৯৪২ খৃষ্টাব্দের আগস্ট মাসের হাঙ্গামা সম্পর্কে বন্দী কংগ্রেসকর্মীদিগকে মুক্তি দিয়াছেন (৯ই শ্রাবণ)! পাঞ্জাবে রাজনীতিক কারণে বন্দীদিগের মধ্যে কেবল আগস্ট মাসের হাঙ্গামার পূর্ববর্তী ও নূতন শাসন পদ্ধতি প্রবর্তনের পূর্বের বন্দীরাই মুক্তিলাভ করেন নাই। পাঞ্জাবের ব্যবস্থা পরিষদের যে ১৩জন সদস্যের গতিবিধি সম্বন্ধে নিষেধাজ্ঞা ছিল তাঁহাদিগের মধ্যে কেবল মাস্টার হরি সিংহ কপূরতলা সামন্ত রাজ্যে থাকিতে বাধ্য থাকিবেন।

বাঙলায় শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র বসু প্রমুখ নেতা ও কর্মীদিগের মুক্তির জন্য আন্দোলন দিন দিন প্রবল হইতেছে। গত ১৬ই মে শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র বসুর স্বাস্থ্যভঙ্গহেতু কলিকাতা কর্পোরেশন সরকারকে তাঁহাকে অবিলম্বে মুক্তি দিতে বলিয়াছিলেন। গৃহীত প্রস্তাব বাঙলা সরকারকে জানান হইলে বাঙলা সরকার উহা গত ৯ই জুন ভারত সরকারকে জানান। এতদিনে ভারত সরকার যাহা লিখিয়াছেন, বাঙলা সরকার তাহা কলিকাতা কর্পোরেশনকে জানাইয়াছেন—(১৩ই শ্রাবণ) —"কর্পোরেশনকে জানান যাইতে পারে, শরৎবাবুর গুরুত্বপূর্ণ অসুস্থতার সংবাদ ভ্রান্ত।" এই উত্তরে যে দেশের লোক সন্তুষ্ট হইতে পারিবে না, তাহা বলা বাহুল্য।

শ্রীযুক্ত সত্যরঞ্জন বক্সীর স্বাস্থ্য সম্বন্ধে সরকার যে সংবাদ দিয়াছেন, তাহাও সন্তোষজনক বলা যায় না।

মৌলানা আবুল কালাম আজাদ রাজনীতিক কারণে বন্দীদিগকে মুক্তিদান জন্য লর্ড ওয়াভেলের সহিত যে পত্র ব্যবহার করিয়াছেন, তাহার ফল এখনও জানিতে পারা যায় নাই। তাহা গোপনীয় বলিয়া বিবেচিত হইতেছে।

বাঙলার বস্ত্র সংকট—

ভারত সরকারের শিল্প ও বেসামরিক সরবরাহ বিভাগের সেক্রেটারী স্যার আকবর হাইদারী দিল্লী হইতে এবং ভারত সরকারের বস্ত্র কমিশনার মিস্টার ভেলডী বোম্বাই হইতে একই দিনে কলিকাতা যাত্রা করিয়াছেন (২৮শে জুলাই)। বস্ত্র নিয়ন্ত্রণ বোর্ডের সভাপতি মিস্টার কৃষ্ণরাজ থ্যাকারসে ও কস্তুরভাই লালভাই মিস্টার ভেলডীর সহযাত্রী। প্রকাশ, তাঁহারা বাঙলায় বস্ত্র সরবরাহের অবস্থা দেখিবেন এবং বস্ত্র সংগ্রহের ও যে বস্ত্র পাওয়া যাইবে তাহা বণ্টনের ব্যবস্থা করিবেন। তাঁহারা হয়ত "পরের মুখে ঝাল না খাইয়া" মফঃস্বলেও কোন কোন স্থানে পরিদর্শনে গমন করিবেন।

গত ২৬শে জুলাই কলিকাতায় মিস্টার গ্রিফিথস বলিয়াছেন—কলিকাতায় ওয়ার্ড কমিটিসমূহের মারফতে যে বস্ত্র বণ্টনের ব্যবস্থা আছে, তাহা বর্জন করিয়া পূর্ণাঙ্গ বস্ত্র বণ্টনের ব্যবস্থা করা হইবে। নূতন ব্যবস্থা প্রবর্তিত হইবার পরবর্তী ৯ মাসে দ্বাদশবর্ষের অধিক বয়স্ক নরনারী প্রত্যেকে ২০ গজ ও দ্বাদশ বর্ষ পর্যন্ত বয়স্ক বালক বালিকা প্রত্যেকে ১০ গজ হিসাবে কাপড় পাইবে। কাপড়ের দোকানের সংখ্যাও বর্ধিত করা হইবে। কবে নূতন ব্যবস্থা প্রবর্তন করা হইবে সেই "গোপন কথাটি" মিস্টার গ্রিফিথস প্রকাশ করেন নাই।

অথচ কলিকাতা কর্পোরেশনের চীফ এক্জিকিউটিভ অফিসার গত ২৭শে জুলাই বলিয়াছেন—সরকার তাঁহাকে জানাইয়াছেন, আগামী ৩রা সেপ্টেম্বর হইতেই পূর্ণাঙ্গ বস্ত্র বণ্টন আরম্ভ হইবে।

এ ব্যবস্থা কলিকাতার ও কলিকাতার উপকণ্ঠের জন্য। গ্রামে কি ব্যবস্থা হইবে এবং কোন ব্যবস্থা হইবে কিনা, তাহা প্রকাশ পায় নাই।

জাতীয় সপ্তাহ—

রাষ্ট্রপতি মৌলানা আবুল কালাম আজাদ গত ২৫শে জুলাই ভারতের সর্বত্র কংগ্রেসানুরাগীদিগকে উপযুক্ত গাম্ভীর্য সহকারে ৯ই আগস্ট জাতীয় সপ্তাহদিবস পালন করিতে নির্দেশ দিয়াছেন।

রবীন্দ্রনাথ স্মৃতিরক্ষা—

আগামী ৭ই আগস্ট রবীন্দ্রনাথের মৃত্যুদিন। আজও যে আমরা তাঁহার স্মৃতিরক্ষার উপযুক্তরূপ ব্যবস্থা করিতে পারি নাই, সেজন্য দুঃখ প্রকাশ করিয়া মৌলানা আবুল কালাম আজাদ স্মৃতিরক্ষা সমিতির আবেদন সমর্থন করিয়া জানাইয়াছেন—বাঙলা যেন ৭ই আগস্টের মধ্যে স্মৃতিরক্ষা ভাণ্ডারে ১০ লক্ষ টাকা পূর্ণ করে। স্মৃতিরক্ষা সমিতির ঐ ১০ লক্ষ টাকা পূর্ণ করিতে এখনও প্রায় ৪ লক্ষ টাকা প্রয়োজন।

বাঙলার সাহিত্যিকগণ ভাণ্ডারের জন্য অর্থ সংগ্রহে আগ্রহ প্রকাশ করিয়া আপনাদিগের কর্তব্যপালনে অগ্রসর হইয়াছেন।

দুর্ভিক্ষের স্মৃতিরক্ষা—

বাঙলার দুর্ভিক্ষে যে লক্ষ লক্ষ নরনারী অনাহারে মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছে, তাহাদিগের স্মৃতিরক্ষার্থ কলিকাতার সাহায্য সমিতি ২০ হাজার টাকা ব্যয়ে একটি স্মৃতিস্তম্ভ প্রতিষ্ঠার সংকল্প করিয়াছেন। কলিকাতায় কোন উপযুক্ত স্থানে উহা প্রতিষ্ঠিত হইবে। হলওয়েলের অপকীর্তি অন্ধকূপ হত্যার স্মৃতিস্তম্ভ যেস্থানে ছিল, ইহা কি তথায় —বাঙলা সরকারের দপ্তরখানার নিকটে প্রতিষ্ঠিত হইবে?

শিক্ষার গলদ

শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ চৌধুরী বি এস-সি

এক ভদ্রলোক জীবন বীমা করিবার জন্য আবেদন করিয়াছিলেন। তাহার জনৈক বন্ধুর নিকট হইতে এই সম্পর্কে কতকগুলি প্রশ্নের উত্তর চাওয়া হয়। প্রশ্নগুলির মধ্যে একটি এই ছিল, আবেদনকারী কোন বিপজ্জনক কার্যে লিপ্ত কিনা। বন্ধুবর উত্তরে লিখিয়াছিলেন, "হাঁ, আবেদনকারী স্কুলের মাস্টার এবং প্রবেশিকা প্রভৃতি পরীক্ষায় গার্ডগিরি করেন।"

ইহা অবশ্য রসিকতা। কিন্তু এমন রসিকতা করিবার কারণ যেখানে ঘটিয়াছে, সেখানে সকলে ইহা উপভোগ করিতে পারে না। অনেকের মনে এই রসিকতা আঘাত দেয়। কায়মনে ছাত্রমণ্ডলীর এমন অধোগতি কিরূপে হইল, ইহার প্রতিকার কি, এই সকল প্রশ্ন তাহাদের চিত্তকে ব্যথিত এবং মথিত করে। কেবল নৈতিক দিক দিয়া নহে, মস্তিষ্কের দিকেও সাধারণ ছাত্র সমাজের নৈরাশ্যজনক অধোগতি লক্ষিত হইতেছে।

এই অধোগতির সহিত বর্তমান মহাযুদ্ধের যে ঘনিষ্ঠ সংযোগ আছে তাহা অবশ্য স্বীকার্য। রণক্ষেত্রে যুদ্ধরত সৈন্যগণের মধ্যে হয়ত শৃঙ্খলা থাকে; কিন্তু সাধারণ নাগরিক জীবনে, বিশেষত পরাধীন দেশে, এই সময় বিশৃঙ্খলার অবধি থাকে না এবং সামরিক, অসামরিক সকলের মধ্যেই উচ্ছৃঙ্খলতা বিকটরূপে আত্মপ্রকাশ করে। ছাত্র সম্প্রদায় কায়মনে এমন একটি অবস্থায় থাকে, যখন তাহাদের মধ্যে অনুকরণপ্রিয়তা অত্যন্ত প্রবল। সুতরাং উপযুক্ত সতর্কতার ব্যবস্থা না থাকিলে এই হুজুগে ছাত্রদের মধ্যে উচ্ছৃঙ্খলতা প্রবেশ করা অস্বাভাবিক নয়। কৈশোর বিবেচনার সময় নহে; হুজুগে এবং চমৎকারিত্ব দ্বারা উহা সহজে আকৃষ্ট হয়। সুতরাং স্বভাবতঃই যুদ্ধজনিত অবস্থা আমাদের ছাত্র সম্প্রদায়ের নৈতিক অধঃপতনের অন্যতম কারণ।

কিন্তু ইহাতে শিক্ষাব্যবস্থার দায়িত্ব মোটেই লাঘব হইল না। বস্তু মাত্রই অবলম্বনহীন হইলে যেমন মাধ্যাকর্ষণ-ধর্মে ভূ-কেন্দ্রের দিকে ধাবিত হয়, সতর্ক শিক্ষাব্যবস্থা না থাকিলেও তেমনি কিশোরমন আদিম পশুত্বের দিকে অধোগতি লাভ করে। যে শিক্ষাব্যবস্থা প্রয়োজনের সময় শিক্ষার্থিগণকে অকল্যাণ হইতে রক্ষা করিতে পারিল না, তাহাকে কিছুতেই ত্রুটীহীন মনে করা যায় না। এই ত্রুটি শিক্ষাব্যবস্থার শিরায় শিরায় এমনভাবে প্রবেশ করিয়াছে যে, ইহার অংশবিশেষের সংশোধন দ্বারা বাঞ্ছিত সুফল লাভ হইতে পারে না। উহার আমূল সংস্কারের প্রয়োজন।

প্রথম কথাই এই যে, আমরা ছোটদেরে কেন শিক্ষা দিতে চাই। যদি একমাত্র প্রকৃতির শিক্ষাই যথেষ্ট মনে করা হইত, তবে মানব সভ্যতা কোনকালেও অগ্রসর হইত না। মানুষে পশুতে বিশেষ পার্থক্য না থাকাই স্বাভাবিক হইত। কিন্তু মানুষ তাহা হইতে দেয় নাই। ইচ্ছা করিয়াই মানুষ নিজের অবস্থার উন্নতি সাধন করিয়াছে। কেবল তাহাই নহে, ভবিষ্যতেও যাহাতে এই উন্নতির গতি অব্যাহত থাকে, সেই ব্যবস্থাই মানুষ করিতে চাহিয়াছে। এই শেষোক্ত কারণেই মানুষ শিশুকে শিক্ষা দেওয়ার প্রয়োজন বোধ করে। শিশুকে আমরা এই আশায়ই শিক্ষা দিতে চাই যে, সে আমাদের পূর্বার্জিত শিক্ষা সভ্যতার উত্তরাধিকারী হইবে এবং ইহাকে যথেষ্ট মনে করিবে না। তাহার মন সর্বদা অধিকতর উন্নতির দিকে উন্মুখ থাকিবে।

পিতা যেমন আপন সন্তানের ভবিষ্যতের অভিভাবক, তেমনি সকল দেশেই অল্পাধিক শক্তিশালী পিতৃধর্মী কতকজন লোক থাকেন, যাহারা সমগ্র দেশের ভবিষ্যৎ চিন্তা করেন। সভ্যরাষ্ট্র সেই দেশ-পিতৃগণের পরামর্শ অনুসারে ভবিষ্যৎ নাগরিকগণের শিক্ষার ব্যবস্থা করে। প্রতি যুগে প্রাপ্ত বয়স্ক প্রাজ্ঞগণের পরিকল্পিত সর্বশ্রেষ্ঠ সমাজ গঠনের প্রয়াসের নামই শিক্ষাব্যবস্থা। এইজন্যই কালের গতির সহিত শিক্ষাব্যবস্থার পরিবর্তনের প্রয়োজন হয়।

শিক্ষার উদ্দেশ্য এবং শিক্ষাব্যবস্থা সম্বন্ধে অতি সংক্ষেপে যাহা বলা হইল, তাহার কষ্টিপাথরে পরীক্ষা করিলেই বর্তমান শিক্ষা ব্যবস্থার ত্রুটি ধরা পড়িবে। দুর্ভাগ্যবশতঃ শিক্ষার উদ্দেশ্য সম্বন্ধে জনসাধারণের ধারণা যেমন অস্পষ্ট, তেমনি আবার প্রচলিত শিক্ষাব্যবস্থাও দেশের পিতৃস্থানীয় মনীষিগণের অনুমোদিত নহে।

শিক্ষাকে সার্থক করিয়া তুলিতে হইলে ছাত্র, অভিভাবক, শিক্ষক এবং রাষ্ট্রের স্বীয় কর্তব্যগুলি দায়িত্বপূর্ণভাবে পালিত হওয়া প্রয়োজন। এখানে দায়িত্ব শব্দটির উপর বিশেষ জোর দেওয়া যাইতেছে। সাধারণত সর্বত্রই দেখা যায় যে, এমন কি পদস্থ ব্যক্তিগণের মধ্যেও দায়িত্ব বোধের অভাব। এমন অনেক উদাহরণ দেওয়া যাইতে পারে, যাহাতে দেখা যায় যে, পদস্থ ব্যক্তিগণের মধ্যে মমতা এবং দায়িত্ববোধের অভাবে জনসাধারণের লক্ষ লক্ষ টাকা ক্ষতি হইয়াছে, এমন কি সহস্র সহস্র জীবনও বিপন্ন হইয়াছে এবং এই সকল ঘটনা আকস্মিক নহে। কিন্তু এইজন্য সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিগণ লজ্জিতও নহে দুঃখিতও নহে। দেশের নিতান্ত দুর্ভাগ্য যে, এই সকল ক্ষুদ্রমনা লোকের হাতেও সাধারণের মঙ্গলামঙ্গল নির্ভর করে।

হিংস্র প্রাণীর আক্রমণে বীভৎসতা অধিক, কিন্তু জীবাণুর আক্রমণ অধিক মারাত্মক। তেমনি অন্যান্য বিভাগের মত শিক্ষা বিভাগে দায়িত্বহীনতার কুফল প্রত্যক্ষ দেখা না গেলেও ইহা অধিক মারাত্মক। এই জীবাণু সমগ্র সমাজ দেহকে বিষাক্ত করিয়া ফেলে। সুতরাং সকলের মধ্যে দায়িত্ববোধ জন্মানই প্রথম কর্তব্য। এই ব্যাপারে শিক্ষার্থী অপেক্ষা বয়স্কগণের কর্তব্য অধিক। কারণ শিক্ষার্থিগণ অনুকরণ দ্বারা বয়স্কগণের দোষগুণের অধিকারী হয়।

শিক্ষা ব্যাপারে শিক্ষার্থীর কথাই সর্বপ্রথম বিবেচ্য। রামকে বাদ দিলে যেমন রামায়ণ হয় না, শিক্ষার্থীকে বাদ দিলে শিক্ষারও কিছু থাকে না। শিক্ষার্থীর বয়স, শারীরিক এবং মানসিক উন্মেষ প্রভৃতির প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া তাহাকে উপযুক্ত পরিবেশের মধ্যে স্থাপন করিতে হইবে। কিন্তু মনে রাখিতে হইবে যে, শিক্ষার্থিগণ শিক্ষার কেন্দ্র হইলেও কর্তা নহে, প্রযুক্ত কর্তা মাত্র। তাহাদের সকল প্রকার প্রচেষ্টার মধ্যে মনে রাখিতে হইবে যে, অভিভাবক এবং শিক্ষক কর্তৃক অনুমোদিত হইলেই শুধু তাহাদের কার্যের মূল্য নির্দেশ হইল। শত অনিচ্ছায়ও যাহারা গুরুজনের নির্দেশ যথাশক্তি পালনে কুণ্ঠিত হয় না তাহারাই শিক্ষার্থী নামের যোগ্য। কর্তা বা বিচারক সাজিয়া গেলে আর শিক্ষা লাভ হয় না। শ্রদ্ধা, বিশ্বাস এবং জিজ্ঞাসার অভাব ঘটিলে শিক্ষার্থীর অনুকূলে কিছুই রহিল না।

বাতাস যেদিকে বয়, জড় পদার্থ সেই দিকেই চালিত হয়। সুতরাং তাহার পরিণতি অনিশ্চিত। জীবধর্ম ইহার বিরোধী। জীব যে দিকেই চলে, উহার গতি সর্বদাই নিজ আয়ত্তে রাখিতে চেষ্টা করে, কারণ তাহার সুনির্দিষ্ট গন্তব্য আছে। কিন্তু এতদ্দেশীয় শিক্ষাব্যবস্থায় সজীবতার লক্ষণ অতি অল্পই দৃষ্ট হয়। সম্প্রতি পাশ্চাত্য দেশসমূহে শিক্ষা সম্পর্কে যে সকল বিধান প্রবর্তিত হইতেছে, তাহার অনেকগুলি এই দেশে নির্বিচারে চালাইবার চেষ্টা চলিতেছে।

যে পারিপার্শ্বিকের মধ্যে সেই সকল দেশে কোন বিশেষ বিধান রচিত হয়, এই দেশে সেই পারিপার্শ্বিক প্রায়ই থাকে না। সুতরাং ইহাতে অনুরূপ ফল লাভের সম্ভাবনাও নাই। শিক্ষা বিধান রচনার সময় একটি কল্পিত শিশুর মনোবৃত্তির কথা ভাবিলেই চলে না। তাহা অপেক্ষা পারিপার্শ্বিক অধিক বিবেচ্য। সকল দেশের শিশুদের মনোবৃত্তিতে যে সামঞ্জস্য থাকিবার কথা, ঘরবাহিরের বিভিন্ন প্রকার প্রভাবে তাহা অন্যরূপ হইয়া পড়ে। সুতরাং সাধারণ নিয়ম প্রযোজ্য নহে।

অগৌরবের হইলেও স্বীকার করিতে হইবে যে, আমাদের দেশে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই পারিবারিক আবহাওয়া সুশিক্ষার সম্পূর্ণ সহায়ক নহে। বিদ্যালয়গুলিতেও যে কৃত্রিম সম্পর্ক আইনের সাহায্যে শিক্ষক এবং ছাত্রের মধ্যে স্থাপিত হইয়াছে, তাহাও সুশিক্ষার সহায়ক নহে। ছাত্র শিক্ষকে সম্পর্ক যদি পরস্পর ভক্তিশ্রদ্ধা এবং স্নেহমমতার দ্বারা না হইয়া বিধিবদ্ধ আইনকানুন দ্বারা স্থির হয়, তবে ইহাতে আর যাহাই হউক, শিক্ষা যে হয় না তাহা নিশ্চিত। দাম্ভিক ছাত্র যদি জানে যে, শিক্ষক তাহাকে শাসন করিবার অধিকারী নন, তবে তাহাকে শিক্ষা দান করা কোন প্রকারেই সম্ভব নহে। সে সহজেই তাহার দলে অধিকতর সঙ্গী জুটাইতে পারিবে। এই ভাবে গল্পের পচা আপেলের মত সে অন্যান্য ছেলেকেও কুপথে টানিয়া আনিবে। আইন দ্বারা সাম্যের সম্পর্ক স্থাপন ছাত্র শিক্ষকের পক্ষে শোভনও নহে শুভও নহে। পিতা যেমন পুত্রকে শাসন করিবার অধিকার রাখেন, শিক্ষকেরও ছাত্রকে সেইরূপ শাসন করিবার অধিকার থাকা উচিত। শিক্ষকের সোহাগের সহিত শাসনও ছাত্রের কল্যাণের নিমিত্তই হইবে। যে উচ্ছৃঙ্খলতা বর্তমানে ছাত্রসমাজে দেখা যায়, তাহা অপেক্ষা যদি কঠোরতম ব্যবস্থার মধ্যেও ইহাদিগকে শিক্ষালাভ করিতে হইত, তাহাও মঙ্গল ছিল।

অধুনা ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে নানাবিধ সঙ্ঘ সমিতি প্রভৃতি গঠিত হইয়াছে এবং হইতেছে। সূক্ষ্ম বিচারে প্রবৃত্ত না হইয়াও মোটামুটি এইগুলি সম্বন্ধে বলা যায় যে, এইগুলির নিয়ন্ত্রণ আবশ্যক। সঙ্ঘ গঠনের উপকারিতা আছে স্বীকার করি, কিন্তু নিরঙ্কুশভাবে চলিতে দেওয়াতে ইহার অপকারের দিকটাই ক্রমশ ভারী হইয়া উঠিতেছে। বাহিরের অর্থাৎ যাহারা ছাত্র নয় অথবা শিক্ষাব্রতীও নন, তাহাদের প্রভাবই ক্রমশ এইগুলিতে অধিক পরিমাণে আসিয়া পড়িতেছে। এমন কি, কোন কোন ক্ষেত্রে বাহিরের প্রভাবেই সঙ্ঘ-সমিতিগুলি চালিত হইতেছে। ইহার পরিণাম শুভ হইতে পারে না, হইতেছেও না। এই সঙ্ঘগঠন যাহাতে তাহাদের দৈহিক এবং মানসিক উন্নতি বিধানের সহায়ক হয়, এই উদ্দেশ্যে ছাত্রসম্প্রদায়ের সকলপ্রকার সঙ্ঘগঠন সংশ্লিষ্ট বিদ্যালয়গুলির কর্তৃপক্ষের অনুমোদিত হওয়া একান্ত প্রয়োজন। কেবল অনুমোদন নহে এইগুলির সহিত তাহাদের সাক্ষাৎ সংস্পর্শ থাকা প্রয়োজন।

অভিভাবকগণের প্রভাবই বালকবালিকার মনের উপর সর্বাপেক্ষা অধিক। সুতরাং ব্যক্তিগতভাবে শিশু সম্প্রদায়ের ভবিষ্যৎ চিন্তা তাঁহাদেরই কর্তব্য। কিন্তু দুঃখের বিষয়, তাঁহারা তাঁহাদের কর্তব্য সম্বন্ধে সম্যকভাবে সচেতন নহেন। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই অভিভাবকগণ তাঁহাদের পুত্রকন্যাদের উপর নিজ নিজ প্রভাব বিস্তারে নিশ্চেষ্ট থাকেন। ইহাতে বরং তাঁহাদের মন্দ দিকটাই ছোটরা অনুকরণ করে। সময় সময় তাঁহাদের আচরণ রীতিমত অদ্ভুত। অনেক অভিভাবক সন্তানকে প্রয়োজনের অতিরিক্ত আদর দিয়া নষ্ট করিয়া আশা বা ইচ্ছা করেন যে, বিদ্যালয়ের প্রভাবে দুলালটি সংশোধিত হউক। কিন্তু বিদ্যালয়ের পক্ষ হইতে যদি দুলালের প্রতি কোন কঠোর ব্যবস্থা করা হয়, অমনি আইনের সাহায্যে বিদ্যালয়কে শিক্ষা দিবার আয়োজন করিয়া দুলালটিকে অধঃপাতের রাজপথ দেখাইয়া দেওয়া হয়।

তবে ইহা স্বীকার করিতেই হইবে যে, পিতামাতা সন্তানের অবনতি চাহেন না, উন্নতিই কামনা করেন। কিন্তু উপযুক্ত শিক্ষার অভাবে পিতামাতার কর্তব্য সুসম্পন্ন করিতে সাধারণ অভিভাবক অপারগ। সুতরাং শিক্ষা সংস্কারে সাধারণভাবে অভিভাবকের সহায়তা লাভের আশা কম। শৈশবে কৈশোরে যাহারা উপযুক্ত শিক্ষা লাভ করেন নাই, যৌবনে বা বার্ধক্যে তাঁহাদের অধিকাংশ যে সুশিক্ষার উপযোগী মনোবৃত্তি লাভ করিবেন তাহা সম্ভব নহে। তবে আপন আপন ছাত্রছাত্রীদিগের মঙ্গলের জন্য অভিভাবকগণকে ন্যূনপক্ষে কতকগুলি অভ্যাস করিতে হইবে। প্রচলিত শিক্ষাব্যবস্থায় তাঁহাদিগকে শ্রদ্ধাবান হইতে হইবে এবং যাঁহারা শিক্ষাদানের ব্যাপারে লিপ্ত আছেন তাঁহাদিগকে সম্মান করিতে হইবে। অভিভাবকগণ যাঁহাদিগকে সম্মান করেন, ছাত্রছাত্রীরাও প্রথম হইতেই তাঁহাদিগকে সম্মানের চক্ষে দেখিবে এবং শ্রদ্ধার সহিত তাঁহাদের নিকট হইতে শিক্ষালাভ করিবে। শ্রদ্ধার অভাব থাকিলে শিক্ষালাভের চেষ্টা পণ্ডশ্রম মাত্র।

অবশ্য ইহাও স্বীকার্য যে, শিক্ষাদানে নিযুক্ত সকলেই গুণবত্তায় সমানভাবে শ্রদ্ধেয় নহে। তাঁহারা সকলেই এই কার্যকে জীবিকা উপার্জনের পন্থা হিসাবে গ্রহণ করিয়াছেন বটে; কিন্তু অনেকেরই এই বিষয়ে ন্যূনতম যোগ্যতাও নাই।

শিক্ষকগণের দৈহিক গঠন, স্বাস্থ্য, চরিত্র, বিদ্যাবত্তা, নিয়মানুবর্তিতা, মমতা, সহিষ্ণুতা, অমায়িকতা, কর্তৃত্ব, মর্যাদাবোধ, উদারতা, পিতৃত্ব, ভাবপ্রবণতা প্রভৃতি গুণাবলী শিক্ষার্থীর উপর অপরিমিত প্রভাব বিস্তার করে। কিন্তু তত্ত্ব হিসাবে ছাড়া, ব্যবহারিক ভাবে এই বিষয়ে মর্যাদাদান করিতে অতি অল্প ক্ষেত্রেই দেখা যায়। বহির্জগতের সংস্পর্শেই হউক, কিম্বা নিজ স্বভাববশতঃই হউক, অনেক ক্ষেত্রেই শিক্ষকগণের মধ্যে ব্যবসায়ী বুদ্ধিই প্রবল হইতে দেখা যায়। এই জন্যই সাধারণতঃ শিক্ষকগণ আচার্য-পদের মর্যাদার অধিকারী হইতে পারেন না।

সাধারণত কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ছাত্রগণের উন্নতি বা অবনতির জন্য প্রতিষ্ঠানের সুনাম বা দুর্নাম হয়। ইহা স্বাভাবিক। কিন্তু বর্তমানে সাধারণভাবে ইহাতে শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানের ঘনিষ্ঠ সংযোগ নাই। মনে হয়, যেন শুধু সামাজিক জড়তাবশতঃই প্রথানুযায়ী বালক বালিকাকে স্কুলে পাঠান হয়; উহাতে কি ফল, সেই সম্বন্ধে চিন্তা করিবার কোন কারণ নাই। বিদ্যালয়ের কার্যকারিতা সম্বন্ধে একটা নৈরাশ্যের ভাব যেন গা-সহা হইয়া যাইতেছে। তবে নৈরাশ্যের কারণ আছে।

অর্থ উপার্জনের পক্ষে শিক্ষাবিভাগ নিকৃষ্টপন্থা। সুতরাং অন্যান্য বিভাগে যাহারা বিফল হন, সাধারণত তাহারাই অধিক সংখ্যায় এই বিভাগে জীবিকা উপার্জন করিতে আসেন। ইহার ফল বিভাগীয় অবনতি ভিন্ন আর কিছু হইতে পারে না। কারণ, সাংসারিক সাচ্ছন্দ্যের দিকে দৃষ্টিপাত না করিয়া শিক্ষার জন্য জীবন উৎসর্গ করেন, এমন সুযোগ্য ত্যাগী শিক্ষাব্রতী কোনকালে কোন দেশে অধিক সংখ্যায় জন্ম গ্রহণ করেন না। যে বিভাগ হইতে জাতির জীবনে অমৃতধারা প্রবাহিত হইবার কথা, এইভাবে তাহাকে যোগ্যতম ব্যক্তিগণের সেবা হইতে বঞ্চিত রাখা হইতেছে। দেশের ইহা পরম দুর্ভাগ্য।

শুধু তাহাই নহে। যাহারা এখানে প্রবেশ করিলেন, তাঁহাদেরও সর্বশক্তি শিক্ষাবিষয়ে নিয়োগ করিবার সম্ভাবনা নাই। জীবনধারণের জন্য প্রয়োজনীয় ন্যূনতম আর্থিক সংস্থানও অনেক ক্ষেত্রে হয় না। সুতরাং বাধ্য হইয়াই তাঁহাদিগকে উপার্জনের অন্যান্য পন্থাও অবলম্বন করিতে হয়। কোন কোন ক্ষেত্রে এমন কার্যও তাহারা করেন, যাহা গুরুজনের মর্যাদার হানিজনক। কিন্তু উপায়ান্তরও থাকে না। কারণ একেইত পারিশ্রমিক কম, তাহাতে আবার বার্ধক্যের সময়ের জন্য কোন ভাতার সংস্থানও সাধারণত নাই। সুতরাং অবিভক্ত মনোযোগ অধ্যাপনা-কার্যে নিয়োগ করা সম্ভব হয় না। বার্ধক্যে ভাতার বন্দোবস্ত না থাকার আর একটি কুফল এই

যে, যতদিন দেহযন্ত্র চাল থাকে, ততদিন পর্যন্ত চাকুরী করার প্রথা প্রায় প্রচলিত হইয়া যাইতেছে। অথচ ইহা বিনাতর্কে গ্রাহ্য যে বৃদ্ধগণের নিকট হইতে প্রয়োজনীয় দৈনন্দিন কর্মক্ষমতা লাভের আশা করা যায় না। সুতরাং অন্তত ষাট বৎসর বয়সের পর শিক্ষকগণের অবসর প্রাপ্তির বন্দোবস্ত থাকাও প্রয়োজন।

কিন্তু শিক্ষা বিভাগের অর্থোপার্জনের প্রশস্ত ক্ষেত্র করিতে পারিলেই যে সমস্যার সমাধান হইবে তাহা মনে করিবারও কোন কারণ নাই। বর্তমান ব্যবস্থায় যোগ্যতম ব্যক্তির নিয়োগে যথেষ্ট বাধা বিপত্তি আছে। নিয়োগ্য ব্যক্তির শিক্ষকোচিত গুণাবলী অপেক্ষা তাহার বাসস্থান, তাহার সম্প্রদায় এবং অন্যান্য শিক্ষা সম্পর্কে অপ্রাসঙ্গিক বিষয়ের প্রতি অধিক গুরুত্ব দেওয়া হয়। সুতরাং এই রোগ শুধু প্রলেপে সারিবার নহে, ইহার অস্ত্রোপচারের প্রয়োজন।

অপরাপর বিষয়ের মত শিক্ষা সম্পর্কেও সংশ্লিষ্ট সরকারী বিভাগই ইহার প্রধান নিয়ামক। কিন্তু সরকারীভাবে আমাদের শুধু শিক্ষার নিয়ন্ত্রণই আছে, পরিচালনা আছে বলিয়া বলিতে পারি না। পরিচালনা বা সময়োপযোগী পরিচালন প্রণালী নির্ধারণ করা সকলের দ্বারা সম্ভব নহে। যাঁহারা শিক্ষা ব্যাপারে নিষ্ঠা এবং ক্ষমতার পরিচয় দিয়াছেন, তাঁহাদের পরামর্শ গ্রহণ করিলেই উহার সুবন্দোবস্ত হইতে পারে। কিন্তু বর্তমান রাষ্ট্রব্যবস্থায় তাহা উপেক্ষা করা হইতেছে। এই সম্পর্কে একটি উদাহরণ অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। জনৈক M. A. পাশ ভদ্রলোক কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা বিভাগে মাধ্যমিক শিক্ষা সম্পর্কে গবেষণা করিতেছিলেন। তখন এইজন্য তিনি কোন বৃত্তি লাভ করেন নাই। অনেক চেষ্টার পর আসাম গবর্ণমেণ্টের পক্ষ হইতে তাঁহাকে মাসিক মাত্র কুড়ি টাকা বৃত্তি দেওয়া হয়। ভদ্রলোক নিতান্ত জাত শিক্ষক; সেই বৃত্তি গ্রহণ করিয়াই প্রায় দুই বৎসর তিনি গবেষণা কার্য চালাইয়া যান। এই বিষয়ে গবেষণার কোন বন্দোবস্ত তখন বিশ্ববিদ্যালয়ে ছিল না। সুতরাং তাঁহাকে নিয়াই প্রথম নূতনভাবে এই বিভাগ গড়িয়া উঠিতে থাকে। কিন্তু বর্তমান যুদ্ধজনিত পরিস্থিতিতে জীবনধারণের ব্যয় যখন অসম্ভবরূপে বৃদ্ধি পাইল, তখন বাধ্য হইয়াই তাঁহাকে তাঁহার নিতান্ত সাধের কার্যটি অর্ধসমাপ্ত রাখিয়া অর্থোপার্জনের অন্য পথ খুঁজিয়া নিতে হইয়াছে। ইহাতে ব্যক্তিগত প্রশ্ন বাদ দিয়া শুধু দেশের যে ক্ষতি হইল তাহাও ত সরকারী বিভাগ অনুভব করেন না। অথচ বিনা প্রয়োজনে বা সামান্য প্রয়োজনে এই শিক্ষা বিভাগেই নূতন নূতন বড় পদের সৃষ্টি করা হইয়াছে এবং আরও হইবে বলিয়া গুজব শোনা যাইতেছে; কিন্তু এইরূপে বিভাগীয় মস্তিষ্কস্ফীতি দ্বারা শিক্ষায় কোন শুভ প্রেরণা আসিবে, এমন আশা কেহ পোষণ করে না।

গুণগ্রাহিতার অভাবই লোকের প্রকৃত শিক্ষার প্রতি আকৃষ্ট না হওয়ার কারণ। সরকারী কোন বিভাগকেই কর্মশক্তি দ্বারা শক্তিশালী করিবার চেষ্টা করা হয় না। সুতরাং অশিক্ষিত এবং অর্ধশিক্ষিত জন-সাধারণের মধ্যে গুণের আদর প্রসার লাভ করিতে পারে না। কেবল শিক্ষা বিভাগ নহে, সরকারী এবং বেসরকারী সকল প্রকার প্রতিষ্ঠানে যদি ভদ্র, চরিত্রবান এবং সুশিক্ষিত যুবকগণ সর্বাগ্রে স্থান না পায়, তবে পরোক্ষভাবে শিক্ষার বিরোধিতাই করা হয়। পরন্তু কার্যক্ষেত্রে এই সকল গুণ পুরস্কৃত হইলে উচ্চ শিক্ষার প্রসারে অপরিমিত প্রভাব বিস্তার করিবে। শিক্ষার সাংসারিক মর্যাদা যত বাড়িবে, শিক্ষা ততই জনপ্রিয় হইবে।

বিদ্যালয়ে শিক্ষক নিয়োগে সাম্প্রদায়িক অনুপাত রক্ষার ব্যবস্থায় যে এই বিভাগ ক্রমশ দুর্বল হইয়া পড়িতেছে তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। পুত্রের অসুখের সময় যখন ডাক্তার ডাকিতে হয়, তখন এই কথা মনেও পড়ে না যে ডাক্তার কোন সম্প্রদায়ের লোক। অথচ শিক্ষিত বলিয়া পরিচিত এবং কত সম্পন্ন ব্যক্তিগণ কিভাবে যে নিজ নিজ পুত্রকন্যার জন্য জানিয়া শুনিয়া শুধু জাতের খাতিরে নিকৃষ্টতর শিক্ষকের বন্দোবস্ত করিতে পারেন, ইহা দুর্ভেদ্য সমস্যা। তাঁহাদের কি এই ধারণা যে মোট বহন করার মত যে কোন লোক শিক্ষকতাও করিতে পারেন? এইজন্যই তাঁহাদের শিক্ষা দীক্ষা সম্বন্ধে সন্দেহ হয়।

কিন্তু তাহাদের নিকট হইতে ইহার অধিক আশা করা বৃথা। যে শিক্ষা ব্যবস্থা প্রচলিত আছে, তাহাকেও যদি কেতাবদুরস্ত ভাব ত্যাগ করাইয়া কার্যকরী ভাব গ্রহণ করান যাইত, তবুও বর্তমান অপেক্ষা অধিকতর শুভফল আশা করা যাইতে পারিত। উদাহরণ-স্বরূপ বলা যাইতে পারে যে, বর্তমানে বিভাগীয় পরিদর্শকগণের স্কুল পরিদর্শনকে অনেকটা আংশিক হিসাব-নিকাশ মাত্র বলা যাইতে পারে। পরিদর্শনের সংবাদ কয়েক-দিন পূর্বেই সংশ্লিষ্ট বিদ্যালয়ে জানাইয়া দেওয়া হয়, যেন স্কুল কর্তৃপক্ষ উহাকে দর্শনযোগ্য করিয়া রাখিতে পারেন। কলিকাতা বেড়াইয়া গিয়া বিদেশীয়গণ বঙ্গ-দেশ সম্বন্ধে তাহাদের অভিজ্ঞতা যেমন বর্ণনা করেন, বিদ্যালয়ের পরিদর্শকগণ বর্তমান ব্যবস্থায় তাহারই অনুরূপে কার্য করিয়া থাকেন। ইহাতে পরিদর্শকের মন ভাল থাকিতে পারে; কিন্তু দুষ্টব্যের ভবিষ্যতের কোন শুভ সূচনা হয় না। ছাত্র-শিক্ষক সকলেই ইহাকে একটা নৈমিত্তিক উৎসব বলিয়া ধরিয়া রাখিয়াছে।

পরিণামের দিকে এই যে, উদাসীনতা, ইহার মূল কারণ রাষ্ট্র ব্যবস্থায় গলদ। মস্তিষ্ক বিকারগ্রস্ত হইলে সবল অঙ্গ প্রত্যঙ্গও প্রয়োজনীয় কর্ম সম্পাদনে অপারগ হয়। সুতরাং দেশের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে উদাসীন রাষ্ট্র ব্যবস্থায় শিক্ষা বা কোন বিভাগেই শক্তিমত্তার পরিচয় পাওয়া যাইতেছে না। অন্তত শিক্ষা বিভাগের এই দুর্দশা মোচনের জন্য দেশের পিতৃকল্প ব্যক্তিগণকে সমবেত হইয়া পন্থা নির্দেশ করিতে হইবে। যদি রাজশক্তি ইহার সহায়তা করে, উত্তম। যদি না করে তবে জন-সাধারণকেই এই প্রচেষ্টায় শক্তি যোগাইতে হইবে।

জীবন-রঙ্গ

শ্রীসতীশ রায়

প্রফেসর অনন্ত পাকড়াশীর স্ত্রীর মত যে, মেয়ে যখন দুটো পাশ করেছে তখন যথেষ্ট হয়েছে। এবার তার বিয়ের চেষ্টা চলতে পারে। কিন্তু বীণা জিদ ধরেছে সে বি এ পড়বে। বি এ পড়া আর কিছু না, বিয়েটাকে এড়ানোর একটা পন্থা। অনন্ত প্রফেসর-পত্নীর তাই ধারণা। কেন যে সে এমন করেছে তা' তিনি বোঝেন না। তাঁর ঐ বয়সে ত তিনি সানন্দে ঘর-সংসার করেছেন। আজকালকার মেয়েদের মনের অন্ত পাওয়া ভার। তিনি পিছিয়েই আছেন বলতে হবে।

বীণার উনিশ বছরের জন্মদিন আজকে। কিন্তু সকাল হ'তেই মেয়ে আলুথালু বেশে ঘরের কোণে বসে। যেন মন-মরা। তিনি উদ্বিগ্ন হয়ে তার চুলের উপর হাত রেখে সস্নেহে জিজ্ঞেস করলেন, তোকে আজ এত শুকনো দেখাচ্ছে কেনরে খুকী? অসুখ করেনি ত কিছু?

আবার তুমি আমাকে খুকী বলে ডাকছ মা, বারণ করে দিয়েছি না কতদিন! বীণা রাগ করে বলে উঠ্‌ল।

প্রফেসর-পত্নী মৃদু হেসে বললেন মা'র কাছে মেয়ে বড় হয় নারে! খুকী থাকে চিরদিন! বীণা তেমনি ভাবে বললে, তোমরাই ত আমাদের বড় হতে দিতে চাও না। আঁচল-চাপা দিয়ে ঘরের কোণে চেপে রাখতে চাও!

মা সস্নেহে বললেন, আচ্ছা পাগলী ত! একলাটি চুপ করে বসে কেন তাই আগে বল্।

বড় ক্লান্ত মা, আমাকে তোমরা শান্তিতে থাকতে দাও তো! বীণার কণ্ঠস্বর এবার কোমল, যেন কান্না-জড়ানো।

প্রফেসর-পত্নী বল্‌লেন, বেঁচে থাকতে থাকতে তোর সুখ-শান্তির ব্যবস্থাটা আমি পাকাপাকি করে যেতে চাই রে!

সে কি তোমার হাতে নাকি? কেমন করে তুমি করবে? বীণা সোৎসুকে শুধালে।

মা বললেন, কেন? তোর বিয়ে দিয়ে! মেয়ে বড় হলে মায়ের মনে যে কত ভাবনা হয় তা আর তুই কি বুঝবি?

বীণা একটু চুপ করে থেকে শুধাল, তোমরা কি করতে চাও, শুনি?

মা একটু উৎসাহিত হয়ে বল্‌লেন, তবে তোকে ভেঙে বলি। আজ তোর জন্মদিনে উনি সেই সব পুরনো ছাত্রদের নেমন্তন্ন করেছেন যারা আমাদের সমাজের পয়সাওয়ালা লোকের ছেলে এবং নিজেদের ভেতরও বড় হবার প্রমিস আছে। উপরন্তু তোরও বন্ধু তারা!—

বীণা অবজ্ঞার হাসি হেসে বল্‌লে, বন্ধু হবে বর! সত্যি মা, তোমার কথায় হাসি পায়, আবার ভয়ও করে।

প্রফেসর-পত্নী নিজের গালে আঙুল ঠেকিয়ে বললেন, একে মেয়ে, তাতে বয়স হয়েছে বিয়ের। উপযুক্ত পাত্রদের জন্মদিনে নিমন্ত্রণে একত্র করা হচ্ছে—আগেকার দিনের স্বয়ংবর-সভার মত। যাকে তোর পছন্দ হবে তার সঙ্গে কথা চল্‌তে পারে। এ তো ভাগ্যের কথা রে। ওঁর কাছে পড়তে এসে অনেকের সঙ্গে আলাপ পরিচয় হবার সুযোগ ঘটেছে বলেই না এটা সম্ভব হচ্ছে। এতে ভয় পাবার কি আছে?

আমার কথা তুমি বুঝবে না মা, বীণা মুখ নীচু করে হাতের নখ খুঁটতে খুঁটতে বল্‌লে।

মা বল্‌লেন, বুঝব আবার কিরে? আমাদের দেশে বল-নাচের চলন নেই। অনাত্মীয়দের সঙ্গে মেলামেশার পরিধি ছোট। পুরুষকে চেনা বোঝার সুযোগ কম। কিন্তু তাই বলে বিয়ের মধ্যে ভয় পাবার কিছু নেই। তুই বরং তোর দিদি অনীতাকে জিজ্ঞেস করে দেখিস।

কি যে তুমি বল, আমি কি তাই বলছি? বীণার গাল লজ্জায় লাল হয়ে উঠ্‌ল। সে ভাবছিল অন্য কথা। যে বন্ধুটির কথা মনে এসেছিল, স্বামীর পদবী পেলে তার কাছে কি আর এমন ব্যবহারের আশা থাকবে? এখন যে উমেদার তখন তার হবে অধিকার। অবস্থাটা দাঁড়াবে বিপরীত। বীণা গম্ভীরভাবে ঘাড় নেড়ে বল্‌লে, আমার কথা বুঝবে না মা! নিজের ভাবনার পেছনেই তুমি ঘুরে মরছ। জীবনে আমার উচ্চাশা আছে। বিয়ে করলে সেটা হবে মাটি। আমাকে ভেবে দেখতে সময় দাও।

বিয়ে করবি, তার আবার এত ভয়-ভাবনা কি? জানিনে বাপু,—কথা অসমাপ্ত রেখেই বিরক্ত মুখে মা মেয়েকে ঘরের মধ্যে একলা ফেলে রেখে চলে গেলেন।

ভাগ্যক্রমে আজ হয়ে পড়েছে রবিবার। সকাল থেকেই শুভ কামনার সঙ্গে নানারকম উপহার এসে পড়তে লাগলো। ফুলের তোড়া আর জিনিসপত্রে বসবার ঘরের বড় টেবিলটা দেখতে দেখতে ভরে উঠ্‌ল। প্রফেসর-পত্নী বাবুর্চি মশালচিদের নিয়ে খাবার জিনিসের তদারক করে ফিরছেন। বসবার ঘরে কে এল না এল দেখেও যাচ্ছেন মাঝে মাঝে। নিমন্ত্রিতদের মিষ্টি-মধুর কথা দিয়ে তুষ্ট করবার ত্রুটি নেই। এতক্ষণে স্নান ও টয়লেট করা সেরে বীণা পরেছে একখানা লাল পেড়ে সাদা গরদের সাড়ী ও ব্লাউজ। তাতেই তাকে লক্ষ্মী ঠাকরুণটির মত দেখাচ্ছে। কালো চুলের গোছা জড়িয়েছে মস্ত এলো খোঁপায়। তাতে গুঁজেছে হেনার মঞ্জরী। এলো খোঁপাটা যেন মোম দিয়ে গড়া সাদা ঘাড়ের ওপর পড়ে বর্ণবৈষম্যে দেখাচ্ছে অপরূপ। ঘরের এক পাশে পিয়ানোর কাছটিতে বসে। মুখখানি এখন তার হাসি-হাসি। আর তাকে ঘিরে বসে আছে বন্ধু-বান্ধবীদের মধ্যে জনকয়েক।

কেউ কেউ এসেছে—কিন্তু অনেকেই এখনো এসে পৌঁছয় নি। ঠিক হয়েছে সকলে মিল্‌লে মোটর-বাস করে বালির কাছাকাছি গঙ্গার ধারে কোনো একটা বাগান-বাড়িতে গিয়ে তারা পিকনিক করবে। তারপর সমস্ত দিনটা সেখানে কাটিয়ে সন্ধ্যায় কলিকাতা ফিরবে।

প্রফেসর পাকড়াশীর কোনো একটি বন্ধু এই উপলক্ষে তাঁর গঙ্গার ধারের বাগান-বাড়িটা এক দিনের জন্যে ধার দিয়েছেন। সেখানে যখন তারা পৌঁছল তখন প্রায় দশটা বাজে। ন'টায় পৌঁছবার কথা। কিন্তু সময়-নিষ্ঠা সম্ভব হল না। যার জন্যে পার্টি তার আগমন-প্রতীক্ষাই বিলম্বের কারণ। দিলীপের আসতে দেরী হয়ে গেল। তাকে ছেড়ে প্রফেসর-গিন্নীর যেতে মন সরল না। প্রফেসর পাকড়াশী সারা সকাল কি একটা লেখা নিয়ে ব্যস্ত। তিনি আস্‌তে পারলেন না।

বাগানে পেয়ারা আর জাম পেকেছে অপর্যাপ্ত। তারা হৈ হৈ করে গাছে চড়ে প্রথমেই অনেকগুলো পেড়ে খেলে। তারপর পুকুর সাঁতরিয়ে হাঁপাই জুড়ে স্নান করে হয়ে পড়ল রীতিমত ক্লান্ত। যেন শহরে ইঁটকাঠ পাথরের কারাগার-মুক্ত সব ছেলে মেয়েদের দল!

ওধারে বড় বট গাছটার তলায় ইঁট সাজিয়ে মাটির অস্থায়ী উনোন করা হয়েছে। তাতে শুকনো কাঠের জ্বাল দিয়ে আহার্য তৈরীর আয়োজনে ব্যস্ত কয়েকজন বন্ধুবান্ধবী।

প্রফেসর-পত্নী মাঝে মাঝে এসে দেখিয়ে শুনিয়ে দিচ্ছেন। তিনি বল্‌লেন, বাবুর্চি

মশালচিদের আনলে ভাল হত। তাহলে এতটা ঝঞ্ঝাট পোয়াতে হত না।

অনীতা ঝঙ্কার দিয়ে বললে, সে ত সব দিনই হয় মা! একদিনও কি ঐসব দাড়িঅলা 'বয়'দের হাত থেকে নিষ্কৃতি পেতে নেই?

মা বললেন, পারলে ত ভাল। কিন্তু সে আর হয়ে ওঠে কই?

দিলীপ বললে, সত্যি দেখুন, যত অদ্ভুত খেয়াল বীণার। জন্মদিনে গার্ডেন পার্টিতে আত্মীয় বন্ধু নিয়ে এলেন পিকনিক করতে। কোথায় ফুল ফুটেছে দেখবেন, পাখী গাইছে শুনবেন? তা না, কোমরে আঁচল জড়িয়ে হাতে তেল হলুদ মেখে এমন দিনে রান্নার কাজে বন্ধ!

দিচ্ছি তাকে পাঠিয়ে, আর দেখি রান্নার কতদূর কি হল, বলে প্রোফেসর-পত্নী উঠে গেলেন।

খানিক পরে বীণা হাতে সাবান ঘসতে ঘসতে দেখা দিলে। উনানের আঁচের কাছে থেকে মুখখানা হয়ে উঠেছে টুকটুকে লাল—আর তার উপর ফুটে উঠেছে মুক্তার মত ঘামের বিন্দু। ঠোঁটের উপর কালো তিলটি বর্ণবৈষম্যে সুস্পষ্ট। তার দিদি অনীতা তাড়াতাড়ি তোয়ালে দিয়ে বীণার মুখটা মুছিয়ে দিলে। তারপর ভ্যানিটী-ব্যাগ খুলে পাউডার-পাফটা নাকের ডগায় বুলুতে বুলুতে বললে, আজ রাঁধলে রোজই রেঁধে মরতে হবে বীণা! মনে রাখিস আজ তোর জন্মদিন!

বীণা তার পাউডার-পাফটা হাত দিয়ে সরিয়ে বললে, তোর মত রাতদিন পুতুলটি সেজে আমি বসে থাকতে পারি না অনীতা —আমি চাই কাজে লাগতে!

পিঠোপিঠি বোন। তাই ছেলেবেলা থেকে নাম ধরে ডাকে। দিদি বলা অভ্যেস নেই। রাতদিন ধরে পরস্পর চলছে খুনসুড়ি আর ক্ষ্যাপানো।

রমেন মজুমদার শিল্পী। সে বললে, অন্নের থালা হাতে আপনাকে মানায় কিন্তু সুন্দর। মনে হয় যেন অন্নপূর্ণা।

দিলীপ হেসে বললে, পেটুকের কেবল খাওয়ার চিন্তা। তোমাকে পরিবেশন করলে যদি মনে হয় যে, শিবকে ভিক্ষা দিচ্ছেন, তাহলে কিন্তু আমার আপত্তি আছে।

অনীতা হাসিতে যোগ দিয়ে বললে, ডুয়েলটা চলুক না ততক্ষণ। খাবারের এখনো অনেক দেরী। তারপর—

রমেন হেসে বললে, এ জাতীয় নিরামিষ 'ডুয়েলে' কি আপনাদের রুচি আছে?

অনীতা কৃত্রিম কোপ প্রকাশ করে বললে, মেয়েদের কি আপনি মাংসাশী বলতে চান?

রমেন হেসে বললে, আমি কিছু বলতে চাই না। নিজের কথাতেই আপনি ধরা দিচ্ছেন।

অনীতা সংক্ষেপে বললে, এ অপবাদে আমার আপত্তি আছে।

রমেন বললে, কিন্তু সত্য হলে ত সমর্থন করবেন? এ দেশের সাধুপুরুষেরা এই-খানেই থেমে যান নি।

বীণা আলোচনায় যোগ দিয়ে বললে, রক্তপায়ীও বলেছেন, 'পলক পলক লহু চোষে!' যারা নিজেদের দুর্বলতা অপরের দৌর্বল্যের উপর আরোপ করে, তারা কাপুরুষ—সাধুপুরুষ নয়।

রমেন্দ্র লজ্জা পেয়ে চুপ ক'রে গেল।

বীণা উত্তেজিত হয়ে বলতে লাগল, আমাদের দেশের মুনি ঋষিদের জীবন-কথা ও বাণীতে দেখি যে, তাঁরা মেয়েদের means to an end ছাড়া আর কিছু মনে করতে পারেন নি। নইলে 'পুত্রার্থে ক্রিয়তে ভার্যা' কথাটার কোনো মানে হয় না।

দিলীপ বললে, সে কি? এদেশের আরাধ্য দেবতাদের চেয়ে দেবীদের সংখ্যা যে অনেক বেশি!

বহু বিবাহ কি তাঁদের মধ্যেও প্রচলিত ছিল? বীণা হেসে জিগ্গেস করল।

অনেকগুলো চেয়ার পেতে গাছতলায় তাদের সভা বসেছিল। বীণার গায়ে, মুখে গাছপালার ফাঁকে পড়েছিল বেলা বেড়ে ওঠার কড়া রোদ্র। বিস্রস্ত রুক্ষ অলকে ঘেরা সুন্দর মুখে জেগেছিল মুক্তার মত ঘামের বিন্দু। দিলীপ চেয়ার ছেড়ে বললে, আপনি এটাতে এসে বসুন বীণা দেবী! গায়ে মুখে বড় রুদ্দুর লাগছে।

বীণা বসে বসেই বললে, না, ধন্যবাদ! আপনি বসুন। রুদ্দুর লেগে কোমল গায়ে ফোস্কা পড়বে না; ভয় নেই। আপনার মত আধুনিকরাই মধ্য যুগের 'সিভালরি' দেখিয়ে আমাদের করে তুলতে চান অবলা! নানা স্তুতিবাদে হিপনোটাইজ করে ভাবতে শিখিয়েছেন কোনো কাজে আমাদের এক কড়ার মুরোদ নেই। আমরা দুনিয়ার সকল কাজের বার। ঠোঁটে রং, মুখে রুজ, চুলে ফুল গুঁজে শাড়ি সায়া ব্লাউজে পুতুল সেজে থাকাই একমাত্র কাজ।

অনীতা তার কথার ঝাঁজে হেসে ফেললে, বললে, সত্যি তুই কী অকৃতজ্ঞ! তোকে দিলীপবাবু রুদ্দুর ছেড়ে ছায়ায় বসতে দিতে চাইছেন, তাতেও তোর রাগ?

বীণা বললে, রাগের কথা না দিদি! মেয়েদের সমান অধিকার মানতে হ'লে আমার সুখ সুবিধার জন্য চেয়ার ছেড়ে ওঠাতে মান বাড়ে না, বরং কমে!

দিলীপ বিলেত ঘুরে এসেছে। সে অপ্রস্তুত হবার পাত্র নয়। বললে, সাম্যবাদ যেখানে অতি প্রবল সেই ফ্রান্সেও এ দস্তুর আছে।

বীণা উত্তর দিলে, শুধু সুন্দরী মেয়েদের দেখলে ইউরোপে পুরুষ আসন ছেড়ে ওঠে। সেটা নিছক নারীপূজা নয়, সৌন্দর্যের পূজা।

রমেন মজুমদার হেসে বললে, তাহলে ত আপনার আপত্তি থাকা উচিত নয়।

বীণা চুপ করে থাকল।

দিলীপ বললে, আমি অদ্বৈতবাদী নই। কিন্তু সে কথা থাক্। এধারে যে ক্ষিদেয় নাড়ী চুঁই চুঁই করছে। আলোচনার চাইতে আহার্যই এখন রুচিকর।

বীণা হেসে বললে, তবেই দেখুন পেটের ক্ষুধা প্রিমিটিভ, মনের ক্ষুধা আধুনিক।

রমেন হেসে বললে, জ্বর হ'লে ত কুইনাইন গিলতেই হবে, তখন সেটা সুগার কোটেড করে নিতে আপত্তি কি?

অনীতা বললে, জ্বর যাতে না হয় সেই রকম সাবধানে আমাদের থাকা উচিত।

রমেন বললে, সেটা প্রাকৃতিক বিধানের বাইরে। শরীর যখন ধারণ করা গেছে, তখন আমরা তার এলাকার মধ্যে। সুতরাং আমাদের জ্বর আসবেই।

প্রফেসার-গিন্নী শেষ কথাটা শুনতে পেয়ে বারান্দা থেকে হেঁকে বললেন, আর জ্বর এসে কাজ নেই। তোমরা খেতে এস। জায়গা হয়েছে।

দিলীপ যেতে যেতে বললে, আলোচনা বিলাস, আর খাওয়া প্রয়োজন। প্রয়োজনের চাইতে বিলাসের দাম বেশি। প্রয়োজন কিন্তু অপরিহার্য।

দিলীপ আজ খুব শুদ্ধ বাঙলা বলছে। রমেন হেসে উঠল।

বিলেত ফেরতের কাছে এর চেয়ে বেশি আর কি আশা করবে? অনীতা তার হাসিতে যোগ দিলে।

আহারাদির পর বিশ্রামের পর্ব। গাছের তলায় সতরঞ্চি বিছিয়ে কেউ বসলেন লুডো খেলতে। যাঁরা তাস খেলার ভক্ত তাঁরা তাস নিয়ে বসলেন। ঘরের মধ্যে কারমবোর্ডের গুটি ও স্ট্রাইকারের আওয়াজ ঘন ঘন উঠতে লাগল। একটি টেবিলের উপর নেট খাটিয়ে পিংপংও চলতে লাগল।

প্রফেসর-গৃহিণী দিলীপ ও বীণাকে-মহিলা জনোচিত কৌশলের সঙ্গে একলা হবার অবসর দিতে চান। তিনি বললেন, তুই যে সেতারে নতুন গৎটা শিখেছিস গঙ্গার ধারে ঐ গাছতলায় বসে দিলীপকে শোনাগে যা না। দিলীপ একজন গানের সমজদার।

বীণা মায়ের উদ্দেশ্য যে বোঝে না তা নয়। কিন্তু সে যেন বনের হরিণী, ধরা দিতে নারাজ। প্রেমের প্রতিদ্বন্দ্বী না পেলেও তার মন ওঠে না। সে বললে, রমেনবাবুই বা কি অপরাধ করেছেন যে, সেটা শুনতে পাবেন না?

প্রফেসর-পত্নীর মুখের ওপর বিরক্তির কালো মেঘ ঘনিয়ে এল। তিনি আর কথা না

বলে সেখান থেকে চলে গেলেন। কিন্তু বীণা তা উপেক্ষা করেই আবার বললে, আসবেন আমাদের সঙ্গে রমেনবাবু, সেতারে আমার নতুন শেখা গৎটা শুনতে?

খুব আনন্দের সঙ্গে বীণা দেবী! বলে রমেন এসে পড়ল।

দিলীপের আর বোঝা-পড়ার অবসর বুঝি ঘটে ওঠে না। তবু দিলীপ মুখে হাসি টেনে এনে বললে, আমাকে আপনার সেতারটা বয়ে নিয়ে যাবার অনুমতি দিন।

বীণা হাসতে হাসতে হাত তুলে বললে, তথাস্তু! আপনাদের কথা শুনলে আমার ভারী হাসি পায়। কিন্তু তবু শুনতে ভালো লাগে। কোনোমতে আমাকে ভুলতে দেবেন না বুঝি আমি অসহায় এবং অক্ষম! একটা হাল্কা সেতার বয়ে নিয়ে যাবারও যোগ্য নই।

এটা ত ভালো কথা, রমেন বোকার মত হেসে উঠল।

বীণা মুচকে হেসে বললে, কিন্তু একটা ব্যাপারের পর এই ভালো কথাগুলোই কালো হয়ে ওঠে—দু'এক বছর যেতে না যেতে!

দিলীপ অন্যমনস্ক হয়ে শুধালো, ব্যাপারটা কি?

বীণা তেমনি করে হেসে বললে, বিয়ে!

গঙ্গার বুকে পাল তুলে নৌকা চলেছে—যেন দিবানিদ্রার স্বপ্ন। নদীতে জোয়ার এসেছে। পাড়ে জলের ঢেউ লেগে ছলাৎ ছলাৎ শব্দ হচ্ছে। কাঠবিরালীরা পিঠে ন্যাজ তুলে গাছের গা বেয়ে নেমে অসঙ্কোচে তাঁদের সতরঞ্চির ওপর উঠে এল পাঁউরুটির টুকরা খেতে। মাঝে মাঝে চারদিকে ভয় চকিত দৃষ্টি মেলে, দুই হাত দিয়ে তুলে ধরে, কুটুস কুটুস করে খাচ্ছে। কাঠঠোকরা পাখী তার লম্বা ঠোঁটের ঘা মেরে ঠকঠক শব্দ করে গাছের গায়ে ফোকর তৈরী করছে, বাসা বানাবার জন্যে। একটা হলদে পাখী নীল পত্রপুঞ্জের আড়াল থেকে হঠাৎ ডাকতে লাগল।

লোকজনের মধ্যে শুধু তারাই। আর কোনো দিকে কেউ কোথাও নেই। সব শূন্যতাকে সুরে ভরে সহসা সেতারের মধুর গম্ভীর আওয়াজ জাগল। মনের অজানিত বেদনা যেন কাঁদছে। দুজনেরই বুক থেকে দীর্ঘনিঃশ্বাস উঠল। অকারণে চোখের কোণে জল আসতে চাইল। কি যেন পেয়েছিল, আজ তা হারিয়ে গেছে—তারি জন্যে জাগছে বেদনা! দুজনের মনে ইচ্ছে হ'ল শিল্পীকে আরো কাছে পাবার। তার হাতে হাত রেখে আত্মার সঙ্গীত শুনবার। দিলীপ নিজের অজ্ঞাতসারে বীণার পাশে আর একটু ঘেঁষে বসল।

সত্যি, আপনার হাত খুব মিষ্টি।—দিলীপ বাজনা শেষে বলে উঠল।

বীণা হেসে বললে, আপনার ও কথার পর বিদেশী রীতি অনুসারে আমার ধন্যবাদ দেওয়া উচিত!

রমেন বললে, না, আপনি আমাদের আনন্দ দিলেন। ধন্যবাদ বরং আপনার প্রাপ্য। বীণা হেসে বললে, তবে আর সে ত্রুটিটা থাকে কেন? রমেন বললে, ধন্যবাদ দেওয়া এবং পাওয়ার মধ্যে কেমন যেন দেনা-পাওনা মিটে যাবার ভাব আছে। কিন্তু আপনি যে আনন্দ দিলেন তা যে অফুরন্ত—কেননা, তা শিল্প।

বীণা হাসি মুখে ভরা মনে চুপ করে থাকল। কিন্তু দিলীপের মুখের চেহারা দেখে রমেন দুঃখিত হল। সে উঠে দাঁড়িয়ে বললে, আচ্ছা আমি উঠি। বাগানের ওধারটা একটু ঘুরে আসবার ইচ্ছে। আপনারা বসুন—বলে সে দিলীপকে মুসড়ে-পড়া থেকে মুক্তি দিয়ে সরে গেল।

দিলীপের সঙ্গে একলা হলে বীণার অস্বাচ্ছন্দ্য বোধ হয়। কেন যে তা সে বলতে পারে না। তাই সে কথার অন্তরাল খুঁজল। তার দিক চেয়ে বললে, আত্মপ্রশংসা শুনতে বেশ মিষ্টি লাগে, না?

কথাটা হয়ত দিলীপেরই বলা উচিত ছিল। কিন্তু বীণা হল অগ্রসর। মনে জ্বালা চড়ল বলে, না ভেবে চিন্তে দিলীপ ঠাট্টা করে বসলে, বিশেষ করে তা যদি প্রিয়জনের কাছ থেকে হয়।

বীণা বললে, এখানে আপনার সঙ্গে একমত হতে পারলাম না। আমি চাই আমার নিজের সত্তাটিকে আবিষ্কার করতে। তাই কোনো উদ্দেশ্য নিয়ে প্রশংসা নয়, যে প্রশংসা স্বতঃস্ফূর্ত তার পরেই আমার লোভ।

দিলীপ এবার আত্মস্থ হয়ে শুধালে, তা নিয়ে আপনার কি হবে।

বীণা বললে, সকলকে দেবার মত আমার যে দান আছে তার পরিচয় পাব। নেবার মত যে দাম তাও বুঝে নেব।

তৃতীয় ব্যক্তির অনুপস্থিতিতে তাদের কথাবার্তা আরো অন্তরঙ্গ হয়ে এল। দিলীপ জিগ্গেস করল, একজনের প্রশংসায় তোমার মন ভরে না?

বীণা সংক্ষেপে বললে, না।

দিলীপ নিঃশ্বাস ফেলে বললে, নিজেকে চিনতে আমাদের অনেক দেরী লাগে।

বীণা বললে, দুইয়ের ভেতর একের পরিচয়ে আমার আস্থা নেই। দশের ভেতরেই একের প্রকৃত পরিচয়।

দিলীপ ম্লান হেসে বললে, তুমি একভাবে ভাবছ, আর আমি অন্যভাবে—আমাদের দুজনার ভাবনা ভিন্নমুখী।

বীণা হেসে বললে, কিন্তু লক্ষ্য এক। দিলীপ খানিকক্ষণ চুপ করে থাকল। তারপর সহসা বলে উঠল, হেঁয়ালী বুঝি না, আমি পৃথিবীর লোক। তারপর সে বীণার একখানা হাত নিজের হাতের মধ্যে টেনে নিয়ে বললে, অনুভব করেছি আমরা দুজনে এক স্ফীয়ারের মানুষ!—তোমাকে আপন করে পেতে চাই, বীণা! তুমি আমার হবে?

বীণার চোখে ভেসে উঠল বিজয় গর্বের দৃষ্টি! সে হাত টেনে নিলে না। মৃদু হেসে বললে, আমাকে তুমি সম্মানিত করলে দিলীপ। নিজেকে অবশ্য তার অযোগ্য বলে মনে করি না। কিন্তু আমি হতে চাই শিল্পের, আমি হতে চাই বিশ্বের!

দিলীপ খানিক ভেবে বললে, বাবা কিছু রেখে গিয়েছেন। প্র্যাকটিসেও ভবিষ্যতে পশার হবে আমার আশা। তুমি যদি আমার জীবনের মধ্যে এস ত তোমার শিল্পচর্চার সুবিধা করে দেব। তোমাকে সংসারের ভাবনা ভাবতে হবে না।

বীণা ঘাড় নেড়ে বললে, সে হয় না। তা হলে আমি ঘর-সংসারে চাপা পড়ে যাব।

দিলীপ দুষ্টু হেসে বললে, যাতে না পড় সে ব্যবস্থাও আমার জানা আছে।

বীণা সহসা উত্তেজিত হয়ে বলে উঠল, তোমার ওপর আমি নির্ভর করব কেন? তুমি আমাকে অশ্রদ্ধা করতে চাইছ? আমার আত্ম-বিশ্বাসে আঘাত করছ!

বীণার কথায় দিলীপের ধাঁধাঁ লাগল। সে মূঢ়ের মত জিগ্গেস করলে, তাহলে কি চাও তুমি?

বীণা বললে, টাকাকড়ির দিক থেকে স্বাধীন হতে। অবশ্য সেটা বাইরের কথা।

দিলীপ বললে, স্বামীর ধনে ত স্ত্রীর অধিকার।

বীণা হেসে বললে, বিগত যুগের উক্তি। আধুনিকাকে তুমি ওকথা বলে ভোলাতে পারবে না।

দিলীপ বললে, তোমার বাবার কাছ থেকেও ত তুমি মাসে মাসে এলাউন্স পাচ্ছ?

বীণা আবার উত্তেজিত হয়ে বললে, সে কথা সত্যি! অত্যন্ত নিষ্ঠুর সত্যি। আজ আমার উনিশ বছরের জন্মদিন। আজ থেকে যা উত্তরাধিকারসূত্রে পাওনা তাকে করব ঘৃণা। উপার্জিত যা কিছু তাই হবে আমার গৌরবের! দিলীপ হাল ছাড়ল না, বললে, বলেছি ত তোমার শিল্প-চর্চায় আমি সাহায্য করব।

বীণা এবার তার হাতখানা দিলীপের মুঠো থেকে মুক্ত করে নিলে, বললে, তুমি আমাকে বুঝবে না দিলীপ! প্রতিকূলতাই শিল্পের প্রাণ। অভাবের অন্ধকারে বসেই সে আলোর ফুল ফোটায়।

সে আলোর ফুল ফোটায়। দিলীপ নিঃশ্বাস ফেলে বললে, য়ুরোপে ঘুরেছি দীর্ঘ দিন। স্থির বিদ্যুতের মত কত সুন্দরী দেখলাম। তোমার মধ্যে যে গভীরতা, যে মাধুর্য, তাদের তা নেই। তোমার আবেশ-ভরা চোখ দুটি যেন আত্মার জানলা। তুমি সহজে নিজেকে প্রকাশ করতে পার। এমন উদাস-করা রূপ কোথাও চোখে পড়ল না।

বীণা হাসতে হাসতে বললে ঠিক নাটকের মত কথা বলছ! তোমার কম্‌প্লিমেণ্টের জন্যে অজস্র ধন্যবাদ! কিন্তু সেটা বিধাতার প্রাপ্য, আমার নয়। ওতে ত আমার হাত নেই। যে সৌন্দর্য আমি সৃষ্টি করব তাকেই কেবল আপন বলে যেন গর্ব করতে পারি।

দিলীপ বললে, সৃষ্টিকর্তা তোমাকে যে সুন্দর করেছেন সেটা কি এতই অবজ্ঞার?

বীণা এবারও হেসে বললে নিতান্ত ওপরের জিনিস নিয়ে তোমার কারবার! দুবছর যেতে না যেতে উল্টো কথা শুনতে হবে, ভয় হয়। তাতে আমি প্রস্তুত নই, বলে সে যাবার জন্য উঠে দাঁড়ালে।

তার দিকে চেয়ে দিলীপ জিগগেস করলে, যাচ্ছ?

সে হেসে বললে, হ্যাঁ। সারা দুপুর আমাকে একচেটে করে রাখলে; অন্য অতিথিরা তোমার ওপর খুসী হবেন না।

আচ্ছা, তুমি কি বলতে চাও? দিলীপ জিগ্‌গেস করলে।

বীণা গম্ভীর হয়ে উত্তর দিলে, আমি হতে চাই তারকা—ফিলমস্টার!

দিলীপ প্রথমে বিস্ময়ে অবাক হয়ে গেল। তারপরে উঠল হেসে, বললে, সত্যি?

বীণা বললে, হাসছ? আমার উচ্চাশাটা কি হাসবার মত?

দিলীপ বললে, না, তা নয় তবে—

বীণা তাকে বাধা দিয়ে বললে, একজন আধুনিকার জন্মদিনের আশা আকাঙ্ক্ষা শুনে খুসী হলে না বোধ হয়।

দিলীপ আমতা আমতা করে বললে, প্রফেসনটা ঠিক গৃহস্থ মেয়ের উপযুক্ত কি? অন্তত এখনো তেমন চল হয়নি!

বীণা অধীর হয়ে বললে, কিন্তু বাধা কি? আমার মধ্যে যে আনন্দ-দানের শক্তি আছে, অনেককে বঞ্চিত করে একজনকে কেন দেব না, এই তোমার অভিযোগ? কিন্তু সে ত তোমার আদিম স্বার্থপরতা! তা নিয়ে আধুনিকতার গর্ব করা চলে কি?

দিলীপ বললে, কঠিন প্রশ্ন। তারপর এক সঙ্গে এতগুলো শুনেই আমি জবাব দিতে পারি না।

বীণা বললে, আচ্ছা ভেবে দেখো। আজকে এই পর্যন্ত। তবে তোমরা বল, মেয়েদের না কি মনের কোনো স্থিরতা নেই—

তার ওপর নির্ভর করা ত বড় মুস্কিল, দিলীপ হেসে উত্তর দিলে।

বীণার গলার স্বর একেবারে নেমে গেল। সে হাতের নখ খুঁটতে খুঁটতে বললে, যদি তোমার ধৈর্য থাকে—বলতে পারি না—দূরের কথা!—

দিলীপ উৎসাহিত হয়ে বললে, তোমার জন্যে আমি অনন্তকাল অপেক্ষা করতে পারি, বীণা!

এবার বীণা হেসে জবাব দিলে, কবিতায় আমার রুচি নেই। তারপর উত্তর শোনাবার অপেক্ষা না রেখে বললে তুমি নিজেকে পৃথিবীর লোক বল, তা তুমি নও, বরং আমি।

দিলীপ হেসে বললে, হয়ত! সংসারে বিপরীতরাই ত পরস্পর মেলে। দেখতে পাই লম্বা লোকের হয় বামন বন্ধু।

বীণা হাসিতে যোগ দিয়ে কথাটা ঘুরিয়ে নিলে, বলতে চাও আমি ইনটেলেকচুয়ালি টলার তোমার চাইতে?

দিলীপ বললে, এ্যাণ্ড ফিজিক্যালি টু!

বীণা হেসে বললে, তাই আশা রাখি। নইলে বলতাম না। সংসারে আমি স্বপ্রতিষ্ঠ হতে চাই অন্তত টাকাকড়ির দিক দিয়ে। কাউকে লতার মত অবলম্বন করার আমার মত নেই!

দিলীপ না বুঝতে পেরে জিগগেস করল, তুমি কি কখনো কাউকে বিয়ে করবে না?

বীণা উত্তর দিলে, করতে পারি হয়ত, ভবিষ্যতে। কিন্তু সে আমার স্বামী হবে না। স্বামী কথাটা অত্যন্ত আপত্তিকর আমার বিবেচনায়। যে কোনো আধুনিকার আত্মসম্মান তাতে আহত হওয়া উচিত।

দিলীপ বললে, আমিও আধুনিক। আমি কারো স্বামী হতে চাই না। আমার স্ত্রী সংসারযাত্রায় সহকারিণী হবেন, এই আমার আশা।

বীণা বললে, তাহলে অবশ্য তোমাকে অপেক্ষা করতে হবে—যতদিন না আমি নিজের পায়ে দাঁড়াতে পারি। আমার প্রেম যে দুদিক থেকে মূল্যবান তা আমি প্রমাণ করতে চাই। আচ্ছা, আজ আমি আসি, কেমন?

যাচ্ছ? দিলীপ তার পানে করুণ দৃষ্টিতে চেয়ে ক্ষীণ স্বরে বললে।

বীণা হেসে বললে, হ্যাঁ, মানবজীবনের প্রকৃত জন্মদিন সেই দিন—যেদিন সে প্রিয়জনের প্রেমের মধ্যে আশ্রয় পায়। আজকে বীণার জন্মদিন!

দিলীপ বললে, কিন্তু আশ্রয় ত তুমি চাও না।

বীণা ঘাড় কাৎ করে বললে, মনের আশ্রয় চাই চিরদিন। তা নইলে আমার চলে না যে। বলে ফেলে, তার ক্ষণিক দুর্বলতায় যেন লজ্জিত হয়ে, আর উত্তরের অপেক্ষা না রেখে, বীণা হন হন করে চলে গেল। খানিকটা দূরে গিয়ে, পেছন ফিরে দেখলে যে, অপরাহ্নের রৌদ্রভরা দূর-প্রসারিত গঙ্গার পানে উদাস চোখে চেয়ে, দিলীপ ঠায় একভাবে বসে আছে।

(২)

বাগান-বাড়ির গাছতলায় খানিকক্ষণ বসে, অপরাহ্নের গঙ্গার পানে শূন্যদৃষ্টিতে তাকিয়ে, দিলীপের হঠাৎ মনে হল, সে অবাঞ্ছিত অতিথি। প্রফেসর অনন্ত পাকড়াশীর পত্নীর কাছে নয়, যার জন্মদিন নিয়ে এই আনন্দ-সম্মিলন তাঁদের মেয়ে সেই বীণার কাছে। প্রত্যাখ্যানের অভিমান তার মনকে করে তুলল আলোড়িত। সে কাউকে কিছু না বলে ঘাট থেকে একখানা নৌকা ভাড়া করে সূর্যাস্তের গঙ্গায় কলকাতামুখো ভেসে পড়ল। বিকেলটা নিমন্ত্রিতদের অনেকের গেল বেড়ানোয় কেটে। কিন্তু কেউ কেউ, যারা বাইরে গেলেও কুণো স্বভাবটি ছাড়তে পারে না, তারা ঘরেই বসে গল্পগুজবে মত্ত রইল। দিলীপকে না দেখতে পেয়ে কারো কিছু মনে এল না। যারা মুখে বললে, দিলীপকে দেখতে পাচ্ছিনে যে, তারাও মনে ভাবলে কাছাকাছি কোথাও একলা বেড়াচ্ছে, যেমন সে ভাবুকলোক! প্রফেসর-পত্নী ব্যাপারটা অনুমানে বুঝলেন। কিন্তু তিনি বুদ্ধিমতী—সে বিষয়ে আর কোনো উচ্চবাচ্য করলেন না। সন্ধ্যেবেলায় যখন তাদের বাগান থেকে ফেরবার সময় হল, বীণা বললে মাগো, দূরের পথে আবার নাকি কেউ বাসে চড়ে! আমার সারাগায়ে যা বেদনা হয়েছে।

শিল্পী রমেন মজুমদার এ সুযোগ ছাড়লে না, প্রফের পত্নীর দিকে তাকিয়ে বললে, আমার বেবী অস্টিন ছোট গাড়ি। কিন্তু যদি ইচ্ছে করেন ত কষ্টেসৃষ্টে একরকম করে জায়গা হয়ে যায়।

প্রফেসর-পত্নী মৃদু হেসে শুধালেন, যাবি না কি বীণা রমেনের গাড়িতে?

বীণা জিগ্‌গেস করলে, আর মা তুমি?

—আমার এতগুলো অতিথিকে ছেড়ে একলা যাওয়া ভাল দেখায় নারে। তাইত নিজেদের গাড়িটা আনিনি।

সামাজিক কর্তব্য, বীণা মুখ বেঁকিয়ে বললে, কিন্তু বাসের ঝাঁকি শরীর না বইলে, সে কর্তব্য করবে কে? আচ্ছা মা তাহলে থাক তুমি!

সত্যি-ই একলা চললি না কি? মা সাশ্চর্যে জিগ্‌গেস করলেন।

না, রমেনবাবু আর আমি, বলে বীণা রমেনের সঙ্গে গাড়িতে গিয়ে উঠল।

আজকালকার মেয়েরা যা হয়েছে! বলে

প্রফেসর-গৃহিণী মুখ ফেরালেন। শুধু বীণা বলে নয়, তাঁর কোনো ছেলেমেয়েকেই তিনি আঁটতে পারেন না। মোটরটা ইতিপূর্বে একবার হাত-বদল হয়েছে। সুতরাং সশব্দে স্টার্ট নিয়ে, একটা ঝাঁকি দিয়ে, সরল রেখায় ছুটে চলল। রমেন ড্রাইভ করছিল। পাশের আসনে বসে বীণা বললে, একটু ফাঁকা দিয়ে চলুন, রমেনবাবু! রমেন স্টীয়ারিং হুইলের উপর হাত রেখে বললে ড্রাইভ করবার ইচ্ছে বুঝি? সেটা কিন্তু হবে ঘুরপথে! বীণা হেসে বললে, তা হোক। আমাদের এত হট হেঁটে যাওয়ারই বা কি দরকার? রমেন বললে, বেশ ত, গ্রামের পথে হাওয়া খেতে খেতে যাওয়া যাবে!—কিন্তু আগে চললে বাসের ধুলোটা এড়ানো যেত! বীণা বললে, সেই জন্যেই পিছিয়ে থাকতে চাই।

রমেন হেসে বললে, আমি এখন বনচ্ছায়াতলে অলক্ষিতে পিছিয়ে যেতে চাই। কিন্তু জীবনটা ত শ্লোক বলা না, বীণাদেবী!

—মোটর চালানো তাহলে! দিন ত স্টীয়ারিং হুইলটা এইবার আমার হাতে। নিজের বিদ্যাবুদ্ধির একটু পরিচয় দেই।

—এই নিন, কিন্তু গাছপালা বাঁচিয়ে। পাথরে টক্কর খেয়ে খানায়ও পড়তে বাধবে না। এ পীচে-মোড়া কলকাতার রাস্তা নয়। কল বেগড়ালে গাছতলাতেই রাত্রি-যাপন, বলে রাখছি আগে থেকে। পরে দোষ দেবেন না। কলকব্জার ক খ ও আমি জানি না কিন্তু।

বীণা স্টীয়ারিং হুইলে হাত রেখে বললে, আধুনিক সম্বন্ধে আপনার ধারণা মোটেই উঁচু নয় দেখছি। দুজনে বিপরীত অবস্থানে মোটর চালানয় অসুবিধা হচ্ছিল অনেক। কিন্তু আনন্দ তার ক্ষতিপূরণ করছিল। হাতে হাত ঠেকে স্নায়ুতন্ত্রীতে তুলল শিহরণ। চুলের আলগা ছোঁয়ায় করল উতলা। অজানা মদির গন্ধে করল উদাস। গাড়ির ঝাঁকুনিতে দুজনের আকস্মিক সংঘর্ষে শিরার শোণিত-স্রোতে তুললে তুফান। আংশিক পাওয়ার দাম পুরো পাওনার চাইতে বেশী। রমেন বললে, ব্রাউনিংয়ের Last Ride togetherএর লাইনগুলো মনে পড়ছে। বীণা গম্ভীরভাবে বললে, কবিদের রঙীন চশমা ছেড়ে সাদা চোখে জগতটা দেখতে শিখবেন কবে?

রমেন বললে, এভাবে চললে আমরা ত মোটে এগুতে পারব না।

বীণা হেসে বললে, এগোনোটা বড় কথা নয়—চলাটাই আসল। আসুন, আমরা সিট বদল করি। পথ সুগম নয়। তার ওপর সন্ধ্যার অন্ধকার আসছে ঘনিয়ে।

সূর্য অস্ত যাওয়ার সঙ্গে আকাশে সন্ধ্যাতারা দেখা দিল। কখনো ঘরে-ফেরা পথিকের দেখা মেলে, কখনা বা না। ঝিঁঝির ডাক নির্জনতাকে করে তুলল মুখর। বীণা মোটরের গতি মন্দীভূত ক'রে বললে, নিশ্চয়ই আমরা ভুলপথে এসেছি। পথ যে দেখি ফুরোতে চায় না। এদিকে রাত হয়ে যাচ্ছে।

রমেন হেসে বললে, আপনি যে বললেন এগোনোটা বড় কথা নয় চলাটাই আসল। এখন আবার ভুল পথ ঠিক পথের কথা উঠছে কেন?

বীণা বললে, সেই কথাটা মনে নিয়ে চুপ ক'রে আছেন নাকি?

রমেন বললে, ভুল পথ বলে কোনো কথা আছে নাকি জীবনে? ভেবে দেখুন ত' অসংখ্য গ্রহ-নক্ষত্রে আকাশভরা বিরাট সৃষ্টি। পৃথিবী ছাড়া আর কোনোটাতেই জীবও আছে বলে জানা নেই। তার মধ্যে মানুষ জীবের শ্রেষ্ঠ বলে আমাদের অভিমান। একজনের কাছে ছোট্ট পিঁপড়ের যে অস্তিত্ব সৃষ্টির বিরাটত্বের কাছে আমরা তার সহস্রের একাংশও নই। তখন আমরা কোনটা ভুল পথ আর কোনটা ঠিক পথ তা নির্দেশ করবার ধৃষ্টতা করতে যাই কেন?

আপনার 'ও ধান ভানতে শিবের গীত' শুনতে গেলে এদিকে মোটর যাবে উল্টে। বলে বীণা নীরবে ড্রাইভ করতে লাগল।

খানিকক্ষণ চুপচাপ। রমেন জিগগেস করল, কি ভাবছেন?

বীণা উত্তর দিল, নিতান্ত সাধারণ ভাবনা। কলকাতা পৌঁছব কখন এবং পৌঁছব কি না "য়্যাট অল।"

রমেন হেসে বলল, পৌঁছুনো কি খুব দরকার? আপনার কথা কি জানি না। আমাকে যদি জিগগেস করেন ত বলি, এই বেশ! তারপর সুর করে গাইলে, আমার এই পথ চলাতেই আনন্দ!

বীণা চোখের কোণে চেয়ে শুধোলে, বাড়ি ফিরতে ইচ্ছে নেই বুঝি?

রমেন বললে, বাড়ি ইট, কাঠ, চুণ-শুরকীর একটা তৈরী জিনিস নয়। My home is where my heart is.

বীণা সরলভাবে বললে, ও বুঝেছি এই গাড়িটাই আপনার বাড়ি।

রমেন হেসে উত্তর দিলে, ম্লেচ্ছ ভাষার সঙ্গে যখন আপনি non-co-operation করেছেন তখন দেবভাষাতেই বলি, গৃহিণী গৃহমুচ্যতে।

বীণা হাসিতে যোগ দিয়ে বললে, সেই হল, আপনি চান একটি সচল ঘর। কিন্তু সে রকম ভালবাসা যে পৃথিবীতে দুর্লভ!

রমেন প্রসঙ্গ বদলিয়ে শুধাল যাযাবরের জীবন আপনার ভাল লাগে?

বীণা বললে, হ্যাঁ, যদি হয় বিলাতী ম্যাগাজিনে পড়া একটা গল্পের মত থ্রিলিং। মনে করুন, দূর দেশে আমরা মোটরে চলেছি' পথে এক ডাকাতের আবির্ভাব। সঙ্গে তার রিভলবার। পথের বাঁকে সহসা সামনে দাঁড়িয়ে হাত তুলে মোটর থামাতে বললে। আমরা থামলুম না। চালাল চাকা লক্ষ্য করে গুলী। গাড়ি অচল হতেই সে তার মধ্যে লাফিয়ে উঠল। রিভলবার উদ্যত করে ধরল আপনার রগ ঘেঁষে। বলল, হাত তোল। এখন তোমার দামী যা কিছু আছে দাও ত ভাল মানুষটির মত।

রমেন বাধা দিয়ে বলল, খানিকটা আমায় বলতে দিন। আপনারা ভালবাসেন যা কিছু আকস্মিক আর থ্রিলিং। অভ্যাসের একঘেয়েমির মধ্যে আমোদ নেই। আচ্ছা, তারপর আপনি মেয়েমানুষ বলে আপনার দিক থেকে যে কোনো counter-attack-এর সম্ভাবনা আছে, তা সে ভাবে নি। কিন্তু জানে না আধুনিকারা অতি সহজে মূর্চ্ছা যান না। আমাকে নিরুপায় হয়ে দুহাত তুলতে দেখে ইতিমধ্যে কোন্ অসতর্ক মুহূর্তে আমার ট্রাউজারের পকেট হাতড়িয়ে কখন যে তুলে নিয়েছেন সিক্স চেম্বার অটোমেটিকটা, আমি নিজেই বুঝতে পারি নি, তার সে জানবে কি? হঠাৎ কাণের মধ্যে ইস্পাতের নলটা লাগতেই মৃত্যু যে কত ঠাণ্ডা, সে তার আভাষ পেয়ে একেবারে চমকে উঠল; কিন্তু নড়ল না। জানে নড়লেই গরম সীসের গুলী তার মগজ ভেদ করে তাকে করবে ঠাণ্ডা'

বীণা আমোদ পেয়ে বললে, এবার আমি বলি। তার এই অপ্রস্তুতভাবের সুযোগ নিয়ে ইতিমধ্যে আপনি তাকে কায়দা করে ফেলেছেন। চোখ থেকে মুখোসটা জোর করে খুলে ফেলতেই দেখা গেল—

রমেন বাধা দিয়ে চেঁচিয়ে উঠল, দিলীপ।

বীণা হেসে বললে, হল না। শেষটা মেলাতে পারলেন না। অতটা উনি পারেন না।

রমেন ঘাড় নেড়ে বললে, ঠিকই হয়েছে। শুধু একটা লাইন বাকি। 'বীণাদেবীর আর আফশোষের অন্ত থাকল না। ক্লাইম্যাক্সটা বাইরের জগতের ঘটনা। হল না। হল মনোজগতের চূড়ান্ত ঘটনা।

বীণা হেসে বললে, সেণ্টিমেণ্টাল মনের অসুস্থ কল্পনা।

তারপর বীণা হেসে বললে, এই নিয়ে একটা ছবি করুন। দাম বিক্রী হবে। বিষয়টা পুরানো হলেও আইডিয়াটা নতুন।

রমেন বললে, না, ঠাট্টা নয়। প্রবলভাবে চাইতে জানলে নারীর অদেয় কিছু থাকে না।

বীণা মোটরের স্টীয়ারিং হুইলে মনোযোগ দিয়ে বলল, আপনার ও প্রিমিটিভ মনোভাব নিজের মধ্যে রাখুন। লোকসমাজে ব্যক্ত করবেন না, নিন্দে হবে। দেখুন ত কতদূর এলাম। আমরা কি বিপরীত দিকে ছুটছি নাকি? তারপর ঘড়ি দেখে বললে, এদিকে দেখি রাত আটটা, বলে

বীণা যেমনি স্টীয়ারিংএর হাণ্ডল থেকে হাত সরিয়ে ঘড়ি দেখ্‌তে গেছে, গাড়িটা পথপাশের একটা গাছে সজোরে ধাক্কা খেয়ে উঠ্‌ল লাফিয়ে—

করলেন কি? সর্বনাশ! বলে রমেন চকিতে স্টীয়ারিং হুইল ঘুরিয়ে এক্সেলেরেটার চেপে ব্রেক কসল। ঘরর্‌ করে একটা রুদ্ধ আর্তনাদে শ্বাস টেনে গাড়িটা পাক খেয়ে কাৎ হয়ে পড়ল একটা ডোবার পাশে। তারপরই নিস্তব্ধ! দারুণ বিরক্তিতে অনেকক্ষণ চুপ করে থেকে রমেন বলে উঠল, এইজন্যেই বলেছে—পথি নারী বিবর্জিতা! একটা অঘটন কিছু ঘটাবেনই আপনারা!

সে রমেনের ভর্ৎসনাটা নীরবে হজম করল। মুখটা হাসির আবরণে মুড়ে বললে, এখন কি হবে?

রমেন শুধু বল্‌লে, তখনই ত বলেছিলুম। বলে নেমে অচল মোটরটার কলকব্জা পরীক্ষা শেষ করে বললে বসুন দেখি কাছাকাছি কোথাও মিস্ত্রী মেলে কি না। রমেন তার উত্তর শোনবার অপেক্ষা না রেখে পথের বাঁকে অদৃশ্য হল। বেশ খানিকক্ষণ পরে এসে রমেন দেখ্‌লে বীণা সেই একভাবে মোটরে বসে! তাকে আসতে দেখে আগ্রহের সঙ্গে বল্‌লে, পেয়েছেন মিস্ত্রী?

রমেন ভেবে বললে, হ্যাঁ, কিন্তু তার আস্‌তে দেরী হবে।

বীণা অসহায়ভাবে বল্‌লে, তবে? এখন বাড়ি ফেরবার উপায় কি?

রমেন হেসে বল্‌লে, যতক্ষণ না আসে এইখানেই স্থিতি। ফিরতেই যে হবে, এমন কি কথা আছে? আর বাড়ির কথা বলছেন, যে বাড়ি আপনি গড়বেন—সেই ত হবে একান্ত আপনার। এখন ত আছেন পরের বাড়িতে। পশুপাখীর ভেতর দেখেন নি—বাচ্চারা বড় হয়ে গেলে ধাড়ীরা আর তাদের আমল দেয় না।

বীণা বলে উঠল, অন্তত খোপের পায়রাদের ত তাই দেখি। ছোটরা খুঁটে খেতে শিখলেই ধাড়ীরা দেবে ঠুকরে ঠুকরে খোপ থেকে তাড়িয়ে। আবার তারা নতুন করে পাড়বে ডিম, পাতবে ঘর-সংসার।

রমেন বললে, কুকুরছানারা একটু বড় হলেই মা করে তাদের সঙ্গে খাবার নিয়ে কাড়াকাড়ি; ঝগড়াঝাঁটি! এটা জীবনের ধর্ম! মানুষের মধ্যে কোথাও যদি চোখে না পড়ে ত বুঝবেন সামাজিক ব্যবস্থার সুবিধার জন্য সেটা প্রাকৃতিক নিয়মের ব্যতিক্রম। মা-বাপও ছেলেমেয়ে বড় হলে তাদের বিয়ে-থা দিয়ে করতে চায় আলাদা। —অন্তত বাইরের দিক থেকে না হলেও মনের দিক থেকে। কিছু শিক্ষাদীক্ষা কিংবা টাকাকড়ি নিয়ে অবাঞ্ছিতরা বিদায় হয় তো হোক। তাই হল ছেলেদের এডুকেসন, মেয়েদের পণপ্রথা। মূলে নিজেদের জীবন-ভোগ নিষ্কণ্টক করাই উদ্দেশ্য।

বীণা হেসে বললে, খানিকটা তাই হলেও পুরোভাবে আপনার দৃষ্টিভঙ্গীকে সমর্থন করতে পারলুম না। মানুষের নিজের সন্তানদের মধ্যে সংসারকে আরো নিবিড়ভাবে ভোগ করবার ইচ্ছে থাকে। এই কামনা আছে বলেই না ছেলেমেয়ের সৃষ্টি!

রমেন বললে, সে নিজেদের অবর্তমানে। জীবনের দিকে তাকালে সব জায়গায় এক কথা।

বীণা চুপ করে থাক্‌ল।

রমেন বীণার মন বুঝতে বল্‌ল, আসুন না, আমরা ইলোপ করি। বয়সের সঙ্গে আপনার পুরোনো ঘর ত ভেঙেছে। আবার নতুন করে ঘর বাঁধি।

বীণা সাশ্চর্যে চোখ তুলে বললে, আপনার সঙ্গে?

রমেন বললে, নয় কেন? ঘটনা কি ভাবনার মত হয় না?

বীণা দ্বিধায় পড়ে চুপ করে থাকল। এ কথা সে ভেবে দেখেনি কোনোদিন। গল্পের বইতে খবরের কাগজে ব্যাপারটা পড়েছে বটে অনেকবার। কিন্তু তার পরিণতি তাকে সুখী করে নি।

রমেন বললে, "জীবনকে নিয়েই জগতের সব কিছু বীণাদেবী। আর আমার আপনার কাছে জগৎ সত্য; কারণ আমরা জীবনকে চাই। মোক্ষপ্রার্থীদের কাছে বরং মিথ্যা হতে পারে।

বীণা বল্‌লে, আমার দরকার শুধু তাই বলছেন। কিন্তু আমাকে আপনার যে দরকার, তা ত বল্‌ছেন না।

রমেন বললে, শুনেছি আপনি হতে চান শিল্পী। আমি তাতে সাহায্য করব।

বীণা হেসে বললে, কথাটা পুরানো। নতুন কিছু জানা থাকে ত বলুন।

রমেন একটু আবেগের সঙ্গে বললে, শুধু টাকা দিয়ে নয়, আমার সাধনা দিয়ে আপনার সাধনাকে করব সচল!

বীণা বললে, হাসালেন। দাড়ি, গোঁফ আর চুল-নখে যে সব ঋষি-মহর্ষি আচ্ছন্ন, তাদের চাঞ্চল্য যে কতদূর প্রবল—জান্‌তে পারি যদি তাঁদের প্রেয়সীরা সত্যি সাক্ষী দেন কখনো। তাঁরা চিন্তা আর ভাবসাধনার যত উঁচু আকাশেই উড়ুন না কেন, সব জীবনেই মধ্যাকর্ষণের সেই অতি পুরানো গল্প।

রমেন বল্‌লে, এই জীবন, কিন্তু তার ব্যতিক্রমও ত আছে।

বীণা বললে, আছে; কিন্তু তা সত্য নয়, কৃত্রিম।

কাছাকাছি কোনো বাঁশবাগানে আকস্মিক শেয়ালের ডাকে তারা যেন উঠ্‌ল জেগে। একটা ডাকে আর তার সঙ্গে গলা মিলিয়ে অন্যগুলো ওঠে এক সঙ্গে চেঁচিয়ে। ঝিঁঝি ও পোকামাকড়ের ঐক্যতানকে ছাপিয়ে উঠল তাদের চীৎকার। অচল মোটরটার মধ্যে বীণা চমকে উঠল। তারপর দুই হাতে মুখ ঢেকে ভয়ে রমেনের অত্যন্ত গা ঘেঁষে এল। বীণার সিটের পিঠের ওপর প্রসারিত রমেনের বামবাহুর আলগা আশ্রয় বীণাকে বেষ্টন করে এবার হল নিবিড়। সে ডান হাতে মোটরের গোল হর্নটা দিল টিপে। সঙ্গে সঙ্গে বহুদূর পর্যন্ত আলোর স্রোত বইয়ে মোটরের দুই চোখও উজ্জ্বল হয়ে উঠ্‌ল। হঠাৎ শব্দ ও আলোর ঝলকানিতে চমকে উঠে গাড়ির কাছাকাছি কতকগুলো অনির্দিষ্ট চতুষ্পদ বন-বাদাড় ভেঙে হুড়মুড় করে ছুটে পালাল।

বীণা এবার রমেনের বাহুবেষ্টনের উষ্ণ আশ্রয় ছেড়ে ক্ষণিক ভীরু ভাব থেকে জেগে উঠল। মৃদু হেসে বললে, সব শেয়ালেরই যে এক রা, তার আজ পরিচয় পেলাম।

রমেন শুধালে, কি করে?

বীণা বল্‌লে, এত কাছাকাছি ও জন্তুটার সঙ্গে পরিচয়ের সুযোগ ঘটেনি এতদিন?

রমেন হেসে বল্‌লে, পরিচয় সব কিছুর সঙ্গেই সময়ে হয়। কিন্তু এখনো ত মোটর-মেকানিকসের দেখা নেই। এ বিপদ থেকে পরিত্রাণ পাবার উপায় কি?

বীণা বললে, বিপদ থেকে উদ্ধারের কথা ভাববে পুরুষমানুষ। মেয়েরা তার কি জানে?

রমেন রাগ করে বললে, কথাটা আধুনিকার উপযুক্ত হল না। বিপদে ফেলবার সময় ত আপনি হলেন অগ্রসর। এখন রক্ষা পাবার উপায় ভাবব আমি?

রমেনের পানে চেয়ে চটুল হাসি হেসে বীণা বললে, দুজনের মধ্যে ত কাজের এই সহজ বিভাগ রয়েছে সৃষ্টির গোড়া থেকে। একদিনেই কি তা ওল্টানো যায়।

রমেন ভাবল, এ বীণার লীলা। তাই সে হেসে জবাব দিলে, সে দায়িত্ব ত হয় খুব আনন্দের। যদি তা আপনি স্বীকার করেন। কিন্তু যদি সত্যি কথা বল্‌লে রাগ না করেন ত বলি—এ আপনার খেলা, ইঁদুরকে নিয়ে যেমন বিড়াল করে থাকে। রাতের আঁধারে যেমন পাওয়া যায়, নিজেকে নিবিড় করে তেমনি পাওয়া যায় যে অন্তরঙ্গ তাকে। দিনের আলোর মধ্যে নেই সেই মোহ, সেই স্বপ্ন। আলো যেন ত্যাগী সন্ন্যাসী, কিন্তু অন্ধকার প্রেমিক। তাই তার বুকে রহস্যময় তারা আর স্বপ্নময় চাঁদ। বাস্তব জগতের উপর বিছায় সে যাদুকরের আবরণ। দিনের বিচ্ছেদের পর রাত্রি আনে প্রিয় সম্মেলনের আনন্দ। আলোর মধ্যে রাখা ঢাকা নেই—সবই প্রকাশ্য। প্রকাশ্যের রূঢ়তায় করে আমাদের পীড়িত, করে আমাদের আত্মসচেতন। কিন্তু অন্ধকারের মায়ায় আমরা হই আত্মবিস্মৃত। তাই মনের অবচেতন লোকের আশা-আকাঙ্ক্ষাগুলো হয়

বল্গা-ছেঁড়া ঘোড়ার মত। পরম মৃত্যুদিনের ক্ষুদ্র অনুকৃতি রাতের অন্ধকারে বিশ্বচেতনা যখন বিলুপ্ত, তখন হয় বন্ধুর হাত ধরবার ইচ্ছা। নিজেকে তখন মনে হয় অসহায়, অসম্পূর্ণ, একান্ত একলা। তাই দিনের বেলাকার আত্মপ্রতিষ্ঠ, আয়সী বীণাকে রাতের আঁধারে চেনা গেল না।

কিন্তু রমেন গেল হকচাকিয়ে! বীণা তাকে এক হ্যাঁচকায় দিলে অনেকটা এগিয়ে। সঙ্গে সঙ্গে এগুবার জন্যে তাকে যেন লাফ দিতে হল। এটা ছিল তার দৃষ্টির অগোচরীভূত দূরের বস্তু। এর ওপর হুমড়ি খেয়ে পড়াতে তার মন মোটেই প্রস্তুত ছিল না। নীরবতা ভঙ্গ করে বীণা বললে, আমার হাতঘড়ির রেডিয়মযুক্ত ডায়েল বল্‌ছে, নটা বাজতে আর দেরী নেই। কিন্তু আপনার মোটর-মিস্ত্রী কোথায়?

রমেন গাড়ি থেকে নাম্‌তে নাম্‌তে বললে, সে বোধ হয় আর এল না। হাত পা কোলে করে বসে থাকলে এইখানেই রাত্রি-যাপন। আসুন নেমে দেখি, অন্য কি উপায় হয়! বলে নিজে নেমে বীণাকে হাত ধরে নামিয়ে নিলে। তারপর রাস্তায় টর্চের আলো ফেলে বললে, চলি ত খানিক দূরে। কাছে কোনো রেলওয়ে স্টেশন থাকতে পারে। কয়লার ধোঁয়া উঠছে দেখছি কিছুক্ষণ ধরে! ইঞ্জিনের আওয়াজও কানে আস্‌ছে।

বীণা বল্‌লে, গাড়ীটা কারো হেপাজত করে দিলে হত না। এতে ত রয়েছে আমাদের যা কিছু জিনিসপত্র!

রমেন বিরক্তির সুরে বললে, আপনারা সব ভুলতে পারেন। ভোলেন না শুধু আপনাদের জিনিসপত্র।

বীণা হেসে শুধোলে, আর?

সাজ পোষাক ও গয়নাগাটি!

বীণা আপত্তি করে বললে, অপবাদ!

রমেন চলতে চলতে বললে, না, সত্যি! এখুনি যদি একজোড়া যুবক যুবতীর সঙ্গে আমাদের হঠাৎ দেখা হয়, আমি দেখব সেই মেয়েটিকে তিনি সত্যি সুন্দরী কিনা। কতটা মিলছে কালিদাস ও অন্যান্য দেশী কবিদের রূপ বর্ণনার সঙ্গে। বিদেশী কবিরা যা যা বলেছেন তার সঙ্গেই কতখানি আত্মীয়তা তাঁর।

বীণা হেসে শুধোলে, আর আমি?

রমেন বললে, আপনার লক্ষ্য থাকবে শুধু মেয়েটির সাজ পোষাক আর গয়নাগাটির ওপর! সে কি কি সব পরে এল। তার শাড়ীর রং ব্লাউজের সঙ্গে ঠিক ম্যাচ করছে কিনা। শাড়ীটা সে ঘুরিয়ে পরেছে আধুনিক স্টাইলে না সাবেকী কাপড়ের পুঁটুলী, যাতে বডি লাইনকে ব্যক্ত করবার বালাই নেই। চুল বেঁধেছে অজন্তা ঢংয়ে এলোখোঁপায়, না উদ্ধত রাধা চূড়ায় না মেম-সায়েবের মত করেছে বব। মোটের ওপর তার সাজসজ্জাটি মনে গাঁথতেই ব্যস্ত রইবেন। কিন্তু হায় সেই হতভাগ্য পুরুষটির দিকে একবারও দৃষ্টি-প্রসাদ করবার অবসর আপনার হবে না।

বীণা হেসে বললে, সংসারের কোন কথা ভাবতে হয় না কিনা। আমাদের এ্যাসিস্ট্যান্ট করে মজাসে দিন কাটান। তাই এত বাজে কথা বানাবার সুযোগ হয়।

রমেন হেসে বললে, চলুন যাই। দেখি, কাছে কোন রেলওয়ে স্টেশন আছে কিনা। তার বেশী দেরী হলে গাড়ি নাও মিলতে পারে।

বীণা বললে, অবশ্য জিনিসপত্র বিশেষ কিছু নেই। কিন্তু দামী গাড়িখানা সত্যিই পথে ফেলে চল্লেন নাকি? রমেন বললে, জীবনের কাছে কি জিনিষের দাম? আজকে আমরা জীবন পেয়েছি!

বীণা শুধোলে, এক্সিডেণ্ট থেকে বেঁচেছেন বলে বুঝি ওকথা বলছেন? তারপর বীণা যেন কি ভেবে মাথা দুলিয়ে বললে, কিন্তু না কথাটার মধ্যে আপনার দুটো মানে। আপনি যা বলতে চান সে অন্য কথা। দুষ্টু হাসি তার সাক্ষ্য দিচ্ছে।

রমেন বললে, জীবনে দুটো দিন জিনিসের কোন দাম থাকে না বীণা দেবী! যেদিন মরণ আসে, আর যেদিন আমরা মরণকে ফাঁকি দেই।

বীণা হেসে শুধোল, অর্থাৎ—

রমেন বললে, যেদিন আমরা ভালবাসি! যেমন ধরুন আজকে!

বীণা কোনো উত্তর দিলে না। টর্চের আলোয় পথ যথেষ্ট আলোকিত হয়নি। তীব্র আলোর সরু রেখায় নির্দেশ করছিল মাত্র। রমেন সাবধান করে দিলে, আলোটার উপর দিয়ে চলুন। পাড়াগাঁয়ের ঝোপঝাড়ে সাপখোপ থাকতে পারে।

রহস্যময়ী রাত্রি দেহমনের বন্ধনকে করে শিথিল। বীণা বোকার মত এক রসিকতা করে বসল, বর যখন পাশে রয়েছে তখন শাপে আর কি করবে।

রমেন যেন কথাটা শুনতে পায়নি এমনি-ভাবে শুধোলে, কি বললেন?

লজ্জা থেকে রক্ষা পাওয়ায় বীণা তাকে মনে মনে ধন্যবাদ দিলে। আশ্বস্থ হয়ে বললে, কথায় আছে, সাপের লেখা আর বাঘের দেখা। আজকে যদি আমার মৃত্যু-দিন বলে লেখা থাকত তবে না সাপের দেখা পেতাম। কিন্তু আজ যে আমার জন্মদিন!

রমেন হেসে বললে, সেই জন্যেই ত' আপনি আজ সাপের দেখা পেলেন না। পেলেন অন্য জনের দেখা।

বীণা সাগ্রহে শুধোল, সে কে?

রমেন পরিহাস করে বললে, কেন দিলীপ, আপনার বর!

বীণা সহসা গম্ভীর হয়ে গেল। জিগগ্যেস করলে, কে বললে আপনাকে?

গ্রামের পথ ধরে তারা চলল। একজন লোক আসছিল মুদির দোকানে সওদা করতে। হাতে তার লণ্ঠন। তাকে জিগগেস করতে সে দেখিয়ে দিলে স্টেশনের পথ। বললে, এই সড়ক বেয়ে সিধে চলে যান বাবু।

রমেন জিগগেস করলে, এখন কলকাতা ফিরবার কোনো গাড়ি আছে কিনা বলতে পার?

কলকাতার কাছাকাছি স্টেশনের নিকটে যাদের বাড়ি ট্রেনের খবর তারা রাখে। সে বললে ৯-৪৫ হ'ল গিয়ে কলকাতা ফিরবার শেষ ট্রেন' তারপর ৯-৫৫ ছুটবে ডাক নিয়ে পশ্চিমের গাড়ি। এখন যেদিকে আপনারা যান!

বীণাকে স্টেশনে সেকেণ্ড ক্লাস ওয়েটিং রুমে বসিয়ে রমেন টিকিট নিয়ে এল।

বীণা জিগেস করলে, কোথাকার টিকিট কিনলেন?

তার গলা কাঁপছিল। যেন নিজের কোনো অস্তিত্ব নেই। ভাগ্যের যেন সে খেলনা। টিকিট কেনাটা যেন 'টস' করার মত। তার-ওপর নির্ভর করছে সবকিছু। সে আশা করছে একটা সর্বনাশ—ভবিষ্যতের অনির্দেশ্য অনিশ্চয়তা! কিন্তু তাতেই যেন রয়েছে জীবনের যত রস।

রমেন একটু থেমে বললে, গল্প লেখকরা যে প্লট বানাতে সাহস করেন না, আমাদের জীবন-গল্পের হবে সেই প্লট।

বীণা সহজভাবে বললে, তাঁরা ত আজকাল লেখেন আফিসের গল্প। কোনো সংঘাত নেই! আপনি এখন কি গল্প বানাতে চান রমেন বাবু, তাই বলুন।

রমেন শুধোলে, কি গল্প চাই আপনার?

বীণা বললে, চাই জীবনের গল্প।

রমেনের চোখ উৎসাহে জ্বলজ্বল করে উঠল। সে বললে, চান জীবনের গল্প? আপনাকে নিয়ে আজ রাতে হ'তে চাই উধাও, রাজি?

বীণা তরলভাবে বললে, কেন নয়?

রমেন হেসে বললে, কই, গলায় ত' তেমন জোর নেই! দো-টানায় পড়েছেন বুঝি?

বীণা চুপ করে থাকল। সত্যি সে দোটানায় পড়েছে। একজন আপনাকে দিতে চায়। আর একজন চায় নিতে। দুজনে তার পাণিপ্রার্থী। কাকে ছেড়ে সে কাকে রাখবে? একটা গানের কলি তার মনে গুনগুনিয়ে এল ভোমরার মত—'হৃদয় আমার চায় যে দিতে, কেবল নিতে নয়!'

প্রবলভাবে দাবী করবার শক্তি আছে বটে রমেনের। সে নিজের যোগ্যতা সম্বন্ধে সজাগ। দিলীপের মত মিনমিনে নয়। তাই বীণা যেন ভয়ে ভয়ে জিগগেস করলে, কোথাকার টিকিট কিনেছেন?

রমেন টিকিট দুটা উল্টেপাল্টে

সেটাকে একটা টোকা মেরে বললে, পেশোয়ার!

পেশোয়ার! —সে যে অনেক দূরে। বীণা বললে বটে, কিন্তু এ চিন্তা তার কল্পনাকে করলে উধাও! এমনি একটা নিরুদ্দেশ-যাত্রা যেন তার সত্তার মধ্যে আছে। একটা পাকা ফল যেমন বোঁটা থেকে সহজে খসে পড়ে, ব্যথা বোধ করে না, বীণার হল তেমনি। বাপ মা আত্মীয় পরিজনের এত-দিনকার সস্নেহ আবেষ্টন-ঘেরা কলকাতা শহর ধীরে ধীরে যেন মিলিয়ে এল স্বপ্নের মত। আর তার জায়গায় জেগে উঠল দিগন্তঘেরা অনুর্বর পাহাড়, বন্ধুর প্রান্তর, মাঝে মাঝে সুবৃহৎ বনস্পতি, অদৃষ্টপূর্ব জগৎ, বিরাটকায় পাঠান দীর্ঘ শ্মশ্রুগুম্ফ-বহুল শিখদের দেশ পেশোয়ার! সেখানে বাদাম আখরোট বনে, আঙ্গুরলতার কুঞ্জে সে আর রমেন, রমেন আর সে। সময় হলে জীবন যেমন প্রেমকে স্বীকার করে, সেই আহবান যেন আজ তার রক্তের মধ্যে। সেখানে চলেছে প্রলয়-তান্ডব। সব ভেঙে-চুরে নতুন সৃষ্টির উন্মাদনা। শিল্পী বীণা গেল কোথায়?

বীণা বললে, তবে এখন ট্রেনের দেরী আছে, ওয়েটিং রুমেই বসা যাক।

রমেন বললে, এক পেয়ালা চা আনতে বলি।

অনুক! গলাটা গেছে শুকিয়ে! একটু ভিজিয়ে নিতে চাই!

মুখটাও, রমেন বললে, শুকোবার আর অপরাধ কি? মাত্র চার ঘণ্টা ত বেরিয়েছি বাগানবাড়ি থেকে। তার মধ্যে কতগুলো ওলটপালট ঘটল বলুন ত দেহ এবং মনের? বলে সে একটু হাসল।

বীণা হাসবার চেষ্টা ক'রে বললে, বিশেষ করে সামনে রয়েছে এই উদ্বেগ!

রমেন বল্‌লে, তাহলে না হয় থাক।

কিন্তু বীণার আর থামবার উপায় নেই। নতুন চিন্তা তার মনকে করেছে সচল। কোন কিছুতে প্রেরণা পেয়ে সে কাজ করতে চায়। এমনি পারে না।

বীণা বললে, না, এখন ফিরলে লজ্জা। কিন্তু কেবল মনে হচ্ছে দিলীপ কি ভাববে?

মুখ টিপে হেসে রমেন বল্‌লে, আমি আগেই বলেছিলাম ত দোটানায় আপনি পড়েছেন। মন ঠিক করতে পারছেন না। আচ্ছা বলুন ত, কাকে আপনার চাই, দিলীপ না আমি?

বীণা লীলাচ্ছলে বললে, একটা পয়সা দিয়ে টস করে দেখব?—না থাক। তারপর হাসিভরা চোখ রমেনের মুখের পানে তুলে একটু সরম-সঙ্কুচিতভাবে বললে, আচ্ছা, যদি বলি দুজনকেই!

তাতে আশ্চর্য হব না, খুব স্বাভাবিক!

বীণা হেসে উঠল, কী যেসব বাজে কথা বলেন, রমেনবাবু!

রমেন বললে, একজনকে নিয়ে আপনি গড়বেন পরিবার, আর একজন হবে পরিবারের বন্ধু!

এমন হয় নাকি আবার, বীণা জিগগেস করলে।

খুব হয়। সে হবে আপনার most obedient servant. আপনি যা বলবেন করতে সে তাই করবে। কারণ আপনার সম্বন্ধে তার মোহ ভাঙার সুযোগ দেবেন না তো কোনো দিন। তাই তার কাছে পড়া-পুঁথির মত পুরানোও হবেন না কোনো কালে। সে কখনো অধিকার পাবে না, চিরদিন রইবে উমেদার। শুধু আপনার হৃদয়ের কাছে বইবে তার আবেদন। ছাড়পত্র তার হাতে নেই অথচ সে পাড়ি দিয়েছে সমুদ্রে।

বীণা হেসে বললে, খারাপ কিছু না অবশ্য, কিন্তু সে রকম চোখে পড়ে কই?

রমেন শুধালে, নাম করতে হবে আবার? কিন্তু কথায় কাজ নেই। এর সমস্ত রসই নীরবতায়।

বীণা আমোদ পেয়ে বললে, চা'র কথা বলেছেন?

রমেনকে অপ্রস্তুত করা অসম্ভব। সে বললে, বেশি কথা বললেও আমি কাজ ভুলিনে। ঐ এসে গেল। বসুন, আসছি আমি। আপনি আরম্ভ করুন, বলে সে একটা সিগারেট ধরিয়ে বেরিয়ে গেল। সত্যি, সন্ধ্যে পাঁচটায় বেরিয়ে বোধ হয় ঘণ্টা চারেক কেটেছে—কিন্তু বীণার মনে হচ্ছে যেন কতদিন! উত্তেজনায় মাথার শিরা দবদব করছে। স্নায়ুতন্ত্রীতে লেগেছে উন্মাদনার ঢেউ। হাত পা কাঁপছে। ইন্দ্রিয়গুলো যেন কেউ তার বাধ্য নয়। এ সময়ে তাকে দিয়ে যে কেউ যে কোনো কাজ করিয়ে নিতে পারে। কেলনারের কড়া চা তার স্নায়ুতন্ত্রীকে শান্তত করলই না বরং উত্তেজনার আর এক পর্দায় চড়িয়ে দিলে। সে যে কি করতে যাচ্ছে তাকে সুস্থমনে ভাবতে দিলে না।

এমন সময়ে সিগারেটের ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে রমেন বই হাতে ওয়েটিং রুমে ঢুকে ইজিচেয়ারটার উপর পা ছড়িয়ে শুয়ে পড়ল বইখানা দুই হাতে খুলে ধরে। তার নিশ্চিন্ত নিরুপদ্রব ভঙ্গীতে বীণা ঈর্ষান্বিত হয়ে উঠল। জিগগেস করলে, কি ওখানা?

পড়বেন? একটা সিক্স পেনী থ্রিলার এডগার ওয়ালেসের। আপনার জন্যেই আনলুম হুইলারের বুকস্টল থেকে। বেশ সময় কাটে। আর জানি আপনি থ্রিলিং বইতে আনন্দ পান!

আমার রুচির প্রশংসা করা হল না কিন্তু, বীণা হেসে উঠল।

রমেন বললে, রুচির জন্যে ত মানুষ নয়। মানুষের জন্যেই রুচি। তারপর হাত-ঘড়িটা দেখে বললে, গাড়ি আসতে আর মিনিট পাঁচেক আছে।

মাত্র পাঁচ মিনিট!—বীণার বুকটা কেঁপে উঠলে। চোখকে ক'রে দিলে ঝাপসা। মনে পড়ে গেল পরিচিত আবেষ্টনীর কত ছোট-খাট সুখস্মৃতি। কিন্তু ছেলের জন্য মেয়ে ছাড়ে সব। বর্তমানের জন্য সমস্ত অতীত। ধীরে ধীরে কুয়াসা কেটে গিয়ে দেখা দিলে পেশোয়ার! সেখানে সে আর রমেন, রমেন আর সে। কোথায় ভেসে গেল তার শিল্প আর তার সাধনা। জীবনের ডাকে সে দিতে চায় সাড়া। বীণা অস্থির হ'য়ে উঠে দাঁড়াল, বললে, গাড়ি আসছে! গুছিয়ে নেবার ত কিছু নেই। কি করি? রমেন হেসে বল্‌লে, কিছু করতে হ'বে না। চুপ করে বসুন। আর যদি মন দিতে পারেন ত এড্‌গার ওয়ালেসের এই থ্রিলারটা দিতে পারি!

কিন্তু কোনো কিছুতে মন দেবার মত মনের অবস্থা বীণার তখন নেই। সেখানে উঠেছে ঝড় এলোমেলো, উচ্ছৃঙ্খল!

একটা ট্রেন সশব্দে স্টেশনে ঢুকে প্ল্যাটফর্মে লাগল। পশ্চিমের গাড়ি এল বুঝি? বীণা শশব্যস্তে উঠে দাঁড়াল। রমেন মৃদু হেসে বললে, তাড়াহুড়োর কিছু নেই। ট্রেনটা এখানে থামবে খানিকক্ষণ।

গাড়িতে উঠে বসতে বাধা কি? বীণা হতে চায় সুনিশ্চিত।

তবে চলুন, বলে রমেন বইটা বন্ধ করে একটা হাই তুলে ইজি-চেয়ার থেকে উঠ্‌ল। বীণা ত্বরিৎ পায়ে নিজেই চলতে লাগল আগে আগে। রমেনকে সাহায্য করতে হ'ল না মোটেই। বীণার কোনো দ্বিধা নেই। এবার আর শিল্প নয়, জীবন তাকে দিয়েছে ডাক। সে ইণ্টার ক্লাসে উঠতে যাচ্ছিল। কিন্তু রমেন তাকে একটা সেকেণ্ড ক্লাস দেখিয়ে বললে ওটা নয়, এইটে!

রাইটো, বলে মনে মনে তার রুচির প্রশংসা করে বীণা উঠলে সেটার মধ্যে। কিন্তু ঢুকেই তার অবস্থা হ'ল 'ন যযৌ ন তস্থৌ'। মুখের চেহারা হ'ল অবর্ণনীয়। —সে যেন ভূত দেখেছে! সে পড়ে যাচ্ছিল। প্রফেসর পাকড়াশী দাঁড়িয়ে উঠে তাকে ধরে ফেল্‌লেন। বললেন, ফ্যানটা চালিয়ে দাও ত দিলীপ, শিগ্‌গির! বীণাকে কাছে টেনে বল্‌লেন, আয় বীণা, বোস! তারপর তার গায়ে হাত বুলোতে বুলোতে, মা, আমার এমন অসাবধানী, ড্রাইভ করতে শিখলিনি। যা'হোক কলকাতার রাস্তায় একরকম করে চলে যায় হাজার ভিড় থাকলেও—হোক পিচে-মোড়া রাস্তা ত! গাঁয়ের অসমান রাস্তায় কি সাহস করতে আছে?

ঠাণ্ডা জল গায়ে পড়লে যেমন তন্দ্রা ছুটে যায়, বাবার সঙ্গে দিলীপকে দেখে বীণার উত্তেজনা প্রশমিত হয়ে এল। সেই পুরানো পৃথিবী আর ঘর-সংসার। সমাজ, কর্তব্য আর কোলাহল। কিন্তু জীবন নেই, আর নেই তার সংগীত। বীণা ধীরে ধীরে শুধরে উঠে বললে, আমি ড্রাইভ করতে গিয়ে বিপদ বাধিয়েছি কার কাছে শুনলে?

প্রফেসর পাকড়াশী অনুযোগ করলেন, শুধু ড্রাইভিংএ বিপদ বাধান নয়, এসে পড়েছিস একেবারে উল্টো পথে।

বীণা জিগেস করলে, এত খবর কার কাছে পেলে, শুনি?

কিন্তু এ প্রশ্নের উত্তর দিলে দিলীপ। সে বললে, খাওয়া-দাওয়া সেরে, রাত সাড়ে আটটা আন্দাজ ক্যাম্প চেয়ারটায় বসে রোমাঁ রোঁলার রামকৃষ্ণদেব সম্বন্ধে বইটা সবে খুলেছি, এমন সময়ে টেলিফোনে বেজে উঠল ঝড়ের ঝংকার। আধ্যাত্মিক ভাবসূত্র গেল হঠাৎ ছিঁড়ে। আস্তেব্যস্তে টেলিফোন ধরে শুনলাম, শ্রীরামপুরে থেকে রমেন জানাচ্ছে তোমাদের বিপদের কথা। অবিলম্বে 'মিট' করতে বলছে রেলওয়ে স্টেশনে। তার পরেই 'সার'কে নিয়ে আমার এখানে আগমন!

বীণা হতভম্ব হয়ে রমেনের দিকে চেয়ে শুধোলে, কিন্তু এ ট্রেনটা?.........

রমেন মৃদুকণ্ঠে বললে, ৯-৪৫এ কলকাতা যাচ্ছে। এখান থেকে ৯-৫৪ ছাড়বে আপের গাড়ী।

বীণা বললে কিন্তু......

রমেন ভালোমানুষের মত নিচু গলায় বললে, আপনি যে রকম ব্যস্তসমস্ত হয়ে গাড়িতে উঠলেন। আপনাকে নিরস্ত করারও অবসর হল না। তখন আপনাকে অনুসরণ করা ছাড়া উপায় ছিল কি?

কিন্তু টিকিটগুলো?

রমেন গম্ভীর হয়ে বললে, রেল কোম্পানীর কাছে টাকা রিফাণ্ডের জন্যে দরখাস্ত করতে হবে, হাওড়া পেঁাছিয়ে, আজকেই! ছলনা বুঝতে পেরে বীণার মুখ হয়ে উঠল কঠিন। সে বললে, মিথ্যাবাদী; সমস্তটাই আপনার সাজানো গল্প! কিন্তু এবার আর চাপা গলায় নয়। বঞ্চিতের চিত্তক্ষোভে বীণা আত্মহারা!

রমেন হাসি মুখে উত্তর দিলে, জীবন-গল্পের এটা হল বাস্তব দিক, বীণাদেবী।

দিলীপ না বুঝতে পেরে ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে রইল।

প্রফেসার পাকড়াশী ভালমানুষ। তিনি তাঁর মতো বুঝে বললেন, না, রমেন ঠিক কাজই করেছ। ওরকম অবস্থায় পড়লে আমিও ঐ করতাম। এছাড়া আর করবার কি ছিল?

বীণা অভিযোগের সুরে বললে, যখন জানতেন তখন আমাকে ও পথে আসতে বাধা দিলেন না কেন?

প্রফেসর পাকড়াশী দুচোখ কপালে তুলে বললেন, আধুনিকার স্বাধীন-ইচ্ছায় বাধা? আমার ত এত বয়স হয়েছে, আমি-ই সাহস করি না। রমেন ত সেদিনকার ছেলে!

বীণার ছেলেমানুষী ফিরে আসছিল। সে বাবার কথা শুনে হেসে বললে, তারপর খবর পেয়ে তোমরা কি করলে?

প্রফেসর পাকড়াশী বললেন, হন্তদন্ত হয়ে আগের ট্রেনে কলকাতা থেকে বেরিয়ে পড়লুম দুজনে, তোকে নিয়ে যেতে। তোর মাও আসতে চাইছিলেন। কিন্তু বলে কয়ে ঠাণ্ডা করেছি। মেয়ের জন্মদিনে এমন বিপত্তি। এতক্ষণ হয়ত ঠাকুরদেবতার পায়ে কত মাথা কুটছেন। বিপদে পড়লে বড় কথা মনে থাকে নারে, তখন সংস্কারই হয় প্রবল!

বীণা আর কোনো দিকে তাকালে না, কোনো কথাও বললে না। গাড়ীর জানলার বাইরে চোখ মেলে গুম হয়ে বসে রইল। রুক্ষ চুল তার শুকনো মুখের চার পাশে উড়ে উড়ে পড়তে লাগল। তার কেবলি মনে হতে লাগল, সে যেন অপরাধিনী। আর পুলিশরা কৌশলে তাকে বন্দিনী করে জেলখানায় নিয়ে চলেছে। বীণার দিকে আড়চোখে চেয়ে রমেনের মুখে জাগল একটু করুণ হাসি। একটা দীর্ঘনিঃশ্বাসও যেন পড়ল। চোখে জল এসেছিল কিনা ঠিক জানি না।



লেখু-ভেক

অ · ক্রূ · র

বন্ধু রাসবিহারী শেষকালে একটা সাপ্তাহিক কাগজের সম্পাদক হইল। ইহাতে আমরা, অর্থাৎ তাহার বন্ধুরা সবাই অবাক হইলাম, অবাক হইল না শুধু রাসু নিজে। তাহার ভাব দেখিয়া মনে হইল সে জন্মমুহূর্ত হইতেই জানিয়া আসিতেছে যে, এযাত্রা সম্পাদক হইবার জন্যই ভগবান তাহাকে মর্ত্যে প্রেরণ করিয়াছেন।

* * *

কাগজটা রাসবিহারীর শ্বশুরের সম্পত্তি। আমাদের মতে সম্পত্তি: কিন্তু তাঁহার মতে সম্পদ। ভদ্রলোকের এই সম্পদ ছাড়া একটি বিবাহযোগ্য কন্যা-সম্পদও ছিল; কিন্তু যত পাত্র বা পাত্রপক্ষকে তিনি হাত করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন, তাঁহারা সকলেই কন্যাটির বিবাহ-যোগ্যতা এবং সম্পদত্ব সম্বন্ধে তাঁহার সহিত একমত হইতে না পারিয়া বেহাত হইয়া গিয়াছিলেন, ফলে সম্পদশালী ভদ্রলোক শেষকালে বেহাল হইয়া পড়িয়াছিলেন।

এ হেন সময় রাসবিহারীর সঙ্গে তাঁহার যোগাযোগ ঘটিয়া গেল নিতান্তই দৈবক্রমে। সবটা খুলিয়া বলিতে গেলে অনেক কথা বলিতে হয়। সুতরাং সংক্ষেপে বলি, উভয়েই উভয়কে পাইয়া হাতে চাঁদ পাইলেন এবং মনে মনে বিধাতাকে ধন্যবাদ দিলেন। শুভদিনে শুভলগ্নে দুই হাত এক হইয়া গেল—একটি হাত রাসবিহারীর, অপরটি তাঁহার শ্বশুর-মহাশয়ের কন্যার। চারি চক্ষুর মিলন আগেই একবার হইয়াছিল, ছাঁদনাতলায় আর একবার হইল।

* * *

রাসবিহারীর লেখক হইবার সাধ ছিল, কিন্তু সাধ্য যে ছিল না, তাহা সম্পাদকেরা যেমন বুঝিতেন, রাসবিহারী নিজে তেমন বুঝিত না। 'তেমন'ই বা বলি কেন? একেবারেই বুঝিত না। তাহার দৃঢ় বিশ্বাস ছিল—সম্পাদকগুলি পদগর্বে গর্বিত হইয়াই লেখকদের সহিত যাচ্ছেতাই ব্যবহার করিয়া থাকে; পদগর্বে ধরাকে সরা জ্ঞান করে বলিয়াই লেখাগুলি ফেরৎ দেয়, এমন কি অনেক সময় ফেরৎ পর্যন্ত দেয় না।

সেকেলে বৌরা যেমন শাশুড়ীর মধুর ব্যবহারে জ্বালাতন হইয়া ভাবিত, "আচ্ছা, আমাদেরও দিন আসিবে। আমরাও একদিন শাশুড়ী হইব।" আমাদের রাসবিহারীও সম্পাদকদের গর্বোদ্ধত ব্যবহারে মনে মনে গোপনে তেলে বেগুনে জ্বলিয়া একদিন সক্রোধ হিন্দীতে বলিয়া উঠিয়াছিল, "আচ্ছা, হাম্ ভি ভবিষ্যৎমে সম্পাদক হোগা। তখন দেখ্ লেগা।"

সেই হইতে রাসবিহারীর মনে সম্পাদক হইবার কামনা ভূতের মত চাপিয়া ছিল। সুতরাং সম্পাদকত্ব লাভের সুবর্ণ সুযোগ যখন আসিল, তখন রাসবিহারী তাহা ছাড়িল না। সম্পাদক হইবার জন্যই অন্য কোনো দিকে না চাহিয়া বিবাহ করিল এবং বিবাহ করিয়াই সম্পাদক হইয়া গেল।

এমনটি যে হইবে তাহা আমরা আগে কেহই আশা করি নাই বলিয়া অবাক হইলাম। রাসবিহারী কি কারণে সম্ভবত অবাক হইল না, তাহা গোড়াতেই বলিয়াছি।

* * *

সম্পাদক হইয়া রাসবিহারীর সত্যই দর বাড়িয়া গেল। যাহারা আগে তাহাকে 'ভ্যাগাবণ্ড' রাসবিহারী বলিত, তাহারা এবার সম্পাদক রাসবিহারীকে সমীহ করিতে লাগিল।

কিন্তু সম্পাদকের গদীতে বসিয়া রাসবিহারী বড় বিপদে পড়িল। আগে ভাবিয়াছিল নিজের যে সব লেখা পরের কাগজে ছাপিতে পারে নাই, নিজের হাতে কাগজ পাইলে সেগুলি নিজের খুশীমত ছাপিবে। কিন্তু লেখক হিসাবে নিজের যে লেখাগুলি সে বিনা দ্বিধায় সম্পাদকদিগকে লক্ষ্য করিয়া ছুঁড়িয়াছিল, সম্পাদক হিসাবে নিজের সেই লেখাগুলিই হাতে লইয়া তাহার মন পরম দ্বিধায় খুঁৎখুঁৎ করিতে লাগিল। তাহার নামটি যে কাগজের মলাটের উপর জোরালো অক্ষরে জ্বলজ্বল্ করিতেছে, সেই কাগজের ভিতরের পাতার কোন লেখা পড়িয়া যদি কোন পাঠক বা পাঠিকা নাক সিটকায়! "আহা মরি, কি লেখাই ছেপেছে!" বলিয়া যদি মলাটের ললাটদেশে তাকাইয়া দেখে এই লেখা প্রকাশের জন্য দায়ী কে!

সুতরাং রাসবিহারীর নিজের লেখাগুলি তাহার সাটকেসেই নীরবে ঘুমাইতে লাগিল।

* * *

সাপ্তাহিক কাগজটির একটি সম্পাদকীয় পৃষ্ঠা ছিল, সেই পৃষ্ঠায় সম্পাদকের মনের কথা ছাপা হইত। অর্থাৎ পাঠক-পাঠিকারা সেইরূপই মনে করিতেন, কিন্তু যাহা ছাপা হইত তাহার সহিত সম্পাদকের মনের কোন সম্পর্কই থাকিত না। রাসবিহারীর বিবাহের পূর্ব পর্যন্ত তাহার শ্বশুর মহাশয়কেই সম্পাদক বলিয়া পত্রিকাটির মলাট ঘোষণা করিত; কিন্তু সম্পাদকীয় লিখিতেন সহ-সম্পাদক বৈকুণ্ঠ চাকলাদার। মলাটের উপর সম্পাদকের নাম পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গেই মর্তধাম সহ-সম্পাদক বৈকুণ্ঠ-বাবুর নিকট কি কারণে সহসা অসহ্য হইয়া উঠিল নিদিষ্ট জানেন; বলা নাই কওয়া নাই হঠাৎ তিনি সন্ন্যাস রোগে বৈকুণ্ঠধামে যাত্রা করিলেন।

তখন ভূতপূর্ব সম্পাদক বর্তমান সম্পাদককে বলিলেন "বাবা রাসু, সম্পাদকীয়টা এখন থেকে তোমাকেই লিখতে হবে।" বলা বাহুল্য শ্বশুর বলিল "আমাকে হবে তোমা লিখতেই হবে"—এমনভাবে যেন বাস্তবিকই তাহাকেই লিখিতে হইবে এবং তাহাকে লিখিতেই হইবে; যেন সে ছাড়া সম্পাদকীয় লিখিতে পারার মত লোক পৃথিবীতে আর কেহ জীবিত নাই। বৃদ্ধও ভাবিলেন সম্পাদকীয় এখন হইতে বাবা রাসুই লিখিবে।........

এইবার আমাকে বাধ্য হইয়াই কিঞ্চিৎ আত্ম-প্রশংসা করিতে হইবে। আত্মপ্রশংসা পছন্দ করি না বলিয়া ভাবিয়াছিলাম কথাটা আপনাদের নিকট চাপিয়া যাইব। কিন্তু সত্য চাপা (ল্যাটিন ভাষায় Suppressio veri) এবং মিথ্যা বলা (Suggestio falsi) নাকি একই জিনিষের এ-পিঠ আর ও-পিঠ, সুতরাং কথাটা সরল প্রাণে আপনাদিগকে না জানাইলে প্রত্যবায়গ্রস্ত হইতে হইবে।

রাসবিহারী গোপনে আসিয়া আমাকে ধরিয়া পড়িল। বলিল "ভাই সম্পাদকীয়টা তোমাকে লিখিতেই হইবে এবং তোমাকেই লিখিতে হইবে।" আমি বলিলাম "দেখ ভাই, তুমি সম্পাদক হইয়া সম্পাদকীয় লিখিবে না ইহা খুবই ভাল কথা—এবং খুবই স্বাভাবিক। কিন্তু তাহা লিখিবার জন্য আমাকে বাছিলে কেন?"

রাসবিহারী প্রথমে কহিল "আত্মপ্রশংসাটা না-ই বা শুনিলে।" তারপর কহিল "আমি নিজেই অবশ্য লিখিতে পারিতাম, কিন্তু সম্পাদকীয় লিখিতে গেলে কাগজের কাজ দেখিব কখন?" ভাবিয়া দেখিলাম কথাটা রাসবিহারী ঠিকই বলিয়াছে। একজন লোকের পক্ষে কাগজের কাজ দেখা এবং সম্পাদকীয় লেখা কি করিয়া সম্ভব হয়? সুতরাং রাজী হইয়া গেলাম।

সেই হইতে আমি গোপনে রাসবিহারীর সাপ্তাহিকে সম্পাদকীয় লিখিয়া আসিতেছি। সেই সম্পাদকীয় প্রকাশ্যে পড়িয়া অনেক পাঠক পাঠিকা রাসবিহারীকে সশ্রদ্ধ মুগ্ধ কণ্ঠে কহিতেছে "চমৎকার!" রাসবিহারী বিনয়ে গলিয়া গিয়া কহিতেছে "কি আর এমন?"

আমি জানি পাঠক-পাঠিকারা যতদিন "চমৎকার" বলিবে, প্রশংসা করিবে, ততদিন রাসবিহারীর সাপ্তাহিকে সম্পাদকীয় লেখক আমি নেপথ্যে পাঠক-পাঠিকার সহিত অপরিচিতই থাকিব।

যদি ইহার বিপরীত কিছু ঘটে, অর্থাৎ পাঠক-পাঠিকাগণ ক্ষেপিয়া উঠিয়া বলেন "কি যাচ্ছেতাই সম্পাদকীয় লিখেছে। লোকটার [illegible] তখন নেপথ্যের যবনিকা সরিয়া গিয়া আমি পাঠক-পাঠিকাগণের কাছে পরিচিত হইব। রাস-বিহারীই পরিচয় করাইয়া দিবে।

অনুবাদসাহিত্য

ডায়েরী

'মেরী ওলস্টোনক্রাফ্ট শেলি'

[মিসেস শেলির ডায়েরির অত্যন্ত কৌতূহলোদ্দীপক। প্রথম প্রথম এ ছিল শুধু ঘটনাস্রোতেরই চিহ্ন, কিন্তু কবির মর্মান্তিক মৃত্যুর পর তিনি এই ডায়েরিকেই তাঁর অন্তরঙ্গ করে নিয়েছেন। এই কয়টি বিষণ্ণ পাতার মধ্য দিয়েও একটি একক ও সাহসী মনের পূত, নিঃস্বার্থ ও অনুরক্ত মনের নিঝর দেখতে পাওয়া যায়। একটি মাত্র উদ্ধৃত অংশই পর্যাপ্ত হবেঃ এইটির রচনাকাল তাঁর নিদারুণ স্বামী-বিয়োগ-ব্যথার প্রায় দুই বৎসর পর।]

১৪ই মে, ১৮২৪। এই ই তবে আমার ইংল্যাণ্ডের জীবন; আর এইভাবেই নির্বান্ধব ছোট ঘরে আবদ্ধ হয়ে আমার সন্তানকে টেনে নিয়ে যেতে হবে। প্রতিদিনই আমি নিজেকে কোনও কাজে লাগাতে চাই। আমি লেখা ও পড়ার চেষ্টা করি, আমার অগ্র বহমান কল্পনা ও আমার দেহশক্তি আমি যা পড়ি তা ধরে রাখতে পারে না; ঘন কালো মেঘের বর্ষণ ধারার সাথে দিন চলে যায়, আর আমার মন মেঘলা আকাশের মত ক্লিষ্ট হয়ে ওঠে। কোনও প্রাচীন বন্ধুর অভাবে আমাকে প্রাকৃতিক পরিবেষ্টনীর সঙ্গে সখ্য করতে হবে; কিন্তু যদিও আমি শহর থেকে দূরের গ্রামের কথা বলি, তবুও এই জঘন্য জলবায়ুতে সেখানে তার কি সার্থকতা দেখবো? ইটালি, প্রিয়তম ইটালি আমার সমস্ত সুখ ও প্রিয়জন হত্যাকারী, তোমার সংগীত-মুখর ভাষার একটি কথা অজানিতভাবে আমাকে প্রতিদিন অঝোরে অশ্রুসিক্ত করে। আবার কবে ওই ভাষা সকলকে বলতে শুনবো, কখন দেখবো তোমার স্নেহ-নীল উদার আকাশ, কবে দেখবো তোমার শ্যামল বনানী, চঞ্চল নির্ঝর? এই অবিরত বর্ষণে কয়েকদিন ছোট্ট ঘরটির আবদ্ধ জীবন আমাকে পঙ্গু করে ফেলেছে। ভগবান জানেন, আমি বৃথাই সুখী হবার চেষ্টা করি। যে সমস্ত অবনমিত কারণে আমি ভারাক্রান্ত হয়ে আছি, আমার মানসিক প্রতিভার ব্যর্থতার মত আর কিছুই পীড়া দেয় না; যা লিখি তার কিছুই আমাকে সন্তুষ্ট করতে পারে না। এ আমার প্রতিভার অপমৃত্যু না শেলির (ও প্রিয়তম শেলি, তোমার নাম লিখেও কতটা শান্তি পাই!) উৎসাহের অভাব, আমি সঠিক বলতে পারি না; কিন্তু আমার মনে হয় আমাকে সুন্দর ও গম্ভীর প্রাকৃতিক আবেষ্টনীই অনুপ্রেরিত করতো—আজ তারই অভাবে আমার অবসান। জেনোয়াতে নিদারুণ মর্মাহত হয়ে থাকা সত্ত্বেও স্বপ্ন আমার মুখরিত হতো গিরিসংকটের আঁকাবাঁকা পথে, সোনালী নদীতে ভাসা নৌকোর পালে, উত্তাল সমুদ্রের ফেন-শীর্ষ জলে, বেগুনি রঙে ভরা অন্তরীপের মাটিতে, তারকা-খচিত আকাশে, জোনাকির চঞ্চল পাখায় ও ঝর্ণার কলসংগীতে। তখন আমি চিন্তা করতে পারতাম, আমার কল্পনা তখন দানা বাঁধতো এবং আমি নিজেই আমার গড়া পৃথিবীর সৌন্দর্যে মুগ্ধ হয়ে থাকতাম। এখন আমার মন মরুভূর মত ফাঁকা যেন নিরাকৃতি শূন্যতার নিঃসীম আবর্ত।

দি লাস্ট ম্যান। হাঁ, এখন আমি সেই মানবের একাকী, নিঃসঙ্গ জীবনের চমৎকার রূপ দিতে পারি; আমার মনে হয় আমি যেন এক জাতির সর্বশেষ মানব, আমার সঙ্গীরা আমার সম্মুখে এখান থেকে মুছে গেছে।

এই ক'দিন ও সপ্তাহের পুঞ্জীভূত বেদনারাশি আজ মুখর হয়ে উঠেছে, 'জেনোয়া' কথাটি আজ আমার চোখে পড়ায় আমার মনে ইটালির স্মৃতি আজ জেগে উঠেছে। একদিন আপন করে একটি 'জেনোয়া' আনবো স্থির করেছিলাম, এখনি সহজেই আজ আমি সুখী। আমি শুধু ওই 'জেনোয়ার' জন্য আবার ওই দেশে ফিরে যাবো।

যদি আমি বলি যে আমার সুস্থভাবে বাঁচার জন্য ওই প্রিয়তম দেশের ঘন-নীল স্বপ্নিল আকাশ ও সবুজ মাটির প্রয়োজন, তবে সকলে আমাকে পাগল বলবে—অবশ্য আজকের চেয়ে বেশী পাগল আর আমাকে কি দেখবে!

যদি এই দুঃসহ দিনগুলির পরিবর্তে কোনও দয়ার্দ্র অশরীরী আত্মা আমার কাছে আসে তবে যেন আমি আজ রাত্রে শুধু স্বপ্ন দেখি যে আমি ইটালিতে আছি! ওগো আমার শেলি, এই ক্লিষ্ট দেশে ফিরে আসার নামে তুমি কি বিভীষিকাই না কল্পনা করতে! তোমাকে ছাড়া এখানে থাকা যেন আমার দুইবার নির্বাসন, ইটালির থেকে দূরে থাকা তোমাকে দুইবার হারানো। প্রিয়তম, কেন আমার আত্মা আজ সমস্ত উদ্যম হারিয়ে ফেলেছে? সত্যি, সত্যিই আমাকে ফিরে যেতে হবে, নয়তো তোমার হতভাগিনী, বিয়োগ-বিধুরা মেরী আর কোনওদিন মৃত্যুঞ্জয়ী তোমাকে কল্পনা করতে পারবে না।

১৫ই মে। কাল রাত্রের দুঃসহ চিন্তা তবে এই ঘটনারই ছায়া মনে ফেলেছিল। বায়রন আজ সমাধিস্থ। মানব-সমাজের এক-জন—আমার প্রিয়পাত্রের প্রত্যেকেই আজ এই অসহ মহাশূন্যতায় আশ্রয় নিয়েছে। আমি তাকে জানতাম আমার যৌবনোচ্ছল দিনে—যখন ভয় ভাবনা আমার মনে উঁকি দিত না,—মৃত্যু এসে আমার নশ্বরতা স্মরণ করিয়ে দেওয়ারও পূর্বে, যখন এই সুন্দর পৃথিবী মৌচাকে আমার আশার চাক বাঁধছিল। আমি কি আমাদের দিয়োদেতির সান্ধ্য-ভ্রমণ ভুলতে পারি? ভুলতে কি পারি শান্ত হ্রদের জল-বিহার, যখন তিনি "টাইরোলিজ হিম" গাইতেন, আর বাতাস ও হ্রদের ঢেউ তাঁর গলার সঙ্গে সুর মিলিয়ে গাইতে শুরু করতো! আমার চরমতম দুঃখের দিনে তাঁর সান্ত্বনা, সহানুভূতির কথা কি ভুলতে পারি?—কখনই না।

তাঁর মুখশ্রী ছিল সৌন্দর্যের প্রতীক, আর তার সুন্দর চোখ দিয়ে কর্মশক্তি বিকীর্ণ হতো। তিনি ছিলেন দুর্বলমনা—তাই প্রত্যেকেই তাঁকে ক্ষমা করতে পারতো।

অ্যালবে ২—লক্ষ্মী, চঞ্চল, সুন্দর অ্যালবে আজ এই মরু-পৃথিবী ছেড়ে চলে গেছে! ভগবান করুন যেন আমিও অল্প বয়সে মারা যাই। আমাকে ঘিরে এক নতুন জাতি জাগছে, মাত্র ছাব্বিশ বছর বয়সেই আমার অবস্থা একজন বৃদ্ধার মত। আমার সমস্ত পুরনো বন্ধুরা চলে গেছেন, নতুন করে বন্ধুত্ব করার স্পৃহাও আমার নেই। যে কয়জন বন্ধু অবশিষ্ট আছেন তাঁদের আমি আঁকড়ে ধরতে চাই, কিন্তু তাঁরা আমার হাত থেকে খসে যাচ্ছেন; এই পৃথিবীর সঙ্গে আর কয়টি মাত্র বাঁধনে জড়িত আছি কল্পনা করতেও আমি মনে মনে শিউরে উঠি। "জীবন এক ধূ ধূ করা নির্জন মরুভূমি, কিন্তু মরণে কি পরিপূর্ণতা!"—এবং যে দেশ আমার প্রিয়তমদের আমার কাছ থেকে ছিনিয়ে নিয়ে গেছে, সেই দেশ এখন আমার কাছে সমুজ্জ্বল হয়ে উঠেছে—তাছাড়া আমার জীবন এই ব্যথিত পৃথিবীতে নিশ্চন্দ্র মধ্যরাত্রির মতই অন্ধকার।

১৮ই জন্। কি সন্দর এই রাত! আমি এখনই শহর থেকে ফিরছি; স্বচ্ছ নীল আকাশে শান্ত গোধূলি ছড়িয়ে আছে; চাঁদটি আকাশ-প্রদীপের মত আকাশে ঝলছে, আর আকাশের পশ্চিম কোণ এখনো সূর্যাস্তের সোনালি রঙে কাঁপছে। যদি আবহাওয়া ঠিক এইরকম থাকে তবে আমি আবার লিখতে বসবো; আমার চিন্তার প্রদীপ হৃদয়ের মধ্যে আবার জলে উঠেছে আর আকাশ থেকে সেই প্রদীপের অগ্নি-শলাকা নেমে এসেছে। প্রিয়তম শেলি, আর দশবছর আগে ঠিক এইরকম সময়েই আমরা দজন পরস্পরকে প্রথম দেখি, ঠিক সেই দৃশ্যেরই পুনরাবৃত্তি এখানেও—সেই গির্জা ও তার পবিত্র মিনার —যেখানে তোমার নীলচোখে প্রথম প্রেমাঞ্জন লেগেছিল। আকাশের তারারা আজ তোমার প্রতিবেশী এবং তোমার আত্মা আজ ওই দেশের সৌন্দর্যে পূর্ণ; আমিও প্রিয়তম, একদিন ওই সন্দর দেশে তোমার সঙ্গে মিলিত হবো। আকাশ, বাতাস, তোমার কথা আমার কানে কানে বলে যায়। শহরে, সমাজে আমি তোমাকে খুঁজে পাই না, কিন্তু নিঃসঙ্গ মুহূর্তে তুমি আমার, আমার একান্ত আপন, আমার অভিন্ন!

আমি আমার শক্তির উৎসের সন্ধান পেয়েছি, সন্ধান পেয়েছি আমার সুখের, শীতার্ত দিনগুলি আমার জীবন থেকে সরে যাচ্ছে। আমি আবার রচনার পূর্ণ আলোকে উদ্ভাসিত হয়ে উঠবো; আবার সেই কাগজের উপর আমার সমস্ত মন নিক্ষেপ করবো, আমার সমস্ত কল্পনা ডানা মেলে উড়ে এসে কাগজ পূর্ণ করে দেবে, আর আমি লেখার আনন্দ প্রাণ ভরে পান করে নেব। পড়া এবং লেখা হবে আমার সাথে কাজ নয়; এবং এই সুখের সন্ধান পাবো আমি দূরের বনানীতে, সবুজ মাঠে, ফুলে, ফলে ও শুভ্রশ্রী রৌদ্রে।

ইংল্যাণ্ড, আমি তোমাকে আদেশ করছি, আমার জন্য তুমি আবার হেসে ওঠো! ও ইংল্যাণ্ড! আমি তোমাকে বিখ্যাত করবো; যদি তুমি তোমার মেঘের ঘোমটাখানা আমার জন্য তোমার মাথার উপর থেকে সরাও তবে তোমার গৌরব আমি বৃদ্ধি করবো। আমাকে শুধু আমার শেলির দেশ ভাল করে দেখতে দাও, এই দেশের মধ্যে তাকে পেতে দাও!

তোমার সঙ্গ আমাকে সুখ দিয়েছে, কিন্তু আজ রাতের আগে আমি আর কোন-দিন পূর্ণ শান্তি পাই নি—এর আগে আর কোনও দিন তোমাকে এত আপনার করে পাইনি। দুঃখে ও শোকে আমি মাঝে মাঝে পার্থিব সান্ত্বনার কাঙাল হয়ে পড়ি। কিন্তু আনন্দের সময়ে আমি তোমার স্মৃতি নিয়েই চুপ করে থাকি, আমার হৃদয় তোমার স্বপ্নে আপ্লুত হয়ে থাকে।

বিদায় শেলি, প্রিয়তম! তোমার কথা মনে হলেই বিরহ-বেদনা দুঃসহ হয়ে ওঠে; কিন্তু আমি নিঃসন্দেহে বিশ্বাস করি, আমি নিঃসংশয়ে জানি যে, আজ তুমি যেখানে আছ আমিও সেখানে থাকবো—এবং প্রতিদিনকার মত এই প্রার্থনা নিয়েই শেষ করি—আমার সমস্ত অন্তরাত্মার এই প্রার্থনাঃ আমার শীঘ্র মৃত্যু হোক্!

অনুবাদকঃ সুনীলকুমার গঙ্গোপাধ্যায়

১। তাঁর একটি উপন্যাসের নাম।
২। ম্যালেগ্রা, লর্ড বায়রনের মেয়ে।

মেয়েদের কথাটাই আগে বলি। লেডিস্ ফার্স্ট হিসাবে তাঁহাদের দাবী আগে তো আছেই. তাছাড়া গত দুই সপ্তাহ ধরিয়া মেয়েরা পৃথিবী জুড়িয়া বিরাট আলোড়ন সৃষ্টি করিয়াছেন। জার্মানী হইতে প্রথম সংবাদ আসিয়াছে যে, যেসব জার্মান কুমারী মিত্রপক্ষীয় সৈন্যদের সঙ্গে দহরম-মহরম করিতেছেন তাহাদের মাথা মুড়াইয়া দেওয়া হইতেছে। জার্মানী বিধ্বস্ত হইলেও বুঝিলাম "আর্য-প্রথার" উপর বিশ্বাস তাদের এতটুকুও শিথিল হয় নাই। মাথা-মুড়ানো প্রায়শ্চিত্তে এখনও তারা আস্থাবান। কিন্তু আমরা বলি শাস্তির মাত্রাটা একটু কমাইয়া গোবর ভক্ষণের অনুকল্পটা গ্রহণ করিলেই হইত। এটাও বিশুদ্ধ আর্য-প্রথা!

* * * *

দ্বিতীয় খবর পাইলাম ঐ জার্মানী হইতেই। মিত্রপক্ষের অনেক ব্যক্তি (নিরাশ প্রেমিক হইতে পারেন) সখেদে বলিয়াছেন, জার্মানীর মেয়েদের আমাদের প্রতি এতটুকু দুর্বলতাও নাই (আহা, বেচারী)—তারা আমাদের চায় না, তারা চায় আমাদের চকোলেট্। চকোলেট হাতে পাইলেই তারা নির্বিকার ঔদাসীন্যে আমাদের ত্যাগ করিয়া চলিয়া যায়। চকোলেটের মত এতবড় একটি মহার্ঘ সামগ্রীর ঋণ জার্মান কুমারীরা স্বীকার করেন না দেখিয়া আমরা বিস্ময়ে হতবাক্ হইয়া গিয়াছি। নাৎসীরা কি জার্মানীকে এত অধঃপতনের পথেই টানিয়া নিয়াছে!

* * * *

তৃতীয় খবরটাও জার্মানীর এবং সেটাও জার্মান কুমারীদের। মিত্রশক্তির সৈন্যদের সঙ্গে মেলামেশার ফলে কোন্ শক্তির কত সংখ্যা তার হিসাব নাই—"Parity"র প্রশ্ন এখানে উঠে নাই। তিন হাজার জার্মান কুমারী নাকি সন্তানসম্ভবা হইয়াছেন। বুঝিলাম মিত্রপক্ষের বিরুদ্ধে জার্মানীকে প্ররোচিত করিবার প্রচার-প্রোপাগাণ্ডা সমস্তই পণ্ডশ্রম মাত্র হইয়াছে। মিত্রপক্ষীয় সৈন্যদের এই মৈত্রী-অস্ত্রের বিরুদ্ধে লড়িবার ক্ষমতা জার্মানী অর্জন করিতে পারে নাই। বিশু খুড়ো বলিলেন—মাথা মুড়ানো প্রায়শ্চিত্তের ভয় এবং শুধু চকোলেট প্রীতিতেই তিন হাজার! এখন ভাবিয়া দেখ অন্যথায় জার্মানীতে আর্যরক্ত বলিয়া আর কিছু অবশিষ্ট থাকিত না।

* * * *

চতুর্থ খবর আসিয়াছে অস্ট্রেলিয়া হইতে। খবরে বলা হইয়াছে:—

Australia is puzzled over a new war problem—what to do about girls who are finding their marriages to American

ট্রামে-বাসে

soldiers vanished along with their departing husbands.

ডি আর জার্ডিন Body-line বল্ করাইয়া অস্ট্রেলিয়াতে এক মহা সমস্যা উত্থাপিত করিয়াছিলেন। আমেরিকাবাসীরাও



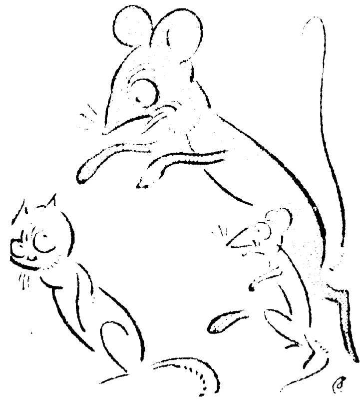
দেখিতেছি "Body-line" ব্যবহার করিতেছেন। আমরা শুধু বলিতে পারি—This is no cricket!

* * * *

সর্বশেষ সংবাদ আসিয়াছে লণ্ডন হইতে। বৃটিশ বিবাহিতা নারী সমিতির পক্ষ হইতে মিসেস ডরোথি উইলসন দাবী জানাইয়াছেন যে, যুদ্ধরত সৈনিকদের যেমন যৌন-স্বাধীনতা দেওয়া হইয়াছে—গৃহে পরিত্যক্তা তাহাদের পত্নীদেরও তেমনি এই ব্যাপারে সমান অধিকার দান করা উচিত। পুরুষদের সঙ্গে সমান অধিকারের অনেক দাবীর কথাই আমরা অনেকবার শুনিয়াছি। কিন্তু আলোচ্য দাবীর কথা শুনিয়া ভাবিলাম হ্যাঁ, মারি তো হাতি, লুটি তো ভাণ্ডার! পরিষদের ভোট, অফিসের চাকরী বড় জোর বিবাহ রদ করা—এসব আবার একটা দাবী, ফুঃ!

* * *

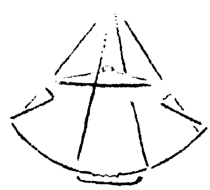
সিভিল সাপ্লাইর কণ্ট্রোলার জেনারেল বলিয়াছেন—"চোরাবাজারের জন্য ভারতের লজ্জিত হওয়ার কিছুই নাই। চোরাবাজারের দিক হইতে আমেরিকাও কিছু কম যান না।" সুতরাং আমরা লজ্জা ত্যাগ করিলাম। যা একটু কিছু লজ্জা ছিল পটসডামের সংবাদে তা একেবারেই গিয়াছে। শুনিলাম সেখানকার সম্মেলনে

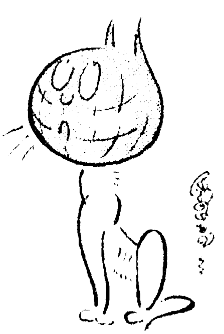


সংশ্লিষ্ট কর্মচারীরা নাকি প্রকাশ্যে চোরাবাজারের কারবার করিতেছে। সুতরাং জয় চোরাবাজারের জয় বলিয়া চুরিতে লাগিয়া যাওয়াই বুদ্ধিমানের কাজ। কোন প্রচার সচিব যদি "ঘৃণা লজ্জা ভয় তিন থাকতে নয়" শ্লোগান ব্যবহার করিয়া বিজ্ঞাপন দিতে পারেন তবে বাজারটার উত্তরোত্তর শ্রীবৃদ্ধি হইবে।

* * * *

পটসডামের পট বা হাঁড়িতে কি যে রান্না হইয়াছে তা বলা শক্ত। কেননা কেহই হাটে হাঁড়ি ভাঙেন নাই। পৃথিবীশুদ্ধ লোক





"পট্-লাকের" জন্য উদগ্রীব হইয়া আছেন। কিন্তু বিড়ালের ভাগ্যে শিকা অত সহজে ছিঁড়ে না।

স্যার জোরাম রইসম্যান নাকি বিলাতে বাড়ী খুঁজিয়া পাইতেছেন না। সংবাদদাতা বলিতেছেন—গৃহহীনেরা সংবাদটি পাঠ করিয়া নিশ্চয়ই কথঞ্চিৎ সান্ত্বনা পাইবেন। করাচী এবং এলাহাবাদে এবং অন্য অনেকস্থানে গৃহের বদলে যারা ফুটপাথে বিনিদ্র রজনী যাপন করিতেছেন রইসম্যানের দুর্গতি তাঁদের পক্ষে কতটা সান্ত্বনার হইবে তা বলা শক্ত। তবে হ্যাঁ, ভারতীয় নারীরা হয়ত খানিকটা সান্ত্বনা লাভ এই ভাবিয়া করিবেন যে, প্রকৃতির প্রতিশোধটি ঠিক জায়গায় গিয়া পড়িয়াছে। স্যার জেরিমি রইসম্যান ভারতের জন্য জন্ম-নিয়ন্ত্রণের সুপারিশ করিয়াছিলেন। নারীর শাপেই হয়ত — — — কিন্তু থাক্, কানাকে কানা বলিতে নাই।

* * * *

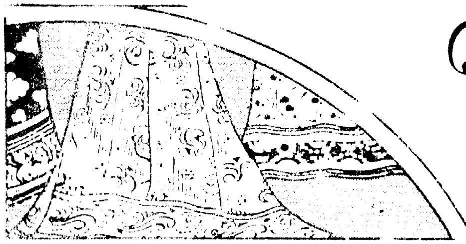
শ্রীযুক্তা গীতা মুখার্জীর পত্র প্রসঙ্গে কলিকাতার পথে ঘাটে এবং খবরের কাগজের স্তম্ভে যে আলোড়ন বিলোড়ন হইয়া গিয়াছে তাহা হইতে জানিতে পারি যে, মেয়েদের নিরাপত্তার জন্য ট্রামচালকের পাশ দিয়া গাড়ী প্রবেশের রাস্তা এবং প্রথম-দিকের দুখানা সীট মেয়েদের জন্য ব্যবস্থা করিবার প্রস্তাব ট্রামের এজেন্ট মহোদয় নোট করিয়া রাখিয়াছেন বটে কিন্তু গ্রাহ্য করেন নাই। মেয়েদের অগ্রগমনের পথে বাধা সৃষ্টি করিয়া ট্রাম কোম্পানী সনাতনী মনোভাবের পরিচয় দিলেন। তাঁহারা ভাবিয়া দেখিলেন না ঐ একটি মাত্র পথ বন্ধ করিয়া দিয়া—দেশের দুর্নীতির কত সহস্র পথ তাঁরা খুলিয়া রাখিলেন!

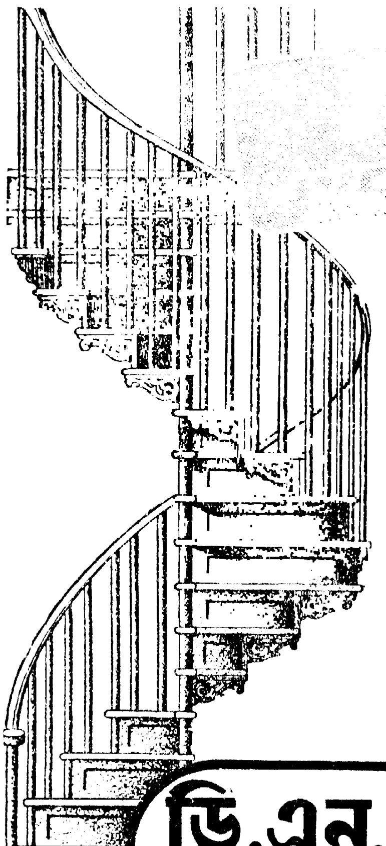
* * * *

পটসডামে যোগ দেওয়ার সময় ষ্টালিন নাকি তাঁর পকেটে করিয়া একটি জাপানীর সন্ধি-প্রস্তাব নিয়া গিয়াছিলেন। কিন্তু পরে সে সম্বন্ধে আর কোন সংবাদ শোনা গেল না। পথে কেউ পকেট মারিয়া দেয় নাই তো?

* * * *

হিটলার মরিয়াও মরিতেছেন না। কত জায়গায় যে তাঁকে কতজনে আবিষ্কার করিতেছে তার হিসাব রাখাই দায় হইয়া উঠিয়াছে। সম্প্রতি মোহনবাগান-ইস্টবেঙ্গল খেলার দিনে নাকি বিশুখুড়ো হিটলারকে রেম্পার্টে দাঁড়াইয়া খেলা দেখিতে দেখিয়াছেন—Believe it or not!





ব্যবসা ও বাণিজ্য

ভারতের লৌহ শিল্প

কালীচরণ ঘোষ

পূর্ব প্রবন্ধে লৌহের ব্যবহার সম্বন্ধে আলোচনা করা হইয়াছে। ভারতবর্ষে এই ব্যবহার যে কত পুরাতন তাহা আজ কোন রূপেই বলিবার সম্ভাবনা নাই। প্রকৃতপক্ষে ধারাবাহিক ইতিহাস সৃষ্টি হইবার বহু পূর্ব হইতেই ভারতবর্ষ এই অদ্ভুত জ্ঞানের পরিচয় দিতেছে।

সাধারণত লৌহ দ্রব্য জল হাওয়ায় ক্ষয়প্রাপ্ত হইয়া যায়; সুতরাং অতি প্রাচীন নিদর্শন পাওয়া বড়ই কঠিন। তবে লৌহের গুণের উপর ইহার তারতম্য বহুল পরিমাণে নির্ভর করে।

যে সকল পুরাতন নিদর্শন এখনও দেখিতে পাওয়া যায়, তাহাতে মনে হয়, ভারতবর্ষ এককালে উৎকৃষ্ট লৌহ প্রস্তুত করিবার জ্ঞানে সমৃদ্ধ ছিল।

বিশেষজ্ঞদিগের মতে পৃথিবীর মধ্যে লৌহ শিল্প সম্বন্ধে ভারতের জ্ঞান সর্বাপেক্ষা পুরাতন। স্যার উইলিয়াম হাণ্টারের মত পণ্ডিতেরা বহু গবেষণা দ্বারা প্রমাণ করিয়াছেন, খনির মধ্যে লৌহ-প্রস্তর নিষ্কাসনে যে সকল পুরাতন পরিচয় লক্ষ্য করিতে পারা যায়, ভারতবর্ষ তাহাদিগের মধ্যে সর্বাপেক্ষা প্রাচীন। রস্কো ও সোরলেমার (Roscoe and Schorlemmer) এ বিষয়ে বিশেষ গবেষণা করিয়া একই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন।

পণ্ডিতগণ যে সকল তথ্যের উপর নির্ভর করিয়া তাহাদের মতামত দিয়াছেন, তাহার চিহ্ন আজও বিলুপ্ত হয় নাই। ব্রহ্মপুত্র, সিন্ধু, গঙ্গা প্রভৃতি নদনদীর পলি পড়িয়া যে সকল নূতন জনপদ সৃষ্টি হইয়াছে, তাহা বাদে ভারতের প্রায় সর্বত্র প্রাচীন লৌহ শিল্পের চিহ্ন এখনও বর্তমান। এখনও যত্রতত্র প্রস্তর হইতে বিমুক্ত মল বা গাদ ছড়াইয়া পড়িয়া আছে এবং তাহা হইতে প্রমাণিত হয় যে, নিকটবর্তী কোনও স্থানে লৌহ নিষ্কাসনের যথোপযুক্ত ব্যবস্থা ছিল।

লৌহ নিষ্কাসনের প্রাচীন প্রথা ও চুল্লী উভয়ই পণ্ডিতদিগের প্রশংসমান দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে সক্ষম হইয়াছে। ভ্যালেণ্টাইন বল ভারতের পুরাতন চুল্লী লক্ষ্য করিয়া বিস্ময়ে অভিভূত হইয়াছেন। তাঁহার মতে ইহা ভারতের অতীত গৌরবের কথা স্মরণ করাইয়া দেয়। চুল্লীর গঠন প্রণালী দেখিয়া স্বচ্ছন্দে অনুমান করা যায় যে, ইহা সর্বপ্রকারে প্রয়োজনের উপযোগী করিয়া নির্মিত। বল একথাও বলেন যে, ইহা সম্ভবতঃ অতীত যুগের অতিকায় চুল্লীর অতি ক্ষুদ্র সংস্করণ। প্রাচীন বিরাটকায় জীব সকল কালের বিবর্তনে হয় লোপ পাইয়াছে, আর না হয় আকারে ক্রমেই ক্ষুদ্র হইয়া পড়িয়াছে। ইহা হইতে অনুমান করা যায়, পূর্বকালের শক্তি-সামর্থ্যের ধারণা করিয়া ইহা মনে করা অস্বাভাবিক নহে, যে তখন চুল্লীর আকার অপেক্ষাকৃত বহুগুণে বড় ছিল। পরে অনেক উন্নতি সাধিত হইলেও, ভারতের পুরাতন চুল্লী আজও বিস্ময় উৎপাদন করে।*

কিন্তু ইহা অপেক্ষাও তাঁহারা আরও অদ্ভুত জ্ঞানের অধিকারী ছিলেন। ভারতবর্ষীয় লোহার লৌহ নিষ্কাসনের জ্ঞান আয়ত্ত করিবার কতকাল পরে অপর দেশে লোকে এই জ্ঞান আহরণ করিয়াছে, তাহা নির্ণয় করা কঠিন; সম্ভবত ইহার মধ্যে কয়েক সহস্র বৎসর গত হইয়া থাকিবে। কিন্তু ভারতবাসীর লৌহ নিস্কাসনের রীতি আরও বিস্ময়জনক। ইহাও হয়ত কোনও প্রাচীন উন্নত প্রথার অপভ্রংশ সংস্করণ। এখনও সে বিষয় আলোচনা করিলে প্রাণ আনন্দে পূর্ণ হইয়া উঠে। এখনও ভারতবাসী বলিয়া নিজেকে পরিচয় দিবার গর্ব অনুভব করি। লৌহবহুল প্রস্তর হইতে লৌহ নিষ্কাসন অপেক্ষাকৃত সহজ; কিন্তু ভারতবাসী তাহা অপেক্ষা কম ধাতুযুক্ত লৌহ-প্রস্তর ব্যবহার করিয়া ধাতু উদ্ধার করিতেন। তাহা ছাড়া প্রয়োজনমত প্রক্রিয়া বা উপকরণের সামান্য পরিবর্তন করিয়া ইস্পাত উদ্ধার করাও এক অতুলনীয় জ্ঞানের পরিচায়ক।

সাধারণত লৌহ নিষ্কাসন ব্যাপারে লৌহ-প্রস্তর (কাঠ) কয়লা এবং অপরাপর প্রয়োজনীয় বস্তু সংযোগে অগ্নির উত্তাপে দগ্ধ করিবার কালে হাপর-এর সাহায্যে বায়ুপ্রবাহ চালিত করা হইত। ইস্পাত প্রস্তুত কার্যে তাঁহারা ইহার পরিবর্তন সাধন করিয়া লইতেন। লৌহকণাময় (ferriginous) মৃত্তিকা সংগ্রহ করিয়া যতদূর সম্ভব অপরাপর অবাঞ্ছিত পদার্থ দূর করিয়া দিতেন এবং ঐ মৃত্তিকার সহিত তুঁষ সংযোগ করিতেন। ইহা দ্বারা তাঁহারা লৌহ গালাই করিবার মূচি (crucibles) তৈয়ারী করিতেন। তাহাতে পূর্বে নিষ্কাসিত কতক পরিমাণ লৌহ, আভারাম গাছের কাঠ অথবা কয়লা এবং মাদার বা আকন্দ পাতা দিয়া মূচি সমেত সমস্ত বস্তু কাদা দিয়া মুড়িয়া দিতেন। এইরূপ কুড়ি পঁচিশটি মূচি পরপর সাজাইয়া অগ্নি দ্বারা দগ্ধ করিতেন। তাহাতে লৌহের পরিমাণ অনুযায়ী এক পোয়া বা ততোধিক, ভাল ইস্পাত পাওয়া যাইত।

লৌহ হইতে ইস্পাত প্রস্তুত করিবার এই প্রথার বৈজ্ঞানিক ভিত্তি আছে। বিশিষ্ট বৈজ্ঞানিকগণ মনে করেন, আভারাম কাঠ ও আকন্দ পাতা অগ্নি সংযোগে কার্বণ ও হাইড্রোকার্বণ উৎপন্ন করিয়া চার হইতে ছয় ঘণ্টার মধ্যে উৎকৃষ্ট ইস্পাত করিতে সক্ষম হইত। কিন্তু অপরাপর দেশে কেবল কয়লা দ্বারা দগ্ধ হওয়ায়, সাধারণত একই প্রথায় ছয়সাত দিন হইতে দুইতিন সপ্তাহ লাগিয়া যাইত।* যাঁহারা ইস্পাত প্রস্তুত করিতে ছয় সাত সপ্তাহ ব্যয় করিতেন, তাঁহারা ভারতবাসীর সহিত তুলনায় সমকক্ষ নহেন। তাহা ছাড়া ইহা অনুমান করা মোটেই কষ্টকর নহে যে, যাঁহারা এইরূপ বৈজ্ঞানিক ভিত্তির উপর নিজেদের ইস্পাত প্রস্তুত করিবার রীতি আবিষ্কার করিয়াছেন, তাঁহারা অপর দেশ হইতে বহু পূর্বেই এই বিদ্যা কেবল আয়ত্ত করিয়াছেন তাহা নহে, ইহার জন্য বহুকাল বহু গবেষণা চালাইয়া তবে এইরূপ উন্নত অবস্থায় উপনীত হইতে পারিয়াছেন।

কেবল যে ইস্পাত তৈয়ারী করিবার উপায় নির্ধারণে তাঁহারা তাঁহাদের অদ্ভুত অধ্যবসায় ও বিরাট জ্ঞানের পরিচয় দিয়াছেন, তাহা নহে, গুণ হিসাবে এই ইস্পাতের তুলনা ছিল না। দেশ দেশান্তে ভারতের ইস্পাতের সুনাম ছড়াইয়া পড়িয়াছিল এবং ইহার গুণে আকৃষ্ট হইয়া ভারতবর্ষের বাহির হইতে বহু সভ্যদেশ বণিক পাঠাইয়া ইহা সংগ্রহ করিবার ব্যবস্থা করিয়াছিল।

ভারতের লৌহ-ইস্পাতের ইতিহাসের তুলনায় ইহাকে "এই সেদিনের কথা" বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। ভারতবর্ষের প্রাচীন অস্ত্র-শস্ত্রাদির যে বিবরণ ভারতীয়

---

* V. Ball—A Manual of the Geology of India, Part III, Economic Geology, P. 238.

* Dr. Panchanan Neogi: **Iron in Ancient India** and Dr. Panchanan Mitra: **Pre-historic India—Its place in World culture, P. 254.**

প্রাচীন গ্রন্থাদিতে পাওয়া যায়, তাহা কল্পনার বিলাস নহে, তাহারা বাস্তব বস্তু।

ভারতের লৌহের উল্লেখ ঋগ্বেদ প্রভৃতি গ্রন্থে পাওয়া যায়। ইহা অস্বাভাবিক ব্যাপার বলিয়া মনে করিবার হেতু নাই। যাঁহারা বেদ রচনার উপযোগী বিদ্যা আয়ত্ত করিয়াছেন, তাঁহারা সভ্যতার যে অবস্থায় উপনীত হইয়াছেন বলিয়া মনে হয়, তাহার পশ্চাতে লৌহের অবস্থিতি নিশ্চিতভাবে সূচনা করে। কৃষির উন্নতি এবং তাহার সহিত প্রাতিনিয়ত অন্নসংস্থানের দুশ্চিন্তার হাত হইতে অব্যাহতি না পাইলে বেদ রচনার উপযোগী বিদ্যার্জন করা এবং তাহাকে রূপ দেওয়ার মত শান্ত অবস্থার উদ্ভব কখনই সম্ভব হইত না। কৃষির এই অবস্থা লৌহের ব্যবহার ব্যতিরেকে সম্ভব হইত না।

আরও ইহা সম্ভব হইত না, যদি এই সকল ঋষিদিগের আত্মরক্ষার বা অপরের সাহায্যে রক্ষা পাইবার উপায় না থাকিত। সদাসর্বদা শত্রুর উৎপাতে বিপর্যস্ত অবস্থায় বেদ সৃষ্টি সম্ভব নয়। বর্বর, পথ চলিতে চলিতে শ্রুতি উৎপন্ন করে না। বন্য পশুর আক্রমণে যাঁহারা সর্বদাই বিপন্ন, সকল সময় অসুর উপদ্রব করিয়া যাঁহাদের সমিধ আহরণে যজ্ঞ কার্যে বিঘ্ন উৎপাদন করে, তাঁহাদের পক্ষে নিরঙ্কুশ থাকিয়া ভগবচ্চিন্তা, অধ্যয়ন, অধ্যাপন, অর্চনা, শিল্প, কাব্য, কলা সৃষ্টি করা সম্ভব হইত না। এই অবস্থা অস্ত্রশস্ত্র সম্পর্কে বহু প্রসারী জ্ঞান সূচনা করে। লৌহ শিল্পে পারদর্শী না হইলে এই সকল কখনই সম্ভব হইত না।

রামায়ণ মহাভারত যুদ্ধশাস্ত্রের যে পরিচয় দেয়, সে যুগের সভ্যতার যে সাক্ষ্য দিতেছে, তাহা কেবল লৌহ নয়, অপরাপর ধাতব পদার্থ সম্বন্ধে জ্ঞানের উপর প্রতিষ্ঠিত। আয়ুর্বেদের যুগে আসিয়া পড়িলে অভিভূত হইতে হয়। সুশ্রুত সংহিতায় শতাধিক ক্ষুরধার অস্ত্রের নাম ও বিবরণ পাওয়া যায়। ইহাদের যে বিবরণ পাওয়া যায় তাহা অতীব অদ্ভুত। কি করিয়া ইহা সম্ভব হইয়াছিল, তাহার ধারণা করা যায় না। সুশ্রুত সংহিতায় "যন্ত্র" অর্থে "শল্য" আহরণ করিবার বস্তু অর্থাৎ মন ও শরীরের পীড়াদায়ক বস্তু (শল্য) দূর করিতে যাহার সাহায্য গ্রহণ করা হয়, তাহাই যন্ত্র। যন্ত্র ছয় প্রকার, যথা স্বস্তিক যন্ত্র, সন্দংশ যন্ত্র, তাল যন্ত্র, নাড়ী যন্ত্র শলাকাযন্ত্র ও উপযন্ত্র। ইহাদের সম্মিলিত সংখ্যা ১০১; তন্মধ্যে উপযন্ত্র ২৫টি ধাতু নির্মিত নহে।

ইহা ছাড়াও কুড়িটি শস্ত্র বলিয়া জানা গিয়াছে। সাধারণ লোকের পক্ষে নাম * হইতে ইহাদের আকার ও ব্যবহার সম্বন্ধে ধারণা করা কষ্টসাধ্য হইলেও সকলগুলি সম্পর্কে একেবারে অসাধ্য নয়। কিন্তু যাঁহারা অন্তত দুই সহস্র, হয়ত বা আরও বেশী, বৎসর পূর্বে এই সকল শস্ত্র নির্মাণ করিতে পটু ছিলেন এবং ইহাদের ব্যবহারে পারদর্শী ছিলেন, তাঁহারা ইহার কত শত বৎসর পূর্ব হইতে ইহাদের সম্বন্ধে গবেষণা করিয়াছেন, তাহার ধারণা করাও কঠিন।

কিন্তু এই সকল যন্ত্রের "মশলা" অর্থাৎ মূল লৌহ ও ইস্পাত উদ্ধার করিতে যে জ্ঞান প্রয়োজন, তাহাও নিতান্ত অদ্ভুত। এই সকল শস্ত্রের অধিকাংশই অত্যন্ত তীক্ষ্ণধার এবং একবার নির্মিত হইলে বহুকাল নিজ কর্তব্য সম্পাদন করিতে পারিত। কোনও যন্ত্র অত্যন্ত সূক্ষ্ম; কথিত আছে স্ত্রীলোকের কেশ লম্বালম্বিভাবে দ্বিখণ্ডিত করিবার ক্ষমতা কোনও কোনও অস্ত্রের ছিল। দেহের সকল অঙ্গে, ভ্রূণ, চক্ষু, নাসিকাভ্যন্তর প্রভৃতি স্থানে

(১) মণ্ডলাগ্র, (২) করপত্র, (৩) বৃদ্ধিপত্র, (৪) নখশস্ত্র, (৫) মুদ্রিকা, (৬) উৎপলপত্র, (৭) অর্ধধার (৮) সূচী (৯) কর্ণপত্র, অন্তর্মুখ, (১৩) ত্রিকূর্চক, (১৪) কুঠারিকা, (১০) আটীমুখ, (১১) শরারিমুখ, (১২) (১৫) ব্রীহিমুখ, (১৬) আরা (১৭) বেতসপত্র, (১৮) বড়িশ, (১৯) দন্তশঙ্কু, (২০) এষণী।

অস্ত্রোপচার করিবার উপযুক্ত যন্ত্রাদি ছিল; সুতরাং ভারতবাসীকে যাহারা অজ্ঞ অসভ্য বর্বর বলিয়া জগতে প্রচারিত করিল, তাহারা সত্যের কত বড় অপলাপ করিয়াছে তাহা তাহারাই জানে। যাহারা অস্ত্রোপচার বিদ্যার বড়াই করিয়া ভারতের নিজস্ব চিকিৎসার ধারা লোপ করিয়া দিয়াছে, তাহারা সভ্যবেশধারী দস্যু ব্যতিরেকে কিছুই নহে। তাহাদের দেশের ঔষধাদি বিক্রীত হইবে, তাহাদের উপার্জনের পথ প্রশস্ত হইবে, নিরঙ্কুশ হইবে, তাই তাহারা একটা প্রাচীন দেশের সমস্ত ধারা, নিজস্ব পরিচয় নষ্ট করিয়া দিয়া, দেশের উপযোগী, দেশবাসীর উপযোগী সমস্ত চিকিৎসার উপায় অবরুদ্ধ করিয়া, হেয় প্রতিপন্ন করিবার চেষ্টা করিয়া জগতে নিজেদের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করিয়াছে। ইতিহাস এইখানে এতদিন মূক ছিল; এখন প্রচার বিদ্যায় শিক্ষালাভ করিয়া ভারতবাসী তাহাকে মুখর করিয়া তুলিলে জগতের মধ্যে আবার ভারতবর্ষ শ্রেষ্ঠ আসনলাভ করিতে সমর্থ হইবে। অবশ্য পরাধীন জাতি বলিয়া তাহাকে বিশেষ ক্লেশ সহনে সত্য কথা জগতকে বিশ্বাস করাইতে হইবে।

লৌহশিল্পের এই ধারা বরাবর চলিয়া আসিয়াছে। হিন্দু, পাঠান, মোগল আমলে ভারতের লৌহ শিল্প সমৃদ্ধ ছিল। দামাস্কাস হইতে বণিক হায়দরাবাদের উট্‌স (wootz) লইবার জন্য "অতি ভয়ানক পর্বতশ্রেণী" নদী নদ উপেক্ষা করিয়া মরু চলিয়া আসিয়া জুটিত। ইস্পাতের তৌলিকা নাম উট্‌স। কত বণিক পথশ্রমে, বন্যজন্তুর আক্রমণ, দস্যুর অত্যাচারে প্রাণ দিয়াছে, তাহার হিসাব নাই। কিন্তু শতাব্দী ধরিয়া বাহিরের শিল্পী ভারতবর্ষে আসিয়া ইস্পাত সংগ্রহ করিত, তাহার প্রমাণের অভাব নাই। ভ্যালেণ্টাইন বল (V. Ball) মহাশয়ের সহিত ভারতীয় শিল্পের বিষয় আলোচনা করিয়াছেন, তাঁহার নিজের ভাষায় ইহার পরিচয় দিলাম:—

"If we take a survey of the system of iron manufacture as practised by the natives of India, we meet here traces of what may be the remnants of higher system of working than those now existing. They are quite independent of various local differences as to the forms and size of the furnaces and the bellows, or difference in the nature, size and subsequent treatment of the bloom. First in importance is the manufacture of the cast steel, in concibles, which attracted so much notice many years ago. for a time Indian Wootz or steel was in considerable demard by cutlers in in England. Its production was the cause of much wonderment and became the subject of various theories. The famous Damascus blades had along attained a reputation for flexibility, strength and beauty before it was known that the material from which they were made was procured in an obscure Indian village, and that traders from Persia found that it paid them to travel to this place, which was difficult of access in order to obtain the raw material.

"There are reasons to believe that it was exported to the West in very early times--possib'y 2,000 years ago."

Economic Geology, Part III, PP. 339-40.

যদি দামাস্কাসের তরবারি জগতের বিস্ময় উৎপাদনে সমর্থ হইয়া থাকে, তাহা হইলে সে গৌরব ভারতের প্রাপ্য, মূলত সে উপাদান ভারতবর্ষ সরবরাহ করিয়াছে।

ভারতবর্ষে এরূপ তরবারি, তীর, বর্শার ফলক, শির উপেশ্যে খড়্গ প্রভৃতি প্রচুর পরিমাণে নির্মিত হইত। ভারতের বিরাট প্রয়োজনে তাহা লাগিয়া যাইত বলিয়া মনে করিলে ভুল হইবে না।

ভারতের লৌহ ইস্পাতের পুরাতন নিদর্শন এখনও স্থানে স্থানে বর্তমান রহিয়াছে। মাদ্রাজের টিনেভেলী জেলায় কয়েকটি সমাধি খনন করিতে করিতে তরবারি, ছোরা, বর্শা, ত্রিশূল, কোদাল, বাটালি, লোহার কাঁড় প্রভৃতি পাওয়া গিয়াছে। সম্ভবতঃ ইহাই ভারতীয় লৌহশিল্পের সর্বাপেক্ষা পুরাতন নিদর্শন। ইহা ছাড়া অন্যান্য স্থানেও অপরাপর নিদর্শন পাওয়া যাইতেছে। নেপাল সীমার সন্নিকটে পিপরাওয়া স্তূপ হইতে প্রাপ্ত দ্রব্যাদি এবং মালেরা (মোলদ)র ধ্বংসস্তূপের উল্লেখ করা প্রয়োজন।

কিন্তু দিল্লী স্তম্ভ সকলকে পরাজিত করিয়াছে। মিঃ ফারগুসন অনুমান করেন, ৪০০ খৃষ্টাব্দের পূর্বেই ইহার নির্মাণকার্য সম্পন্ন হইয়াছে। এতদিনেও ইহার গায়ে মরিচা ধরে নাই, কোনও পরিবর্তন সংসাধিত হয় নাই, যদিও ইহা অনাবৃত অবস্থায় থাকায় রৌদ্র, বৃষ্টি হিম-শিশির সবদেই ইহার উপর প্রভাব বিস্তার করিতেছে। স্যার রবার্ট হ্যাডফিল্ড বিশ্লেষণ দ্বারা দেখিয়াছেন, ইহা সম্পূর্ণরূপে লৌহ দ্বারা নির্মিত। ইহাতে মরিচারোধকারী ক্রোমিয়ম প্রভৃতি খাদ মিশ্রিত নাই। ইহার মধ্যে শতকরা ৯৯·৭২ ভাগ লৌহ বর্তমান আর বাকী অর্থাৎ ·২৮ ভাগ মাত্র কার্বন, সিলিকা, গন্ধক ও ফসফরস।

এই গুণ ছাড়া ইহাতে আরও একটি অদ্ভুতত্ব বর্তমান। প্রায় ছয় হইতে আট টন ওজনের লৌহের একটি পিণ্ড লইয়া কিভাবে নাড়াচাড়া করিয়া ইহার গঠনকার্য সম্পন্ন করা গিয়াছে, তাহা অনুমান করাও কঠিন। লোভাট ফ্রেজার তাঁহার Iron and Steel in India নামক পুস্তকে লিখিয়াছেন

Iron and steel in India

"To this day, the method by which it was produced is a mystry greater than the pyremids."

মন্দিরাদিতে যে লৌহের থাম, ছড়, কোণ প্রভৃতি দেখা যায়, তাহাও পুরাতন শিল্পের অবশিষ্ট পরিচয়। তাহা ছাড়া সংসারে নিত্য ব্যবহার্য তৈজসাদি, কৃষি প্রভৃতির সরঞ্জাম, গৃহনির্মাণের সরঞ্জাম, অশ্বপদের উপযোগী লৌহ, পেরেক প্রভৃতি সবই দেশী ছিল।

মুসলমান আমল বজায় থাকিলেও ইংরেজ আমলে লোপ পাইয়াছে। ইংরেজ আসিয়াও এখানকার নিষ্কাসিত লৌহ দেশে পাঠাইয়াছে, মেনাই নদীর পুল নির্মাণকার্যে ব্যবহার করিবার জন্য; কারণ পরীক্ষার প্রমাণিত হইল ভারতীয় প্রথায় নিষ্কাসিত লৌহ বিদেশী ফার্ণেস হইতে প্রাপ্ত লৌহ অপেক্ষা গুণে শ্রেষ্ঠ।

এই সকল প্রমাণ হইতে বেশ বুঝিতে পারা যায় যে, ভারতীয় শিল্পের ধারাবাহিকতা কোনও কালে নষ্ট হয় নাই, তবে শ্বেতাঙ্গ জাতির চাপে তাহা নষ্ট হইয়াছে। আশা আজ নূতন অধ্যায়ে ভারতীয় শিল্প পুরাতন প্রথায় না হইলেও পুরাতন যশঃ লাভ করিয়া প্রতিষ্ঠিত হইতে পারিবে।

ফুটবল লীগ

কলিকাতা ফুটবল লীগ প্রতিযোগিতার প্রথম ডিভিসনের চ্যাম্পিয়ানসিপের মীমাংসা এখনও হয় নাই। আরও দুই সপ্তাহ ধৈর্য ধরিয়া থাকিলে ফলাফল দেখিবার সৌভাগ্য হইবে। গত সপ্তাহেও সাধারণ ক্রীড়ামোদিগণের মধ্যে "কে চ্যাম্পিয়ান" হইবে দেখিবার জন্য যে প্রবল উত্তেজনা ছিল, বর্তমানে তাহা অনেকাংশে হ্রাস পাইয়াছে। দুই সপ্তাহ পরে এই উৎসাহের পরিণতি কি হইবে, তাহা সহজেই অনুমেয়।

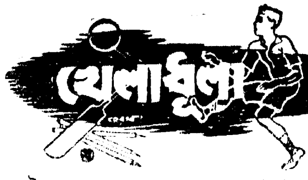
ইস্টবেঙ্গল ও ভবানীপুর দলের খেলার ফলাফলের উপরই চ্যাম্পিয়ানসিপের মীমাংসা নির্ভর করিতেছে। এই খেলা আগামী ১১ই আগষ্ট আই, এফ, এ, শীল্ড ফাইনাল অনুষ্ঠানের পর হইবে বলিয়া পরিচালকগণ স্থির করিয়াছেন। ইণ্ডিয়ান ফুটবল এসোসিয়েশনের ইতিহাসের পাতা উল্টাইয়া দেখিলে লীগের মীমাংসা শীল্ড প্রতিযোগিতার শেষে হইয়াছে বলিয়া দেখা যায় না। সুতরাং সেইদিক দিয়া এইরূপ অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা হওয়ায় আই, এফ, এর ইতিহাসে একটি অভিনব নূতন অধ্যায় রচিত হইল সন্দেহ নাই। তবে দুঃখ হয় যে, ইহার ফলে লীগ প্রতিযোগিতার গুরুত্বের মূলে কুঠারাঘাত করা হইল।

আই এফ এ, শীল্ড

আই, এফ, এ শীল্ড প্রতিযোগিতার সকল খেলা শেষ হইতে চলিয়াছে। শীল্ড-বিজয়ী যে স্থানীয় একটি দল হইবে, সেই বিষয় আর কোনই সন্দেহ নাই। বাহিরের সকল দল, এমন কি সকল জেলার দলও প্রায় প্রতিযোগিতা হইতে বিদায় গ্রহণ করিয়াছে। বর্তমানে নিম্নলিখিত আটটি দল কোয়ার্টার ফাইনালে বা চতুর্থ রাউণ্ডে উন্নীত হইয়াছে:—

(১) মোহনবাগান ঃ ভবানীপুর
(২) ক্যালকাটা ঃ স্পোর্টিং ইউনিয়ন
(৩) মহমেডান স্পোর্টিং ঃ কালীঘাট
(৪) ইস্টবেঙ্গল ঃ বগুড়া জেলা দল

উক্ত আটটি দলের মধ্যে ক্যালকাটা, মহমেডান স্পোর্টিং ও ইস্টবেঙ্গল এই তিনটি দল সেমিফাইনালে নিশ্চয় উন্নীত হইবে। মোহনবাগান ও ভবানীপুর এই দুইটি দলের মধ্যে কোন্ দল সেমিফাইনালে উন্নীত হইবে বলা কঠিন। খেলার বিচারে মোহনবাগান দলেরই জয়লাভের সম্ভাবনা অধিক। কিন্তু মোহনবাগান দলের খেলোয়াড়গণ রক্ষণভাগের এস মান্নার অভাব বিশেষভাবে উপলব্ধি করিতেছেন। যদি শ্রীযুত মান্না ইহার মধ্যে খেলিবার উপযুক্ত শক্তিলাভ করেন, তবে দলের শক্তিও বৃদ্ধি



পাইবে এবং জয়লাভের পথও সুগম হইবে। দেখা যাক শেষ পরিণাম কি হয়?

বাহিরের দলসমূহ সম্বন্ধে বহু উচ্চ আশা পোষণ করা গিয়াছিল, কিন্তু হতাশ হইতে হইয়াছে। আই, এফ, এ, শীল্ডের পরিচালকগণ ভবিষ্যতে এই শ্রেণীর দলের জন্য অর্থ ব্যয় না করিলেই আমরা সুখী হইব।

ক্রিকেট

ভারতীয় ক্রিকেট কণ্ট্রোল বোর্ডের সাধারণ সভা কলিকাতায় অনুষ্ঠিত হইয়াছে। পূর্ব বৎসরে কার্যকরী সমিতিতে যে যে পদে ছিলেন, এই সভায় তাঁহারাই পুনরায় সেই সেই পদে নির্বাচিত হইয়াছেন। এই সভায় গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটি বিষয়ের সিদ্ধান্ত গৃহীত হইয়াছে:—(১) বর্তমানে যে অস্ট্রেলিয়া ক্রিকেট দল ইংল্যাণ্ডে বিভিন্ন স্থানে খেলিতেছে, ঐ দলকে দেশে প্রত্যাবর্তন পথে ভারতে বিভিন্ন খেলায় যোগদান করিবার জন্য আমন্ত্রণ করা হইবে। (২) বেঙ্গল ক্রিকেট এসোসিয়েশনকে আগামী শীতকালে "রবীন্দ্র মেমোরিয়াল ফাণ্ডের" সাহায্যের জন্য বিশেষ প্রদর্শনী ক্রিকেট খেলার আয়োজন করিবার অধিকার দেওয়া হইয়াছে। ইহা ছাড়া এই সময় নিখিল ভারত আন্তঃস্কুল ক্রিকেট প্রতি-যোগিতা পরিচালনা করিবারও অধিকার দেওয়া হইয়াছে। (৩) ১৯৪৬-৪৭ সালে সিংহল দল ভারতে আসিবে তাহার ভ্রমণ, তালিকা গঠন করিবার জন্য সাবকমিটি গঠিত হইয়াছে। (৪) আগামী রণজি ক্রিকেট প্রতিযোগিতার খেলার তালিকা প্রণীত হইয়াছে। বাঙলা দলকে প্রথম রাউণ্ডে যুক্তপ্রদেশ দলের সহিত যুক্তপ্রদেশে খেলিতে হইবে। এই খেলা ডিসেম্বর মাসে অনুষ্ঠিত হইবে। (৫) আগামী ১৯৪৭ সালে রণজি ক্রিকেট প্রতিযোগিতা বর্তমানে যে নিয়মে অনুষ্ঠিত হইতেছে, তাহা পরিবর্তন করিয়া নূতনভাবে পরিচালনার ব্যবস্থা করা হইবে। (৬) এম, সি, সি, ক্রিকেট দল ভারত ভ্রমণে আসিবে না। অস্ট্রেলিয়া দলও যদি না আসে, তবে একটি নিখিল ভারত দল গঠন করা হইবে এবং সেই দল বোম্বাই, কলিকাতা ও মাদ্রাজ এই তিনটি শহরে নির্বাচিত দলের সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিবে।

ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ডের সাধারণ সভায় নির্বাচনে যে কোন পরিবর্তন হইবে না তাহা আমরা পূর্বেই জানিতাম এবং সেই জন্য নির্বাচন সংবাদে আশ্চর্য হই নাই। অস্ট্রেলিয়া দলকে আমন্ত্রণ করিবার যে ব্যবস্থা হইয়াছে উহা না করিলেই যুক্তিযুক্ত হইত। উক্ত ভ্রমণ ব্যবস্থা কার্যকরী হইবে বলিয়া মনে হয় না। শেষ পর্যন্ত নিখিল ভারত ক্রিকেট দলকে ভারতের বিভিন্ন অঞ্চল ভ্রমণ করিতে দেখিব। তবে আমরা সর্বাপেক্ষা আনন্দিত হইয়াছি "রবীন্দ্র মেমোরিয়াল ফাণ্ডের" জন্য ক্রিকেট খেলা অনুমোদন করায়। এই খেলাটি যাহাতে সাফল্যমণ্ডিত হয় তাহার জন্য বেঙ্গল ক্রিকেট এসোসিয়েশনের পরি-চালকগণ এখন হইতে ব্যবস্থা করিলে খুবই ভাল হয়।

সন্তরণ

নবগঠিত বেঙ্গল এমেচার সুইমিং এসো-সিয়েশন ওয়াটারপোলো লীগ খেলার ব্যবস্থা করিয়াছেন, কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় এই যে, অনেক ক্লাবই ইহাতে যোগদান করিতে-ছেন না। অনুসন্ধানে জানা গেল ক্লাবে খেলোয়াড় নাই বলিয়াই এই সকল দলকে যোগদান হইতে বিরত হইতে হইতেছে। এই সংবাদ শ্রবণে আমরা মর্মাহত হইয়াছি। ১০ বৎসর পরে ওয়াটারপোলো খেলার কোন দলই পাওয়া যাইবে না বলিয়া আশঙ্কা হইতেছে। সকল ক্লাবের পরি-চালকদের এখন হইতেই এই দিকে বিশেষ দৃষ্টি দেওয়া উচিত। শীঘ্র একটি ওয়াটার পোলো সাব কমিটি গঠন করিয়া যাহাতে অন্তর্ভুক্ত সকল ক্লাবে নিয়মিতভাবে ওয়াটার পোলো খেলা হয় ও সাধারণ সাঁতারুদের খেলার কৌশল শিক্ষা দেওয়া হয় তাহার ব্যবস্থা করিতে হইবে। যদি তা না করা হয় তবে বাঙলার সাঁতারুগণ এতদিন ভারতীয় ক্রীড়াক্ষেত্রে যে গৌরবময় আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন, বোম্বাইর সাঁতারুগণকে তাহা ছাড়িয়া দিতে বাধ্য হইবেন।

মুষ্টিযুদ্ধ

বাঙলা দেশে মুষ্টিযুদ্ধ পরিচালনা করিবার অধিকার লইয়া এতদিন বেঙ্গলী বক্সিং এসোসিয়েশন ও বেঙ্গল বক্সিং ফেডারেশনের মধ্যে যে দ্বন্দ্ব চলিয়াছিল তাহার শীঘ্র অবসান হইবার সম্ভাবনা দেখা দিয়াছে। উভয় দল হইতে ৭ জন করিয়া লোক লইয়া একটি বিশেষ কমিটি গঠন করা হইবে এবং সেই কমিটি "মিটমাটের" ব্যবস্থা করিবে। উভয় পরিচালকমণ্ডলীর সভ্যগণের সুবুদ্ধির উদয় হইয়াছে দেখিয়া সুখী হইলাম।

বাংলার কথা

শ্রীহেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ

জুলাই মাসের শেষে—আশু ধান্য ফলনের পূর্বেই ভারত সরকার সংবাদ দিয়াছেন—

"যেসব সংবাদ পাওয়া যাইতেছে, তাহাতে ভারতবর্ষে চাউলের অবস্থার উন্নতি ঘটিয়াছে। যে বাঙলা ১৯৪৩ খৃষ্টাব্দে দুর্ভিক্ষে পীড়িত হইয়াছিল উত্তম ফসলের এবং ভারত-সরকারের ও প্রাদেশিক সরকারের খাদ্য বিষয়ে নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার ফলে সেই বাঙলারই প্রয়োজনাতিরিক্ত চাউল রহিয়াছে। আগামী আগস্ট ও সেপ্টেম্বর মাসে যে প্রভূত পরিমাণ ধান্য ফলিবে তাহা হইতে অভাবগ্রস্ত প্রদেশসমূহে চাউল প্রেরণ করা যাইবে। পরে যে মূল্য নির্ধারিত হইবে, তাহাতে যুক্তপ্রদেশের সরকার ২৫ হাজার টন চাউল লইতে চাহিয়াছেন।"

আমাদিগের দেশে একটি চলিত কথা আছে—"গাছে কাঁঠাল—ঠোঁটে তেল।" আগস্ট ও সেপ্টেম্বর মাসে ফসলের কখন কি হইবে, তাহা এখনই বলা যায় না। বাঙলার কোন কোন স্থান হইতে বৃষ্টির স্বল্পতাহেতু আশু ধানের সম্বন্ধে আশঙ্কার সংবাদ পাওয়া যাইতেছে।

জুলাই মাসের শেষভাগে ভারত-সরকার যে সংবাদ প্রচার করিয়াছেন, তাহার পূর্বে মাসের প্রথমেই আমরা বাঙলার গভর্নরের উক্তিতে তাহার আভাস পাইয়াছিলাম। তিনি বলিয়াছিলেন, বাঙলা সরকার এত ধান্য ও চাউল সঞ্চিত করিয়াছেন যে, পাছে অব্যবহারে তাহার কতকাংশ বিকৃত হয় সেই ভয়ে তাহা হইতে কতকাংশ—প্রায় লক্ষ টন চাউল—ভারত-সরকারকে ঋণ হিসাবে দেওয়া হইবে এবং ভারত-সরকার তাহা হইতে কিছু সিংহলকেও দিবেন।

সিংহলকে যে যুদ্ধের সময় ভারত-সরকার চাউল দিতে প্রতিশ্রুতি দিয়াছিলেন, তাহা আমরা সেই চাউল দাবী করিতে তথা হইতে স্যার ব্যারণ জয়াতিলকের আগমনের পূর্বে জানিতেই পারি নাই। অবশ্য ইহাই আমাদিগের তথাকথিত স্বায়ত্ত-শাসনের দৃষ্টান্ত।

গত ৩০শে জুলাই দিল্লী হইতে পরিবেশিত সংবাদে প্রকাশ,—

বর্তমান অবস্থা বিবেচনা করিয়া ভারত-সরকার আর খাদ্যদ্রব্য সম্পর্কে বাঙলাকে কোন বিশেষ সুবিধা দিবেন না। কারণ, ভারত-সরকার যেরূপ সংবাদ পাইয়াছেন, তাহাতে বাঙলার অভাব নাই—অতিরিক্ত আছে। বাঙলা হইতে কেবল যে যুক্তপ্রদেশকে ২৫ হাজার টন চাউল দেওয়া হইবে তাহাই নহে, পরন্তু বিহারকে ১৫ হাজার টন এবং মাদ্রাজকেও কিছু চাউল দেওয়া হইবে।

বাঙলায় সরকারের ব্যবস্থার ত্রুটিতে যে দুর্ভিক্ষে ৩০।৩৫ লক্ষ লোক মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছিল এবং আরও কয় লক্ষ লোক অল্পাহারে মরণাহত হইয়া বাঁচিয়া আছে সেই দুর্ভিক্ষের সময় যখন অন্যান্য প্রদেশ বাঙলাকে সাহায্য করিয়াছে, তখন বাঙলা যদি দেশে তাহার প্রয়োজনাতিরিক্ত চাউল থাকিলে সে অন্যান্য প্রদেশকে তাহাদিগের প্রয়োজনে সাহায্য করিবে না, তবে তাহা ক্ষমার অযোগ্য স্বার্থপরতারই পরিচায়ক হইবে।

কিন্তু প্রথমে জিজ্ঞাস্য যে হিসাবে নির্ভর করিয়া বাঙলায় প্রয়োজনাতিরিক্ত চাউল আছে বলা হইতেছে, সে হিসাব কতদূর নির্ভরযোগ্য। আমাদিগের এই কথা বলিবার কারণ—গত দুর্ভিক্ষের সময় ভারত-সরকারের শাসন-পরিষদের একাধিক সদস্য বলিয়াছিলেন—বাঙলায় চাউলের অভাব নাই। অবশ্য বাঙলায় সচিবরা যে অভাব আছে জানিয়াও—অভাব নাই বলিয়াছিলেন, তাহা সকলেই জানেন। দুর্ভিক্ষ তদন্ত কমিশন এদেশে সরকারের হিসাবে নির্ভরযোগ্যতায় সন্দেহ প্রকাশ করিতে ত্রুটি করেন নাই।

যদি হিসাব নির্ভরযোগ্য হয়, তবে আবার বৎসর হইতে প্রথমেই বাঙলায় চাউল আমদানী হইবে, একথা বলিয়া লোককে আশ্বাস দিবার কি প্রয়োজন আছে? চাউল সম্বন্ধে বাঙলাকে স্বাবলম্বী করাই কি অভিপ্রেত নহে?

দ্বিতীয় কথা—বাঙলায় যদি বাঙালীর প্রয়োজনাতিরিক্ত চাউল থাকে, তবে তাহাতে কি বাঙলার অধিকারই সর্বপ্রধান নহে? সে অধিকারের বিষয় কি বিবেচিত হইয়াছে? যদি তাহা বিবেচিত হইয়া থাকে, তবে বাঙলায় চাউলের মূল্য হ্রাস করায় সরকারের আপত্তির কি কারণ আছে বা থাকিতে পারে? চাউল যখন দুষ্প্রাপ্য ছিল, তখনই তাহা দুর্মূল্য হইয়াছিল। কিন্তু যখন তাহা প্রয়োজনাতিরিক্ত—তখনও সেই দুর্মূল্য থাকে কেন?

শুনা যায়, ভারত-সরকার এ বিষয়ে যুক্তি দিয়াছেন—যদি চাউলের মূল্য হ্রাস করা হয়, তবে কৃষকদিগের বিশেষ অনিষ্ট হইবে—অন্যান্য দ্রব্যের মূল্য হ্রাসোন্মুখ না হওয়া পর্যন্ত চাউলের মূল্য হ্রাস করা যায় না।

ইংরেজীতে যাহাকে "ভিশাস সার্কল" বলে—এ যুক্তিতে তাহাই লক্ষিত হয়। চাউলের মূল্য হ্রাস না হইলে অন্যান্য দ্রব্যের মূল্য কমিবে না এবং অন্যান্য দ্রব্যের মূল্য হ্রাস না হইলে চাউলের মূল্য কমান যায় না—এইরূপ যুক্তিতে কিছুতেই দ্রব্যের মূল্য কমিতে পারে না। বাঙলায় বলা হয়—"চাউল লক্ষ্মীর বাহন।" অর্থাৎ সব জিনিসের মূল্য চাউলের উপর নির্ভর করে।

যে কৃষকের জন্য আজ সরকার সহৃদয়তা দেখাইতেছেন, সেই কৃষক যে মূল্যে চাউল বিক্রয় করিতে বাধ্য হইতেছে, সেই মূল্যের সহিত যে মূল্যে সরকার চাউল বিক্রয় করিতেছেন, তাহার প্রভেদ কিরূপ? গত দুর্ভিক্ষের সময় পাঞ্জাবের সচিব সর্দার বলদেব সিংহ দেখাইয়া দিয়াছিলেন—পাঞ্জাব বাঙলা সরকার যে মূল্যে গম কিনিতেছিলেন, তাহা বাঙলায় তদপেক্ষা অনেক অধিক মূল্যে বিক্রয় করিতেছিলেন—নিরন্নদিগকে অন্নদান কার্যে লাভবান হইতেছিলেন। তাঁহার সেই অভিযোগ বিশেষভাবেই প্রমাণিত হইয়াছে। এবার বাঙলায় চাউলেও তাহাই হইতেছে কিনা, তাহা কি বিবেচনার বিষয় নহে?

চাউলের মূল্য হ্রাসের বিশেষ কারণ যে আছে, তাহা বলা বাহুল্য। দুর্ভিক্ষের সময় লোক অন্নাভাবে মরিয়াছে। বাঙলা সরকার নিরন্নদিগকে যে "অন্ন" দিয়াছিলেন, তাহা যে মানুষের স্বাস্থ্যরক্ষা করিতে পারে না, তাহা স্বীকৃত হইয়াছে, বাঙলা সরকার কেবল যে আপনারা সেইরূপ খাদ্য দিয়াছিলেন তাহাই নহে—অপরকেও সেইরূপ খাদ্য দিতে বাধ্য করিয়াছিলেন। তাহার ফলে বহু লোকের স্বাস্থ্য ক্ষুণ্ণ হইয়াছে। হয়ত তাহারা পরে পূর্ণাহার পাইলেও আর সুস্থ হইতে পারিবে না; তথাপি যাহাতে তাহারা এখন পূর্ণাহার পাইতে পারে সেদিকে লক্ষ্য রাখিয়া কাজ করা কি সরকারের কর্তব্য নহে? বর্তমানে সরকার চাউলের যে মূল্য নির্ধারিত করিয়াছেন, তাহাতে দরিদ্রের পক্ষে পূর্ণাহারের উপকরণ সংগ্রহ করা যে অসম্ভব তাহা আমরা অবশ্যই বলিব।

দুগ্ধ আর দুষ্প্রাপ্য নহে—অপ্রাপ্য বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। অথচ [illegible] সামরিক কার্যে লিপ্ত থাকিয়া প্রয়োজন না থাকিলেও দুগ্ধের অংশ লইতেছে। যে সকল সৈনিকের জন্য বিদেশ হইতে জমান দুগ্ধ আমদানী করিয়া সরবরাহ করা হয়,

তাহারাও যে সেই দুগ্ধ "ভাল লাগে না" বলিয়া টাটকা দুগ্ধ ব্যবহার করে, তাহা দুর্ভিক্ষ তদন্ত কমিশন দেখাইয়া দিয়াছেন। সৈনিকদিগের জন্য ব্যবহৃত দুগ্ধের পরিমাণও অল্প নহে।

ইহার পরে মৎস্যের কথা। সেদিনও বাঙলার গভর্নর বাঙলার খাদ্য হিসাবে মৎস্যের প্রয়োজন স্বীকার করিয়াছেন। বরফের সরবরাহ বৃদ্ধির ব্যবস্থা হইলেও কেন যে কলিকাতায় মৎস্যের সরবরাহ বর্ধিত হইতেছে না, তাহা তিনি বুঝিতে পারেন নাই। কিন্তু তিনি কি জানেন না— নৌকাপসরণের ফলে বৃত্তিভ্রষ্ট হইয়া লক্ষ লক্ষ ধীবর মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছে? দুর্ভিক্ষের সময়েই বাঙলায় আসিয়া স্যর জগদীশপ্রসাদ যে বিবৃতি প্রদান করিয়াছিলেন, তাহাতে তিনি ধীবরদিগকে আবশ্যক সাহায্য প্রদানের প্রয়োজন জানাইয়াছিলেন। কিন্তু সরকার সে কথায় কর্ণপাত করেন নাই। বঙ্গোপসাগরের কূলে অবস্থিত দীঘাগ্রামে দুর্ভিক্ষের পূর্বে কত ধীবর মৎস্য ধরিত আর আজ তাহাদিগের সংখ্যা কিরূপ তাহার সন্ধান লইলেই বাঙলা সরকার অবস্থা উপলব্ধি করিতে পারিবেন।

শাকসব্জীর মূল্যও অধিক।

বস্ত্র নাই বলিলে অত্যুক্তি হয় না। অথচ বাঙলা হইতে বিদেশে বস্ত্র রপ্তানি বন্ধ করা হয় নাই।

এই অবস্থায় বাঙলার চাউলে বাঙালীর অধিকার যে সর্বাগ্রে স্বীকার্য তাহা স্মরণ করিয়া তবে বাঙলা হইতে চাউল রপ্তানি করিতে দেওয়া সঙ্গত তাহা বলা বাহুল্য।

যাহারা অন্নাভাবে কাতর তাহারা যাহাতে দুইবেলা পূর্ণাহার পায় তাহা বিবেচনা করিয়া চাউলের মূল্য হ্রাস করা কি কর্তব্য নহে?

আমরা পূর্বেই বলিয়াছি, কৃষককে যে মূল্যে ধান্য ও চাউল বিক্রয় করিতে হয়, আর যে মূল্যে চাউল সরকারী ব্যবস্থায় বিক্রয় হয়—তদুভয়ের মধ্যে বিশেষ ব্যবধান আছে। "চীফ এজেণ্ট" নিযুক্ত করিয়া ধান্য ও চাউল ক্রয়ের ব্যবস্থায় মধ্যবর্তীর যে লাভ হয়—তাহা অনায়াসে কৃষকের ও জনগণের মধ্যে বণ্টন করা যায়। দুর্ভিক্ষ তদন্ত কমিশন "চীফ এজেণ্ট" নিয়োগ প্রথার বিশেষ নিন্দা করিয়াছেন এবং দেখাইয়া দিয়াছেন—বোম্বাই, মাদ্রাজ, যুক্ত প্রদেশ, বিহার প্রভৃতি প্রদেশে সে প্রথা নাই—এমন কি যে সকল স্থানে সে প্রথা প্রবর্তিত হইয়াছিল সে সকল স্থানেও তাহা ত্যক্ত হয়। কিন্তু বাঙলায় সেই প্রথা প্রচলিত রাখা হইয়াছে। কেন? দুর্ভিক্ষ তদন্ত কমিশন অকাট্য যুক্তি দিয়া দেখাইয়াছেন—ঐ প্রথায় লোকের আস্থা থাকিতে পারে না। লোক বিশ্বাস করিতে পারে না—এজেণ্টরা স্বার্থত্যাগী হইয়া কাজ করেন।

আমাদিগের দৃঢ় বিশ্বাস, বাঙলা সরকার যদি গত আমন ধান্যের ফসল সংগৃহীত হইবার পরে সংকটকালীন ব্যবস্থা নিয়ন্ত্রণ—বর্জন করিয়া চাউলের ব্যবসা স্বাভাবিক খাতে প্রবাহিত হইতে দিতেন, তবে চাউলের মূল্য অনেক কমিত এবং সঙ্গে সঙ্গে অন্যান্য দ্রব্যের মূল্যও হ্রাস হইত—বাঙলার লোক দুইবেলা পূর্ণাহার পাইতে পারিত।

বাঙলাকে চাউল সম্বন্ধে স্বাবলম্বী করিবার কি চেষ্টা হইয়াছে? একথা কি সত্য নহে যে, সুন্দরবন অঞ্চলে কোন কোন স্থানে জমিদারদিগের ত্রুটিতে বাঁধ ভাঙ্গিয়া শস্যহানি হয় এবং জমিদার ঐ ভাঙ্গা প্রজাকে খাজনা হইতে রেহাই না দিয়া "সেচের" জন্য অতিরিক্ত খাজনা আদায়ও করেন?

সেদিন বাঙলার গভর্নর বলিয়াছেন—সরকার হরিণঘাটার নিকট ম্যালেরিয়ার প্রাদুর্ভাবে গ্রাম ও জঙ্গল একত্র পতিত জমি হইয়া তাহা পরিষ্কৃত করিয়া ও তথায় সেচের সুব্যবস্থা করিয়া সেই জমিতে গোশালা প্রতিষ্ঠিত করিয়া বাঙলায় গোজাতির উন্নতিসাধন চেষ্টা করিবেন। ইহাতে কত টাকা ব্যয় হইবে, তাহা আমরা জানি না। তবে সরকারের উদ্যম কতদিন থাকিবে, তাহাও বলা যায় না। কারণ, আমরা জানি, ১৯১০ খৃষ্টাব্দ হইতে কলিকাতা কর্পোরেশন যেমন এ বিষয়ে কেবল আলোচনাই করিতেছেন—কাজ কিছুই হয় নাই, তেমনই সরকার রংপুরে যে গোশালা প্রতিষ্ঠিত করিয়া সুফল লাভ করিয়াছিলেন, তাহাও দীর্ঘকাল রাখেন নাই! ঐ গোশালায় কিরূপ ফললাভ হইয়াছিল, তাহা ব্র্যাকউড প্রণীত সরকারী পুস্তকে প্রকাশিত চিত্রসমূহ হইতেই বুঝিতে পারা যায়।

বাঙলায় চাউলের প্রাচুর্য থাকিলেও চাউলের মূল্য হ্রাস না করার সমর্থনে ভারত-সরকার যে যুক্তি উপস্থাপিত করিয়াছেন, তাহা বিচারসহ বলা যায় না। বাঙলায় যদি চাউলের প্রাচুর্য হয় প্রকৃতি যদি প্রসন্না হন, তবে যেন বাঙালীরা "দুধে ভাতে" না থাকিতে পারিলেও যথেষ্ট ভাত পায় সে দাবী কখনই অসঙ্গত নহে।

চার্চিল-প্রতিদ্বন্দ্বীর পরাক্রম

ইংলণ্ডে নির্বাচন পর্বে এবার শ্রমিক দলের সদস্যদের জয় জয়কার পড়ে গেছে। রক্ষণশীল দলের বড় বড় চাঁইরা সবাই প্রায় হেরে গেছেন—কিন্তু ভাগ্য বলতে হবে চার্চিল সাহেবের! তিনি নির্বাচনে তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বীকে হারিয়ে দিয়েছেন। তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বী যিনি ছিলেন তাঁর পরিচয় জানেন কি? তিনি হচ্ছেন এক চাষী—আলেকজাণ্ডার হ্যান্‌কক বয়স সাত চল্লিশ। এসেক্স অঞ্চলের উড ফোর্ড থেকে নির্বাচনে দাঁড়িয়েছিলেন ইনি। চার্চিলের প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার কথা ছিল কর্পোরাল আর্থার ইয়েট্‌সের—কিন্তু বার্মার যুদ্ধক্ষেত্র থেকে দেশে পৌঁছতে তাঁর দেরী হয়ে যাওয়াতে এই হ্যানককেই শেষ মুহূর্তে খাড়া করে দেওয়া হয়—চার্চিলের বিরুদ্ধে। উডফোর্ডের একটি



চার্চিল প্রতিদ্বন্দ্বী হ্যানকক
মানুষ......ভেড়া নয়!

প্রাণীকেও হ্যানকক্ চিনতেন না—তবু তিনিই ছিলেন উডফোর্ডের প্রতিনিধি। তিনিও অন্যান্য প্রতিনিধিদের মতই নির্বাচন বক্তৃতা দিয়ে সোজাসুজি বলেছিলেন—"আমি পার্টি কর্টির ধার ধারিনে—আমি ভেড়া নই।" চার্চিলের প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে তিনি বলেন—"তিনিও যেমন মানুষ আমিও তেমনি মানুষ"—"আমি এই সুসংগঠিত অত্যাচার ব্যবস্থার বিরুদ্ধে জনসাধারণের প্রতিনিধি হিসাবে দাঁড়িয়েছি।" এমন প্রতিদ্বন্দ্বী পাওয়া চার্চিলের মহাসৌভাগ্য বলতে হবে। হ্যানকক্ হেরে গেলেও তার জয় হয়েছে কি বলেন?

প্রেসিডেণ্টের বন্ধু-প্রীতি

আমেরিকার নূতন প্রেসিডেণ্ট, বর্তমান তিন-প্রধানের এক প্রধান মিঃ হ্যারি ট্রুম্যান অত্যন্ত বন্ধুবৎসল ব্যক্তি তা কি আপনারা জানেন? তিনি যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেণ্ট নির্বাচিত হওয়ার পরও তাঁর পুরাণো বন্ধুবান্ধবদের ভুলে যান নি। বিশ্ব-নিরাপত্তা সম্মেলনের অত ঝামেলা ঝঞ্ঝাটের মধ্যেও তিনি এ মাসের গোড়াতে ক্যানসাস সিটিতে বেড়াতে গেলেন। সেখানে পৌঁছেই তাঁর বহুদিনের পরিচিত নাপিত বন্ধু ফ্রাঙ্ক স্পিনা'র দোকানে গিয়ে উঠলেন—নাপিতটি তাঁর প্রতীক্ষাতেই ছিল। সে সংবাদপত্রের রিপোর্টারদের কাছে বললে—"কাল যখন ময়দানে কুচকাওয়াজ হচ্ছিল তখন আমি "হি ক্যাপ" বলে চেঁচালাম আর ও অমনি ওর মাথাটা দেখিয়ে দিলে—আমি বুঝলাম ও কি

খবর

চাইছিল।" অর্থাৎ নাপিত বন্ধু এইটাই সমঝিয়ে দিলে সাংবাদিকদের যে ট্রুম্যান, প্রেসিডেণ্ট হলেও তার দোকানেই চুল ছাঁটতে আসবেন একথাটা সে আগেই টের পেয়েছিল।

ক্যানসাসে প্রেসিডেণ্টের এই রকম বন্ধু—একাধিক আছেন বলেই জানা গেছে কারণ এই ক্যানসাসের বন্ধু পরিদর্শনে বেশ সময় লেগেছিল। পোষাক ব্যবসায়ী ও দর্জি বন্ধু এডি জেকব্‌সনের 'ক্যানসাস সিটি স্টোর' বলে পোষাক পরিচ্ছদের একখানি দোকান দিয়ে উঠলেন—২৫ বছর আগে মিঃ ট্রুম্যান এই জেকবসনের সঙ্গেই জামা কাপড়ের ব্যবসা করেছিলেন তবে সে ব্যবসা তখন তেমন সুবিধে হয়নি। এই বন্ধুটির দোকানে হাজির হয়ে হ্যারি ট্রুম্যান বললেন "আড়ে পনের গলা আর তেত্রিশ হাতার গোটাকতক সার্ট দাওহে—আমার সার্ট বড় কম পড়েছে।" বন্ধু এডির দোকানে ঠিক ঐ মাপের একটিও সার্ট ছিল না। বেচারা ভারি লজ্জায় পড়ে গেল। প্রেসিডেণ্টের সার্টের টানাটানি! এ খবর মুখে মুখে ছড়িয়ে গেল। পরের দিন সার্টের পর সার্ট প্রেসিডেণ্টের কাছে হাজির। প্রেসিডেণ্ট চাপা পড়েন সার্টের স্তূপে—এমনি অবস্থা! দরজা বন্ধু এডি জেকবসনও আর ডজন সার্ট আর লাল টক্‌টকে কয়েকটা 'বো-টাই' নিয়ে হাজির হলেন প্রেসিডেণ্টের কাছে। এসব দেখে শুনে এই কথাই কি মনে হচ্ছে না যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেণ্ট 'খাঁটি মানুষ'—সার্থক নাম তাঁর 'ট্রুম্যান?' তবে একটাও ঠিক, ট্রুম্যানের এসব কীর্তির খবর জানলে চার্চিল নিশ্চয়ই তাঁর সঙ্গে খানা খেতেন না!

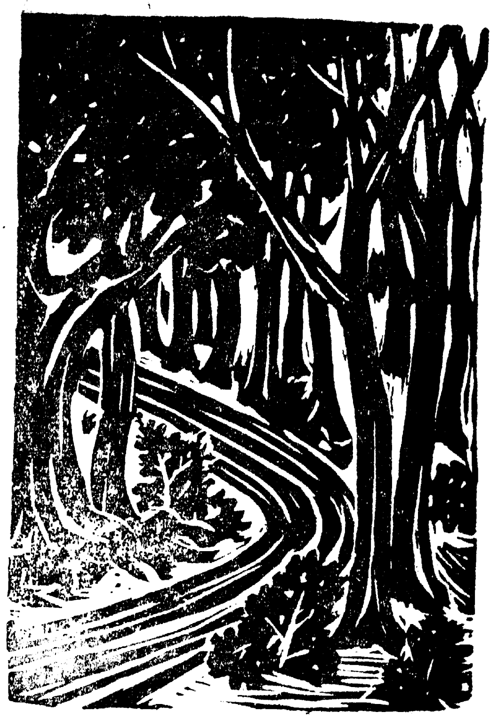
সোভিয়েট বিজয়োৎসব

ফ্রান্স, ইংলণ্ড, আমেরিকার বিজয়োৎসবের খবর আপনারা কাগজে পড়েছেন—আর মিত্রপক্ষের জয়ের আনন্দে এদেশের সোভিয়েট সুহৃদদের বিজয়োৎসবও দেখেছেন—কিন্তু আসল সোভিয়েটদের বিজয়োৎসবটা কেমন হয়েছিল জেনে রাখুন।

ঝম্‌ঝম্‌ করে বৃষ্টি পড়ছে—মার্শাল জোসেফ স্ট্যালিনের আর তাঁর 'কমিশার'দের গা মাথা ভিজছে। এঁরা সবাই দাঁড়িয়ে আছেন—লাল গ্রানাইট পাথরে গড়া লেনিনের স্মৃতিমন্দিরের ছাদে। বৃষ্টি ঝরছে— লাল ফৌজের দু'শো সেপাইয়ের গা মাথা বেয়ে, যারা মস্কোর রেড্ স্কোয়ারের আঙিনা দিয়ে দৃঢ়পদে মাটি কাঁপিয়ে চলে গেল, সব প্রথমে। ওদিকে সামরিক ব্যাণ্ড বাদকদলের বাজনা বাদ্য ভিজিয়ে দিয়ে বৃষ্টি ঝরছে। হাজার হাজার লোক দাঁড়িয়েছে এসে পথের দুধারে—এরা সবাই বৃষ্টি বাদলাকে অগ্রাহ্য করে হাঁ করে দেখছে—কালো ঘোড়ার পিঠে মার্শাল কনস্ট্যান্‌টিন রোকসোভস্কি—আর সাদা ঘোড়ার পিঠে মার্শাল জর্জি জুকোভ আগে আগে চলেছেন। —ট্যাঙ্কবাহিনী, সাঁজোয়া গাড়ি, কামান-গাড়ি সব আসছে পিছনে পিছনে—মাটি কাঁপিয়ে। রাশিয়ার বিজয়োৎসব ঘোষণা করে। কিন্তু সবাইকার চোখ পড়লো সেই দু'শো জন সৈন্যের উপর—যাদের প্রত্যেকের হাতে ছিল জার্মান পতাকা—আর বুকে ছিল জার্মান সৈন্যদের বুক থেকে কেড়ে নেওয়া বীরত্বের স্মারক—রকমারী মেডেলগুলি। এরা লেনিন স্মৃতিমন্দিরের সামনে আসতেই অন্য সমস্ত বাজনার সুর খাদে নেমে এল। শুধু বেজে চললো একশোটা ড্রাম। সেখানে পৌঁছেই ঐ সৈন্যরা জার্মান পতাকাগুলিকে নীচু করে কাদা মাটিতে লুটিয়ে নিয়ে চললো—তারপর ঐ জার্মান পতাকাগুলিতে তারা মাটি কাদা মাখিয়ে নিয়ে লোফালুফি করতে লাগলো। এই হল্লা শেষ হবার পর সুরু হোল সোভিয়েট বীরদের বিজয়-পুরস্কারে পুরস্কৃত করার পালা। মার্শাল স্ট্যালিনও বিজয়পুরস্কার পেলেন এই উৎসবে। সোভিয়েট সুপ্রীমের নির্দেশ অনুসারে এই উৎসবে তাঁকে "জেনারালিসিমো" খেতাব দেওয়া হলো—এছাড়া 'অর্ডার অব্ ভিক্টরী'—সোভিয়েট ইউনিয়নের শ্রেষ্ঠ বীরের সুবর্ণ-তারকা ও 'অর্ডার অব লেনিন' ইত্যাদি সম্মানেও ভূষিত করা হলো। সাম্যের দেশে পদক ও সম্মানের তারতম্য আছে বোধ হয় বলেই এদেশের সাম্যবাদীরা 'জনযুদ্ধ' ঘোষণা করেছিলেন—কিন্তু এঁদের মেডেল কই?



প্রেসিডেণ্ট ট্রুম্যান ও তাঁর পোষাক-ব্যবসায়ী বন্ধু জেকবসন



কাঠ-খোদাই
শ্রীনন্দপাত বসু

অরণ্য পথ

কাঠ-খোদাই
শ্রীনতেন্দ্রনাথ বিশী

পানিয়া ভরণে



রূপ জগৎ

পত্রান্তরে কোন প্রবীণ সমালোচক চলচ্চিত্রে ভদ্রঘরের মেয়েদের যোগদান বিষয়ে কটাক্ষ ক'রেছেন। এঁর বক্তব্যের সার হ'চ্ছে যে, ভদ্রঘরের মেয়েদের চলচ্চিত্রে যোগদান করা উচিত নয়, আর দ্বিতীয়তঃ এমন যারা যোগদান করছে, তারা ভদ্রঘরের নয়। এই নিয়ে অনেক



দক্ষিণী নৃত্যশিল্পী কুমারী মংগলমঃ আগামী রবি, সোম ও মংগলবার নিউ এম্পায়ারে 'ভারতনাট্যম' নৃত্যকলার যে প্রদর্শনীর আয়োজন হয়েছে তাতে কুমারী মংগলমকে প্রধান ভূমিকায় দেখা যাবে।

লেখা অনেকদিন ধ'রে হ'য়েছে, লোকে লিখে লিখে আর পড়ে পড়ে ক্লান্ত হ'য়ে থেমে গেছে, শেষ কথায় তার পৌঁছনো যায়নি। চলচ্চিত্র ক্ষেত্র যেন যে নরককুণ্ড ব'লে লোকে ধ'রে রেখেছে প্রবীণেরা তার সঠিক জবাব দিতে পারবেন, কারণ গোড়ার আমলটা তারাই জানেন ভাল করে; আর দ্বিতীয় কথা হ'চ্ছে ভদ্র-অভদ্রের নিরীখটাই বা কি? একটা ভদ্রবংশের জন্ম-সার্টিফিকেট, বিদ্যে বুদ্ধি, অর্থ, মার্জিত রুচি না আর অন্য কিছু? এই সবই যদি ছাড়পত্র হয় তো এখনকার চিত্রজগতে এমন লোক তো নজরে পড়ে না যাকে এই হিসাবে অভদ্র শ্রেণীতে ঠেলে এনে ফেলা যায়। আসলে আগেকার দিনের গোঁড়ারা সিনেমা থিয়েটারে যোগ দেওয়া নিয়ে লোকের মনে এমনি এক জুজুর ভয় ঢুকিয়ে রেখেছে যে, সিনেমা থিয়েটারের লোক বললেই অমনি সবাই মনে এঁকে নেয় এমন এক জাতের লোক যাদের চলন-বলন-ভাষা যেন আমাদের মত নয় অন্য রকম, খাওয়া-পরা-আচার-ব্যবহার যেন একেবারে আলাদা, ওদের যেন পারিবারিক জীবন বলতে কিছু থাকে না; স্ত্রী-পুত্র-স্বামী, আত্মীয়-স্বজন থাকে না যেন কারুরই, আমাদের জীবন সমস্যার সঙ্গে ওদের মিল নেই কোথাও; একেবারে ভিন্ন জগতের ভিন্ন জিনিস দিয়ে তৈরী ওরা, এমন কি যেন চেহারাই ওদের আলাদা! অথচ আপনারই, নয়তো আপনারই জানাশুনো কারুর ভাই, বন্ধু, কিংবা কোন পরিচিত মহিলাকেই দেখছেন কাজ করতে; কাল হয়তো আপনি নিজেই যোগ দিলেন, তাহ'লে কাল থেকে আপনিও অসৎ হ'য়ে, অসৎকর্ম কিছু করুন আর না-ই করুন—রঙ্গজগতে যে প্রবেশ করবে তারই ভাগ্যে ঐ দুর্দশা। কি বিচিত্র মতি আমাদের! গতিও তাই অধোপানেই ঝুঁকে রয়েছে চিরকাল ধরে। রঙ্গজগতের লোকে ব্রহ্মচারী ঋষি কেউ নয় সবাই-ই জানে, কিন্তু আপনার সঙ্গে আমার সঙ্গে কিংবা আর পাঁচজন মানুষের সঙ্গে তাদের তফাৎ কোন খানটায়? আর বলেন যদি যে লাইনটাই খারাপ তা'হলে কি দরকার জিইয়ে রাখবার, একেবারে উচ্ছেদ করে দিলেই তো হয়! তা চলবে না—রঙ্গজগত রাখতেই হবে, অন্য দেশের মত হচ্ছে না কেন তাই নিয়ে চেঁচাতেও হবে, ওর নামে ক'রে খাবার ফিকির ফন্দীও খুঁজতে হবে, ওকে ঘিরে হৈ হৈ করতেও হবে, কিন্তু 'হেঁসেলে'র ধারে ঘেঁষতে দেওয়া হবে না কিছুতেই! ওটাকে আমরা নিম গাছ করে রাখতে চাই—উঠোনে গজাতে দেব না, আবার ওর অতো গুণকে কাজে না লাগিয়েও উপায় নেই। এ মনোবৃত্তির পরিবর্তন করে হবে।

নূতন ও আগামী আকর্ষণ

কলারসপ্রিয়রা মাদ্রাজের আসল দেবদাসী নৃত্য দেখার সুযোগ পাবেন আসছে রবিবার সকালে নিউ এম্পায়ার থিয়েটারে—নর্তকীদ্বয় হ'চ্ছেন মিস যোগম্ ও মিস মংগলম।

* * *

শৈলজানন্দের 'মানে-না-মানা'র উদ্বোধন পূর্ণ ও পূরবীতে 'চল-চলরে' থেমে গেলেই ঐ দুটির সঙ্গে উত্তরাতে নিয়ে এক সঙ্গে মুক্তিলাভ ক'রবে। ছবিখানি এতদিনে সত্যিই বহু প্রতীক্ষিত হয়ে দাঁড়িয়েছে। অহীন্দ্র চৌধুরী, জহর গাঙ্গুলী, ধীরাজ ভট্টাচার্য, সন্তোষ সিংহ, নবদ্বীপ হালদার, রঞ্জিত রায়, আশু বোস, মলিনা, রেণুকা রায়, সন্ধ্যারাণী, সাবিত্রী প্রভা ও রাজলক্ষ্মী মিলে ছবিখানাকে নিতান্ত বেমানান ক'রে তুলবেন না ব'লেই বিশ্বাস।

* * *

এ সপ্তাহে নূতন হিন্দী ছবি হচ্ছে

দীপকএ দু বছর আগের তৈরী ছবি 'রামানুজ।' ছবিটি দেবকীবাবুর তোলা এবং প্রধান ভূমিকায় আছেন ছায়াদেবী ও বিমান বন্দ্যোপাধ্যায়।

* * *

দুখানি আগামী হিন্দী ছবি হচ্ছে মিনার্ভায় 'নল-দময়ন্তী' শ্রেষ্ঠাংশে—পৃথ্বীরাজ ও শোভনা সমর্থ; আর সিটি-প্যারামাউণ্টে 'শ্রীকৃষ্ণার্জুন যুদ্ধ'—এতেও ঐ পৃথ্বীরাজ ও শোভনা সমর্থ।

* * *

আগামী রবিবার সকালে 'রূপবাণী' ছায়াচিত্র গৃহে একটি বিচিত্রানুষ্ঠানের আয়োজন হয়েছে। নিউ থিয়েটার্সের শ্রীযুত বাইচাঁদ বড়াল ও বোম্বাইয়ের খ্যাতনামা চিত্র-পরিচালক শ্রীযুক্ত হীরেন বসু রবীন্দ্রনাথ স্মৃতিভাণ্ডারে সংগ্রহের উদ্দেশে এই অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছেন এবং ছায়াচিত্র জগতের কয়েকজন খ্যাতনামা জনপ্রিয় অভিনেতা ও অভিনেত্রী এই অনুষ্ঠানের বিভিন্ন অংশে যোগদান করবেন। সেই সঙ্গে ছায়াচিত্রে রবীন্দ্রনাথের বিভিন্ন অনুষ্ঠানে উপস্থিতির কয়েকটি ছবি দেখানো হবে।

বিবিধ

বঙ্গীয় চলচ্চিত্র সঙ্ঘ অর্থাৎ বি-এম-পিএ জেগে আছে বোঝা গেল। রবীন্দ্র স্মৃতি-ভাণ্ডারে সাহায্য করার জন্যে তারা ঠিক ক'রেছেন যে, আগামী ১৫ই আগষ্ট বাঙলা কেন্দ্র অর্থাৎ বাঙলা, বিহার, উড়িষ্যা ও আসামে যত চিত্রগৃহ আছে সব জায়গায় সেই দিনের বিক্রয়লব্ধ অর্থ দান করা হবে। সারা দেশের চিত্রপ্রিয়রা ঐ দিন কোন না কোন চিত্রগৃহে যাওয়া নিশ্চয়ই অবশ্য কর্তব্য বলে ধরে নেবে।

* * *

চলচ্চিত্রের কলাকুশলীরা নিজেদের একটি সঙ্ঘ গঠনের উদ্যোগ ক'রছেন বলে জানা গেল; হওয়া উচিত ছিল অনেককাল আগেই।

* * *

মধু বসু কলকাতায় ফিরে আবার ক্যালকাটা আর্ট প্লেয়ার্সকে জাগিয়ে তুলতে চান। হাতে একখানা ছবি তোলার লাইসেন্সও আছে তার। দুটো কাজই তার একই সঙ্গে চলবে, তোলার আর মঞ্চাভিনয় প্রযোজনার।

'বীর অভিমন্যু'তে অভিনয় করার সময় অশোককুমার গত সপ্তাহে চোখে আঘাত পেয়ে নিষ্কর্মা হ'য়ে পড়েছেন। 'অভিমন্যু' ও বেগম'এর কাজ তাই বন্ধ এখন।

* * *

রামা সুকুল ও শীলা পরিণয় সূত্রে আবদ্ধ হ'তে পারে ব'লে খবর পাওয়া গেছে।

বিলাতী আর দিশী টাকার তৈরী ফ্রী স্টার ফিল্ম কোম্পানীর উদ্দেশ্য হ'চ্ছে ভারতবর্ষের সিনেমা গৃহের সংখ্যা ছ'হাজারে পৌঁছে দেওয়া।

* * * *

মমতাজ শান্তি [illegible] কাজ ক'রতে ক'রতে [illegible] স্টুডিও থেকে বেরিয়ে গিয়েছে এবং বোধ হয় আর ফিরে যোগ দেবে না কারণ [illegible]।

* * * *

* * *

সোরাব মোদী নূরজহাঁর চরিত্র নিয়ে একখানি ছবি তুলবেন যার নাম ভূমিকায় অভিনয় করবেন মেহতাব।

* * * *

উদয়শঙ্করের [illegible] চিত্র 'কল্পনা' বাস্তব হ'তে [illegible] আগেই মাদ্রাজ থেকে এই রকম খবরই পাওয়া যাচ্ছে।

* * * *

পরিচালক [illegible] ফিল্মস [illegible] শ্রীরামকৃষ্ণ[illegible] পিকচার্সে [illegible] ক'রবেন ব'লে শোনা যাচ্ছে।

* * * *

বম্বেতে [illegible] ধরণের যে মামলাটি সম্প্রতি [illegible] শুরু [illegible] নয়, নূরজাঁহাও নন, ইনি [illegible] নূরজাঁহা, [illegible] ভূমিকায় অভিনয় করেন।

* * * *

আমাদের বড় কর্তাদের দৃষ্টিকোণ বদলে [illegible] পরিচালিত, প্রযোজিত ও অভিনীত ইণ্ডিয়ান নিউজ প্যারেডে 'কংগ্রেসী নেতাদের আবির্ভাব'—যদিও নেতাদের নাম উল্লেখ না হ'য়ে পড়ার দিকে বেশ সতর্কতা অবলম্বন করা হ'য়েছে। উপলক্ষ্য সিমলা সম্মেলন [illegible] হঠাৎ সামনে পড়ে যাওয়ার মতো দেখালো।

* * * *

ইষ্টার্ণ [illegible] ফিল্মসের [illegible] পরের হিন্দী ছবি হ'চ্ছে [illegible] ছবি 'কুরুক্ষেত্র', [illegible] টাকায় সর্বভারতীয় স্বত্ব বিক্রীত হ'য়েছে।

* * * *

চিত্র [illegible] রায় চিত্ররূপার হ'য়ে [illegible] কাহিনী অবলম্বনে রাধা ফিল্মস স্টুডিওতে যে ছবিখানি [illegible] দেওয়া হয়েছে 'প্রতিমা'। [illegible] মধ্যে থাকবেন [illegible] মিত্র, [illegible] রায় সন্ধ্যারাণী প্রভৃতি [illegible] পি-এন-জেএ'র [illegible]।

* * * *

[illegible] দীনবন্ধু মিত্রের 'নীলদর্পণ' নাটক [illegible] আয়োজন [illegible] পরিচয় নূতন করে [illegible]। উনবিংশ শতাব্দীতে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর আমলে বাঙলা দেশে [illegible] অত্যাচারী নীলকরদের [illegible] হয়েছিল তা [illegible] এই নাটক [illegible]। বাঙলা দেশে [illegible] এই নাটক চাঞ্চল্য সৃষ্টি [illegible] করবার জন্য [illegible] সাধন করা [illegible] চলেছে।



"দেশ" এর
নিয়মাবলী

বার্ষিক মূল্য—১৩৲ ষাণ্মাসিক—৬৷৷

বিজ্ঞাপনের নিয়ম

"দেশ" পত্রিকায় বিজ্ঞাপনের হার সাধারণতঃ নিম্নলিখিতরূপ :—

সাধারণ পৃষ্ঠা—এক বৎসরের চুক্তিতে
১০০" ও তদূর্ধ্ব ... ৩৲ প্রতি ইঞ্চি প্রতি বার
৫০"—৯৯" ... ৩৷৷০ „ „ „ „

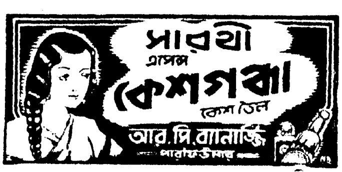
সাময়িক বিজ্ঞাপন
৪৲ টাকা প্রতি ইঞ্চি প্রতি বার

বিজ্ঞাপন সম্বন্ধে অন্যান্য বিবরণ বিজ্ঞাপন বিভাগ হইতে জানা যাইবে।

সম্পাদক—"দেশ"
১নং বর্মণ স্ট্রীট, কলিকাতা।









গঙ্গোত্রী

সুবোধ ঘোষ

(৩৯)

সঞ্জীববাবু যেন ভীতভাবে ডাকছিলেন—মাধুরী, মাধুরী।

আকাশের গায়ে মাত্র বিকালের আমেজ লেগেছে। মধ্যাহ্নের জ্বালা ফুরিয়ে আসছে। আদালত থেকে অসময়ে ঘরে ফিরেছেন সঞ্জীববাবু। এত বড় নামকরা উকীল সঞ্জীববাবু, বহু মামলা জয় করেছেন। হেরে গেলেও কোনদিন বিচলিত হননি, হেরেছেনও কদাচিৎ; কিন্তু আজ তার গলার স্বর অন্য রকমের। যেখানে জয় সুনিশ্চিত ছিল, হেরে যাবার কোন আশঙ্কাই ছিল না, এই ধরণেরই একটি বড় মামলায় যেন চরমভাবে পরাজয় স্বীকার করে নিয়ে শ্রান্ত ক্লান্ত ও উদভ্রান্ত হয়ে ঘরে ফিরেছেন।

মাধুরী কাছে এসে দাঁড়িয়েছে সেদিকেও ভ্রূক্ষেপ করলেন না সঞ্জীববাবু। নিজের মনেই বলে চললেন—আর এখানে নয়; সব দিক বন্ধ হয়ে গেল। না, ঠিক বন্ধ হয়ে যায়নি, সব দিক ফুরিয়ে গেল। আর এগিয়ে যাবার রাস্তা নেই। এখন ঝুলিঝোলা তুলে সরে পড়তে হবে। এইবার সময় এসে গেছে মাধুরী, চল্ মুশৌরী চলে যাই।

মাধুরী আশ্চর্য হলো—হঠাৎ মুশৌরী

সঞ্জীববাবু—হ্যাঁ, আর কোন মানে হয় না। মুশৌরী অনেক দূরে, তাই সেখানে যাচ্ছি। কাছাকাছিও থাকতে চাই না।

মাধুরী—কেন বাবা?

সঞ্জীববাবু—কাছাকাছি থাকলে সব শুনতে পাব। সব কথা কানে আসবে। এমন জায়গায় চলে যেতে চাই, যেখান থেকে ইচ্ছে করলেও চট্ করে আসতে পারবো না। অর্থাৎ যেন আর ফিরতে না হয়।

মাধুরীর মুখ ভয়ে বিবর্ণ হয়ে উঠেছিল,—কি ব্যাপার হলো, কিছু বুঝতে পারছি না।

সঞ্জীববাবু—আমার প্ল্যান ভেঙে গেল মাধুরী, আমার জীবনের প্ল্যান।

আর কোন প্রশ্ন করলো না মাধুরী। প্রশ্ন করে লাভ নেই। বাঁধ ভেঙে গেছে, এই জলোচ্ছ্বাস নিজের ভাষাতেই তার শোক, বেদনা ও হর্ষকে প্রতিধ্বনিত করবে। যা প্রশ্নেরও অতিরিক্ত, তারও উত্তর এই উদ্ভ্রান্ত বিলাপের মধ্যে নিজের থেকেই ফুটে উঠছে। প্রশ্ন করে আর লাভ নেই।

সঞ্জীববাবুও তাই করলেন। কিছুক্ষণ একেবারে স্তব্ধ হয়ে রইলেন। মনের গভীরে তলিয়ে গিয়ে ডুবুরীর মত হাতড়ে যেন বহু হারানো রত্নের কণিকা খুঁজে বেড়ালেন। হাতের মুঠোয় যা উঠে আসছে, কিছুক্ষণের জন্য তারই দিকে তাকিয়ে থাকছেন। তার পরেই বুঝতে পারছেন—কিছুই নয়, কিছুই নয়। সব ফাঁকি, সব ফাঁকা। শুধু এক মুঠো মূল্যহীন বালুকণা। এর বেশী কিছু আর পাওয়া গেল না। সারাজীবনের কামনার স্বপ্ন, সারা আয়ুষ্কালের অন্বেষণের স্বপ্ন সেই শুক্তি আর খুঁজে পাওয়া যাবে না। কাছে থেকেও সে হারিয়ে গেছে চিরকালের মত।

সঞ্জীববাবু অনেকক্ষণ পরে বললেন—কেশব আজ ছাড়া পেয়েছে। গাঁয়ে ফিরে গেছে।

চমকে উঠলো মাধুরী। অপ্রত্যাশিত আনন্দের জন্য নয়, এটা যেন একটা আকস্মিক আঘাত। এটাই আজ তার জীবনে একটা রূঢ় সত্য। অমিয় গরল হয়ে গেছে, সূর্যোদয় দেখলে যেন আজ চোখে ঘুম নেমে আসে মাধুরীর। জীবনে এত ক্ষয়-ক্ষতি, চিন্তা-ভাবনা, আগ্রহ ও আবেগের মূল্যে যে সত্য কেনা হয়েছিল, আজ সেটা নিছক লোকসান হয়ে দাঁড়িয়েছে। কেশবের মুক্তি সংবাদে মাধুরীকে তাই চমকে উঠতে হয়।

সঞ্জীববাবু—এরা তিনজনেই একসঙ্গে গাঁয়ে ফিরেছে—কেশব, পরিতোষ আর অজয়।

প্রত্যেকটি উচ্চারিত কথার ধ্বনিকে যেন মনে মনে একবার বন্দী করে ধরে মাধুরী তিনটি নাম। মুহূর্তের মত নামগুলি এক এক করে যেন মূর্তি ধরে তার চোখের সম্মুখে দাঁড়ায়। কেশব, পরিতোষ, অজয়।

কেশব, এই নামের পরীক্ষা যেন সম্পূর্ণ হয়ে গেছে, এ নাম মোটেই দুর্জ্ঞেয় নয় একেবারে রহস্যহীন অতি-পরিচিত। তাকে জানা হয়ে গেছে। তার প্রতিটি নিশ্বাসকে মাধুরী চেনে, তার জীবনের প্রত্যেকটি আলোকের কলরবের মর্ম মাধুরীর কাছে একেবারে স্পষ্ট, মান্দারগাঁয়ের দীঘির একেবারে স্পষ্ট। মান্দার গাঁয়ের দীঘির জলের পদ্মগুলির মত। খুবই সুন্দর, কিন্তু বড় পরিচিত। অনেক দিন ধরে, শত-সহস্রবার তার দিকে তাকানো হয়েছে। আর নতুন করে দেখবার মত কিছু নেই। কেশব যা ছিল তাই আছে, সেই দীঘির জলপদ্মের মত। তাকে দেখবার নেশা ক্রমেই যেন নিরাস্বাদ হয়ে গেছে।

পরিতোষ, এ নামের অর্থ মাধুরীর নিজেরই সৃষ্টি। পরিতোষ মাধুরীর কাছে এগিয়ে যায়নি, মাধুরী তাকে কাছে ডেকে এনেছে ইচ্ছে করে। পরিতোষ বিলেত গিয়েছিল নিছক পড়াশুনা করার জন্যেই। মাধুরী ইচ্ছে করেই পরিতোষের প্রবাস-জীবনের মুহূর্তগুলির মধ্যে বিরহের বেদনার স্পর্শ এনে দিয়েছিল। যেখানে ভালবাসার কথাই উঠতে পারে না মাধুরী সেই শূন্যতার শান্তিকে অধীর করে দিয়েছিল ভালবাসার কথা তুলে। এই অনুরাগের আলপনা মাধুরীর নিজের চেষ্টায়, নিজের খেয়ালে, নিজের হাতে আঁকা। নিজের ইচ্ছামত রঙ দিয়ে এঁকেছে। এর মধ্যে পরিতোষের কোন হাত ছিল না, সেই

বিশেষ বিজ্ঞপ্তি

আগামী সংখ্যা হইতে প্রবীণ কথাশিল্পী শ্রীযুত উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের উপন্যাস আশাবরী ধারাবাহিকরূপে প্রকাশিত হইবে।

রীতি-নীতি তার জানা নেই, এত দুঃসাহসও তার ছিল না। সঞ্জীববাবুর উপকারে শুধু কৃতজ্ঞ থাকবার জন্য পরিতোষ প্রস্তুত হয়েছিল। সেই কৃতজ্ঞতাকেই সোনার শিকল দিয়ে মাধুরী বন্দী করে ফেলেছিল।

পরিতোষের দাবীর মূল্য কতটুকু? সে তো মাধুরীর হাতের কৌশলে তৈরী একটি কৃত্রিম ফোয়ারা। আজ যদি সে এক উৎসের গর্ব নিয়ে মাধুরীর জীবনে নদী হবার দাবী করে, কী হাস্যকর সেই দাবী!

অজয়দাও গাঁয়ে চলে গেছে। মাধুরীর চিন্তার অহংকারগুলি যেন এইখানে এসে হঠাৎ মাথায় আঘাত পায়, মাথা হেঁট হয়ে যায়।

আজ সবচেয়ে রহস্যময় মনে হয় এই মানুষটিকে—অজয়দা। নিজেরই সৃষ্টি, এক অদ্ভুত পৃথিবীতে অজয়দা যেন একা একা ঘুরে বেড়াচ্ছেন। সেখানে তিনি কারও সাহায্যের প্রার্থী নন। তাঁর দাবী আজ পর্যন্ত কেউ শুনতে পায়নি। পরিতোষের কথা যদি বিশ্বাস করা যায়, তবে একথাও বিশ্বাস করতে হয়—কী বিচিত্র অজয়দার এই পৃথিবী! এক স্বপ্নচারিণীর রূপে মাধুরীকে সেই পৃথিবীতে ঘুরে বেড়াবার অবকাশ দিয়েছেন অজয়দা। আর কাউকে নয়। একথা বিশ্বাস করতেও যে এত গর্ব ছিল, তা মাধুরী জানতো না। আজ সবই বুঝা যায়। আরও জানতে, চিনতে ও দেখতে লোভ হয়। বিনা উপকারে, বিনা আবদারে, বিনা প্রলোভনে কেউ কারও জন্য সর্বস্ব দিয়ে আড়ালে একটা স্বর্গ রচনা

করে রাখবে, জীবনে এতখানি গৌরব আশা করা যায় না। তবু মাধুরী জানে, অজয়দা সেই অসম্ভব ও অবাস্তবকে একেবারে সত্য করে রেখেছে। জীবন ধন্য হয়ে যাবার মত এই উপহার।

সঞ্জীববাবু—আর দেরি করবো না মাধুরী। কদিনের মধ্যেই সব গুছিয়ে নিতে হবে।

মাধুরী—একটা কথা ছিল।

সঞ্জীববাবু—না, আর কোন কথা থাকতে পারে না। কেশবের হাতে আমি তোমাকে বিলিয়ে দিতে পারবো না।

মাধুরী—না, সেকথা নয়।

সঞ্জীববাবু—তবে আর কি?

মাধুরী—আমার আশ্চর্য লাগছে, তুমি এত ঘাবড়ে যাচ্ছ কেন গাঁয়ের লোকেরা তোমাকে সম্মান করতে পারলো না, সব দিক দিয়ে শত্রুতা করলো, এর জন্য এত কি ভাববার আছে?

সঞ্জীববাবু—ঠিক কথা। আর ভাববো না। এইবার সব চুকিয়ে দেব। শুধু একটা শিক্ষা রেখে যাব......।

সঞ্জীববাবুর এত বিষণ্ণ ও করুণ চেহারাও মুহূর্তের মধ্যে কঠোর হয়ে উঠলো। এখনো যেন একটা শেষ প্রতিশোধের সংকল্পকে হাতের কাছে পুষে রেখেছেন।

নিজে থেকেই বেসামাল বলে ফেললেন সঞ্জীববাবু—ঐ পুরুত ছোঁড়া আমার ওপর টেক্কা দিতে এসেছিল। বাপের গুণ পেয়েছিল। তার মাতৃদেবীও এ বিষয়ে তাকে চিরকাল লাই দিয়েছে। সব ভেস্তে দিয়ে চলে যাব।

সঞ্জীববাবুর আক্রোশ বর্বরের প্রতিহিংসার মত নির্লজ্জ হয়ে উঠলো। সঞ্জীব উকিলের মেয়েকে বিয়ে করবে সারদার ছেলে? সারদা এই আলোক মনে মনে জপছে সারা জীবন ধরে। এই আলোক চূর্ণ হবে। সারদাকে আমি ক্ষমা করতে পারি না।

মাধুরীর মাথা হেঁট হয়ে এল।

সঞ্জীববাবু এঘর ওঘর পায়চারী করে বেড়ালেন। আজ সব দিক দিয়ে হেরে গিয়ে শুধু শেষ প্রতিহিংসার আঘাত দিয়ে সরে পড়তে চান। মাধুরীর মনে হয়—আজ সত্যি করে সারদা জেঠীমার ঘরে আগুন লাগাবার জন্য প্রস্তুত হয়েছেন সঞ্জীববাবু। কেশবকে ব্যর্থ করে দিয়ে, অনুরোগের প্রতিশ্রুতির ধর্মকে বাতিল করে দিয়ে, সারদা জেঠীমার সম্মুখে একটা প্রায়শ্চিত্তের অগ্নিকুণ্ড রেখে দিয়ে সঞ্জীববাবু চলে যাবেন। এর বেশী আর কিছু করতে চান না।

মাধুরী বললো—কিন্তু গাঁয়ের মানুষকে তুমি এখনো চিনতে পারনি বাবা।

সঞ্জীববাবু—কি বললি?

মাধুরী—তুমি যা করছো, তাতে কেশবদার কোন ক্ষতি হবে না। তারা বড় বেশী চালাক বাবা।

সঞ্জীববাবু—কি চালাকি করেছে?

মাধুরী—কেশবদা এইবার খুশি হয়েই গাঁয়ে থাকবে। আরও বেশি খুশি হবে এই কথা শুনে যে, আমাদের বাড়ি পুড়ে গেছে, আমরা আর গাঁয়ে ফিরবো না।

সঞ্জীববাবু—তা কি করে হয়। অন্তত তোকে তো সে আজও......।

মাধুরী—মোটেই না। সেই সব নিয়ম উল্টে গেছে। গাঁয়ের লোক বোকা নয়।

সঞ্জীববাবু উত্তেজিত হয়ে উঠলেন—কিছুই বুঝতে পারছি না।

মাধুরী—যদি কয়েকদিনের মধ্যেই শুনতে পান যে, কেশবদার বিয়ে হয়ে গেছে।

সঞ্জীববাবু—বিয়ে? কার সঙ্গে?

মাধুরী—ঐ গাঁয়েরই একটি মেয়ের সঙ্গে।

সঞ্জীব—এও কি সম্ভব?

মাধুরী—কেন সম্ভব নয়?

সঞ্জীববাবু—ঠিক বলেছিস্! কেন সম্ভব হবে না। এতো নতুন কিছু নয়, এ-রকম আরও হয়েছে। নইলে...।

সঞ্জীববাবু নিজের মনে খেই হারিয়ে বিড়বিড় করতে লাগলেন। ধীরে ধীরে অবসন্ন হয়ে আসতে লাগলেন। সব পথ সত্যিই নিঃশেষ হয়ে গেছে। আর কিছু করবার নেই; সময় বুঝে সবাই বদ্‌লে গেছে। তপস্যা করা জীবনের রীতি নয়। সারদা সাবধান হয়ে গেছে, কেশবও প্রস্তুত হয়েছে। সত্যি ওরা বড় চালাক।

সঞ্জীববাবু—তাহ'লে তো সবই পরিষ্কার হয়ে গেল মাধুরী। আর দুঃখ করার কিছু নেই।

মাধুরী—আর রাগ করারও কিছু নেই।

সঞ্জীববাবু—হ্যাঁ, আর অপমানেরও কিছু নেই।

মাধুরী—এখন আমরা অনায়াসে গাঁয়ে গিয়ে থাকতে পারি।

সঞ্জীববাবু বোকার মত তাকিয়ে রইলেন, যেন আর্তনাদ করলেন—আবার?

মাধুরী হেসে ফেললো—এত ভয় পাবার কোন দরকার নেই বাবা। গাঁয়ের কারও সঙ্গে আমাদের কোন সম্পর্ক নেই। আমরা সবারই পর হয়ে থাকবো। (ক্রমশ)

সমরপ্রসঙ্গ

গত ২৬শে জুলাই ব্রিটিশ পার্লামেণ্টের নির্বাচনের ফল জানা গিয়েছে। এ নির্বাচনে শ্রমিকদল অন্যনিরপেক্ষ সংখ্যা-গরিষ্ঠতা লাভ করেছে। শ্রমিক দলের ইতিহাসে এ প্রকারের সাফল্য এই প্রথম। পার্লামেণ্টের মোট ৬৪০ জন সদস্যের মধ্যে শ্রমিক দলের নির্বাচিত হয়েছে ৩৯০ জন, রক্ষণশীল দলের ১৯৫ জন, উদারনৈতিক শ্রমিক দলের ৩ জন, কম্যুনিস্ট দলের ১১ জন, স্বতন্ত্র দলের ১০ জন, স্বতন্ত্র শ্রমিক দলের ৩ জন, কম্যুনিণ্ট দলের ২ জন, কমনওয়েলথ দলের ১ জন ও জাতীয় দলের ১ জন। বাকী ১৩টি আসনের ফল এখনও জানা যায় নি। পূর্বতন মন্ত্রিসভার ৯ জন মন্ত্রী এ নির্বাচনে পরাজিত হয়েছেন। তন্মধ্যে চরম প্রতিক্রিয়াপন্থী, অবাঞ্ছিত ভারতসচিব মিঃ আমেরীর পরাজয় বিশেষভাবে উল্লেখ-যোগ্য। ভারতের যে দুচারজন প্রগতি-বিরোধী মানুষের তিনি মুরুব্বি ছিলেন, সেই নিমকহালালেরা ছাড়া সমস্ত ভারতবর্ষ মিঃ আমেরীর পরাজয়ে আনন্দিত হয়েছে—উল্লসিত হয়েছে। মিঃ আমেরীর অপসারণের দাবী ভারতবর্ষ বহুদিন থেকে বহুভাবে করে আসছিল। কিন্তু সাম্রাজ্যবাদদম্ভী ইংরেজের তাচ্ছিল্যপূর্ণ উপেক্ষাতেই সে দাবী লাঞ্ছিত হয়েছে। ভারতবর্ষ নিজের দাবীর শক্তিতে মিঃ আমেরীর অপসারণ ঘটাতে পারেনি, এ নিশ্চয়ই তার অগৌরব। সে দিক থেকে বিচার করলে তার উল্লসিত না হওয়াই উচিত। কিন্তু মিঃ আমেরীর কার্যকালের সঙ্গে ভারতের এত দুঃখ লাঞ্ছনা, এত দুর্গতি আর অবমাননা বিজড়িত—বিশেষ করে ভারতে অচল অবস্থা সৃষ্টি করার জন্য সর্বজনপ্রিয় ও শ্রদ্ধেয় কংগ্রেস নেতৃবৃন্দকে কারাবরুদ্ধ করার জন্য ও তার পরবর্তী নিরঙ্কুশ দমননীতির জন্য কংগ্রেসের সঙ্গে আপোষ-মীমাংসায় অনিচ্ছার জন্য, ভারতের স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষাকে পুনঃ পুনঃ অবজ্ঞা ও উপেক্ষায় লাঞ্ছিত করার জন্য, সর্বোপরি বাঙলার প্রলয়ংকর দুর্ভিক্ষ ও মহামারীর জন্য তাঁর নাম ভারতের ঘরে ঘরে কুখ্যাতি অর্জন করেছে। কাজেই অতি দর্পিতের এই ভূমাবলুণ্ঠনে স্বতই তাদের হৃদয়ে উল্লাস উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠেছে—সে উল্লাসকে যুক্তিতে তোল করে দেখবার সময় তারা পায়নি। মিঃ আমেরীর দর্পিত অভিভাবক মিঃ চার্চিল বহু ভোটাধিক্যে প্রতিদ্বন্দ্বীকে পরাজিত করে নির্বাচিত হয়েছেন সত্য, কিন্তু তাঁর এ জয় পরাজয়ের চেয়েও শোচনীয়। কারণ পার্লামেণ্টে তাঁর দলের সংখ্যালঘিষ্ঠতা তাঁর আস্ফালনকে স্তব্ধ করে দিয়েছে। সমরকালীন প্রধান মন্ত্রী হিসাবে মিঃ চার্চিলের কাছে ব্রিটেনের কতখানি ঋণ, তা তারা বিচার করবেন। কিন্তু সাম্রাজ্য-বাদের নাগপাশে আবদ্ধ মানুষ যারা, তারা বিষধর সাপের বিষদাঁত খুলে ফেলে দিলে যে অবস্থা হয়, মিঃ চার্চিলের সেই অবস্থা-প্রাপ্তিতে উৎফুল্ল না হয়ে পারবে না। কারণ যে আকাশচুম্বী স্পর্ধায় ও বলাধিকারে তিনি ধরাকে (আমেরিকা ও রুশিয়া বাদে, কারণ এই বৃদ্ধ বয়সেও পুনঃ পুনঃ তাঁকে স্ট্যালিন আর রুজভেল্টের দ্বারে গিয়ে ধর্ণা দিতে হয়েছে) শরা জ্ঞান করেছেন, পরাধীন ও দুর্বল জাতির মাথায় অপমান ও অবজ্ঞার গ্লানি নির্বিচারে চাপিয়ে দিয়েছেন, তাঁকে তলোয়ারহীন খাপের অবস্থায় উপনীত হতে দেখে ভারতবাসীর যে উৎফুল্লতা তাকে অক্ষমের উৎফুল্লতা বলে হয়তো নিন্দা করা চলে, কিন্তু তার অকপটতায় সন্দেহ করা চলে না।

নির্বাচনে শ্রমিক দলের এরূপে সংখ্যা-ধিক্য লাভ অনেকেরই অপ্রত্যাশিত ছিল, এমন কি শ্রমিক দলের নেতারাও এরূপে সাফল্য প্রত্যাশা করেন নি। কিন্তু শ্রমিক দলের এ সাফল্য কিরূপ ভবিষ্যতের সূচনা করছে? অনেক বিদেশী কাগজে মন্তব্য করা হয়েছে যে, ইংলণ্ডে নীরবে বিপ্লব ঘটে গিয়েছে। রুশিয়া থেকে আরম্ভ করে ভারতবর্ষ পর্যন্ত সর্বত্রই শ্রমিক দলের জয়ে আনন্দ প্রকাশ করা হয়েছে। একদিক থেকে আনন্দপ্রকাশের কারণ কতকটা আছে বটে। কারণ রক্ষণশীল দলের প্রতিক্রিয়া-শীল মতবাদের থেকে যে শ্রমিক দলের মতবাদ অনেকটা অগ্রসর, তা হয়তো বিনা দ্বিধায়ই বলা চলে। কিন্তু তাঁদের এই মতবাদের উদারতা তাঁরা স্বদেশের মত পরাধীন দেশগুলোতেও প্রসারিত করতে সক্ষম কি না, তা তাঁদের ভবিষ্য কর্মপদ্ধতি না দেখে বলা সম্ভব নয়। কারণ ইতিপূর্বে পার্লামেণ্টে যখন শ্রমিকদলের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, তখন তাঁরা ভারতবর্ষ সম্বন্ধে যে মনোভাবের পরিচয় দিয়েছেন ও যে আচরণ ভারতের প্রতি করেছেন তাতে আশান্বিত হয়ে ওঠবার মত সম্বল আমাদের কিছু নেই। কালের পৃথিবী আজের পৃথিবী নয়। সেদিনের শ্রমিকদল আজের শ্রমিকদল এক না-ও হতে পারে। কিন্তু এক যে নয়, কাজ দেখেই সে সিদ্ধান্তে আমাদের আসতে হবে কল্পনায় মায়াজাল সৃষ্টি করে নয়। নির্বাচনের পূর্বে বা পরে এ পর্যন্ত শ্রমিকনেতারা ভারতবর্ষ সম্বন্ধে যা বলেছেন, তাতে আশান্বিত হবার কোন কারণ ঘটে নি। তবুও ভারতবর্ষ সম্বন্ধে তাঁরা কি নীতি অবলম্বন করেন, তা না দেখে আগে থেকেই কোন সিদ্ধান্ত করা সংগত হবে বলে মনে হয় না।

পটসড্যাম সম্মেলন ও জাপান

পটসড্যামের বৈঠক এখনও চলেছে, আরও কিছুদিন নাকি চলবে। তবে মাঝখানে ব্রিটিশ পার্লামেণ্টের নূতন নির্বাচনে শ্রমিকদল বিজয়ী হওয়াতে শ্রমিক-নেতা মিঃ অ্যাটলী প্রধান মন্ত্রীরূপে মন্ত্রিসভা গঠনের ভার গ্রহণ করেছেন। ফলে ত্রি-রাষ্ট্রনেতা'র মধ্যে একজনের পরিবর্তন হয়েছে—মিঃ চার্চিলের বদলে মিঃ অ্যাটলী এখন বৈঠকে যোগ দিয়েছেন। বৈঠকে কি আলোচনা হচ্ছে আর সিদ্ধান্তই বা কি হচ্ছে, তা অত্যন্ত গোপনে রাখা হয়েছে। তবে সংবাদ-দাতারা দমবার পাত্র নন, তাঁরা বাতাস থেকেই সংবাদ সংগ্রহ করে বাতাসের মারফতেই পৃথিবীতে ছড়িয়ে দিচ্ছেন। সেগুলো নির্ভরযোগ্য কি না, অনুমান করে বলা মুস্কিল। এইরূপ একটি সংবাদ হল যে, রুশিয়া ভ্লাডিভাস্টক অঞ্চলের ঘাটিগুলো ব্রিটেন ও আমেরিকাকে জাপানের বিরুদ্ধে ব্যবহার করতে দেবে; তবে সে নিজে প্রত্যক্ষ-ভাবে জাপানের বিরুদ্ধে যোগ দেবে না; কারণ আগামী বৎসরের ৫ই এপ্রিল পর্যন্ত তার জাপানের সঙ্গে নিরপেক্ষতা চুক্তির মেয়াদ রয়েছে। সংবাদদাতার এ সংবাদ যে যুক্তির উপর প্রতিষ্ঠিত, তা হাস্যকর না হলেও কৌতুকজনক। এ যেন কতকটা এই রকমের কথা—অমুককে আমি হত্যা করবো না বলে প্রতিশ্রুত আছি, তাই কি করে হত্যা করি। তবে কেউ যদি আমার হাতে তলোয়ার গুঁজে দিয়ে তার মাথা কেটে ফেলে, তাতে আমার আপত্তি নেই। রুশিয়া যদি তার ঘাটিগুলো জাপানের বিরুদ্ধে ব্যবহার করতে দেয়, তা হলেও তার নিরপেক্ষতা বজায় থাকে, আর শুধু প্রত্যক্ষভাবে যুদ্ধ করতে নামলেই নিরপেক্ষতা ভঙ্গ করা হয়, এ যুক্তি অদ্ভুত বটে। যাক পটসড্যাম সম্মেলনে যে জাপানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ পরিচালনা সম্বন্ধে আলোচনা হচ্ছে এবং রুশিয়াকে জাপানের বিরুদ্ধে যুদ্ধে নামানোর প্রচেষ্টাও যে চলছে, তা অনুমান করা চলে। তার ফলাফল কি হবে, তা অনুমান করে বলা সম্ভব নয়। তবে রুশিয়া যদি তার ঘাটি জাপানের বিরুদ্ধে ব্যবহার করতে দিতে রাজী হয়, তা হলে জাপানের বিরুদ্ধে তার যুদ্ধে অবতীর্ণ হওয়ার বিরুদ্ধেও বিশেষ কোন যুক্তি তো থাকবেই না, তার আপত্তিও খুব প্রবল হবে বলে মনে হয় না। সে যাই হোক সঠিক সংবাদের জন্য পটসড্যাম সম্মেলনের আশ্চর্য নীরবতা ভঙ্গের অপেক্ষা আমাদের করতেই হবে।

সাপ্তাহিক সংবাদ

দেশী সংবাদ

২৫শে জুলাই—আটকের জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের নিষেধাজ্ঞা অমান্যের অভিযোগে পাঞ্জাব পুলিশ অদ্য খান আবদুল গফুর খানকে গ্রেপ্তার করে।

আগস্ট আন্দোলন সম্পর্কিত সকল কয়েদীকে মুক্তি দিবার জন্য পাঞ্জাব সরকার এক আদেশ জারী করেন।

বাঙলার অবস্থা পরিদর্শনের জন্য গান্ধীজী সেপ্টেম্বর মাসে বাঙলায় আসিতে পারেন বলিয়া ওয়ার্ধার এক সংবাদে জানা গিয়াছে।

নাসিকে একটি বোমা বিস্ফোরণে তিনিট ছাত্র নিহত হইয়াছে।

২৬শে জুলাই—পাঞ্জাব পুলিশ খান আবদুল গফুর খানকে সীমান্ত প্রদেশের কোহাট জেলার খুসাবগড়ে লইয়া গিয়া তথা হইতে তাঁহাকে মুক্তি দিয়াছে।

বাঙলা গভর্ণমেণ্টের সিভিল সাপ্লাই বিভাগের এনফোর্সমেণ্ট ও পাবলিক রিলেসন্স-এর ডিরেক্টর জেনারেল মিঃ পি জে গ্রিফিথ্স্ এক সাংবাদিক সম্মেলনে ঘোষণা করেন যে, বৃহত্তর কলিকাতা অঞ্চলে পূর্ণাঙ্গ বস্ত্র রেশনিং শীঘ্রই চালু করা হইবে এবং রেশিনিংএর বৎসরের প্রথম ৯ মাসে পূর্ণ বয়স্কদের জন্য মাথাপিছু ২০ গজ করিয়া বস্ত্র বরাদ্দ করা হইবে।

তুচ্ছ ব্যাপারে ছাত্রের প্রতি কঠোর দণ্ডদান করার প্রতিবাদে পাটনায় ব্যাপক ছাত্র ধর্মঘট হইয়াছে।

বোম্বে সেণ্টিনেলের সম্পাদক মিঃ বি জি হর্নিম্যানের সাংবাদিক জীবনের সুবর্ণ-জয়ন্তী অনুষ্ঠানের আয়োজন হইয়াছে।

২৭শে জুলাই—বাঙলা গভর্নমেণ্ট ৩রা সেপ্টেম্বর হইতে কলিকাতা অঞ্চলে পূর্ণাঙ্গ রেশনিং প্রবর্তনের সিদ্ধান্ত করিয়াছেন।

বৃটেনের সাধারণ নির্বাচনের ফলাফল সম্পর্কে সাংবাদিকগণ মহাত্মা গান্ধীর মতামত জানিবার জন্য বহুবার চেষ্টা করেন। গান্ধীজীর পক্ষ হইতে জানাইয়া দেওয়া হয় যে, এ সম্বন্ধে তাঁহার বলিবার কিছু নাই।

বোম্বাইএর ইংরাজী সাপ্তাহিক পত্রিকা "ফোরামের" সম্পাদক, মুদ্রাকর ও প্রকাশক মিঃ জোয়াকিম আলভার উপর বোম্বাই গভর্ণমেণ্ট ৩ হাজার টাকা জামিন জমা দিবার এক আদেশ জারী করিয়াছেন।

২৮শে জুলাই—রাষ্ট্রপতি মৌলানা আবুল কালাম আজাদ বড়লাটের নিকট একখানি পত্র প্রেরণ করিয়াছেন। এই পত্রে রাষ্ট্রপতি বড়লাটকে সমস্ত রাজনৈতিক বন্দীকে মুক্তিদান করিতে এবং যে সমস্ত পরোয়ানা (রাজনৈতিক ধরণের) এখনও জারী করিতে পারা যায় নাই সে সমস্ত পরোয়ানা বাতিল করিতে অনুরোধ করিয়াছেন।

রাষ্ট্রপতি আজাদ শনিবার মধ্যাহ্নে বিমান-যোগে কাশ্মীর যাত্রা করিয়াছেন।

বিনা লাইসেন্সে এক বাণ্ডিল কার্তুজ রাখার অপরাধে ব্যারাকপুর কোর্টের তৃতীয় হাকিমের বিচারে দশ বৎসর বয়স্ক একটি বালকের ৩০্ জরিমানা হইয়াছে।

২৯শে জুলাই—মোগলসরাই স্টেশনের প্রায় তিন মাইল পূর্বে লুপ ও মেন লাইনের সংযোগস্থলে একসঙ্গে জোড়া দুইখানি পাইলট ইঞ্জিনের সহিত সংঘর্ষের ফলে ৯৯নং আপ গয়া প্যাসেঞ্জার ট্রেণের ফুটবোর্ডে দণ্ডায়মান ও দরজার পাশে উপবিষ্ট ১৭ জন যাত্রী নিহত ও পাঁচজন গুরুতররূপে আহত হইয়াছে।

৩০শে জুলাই—বঙ্গীয় কংগ্রেস পার্লামেণ্টারী দলভুক্ত বঙ্গীয় ব্যবস্থা পরিষদের ১৩ জন সদস্য এবং বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার একজন সদস্য নূতন বৃটিশ প্রধানমন্ত্রী মিঃ ক্লেমেণ্ট এটলী এবং মিঃ আর্থার গ্রীনউডের নিকট তার করিয়া বাঙলার জনপ্রিয় নেতা শ্রীযুত শরৎচন্দ্র বসুর মুক্তি দাবী করিয়াছেন।

গত ১১ই জুলাই তারিখে মাদারীপুর মহকুমার রাজের থানার অন্তর্গত ট্যাকেরহাট নামক স্থানে হাটের সময় একটি বিমান ভাঙ্গিয়া পড়ায় শতাধিক লোক নিহত হইয়াছে এবং আরও বহু ব্যক্তি নিখোঁজ হইয়াছে। বিমানটি খুব নীচু দিয়া উড়িয়া যাইবার কালে কুমার নদীর উপর টেলিগ্রাফের তারের ধাক্কা খাইয়া হাটের স্থানে ভাঙ্গিয়া পড়ে। তখন হাট চলিতেছিল। বহু মাল বোঝাই নৌকাও চূর্ণবিচূর্ণ হইয়া গিয়াছে।

প্রকাশ, গভর্নমেণ্ট সমাজতন্ত্রী নেতা শ্রীযুক্ত জয়প্রকাশ নারায়ণের বিরুদ্ধে কোন বিশ্বাস-যোগ্য প্রমাণ খাড়া করিতে পারেন নাই। এই হেতু তাঁহাকে আদালতে অভিযুক্ত না করিয়া আটক রাখাই স্থির করা হইয়াছে।

৩১শে জুলাই—পাঞ্জাব গভর্নমেণ্ট ১৫৯ জন কংগ্রেসসেবীর উপর আরোপিত বিধি নিষেধ রহিত করিয়াছেন।

বিদেশী সংবাদ

২৫শে জুলাই—চীনা সরকারী বাহিনী কর্তৃক চীনা কম্যুনিস্টদের উপর আক্রমণ পরিচালনার কথা কমিউন্স্ট নিয়ন্ত্রিত ইয়েনান রেডিওতে ঘোষণা করা হইয়াছে।

২৬শে জুলাই—বৃটেনের সাধারণ নির্বাচনে শ্রমিক দল নিরপেক্ষ সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করিয়াছে। মিঃ আমেরী শ্রমিক দলের প্রার্থী কর্তৃক পরাজিত হইয়াছেন। শ্রমিক নেতা মিঃ ক্লেমেণ্ট এটলীকে রাজা মন্ত্রিমণ্ডলী গঠন করিতে আহ্বান করেন এবং তিনি তাহাতে রাজী হন। মিঃ চার্চিল পদত্যাগ করিয়াছেন। প্রাক্তন রক্ষণশীল গভর্নমেণ্টের ৯জন মন্ত্রীই নির্বাচনে পরাজিত হইয়াছেন। শ্রমিক দলের মোট ৩৮০জন প্রার্থী নির্বাচিত হইয়াছেন।

জাপানের নিকট যুক্তরাষ্ট্র, বৃটেন ও চীন সম্মিলিতভাবে এক বিবৃতিতে প্রতিরোধ বন্ধ করার জন্য দাবী জানাইয়াছে, অন্যথায় জাপানকে সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস হইতে হইবে।

প্রকাশ, টোকিও বেতারে বলা হইয়াছে যে, মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র যদি সর্তহীন আত্মসমর্পণ দাবী না করিয়া জাপানের প্রতি অপেক্ষাকৃত উদার মনোভাব অবলম্বন করে, তাহা হইলে জাপান শান্তি প্রতিষ্ঠায় রাজি হইবে।

২৭শে জুলাই—অদ্য রাত্রে নূতন শ্রমিক গভর্নমেণ্টের প্রধান প্রধান সদস্যদের নাম ঘোষণা করা হইয়াছে। প্রধানমন্ত্রী—মিঃ সি আর এট্লী; পররাষ্ট্রসচিব—মিঃ আর্নেস্ট বেভিন; অর্থসচিব—ডাঃ হিউ ডালটন; বাণিজ্যসচিব—স্যার স্ট্যাফোর্ড ক্রীপ্স্; লর্ড প্রেসিডেণ্ট অব কাউন্সিল—মিঃ হার্বার্ট মরিসন; লর্ড চ্যান্সে-লর—স্যার উইলিয়ম জোয়েট; লর্ড প্রিভিসিল—মিঃ আর্থার গ্রীনউড।

অদ্য 'নিউজ ক্রনিকলের' রাজনৈতিক সংবাদ-দাতা স্ট্যান্‌লি ডবসন জানাইয়াছেন যে, প্রধান মন্ত্রী মিঃ এট্লী ভারতসচিবের দপ্তর (ইণ্ডিয়া অফিস) উঠাইয়া দিবার অভিপ্রায় পোষণ করেন। ভারতীয়গণ হোয়াইট হল হইতে শাসিত হয়, ভারতীয় নেতাদের এই অভিযোগ দূরীকরণের জন্য ভারতীয় ব্যাপার ডোমিনিয়ন অফিস কর্তৃক পরিচালিত হইবে।

চীনের পিপলস পলিটিক্যাল কাউন্সিলের সেক্রেটারী জেনারেল মিঃ লিণ্ডসে শিয়াসের উত্তরে কমিউনিস্ট সৈন্যদল ও সরকারী সৈন্যদের মধ্যে সংঘর্ষ সম্পর্কে দৃঢ়তার সঙ্গে বলেন যে, কমিউনিস্টরা বিনা কারণে চুংওয়া আক্রমণ করে ও দখল করিয়া নেয়. পরে তাহাদিগকে বিতাড়িত করা হয়।

গত রাত্রে মিঃ চার্চিল, প্রেসিডেণ্ট ট্রুম্যান ও জেনারেল চিয়াং কাইশেকের স্বাক্ষরিত পটসডাম ঘোষণায় জাপানীদের প্রতি "আত্মসমর্পণ কর, নতুবা ধ্বংস হও" এই চরম বাণীর মর্ম বিশ্ববাসীকে জানান হয়।

২৮শে জুলাই—বৃটিশ প্রধানমন্ত্রী মিঃ এটলী পটসডাম গিয়াছেন। মিঃ চার্চিল বা মিঃ ইডেন কেহই তাঁহার সহিত যান নাই। অদ্য পুনরায় ত্রিনেতৃ সম্মেলন আরম্ভ হইয়াছে।

গ্রীসের প্রধানমন্ত্রী এডমিরাল ভালগারিক পদত্যাগপত্র দাখিল করিয়াছেন।

সুপারফোর্ট বিমানের ইঞ্জিন কিংবা আংশিক কলকব্জা প্রস্তুত বন্ধ করিয়া ৫০ হাজার শ্রমিক ধর্মঘট করিতে থাকায় জাপানের উপর সুপার ফোর্ট আক্রমণ হ্রাস পাইবার ও যুদ্ধ দীর্ঘতর হইবার আশঙ্কা ঘটিয়াছে বলিয়া অস্থায়ী মার্কিন সমরসচিব মিঃ রবার্ট পি প্যাটার্সন এক সতর্কবাণী ঘোষণা করিয়াছেন।

২৯শে জুলাই—অদ্য টোকিও বেতারে প্রচারিত সংবাদে বলা হইয়াছে যে, জাপ প্রধান মন্ত্রী মিত্রপক্ষের বিনাসর্তে আত্মসমর্পণের চরম দাবী প্রত্যাখ্যান করিয়াছেন।

নিউইয়র্কে পৃথিবীর বৃহত্তম অট্টালিকা "এম্পায়ার স্টেট বিল্ডিংস"এর উপর সৈন্য বিভাগের একখানি বোমারু বিমানের সংঘর্ষের ফলে বহু লোক হতাহত হইয়াছে।

মার্কিন যুদ্ধবার্তা অফিসের এক সতর্ক-বাণীতে প্রকাশ, বাহির হইতে দ্রুত সাহায্য না আসিলে আগামী শীতকালে ইউরোপে অনাহারে ও শীতে হাজার হাজার লোক মারা যাইবে।

৩০শে জুলাই—বৃটেনে লিভারপুল অঞ্চলে গতকল্য প্রায় ২০ হাজার রেলওয়ে শ্রমিক রবিবারে কাজ না করিবার জন্য প্রতিবাদস্বরূপ কার্যে যোগদানে বিরত থাকে।

৩১শে জুলাই—মঃ পিয়ের লাভাল অদ্য রাত্রিতে মিত্রপক্ষের হস্তে বন্দী হইয়াছেন।

বর্ণানুক্রমিক সূচীপত্র

(২৭শ সংখ্যা হইতে ৩৯শ সংখ্যা পর্যন্ত)

দেশ

সম্পাদক ঃ শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র সেন

সহকারী সম্পাদক ঃ শ্রীসাগরময় ঘোষ

১২ বর্ষ] শনিবার, ২৬শে শ্রাবণ, ১৩৫২ সাল। Saturday, 11th August, 1945 [৪০শ সংখ্যা

সাময়িক প্রসঙ্গ

ভারত ও শ্রমিক মন্ত্রিমণ্ডল

শ্রমিক মন্ত্রিমণ্ডল পুরাপুরি রকমে গঠিত হইয়াছে এবং বর্ষীয়ান্ শ্রমিক-নেতা মিঃ পেথিক লরেন্স ভারতসচিব নিযুক্ত হইয়াছেন। তিনি "লর্ড" উপাধিতে ভূষিত হইয়া লর্ডসভায় সদস্যরূপে ভারতসচিবের কাজ করিবেন এবং কমন্স সভার সদস্য মেজর আর্থার হেণ্ডারসন সহকারী ভারত-সচিবের পদে নিযুক্ত হইয়াছেন। মিঃ লরেন্সের এই নিয়োগের বিষয় লইয়া রাজনীতিক মহলে নানারূপ গবেষণা চলিতেছে এবং তাহার কতকগুলি কারণও রহিয়াছে; প্রথমত আমরা শুনিয়াছিলাম যে, শ্রমিক দল যদি মন্ত্রিত্ব দখল করিতে পারেন, তবে প্রথমেই তাঁহারা ইণ্ডিয়া অফিস তুলিয়া দিবেন এবং ভারতের ব্যাপার উপনিবেশ বিভাগের অফিস হইতে নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা করিবেন; ইহাতে কার্যত ভারতবর্ষ ঔপনিবেশিক স্বায়ত্তশাসনের অধিকার লাভ না করিলেও ভারতবাসীদের মনে আশার সঞ্চার হইবে এবং ঔপনিবেশিক বিভাগের নামের মহিমায় ভারতবাসীদের কপাল হইতে পরাধীনতার অনেকটা ছাপ মুছিয়া গিয়া আন্তর্জাতিক সমাজে তাহাদের মর্যাদা কিছু বাড়িবে। বলা বাহুল্য, ভারতের শাসন ব্যাপারে যদি দেশবাসীর পূর্ণ কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত না হয় এবং কার্যত বড়লাটের মারফতে বৃটিশ পার্লামেন্টের মুষ্টিমেয় সদস্যের দ্বারা বৃটিশের স্বার্থেই ভারতের শাসনযন্ত্র পরিচালিত হয়, তবে যে বিভাগের নামেই হউক এবং একজন বৃটিশ মন্ত্রী কি-বা মন্ত্রীর কমিটির দ্বারাই হউক, ভারতের স্বাধীনতার দিক হইতে আমরা তাহার কোন মূল্য আছে বলিয়াই মনে করি না। সুতরাং প্রকৃত প্রশ্ন দাঁড়াইতেছে এই যে, শ্রমিক মন্ত্রিমণ্ডল ভারতের উপর হইতে বৃটিশের কর্তৃত্ব অপসারিত করিতে প্রস্তুত আছেন কি না এবং স্বাধীন জাতিস্বরূপে ভারতবাসীদের রাজনীতিক এবং অর্থনীতিক জীবনের পূর্ণাভিব্যক্তির পথ উন্মুক্ত করিতে সত্যই তাঁহাদের আগ্রহ আছে কি না। আশাশীল ব্যক্তিদের এ সম্বন্ধে অভিমত এই যে, আপাতত আইনগত কতকগুলি অন্তরায় আছে বলিয়াই ভারতসচিবের পদ পুনরায় প্রবর্তন করা হইল; কিন্তু অচিরেই এই ব্যবস্থার সংস্কার সাধন করা হইবে। আগামী ১৫ই আগস্ট পার্লামেন্টের উদ্বোধনকালে ইংলণ্ডেশ্বরের অভিভাষণে ভারতের স্বাধীনতা স্বীকৃতির সম্বন্ধে বৃটিশ মন্ত্রিমণ্ডলের নূতন কার্যক্রম ঘোষিত হইবে। মিঃ পেথিক লরেন্স ভারতের স্বাধীনতার প্রতি একান্ত সহানুভূতি-সম্পন্ন ব্যক্তি; এজন্যই তাঁহাকে এই সম্মান দেওয়া হইয়াছে। মিঃ লরেন্সের সম্বন্ধে আমাদের বিশেষ কিছু বলিবার নাই। ভারতবাসীদের অধিকার সমর্থন করিয়া তিনি অতীতে অনেক বড় বড় কথা বলিয়াছেন এবং সেই প্রশ্নে সংরক্ষণশীলদের বিরুদ্ধে বহু বিতর্কে কৃতিত্ব প্রদর্শন করিয়াছেন, ইহা সত্য; কিন্তু সেজন্য আমাদের উল্লসিত হইবার কোন কারণ আছে বলিয়া আমরা মনে করি না। এ সম্বন্ধে অতীতের যে অভিজ্ঞতা আমাদের আছে, আমরা তাহা বিস্মৃত হইতে পারি না। আমরা জানি, বৃটিশের শাসন-নীতি স্বার্থের দুর্নিবার চক্রে আবর্তিত হয় এবং সেই চক্রের ভিতরে পড়িলে ব্যক্তির নিজস্ব মতামতের কোন বিশেষত্ব থাকে না। মর্লে হইতে আরম্ভ করিয়া সেদিন পর্যন্ত সহকারী ভারতসচিব লর্ড লিস্টওয়েলের আচরণে আমরা এই পরিচয়ই পাইয়াছি; সুতরাং মিঃ পেথিক লরেন্সের স্বরূপও দুই দিনেই ঘুরিয়া দাঁড়াইবে, এ আশঙ্কার কারণ রহিয়াছে। এ সম্বন্ধে স্যার স্ট্যাফোর্ড ক্রীপস আমাদিগকে সেদিন আশ্বাস দিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, অতীতে যাহা হইবার, তাহা হইয়াছে; এবার আর তেমন ঘটিবে না। ওয়াভেলের প্রস্তাবে ভারতে সদ্ভাবের যে প্রতিবেশ সৃষ্টি হইয়াছে তাহা কিছুতেই নষ্ট হইতে দেওয়া হইবে না। স্যার স্ট্যাফোর্ড ইহাতেও সন্তুষ্ট নহেন; তিনি আরও আগাইয়া গিয়াছেন। তিনি বলেন, সাময়িক ব্যবস্থা নয়, ভারতবর্ষের সম্বন্ধে এবার একেবারে পাকাপাকি রকমে মীমাংসা করা হইবে। এসব কথা শুনিতে মন্দ নয়; কিন্তু কার্যের গতি কোন্ পথে গিয়া কিরূপ দাঁড়াইবে, ইহাই বিবেচ্য। মিঃ জিন্না পাছে অসন্তুষ্ট হন, এজন্য সাময়িকভাবে যাঁহারা ভারতের সকল দলের সর্বজনসম্মত দাবীর মর্যাদা রক্ষা করিতে সাহসী হন নাই, তাঁহারা চিরদিনের জন্য ভারতে বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদ কায়েমী রাখিবার পক্ষে অন্ধের যষ্টিস্বরূপ মিঃ জিন্না এবং তাঁহার অনুগত দলের পৃষ্ঠপোষকতার নীতি পরিত্যাগ করিতে পারিবেন কি? কোন রকমে একটা গোলমাল পাকাইয়া ভারতের দাবীকে আপাততঃ চাপা দিবার চেষ্টা হইবে বলিয়াই আমাদের মনে হয়। আমরা জানি, বৃটিশ শ্রমিক দল ওয়াভেল প্রস্তাবের সমর্থক ছিলেন এবং সিমলা সম্মেলনের ব্যর্থতা ঘোষণার যে যৌক্তিকতা লর্ড ওয়াভেল প্রদর্শন করিয়াছেন, তাহারও তাঁহারা প্রতিবাদ করেন নাই। কারণ, বুঝিতে বেগ পাইতে হয় না; ভারতের শোষণ-স্বার্থই ইহার মূলে রহিয়াছে। স্যার স্ট্যাফোর্ড ক্রীপস সম্প্রতি বৃটিশ গভর্নমেন্টের ব্যবসা-বাণিজ্য বিভাগের ভার পাইয়াছেন। ভারতের বাজারে বৃটিশ বাণিজ্যের সম্প্রসারণে শ্রমিক দলের প্রত্যক্ষ স্বার্থ রহিয়াছে; ভারতবাসীদের হাতে ভারতের অর্থনীতিক পূর্ণ কর্তৃত্ব প্রদান করিবার মত ঔদার্য প্রদর্শন করিবার অবসর সত্যই তিনি কতটা লাভ করিবেন, এ সম্বন্ধে আমাদের মনে সম্পূর্ণই সন্দেহ রহিয়াছে। প্রকৃতপক্ষে ফাঁকা কথার চাল-বাজীতে ভারতবাসীরা আর প্রবঞ্চিত হইবে না; বৃটিশ শ্রমিক মন্ত্রিমণ্ডল কার্যত ভারতের দাবীর মর্যাদা কতটা রক্ষা করেন, বা করিতে পারেন, তদ্দ্বারাই ভারতবাসীরা তাঁহাদের বিচার করিবে। এক্ষেত্রে মিঃ পেথিক লরেন্স বা হেণ্ডারসনের নিয়োগের মধ্যে আমাদের মনে কোন মোহই নাই।

শরৎচন্দ্রের স্বাস্থ্য

গত ১৬ই মে শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র বসুর স্বাস্থ্য সম্বন্ধে উদ্বেগ প্রকাশ করিয়া কলিকাতা কর্পোরেশনের সভায় শরৎচন্দ্রের মুক্তির দাবী করিয়া একটি প্রস্তাব গৃহীত হয়। তাহার উত্তরে ভারত সরকার বাঙলা সরকারের মারফতে কর্পোরেশনকে জানাইয়াছেন যে, বসু মহাশয়ের গুরুতর অসুখের সংবাদ সত্য নয়। গত ১৬ই শ্রাবণ কর্পোরেশনের সভায় মেয়র শ্রীযুত দেবেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় মহাশয় বলেন যে, তাঁহারা জানিতে পারিয়াছেন, (১) গত ১৯৪২ সালের এপ্রিল মাস হইতে শরৎচন্দ্রের প্রত্যহ জ্বর হইতেছে; (২) তাঁহার ওজন যথেষ্ট হ্রাস পাইয়াছে; (৩) তাঁহার দৃষ্টিশক্তি ক্রমেই হ্রাস পাইতেছে; আশঙ্কা হইতেছে, তাঁহার দৃষ্টিশক্তি একেবারে নষ্ট হইয়া যাইতে পারে; (৪) নিয়মিতভাবে ইনস্যুলিন ইঞ্জেকশন ও পথ্য নিয়ন্ত্রণ সত্ত্বেও বহুমূত্রের পীড়া হ্রাস পাইতেছে না; (৫) তাঁহার সমস্ত দাঁত তুলিয়া ফেলিতে হইয়াছে। মেয়র মহাশয় বলিয়াছেন তাঁহার এই খবর পাকা খবর। এ সম্বন্ধে গভর্নমেণ্টের ধারণা কি আমরা জানি না। গভর্নমেণ্ট কি বলিতে চান যে, এসব খবর মিথ্যা? অথবা এগুলি সত্য হইলেও শরৎচন্দ্রের অসুখ গুরুতর নয়? কর্পোরেশন ভারত গভর্নমেণ্টের জবাবের সঙ্গত প্রত্যুত্তর দিয়াছেন। তাঁহারা সরকারকে জানাইয়াছেন যে, মেয়র কর্তৃক প্রকাশিত তথ্যের পরেও গভর্নমেণ্ট শরৎচন্দ্রের অসুস্থতা গুরুতর বলিয়া মনে করেন কিনা, যদি তাঁহারা তাহা না করেন, তাহা হইলে কয়েকজন বিশেষজ্ঞ দ্বারা শরৎচন্দ্রের স্বাস্থ্য পরীক্ষা করাইয়া তাঁহাদের উক্তির যাথার্থ্য প্রমাণ করা আবশ্যক। শ্রমিক দল বর্তমানে বৃটিশ শাসন-নীতির পরিচালক। তাঁহারা আমাদিগকে হাতে হাতে স্বর্গে তুলিবেন, এমন ধরণের অনেক কথা শুনিতেছি। কিন্তু বিনা বিচারে নির্যাতিত ভারতের জনবরেণ্য নেতার সম্বন্ধে তাঁহারা কি ব্যবস্থা অবলম্বন করেন, আমরা তাহাই দেখিবার অপেক্ষায় থাকিলাম। ভারতের স্বাধীনতার কথা—সে তো অনেক দূরের প্রশ্ন। ভারতের স্বদেশপ্রেমিক সন্তানগণের নির্যাতনজনিত এই বেদনা ভারতবাসীদের অন্তর হইতে দূর করিবার জন্য নিতান্ত সাধারণ মানবতার প্রবৃত্তিও আজ যদি তাঁহাদের অন্তরে সাড়া না দেয়, তবে ভারতের পুঞ্জীভূত বিক্ষোভের প্রতিক্রিয়া বিলাতের শ্রমিক দল শুধু প্রতিশ্রুতির কৌশলে এড়াইতে পারিবেন না, ইহা তাঁহারা জানিয়া রাখুন। আশ্চর্যের বিষয় এই যে, রাজনীতিক সমস্যা সমাধানের সার্বভৌম এবং সাধারণ ঔদার্যটুকুও তাঁহারা এ পর্যন্ত সাহসের সহিত প্রদর্শন করিতে সমর্থ হইতেছেন না। শ্রমিক দল বিলাতের মন্ত্রিমণ্ডলে কর্তৃত্ব লাভ করিবার পরও বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে রাজনীতিক বন্দীদের মুক্তির কথাই শুনিতেছি; ব্যাপকভাবে সকল রাজনীতিক বন্দীর মুক্তির দাবী এড়াইয়া চলিবার চেষ্টা হইতেছে এবং কার্যত শরৎচন্দ্রের ন্যায় বিনা বিচারে বন্দীভূত ভারতের সর্বজনমান্য জননায়ককে তাঁহার স্বাস্থ্যভঙ্গ হওয়া সত্ত্বেও আটক রাখিয়া আমলাতান্ত্রিক সংস্কারের কাছে মানবতার বিচারকে নিতান্ত নির্মম ভাবে বিসর্জনই দেওয়া হইতেছে।

কাপড়ের ব্যবস্থা

বাঙলার বস্ত্র-ব্যবস্থা সম্বন্ধে আলোচনা করিবার জন্য ভারত গভর্নমেণ্টের পক্ষ হইতে স্যার আকবর হায়দরী এবং এম কে ভেলোদি সম্প্রতি কলিকাতায় আগমন করিয়াছিলেন। আমরা দেখিলাম, বাঙলা সরকার এ সম্বন্ধে যে পরিকল্পনা করিয়াছিলেন, তাঁহারা তাহা পাল্টাইয়া দিয়াছেন। বাঙলা সরকারের বস্ত্র-বণ্টন ব্যবস্থা যে সুনিয়ন্ত্রিত হয় নাই, সরকারের কর্তৃত্বে পরিচালিত ব্যবস্থার মধ্যে যে দুর্নীতি চলিয়াছে এবং কাপড় প্রকাশ্য বাজার হইতে চোরাবাজারে অদৃশ্য হইয়াছে, এ সম্বন্ধে তাঁহাদের অভিমত সুস্পষ্ট। তাঁহাদের পরামর্শ অনুসারে বস্ত্র সিণ্ডিকেটের পরিবর্তে বাঙলা দেশের বিভিন্ন কেন্দ্রে বস্ত্র-বণ্টন করিবার জন্য একটি সমিতি গঠিত হইবে। এই কমিটিতে এবং ইহার পরিচালক সভায় কলিকাতার সর্ব-সম্প্রদায়ের বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ এবং বিভিন্ন বণিক সভা-সমূহের প্রতিনিধিগণ থাকিবেন। এই সমিতি কাহাদিগকে লইয়া গঠিত হইবে এ পর্যন্ত তাহা জানিতে পারা যায় নাই। এই সব ব্যক্তির নাম যে পর্যন্ত না জানা যাইতেছে, সে পর্যন্ত এ সম্বন্ধে কোনরূপ মন্তব্য করা সমীচীন হইবে বলিয়া আমরা মনে করি না। দুঃখের বিষয় এই যে, কর্তৃপক্ষ এই সমিতি গঠনে কিংবা ইহার প্রতিনিধি-নির্বাচনে দেশবাসীকে কোনরূপ অধিকার প্রদান করেন নাই; তাঁহারা নিজেরাই নিজেদের মতে চলিতেছেন। দেশের জনমতকে উপেক্ষা করিয়া দেশব্যাপী এত বড় সমস্যার কিভাবে সমাধান সম্ভব হইবে এবং তৎসম্পর্কিত ব্যবস্থা সুনিয়ন্ত্রিত হইবে, এ সম্বন্ধে আমাদের মনে এখনও গভীর সন্দেহ রহিয়াছে। ইহা ছাড়া, ব্যবস্থার গোড়ায় দেখিতেছি, এখনও গলদ রহিয়াছে। বাঙলার জন্য বরাদ্দ কাপড়ের পরিমাণ বাড়ানো হইবে, স্যার আকবর হায়দরী কিংবা মিঃ ভেলোদি সে ভরসা আমাদিগকে দিতে পারেন নাই। বাঙলা দেশকে বস্ত্রের জন্য ভারতের অন্যান্য প্রদেশের উপর নির্ভর করিতে হয়; সুতরাং বস্ত্রের বরাদ্দ সম্পর্কে বাঙলার প্রতি অবিচার বাঙালীকে মানিয়া লইতে হইবে নতুবা অন্য প্রদেশ চটিয়া উঠিবে; এমন যুক্তির মূলে কোন সঙ্গতি থাকিতে পারে না। স্যার আকবর এই ভরসা দিয়াছেন যে, বস্ত্রের পূর্ণাঙ্গ রেশনিং প্রবর্তনে সাহায্য করিবার জন্য বাঙলা দেশকে ১০,৫০০ বেল অতিরিক্ত বস্ত্র সরবরাহ করা হইবে; কিন্তু স্থায়ী ভাবে সমস্যার ইহাতে সমাধান হইতে পারে না। ইঁহাদের প্রস্তাবনায় আরও দেখিতেছি, কলিকাতা এবং তন্নিকটবর্তী অঞ্চলের জন্য মাথাপিছু ২০ গজ কাপড় দেওয়া হইবে। কিন্তু গোটা প্রদেশের জন্য মাথাপিছু দশ গজ হিসাব করিয়া দিয়া কলিকাতার অধিবাসীদের জন্য মাথাপিছু এই কুড়ি গজ কাপড় অর্থাৎ অতিরিক্ত দশ গজ ইহা আসিবে কোথা হইতে? কর্তাদের হিসাবের ধারা দেখিয়া ইহাই বুঝিতে হয়, মফঃস্বলের বরাদ্দ হইতে কাটিয়া লইয়াই কলিকাতা ও তন্নিকটবর্তী অঞ্চলের জন্য এই কাপড়ের ব্যবস্থা হইবে। মাথাপিছু দশ গজ কাপড়ে কিরূপে বস্ত্রের অভাব মিটিবে, ইহাই সমস্যা; এরূপ অবস্থায় কলিকাতাবাসীদের সুবিধার দায়ে মফঃস্বল নরনারীরা সেই দশ গজ কাপড়ও যদি পুরোপুরি না পায়, তবে তাহাদের অবস্থা কি দাঁড়াইবে, সহজেই বুঝিতে পারা যায়। কিন্তু আমাদের পক্ষে ইহা বোঝা সহজ হইলেও ভারত সরকারের কর্তৃপক্ষ তাহা বুঝিতে পারেন বলিয়া মনে হয় না; তাঁহারা সম্ভবত ইহাই ধরিয়া লইয়াছেন যে, বাঙলার মফঃস্বলের নরনারী অর্ধনগ্ন থাকিলেও তাহাতে বিশেষ কিছু আসিয়া যায় না; শহর কলিকাতাকে কোন রকমে ঠাণ্ডা রাখিতে পারিলেই তাঁহাদের কর্তব্য প্রতিপালিত হইল। ইহার পর নূতন ব্যবস্থা অনুযায়ী বস্ত্রের এই পূর্ণ রেশনিং যে কবে প্রবর্তিত হইবে, সে সম্বন্ধে সরকার হইতে এখন সুস্পষ্টভাবে কোন কথা জানা যাইতেছে না। কলিকাতা কর্পোরেশনের একখানি চিঠির উত্তরে রেশনিং বিভাগের কর্তৃপক্ষ সম্প্রতি জানাইয়াছেন যে, আগামী ৩রা সেপ্টেম্বর হইতে কলিকাতায় পূর্ণাঙ্গ বস্ত্র-রেশনিং প্রবর্তিত হইবে; যদি ইহা সত্য হয়, সেক্ষেত্রেও এই প্রশ্ন থাকে যে, কলিকাতা শহরই বাঙলা দেশ নয়। বস্ত্রের অভাবে বাঙলার মফঃস্বলে মেয়েরা আত্মহত্যা করিতেছে। ইঁহাদের এই নিদারুণ দুর্গতি কত দিনে দূর হইবে? এই প্রসঙ্গে ইহাও উল্লেখযোগ্য যে, হিন্দু এবং মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের দুইটি পর্ব ঈদ এবং দুর্গোৎসব নিকটবর্তী হইয়া আসিতেছে। কলিকাতায় ৩রা সেপ্টেম্বর পূর্ণাঙ্গ বস্ত্র-রেশনিং প্রবর্তিত হইলেও বাঙলা দেশের বিপুল জনসাধারণ বৎসরের সর্বপ্রধান দুইটি পর্বে বস্ত্রের অভাবে ক্লিষ্ট থাকিবে। ছেলেমেয়েদের জন্য বস্ত্রখণ্ডও জুটিবে না। পরাধীন জাতির এই বিপুল বেদনা আর কত দিন নির্জীব ব্যর্থতায়

র্যবসিত থাকিবে এবং পদাধিকারী শাসক-দর ঔদাসীন্য এমনভাবে প্রশ্রয় পাইবে, ামরা শুধু এই কথাই চিন্তা করিতেছি।

হীদ দিবস ও এলাহাদে দমননীতি

স্বাধীনতা সপ্তাহ পালন সম্পর্কে মন-নীতি প্রয়োগের জন্য এলাহাবাদের ্যাজিস্ট্রেটের তোড়জোড় সম্পর্কে গতবার ামরা আলোচনা করিয়াছি। তাঁহার পরবর্তী ার্যকলাপ সুস্পষ্টরূপে প্রমাণিত করিয়া য়াছে যে, তিনি স্বাধীনতা দিবস ালন অনুষ্ঠানে বাধাদান করিতে ্ধপরিকর হইয়াছেন। তাঁহার নিষেধাজ্ঞা নুসারে ৭২ ঘণ্টা পূর্বে নোটিশ দিয়া এলাহাবাদ পোস্ট অফিসের তুষ্পার্শ্ববর্তী ১০ মাইল ব্যাসার্ধ রিমিত স্থানে কোনরূপ সভা-মিতি ও শোভাযাত্রা করা চলিবে না। নি সিটি কংগ্রেস প্রতিনিধি পরিষদের ভাপতি শ্রীযুক্ত বিশ্বম্ভরনাথ পাণ্ডেকে লয়াছেন,— "গভর্নর-সম্মেলনে এই ্ধান্ত গৃহীত হইয়াছে যে, দেশে কোন ; জনসভা বা শোভাযাত্রা অনুষ্ঠিত হইতে ওয়া হইবে না। স্বাধীনতা সপ্তাহে ান আকারেই শহীদ-দিবস পালন করিতে ওয়া হইবে না। কলিকাতা হইতে কংগ্রেস-চাপতি যে সমস্ত নির্দেশ প্রচার করিয়া-ন, কেবলমাত্র তদনুসারেই স্বাধীনতা তাহ পালনের অনুমতি দেওয়া যাইতে রে।" গভর্নর-সম্মেলনে যে সমস্ত বিষয় লোচিত, এবং যে সমস্ত সিদ্ধান্ত হীত হইয়াছে, তাহার একটির বিষয় ্শেষে অবগত হওয়া গেল। লর্ড াভেলের উদ্যোগে অনুষ্ঠিত গভর্নর-সম্মেলন সম্পর্কে হারা আশাবাদী ছিলেন, তাঁহারা ম্মলনে গৃহীত এই সিদ্ধান্ত হইতে ঝিতে পারিবেন, দেশের শাসনযন্ত্র রও কঠোরভাবে কিরূপে পরিচালিত রতে পারা যায়, এই সম্মেলনে তাহাই রীকৃত হইয়াছে। বিলাতের শ্রমিক ন্মেন্টের ভারতের প্রতি ইহাই বোধ প্রথম উপহার। ভারত-শাসনে ব্যক্তিগত ধীনতার প্রতি তাঁহাদের মর্যাদাবুদ্ধির নই সূচনা। কিন্তু এই প্রসঙ্গে াদের বক্তব্য এই যে, গভর্নর-মলনে যদি জনসভা ও শোভাযাত্রা ার্কে এইরূপ সিদ্ধান্তই করা হইয়া ক, তবে তদনুসারে সর্বপ্রথমে যুক্ত-শের কর্তৃপক্ষই উৎসাহী হইয়া উঠিলেন ।? অন্যান্য প্রদেশের শাসকদের ৎসম্পর্কে তুষ্ণীম্ভাব অবলম্বন করিবার ণ কি? এলাহাবাদের জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের একটি কথা আমাদের কাছে দুর্বোধ্য বলিয়া বোধ হইতেছে। তিনি স্বাধীনতা সপ্তাহ পালন সম্পর্কে শ্রীযুক্ত বিশ্বম্ভর নাথ পাণ্ডের নিকট বলিয়াছেন—কলিকাতা হইতে রাষ্ট্রপতি কর্তৃক নির্দেশিত উপায়ে স্বাধীনতা সপ্তাহ পালনে তাঁহার আপত্তি নাই, কিন্তু কোন আকারেই শহীদ দিবস পালন করিতে দেওয়া হইবে না। গত ২৪শে জুলাই রাষ্ট্রপতি আজাদ কলিকাতা হইতে যে সমস্ত নির্দেশ প্রচার করিয়াছেন, তাহাতে বলা হইয়াছে—"যাঁহারা আত্মাহুতি দিয়াছেন, কোলাহলপূর্ণ অনুষ্ঠান ও সস্তা বুলির দ্বারা তাঁহাদের স্মৃতির অপমান করা হয়। সুতরাং এক্ষেত্রে সেগুলি বর্জনীয়।" রাষ্ট্রপতির এই নির্দেশে আগস্ট আন্দোলনের শহীদগণের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করাই আগস্ট সপ্তাহের মুখ্য লক্ষ্য-স্বরূপে নির্দিষ্ট হইয়াছে এবং সমগ্র অনুষ্ঠানের মধ্যে এই শহীদগণের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদনই যে মূল কথা ইহাও স্পষ্ট রহিয়াছে। এরূপ ক্ষেত্রে এলাহাবাদের জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের, রাষ্ট্রপতির নির্দেশ অনুসারে স্বাধীনতা সপ্তাহ পালন করিতে দেওয়া এবং কোন আকারেই শহীদ দিবস পালন করিতে দেওয়া হইবে না এই উক্তির তাৎপর্য কি? তিনি রাষ্ট্রপতি আজাদের নির্দেশের কিরূপ ভাষ্য করিয়াছেন, তাহা আমরা স্থূল বুদ্ধিতে বুঝিতে পারিতেছি না। রাষ্ট্রপতি এতৎসম্পর্কে সর্ববিধ উচ্ছ্বাস পরিহার করিতে এবং "সুসংবদ্ধ বাক্য-সমষ্টির সাহায্যে" মনোভাব ব্যক্ত করিতে বলিয়াছেন। নিষেধাজ্ঞা প্রচার না করিয়া এলাহাবাদের জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের দেখা উচিত ছিল রাষ্ট্রপতির নির্দেশ অনুসারে সহীদ দিবস তথা স্বাধীনতা সপ্তাহ পালন উপলক্ষে তথাকার জনগণ "সর্ববিধ উচ্ছ্বাস" পরিত্যাগ করিয়া সংযতভাব অবলম্বন করে কি না। কিন্তু তিনি অতখানি ধৈর্য অবলম্বন করিতে পারেন নাই এবং এই অসংযমের ফলেই তিনি ব্যাপকভাবে বিক্ষোভের সৃষ্টি করিয়াছেন। পরে দেখিতেছি, যুক্ত প্রদেশের সর্বত্র এই নিষেধ বিধি সম্প্রসারিত হইয়াছে। উড়িষ্যার গভর্নরও তথায় এ সম্পর্কে সভাসমিতি ও শোভাযাত্রা নিষিদ্ধ করিয়া যুক্তপ্রদেশের গভর্নরের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করিয়াছেন। কংগ্রেস ও দেশের জনগণ নিশ্চয়ই বিরোধের পথ পরিত্যাগ করিয়া শান্তি-পূর্ণভাবে স্বাধীনতা সপ্তাহ পালন করিতে চাহিয়াছিলেন। কিন্তু শাসকগণ অনর্থক এ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করিয়া তিক্ততার কারণ সৃষ্টি করিতেছেন; এরূপ ক্ষেত্রে যদি অশান্তিজনক কোন ব্যাপার ঘটে, তবে তাহার দায়িত্ব কর্তৃপক্ষের, জনগণের নহে, আমরা পূর্বাহ্নেই এতৎ-সম্পর্কে সাবধানবাণী উচ্চারণ করিয়াছি।

প্রাণদণ্ডাদেশের বিরুদ্ধে

অস্তি-চিমুর ও আগস্ট হাঙ্গামা সম্পর্কে প্রাণদণ্ডাজ্ঞাপ্রাপ্ত হতভাগ্য ব্যক্তি-গণের প্রাণদণ্ড মকুবের জন্য দেশব্যাপী আন্দোলন হইয়াছে এবং তাঁহাদের প্রাণ-ভিক্ষা করা হইয়াছে। মহাত্মা গান্ধী এতৎসম্পর্কে হস্তক্ষেপ করিয়াছিলেন। কিন্তু সম্প্রতি তিনি এসম্বন্ধে যে উক্তি করিয়াছেন, তাহা হইতে অনুমিত হয়, তাঁহার চেষ্টা সফল হয় নাই। তিনি বলিয়া-ছেন—"তাহাদের জীবনরক্ষার জন্য মানুষের সমস্ত চেষ্টাই ব্যর্থ হইয়াছে। অবশিষ্ট সবই এখন ভগবানের হাত।" মহাত্মা গান্ধীর অনুরোধ ও সমগ্র ভারতের জনগণের দ্বারা প্রাণভিক্ষার্থ সমবেত আবেদন সত্ত্বেও যদি অস্তি-চিমুর ও আগস্ট হাঙ্গামা সম্পর্কিত অন্যান্য প্রাণদণ্ডাজ্ঞা-প্রাপ্ত ব্যক্তিগণের প্রাণদণ্ড দান করা হয় তবে তাহা ভারতের রাজনীতিক সমস্যা সমাধানে অনুকূল আবহাওয়া সৃষ্টির জন্য শ্রমিক গভর্নমেণ্টের সদিচ্ছার পরিচায়ক হইবে না। বিশেষত এই সমস্ত চরম দণ্ডে দণ্ডিত ব্যক্তিগণ সাধারণ হত্যাকারী বা তদনুরূপ অপরাধে অপরাধী নহে। স্বদেশের স্বাধীনতার আদর্শ সাধনে ইহাদের অন্তরের উগ্রতা অস্বাভাবিক একটা আবেগ ও উত্তেজনার মধ্যে সাময়িকভাবে ইহাদের ভাবপ্রবণ তরুণ চিত্তবৃত্তির স্বাভাবিক স্থৈর্যকে বিপর্যস্ত করিয়াছিল। আমলাতন্ত্রের ব্যাপক দমনমূলক কার্যের ফলে আগস্ট হাঙ্গামা স্বতঃস্ফূর্ত হইয়া উঠিয়াছিল। এই ঘটনার পরিবেশরূপে তাহাও বিচার করা কর্তব্য। আইনের মর্যাদা রক্ষার জন্য অন্য কঠোর দণ্ডেরও ব্যবস্থা রহিয়াছে। কেবল প্রাণের পরিবর্তে প্রাণ গ্রহণ করিলেই যে তাহার ফল শুভ হয়, ইতিহাস কখনও এরূপ সাক্ষ্য প্রদান করে না; বরং এতৎ-সম্পর্কে গভর্নমেণ্ট উদারনীতি অবলম্বন করিয়া এই সমস্ত হতভাগ্য ব্যক্তির জীবন রক্ষা করিলেই তাহা শাসক ও শাসিতের মধ্যে সৌহার্দপূর্ণ আবহাওয়া সৃষ্টির সহায়ক হইত। আমরা শেষ মুহূর্তেও নবপ্রতিষ্ঠিত শ্রমিক গভর্নমেণ্টকে এতৎসম্পর্কে পুনরায় উদার-ভাবে বিবেচনা করিয়া দেখিতে অনুরোধ করিতেছি।

২২শে শ্রাবণ

গত ২২শে শ্রাবণ রবীন্দ্রনাথের মৃত্যু-বার্ষিকী অনুষ্ঠিত হইয়া গিয়াছে। এদেশে সাধকগণের দৃষ্টিতে কবি যিনি তাঁহার মৃত্যু নাই। কবি ছন্দোময় এবং চিন্ময় জীবনে আনন্দলোকে বিরাজ করিয়া থাকেন এবং তাঁহার প্রাণবল বিশ্ববাসীর অন্তরকে রূপে রসে বর্ণে গন্ধে দিব্য-চেতনায় অনুপ্রাণিত করে। রবীন্দ্রনাথের জীবন প্রাণময় এবং জাতির অন্তরে সে প্রাণবল অক্ষয় শক্তিই সঞ্চার করিয়াছে; সুতরাং মৃত্যু তাঁহাকে স্পর্শ করিতে পারে না। তাঁহার প্রাণ-রসোজ্জ্বল অবদান কালকে অতিক্রম করিয়া অনির্বাণ জীবনের মহিমায় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।

এ সবই সত্য; কিন্তু তথাপি আমরা বাঙালী, আমরা রবীন্দ্রনাথের মর্ত-জীবনকে বিস্মৃত হইতে পারি না। প্রত্যক্ষ এবং বাস্তব জীবনের পরিবর্তনশীলতার অন্তরালে অপরিবর্তনীয় সনাতন যে সত্য রহিয়াছে, তাহার প্রজ্ঞান-ঘন মনন সম্বন্ধে আমরা সকল সময়ে সচেতন নহি; বস্তু-বিচারের পরপারে প্রাণ-মহিমার চেতনা সব সময় আমাদিগকে সান্ত্বনা দিতে পারে না। সুতরাং ২২শে শ্রাবণের স্মৃতি আমাদিগকে বিচলিত করে, এবং বুদ্ধির বিচারকে অতিক্রম করিয়া কবির বিয়োগ-ব্যথা অবিতর্ক উচ্ছ্বাসে আমাদিগকে আকুল করিয়া তোলে। এই দিনের আকাশ-বাতাস আমাদের মনে নৈরাশ্যের সঞ্চার করে এবং বর্তমানের প্রতিবেশ-প্রভাব এই অভাববোধকে সমধিক উগ্র করিয়া দেয়।

যদিও আমরা জানি কবির এই মৃত্যু তাঁহার জড়দেহের মৃত্যু, তাঁহার ভাবময় চিন্ময় দেহের মৃত্যু নাই; যে চির অক্ষয় প্রাণময় অবদানে তিনি জাতির হৃদয়কে অনুপ্রাণিত অমৃত-নিষিক্ত করিয়া গিয়াছেন, তাহা অবিনশ্বর, তথাপি আমরা সাধারণ মানুষ তাঁহার শোক-স্মৃতিতে অভিভূত হইয়া অশ্রু বিসর্জন না করিয়া পারি না।

আমরা কবিগুরুর অলোকসম্ভব সাহিত্যপ্রতিভার ক্ষেত্রে ভূমিষ্ঠ হইয়াছি। কেবল সাহিত্য-রীতি, ভাষার প্রকাশভঙ্গিই নহে, আমাদের মুখের ভাষার আধুনিক সুষ্ঠুরূপও দান করিয়াছেন তিনি। সাহিত্য, সংস্কৃতি, সংগীত ইত্যাদি জাতির বৃহত্তর ও মহত্তর জীবনের সর্বক্ষেত্রে তাঁহার অভূতপূর্ব সৃজনীশক্তি নবরূপায়ণ ও গতিপথের সন্ধান দিয়াছে। সবলের মদোদ্ধত অত্যাচার ও জাতির ক্লৈব্য-কলুষ-দর্শনে তিনি তাঁহার অমোঘ, উদাত্ত অভয়বাণী উচ্চারণ করিয়াছেন, যাহা জাতির হৃদয়ে কেবল অতীতে ও বর্তমানে নয়, অনাগত অনন্তকাল ধরিয়াও জাতির হৃদয়ে নব নব প্রেরণার সঞ্জীবনী মন্ত্র দান করিবে। তিনি জাতির সাহিত্যিক ও সাংস্কৃতিক ক্ষুদ্রতর সীমারেখাকে বৃহত্তর পরিণতির দিকে, সমগ্র বিশ্বে সম্প্রসারিত করিয়াছেন। এই লোকোত্তর প্রতিভার অধিকারী মহাকবির অযোগ্য দেশবাসী হিসাবে আমরা গর্বিত, ধন্য।

নিদারুণ বেদনায় সমগ্র বাঙলা দেশ আজ অভিভূত। অমানুষিক রাক্ষসী-পিপাসার আগুনে বাঙলার বুক জ্বলিয়া পুড়িয়া ছাই হইয়া যাইতেছে। অপরিসীম গৃধ্নুতার



এমন নির্মম, নিষ্ঠুর এবং নির্লজ্জ লীলা, এমন পাশবিক পেষণ, পীড়নের পাকে দুর্নীতির দুর্নিবার তাণ্ডব—বাঙলা দেশ কোন দিন প্রত্যক্ষ করে নাই। পশুবলের কাছে মনুষ্যত্ব আজ পীড়িত এবং নির্জিত; জাতির প্রাণবল পরাভূত। ইহার বিরুদ্ধে দাঁড়াইবার কেহ নাই, কথা বলিবার কেহ নাই; মনুষ্যত্বের মহিমা বজ্রগম্ভীর কণ্ঠে ঘোষণা করিবার কেহ নাই। বাঙলা দেশের দিক-চক্রবাল ঘন অন্ধকারে আচ্ছন্ন হইয়াছে এবং সেই অন্ধকারে মাংসগৃধ্নু শৃগাল ও কুক্কুর দলের কোলাহল চলিতেছে। পদ, মান ও প্রতিষ্ঠার ঘৃণ্য স্বার্থের প্রেরণা ভদ্রবেশী ভণ্ডতার আবরণে সমগ্র জাতির দৈন্যভার বাড়াইয়া চলিয়াছে।

এ অবস্থায় অন্তর স্বভাবতঃই কাঁদিয়া উঠে—কোথায় রবীন্দ্রনাথ? অত্যাচারীর বিরুদ্ধে অগ্নিময়ী বাণী কে শুনাইবে, জাতিকে কে জাগাইবে, আত্মদানের আহ্বানে কে জাতিকে অনুপ্রাণিত করিয়া প্রাণধর্মের উদ্বোধন করিবে? কাহার ব্রহ্মবলের কাছে পশুবল প্রকম্পিত হইবে—প্রাণহীন জাতি ভয়-ভীতি পরিত্যাগ করিয়া আত্মশক্তিকে উপলব্ধি করিবে?

২২শে শ্রাবণের এই বেদনা; কিন্তু এ বেদনায় আমরা অবসন্ন হইব না। কবির জীবনের আদর্শ, জাতির সেবায় তাঁহার ঐকান্তিক অবদান আমাদিগকে অনুপ্রাণিত করিবে। আমরা জাগিব, দুর্নীতিকে দলন করিব। দৈন্য ও দুর্বলতা পরিত্যাগ করিব। দেশ ও জাতির দুঃখ দূর করিব। পরাধীনতার শৃঙ্খল চূর্ণ করিব। আমরা মনুষ্যত্বের সাধনার দুর্গম পথে অগ্রসর হইব। শ্রাবণ রাত্রির বজ্রনাদকে ভয় করিব না। আমাদিগকে যদি বাঁচিতে হয়, মানুষের মতই বাঁচিব এবং মনুষ্যত্বের পরিপূর্ণ মহিমা লইয়া তেমন বাঁচিবার পথে যদি প্রতিকূলতা দেখা দেয়, তবে তাহাকে অতিক্রম করিবার জন্য মানুষের মতই প্রাণ দিব। কবি ঊর্ধ্বলোক হইতে আমাদিগকে আশীর্বাদ করুন, ইহাই আমাদের প্রার্থনা।

দেশের কথা

(১৫ই শ্রাবণ—২১শে শ্রাবণ)

বিলাতে নির্বাচনের পরে—বাঙলা হইতে চাউল রপ্তানী—কংগ্রেসের কার্যপদ্ধতি—মুসলমান কন্‌ফারেন্সের অপচেষ্টা।

বিলাতে নির্বাচনের পরে

বিলাতের পার্লামেণ্টে সদস্য নির্বাচনের ফলে শ্রমিকদল যেভাবে জয়লাভ করিয়াছেন, তাহা তাঁহাদিগেরও কল্পনাতীত ছিল। এখন বলা হইতেছে, গত কয় বৎসরে—বিশেষ যুদ্ধের সময়ে বিলাতে নীরবে—অনেকের অলক্ষ্যে যে পরিবর্তন ঘটিয়াছে, তাহা বিপ্লব ব্যতীত আর কিছুই বলা যায় না। শ্রমিক দলের জয়ের প্রভাব এ দেশে কিরূপ অনুভূত হইবে, তাহা এখন বিবেচনার বিষয়। প্রথমে জানা গিয়াছিল, ভারত আফিস তাড় হইবে এবং ভারতবর্ষ ডোমিনিয়নসমূহে প্রচলিত স্বায়ত্ত-শাসনাধিকার না চাহিলেও, ডোমিনিয়ন আফিসের অধীন হইবে। কে ভারত-সচিব হইবেন, তাহা লইয়াও অনিশ্চয়তা ছিল। পরে জানা গিয়াছে আপাতত মিস্টার পেথিক লরেন্স ভারত-সচিব হইলেন এবং শীঘ্রই ভারত আফিস-ডোমিনিয়ন আফিসের অন্তর্ভুক্ত করিবার জন্য আইন প্রণীত হইবে। (২রা আগস্ট) মিস্টার পেথিক লরেন্স পরিণত বয়স্ক এবং ভারতবর্ষের ব্যাপারে তিনি মনোযোগের প্রমাণ দিয়া আসিয়াছেন।

বিলাতে জনরব (৫ই আগস্ট) বড়লাট লর্ড ওয়াভেল, বোধ হয়, শীঘ্রই বিলাতের মন্ত্রিমণ্ডলের সহিত আলোচনার উদ্দেশ্যে বিলাতে যাইবেন। কারণ, অনেক বিষয়ে ব্যক্তিগত আলোচনা ব্যতীত সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় না। তিনি যে ইতোমধ্যে সকল প্রদেশের গভর্নরদিগকে ডাকিয়াছিলেন এবং তাহার পরে সকল প্রদেশের প্রধান সেক্রেটারীদিগকে দিল্লীতে আলোচনা সভায় আহ্বান করিয়াছেন, তাহাতেও অনুমান করা হইতেছে তিনি বিলাতে যাইয়া আলোচনার জন্য উপকরণ সংগ্রহ করিতেছেন।

শুনা যাইতেছে, যথাসম্ভব শীঘ্র কেন্দ্রে ও প্রদেশসমূহে ব্যবস্থা পরিষদে সদস্য নির্বাচন হইবে। মিস্টার জিন্না যে বলিয়াছেন, ভারতে মুসলিম লীগই মুসলমান সম্প্রদায়ের একমাত্র প্রতিনিধি প্রতিষ্ঠান, তাহা কতদূর সত্য, তাহাও নূতন নির্বাচনে প্রতিপন্ন হইবে।

স্যার স্ট্যাফোর্ড ক্রীপস্ আমেরিকার "ইউনাইটেড প্রেসের" প্রতিনিধিকে জানাইয়াছেন (৪ঠা আগস্ট অর্থাৎ ১৯শে শ্রাবণ) ভারতে লর্ড ওয়াভেল যে প্রস্তাব করিয়াছিলেন, তাহার ফলে যে সদ্ভাবের সৃষ্টি হইয়াছে, সম্যক সদ্ব্যবহারের অভাবে বিলাতের শ্রমিকদল তাহা নষ্ট হইতে দিবেন না; তবে ভারতবর্ষকে কোন অস্থায়ী মীমাংসায় সম্মত হইতে না বলিয়া শ্রমিক সরকার স্থায়ী মীমাংসার জন্য চেষ্টা করিবেন। হয়ত একমাসের মধ্যেই সে চেষ্টা দেখা যাইবে। তাহার পরে—ভারতের ব্যাপার এখন আর একজন মাত্র মন্ত্রীর অর্থাৎ ভারত-সচিবের দ্বারা নির্বাহিত হইবে না—মন্ত্রীরা ভারত সমিতি গঠিত করিবেন। ভারতবর্ষের ব্যাপার ক্রমে ডোমিনিয়ন আফিসের কর্তৃত্বাধীন হইবে; তাহাতে ভারতবর্ষের সহিত বৃটেনের সম্বন্ধের পরিবর্তন ঘটা অনিবার্য। কিন্তু ব্রহ্ম ডোমিনিয়নসমূহে প্রচলিত স্বায়ত্ত-শাসন লাভ না করা পর্যন্ত ব্রহ্ম আফিস ভারত-সচিবের অধীন থাকিবে।

ভারতবর্ষ সম্বন্ধে নূতন মন্ত্রীরা কিভাবে কাজ করিতে অগ্রসর হইয়াছেন, তাহার আভাস নাকি ১৫ই আগস্ট পার্লামেণ্টে রাজার অভিভাষণে পাওয়া যাইবে।

কংগ্রেসের কার্যপদ্ধতি

এখন কংগ্রেসের কার্যপদ্ধতি কি হইবে, সে বিষয়ে অনেকে এদেশের ও বিদেশের বহু লোক গান্ধীজীর নিকট জিজ্ঞাসা করিয়া পত্রাদি প্রেরণ করিয়াছেন। উত্তরে গান্ধীজী গত ৫ই আগস্ট যে বিবৃতি প্রচার করিয়াছেন, তাহাতে তিনি বলিয়াছেন, রাষ্ট্রপতি মৌলানা আবুল কালাম আজাদ ও কংগ্রেসের কার্যকরী সমিতির অন্যান্য সদস্যগণ যখন কারাগারে, তখন, তাঁহাদিগের অনুপস্থিতিকালে, তিনি কংগ্রেসের কার্য-পরিচালন সম্পর্কে যথাবিধি পরামর্শ দিয়াছেন। এখন তাঁহারা মুক্তিলাভ করায় তিনি যদি কোন বিবৃতি প্রদান করিতে হয়, তবে তাঁহাদিগের কাছেই দিবেন। তিনি যদি স্বতন্ত্রভাবে পরামর্শ দেন, তবে তাহাতে যেমন ভুল বুঝিবার সম্ভাবনা থাকিবে, তেমনই তাহা কংগ্রেসের কার্যকরী সমিতির মতের সহিত সামঞ্জস্য-শূন্যও হইতে পারে।

কংগ্রেসের নেতৃগণের মুক্তিলাভের সঙ্গে সঙ্গে কংগ্রেসের প্রতি দেশবাসীর অনুরাগের অনেক পরিচয় প্রকট হইবে। সর্দার বল্লভভাই প্যাটেল অসুস্থ এবং অস্ত্রোপচার না করাইয়া "স্বাভাবিক আরোগ্যলাভ" পদ্ধতিতে চিকিৎসিত হইবেন। তাঁহার আরোগ্যলাভ করিবার জন্য গান্ধীজী পুনায় যাইবেন এবং সেই কারণে তাঁহার বাঙলায় আগমন এখন স্থগিত থাকিবার সম্ভাবনা। কিন্তু সর্দারজী কর্মরত। গত ৫ই আগস্ট তিনি আমেদাবাদে কার্পাস শিল্পের কলের শ্রমিকদিগের এক সভায় বক্তৃতা করেন। সে সভায় যেরূপ লোক সমাগম হইয়াছিল, সেরূপ সচরাচর হয় না। লোকের ভারে একটি ছাদ ভাঙ্গিয়া পড়ায় প্রায় ২৫ জন লোক আহত হয়। বাধ্য হইয়া সর্দার সাহেবকে নির্ধারিত সময়ের এক ঘণ্টা পূর্বেই বক্তৃতা শেষ করিতে হইয়াছিল। ১৯৪২ খৃষ্টাব্দের ৮ই আগস্ট তারিখে কংগ্রেসের নেতৃগণের গ্রেপ্তারের পরেই আমেদাবাদের শ্রমিকগণ যে হরতাল পালন করিয়াছিলেন, সেজন্য তিনি তাঁহাদিগকে অভিনন্দিত করিয়া বলেন, ভারতবর্ষের সকল স্থানে শ্রমিকগণ যদি আমেদাবাদের শ্রমিকদিগের দৃষ্টান্তের অনুকরণ ও অনুসরণ করিতেন, তবে কংগ্রেসের সংগ্রাম সপ্তাহকাল মধ্যেই জয়যুক্ত হইত।

এদিকে পণ্ডিত জওহরলাল জাতীয় পরিকল্পনার কার্যে আবার মনোনিবেশ করিয়াছেন এবং তাঁহার নির্দেশে পরিকল্পনা রচনার কার্য অগ্রসর হইতেছে।

বাঙলা হইতে চাউল রপ্তানী—গত ৩রা আগস্ট কলিকাতা ইউনিভার্সিটি ইনষ্টিটিউটে এক বিরাট জনসভায় বাঙলা হইতে চাউল রপ্তানীর প্রতিবাদ ও বাঙলায় আবার সচিবসঙ্ঘ প্রতিষ্ঠা করার দাবী করা হইয়াছিল। বঙ্গীয় ব্যবস্থা পরিষদের সভাপতি মিস্টার নৌসের আলী সভাপতিরূপে বলেন, গত ২৮শে আগস্ট বাঙলায় সচিব সঙ্ঘের পতন হয় এবং সরকার ভারত শাসন আইনের ৯৩ ধারা জারি করিয়া গভর্নরকে শাসনের সকল অধিকার প্রদান করেন। ৩০শে মার্চ লাটভবন হইতে যে বিবৃতি প্রচারিত হয়, তাহাতে ব্যবস্থা পরিষদের সভাপতির নির্ধারণ (সচিবসঙ্ঘ অনাস্থাজ্ঞাপক প্রস্তাব গৃহীত হইবার পরে আর কাজ চালাইতে পারেন না) সমালোচনা করিবার যে আগ্রহ সপ্রকাশ হইয়াছিল, তাহা অশোভন এবং তাহার পর হইতে এতদিন পুনরায় সচিবসঙ্ঘ গঠন না করা অসঙ্গত।

বাঙলা হইতে চাউল রপ্তানীর প্রবল প্রতিবাদ করা হয়।

গত ৩০শে জুলাই দিল্লী হইতে সংবাদ প্রকাশিত হইয়াছে বাঙলায় এখন

প্রয়োজনাতিরিক্ত পরিমাণ চাউল সঞ্চিত আছে. সুতরাং স্থির হইয়াছে—আগস্ট ও সেপ্টেম্বর মাসে (আশু ধান্য) সংগৃহীত হইলে যুক্তপ্রদেশকে ২৫ হাজার টন চাউল ব্যতীত বিহারকে ১৫ হাজার টন ও মাদ্রাজকে অরও চাউল বাঙলা হইতে প্রদান করা হইবে।

সভায় জিজ্ঞাসা করা হয়, বাঙলায় এবার যখন বৃষ্টির অভাবে আশু ধানের ফসল ভাল হইবে না এবং হৈমন্তিক ধান্যের ফসলও মন্দ হইতে পারে, তখন যে চাউলে বাঙলার অধিকার সর্বপ্রথম তাহাতে তাহাকে বঞ্চিত করা কখনই সমর্থিত হইতে পারে না। যুক্তপ্রদেশে বা বিহারে বা মাদ্রাজে অবস্থা এমন দাঁড়াইয়াছে যে, বাঙলা হইতে চাউল না পাঠাইলে সে সকল প্রদেশে দুর্ভিক্ষ ঘটিবার সম্ভাবনা, এমন কথা শুনা যায় নাই। আর বাঙলায় যদি প্রয়োজনেরও অতিরিক্ত চাউল থাকে, তবে চাউলের সরকার কর্তৃক নির্ধারিত মূল্য এবারও দুর্ভিক্ষের পূর্ববর্তী মূল্যের অন্তত ৩ গুণ কেন? বাঙলার গভর্নর তাঁহার বেতার বক্তৃতায় বলিয়াছিলেন, রপ্তানী না করিলে বাঙলার সঞ্চিত অনেক ধান্য ও চাউল পচিয়া নষ্ট হইবার সম্ভাবনা। যদি তাহাই হয়, তবে যেভাবে সরকারী ব্যবস্থায় ধান্য ও চাউল গুদামে রাখা হইয়াছে, তাহাতে অযোগ্যতারই পরিচয় পাওয়া যায়। মিস্টার কেসী বলিয়াছেন, গুদামজাত ধান্য ও চাউল নষ্ট হইতে পারে। কিন্তু একথা কি সত্য হইতে পারে যে, তাহা নষ্ট হইয়াছে ও হইতেছে? যদি তাহাই হয়, তবে কি যুক্তপ্রদেশ, বিহার ও মাদ্রাজ—যদি তাহারা তাহা মূল্য দিয়া না কিনে, তবে বাঙলা সরকারের যে লোকসান হইবে, তাহার জন্য কে দায়ী হইবে এবং অব্যবস্থার জন্য যাহারা দায়ী, তাহাদিগকে দণ্ড দিবার কোন ব্যবস্থা হইবে কি?

মৌলভী ফজলুল হক দৃঢ়ভাবে বলেন, বাঙলা আবার না খাইয়া মরিবে না—সে চাউল রপ্তানীর বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইবে। কারণ এবার বাঙলা হইতে চাউল রপ্তানী করিলে আবার দুর্ভিক্ষের সম্ভাবনা ঘটিবে। সভায় শ্রীযুক্ত সন্তোষকুমার বসু, মিঃ শামসুদ্দীন আমেদ প্রভৃতিও চাউল রপ্তানীর এবং এখনও সচিবসঙ্ঘ গঠন না করার তীব্র প্রতিবাদ করেন।

সিন্ধুর খুরো প্রভৃতির মুক্তি—সিন্ধু প্রদেশের ভূতপূর্ব রাজস্ব সচিব ও মুসলিম লীগের নেতা খান বাহাদুর খুরো ও আর চারজন হুরদিগের সাহায্যে আল্লাবক্সকে হত্যার ষড়যন্ত্রের অভিযোগে অভিযুক্ত হইয়াছিলেন। গত ৩রা আগস্ট আসামীরা দায়রা জজের বিচারে বেকসুর খালাস পাইয়াছেন। রায়ে জজ বলিয়াছেন—খুরো যে নিরপরাধ, এমন কথা তিনি বলিতে পারেন না—খুরোর সম্বন্ধে যে সন্দেহের অবকাশ নাই, তাহাও বলা যায় না। অর্থাৎ তাহার অপরাধ প্রমাণিত হয় নাই বটে, কিন্তু হত্যাকাণ্ডে তাহার যোগের সন্দেহ হইতে তিনি সম্পূর্ণরূপে মুক্তি পাইতে পারেন না। তাহাকে এ মামলায় চালান দিবার মত প্রমাণ ছিল এবং যদি পুলিশের ইন্সপেক্টার-জেনারেল মিস্টার জি জি রায় তদন্তের কর্তা না থাকিতেন, তবে আসামী খুরোকে ও তাহার ভ্রাতাকে চালান দেওয়া হইত না ইহাই তাঁহার বিশ্বাস। সিন্ধু প্রদেশের রাজস্ব সচিবকে বিচারার্থ চালান দেওয়া সহজ ব্যাপার নহে। আসামীরা যে খালাস পাইয়াছে—সেজন্য পুলিশের কর্মচারীরা দায়ী নহেন।

দুর্ভিক্ষ কমিশনের রিপোর্ট—সংবাদ পাওয়া গিয়াছে, (৪ঠা আগস্ট) দুর্ভিক্ষ কমিশন তাঁহাদিগের রিপোর্টের দ্বিতীয় ভাগ শেষ করিয়া ভারত সরকারের নিকটে প্রেরণ করিয়াছেন। প্রথমভাগে বাঙলার দুর্ভিক্ষ আলোচিত হইয়াছিল। দ্বিতীয় ভাগে খাদ্যদ্রব্য উৎপাদন ও পুষ্টিকর খাদ্য সম্বন্ধে আলোচনা করা হইয়াছে এবং যাহাতে ভবিষ্যতে আর দুর্ভিক্ষ না হইতে পারে, তাহার উপায় নির্ধারণের চেষ্টা করা হইয়াছে।

মুসলমান কনফারেন্সের অপচেষ্টা—গত ১লা আগস্ট (১৬ই শ্রাবণ) কাশ্মীরে যে শোচনীয় ঘটনা ঘটিয়াছে, সে সম্বন্ধে সরকারী বিবৃতিতে প্রকাশ, ঐদিন জাতীয় কনফারেন্সের পক্ষ হইতে কংগ্রেসী নেতা মৌলানা আবুল কালাম আজাদ, খান আবদুল গফুর খান ও পণ্ডিত শ্রীযুত জওহরলাল নেহরুর সম্বর্ধনার্থ জলপথে যে শোভাযাত্রার ব্যবস্থা করা হইয়াছিল, তাহা জিলা ম্যাজিস্ট্রেটের অনুমতি লইয়াই করা হয়। শ্রীনগর নগরের একাংশে মুসলিম কনফারেন্সের স্থানীয় লোকেরা শোভাযাত্রার জাতীয় কনফারেন্স দলের উপর লোষ্ট্র-নিক্ষেপ করে। ফলে উভয় দলের কতকগুলি লোক আহত হয়—জাতীয় দলের একজন আহত হাসপাতালে মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছে। কয়েকজন পুলিশও আহত হইয়াছে।

বাঙলায় বস্ত্র-সমস্যা—বাঙলায় বস্ত্র-সমস্যার সমাধান হয় নাই। স্থির হইয়াছে, কেহ মরিলে—শবের জন্য কুড়ি গজ কাপড় পাওয়া যাইবে, কিন্তু জীবিতাবস্থায় বার গজের অধিক পাইতে পারিবে না। মোট সরবরাহ যে প্রয়োজনের অনুরূপ হইবে, এমন কোন নিশ্চয়তা নাই। কেবল বলা হইয়াছে—দুর্গোৎসবের পূর্বেই পূর্ণাঙ্গ "রেশনিং" ব্যবস্থা হইয়া যাইবে। গত বৎসর এবং তাহারও পূর্ব বৎসর ঠিক এ আশ্বাস দেওয়া হইয়াছিল, দুর্গোৎসবের পূর্বেই সুব্যবস্থা হইয়া যাইবে। ব্যবস্থার পরে ব্যবস্থার পরীক্ষা হইতেছে মাত্র। যেরূপ সূতা দিলে বাঙলার হাতের তাঁতগুলি সচল হইত এবং ফলে কৃষির পরেই যে শিল্পে সর্বাপেক্ষা অধিক লোকের অন্নসংস্থান হইত, সেই শিল্পই চলিত না—সঙ্গে সঙ্গে বাঙলার লোকের বস্ত্রাভাব বহু পরিমাণে দূর করা সম্ভব হইত। হাতের তাঁতের জন্য সূতা প্রদানের নামেও কেবলই অযোগ্যতা ও বিশৃঙ্খলা দেখা যাইতেছে, আর অসাধুতার অভিযোগও পাওয়া যাইতেছে।

স্বাধীনতা সপ্তাহ—এলাহাবাদের জিলা ম্যাজিস্ট্রেট গত ৫ই আগস্ট ভারতরক্ষা নিয়মের ৫৬ ধারার বলে ইস্তাহার জারি করিয়াছেন—৭২ ঘণ্টা অর্থাৎ তিন দিন পূর্বে বিজ্ঞাপিত না করিয়া তথায় কোন সভা বা শোভাযাত্রা হইতে পারিবে না। আগামী ৯ই আগস্ট হইতে ১৫ই আগস্ট এক সপ্তাহকাল স্বাধীনতা সপ্তাহ অনুষ্ঠিত হইবে। প্রকাশ সেই সম্পর্কেই এই আদেশ প্রচারিত হইয়াছে। আরও জনা গিয়াছে, সম্প্রতি দিল্লীতে প্রাদেশিক গভর্নরদিগের যে সম্মিলন হইয়াছিল, তাহাতে স্থির হইয়াছিল—ভারতবর্ষে কোথাও বড় সভা বা শোভাযাত্রা হইতে দেওয়া হইবে না। এলাহাবাদের ম্যাজিস্ট্রেটের আদেশ এলাহাবাদ মিউনিসিপ্যালিটির এলাকায়, গোরাবারিকের হুদ্দায় এবং এলাহাবাদ জেনারেল পোস্ট অফিস হইতে দশ মাইলের মধ্যবর্তী সকল স্থানে প্রযোজ্য।

এই আদেশের বিষয় রাষ্ট্রপতি মৌলানা আবুল কালাম আজাদকে ও পণ্ডিত শ্রীযুত জওহরলাল নেহরুকে জ্ঞাত করান হয়। উত্তরে পণ্ডিতজী তার করিয়াছেন—"আমি আশা করি, স্বাধীনতা সপ্তাহের অনুষ্ঠান গাম্ভীর্য ও ধৈর্য সহকারে এবং ত্যাগের ভাবে উদ্ভাসিত হইলে সর্ববিধ বিরোধ বর্জিত হইবে।"

আশাবরী

শ্রীউপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়

[বহু পূর্বে এই উপন্যাসের প্রথম কয়েকটি পরিচ্ছেদ 'পাথেয়' নামে বঙ্গলক্ষ্মী মাসিক পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছিল। কিন্তু অনিবার্য কারণবশত কয়েক সংখ্যা প্রকাশিত হইয়াই তাহা বন্ধ হইয়া যায়। উক্ত উপন্যাসের কাহিনী পরিকল্পনা পরিবর্তিত হওয়ার জন্য বর্তমান উপন্যাসে নামটি পরিবর্তিত করিবারও প্রয়োজন হইয়াছে। —লেখক]

১

সা**তক্ষীরা** হইতে পূর্বদিকে দৌলতপুরের পথে ক্রোশ তিনেক অগ্রসর হইলে দেখা যায় একটা অপ্রশস্ত কাঁচা রাস্তা উত্তর দিকে চলিয়া গিয়াছে। এই পথ শেষ হইয়াছে কপোতাক্ষ নদের তীরে তিলেশিবানীপুর গ্রামে। পথে তিন-চারটা ক্ষুদ্র গ্রাম ভিন্ন কোনো বড় গ্রাম চোখে পড়ে না। ম্যালেরিয়ার উপদ্রবে শিবানীপুরের বর্তমান অবস্থা যেমন শোচনীয়, সংস্কারের বিষয়ে আগ্রহের অভাবে পথের অবস্থাও তেমনি দুর্দশাগ্রস্ত। অবৃষ্টির দিনে এ পথে গোরুর গাড়ি চলে; কিন্তু বর্ষাকালে গোরুর গাড়ি চলাও দুষ্কর হইয়া উঠে। তখন পাল্কী অথবা পদব্রজ ভিন্ন গমনাগমনের অন্য কোনো উপায় থাকে না।

গ্রামের পূর্বদিকে নদীর ধারে মুখুজ্যেদের ভগ্ন গৃহ; দেখিলে মনে হয় পূর্বে কোনোদিন অবস্থা ভালই ছিল। কিন্তু সে কোনোদিন নিশ্চয়ই বহুদিন পূর্বে; কারণ উপস্থিত বহির্বাটির ঘরগুলি পড়িয়া গিয়া যে বট এবং অশথ গাছের লীলাভূমি হইয়াছে, তাহাদের বর্তমান বাড়-বৃদ্ধি অল্প দিনে হয় নাই, তাহা নিশ্চয়। ভিতর বাটিতে মাত্র দুইখানি পাকা ঘর কোনোপ্রকারে মনুষ্য-বাসোপযোগী আছে; অর্থাৎ এখনো সে দুটিতে কোনোপ্রকারে মানুষ বাস করিতেছে। একটিতে বাস করে বাড়ির বড়বউ ভবতারা এবং অপরটিতে ছোটবউ গিরিবালা। উভয়েই বিধবা। ভবতারা নিঃসন্তান; গিরিবালার একমাত্র সন্তান তাহার আঠার বৎসর বয়সের অনূঢ়া কন্যা শক্তি।

মুখুজ্যে বংশের কোন্ পূর্বপুরুষ কতদিন পূর্বে সর্বপ্রথম শিবানীপুরে আসিয়া বাস আরম্ভ করে, সে ইতিহাস দুষ্প্রাপ্য। কাহার আমলে সংসারে লক্ষ্মীর পদার্পণ হইয়া কোঠা বাড়ি এবং জমিজমা হইয়াছিল, তাহা নির্ণয় করাও সহজ নহে। সে বোধকরি অন্তত সওয়া-শ দেড়-শ বৎসরের কথা হইবে; কিন্তু তাহার পর কমলার কৃপাবর্ষণ বৃদ্ধিও পায় নাই, স্থায়ীও হয় নাই। ক্রমশ ভবতারার স্বামী দুর্গাপদর আমলে অবস্থা এমন দুস্থ হইয়া উঠিল যে, প্রচলিত পূজা-পার্বণ ত একে একে উঠিয়া গেলই, নিত্যকার সাধারণ গ্রাসাচ্ছাদনের কথাটাও সমস্যা হইয়া দাঁড়াইল। দুর্গাপদ ছিল অলস প্রকৃতির লোক, পরিশ্রম এবং কার্যপরতা তাহার ধাতে সহিত না। সে করিত চিন্তা, বড় জোর দুশ্চিন্তা এবং সংসার চালাইবার ব্যবস্থা করিত কর্তাদের আমলের একজন পুরাতন গোমস্তা বরদা। অর্থের যখন প্রয়োজন হইত, তখন বরদা মহকুমার উকিলের নিকট হইতে একটি দলিল মুসাবিদা করাইয়া আনিত, দুর্গাপদ শুধু তাহাতে নিজের নাম সহি করিয়া কনিষ্ঠ ভ্রাতা হরিপদকে দিয়াও সহি করাইয়া লইত। তাহার পর একদিন পড়িত পাল্কী চড়িয়া সাতক্ষীরার রেজেষ্ট্রী অফিসে যাইবার সমারোহ।

এইরূপে সংসার-তরণীর তলদেশ ছিদ্র হইতে হইতে যেদিন তাহা ঋণ-সাগরের গভীর তলে নিমগ্ন হইল, সে দিন আর বরদার সাক্ষাৎ পাওয়া গেল না। শুনা গেল, দেশে বিশেষ কিছু উন্নতি করিতে না পারিয়া সে অদৃষ্ট-পরীক্ষার জন্য বিদেশ যাত্রা করিয়াছে; যাহা কিছু পুঁজি-পাটা ছিল, তাহা লইয়া সে কলিকাতায় গিয়া বাণিজ্য-সাগরে পাড়ি দিবে।

নিরুপায় অবস্থায় দুর্গাপদর সমস্ত রাগটা পড়িল কনিষ্ঠ সহোদর হরিপদর উপর। তাহাকে ডাকাইয়া ভর্ৎসনা করিয়া বলিল, "এতখানি বয়স হ'ল, ব'সে ব'সে অন্ন ধ্বংস করতে লজ্জা করে না? আমি ত' এতদিন শরীরপাত ক'রে সংসার চালালাম, এবার তুমি কিছুদিন চালাও, যা হয় কিছু উপায় কর।"

হরিপদ তাহার দাদার চেয়ে বার-তের বৎসর বয়সে ছোট; তখন তার বয়ক্রম কুড়ি বৎসর। সে দুর্গাপদর কথার কোনো প্রতিবাদ করিল না, মনের মধ্যেও রোষ অথবা অভিমান সঞ্চিত হইতে দিল না। তাহার কর্মঠ তৎপর দেহের মধ্যে নিহিত যে শক্তি এতদিন দাঁড়টানা, সাঁতার কাটা, পথচলা, ক্রীড়া-কসরতে ব্যয়িত হইত, মিথ্যা অপবাদের অঙ্কুশাঘাতে সহসা তাহা কর্মাভিমুখী হইয়া সাড়া দিয়া উঠিল। তখন কার্তিক মাস, দেশে প্রচুর খেজুরে গুড় উৎপন্ন হইতে আরম্ভ করিয়াছে; নববিবাহিতা পত্নী গিরিবালার সহিত পরামর্শের পর কিছু অলংকার বিক্রয় করিয়া হরিপদ সুলভ মূল্যে খেজুরে গুড় ক্রয় করিয়া কলিকাতায় চালান দিতে লাগিল। এই কার্যে সে আহার নিদ্রা ভুলিল, খেলাধুলা পরিত্যাগ করিল, এমন কি নবীনা বধূর সহিত বিশ্রম্ভালাপেরও অবসর রাখিল না। শুধু খরিদ, শুধু বিক্রয়, শুধু হিসাব শুধু পত্র। পরিশ্রমী অযথা-তিরস্কৃত যুবকের কর্মনিষ্ঠায় প্রসন্ন হইয়া কমলা কৃপাদৃষ্টি করিলেন। তিন চার মাস গুড়ের কারবার করিয়া লাভ নিতান্ত মন্দ হইল না। গুড়ের মরশুম উত্তীর্ণ হইলে হরিপদ সংসার খরচের জন্য দুর্গাপদকে কিছু টাকা দিয়া বাকি সমস্ত টাকা লইয়া চাঁদখালীতে গিয়া কলিকাতায় সুঁদরী কাঠ চালান দিতে আরম্ভ করিল। এই ব্যবসায়ে লাভ হইতে লাগিল প্রচুর। নৌকা ভরিয়া ভরিয়া কাঠ চালান হয় কলিকাতায়, সেখান হইতে মনি-অর্ডার ইনসিওর করিয়া দফায় দফায় লাভের টাকা ফিরিয়া আসে। সৌভাগ্যের স্রোত নদী এবং রেলপথে আবর্তিত হইতে লাগিল। তখন দেশে মাল চালান দিবার পাকা বন্দোবস্ত করিয়া তদ্বিষয়ে দুর্গাপদকে নাম মাত্র কর্তা সাজাইয়া হরিপদ কলিকাতায় গিয়া গোলা খুলিয়া বসিল। ব্যবসার উন্নতিমুখে হঠাৎ দৃষ্টি পড়িল চাঁদখালী হইতে ব্রহ্মদেশে, নৌকার পথ হইতে জাহাজের পথে, সুঁদরী কাঠ হইতে সেগুন কাঠে। বড় বড় চালান আসিতে লাগিল সেগুন কাঠের, তাহার অন্তরালে সুঁদরী কাঠের কারবার ক্রমশ লুপ্ত হইয়া গেল। নামধারী চালানদার সাজিয়া দুর্গাপদকে যে যৎসামান্য পরিশ্রম করিতে হইত সে শুধু তাহা হইতে অব্যাহতিই পাইল না, মাসে মাসে নিয়মিত হরিপদর নিকট হইতে সংসার খরচের টাকাও পাইতে লাগিল।

বছর ষোল-সতের ধরিয়া কারবার ভাল ভাবেই চলিল, তাহার পর হঠাৎ একদিন মধ্যরাত্রে অচিন্তিত দুর্দিন আসিয়া উপস্থিত হইল। গোলার নিকট কেরোসিন তৈলের দোকান ছিল, ঘটনাক্রমে তাহাতে আগুন লাগিয়া সমস্ত পল্লীতে একটা

ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডের সৃষ্টি করিল। তিনটি দমকলের দ্বারা সমস্ত রাত্রি নিরবসর পরিশ্রমের পর অগ্নি নির্বাপিত হইলে দেখা গেল হরিপদর কাঠের গোলার সমস্ত সেগুন কাঠ ভস্মে এবং অঙ্গারে পরিণত হইয়াছে। কারবার ইন্সিওর করা ছিল না, প্রায় লক্ষ টাকার সম্পত্তি নষ্ট হইয়া গেল। দিন দুই হরিপদ শয্যা গ্রহণ করিয়া শুইয়া কাটাইল, তাহার পর পাওনাদার এবং মহাজনদের হাতে পায়ে ধরিয়া কারবার চালাইবার একবার চেষ্টা করিল, কিন্তু কোনো ফল হইল না; কাঠের কারবারের সহিত দেহের কারবারও ক্রমশ অচল হইয়া আসিল। অবশেষে সাত আট মাস পরে একদিন কাশীমিত্রের ঘাটে হরিপদর দেহ লইয়াও একটা ছোটোখাটো অগ্নিকাণ্ড হইয়া গেল। তাহার পর কলিকাতার বাড়ি এবং আসবাব-পত্র পাওনাদাররূপী একপাল নেকড়ে বাঘের লালায়িত মুখে ছাড়িয়া দিয়া গিরিবালা নগদ কিছু টাকা এবং দেহচ্যুত অলংকার লইয়া একমাত্র সন্তান শক্তির ডাফ্ স্কুল হইতে নাম কাটাইয়া দেশের বাড়িতে পলাইয়া আসিল।

সে আজ প্রায় চার বৎসরের কথা।

তাহার দুই বৎসর পূর্বে দুর্গাপদর মৃত্যু ঘটিয়াছিল। বিধবা ভবতারা গিরিবালাকে ভালভাবে গ্রহণ করিতে পারিল না। হরিপদর মৃত্যুতে মাসহারার টাকা বন্ধ হইল বুঝিয়া মনের মধ্যে একটা অহেতুক অবুঝ বিরক্তি ত' ছিলই, তাহা ছাড়া গিরিবালার অস্তমিত সৌভাগ্য-রবি যথাকালে ভবতারার অন্তরে যে ঈর্ষানল উৎপন্ন করিয়াছিল, দুঃখের তিমিরাবরিত রাত্রে তাহা রক্তবর্ণ ধারণ করিয়া গিরিবালাকে দহন করিতে আরম্ভ করিল। সমবেদনার স্থলে দেখা দিল প্রচ্ছন্ন পরিতোষ, সান্ত্বনার স্থলে বিদ্রূপাত্মক বচন। গিরিবালা বুঝিল ষোল বৎসর ধরিয়া তাহার স্বামী মাসে মাসে যে টাকা পাঠাইয়া গিয়াছে, উপস্থিত তাহার সুদ আদায় আরম্ভ হইল; ভবিষ্যতে কোনদিন আসল আদায়ের পালা সমারোহ করিয়াই হয়ত' আসিবে। দুর্দিনের অন্ধকারে, কষ্টিপাথরে সোনার মতো, মানুষের খাঁটি মেকির যাচাই হইয়া যায়। গিরিবালা প্রথম দিনই ভবতারার স্বরূপ দেখিতে পাইল।

দ্বিতীয় দিনে একটা ছোটোখাটো বচসার মতই হইয়া গেল। স্নানান্তে শক্তি উঠানের দড়ির আলনায় তাহার শাড়ি এবং সায়া শুকাইতে দিতেছিল, গিরিবালা বারান্দায় বসিয়া কুটনা কুটিতেছিল। ভবতারা শক্তিকে লক্ষ্য করিয়া বলিল, "তোমার ওই ঘাগরা-টাগরাগুলো ও দিকের আলনায় দিয়ো বাছা, এ আলনায় আমার পুজোর কাপড় শুকতে দিই কি-না।"

ভবতারার প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া শান্ত স্বরে শক্তি বলিল, "এ আমি ভাল ক'রে কেচে এনেছি জেঠাইমা।"

মাথা নাড়িয়া ভবতারা বলিল, "কাচলেই কি ওসব জিনিস শুদ্ধু হয়? ওর ময়লা ওতে লেগেই থাকে। আমার কথা শোন, ওটা ওদিকের আলনায় দিয়ে এস।" কথার শেষ দিকটায় একটু উত্তাপ প্রকাশ পাইল।

আর কোনো আপত্তি না করিয়া শক্তি শাড়ি এবং সায়া তুলিয়া লইয়া গিয়া দুইটা পেয়ারাগাছের ডালে একটা ছোট অপরিচ্ছন্ন দড়ি খাটানো ছিল, তাহাতে মেলিয়া দিল। উপস্থিত ত' সেখানে বিন্দুমাত্র রৌদ্র নাই, কতক্ষণে আসিবে তাহাও বলা কঠিন।

গিরিবালার দিকে চাহিয়া ভবতারা বলিল, "তাই ভাবছিলাম ছোটবউ, তুমি ত' জোর ক'রে বনবাদাড়ে বাস করতে এলে,—কিন্তু শেষ পর্যন্ত পেরে উঠবে ব'লে ত মনে হয় না।"

বিষণ্ণ বদনে তরকারি কোটার উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখিয়া গিরিবালা বলিল, "তা পারব না কেন দিদি, তা পারব। কলকাতায় অত বড় বিপদ হ'য়ে গেল তা সহ্য করতে পারলাম, আর এখানকার বনবাদাড় সহ্য করতে পারব না! তবে বাড়ির যা দুরবস্থা, মেয়েটার হয়ত' কষ্ট হবে। ও ত' জন্মাবধি এ পর্যন্ত দুঃখের মুখ দেখেনি, ওর জন্যেই ভাবনা।"

ভবতারার উপস্থিতিতে এ কথার প্রতিবাদ করিতে শক্তির প্রবৃত্তি হইল না। মনে মনে বলিল, এ তোমার অন্তরের কথা নয় মা, এ তোমার দুঃখের কথা। তা যদি না হয়, তা হ'লে তোমার মেয়েকে আজ পর্যন্ত তুমি চেনোনি।

মুখখানা কয়লার মতো কালো করিয়া ভবতারা বলিল, "বাড়ির দুরবস্থা হবে না কেন ছোটবউ? ঠাকুরপো মারা গেছেন, তাঁর কথা এখন না বলাই ভাল, তিনি যদি সমস্ত টাকা কলকাতায় আটকে ফেলেন ত' এখানকার সম্পত্তি থাকে কি ক'রে?

কুটনা কোটা বন্ধ রাখিয়া গিরিবালা সবিস্ময়ে বলিল, "সে কি কথা দিদি? তিনি ত' প্রতিমাসে বড়ঠাকুরকে সংসার খরচ পাঠিয়েছেন। তা ছাড়া, বড়ঠাকুর যখন যা লিখে পাঠাতেন তিনি পাঠিয়ে দিতেন।"

উত্তপ্ত কণ্ঠে ভবতারা বলিল, "সেই ত' হ'ল অবিচার! সেই পাপেই ত' সমস্ত জ্বলে পুড়ে গেল। রইল কি কিছু? এজমালি টাকার কারবার—তোমার ভাশুর ছিলেন কারবারের কর্তা—আর ঠাকুরপো সমস্ত টাকাটি নিজের কাছে রেখে পাঠাতে লাগলেন সংসার খরচ! উচিত ছিল, সমস্ত টাকা এখানে পাঠিয়ে সংসার খরচ চেয়ে নেওয়া।"

শুনিয়া গিরিবালার বিস্ময়ের পরিসীমা রহিল না। বলিল, "সে কি কথা দিদি! এজমালি টাকার কারবার কি বলছ? উনি ত' কারবারে সংসারের একটি পয়সাও লাগাননি,—সমস্তই ত' হয়েছিল আমার গয়না বিক্রী করে।"

ভবতারা তর্জন করিয়া উঠিল, "বাজে কথা ব'কো না ছোটবউ! গয়না তোমারই ছিল, আর আমার ছিল না! উনি ধার্মিক লোক ছিলেন, সগ্গে গেছেন, উনি না হ'য়ে আর কেউ যদি হোত তা হ'লে তোমাদের যা-কিছু সমস্ত কেড়ে নিত। বরদা গোমস্তাকে মনে আছে ত? সে একেবারে জেলাকোর্টের উকিলের পরামর্শ নিয়ে এসে বল্লে, 'বড়বাবু, উকিলরা বলছে যে, আপনি একবার নালিশ করলেই সঙ্গে সঙ্গে জিত, কলকাতার বাড়ির আর সমস্ত টাকার মালিক আপনি হবেন।' উনি জিভ্ কেটে বললেন, 'বাপরে! তা কি আমি কখনো পারি! হরি আমার মার পেটের ভাই সে খাচ্ছে আমারই পেট ভরছে। আমি সন্নেসী-বৈরিগী মানুষ, যা আছে আমার তাই যথেষ্ট।' বরদা কি সহজে ছাড়তে চায়? বলে, 'আপনার বিশেষ কিছু খরচ করতে হবে না বড়বাবু, নালিশ দায়ের করলেই ছোটবাবু আপনি দৌড়ে এসে পড়বে।' তা উনি রাজি হ'লেন না। মাথা নেড়ে বললেন, 'রামচন্দোর! ছোটো ভাই পুত্তুর সমান!'

এত দুঃখের উপরও গিরিবালার মুখে হাসি দেখা দিল; বলিল, "আর বরদার ওদিক্কার কথা শুনবে দিদি? একদিন সন্ধ্যেবেলা বরদা এসে হাজির। দেশের লোক, পাশের ঘর থেকে আমি তার কথা শুনেছিলাম। এদিক ওদিক নানান্ কথাবার্তার পর হঠাৎ সে বললে, 'ছোটবাবু, আপনি মাসে মাসে বড়বাবুকে অতগুলো ক'রে টাকা গোঁজেন কি জন্যে? কারবার ত' আপনি সংসার থেকে বেরিয়ে এসে একা করেছেন। সে টাকায় বড়বাবুর কি অধিকার?' একটু চুপ ক'রে থেকে শান্তভাবে উনি বললেন, 'বড়বাবুর কি অধিকার তা তোমাকে একটু পরে আমি বুঝিয়ে দিচ্ছি, কিন্তু তার আগে এসব কথায় তোমার কি অধিকার তা আমাকে তোমার বোঝাতে হবে। তা যদি না পার, তা হ'লে আমি ফোন ক'রে পুলিশ ডেকে তোমাকে ধরিয়ে দেবো।' যাই এই কথা বলা, সে কি অবস্থা হোল বরদার! মুখ হ'য়ে গেল ছাইয়ের মতো ফ্যাকাসে, ভাল ক'রে কথা বার হয় না, আমতা আমতা ক'রে দুচারটে কি আবোল তাবোল ব'কে ওঁকে একটা প্রণাম ক'রেই একেবারে উঠি ত পড়ি ক'রে পালিয়ে গেল। বরদা চ'লে যেতেই আমি বাইরের ঘরে ঢুকে হাসতে লাগলাম। বরদার কথা বলাবলি ক'রে আমরা দুজনে সেদিন বোধ হয় আধ ঘণ্টা হেসেছিলাম।" তাহার পর সহসা গিরিবালার

মুখ বিষণ্ণ এবং কণ্ঠস্বর গাঢ় হইয়া আসিল; বলিল, "উঃ, সে সব দিন কি সুখের দিনই আমার গেছে দিদি! সব যেন স্বপ্ন হ'য়ে গেল—ক্রমে ক্রমে বোধ হয় সমস্ত ভুলেই যাব!" গিরিবালার দুই চক্ষু দিয়া ঝরঝর করিয়া একরাশ অশ্রু ঝরিয়া পড়িল।

গিরিবালার অশ্রু এবং কাতরোক্তির প্রতি কিছুমাত্র মনোযোগ না দিয়া ভবতারা কহিল, "শুধু বরদা গোমস্তাই নয় ছোটবউ, পাড়ার অনেকেও আমাদের ঠিক ঐ পরামর্শই দিয়েছিল, কিন্তু আমরা তাতে কান দিইনি। বিশ্বাস না হয়, ভজার মা, নেপালের পিসি এরা সব এলে তোমার সামনেই কথাটা মোকাবেলা ক'রে দেবো'খন।"

ভবতারার কথা শুনিয়া ব্যস্ত হইয়া গিরিবালা বলিল, "না, না, দিদি, দোহাই তোমার, পাড়ার লোকের কাছে আর অনর্থক ওসব কথা তুলো না। আর, যখন কর্তারাও নেই, কারবারও নেই, সব চুকে-বুকে গেছে, তখন আর সে সব কথা তুলে লাভ কি?"

ভবতারা বলিল, "না, তুমি এজমালি কারবার মানতে চাচ্ছিলে না কি-না, তাই বলছি।"

আর কোনো কথা না বলিয়া গিরিবালা চুপ করিয়া রহিল।

এইরূপে যাহার সূত্রপাত হইল, দিনে দিনে তাহা ক্রমশ বাড়িয়াই চলিল। কোনোদিন কলহ, কোনোদিন কটূক্তি, কোনোদিন বিদ্রূপ, কোনোদিন ব্যঙ্গ, একটা-না-একটা উৎপাত লাগিয়াই রহিল। শক্তির ইংরাজি পড়া, কার্পেট বোনা, পূজার জন্য গিরিবালার ফুল তোলা, জেলেদের বলিয়া জমার পুষ্করিণী হইতে শক্তির জন্য কিছু মাছ কিনিয়া লওয়া, এত অধিক বয়স পর্যন্ত শক্তির অবিবাহিত থাকা—এইরূপ একটা কিছু-না-কিছু উপলক্ষ করিয়া ভবতারার কলহের কারবার একটানা নদীর মত বহিয়া চলিল। স্বামীর মৃত্যুর পর এই নির্জন পুরীতে কথাবার্তা একরকম বন্ধ হইয়াই গিয়াছিল, মানুষ পাইয়া ভবতারা ঝগড়া করিয়া বাঁচিল।

কিন্তু গিরিবালা এবং শক্তি এই উৎপীড়নে অতিষ্ঠ হইয়া উঠিল। যে অঙ্কুর বীজ-বপনের অপেক্ষা রা'খে না, আপনিই গজাইয়া উঠে, তাহাকে কিরূপে নিবৃত্ত করিবে তাহা তাহারা কিছুতেই ভাবিয়া পায় না। মাঝে মাঝে শক্তি বলে, 'মা, চলো এখান থেকে কোথাও আমরা চ'লে যাই।' গিরিবালা বলে, 'কোথায় আর যাব মা, যাবার ঠাঁই গোবিন্দ কোথাও কি রেখেছেন!' মনে মনে বলে, 'একমাত্র কপোতাক্ষর কোল ছাড়া।' দুঃখে কষ্টে অপমানে এক এক সময়ে সত্যই গিরিবালার চক্ষে কপোতাক্ষর তরঙ্গাবিক্ষুব্ধ মধুর ভয়াবহ মূর্তি জাগিয়া উঠে, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে মনে পড়ে অভাগিনী কন্যা শক্তির কথা।

দুঃখে যন্ত্রণায় ভাবিয়া ভাবিয়া কিছুদিন হইতে গিরিবালার একটা কঠিন রোগ হইয়াছে। হঠাৎ এক-এক সময়ে বুকের ভিতর ধুক্ ধুক্ করিয়া উঠে, নিঃশ্বাস রোধ হইয়া আসে, হাত-পা বরফের মতো ঠাণ্ডা হইয়া যায়, এবং কিছুক্ষণ নড়িবার চড়িবার শক্তি থাকে না। গ্রামে ডাক্তার নাই, একজন বৃদ্ধ কবিরাজ আছে। শক্তি একদিন জোর করিয়া কবিরাজকে ডাকাইয়া আনিল। কবিরাজ আসিয়া প্রথমে দর্শনী একটাকা আদায় করিল, তাহার পর রোগিণীর নাড়ী দেখিয়া এবং রোগের লক্ষণাদি শুনিয়া বলিল, গিরিবালার কঠিন হৃদ্‌রোগ হইয়াছে। নিদানে এই রোগকে অসাধ্য না বলিলেও দুঃসাধ্য বলিয়াছে। তৎপ্রমাণে মাধব করের নিদান হইতে শ্লোক আবৃত্তি করিয়া শুনাইল। বলিল, বায়ু, পিত্ত এবং কফ কুপিত হইয়া এই রোগের উৎপত্তি হইয়াছে; আধ্যাত্মিক, আধিভৌতিক এবং আধিদৈবিক কারণ ইহার সহিত জড়িত। এই কঠিন রোগকে শাস্ত্রীয় চিকিৎসার দ্বারা আশু দমিত না করিলে যে-কোনো মুহূর্তে রোগিণীর মৃত্যু ঘটাইতে পারে। কাগজ কলম চাহিয়া লইয়া কবিরাজ ব্যবস্থাপত্র লিখিল। রসায়ন, অরিষ্ট, বটিকা এবং তৈলে সাপ্তাহিক ব্যয় পড়িল সওয়া সাত টাকা। গ্রামে একথা রাষ্ট্র ছিল যে, প্রস্থানপরায়ণা সৌভাগ্যলক্ষ্মীর অঞ্চল হইতে গিরিবালা যে-কয়টি মণিমুক্তা কাড়িয়া আনিতে সক্ষম হইয়াছিল তাহার মূল্যে সমস্ত শিবানীপুরে গ্রামখানা কিনিয়া ফেলাও বিচিত্র নহে।

কবিরাজকে বিদায় করিয়া গিরিবালা শক্তিকে তাহার অবিমৃষ্যকারিতার জন্য ভর্ৎসনা করিল। বলিল, রোগ তাহার কিছুই কঠিন নহে, শুধু লোভাতুর কবিরাজের রোগকে অযথা বাড়াইয়া অর্থলাভের ফন্দী। মুখে রোগকে লঘু করিলেও মনে মনে গিরিবালার চিন্তা বাড়িল,—মনে হইল কবিরাজের কথা যদি ফলিয়া যায়, হঠাৎ যদি তাহার মৃত্যু হয়—এমন হওয়া ত' আশ্চর্যও নহে—তাহা হইলে এই নির্বান্ধব পুরীতে ভবতারার হস্তে শক্তির কি নিগ্রহটাই না হইবে! বিশেষত সম্প্রতি কিছুদিন হইতে একটা যে অত্যন্ত কুৎসিত উৎপাত আরম্ভ হইয়াছে, সে কথা ভাবিয়া গিরিবালার মনে উৎকণ্ঠার পরিসীমা ছিল না।

২

মাস দুই পূর্বের কথা। হঠাৎ একদিন অনিশ্চিত ধূমকেতুর মতো 'মাসিমা, কোথায় গো' বলিয়া ভবতারার এক দূর-সম্পর্কীয় ভাগিনেয় বাড়ির ভিতর প্রবেশ করিল। বয়স বৎসর চব্বিশ, ঘনকৃষ্ণবর্ণ বলিষ্ঠ দেহ, সমস্ত মুখে বসন্তের দাগ এবং আকৃতির মধ্যে শিক্ষাহীনতার একটা সুস্পষ্ট ছাপ বর্তমান।

প্রবেশ করিয়া প্রথমেই সে দেখিতে পাইল শক্তিকে। অপ্রত্যাশিত ঘটনার চকিত বিস্ময়ে সে ক্ষণকাল নির্নিমেষে শক্তির সুগঠিত সুন্দর মূর্তির প্রতি চাহিয়া রহিল, তাহার পর শক্তির বয়স এবং তদুচিত মর্যাদার কোনো হিসাব না রাখিয়া এক মুখ নিঃশব্দ হাস্যের সহিত বলিল, "তুমি এ বাড়িতে থাক?"

তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে আগন্তুকের আপাদ-মস্তক একবার দেখিয়া লইয়া শক্তি বলিল, "থাকি।"

"আর, মাসিমা থাকে না?"

"কে আপনার মাসিমা?"

আগন্তুকের মুখে পুনরায় হাস্যের সঞ্চার হইল। বলিল, "তুমি দেখছি বিপদে ফেল্লে! এ হল আমার মাসিমার বাড়ি, আর জিজ্ঞেস করছ কে আপনার মাসিমা? ভবতারা মাসি গো!"

দ্বিপ্রহরে আহারের পর ভবতারা নিজ-কক্ষে শুইবার উদ্যোগ করিতেছিল। কথা-বার্তা কানে আসিতেছিল, কিন্তু মন সেদিকে ছিল না; নিজের নাম উচ্চারিত হইতে শুনিয়া উৎসুক হইয়া উচ্চৈঃস্বরে বলিল, "কে রে?" তাহার পর বাহিরে আসিয়া আগন্তুককে দেখিয়া সবিস্ময়ে বলিয়া উঠিল, "কে—নবা না? ওমা! কত বড় হ'য়ে গেছিস রে! তা, পাঁচ ছ বছর ত' দেখা সাক্ষেৎ নেই। কবে এলি তোরা?"

তাড়াতাড়ি বারান্দায় উঠিয়া আসিয়া নত হইয়া ভবতারার পদধূলি লইয়া একমুখ সাদা সাদা দাঁত বাহির করিয়া হাসিয়া নবগোপাল বলিল, "পরশু এসেছি মাসিমা।"

"কোথা থেকে এলি? রাউলপিণ্ডি থেকে?"

নবগোপাল বলিল, "হাঁ। রাউলপিণ্ডিতে বাবার চাকরির পিণ্ডি দিয়ে আমরা দেশে ফিরেছি।"

চিন্তিত মুখে উদ্বিগ্নকণ্ঠে ভবতারা বলিল, "ওমা, সে কি কথা রে!"

"তার মানে বুঝলে না? পেন্সেন হয়েছে!" বলিয়া হো হো করিয়া নবগোপাল প্রচুর হাস্য করিল; এবং তাহার এই রসিকতা শক্তির উপর কিরূপ ক্রিয়া করিল দেখিবার জন্য শক্তি যেদিকে ছিল সেদিকে একবার ফিরিয়া চাহিল। কিন্তু শক্তি ততক্ষণে তাহাদের শয়নকক্ষে জননীর নিকট আশ্রয় লইয়াছে। অগত্যা ভবতারার দিকে

পুনরায় চাহিয়া নবগোপাল আর এক দফা হাসি হাসিল। রাউলপিণ্ডির কথার শেষাংশের অর্থের সহিত তাহার পিতার পেন্সন লওয়ার ঘটনা যুক্ত করিয়া এই রসিকতা রাওলপিণ্ডি হইতে আরম্ভ করিয়া এ পর্যন্ত অন্তত সে বার পঁচিশ করিয়াছে, এবং যতবার করিয়াছে প্রতিবারেই ইহার রস-সম্পন্নতায় একই মাত্রায় পুলকিত হইয়াছে।

নবগোপালের হাতে কাপড়ে বাঁধা একটা ছোট পুঁটুলি ছিল। সেদিকে দৃষ্টিপাত করিয়া ভবতারা বলিল, "আয় নব, ঘরের ভিতরে বসবি আয়।" ভয় হইল, যদি ঘটনাক্রমে গিরিবালা অথবা শক্তি আসিয়া পড়ে এবং পুঁটুলির মধ্যে যে-সকল সামগ্রী আসিয়াছে চক্ষুলজ্জায় পড়িয়া তাহার কিছু ভাগ তাহাদিগকে দিতে হয়।

ঘরে প্রবেশ করিয়া ভবতারা জিজ্ঞাসা করিল, কামিনীদিদি কেমন আছেন রে নব?"

মাথা নাড়িয়া নবগোপাল বলিল, "আর কথা জিজ্ঞেস কোরোনা মাসিমা, কোন্ দিন হঠাৎ দেখবে কাছা নিয়ে এসে দাঁড়িয়েছি।"

ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া ভবতারা বলিল, "কেন রে? অসুখ না-কি খুব?" নবগোপাল বলিল, "খুব বেশি;—অম্বলের অসুখ। চেহারা হয়েছে যেন একটি বেরয়ো-কাঠ, বুঝলে মাসিমা,—হাড়ের ওপর শুধু চামড়াটি আঁটা।"

"আর চাটুয্যে মশাই?—তিনি কেমন আছেন?"

"চাটুয্যে মশাই তোমার বেশ আছেন। তাঁর কোনো অসুখবিসুখ নেই।"

হাসিমুখে ভবতারা বলিল, "সে ত' খুব সুখের কথা রে।"

"না, তাই বলছি।" বলিয়া নবগোপাল পুঁটুলি খুলিতে লাগিল। পুঁটুলি হইতে বাহির হইল মাটির খুরি করিয়া কয়েক রকমের আচার, কিছু পাঁপর, একটা পঞ্চমুখ রুদ্রাক্ষের মালা, আরও দুই-চারটা কি জিনিস।

ভবতারা বলিল, "থাক্—থাক্, আর খুলতে হবে না—অনেক জিনিস কামিনী-দিদি পাঠিয়েছেন,—বলিস আমি খুব খুশি হয়েছি।" বলিয়া জিনিসগুলা ঠেলিয়া পালঙ্কের তলায় রাখিয়া দিল।

ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া নবগোপাল বলিল, "তা মনে কোরো না মাসিমা, তোমার কামিনীদিদি হাতখোলা মানুষ নয়। বলে, 'হয়েচে, হয়েচে, ঐ ঢের হয়েচে, নিয়ে যা'। আমি টেনেটুনে তবু একটু বেশি ক'রে নিয়ে এলাম।"

নবগোপালের কথা শুনিয়া ভবতারার অধরপ্রান্তে হাসি ফুটিয়া উঠিল; বলিল, "কি পাগল ছেলেরে তুই!"

ভবতারার কথার প্রতি কোনো প্রকার মন্তব্য না করিয়া নবগোপাল বলিল, "বাড়িতে ঢুকেই উঠোনে একজন মেয়েকে দেখলাম—ও কে মাসিমা?"

ভবতারা বলিল, "ও শক্তি,—আমার দেওরঝি।"

"কই, আগে কখনো দেখিনি ত?"

"আগে ওরা কলকাতায় থাকত। ওদের পুষতে গিয়েই ত' আজ আমার এই দুর্দশা! তা নইলে আজ আমার টাকা খায় কে!"

অবান্তর কথা শুনিবার জন্য নবগোপালের মনে কিছুমাত্র ঔৎসুক্য ছিল না। বলিল, "সিঁথেয় ত' সিঁদুর দেখলাম না, এখনো ওর বিয়ে হয়নি না-কি?"

ভবতারা বলিল, "না, হয়নি।"

সবিস্ময়ে নবগোপাল বলিল, "ওমা, অত বড় মেয়ের এখনো বিয়ে হয়নি!"

মুখ বাঁকাইয়া ভবতারা কহিল, "ও মেয়ের কি আমাদের দেশে পাত্তোর আছে যে বিয়ে হবে? একেবারে বিলেত থেকে বাদশা এসে ওকে বিয়ে ক'রে নিয়ে যাবে। রাম, রাম! খিরিস্টানি কাণ্ডর জন্যে গাঁয়ে মুখ দেখাবার যো নেই। তোর বিয়ে হয়েচে নব?"

মাথা নাড়িয়া নবগোপাল বলিল, "না, আমারও হয়নি।"

'আমার' শব্দের পিছনে সহসা 'ও অক্ষরের যোগে নবগোপালের মনের ব্যঞ্জনা উপলব্ধি করিয়া ভবতারার মুখে হাসি দেখা দিল; বলিল, "তোরও হয়নি? আমি মনে করছিলাম আমাদের না জানিয়েই বুঝি তোর বাবা তোর বিয়ে দিয়ে দিয়েছে।"

নবগোপাল বলিল, "তা বড় মন্দ ভাবনি মাসিমা, রাউলপিণ্ডিতে আমার বিয়ে একরকম ত' হয়েই গিয়েছিল, শুধু আমি মত করলাম না ব'লেই হ'ল না।"

"কেন, মত করলিনে কেন?"

"মেয়ে বড্ড ছোট মাসিমা।"

"কত ছোট রে? কত বয়েস?"

মনে মনে একটু চিন্তা করিয়া নবগোপাল বলিল, "বছর চোদ্দ হবে।"

ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া ভবতারা বলিল, "ওমা, বলিস কিরে! চোদ্দ বছরের মেয়ে ছোট হ'ল? তবে তুই কি রকম মেয়ে চাস?"

একবার ভবতারার প্রতি মুহূর্তের জন্য দৃষ্টিপাত করিয়া ঘাড় নীচু করিয়া মৃদুস্বরে নবগোপাল বলিল, "ডাগোর।"

এই কথোপকথনের অর্ধঘণ্টা পরে ভবতারা নবগোপালকে গিরিবালা ও শক্তির নিকট লইয়া গিয়া পরিচয় করাইয়া দিল, এবং সন্ধ্যার পূর্বে নবগোপাল প্রস্থান করিলে নবগোপালের সহিত শক্তির বিবাহের প্রস্তাব করিল। বলিল, "এ তুই একেবারে ঠিক ক'রে ফেল ছোটবউ। খাসা ছেলে, হৃষ্টপুষ্টু, কান্তিবান;—শুধু রংটা একটু ময়লা। তা পুরুষ মানুষের আবার রং, চাঁদের আবার কলঙ্ক। তা ছাড়া, বাপের অবস্থা কি! জমিজমা, পুকুর-ভদ্রাসন—তার ওপর মাসে তিন-কম তিন-কুড়ি টাকা পেন্সোন্। সংসার একেবারে উছলে উঠছে!"

এই উক্তির যৎসামান্য প্রমাণস্বরূপ ভবতারা গিরিবালাকে আচার এবং পাঁপড়ের কিছু অংশ দিয়া বলিল, 'হরিপুর ত এখান থেকে মোটে কোশ দুই পথ, খবর নিয়ে দেখিস, রামগোপাল চাটুয্যেকে খাতির করে না, এমন লোক ও তল্লাটে নেই।"

ভবতারার প্রস্তাব শুনিয়া বিস্ময়, বিরক্তি এবং কতকটা কৌতুকে ক্ষণকাল গিরিবালার মুখ দিয়া কোনো কথা বাহির হইল না। তাহার পর মৃদুস্বরে বলিল, "তুমি ত জান দিদি, অনেক করে মেয়েটাকে লেখাপড়া শিখিয়েছি। এই চার বছর সে ইস্কুল ছাড়া, তবু শুধু নিজের আগ্রহে আর যত্নে এই বন-বাদাড়ে থেকেও তার ইস্কুলের মাস্টারদের লিখে লিখে বই আনিয়ে কত লেখাপড়া করেচে। তাই ইচ্ছে হয়, একটি পাশ-টাশ করা পাত্র দেখে—"

গিরিবালার কথার মধ্যেই ভবতারা ঝঙ্কার দিয়া বলিয়া উঠিল, "পাশ-করা পাত্তোর নিয়ে ত সবই হবে! ঠাকুরপো যে অত কাঁড়িকাঁড়ি টাকা কামিয়ে গেল, কটা পাশ করেছিল শুনি? লক্ষ্মীর ভাঁড়ে আর সব থাকে, শুধু পুঁথি থাকে না,—এ কথা জানিস নে? ঐশ্বর্য ত যত সব মুখখুর ঘরে। আর, মুখখুই বা বলি কেমন করে,—তিনটে ইংরিজি বই শেষ করেছে ত!"

নবগোপালের বিদ্যার পরিমাণ শুনিয়া গিরিবালার অধরপ্রান্তে হাস্য দেখা দিল, এবং অদূরে শক্তির দুই চক্ষু বিস্ফারিত হইয়া উঠিল।

ভবতারা বলিল, "তা ছাড়া, আমি তেমন করে চেপে ধরলে চাটুয্যে মশাই কি এক পয়সার কামোড় করতে পারবে! একটা হত্তুকী দিয়ে কন্যে উচ্ছুগ্‌গু হয়ে যাবে। পাশ-করা পাত্তোর ত চাচ্ছিস—পাশ করা পাত্তোরের জন্যে এক কাঁড়ি টাকার ব্যবস্থা করতে পারবি? আর, এই বুনো দেশ থেকে পাশ-করা পাত্তোর কেমন করে জোগাড় করবি শুনি?"

কথা সত্য তার আর সন্দেহ নাই,—এবং সে কথা মনে মনে চিন্তা করিয়া গিরিবালার মনে উৎকণ্ঠারও পরিসীমা ছিল না,—কিন্তু তাই বলিয়া একেবারে নবগোপাল! পূর্ণিমা দুরাশা বলিয়া একেবারে অমাবস্যা!

গিরিবালা বলিল, "এ পর্যন্ত ত তেমন করে চেষ্টা-চরিত্র কিছু করা হয় নি, একবার সকলকে চিঠিপত্র লিখে দেখি, তারপর যা-হয় একটা কিছু ত করতেই হবে।"

গম্ভীর মুখ করিয়া ভবতারা বলিল, "তা যা করতে ইচ্ছে হয় তোমার করে দেখ, কিন্তু এই শ্রাবণ মাসের মধ্যে যদি তোমার মেয়ের বিয়ে না হয় তা হলে তোমার ছেলেমানুষ মেয়েকে নিয়ে এ বাড়িতে বাস কোরো, আমি ভাদ্রমাসেই শ্বশুরের ভিটে ছেড়ে যেখানে হয় চলে যাব। না হয় ঐশ্বর্যই গেছে, তাই বলে কি এত বড় বনেদী বংশের নামটাও এমনি করে নষ্ট করতে হয় ছোটোবউ? গাঁয়ে যে ঢি-ঢিককার পড়ে গেছে—কান পাতা যায় না!"

আর কোনো কথা না বলিয়া গিরিবালা ক্ষণকাল নীরবে বসিয়া কি চিন্তা করিয়া ধীরে ধীরে উঠিয়া গেল।

৩

সেদিনের মতো কথাটা বন্ধ হইল বটে, কিন্তু ক্রমশ ইহার উৎপাত বাড়িয়াই চলিল। পাড়া প্রতিবেশীদের কানে কথাটা উঠিল। তাহারা মাঝে মাঝে আসিয়া গিরিবালকে উৎসাহিত করে; ভবতারা কখনো পরামর্শ দেয়, কখনো রাগ করে, কখনো বা ভয় দেখায়; পাড়ার নূতন বধূ এবং কন্যাদের মধ্যে যে কয়েকজনের সহিত শক্তির ঘনিষ্ঠতা হইয়াছিল, তাহারা আসিয়া শক্তিকে পরিহাস করে, ছড়া কাটে, চুনে হলুদে রং তৈয়ার করিয়া সাদা কাগজের উপর 'নবশক্তি' লিখিয়া শক্তির সম্মুখে আনিয়া ধরে; এবং সকলের চেয়ে বিপদ হইয়াছে স্বয়ং নবগোপালকে লইয়া। সে ক্রমশ আসিতে আরম্ভ করিয়াছে যেমন ঘন ঘন, থাকিতে আরম্ভ করিয়াছেও তেমনি বেশি বেশি। সকালে আসিলে সন্ধ্যার পূর্বে যায় না, এবং সন্ধ্যার সময়ে আসিলে পরদিন সন্ধ্যা পর্যন্ত থাকিয়া যায়। এবং যতক্ষণ থাকে কোনো সময়েই শক্তির প্রতি তাহার ঔদাসীন্য লক্ষ্য করা যায় না; চুম্বকের প্রতি লোহশলাকার ন্যায় শক্তির প্রতি তাহার মনোযোগ নিরন্তর লাগিয়াই থাকে।

ভবতারা বলে, "ছেলেটার ছটফটানি ত আর দেখা যায় না ছোটবউ! মনটা ঠিক করে ফেল। লোকে বলে, যাচা কুটুম আর কাচা কাপড় ত্যাগ করতে নেই।"

গিরিবালা মুখে কিছু বলে না, মনে মনে যাচা কুটুমের মুণ্ডুপাত করিতে থাকে।

শক্তি বলে, "মা, আর ত পারা যায় না, এর যা হয় একটা উপায় কর!"

গিরিবালা বলে, "কেন, তোকে কোনো রকম জ্বালাতন করে না-কি?"

শক্তি বলে, "জ্বালাতন আর কাকে বলে? সব সময়ে যদি একটা লোক সাদা সাদা চোখ দিয়ে প্যাট প্যাট করে তাকিয়ে থাকে, সে কি কম জ্বালাতন?"

গিরিবালার মুখে সকরুণ কৌতুকের মৃদু হাসি ফুটিয়া উঠে।

সন্ধ্যার সময়ে গিরিবালা রন্ধনের উদ্যোগ করিতেছিল, শক্তি আসিয়া বলিল, "মা, তোমাদের নবোর কাণ্ড দেখ!

উদ্বিগ্নমুখে শক্তির দিকে ফিরিয়া চাহিয়া গিরিবালা বলিল, "কেন রে, কি কাণ্ড?"

শক্তির হাতে দুইখানা বই ছিল, গিরিবালাকে দেখাইয়া বলিল, "এই বই দুখানা আজ আমাকে উপহার দিয়েছে!"

"কি বই?"

"উদাসিনী রাজকন্যার গুপ্তকথা" আর "গুমখুন" আর, দিন পাঁচেক পরে "দিনে ডাকাতি" দেবে বলেছে। না মা, একটা ব্যবস্থা না করলে চলছে না! এ জুলুম একেবারে অসহ্য!

"তা তুই বই নিলি কেন?"

চক্ষু বিস্ফারিত করিয়া শক্তি বলিল, "আমি সহজে নিয়েচি না-কি? জবরদস্তিতে দিয়েছে! বলে, "তুমি বই না নিলে আমি বুঝব যে, আমাকে তুমি ঘেন্না কর", বলে জোর করে হাতে গুঁজে দিলে। বেশি আপত্তি করলে পাছে আরো কিছু বলে ব'লে তাড়াতাড়ি বই নিয়ে চলে এসেছি। আবার বইয়ে আমার নাম লিখে দেওয়া হয়েছে—তার বানান কি করেছে জানো? দন্ত্য স কয়ে তয়ে হ্রস্বই সক্তি। তাতে আবার রাণী যোগ করা হয়েছে। উঃ, দেখচি, আর আমার গা ঘিন-ঘিন করছে! না মা, যে রকম করে পার "দিনে ডাকাতি" আসবার আগে এসব ব্যাপার বন্ধ করবার ব্যবস্থা কর!"

চিন্তিত মুখে গিরিবালা বলিল, "আচ্ছা, দেখি।"

সেই দিনই রাত্রে নবগোপাল প্রস্থান করিবার পর গিরিবালা ভবতারাকে বলিল, "দিদি, নবগোপালের সঙ্গে শক্তির বিয়ে হবার কোনো সম্ভাবনা নেই, এ কথা নবগোপালকে ভাল করে বুঝিয়ে দেওয়া উচিত।"

গিরিবালা আশঙ্কা করিয়াছিল এই কথাকে সূত্রপাত করিয়া বহুক্ষণ ধরিয়া একটা বিতর্ক এবং বচসা চলিবে। কিন্তু সেরূপ কিছু হইল না। মুখখানা অন্ধকার করিয়া ভবতারা শুধু বলিল, "আচ্ছা, বুঝিয়ে দোবো।"

ভবতারার উত্তর শুনিয়া গিরিবালা হয়ত মনে করিল সহজেই ব্যাপারটার নিষ্পত্তি হইল। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে, এতদিন যাহা বিরক্তি এবং সময়ে সময়ে কৌতুক উৎপাদন করিত, ইহার পর তাহা ভীতি এবং উৎকণ্ঠার কারণ হইল। (ক্রমশঃ)



হাট



শ্রীবিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়

গাঙের ধারে পটলের ক্ষেত।

বুড়ো কুড়োন মণ্ডল সবুজ উলুখড়ের বেড়াঘেরা ক্ষেতটিতে বসে পটল তুলে বাজরা বোঝাই করছিল। ক্ষেতের নীচেই হারাণ মাঝি দোয়াড়ি পাতচে গাঙের জলে। আজ বড় মেঘলা দিন, বৃষ্টি হবে না হবে না করে এমন বৃষ্টি নেমেচে যে, দুদিনের মধ্যে থামলো না। হারাণ বল্লে—ও কুড়োন, একটু তামাক খাওয়াবা?

—নামো হোথা থেকে। ইদিকে এসো।

একটা বাবলাগাছের তলায় দুজনে তামাক খায় বসে। দুজনেই জলে ভিজচে, কিন্তু সে ওটা গ্রাহ্য করচে না। ভদ্দরলোক নয়



বাবলা গাছের তলায় দুজনে তামাক খায় ব'সে।

যে ঘরের মধ্যে বসে থাকবে। জলে না ভিজলে ক্ষেতখামারের কাজ বা মাছধরার কাজ হবে কোথা থেকে? আর এতে ওদের শরীরও খারাপ হয় না ওরা জানে। রোদে জলে শরীর পেকে গিয়েচে। ভদ্দর-লোক হোলে এমন ধারা ভিজলে নিমোনিয়া হোত হয়তো।

হারাণ বল্লে—হাটে যাবা?

—যাই। দু-বাজরা মাল কাটাতি হবে তো।

—কোন্ হাটে যাবা? নতুন হাটে?

—তাই যাবো। পুরনো হাটে কেউ বড় একটা আসচে না। মাল কাটে না।

—পটলের মণ?

—তা কি করে বলবো। খদ্দেরে যা দ্যায়। মাছ?

—না'সিকে।

দুজনে খুব খুশি। এবার চড়া পটল আর চড়া মাছের দাম গিয়েচে দু-তিন মাস। হাতে কিছু জমেচে দুজনেরই। অবিশ্যি কুড়োন মণ্ডলের অবস্থা হারাণ মাঝির চেয়ে স্বচ্ছল। বায়েন সাত বিঘে পটল বাদে প্রায় দশ বিঘে কলাবাগান আছে ওর। একখানা ডিঙি বেয়ে হারাণ মাঝি আর ক'মণ মাছ ধরবে মাসে?

কুড়োন বাড়ি ফিরে খেয়ে নিলে, তারপর পটলের বাজরা মাথায় হাটের দিকে রওনা হোল। এ হাটটা নতুন হয়েচে আজ মাস পাঁচ ছয়। রসুলপুরের আবদুল খালেক মিঞা জমিদার গত পৌষ মাস থেকে এ হাট বসিয়েচেন। ঝিটকিপোতার পুরনো হাটে আজকাল লোক হয় না। নতুন হাটে খাজনা নেই, তোলা নেই, ভিখিরীর উৎপাত নেই। কলকাতার পাইকিরী খদ্দের এখানে আসে বেশী, দামও দেয় বেশী।

হাটে গিয়ে কুড়োন বসে তার নির্দিষ্ট স্থান-টিতে। পটল প্রথমে ছিল দু' আনা সের, কলকাতা ও রাণাঘাটের পাইকারী খদ্দের যেমন আসতে শুরু করলো অমনি দাম চড়লো দশ পয়সা।

কুড়োন হাতের দাঁড়িপাল্লা নামিয়ে একবার তামাক সেজে হাওয়ায় কল্কেটা রেখে দিলে টিকে ধরবার জন্যে। একটা খদ্দের এসে বল্লে—পটল কত?

কুড়োন গম্ভীর ও নিস্পৃহস্বরে বল্লে, বারো পয়সা।

—বারো পয়সা কি রকম? সব জায়গায় দশ পয়সা আর তোমার বারো পয়সা?

—তবে সেই সব জায়গায় নেও গে যাও—

—ভাল পটল?

—হাত দিয়ে দ্যাখো—আসল বোশেখি লতার পটল। তুলে দ্যাখো না একটা? এর দাম বারো পয়সা। কুড়োন মণ্ডল ঘুঘু ব্যবসাদার। খদ্দের কিসে ভোলে, কোন ধাপ্পায় তাকে কাবু করা যায়, এসব তার গত ছত্রিশ বছরের অভিজ্ঞতাপ্রসূত জিনিস। নিজের জিনিসের দাম নিজেই চড়িয়ে দিতে হবে এবং জোর গলায় নিজের জিনিসের তারিফ করতে হবে—খদ্দের ভিজবেই, ভিজতে বাধ্য। খদ্দের তখন বারো পয়সার পটলকে কল্পনা-নয়নে অনেক উঁচু বলে ভাবতে শুরু করবে। ব্যবসার এ অতি গূহ্যতত্ত্ব, কুড়োন মণ্ডল সারাজীবন ধরে সাধনা করে এ তত্ত্বে সিদ্ধিলাভ করেচে। দেখতে দেখতে খদ্দেরের ভীড় লেগে গেল তার সামনে। দশ পয়সা সেরের পটল কেউ কেনে না। কুড়োন মণ্ডল মনে মনে হেসে চড়া গলায় বলতে লাগলো—এই চলে এসো খদ্দের, বারো পয়সা—চড়ার সেরা পটল বারো পয়সা—চলে এসো—

কুড়ি মিনিটের মধ্যে আধমণ পটল উঠে গেল ঐ দরে। সিকি ও আনি প্রচুর জমলো বগলিতে। কুড়োন আবদুল শোভান ফকিরের কাছ থেকে এক ছড়া পাকা মর্তমান কলা কিনে নিজের বাজরায় রেখে বল্লে—ক'টা পয়সা দেবো ও ফকির?

—দ্যাও যা দেবা। তিন আনা দ্যাও।

—বারোটা কলার দাম তিন আনা। এক একটা কলা এক একটা পয়সা?

আবদুল ফকিরও ঘুণ ব্যবসাদার। নিজের বাড়ির উঠোনে সব রকম তরিতরকারী উৎপন্ন করে এবং তাই হাটে বেচে দু-পয়সা রোজগার করে। ওর সম্বন্ধে একটা গল্প



একটা খদ্দের এসে বল্লে—পটল কত?

প্রচলিত আছে এ অঞ্চলে। কে একজন দুটি পাতিলেবু চাইতে গিয়েছিল আবদুল শোভানের বাড়ি।

—ও ফকির, লেবু আছে তোমার বাড়ি?

পাছে কিনে পয়সায় দিতে হয়, তখনি ওর মুখ বন্ধ করবার জন্যে আবদুল ফকির বল্লে—পয়সা দিলিই পাওয়া যায়। সেই আবদুল ফকির। সে অমায়িকভাবে হেসে বল্লে—যুদ্ধোর বাজারে কোন জিনিসটা সস্তা দ্যাখচো, ও কুড়োন? তুমি পটল বেচলে কি দর?

তুমি পটল বেচলে কি দর?

না, ফকিরের সঙ্গে পারা গেল না। অবশেষে দশটা পয়সা দাম দিতেই হোল।

বেলা পাঁচটার মধ্যে পটলের বাজার কাবার। বিক্রীও বটে। কুড়োন তাদের গাঁয়ের হরিপদ মাইতিকে ডেকে বল্লে—ক'খানা বাজরা বেচলে?

—দুখানা।

—বেশ বিক্রী, কি বলো ভাইপো?

—যুদ্ধোর সময় লোকের হাতে পয়সা কত আজকাল?

—তা সত্য।

—এমন কখনো দেখেছিলে খুড়ো? তোমার বয়েস তো চার কুড়ির কাছে ঠেকলো। তুমি যখন হাট করতে আরম্ভ করেচ, তখন আমরা জন্মাইনি।

—তা সত্যি।

হরিপদ মিথ্যে বলেনি। কুড়োন ভেবে দ্যাখে সত্যিই হরিপদ যখন জন্মায়নি, তখন থেকে সে হাটে পটল বেচে। কিন্তু সে এ হাটে নয়, ঝিটকিপোতার পুরনো হাটে। এ হাট তো মোটে গত পৌষ মাস থেকে হয়েচে।

কুড়োন আজ চল্লিশ বিয়াল্লিশ বছর ধরে ঝিটকিপোতার হাট করচে। কতদিনের কত স্মৃতি ঝিটকিপোতার হাটের সঙ্গে জড়ানো! এ নতুন হাটে এসে কোনো আনন্দ হয় না, এখানে এসে পয়সা হয় বটে, কিন্তু সব ফাঁকা ফাঁকা ঠেকে। মন খুসি হয়ে ওঠে না। মনের যোগাযোগ কিছু নেই এ হাটের সঙ্গে।

কথাটা তার রোজই মনে হয়।

ঝিটকিপোতার হাট তার কত কালের পরিচিত। এখানে বসে সে এতক্ষণ ভাবছিল ঝিটকিপোতার হাটের সেই অশ্বত্থ গাছের তলা, যেখানটিতে বিয়াল্লিশ বছর ধরে ফি হাটে বসে সে পটল বিক্রী করে এসেচে। কত পুরনো লোক ছিল, তাদের কথা মনে পড়ে। তার আগে ঐখানটিতে বসতো লক্ষ্মণ সর্দার, ভীম সর্দারের বাপ। লক্ষ্মণ সর্দার বেগুন বিক্রী করতো, তার বাপের বয়সী বুড়ো, তাকে হাতে ধরে বেচা-কেনা শিখিয়েছিল—রোজ নিজের গাড়িতে চড়িয়ে ওকে নিয়ে আসতো হাটে। লক্ষ্মণ সর্দার মরবার পরে তার ছেলে ভীম ওকে বল্লে—বাবার জায়গাটিতে তুমি বসে বেচা-কেনা কোরো দাদা। আমি হাট করা ছেড়ে দিলাম। বেগুন, পটল বিক্রী আমার পোষাবে না, আমি পাটের ব্যবসাতে নামবো ভাবচি।

দু'বছর পরে পাটের ব্যবসাতে ফেল মেরে ভীম সর্দার আবার যখন হাটে ফিরে এল বেগুন-পটল বেচতে, তখন অশ্বত্থতলায় কুড়োনের আসন পাকা হয়ে গিয়েচে।

সে সব আজ কত বছরের কথা।

নতুন হাটে বসে পুরনো হাটের সেই অশ্বত্থতলার কোণটি বড় মনে পড়ে। ওই জায়গাটি ছিল ওর লক্ষ্মী, ওখানেই বেচা-কেনার কাজে হাতেখড়ি; জীবনের উন্নতির সূচনা। আজ যুদ্ধের বাজারে পটলের দাম বড় চড়া। এত চড়া দামে কখনো পটল বিক্রী হয়নি তার জীবনে, এত পয়সাও কোনদিন হাতে আসে নি। তবুও ভাল লাগে না। পয়সাতেই কি জীবনের সুখ হয় শুধু? আজ কোথায় গেল সেই ভূষণদা, কোথায় গেল কেষ্ট ময়রার বাবা হরি ময়রা; কোথায় গেল হাটের সাবেক ইজারাদার পাঁচু নিকিরী।

পাঁচকড়ি নিকিরি কখনো হাটের খাজনা আদায় করেনি ওর কাছে। বলতো, তোমার কাছে চার পয়সা খাজনা নিয়ে কি করবো কুড়োন, একসের করে পটল দিও তার বদলে আর দুটো বেগুনের চারা। এবার বর্ষায় আধবিঘেটায় বেগুন লাগাবো ভাবচি। মুক্তকেশী বেগুন আছে?

—আছে। বীজ দেবো এখন। নি-কাঁটা বেগুন। এক একটাতে এক এক সের।

—বল কি?

—হয় না হয় চাক দেখো। নিজের চাক দেখলি তো অবিশ্বাস যাবা না?

বেলা গেল। ওদের গাঁয়ের লোকেরা গাড়ি করে বেগুন-পটল এনেছিল, খালি গাড়িতে ওরা সবাই একসঙ্গে বসে বাড়ি ফেরে। হাঁটতে হয় না এতটা রাস্তা। ওকে ডাকতে এল। হরিপদ মাইতি বল্লে—খুড়ো, বাড়ি যাবা না? চলো গাড়ি যাচ্ছে। কই দ্যাও তোমার বাজরা তুলে দিই গাড়িতে।

—যাবো। তুমি বাজরা তুলে দ্যাও, আমি মেছোহাটা পানে যাই।

—কেন যাবা? আজ মাছ কিনতি পারবা না। আড়াই টাকা কাটা পোনা।

—ও, আর আমাদের পটলের বেলা বুঝি সবাই সস্তা খোঁজে? আসচে হাটে চার আনার কমে পটল কেউ বেচতি পারবা না, সবাইকে বলে দিচ্ছি।

গরুর গাড়িতে ওদের গ্রামের আটজন উঠলো। গল্প করতে করতে যাচ্ছে সবাই। পান-বিড়ি এ ওকে দিচ্ছে, ও একে দিচ্ছে। কুড়োন মণ্ডলের সমবয়সী কেউ নেই গাড়িতে, তবে নিতাই ঘোষ আছে; সে যদিও তার দশ বছরের ছোট—বর্তমানে দুজনেই সমান বৃদ্ধ। কুড়োন নিতাইকে বল্লে—কিন্তু যতই বলো, ঝিটকিপোতার হাটে গিয়ে যে মজা ছিল, এখানে তা নেই।

নিতাই বল্লে—যা বল্লে দাদা—সেখানে অন্তত ত্রিশ বছর হাট করিচি—

—তুমি ত্রিশ বছর—আর আমি চল্লিশ বিয়াল্লিশ বছর সেখানে হাট করিচি—সেখানে মন বড্ড টানে।

—মনে পড়ে সেবার বন্যের সময় ভূষণ দাঁর দোকানে চড়ুই-ভাতি কোরলাম?

—ওঃ, সে সব কি আজকের কথা? ভূষণ দাঁ মারা গিয়েচে আজ অন্তত দশ বছর। সে অন্তত বিশ বছর আগের কথা।

—কি দিয়ে খেয়েছিলে বলো তো? আমার আজও মনে আছে—খিচুড়ী কুমড়ো ভাজা; পটল ভাজা; পোস্ত দিয়ে বড়া ভাজা—

—আমারও মনে আছে। আর হয়েছিলো বেগুনের টক।



গাড়ি করে বেগুন-পটল এনেছিল, খালি গাড়িতে ওরা সবাই একসঙ্গে বসে বাড়ি ফেরে।

গাড়ির অন্য সবাই ছোকরা বয়সের। দুই বুড়োর কথাবার্তা শুনে হেসেই তারা অস্থির। ওদের মধ্যে একটি হাস্যরত ছোকরাকে ধমক দিয়ে কুড়োন বল্লে—ওরে থাম ছোঁড়া—হেসে যে মলি? তোরা তখন কোথায়? আর জন্মে আমাদের মত বুড়ো। তোরা কি জানবি?

ছোকরা জিগ্যেস করলে—তখন পটলের দর কি ছিল দাদু?

—পয়সা পয়সা সের, কখনো বা পয়সায় দু-সের—

—দূয়ো—এমন পয়সার জুৎ ছিল' না তখন বলো—

—ওরে বাপু, হাসিসনে; হাসিসনে। তখন একখানা বাজরা পটল বেচে এক টাকা পাঁচ সিকে হোত—আর এখন হয় ষোলো টাকা সতেরো টাকা। **কিন্তু তখনই সুখ ছিল।** এখন এক বাজরা পটল বেচে একখানা কাপড় হয় না—

—ওগো, মেঘ করে আসচে। শীগগির হাঁকিয়ে চলো—পদ্মবিলের ওপারে দেখোনা মেঘ।

একজন বল্লে—বুঝলে দাদু, সেবার এই পদ্মবিলের ধারে জ্যোছনা রাতে আমার জ্যাঠা বড় মাছ পেয়েছিল ডাঙায়।

সকলে বল্লে—দূর—

বৃদ্ধ নিতাই বল্লে—দূর না, অমন হয়। আমি একবার এত বড় সরম পুঁটি পেয়েছিলাম গাঙের ধারের শর-ঝোপে। জল থেকে লাফিয়ে উঠে শরের ঝোপে আটকে ছটফট করছিল। খপ্ করে গিয়ে ধরলাম অমনি। এক সের পাঁচ পোয়া ওজন ছিল।

পুকুরে ডোবায় ব্যাঙ ডাকচে শুনে দু-একজন বল্লে—আজ রাত্তিরে ভরা হবে—ওই শোনো ব্যাঙের ডাক—

হরিপদ মাইতি বল্লে—চোখ দিও না, চোখ দিও না। আমন ধান হবে না জল না হলি। জল হোক। জল হোক। ধানের জাওলা খড় হয়ে গেল বিষ্টি অবানে। এ দুদিন যা বিষ্টি হচ্চে, এ তো শুকনো মাটি টেনে নেবে। বড় ভরা হওয়ার দরকার। টিপ টিপ বিষ্টির কাজ নয়।

সন্ধ্যা হয়ে গিয়েচে। বেশ অন্ধকার। বর্ষা সন্ধ্যায় ঝোপ-ঝাড়ে জোনাকী জ্বলচে ঘেঁটকোল ফুলের কটুগন্ধ সজল বাতাসে।

ওরা গ্রামে পৌঁছে যে যার বাড়ি চলে গেল।

জনগণ ও রবীন্দ্রসংগীত

শ্রীসুধীরচন্দ্র কর

বৈষ্ণব কবিতা সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ একদিন লিখেছিলেন—

বৈষ্ণব কবির গাঁথা প্রেম-উপহার
চলিয়াছে নিশিদিন কত ভারে ভার
বৈকুণ্ঠের পথে। মধ্যপথে নরনারী
অক্ষয় সে সুধারাশি করি কাড়াকাড়ি
লইতেছে আপনার প্রিয়-গৃহতরে
যথাসাধ্য যে যাহার; —

আজ রবীন্দ্র-সংগীত সম্বন্ধেও সে কথাই মনে হয়। আবির্ভাবের সময় দেশে কবি যেমন দেখেছেন, বৈষ্ণব কবিতার প্রভাব, বলা চলে যে, তিরোভাবের সময় শিক্ষিত মহলে তিনি তারো বেশি প্রভাব রেখে গেছেন রবীন্দ্র-সংগীতের। রবীন্দ্র-সংগীত সত্যই মর্তে স্বর্গ সৃষ্টি করেছে। —সুরের বিশিষ্ট আবেদন পার্থিব অন্য সব কিছুকেই করে দেয় অবান্তর রসিকের মনে। কিন্তু দেশে স্বর্গমর্তের তফাৎ বাধিয়েছে ওর কথায়। যারা অর্থ জানে তারাই গানগুলিকে উপভোগ করে বেশি করে, আর সেই বিশেষ ক্ষমতার অধিকারে তারাই ওর চর্চাকে নিয়েছে জন্ম-স্বত্ব করে। ওর প্রভাব আজ শুধু শিক্ষিত মহলেই সীমাবদ্ধ,—জনসাধারণ, অর্থাৎ চাষাভূষো প্রভৃতির কাছে রবীন্দ্র-সংগীত হয়ে আছে আজও বৈষ্ণব কবিতারই মতো সুদুর্লভ, দেবভোগ্য, মর্তবাসীর কাছে কবির ভাষায় স্বর্গের 'সুধাস্রোত' বিশেষ। অভিজাত, বিদগ্ধ এবং অর্থবান—সমাজের এই একটা বিশেষ শ্রেণীরই তা ব্যবহার্য, তার ধারায় স্নান, পান, কেলি অধিকার শুধু বড়োদেরই —মর্তলোকেও সেই যারা দেবতারই সামিল। কিন্তু—'এ কি শুধু দেবতার।'

স্বতঃই মনে হয়, ছোটোলোকেরা মানে জানে না, ওরা এ-গানের বুঝবে কী। রচনার যে চারুশিল্প, ভাষার যে মাধুর্য, ছন্দের যে আন্দোলন, ভাবের যে মহত্ত্ব, চমৎকারীত্ব—এ শিক্ষিত মহলেরই অধিগম্য; গানগুলির পরিবেশ ও অনুভবগুলিও সেই মহলেরই তো জিনিস; স্বয়ং স্রষ্টা রবীন্দ্রনাথের মনোভূমিই যে সেই মহলের।

তাহলেও রবীন্দ্রনাথের গানের রস স্থায়ী রস। তাতে মানুষের শাশ্বত স্নেহ-প্রেমাদি চিত্তবৃত্তিরই সুষ্ঠু বিকাশ রয়েছে, সুখ-দুঃখময় মানবজীবনের গভীরতম বেদনাই প্রতিধ্বনিত এর পংক্তিতে পংক্তিতে, সুরের প্রতিকম্পনে তার কান্নাহাসির যে দোলা, সে দোলা এই মানুষেরই চিত্তের।

শুনি সেই সুর
সহসা দেখিতে পাই দ্বিগুণ মধুর
আমাদের ধরা;—

মহাকবির লেখনীতে সমাজের উচ্চশ্রেণীর উচ্চকথা বিচিত্র ভাষাভঙ্গিতে বেশি করে প্রকাশ পেলেও মূলত তা যে মানুষেরই মনের কথা। তাই মানুষের কাছে তার আবেদন কিছু না কিছু সর্বস্তরেই পৌঁছবে। এই সার্বজনীনতাই মহৎ সৃষ্টির মহৎ গুণ। কবির কাব্যের চেয়ে কবির গানের সুরে এই আবেদন আরো বেশি অনুস্যূত। আঙ্গিকের বাধা অবশ্য উচ্চকলার ক্ষেত্রে সর্বত্রই জনগণের পক্ষে দুরূহ। কিন্তু এক্ষেত্রে আঙ্গিক জন-সংস্কৃতির প্রতিকূল নয় বলেই এ অপেক্ষাকৃত গ্রহণসাধ্য। জনসাধারণকে জাতীয় মহাকবির সহস্রদ্বার কীর্তিসৌধের অন্তর্নিহিত অতুল আনন্দ-বৈভবের কোন দিক দিয়ে উত্তরাধিকারের অংশ দিতে হলে এই গানের দিকটাই বরঞ্চ তার অনুকূল ক্ষেত্র। ভাষা ছাড়াও পাখির গান যদি মানুষের প্রাণে লাগে, মানুষের প্রাণে সাড়া জাগাবে না কি? গল্পগুচ্ছের 'শুভা'র কথা মনে পড়ে। বোবা গোরু-গুলির সঙ্গে নীরব ভাষার উত্তর-প্রত্যুত্তর চলত বোবা মেয়েটির। বেদনার আবেদন সর্বত্র ভাষা মাধ্যমের অপেক্ষা রাখে না, সোজাই গিয়ে প্রাণে লাগে। মূক জনসাধারণও তাদের বোঝাটাকে ভাষায় পরিষ্কার না বুঝাতে পারুক, তাদের মতো করে একরকম তারা বুঝে নেবেই গানের অন্তর্নিহিত হাসিকান্নার রস, তাই থেকে সেই 'ধরার সঙ্গিনীটি'র মতো—

ওই গানে যদি বা সে পায় নিজ ভাষা—
যদি তার মুখে ফুটে পূর্ণ প্রেমজ্যোতি
তোমার কি তাঁর বন্ধু, তাহে কার ক্ষতি!

কাউকে চিরকাল গণ্ডি বেঁধে অশিক্ষিতত্বে অচল রাখা যায় না। মানুষে মানুষকে 'জাতে ঠেলে, আবার 'জাতে ওঠায়' তাতে মানুষেরই মহৎ কৃতিত্ব। রবীন্দ্র-পূর্বের শিক্ষিত সমাজই কি সংস্কৃতিতে রবীন্দ্র-পরবর্তী সমাজের সগোত্র? এই শিক্ষিতেরাই তো আপেক্ষিকভাবে একদিন অশিক্ষিত ছিল, 'সেকালের রুচির' শিক্ষিতরা আজকের শিক্ষিত সমাজে জাতে-ঠেলা। বস্তুত অনুভূতির সূক্ষ্মতা ও সৌন্দর্য দিয়ে দুই স্তরে তফাৎ অনেকখানি। রস-বোধে এই ব্যবধানের আপেক্ষিক কৌলীন্য অনেকাংশে রবীন্দ্রনাথেরই সৃষ্টি। শিক্ষিত মহলকে মনঃক্ষেত্র ঢেলে সেজে তিনিই একে জাত থেকে তুলেছেন আভিজাত্যের বৈকুণ্ঠ লোকে।

বৈকুণ্ঠ বৈকুণ্ঠই থাকুক, বৈষ্ণব গানও বৈষ্ণব গানই থাকুক, দেবতারা দেবতা থেকেই সে স্বর্গীয় গান উপভোগ করুন, কিন্তু অতি বেদনায় যেমন কবির মনের এককোণে একদিন এই প্রশ্ন আঁকুবাঁকু করেছিল, তেমনি আজো তাই করে,—

'শুধু বৈকুণ্ঠের তরে বৈষ্ণবের গান?'

রবীন্দ্রনাথের রচিত নব বৈকুণ্ঠ লোকের

দ্বারে রবীন্দ্রনাথের বেদনার সুর-স্মৃতিটুকুর রেশমাত্র ধরে সেই জিজ্ঞাসাই আজ প্রতিধ্বনিত—রবীন্দ্রনাথের গানও কি কেবলি শুধু বড়োদের বৈকুণ্ঠ বনাম বৈঠকখানার গান? আপেক্ষিকভাবে দেশের অলিতে গলিতে যে জনসাধারণ মর্তবাসী আছে,—

এ সংগীত-রসধারা নহে মিটাবার
দীন মর্তবাসী এই নরনারীদের
প্রতি রজনীর আর প্রতি দিবসের
তপ্ত প্রেমতৃষা?

ওরা যদি হীন রুচি, হীনবৃত্তির জন্য নিম্নগামী হয়ে থাকে, এই সংগীত তাদের মধ্যে মহৎ আদর্শ এবং সৌন্দর্য ও শালীনতার উন্নত বোধ জাগিয়ে তাদের গোটা শ্রেণীজীবনকেই সুসংস্কৃত করে তুলতে পারে। ভালো জিনিস পেলে মন্দ জিনিসে রুচি আপনি ক্রমে হবে মন্দীভূত। কিন্তু তাদেরকে সংস্কৃতির এ ক্ষেত্রে বঞ্চিত করলে, তাদেরকে ঘৃণা অপমানে দূরে ঠেলে রাখলে—

অপমানে হোতে হবে তাহাদের সবার সমান। কবিরই সতর্ক বাণী স্মরণীয়—

যারে তুমি নীচে ফেল সে তোমারে বাঁধিবে যে নীচে,
পশ্চাতে রেখেছ যারে সে তোমারে পশ্চাতে টানিছে।
অজ্ঞানের অন্ধকারে আড়ালে ঢাকিছ যারে
তোমার মঙ্গল ঢাকি গড়িছে সে ঘোর ব্যবধান।
অপমানে হোতে হবে তাহাদের সবার সমান॥
দেখিতে পাও না তুমি মৃত্যুদূত দাঁড়ায়েছে দ্বারে,
অভিশাপ আঁকি দিল তোমার জাতির অহঙ্কারে।
সবারে না যদি ডাক, এখনো সরিয়া থাক,
আপনারে বেঁধে রাখো চৌদিকে জড়ায়ে অভিমান—
মৃত্যুমাঝে হবে তবে চিতাভস্মে সবার সমান॥

এদের রুচির উন্নতির সঙ্গে সমগ্র জাতির সংস্কৃতিমানই হবে সমুন্নত।

সুর দিয়েই প্রধানত সংগীতের সার্থকতা বিচার্য। কথা তো সাহিত্যের এলাকার জিনিস। আমরা হিন্দী গান গাই, শুনি, কথায় উদাসীন থেকে। সুরের আবেদনেই থাকে আমাদের লক্ষ্য। নিছক সুরেই মনোহরণ করে বলে হিন্দী গানকে শাস্ত্রীয় গান বা মার্গ-সংগীত বলি। রবীন্দ্র-সংগীতও কথা নিরপেক্ষ শুধু সুরের টানে কোথাও ভালো লাগে কি না, অর্থাৎ বিশুদ্ধ গীতিকলার ক্ষেত্রে তার সার্থকতার সম্ভাবনা কতদূর সেই সত্য প্রমাণের ক্ষেত্রেই আমাদের মনে হয়, এক হচ্ছে কথা-উদাসীন অ-বাঙালীমণ্ডল, আর হচ্ছে এই বাঙালী জনসাধারণ।

রবীন্দ্রনাথের সুরগুলি জনগণের হৃদয় স্পর্শ করে কি না, তার পরীক্ষা হয়নি; পরীক্ষার যেটুকু সুযোগ মিলেছে সে সিনেমায়,—ব্যবসাদারির পরিবেশে। এটা জাতির পক্ষে কলঙ্কজনক হোলেও, সত্যি। সিনেমায় দেখা যায়, রবীন্দ্র-সংগীতের সমাদর দিনে দিনেই বৃদ্ধিশীল। থাক না তার পেছনে নাটকীয় সংস্থান কৌশলের সহায়তা, কিন্তু এও সত্য যে, যা লোকে শুনছে, ভালো লেগে গাইবার স্পৃহা জাগছে বলেই তারা পথে-ঘাটে তা গেয়ে চলেছে। সুর হয়তো সর্বাঙ্গশুদ্ধ নয়। এই সময় যদি শুদ্ধ সুর শেখাবার সুযোগ দেওয়া হোত তাদের, স্থানে স্থানে কেন্দ্র খুলে, তবে আরো ভালো ভাবে গেয়ে সুরের সৌন্দর্যে ও মাধুর্যে তারা আরো আনন্দ নিজেরা পেত, বিলাতো তা পরকেও। এ ভাবেই কীর্তন, বাউল এবং অন্যান্য জাতীয় সংগীত শাখার মতো রবীন্দ্র-সংগীতও হয়ে পড়ত দেশবাসীর জাতীয় জিনিস। ঘরে ঘরে এভাবে না ছড়ালে, অর্থাৎ জাতির প্রাণে প্রাণ গেঁথে না গেলে সুদূর দেশকালের পরিধিকে পেরিয়ে সম্ভাব্য মহানতায় এ সংগীত অমর হোতে পারবে কি? যতই ভালো জিনিস হোক, টিঁকে থাকতে হোলে জাতির অন্তরের সঙ্গে যোগ চাই। রবীন্দ্রনাথ অন্তিমদশায় জোর দিয়ে এই ভবিষ্যদ্বাণী করে গেছেন। আরো বলেছেন জাতিকে তার গান গাইতে হবে গাইতে হবে ঘরে ঘরে। বলে গেছেন, যদি কোনো রচনা নিয়ে আমি অমরত্বের অহঙ্কার করতে পারি, সে আমার এই সংগীত। এই সংগীতেই আমি রেখে গেলাম পূর্ণ বিশ্বাসে, রইল এ জাতির বিয়েতে, শ্রাদ্ধেতে, সুখে-দুঃখে ঘরকন্নার তুচ্ছাতিতুচ্ছ নানা অনুষ্ঠানে। জন্ম থেকে মৃত্যু অবধি সকল অবস্থার সকল রকম বেদনাই আমি ধরে ধরে গেঁথে দিয়ে গেলাম এই গানে। জাতি বাঁচলে তাকে গাইতেই হবে আমার গান। প্রাণের মধ্যে তিনি জাতির প্রাণ অনুভব করেছিলেন, প্রাণ দিয়েই গানে গানে সে প্রাণ ফুটিয়েছেন; তাই তাঁর গান যে জাতির প্রাণের গান হোতে পারে বা হবেই এমন সত্য শুনিয়ে যেতে তাঁর দ্বিধা হয়নি। আশা করি, তাঁর সেই কথাকে মূল্য দিবেন যাঁরা তাঁর অনুরাগী, দিবেন জাতির যাঁরা ব্যবস্থাপক,—দিবেন সমগ্র জাতির যাঁরা প্রধান অংশ—সেই জনগণ। তাঁর গানকে জনগণের গান করবার ব্যবস্থা করতেই হবে। সেই হবে তাঁর স্মৃতির একটি অন্যতম যথার্থ পূজা। আজ জন-জাগরণের যুগে জনকর্মীদের এবং স্মৃতি-রক্ষার দিনে দেশব্যাপী ভারপ্রাপ্ত কর্মরত বিরাট অনুষ্ঠানটির এ বিষয়টির ব্যবস্থায় তৎপর হবার দায়িত্ব আছে। এদিক দিয়ে বিশেষ করে রবীন্দ্র স্মৃতিরক্ষা কমিটির কার্যসূচীতে এ বিষয়টির বিশিষ্ট স্থান পাবার কথা।

কিন্তু তাচ্ছিল্য করে বাঁ হাতের ক্ষুদ-কুঁড়ার দান নয়—ব্যবস্থা করতে হবে ভালো গানগুলি সবই ভালো করে ছড়াবার। শুধু খানকয়েক জাতীয় সংগীত বা কীর্তন বাউল ঢঙের সহজে জন-আবেদনমূলক গান নয়, সুরৈশ্বর্যের মণিকোঠার সন্ধান দিতে হবে তাদের মধ্যে বেছে বেছে সুকণ্ঠ গুণীদের; সেখানে জাতি দেখে পাঁতি নয়, কাঞ্চন বা বিদ্যা কৌলীন্যের বাছবিচার নয়। গানের ক্ষেত্রে জাতি হচ্ছে সুর আর বে-সুরের। সুরে যার অধিকার আছে, তারই সহজ অধিকার থাকবে ভালো গানে। ছোটো-বড়ো ধনী-দীন পুরুষনারী সকল জাতির সকলে এক একটি সংঘে মিলে গানের নিয়মিত চর্চা করলে দেশ জুড়ে হবে একটি বিরাট আনন্দ-নিকেতনের সৃষ্টি; রবীন্দ্র সংস্কৃতির দুই ধারা—শান্তি-নিকেতন ও শ্রীনিকেতনের মতো এই 'আনন্দ নিকেতনের' আর একটি ধারাতে রয়ে যাবে কবির আর একটি অবদান; সে আনন্দে প্রাণ পাবে সমগ্র জাতি। এই সংগীতের ধারাটিকে কেবল বিশেষ একটি শ্রেণীর আওতায়, দেবোদ্দেশে উৎসর্গিত পুষ্করিণীর মধ্যে ধরে রাখলে একদিন পুকুর শুকিয়ে ধারাটি লোপ পাবার বা অচলতায় দূষিত হবার ভয় আছে। জনচিত্তের চিরবহমান সমুদ্রবক্ষে একে মুক্তি দিতে হবে। পুকুরগুলিও থাকবে কিন্তু সমুদ্রের যোগে তলায় তলায় তার ধারাবেগ অব্যাহত থেকে সে পুকুর থাকবে তখন ভরপুর এবং নির্মল সুস্বাদু সুগভীর জীবনরসে সঞ্জীবিত। যেমন সঞ্জীবিত থেকে আসছে আপামর-বাহিত কীর্তন গানে শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে বাঙালীর শিক্ষিত সমাজ। কিন্তু রবীন্দ্র সংগীত কীর্তন বাউলের চেয়ে সুরৈশ্বর্যে, বিষয় বা বেদনাবৈচিত্র্যে, সর্বোপরি বিশ্বসাহিত্য-মূল্যে ন্যূন তো নয়ই, বরং তারো চেয়ে বেশি দিন ধরে বেশি লোকের মধ্যে তা বেঁচে থাকবারই সম্ভাবনায় পূর্ণ, অবশ্য যদি তা সুসংগঠিত প্রচেষ্টায় অনুশীলিত ও প্রচারিত হয়ে চলে। কীর্তনের পিছনে বৈষ্ণবসম্প্রদায়ের সংঘবদ্ধ বিপুল জন-সংগঠনক্রিয়াও লক্ষ্য করবার বিষয়। তেমনি-ভাবে সংগঠিত সুসম্বদ্ধ প্রচেষ্টায় অগ্রসর

হয়ে অশিক্ষিত সাধারণ মহলের কেন্দ্রে কেন্দ্রে রবীন্দ্রসংগীতের সুর শুনালে তারা আকৃষ্ট হবেই, তারপরে কথার অর্থ কিছু কিছু বুঝিয়ে দিলে তারাও কিছু কিছু করে তা বুঝতে না পারবে এমন নয়। কারণ কীর্তন বাউলেরও অনেক গান দেখা যায় ভাবগাম্ভীর্যে তা শিক্ষিতদেরও অনধিগম্য। কিন্তু এই দেশের লোকশিক্ষা-পদ্ধতির নিজস্ব প্রবণতা মতোই নিরক্ষর চাষারা সেগুলি উপভোগ করে তার নিগূঢ় অর্থেই। রবীন্দ্রনাথের নিজস্ব শিক্ষা-পদ্ধতিরও তো কথা,—অবিকৃত সত্য ছড়িয়ে দেওয়া চাই সমাজের সর্বস্তরে, যে যার অধিকার মতো সত্যকে আয়ত্ত করবে তার নিজস্বমতে। তিনি নিজের জীবনেও গ্যাটে সেকস্‌পীয়র ইত্যাদির কাব্য বা দুরূহ দর্শন বিজ্ঞান ইত্যাদি ছোটোবেলা থেকে পড়ে গেছেন নির্বিচারে, কেউ তাঁকে বাধা দেয়নি, তিনিও অন্তরের দ্বিধায় ঠেকে যাননি। যে বয়সে যার থেকে যতটা নেবার বুঝে বুঝে নিয়ে অগ্রসর হয়েছেন; শেষটা লোকশিক্ষাক্ষেত্রে তাঁর অভিমতও জানিয়েছেন এ পদ্ধতির অনুকূলে। শিক্ষিতেরা গানের মানে বুঝিয়ে দিতে গিয়ে মনের অনেকটা কাছে দাঁড়াবে অশিক্ষিতদের। ক্রমে মানে বুঝে যে উপরি আনন্দ পাবে, তার প্রতিদানে জাগবে জ্ঞানদাতার প্রতি শিক্ষার্থীর স্বাভাবিক কৃতজ্ঞতা। অশিক্ষিতদের কাছ থেকে এই কৃতজ্ঞতা ছাড়াও মাঝে মাঝে আচমকা দেখা যাবে শিক্ষিতেরা উপহার পেয়েছেন এক একটি সুকণ্ঠের সুরের আনন্দ।

বৈষয়িক সংসারের কাজের প্রয়োজনে যে-ই যে স্তরে থেকে যতকিছু উচ্চনীচ মান অপমানের ভূমিকায় চলাফেরা করুক,—বড়োবাবু, বেহারা, মনিব-প্রজা খাতক মহাজন যে সম্বন্ধ যতই বিকৃত ব্যাহত, বা যত দূরায়িত করুক মানবের আত্মিক সম্বন্ধকে—শুধু বিষয়স্বার্থবিরহিত এই একটি ক্ষেত্রেই দেখা যাবে সংগীতআনন্দে মেতে সকলেই সকল আড়াল অজানিতে কখন ঘুচিয়ে দিয়ে এক হয়ে বসেছে একাসনে। দিনের শেষে রাত্রির পরিবেশে রাত্রির ঘুমের মতোই এই গীতি-আসরের আনন্দ আবেসের প্রতিক্রিয়া ব্যক্তিমনকে সেই সঙ্গে ক্রমে সমাজকেও করে চলবে দিনের পর দিন নূতন প্রাতের শিশির ধোয়া নূতন ফোটা ফুলগুলির মতো টাটকা স্নিগ্ধ সুনির্মল। এইভাবে তার জড়তা ঘুচিয়ে, দুশ্চিন্তা দুষ্প্রবৃত্তি ঘুচিয়ে, অনেক দুর্গতি থেকে করবে তাকে ত্রাণ। সমাজের উচ্চনীচের মধ্যে ব্যবহারিক সম্বন্ধে উচ্চনীচ থাকলেও আত্মিক সম্বন্ধে সম্প্রীতির ফল্গু যোগ চলবে এই একটা সংগীত সংস্কৃতি সূত্রে। সামাজিক স্বাস্থ্যোন্নতিতে তার প্রতিক্রিয়া হবে অভূতপূর্ব ফলপ্রদ। বক্তৃতা নয়, সংঘর্ষ নয়, দেশহিতের কোনো গালভরা নামের জাঁকালো উদ্দেশ্য নয়, নয় কোনো—"বাদ" বা প্রতিবাদ,—শুধু নিছক একটা আনন্দ ও প্রীতি উপলক্ষ্য নিয়ে এই রবীন্দ্রসংগীত ওটা থেকেই দেখা যাবে তলে তলে সর্বসাধারণের মিলনক্ষেত্র রচনা দ্বারা জাতীয় প্রগতির একটা মহান সুকঠিন কাজ কত সহজে সিদ্ধ হয়ে চলেছে। রবীন্দ্রনাথ জাতীয় জাগরণের দিনে মানুষের সঙ্গে মানুষের আত্মিক যোগকে মুখ্যসূত্র ধরেছেন। সেইখানে যোগযুক্ত হবার একটি সহজ ও কার্যকরী পন্থা হিসাবে রবীন্দ্র-সংগীতের সম্ভাবনাকে কাজে লাগাবার চেষ্টায় প্রত্যেক দেশহিতৈষীরই অগ্রসর হওয়া উচিত।

গানে জাতির জাগ্রত এক মহান সম্মিলিতরূপ কবির চোখে একদিন সবিস্ময় সম্ভ্রম জাগিয়েছিল বৈদেশিক মহলে। তিনি ইতালিতে গিয়ে একবার দেখেছিলেন, হাজার হাজার লোকের একটি সমবেত সংগীতানুষ্ঠান। বোধ হয় সেটি কোনো প্রসিদ্ধ সংগীতস্রষ্টার শতবার্ষিকী অনুষ্ঠানে শ্রদ্ধাঞ্জলির উপলক্ষ্য হয়ে থাকবে। সেই সহস্র কণ্ঠের ও যন্ত্রের সমবেত সংগীত শুনে অবধি আমৃত্যু তাঁর মনে গাঁথা ছিল সেই দূরাকাঙ্ক্ষার ছবি,—ভরসা করে আমাদের দেশে তা দেখে যাবার আশা জানান নি, কিন্তু প্রসঙ্গত মাঝে মাঝে সেই অলৌকিক ঘটনাস্মৃতির করে চলতেন পুনরুক্তি। ঐসঙ্গেই মুখ দিয়ে বেরিয়ে পড়ত, "রেখে গেলেম, গাইতে হবে আমার গান ঘরে ঘরে।"

ছোটো ও বড়ো, সমাজের এই বড়ো দুই স্তরে মিলন ঘটাবার মহাকাজে রবীন্দ্র সংগীতেরই উপযোগিতার কারণ দুদিক থেকে দুটি। এক হচ্ছে এ সংগীত জাতীয় বনেদী সংগীত ধারার ভিত্তিতে রচিত; এবং অন্যান্য শাখাউপশাখার অর্থাৎ লৌকিক ধারার সংগীত কৌশলও আত্মগত করে জাতির সঙ্গে এ সংগীত একেবারে নাড়ির যোগে যুক্ত। সর্বোপরি সে মনোহারীতার নিজস্ব কৌশলে সুরে সুরে বর্ণবিন্যাসের জাদু সৃষ্টিতে। জনগণ এর মধ্যে চিরন্তনকে পাবে বিচিত্র নূতনের বেশে। তাই তাদের দিক থেকে রবীন্দ্র-সংগীতের সুরে তাদের ধাতগত আসক্তি এবং কৌতূহল অবশ্যম্ভাবী। শিক্ষিতদের তো কথাই নেই, সুর ছাড়াও তারা তো উন্নত ভাব এবং সাহিত্য রসের জন্য এমনিতেই এর অনুরাগী। এর চর্চায় বিশুদ্ধ মানসিক পরিমণ্ডলে থেকে দুই স্তরের লোকই আনন্দ উপভোগের সুযোগ পাবে। তার কারণ রবীন্দ্রসংগীত সুরে, ভাবে, ভাষায় গ্রাম্যতা বা ন্যাকামি ইত্যাদি সর্বপ্রকার আবিলতাবর্জিত। আদিরসের অশ্লীলতা নেই, আবার আধ্যাত্মিক তত্ত্বকথায় নীরসতাও মনকে বিমুখ করে তোলে না। সর্বত্র তাকে সৌন্দর্য, মাধুর্য, পবিত্রতার মধ্যে রেখে ভাবের বিচিত্র পথে গভীর গহনে ডুবিয়ে নিয়ে চলে। অন্য কোনো গানে ভাষায়, ভাবে জাতিবর্ণনির্বিশেষে মেশবার এমন উদার অসাম্প্রদায়িক সর্বমানবিক বিষয় নির্বাচন নেই। এই গানের আসর তারই জন্য একটি জাতীয় মিলন-মঞ্চের সম্ভাবনায় মহীয়ান। শিক্ষিত-অশিক্ষিত দুয়েরই এতে কল্যাণের যোগ এত সমস্ত কারণেই সম্ভব।

যাঁরা মনে করেন, ছড়িয়ে দিলে এর জাত যাবে, তাঁরা এর প্রাণশক্তিতে যথেষ্ট বিশ্বাস-বান কি না সন্দেহ। আগেই বলা হয়েছে, আবার বলি,—সকলের মনের জিনিস হোলেই এর মান বাড়বে। সে মান বৈঠক-খানার পোষাকী মানের চেয়ে বড় এবং বেশী

টে'কসই। বেশী ছড়ালেই যে গুণ নষ্ট হবে এমন নয়। আটপৌরে রকমে মোটামুটি সুরের ঠাট বজায় রেখে কণ্ঠে কণ্ঠে দেশব্যাপী এ গান ফিরবে ঘরে ঘরে, মাঠে-ঘাটে। তার থেকেই প্রকৃত সুরের বিশুদ্ধতার জন্য লোকের কৌতূহল ও আগ্রহ বাড়বে স্বাভাবিকভাবে। কয়েকটি মূলকেন্দ্র যদি থাকে সেই সুরের রক্ষণ ও বিশেষজ্ঞ তৈরীর কাজে নিষ্ঠাসহকারে নিয়মিতব্রতী, তবে তাদের কাছেই ছুটে আসবে পিপাসিত চিত্ত—লোক-সংঘ—'অনন্ত তৃষায় জাগ্রত প্রাণ তৃষিত চকোর সমান হয়ে আসবে তারা গীত সুধার তরে'। সমাজের সর্বস্তরে সর্বত্র গানের এই চাহিদার সঙ্গে তাদেরও মান বাড়বে সঙ্গে সঙ্গে। দেশকে সঠিক সুরের ইন্দ্রজালে চিরতৃপ্ত চির-চমৎকৃত ক'রে নিজেরাও কেন্দ্রগুলি সেই খানে বিপুল প্রাণশক্তির প্রবর্তনা পাবেন দিনে দিনে।

জনগণের পক্ষে রবীন্দ্রনাথের সুর অনধিগম্য, একথা বলা চলে না। কেননা, জনগণের একান্ত প্রিয় ও অভ্যস্ত কবি-সংগীত বা কীর্তনে স্থলবিশেষে অতি উচ্চাঙ্গের সব দুরূহ রাগ-রাগিণী তাল-মানের জটিলতা থাকা সত্ত্বেও তা তাদের দৈনন্দিন জীবনের উপভোগের অঙ্গ করে গ্রহণ করতে কোথাও বাধে নি। এমন কি দেখা যায়, একটি বিশেষ ধারাসূত্রে এদেশের দর্শনের জটিল তত্ত্বগুলির মতোই মার্গ-সংগীতও জনগণের মধ্যে সকলে না হোক অনেকে বেশ ভালোভাবেই আয়ত্ত করে নেয়; অর্থাৎ তা তারা আঙ্গিকের দিক থেকে বুঝতে এবং যাচাইও করতে পারে। রবীন্দ্র-সংগীতে শাস্ত্রীয় রাগ-রাগিণী বহু বিস্তার বা তার বহুকাল সাধনাসাপেক্ষ আঙ্গিকের জটিলতা নেই, অথচ তারই ভিত্তিতে, তারই নানারূপ সংমিশ্রণ থেকে পরিমিত বিস্তারের সুর-বৈচিত্র্যে এ সংগীত ঐশ্বর্যবান। একে আয়ত্ত করাও চেষ্টা-সাপেক্ষ বটে, কিন্তু তা জনগণের পক্ষে অসম্ভব তো নয়ই। বরং মার্গ-সংগীতের তুলনায় সহজলভ্য।

তবে ঠিকভাবে রবীন্দ্র-সংগীত আয়ত্ত করার সময় আসতে আরো বহুদিন দেরি। যাদের মধ্যে এ গান আজ চলছে সেই শিক্ষিতরাই কি সকলে তাকে রূপে, রসে যথার্থ তাৎপর্যে সম্যক্ আয়ত্ত করতে পেরেছেন? সাহিত্য এবং সংগীত দুদিকেরই আঙ্গিক ও রসে রীতিমত অধিকার থাকলেই সে আয়ত্ত সম্ভব। সেই দিক থেকেই সেই অর্থেই আসলে রবীন্দ্র-সংগীত দুরূহ। রবীন্দ্র-সংগীত সংস্কৃতির অপেক্ষা রাখে, একথা সত্য। দেশে জনশিক্ষার বহুল প্রচারে তাদের সংস্কৃতিমান না বাড়া পর্যন্ত রবীন্দ্র-সংগীতের চর্চা আদর্শমতো হবার নয়। কিন্তু ঠিক আদর্শমতো না হওয়া অবধি কিছুই হবে না, এও আবার ঠিক নয়।

দুর্ভিক্ষের দিন। ঠনঠনে কঠিন অনাবাদী গোটা প্রান্তরটাতে কোদাল পেড়ে লাঙল চালিয়ে চাষের কাজ সেরেসুরে যত শিগ্‌গির হয় বীজ ছড়িয়ে রাখা হোক; যখন সর্বত্র অঙ্কুর দেখা দেবে, নিড়ানী চালানো, বেড়া দেওয়া বা সেচের কাজ করার সময় আসবে পরে। দুমুঠো খেয়ে বাঁচুক লোকে, তারপরে রয়েসয়ে সরকারী কৃষি-গবেষণাগার থেকে ভাল ফসলের বীজ এনে কৃষির নানা পারিপাট্যে শস্যের উৎকর্ষ বিধানে ক্ষেতের শোভায় ও খাদ্যের রকমারী প্রাচুর্যে কৃষি-সুখ উপভোগ করা যাবে। তখন ভোজ হবে আরো জমিয়ে। আপাতত দেশে মোটা ভাত, মোটা কাপড়ের জোগান চাই যেমন অগোণে—তেমনি অন্তরের দিকে মোটামুটি জনগণের রসতৃষ্ণা মিটাতে এমন একটি অফুরন্ত সুস্বাদু, সুনির্মল ধারা ছড়িয়ে দেওয়া চাই ব্যাপকভাবে ঘরে ঘরে।

তাই শিক্ষাবিস্তারে সংস্কৃতি বৃদ্ধির অপেক্ষায় এ কাজ ফেলে রাখার নয় কিছুতেই। সংস্কৃতি না হোলে সংগীত হবেই না এমন নয়, বরং সংগীতের থেকেই সংস্কৃতি প্রচারে সাহায্য হবে; এটাই সত্য।

মানুষ রবীন্দ্রনাথ

শ্রীকাননবিহারী মুখোপাধ্যায় এম-এ

(১)

মহামানুষ আসেন, মহামানুষ চলে যান। তাঁদের কীর্তি থাকে অমর হয়ে। অস্তসূর্য যখন মেঘের আড়ালে যায় বিলীন হয়ে, আকাশ ভরে ছড়িয়ে থাকে রঙের খেলা। কাব্যের রস উপভোগ করার জন্য একথা বলা যায় না যে, কবি অপরিহার্য। লেখককে বাদ দিয়েও তাঁর লেখার মহিমায় মানুষ মুগ্ধ হয়েছে—এমন দৃষ্টান্ত অনেক আছে। সেক্সপিয়র কে ছিলেন তার সঠিক খবর জানা নেই, তবু তাঁর কাব্যের রসে দেশে দেশে শত শত গুণীর মন ভরে ওঠে। সংসারে মানুষের চেয়ে মানুষের কীর্তিই বড়।

কিন্তু সময়ে সময়ে এমন এক-একজন মহামানুষ আসেন, যার সম্বন্ধে সাধারণ নিয়ম খাটে না। রবীন্দ্রনাথ ছিলেন এমনি একজন মহামানুষ। তাঁর লেখা কাব্য অপরূপ সন্দেহ নেই। কিন্তু তেমনি অপরূপ ছিলেন তিনি মানুষটি। কীর্তি ছাড়াও তাঁর মধ্যে এমন কিছু ছিল, যার সম্বন্ধে আমরা চুপ করে থাকতে পারি না। মানুষটি নিজেই ছিলেন এক অপূর্ব মহাকাব্য। যাঁরা তাঁকে কাছে থেকে দেখবার সুযোগ পেয়েছিলেন তাঁরা সকলেই স্বীকার করবেন, শত্রু হোক, মিত্র হোক তাঁর কাছে গিয়ে কেউ তাঁর সম্বন্ধে উদাসীন হয়ে থাকতে পারত না। তাঁর মত ব্যক্তিত্ব পৃথিবীর ইতিহাসে খুব কম দেখা গেছে। তাঁর কাছে দাঁড়ালে হিমালয়ের কথা মনে পড়ত। তিনি ছিলেন পুরুষশ্রেষ্ঠ। বিশাল ছিল তাঁর দেহ—বিশালতর ছিল সেই দেহাশ্রয়ী ব্যক্তিত্ব। রবীন্দ্র-কাব্য একান্ত যত্নের পাঠ্য বস্তু। মানুষ রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে বিচার-বিশ্লেষণ করতে বসলে বোধ হয় এ-কাজও তাঁর কাব্যের মত বিস্ময়কর; মানুষের দেশে তিনি এসেছিলেন মানুষ হয়েই তবু যেন চারিদিকের পৃথিবীতে তাঁর মিল খুঁজে পাওয়া যায় না।

অবশ্য রবীন্দ্র-কাব্য রবীন্দ্র-জীবনের সঙ্গে এমনভাবে জড়িয়ে আছে যে, মানুষ রবীন্দ্রনাথকে না বুঝলে তার মর্মমূলে যাওয়া অসম্ভব। তাঁর রচনাবলীর ঠিক ঠিক বিশ্লেষণের জন্য আগে চাই তাঁর প্রকৃতির অন্তর্দেশের সন্ধান। কিন্তু সে প্রয়োজন ছাড়াও রবীন্দ্র-চরিত্রের নিজস্ব একটি আকর্ষণ আছে। প্রবাদ আছে, বুদ্ধের আগে অনেক বুদ্ধ জন্ম নিয়েছিলেন। এক বুদ্ধের কথা আমরা সকলেই জানি, অন্যেরা চিরকাল থেকে গেলেন অজানা। সংসারে যে মহাপুরুষের জীবন লোকচোখে ফলে-ফুলে ফুটে ওঠে, তাঁর কথা আমরা জানতে পারি। তাঁকে নিয়ে রচনা করি আমাদের গোষ্ঠী জীবনের ইতিহাস। কিন্তু লোক-চোখের অগোচরে আরও কত মহাপুরুষ আসেন—সবার অজান্তে জীবন দিয়ে তাঁরা সৃষ্টি করে যান নব নব আন্দোলনের পরিমণ্ডল। সংসারীর চোখে জীবন তাদের সাফল্যের গৌরবে মহৎ নয়। মহাকালের রঙ্গভূমিতে তাঁরা কেবল হারের খেলাই খেলে ভবলীলা শেষ করেন—কীর্তির জয়মালা তাঁদের নামকে মানুষের স্মৃতিতে অমর করে রাখে না। তবু ব্যক্তি হিসাবে তাঁরা অবহেলার নন। যে মহাশক্তির উৎস নিয়ে তাঁরা জন্ম নেন সেই শক্তির দ্যুতিতে মহনীয় হয়ে ওঠে তাঁদের বিরাট ব্যক্তিত্ব। সন্ধানী মানুষের কাছে অপরের কীর্তি-কথার চেয়ে সেই বিরাট ব্যক্তিত্বের কাহিনী কম মনোহারী নয়।

রবীন্দ্রনাথকে দেখলে সেই কথা মনে হত। ভাগ্যের কোন আকস্মিক অনুগ্রহে তিনি কীর্তি প্রতিষ্ঠা করে যাননি। নিজের চেষ্টায় প্রচণ্ড সাধনার দ্বারা অর্জন করে গেছেন কালবিজয়ী নাম। কিন্তু যদি এমন হত যে, অদৃষ্টের কোন যোগাযোগে তিনি তাঁর রচনাবলী সৃষ্টি করে না যেতেন, তবু সেই মানুষটির ব্যক্তিত্বের সংস্পর্শে এসে তাঁর প্রতি আকৃষ্ট না হয়ে কেউ থাকতে পারত না। এমনই বৈদ্যুতিক উপাদানে গড়া ছিল তাঁর ব্যক্তিত্ব। বড় হয়ে তিনি জন্মেছিলেন—আজীবন বড় হবারই সাধনা করে গেছেন। সকল দেশের সকল কালের মানদণ্ডেই রবীন্দ্রনাথ ছিলেন বিরাট পুরুষ। তাঁকে উদ্দেশ করে সত্যিসত্যিই বলা যায়, "তোমার কীর্তির চেয়ে তুমি যে মহৎ!"

(২)

রবীন্দ্রনাথের ব্যক্তিত্বের বিশেষত্ব শুধু বিরাট রূপে নয়—বিচিত্র রূপে।

১৯৩৭ খৃষ্টাব্দের কথা। রবীন্দ্রনাথ তখন সবেমাত্র ইরিসিপিলাস রোগ থেকে উঠেছেন। সম্পূর্ণ আরোগ্য হননি। একটু একটু করে সেরে উঠেছেন। শান্তিনিকেতনে কদিন অবিশ্রান্ত বৃষ্টি হবার পর সেদিন বিকেলে শুরু হয়েছিল আকাশ ভরে শেষ রোদের খেলা। কবি বেশ খুশী মনে ছিলেন। এমনি দিনে মানুষ মানুষকে সহজভাবেই অন্তরঙ্গ কথা—ভুলে-যাওয়া ঘটনা গল্প করে। আমি সাহস করে বললুম, যতই আপনাকে দেখছি, ততই মনে হচ্ছে, আপনার কবিতার চেয়ে আপনি একটুও ছোট নন। আশ্চর্যের কথা এই যে, আজও আপনার একটা সত্যিকার জীবনী বার হল না।

হাল্কা মেজাজে হাসির ছলে কবি জবাব দিলেন, না। যারা আমার কথা লিখতে পারত, যারা আমাকে ছেলেবেলা থেকে জানত, তারা সবাই শেষ হয়ে গেছে। আমি যে বড় বেশি দিন বেঁচে আছি।

ক্ষণিকের জন্য তাঁর মনে যেন স্মৃতির এক সারি ছবি ভেসে উঠল। কবি কয়েক মুহূর্ত অন্যমনস্ক হয়ে যাবার পর হঠাৎ কথা শেষ করলেন ঃ আর দেখ, এর আরও একটা দিক আছে। আমি এত নানাদিকে কাজ করেছি—আমার বীণায় এত বিচিত্র তার যে, আমার মত আর একজন ছাড়া অপরের পক্ষে আমার জীবনী লেখা কঠিন।

রবীন্দ্রনাথের মধ্যে ছিল অনেকগুলি মানুষ। অনেক প্রতিভাশালী চরিত্রের মধ্যেই এমনি একাধিক সত্তার পরিচয় পাওয়া যায়। হয়ত একদিন এ তথ্য প্রমাণিত হবে, সব মানুষই একাধিক মানুষের সমষ্টি। কিন্তু সাধারণ মানুষের মধ্যে যাদের পরিচয় পাওয়া যায় শুধু আভাসে, মহাপুরুষদের ব্যক্তিত্বে তারা নির্দিষ্ট রূপ পরিগ্রহ করে থাকে। রবীন্দ্রনাথ ছিলেন বহুরূপী মানুষ। কবি তিনি, শিল্পী তিনি, নট তিনি, সুরজ্ঞ তিনি,—এত তাঁর বাইরের জীবনের বহু রূপ। অন্তরেও তিনি ছিলেন বহুরূপী। শুধু তাই নয়। তাঁর বহু রূপের মধ্যেও বৈশিষ্ট্য ছিল। তাঁর অন্তরে বাস করতেন বিচিত্রধর্মী বহু-রূপী সত্তা। তাঁর সমগ্র ব্যক্তিত্ব গড়ে উঠেছিল নানা বিপরীতমুখী খণ্ড-ব্যক্তিত্বের সমাবেশে। তিনি শুধু বিচিত্র শিল্পের ক্ষেত্রে তাঁর সৃষ্টিশক্তি প্রয়োগ করে নিশ্চিন্ত থাকেন নি। জীবনের পরস্পরবিরোধী ক্ষেত্রে তাকে সফল করে তুলেছিলেন। চিত্রশিল্পী মাইকেল এঞ্জেলো চমৎকার চমৎকার সনেট লিখে গেছেন। ইংরেজ ঔপন্যাসিক টমাস হার্ডি খুব উঁচুস্তরের কবিও ছিলেন। কিন্তু তাঁদের সৃষ্টিশক্তি প্রবাহিত হয়েছিল বিভিন্ন অথচ সমধর্মী ক্ষেত্রে। শোনা যায়, চীন দেশে কোন কোন রাজা বড় কবি ছিলেন। আমাদের অদ্বৈতবাদী বিবেকানন্দ তাঁর লক্ষ্যের সন্ধান খুঁজে পেয়েছিলেন আর্ত মানুষের সেবায়। কবি রবীন্দ্রনাথের ব্যক্তিত্ব ছিল আরও পরস্পরবিরোধী। তাঁর অন্তরে বাস করত একাধারে শিল্পী, কর্মী

ও সাধক নিজ নিজ বিরুদ্ধধর্মী বিচিত্র প্রবৃত্তির মণ্ডলী নিয়ে।

বিশ্বপ্রকৃতির ভক্ত পূজারী ও অদ্বৈতের সাধক, সৌন্দর্যের রূপকার ও নিপীড়িত মানব আত্মার প্রতিনিধি, নিরাসক্ত দার্শনিক ও পৃথিবীর ভোগরসে আত্মহারা কবি, অপরিমেয় কল্পনাবিলাসী ও বিচক্ষণ জমিদার, আন্তর্জাতীয়তার নির্যাতিত হোতা ও স্বাদেশিকতার পরম উৎস—রবীন্দ্রনাথ এ সবই ছিলেন; অথচ বিশেষ কোন একটি ছিলেন না। তাই তাঁর জীবনী আলোচনা করতে গিয়ে অনেকের মনে হয়েছে তাঁর চরিত্র ছিল হেঁয়ালি ভরা। এই রহস্যের উৎস কোনখানে—সে সন্ধান মেলেনি বলে অনেকে রবীন্দ্রনাথের জীবনকালে তাঁর নানা বিপরীত-ধর্মী মতামত ও কার্য-কলাপ দেখে বিস্মিত হয়ে যেতেন। রবীন্দ্র-চরিত্রের রহস্যের মূল এইখানে। কবি নিজে তা জানতেন। শেষ বয়সের লেখা একখানা চিঠিতে তিনি বলেছেন, "আমার বীণায় অনেক বেশি তার—সব তারে নিখুঁত সুর মেলানো বড় কঠিন। আমার জীবনে সবচেয়ে কঠিন সমস্যা আমার কবিপ্রকৃতি। হৃদয়ের সব অনুভূতির দাবীই আমাকে মানতে হল—কোনটাকে ক্ষীণ করলে আমার এই হাজার সুরের গানের আসর সম্পূর্ণ জমে না। অথচ নানা অনুভূতিকে নিয়ে যাদের ব্যবহার, জীবনের পথে সোজা রথ হাঁকিয়ে চলা তাদের পক্ষে একটুও সহজ নয়—এ যেন এক্কা গাড়িতে দশটা বাহন জুতে চালানো। তার সবগুলোই যদি ঘোড়া হত, তাহলেও একরকম করে সারথ্য করা যেতে পারত। মুস্কিল এই, এর কোনটা উট, কোনটা হাতি কোনটা ঘোড়া আবার ধোবার বাড়ির গাধা, ময়লা কাপড়ের বাহক। * * * এটুকু প্রতিদিনই বুঝতে পারি, কবিধর্ম আমার একমাত্র ধর্ম নয়—রসবোধ এবং সেই রসকে রসাত্মক বাক্যে প্রকাশ করেই আমার খালাস নয়। অস্তিত্বের নানা বিভাগেই আমার জবাবদিহি।"

পৃথিবীতে যত রকমের মানুষ দেখা যায় প্রকৃতিভেদে তাদের কয়েকটি মূল শ্রেণীতে ভাগ করা যেতে পারে। তাদের মধ্যে যে দুটি শ্রেণী সব চেয়ে সুস্পষ্ট ও পরস্পরবিরোধী তাদের বলা যায় কবি-প্রকৃতি আর সাধকপ্রকৃতি। মূলতঃ সাধক-প্রকৃতির যে মানুষ—তার বৈশিষ্ট্য হচ্ছে একাগ্র সাধনায় নিজের ভিতরের বিরোধী খণ্ডব্যক্তিত্বগুলিকে একমুখী করে একটি পরম ব্যক্তিত্বকে বিকাশ করে তোলা। সংসারে স্বভাবতঃ কি হয় তার চেয়ে কি হওয়া উচিত তার অনুসরণ করাই তার লক্ষ্য। তার জীবনের পথ নিয়মের গণ্ডিতে বাঁধা। একতার চরম লক্ষ্য—জীবনে বিচিত্রের অনুভূতিতে সে আমল দেয় না। তার চোখে আমাদের এই জীবন নটরাজের লীলার প্রকাশ নয়—সত্যের পরম অভিব্যক্তি। কবিপ্রকৃতির ধর্ম হচ্ছে সম্পূর্ণ বিপরীত। সে চায় সহজ-পথে নিজের চরম বিকাশ করতে—সে সহজের পূজারী। বিচিত্রের অনুভূতির মধ্যে সে পায় শ্রেষ্ঠ আনন্দ। রবীন্দ্র-নাথের মনের মূল ভিত্তি বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় তিনি ছিলেন ভিত্তিমূলে কবিপ্রকৃতির মানুষ। কবিপ্রকৃতি হলেই যে কাব্যলেখক হতে হবে তা নয়। মীরাবাঈ, কবিরের মত মূলতঃ সাধক-প্রকৃতির কত মানুষ কবিতা লিখে গেছেন। আবার চিত্তরঞ্জনের মত মূলতঃ কবি-প্রকৃতির মানুষ কর্মের মধ্যেই নিজের চরম রূপ প্রকাশ করেছিলেন। কবিপ্রকৃতি রবীন্দ্রনাথের মধ্যে নিজের বিপরীতমুখী খণ্ডব্যক্তিত্বগুলিকে দমনের পথে একমুখী করার চেষ্টা দেখা যায় না। তিনি বিচিত্রের অনুভূতিকে অপরিমেয় আনন্দে সম্ভোগ করতেন। মাঝে মাঝে জীবনের পর্বে পর্বে একমুখী গতির সাধনা করার চেষ্টা করেন নি যে তা নয়—কিন্তু শেষ পর্যন্ত বুঝেছিলেন ও পথ তাঁর স্বভাবের সহজ পথ নয়।

স্বামী বিবেকানন্দও ছিলেন জটিল প্রকৃতির ব্যক্তিত্ব। তাঁর অন্তরেও ছিল বিপরীতমুখী একাধিক। একদিকে তিনি ছিলেন ভোগবিমুখ সত্যের সন্ধানী, আর একদিকে ছিলেন মানুষের সুখদুঃখে করুণার্ত শিল্পী। কিন্তু তাঁর মনের গড়ন ছিল মূলতঃ সাধকপ্রকৃতির—দুর্লভ সাধনায় তিনি নানা বিপরীতমুখী সৃষ্টি-আবেগগুলিকে একমুখী প্রবাহে বিকশিত করে তুলেছিলেন। ফলে ভারতের ইতি-হাসে উদয় হয়েছিল এক অপরূপ ব্যক্তিত্ব। কঠোর অদ্বৈতবাদের যজ্ঞভূমিতে তিনি নিয়ে এসেছিলেন করুণার সুরধুনী। পৃথিবীর ইতিহাসে এমন মানুষের প্রেমে পাগল মহামানুষ একান্তই দুর্লভ। রবীন্দ্রনাথ জীবনে আরও জটিল খেলা খেলে গেছেন। তাঁর অন্তরের বহুরূপকে তিনি একরূপের মধ্যে অপরূপ করে তোলেন নি। তিনি বহুরূপী হয়ে জন্মেছিলেন—জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত ছিলেন সেই বহুরূপীই।

অনুবাদসাহিত্য

ফালতু

কৃষণ চন্দ্র, এম-এ

[উর্দু ভাষায় আধুনিক কালের শ্রেষ্ঠ কথা-শিল্পী বলে খ্যাত কৃষণ চন্দ্র শুধু বাস্তবের চরিত্র ও চিত্রই আঁকেন—ফালতুর কাহিনী গল্প মাত্র হতে পারে কিন্তু বাস্তবেও সে চরিত্র আজ বিরল নয়।]

১৯৪৪।

১১ই ডিসেম্বরের দুপুর। খানা শেষ ক'রে অফিসের টেবিলে ঝিমিয়ে নিয়েছি ইতিমধ্যেই। তারপরেই এই ব্যাপার। সামনে এসে ও দাঁড়ালো। মানে, সেই ফালতু মেয়েটি, নায়িকা নয়। নায়িকা আর ফালতুর মধ্যে পার্থক্য অনেক। স্পষ্টই তো বুঝতে পারা যায় যে, নায়িকা হ'লে অমন অনাড়ম্বর সাধাসিধেভাবে ঘরে এসে ঢুকতো না সে। তার আসবার আগেই খবর দিতে যেত কেউ, না কেউ; তার ও তারপর আসতো নবাবী চালে। আসবার আগে থেকেই কত লোক ওকে সম্বর্ধনা করবার জন্যে ঘরে এসে পড়তো আর আমার মাথাটা টেবিলে ওই রকম ঝুঁকানো দেখলে দিতো বেশ ক'রে ঠুকে।

১৯৪৪ সালের ১১ই ডিসেম্বরের সেই দুপুরে তেমন যখন কিছু ঘটলো না তখন বুঝলুম, আমার ঘরে যে মেয়েটি এসে দাঁড়িয়েছে, সে আর যেই হোক নায়িকা নয় কক্ষণো। সামান্য ফালতুই হ'বে। জানেন তো ফালতু মেয়েদের? ওই যে যারা নায়িকা সামনে থাকলে পশ্চাদপটে সরে যায়, নায়িকা হাসলে তারাও হাসে, নায়িকা কাঁদলে তারা কাঁদে! উপস্থিত শুধু এই কাজ। অবশ্য তার কারণ ফালতু বলেই। কিন্তু পর্দায় সে কত ঢংই না দেখায়। নায়ক নায়িকার প্রথম মিলন রাতে, ও-ই দেয় শোবার ঘরের দরজা খুলে, লাইট নিবিয়ে—অর্থাৎ শোবার ঘরের আলোটা জেলে দিয়ে প্রেমিক আর প্রেমিকাকে নির্জনে ছেড়ে চলে যায় ঃ ঘর থেকে বেরিয়ে ও গিয়ে চড়ে ছবির জন্য তৈরী নকল গাছের ডগায় আর সেখান থেকে শোনে ওদের জড়ী-গান। মনে আছে, বাসর রাত্রে ক'নেকে হাসিয়ে দিয়েছিল সেই যে মেয়েটি? প্রেক্ষাগৃহে বসে আমরাও তো হেসেই খুন! সেও ঐ ফালতু মেয়েই! তারপর সেই মেয়েটি নায়িকার পিছনে দাঁড়িয়ে, নায়ক নায়িকাকে পদাঘাত ক'রে চলে গেল—মানে তার সাড়িতে পা বুলিয়ে বেরিয়ে গেল? নায়িকা মূর্চ্ছা গেলেন আর সেই মেয়েটি ছুটে বেরিয়ে এসে বলতে লাগলো "ওগো নিঠুর, শোন! (বিনোদ, হামিদ বা বিচ্ছেওর সিং যেই হও), একবার শোন; আমার সখী যে মূর্চ্ছা গেছে!" সেও তো ওই ফালতুদেরই একজন। আমার কথা ঠিক ধ'রতে পেরেছেন কি-না জানিনা তবে আমার বক্তব্য হ'চ্ছে এই যে, ফালতুরা সবই হ'তে পারে; আয়া হ'তে পারে, নার্স হ'তে পারে, টাইপিস্ট হ'তে পারে, আমার তোমার বউও হ'তে পারে, কিন্তু নায়িকা কিছুতেই হ'তে পারে না। এতক্ষণে বোধ হয় মোদ্দা কথাটা বুঝতে পেরেছেন।

নাম তার জুবেদা, কিন্তু হাসতে হাসতে বললে যে ওর ডাক নাম 'জেবু'। আরও একজন মেয়ের কথা জানি, তারও বাপ মা বন্ধুবান্ধব 'জেবু' বলেই ডাকে, কিন্তু তার কথা থাক্, পরে বলবো'খন। কারণ এই দ্বিতীয় জেবুর জীবনে সেই বড় প্রশ্নটার উদয় এখনো হয়নি যা জেবু, মানে, এই জুবেদার জীবন থেকে অনেক আগেই ঠিকরে পড়েছে। প্রশ্নটা যেন গুলিয়ে ফেলবেন না। প্রত্যেক মানুষের জীবনেই এ প্রশ্ন আসে। কখনও আসে প্রিয়তমের সোহাগ হ'য়ে, কখনও অপূর্ণ আকাঙ্খার তিক্ত রূপ নিয়ে; কখনও আসে টকটকে লাল শিখার মত হ'য়ে, আবার কখনও তপ্ত অশ্রু হ'য়ে জ্বালিয়ে দিয়ে যায়। কিন্তু জীবনের খেলায় তা আসবেই, তোমার জীবনে যেমন তেমনি আমার জীবনেও! যে জেবুর কথা পরে বলবো আজ সেও এই জিজ্ঞাসার সামনে পড়েছে আর আমিও নিরপেক্ষ দর্শকরূপে সমাধান নিয়ে কোন উপদেশই দেব না তাকে। তবে জানি, কোনদিন এ লেখা তার চোখে পড়লে সে হাসবেই, কিন্তু মুখ লুকিয়ে। ব্যক্তিগতভাবে বলতে কি, ও যদি নাও হাসে তো আমার কিছু এসে যাবে না।

জুবেদা এসেছিলো চাকরী চাইতে। স্টুডিওর মালিক আমাকে ফালতু মেয়েদের সঙ্গে দেখা করার কাজ দিয়েছেন। আমাকে এ কাজ তিনি এই ভেবেই দিয়েছিলেন যে লোকটা আমি একেবারেই বেচারা! তাঁর মতে অত্যন্ত নিরাপদ, কারণ আমার মাথায় টাক, কুৎসিত চেহারা আর চশমার মোটা মোটা কাঁচ। কিন্তু তিনি বোধ হয় ভুলে গিয়েছিলেন যে আমারও যৌবন বলে একটা কিছু আছে, কুৎসিত হ'তে পারি, কিন্তু জোয়ান তো! আমারও চামড়ার নীচে যৌবনের তাজা রক্ত উদ্দাম হ'য়ে বয়ে চলেছে! শিরায় শিরায় গলিত লাভার স্রোত।

সেদিনের সাক্ষাৎকারিণীদের মধ্যে জুবেদা ষষ্ঠ। অন্য পাঁচজনও ঐ ফালতুই। প্রথমটি সঙ্গে তার দুটি ভাইকেও এনেছিলো। শিশু এবং অলৌকিক ক্ষমতা-সম্পন্ন। একজন ভাইয়ের নাম 'বেবী রূপো'; আর অপরজন খ্যাত 'মাস্টার ল্যাঙড়া' ব'লে। প্রত্যেক চিত্র প্রতিষ্ঠানে অলৌকিক ক্ষমতাসম্পন্ন এমনি সব শিশুর দরকার থাকে, কিন্তু আমাদের চারটি মজুদ তখন, সুতরাং তাদের নেওয়া হ'লো না। মেয়েটির নাম উষা। কিন্তু এমন ম্লান উষা আর দেখিনি কখনও। গুজরাটি মেয়ে, যৌবন এবং সাজসজ্জা সত্ত্বেও বাঁকা ধনুকের মত। ওর যেন সবই ঘোলাটে অনির্দিষ্ট, বেঠিক। মনে হ'লো এইমাত্র যেন ও একটা অসমাপ্ত, অস্পষ্ট কাঁচা ছাঁচ থেকে বেরিয়ে এসেছে এবং হঠাৎ এক ধাক্কায় একেবারে আমার কামরায় হাজির। মনে মনে ঠিক করলুম যে, ওকে কাজ দেওয়া হবে না এবং জানিয়েও দিলুম সে কথা ঃ "আপনার ঠিকানা রেখে দিয়েছি, দরকার হ'লেই জানাবো।" মনে মনে বললুম, একেবারে স্যাঁৎসেঁতে, ওর আসলে দরকার আলো আর বাতাস আর তাপ; একটু শুকিয়ে যাওয়ার দরকার! কিন্তু জানতুম ও ছাঁচ শুকবে না কখনও, সবসময়েই ও স্যাঁৎসেঁতে আর ঘোলাটেই থাকবে। নিশ্চিন্ত হবার জন্যে বললে ঃ "আমার ঠিকানা......ঠিকানাটা...... লিখে নিয়েছেন তো?"

"হ্যাঁ, নিয়েছি।"

"লিখে নিন তাহ'লে।" বলে যেতে লাগলো জিভ দিয়ে ঠোঁট ভিজিয়ে নিয়ে "লালুভাই লেন, সরাভাই স্কোয়ার, বাড়ির নম্বর ৪৫০।৫৩৩। নম্বর ৪৫০/৫৩৩। ভুলে যাবেন না তো! আর আহমেদাবাদ নগর।"

"ঠিক আছে। আমি লিখে নিয়েছি। আপনি ভাববেন না, মিস্ উষা। আপনাকে আমরা খবর দেব।"

"তাহ'লে খবর দেবেন আমাকে?"

"আর ওটা ঠিক আছে তো, মানে, ঠিকানাটা?"

বিদায় দেবার উদ্দেশ্যে আমি হাতটা জোড় ক'রলুম।

সেও তাড়াতাড়ি হাতজোড় ক'রে চলে যেতে লাগলো, পিছু হটেই আমার দিকে চাইতে চাইতে; ওর মুখময় একটা নির্বোধ হাসি। তারপর সে অদৃশ্য হ'য়ে গেল। হয়তো আমার ভুল। ও যেন এখনও রয়েছে, এখানে এই ঘরে, এই চৌকাঠে, এই মেঝেতে এই টেবিলের ধারে; কাদার সেই ঢেলাটা এখনও যেন চোখের সামনে রয়েছে।

দ্বিতীয় যে মেয়েটি এলো সে পুনার

লোক। বুধওয়ার পিঠ, পুনা, আমাকে বললে। বললে পুনা থেকেই সে বম্বেতে এসেছে। পরণে ফিনফিনে জর্জেটের শাড়ি, বেগুনে রঙের ওপরে নীল পাড়। সাড়িটা কোমরে খুব চেপে জড়ানো, যাতে আমি তার রোগা দেহের প্রতিটি রেখা ভাল ক'রে দেখতে পারি। একেবারে একটা তলতা বাঁশ। বুক ধু ধু ক'রছে মরুভূমি, ঠোঁট শুকনো, আর তার চাউনী—তাও মরুভূমির সেই সীমাহীন শূন্যতায় ভরা। আমার সামনে এসে বসলো যেন বোমা বর্ষণের ভয়াবহ অভিজ্ঞতা নিয়ে এইমাত্র আসছে। আর আমাকে যেন বলতে চাইছে ঃ আমি জানি তুমায় আপনি চাকরী দেবেন না। আমি জানি আমি ফোঁপরা একেবারে, চেহারায় কোন কবিত্ব নেই আমার, ভিতরে নেই নারীত্ব। তবুও এসেছি চাকরী ভিক্ষা ক'রতে। জীবনের ওপরে ব্যর্থতা আর বিরক্তি ছেয়ে গেলে যে নির্লজ্জতা দেখা দেয় তা আপনার ভাল লাগবে না জানি। কিন্তু দুঃখ আর দুর্দশার মধ্যে থেকে থেকে আমার এই যে ঔদ্ধত্য সেটার কথা তো একবার ভেবে দেখবেন? আমি যে ভাঙা প্রাসাদের একখানি ইঁট, বিগত দিনের জন্যে অশ্রুপাত ক'রে যাচ্ছি। আমাকে হতাশ ক'রবেন না নিশ্চয়ই?

তাই করবো বললুম মনে মনে, তারপর প্রশ্ন করলাম, "আপনার নাম?"

"কৌশল্যা।"

"কোথায় বাড়ি আপনার?"

আমার হাতে ও একখানা কার্ড দিলে। ময়লা, জীর্ণ সোনালী অক্ষরে লেখা অতীত সম্পদের স্মৃতির মধ্যে পড়লাম, "কৌশল্যা, চিত্রাভিনেত্রী, বুধওয়ার পিঠ, পুনা।"

"হাঁ, ওইটেই ঠিকানা।" বললে।

হঠাৎ 'হাঁ' কথাটায় খট্‌কা লাগ্‌লো। মেয়েটি পাঞ্জাবী, বোধ হয়, অমৃতসরের।

"আপনার বাড়ি বোধ হয় অমৃতসরে, নয়?"

"কি ক'রে বুঝলেন?" বললে সে, বিশ্রী একপাটি দাঁত বের করে হাসবার চেষ্টা ক'রে; অমন কুৎসিত দাঁত দেখিনি কখনও।

"আগে কখনও ছবিতে কাজ ক'রেছেন?"

হ্যাঁ, হ্যাঁ! অনেক ছবিতে কাজ ক'রেছি... 'রয়েল এস্', 'কালা জাদুকর', 'ম্যারেজ ফর এ সঙ্', 'সর্দার ডাকু'। আমি গাইতেও পারি। পুনাতে আমার নিজের বাড়ি আছে। আসবেন একদিন, নিশ্চয়ই কিন্তু!"

"পুনায় এসে কি ক'রে জুটলে? কোথায় অমৃতসর আর কোথায় পুনা?"

"রুটি", আস্তে আস্তে বললে, বিশ্রী নিষ্প্রাণ স্বর যেন অন্ধকারে চাপা নির্জীব ঃ যেন অতি অস্পষ্ট, অতি ভয়ানক। সবচেয়ে অন্ধকার ছেয়ে ছিলো ওর চাহনীতে, ওর দেহে, আত্মায়। অন্ধকার, আবার অন্ধকার কেবল অন্ধকার আর অন্ধকার। ভয়াবহ, যেন গিলতে আসছে। আর আমার এতো কাছে বসে আছে ও! মনে হ'লো ও যেন নারী নয়, অন্ধকারের একটা জীব। যেন একটা......একটা সিঙীমাছ। ঠিকই তাই। পচাপুকুরের থমথমে জলের নীচে ওর জন্ম, এখন আমার সামনে টেবিলের ধারে এসে রয়েছে, আর আস্তে আস্তে আমার দিকে এগিয়ে আসছে!

"আপনি যান," বিরক্তি আর ভয়ার্ত আশঙ্কায় প্রায় চিৎকার করে উঠলুম আমি।

অত্যন্ত বিস্মিত হয়ে আমার দিকে চাইলে। কিন্তু আমি যে ওর মধ্যে কি দেখেছি তা কি করে জানবে?

তাই মাপ চেয়ে বলতে হলোঃ "পুণা থেকে এসেছেন, যাক, খুসী হলুম! পরের ছবির জন্যে আপনাকে খবর দেবো। আমাদের অনেক ফালতু মেয়ের দরকার......

কথা শেষ না করতে দিয়েই বলে উঠলো "আমার ছোট বোনও সঙ্গে এসেছে—গোমতী। ওকেও দরকা'র হতে পারে। একবা'র দেখুন না। গোমতী! ও গোমতী! আরে ও শুয়োর কী বাচ্চী—কোথায় গেলি লো?" শুকনো কাংস্য কণ্ঠে চেঁচিয়ে উঠলো। গোমতী এসে দরজা'র কাছ থেকেই হাতজোড় কা'রে সম্ভাষণ জানালে। সেই একই শীর্ণ ভাব। ঐ সিঙীমা'ছ! বড় সিঙী, আর ছোট সিঙী।

"নিশ্চয়! নিশ্চয়!" উঠে দাঁড়িয়ে বললুম তাড়াতাড়ি, "পরের ছবিতে দুজনকেই ডাকবো। এবা'রে—"

"এবারে তাহ'লে আমার ফটোগুলো দেখুন।" ছো'ট সিঙীটি নীরস হেসে বললে। কৌশল্যা উঠে ওর সাড়ির ভাঁজ ঠিক করে দিলে। "পুনায় গেলে আমার বাড়িতে আসবেন কিন্তু।" আমার দিকে চোখ টিপে বোনের সঙ্গে বেরিয়ে গেল।

এর পরেরটি হলো মারা'ঠি মেয়ে। মারাঠি মেয়েদের গড়নের মধ্যে একটা মাধুর্য এবং সৌষ্ঠব থাকে। ওদের চাহনীতে এমন একটা করুণ ভাব থাকে যা লোকে মেয়েদের মধ্যে চায়। এ মেয়েটির মধ্যে করুণভাব যথেষ্টই ছিল, কিন্তু না ছিল অঙ্গের সৌষ্ঠব না মাধুর্য। এ যেন বুনো কোন জানোয়ারের মত! সঙ্গে এনেছিল ওর স্বামীকে: ভদ্দরলোক ঘরে ঢোকা থেকে যতক্ষণ ছিল কেবল হেসে গেল। ওটা আমা'র ঘরের কোন চাপা গুণের জন্যে, না আমার ব্যঙ্গমূর্তি'র জন্যে? একটা আবছা সন্দেহ হলো ও বোধ হয় হাসছিলো ওর ভাগ্যের জিজ্ঞাসা-চিহ্নের দিকে চেয়ে। দুটি হৃতভাগ্যের পরিণতি! স্বামী আর স্ত্রী, দুজনেই বেকার। ও হয়তো আসল ব্যাপারটা মোটেই উপলব্ধি করেনি। ফাঁকো, নির্বোধ হাসি, তার মধ্যে কোন উদ্দেশ্য নেই। আলো নেই। দীপ্তি নেই। কিসের জন্যে অস্তিত্ব তবে? অনেক সময় এমনও হয় যে, লোকে আগত প্রশ্নটা ধরতেই পারে না, আর সে হেসেই যায় না জেনে যে, ঐ প্রশ্নটা তার জীবন মরণের, তার শেষ নির্ণয়ের, একেবারে তার আঁতের কথা! কোনদিনই একথাও বুঝতে পারবে না। আজ তো নয়ই, হয়তো বিশ বছর পরে যখন বুড়ো হবে, মাথায় টাক, পুরু চশমা, আমারই মত, তখন হয়তো বুঝবে। কিন্তু বড় দেরী হয়ে যাবে তখন। এখন তো হেসে যাক!

"ইনি আমার স্ত্রী", ভাঙা হিন্দীতে মেয়েটিকে দেখিয়ে বললে।

"ওর জন্যেই একটা কাজ চাই।"

"উনি হিন্দুস্থানী জানেন?" জিগ্যেস করলাম।

"হো! হো! ভাল রকম" মেয়েটি বললে জোরে মাথা দুলিয়ে।

"আচ্ছা," হাতে একটা পেনসিল আর কাগজ দিয়ে বললাম, "লিখুন তো ঃ আমি ঐ গাধাটাকে বিয়ে করবো না!"

"না, না, না" লোকটি হাসলে। "ও লিখতে পারে না। আমার স্ত্রী লিখতে জানে না। আপনি কথা বলুন, ও বুঝতে পারবে। তার পর ও কথা বলবে, আপনি শুনবেন। বুঝলেন?

"আচ্ছা, বেশ," কাগজখানার দিকে চোখ বুলিয়ে বললাম, "বলুন তো: হা'জারা পলিটিক্যাল কনফারেন্স।"

"হাঝারা পার্টীলকাল কানফারেন্স।"

"হাঝারা নয়, বলুন হাজারা।"

"হাঝারা।"

"ওটা পাটীলকাল নয়, ওটা হচ্ছে পলিটিক্যাল।"

"পুতুকুকালিতাল" বলেই হেসে গড়িয়ে গেল।

"বেশ, বেশ! বললুম আমি। যাক বুঝেছি: আচ্ছা, আপনারা হাসছেন কেন বলুন তো?"

স্বামীটি কথা কাটলেন, "আপনি যা বললেন, ওটা আমাদের ভাষায় একটা গালাগাল। ঐ পুতুলীকীলাল! হো, হো!"

"ও!" জোর দিয়ে বললুম। এবারে আবার বলুন, "পলিটিক্যাল।"

"না! না।" আকস্মিক লজ্জায় মেয়েটি বলতে অরাজী হল।

বললাম, "আগে কখনও ছবিতে নেমেছেন?"

"হো! না! কোনদিন নয়। আমার স্ত্রী বাড়ির বার হন না কখনো। কোন ছবিই দেখেন না। কিন্তু কি বলে জানেন? বলে তুমি যদি কাজ করো তো আমিও কাজ করবো। বুঝলেন, এতো ভালবাসে

আমাকে!" একটা নতুন ধাঁচের হাসি ফুটিয়ে লোকটি বললে।

"বেশ।" বললাম আমি, "আপনাদের ঠিকানা রইলো আমার কাছে। ৫৫, কলবাদেবী লেন, মর্মর মন্দির, বম্বে ১৯। যত শীগ্গির হয় আপনাদের দুজনকেই সম্ভব হলে ডেকে পাঠাবো।

লোকটি আমার দিকে চেয়ে হাসলে এবং তাকে বিদায় জানাবার জন্যে হাত বাড়াতেই তার কোটের খাঁজে খাঁজে ছেঁড়া নজরে পড়লো। মেয়েটিরও দেখলুম পরনে একখানা ধুতি, পরিষ্কার, কিন্তু পুরনো, পিঁজে গেছে, ছিঁড়ে গেছে। আমার দিকে চাইলে মেয়েটি তারপর মাথা হেঁট করলে লজ্জায়। যেন ব্যাধতাড়িতা হরিণী। লোকটির মুখে কিন্তু সেই হাসি। ঘর থেকে বেরুবার সময়েও হাসি। বেরিয়ে যখন যাচ্ছে, মনে হলো ওটা ওর হাসি নয়, ওটা যেন হতাশা আর হারানো দিশার তিক্ত কান্না। আমার মতই ওর মিথ্যা ভদ্রতার আবরণ, কিন্তু অনেক স্থানেই ছেঁড়া, আর তাই ও চাইছিলো লোকের দৃষ্টি থেকে নিজের দারিদ্র্যকে চাপা দেবার জন্যে হাসির সেলাই দিয়ে তালি দিতে। ও এসেছিলো ইচ্ছার বিরুদ্ধেও ওর বৌকে বেচতে আর ওর ওই হাসিতে ছিল নিরীহ মনুষ্যত্বের ওপর বলাৎকারের নিশানা।

পঞ্চম মেয়েটিকে ঠিক মেয়ে বলা চলে না। আধা বয়সী স্ত্রীলোক, দুটি মেয়ে ও একটি ছেলের মা। মোটা এবং ফর্সা আর কথা বলে নাকি সুরে। চেয়ারে ধপাস ক'রে বসে হাতের ওপর মাথা হেলান দিয়ে আমার দিকে চেয়ে একটু উদ্ধতভাবে বললে ঃ "ফালতু মেয়ের জন্যে বিজ্ঞাপন দিয়েছেন যে?"

"আমাদের দরকার, তাই!"

"হাঃ, হাঃ!" হেসে উঠলো যেন আমার কথাটা বিশ্বাসই হ'লো না তার। ব্লাউজের ভিতর থেকে একটা বিড়ী বের ক'রে পুরু কামব্লিস্ট ঠোঁটের মধ্যে গুঁজে দিলে।

"কত মাইনে দেবেন?" ভারীক্কি চালে বলে উঠলো।

"কখনো কাজ ক'রেছেন?" আমি আরম্ভ করলুম।

"নিশ্চয়! ষাটখানা ছবিতে নেমেছি আমি। ষাটখানা!" হাতটা বাড়িয়ে টেবিলের ওপর রেখে বললে। "এককালে নায়িকাও ছিলুম আমি। আনন্দবালার নাম শুনেছেন?"

"না তো!" আমি জবাব দিলুম।

"আপনি বড় শক্ত ঠাঁই দেখছি।" ক্যাবলার মতো হেসে বললে। "যাক তাতে কিছু এসে যাবে না। এমন কিছু রাস্তায় তো বসে নেই। একটা ভাল পার্ট পাবো ভেবেই এসেছিলুম এখেনে। ষাটখানা ছবিতে কাজ করার পর নিতান্ত দু-সীনের কোন পার্ট দেবেন না নিশ্চয়ই? আচ্ছা পার্টটা ভাল তো?"

"খুব ভলো।"

"আমাকে নাবাবার জন্যে কটা সীন থাকবে তাতে?"

"তা প্রায় আট দশটা, ঠিক বলতে পারি না।"

"কদিনের কাজ হবে?"

"ধরুন দশ দিন।"

"ব্যস?"

"ব্যস!"

"আচ্ছা। ভেবে দেখতে হবে। এখন বলুন তো কতো মাইনে দেবেন?"

"পঁচাত্তর টাকা।"

"ব্যস?"

"ব্যস!"

"মাত্তর! আরে বাবা, একবার ভাবুন তো, মোটে পঁচাত্তর টাকা! আর আমাকে দুটো মেয়ের বিয়ে দিতে হবে! কি ক'রে হয় বলুন? গরীব বুড়ীর ওপর অতটা নির্দয় হবেন না!"

ওর আভিজাত্য আর শালীনতার পাতলা প্রলেপ ফেটে চুরমার হ'য়ে ঝরে পড়তে লাগলো এবং ঘর ছেড়ে যেতে যেতেই তা তো একেবারে সাফই হ'য়ে গেলো।

ষষ্ঠ মেয়ে এই জুবেদা, প্রিয়জনে আদর ক'রে যাকে ডাকে 'জেবু' বলে। মেয়েটি কুমারী মানে তখনও বিবাহিতা নয়। দেহে তার যৌবন। দৃষ্টিতে যৌবন। ওষ্ঠে যৌবন। হাসিতে যৌবন। কপাল নীচু। নাকটা থ্যাবড়া। রঙ তার কালো। কুৎসিত যে সে বিষয়ে সন্দেহ নেই, কিন্তু দেখাতো না কুৎসিত ব'লে। ও যেন সেই সব সুন্দরী যারা রূপে থাকতেও সুন্দর নয়। ভারতের একেবারে দুই প্রান্ত, উত্তর আর দক্ষিণ, তার দেহের রেখায় রেখায়, ছন্দে ছন্দে যেন মিশে গেছে। তার দ্রাবীড়ী চামড়ার নীচে দিয়ে বয়ে গিয়েছে আর্য রক্ত এবং দাক্ষিণাত্যের আঁচে আর্যাবর্তের হিমশীতল আবরণের মধ্যে উত্তপ্ত হয়ে বিষাক্ত গলিত লাভায় পরিণত ক'রে দিচ্ছে। দুটো যুগ, দুটো সভ্যতা, দুটো জাতির মহাসন্ধিক্ষণেরও যেন একটা পরীক্ষা, আজও যেন সে পরীক্ষা থামেনি। তাই জুবেদা সুন্দরী নয়, কুৎসিতও নয়। যুবতী নয়, বৃদ্ধাও নয়। কালোও নয় ফর্সাও নয়। না আর্য, না দ্রাবীড়ী। এই তার দৃষ্টি উজ্জ্বল বিস্ফারিত চাহনী, পর মুহূর্তেই সে চোখ ছোট, নিস্তেজ, আর কপাল নীচু হ'য়ে পড়ে, ঝুঁকে যায়। কখনো তার গায়ের রঙ দিব্যি পরিষ্কার, ফর্সা, কিন্তু পরমুহূর্তেই বহুরূপীর মত রঙ বদলে কৃষ্ণাঙ্গী কোন দেবী হ'য়ে যায়, যেন মনসা, আর তার সেই থ্যাবড়া নাকের গর্ত বিষাক্ত কেউটের মাথার মত যেন ফুলে ফুলে ওঠে।

"জুবেদা!" আমি জানবার জন্যে বললুম, "তোমার বাড়ি কোথায়?"

"বম্বেই আমার ঘর।"

"তোমার বাবা?"

"এক সোডা ফ্যাক্টরীতে কাজ করেন; আর মা কাজ করে এক পার্সী সাহেবের বাড়িতে।" বেশ গর্বের সঙ্গেই বললে।

"ফিল্মে নামলে তোমার বাপ-মার আপত্তি হবে না?"

"আজ্ঞে না।"

তুমি উর্দু জানো?"

"উর্দু আর জানি না! গজলের আমি ভারী ভক্ত। আমার বাবা খুব পণ্ডিত। গালিব, মীনাই, দাঘ, জীগরের লেখা যে কতবার ক'রে পড়েছি তার ইয়ত্তা নেই।"

"জোশের কবিতা পড়েছো?"

"না।"

"কৃষণচন্দ্রের গল্প?"

"না। গল্প আমার ভাল লাগে না। গজল আমার খুব প্রিয়। দাঘ বড় মধুর, আর জীগর? বাঃ! বাঃ"

"আচ্ছা, ফিল্মে কেন কাজ ক'রতে চাও বলতো?"

"এমনি! ছবিতে কাজ ক'রবো, এই শুধু।"

"কাজ কিন্তু বড় শক্ত, পরিশ্রমের।"

"ভারী পরিশ্রম! মেক-আপ ক'রে ক্যামেরার সামনে গিয়ে দাঁড়ানো এই তো? ব্যস তারপরেই সিনেমা-স্টার বনে গেলো!"

"আগে কোনদিন কাজ করেছো?"

"না। তবে ক'রতে চাই। একবার কাজ দিয়ে দেখুন।" ব'লেই বললে, "আচ্ছা আপনি গজল ভালবাসেন? আমার কিন্তু খুব প্রিয়। আপনি কবিতা লেখেন না? শোনান না আপনার গজল দু' একটা।

"না। আমি তো কবি নই, তবে কবিতা ভালবাসি। তুমি যদি কিছু শোনাও তো শুনতে পারি।" বললুম তাকে।

"বাঃ! আমি কেন শোনাব? আমিও কি কবি নাকি? কবিতা শুধু শুনতেই ভালবাসি। সত্যি, একটা কাজ দিন আমাকে। আপনার নামটা বলবেন?" হঠাৎ প্রশ্ন করে বসে।

"জনি ওয়াকার!"

"ধ্যেৎ! জনি ওয়াকার কক্ষণো আপনার নাম নয়। জনি তো একটা মদের নাম, হুইস্কি, মানুষ বুঝি। ভাল লোকে কখনো মদ খায় না। বুঝলেন, আমি জীগরের গজল......।"

"জীগর তো মদ খায় না," বল্লাম তার কথা কেটে।

"জানি।"

"কি ক'রে জানলে?"

"ব'ঃ! মেহতাব নিজে আমাকে ব'লেছে!

জানেন, একদিন মেহতাবের সঙ্গে দেখা ক'রতে গিছলাম। ভারী চমৎকার ব্যবহার ক'রলে কিন্তুঃ অতবড় অভিনেত্রী, কিন্তু এতটুকু দেমাক নেই। ছিঃ ছিঃ ছিঃ বড় বড় আর্টিস্টরা অত দেমাকী হয় কেন বলুন তো? কেন বলছি জানেন? দেবীকারাণীকে একবার ফোন করেছিলুম, বুঝলেন, কথাই বললে না দেমাকে! কেন, কিসের জন্যে বলুন তো?......"

আমি তখন দেখছি ওর সাদা ভয়েলের সাড়ীখানা। সুন্দর ময়ূরপংখী পাড় দেওয়া। "চমৎকার!" বললুম।

"জানি।"

"কি ক'রে জানলে? আমি জানতে চাইলুম," কে বলে দিয়েছে তোমায়? জীগর না মেহতাব, না দেবীকারাণী নিজেই?"

"ছিঃ ছিঃ ছিঃ! কি যে বলেন! আচ্ছা, আপনার হাতটা দেখান তো। আমি গুণে দিচ্ছি।" ও বললে আমাকে।

হাত বাড়িয়ে দিলুম। অনেকক্ষণ হাতে হাতে কথা হতে লাগলো। তারা বলে গেল প্রেমের কথা, জীবনের, যৌবনের কথা। শ্বাশ্বত যৌবন আর বাঁধ ভাঙা সুখ। সবই মিথ্যা; এতটুকু সত্যি নেই। আমি তা জানি, সেও জানলে, এবং শ্রান্ত হয়ে বলে উঠলো, "আমাকে একটা কাজ দিন না!

হাতটা ছিনিয়ে নিলুম।

"তোমার ঠিকানা আমি রেখেছি---" বলতে গেলাম---

"নাঃ সে হবে না! কাজ আমায় দিতেই হবে। আজ হোক। কাল হোক। না হলে চলবে না।"

ও এলো পরদিনই, তার পরদিনও, তারও পরদিন।

দিন পনেরো ধরে আসতে লাগলো, আর রোজই হাতে একখানা বই নিয়ে আর সেই ময়ূরপঙ্ক্ষী পাড় সাদা ভয়েলের সাড়ি। বড় বড় কবিদের কবিতা আবৃত্তি করতো। যে বইগুলো আনতো, ঝরঝরে, পুরনো, পোকায় কাটা। একটা কেমন বিদ্ঘুটে গন্ধ বেরুতো যেন। পুরাতন গৌরব দিনে যৌবনের অবাধ সুখ, অশ্রু আর হাসির অবশিষ্ট সৌরভের মতো! রোজই সেই একই সাড়ি, আর সেই চাকরী ভিক্ষা!

একদিন কর্তাকে তার কথা বললুম। "একটা ফালতু মেয়ে কাজের জন্যে রোজ এসে ঘুরে যাচ্ছে। জুবেদা নাম। সংক্ষেপে জিবু। নাকি সুরে কথা বলে। ফালতুতে চলে যাবে।"

"দেখতে কেমন?" কর্তা জানতে চাইলেন।

"ভালও নয়, খারাপও নয়; আর পাঁচটারই মত। কিন্তু বেশ চালাক চতুর মনে হয়। গজলের খুব ভক্ত। ওর বাপ কাজ করে সোডা ফ্যাক্টরীতে, আর মা কোন বড় পার্সী সাহেবের বাড়িতে।"

"ও তবে কী?"

বললাম, "না, বেশ্যা মনে হয় না তবে......"

"অন্য জায়গায় দেখতে বলো!" নির্দেশ দিয়ে পানের পিচ ফেলে কর্তা অন্তর্ধান হলেন।

জেবুকে বললুম আমি তাকে কোন কাজ দিতে পারবো না। কিন্তু আমার কথায় কানই দিলে না। প্রতিদিন নিয়মিতই আসতে লাগলো। তারপর কে যেন ওকে জানিয়ে দিলে যে, সৈয়দ ওকে কাজ জুটিয়ে দিতে পারে। জেবু কাজের জন্যে সৈয়দকে ধরলে। সৈয়দ পাঠালে ওকে লালের কাছে, সেখান থেকে গেল হুসেনের কাছে এবং হুসেন থেকে একেবারে অতলে। ইতিমধ্যে বেশ দুর্নাম করে নিয়েছে। আবার এসে চাকরি চাইলে। অতি কাতরভবে মিনতি করলে, লজ্জা-সরমের একেবারে মাথা খেয়ে।

পরে আবার যেদিন দেখা হলো আমি ভ্রূ কুঁচকে অত্যন্ত বিরক্তির ভাব দেখালুম।

"দেখ জেবু," বললুম।

"জী।"

"তোমাকে দরকার যখন হবে আমরা খবর পাঠাবো।"

"আচ্ছা।"

"জেবু?"

"জী।"

"তোমার এই চাকরির ভিক্ষাবৃত্তি ......"

আমার কথা শেষ করতে দিলে না। কান্নায় ভেঙে পড়লো। বেশ জোরেই কাঁদতে লাগলো, আর আমি আঙুল দিয়ে টেবিলে তার তালে তাল দিয়ে যেতে লাগলুম। কিছুক্ষণ এইভাবে কাটবার পর আমার দিকে চেয়ে শ্রান্ত ম্লান হাসি টেনে বললে, "আচ্ছা, এ পদটা আপনার কেমন লাগে :

'জিন্দগী য়ুঁ ভী গুজর ভী জাতী
ক্যুঁ তেরা রাহ্গুজারে ইয়াদ আয়া?'

(জীবন তো এমনিই কেটে যায়---তবে পথের স্মৃতি কেন মনে আসে?)

"হ্যাঁ, জানি, গালীবের লেখা।"

"আর এইটেও আমার বড় ভাল লাগে---
হম নে ভী ওয়াজে গম্ বদল ডালি; যব সে ও তরজে-ই-ইলতিফাৎ গই।"

(বিমর্ষভাবে আমিও বদলে ফেলেছি, যেদিন থেকে তার স্নেহ বদলে গিয়েছে)।

"হ্যাঁ, জানি, এটা জীগারর।" বললুম।

ও বললে, "তাহলে যাই, নমস্তে।"

"নমস্তে।"

জুবৈদা চলে গেল। দুঃখময় জীবনের চেহারাই ও একেবারে বদলে ফেলেছে। এখন প্যাটেলের সঙ্গে থাকে। প্যাটেল হচ্ছে দালাল, জুবেদাকে তারকা শ্রেণীতে পেঁাছে দেবে। প্রায় আধ ডজন ফিল্মস্টার প্যাটেলের সাধু প্রচেষ্টাতেই তারকায়িত হতে পেরেছে। প্যাটেল বছরে প্রায় লাখ টাকা আয়কর দেয়। তার ব্যবসা হচ্ছে ফালতু মেয়ে কিনে তাদের সাজিয়ে গুছিয়ে তারকায়িত করা। বেশ বড় ইণ্ডাষ্ট্রী এটা, ও বলে। একেবারে স্বদেশী, দেশের মধ্যে পঞ্চম ঠাঁই। প্যাটেল খুব গর্বিত সে জন্যে, বড় দেশসেবী একজন। জুবেদাকে ও সংকট থেকে বাঁচিয়ে তুলেছে। জুবেদা ওর কাছে খুবই কৃতজ্ঞ। এ বছর প্যাটেলের ডান্স-পার্টির সঙ্গে ও ঘুরতে বেরুবে। এই ডান্স-পার্টি থেকে প্যাটেল পাঁচ লাখ টাকা গত বছর কামিয়েছে। জুবেদাকে ধন্যবাদ! এ বছর প্যাটেল ঢের বেশী টাকা পিটে আনবে।

১৯৪৬ সালে জুবেদা একেবারে পূর্ণাঙ্গী তারকায় পরিণত হয়ে যাবে। প্যাটেল ওর মোট আয় থেকে পাবে শতকরা তিরিশ টাকা হিসেবে; আর কলেজের ছেলেরা রোজই জুবেদার প্রেমে পড়বে। এ্যালবামে ওর ছবি তারা রেখে দেবে, আর ওর থ্যাবড়া নাক আর নীচু কপালের দিকে মোহাবিষ্ট হয়ে চেয়ে থাকবে। ওর ওই নাকি সুর শোনবার জন্যে ছটফট করে মরবে তারা।

আর কাগজগুলো, বড় বড় দৈনিক, মাসিক আর সাপ্তাহিক সবাই ছাপবে জুবেদার ক্লোজ-আপ। তারা ওর সুশ্রী চেহারার গুণ গাইবে, আর গাল দেবে ওর নীতির কথা তুলে। বলবে : 'বিশ্বাসঘাতিনী, কুলটা, ভারতীয় নারীত্বের কলঙ্ক।'

সময়ে সবই ঠিক হয়ে যাবে। এক রকম ভালই হবে, যেমনটি হওয়া দরকার। খুবই ভল, সত্যিই বেশ! আর তা সম্ভব হবে এই জন্যে যে, ১৯৪৪ সালের ১১ই ডিসেম্বরের সেই গুমোট দুপুরে তুমি আর আমি এক নারীকে হত্যা করে তার জায়গায় জন্ম দিয়েছি এক গণিকাকে; সেই ১৯৪৪-র ১১ই ডিসেম্বর তুমি আর আমি অন্ধকারকে বাঁচাতে গিয়ে সূর্যকে দিয়েছি ডুবিয়ে। ১৯৪৪-এর ১১ই ডিসেম্বর একটা প্রশ্নচিহ্ন আমাদের সামনে ভেসে ওঠে, আর, যেন তার উত্তরেই আমরা সেদিনের সেই ছটি মেয়ের মুখে কাদা লেপে দিয়েছি।

ছটি মেয়ে? তাই। জুবেদা তো একটিমাত্র মেয়ে নয়। ও যে ঐ ছজনেরই প্রতিভূ। বরং সাতটাই বলতে হয়। কারণ, এই সাতটি মেয়ের মধ্যেই ছিল আর এক জুবেদা, সংক্ষেপে জেবু, যার কাহিনী এখনো বলা হয়নি।

—অনুবাদক : পঙ্কজ দত্ত

বঙ্গে বৃটিশ বণিক

শ্রীহেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ

খৃষ্টীয় প্রথম শতাব্দীতে ঐতিহাসিক প্লিনী আক্ষেপ করিয়াছিলেন—ভারতবর্ষ প্রতি বৎসর রোম সাম্রাজ্য হইতে অন্ততঃ ৬৮ লক্ষ ৭০ হাজার টাকা শোষণ করে—ভারতীয় পণ্য শতগুণ মূল্যে বিক্রীত হয়। যে দেশের পণ্যের এত আদর ছিল সে দেশের সহিত বাণিজ্য করিয়া সমৃদ্ধি লাভের আশা যে য়ুরোপীয় জাতিসমূহকে ভারতবর্ষের সহিত বাণিজ্যে আত্মনিয়োগ করিতে প্রণোদিত করিয়াছিল, ইহা একান্তই স্বাভাবিক। সেই বাণিজ্যের জন্য য়ুরোপীয় বিভিন্ন জাতি পরস্পরের সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতায় কত রক্তপাত করিয়াছে, কত হীনতা স্বীকার করিয়াছে, তাহা মনে করিলে বিস্মিত হইতে হয়। কেবল ভারতবর্ষের সহিতই নহে—সমগ্র প্রাচীর সহিত বাণিজ্য এই সকল জাতির কাম্য ছিল। খৃষ্টীয় সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথমভাগে সুমাত্রার রাজা ইংরেজ তরুণীকে পত্নীরূপে লাভের অভিপ্রায় প্রকাশ করায় ১৬১৪ খৃষ্টাব্দে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর পরিচালকগণের এক সভায় একজন সম্ভ্রান্ত ইংরেজ তাঁহার সুন্দরী দুহিতাকে দিবার প্রস্তাব করেন। তাহাতে কোম্পানীর লাভ-সম্ভাবনার বিষয় গভীরভাবে আলোচিত হয় এবং সে কার্য যে ধর্মনির্দেশবিরোধ নহে, তাহাও বলা হয়। যদি ঐ তরুণী স্বামীর অধিক প্রীতি-ভাজন হইলে—তাহার সপত্নীরা বিষপ্রয়োগে তাহার জীবনান্ত ঘটায় সে কথাও উল্লেখিত হয়। কিন্তু তরুণীর পিতা তাহাতে ভয় করেন নাই।

১৬৪০ খৃষ্টাব্দে যে দীর্ঘ পার্লামেন্টের আরম্ভ তাহার আরম্ভকালে এক বিজ্ঞাপনে দেখা যায়—ইংরেজদের নাম যে বারবেরী, তুরস্ক আর্মিনিয়া মস্কোভী আরব পারস্য ভারতবর্ষ, চীন প্রভৃতি দেশে—সমগ্র জগতে ব্যাপ্তিলাভ করিয়াছে, ইংরেজের দেশজয় তাহার কারণ নহে, ইংরেজের বাণিজ্যের ফলেই তাহা হইয়াছে—তরবারে তাহা হয় নাই—বাণিজ্য তরীর দ্বারা হইয়াছে।

এ কথা কত সত্য তাহা ইতিহাসের সাক্ষ্যে বুঝিতে পারা যায়।

ইংরেজ বণিক বাণিজ্য-ব্যপদেশে ভারতবর্ষে আসিয়া যে বাঙলায় বাণিজ্য করিবার অধিকারের জন্য লালায়িত হইবে, তাহাতে বিস্ময়ের কোনই কারণ থাকিতে পারে না।

১৬৬৬ খৃষ্টাব্দের প্রথমভাগে পর্যটক বার্নিয়ার বাঙলার ঐশ্বর্যের বর্ণনা করিয়া লিখিয়াছিলেন—পৃথিবীতে বাঙলার মত উর্বর দেশ আর নাই—বাঙলা হইতে সিংহলে ও মালদ্বীপেও চাউল এবং আরবে, ইরাকে ও পারস্যেও শর্করা রপ্তানী হয়। বাঙলায় জীবনধারণের জন্য প্রয়োজনীয় সকল দ্রব্যই সুলভ। বাঙলা হইতে কার্পাসের ও রেশমের বস্ত্র য়ুরোপে ও জাপানে রপ্তানী হয়।

বার্নিয়ার যখন বাঙলা সম্বন্ধে এইরূপ কথা লিখিয়াছিলেন, তাহার অল্পদিন মাত্র পূর্বে ইংরেজ বণিক হুগলীতে ব্যবসা করিবার অধিকার অর্জন করিয়াছিল। বাঙলা বলিতে তখন বাঙলা, বিহার ও উড়িষ্যা—এই প্রদেশত্রয় বুঝাইত। সুতরাং বলা যায় ১৬৩৩ খৃষ্টাব্দে ইংরেজ বাঙলার সহিত বাণিজ্য আরম্ভ করে। কারণ, ঐ বৎসর ২২শে এপ্রিল উড়িষ্যার হরিশপুর কুৎঘাটে প্রথম ইংরেজ বণিকের জাহাজ নোঙর করিয়াছিল।

বহুদিন বাঙলার ইতিহাসে দেখা যাইত, বৌটন নামক একজন ইংরেজ চিকিৎসকের কার্যফলে ইংরেজের পক্ষে বাঙলায় বাণিজ্যের দ্বার মুক্ত হয়। সম্রাট সাহজাহানের এক কন্যা পীড়িতা হইলে সুরাট হইতে বৌটনকে তাঁহার চিকিৎসার জন্য লইয়া যাওয়া হয় এবং নানা পুরস্কারের মধ্যে তিনি সমগ্র সাম্রাজ্যে বিনাশুল্কে বাণিজ্যের অধিকার লাভ করেন। সেই অধিকারের ছাড় লইয়া তিনি বাঙলায় পণ্য কিনিয়া তাহা জলপথে সুরাটে পাঠাইবার জন্য বাঙলায় গমন করেন। কিন্তু বাঙলায় তিনি যদি নবাবের অনুগ্রহ লাভ করিতে না পারিতেন, তবে, বোধহয়, বাদশাহের ছাড়ে তাঁহার বিশেষ সুবিধা হইত না। সেই ভাগ্যক্রমে তিনি নবাবের কোন প্রিয়পাত্রীর পীড়া আরোগ্য করিয়া তাঁহাকে তুষ্ট করেন এবং নবাব তাঁহার অর্জিত অধিকার তাঁহার দেশবাসী মাত্রকেই দিতে সম্মত হয়েন। বৌটন সে কথা সুরাটের কুঠীতে ইংরেজ গভর্নরকে লিখিলে তাঁহার পরামর্শে ১৬৪০ খৃষ্টাব্দে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী ২ খানি জাহাজ বাঙলায় প্রেরণ করেন এবং বৌটন জাহাজের এজেন্টদিগকে নবাবের দরবারে লইয়া যাইলে নবাব তাঁহাদিগকে সৌজন্য দেখান।

এই বিবরণ অর্মের পুস্তকে পাওয়া যায়। সে পুস্তক ১৭৬৪ খৃষ্টাব্দে প্রথম প্রকাশিত হয়।

সুরাটে ইংরাজদের কুঠী ১৬০৯ খৃষ্টাব্দের পূর্বে স্থাপিত হয় নাই। ১৬০৭ খৃষ্টাব্দে ক্যাপ্টেন হকিন্স ইংলণ্ডের রাজা প্রথম জেমসের পত্র লইয়া আসিয়া সম্রাট জাহাঙ্গীরের সহিত সাক্ষাৎ করেন ও সুরাটে কুঠী প্রতিষ্ঠিত করিবার অনুমতি লাভ করেন বটে, কিন্তু তিনি প্রাসাদের কোন নারীকে বিবাহ করিয়া সম্রাটের আনুগত্যের প্রতিশ্রুতি ও প্রমাণ দিলেও পর্টুগীজরা সেই অনুমতি নাকচ করায় এবং আগ্রার দরবারে সার্ধ ২ বৎসরকাল বৃথা ব্যয় করিয়া হকিন্স স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করেন।

স্টুয়ার্টের বাঙলার ইতিহাস ১৮১৩ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়। উহাতে স্টুয়ার্ট অর্ম-প্রচারিত বিবরণেই বর্ণলেপ করিয়া প্রদান করিয়াছিলেন। তিনি লিখিয়াছিলেন:—

"১০৪৬ হিজিরায় (১৬৩৮ খৃঃ) সম্রাট সাহজাহানের এক কন্যা—বস্ত্রে অগ্নিযোগ হওয়ায় বিশেষরূপে দগ্ধ হওয়ায় উজীর আসদ খাঁনের পরামর্শে একজন য়ুরোপীয় চিকিৎসকের জন্য সুরাটে লোক প্রেরণ করা হয়। সুরাটের (ইংরেজ) কাউন্সিল কর্তৃক মনোনীত হইয়া "হোপওয়েল" জাহাজের চিকিৎসক গ্রেবিয়েল বৌটন অবিলম্বে দাক্ষিণাত্যে সম্রাটের স্কন্ধাবারে গমন করেন এবং ভাগ্যক্রমে সম্রাট-কন্যাকে আরোগ্য করিতে পারেন। বৌটন এই কার্যে দরবারে প্রিয়পাত্র হয়েন এবং তাঁহাকে পুরস্কার প্রার্থনা করিতে বলিলে তিনি ইংরেজের বৈশিষ্ট্য—উদারতাসহকারে স্বয়ং কোন পুরস্কার না চাহিয়া তাহার স্বজাতীয়রা যাহাতে বিনাশুল্কে বাঙলায় বাণিজ্য করিতে ও তথায় কুঠী স্থাপিত করিতে পারেন—সেই অধিকার চাহেন। তাঁহার প্রার্থনা পূর্ণ করা হয় এবং তিনি বাঙলায় যাইবার ছাড় লাভ করেন। বাঙলায় উপনীত হইয়া বৌটন পিপলীতে (পুরী জিলা) গমন করেন। সেই সময় ইংরেজের একখানি জাহাজ তথায় উপনীত হওয়ায় তিনি সম্রাটের ছাড়ের বলে জাহাজের সব মাল বিনাশুল্কে বিক্রয়ের ব্যবস্থা করেন।

"পর বৎসর শাহ সুজা বাঙলার শাসক হইলে বৌটন তাঁহাকে শ্রদ্ধা জ্ঞাপন জন্য রাজমহলে (দরবারে) গমন করেন। তিনি সাদরে গৃহীত হয়েন এবং সেই সময়ে সুজার কোন অন্তঃপুরিকা অসুস্থ থাকায় তাঁহার চিকিৎসাকার্যে নিযুক্ত হইয়া তাঁহার আরোগ্য সাধনে সহায় হয়েন। ইহাতে তিনি নবাবের অনুগ্রহভাজন হওয়ায় সম্রাটের আদেশের সদ্ব্যবহার করিতে পারেন; তাহা

না হইলে হয়ত সে আদেশ পালিত হইত না।

"পর বৎসর পূর্বোক্ত জাহাজ যখন বিলাত হইতে পুনরায় এদেশে আইসে, তখন বাঙলায় কুঠী স্থাপন করিবার জন্য তাহাতে মিস্টার ব্রিজম্যান প্রভৃতি কয়জন ইংরেজ আসেন। বৌটন উহা নবাবকে জানাইলে তিনি ব্রিজম্যানকে আসিতে বলেন এবং তিনি দরবারে যাইলে পিপলীর কুঠী ব্যতীত বালেশ্বরে ও হুগলীতেও কুঠী স্থাপিত করিবার অনুমতি লাভ করেন।

এই ঘটনার অল্পদিন পরেই বৌটনের মৃত্যু হয়। কিন্তু সুজা ইংরেজদিগকে অনুগ্রহ করিতে থাকেন।"

স্টুয়ার্টের বিবরণে তিনি স্বজাতির জাতিপ্রেমের ও উদারতার উল্লেখ সগর্বে করিয়াছেন। ইংরেজের পক্ষে ইহা স্বাভাবিক, সন্দেহ নাই।

কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্র যে বলিয়াছেন—মার্শম্যান, স্টুয়ার্ট প্রভৃতি প্রণীত পুস্তকগুলিকে আমরা সাধ করিয়া ইতিহাস বলি; সে কেবল সাধপুরান মাত্র।"

রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়ের "প্রথম শিক্ষা বাঙলার ইতিহাস" স্টুয়ার্টের পুস্তকের পরবর্তী। সেই ইতিহাসের সমালোচনা প্রসঙ্গে বঙ্কিমচন্দ্র লিখিয়াছিলেন—"রাজকৃষ্ণবাবু মনে করিলে বাঙলার সম্পূর্ণ ইতিহাস লিখিতে পারিতেন; তাহা না লিখিয়া তিনি বালক-শিক্ষার্থ এক অতি ক্ষুদ্র পুস্তক লিখিয়াছেন। যে দাতা মনে করিলে অর্ধেক রাজ্য ও এক রাজকন্যা দান করিতে পারে, সে মুষ্টিভিক্ষা দিয়া ভিক্ষুককে বিদায় করিয়াছে। মুষ্টিভিক্ষা হউক, কিন্তু সুবর্ণের মুষ্টি।" রাজকৃষ্ণবাবুও অর্ম ও ষ্টুয়ার্ট লিখিত বিবরণ গ্রহণ করিয়াছিলেন—

"একদা সাহজাহান বাদসাহের একটি কন্যার কাপড়ে আগুন লাগিয়া তাহার দেহ দগ্ধ হয়; বৌটন নামক একজন ইংরেজের চিকিৎসায় তাহার আরোগ্যলাভ ঘটে এবং সম্রাট পুরস্কার দিতে চাহিলে বৌটন প্রার্থনা করেন যে, ইংরেজেরা যেন বাঙলায় নিষ্করে বাণিজ্য করিতে পারেন (১৬৩৪)। বাদশাহ এই মর্মের আদেশপত্র দিলে বৌটন তৎসহ এদেশে (বাঙলায়) আসেন; এবং সুজার অন্তঃপুরবাসিনী কামিনী বিশেষের পীড়া শান্তি করিয়া স্বীয় উদ্দেশ্য সাধনের সুবিধা পান (১৬৩৯)। এই সময় হইতে ইংরেজেরা সুজার প্রিয়পাত্র হইয়া উঠিলেন, হুগলীতে, বালেশ্বরে কুঠী নির্মাণ করিবার অনুমতি পাইলেন, এবং বিনা করে বাণিজ্য-দ্রব্যজাত আমদানী রপ্তানী করিতে লাগিলেন।

স্টুয়ার্ট লিখিয়াছেন, তিনি বৌটনকে প্রদত্ত সম্রাটের ছাড়ের নকল সরকারের দলিলের মধ্যে পান নাই—তবে ব্রুস তাহার উল্লেখ করিয়াছেন। স্যার হেনরী হউল পূর্বোক্ত বিবরণে সন্দেহ প্রকাশ করিয়া লিখিয়াছিলেন —ঐতিহাসিকরা উহাতে বিশ্বাস স্থাপন করিয়াছেন বটে, কিন্তু তিনি উহার প্রমাণের সন্ধান পান নাই।

অনুসন্ধানে জানা যায় যে, বৌটন নামক একজন ইংরেজ মোগল দরবারে প্রভাবসম্পন্ন হইয়াছিলেন বটে, কিন্তু তিনি ১৬৪৫ খৃষ্টাব্দের পূর্বে দরবারে গমন করেন নাই —তখন ইংরেজরা বাঙলার- সমুদ্র-কূলে স্থান করিয়া লইয়াছেন; আর তাহা সম্রাটের ছাড়ের বলে হয় নাই—বিশেষ কষ্ট-স্বীকারের ফলে।

বৌটনের পূর্বে একজন ইংরেজ চিকিৎসক মোগল দরবারে গিয়াছিলেন। তিনি বৌটন নহেন, বার্ণার্ড। বার্ণিয়ার তাঁহার উল্লেখ করিয়াছেন। তিনি জাহাঙ্গীরের রাজত্বের শেষভাগে দরবারে ছিলেন এবং সাধারণত অস্ত্রচিকিৎসকরূপে খ্যাতিলাভ করিয়াছিলেন। তিনি জাহাঙ্গীরের প্রিয়পাত্র ছিলেন এবং উভয়ে একত্র প্রভূত পরিমাণে মদ্য পান করিতেন। উভয়েই বিলাসপ্রিয় ও মদ্যপ ছিলেন। বার্ণার্ড দৈনিক বেতন হিসাবে যাহা পাইতেন, তদ্ভিন্ন অন্তঃপুরের মহিলাদিগের ও ওমরাহদিগের চিকিৎসা করিয়া আরও অর্থ পাইতেন। দরবারে তাঁহার প্রভাবহেতু ওমরাহরা তাঁহাকে তুষ্ট রাখিবার জন্যও তাঁহাকে অধিক অর্থ দিতেন। কিন্তু বার্ণার্ড অর্থলোভী ছিলেন না—যত অর্থ পাইতেন, তত ব্যয় করিতেন। সেই কারণে তিনি সকলেরই বিশেষ নর্তকীদিগের বিশেষ প্রিয়পাত্র ছিলেন। নর্তকীদিগের জন্য তিনি প্রভূত অর্থ ব্যয় করিতেন এবং প্রতি রাত্রে তাঁহার গৃহে বহু নর্তকীর সমাবেশ হইত। উহাদিগের মধ্যে একজনের নৃত্য-কলানৈপুণ্য চিত্তাকর্ষক ছিল এবং বার্ণার্ড তাহার প্রতি বিশেষ আকৃষ্ট হইয়াছিলেন। কিন্তু সেই আকর্ষণ ঘনিষ্ঠতায় পরিণতি লাভ করিলে কন্যার স্বাস্থ্য ও সৌন্দর্য লুপ্ত হইতে পারে, এই আশঙ্কায় তাহার মাতা তাহার প্রতি সর্বদা সতর্ক দৃষ্টি রাখিত এবং সম্রাটের চিকিৎসকের ঘনিষ্ঠতা-প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করিত। এইরূপে বার্ণার্ড যখন তাহাকে পাইবার আশায় নিরাশ হইয়াছিলেন—তখন তিনি অন্তঃপুরে কোন কঠিন রোগে রোগীকে আরোগ্য করায়—জাহাঙ্গীর আম-খাস ওমরাহদিগের সম্মুখে বার্ণার্ডকে পুরস্কার দিতে চাহেন। বার্ণার্ড বলেন, তিনি পুরস্কার প্রত্যাখ্যান করায় সম্রাট যেন রুষ্ট না হন এবং তাহার পরিবর্তে নিয়মানুসারে সম্রাটকে প্রণাম করিবার জন্য সমাগত নর্তকীদিগের মধ্যে উপস্থিত তাঁহার বাঞ্ছিত নর্তকীকে তাঁহাকে প্রদান করেন। উপস্থিত দরবারীরা দুই কারণে বার্ণার্ডের প্রস্তাবে হাসিয়া উঠেন —প্রথম, তিনি সম্রাটের পুরস্কার প্রত্যাখ্যান করায় এবং দ্বিতীয়, তিনি যাহা চাহিলেন, তাহা পাইবার সম্ভাবনা অতি অল্প বলিয়া —কারণ, বার্ণার্ড খৃষ্টান আর তরুণী মুসলমান ও নর্তকী। কিন্তু জাহাঙ্গীরের ধর্মগত সংস্কার ছিল না। তিনি বার্ণার্ডের প্রস্তাবে উচ্চহাস্য করিয়া তাঁহাকে নর্তকীটিকে দিতে আদেশ করিয়া বলিলেন —"উহাকে তুলিয়া চিকিৎসকের স্কন্ধে বসাইয়া দাও—চিকিৎসক উহাকে বহন করিয়া লইয়া যাউক।" সেই বহু জনপূর্ণ দরবারে নর্তকীকে বার্ণার্ডের পৃষ্ঠে তুলিয়া দেওয়া হইল এবং বার্ণার্ড বিজয়গর্বে তাহাকে গৃহে লইয়া গেল।

বার্ণার্ড যে ইংরেজদিগের বাঙলায় বাণিজ্যের অধিকার প্রতিষ্ঠার কোন চেষ্টা করিয়াছিলেন, তাহার কোন প্রমাণ নাই। সে চেষ্টা এদেশে ভাগ্যান্বেষী ইংরেজদিগের মধ্যে কেহই মোগল দরবারে করেন নাই।

অবশ্য ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর বাঙলায় বাণিজ্য করিবার বাসনা ও চেষ্টা পূর্বে হইতেই ছিল। ১৬১৫ খৃষ্টাব্দে ইংলণ্ডের রাজা প্রথম জেমস দূত নিযুক্ত করিয়া স্যার টমাস রোকে মোগল বাদশাহের নিকট প্রেরণ করেন। সর্ত থাকে, দূতের সব ব্যয় কোম্পানী বহন করিবেন এবং দৌত্যে কোন সুবিধা হইলে কোম্পানী তাহা সম্ভোগ করিবেন। রো ঐ বৎসর সেপ্টেম্বর মাসে সুরাটে উপনীত হইয়া আজমীরে মোগল দরবারে গমন করেন। তখন মুসলমান তীর্থযাত্রীরা সুরাট হইয়া মক্কা যাত্রা করিতেন এবং পর্তুগীজরা জলপথে তীর্থযাত্রী-দিগকে উত্যক্ত করিত। একদল কাফের আর একদল হাফেরের নিপাত সাধন করিবে, এই আশায় মোগল দরবার স্যার টমাসকে বাণিজ্যের ছাড় দেন। স্যার টমাস যে চুক্তি-পত্রের খসড়া প্রস্তুত করিয়াছিলেন, তাহাতে মোগল সাম্রাজ্যের সকল বন্দরে—বিশেষ গুজরাটে, বাঙলায় ও সিন্ধুতে—ইংরেজ-দিগের কুঠী প্রতিষ্ঠিত করিবার ব্যবস্থা ছিল। কিন্তু ঐ চুক্তিপত্র সম্রাটের স্বাক্ষর-লাভ করে নাই। তবে রো ইংরেজের সুরাটে বাসের, দেশমধ্যে গমনের ও অত্যাচারের প্রতিকার পাইবার ছাড়লাভ করেন। যুবরাজ সাজাহান তখন গুজরাটের শাসক। তিনি ইংরেজদিগকে সুরাটে গৃহ ভাড়া করিয়া ব্যবসা করিবার অনুমতি এবং পর্তুগীজ-দিগের দ্বারা আক্রান্ত হইলে সাহায্য করিবার প্রতিশ্রুতি প্রদান করেন। সম্রাটের ছাড়ে ও যুবরাজের প্রতিশ্রুতিতে যে সে সময়ে সুরাটে ইংরেজ বণিকের সম্ভ্রম বৃদ্ধি হইয়াছিল, তাহা বলা বাহুল্য।

ভারতবর্ষের পূর্ব সাগরকূলে কুঠী-স্থাপনও ইংরেজের পক্ষে সহজসাধ্য হয় নাই। ডাচগণ ১৬০৯ খৃষ্টাব্দে মাদ্রাজের উত্তরে কুলিকটে প্রথম অবতরণ করে।

১৬১১ খৃষ্টাব্দে ইংরেজ ক্যাপ্টেন হীপনও তথায় গমন করিলে ডাচদিগের (হল্যান্ডার) প্ররোচনায় স্থানীয় ভূস্বামী রাণী ইংরেজকে তথায় কোন অধিকার দিতে অস্বীকার করিলে ইংরেজরা পেট্টাপলীতে গমন করেন (১৮ই আগস্ট, ১৬১১ খৃঃ)। তথায় ইংরেজরা গলকণ্ডার রাজার সাহায্যও লাভ করেন। কিন্তু তথায় কার্যের সুবিধা না হওয়ায় ১৬২১ খৃষ্টাব্দে কুঠী বন্ধ করা হয়। আরও একবার (১৬৩৮ খৃঃ) তথায় আড্ডা লইবার পরে পূর্ব উপকূলে মশুলীপট্টমে ইংরেজের প্রথম ব্যবসাকেন্দ্র হয়। তথা হইতে সুরাটের সহিত, যেমন বিলাতের সহিতও তেমনই ব্যবসা চলিতে থাকে। ইংরেজরা তথায় সশস্ত্র দুর্গ নির্মাণ করিবার অধিকার যে ছাড়ে স্থানীয় হিন্দু ভূম্যধিকারীর নিকট হইতে লাভ করেন, তাহা স্বর্ণপত্রে লিখিত। পরে গলকণ্ডার মুসলমান শাসকগণ ইংরেজদিগকে অভয় দেন—"আমি রাজা—আমার আশ্রয়ে তাহারা নিরাপদে থাকিবে।" পরে মশুলীপট্টম হইতে পূর্বোপকূলে ইংরেজের প্রধান বাণিজ্য কেন্দ্র মাদ্রাজে স্থানান্তরিত হইয়াছিল বটে, কিন্তু ১৬৩২ খৃষ্টাব্দে মশুলীপট্টমের কুঠীর ইংরেজরাই ব্যবসা বিস্তার চেষ্টায় উত্তর দিকে যাইবার সংকল্প করে। সেই সংকল্পফলে ১৬৩৩ খৃষ্টাব্দের মার্চ মাসে আটজন ইংরেজ দেশীয় নৌকায় যাত্রা করিয়া ২১শে এপ্রিল মোগলদিগের কুম্ভঘর হরিশপুরে উপনীত হয়। যে নৌকায় তাহারা গমন করিয়াছিল, তাহার পাইন সমচতুষ্কোণ ও তাহার উপরে যে ছত্র ছিল, তাহা খড়ের ছাউনী। তাহাতেই তরঙ্গতাড়িত অবস্থায় ঐ আটজন ইংরেজ মহানদীর মোহনায় হরিশপুরে উপনীত হয়েন। বন্দরের প্রধান কর্মচারী হিন্দু—ইংরেজরা তাঁহাকে "রাজা" বলিয়াই উল্লেখ করিয়াছেন। তাঁহার নামও জানা যায় নাই। তবে তাহা লক্ষ্মী বলিয়া বোধ হয়। কারণ ইংরেজরা তাঁহাকে "লকলিপ দি রাব্বার" (রাজা লক্ষ্মী?) বলিয়া উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। তিনি ইংরেজ আগন্তুকদিগের সহিত ভারতীয়সুলভ শিষ্টাচার করেন। কিন্তু পর্তুগীজরা ইংরেজদিগের আগমনে রুষ্ট হইয়াছিল। তাহারা ইংরেজদিগের বিরুদ্ধাচরণে তৎপর ছিল। পরস্পরের স্বার্থে বিরোধিতাই তাহার কারণ। একখানি পর্তুগীজ তরী ইংরেজদিগের অনুসরণ করিয়াছিল এবং হরিশপুরে (হরিশপুরগড় বা হরিশপুর কেল্লা) আসিয়া ইংরেজদিগের নৌকার নিকটেই থাকে। ইংরেজরা কূলে অবতরণ করিলে পর্তুগীজরা তাহাদিগের সহিত হাঙ্গামা বাধায় এবং স্থানীয় লোকরা যেরূপ উগ্র হইয়া উঠে তাহাতে ইংরেজদিগের জীবননাশের সম্ভাবনা ঘটে। রাজার প্রায় দুই শত লোক আসিয়া ইংরেজদিগের উদ্ধারসাধন করে।

যে ৮ জন ইংরেজ আসিয়াছিল—রাল্ফ কার্টরাইট তাহাদিগের নেতা। হরিশপুরে ৬ জন ইংরেজ সহযাত্রীর ও অনুকূলে রাজার হেপাজতে নৌকা রাখিয়া কার্টরাইট ২ জন মাত্র ইংরেজকে লইয়া মহানদীর কূলে কটকাভিমুখে যাত্রা করে। বাঙ্গলা বিহার ও উড়িষ্যা তখন বাঙ্গলার মোগল সম্রাটের অধীন শাসক নবাবের অধীন। তিনিই বিদেশী বণিকদিগকে বাণিজ্য করিবার অধিকার দিতে পারিতেন। উড়িষ্যার শাসক নবাব বাঙ্গলার শাসকের অধীন ছিলেন। সে সময়ে যিনি উড়িষ্যার শাসক ছিলেন, তাঁহার নাম আলা মহম্মদ জমান। তিনি পারস্যের তিহারাণে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন এবং মোগল সাম্রাজ্যে দক্ষ সেনাপতি ও শাসন ক্ষমতাশালী বলিয়া প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন। ইংরেজরা হয় বাঙ্গলার (অর্থাৎ বাঙ্গলা, বিহার ও উড়িষ্যার) নবাবে ও উড়িষ্যার শাসকে প্রভেদ বুঝিতে পারে নাই, নহেত মনে করিয়াছিল, উড়িষ্যার শাসকের অনুগ্রহ লাভ করিলেই তাহাদিগের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইবে। শাসক কটকে (মহানদী ও কাটজুরী নদীদ্বয় যেখানে ভিন্ন ভিন্ন দিকে গিয়াছে তথায় "মালকান্দী" কূলে) থাকিতেন। কটক যাইবার পথে ইংরেজ বণিকরা অসহায় বিদেশীদিগের সম্বন্ধে স্বভাবতঃ অতিথি সৎকারপরায়ণ হিন্দু অধিবাসীদিগের নিকট বিশেষ শিষ্টাচার লাভ করিয়াছিল।

কিন্তু কটকে দরবারে উপনীত হইয়া ইংরেজ ৩ জনের আপনাদিগের অবস্থা সম্বন্ধে চৈতন্যোদয় হইতে বিলম্ব ঘটে নাই। কটকের মুসলমান শাসক বাঙ্গলায় মোগল সম্রাটের প্রতিনিধির অধীন ছিলেন। তিনি শিষ্টাচারের সহিত রাজকার্যের সম্মিলনপটু ছিলেন এবং যে সকলভাবে থাকিতেন তাহার কতকাংশ সামরিক, কতকাংশ ধর্মসম্পর্কিত। তিনি দিবাভাগে বিশাল দুর্গ-প্রাসাদে শাসন কার্য পরিচালিত করিতেন এবং রাত্রিকালে সৈনিকের মত বিশ্বাসভাজন ভৃত্য ও রক্ষীদিগে পরিবেষ্টিত হইয়া শিবিরে শয়ন করিতেন। তিনি তাঁহার সাধারণ দরবার গৃহে সমৃদ্ধির পরিচায়ক সভামধ্যে ইংরেজদের সহিত সাক্ষাৎ করেন। তিনি শিষ্টভাবে কার্টরাইটের দিকে মস্তক নত করিয়া তাহার পরেই নিজ পদ পাদুকা মুক্ত করিয়া কার্টরাইটের চুম্বনের জন্য দেন। কার্টরাইট চরণ চুম্বনের প্রথা অপমানজনক মনে করিয়া দুইবার ইতস্ততঃ করেন বটে, কিন্তু তৃতীয়বার সে ভাব বর্জন করিয়া সানন্দে সেই চরণ চুম্বন করেন। কার্টরাইট শাসকের জন্য যে সকল দ্রব্য উপহাররূপে আনিয়াছিলেন; সে সকল প্রদান করেন। কিন্তু সে তাহার আবেদন পেশ করিবার পূর্বেই নমাজের আজান ধ্বনিত হয়—সমুজ্জ্বল বেশধারী দরবারীরা সকলেই অস্তাচলগামী সূর্যের দিকে ফিরিয়া জানু পাতিয়া উপবেশন করেন—সে দিনের মত দরবারের কাজ শেষ হয়। এদিকে প্রাসাদে অসংখ্য দীপ, জ্বলিয়া উঠে। তখন ইংরেজরা দুর্গ প্রাসাদের নিকটস্থ কটক নগরে তাহাদিগের জন্য নির্দিষ্ট গৃহে ফিরিয়া যায়। সে দিনের কাজ শেষ হয়।

তাহার পর দরবারে দরবার চলিতে লাগিল। কার্টরাইট ২টি উদ্দেশ্যে তথায় উপস্থিত হইয়াছিলেন, প্রথম—মোগল সম্রাটের বন্দরে পর্তুগীজদিগের দ্বারা তাঁহাদিগকে আক্রমণের প্রতীকার, দ্বিতীয় বাঙ্গলায় বাণিজ্যের জন্য ছাড়প্রাপ্তি। পর্তুগীজ নৌকার অধ্যক্ষ ইংরেজদিগের বিরুদ্ধে পাল্টা অভিযোগ উপস্থাপিত করিল এবং উভয় পক্ষই প্রভাবশালী রাজকর্মচারীদিগকে অর্থ দিয়া তাহাদিগের সমর্থন লাভের ব্যবস্থা করিল। কার্টরাইট সাহস করিয়া বলিলেন, যখন পর্তুগীজরা ইংরেজ, ডেন বা ডাচ কোন জাতির ছাড় না লইয়াই উপকূলে বাণিজ্য করিয়াছে, তখন তাহাদিগের নৌকা সে লইতে পারে। পর্তুগীজ নাবিক তাহার জাতির ছাড় ব্যতীত আর কোন ছাড় দাখিল করিতে পারিল না। কিন্তু তাহা গ্রাহ্য করা হইল না। বিশেষ মোগল সরকার পর্তুগীজদিগকে দস্যু বলিয়া বিবেচনা করিতেন এবং পূর্ব বৎসর বাঙলায় পর্তুগীজদিগের প্রধান কেন্দ্র (হুগলী) ধ্বংস করিয়াছিলেন।

হুগলীতে পর্তুগীজরা বাদসাহের অনুমতি লইয়া ১৫৭৯ খৃষ্টাব্দে বা ঐরূপ কোন সময়ে বাণিজ্যকেন্দ্র স্থাপন করে। তখনও সপ্তগ্রাম বাঙ্গালার সর্বপ্রধান বন্দর। পর্তুগীজরা ব্যবসায়ে লাভবান হইতে থাকে এবং সপ্তগ্রাম বন্দরও সরস্বতী নদী মজিয়া যাওয়ায় অবনতিগ্রস্ত হইতে থাকে। পর্তুগীজরা এখন অশিষ্ট হইয়া উঠে এবং আপনাদিগের বাণিজ্যকেন্দ্র সুরক্ষিত করিতে প্রবৃত্ত হয়। তাহারা হুগলীতে দুর্গও প্রস্তুত করে এবং উহারা গড় খনন করিতেও ত্রুটি করে নাই। পিতার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করিয়া সাহজাহান যখন পলাইয়া বাঙগলায় আসিয়া বর্ধমানে আশ্রয় গ্রহণ করেন, তখন তিনি হুগলীতে পর্তুগীজ শাসককে তাঁহাকে সাহায্য করিতে বলেন। সম্রাটের কোপানলে পতিত হইবার আশঙ্কায় শাসক তাহাতে অসম্মত হয়েন। সাহজাহান সেই অপমান ভুলেন নাই। তিনি সম্রাট হইয়া যখন কাশেম খাঁকে বাঙগলার নবাব নাজিম করিয়া প্রেরণ করেন, তখন তাঁহাকে পর্তুগীজদিগের প্রতি দৃষ্টি রাখিতে

নির্দেশ দেন। কাশেম খাঁন•দীর্ঘ ২ বৎসর পর্তুগীজদিগের ব্যবহার লক্ষ্য করিয়া প্রমাণ সংগ্রহ করিয়া সম্রাটের নিকট তাহাদিগের বিরুদ্ধে অভিযোগ উপস্থাপিত করেন। প্রধান অভিযোগ—তাহারা বহু ভারতীয়কে বলপূর্বক খৃষ্টান করিত এবং অনুমতির অপেক্ষা না রাখিয়া হুগলী রক্ষার ব্যবস্থা করিয়াছে। অভিযোগ পাইয়া সম্রাট বাঙলা হইতে পর্তুগীজদিগকে দূর করিয়া দিতে আদেশ করিলেন। কিন্তু হুগলী অধিকার করা যে সহজ সাধ্য নহে—কাশেম খাঁন তাহা জানিতেন। সেই জন্য তিনি বিশেষরূপে আয়োজন করিলেন। ১৬৩২ খৃস্টাব্দের ১১ই জুন মোগল বাহিনী হুগলী পরিবেষ্টিত করে। দীর্ঘ ৩ মাস আত্মরক্ষার পরে পর্তুগীজরা ১০ই সেপ্টেম্বর পরাভূত হয়। তখন হুগলীর নিম্নে গঙ্গায় পর্তুগীজদিগের ৬৪ খানি বড় নৌকা, ৫৭ খানি "গ্রাব" নৌকা ও ২ শত অন্যান্য নৌকা ছিল। সে সকলের মধ্যে কেবল ৩ খানি রক্ষা পায়—আর সবই ধ্বংস হয়। সর্বাপেক্ষা বৃহৎ যানের অধ্যক্ষ ২ হাজার নরনারী শিশু ও তাহাদিগের সকল বহুমূল্য দ্রব্য সহ মুসলমানের কাছে ধরা না দিয়া নৌকার বারুদে অগ্নি দিয়া নৌকা উড়াইয়া দেন। শুনা যায় এক হাজার পর্তুগীজ নিহত ও ৪ হাজার ৪ শত বন্দী হয়। মুসলমান পক্ষেও নিহতের সংখ্যা এক হাজার। স্টুয়ার্ট বলেন, আগ্রায় পর্তুগীজ বালিকাদিগকে সম্রাটের ও ওমরাহদিগের অন্তঃপুরে বণ্টন করা হইয়াছিল। কেবল হুগলীর উপকণ্ঠে ব্যাণ্ডেলে কতকগুলি পর্তুগীজ রক্ষা পায়। ইহার পরে মোগল সম্রাট হুগলীকেই প্রধান বন্দর করেন। সপ্তগ্রাম হইতে দপ্তর হুগলীতে স্থানান্তরিত করা হয়। হুগলীই কলিকাতার ভাগ্যোদয়ের পূর্বে পর্যন্ত প্রধান বন্দর ছিল।

পর্তুগীজদিগের প্রতি সম্রাটের এই মনোভাব উড়িষ্যার শাসক অবগত ছিলেন। তিনি "অনেক চিন্তার পর" "সুবিচারের" সরল পন্থা স্থির করিলেন—সমগ্র মাল সহ উভয় পক্ষের নৌকাই আত্মসাৎ করিবেন—নির্দেশ দিলেন। ইংরেজ কার্টরাইটের ধৈর্যসীমা অতিক্রান্ত হইল। সে দাঁড়াইয়া ক্রুদ্ধভাবে বলিল সে যদি তথায় বিচার না পায়, তবে অন্যত্র যাইবে। তাহার পরে সে নবাবের বা অন্য কাহারও নিকট বিদায় না লইয়া থাকিয়া গেল। তাহার এই অতর্কিত ব্যবহার সকলেরই প্রশংসা অর্জন করিল।

নবাব কার্টরাইটের ব্যবহারে ক্রুদ্ধ না হইয়া আমোদ পাইলেন এবং তাহাকে শান্ত হইবার জন্য ৩ দিন সময় দিয়া তাহার পরে তাহাকে ডাকিয়া পাঠাইলেন। কার্টরাইট জানিত, নবাবের গদী হইতে সামান্য ইঙ্গিতে তাঁহার ও তাঁহার সঙ্গীদিগের জীবনান্ত হইতে পারে। তথাপি সে ভীত না হইয়া বলিল, নবাব তাহার প্রভু ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর সম্বন্ধে অন্যায় করিয়াছেন—তিনি তাঁহার ক্ষমতাবলে কোম্পানীর অধিকার হরণ করিয়াছেন। তাহা সহ্য করা হইবে না। নবাব কখন এইরূপ অশিষ্ট উক্তি শুনেন নাই; সেইজন্য সমবেত ভারতীয় বণিকদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন—কোন জাতির লোক এইরূপ হয়? তাঁহারা বলিলেন, ইংরেজ জাতির জাহাজ এরূপে যে নবাবের রাজ্যের কোন তরণী বৃহৎই হউক বা ক্ষুদ্রই হউক বাহির হইলে সেই জাতির জাহাজ সে সব ধরিতে পারে। সেই কথা শুনিয়া নবাব আর বিশেষ কিছু বলিলেন না। তবে তিনি কি মনে করিলেন, তাহা অল্পদিনেই বুঝিতে পারা গেল।

নবাব পর্তুগীজদিগের নৌকা ছাড়িলেন না; কিন্তু ১৬৩৩ খৃস্টাব্দের ৫ই মে তারিখে মোহর দিয়া "বণিক রালফ কার্টরাইটের" নামে ব্যবসা করিবার ছাড় দিলেন। কার্টরাইট উড়িষ্যার সকল বন্দরে বিনা শুল্কে পণ্যক্রয় ও চালান করিবার জমী কিনিবার, কুঠী নির্মাণের এবং জাহাজ নির্মাণের ও সংস্কারের অধিকার লাভ করিল। কথা থাকিল, ইংরেজরা বণিকোচিত ব্যবহার করিলে তাহাদিগের প্রতি কোনরূপ অনাচার হইবে না এবং কোন বিষয়ে দ্বন্দ্ব হইলে প্রকাশ্য দরবারে তাহার বিচার হইবে।

বাঙলা বিহার উড়িষ্যা সম্মিলিত প্রদেশত্রয়ে ইহাই ইংরেজ জীবনের প্রথম বাণিজ্যাধিকার লাভ। তবে যে হারে তাহা প্রদত্ত হয়, তাহা উড়িষ্যার বাহিরে ব্যবহৃত হইবার কোন সম্ভাবনা ছিল না।

ছাড় প্রদানের পরদিন নবাব ইংরেজ ৩ জনকে ভোজে তৃপ্ত করিয়া বিদায় দিলেন। তাহারাও কার্যসিদ্ধির গৌরবে ও আনন্দে প্রস্থান করিল। তাহারা কটকের পথে হরিহরপুরে যাত্রাভঙ্গ করিয়াছিল। হরিহরপুর তখন সমৃদ্ধ গঞ্জ ছিল। উহা হরিশপুর ও কটকের মধ্যবর্তী স্থানে অবস্থিত এবং ইংরেজরা মনে করিয়াছিল, উহা ম্যালেরিয়া মুক্ত হইবে। তাহারা হরিহরপুরে প্রথম কুঠী স্থাপিত করিল। তাহাই বাঙলা-বিহার-উড়িষ্যায় ইংরেজ বণিকের প্রথম কুঠী। পরমাসে (জুন) কার্টরাইট বালেশ্বরে একটি কুঠী স্থাপিত করেন এবং মশুলীপট্টমের কুঠী উড়িষ্যার কুঠীর সাহায্য করিতে অগ্রহশীল হইয়া বিলাত হইতে পণ্য লইয়া 'সোয়ান' জাহাজ সমগ্র পণ্যসহ কার্টরাইটের নিকট প্রেরণ করিলেন। ১৬৩৩ খৃস্টাব্দের ২২শে জুলাই 'সোয়ান' জাহাজ হরিশপুরে কুৎঘাটার নিকটে নোঙ্গর করিয়া ৩ বার কামান "দাগিয়া" সেই জলার নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিল এবং কোন উত্তর না পাইয়া বালেশ্বরে যাইয়া কার্টরাইটকে পাইল।

ঘটনাসমূহে দেখিয়া মনে হইল অদৃষ্ট ইংরেজদের প্রতি প্রসন্ন। আশায় উৎফুল্ল হইয়া কার্টরাইট উত্তরদিকে পিপলীতে ও দক্ষিণদিকে পুরীতে কুঠী স্থাপনের পরিকল্পনা করিল।

কিন্তু ইংরেজদের এই সমৃদ্ধি স্বল্পকালস্থায়ী এবং আশা হতাশায় পর্যবসিত হইল। 'সোয়ান' জাহাজে প্রধান পণ্য বনাত ও সীস। বালেশ্বরে ক্রেতার অভাবে ঐ পণ্য প্রায় এক বৎসর অবিক্রীত রহিল।

ইহার কারণ, সহজেই অনুমেয়। উড়িষ্যায় ইংরেজদের কুঠী প্রতিষ্ঠিত হইবার প্রায় দেড় শত বৎসর পরে স্যার টমাস মনরো লিখিয়াছিলেনঃ—

"কোন জাতি যে সকল দ্রব্য অল্প মূল্যে ও উত্তমরূপে প্রস্তুত করিতে পারে, তাহা পরের নিকট হইতে গ্রহণ করে না। ভারতবর্ষের লোক যে সকল দ্রব্য ব্যবহার করে, প্রায় সে সকলই ইউরোপের তুলনায় তাহাদিগের দেশে অল্পমূল্যে ও উত্তমরূপে প্রস্তুত হয়। কার্পাসের ও রেশমের বস্ত্রাদি, পরিষ্কৃত চামড়া, কাগজ, লৌহের ও পিতলের পাত্রাদি, কৃষির যন্ত্রাদি সেই সকলের মধ্যে উল্লেখ করা যায়। তাহাদিগের পশমী দ্রব্য মোটা হইলেও মূল্যের অল্পতায় আদৃত থাকিবে এবং তাহাদিগের ভাল কম্বল আমাদিগের কম্বলের তুলনায় অধিক গরম ও দীর্ঘকালস্থায়ী।"

তখনও ভারতীয়দিগের অভাব অল্প ছিল এবং মনরো তাহার উল্লেখ করিয়া মনে করিয়াছিলেন, এ দেশে বিলাতী পণ্যের ব্যবহার বৃদ্ধির সম্ভাবনা সুদূর পরাহত। যে পরিবর্তনের ফলে তাহার অর্ধ শতাব্দীর মধ্যে অবস্থা হয়ঃ—

"তাঁতী কর্মকার করে হাহাকার,
সুতা জাঁতা টেনে অন্ন মেলা ভার—
দেশী তন্ত্র বস্ত্র বিকায় নাকো আর
হলো দেশের কি দুর্দিন"

সেই পরিবর্তন স্যার টমাস মনরোও কল্পনা করিতে পারেন নাই।

একদিকে বনাত ও সীস অবিক্রীত রহিল—আর একদিকে ইংরেজের পক্ষে রসাল ফলের ও সুলভ দেশী মদ্যের প্রলোভন সম্বরণ করা দুষ্কর হইল। আর বর্ষাকালে যখন জলাভূমির ম্যালেরিয়া বদ্বীপে ইংরেজের কুঠী আক্রমণ করিল, তখন মৃত্যুর ভয়ংকর রূপেই সপ্রকাশ হইল।

বর্ষাশেষ হইবার পূর্বে উড়িষ্যায় ৬ জন ইংরেজ কুঠীয়ালের মধ্যে ৫ জনের মৃত্যু হইল। নাবিকদিগের মধ্যে মৃত্যু অত্যন্ত অধিক হইতে লাগিল। 'সোয়ান' জাহাজের পরে যে জাহাজ আসিয়াছিল, তাহা মাদ্রাজে ফিরিয়া গেল তাহার অধিকাংশ নাবিক তখন

ম্যালেরিয়াজীর্ণ। বিলাতী বেশে ও আহার্যে-পানীয়ে অভ্যস্ত ইংরেজরা এদেশে তখন কিরূপ কষ্টভোগ করিত, তাহা কল্পনা করাও দুঃসাধ্য। জাহাজের ঘরে যেন শ্বাসরোধ হইয়া আসিল, আর কূলে দরমার ঘরই তাহাদিগের একমাত্র আশ্রয় ছিল। ইহার প্রায় ৩০ বৎসর পরে যখন এদেশে ইংরেজরা দেশের জলবায়ুর সহিত সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়া আহারের ও বেশের পরিবর্তন করিতে শিখিয়াছে, তখনও ইংরেজদের ২খানি বড় জাহাজ এক বৎসর বালেশ্বরে থাকিবার পরে অধিকাংশ নাবিকের মৃত্যুহেতু সমুদ্রে যাইতে অক্ষম হইয়াছিল।

যদিও পণ্য অবিক্রীত রহিল এবং কুঠীয়ালরা ও নাবিকরা মৃত্যুমুখে পতিত হইতে লাগিল, তথাপি অবশিষ্ট ইংরেজরা উড়িষ্যার উপকূলে বহুকষ্টে লব্ধ অধিকার—কুঠী ত্যাগ করিয়া যাইতে অসম্মত হইল।

কিন্তু ঐ সকলের সঙ্গে আবার ২টি নূতন বিপদ দেখা দিল—

(১) বঙ্গোপসাগরের পরপার—আরাকানের ও চট্টগ্রামের সমুদ্র কূল হইতে আবির্ভূত—পর্তুগীজ জলদস্যুরা নদীর মোহনায় আক্রমণ পরিচালিত করিতে লাগিল।

(২) মাদ্রাজের উপকূলে ও পূর্ব দ্বীপ-পুঞ্জ হইতে একটি ডাচ নৌবহর উপনীত হইয়া ইংরেজদিগের জাহাজের পথরোধ করিল।

কার্টরাইটকে পুরীতে ও পিপলীতে কুঠী স্থাপনের কল্পনা ত্যাগ করিতে হইল এবং নদী মজিয়া যাওয়ায় হরিহরপুরের গঞ্জও হতশ্রী হইল। অল্প দিনের মধ্যেই উড়িষ্যায় অস্বাস্থ্যকর বালেশ্বর ব্যতীত আর কোথাও ইংরেজদিগের কুঠী রহিল না। বালেশ্বরের কুঠীরও অবস্থা সন্তোষজনক হইতে পারিল না। মশুলীপট্টমের কুঠীই বাঙলার (উড়িষ্যার) কুঠীর সহায় হইল। কিন্তু গলকণ্ডার রাজার সহিত উপকূলের ভূস্বামীদিগের কলহে সে কুঠীর পক্ষেও আত্মরক্ষা করা কষ্টকর হয়। বৃটেনেও তখন কোম্পানীর অবস্থা সন্তোষজনক নহে। কোম্পানীর পরিচালকগণ উড়িষ্যার কুঠী ক্ষতিজনক ভারমাত্র বলিয়া মনে করেন। শেষে ১৬৪১ খৃষ্টাব্দে বালেশ্বরে কুঠীর দেনা শোধ করিয়া কুঠীয়ালদিগকে লইয়া যাইবার জন্য 'ডায়মণ্ড' জাহাজ প্রেরণ করা হয়।

কিন্তু ভাগ্যক্রমে এই স্থানেই যবনিকাপাত হইল না। উড়িষ্যায় কুঠী স্থাপনের চেষ্টা অতিকষ্টে ৯ বৎসরকাল রক্ষার পরে ১৬৪২ খৃষ্টাব্দের গ্রীষ্মকালে ফ্রান্সিস ডে মাদ্রাজ প্রতিষ্ঠার পরে বালেশ্বরে আইসেন এবং বালেশ্বর ত্যাগের প্রতিবাদ করেন। তিনি বলেন, উড়িষ্যার বিশেষ সুবিধা এই যে, তাহা মোগল শাসনাধীন। অন্যান্য স্থানে অধিকারগত বিবাদবিসম্বাদের যে আশঙ্কা ও বিশৃঙ্খলা সর্বদা বিদ্যমান, উড়িষ্যায় সে সকল নাই। কাজেই ইংরেজের পক্ষে উড়িষ্যায় কুঠী স্থাপন নিরাপদ ও সুবিধাজনক। কিন্তু ডে'র মতানুসারে বালেশ্বরে কুঠী রাখিবার সাহস মাদ্রাজের ইংরেজ কাউন্সিলের হইল না। কাউন্সিল বিলাতে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর পরিচালকদিগের মত জানিতে চাহিলেন। তাঁহারা বিশেষ বিবেচনা করিয়া মনে করিলেন, ডাচদিগের দৃষ্টান্তের অনুসরণ করিয়া খাস বাঙলায় কুঠী স্থাপন করাই ভাল। কিন্তু কলিকাতার তলবাহী ভাগীরথীর পথ তখনও পরীক্ষা করা হয় নাই—নদীর কোথায় চড়া, কোথায় চোরা-বালু সে সকল জানা নাই। কাজেই বড় জাহাজ লইয়া ভাগীরথীতে প্রবেশ করিলে বিপদ ঘটিতে পারে। সেই জন্য মাদ্রাজ কাউন্সিল স্থির করিলেন, বালেশ্বরে জাহাজ হইতে মাল নামাইয়া দেশী নৌকায় তাহা বোঝাই করিয়া সমুদ্র হইতে প্রায় শত মাইল দূরে অবস্থিত হুগলীতে লইয়া যাইয়া তথায় পণ্য বিক্রয় করা হইবে। সে ১৬৫০ খৃষ্টাব্দের কথা।

হুগলীতে যে পর্তুগীজরা ১৫৩৭—৩৮ খৃষ্টাব্দে কুঠী স্থাপিত করিয়াছিল, তাহার উল্লেখ পূর্বেই করা হইয়াছে। আর হুগলীর নিকটে চুঁচুড়ায় ডাচদিগের কুঠী ছিল।

১৬৫০ খৃষ্টাব্দে যখন ইংরেজরা খাস বাঙলায়—হুগলীতে প্রথম বাণিজ্য আরম্ভ করিল, তখন প্রাচীন বন্দর সপ্তগ্রামের অবস্থা শোচনীয়। কাজেই বাণিজ্য কেন্দ্র হিসাবে হুগলীর শ্রীবৃদ্ধি হইতে থাকে।

কলিকাতা স্থাপিত হইবার পূর্বে পর্যন্ত হুগলীই বাঙলায় জলযান বাহিত বাণিজ্যের, প্রধান বন্দর ছিল।

হুগলীতেই বৃটিশ বণিকের বাঙলায় প্রথম আত্ম প্রতিষ্ঠা।

বাংলার কথা

শ্রীহেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ

গত ২১শে ও ২২শে শ্রাবণ পর পর দুইদিন বাঙলা তাহার দুইজন বরেণ্য সন্তানের উদ্দেশে শ্রদ্ধা নিবেদন করিয়াছে। একজন সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়—দ্বিতীয় জন—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। সুরেন্দ্রনাথ রাজনীতিক্ষেত্রে দিক্‌পাল ছিলেন; রবীন্দ্রনাথের তিরোভাবে এদেশে ইন্দ্রপাত হইয়াছে বলিলে অত্যুক্তি হয় না। সুরেন্দ্রনাথ এদেশে রাজনীতিক চেতনা সঞ্চারের গুরু। রবীন্দ্রনাথ বাঙালীর নাম স্বদেশের মত বিদেশেও পরিচিত ও শ্রদ্ধেয় করিয়া গিয়াছেন। সুরেন্দ্রনাথের স্মৃতি তাঁহার উপযুক্তভাবে রক্ষিত হয় নাই। রবীন্দ্রনাথের স্মৃতিরক্ষায় আমাদিগের সেই কলঙ্ক থাকিবে না—ইহাই আমাদিগের আশা ও আকাঙ্ক্ষা। রবীন্দ্রনাথের স্মৃতিরক্ষার জন্য জাতির কর্তব্য পূর্ণ করিবার কার্যে বাঙলার সর্বাপেক্ষা বহুল প্রচারিত সংবাদপত্রসঙ্ঘ অগ্রণী হইয়াছেন এবং সে কার্য দ্রুত অগ্রসরও হইতেছে।

বাঙলার কথায় গোপালকৃষ্ণ গোখলে যে বলিয়াছিলেন—চিন্তায় বাঙলা ভারতে অগ্রণী বাঙলা আজ যাহা চিন্তা করে, সমগ্র ভারতবর্ষ পরদিন তাহাই চিন্তা করে, তাহা আমরা স্মরণ করিয়া থাকি। কিন্তু গোখলে মহাশয়ের কথা শ্রীঅরবিন্দের কথার প্রতিধ্বনি। বাঙালী অরবিন্দ ১৮৯৪ খৃষ্টাব্দে বঙ্কিমচন্দ্র সম্বন্ধে তাঁহার সপ্তম প্রবন্ধে ("আমাদিগের ভবিষ্যৎ আশা") ভবিষ্যদ্বাণী করিয়াছিলেন—বাঙলার ভবিষ্যৎ সমুজ্জ্বল—

"What Bengal thinks tomorrow, India will be thinking tomorrow week."

বাঙলার সেই ভাবসম্পদ যাঁহারা বর্ধিত ও ব্যক্ত করিয়াছিলেন—রবীন্দ্রনাথ ও সুরেন্দ্রনাথ তাঁহাদিগের মধ্যে স্মরণীয় ও বরণীয়। আর সেইজন্যই আজ আমরা তাঁহাদিগের অভাব যেমন অনুভব করিতেছি, তাঁহাদিগের প্রতি শ্রদ্ধা-নিবেদনের আগ্রহ তত বোধ করিতেছি। বাঙলার গোমুখী-মুখ হইতে যে ভাব-গঙ্গার পাবনীধারা প্রবাহিত হইয়াছে, তাহা সমগ্র দেশকে ধন্য করিয়াছে,- তাহা কে অস্বীকার করিবে?

বঙ্কিমচন্দ্রের কথায় রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছিলেন, "ভাব সম্পদকে আমরা এখনও যথার্থ সম্পদরূপে গণ্য করিতে শিখি নাই।" শিখি নাই বলিয়াই—

"যে কয়টি মহাত্মা আমাদের দেশের কাজে জীবন বিসর্জন করিয়া গিয়াছেন, তাঁহাদিগকে মিশরের বিস্তীর্ণ মরুভূমির মধ্যে গুটিকতক নিঃসঙ্গ পিরামিডের মত দেখিতে হয়। এই মৃত সমভূমির মধ্যে তাঁহাদের সমুন্নত মহিমা দ্বিগুণ দেদীপ্যমান হয় বটে, কিন্তু সেই সঙ্গে একটি সুবিশাল বিষাদ হৃদয়কে বাষ্পাকুল করিয়া তোলে। হায়, এতবড় জীবন যাহার নিকট নিঃশেষে সমর্পিত হইয়াছে সে জানিতেও পারিল না, তাহার কি সৌভাগ্য এবং সে চিরদিনের জন্য কতখানি লাভ করিল।"

কিন্তু আমাদিগের দেশে আত্মবিসর্জনের প্রয়োজন বত অধিক তাহা বুঝিয়াই সেই সকল বরেণ্য ব্যক্তি কাজ করেন "সহায় নাই, কৃতজ্ঞতা নাই, অনুকূলতা নাই কেবল আপনার অন্তরের অপ্রতিহত ধৈর্য ও উপবাস সহিষ্ণু অকারণ অনুরাগে চিরজীবন একাকী বসিয়া" তাঁহারা কাজ করেন।

স্বদেশের প্রতি অনাবিল অনুরাগই তাঁহাদিগের কাজের উৎস।

সুরেন্দ্রনাথ ও রবীন্দ্রনাথ উভয়েই দীর্ঘজীবী ছিলেন। বিজ্ঞবর গেটে একবার বহু মনীষির অপেক্ষাকৃত অল্পবয়সে মৃত্যুর আলোচনা প্রসঙ্গে বলিয়াছিলেন—মনীষীমাত্রেরই জীবনের বিশেষ উদ্দেশ্য থাকে; সেই উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইবার পরে আর তাঁহাদিগের সেই দেহে থাকিবার প্রয়োজন হয় না, তাই তাঁহাদিগের তিরোভাব ঘটে। দীর্ঘজীবী সুরেন্দ্রনাথ ও রবীন্দ্রনাথ উভয়ের জীবনের উদ্দেশ্য ব্যাপক ছিল বলিয়াই তাঁহারা দীর্ঘকাল আমাদিগের মধ্যে ছিলেন। আবার উভয়েই শিক্ষক, লেখক, প্রচারক, সাধক।

উভয়েই স্বদেশীর সেবক ছিলেন। কিন্তু উভয়ের ভাবই যে এক ছিল, তাহা নহে। যাহাকে আমরা সাধারণত "স্বদেশী" বলি তাহা উভয়েরই চেষ্টায় পুষ্টি ও ব্যাপ্তি লাভ করিয়াছিল। উভয়েই স্বদেশীর জন্য বিদেশী পণ্য বর্জনের সমর্থন করিয়াছিলেন। কিন্তু সুরেন্দ্রনাথ যখন "বয়কটের" সমর্থন করেন, তখন তাহা রাজনীতিক কারণে। কংগ্রেসে যে প্রস্তাব গৃহীত হয়, তাহাতে বলা হয়, বাঙলার লোকের প্রতিবাদ অগ্রাহ্য করিয়া যখন বাঙলা প্রদেশকে ইংরেজ সরকার দ্বিধা-বিভক্ত করিলেন—সব আপত্তি অগ্রাহ্য করা হইল, তখন বাঙালীর পক্ষে বিলাতী পণ্য বর্জন সঙ্গত। রবীন্দ্রনাথ তাহা মনে করেন নাই। তিনি জন্মাবধি স্বদেশীর পরিবেষ্টনে লালিত-পালিত। তাঁহার পিতা দেবেন্দ্রনাথ সর্বতোভাবে স্বদেশী ছিলেন। তাঁহার অগ্রজ দ্বিজেন্দ্রনাথ, সত্যেন্দ্রনাথ ও জ্যোতিরিন্দ্রনাথ স্বদেশী গানে, কবিতায়, নাটকে দেশাত্মবোধ প্রচার করিয়াছিলেন, বিশেষ জ্যোতিরিন্দ্রনাথ সর্বাগ্রে স্বদেশী স্টীমার চালাইয়া প্রভূত অর্থ হারাইয়াছিলেন। দেবেন্দ্রনাথের অনুগ্রহে "হিন্দুমেলা" সমাদৃত হয়। সেই মেলার উদ্দেশ্য—স্বদেশীভাবে বাঙলার লোককে ভাবিত করা। রবীন্দ্রনাথ কংগ্রেস উপলক্ষে গান রচনা করিয়াছিলেন এবং পাঞ্জাবে স্বদেশীয়দিগের অপমান আপনার আপমান মনে করিয়া তাহার যে প্রতিবাদ করিয়াছিলেন, তাহা আমাদিগের দেশে স্মরণীয় হইয়া আছে।

রবীন্দ্রনাথ স্বদেশীর সঙ্গে বিদেশী পণ্য বর্জনকে কেবল সাময়িক ও উদ্দেশ্যসাধনের উপায় বলিয়া মনে করিতে পারেন নাই। তিনি তাহার প্রকৃত ভাবটি গ্রহণ করিয়া দেশের লোককেও তাহাই গ্রহণ করিতে বলিয়াছিলেন। আগ্রহের ব্যাকুলতাকে কিরূপে স্থায়ী করা যায় এবং তাহার কল্যাণ আকর্ষণ করা সম্ভব হয়, তিনি সেই চেষ্টাই করিয়াছিলেন—ভাবের দিক হইতে অভাবটি দেখিয়াছিলেন। তিনি বলিয়াছিলেনঃ—

"এখন তবে কথা এই যে, আমাদের দেশে বঙ্গব্যবচ্ছেদের আক্ষেপে আমরা যথাসম্ভব বিলাতী জিনিস-কেনা বন্ধ করিয়া দেশী জিনিস কিনিবার জন্য যে সংকল্প করিয়াছি সেই সংকল্পটিকে স্তব্ধভাবে, গভীরভাবে স্থায়ী মঙ্গলের উপরে স্থাপিত করিতে হইবে। আমি আমাদের এই বর্তমান উদ্যোগটির সম্বন্ধে যদি আনন্দ অনুভব করি, তবে তাহার কারণ এ নয় যে, তাহাতে ইংরেজের ক্ষতি হইবে, তাহার কারণ সম্পূর্ণভাবে এও নহে যে, তাহাতে আমাদের দেশী ব্যবসায়ীদের লাভ হইবে—এ সমস্ত লাভ-ক্ষতি নানা বাহিরের অবস্থার উপরে নির্ভর করে—সে সমস্ত সূক্ষ্মভাবে বিচার করিয়া দেখা আমার ক্ষমতায় নাই। আমি আমাদের অন্তরের লাভের দিক্‌টা দেখিতেছি। আমি দেখিতেছি, আমরা যদি সর্বদা সচেষ্ট হইয়া দেশী জিনিস ব্যবহার করিতে প্রবৃত্ত হই, যে জিনিসটা দেশী নহে, তাহার ব্যবহারে বাধ্য হইতে হইলে যদি কষ্ট অনুভব করিতে থাকি, দেশী জিনিস ব্যবহারের গতিকে যদি কতকটা পরিমাণে আরাম ও আড়ম্বর হইতে বঞ্চিত হইতে হয়, যদি সেজন্য মাঝে মাঝে স্বদলের উপহাস ও নিন্দা সহ্য করিতে প্রস্তুত হই তবে স্বদেশ আমাদের হৃদয়কে অধিকার করিতে পারিবে। এই উপলক্ষে আমাদের চিত্ত সর্বদা স্বদেশের অভিমুখ হইয়া থাকিবে। আমরা ত্যাগের দ্বারা, দুঃখ-

স্বীকারের দ্বারা অপন দেশকে যথার্থ-ভাবে আপনার করিয়া লইব। আমাদের আরাম, বিলাস, আত্মসুখতৃপ্তি আমাদিগকে প্রত্যহ স্বদেশ হইতে দূরে লইয়া যাইতেছিল, প্রত্যহ আমাদিগকে পরবশ করিয়া লোকহিতব্রতের জন্য অক্ষম করিতেছিল—আজ আমরা সকলে মিলিয়া যদি নিজের প্রাত্যহিক জীবনযাত্রায় দেশের দিকে তাকাইয়া ঐশ্বর্যের আড়ম্বর ও আরামের অভ্যাস কিছু পরিমাণও ত্যাগ করিতে পারি, তবে সেই ত্যাগের ঐক্যদ্বারা আমরা পরস্পরের নিকটবর্তী হইয়া দেশকে বলিষ্ঠ করিতে পারিব। দেশী জিনিস ব্যবহার করার ইহাই যথার্থ সার্থকতা—ইহাই দেশের পূজা, ইহা একটি মহান সংকল্পের নিকট আত্মনিবেদন।"

আজ যে বাঙলায় আমরা বিপন্ন, বিব্রত, বিধ্বস্তপ্রায় তাহার কারণ আমাদিগের মধ্যে ভাবুকের অভাব। গঙ্গা যেমন তাহার সলিল দিয়া দেশ উর্বর করে- মনীষীরা তেমনই ভাব দিয়া জাতিকে উপকৃত করেন। আজ যখন বাঙলা অন্নহীন, বস্ত্রহীন শিল্পহীন, স্বাস্থ্যহীন, শিক্ষাহীন তখন তাহার পক্ষে অর্থের প্রয়োজনের তুলনায়ও ভাবের প্রয়োজন অল্প নহে।

কারণ, আজ সর্বনাশের পরে আমাদিগকে গঠনকার্যে আত্মনিয়োগ করিতে হইবে। যে স্থানে সব নষ্ট হইয়া গিয়াছে, সেই স্থানে আবার গঠনকার্যে প্রবৃত্ত হইতে হইবে। রবীন্দ্রনাথ স্বদেশী সমাজের পরিকল্পনাও করিয়াছিলেন। সেই পরিকল্পনা ভাবুকের কার্য পরিচায়ক। বাঙলার সমাজকে আজ আবার পুরাতন ভিত্তির উপরে বা কোথাও সেই ভিত্তির আবশ্যক পরিবর্তন, পরিবর্জন ও পরিবর্ধন করিয়া গড়িয়া তুলিবার প্রয়োজন অনুভূত হইতেছে। প্রয়োজন এত অধিক যে, তাহা মিটাইবার জন্য রবীন্দ্রনাথের মত ভাবুকের ও সুরেন্দ্রনাথের মত প্রচারকের অভাব আমরা অত্যন্ত অনুভব করিতেছি। যদি আমাদিগের সেই অনুভূতি অতিরিক্ত ও প্রবল হয়, তবেই আমরা তাঁহাদিগের ভাবে অনুপ্রাণিত ও তাঁহাদিগের আদর্শে অনুপ্রাণিত হইতে পারিব। তাঁহারা তাঁহাদিগের কার্য শেষ করিয়া আদর্শ প্রতিষ্ঠিত করিয়া তিরোহিত হইয়াছেন। কিন্তু তাঁহাদিগের আদর্শ তাঁহারা আমাদিগকে দান করিয়া গিয়াছেন।

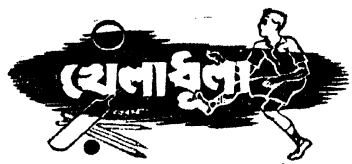
মধুসূদন দত্তের মৃত্যুতে বঙ্কিমচন্দ্র লিখিয়াছিলেন—

"যদি কেন আধুনিক ঐশ্বর্যগর্বিত ইউরোপীয় আমাদিগকে জিজ্ঞাসা করেন, তোমাদের আবার ভরসা কি? —বাঙালীর মধ্যে মানুষ জন্মিয়াছেন কে? আমরা বলিব, ধর্মোপদেশকের মধ্যে শ্রীচৈতন্যদেব, দার্শনিকের মধ্যে রঘুনাথ, কবির মধ্যে শ্রীজয়দেব ও শ্রীমধুসূদন।

"স্মরণীয় বাঙালীর অভাব নাই। কুল্লুক ভট্ট, রঘুনন্দন, জগন্নাথ, গদাধর, জগদীশ, বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস, গোবিন্দদাস, মুকুন্দরাম, ভারতচন্দ্র, রামমোহন রায় প্রভৃতি অনেক নাম করিতে পারি। অবনতাবস্থায়ও বঙ্গমাতা রত্নপ্রসবিনী। সেই সকল নামের সঙ্গে মধুসূদনের নামও বঙ্গদেশে ধন্য হইল।"

বঙ্কিমচন্দ্র জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন—"কেবলই কি বঙ্গদেশে?"

কিন্তু রবীন্দ্রনাথের সম্বন্ধে আমরা দৃঢ়তাসহকারে বলিতে পারি—কেবল বঙ্গদেশেই নহে—সমগ্র সভ্য জগতে।



ফুটবল লীগ

কলিকাতা ফুটবল লীগ প্রতিযোগিতার প্রথম ডিভিসনের চ্যাম্পিয়ানসিপ সম্পর্কে গত সপ্তাহে যে মন্তব্য আমরা করিয়াছিলাম ফলত তাহাই একরূপ হইয়াছে। কোন ক্রীড়ামোদীই এই বিষয় লইয়া বর্তমানে আলোচনা করে না। সকলেই আই এফ এ শীল্ড বিজয়ী "কে হইবে" এই চিন্তায় মত্ত। মোহনবাগান ও ইস্টবেঙ্গলের ন্যায় দুইটি জনপ্রিয় দল ফাইন্যালে উন্নীত হওয়ায় এই অবস্থা সৃষ্টি হইয়াছে। এই দুইটি দলের শীল্ড প্রতিযোগিতার পরিণাম দেখিবার জন্য সাধারণ ক্রীড়ামোদিগণ কিরূপ চঞ্চল হইয়া পড়িয়াছেন তাহা দুইটি দলের শীল্ড সেমি-ফাইন্যালের খেলায় যাঁহারা উপস্থিত ছিলেন তাঁহারা ভাল করিয়াই উপলব্ধি করিয়াছেন। ইস্টবেঙ্গল দলকে সেমি-ফাইন্যালে কালীঘাটের সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিতে হয়। এই খেলায় ইস্টবেঙ্গল দল বিজয়ী হইবেই ইহাতে কাহারও সন্দেহ ছিল না, কিন্তু তথাপিও এই দুই দলের যেদিন খেলা হয় সেইদিন মাঠে দর্শক ভাঙিয়া পড়িয়াছিল। মোহনবাগান দলকে ক্যালকাটার সহিত সেমি-ফাইন্যালে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিতে হয়। এই খেলায় মোহনবাগান দল বিজয়ীর সম্মান লাভ করিবে, ইহা অধিকাংশ ক্রীড়ামোদীরই ধারণা ছিল। কারণ ইহার পূর্বে মোহনবাগান দল লীগ প্রতিযোগিতার দুইটি খেলাতেই ক্যালকাটা দলকে পরাজিত করে। খেলাটি মোহনবাগান মাঠে অনুষ্ঠিত হয়। ইহাতে কেহ ধারণাই করিতে পারে নাই যে, প্রবেশ মূল্য হইতে ৩০ হাজারের অধিক টাকা সংগৃহীত হইবে। ইহাতেই অনুমান করা চলে যে, মোহনবাগান ও ইস্টবেঙ্গল যেদিন ফাইন্যাল খেলায় মিলিত হইবে সেদিন প্রবেশমূল্য হইতে কত সহস্র মুদ্রা পাওয়া যাইবে। ইহা নিঃসন্দেহে বলা চলে যে, ইতিপূর্বে সংগৃহীত অর্থের যে সকল রেকর্ড আছে তাহা নিশ্চয় এইদিনে অতিক্রম করিবে। সুতরাং এইরূপ অবস্থায় লীগ প্রতিযোগিতার চ্যাম্পিয়ানসিপ লইয়া আলোচনার কোন ক্রীড়ামোদীরই অবসর থাকিতে পারে কি? লীগ প্রতিযোগিতার এই শোচনীয় পরিণতির জন্য সম্পূর্ণ দায়ী পরিচালকমণ্ডলী। তবে বর্তমান অবস্থায় ইহার পরিবর্তন অসম্ভব। ভবিষ্যতে এইরূপ না হইলেই ভাল।

আই এফ এ শীল্ড

আই এফ এ শীল্ড প্রতিযোগিতা ভারতীয় ফুটবলের সর্বাপেক্ষা প্রাচীনতম ও জনপ্রিয় প্রতিযোগিতা। এই প্রতিযোগিতায় সাফল্য লাভ করা একদিন, কি ভারতীয়, কি ইউরোপীয়, কি সামরিক, কি বেসামরিক প্রত্যেকের বিশেষ গৌরবের বিষয় ছিল। পরিচালনার ত্রুটির জন্য ধীরে ধীরে প্রতিযোগিতার খ্যাতি ও জনপ্রিয়তা হ্রাস পাইতে থাকে। এমন কি বাঙলার বাহিরের দলের আগমন সংখ্যা ক্রমশ কমিয়া যায়। তিন চারি বৎসর পূর্বে এইরূপ অবস্থা সৃষ্টি হয় যে, পরিচালকগণকে কেবলমাত্র স্থানীয় দলসমূহকেই লইয়াই প্রতিযোগিতার অস্তিত্ব বজায় রাখিতে হয়। কিন্তু এই বৎসর সেই অবস্থার নাটকীয় পরিবর্তন পরিলক্ষিত হইতেছে। বাঙলার বাহিরের বিশিষ্ট দলসমূহও যোগদান করিয়াছে। প্রতিযোগিতার বিভিন্ন খেলা দেখিবার জন্যও বিপুল জনসমাগম হইয়াছে। এই পর্যন্ত যে কয়েকটি চ্যারিটি খেলা হইয়াছে তাহার অধিকাংশতেই গত তিন চারি বৎসর অপেক্ষা অধিক দর্শক সমাগম হইয়াছে। এমন কি কয়েকটি খেলায় রেকর্ড সংখ্যক অর্থ সংগ্রহও হইয়াছে। বিশেষ করিয়া মোহনবাগান ও ইস্টবেঙ্গলের ন্যায় দুইটি জনপ্রিয় ক্লাব ফাইন্যালে উন্নীত হইয়া যে অবস্থা সৃষ্টি করিয়াছে আই এফ এ শীল্ড ইতিহাসে কখনও তাহা পরিদৃষ্ট হয় নাই। এই দুইটি দলের মধ্যে যে দলই বিজয়ীর সম্মান লাভ করুক না কেন, সারা বাঙলা দেশের মধ্যে ফুটবল খেলার যে প্রবল উত্তেজনা ও উন্মাদনা সৃষ্টি হইয়াছে তাহা ভারতীয় ফুটবল ইতিহাসে এক নূতন অধ্যায় সৃষ্টি করিবে। বাঙলার ক্রীড়ামোদিগণ বিপুল উৎসাহে পুনরায় ফুটবল খেলার স্ট্যাণ্ডার্ড বৃদ্ধির জন্য উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়া যাইবেন।

কোন দল সম্মান লাভ করিবে

মোহনবাগান ও ইস্টবেঙ্গল এই দুইটি দলের মধ্যে ঠিক কোন দল বিজয়ীর সম্মানে ভূষিত হইবে বলা খুবই কঠিন। বিশেষ করিয়া খেলার ফলাফল যখন সব সময়েই অনিশ্চয়তার মধ্যে থাকে। তবে দুইটি দলের এই বৎসরের শীল্ডের বিভিন্ন খেলার ফলাফল ও প্রতিদ্বন্দ্বী দলের বিরুদ্ধে নৈপুণ্য প্রদর্শন বিচার করিলে এইটুকু বলা চলে মোহনবাগান দলেরই শীল্ড বিজয়ী হইবার সম্ভাবনা অধিক। কারণ মোহনবাগান দলকে শীল্ডের বিভিন্ন রাউণ্ডে ইস্টবেঙ্গল অপেক্ষা অধিক শক্তিশালী দলের সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিয়া ফাইন্যালে উঠিতে হইয়াছে। এমন কি কোন প্রতিদ্বন্দ্বী দলই মোহনবাগান দলের বিরুদ্ধে একটি গোল করিতে পারে নাই। ইহাতে স্পষ্টই উপলব্ধি করা যায় মোহনবাগান দলের রক্ষণভাগের শক্তি কিরূপ। তবে ইহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই, ইস্টবেঙ্গল দলের আক্রমণভাগে মোহনবাগান অপেক্ষা ভাল খেলোয়াড় বর্তমান আছেন। বিশেষ করিয়া আপ্পারাওয়ের সমতুল্য খেলোয়াড় মোহনবাগান দলে নাই। এই খেলোয়াড়টি যেরূপ পরিশ্রমী তেমনি সুচতুর। গত ৭।৮ বৎসর হইতে ইঁহাকে কলিকাতার মাঠে খেলিতে দেখা যাইতেছে সত্য, কিন্তু এই বৎসরে যেরূপ নৈপুণ্য প্রদর্শন করিতেছেন ইতিপূর্বে কখনও সেইরূপ দেখা যায় নাই। ইস্টবেঙ্গল দল যদি শীল্ড বিজয়ীর সম্মান লাভ করে তবে তাহা আপ্পারাওয়ের জন্যই সম্ভব হইবে। ইনি ছাড়া ইস্টবেঙ্গলের আক্রমণভাগে যে সকল খেলোয়াড় খেলিয়া থাকেন তাঁহাদের সমতুল্য খেলোয়াড় মোহনবাগান দলে অভাব নাই। যাহা হউক ভারতীয় একটি দল শীল্ড বিজয়ী হইবে, ইহাই গৌরবের বিষয়। নিম্নে মোহনবাগান ও ইস্টবেঙ্গল দল কিরূপে ফাইন্যালে উন্নীত হইয়াছে তাহার তালিকা প্রদত্ত হইল :—

মোহনবাগান দল প্রথম খেলায় গত বৎসরের শীল্ড বিজয়ী বি এণ্ড এ রেল-দলকে ২—০ গোলে পরাজিত করে। দ্বিতীয় খেলায় ঢাকা উয়াড়ী দলকে ১—০ গোলে পরাজিত করে। এই স্থানে উল্লেখ করা যাইতে পারে যে, ইতিপূর্বে কোন বৎসর শীল্ডের খেলায় মোহনবাগান, ক্যালকাটা দলকে পরাজিত করিতে পারে নাই। এই বৎসর সর্বপ্রথম শীল্ডের সেমি-ফাইন্যাল খেলায় ক্যালকাটা দলকে পরাজিত করিয়া তাহারা বহুকালের অপযশ হইতে অব্যাহতি পাইয়াছে। আই এফ এ শীল্ড ইতিহাসে ইহা স্মরণীয় হইয়া থাকিবে।

ইস্টবেঙ্গল ক্লাব প্রথম খেলায় বরিশাল ফুটবল এসোসিয়েশন দলকে ২—০ গোলে পরাজিত করে। দ্বিতীয় খেলায় হায়দরাবাদ পুলিশ দলের সহিত পর পর দুইদিন অমীমাংসিতভাবে খেলা শেষ করিয়া তৃতীয় দিনে ২—০ গোলে পরাজিত করিতে সক্ষম হইয়াছে। তৃতীয় খেলায় বগুড়া টাউন দলকে ৩—১ গোলে এবং চতুর্থ খেলায় কালীঘাট দলকে ২—১ গোলে পরাজিত করে।

দুইটি দলের কৃতিত্ব

মোহনবাগান দল এইবার লইয়া মোট চারিবার আই এফ এ শীল্ড ফাইন্যালে উন্নীত হইল। সর্বপ্রথম ১৯১১ সালে উন্নীত হইয়া ইস্টইয়র্ক দলকে ২—১ গোলে পরাজিত করিয়া শীল্ড বিজয়ী হয়। দ্বিতীয়বার ১৯২৩ সালে ক্যালকাটা দলের নিকট ৩—০ গোলে পরাজিত হয় ও তৃতীয়বার ১৯৪০ সালে এরিয়ান্স দলের নিকট ৪—১ গোলে পরাজয় বরণ করে। এই দিক দিয়া ইস্টবেঙ্গল ক্লাবের কৃতিত্ব উল্লেখযোগ্য। এই দল এইবার লইয়া পর পর চারিবার শীল্ড ফাইন্যালে উন্নীত হইল। ভারতীয় দলের মধ্যে ইস্টবেঙ্গল দলই এই গৌরবের প্রথম অধিকারী হইল। ১৯৪২ সালে মহমেডান স্পোর্টিং দলের নিকট ১—০ গোলে পরাজয় বরণ করে। ১৯৪৩ সালে পুলিশ দলকে ৩—০ গোলে পরাজিত করিয়া শীল্ড বিজয়ী হয় এবং ১৯৪৪ সালে বি এণ্ড এ রেল দলের নিকট পরাজিত হয়।

মোহনবাগান ও ইস্টবেঙ্গল উভয় দলই চতুর্থবার শীল্ড ফাইন্যালে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিতেছে। ইহার ফলাফলে একে অপরকে পশ্চাতে ফেলিতে সক্ষম হইবে। দেখা যাক ফল কি হয়। প্রকৃত সৌভাগ্যবান কোন দল!

"দেশ"-এর

নিয়মাবলী

বার্ষিক মূল্য—১৩, ষাণ্মাসিক—৬॥

বিজ্ঞাপনের নিয়ম

"দেশ" পত্রিকায় বিজ্ঞাপনের হার সাধারণত নিম্নলিখিতরূপ ঃ—

সাধারণ পৃষ্ঠা—এক বৎসরের চুক্তিতে
১০০" ও তদূর্ধ্ব ... ৩, প্রতি ইঞ্চি প্রতি বার
৫০"—৯৯" ... ৩৷৷৹ " " " "

সাময়িক বিজ্ঞাপন

৪, টাকা প্রতি ইঞ্চি প্রতি বার

বিজ্ঞাপন সম্বন্ধে অন্যান্য বিবরণ বিজ্ঞাপন বিভাগ হইতে জানা যাইবে।

প্রবন্ধাদি সম্বন্ধে নিয়ম

পাঠক, গ্রাহক ও অনুগ্রাহকবর্গের নিকট হইতে প্রাপ্ত উপযুক্ত প্রবন্ধ, গল্প, কবিতা ইত্যাদি সাদরে গৃহীত হয়।

প্রবন্ধাদি কাগজের এক পৃষ্ঠায় কালিতে লিখিবেন। কোন প্রবন্ধের সহিত ছবি দিতে হইলে অনুগ্রহপূর্বক ছবি সঙ্গে পাঠাইবেন অথবা ছবি কোথায় পাওয়া যাইবে জানাইবেন।

সম্পাদক—"দেশ"
১নং বর্মণ স্ট্রীট, কলিকাতা।

ট্রামে-বাসে

বিলাতের নির্বাচনী প্রতিযোগিতায় আমেরী সাহেবের শোচনীয় পরাজয় ঘটিয়াছে। অবশ্য হারিয়া গেলেও তিনি হার মানিবার পাত্র নহেন। তাই তিনি বলিতেছেন—"Attack on my India policy obviously had no effect." চৌরঙ্গীর স্টেটসম্যানও ঠিক ঐ ধরণের কথাই বলিয়াছেন—"হারাইয়াছ বটে, কিন্তু পামি দত্তও তো কিছু করিতে পারে নাই!" ঠিক কথা। সান্ত্বনা একটা মিলিলেই হইল। লোকটা মরিলেও শুধু চোখটা বাঁচিয়া গিয়াছিল দেখিয়া কে নাকি কোথায় এমনি করিয়া মৃত ব্যক্তির আত্মীয়দের সান্ত্বনা দিয়াছিলেন।

*　　　*　　　*

নির্বাচনে মিঃ চার্চিল পার্লামেন্টের সদস্য নির্বাচিত হইলেও তিনি আর প্রধান মন্ত্রী নহেন। তাঁর দোসরদের মধ্যে এক ইডেন ছাড়া আর প্রায় সকলেই পরাজিত। আর শুধু দলগত নীতির পরাজয় নহে, পারিবারিক জীবনেও তার প্রতিক্রিয়া দেখা গিয়াছে। জামাতা জীবন পরাজিত, তৎসঙ্গে পরাজিত প্রাণাধিক পুত্র। আমরা তো এই দুর্দৈবে সান্ত্বনার ভাষাই খুঁজিয়া পাইতেছিলাম না। স্যার নাজিম যাহোক "Surprised" হইয়া খানিকটা সান্ত্বনার বাণী শুনাইয়াছেন—তাহা না হইলে বেচারী চার্চিলকে খাওয়ানো পরানোই দায় হইয়া উঠিত।



ইতিমধ্যেই তিনি মিঃ এটলীর সঙ্গে পটসডামে যাইতে অস্বীকার করিয়াছেন, রাজদত্ত সম্মানও বিস্বাদ বোধ হইতেছে এবং তাহা গ্রহণে অপারগতা প্রকাশ করিয়াছেন। সত্যি, চোটটা একটু বেশীই লাগিয়াছে।

*　　　*　　　*

অন্যদিকে শ্রমিকদের জয়ে আমাদের ভবিষ্যৎ কতখানি উজ্জ্বল হইয়া উঠিবে এই নিয়া দেশে বিবৃতির বান ডাকিয়াছে। সেই সব অনন্ত-পার বিবৃতিশাস্ত্র হইতে শুধু সারটুকু গ্রহণ করাও আমাদের মত অসারদের পক্ষে অসম্ভব। তাই বিশু খুড়োর শরণই নিতে হইল। তিনি গম্ভীর হইয়া বলিলেন—"Although British election result is an interesting subject, it is not my subject"। বুঝিলাম খুড়ো বার্নার্ড শকে ভেঙ্চাইলেন মাত্র, মূল বিষয়টি এড়াইয়া গেলেন। পরে পীড়াপীড়ি করায় বলিলেন—"তবে একটা গল্প শোন। কোনও এক জমিদার প্রতিবেশী অন্য জমিদারের একটি চাকরকে ভাগাইয়া আনিতে বলিয়াছিলেন—ও বাড়িতে তো তোকে খেতে দেয় এক সকাল আর ঐ সেই বিকেলে। আর আমার বাড়ি যদি আসিস তাহলে সকালে খাবি বিকেলে খাবি, সকালে খাবি, বিকেলে খাবি—সারাদিনই কেবল খাওয়া। আমাদের ভাগ্য পরিবর্তনটি ঐ চাকরের ভাগ্যের মতই হইবে।" দীর্ঘ নিঃশ্বাস ছাড়িয়া খবরের কাগজটা হাতে নিয়া দেখিলাম ইতিমধ্যেই মিঃ বেভিনের ঘ্রাকুপন্থীর বিবৃতির নানারকম ভাষ্য হইতেছে—ইণ্ডিয়া অফিস সম্বন্ধে ভাইনের প্যাঁচ লাগিতেছে। চাকরের ভাগ্য আর কাকে বলে!

*　　　*　　　*

বোর্ড অফ সায়েন্টিফিক এণ্ড ইনডাস-ট্রিয়েল রিসার্চ সম্প্রতি একটি ২,০০০৲ টাকার পুরস্কার ঘোষণা করিয়াছেন। যিনি একটি উন্নত ধরণের উনান প্রস্তুতের পন্থা বাৎলাইতে পারিবেন, তাহাকেই উক্ত পুরস্কার দেওয়া হইবে। আমাদের দেশে উক্ত বিজ্ঞাপনে কোন কাজ হইবে বলিয়া বিশ্বাস হয় না। অনেকদিন "অরন্ধন" খাওয়াতে উনানের ব্যবহারই আমরা একরকম ভুলিয়া গিয়াছি। চাল আর



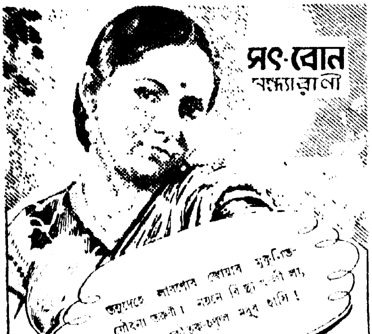
চুলা, কোনটার সম্বন্ধেই আমাদের গর্বের কিছু অবশিষ্ট নাই। একদিন উনানে জল ঢালিয়া ছল করিয়া কাঁদিয়াছি আর এখন উনানে কিছু চাপাইবার অভাবে কাঁদিতেছি।

*　　　*　　　*

সিমলা সম্মেলন সম্বন্ধে স্যার ... স্বামী মুদালিয়ার বলিয়াছেন—"The bus is always there and will move on as soon as they all get into it!" কিন্তু স্যার কি জানেন না যে, যাঁহারা "বাসে" ভ্রমণ করিতে ইচ্ছুক তাঁহারা লটবহর নিয়া প্রস্তুত হইয়াই আছেন। কিন্তু যাঁহারা "মনোরম" ভ্রমণ









করিবেন বলিয়া বায়না ধরিয়াছেন, তাঁরা বাসে না চড়িলে যদি বাস অচলই থাকে, তবে সেই বাস্ সার্ভিসের প্রতি আর যাত্রীদের আস্থা টিকাইয়া রাখা যাইবে না!

* * *

জাতি এবং ধর্মনির্বিশেষে পরস্পর পরস্পরের মধ্যে বিবাহের আদান-প্রদানের জন্য শ্রীযুক্ত রাজাগোপালাচারি



সম্প্রতি একটি আবেদন জানাইয়াছেন। তাঁহার বিশ্বাস ইহাতে নাকি আমাদের সাম্প্রদায়িক সমস্যার সমাধান হইয়া যাইবে। রাজাজীর এই নূতন "ফরমূলা" কতটা কার্যকরী হইবে তা বলা শক্ত। কেননা এই সূত্র ধরিয়া বরের Parityর প্রশ্ন অবশ্যই মাথা চাড়া দিয়া উঠিবে এবং বিভিন্ন দল নিজস্ব বর নির্বাচনের দাবী তারস্বরে ঘোষণা করিতে থাকিবেন। লগ্ন এইভাবেই বহিয়া যাইবে।

* * *

জাপানের মন্ত্রী সুজুকি নাকি ভয়ানক ধূমপান করিতেন। কিন্তু তিনি সম্প্রতি তাঁর গুরুত্বপূর্ণ পদের দায়িত্ব সম্বন্ধে অবহিত হইয়াই তাঁর স্বাস্থ্য সম্বন্ধেও সচেতন হইতে বাধ্য হইয়াছেন এবং ফলে এখন তিনি দিনমানে মাত্র দুইটি "সিগার"এর ধূমপান করেন। ভাল কথা সন্দেহ নাই। কিন্তু তাঁর স্বজাতিরা গাঁজার অভ্যাস ত্যাগ না করা পর্যন্ত অবস্থার কোন উন্নতি হইবে বলিয়া মনে হয় না। প্রসঙ্গত, চার্চিল সম্প্রতি কয়টি করিয়া সিগার টানিতেছেন সেই কথাটাও জানিতে ইচ্ছা হইতেছে।

* * *

শ্রীযুক্ত বিড়লা বলিয়াছেন, আমেরিকায় এমন আহা-মরি বড় একটা কিছুই নাই অর্থাৎ বিলাত সম্বন্ধে ডি এল্ রায়ের মতবাদের মতই তিনি বলিতে চাহিতেছেন—"সেখানে পুরুষগুলো সব পুরুষ অর মেয়েগুলো সব মেয়ে"। আমরা বিড়লাজীর সঙ্গে একমত হইতে পারিলাম না। সেখানে পুরুষদের মধ্যে সত্যিকারের পুরুষ বা "হিম্যান" আছে—আর মেয়েদের মধ্যেও আছে "তারকা"! সত্যি সত্যি আহা-মরি বলিতে হইলে বিড়লাজী যেন হলিউডটা একটু ঘুরিয়া আসেন।

* * *

বাঙলা দেশে অনেক চাউল উদ্বৃত্ত হইয়াছে—খবরটা বিশু খুড়োকে পাঠ করিয়া শুনাইতেই খুড়ো স্থানকালপাত্র ভুলিয়া গান ধরিলেন—"এখনও তারে চোখে দেখিনি, শুধু কানে শুনেছি।" তারপর গান থামাইয়া বলিলেন—"নাও, আনন্দ কর, বিড়ি খাও।" কিন্তু খবরদার দেশলাই চেয়ো না। ও জিনিসটার বাড়তি স্টক্ সম্বন্ধে এখনো সরকারী বিবৃতি পাইনি।

* * *

কথায় কথায় আটকে সীমান্ত গান্ধীর আটকের কাহিনী উঠিয়া পড়িল। গভর্নমেণ্টের অজ্ঞাতে পাঞ্জাব পুলিশের এই জুলুমবাজিতে আমরা সকলেই সাতিশয় বিস্মিত হইলাম। খুড়ো বলিলেন—"এতে বিস্ময়ের কিছু নেই। পুলিশের স্বভাবই এই। হালে দেখলে না বাঙলা গভর্নমেণ্টের তল্লাটে এসে হায়দ্রাবাদ পুলিশ কি জুলুমটাই করে গেল। দু'দিন দু'দিন ইস্টবেঙ্গলকে না হক আটকে রেখে নাস্তানাবুদের একশেষ করেছে।

* * *

ক্রিকেট ক্লাবের সভায় কলিকাতা স্টেডিয়াম সম্বন্ধে নাকি খানিকটা আলাপ আলোচনা হইয়াছে। মিঃ জাসদেনওয়ালা (যিনি বোম্বেতে ব্রেবোর্ন স্টেডিয়াম নির্মাণে অনেক সাহায্য করিয়াছেন) নাকি বলিয়াছেন যে কর্তৃপক্ষকে কি করিয়া চাপ দিয়া স্টেডিয়াম নির্মাণে বাধ্য করাইতে হয় সেই টেক্নিক কলিকাতার নাগরিক জানেন না। কথাটা হয়ত সত্যি। কিন্তু মিঃ জাসদেনওয়ালা জানেন না যে বোম্বাই আম কলিকাতায় চলিতে পারে এবং চলিতে পারে বোম্বাই টকীজের গৌরব সপ্তাহ কিন্তু স্টেডিয়ামের ব্যাপারে বোম্বাই টেক্নিক এইখানে কিছুতেই চলিবে না। ময়দানের মাটি চোরাবালিতে ভর্তি। বাহির হইতে দেখিয়া কিছুই বোঝা যায় না!

হাতে আধুনিক হওয়ার চেয়ে প্রাচীনের ঠিক রূপের প্রতি শ্রদ্ধার সংগে সজাগ থাকাই বাঞ্ছনীয়। তা না হলে কতখানি অপদার্থ নাচের সৃষ্টি হয়, তার একটি উদাহরণ দিচ্ছি।

গত বৎসর কলিকাতায় খ্যাতনামা শিক্ষিত একটি বাঙালী চলচ্চিত্রাভিনেত্রীর নৃত্যের আসরের একটি নাচ এত কুরুচিপূর্ণ ছিল যে, তার পরেই আমি উঠে পড়তে বাধ্য হই। কিন্তু সেই নাচের পর দর্শকদের মাঝে নোংরা উল্লাস ও অর্থ-নিক্ষেপের দৃশ্য দেখেছিলাম নর্তকীকে উদ্দেশ্য করে, তাতে লজ্জায় দুঃখে মন ভারাক্রান্ত হয়েছিল—কলিকাতাবাসী ধনীদের রুচির অবনতি দেখে। অথচ এই নর্তকী প্রাচীন ভারতীয় নাচে একজন বড় সমর্থক হিসেবে নিজেকে প্রচার করে থাকেন।

যোগম্ ও মংগলমের ভারত-নাট্যমের মধ্যে সে ধরণের কোন আবেদন ছিল না—তাই বিলাসী ধনীদের তেমন ভিড় হয়নি। এদের নাচের মধ্যে বড় কথা হল নাচের ভিতর দিয়ে কোন রকমে দর্শকদের বিকৃত রুচির আবেদনকে প্রশ্রয় দেয় না, যা আধুনিক সব নাচের সম্প্রদায়ের বলতে গেলে প্রধান অবলম্বন।

ভারত-নাট্যম দক্ষিণ ভারতের দেবদাসী সম্প্রদায়ের নাচ হিসেবেই বিখ্যাত। এই সম্প্রদায় অতি প্রাচীন কাল থেকেই দেবতা ও সমাজের চিত্ত-বিনোদনে নিয়োজিত। আমাদের দেশে হিন্দুরা তাদের যাকিছু ভালো দেবতাকে না সংকল্প করে গ্রহণ করে না, এই ছিল নিয়ম। নাচেও সেই নিয়মের প্রকাশেই দেবদাসী প্রথার সৃষ্টি। কেবল দেবতার উদ্দেশ্যেই সমাজ এই ব্যবস্থা করেছিল, একথা বললে আমি মানতে রাজি নই। আমাদের সব শিল্পকলার গতি যে পথে নৃত্যেরও গতি ছিল তাই। সেই জন্যে এই সম্প্রদায় যুগ যুগ ধরে যে ভক্তি-শ্রদ্ধা নিয়ে এই বৃত্তিতে নিজেদের জীবন পরিচালিত করছে, তাকে কেউ অবহেলা করতে পারেনি—তাই সমাজ এই সম্প্রদায়কে চিরকালই সমাদর করেছে। এদের একটা বড় গুণ হল ব্যক্তিগত জীবনে এরা যাই থাক না কেন, এরা নাচের আসরে দাঁড়িয়ে নৃত্যে কোনপ্রকার নীচ-মনোভাবের প্রশ্রয় দেয় না। এইটিই আধুনিক শিক্ষিত পেশাদারী নর্তক-নর্তকী সম্প্রদায়ের এদের কাছে বিশেষ করে শেখবার জিনিস। শ্রীমতী মংগলম ও যোগাম তাঁদের প্রাচীন ধারা থেকে এতটুকু বিচ্যুত হননি। তাঁরা উভয়েই তাঁদের গুরুর আশীর্বাদে নৃত্যবিষয়ে যে দক্ষতা লাভ করেছেন—নৃত্য-কলায় অভিজ্ঞ প্রত্যেক ব্যক্তি তার প্রশংসা না করে পারবেন না। অভিনয়ে—দেহের ও পায়ের ছন্দ বৈচিত্র্যে, ও কলানৈপুণ্যে কোথাও এতটুকু জড়তা দেখা যায়নি। প্রত্যেকটি ভংগি এ-যুগের ভারত-নাট্যমের আদর্শে নিখুঁত বলা চলে। দু ঘণ্টা তাঁরা নাচলেন, অথচ দেহে মনে কোথাও প্রাণের প্রাচুর্যের একটুও কম পড়েনি। বর্তমানে তামিল দেশে এই নাচ যেভাবে আসর সাজায়, এরা সেই নিয়মেই সাজিয়েছিলেন বলা চলে। তাই অনেকের কাছে সেদিক থেকেও নাচটি শিক্ষণীয় হয়েছিল। তবে আমার মনে হয়, যদি কেউ প্রত্যেক নৃত্য-সূচীর আগে একটুক্ষণের জন্যে দর্শকদের কাছে সেই নাচের গানের কথাটি ব্যাখ্যা করে দিতেন, তাহলে অভিনয়ের সংগে দর্শকের মন আরও বেশি মিশে যেতে পারতো।

সব শেষে একটি কথা না উল্লেখ করে পারছি না তা হল, দক্ষিণ ভারতে এই নৃত্য-সম্প্রদায়কে আইন দ্বারা উচ্ছেদ করার যে আন্দোলন বহু দিন থেকে শুরু হয়েছে, তা নিয়ে। দক্ষিণ ভারতে দেবদাসী সম্প্রদায় যেভাবে জীবনযাপন করে, তা দোষাবহ যে ঠিকই; কিন্তু কথা হচ্ছে যে, তাদের উচ্ছেদ করতে গিয়ে আমরা তাদের মনোবৃত্তিকে ত মানব-সমাজ থেকে উচ্ছেদ করতে পারবো না বা সমাজে যাদের উৎসাহে ও প্রয়োজনে এই দেবদাসীরা ঘৃণ্য ব্যবসায়ে লিপ্ত থাকে, তাদের আমরা ভালো করতে পারবো না। তাই ঘৃণ্য ধারা ঠিক থেকে যাচ্ছে, মাঝের থেকে তাদের চেষ্টায় যে কলার উৎকর্ষ দেখে আমরা মুগ্ধ হচ্ছিলাম, তাকেও হারাতে বসেছি। অথচ এরা যদি এই ধারাকে না ধরে রাখতো, তা হলে প্রাচীন নৃত্যাভিনয়ের পরিচয় পাওয়া আজ অসম্ভব হোত এবং এরাই যদি এদের সাধনা ও একাগ্রতা দিয়ে এই কলাকে বাঁচিয়ে না রাখে, তবে এ নৃত্যপদ্ধতির ভবিষ্যৎ অন্ধকার। শিক্ষিত সমাজের নৃত্যচর্চা হল সখের চর্চা, তাতে অভাব হয় একাগ্রতার ও সাধনার; সুতরাং তাদের হাতে এ-নাচ বাঁচতে পারেই না।

ইউরোপের বলনাচের নর্তক-নর্তকীদের সাধারণ জীবন সমাজের কাছে যে মোটে প্রশংসার বা আদর্শের জিনিস নয়, এক সকলেই জানেন। তবুও সেই নাচের নর্তকীদের বা সেই নর্তকী সম্প্রদায়কে উচ্ছেদ করতে তারা কখন চায় না, চাইবে না। অথচ আমাদের দেশ যখন তা করতে চাইল এত যুগের পরে, তখনই বুঝলাম আমাদের দেশ ক্রমশই নিজের সংস্কৃতিকে ভুলতে শিখেছে। সত্যকার ভালবাসার অভাব হয়েছে—দেশের প্রতি, তা যতই দেশের স্বাধীনতা নিয়ে বড় বড় কথা ও আন্দোলন চলুক না কেন।



(৪০)

সবারই পর হয়ে থাকবো—কথাটা যত সহজে মাধুরী বলতে পারে, সঞ্জীববাবু ত সহজে বুঝে উঠতে পারে না. এই পর হয়ে থাকার শাস্তি ও অপমান থেকে উদ্ধার পাওয়ার জন্য তিনি গাঁয়ের মায়া কাটাতে পেরেছিলেন। কাউকে আপন-করে পাওয়ার স্বপ্ন যেখানে নেই, সেখানে থেকেই বা লাভ কি? বহুদিন ধরে, বহু ধৈর্যে, বহু কষ্ট-দৈন্য স্বীকার করে সঞ্জীববাবু গ্রামের মাটীর এক দুরাশাকে আঁকড়ে পড়েছিলেন। এভাবে পড়ে থাকার মধ্যেই একটা মোহ ছিল। সকল আকাঙ্ক্ষার এপারেই সে দাঁড়িয়েছে, কিন্তু তবু তাকে নিকটে পাওয়া যায় না—এ এক অদ্ভুত অস্তিত্ব। যদি মাঝখানে একটা দুস্তর ব্যবধান সৃষ্টি করে সে চিরকালের মত ওপারের রহস্যে অস্পষ্ট হয়ে যেত, তবে জীবনের এই অস্থিরতার একটা সমাপ্তি খুঁজে পাওয়া যেত। কিন্তু তা হয়নি। সারদা আজও মান্দার গাঁয়ে রয়েছে, সঞ্জীববাবুও গেঁয়ো হয়েছিলেন, দুরাশার শেষ ইঙ্গিত-টুকু দেখা পর্যন্ত। তাঁর আঙিনার চারদিকে তার পদধ্বনির রেশ শোনা যায়, কিন্তু এই আঙিনার ভেতরে সে কোন দিন আসবে না। এই সামান্য সত্যের নিয়মটুকু যেদিন বুঝতে পারলেন, সেদিন আর এক মুহূর্তে দেরী করেননি সঞ্জীববাবু।

কিন্তু আজ আবার মাধুরী তাঁকে সেই নির্বাসনের ভূমিতেই ফিরে যেতে অনুরোধ করছে। জীবনব্যাপী একটা সংগ্রামের গর্ব আজ আসন্ন হয়ে গেছে, সব দিক দিয়ে পরাজয় স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। আজ আর কখনই উচিত নয়। সারদার নিষ্ঠুর অহংকারের কাছে গিয়ে একেবারে মাথা হেঁট করে ভিখিরী হয়ে যাওয়ার কোন অর্থ হয় না। তাছাড়া, মাধুরীই বা এত সাহস করে কেন? কি আছে সেখানে? জীবনে এত হঠাৎ, এত ভয়ানক ভাবে ঠকে গেল মাধুরী, তবু ওর শিক্ষা হয় না।

সঞ্জীববাবু বললেন—কিন্তু তোর দিন কাটবে কি করে?

মাধুরী—যেভাবে তোমার দিন কেটে যাবে, আমারও সেইভাবে কাটবে।

সঞ্জীববাবু—না বুঝে কোন কথা বলিস না মাধুরী। আমার মতন করে দিন যেন কারও না কাটে।

মাধুরী—আমি সব বুঝেই বলছি বাবা। আমারও দিন কেটে যাবে।

সঞ্জীববাবু ছটফট করে উঠলেন, কিন্তু সে যে তোর পক্ষে ভয়ানক শাস্তি। এ শাস্তি সইবার দরকার কি?

এই প্রশ্নের উত্তর মাধুরীর মনের মধ্যেই গুঞ্জরণ সৃষ্টি করে, ভাষায় প্রকাশ হতে চায় না। শাস্তি না শূন্যতা—ঠিক অনুমান করে উঠতে পারে না মাধুরী। তবু এই পথই সে আজ বেছে নিচ্ছে। যাদের কাছে তার দাবী ছিল, তাদের সঙ্গে কথা বলার পালা ফুরিয়ে গেছে। সেই ব্রত সাঙ্গ হয়ে গেছে। তার সঙ্গে সঙ্গে যত ভুল, গ্লানি ও বেদনার সমাপ্তি হোক। শুধু থেকে যায় একখানি অজ্ঞাত পৃথিবীর আবেদন। নিজেরই গোপনীয়তায় সেই পৃথিবী অলীক হয়ে রয়েছে। বোধ হয় চিরকাল অলীক হয়েই থাকবে। অজয়দার মুখের ভাষায় তার তিলমাত্র আভাসও কোন দিন ফুটে উঠবে না।

ক্ষতি কি? এই নতুন পৃথিবীর ধ্যানে, নীরবে এক এক করে যদি দিন কেটে যায়, ক্ষতি কি?

সারদা বললেন—আর এখানে নয় রে কেশব। এ গাঁয়ে থাকলে, তোর সর্বনাশ হবে।

কেশব—আমিও তাই ঠিক করেছি।

সারদা—তবুও তুই আর একবার ভাল করে ভেবে দেখ। আমার দোষ দিস্ না।

কেশব হেসে ফেললে—আমি সব ভেবে দেখিছি। ভাবনা শেষ হয়ে গেছে। তুমি যা ভেবে ভয় করছো, তার আর কোন মানে হয় না।

সারদা—মাধুরীরা ফিরে এসেছে, শুনেছিস্?

কেশব—হ্যাঁ।

সারদা—তবে?

কেশব—তাতে কিছুই আসে যায় না। ওরা নিজের খেয়ালে চিরকাল এভাবে আসবে আর যাবে, তার জন্য আমরা এভাবে পড়ে থাকতে পারি না।

সারদার চোখ দুটো অকারণে সজল হয়ে উঠেছিল—এতটা ভাবতে পারেনি। সব যেন কেমন গোলমাল হয়ে গেল। কি ভেবেছিলাম, আর কি হলো!

কেশব—আমরা বেঁচে গেলাম মা।

সারদা—হয়তো তাই। সবাই বাঁচতে চায়, কেউ কাউকে বাঁচাতে চায় না।

কেশব—কটা দিন দেরী করতে হবে মা।

সারদা—কেন?

কেশব—অজয়ের অনুরোধ। বাসন্তীর বিয়েটা চুকে যাক্।

সারদা একটু আশ্চর্য হলেন—বাসন্তীর বিয়ে?

কেশব যেন মনের ভেতর একটা বিষণ্ণকর বেদনাকে জোর করে একপাশে সরিয়ে রেখে ক্লান্তভাবে উত্তর দিল—হ্যাঁ, সব ঠিক হয় গেছে।

সারদা কিছুক্ষণ কেশবের মুখের দিকে তাকিয়ে রইলেন। তারপর বললেন—একটা কথা আমার মনে হয়েছিল কেশব, কিন্তু সময় থাকতে মনে পড়েনি, আজ আর মনে করেও কোন লাভ নেই।

কেশব—কি কথা?

সারদা যেন নিজেকে শক্ত করে নিজের মনের ইচ্ছেটার দিকে তাকিয়ে বার বার আপনি বলতে লাগলেন—না না, আজ আর কিছু করবার নেই। বড় অশোভন হবে।

কেশব চুপ করে রইল। সারদা বললেন—বাসন্তীর সঙ্গে তোর দেখা হয়েছে?

কেশব—হ্যাঁ।

সারদা—কি বললে বাসন্তী?

কেশব বিস্মিত হয়ে বললে—কি আর বলবে? আমার কাছে তার বলার মত কি এমন কথা থাকতে পারে?

সারদা—তা নয়, আমি ওকে বলেছিলাম, তোকে কতকগুলি কথা জানিয়ে দেবার জন্য।

কেশব হঠাৎ বিরক্ত ও উত্তেজিত হয়ে পড়লো—আমার আর কারও কথা শোনবার মত শক্তি বা ইচ্ছে নেই। এ গাঁ থেকে যখন চলে যেতে চাইছ, তখন চলে যাবার কথাই শুধু ভাবা উচিত, অন্য কোন কথা নয়।

সারদা—তাই হবে রে বাবা, আর অশান্তি সৃষ্টি করিস না, কিন্তু বাসন্তীর বিয়েটা ভালয় ভালয় চুকে যাক্। বড় লক্ষ্মী, বড় বুদ্ধিমতী মেয়ে।

কেশব—বাসন্তী তোমার কাছে কেন এসেছিল?

সারদা—কি জানি, কিসের জন্য মেয়েটা ভয়ানক রাগ আর অভিমান করে বসে আছে। মাধুরীর নাম শুনলে ও ভয় পেয়ে ওঠে।

কেশবের বিষণ্ণ মুখটা হঠাৎ যেন উত্তপ্ত হয়ে ওঠে। কোথা থেকে লজ্জায় রঞ্জিত ছটা এসে চোখে মুখে ছড়িয়ে পড়ে। মাথা নীচু করে দুর্ভেদ্য কতগুলি ভাবনার মধ্যে যেন পথ খুঁজতে থাকে কেশব।

কেশব—সঞ্জীববাবু আবার গাঁয়ে ফিরে এল কেন বলতে পার?

সারদা অকারণে চমকে উঠলেন—এ প্রশ্ন আমাকে কেন? আমি কি করে বলবো। তারা বড়লোক মানুষ, নিজের খেয়ালে আসছে যাচ্ছে।

কেশব—চক্ষুলজ্জা বলে তো একটা জিনিস আছে।

সারদার মুখটা আরও বিবর্ণ হয়ে উঠলো—চক্ষুলজ্জা? হ্যাঁ, তা তো থাকা উচিত, কিন্তু এইসব মানুষের তাও নাই। শত্রুতা করেও সাধ মেটে না, অপমান পেয়েও লজ্জা হয় না। না, আর এ গাঁয়ে কোনমতেই থাকা চলবে না রে বাবা, তাড়াতাড়ি ব্যবস্থা কর।

কেশব—আজই চল।

সারদা—বাসুর বিয়েটা হয়ে যাক্। মেয়েটার জন্য কি জানি কেন বড় মায়া হয়, ওর মনটা যেন সারাক্ষণ কাঁদছে, একটু ভুলিয়ে ভালিয়ে ওকে বিদেয় করতে হবে।

কেশব তোমার কথার অর্থ আমি বুঝি না।

সারদা—অবুঝেরা কোনদিনই বোঝে না। কিন্তু বাসু তোদের মত অবুঝ নয়।

সারদা দেবী যেন হঠাৎ তাঁর মনের আবেগ ও ভাষায় সঙ্কোচ ও মাত্রা ভুলে গেলেন। অনায়াসে যেন একটা অদম্য কথা বলার সুখের আবেগে বলে চললেন—বাসুর মত মেয়ে গাঁয়ে আর দুটি তিনটি হয় না। ও ঠিক আমারই মত। তাই বোধ হয় ওকে আমি চিনে ফেলেছি। তাই ওকে এত ভাল লাগে। তাই বলি, এত মায়াই বা আসে কেন? এ গাঁয়ে থাকতে পারলে, অন্য কোথাও যেতে চাইবে না বাসু। কিন্তু ঠাঁই নেই, যেতেই হবে। তাই ওকে আশীর্বাদ করি, জীবনে যেন অবুঝ হয়ে না থাকে। বাসু আজ ভয় পাচ্ছে লজ্জা করছে, মুখ লুকোতে চাইছে। যেন একটা ভয়ানক অপরাধ করে ফেলেছে। কিন্তু ওকে বুঝিয়ে দিতে হবে, এ সব কিছুই অপরাধ নয়।

কেশব একেবারে চুপ করেছিল। সারদা হঠাৎ সাবধান হয়ে গেলেন। বললেন—এর মধ্যে তোর কিছু ভাবনা করার নেই কেশব। তুই এত ভাবছিস্ কি?

কেশব—ভাবছি একটা কাজের কথা।

সারদা—কি?

কেশব—তুমি যা বললে তাই। বাসন্তীকে ভুলিয়ে ভালিয়ে বিদেয় দিতে হবে। যেন কোন দুঃখ না নিয়ে যায়।

সারদার মুখটা যেন অপ্রসন্ন হয়ে উঠলো। চুপ করে গেলেন।

কেশব একটু বিচলিতভাবেই বললো—আর কি বলছিলে বল।

সারদা—তোর কথাগুলি শুনতে আমার মোটেই ভাল লাগছে না কেশব। বৃথা তোর সঙ্গে এত বক্‌বক্ করলাম।

কেশব বোকার মত তাকিয়ে রইল। সারদা বেশ রাগ করেই যেন অনুযোগ করলেন—কেন, বাসুকে বিয়ে করতে তোর এত আপত্তি কেন? ভাবতে এত সংকোচ কেন? এতে আশ্চর্য হবারই বা কি আছে?

সঞ্জীববাবু গ্রামে ফিরে এসেছেন। কিন্তু সবারই কাছে প্রথম বিস্ময় হলো—পোড়া বাড়িটাকে আর সারিয়ে তুলবার কোন চেষ্টা করলেন না সঞ্জীববাবু। নতুন একটি মেটে ঘর তুললেন, পিতা-পুত্রী উভয়ে যেন পলাতকের মত একটা গোপন আশ্রয়ে এসে ঠাঁই নিয়েছে। লোকের চোখে তাই ওরা আরও বিস্ময়কর হয়ে ওঠে। এত বড় পয়সাওয়ালা মানুষ সঞ্জীববাবু, তবু বারবার কোন্ সাধে গ্রামের একটি কোণে ঠাঁই পেতে চান, কে জানে? সঞ্জীববাবু এ গ্রামের কোন উপকার করেননি। তাঁর মেয়ে মাধুরী হঠাৎ কালেজে পড়ে সখের স্বদেশী করলো, দুটো দিন হৈ-চৈ করে চুপ করে গেল। এদের স্বরূপ ধরা পড়ে গেছে। এরা আর ধর্তব্যের মধ্যে নয়। এখানে তাদের কেউ কাছে ডেকে শ্রদ্ধা জানাবে না, দুটো পরামর্শ নিতে আসবে না, দুটো কুশলবার্তা জিজ্ঞাসা করবে না। কারণ এরা অত্যন্ত নতুন, ভিন্ন ধরণের ও ভিন্ন ধর্মের। তবু এরা বারবার আসে, লোকে সন্দেহ করে, এর মধ্যে একটা রহস্য আছে এবং সে রহস্য যদি ভালভাবে খুঁজে আবিষ্কার করা যায়, তবে দেখা যাবে যে সঞ্জীব উকিল গ্রামের কোন একটা ভয়ানক ক্ষতি করার জন্যই যেন প্রতিজ্ঞা করে রয়েছেন।

দুদিনের মধ্যেই সঞ্জীববাবু ছটফট করতে লাগলেন, বিকারগ্রস্ত রোগীর মত। নির্বাসনের আশ্রয় মনে করে যেখানে তিনি সকলের থেকে পর হয়ে দিন কাটাবার জন্য এসেছিলেন, তাঁর হঠাৎ মনে হয়েছে, দিন শেষ হয়ে গেছে, আর দিন কাটিয়ে দেবার প্রশ্ন আসে না। নির্বাসন নয়, নিজে সমাধি রচনা করেছেন সঞ্জীববাবু। তাঁর জীবনের সকল আশা উত্তাপ ও বিদ্বন্দ্বের চাঞ্চল্য এখানে এসে একেবারে শেষ হয়ে যেতে চলেছে, কারণ......।

কারণ তিনি শুনতে পেয়েছেন, সারদা ও কেশব গাঁ ছেড়ে চলে যাচ্ছে। ক'মাসের মধ্যেই গ্রামের জীবনে একটা ওলট-পালট হয়ে গেছে। বোর্ডের প্রেসিডেণ্ট ভূদেব গাঁ ছেড়ে চলে গেছে। হেডমাস্টার দিনমণি বিশ্বাস চলে গেছেন, আর আসবেন না। এক একটা ধ্বংসের ভস্মচিহ্ন রেখে তারা চলে গেছে, এ গ্রামের মাটী তাদের সহ্য করতে পারলে না। তবু যেন গ্রামে শান্তি আসেনি। একটা শূন্যতা চারিদিক গ্রাস করে রয়েছে। তবু পাঁচ বছর আগেকার জীবনের কলরব নতুন করে জেগে উঠতে পারেনি।

এই শূন্যতাকে চরম করে দেবে, সেই ঘটনার সংবাদ শুনতে পেয়েছেন সঞ্জীববাবু। সারদা ও কেশব চলে যাবে।

(ক্রমশ)

মর্ম্ম-শাসন

বিমলচন্দ্র ঘোষ

লিখে রাখো নামঃ
পরিণাম খুঁজোনা,
মিছে ভুল বুঝোনা,
কতটুকু দাম—
মনে রাখা, না-রাখার?
এ পৃথিবী কতবার
কত নাম ভুলেছে,
শূন্যের দোলা লেগে
কত স্মৃতি দুলেছে!

লেখো প্রিয়নাম
অবিরাম কবিতায়
তারকায় সবিতায়;

হোক্ মৃতকাম—
গত অমারজনীর
শত স্মৃতি বাহিনীর;

আজি মধু ফাল্গুনে—
মর্ম-শাসনে নাম।

সাপ্তাহিক সংবাদ

দেশী সংবাদ

১লা আগস্ট—বোম্বাই শহরে [illegible]লক মৃত্যু-বার্ষিকী উদ্‌যাপন উপলক্ষে চারিজন লোককে গ্রেপ্তার করিয়া পরে ছাড়িয়া দেওয়া হয়।

[illegible] কলিকাতার ডালিমতলা [illegible]নের এক বাটীতে অমলা দত্ত নামে এক তরুণী পরিধেয় বস্ত্রে আগুন লাগিয়া মারা গিয়াছে।

ছাড়পত্র ছাড়া ভারতবর্ষে প্রবেশের অপরাধে ষোড়শ বর্ষীয়া একটি বালিকাসহ তিনজন রুশ একদিন কারাদণ্ড ও প্রত্যেকে ১৫৲ অর্থদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছে।

২রা আগস্ট—শ্রীনগরে কংগ্রেস সভাপতি মৌলানা আবুল কালাম আজাদ, পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু এবং খান আবদুল গফুর খানের প্রতি সম্মান প্রদর্শনের উদ্দেশ্যে নৌকা-পথে যে শোভাযাত্রা বাহির হয়, মুসলিম [illegible]মেলন দল তৎপ্রতি প্রস্তর বর্ষণ [illegible]ার ফলে দাঙ্গা-হাঙ্গামা বাধে। কাশ্মীর [illegible]জ্যের পুলিশ ৫০ জন দাঙ্গাকারীকে গ্রেপ্তার করিয়াছে। উক্ত প্রস্তর বর্ষণের [illegible] জাতীয় সম্মেলন দলের এক ব্যক্তি নিহত [illegible]য়াছে।

[illegible] বঙ্গীয় ব্যবস্থা পরিষদস্থিত বিরোধী দল-সমূহের নেতৃবৃন্দ বৃটেনের প্রধান মন্ত্রী মিঃ ক্লেমেণ্ট এটলী এবং মিঃ আর্থার গ্রীন-উডের নিকট এক তার পাঠাইয়া তাঁহাদিগকে অবিলম্বে বাঙলা হইতে ভারত শাসন আইনের ৯৩ ধারার শাসন প্রত্যাহার করিয়া সাধারণের মন্ত্রিমণ্ডলী প্রতিষ্ঠার অনুরোধ করিয়াছেন।

অস্তি-চিমুর বন্দী সাহায্য কমিটিকে উহার লণ্ডনের সলিসিটার তারযোগে জানাইয়াছেন যে, প্রিভিকাউন্সিল অস্তি-চিমুর মামলার মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত বন্দীদের আপীল করিবার আবেদন অগ্রাহ্য করিয়াছেন। আগস্ট আন্দোলন সম্পর্কে যে সাতজন অস্তি-চিমুর বন্দীর মৃত্যুদণ্ড হইয়াছে, তাহাদের জীবন রক্ষার ইহাই শেষ চেষ্টা।

৩রা আগস্ট—দায়রা জজ মিঃ আর বি পেমাষ্টার আত্মাবক্স হত্যা মামলার রায় দিয়াছেন। এই মামলার আসামী খান বাহাদুর এম এ খুরো, তাঁহার ভ্রাতা মিঃ মহম্মদ নওয়াজ এবং অপর তিন ব্যক্তিকে জজ মুক্তি দিয়াছেন।

বিহারের ভূতপূর্ব প্রধান মন্ত্রী শ্রীযুত শ্রীকৃষ্ণ সিংহ এবং আরও কতিপয় বিশিষ্ট ব্যক্তি সমবেত-ভাবে অবিলম্বে এবং বিনাসর্তে শ্রীযুত শরৎচন্দ্র বসুর মুক্তি দাবী করিয়া একটি আবেদন প্রচার করিয়াছেন।

বেপরোয়াভাবে সামরিক গাড়ী চালাইবার দরুণ নারায়ণগঞ্জে শীতললক্ষা রোডে ৪ জন লোক চাপা পড়িয়া গুরুতরভাবে জখম হয় এবং পরে হাসপাতালে মারা যায়।

৪ঠা আগস্ট—১৯৪২ সালের অন্ধ্র সার্কুলার সম্পর্কে [illegible]ক বিবৃতি প্রসঙ্গে মহাত্মা গান্ধী [illegible]যে, উক্ত সার্কুলার তাঁহার কিংবা কংগ্রেসের অনুমোদিত নহে।

[illegible] গুলমণিরহাট থানার বড় দারোগাকে মারপিট [illegible]রবার অভিযোগে বৈদোরবাজার গ্রামের বহু-[illegible]কে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে। আরও প্রকাশ, [illegible]শ গ্রামবাসীদের বাড়িতে হানা দিয়াছিল। [illegible] ৯০জন গ্রামবাসী নারী এবং শিশু-[illegible]লইয়া গ্রাম ছাড়িয়া পলাইয়া গিয়াছে। [illegible] ম্যাজিষ্ট্রেটের নিকট তার পাঠান [illegible]হাতে পুলিশের বিরুদ্ধে গুরুতর [illegible]রা হইয়াছে।

[illegible]—এলাহাবাদের জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট [illegible]াবলীর ৫৬ ধারা অনুসারে এই মর্মে একটি আদেশ জারী করিয়াছেন যে, অন্ততঃপক্ষে ৭২ ঘণ্টা পূর্বে তাঁহার নিকট লিখিতভাবে কোন নোটিশ না দিয়া কোনরূপ জনসভা ও শোভাযাত্রাদির অনুষ্ঠান করা চলিবে না।

অস্তি-চিমুর বন্দীদের ফাঁসী স্থগিত রাখার জন্য অনুরোধ করিয়া পার্লামেণ্টের শ্রমিক দলীয় সদস্য মিঃ রেজিন্যাল্ড সোরেনসেন ও ইণ্ডিয়া লীগের সেক্রেটারী ডাঃ ভি কে কৃষ্ণমেনন নূতন ভারতসচিব প্যাথিক লরেন্সের নিকট এক পত্র লিখিয়াছেন।

৬ই আগস্ট—'হিন্দু' পত্রিকার ওয়ার্ধা সংবাদ-দাতা জানাইতেছেন, আগামী অক্টোবর মাসে মহাত্মা গান্ধী বাঙলা পরিদর্শনে আসিবেন বলিয়া প্রতিশ্রুতি দিয়াছেন। গান্ধীজী এক মাস বাঙলায় থাকিবেন। যুদ্ধ ও দুর্ভিক্ষক্লিষ্ট বিভিন্ন জেলা তিনি পরিদর্শন করিবেন।

৭ই আগস্ট—অদ্য কলিকাতায় ও শহর-তলীতে বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের মহাপ্রয়াণ দিবসের চতুর্থ স্মৃতি বার্ষিকী অনুষ্ঠান বিভিন্ন সভাসমিতির মধ্য দিয়া উদ্‌যাপিত হইয়াছে।

গতকল্য মাদ্রাজের গোখলে হলে ভারতীয় ছাত্র কংগ্রেস কর্তৃক আহূত এক বিরাট সভায় অবিলম্বে শ্রীযুত শরৎচন্দ্র বসুর মুক্তির দাবী করা হয়।

বিদেশী সংবাদ

১লা আগস্ট—অদ্য রাত্রিতে পটসডামে তিন প্রধানের বৈঠকের উপসংহার অধিবেশন হয়।

সামরিক শক্তি হিসাবে জাপ নৌবহরকে ধ্বংস করা হইয়াছে বলিয়া মার্কিণ সহকারী নৌসচিব এক ঘোষণায় দাবী করিয়াছেন।

চীনা সেনাবাহিনীগুলির সহিত কুয়োমিং-টাঙ্গের যে সকল প্রধান প্রধান কার্যালয় সংযুক্ত ছিল, ষষ্ঠ কুয়োমিংটাঙ্গ কংগ্রেসে গৃহীত এক প্রস্তাব দ্বারা তাহার সবগুলিই রহিত করিয়া দিয়াছে।

বৃটেনে পাঁচ লক্ষ রেল শ্রমিক ধর্মঘট করিয়া যে অচল অবস্থার সৃষ্টি করিয়াছে, তাহার অবসানের জন্য কর্তৃপক্ষ বিশেষভাবে চেষ্টা করিতেছেন বলিয়া প্রকাশ।

২রা আগস্ট—অদ্য ত্রিনেতৃ সম্মেলনে গৃহীত সাত হাজার শব্দের এক ঘোষণা যুগপৎ লণ্ডন, ওয়াশিংটন, মস্কো ও বার্লিন হইতে প্রকাশিত হইয়াছে। উহাতে নাৎসীবাদ, জার্মান জেনারেল ষ্টাফ এবং জার্মানীর সমরশক্তি সম্পূর্ণ ও চূড়ান্তভাবে ধ্বংস করার এক সর্বসম্মত পরি-কল্পনা আছে।

৩রা আগস্ট—অদ্য দ্বিপ্রহরে বাকিংহাম প্রাসাদে মিঃ এটলী রাজার সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন এবং তাঁহার নূতন সহকর্মিগণের নাম ঘোষণা করেন। মিঃ প্যাথিক লরেন্স ভারতসচিবের পদে বৃত হইয়াছেন। মন্ত্রিসভার নিম্নলিখিত নূতন নাম ঘোষিত হইয়াছে—স্বরাষ্ট্রসচিব—মিঃ চুটার এড; ডোমিনিয়ন সচিব—লর্ড এডিসন; ভারত-সচিব—মিঃ প্যাথিক লরেন্স; নৌসচিব—মিঃ এ ভি আলেকজাণ্ডার; উপনিবেশসচিব—মিঃ জি এইচ হল; সমরসচিব—মিঃ জে জে লসন; বিমান-সচিব—ভাইকাউণ্ট ষ্ট্যানস্‌গেট; স্কটল্যাণ্ডসচিব—মিঃ জোসেফ ওয়েস্ট উড; শ্রম ও জাতীয় উন্নয়ন ব্যবস্থা—মিঃ জি এ আইজ্যাকস।

৪ঠা আগস্ট—যদি বার্লিনে হিটলারের মৃত্যু না ঘটিয়া থাকে, তাহা হইলে তিনি যাহাতে ধরা পড়িতে পারেন, তজ্জন্য পাশ্চাত্য মিত্রশক্তিবর্গ ১ লক্ষ ২৫ হাজার বর্গ মাইল পরিমিত স্থানে কড়া পাহারা বসাইয়াছেন।

জেনারেল ম্যাক আর্থারের উপর রিউকিউ দ্বীপপুঞ্জ হইতে জাপান আক্রমণের ভার ন্যস্ত হইয়াছে। রিউকিউ দ্বীপপুঞ্জ অর্ধবৃত্তাকারে দক্ষিণ জাপান হইতে ফরমোসা পর্যন্ত বিস্তৃত।

৫ই আগস্ট—সরকারীভাবে বলা হইয়াছে যে, দুই সপ্তাহ ব্যাপী যুদ্ধের পর ব্রহ্মে জাপ-বাহিনী কর্তৃক মিত্রসেনার বেষ্টনী ভেদের সংগ্রামের কার্যত অবসান ঘটিয়াছে। দশ সহস্রাধিক জাপসৈন্য নিহত বা বন্দী হইয়াছে।

৬ই আগস্ট—প্রকাশ, মিত্রপক্ষের বিমানের আক্রমণে ফিলিপাইনে জাপানী সৈন্যবাহিনীর ভূতপূর্ব অধিনায়ক জেনারেল ইয়ামাসিতা নিহত হইয়াছেন।

৭ই আগস্ট—মিত্রপক্ষ মানব-ইতিহাসের সর্বা-পেক্ষা শক্তিশালী ও ভীষণ অস্ত্র আণবিক বোমা আবিষ্কার করিয়াছেন এবং জাপানকে এই বোমাবর্ষণের সঙ্কল্পের কথা জানাইয়া দিয়া সতর্ক করিয়া দিয়াছেন। জাপানের হিরোহিতো বন্দরে ইতিপূর্বেই এইরূপ একটি বোমা বর্ষিত হইয়াছে।